উদ্বোধন

।।১০০।।

শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন



সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

শতবর্ষ-প্রাচীন 'উদ্বোধন'

বহুমুখী ও বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বাগ্মিতা, দেশপ্রেম, সাহস এবং তেজস্বিতা তাঁকে এক চিরন্তন কিংবদন্তীতে পরিণত করেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশন' সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত এক আন্তর্জাতিক সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ। ১৯৯৭ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ যে কত বড় সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তার দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণ মিশন। তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভার আরেক উজ্জ্বল নিদর্শন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্ররূপে প্রবর্তিত বাঙলা সাময়িকপত্র 'উদ্বোধন'।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' তার মাঘ ১৪০৪ (জানুয়ারি ১৯৯৮) সংখ্যায় ১০০তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এবং পৌষ ১৪০৫ (ডিসেম্বর ১৯৯৮) সংখ্যায় ১০০তম বর্ষ পূর্ণ করেছে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র হিসাবে কলকাতা থেকে 'উদ্বোধন'-এর প্রবর্তন করেছিলেন। ইংরেজী তারিখটি ছিল ১৪ই জানুয়ারি ১৮৯৯। 'উদ্বোধন' প্রবর্তনের কিছু আগে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ প্রেরণায় 'ব্রহ্মবাদিন' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে দুটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হলেও পত্রিকা-দুটি জন্মলগ্নে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক মুখপত্র ছিল না। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত 'ব্রহ্মবাদিন' ভক্তদের দ্বারা সঙ্ঘের বাইরে থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রবুদ্ধ ভারত' ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুন পর্যন্ত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাইরে থেকে ভক্তদের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে এক মাস (জুলাই) বন্ধ থাকার পর ঐ বছরের আগস্ট মাস থেকে (প্রথমে আলমোড়া, পরে মায়াবতী থেকে) আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

স্বামীজী তাঁর গুরুভাই এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে 'উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পর 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ। স্বামী শুদ্ধানন্দের পর 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন স্বামীজীর আরেক বিখ্যাত গুরুভাই এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী সারদানন্দ। ১০০তম বর্ষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ১৬ জন ত্যাগী সদস্য 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

শুধু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবেই স্বামীজী 'উদ্বোধন'-এর প্রবর্তন করেননি, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে নতুন শক্তি, মাত্রা ও গতিবেগ সঞ্চার করাও ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য। তাছাড়া বাঙালীর মানসলোককে ইতিবাচক ও শক্তিশালী চিন্তা, ভাব ও আদর্শের দ্বারা প্রদীপ্ত করার এবং অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যও তাঁর ছিল। বাঙলা ভাষাকে, বিশেষ করে চলিত বাঙলাকে নতুনভাবে নির্মাণ করার উদ্দেশ্য সামনে রেখে স্বামীজী তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি মৌলিক বাঙলা রচনাগুলি প্রধানত 'উদ্বোধন'-এর জন্যই লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর চলিত বাঙলার শতমুখে প্রশংসা করেছিলেন। সাধু বাঙলার ধ্রুপদী গাম্ভীর্য উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত' এবং 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা' (পরবর্তী কালে 'ভাববার কথা'য় 'বর্তমান সমস্যা' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত) প্রবন্ধে। বস্তুত, 'উদ্বোধন' না থাকলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য দরিদ্রতর হয়ে যেত।

'উদ্বোধন' নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা-রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, স্বামীজীর ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প, লোকসংস্কৃতি-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা 'উদ্বোধন'-এ প্রথম থেকেই নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। ভারতের কোন ধর্মীয় সাময়িকপত্রের এই ঐতিহ্য নেই। 'উদ্বোধন' কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শ প্রচা করে না, কোন সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে না। শতবর্ষ ধ 'উদ্বোধন' তার এই সুমহান ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছে। 'উদ্বোধন'-





শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন

উদ্বোধন

॥১০০॥

শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন

সঙ্কলক ও সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

প্রথম সংস্করণ
উদ্বোধন-বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ-তিথি
১৭ জুন ১৯৯৯
IMIC

অক্ষরবিন্যাস
অরিন্দম বসু
ডি. বি. গ্রাফিক্স
৬/২ইউ/১এ, উমাকান্ত সেন লেন
কলিকাতা-৭০০ ০৩০

মুদ্রক
নৃপেন কুণ্ডু
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০, দমদম রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

অবশেষে শ্রীভগবানের আশীর্বাদে বহু-প্রতীক্ষিত 'উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন' প্রকাশিত হলো। বিগত এক দশক ধরে দেশ-বিদেশ থেকে 'উদ্বোধন'-এর বহু পাঠক ও গ্রাহক এবং অনেক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আমাদের কাছে অনুরোধ করছিলেন, 'উদ্বোধন'-এর শতবর্ষপূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই যেন 'সঙ্কলন'টি প্রকাশিত হয়। সঙ্কলনটি কত প্রত্যাশিত ছিল তাঁদের ব্যগ্রতাতেই তা প্রমাণিত। 'উদ্বোধন'-এর ১০১তম বর্ষেই 'শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন'টি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

'উদ্বোধন'-এর ১০০তম বর্ষ সদ্য অতিক্রান্ত। 'উদ্বোধন' এখন তার ১০১তম বর্ষে পথ হাঁটছে। শতাব্দী অতিক্রম করেও 'উদ্বোধন'-এর শরীরে ক্লান্তি ও বার্ধক্যের কোন চিহ্ন নেই, বরং 'উদ্বোধন' যেন চিরযৌবনের শক্তিতে পূর্ণ। 'উদ্বোধন' তার বিগত শতাব্দীতে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে সে নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত করেছে, বাঙলা ও বাঙালীর মানস দিগন্তকে সে তার দীপ্তিতে আলোকিত করেছে। বিগত ১০০ বছরের বাংলা ও বাঙালীর ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও কৃষ্টির জগতে যে বিবর্তন ঘটেছে 'উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন' তার এক প্রামাণ্য দলিল। ইতিহাসের নিরিখে তাই গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে এক অসামান্য আকরগ্রন্থ। বলা বাহুল্য, 'উদ্বোধন' সম্পর্কে ভবিষ্যৎ গবেষণার কাজেও গ্রন্থটি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

কাগজ, মুদ্রণ এবং বাঁধানোর সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গ্রন্থটির প্রকাশনা-ব্যয় গ্রন্থে মুদ্রিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি হলেও 'উদ্বোধন'-এর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আমরা ১৬ পৃষ্ঠা আলোকচিত্র সহ দীর্ঘ ৯২৮ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ গ্রন্থটির মূল্য মাত্র ১০০ টাকা রেখেছি যাতে এমন মূল্যবান গ্রন্থটি পাঠকসাধারণ সুলভে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিগত ১০০ বছর ধরে প্রকাশিত হাজার হাজার রচনা থেকে গ্রন্থের মূল তথা প্রথম পর্বে মাত্র ১০০টি, দ্বিতীয় পর্বে ৫১টি এবং তৃতীয় তথা শেষ পর্বে ১৬টি রচনা সঙ্কলন ও সম্পাদন করার দুরূহ কাজটি করেছেন 'উদ্বোধন'-এর বর্তমান সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তাঁকে এবিষয়ে সাহায্য করেছেন 'উদ্বোধন'-এর কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী।

'উদ্বোধন'-এর মহান প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে এক অপূর্ব অমৃতপাত্র উপহার দিয়েছিলেন। 'উদ্বোধন' তার ১০০ বছরের সগৌরব পরিক্রমায় সেই অমৃতপাত্র থেকে অজস্র ধারায় অকাতরে মানুষকে সঞ্জীবনী-সুধা বিতরণ করে এসেছে। বর্তমান সঙ্কলন-গ্রন্থটির মাধ্যমে পাঠকসাধারণ সেই সুধার কিয়দংশ আস্বাদ করতে পারবেন। ১০০ বছরের 'নির্বাচিত সঙ্কলন'-এর কাজটি ছিল স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত কঠিন এবং তাতে যে সম্পূর্ণ সফল হতে পেরেছি সে-দাবি আমরা করি না, কিন্তু 'উদ্বোধন : শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন' পাঠকসাধারণ এবং গবেষকদের কাছে যে আনন্দ ও আগ্রহের যথেষ্ট উপাদান সরবরাহ করতে পারবে, সেবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের কারণ 'উদ্বোধন' স্বয়ং। তার প্রতিটি অংশ ''স্বাদু পদে পদে''। 'উদ্বোধন' যেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, ''মিছরির রুটি''। যেখান থেকেই তাকে আস্বাদ করি না কেন সেখানেই সে আমাদের মানস রসনাকে গভীর তৃপ্তি ও আনন্দ দান করে। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থটি যে পাঠকসাধারণ ও গবেষকবৃন্দের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৪ মে ১৯৯৯
ফলহারিণী কালীপূজা, ১৪০৬

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদকের নিবেদন

'উদ্বোধন' একটি নাম-মাত্র নয়; একটি প্রেরণা, একটি ঐতিহ্য, একটি অঙ্গীকারের ঘনীভূত উচ্চারণ। এই একটিমাত্র নামের অনুষঙ্গে তৎক্ষণাৎ স্মৃতিপথে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ। উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, গিরিশচন্দ্র, শ্রীম সহ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পরিকরবৃন্দ। সেইসঙ্গে আলোকিত হয়ে ওঠে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এবং কয়েকটি ভাবনা—ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন, বাঙলা সাহিত্য, অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতা, গুহাহিত অধ্যাত্মসত্যের প্রাঞ্জলীকরণঃ যেগুলি 'উদ্বোধন'-এর অঙ্গের ভূষণ, চরিত্রের মূর্তলক্ষণ। তাই 'উদ্বোধন' একটি নাম-মাত্র নয়—চার অক্ষরে 'উদ্বোধন' একটি মন্ত্র; মনুষ্যত্বের দেবত্বে উত্তরণের প্রণবধ্বনি।

'উদ্বোধন' একটি পত্রিকা মাত্র নয়, 'উদ্বোধন' হলো শ্রীরামকৃষ্ণ-দেহ। সুতরাং যে-গৃহে 'উদ্বোধন' থাকে, সে-গৃহ গৃহ নয়—তা মন্দির। যে 'উদ্বোধন' পাঠ করে—সে একটি পত্রিকা পাঠ করে না, সে অবিরত শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের সৌভাগ্য লাভ করে। 'উদ্বোধন' ছিল শ্রীমা সারদাদেবীর খুব প্রিয়। তাঁকে নিয়মিত 'উদ্বোধন' পাঠ করে শোনানো হতো। তিনি ভক্তদের 'উদ্বোধন' পাঠ করতে বলতেন। একবার পূর্ববঙ্গের এক ভক্ত গুরুতর অসুস্থ হয়ে তাঁকে পত্র লিখেছিলেন—তিনি হয়তো আর বাঁচবেন না, তাই শ্রীশ্রীমা যদি একবার দয়া করে পূর্ববঙ্গে তাঁর বাড়িতে আসেন তাহলে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ হয়। শ্রীশ্রীমা তাঁকে নিজের একটি ছবি ও একবছরের বাঁধানো 'উদ্বোধন' পাঠিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, এর মধ্যেই তিনি তাঁকে পাবেন। অর্থাৎ 'উদ্বোধন' যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, তেমনি আবার স্বয়ং শ্রীমা সারদাদেবীও। 'উদ্বোধন' আবার স্বামী বিবেকানন্দও। স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর মধ্যে যেমন রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মতেজ, তেমনি রয়েছে বীরেন্দ্রকেশরী বিবেকানন্দের ক্ষাত্রবীর্য। তাই 'উদ্বোধন' একইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর।

এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এর নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের শতবর্ষপূর্তি সর্ববিচারে এক আনন্দসংবাদ। কিন্তু সংবাদ তো শুধুই কোন ঘটনার বিবৃতিমাত্র—তাতে আনন্দ কোথায়? আনন্দ এখানে যে, 'উদ্বোধন'

থাকা মানেই আমাদের অনেক আদর্শ, অনেক স্বপ্ন, অনেক সাধনার বেঁচে থাকা; 'উদ্বোধন' থাকা মানেই আমাদের নিত্য উদ্বোধিত হতে থাকা। বাস্তবিক, 'উদ্বোধন' শব্দটির মধ্যে নিত্যত্বের অনুষঙ্গ সংযুক্ত। সংযুক্ত দেশ, কাল, ধর্ম, বর্ণ, জাতির গণ্ডি ভাঙার আহ্বান ও অঙ্গীকার। 'উদ্বোধন' তাই সকলের, সর্বকালের। সেজন্যই 'উদ্বোধন'-এর শতবর্ষপূর্তি আমাদের সকলের কাছে এত আনন্দের। সেই আনন্দ অনেকে মিলে উপভোগ করার জন্যই 'উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন'-এর প্রকাশ। যে-পত্রিকার প্রথম দিকের সম্পাদকের তালিকায় রয়েছেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী সারদানন্দের মতো স্বনামধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা স্বামী বিবেকানন্দের সন্তান, যার প্রবর্তক স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ, যার শিরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীর প্রসন্ন আশীর্বাদ বর্ষিত, যার সর্ব অঙ্গ প্রতিভা, আত্মদান ও প্রেমের পবিত্র স্পর্শমাখা—সেই পত্রিকার ১০০ বছর পূর্তির এর থেকে উপযুক্ত মাধ্যম আর কী-ই বা হতে পারে?

তবে, 'শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন' প্রস্তুত করার কাজটি ছিল একইসঙ্গে দুরূহ এবং গভীর আনন্দদায়ক। দুরূহ এই কারণে যে, মাণিক্যভাণ্ডারের মহামূল্যবান রত্নরাজির মধ্য থেকে ১০০টি মাত্র বাছাই করতে গেলে সেই রত্নচ্ছটায় পদে পদে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আর আনন্দদায়ক এই কারণে—শতাব্দী-প্রাচীন 'উদ্বোধন' এমনই এক মহাসমুদ্র, যা মন্থন করে অমৃত—কেবল অমৃতই লাভ হয় প্রতিনিয়ত। বাস্তবিক, শতবর্ষের 'উদ্বোধন'-এর পুণ্য যাত্রাপথকে উজ্জ্বল আলোয় অভিস্নাত করে রেখেছেন যাঁরা, সেইসব লেখক-লেখিকার তালিকার দিকে তাকালে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। সেখানে একদিকে যেমন রয়েছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ সহ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী সন্তানেরা, তেমনি আরেক দিকে রয়েছেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বর্তমান অধ্যক্ষ সহ প্রাচীন ও বহুমানিত সন্ন্যাসিবৃন্দ। রয়েছেন সেকাল ও একালের বিদগ্ধ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও গবেষকবৃন্দ। কবিদের মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অতি সাম্প্রতিককালের বহু তরুণ প্রতিভা। শুধু কি লেখক-লেখিকার বৈচিত্র্য? বিষয়বৈচিত্র্যেও 'উদ্বোধন' অনন্য। উত্তুঙ্গ গিরিশীর্ষ-জয়ের রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনী যেমন এ-পত্রিকার উপজীব্য হয়েছে, তেমনি আবার এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে মানবচেতনার অতলান্ত গভীরে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল অভিযাত্রার অমৃতকথাও। কেবল রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গই নয়, 'উদ্বোধন' নিজেকে উন্মীলিত করেছে জীবন ও জগতের নানা বিচিত্র আঙিনায়। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি সহ বহুমুখী মনন ও জ্ঞানের চর্চাকে এই মহান পত্রিকা নব নব মাত্রায় প্রাণিত করে তুলেছে বারেবারে।

এখানেই এসে পড়ে 'উদ্বোধন'-এর সর্বজনীন চরিত্রের প্রসঙ্গ। পুরাণের মহীয়সী নারী মদালসা তাঁর শিশুসন্তানকে আত্মস্বরূপ স্মরণ করানোর প্রযত্ন করেছিলেন। আর একালে স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন 'বনের বেদান্ত'কে মানুষের 'ঘরে ঘরে' পৌঁছে দিতে। তাঁরই বার্তাবহ ও মানস সন্তান 'উদ্বোধন' তার শতবর্ষের অভিযাত্রার প্রতিক্ষণে প্রয়াসী হয়েছে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে

বিভিন্ন বয়স, পেশা ও রুচির মানুষের কাছে ধর্ম তথা মানবতার সারসত্যগুলিকে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করতে। সেইসঙ্গে রম্যরচনা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, স্মৃতিকথা, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের সরস, নির্মল অনুভূতির জগৎটিকেও সজীব রাখতে চেষ্টা করেছে সে। 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে নতুন শক্তি, মাত্রা ও গতিবেগ সঞ্চার করাও ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য। তাছাড়া বাঙালীর মানসলোককে ইতিবাচক ও শক্তিশালী চিন্তা, ভাব ও আদর্শ দিয়ে প্রদীপ্ত করার এবং অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যও তাঁর ছিল। বর্তমান 'শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন'-এ 'উদ্বোধন'-এর এই সর্বজনীন রূপটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে ১০০টি বিশিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ রচনা সঙ্কলিত হয়েছে গ্রন্থের মূল তথা প্রথম পর্বে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, সঙ্কলনের কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। তার অন্যতম কারণ, 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত রচনাসমূহের তুল্যমূল্য বিচার করা প্রায় অসম্ভব। আমরা সে-চেষ্টা করিওনি। অতীত এবং বর্তমানের পত্রিকার পাতা থেকে বিভিন্ন বিভাগে প্রতিনিধিস্থানীয় ১০০টি রচনা নির্বাচন করে আমরা গ্রন্থের এই মূল ও প্রথম পর্বটি প্রস্তুত করেছি।

এবার গ্রন্থের বিন্যাস, নির্বাচিত রচনাগুলির বিষয়বস্তু ও প্রাসঙ্গিক দু-চারটি কথা। গ্রন্থটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে স্থান পেয়েছে পূর্বোক্ত ১০০টি পূর্ণাঙ্গ রচনা। ১০০ কেন?—গ্রন্থটি 'উদ্বোধন'-এর 'শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন' বলে। এই ১০০টি রচনার মধ্যে রয়েছে 'উদ্বোধন'-এর জন্য লেখা স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত 'প্রস্তাবনা', যেটি 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথমেই প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুত, এই অসাধারণ রচনাটি ছিল 'উদ্বোধন'-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধ। ঐ সংখ্যায় পৃথক কোন সম্পাদকীয় ছিল না। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এই 'দিগ্‌দর্শক' সম্পাদকীয়টি ছাড়া এ-পর্যন্ত 'উদ্বোধন'-এ সম্পাদকীয় লিখেছেন ষোলজন সন্ন্যাসী; তাঁদের একটি করে সম্পাদকীয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বর্তমান সঙ্কলনের প্রথম পর্বে। প্রসঙ্গত, প্রথমদিকে সব সংখ্যায় সম্পাদকীয় থাকত না, থাকলেও বেশ কিছুকাল সম্পাদকীয়গুলি 'কথাপ্রসঙ্গে' বা অন্য কোন শীর্ষনাম ছাড়াই প্রকাশিত হতো। তারপর মাঝে মাঝে 'কথাপ্রসঙ্গে' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলেও মোটামুটিভাবে ৫৪তম বর্ষের বৈশাখ সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'কথাপ্রসঙ্গে' শিরোনামে প্রকাশিত হয়ে আসছে। গ্রন্থের প্রথম পর্বে এই ১৭টি রচনা ভিন্ন ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজবিজ্ঞান, শিল্প-সঙ্গীত, বিজ্ঞান, মহাজীবন-প্রসঙ্গ, লোকসংস্কৃতি, রম্যরচনা, পরিক্রমা, রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও 'উদ্বোধন'-এর ওপর নির্বাচিত রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম পর্বে একজন লেখকের একটিই রচনা চয়ন করা হয়েছে। তবে এর ব্যতিক্রম হয়েছে 'উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের ক্ষেত্রে। তাঁর রচনা চয়ন করা হয়েছে দুটি। কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু রচনাকে ইচ্ছা সত্ত্বেও স্থান দেওয়া যায়নি অতিদীর্ঘ (অনেকগুলি সংখ্যায় প্রকাশিত) বলে। পরবর্তী কালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে বা অন্য সঙ্কলনগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এমন রচনাকেও গ্রহণ করা

হয়নি। তবে এখানেও ব্যতিক্রম হয়েছে স্বামীজীর 'প্রস্তাবনা' এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের 'গুরু' রচনা-দুটির ক্ষেত্রে। প্রথম পর্বে যাঁদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে, ব্যতিক্রম হিসাবে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পর্বেও তাঁদের রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এমন লেখক আছেন চারজন—স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীম, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘ ৪৫ বছরের মনস্বী লেখক দিলীপকুমার রায়। ব্যতিক্রমের তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই আছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর একটি কবিতা দ্বিতীয় পর্বে এবং একটি প্রবন্ধ তৃতীয় পর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'কবিতা' বরাবরই 'উদ্বোধন'-এর পাতায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এসেছে। কিন্তু প্রথম পর্বে সঙ্কলিত রচনাগুলির গড় দৈর্ঘ্যের তুলনায় কবিতাগুলির গড় দৈর্ঘ্য স্বাভাবিকভাবেই অনেক কম। তাছাড়া, প্রথম পর্বের ১০০টি রচনার মধ্যে 'কবিতা'কে অন্তর্ভুক্ত করলে কবিতার সুদীর্ঘ তালিকার প্রতি সুবিচার করা হতো না। শুধু পূর্ণাঙ্গ রচনা বলেই নয়, সংখ্যাধিক্যের জন্যও কবিতাকে আলাদাভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন বলে আমাদের মনে হয়েছে। সেজন্য দ্বিতীয় পর্বে পৃথগ্‌ভাবে কবিতার সঙ্কলন করা হয়েছে। এই পর্বে স্বামীজীর 'সখার প্রতি' এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতাটি সহ মোট ৫১টি কবিতা নির্বাচিত হয়েছে। তবে এখানেও 'সেরা' বাছাইয়ে আমাদের অসুবিধা ও অবধারিত সীমাবদ্ধতা আমরা সবিনয়ে স্বীকার করে নিচ্ছি।

তৃতীয় পর্বে আমরা 'ভাষান্তর', 'মাধুকরী' ও 'গ্রন্থ-পরিচয়'—এই তিনটি বিভাগে মোট ১৬টি রচনাকে অন্তর্ভুক্ত করে 'সঙ্কলন'টির 'ষোলকলা' পূর্ণ করতে প্রয়াস পেয়েছি।

সমস্ত রচনার বানান ও ক্ষেত্রবিশেষে যতিচিহ্নের স্থাপনরীতি আধুনিক করা হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় পর্বের রচনাগুলি প্রকাশকালের ক্রমানুসারে সজ্জিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যদিও প্রথম সংখ্যা থেকেই 'উদ্বোধন'-এ বিভিন্ন বিষয়ে রচনা প্রকাশিত হয়ে আসছে, কিন্তু বিভাগ-শিরোনাম পদ্ধতিটি সাম্প্রতিক সংযোজন। প্রথম পর্বের বিষয়-বিভাগগুলি আমরা সাম্প্রতিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করে নির্ধারণ করেছি। দ্বিতীয় পর্ব বা কবিতা পর্বটির ক্ষেত্রে কবিদের কালানুক্রমকে আমরা যথাসম্ভব অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।

এই সঙ্কলনগ্রন্থের মধ্য থেকে সচেতন পাঠক দৃষ্টিভঙ্গি ও লিখনশৈলীর একটি ক্রমবিবর্তনের ধারা আবিষ্কার করবেন। আবার, অতীতের দূরদর্শী রচনায় বর্তমান প্রাসঙ্গিকতারও অনেক নিদর্শন মিলবে। সাহিত্যক্ষেত্রে সাহসী ও সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর রয়েছে বহু রচনার মধ্যেই। অতীতের অনেক রচনাই ভবিষ্যৎ শৈলীর পথপ্রদর্শক হয়েছে। এখানে স্বামীজীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর লেখা অধ্যাপক ফ্রেডরিক ম্যাক্সমূলারের শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কিত সুবিখ্যাত গ্রন্থের অবিস্মরণীয় সমালোচনাটি (তৃতীয় পর্বে অন্তর্ভুক্ত), যেটি 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষে অর্থাৎ আজ থেকে ১০০ বছরেরও আগে প্রকাশিত, সেটি একেবারে সাম্প্রতিক কালের গ্রন্থ-সমালোচনার সমস্ত আঙ্গিক, বৈশিষ্ট্য, গুণ এবং তার চেয়েও আরো বেশি কিছুর নিদর্শনবাহী।

বর্তমান সঙ্কলনগ্রন্থটি পরিকল্পনা ও প্রস্তুত করার দুরূহ কাজে প্রথম থেকেই সক্রিয় সহযোগিতা আমরা পেয়েছি তরুণ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্যের। পরবর্তী ও শেষ পর্যায়ে সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রীকল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সাহায্য করেছেন শ্রীমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকাঞ্চনকুমার দাস, শ্রীতুহিন বসু মল্লিক এবং শ্রীমান মুকুল দত্ত। তাঁরা সকলেই 'উদ্বোধন'-এর নিষ্ঠাবান স্বেচ্ছাসেবী। ধন্যবাদ দিলে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন, কিন্তু তাঁদের সকলের কথা আমাদের কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতেই হবে। পাণ্ডুলিপি কম্পোজ করার ব্যাপারে ডি. বি. গ্রাফিক্স-এর তরুণ স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরিন্দম বসু যে নিষ্ঠা ও ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। প্রচ্ছদ-সহ সমগ্র গ্রন্থটির মুদ্রক রমা আর্ট প্রেস-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীনৃপেন কুণ্ডু। তিনি এবং তাঁর সহকারীদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

'উদ্বোধন'-এর প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান। 'উদ্বোধন' যে সমাজের সকল স্তরের মানুষেরই মনের খোরাক যোগাচ্ছে, তার ক্রমবর্ধমান গ্রাহকসংখ্যা থেকে তা সুস্পষ্ট। 'উদ্বোধন'-এ সস্তা চিত্ত-বিনোদনের কোন লেখা থাকে না, বরং 'সিরিয়াস' রচনাই 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়। এমনতর এক পত্রিকার প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'উদ্বোধন' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মহান ভাবাদর্শকে প্রতিটি পাঠকের অন্তর্লোকে পৌঁছে দিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে 'উদ্বোধন'-এর শতবর্ষ সঙ্কলন প্রকাশ করতে যে বিপুল সংখ্যক অনুরোধ আমাদের দপ্তরে এসেছে তা থেকে বোঝা যায়, 'উদ্বোধন'-এর প্রতি মানুষের ভালবাসা আকস্মিক বা ক্ষণিকের নয়, তা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত তেমনি স্থায়ী ও গভীর। সুতরাং 'উদ্বোধন'-এর 'শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন'টি যে তাঁদের কাছে প্রভূত আনন্দের আকর হয়ে উঠবে সেবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

প্রচ্ছদে মুদ্রিত রথচক্রটি কোনারক সূর্য-মন্দিরের। রথচক্র গতির প্রতীক। সূর্যরথচক্র অনন্ত গতির প্রতীক। 'উদ্বোধন' মাত্র ১০০ বছর অতিক্রম করেছে। তার অনন্ত কালের গতিতে ১০০ বছর একটি পদক্ষেপ মাত্র। শত-সহস্র বছর ধরে 'উদ্বোধন' এগিয়ে চলবে তার অনন্ত কালের যাত্রাপথে। যতদিন পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্য থাকবেন, ততদিন থাকবেন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং থাকবে তাঁদের ভাবাদর্শ। ততদিন থাকবে তাঁদের ভাব ও বাণী-শরীর 'উদ্বোধন'ও। প্রচ্ছদে মুদ্রিত সূর্যরথচক্রে 'উদ্বোধন'-এর অব্যাহত, দুর্বার ও অনন্ত গতি প্রতীকায়িত।

আগ্রহী পাঠক 'উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন' গ্রন্থের প্রতিটি রচনাই তার নিজস্ব বিশিষ্টতায় গ্রহণ ও আস্বাদন করতে পারবেন। লক্ষ্য করবেন, কেমন করে এক-একটি রচনা এক-একদিক থেকে 'উদ্বোধন'-এর 'জীবনোদ্দেশ্য'কে সার্থক করে তুলেছে। অনুভব করতে পারবেন, এইরকম শত-সহস্র রচনার নক্ষত্র-সমাবেশ কেমন করে 'উদ্বোধন'-গগনকে চির-উজ্জ্বল করে রেখেছে। সেই অতুলনীয় নক্ষত্র-সমাবেশের কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করাতে পারলেই বর্তমান সঙ্কলনটির উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে আমরা মনে করব।

'উদ্বোধন' ১০০ বছর পূর্ণ করল। এটি একটি প্রতীকী ঘটনা। 'উদ্বোধন' তার বিগত শতাব্দীর বার্তা বহন করেছে, আবার তার পরবর্তী শতাব্দীর এবং ইতিহাসের নতুন শতাব্দীর জন্যও ইতিবাচক বার্তা বহন করে চলবে 'উদ্বোধন'। সুতরাং 'উদ্বোধন'-এর নতুন শতাব্দীতে পদার্পণ দুটি দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। ১০০ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে পরবর্তী ১০০ বছরে নতুন বার্তা দেওয়ার জন্য সে উদ্‌গ্রীব। আবার ইতিহাসের আগামী শতাব্দীতেও যুগোপযোগী বার্তা দেওয়ার জন্যও সে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যকে বহন করে 'উদ্বোধন' একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে 'উদ্বোধন' যেন বলছে, একবিংশ শতাব্দীর জন্য ইতিবাচক বার্তা বহনেও সে দায়বদ্ধ।

ভারতের দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এই প্রথম একটি পত্রিকা ১০০ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্য গঠন করল। আবার নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্য নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের শতবর্ষব্যাপী প্রকাশিত রচনা-সঙ্কলনও ভারতবর্ষে এই প্রথম। শতবর্ষ-প্রাচীন বা ততোধিক প্রাচীন দু-একটি সাময়িকপত্র বাঙলা ভাষায় এখনো প্রচারিত, কিন্তু তাদের শতবর্ষ-পূর্তি বা শতবর্ষ-অতিক্রম কখনোই নিরবচ্ছিন্ন এবং নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি। সুতরাং 'উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন' ভারতবর্ষের সাময়িকপত্রের জগতে এক অনন্য স্থান অধিকার করল। নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যের নিরিখে দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 'উদ্বোধন' এই দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য ভারতের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে চিরদিন প্রথম স্থান অধিকার করে থাকবে। এর পরে যদি কোন পত্রিকা এই দুটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেও, তার স্থান হবে দ্বিতীয়; প্রথম স্থানটি 'উদ্বোধন'-এরই অধিকারে থেকে যাবে চিরকালের জন্য। সবদিক বিচার করে পরিশেষে জানাই যে, আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান গ্রন্থটিই হয়ে উঠবে বাঙলা ভাষায় বিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

১৪ মে ১৯৯৯
ফলহারিণী কালীপূজা, ১৪০৬

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

উদ্বোধন ঃ শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

সম্পাদকীয়

ধর্ম

দর্শন

ইতিহাস

সাহিত্য-সংস্কৃতি

সমাজবিজ্ঞান

শিল্প-সঙ্গীত

বিজ্ঞান

মহাজীবন-প্রসঙ্গ

লোকসংস্কৃতি

রম্যরচনা

পরিক্রমা

রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন

'উদ্বোধন'

দ্বিতীয় পর্ব

কবিতা

তৃতীয় পর্ব

ভাষান্তর

মাধুকরী

গ্রন্থ-পরিচয়

প্রথম পর্ব

'উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনা

স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত—এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসঙ্ঘাত ও সর্বাপেক্ষা অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস বলিলে সচরাচর রাজা রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম ক্রোধ ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা কুচেষ্টায় সাময়িক বিচালিত সামাজিক চিত্রকে বুঝায়; তাহা হয়তো প্রাচীন ভারতের একেবারেই নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-বিতাড়িত, সৌন্দর্যতৃষ্ণা-কৃষ্ট ও মহান-অপ্রতিহতবুদ্ধি, নানাভাবপরিচালিত একটি অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতে নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে-স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন—ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী প্রতি ছত্রে তাহার প্রতিপদ-বিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষ-বিশেষবর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটিকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।

এই জাতি মধ্য-এসিয়া, উত্তর ইউরোপ বা সুমেরুসন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে শনৈঃপদসঞ্চারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভূমিই তাঁহাদের আদিম নিবাস—এখনও জানিবার উপায় নাই।

অথবা ভারতমধ্যস্থ বা ভারতবহির্ভূত-দেশবিশেষনিবাসী একটি বিরাট জাতি নৈসর্গিক নিয়মে স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইউরোপাদি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারা শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায়, নীলচক্ষু বা কৃষ্ণচক্ষু, কৃষ্ণকেশ বা হিরণ্যকেশ ছিলেন—কতিপয় ইউরোপীয় ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য ব্যতিরেকে এই সকল সিদ্ধান্তের আর কোন প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী তাঁহাদের বংশধর কিনা, অথবা ভারতের কোন জাতি কত পরিমাণে তাঁহাদের শোণিত বহন করিতেছেন, এসকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজ নহে।

অনিশ্চিতত্বেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। তবে যে-জাতির মধ্যে সভ্যতার উন্মীলন হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছে—সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তাঁহাদের বংশধর—মানসপুত্র—তাঁহাদের ভাবরাশির—চিন্তারাশির—উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্বত, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া, সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্বচনীয় সূত্রে ভারতীয়চিন্তা-রুধির অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পঁহুছিতেছে। হয়তো আমাদের ভাগ্যে সার্বভৌমিক পৈতৃকসম্পত্তি কিছু অধিক।

ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবিভূষিত একটি ক্ষুদ্রদেশে অল্পসংখ্যক অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশী-সমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল অধ্যবসায়সহায়, পার্থিব-সৌন্দর্য-সৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্বক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন।

অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে যবন বলিত; ইঁহাদের নিজনাম—গ্রীক।

মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্বদৃষ্টান্ত। যে-দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে—অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেস্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; আমরা আধুনিক বাঙ্গালী—আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবনগুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি।

সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ববিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী; এমনকি একজন ইংলন্ডীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন ঃ "যাহা কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীক মনের সৃষ্টি।"

সুদূরস্থিত বিভিন্ন পর্বতসমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়; যখনই ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যতারেখা সুদূরসম্প্রসারিত, এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হয়।

অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরানী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সূত্রিত করে। সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাজলপ্রপাতের সঙ্ঘর্ষে প্রায় অর্ধভূভাগ ঈশাদি-নামাখ্যাত অধ্যাত্মতরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে; এবং বোধহয় আধুনিক সময়ে পুনরায় ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীরচিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ'; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।

এযুগে পূর্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্তমান।

ইউরোপ আমেরিকা, যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন।

কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।

প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে?

পুনর্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা পশুরক্তে পুনর্বার রন্তিদেবের কীর্তির পুনরুদ্দীপন হইবে? গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি আদি প্রাচীন প্রথা পুনরায় কি ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মনুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্বতোমুখী প্রভুতা উপভোগ করিবে? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে?—গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত থাকিবে? জাতিভেদে ভক্ষ্যসম্বন্ধে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টবিচার বঙ্গদেশের ন্যায় থাকিবে বা মান্দ্রাজাদির ন্যায় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে? অথবা পঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্যায় একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে? বর্ণভেদে যৌনসম্বন্ধ মনূক্ত ধর্মের ন্যায় এবং নেপালাদি দেশের ন্যায় অনুলোক্রমে পুনঃ প্রচলিত হইবে বা বঙ্গাদি দেশের ন্যায় এক বর্ণ মধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবিদ্ধ হইয়া অবস্থান করিবে? এ-সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। দেশভেদে, এমনকি একই দেশে, জাতি এবং বংশভেদে আচারের ঘোর বিভিন্নতা-দৃষ্টে মীমাংসা আরও দুরূহতর প্রতীত হইতেছে।

তবে হইবে কি?

যাহা আমাদের নাই, বোধহয় পূর্বকালেও ছিল না—যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘনঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিতদৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তিসঞ্চার আর কিসে হয়? অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা'—সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ-জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে—এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়—আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের নিচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?

এ পেষণেরই বা কি ফল?

দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল? যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মা তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তককণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বনে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে, সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

অতএব সত্ত্বগুণ এখনো বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?

অপর দিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম; সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না; সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী, ইহার সাক্ষী ইতিহাস।

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেইপ্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাটিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধন'-এর জীবনোদ্দেশ্য।

যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়—ভয় হয় পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া যাই—

এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাঁহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে?

কত পর্বতশিখর হইতে কত চিরহিমনদী, কত উৎস, কত জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশাল সুরতরঙ্গিনীরূপে মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে।

কত বিবিধ প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ, দেশদেশান্তর হইতে কত সাধুহৃদয়, কত ওজস্বিমস্তিষ্ক হইতে প্রসৃত হইয়া নর-রঙ্গক্ষেত্র, কর্মভূমি ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। লৌহবর্ত্ম-বাষ্পপোতবাহন ও তড়িৎসহায়-ইংরেজের আধিপত্যে বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব, রীতিনীতি, দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে—ক্রোধ-কোলাহল, রুধিরপাতাদি সমস্তই হইয়া গিয়াছে, এ-তরঙ্গরোধের শক্তি হিন্দুসমাজে নাই। যন্ত্রোদ্ধৃতজল হইতে মৃতজীবাস্থিবিশোধিত শর্করা পর্যন্ত সকলই বহু বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল; আইনের প্রবল প্রভাবে ধীরে ধীরে অতি যত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে—রাখিবার শক্তি নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন? ''সত্যমেব জয়তে নানৃতং''—এই বেদবাণী কি মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে—সেই আচারগুলিই অনাচার ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়।

''বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়''। নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এইসকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষবুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; কেবল আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান কর।* □

*১ বর্ষ, ১ সংখ্যা

আনন্দময়ীর আগমন

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

মা আবার আমাদের দেখতে আসছেন। প্রিয়তম সন্তানদিগের নিকট স্নেহভরে ধেয়ে ধেয়ে আসছেন। স্মরণ করলে আনন্দে হৃদয় ভরে যায়। মা আমাদের কত দয়াময়ী! কতই স্নেহময়ী! প্রতি বৎসরেই আমাদিগকে না দেখতে এসে থাকতে পারেন না। বেশি দিন ছেলেকে না দেখে কি থাকতে পারেন? তাই মায়ের অত সজল নয়ন। স্নেহময়ী স্নেহে এত ভরা না হলে কি এ-সকল অস্ফুট শুষ্ক সন্তানদিগের ভিতরে স্নেহের উদ্রেক করে দিতে পারেন? মায়ের নিকট হতেই এত অবিরত ধারায় স্নেহ পাইয়া তো আমরা অপরকে কিঞ্চিৎ স্নেহের চোখে দেখতে শিখেছি।

মাকে অনায়াসেই ভুলে যেতে পারি—কিছুই আশ্চর্য নয়; মা ছেলেকে কখনোই ভুলতে পারেন না। মা নিজে জানেন ছেলে কি বস্তু। ছেলে জানে না, 'মা' কি বস্তু, মায়ের কত গুণ, মায়ের কত মহিমা; যদি জানতুম, আজ আমাদের এরূপ অবস্থা কি হতো? মা নিজে ছেলেকে গর্ভে ধারণ করেছেন, প্রসব করেছেন, কত করে মানুষ করেছেন; ছেলে কি বস্তু, মা খুবই জানেন। না থাকতে পেরে, এত হামেশা ছেলেকে মা দেখতে আসেন! এসে ভালবেসে কত ভক্তি বিশ্বাস, কত ভালবাসা, উদারতা, কি অদ্ভুতরূপে অন্তরে অন্তরে শিখাইয়া যান। আহা! মায়ের সে ভালবাসার, সে ক্ষমাশীলতার এক কণাও যদি পাই, মায়ের ছেলে বলে নিজেকে একদিনের তরেও সাধ মিটাইয়া পরিচয় দিই।

আমাদের মাকে ভাল করে ঠাউরে ঠাউরে দেখেছেন? মার চোখ কত স্নেহে ভরা, জলে ছলছল; মা কত আনন্দে ভরা, কাছে দাঁড়াইলেই যেন শরীর মন হৃদয় সমস্ত এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মা আসবেন—কত শত লোকে কত আনন্দ অনুভব করছেন; মাকে দেখব—কত লোকে সমস্ত কাজকর্ম ফেলে-ঝেলে দেশ-দেশান্তর হতে চলে আসছেন। মাকে প্রাণ ভরে পূজা করব—কত লোকে কত প্রকারের দ্রব্যাদি দূর দূর দেশ হতে সংগ্রহ করে আনছেন। আজ ঘরে মা আসবেন—কতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কত নূতন নূতন বেশভূষা, কতই পরস্পর প্রীতিসম্ভাষণ, কত প্রকারেরই আনন্দ-উল্লাস হতেছে। কত লোকে ঘরের মলা [ময়লা], বস্ত্রের মলা, শরীরের মলা, মনের মলা সব দূর করে দিতেছেন। মা আসবেন—দরিদ্র ও ধনী সমভাবে আনন্দে মত্ত হতেছেন। ধনীর প্রতিও যেমন স্নেহ, দরিদ্রের প্রতিও মার তেমনি স্নেহ। ধনীরও কথা যেমন শোনেন, গরিবের কথাও মা তেমনি শোনেন। গরিব, মায়ের কানে কানে বলে দিলেন: ''মা, আবার আমার ঘরে এস।'' ''আমার গরিব ছেলের আমি ছাড়া আর কেহই নাই''—ঠিক বৎসর যেতে না যেতে মা আবার স্নেহভরে এসে উপস্থিত। গরিব খেতে

পায় না; তত্রাচ—মায়ের এমনি কৃপা—গরিব, মায়ের সাধের পূজা কেমন সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হন।

মায়ের উন্নত ছেলেরা বলেন, "আমাদের মা—এত ছোট মা নয়। আমাদের মা সর্বব্যাপী। তাঁর আবার আগমন, আবাহন ও বিসর্জন কি? তাঁর আবার চাল-কলা দিয়া পূজা কি?"

আমাদের কিন্তু এতে মন ওঠে না। আমাদের মা সব রকমই হতে পারেন। "তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, এবং এছাড়া আর কত কি হতে পারেন, তা কে জানে?" তিনি অনন্ত; তাঁহার গুণ অনন্ত, মাহাত্ম্য অনন্ত, রূপও তাঁর অনন্ত। তিনি ভক্তবৎসল। অপার তাঁর করুণা। যে-ছেলে যেরূপে তাঁকে পেলে আনন্দ পায়, তার নিকট সেই রূপেই প্রকাশিত হন। তিনি না কৃপা করে আমাদের আধার অনুযায়ী প্রকাশিত হলে আমাদের সাধ্য কি, সে অসীম অনন্তের স্বরূপ একেবারে বোধগম্য করি। আমরা যখন বড় হব, আমাদের বুদ্ধি যখন খুব মার্জিত হবে, হৃদয় যখন দর্পণের ন্যায় নির্মল হবে; তখন মা আমাদের নিকটে তাঁর অত গম্ভীরভাব, অত উচ্চ অবাঙমনসোগোচর ভাব ধারণ করলে কিছু তত ক্ষতি হবে না। এখন আমরা অতি শিশু, এখন থেকে যত মাকে আমরা স্বচক্ষে দেখে নেব, ততই আমাদের হৃদয়ে মায়ের ছবি অঙ্কিত হয়ে যেতে থাকবে, ততই মায়ের গুণ, মায়ের ভাব, অন্তরে অন্তরে গেঁথে যেতে থাকবে। বাল্যকালে যাহা করা যায়, শুনা যায়, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে; এ সময়ে অনন্ত অসীম ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ ভাব বোঝা বড়ই কঠিন, এমনকি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এদিকে, নানা প্রকারের পার্থিব অনিত্য ভাবসকলের সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হতে লাগল; বড় হয়ে দেখলুম মনের ভিতর কতই আবর্জনা এসে জুটেছে—সাফ করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখ বুজিয়ে দুদণ্ড ধ্যান করতে গেলুম—একপ্রকার অন্ধকারই দেখি। বড় হলুম বটে, কিন্তু বিশ্বাস ভক্তিতে বালকের মতো—এমনকি সেই নির্মলবুদ্ধি বালকের অপেক্ষাও অধম রহিলাম। আবার বালকের মতো মা বলে যখন কিছু জিনিস চোখে দেখতে, হাতে স্পর্শ করতে আরম্ভ করলুম, তখন অনেক কষ্টে একটু উন্নতি বোধ করতে লাগলুম। ক্রমশ বুঝলুম মায়ের মূর্তিপূজা দুর্বল মনকে কত সাহায্য করে; অল্পেই কত ফলপ্রদ হয়।

আমাদের মা তো খালি মাটির বা খেলাঘরের মা নয়। শুনেছিলাম, এখন বিশ্বাসও হয়েছে—আমাদের মা শুনতে পায়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। আমাদের মা সর্বমঙ্গলা, অন্তর্যামিনী, সর্বশক্তিমতী, সর্বশক্তিস্বরূপা। একটি সাধক গাহিয়াছিলেন—"আমার মা যদি কালো হত, তবে কি ডাকিতাম এত; যার কালো তার কালো শ্যামা, আমার সে যে ভাল। যদি কালো, তবে কেন হৃদিপদ্ম করে আলো।" আমার মাকে ডেকে; আমার মাকে পূজে, আমার হৃদয় পূর্ণ হচ্ছে—কি করে অস্বীকার করি। মার কাছে যেটা জোর করে অন্তরের সহিত বলি, সেটা যে খেটে যায়—কি করে তা না মানি। "জাননা রে মন পরমকারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।" মা কি আমার অমনি যে সে; আমি কি অমনি যাকে তাকে মা বলি।—

দেব্যুপনিষদ্ বলছেন—"সর্বে বৈ দেবা দেবীম্ উপতস্থুঃ। কাসি ত্বং মহাদেবি! সাব্রবীৎ অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ শূন্যঞ্চাশূন্যঞ্চ অহমানন্দানানন্দাঃ বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহম্। ব্রহ্মাব্রহ্মণী...।" অর্থাৎ, দেবীর নিকট গিয়া দেবতাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "আপনি কে মহাদেবি?" দেবী বলিলেন ঃ "আমি ব্রহ্মস্বরূপা; আমা হইতেই প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ উৎপন্ন; আমি শূন্য অশূন্য, আনন্দ নিরানন্দ, বিজ্ঞান অবিজ্ঞান; আমিই ব্রহ্মা অব্রহ্মা"; ইত্যাদি ইত্যাদি।

বৈদিক দেবীসূক্তে দেবী বলছেন—

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্।।
ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।।...
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা...।।

অর্থাৎ আমিই জগদীশ্বরী, সকলকে আমিই ধন দিয়া থাকি, সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি, যাবতীয় যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ; আমি সকল স্থানেই বাস করি—সকলের দেহেই অবস্থান করি; দেবগণ যেখানে যাহাই করুন, আমারই উপাসনা করেন। আমারই দ্বারা, অর্থাৎ সকলের ভিতর আমার শক্তি থাকার দরুনই; সকলে আহারাদি করিতে পারে, দেখিতে শুনিতে পারে, আমারই শক্তির দ্বারা সকলে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে পারে। আমাকে যিনি মানেন না তিনি ক্ষয়প্রাপ্ত হন। আমিই কারণের কারণ। পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থে চৈতন্য এবং মায়ারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি।

বহ্বৃচোপনিষদ্ প্রচার করিতেছেন—"তস্যা এব ব্রহ্মা অজীজনৎ। বিষ্ণুরজীজনৎ। রুদ্রোঽজীজনৎ।... সর্বমজীজনৎ। সর্বং শাক্তমজীজনৎ।" অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি সমস্তই শক্তি হইতে উৎপন্ন।

এই শক্তিই নিরাকার সর্বব্যাপী হইয়াও ভক্তের হিতার্থে সাকার রূপ ধারণ করিতেছেন, যথা—সামবেদীয় কেনোপনিষদ্ বলিতেছেন, "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্"—অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বহু শোভমানা স্ত্রীমূর্তি ধারণপূর্বক 'উমা হৈমবতী' রূপে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন।

মেধস ঋষি সুরথ রাজাকে বলিতেছেন, "নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততং। তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম।। দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।।"—অর্থাৎ সেই জগন্মূর্তিস্বরূপ সর্বব্যাপী মহামায়া জন্মাদিরহিত ও নিত্য হইলেও প্রায়ই ভক্তদিগের কার্যসিদ্ধির জন্য মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হন। যখন এইরূপ আবির্ভূত হন, তিনি নিত্য হইলেও তখন তাঁহাকে "উৎপন্ন" অথবা "অবতার" বলা যায়।

শিশু গর্ভধারিণীকে "মা" বলে ডাকে; 'মা যে কি বস্তু' তা কি বুঝিয়া ডাকে? "মা" বলে ডাকতে হয়—ডাকে। জোর মেরে কেটে "মা" বলে

ডাকলে, মার কাছে গেলে, মার কোলে উঠলে একরকম শান্তি পায়; তাই ''মা'' বলে ডাকে। যখন বড় হয় তখন ''মা'' যে কি বস্তু তা ক্রমশ একটু একটু করে বুঝতে পারে। তেমনি আমরাও আগে যখন দশভুজা আনন্দময়ীকে ''মা'' বলে ডাকতুম তখন তত মাকে বুঝতুম না। একটু বড় হলুম, শুনলুম 'সেই মা হচ্ছেন—মা দুর্গা, মা হচ্ছেন—ভগবতী ঈশ্বরী—মাকে নমো করতে হয়, পুজো করতে হয়'।

আরো একটু বড় হলুম, জানলুম—সেই দশভুজা মা আমাদের দুঃখ মোচন করেন; বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, অন্তরের সহিত ডাকলে কথা শোনেন। এখন একটু জ্ঞান হয়েছে—সেই দশভুজা দুর্গা সম্বন্ধে বুঝছি, ''কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী। সাধকেরি বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী।। কভু কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী।।'' আরো যখন বুড়ো হব তখন হয়তো এও উপলব্ধি করতে পারব—

''যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়।
তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়, সকলি মা তুমি ত্রিলোকব্যাপিনী।।''

আমাদের মা অপরের চোখে মাটির মা হতে পারে; ভক্তের চোখে 'সচ্চিদানন্দময়ী'—চিদ্‌ঘন মূর্তি। মা সর্বব্যাপী—শূন্যে থাকতে পারেন, মানুষের ভিতরে থাকতে পারেন; গাছের ভিতরে, ইট কাঠের ভিতরে, এমনকি সেই ক্ষুদ্র বালুকণার ভিতরেও থাকতে পারেন; আর আমার মা, আমার হাতের গড়া এত সাধের আনন্দময়ী প্রতিমায় থাকবেন না—এ কখনোই হতে পারে না। আমার যদি ভক্তি থাকে; বিশ্বাস থাকে; আমি যদি অন্তরের সহিত মাকে ডাকি; প্রাণের সহিত মার কাছে কেঁদে বলি; মার জন্যে যদি সত্যই আমার প্রাণ ছটফট করে; মাকে না দেখতে পেলে মহা অশান্তি বোধ করি—প্রাণ বেরিয়ে যায় এমন যদি হয়—নিশ্চয়ই বলছি—মা আসবেনই আসবেন; এই মাটির প্রতিমার ভিতরেই আসবেন। যেখানে বলব সেইখানেই আসবেন; যেমন করে হলে আমার এই ক্ষুদ্র মন তাঁকে বুঝতে পারবে, তেমনি করেই তিনি আমার কাছে আসবেন। মা সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন; মা সত্যই অন্তর্যামী, সত্যই ভক্ত-বৎসল, সত্যই স্নেহময়ী জননী। ছেলে প্রাণের সহিত ডাকলে মা আসবেনই আসবেন, কোনও সন্দেহ নাই। মা সর্বশক্তিমতী; আমার ক্ষুদ্র আধারের মতো হয়েই মা আমার নিকট প্রকাশিত হবেনই হবেন।

''এস মা এস মা ও হৃদয়রমা পরাণ-পুতলি গো।
হৃদয় আসনে একবার হও মা আসীন নিরখি তোমায় গো।।
জন্মাবধি তব মুখপানে চেয়ে, আমি ধরি এ জীবন যে যাতনা সয়ে,
(তাত জান গো।)
একবার হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী গো''।* □

* ১ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা

উন্নতির উপায়

স্বামী শুদ্ধানন্দ

অনেকেরই মনে অজ্ঞাতসারে একটা ভাব আছে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার, উন্নতি করিবার একটা নির্দিষ্ট প্রণালী আছে—এই প্রণালীটি কোন প্রকারে জানিতে পারিলেই মানুষ উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে। এই প্রণালীটি জানিবার জন্য মানুষ কতই না চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহার ফলে কতই না বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সকলেই সমগ্র জগৎকে তাঁহার নির্দিষ্ট প্রণালীর সহায়ে উন্নতির চরম সীমায় লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক কতই না প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। মানবজীবনের কতই সমস্যা মানুষের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার কতপ্রকার বিচিত্র সমাধানও মানবসমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে। জগতের বর্তমানকালেও আমরা কত কত সম্প্রদায়ের সহিত পরিচিত হইলাম এবং কতপ্রকার কথাই না শুনিলাম। অহরহ কত কথাই না শুনিতেছি এবং কতই না নূতন মতের অভ্যুত্থান দর্শনে কখন-বা আশান্বিত, কখন-বা ভীত হইতেছি।

একপ্রকার চিন্তাপ্রণালী আছে—তাহাতে পূর্ব পূর্ব মতগুলিকে বৃথা বলিয়া উল্লেখ করিয়া নবোদ্ভাবিত প্রণালীবিশেষকে সকল সমস্যার মীমাংসক বলিয়া নির্দেশ করে। কেহ কেহ আবার পূর্ব পূর্ব প্রণালীগুলির আংশিক সত্যতা স্বীকার করিয়া নিজ মতকেই পূর্ণাঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিতে ভালবাসেন। আমিও যে এবিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত দোষ হইতে মুক্ত হইব, এ-স্পর্ধা রাখি না। আমি শিষ্য ও ছাত্র—আমার কার্য আলোচনা করা মাত্র—নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার বা প্রচার করা নহে।

বস্তুত নূতন কথাটিই আমার নিকট কেমন নূতন নূতন ঠেকে। আমি দেখিতেছি, জগতে নূতন কিছুই নহে। আমি দেখিতেছি, সেই এক পুরাতন বাণীই নূতন নূতন আকারে প্রকাশ হইতেছে। আমি আশা করি যে, জগৎ কোনদিন স্বর্গরাজ্যে পরিণীত হইবে। কিন্তু আশা না রাখিলেও আমি কার্য হইতে বিরত নহি। কারণ, কার্যই জীবন। নূতন কিছু না থাকিলেও পুরাতনের নূতন করিয়া উপলব্ধি আছে। সেই উপলব্ধিতে আশা আছে, বিশ্বাস আছে, জীবন আছে, আলো আছে, অমৃত আছে।

তাই আজি যাহা লইয়া হে পাঠক, তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, তাহাও একটা সামান্য পুরাতন কথা—কিন্তু ঐ পুরাতন কথা আমার প্রাণে নূতন করিয়া জাগিয়াছে—আমি ইহাতে আশাবাণী পাইয়াছি। যদি কেহ উহা গ্রহণ করিতে পারে, আমার বিশ্বাস—সেও বল পাইবে।

কথাটি কি? কথাটি এই—জগতের উন্নতির নূতন প্রণালী কিছুই নাই। প্রকৃত প্রণালীটি সনাতন—সৃষ্টির মতো অনাদি অনন্ত। চেষ্টা কর। যাহা লাভ করিতে চাহিতেছ, তাহার জন্য উদ্যম কর আর তোমার বুদ্ধি—উহা যতই ক্ষুদ্র হউক, লোকে উহাকে যতই ছোট বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা করুক—তুমি সেই বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া বিচার করিয়াই কর্তব্যাকর্তব্য স্থির কর। মোটের উপর—আত্মবিশ্বাস আশ্রয় কর। এই আত্মবিশ্বাস কথাটির ভিতর কত শক্তি, কত বল, কত প্রাণ, কত বীর্য, কত ওজঃ, কত অমৃত নিহিত রহিয়াছে বলিতে পারি না। এই আত্মবিশ্বাস-রূপ খুঁটিটি পাইলে ক্রমে আর সব পাইবে। বলিতে পার, আমার তো কত ভুলভ্রান্তি হইতে পারে! পাগল, ভুলভ্রান্তি এড়াইবে কিরূপে? যাকে ভুল বলিতেছ, সেটাও যে তোমার একটা মহাশিক্ষা। আর যখন তুমি অপরের বাক্যে বা কোন গ্রন্থ প্রমাণে নিজ কর্তব্য স্থির করিয়াছ বলিয়া নির্দেশ কর, তখন তোমার বুদ্ধিই কি তোমাকে সেই অপরের বাক্যের বা গ্রন্থবিশেষের সত্যতার প্রমাণ হয় না? আর তুমিও কি নিজেই ঐ সকল বাক্যের নিজ মনোমত টীকা করিয়া কার্যে পরিচালিত হও না? অতএব চরমে তোমার নিজ বুদ্ধিই কি চূড়ান্ত প্রমাণরূপে পরিগণিত হয় না?

বুদ্ধি আজ যাহা নিশ্চয় করিতেছে, কাল তাহার বিপরীত করিতে বলে কেন! বুদ্ধি যদি তোমার জীবন্ত হয়, তবেই নূতন নূতন কথা বলিবে অথবা সনাতন প্রাচীন সত্যকেই নূতন নূতন ভাবে, নূতন নূতন দিক হইতে, নূতন নূতন দৃষ্টি হইতে দেখিবে। চিরকাল এক পন্থার অনুযায়ী যে, তাহার উপর বড় বিশ্বাস করিও না। জানিও, সে মরিয়াছে। জীবনে কৌমার, যৌবন, জরা, বার্ধক্য আছে; সমাজে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ ও ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমবিভাগ আছে; সমগ্র প্রকৃতিরই লক্ষণ একত্বে বহুত্ব। এই বহুত্বকে বিনষ্ট করিতে যাইও না; প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অগ্রসর হও। তথায় দেখিবে প্রকৃত একত্ব, তথায় দেখিবে প্রকৃত জীবন, প্রকৃত অমৃতত্ব।

যতদিন না তথায় পৌঁছিতেছ, দোহাই তোমার, তোমার নিজ মনোমতো এক প্রণালীতে জগৎকে আবদ্ধ করিতে যাইও না। দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অনেক দার্শনিক সম্প্রদায় দেখিলাম; শাক্ত বৈষ্ণবাদি অনেক ধর্মসম্প্রদায় দেখিলাম; রক্ষণশীল উদারনৈতিক প্রভৃতি অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক সমিতিও দেখিলাম; জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের বিবাদ, বিভিন্ন ভাব লইয়া ঘোর সঙ্ঘর্ষ দ্বন্দ্ব দিবানিশি দেখিতেছি, শুনিতেছি ও বুঝিতেছি। দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ আর কোন বিশেষ মতে সায় দিতে চায় না; অথচ কাহাকেও মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। প্রাণ হইতে সদাই এই বাণী উত্থিত হইতে থাকে যে, ভাই, যে যে-পথে চলিয়াছ, সে সেই পথেই অগ্রসর হও, অগ্রসর হও; ঐ দেখ দূরে আলো দেখা যাইতেছে। উহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, উহাকে ধ্রুবতারা করিয়া জীবনসংগ্রামে ঝাঁপ দাও; পরচর্চার সময় নাই, আত্মচর্চা কর। "তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্য বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতত্বস্যৈষ সেতুঃ—" সেই আত্মাকেই জান, আর সকল বৃথা বাক্য পরিত্যাগ কর।

আশঙ্কা—এরূপ প্রবল উদারতায় উন্নতির বিশেষ বিঘ্ন হইবে। লোকে একটা কিছু ধরিতে ছুঁইতে না পাইলে অন্ধকারে হাতড়াইয়া বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে। এ অমূলক আশঙ্কা করিও না, বিশ্বাসী হও, তোমার আমার জন্য কিছু আটকাইয়া থাকিবে না। যে যাহা চাহিতেছে সে তাহা পাইবে। জগদ্ধাত্রী মহাশক্তির লীলাক্ষেত্র এই জগৎ। তুমি আমি যন্ত্র মাত্র। তিনি যাহাকে বলাইবেন, সে বলিবে; তিনি যাহাকে শুনাইবেন, সে শুনিবে; তিনি যাহাকে যাহা করাইবেন, সে তাহাই করিবে; শক্তি থাকে, রঙ্গময়ীর রঙ্গ দেখ ও অবাক হও।

মহা পুরুষকার ও মহানির্ভরে সামঞ্জস্য আছে। এমন স্থান আছে—যেখানে জ্ঞান ভক্তির সহিত কোলাকুলি করে, যেখানে বাঘে হরিণে নির্বিবাদে খেলা করে। কেবল দেখিয়া যাও, কতদূরের জল কতদূরে গিয়া গড়ায়। আর দেখিয়া কবির সহিত উচ্চঃস্বরে গাহিয়া বল, "যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।"* □

*৯ বর্ষ, ৭ সংখ্যা

সারকথা

(মায়া ও মায়ার পাশা)

স্বামী সারদানন্দ

বিবেকানন্দ স্বামীজী বলতেন, হিঁদুর জাতিবিভাগ এবং কালবিভাগের একটা বড় উদার মানে আছে। হিঁদু বলে, 'মায়া' শক্তিটা—যেটা দিয়ে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তৈয়ারি হচ্চে—সান্ত অর্থাৎ তার একটা শেষ আছে। কিন্তু এই 'শেষ' কথাটার একটু আলাদা মানে। আমরা 'শেষ' কথাটা যেভাবে বুঝি, সেভাবে কথাটা ব্যবহার হয়নি। কেননা, আমরা কোন জিনিসের 'শেষ' আছে বললে বুঝি এই যে, কালে সে জিনিসটা একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়ে ক্রমে এককালে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এই সম্পূর্ণ রূপ পরিবর্তনটারই আমরা 'বিনাশ' 'মৃত্যু' ইত্যাদি নাম দিয়ে থাকি। জড় জিনিস রূপান্তর হলে তার বিনাশ হলো বলি; আর চৈতন্যসংযুক্ত জড় জিনিস—যথা মনুষ্যদেহাদি—রূপান্তরিত হলে বলি 'মরে গেল'। কিন্তু হিঁদু এটা বেশ বুঝে যে, মায়াশক্তিটার সেভাবে কালে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব। কেননা, 'কাল' পদার্থটাই ঐ শক্তিপ্রসূত বা উহার কার্যবিশেষ। আর কার্যটা কখনোই এত বড় হতে পারে না যে, তার কারণটার উপর ক্ষমতা বিস্তার করে বা কারণটাকে পরিবর্তিত করে। মায়ার খেলা আরম্ভ হলে পর যখন কালের আরম্ভ, তখন মায়া খেলা গুটুলেই যে কাল শেষ হলো, একথা হিঁদু খুব বুঝে। তার মতে মায়াটা যখন কালের পূর্বে বর্তমান, তখন সেটা অনাদি। তবে মায়া সান্ত হলো কি করে? মায়ার খেলাটা কালে শেষ না হয়ে কিসে শেষ হয়? হিঁদু বলে, শেষ হয় জ্ঞানে। পূর্ণজ্ঞান হলে পর মায়ার খেলার আর কিছুমাত্র অনুভব থাকে না। কখনো যে ঐ খেলা হয়েছিল বা হচ্চে বা হবে, এসব কিছুই বোধ থাকে না। সেইজন্য মায়া হচ্চে 'জ্ঞাননাশ্যা'। মায়ার বাইরে গিয়ে দেখলে কাল তো দূরের কথা, মায়ারও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু মায়ার ভিতরে দাঁড়িয়ে মায়ার খেলাটা দেখলে বুঝা যায় যে, মায়া কখনো পাশা ফেলচে ও জগৎটার বিকাশ হচ্চে; আর কখনো পাশা গুটিয়ে হাতে করে আছে ও জগৎটা সঙ্কুচিত হয়ে বীজভাবে রয়েচে। সৃষ্টির সঙ্কোচ ও বিকাশ, সঙ্কোচ ও বিকাশ—বারবার এই ভাবে মায়াশক্তি খেলা কচ্চে! এই সঙ্কোচ ও বিকাশের প্রবাহটা অনাদি—অর্থাৎ কালেতে ইহার আরম্ভ হয়নি। ইহার আরম্ভ হয়েচে 'অজ্ঞানে'—নাশ হবে 'জ্ঞানে'! এইজন্য হিঁদুদর্শন মায়ার খেলার বাইরে যাবার পথটি মাত্র দেখিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত থাকে। কেন মায়া খেলচে, খেলাটার উদ্দেশ্য কি, মায়াবীর এ খেলায় লাভ কি? এসব কথা বিচার করতে দৌড়ায় না। কেননা হিঁদু বহু সহস্র বৎসর ঘটত্ব, পটত্ব করে বুঝেছে, ও সব প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। উহা মনুষ্যবুদ্ধির গণ্ডির বাইরে!

ইউরোপীয়েরা সম্প্রতি বলে-কৌশলে পয়সা কড়ি রোজগার করে, পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে নিজের উদরপূরণের সচ্ছল বন্দোবস্ত করে ঘটত্ব পটত্ব করবার একটু অবসর পেয়েছে। ওরা এখন teleology of Evolution, Purposive view of creation ইত্যাদি লম্বা-চওড়া বাক্যবিন্যাস করে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বার করতে মিছে মাথা ঘামাক। ঘামিয়ে ঘামিয়ে কিছু না করতে পেরে যখন হাত-পা এলিয়ে পড়বে, আর তারও বড় দেরি নাই, তখন হিঁদু বলবে ঃ "কি, ভায়ারও ফলার নাকি?"

হিঁদু শাস্ত্র আর একটা বড় অদ্ভুত কথা বলে। হিঁদুর শাস্ত্র বলে যে, মায়ার পাশা যুগে যুগে একরকমই পড়ে থাকে। এখানে যুগ শব্দটি, সৃষ্টির একবার বিকাশ ও সঙ্কোচ ব্যাপক কাল অর্থে ব্যবহার হচ্চে। অতএব পূর্বের কথাটার মানে হচ্চে এই—সে মায়ার দ্বারা সৃষ্টির একবার বিকাশ ও সঙ্কোচ হবার সময় ব্রহ্মাণ্ডটা ও তার ভিতরের প্রত্যেক জড়জীবাদির শরীর ও মনগুলোর যেমন গঠন, প্রকাশ, বৃদ্ধি ও পরিণতি হয়ে থাকে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি সকল বারের বিকাশ ও সঙ্কোচের সময়ও ঠিক সেই রকম হয়, কিছুমাত্র ভিন্ন হয় না। মায়া নিজে হচ্চে সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী, নিজের ভিতরের ঐ তিনটে পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে মিশিয়ে জগতের যত কিছু স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের সৃষ্টি করে থাকে। এখন কথা হচ্চে, ঐ তিনটে পদার্থের বিভিন্ন ভাবে মিশান স্থূল চক্ষে অনন্ত বলে দেখালেও বাস্তবিক অনন্ত কখনো হতে পারে না। উহা সান্ত হবেই হবে; অর্থাৎ ঐ সকল মিশ্রিত পদার্থের সংখ্যার একটা সীমা আছে। মনে কর, একজন লোক তিনখান পাশা নিয়ে খেলতে বসল। প্রথমে পড়ল 'ছ তিন নয়', তারপর পড়ল 'কচে বারো', তারপর পড়ল 'পোয়া বারো' ইত্যাদি। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয়, ঐ তিনখানা পাশা অনন্ত রকমে পড়তে পারে। কিন্তু একটু ভাবলেই বুঝা যায়, তা নয়। পাশা কখানায় ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার সংযোগ-বিয়োগে এতগুলি রকমারি দানই পড়তে পারে। অনন্তকাল ধরে বসে বসে পাশা ফেললেও এতগুলি রকমের ভিতর একটি রকম ছাড়া অন্য কোন নতুন রকম কখনো পড়বে না। সেইরূপ, মায়ার পাশা ফেলা হচ্চে, ঐ তিন গুণ বা পদার্থের মিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন স্থূল সূক্ষ্ম, বড় ছোট, ভাল মন্দ, সুন্দর বিকট, দৈবী আসুরী, সাধু অসাধু, ঐশ্বরিক জৈবিক শরীরান্তঃকরণ বিকাশ করা। চৈতন্য পদার্থ 'আত্মা' নিত্য, এক ও সর্বত্র সমানভাবে থাকলেও মায়াসৃষ্ট প্রত্যেক শরীরান্তঃকরণের বিভিন্নতার দরুন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত দেখায় মাত্র। অতএব সত্ত্বরজস্তমোগুণের বিভিন্ন মিশ্রণে উৎপন্ন শরীরান্তঃকরণের সংখ্যারও একটা সীমা আছে। মায়া অনন্তকাল ধরে চেষ্টা করলেও ততগুলি রকমের শরীরান্তঃকরণ গড়া ছাড়া অন্য কোন নতুন রকমের গড়তে পারেন না! সেইজন্যই হিঁদু বলে "সূর্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ"। অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা বিগত প্রলয়ের পূর্ব পূর্ব যুগে যেমন সূর্যচন্দ্রমাদি তৈয়ার করেছিলেন, এবারকার সৃষ্টি বিকাশের সময়ও ঠিক সেই রকম করলেন। সেইজন্যই হিঁদুর পুরাণে শুনতে পাওয়া যায়, যুগে যুগে ব্যাস, শুক, জনক প্রভৃতি শরীরী আলাদা আলাদা জন্মায়। কিন্তু তাদের

শরীরান্তঃকরণের গঠন পূর্ব পূর্ব যুগের ব্যাস-শুক-জনকাদির ন্যায়ই হয়ে থাকে; কিছুমাত্র বিভিন্ন হয় না। সেইজন্যই আবার পুরাণাদিতে দেখা যায়, একটা সৌরজগতে সৃষ্টির বিকাশ যেভাবে বর্ণিত, অন্য অন্য সৌরজগতের সৃষ্টিও সেইভাবে বর্ণিত। সেখানেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবতা সকল; সেখানেও সকল বন্দোবস্ত এখানকার মতো এবং মায়ার পাশা একই ভাবে পড়চে। সেখানেও ঝগড়া কোঁদল, সেখানেও ভালবাসাবাসি, সেখানেও ছাড়াছাড়ি, সেখানেও পরিণামে সম্পূর্ণ পরিবর্তন বা মৃত্যু!

যেখানেই থাক, যে লোকেই যাও, মায়ার পাশা একই রকম পড়চে ও পড়বে এবং ঐ মায়ার ভিতর শরীরান্তঃকরণধারী সকলকে থাকতেই হবে। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুনঃ"—হে অর্জুন! সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোক থেকে পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোকই (একই ভাবে) বার বার হচ্চে ও যাচ্চে! এই সত্যটি প্রাণে প্রাণে, "হাড়ে হাড়ে" বোঝার নামই হিঁদু দিচ্চে—'বৈরাগ্য'। বৈরাগ্যটা হাতি ঘোড়া নয়, মানুষের মুখমাত্র না দেখে বনে বাস করা নয়, বা ভোগবিলাস যথাসম্ভব ছেড়েছুড়ে সাদাসিদে চালে জীবনধারণ করাও নয়। বৈরাগ্য হচ্চে, জগতের অনিত্যতাবোধ—এমন 'হাড়ে হাড়ে' ভিতরে ঐ বোধটা সেঁধুনো যে, রূপরসাদির সুখস্পর্শের ভিতর, শোক দুঃখাদির তীব্র যাতনার ভিতর, নামযশাদি মরীচিকার ভিতর, জগৎ যাহাকে 'ভাল' বলে এবং 'মন্দ' বলে, সে দুটোরি ভিতর সেই অনিত্যকালের অঙ্গুলীর দাগ স্পষ্ট, জ্বলন্ত অঙ্কিত দেখতে পাওয়া! কাজেই বৈরাগ্য এলে আর মোহ আসতে পায় না, গন্তব্য পথে যেতে যেতে পথের পাশের বাহার দেখে আগিয়ে যেতে ভুল হয় না! কাজেই হিঁদু বলে, ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে আর তোমার মার নাই! তুমি রাজসিংহাসনে বসে রাজদণ্ডের চালনা কর বা ভিক্ষুক হয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরে বেড়াও, ও দুটোর একটাকেও বড়, ছোট বলে বোধ হবে না! কাজেই জ্ঞান তোমার 'করতলগত আমলকবৎ' অতি সুলভ হবে! আর জ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়ার খেলাও গুটিয়ে আসবে—মায়ার পারে যা আছে, তার অনুভবও তুমি করতে পারবে। কিন্তু যতদিন না তা হয়, ততদিন হিঁদু বলে—তোমার বর্ণাশ্রমধর্মের ভিতর অধিকার। তার বাহিরে যাবার তোমার সামর্থ্য নাই!* □

*১৩ বর্ষ, ৮ সংখ্যা

পূজা

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

হৃদয়ের সরস ভাব হইলেই প্রকৃত পূজা সম্ভব। কিন্তু হৃদয় তো সরস হয় না—উহা সদাই মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করিতেছে—কদাচ কখনো ওয়েসিসের মতো উহাতে সরস ভাব দেখা দেয়। তাই পূজাপদ্ধতির সৃষ্টি—তাই অনুষ্ঠানের বাহুল্য সকল ধর্মসম্প্রদায়ে। যাঁহারা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চিৎকার করেন, তাঁহারা হয় সর্বপ্রকার ধর্মসাধনের বিরোধী, নয় নূতন নূতন অনুষ্ঠান পদ্ধতির পক্ষপাতী। আরেক অবস্থায় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চিৎকার দেখা যায়। যখন মানুষ বারবার অনুষ্ঠান করিয়াও হৃদয়ের সরস ভাব জাগাইতে পারিতেছে না—এমন হয়, তখন তাহার প্রাণ ক্ষণকালের জন্য যেন সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানের উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠে—তখন সে খানিকক্ষণের জন্য সব অনুষ্ঠান ছাড়িয়া উহার মূল ভাবটি ধরিবার জন্য ছটফট করিতে থাকে। কিন্তু যখন সে কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ে ভাবোদ্দীপনে কৃতকার্য হয়, তখন আবার তাহার সেই হৃদয়গত ভাব পুরাতন বা নূতন কোন অনুষ্ঠান-বিশেষেরই আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই সর্বভাবাতীত সমাধি-অবস্থা লাভ না করিতে পারিলে সর্বানুষ্ঠানের অতীত হওয়া যাইতে পারে না।

আবার একজনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, অপরের পক্ষে তাহা কৃত্রিম। একজনের ভিতরে যে-ভাবের প্রকাশ হইল, যদি অপর দশজনে তাহা স্বায়ত্ত করিতে যায়, তবে তাহাদের পক্ষে অন্তত প্রথমাবস্থায় উহা যে অল্পবিস্তর কৃত্রিমভাবাপন্ন হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাকেই 'ভাব আরোপ করা' বলে। এই ভাবের আয়ত্তীকরণ আবার বিবিধ উপায়ে সাধিত হইতে পারে। উক্ত ভাবসম্পন্ন পুরুষের বাহ্য কার্যকলাপ, আচার-ব্যবহারাদির অনুকরণ-চেষ্টা, অথবা চিন্তা দ্বারা ভিতরের ভাব ধারণার চেষ্টা। ইহাতে সদাই বিপদাশঙ্কা এই যে, এই জগতে—এই মায়ার রাজ্যে—তমোগুণ বা নিশ্চেষ্টতার এতই প্রাবল্য যে, যতই উচ্চভাব হউক না কেন, উহার চিরকালই নিরর্থক বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উহা নিবারণ করিবার একমাত্র উপায়—নিজ ধর্মজীবনকে সতেজ ও সরস রাখিবার অবিরাম চেষ্টা—সদাই মনে রাখিবার চেষ্টা—আমরা জড়যন্ত্রমাত্র নহি—আমরা চিন্তাশীল মানুষ। তাই বলি, শুধু অনুষ্ঠান ত্যাগ করিলেও হয় না, আবার কেবল নিয়মিতভাবে জড়যন্ত্রের মতো অনুষ্ঠান করিয়া গেলেও হয় না—চাই জীবন, চাই ভাব, চাই আমৃত্যু অহরহ কঠোর চেষ্টা।

যাহা হউক, আমরা আজ এই শারদীয়া পূজার দিনে পূজার তত্ত্ব একটু-আধটু আলোচনা করিতে চাই। আমাদের বাঙলাদেশে যে-পূজাপদ্ধতি প্রচলিত, তাহাতে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক—তিন ভাবেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটস্থাপনাদির মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ বৈদিক—অন্যান্য স্থলেও নানা বৈদিক মন্ত্র সংগৃহীত হইয়া পদ্ধতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট। পূজার প্রণালীটি সম্পূর্ণ তান্ত্রিক—পূজা

করিতে গেলেই কয়েকটি বিশিষ্ট ক্রিয়া করিতে হয়; সংক্ষিপ্ত পূজায় এই ক্রিয়াবিশেষের সংখ্যার অল্পতা ও বিস্তারিত পূজায় আধিক্য—এইমাত্র। অদ্বৈতবাদ এই তান্ত্রিক পূজা-প্রণালীর দার্শনিক ভিত্তি। আবাহন করিতে হয় হৃদয় হইতে, বিসর্জন করিতে হয় হৃদয়ে। প্রথমে মানসপূজা, তারপর বাহ্যপূজা। আবার ভূতশুদ্ধি নামক ক্রিয়ার তো মূল তাৎপর্যই অদ্বৈত ভাবনা—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব মূল শক্তিসহ নিজ কারণ পরমাত্মায় বিলীন হইল—ইহাই ঐ স্থলে মূল ভাবনার কথা। সমুদয় ক্রিয়াগুলির মূল কথা—শুদ্ধি। এই শুদ্ধিকে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—মন্ত্রশুদ্ধি, দেবতাশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি। প্রত্যেক ক্রিয়ার খুঁটিনাটি তাৎপর্য না বুঝিতে পারিলেও এটুকু বেশ বোধ হয় যে, সমুদয় ক্রিয়াগুলির মূলই ভাবনা—সুতরাং সেগুলিকে একপ্রকার যোগেরই বিভিন্ন অঙ্গ বলা যাইতে পারে। এই ভাবনার প্রধান সহায়ক মন্ত্র—অন্যান্য স্থূল দ্রব্যাদি আনুষঙ্গিক। পূজাপদ্ধতির মধ্যে যে পৌরাণিক উপাদানের কথা বলিয়াছি, উহা ভক্তিরসাত্মক। এই অংশের মধ্যেই আগমনী, বিজয়াদির উদ্ভব—এই অংশেই ভক্ত দেবীকে সম্বোধিয়া বলে—"সংবৎসরব্যতীত তু পুনরাগমনায় চ।" ভক্ত চিরকালই ভগবানকে পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতি সাংসারিক সম্বন্ধের কোন একটিতে বাঁধিতে চায়—সে তত্ত্বের ধার ধারিতে বড় চাহে না—হৃদয়—হৃদয়কেই সে বড় করিয়া দেখে। সংসারে সে যেসকল সম্বন্ধে পরম সুখ বোধ করে, ঈশ্বর বাস্তবিক আমাদের সহিত সেই সম্বন্ধে সম্বন্ধ—ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই ভক্ত শারদীয়া পূজার আগমনের সূচনায়ই মায়ের আগমনী গাহিতে ও শুনিতে বড়ই ভালবাসে। সে সেই জগজ্জননীকে কখনো মাতৃভাবে, আবার কখনো কন্যাভাবে ভাবিয়া সুখ পায়; আর যদি কেহ রামপ্রসাদ বা শৈলেশ্বরের মতো অকপট ভক্ত হয়, তবে সত্য সত্যই মা আসিয়া তাহার বেড়া বাঁধিয়া দেন বা বলেন—

"বাপ নন্দীরে গিরিমন্দিরে যেতে আমার আর নাই বাসনা,
আর এক পিতামাতা আছে কাঁদিবে তারা দুজনা।
তারা তারা বলে তারা, হয়ে আছে দিশেহারা,
এখন যদি যায় না তারা, তারা-নাম আর কেউ লবে না।"

তাই বলি, হে ভক্তসাধক, আর কিছু না পার, তাঁহাকে একবার এই শুভমুহূর্তে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার চেষ্টা কর। বল—মা, আমি শাস্ত্র জানিনে, জপ-তপ জানিনে, ভজন-পূজন জানিনে—আমি পুণ্য-পাপ চাইনে, শুচি-অশুচি চাইনে, জ্ঞান-অজ্ঞান চাইনে—দে মা, তোর চরণে শুদ্ধাভক্তি। কোথায় পাব মা প্রতিমা, কোথায় পাব উপকরণ দ্রব্যবাহুল্য, তুই মা নিজগুণে হৃদয়কন্দরে প্রকাশিত হয়ে হৃদয়ান্ধকার দূর করে দে।

যাহা হউক, পূজার কথা বলিতেছিলাম। শাস্ত্রে বলে,—

"অর্চকস্য তপোযোগাৎ দ্রব্যস্য চাতিশায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমিচ্ছতি।।"

বৈধী পূজায় তিনটি ব্যাপারের একান্ত আবশ্যকতা। অর্চক—যিনি পূজা করিবেন—তাঁহার তপস্বী হওয়া প্রয়োজন। যিনি নিজ ইন্দ্রিয়মনাদি সংযত করিতে না পারিয়াছেন—তিনি হৃদয়-দেবতাকে জাগাইবেন কি করিয়া—"দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।" যাঁহার ভাবনার অভ্যাস হয় নাই, তিনি শুধু উপর-উপর

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান জানিলে বা মন্ত্র মুখস্থ করিলে বা উহার অর্থ বুঝিলেই যথার্থ পূজকপদবাচ্য হইতে পারেন না। এই পূজকবৃত্তি যেন ব্যবসাদারি হইয়া না দাঁড়ায়—যতই ব্যবসাদারি দাঁড়াইবে, ততই আর মূলভাবের দিকে দৃষ্টি থাকিবে না। বুঝিতে হইবে, পূজায় সকলের অধিকার। শুধু ব্রাহ্মণ নহেন, স্ত্রী, শূদ্র সকলেরই অধিকার—যদি তাহার তপোযোগ থাকে। তপস্যা চাই, মন ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ চাই—তবেই সে পূজার যথার্থ অধিকারী। পৌরোহিত্য ব্যবসায়িকগণ যদি নিভৃতে বসিয়া, পূজাকালীন নিজের কি গুরুতর দায়িত্ব একবার ভাবিয়া দেখেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা উহাতে অধিকারী হইবার জন্য আরো সচেষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। যথার্থ অর্চকই প্রতিমার যথার্থ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন—নতুবা কতকগুলি মন্ত্র আওড়ানোই সার হয়।

তারপর প্রতিমাখানি সুদৃশ্য হওয়া চাই। প্রতিমাখানি এমন হওয়া চাই, যেন দেখিলেই সেই জগজ্জননীর স্মৃতি আপনিই স্মরণপথে উদিত হয়। সুতরাং যে-সে কুম্ভকার-নির্মিত হইলেই প্রতিমা হয় না। প্রতিমা-নির্মাতা যদি সাধক হন, তবেই প্রতিমাখানি যথার্থ পূজার উপযোগী হইবে। এখনো এমন এক-একজন সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি স্বয়ং প্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন। প্রতিমা সাধকহৃদয়ের ভাবময়ী প্রতিমারই বহিঃপ্রকাশমাত্র। সুতরাং সাধক ব্যতীত ঠিক ঠিক ভাবপ্রকাশক প্রতিমা কে গঠন করিতে পারে? অবশ্য ইহাতে সাধকের কুম্ভকারবৎ শক্তি থাকারও প্রয়োজন এবং সর্বস্থলে সকল সাধকের তাহা থাকা সম্ভব নহে, কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রতিমা গঠনে সমর্থ না হইলেও অন্তত তাহার কার্যের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন ও তাহাকে যথার্থ পথে পরিচালিত করিতে পারেন। নতুবা ফাঁকি দিয়া সব কাজ সারিতে গেলে আসল কার্যের সময় নিজেকেও ফাঁকে পড়িতে হয়।

তৃতীয়ত দ্রব্যবাহুল্য। অবশ্য এই সকল বাহ্যপূজা প্রধানত রাজসিক গৃহস্থ ব্যক্তিরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া এই দ্রব্যবাহুল্যের কথা বলা হইয়াছে। ধনী ব্যক্তি পূজার আয়োজনে কখনো যেন বিত্তশাঠ্য না করেন। দেবনিবেদিত দ্রব্যে সর্বসাধারণের—বিশেষত যথার্থ অভাবগ্রস্ত সকলেরই অধিকার; সুতরাং দ্রব্যবাহুল্যে যে অধিকসংখ্যক দরিদ্ররূপী নারায়ণের তৃপ্তি, ইহা নিঃসন্দেহ। তবে আজকালকার মতো পুরোহিত ও আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে বণ্টনের জন্য দ্রব্যবাহুল্যে বিশেষ কোন ফল দেখা যায় না। ইহার আরেকটা দিক আছে। দ্রব্যবাহুল্যের সহিত একটা মহান ভাবের—প্রকাণ্ড ভাবের যোগ আছে—বিশেষত, যদি ঐ দ্রব্যাদি সজ্জায় কিঞ্চিৎ শিল্পের পরিচয় থাকে। এইরূপ শিল্প যে ভক্তিভাববৃদ্ধির সহায়ক, তাহা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে পূজায় বলিদান সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। সমগ্র শাস্ত্রের যথার্থ মর্মানুশীলনে বুঝা যায়, এই বলিদান বা জীবহিংসা পূজার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ নহে। "কামক্রোধৌ বলিং দদ্যাৎ"—ইহাই যথার্থ সাত্ত্বিক বলি। তবে একথাও বলা আবশ্যক, যাঁহারা অন্য সময়ে মাংসাদি ভোজনে অবিরত, অথবা অন্য প্রকারে সদা হিংসাপরায়ণ, তাঁহাদের দেবোদ্দেশে বলিদানের বিরুদ্ধাচরণ হাস্যজনক ব্যাপার।

পূর্বে দরিদ্রনারায়ণ পূজার কথার সামান্য উল্লেখ করিয়াছি। ইহাই বর্তমানকালের উপযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা। ভগবান কপিল তদীয় মাতা দেবহূতিকে উপদেশ

দিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন, যে-ব্যক্তি অপর প্রাণীতে দ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া প্রতিমাপূজা করে, তাহার পূজা ভস্মে ঘি ঢালার মতো—তাহাতে বিশেষ ফল হয় না। তুমি জীবন্ত নরনারীকে ভগবানের প্রতিমা বলিয়া ভাবিয়া তাহাদের সেবা করিতে পার না, তুমি আবার মৃন্ময়ীমূর্তিতে চিন্ময়ীকে আবাহন করিবে কিরূপে? ভালবাসাই পূজার মূল—সেবাই সেই ভালবাসার অভিব্যক্তি। শুধু 'কাঙালী বিদায়' বা 'কাঙালী ভোজন' নহে, প্রকৃত 'দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা'। এখানেও ভাবই মুখ্য—বাহিরের অনুষ্ঠান যেরূপই হউক, কিছু আসিয়া যায় না, অথবা সংখ্যাতেও কিছু আসিয়া যায় না—মূলকথা হইতেছে ভাব—সেই ভাবটি হৃদয়ে আনয়নের চেষ্টাই আসল কথা। নতুবা লক্ষ কাঙালী বিদায় করিয়া বা স্তূপাকার চন্দন, বিল্বদল, ফলমূল নৈবেদ্য ভোগরাগাদি দিয়াও তোমার পূজা সিদ্ধ হইবে না। অনুষ্ঠান অবশ্য-কর্তব্য। বেদান্ত বলেন, ক্রিয়া দুই প্রকারে হইতে পারে—অজ্ঞানপূর্বক ও জ্ঞানপূর্বক। অজ্ঞানপূর্বক কর্মানুষ্ঠানেও ফল হয়, তবে জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠানে উহা পরিবর্তিত হয়। তাই বলি ভাই, এস, আমরা প্রথম এই বিশ্বাসে বিশ্বাসবান হই যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এতাবৎকাল যাহা করিয়া আসিয়াছেন তাহা একেবারে বৃথা নহে; আমরা তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথানুসরণ করি, কিন্তু আরো উত্তমরূপে, আরো শ্রদ্ধার সহিত, আরো অনুরাগের সহিত যেন আমরা পূজাদির অনুষ্ঠানে অগ্রসর হই; আর প্রতি মুহূর্তে যেন পূজার চরম উদ্দেশ্য আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে যে, জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে সমগ্র বিশ্বের সহিত আপনাকে এক করিয়া ফেলিতে হইবে। সমগ্র বিশ্বের সহিত, বিশ্বেশ্বরের সহিত, তাদাত্ম্য লাভ করিতে হইবে।

দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন আমরা যে পরস্পরকে, এমনকি শত্রুকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করিয়া থাকি, উহা যেন কেবল বাহিরের একটা লৌকিক ব্যাপারেই শেষ না হয়, উহা যেন হৃদয়ের প্রত্যক্ষানুভূতিজনিত প্রেমসম্ভূত হয়। যেন হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে পারে—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥"

যেন দেবীকে সর্বত্র সাক্ষাৎকার করিয়া বলিতে পারে—সর্বস্বরূপে! সর্বেশে! সর্বশক্তিসমন্বিতে! যেন বৈদিক ঋষির সুরে সুর মিশাইয়া গাহিতে পারে—

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।"

যেন সর্বশেষ শান্তিজল গ্রহণের সময় হৃদয়ে যথার্থই শান্তির আবির্ভাব হয়।* □

* ১৫ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

শ্রেয় ও প্রেয়

স্বামী মাধবানন্দ

আমাদের মধ্যে এমন কম লোকই আছেন, যাঁহারা জীবনে একাধিকবার প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন যে, জগতে শ্রেয় ও প্রেয়—এ দুইটি একমার্গগামী নহে। শ্রেয় বলিতে যাহাতে আমাদের কল্যাণ হইবে, তাহাই বুঝায়; এবং প্রেয় শব্দের অর্থ যাহা আমাদের ভাল লাগে। এখন, যাহা আমার ভাল লাগিবে, তাহাই যে আমার কল্যাণপ্রদ হইবে, এমন তো কোন কথা নাই। হয়তো কোন কোন স্থলে এরূপ হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এরূপ হইবার আশা কম। বালক জ্বরে ভুগিতেছে, কিন্তু লুকাইয়া মুখরোচক কুপথ্যগুলি একে একে আত্মসাৎ করিতেছে—অথচ সে জানে, উহাতে তাহার জ্বর বাড়িবে বই কমিবে না। যুবক ও বৃদ্ধের সম্বন্ধেও ঐরূপ উদাহরণ মোটেই বিরল নয়। সুতরাং শ্রেয় ও প্রেয়—এই দুইটি শব্দের অর্থ বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না—এইরূপ আশা করা যায়।

মানবেতর প্রাণিজগতে কিন্তু শ্রেয় ও প্রেয়—এ দুয়ের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান বা দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয় না। তাহারা একমাত্র প্রেরণায়ই সমস্ত কার্য করিয়া থাকে—উহাকে শ্রেয় বলিতে হয় বল; প্রেয় বলিতে হয় বল। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মানবের মতো উন্নত নহে। মানব নিজ প্রাধান্যের ষোল আনা সদ্ব্যবহার করিয়া ইতর প্রাণীর চেষ্টাদিকে সহজাত সংস্কার (instinct)-প্রসূত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। এই সহজাত সংস্কার বা instinct তাহাকে যেদিকে লইয়া যায়, যন্ত্রচালিতবৎ সে সেই দিকেই গিয়া থাকে। তাহার উহাকে রোধ করিবার সামর্থ্য নাই—সে সম্পূর্ণ স্বভাবের বশ। প্রকৃতিদেবী তাহাকে যেরূপে ইচ্ছা চালাইতেছেন, গড়িয়া পিটিয়া তুলিতেছেন, বা অযোগ্য বিবেচনা করিলে সমগ্র জাতিটিকেই জগৎ হইতে অপসারিত করিতেছেন। এইরূপে কতকগুলি প্রাণী ধীরে ধীরে অপর সকলের অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিতেছে, এবং যাহার মধ্যে যে পরিমাণে এই instinct বিকাশ পাইতেছে, সে সেই পরিমাণে 'যোগ্য' বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু প্রাণিগণ যে এইরূপে প্রকৃতিদেবীর ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া জন্মিতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে এবং মরিতেছে, উহাতে তাহাদের একটি বিশেষ সুবিধা হইতেছে। প্রকৃতিকে বৈজ্ঞানিক জড়ই বলুন আর যাহাই বলুন, প্রকৃতি কিন্তু কখনো ভুল করেন না; ধীর স্থির গতিতে সন্তানতুল্য জীবনিচয়কে তাহাদের প্রকৃত উন্নতির পথে লইয়া যান। ইতর প্রাণীর মধ্যে ইন্দ্রিয়শক্তি এত প্রবল ও এত সূক্ষ্ম যে, উহাদের আর মানুষের মতো হিসাব করিয়া কাজ করিতে হয় না। কোথায় মধু-ভরা ফুল আছে,

তাহা মধুমক্ষিকা আপনা হইতেই অভ্রান্তভাবে জানিতে পারিবে, এবং দক্ষিণে বামে না বাঁকিয়া সোজা তাহারই দিকে চলিয়া যাইবে। আবার বহু দূরে গিয়া পড়িলেও নিজ চক্রে ফিরিয়া আসিবে। ইহাকে বুদ্ধি না বল, হানি নাই। কিন্তু মানুষ ঐরূপ অবস্থায় কিরূপ করিত, তাহা প্রণিধানযোগ্য। শতকরা ৯৯জন লোক যে ঐরূপ অবস্থায় বিফলমনোরথ হইত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হয়তো সহজাত সংস্কার বা instinct বুদ্ধির নিম্নতর অবস্থা, হয়তো বা উচ্চতর অবস্থা—কিন্তু ইহা সত্য যে, কার্যফল তুলনা করিলে বুদ্ধি সহজাত সংস্কারের কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। মোটের উপর, প্রকৃতির হস্তে নিজ নিজ জীবনভার সমর্পণ করিয়া দিয়া ইতর প্রাণিগণের লাভ বই লোকসান নাই। এও এক রকম 'বকলমা দেওয়া'; এবং শিশু যেমন মাকে পাইয়া মায়ের ক্রোড়ে থাকিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে, ইহারাও সেইরূপ। মানুষ নিজের হাতে নিজ পরিচালন ভার লইয়া অনেক বিষয়ে সুবিধা পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার যে-অংশে সে ইতর প্রাণিগণের সমধর্মী, সে-অংশে তাহার এই স্বায়ত্ত-শাসনে কিছুই লাভ ঘটে নাই, একথা নিশ্চিত।

এখন দেখা যাউক, মানবের এই শ্রেয় ও প্রেয়-রূপ দ্বন্দ্বের মূল কোথায়। আমরা দেখিতে পাই, চিন্তাশীল মানব স্মরণাতীত কাল হইতে এই প্রশ্নের আলোচনা ও ইহার সমাধানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। মৃত্যুর পরপারে কী আছে তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে যমরাজ বালক নচিকেতাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। পরিশেষে নির্ভীক বালকের বীরোচিত প্রত্যাখ্যানে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উত্তর দিবার প্রারম্ভেই নচিকেতার ত্যাগের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন ঃ

"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।।"

অর্থাৎ—শ্রেয় এক জিনিস, প্রেয় আরেক জিনিস। উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন, মানুষকে এই দুয়ের মধ্য হইতে কর্তব্য বাছিয়া লইতে হয়। তন্মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়; আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হন। যমরাজের এই উক্তিই শ্রেয় ও প্রেয়ের ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করাইয়া দেয়। তুমি ইন্দ্রিয়সুখ চাও, না শাশ্বত শান্তি চাও? আপাত-মনোরম বর্তমান চাও, না অপেক্ষাকৃত কষ্টসঙ্কুল কিন্তু নিশ্চিতকল্যাণপ্রদ ভবিষ্যৎ চাও? যেরূপ কামনা কর, তাহাই পাইবে। অনিত্য সুখ চাও, অনিত্য সুখই পাইবে; নিত্যানন্দ চাও, তাহাও পাইবে। এখন নির্বাচনের ভার তোমার উপর।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা হইতেই এই নির্বাচন কত কঠিন ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রেয় ইন্দ্রিয়জ সুখ বলিয়া অতি নিকটে, হাতের কাছে রহিয়াছে; কিন্তু শ্রেয় অত শীঘ্র ফলদান করে না। আবার

প্রেয়োজনিত সুখ ক্ষণপ্রভার ন্যায়, অতি উজ্জ্বল, কিন্তু নিমিষমাত্রস্থায়ী; শ্রেয়ের ফল অত তীব্র নয়, ইহা দেবমন্দিরের ঘৃতপ্রদীপের স্নিগ্ধ জ্যোতির ন্যায়। ইহাতে সত্ত্বগুণের উদ্রেক করিয়া দেয়। একটি, বিষয়-মদিরোন্মত্ত মানবমনকে আরও উন্মাদগ্রস্ত করিয়া তুলে; অপরটি, শান্তির অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করে। সুতরাং যে যেরূপ প্রকৃতির লোক, সে সেইরূপ পথই বাছিয়া লইবে। সুতরাং যাহার মধ্যে পশুভাব প্রবল, সে পশুর ন্যায় instinct-এর—সহজাত সংস্কারের—বশে চালিত হইবে। পশুর ধর্মই তো ঐ—সে বর্তমানের প্রেরণার বাহিরে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে না। পূর্বাপর চিন্তা করা তাহার প্রকৃতিতে নাই; যেমন বাসনার উদয় হওয়া, অমনি তাহা কার্যে পরিণত করা—ইহাই পশুধর্ম। কিন্তু মানব বিচারপরায়ণ জীব, চিন্তাপূর্বক কার্য করাই তাহার স্বভাব। কি সামান্য কার্যে, কি কঠিন ব্যাপারে, সে চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। যদি কোন কার্য তাহার অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে সে তাহার জন্য দায়ী নহে—উহা non-moral,আমরা মোটামুটি এরূপ বলিতে পারি যে, সুস্থাবস্থায় এবং নিদ্রিত না হইলে মানুষের প্রতিকার্য তাহার বিচারশক্তির সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহার মধ্যে এই মানবত্ব বা বিচারবুদ্ধির প্রাধান্য যত অধিক, সে ততই ঐ instinct-কে বিচারের সাহায্যে ওজন করিয়া, উহার কর্তব্যাকর্তব্যতা নির্ধারণ করিয়া তবে উহা কার্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইবে। যদি উহা ভাল হয়, যদি উহা তাহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর করাইয়া দেয়, তবেই সে উহাকে প্রশ্রয় দিবে, উহাকে কার্যে পরিণত করিবে। আর যদি উহা তাহার অযোগ্য হয়, যদি উহা তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে চাহে, তাহা হইলে সে উহাকে দমন করিয়া স্থিরভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করে।

সুস্থ মানবমনে সাধারণত এইরূপই ঘটিয়া থাকে। যদি কোথাও ইহার বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কোথাও কোন অন্যায্য বাসনা প্রশ্রয় পায়, যদি দেখিতে পাও—কেহ উক্ত বাসনাকে অসৎ জানিয়াও তাহার রোধকল্পে কোন চেষ্টা করিতেছে না, তবে বুঝিতে হইবে—উক্ত ব্যক্তি তাহার বহুমানাস্পদ মানবত্বরূপ সিংহাসন পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে। সে ইচ্ছাপূর্বক আপনার পায়ে আপনি কুডুল মারিতেছে। আবার, এমন অনেক সময় আসে, যখন এই বাসনা প্রকৃতপক্ষে অসৎ হইলেও আপনাকে সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে, অসত্য সত্যের মুখোস পরিয়া উপস্থিত হয়, তখনই বিপদ গুরুতর। যখন ভোগ ত্যাগের বেশে উপস্থিত হয়, যখন স্বার্থপরতা আত্মত্যাগের ভান করে, তখনই প্রকৃত বীরের পরীক্ষাস্থল উপস্থিত হয়। ফরাসীভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ভিক্টর হিউগোর অমর লেখনীমুখে এই দ্বন্দ্ব অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার 'লে মিজারেবল' ('Les Miserables') নামক গ্রন্থের 'মাথার মধ্যে ঝড়' ('Tempest in a Brain')-শীর্ষক পরিচ্ছেদটি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাইয়াছেন।

মানবের বিশ্লেষণশক্তি বুঝি বা ঐ অধ্যায়ে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অপর এক ব্যক্তি আমার জন্য প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে—সম্ভবত সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ—অন্তত যে-প্রাণদণ্ডে আমার দণ্ডিত হওয়া উচিত ছিল, বিধির বিড়ম্বনায় অপর একজন সেই কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে চলিয়াছে—এরূপ অবস্থায় মানবের সমগ্র মনুষ্যত্ব উচ্চকণ্ঠে বলিতে থাকে—যাও, এখনি গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া উহাকে বাঁচাও—নির্দোষের জীবনবিনিময়ে নিজ পাপজীবন ক্রয় করিও না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার জিজীবিষা বলবতী হইয়া কত প্রলোভন দেখাইতে থাকে—কানে কানে আসিয়া বলে—কী করিতেছ? তোমার এরূপ নাম, তুমি এতগুলি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তোমাকে লোকে ঘুণাক্ষরেও প্রাণদণ্ডার্হ বলিয়া সন্দেহ করিবে না—কেন আগ বাড়াইয়া নিজ মরণ ডাকিয়া আনিতেছ? শত যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া দুষ্টবুদ্ধি তোমায় বুঝাইয়া দিবে—তুমি তো এখন আর পাপী নহ, তোমার দ্বারা কত উপকার হইতেছে—কেন অকারণ প্রাণ দিতে যাইতেছ? সে-ব্যক্তিকে তুমি তো ধরাইয়া দাও নাই? যখন সে ঘটনাচক্রে তোমার জীবনপথের একমাত্র কণ্টকটি উঠাইয়া ফেলিতেছে, তখন তাহাতে বাধা দাও কেন? তুমি বাতুল নাকি? আর 'বাধা-বিপত্তি' (Difficulties)-শীর্ষক অধ্যায়ে যখন আমরা দেখিতে পাই—সে ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াও কিরূপে গ্রন্থের নায়ক মাদিলীন প্রত্যেক নূতন নূতন বিঘ্নকে যেন নিজ জীবনরক্ষারই ইঙ্গিত বলিয়া মনে করিতেছেন—কিন্তু প্রত্যেক বারেই শেষে দেবভাবই জয়ী হইতেছে, এবং যখন দেখি—পরিশেষে সমস্ত বাধা দূরে ঠেলিয়া বীরহৃদয় মাদিলীন ধর্মাধিকরণে আপনাকেই দোষী ব্যক্তি বলিয়া অকাট্য প্রমাণ দিলেন—তখন আনন্দে, বিস্ময়ে অধীর হইয়া আমরা বলিতে বাধ্য হই—ধন্য কবি—ধন্য তোমার প্রতিভা! শ্রেয় ও প্রেয়ের সংগ্রাম সাহিত্যক্ষেত্রে অমন দক্ষতার সহিত আর কোথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে কি?

আপাত-মধুরের এই আকর্ষণ কেন? কেন মানুষ জানিয়া শুনিয়া ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়সুখের জন্য লালায়িত হয়? যাহা লাভ করিলে মানুষ আর অন্য কিছু চাহে না, তাহার জন্য এতটুকু অপেক্ষা করিতে কেন সে অপারগ হয়? তাহার উত্তর—মানবের জন্মজন্মান্তরাগত সংস্কাররাশি। বহুদিন ধরিয়া কোন কিছু অভ্যাস করিলে আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা সেই অভ্যাসানুবর্তী কাজ করিতে বাধ্য হই। শুধু কয়েক দিনের অভ্যাসেরই যদি এই ফল, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, বহু জন্মজন্মান্তরের কর্মজনিত সংস্কাররাশির কী ভীষণ প্রতাপ! পুনঃ পুনঃ এবং দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যবিষয়ের প্রতীতিমাত্রই প্রতিক্রিয়া করিবার জন্য সদা উন্মুখ হইয়া আছে। বুদ্ধি উহার মধ্যে ক্রিয়া করিবার অবসর পায় না। মানুষ হইলে কি হয়, ওরূপ স্থলে আমরা সহজাত সংস্কারেরই—instinct-এরই দাস হইয়া থাকি, এবং মনে করি—পরমপুরুষার্থ লাভ করিলাম! স্থিরভাবে এই বদ্ধমূল সংস্কারপুঞ্জের প্রভাব চিন্তা করিলে



হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হয়; মনে হয়, তাই তো, আমি ভাল হইতে চাহিলেও ইহারা আমায় সবলে অন্যদিকে—ভোগের দিকেই লইয়া যাইবে! মানুষ যে অসদ্বস্তুকে অসৎ বলিয়া জানিয়াও ছাড়িতে চাহে না, তাহাতেই নিশ্চেষ্টভাবে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহার এই জড়তা দর্শন করিলে মনে স্বতই প্রশ্ন উঠে—তবে কি কখনো আমাদের মনে প্রেয়কে ছাড়িয়া শুধু শ্রেয়কেই কামনা করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিবে না? আমাদের প্রেয় কি কখনো শ্রেয়ে পর্যবসিত হইবে না? কখনো কি আমাদের ইচ্ছা ভুলিয়াও শ্রীভগবানের বিরাট ইচ্ছার সহিত এক হইয়া যাইবে না?

শ্রুতি এবং আপ্তবাক্য ইহার উত্তরে বলেন—অবশ্যই হইবে। প্রত্যেকের জীবনে এমন একদিন আসিবেই আসিবে, যেদিন তাহার অন্তরাত্মার বাণীই তাহার নিকট প্রবলতম হইবে। একদিন না একদিন মানব শুধু শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া নয়, আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এই তুচ্ছ বিষয়ের আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইবে, আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া শ্রীভগবানের ক্রীড়াপুত্তলিমাত্র হইয়া থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে। তখন তাহার আর কোন তুচ্ছ বস্তুতে লোভ থাকিবে না। 'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।'—ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাহার বাসনাসমূহ এককালে ক্ষয় পাইবে এবং সে নিত্যানন্দপদবীতে আরোহণ করিবে। ইহাই শাস্ত্রোক্ত পরমহংস-অবস্থা—যে অবস্থায় মানবীয় দেহে স্বয়ং ঈশ্বরই বিরাজ করিতে থাকেন, যে অবস্থায় আরূঢ় হইয়া মানব বলিতে পারে ঃ

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।"

—"আমি তমসের পরপারে অবস্থিত এই মহান আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। পরমার্থলাভের আর অন্য পথ নাই।" ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।* □

*১৭ বর্ষ, ৫ সংখ্যা

সত্যলাভ

স্বামী দয়ানন্দ

সত্য কী?

উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রেই বিকার প্রাপ্ত হয়। বিকার ছয় প্রকার—জন্ম (birth), সত্তা (relative existence), বৃদ্ধি (growth), বিপরিণাম (change), অপক্ষয় (decay) ও বিনাশ (death)। একটি বৃক্ষের কথা ধরুন। এই বৃক্ষটি ইতিপূর্বে ছিল না। একদিন একটি বীজ পুঁতিলাম, সেই বীজ রস ও উত্তাপ সহযোগে অঙ্কুরিত হইল—বৃক্ষটি জন্মলাভ করিল। এতদিন বৃক্ষের সত্তাই ছিল না; জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের অস্তিত্ব হইল। তৎপরে বৃক্ষটি বড় হইতে লাগিল; ক্রমে তাহাতে পত্র, পুষ্প ও ফলোদ্গম হইল। বৃক্ষটি তাহার উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিল। এইবার বৃক্ষদেহের মূলীভূত কারণগুলি ধীরে ধীরে পৃথক হইতে লাগিল—কার্য কারণে লয় হইয়া গেল—বৃক্ষের ক্ষুদ্র জীবনের অবসান হইল—বৃক্ষ মরিয়া গেল। ইহাই নামরূপাত্মক যাবতীয় বস্তুর জীবনেতিহাস। কারণ, যাহা কিছু দেশ-কাল-নিমিত্তের অধীন তাহাই কতকগুলি কারণের সমবায়ে গঠিত—তাহা বদ্ধ—তাহার অস্তিত্ব কারণগুলির উপর নির্ভর করিতেছে। যতদিন তাহারা সম্মিলিতভাবে কার্য করিবে ততদিনই বস্তুর অস্তিত্ব—যে মুহূর্তে তাহারা পৃথক হইয়া যাইবে সেই মুহূর্তে তাহার লয়। সূর্য, চন্দ্র, কোটি কোটি নক্ষত্রমণ্ডলী সকলেরই এই পরিণাম। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিমুহূর্তে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে—তাই ইহার নাম জগৎ, অর্থাৎ সদা পরিবর্তনশীল—তাই ইহা অনিত্য—মিথ্যা।

তবে কি সত্য বলিয়া কিছুই নাই—সবই মিথ্যা—সবই দুদিনের? আছে। এই দেশ-কাল-নিমিত্তের পারে এমন এক বস্তু আছে যাহা অপর কতকগুলি কারণের সমবায়ে জন্মলাভ করে না—যাহা এ-থাকের বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যাহার অস্তিত্ব ধার করা নয়—যাহা নিজের সত্তায় সত্তাবান—যাহা অস্তিত্বস্বরূপ। দেশে যাহার উদ্ভব নয়, দেশ যাহা হইতে উদ্ভূত; কালে যাহার উদ্ভব নয়, কাল যাহা হইতে উদ্ভূত; নিমিত্তে যাহার উদ্ভব নয়—নিমিত্ত যাহা হইতে উদ্ভূত।

এই দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত অবস্থা বুঝিতে হইলে, দেশ, কাল ও নিমিত্ত কী তাহা প্রথমে বুঝা আবশ্যক। পাশাপাশি দুইটি পদার্থ রহিয়াছে; কে উহাদিগকে পৃথক করিতেছে?—দেশ (Space)। পর পর দুইটি একই প্রকার শব্দ হইল; কে উহাদের পৃথক জ্ঞান উৎপাদন করিল?—কাল (Time)। আজ একটি বীজ রোপণ করিলাম, কাল উহা এক প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইল; কে এই পার্থক্য ঘটাইল?—নিমিত্ত (Causation)। অতএব বহুত্বের জ্ঞান দেশ-কাল-নিমিত্ত হইতেই জন্মায়। বহুত্বজ্ঞানের আর অপর কোন কারণ নাই। সুতরাং যাহা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত সেখানে দুই নাই—তাহা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—তাহাই সত্য। যাহা এক, তাহা অনন্ত, অসীম—কে তাহাকে সীমাবদ্ধ করিবে? তাহা অবিনাশী—কে তাহাকে বিনাশ করিবে? তাহা অভয়—কে তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিবে?

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব মাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ? তৎ কেন কং পশ্যেৎ? তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ? তৎ কেন কমভিবদেৎ? তৎ কেন কং মন্বীত? তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ? যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ? বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?[১] (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্)

আমরা কি করিয়া এই মহান সত্যকে লাভ করিব? ধনের দ্বারাই ধন লাভ হয়। বিদ্যা দ্বারাই বিদ্যালাভ হয়, ত্যাগের দ্বারাই সন্ন্যাস লাভ হয়, প্রেমের দ্বারাই প্রেমস্বরূপকে লাভ করা যায়—আমরা সত্যের দ্বারাই সত্য লাভ করিব। শ্রুতি বলিতেছেন—

"সত্যেনলভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।"
"সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।" (মুণ্ডকোপনিষদ্)
"তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো।
ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি।" (প্রশ্নোপনিষদ্)

তাঁহাদেরই এই বিরজঃ ব্রহ্মলোক যাঁহাদের কপটতা, মিথ্যা-ব্যবহার ও ছল নাই।

সত্যনিষ্ঠা ও তপস্যার দ্বারাই এই আত্মলাভ হয়। সত্যেরই জয় হয়। মিথ্যার কখনো জয় হয় না। সত্যের দ্বারাই সেই বিস্তীর্ণ দেবযান মার্গ লাভ করা যায়।

সত্যনিষ্ঠা বলিতে কি বুঝায়? কায়মনোবাক্যে সত্যপালনের নামই সত্যনিষ্ঠা। বাক্যে সত্যপালন, যথা—সত্য কথা বলা; অর্থাৎ ফলাফলের দিকে না চাহিয়া কোন বিষয়ের যথাজ্ঞান বিবৃতি। মনে সত্যপালন, যথা—(১) মন হইতে সকল প্রকার মিথ্যা জল্পনা-কল্পনা পরিত্যাগ করা; যথা কোন একটি অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াও তাহা গোপন করিবার জন্য মনে মনে কোন প্রকার মিথ্যা কল্পনার পোষণ না করা। (২) সর্বদাই সদসৎ বিচার করা। কায়ে সত্যপালন তিন প্রকারের হইতে পারে। যথা—(১) কথা রক্ষা করা; অর্থাৎ যাহা করিব বলিয়াছি তাহা কার্যে পালন করা। (২) অকপট ব্যবহার করা; অর্থাৎ ভিতর বাহির সমান করিয়া চলা। যাহারা কপট তাহাদের মনে এক ভাব কিন্তু তাহারা বাহিরের হাবভাব চালচলনে অন্য প্রকার দেখায়—এরূপ না করা। (৩) মনে সদসৎ বিচার করিতে করিতে যেটি মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সমস্ত দৈহিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সত্যটি গ্রহণ করা।

অন্যান্য গুণ অপেক্ষা সত্যের এত আদর কেন? ইহার কারণ, সত্য সকল গুণের আয়তন—আধার। পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে যেমন ভ্রমর আসিয়া জুটে, সেইরূপ যে সত্যকে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরিয়া থাকে, তাহার অন্তরে দিন দিন নব নব গুণের বিকাশ হইতে থাকে।

সত্যবাদী হইতে হইলে অকপট হইতে হইবে—মন মুখ এক করিতে হইবে। অকপট লোক সংসারে অতি বিরল। যে অকপট, লোকে তাহাকে শ্রদ্ধা করে এবং স্ত্রী-পুত্রাদি অপেক্ষাও অধিক বিশ্বাস করে। অকপট ব্যক্তি সকলের নিকট প্রাণ খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লয়। সে কোন

অপবিত্র ভাব বা বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারে না—অন্তত লোকলজ্জার ভয়েও তাহাকে উহা পরিত্যাগ করিতে হয়।

একটা মিথ্যা কথা বলিলে সেটি ঢাকিবার জন্য আরও দশটা মিথ্যা কথা বলিতে হয়, নানারূপ প্রতারণা, জাল, জুয়াচুরি করিতে হয়—তাহার সদাই ভয়, কখন ধরা পড়ি, কখন অপদস্থ হই। তাহার মন সর্বদাই ভীত ও সঙ্কুচিত থাকে। কিন্তু সত্যবাদীর পথ অতি সরল—তাহাতে লুকোচুরি নাই—ভয় নাই। সে সদাই প্রফুল্ল—সদাই নিশ্চিন্ত। যদি কখনো সে অন্যায় করে তাহা হইলে তাহা স্পষ্টই স্বীকার করে এবং স্থিরচিত্তে তাহার ফলভোগ করে।

সত্যবাদীকে বাকসংযম করিতে হয়। বেশি কথা বলিলে তাহার সঙ্গে দুই চারিটা মিথ্যা কথাও বাহির হইয়া যায়। সেইজন্য পরনিন্দা, পরচর্চা প্রভৃতি বাজে কথা পরিত্যাগ করিতে হয়। কাজেই সে "বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ অরতির্জনসংসদি"—গীতার এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া সচ্চিন্তায় কালাতিপাত করে।

সত্যবাদী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহার নিকট কথা কেবল শব্দ মাত্র নয়; সে জানে, Man's word is God in man—কথা দিলাম তো জান দিলাম—এই তার ভাব। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হউক অথবা প্রাধান্য লাভের জন্যই হউক, কোন কাজের জন্য প্রতিশ্রুত হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, কিন্তু তারপর কাজের কোন খোঁজখবর রাখে না। আর যে সত্যবাদী, সে হয়তো সব কাজ করিতে রাজি হয় না, কিন্তু যেটি করিব বলিয়া কথা দেয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। তখন যেন প্রতিজ্ঞারক্ষা করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সে দেহ-মন-প্রাণ সর্বস্ব অর্পণ করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। এইরূপে সত্যবাদীর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইতে থাকে।

সত্য হৃদয়ে সৎসাহস আনিয়া দেয়। দণ্ডীরাজ যখন শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে অশ্বিনীকে লইয়া রাজামহারাজার দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াও প্রত্যাখ্যাত হইয়া দুঃখে ও ক্ষোভে নদীতে আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে কে আশ্রয় দিয়াছিল? কে তাঁহাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল? একটি অবলা রমণী। কিসের সাহসে, কিসের প্রেরণায় রমণী তাহার ত্রিভুবনবিজয়ী ভ্রাতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ারূপ দুঃসাহসিক কার্যে অগ্রসর হইল? সত্যের প্রেরণায়। কি হেতু ভীমসেন প্রাণপ্রতিম যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল? সত্যের প্রেরণায়। সত্যনিষ্ঠাই নচিকেতার হৃদয়ে সেই অমানুষিক সাহস আনিয়া দিয়াছিল, যাহাতে বালক মৃত্যুভয় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যমালয়ে যাত্রা করিয়াছিল। সত্যনিষ্ঠাই তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করিয়াছিল। বালক পুনঃ পুনঃ প্রলোভিত হইয়াও যখন জলদগম্ভীর স্বরে বলিল—

"যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে।।"

—অর্থাৎ, এই যে আত্মবিষয়ক গূহ্য বর, নচিকেতা এছাড়া অন্য কোন বর চায় না, তখনই যম তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

সত্যবাদীর হৃদয় দিন দিন শতদলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তাহার মন—মিথ্যা, দু-দিনের বস্তু পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ-উচ্চতর চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে। কথায়, কার্যে, চিন্তায়—প্রতি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে সে কেবল

সত্যকেই অনুভব করিতে চায় এবং দিন দিন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সত্যের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নব নব রহস্য অবগত হইতে থাকে। তাহার মুখে সত্যের বিমল জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। তাহাকে যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়—যে তাহার সঙ্গ করে সেই পবিত্র হইয়া যায়। সত্যের মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না—উহা উপলব্ধির বস্তু। যে উপলব্ধি করিবে, সেই দেখিবে সত্যের ভাণ্ডারে কি অমূল্য ধন রহিয়াছে—পার্থিব রত্নরাজি তাহার নিকট তুচ্ছ। "যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি" বলিয়া সনাতনের তীব্র বৈরাগ্য দর্শনে অনুপ্রাণিত ব্রাহ্মণ নদীনীরে মানিক ফেলিয়াছিল, এ সেই ধন। বহ্নিপুরাণে আছে—

"সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যমেব পরং তপঃ।
সত্যমেব পরোযজ্ঞঃ সত্যমেব পরং শ্রুতম্।।
সত্যং বেদেষু জাগর্তি সত্যঞ্চ পরমং পদম্।
কীর্তির্যশশ্চ পুণ্যঞ্চ পিতৃদেবর্ষি পূজনম্।।
আদ্যো বিধিশ্চ বিদ্যা চ সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্।"

ধর্মেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহা সত্যনিষ্ঠার জ্বলন্ত মহিমায় পরিপূর্ণ। বৈদিকযুগে সত্যকাম, পৌরাণিকযুগে যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম প্রভৃতির কথা আমরা পড়িয়া আসিতেছি এবং আধুনিক যুগে—আধুনিক যুগ বলি কেন, এই সেদিন বঙ্গদেশে—এই কলিকাতার সন্নিকটে যে অশ্রুতপূর্ব মহিমামণ্ডিত সত্যসূর্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার কথা কি আর স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে ? আমরা দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বলিতেছি। কী অমানুষিক অনুরাগের সহিত তিনি আজীবন সত্য পালন করিয়াছিলেন! যখন যাহা করিব বলিয়াছেন তখনই তাহা করিয়াছেন; যখন যেখানে যাইব বলিয়াছেন তখনই সেখানে গিয়াছেন; যাহার নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিব বলিয়াছেন, তাহারই নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন; যাহা একবার করিব না বলিয়াছেন তাহা জীবনে কখনো করেন নাই। ছোট বড় সকল বিষয়েই তাঁহার সত্যের উপর সমান আঁট ছিল। আজীবন এইরূপে সত্য পালন করায় শেষে তাঁহার স্বভাব এইরূপ হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহার মুখ দিয়া একবার যাহা বাহির হইয়াছে, ভুলক্রমেও তিনি তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিতেন না—তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী তাহা করিতে পারিত না। জানিনা, আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ ইঁহার কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারেন কিনা, কিন্তু ইহা ঘটিয়াছিল। আজীবন একভাবে চিন্তা করিলে তাহা যে কি অদ্ভুত ফল প্রসব করে, তাহা আমরা এইসকল মহাপুরুষের জীবনেই দেখিতে পাই। বিজ্ঞান এখনও ইঁহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ইঁহাদের জীবনই নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিবে। আমরা এই মহাপুরুষের জীবনের প্রথমাবস্থার ইচ্ছাকৃত এবং শেষাবস্থার স্বতঃপ্রণোদিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির পার্শ্বেই শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাগানবাটী। ঠাকুর সেখানে মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইতেন। একদিন তিনি যদু মল্লিককে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাগানে যাইবেন। কিন্তু কোন কারণে সে-কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার হঠাৎ সেই কথা মনে পড়িল। তখন তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া তিনি সেই বাগানের দিকে চলিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখেন যে, বাগানের ফটক বন্ধ। কি

করেন, কথা তো রাখিতেই হইবে। ফটকের দ্বারে ফাঁক ছিল, তিনি সেই ফাঁক দিয়া পা গলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেনঃ "ওগো, আমি এসেছি।" পরে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নিদ্রা গেলেন।

পূর্বের ঘটনাটি তাঁহার ইচ্ছাকৃত সত্যনিষ্ঠার উদাহরণ, কিন্তু নিম্নের ঘটনা দুইটি তাঁহার সিদ্ধাবস্থার কথা—যখন সত্য-ই তাঁহাকে চালিত করিত—যখন তিনি চেষ্টা করিয়াও অসত্য আচরণ করিতে পারিতেন না। ঠাকুর বলিতেন ঃ "যার সত্যে আঁট আছে, মা তার কথা মিথ্যা হতে দেন না।" বাস্তবিকই নিম্নোক্ত ঘটনা দুইটি হইতে আমরা তাহাই দেখিতে পাই।

একদিন জনৈকা বৃদ্ধা ভক্ত (গোপালের মা) ভাত রাঁধিয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছেন। কিন্তু ভাতগুলি শক্ত ছিল। ঠাকুরের শক্ত ভাত সহ্য হইত না। তিনি উহা না খাইয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন ঃ "ওর হাতে আর কখনো ভাত খাব না।" বাস্তবিকই ইহার অল্পকাল পরে ঠাকুরের গলায় ঘা হইয়া ভাত খাওয়া বন্ধ হইল এবং আর গোপালের মার হাতে খাওয়া হইল না।

আর একবার ঠাকুরের পেটের অসুখ করিয়াছিল। ঠাকুর শম্ভুবাবুর নিকট এই কথা বলিলে তিনি ঠাকুরকে তাঁহার নিকট হইতে একটু আফিম লইয়া গিয়া খাইতে বলিলেন। পরে দুইজনেই ঐ কথা ভুলিয়া গেলেন। ঘরে ফিরিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুরের আফিমের কথা মনে পড়ায় তিনি ফিরিয়া গেলেন কিন্তু শম্ভুবাবুকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার এক কর্মচারীর নিকট হইতে আফিম লইয়া কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া চলিয়া আসিলেন। কিন্তু কিছুদূর আসিতে না আসিতে তিনি আর পথ দেখিতে পাইলেন না। কে যেন জোর করিয়া পাশের নালার দিকে তাঁহার পা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। রাস্তা ভুল হইয়াছে মনে করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন; তখন বেশ রাস্তা দেখিতে পাইলেন। আবার ফিরিলেন, আবার সেইরূপ পথ দেখিতে পাইলেন না। তখন হঠাৎ তাঁহার আফিমের কথা মনে হইল। তিনি উহা শম্ভুবাবুর নিকট হইতে লইব বলিয়া তাঁহার এক কর্মচারীর নিকট হইতে লইয়াছেন! তৎক্ষণাৎ তিনি শম্ভুবাবুর বাসায় ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে না পাওয়ায় আফিমের মোড়কটি খুলিয়া জানালা দিয়া ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন ঃ "ওগো, এই তোমাদের আফিম রহিল।" এই বলিয়া তিনি শুধু-হাতে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং এবার বেশ পরিষ্কার পথ দেখিতে পাইলেন।

আমরা কি এই মহাপুরুষের জীবনী শুধু পাঠই করিব, না তাঁহার উজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিজেদের জীবন গঠন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব?* □

পাদটীকা

১ যেখানে যেন দ্বৈতই হইয়াছে সেখানে এক অপরকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে দেখে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে চিন্তা করে, এক অপরকে জানিতে পারে। আর যেখানে সমস্তই আত্মা হইয়া যায় সেখানে কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কে কাহাকে দেখিবে? কে কাহাকে শ্রবণ করিবে? কে কাহাকে অভিবাদন করিবে? কে কাহাকে চিন্তা করিবে? কে কাহাকে জানিবে? যাহা দ্বারা এই সমস্তই বিজ্ঞাত হইতেছে, তাহাকে কে জানিবে? অয়ি মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে কে জানিবে?

*১৯ বর্ষ, ৩ সংখ্যা

কর্মযোগ ও আমাদের উপস্থিত কর্তব্য

স্বামী গঙ্গেশানন্দ

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।"

আমরা প্রবল কর্মপ্রবৃত্তি লইয়া জন্মিয়াছি—আমাদিগকে কাজ করিতেই হইবে। কাজ না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের ভিতরে ঠাসা কর্মস্পৃহা বা কর্মের বাসনা রহিয়াছে যতদিন না উহা সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইয়া যায় ততদিন কাহারও বিশ্রাম নাই। আমাদের অন্তর্নিহিত এই সুপ্ত বাসনাই আমাদিগকে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, জন্মের পর জন্ম কানে ধরিয়া ঘুরাইতেছে, ফিরাইতেছে, নাচাইতেছে—ইহাই আমাদের নিষেকাদিশ্মশানান্ত চেষ্টার প্রসূতি। ব্যষ্টি জীবনের ন্যায় সমষ্টি জীবনেও যাহা কিছু উদ্যম, যাহা কিছু আন্দোলন—civilisation বল, patriotism বল, socialism বল, militarism বল—পৃথিবী ব্যাপিয়া চলিতেছে, সকলের মূলে সেই বাসনা। তাই কবি গাহিয়াছেন—"বাসনায় জগৎসৃজন।"

এই বাসনা কোথা হইতে আসিল? অভাববোধ—অপূর্ণতার বোধ হইতেই বাসনার সৃষ্টি। পূর্ণ যে, সে আর কী প্রার্থনা করিবে? তাহার কোন অভাববোধ নাই—কিছুই প্রার্থনীয় নাই; সুতরাং কোন চেষ্টা বা কর্মও নাই। অতএব অপূর্ণতা হইতে যখন কর্মের সৃষ্টি, তখন যাহা কিছু আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়—যাহা কিছু আমাদিগকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি উদাসীন করে, তাহাই সৎকর্ম এবং তাহাই আমাদিগকে উদার করে। আর যাহা কিছু আমাদিগকে অপূর্ণতার দিকে লইয়া যায়—যাহা কিছু "আমি আমার" হইতে প্রসূত—যাহা কিছু অপরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনোদ্দেশে কৃত হয়, তাহাই অসৎ কর্ম এবং তাহাই আমাদের আত্মাকে সঙ্কুচিত করে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।" বাস্তবিক কর্মরহস্য অতি জটিল। কিন্তু সদসৎ কর্মের উপরোক্ত সংজ্ঞা মনে রাখিলে আমরা সহজেই কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে পারি। আর আমরা উদার হইতেছি কি সঙ্কুচিত হইতেছি, আমাদের নিজের মনই তাহার প্রধান সাক্ষী।

উপরে সদসৎভেদে কর্মের দুইটি বিভাগ করা হইল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম জিনিসটা সৎও নহে, অসৎও নহে—সদসৎ আমাদের মনে। একই কর্ম উদ্দেশ্যভেদে প্রবৃত্তিভেদে ভাল বা মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়। হত্যা করা খারাপ কিন্তু ভগবান অর্জুনকে দিয়া যে অত বড় কুরুক্ষেত্র সমর করাইলেন, তাহা নিশ্চিতই খারাপ নহে। কারণ, ক্ষাত্রশক্তির হস্ত হইতে সনাতন ধর্মের সংরক্ষণরূপ তাহার উদ্দেশ্য অতি মহান ছিল। সেইরূপ কর্মের মধ্যে ছোট

বড়ও নাই। যে জুতা সেলাই করিতেছে সে ছোট কাজ করিতেছে এবং যে চণ্ডীপাঠ করিতেছে সে বড় কাজ করিতেছে, ইহা বলাও ঠিক নহে। উভয়ের উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের লক্ষ করিতে হইবে। উহা যদি নিষ্কাম হয় তবে উভয়ই মহৎ। উভয়ই আমাদের ভববন্ধন ছেদন করিতে সহায়তা করিবে— উভয়ই আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবে। সকাম কর্ম, তাহা আপাতদৃষ্টিতে যতই বড় হউক না কেন, বন্ধন আনয়ন করে। অতএব কী কর্ম করিতেছি না করিতেছি তাহার প্রতি তত লক্ষ্য না রাখিয়া কী ভাবে উহা করিতেছি তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। প্রতি কার্যে, প্রতি কথাবার্তায় আমাদের ভাবশুদ্ধি হওয়া চাই—আমাদের আসক্তিশূন্য, নিঃস্বার্থ হওয়া চাই—ইহাই কর্মযোগ। এই ভাবশুদ্ধিতেই মানুষে মানুষে প্রভেদ, মানুষে দেবতায় প্রভেদ, দেবতা ঈশ্বরে প্রভেদ। যাঁহার যত ভাবশুদ্ধ তিনি ততই ভগবানের নিকটবর্তী, তাঁহার ভিতর দিয়া তিনি তত অধিকমাত্রায় প্রকাশিত হইতেছেন। যাঁহার ভাব পূর্ণমাত্রায় শুদ্ধ হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধেই শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ

"হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন ন হন্তি ন নিবধ্যতে।।"

এই ভাবশুদ্ধি সাধন করিবার বিভিন্ন উপায় আছে। যাঁহাদের কর্ম করিবার প্রবল উৎসাহ রহিয়াছে, অথচ যাঁহারা ঈশ্বরে বা অপর বহিঃশক্তিতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিবলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা নিজ মনকে অনাসক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। আর যাঁহারা ভগবদবিশ্বাসী, তাঁহারা শুভাশুভ সমস্ত কর্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিবেন, কারণ, সমস্তই তো তাঁহার। আপনাকে প্রতি কার্যে, প্রতি চিন্তায়, প্রতি নিঃশ্বাসে তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিতে হইবে। যাহা কিছু 'আমার' বলিয়া মনে উঠিবে, তখনই তাহা প্রিয়তমের চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে। তাই ভগবান বলিতেছেন ঃ

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।"

ইহ-পরকালে তিনিই একমাত্র আপনার—জীবন-মরণের সাথী। আর যাহা কিছু—সকলের সহিত ক্ষণিক সম্বন্ধ, সুতরাং তাহাদিগকে 'আমার' ভাবিয়া দুঃখের সৃষ্টি করা নির্বোধের কার্য। এইরূপে যথার্থ আত্মনিবেদনে সমর্থ হইলে আমরা সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, সকল অবস্থাতেই অচল অটল সুমেরুবৎ অবস্থান করিতে পারিব।

আর যাঁহারা জ্ঞানী—বিচারপথ অবলম্বন করিয়া নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, নির্লেপ, সর্বকার্যকারণাতীত আত্মার উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা এই ভাবশুদ্ধির জন্য 'বিপরীত দৃষ্টি' করিবেন। শ্রীভগবান বলিতেছেন ঃ

"কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।।"

অর্থাৎ যিনি কর্মেতে অকর্ম দেখিয়া থাকেন, এবং অকর্মে কর্ম দেখিয়া থাকেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগযুক্ত এবং সকল প্রকার কর্মের কর্তা।

আচার্য শঙ্কর এই শ্লোকের ভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিই কর্মের আশ্রয়, কিন্তু সেই দেহাদি ধর্ম-কর্ম সকল আত্মাতে আরোপিত করিয়া (ভ্রান্ত জীব) ভাবিয়া থাকে যে 'আমি কর্তা; আমার ইহা কর্ম, আমি ইহার ফলভোগ করিব।' এই প্রকার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারনিবৃত্তি এবং সেই নিবৃত্তিজনিত সুখিত্বও আত্মাতে আরোপ করিয়া (ভ্রান্ত জীব) বোধ করিয়া থাকে যে, 'আমি এক্ষণে কিছুই করিতেছি না, আমি স্থির হইয়া রহিয়াছি, এবং (নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রযুক্ত) আমি এক্ষণে সুখী' ইত্যাদি। সেই এই প্রকার স্বভাবাক্রান্ত সংসারের লোকের এই প্রকার বিপরীত দর্শন নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান 'কর্মণ্যকর্ম' ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন।"[১]

পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামীজী এই কর্মযোগ পথে নূতন আলোক প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ঃ "আদর্শ পুরুষ তিনিই যিনি গভীরতম নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা অনুভব করেন। তিনি সংযম রহস্য বুঝিয়াছেন—আত্মসংযম করিয়াছেন।" এই আত্মসংযম খুব কঠিন বলিয়া দুর্বল মানব যাহাতে সহজে ঐ পথে চলিতে পারে, যাহাতে সহজেই কর্মে আসক্ত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য স্বামীজী তাঁহার ঐশীজ্ঞানলব্ধ অমূল্য অভিজ্ঞতারাশি রাখিয়া গিয়াছেন। জগতে পরোপকারের তুল্য আর ধর্ম নাই। কিন্তু জগতের দুঃখ দূর করিব ইত্যাদি অভিমান থাকিলে কর্মফলে স্পৃহা আসিবেই আসিবে। তাই কর্মফলস্পৃহা ত্যাগ করিবার সহজ উপায়, আমরা যে-চক্ষে জগৎটা দেখি সেই দৃষ্টিটাই বদলাইয়া দেওয়া। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন—এ জগৎটা একটি Moral gymnasium বা নৈতিক ব্যায়ামশালা। জগৎ জগৎই থাকিবে; মধ্য হইতে আমরা ভাল হইয়া যাইব। ইহারও দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি জগৎকে কুকুরের ল্যাজের সহিত তুলনা করিয়াছেন—উহা যেমন হাজার চেষ্টা করিলেও সোজা করিতে পারা যায় না, ছাড়িয়া দিলে যেমন বাঁকা তেমনই হইবে; সেইরূপ শতশত জন্ম ধরিয়া চেষ্টা করিলেও জগতের দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-শোক কিছুমাত্র দূর হইবে না—ইহা বাতব্যাধির ন্যায় শরীরের একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র। তথাপি স্বামীজী বলিতেছেন, আমাদিগকে সর্বদাই সৎকার্য করিতে হইবে—পরোপকার করিতে হইবে। কারণ, উহাতেই আমাদের পরম কল্যাণ।

এতদিন 'জীবে দয়া' কর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল, কিন্তু স্বামীজী বলিয়াছেন, "আমি কাহাকেও দয়া করিতেছি"—এ ভাবও ঠিক নহে, কারণ দয়ার ভিতর ছোটবড় ভাব থাকে। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমার কতটুকু শক্তি যে দয়া করিব! আমার দয়া করিবার অধিকার কী? যিনি এতবড় সংসার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তিনি সৃষ্টি রক্ষার জন্য তোমার আমার মতো লোকের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া নাই। "কোন দরিদ্রই আমাদের এক পয়সা ধারে না, আমরাই তাহার সব ধারি। কারণ, সে আমাদের সমুদয় দয়াশক্তি তাহার উপর ব্যবহার করিতে দিয়াছে।" তোমার আমার জন্মিবার পূর্বেও সৃষ্টি চলিয়াছিল এবং মৃত্যুর পরেও চলিতে থাকিবে। সুতরাং আমাদের দয়া-করা-রূপ

অভিমানের স্থান কোথায়? তাই স্বামীজী বলিয়াছেনঃ 'সেবা কর'। জীব তুচ্ছ দয়ার পাত্র নহে—জীব সাক্ষাৎ শিব। সেই বাক্যমনাতীত ভগবান তোমার সম্মুখে তোমার পূজা লইবার জন্য বহুরূপে বিরাজ করিতেছেন। তুমি তাঁহার সেবা করিয়া—নরদেহে তাঁহার পূজা করিয়া ধন্য হও। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ "তোমরা শাস্ত্রে পড়িয়াছ, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব ইত্যাদি, কিন্তু আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক।"

কর্ম জিনিসটি বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম হইতে বিরত হইলে চলিবে না। কর্মদ্বারাই আমাদিগকে কর্মের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। যেমন কাঁটা দ্বারা কাঁটা তুলিতে হয়, সেইরূপ প্রথমে সৎকর্মরূপ কাঁটা দ্বারা অসৎ কর্মরূপ কাঁটা তুলিতে হইবে, পরে সৎকর্ম ও অসৎকর্মরূপ উভয় কাঁটাই ফেলিয়া দিতে হইবে। কর্মের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ করিতে হইবে। কর্ম না করিয়া নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ হয় না। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন ঃ "গোরুতে মিথ্যা কথা বলে না, দেয়ালে চুরি করে না, কিন্তু গোরু গোরুই থাকে, দেয়াল দেয়ালই থাকে।" তাঁহার মতে Struggle is life—সংগ্রামই জীবন। ভাল হইবার জন্য চেষ্টা কর, তাহাতে খারাপ হয় হউক—ভয় নাই—ফের চেষ্টা কর, ইহাই জীবন। তমঃ হইতে সত্ত্বে যাইবার ইহাই একমাত্র উপায়—আমাদিগকে রজোগুণের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। অধিকাংশ লোকই তামসিক ও রাজসিক। সাত্ত্বিক লোক নাই বলিলেই হয়। মুখের কথায় এই সাত্ত্বিক অবস্থা লাভ হয় না—দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর সাধনার প্রয়োজন। তবে ধীরে ধীরে তামসিক হইতে রাজসিক, রাজসিক হইতে সাত্ত্বিক অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। তাই স্বামীজী বলিতেছেন ঃ "কিন্তু কয়জন এজগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে—এজগতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।"

কিন্তু আমরা এ-অবস্থার মর্যাদা বুঝি না, আমাদের বুঝিবার শক্তিই বা কোথায়? আমরা অহঙ্কারবশত মনে করি, আমাদের সাত্ত্বিক অবস্থা—আমাদের কার্য করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জন লোক এইরূপে আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছে—ভাবিতেছে—আমরা ভগবানের প্রিয়পাত্র; ভগবান ভক্তবৎসল, তিনি কৃপা করিয়া আমাদের উদ্ধার করিবেন—আমাদের দেশের দুঃখদারিদ্র্য, রোগশোক দূর করিবেন। ভগবান তো আর ভক্ত চেনেন না—তাই আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে! নির্বোধ আমরা নিজের চক্ষে ধূলি দিয়াছি, আবার ভগবানের চক্ষেও ধূলি দিতে চাহি! কিন্তু তিনি চক্ষুষ্মান—তিনি উত্তম বৈদ্য। তিনি জানেন, কোন রোগের কি ঔষধ এবং তাহাই তিনি প্রয়োগ করিতেছেন। কেন আজ সুজলা

সুফলা ভারতভূমি করাল দুর্ভিক্ষ, রোগ ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে উজাড় হইতে চলিতেছে? কেন আজ গৃহে গৃহে হাহাকার, নিত্য নূতন উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে? ইউরোপ না হয় মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে—আমাদের দেশে তো মারামারি কাটাকাটি নাই—তবে আমাদের মৃত্যুর হার পৃথিবীর সমুদয় দেশ অপেক্ষা এত অধিক কেন? কেন এক দুর্ভিক্ষে, এক ম্যালেরিয়ায়, এক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে শত শত ইউরোপীয় মহাসমর অভিনীত হইতেছে! কেন—তাহা কি এখনো বলিয়া দিতে হইবে? আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে! স্বামীজী বলিয়াছেন, আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দেশের কোটি কোটি দরিদ্র ও নারী জাতির উপর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছি—ইহাই আমাদের national sin (জাতীয় পাপ) এবং তাহারই প্রায়শ্চিত্ত সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তাহার উপর দাসসুলভ ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ও দুর্বলতা আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে অন্ধ ও জড় করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা নিজেরাই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতেছি—নিজেরাই নিজের উন্নতির পথে কণ্টক রোপন করিতেছি। আমরা বুঝিয়াছি সংহতিই শক্তি—কোন একটা বড় কাজ, নূতন কাজ করিতে গেলে দশজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা দরকার। ঐরূপ কাজও কয়েকটা আরম্ভ হইল—হাজার হাজার টাকাও সংগৃহীত হইল, কিন্তু দু-এক বৎসর যাইতে না যাইতেই তাহাদের সবগুলিই নষ্ট হইল! ইহার কারণ কি? পাশ্চাত্যের নিকট হইতেই আমরা এই co-operation শিক্ষা করিয়াছি। কই, তাহাদের দেশে তো এরূপ হয় না! চুরি, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘোর স্বার্থপরতা ইহার মূলে বিদ্যমান। দুই শতাব্দী বৎসর পূর্বে এই সমস্ত দোষেই আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে। এতদিনে আমাদের যথেষ্ট ভাল হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু হায়, তাহাদের প্রত্যেক দোষটি আজও পূর্ণমাত্রায় আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

অতএব আমাদিগকে সযত্নে এই তমঃ পরিহার করিতে হইবে। আমাদিগকে আলস্য, জড়তা পরিত্যাগ করিয়া কর্মতৎপর হইতে হইবে। সমস্ত দেশের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে সারা দেশ নিদ্রায় অচেতন। আমাদের স্বদেশহিতৈষণা, র কংগ্রেস, আমাদের হোমরুল এজিটেসন সেই ঘুমের ঘোরে প্রলাপোক্তিমাত্র। তেছি না যে আমাদের শক্তি নাই, বুদ্ধি নাই—বলিতেছি না যে আমাদের সাহস নাই—আমাদের সবই আছে। কিন্তু আমরা সে শক্তি, সে বুদ্ধি, সে সাহসের ব্যবহার করিতেছি কই? বিনা ব্যবহারে উহাতে 'মরচে' পড়িয়া গিয়াছে—উহাদিগকে আবার ব্যবহার দ্বারা ঘসিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল করিতে হইবে। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন ঃ "চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা, চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া, অনন্তসম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

আমাদের সম্মুখে যে অনন্ত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, বর্তমানে আমাদের উপর যে-গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে, কোন দেশের লোকদের উপর কোন কালে এরূপ গুরুভার ন্যস্ত ছিল কিনা সন্দেহ। গ্রামকে গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড়

হইয়া যাইতেছে। গ্রামের জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিয়া দিলে, দুই চারিটা ড্রেন কাটিয়া জল নিকাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলে এবং পানীয় জলের একটা সুবন্দোবস্ত করিলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আট-আনা কমিয়া যায়। আমরা অনেকেই ইহা বুঝি এবং এই সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু একটা গ্রামে গিয়া যথার্থ কাজ আরম্ভ করিতে রাজি নহি।—ইহাই কি আমাদের সত্ত্বগুণের লক্ষণ?

দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবিসম্প্রদায় এক বিন্দু বৃষ্টির আশায় আকাশের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে—বৃষ্টি হইল না—শষ্য শুকাইয়া গেল। ফলে কোটি কোটি নরনারী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল! গোটাকতক খাল কাটিয়া দিলে হয়তো তাহাদের প্রাণরক্ষা হইত; কিন্তু গ্রামবাসীর সে একতা, সে উদ্যম নাই। আমরা ইহার জন্য অপরের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি।—ইহাই কি আমাদের সত্ত্বগুণের লক্ষণ?

গ্রামের মধ্যে যাঁহারা অবস্থাপন্ন, তাঁহারা নিজের পুত্রকন্যাকে শহরে লইয়া গিয়া বিপুল অর্থব্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছেন, কিন্তু গ্রামের শতশত বালক-বালিকা যে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই। পুত্রকন্যার অন্নপ্রাশনে, বিবাহে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন কিন্তু গ্রামে একটি স্কুল স্থাপন করিলে যে পার্শ্ববর্তী ১০/২০ খানি গ্রামের বালক-বালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করিবে, ইহা জানিয়াও কেহ ততটুকু স্বার্থত্যাগ করিতে রাজি নহেন। তাহাও অপরে করিবে তবে হইবে। নিজের ক্ষমতা থাকিতেও পরের মুখাপেক্ষী হওয়াই কি সত্ত্বগুণের লক্ষণ?

তাই স্বামীজী বলিয়াছেন ঃ "Feed the poor and educate the masses." ভারত অনাহারে মৃতপ্রায়, তাহাকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখ এবং শিক্ষা দাও ঃ "Teach them through the ears and not through the eyes. If the mountain does not come to Mohammed, Mohammed must go to the mountain." অর্থাৎ দেশের দরিদ্র, নিরক্ষর ব্যক্তিগণ যদি তোমার নিকট আসিতে না পারে, তুমি তাহাদের বাড়ি বাড়ি যাও এবং মুখে মুখে গল্প করিয়া, ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা ছবি দেখাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত কর। "Let these be your gods." হে দেশবাসি! তোমরা কি কেহ সেই মহাপুরুষের কথায় কর্ণপাত করিবে না?* □

পাদটীকা

১ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়-কৃত অনুবাদ।

*২১ বর্ষ, ২ সংখ্যা

পূজার আনন্দ

স্বামী বাসুদেবানন্দ

বৎসরের নির্দিষ্ট দিন কয়টি পলে পলে শেষ করিয়া সেই পূজার দিন আবার আসিয়াছিল—কোন স্মরণাতীত কাল হইতে কত হৃদয়ের উদ্বেলিত ধারায় দিগ্‌দেশ পূর্ণ করিয়া যেমন আসে, আমার এই শ্যামা মায়ের বিশাল বক্ষ শ্যাম-সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করিয়া আসিল প্রথম শরৎ—আনন্দময়ী মায়ের আগমন বার্তা লইয়া, তাহার মধুর হাসির দীপ্তি বিকীরণে আকাশ ভুবন আলোকিত করিয়া। তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিলাম, আর তাহার অভিনন্দনের জন্য আমি আমার কষ্টে-সঞ্চিত অতীত স্মৃতির যে বিচিত্র বরণ-ডালা সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম তাহা সেই সুন্দরের চরণে উপহার দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আসিল—শারদীয়া আনন্দময়ী দেবী; শরতের সৌন্দর্য-গরিমার উপর আনন্দের ভাণ্ডার খুলিয়া তাহাকে আরো সৌন্দর্যময়, আরো মহিমাময় করিয়া। বড় আনন্দে মাকে বরণ করিলাম; কিন্তু জানিনা সে-আনন্দ হৃদয়ের কিনা। কেবল, আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দোচ্ছ্বাসে চতুর্দিক ভরিয়া যাওয়া যেন একটা চিরন্তন প্রবাদ; তাই নিরানন্দকেই আনন্দ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। আনন্দের স্বতঃ উচ্ছ্বাস আজ তীব্র দহনের নিষ্ঠুর জ্বালায় যেন চিরতরে শুষ্ক, নিরাশায় বিলীন।

এই পূজার বার্তা একদিন বঙ্গের প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে গৃহস্বামীর হৃদয়ে, শিশুর প্রাণে প্রাণে ঘোষিত হইয়া মনে যে-আনন্দ দিত, তাহারা তাহাতে আত্মহারা হইত। আজ তাহাদেরই জীবনে সে-আনন্দ স্বপ্নে পর্যবসিত, সে শোকের তরঙ্গে বিধ্বস্ত। দেশের, বিরাট সমাজের সকলেই কি তবে আজ একই বেদনায় জর্জরিত? না, তা নয়। আজ কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া চায় না, কেহ কাহারও সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইয়া অপরের ব্যথার ভার আপনার বুকে লইতে পারে না। আজ প্রত্যেকেই আপনার সুখে আপনি ভাসমান, আপনার দুঃখের অকূল পাথারে আপনি মজ্জমান। আশ্রয়তরী ভগ্ন, দিকহারা হইয়া তরঙ্গাভিঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

তাই আজ আনন্দময়ীর আগমনে কাহারও রত্নাভরণ-শোভিত কৈলাস-প্রতিম প্রাসাদখানি আনন্দ ও হাস্য-কৌতুকের উচ্চ কোলাহলে মুখরিত, আবার কাহারও জীর্ণকুটিরখানি শোক বিষাদ-জনিত করুণ ক্রন্দনের মৃদুরোলে পরিপূরিত। কেহ তাহার জীর্ণকুটির-অঙ্গনে বসিয়া ভাবিতেছে পূজার কথা—সেই সুদূর অতীতের কত স্মৃতি বিজড়িত দিনের কথা—যে দিনে সেও তার প্রতিবেশীর মতো কত আনন্দে, কত উৎসাহে, কত আশায় হৃদয় মাতাইয়া তুলিয়াছে। সেই পূজাই তো আবার আসিল? কিন্তু তাহার সে-আনন্দ কই, সে-উৎসাহ কই, সে-আশাই বা কই? আজ তাহার দশদিক অন্ধকার বিষাদময়! আজ

তাহার সকল আশ্রয় হারাইয়া গিয়াছে, তাই শূন্য হৃদয়ে শূন্যে ভর করিয়া মার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, যদি সেই বরাভয়দাত্রীর চরণে আশ্রয় পায়। কিন্তু হায় একি! যেখানে সামর্থ্যের বিচিত্র প্রাসাদ-শিখর গগনস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান, তাহারই পার্শ্বে এই নিরাশ্রয় দীনের জীর্ণ কুটিরখানি পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষায় ভর করিয়া; কিন্তু সামর্থ্যের সেদিকে চাহিবার অবসর নাই, সে আপনার গরিমায় আপনি ভরপুর।

দেখিলাম—দীনা অনাথিনী জননী বড় আশায় বুক বাঁধিয়া সামর্থ্যের তোরণদ্বারে দাঁড়াইল, শুধু তাহার প্রাণপ্রতিমাটির জীবনরক্ষার মানসে। হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিলঃ "আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে, হের ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়ে কাঙালিনী মেয়ে"। কিন্তু হায়! তাহার কাতরতা শুনিবে কে, তাহার অবস্থা দেখিবেই বা কে? সে একটু মুখের সান্ত্বনাও পাইল না, তাহার ভূম্যবলুণ্ঠিত দেহের সকল শক্তি-নিয়োজিত ক্ষীণ প্রার্থনার স্বর কেহ শুনিল না—বাতাসের দোলায় ভাসিয়া গেল, শুধু লৌহময় তোরণদ্বারে প্রতিহত একটি প্রতিধ্বনি কানে ফিরিয়া আসিল—"কিছু খাবার দাও, এক টুকরা কাপড় দাও"। শিশু আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল—মায়ের বক্ষে শেল বিঁধাইয়া। ক্রমে অবসন্ন হইয়া শিশু স্নেহময়ীর বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। পাগলিনী স্নেহের পুতুলটিকে বক্ষে চাপিয়া ছলছল নেত্রে দাঁড়াইল আসিয়া পূজামন্দিরের অঙ্গনে। হৃদয়ের বেদনা উচ্ছ্বসিত ধারায় বহিয়া নীরব ভাষায় আনন্দময়ীর প্রতিমার উদ্দেশে জানাইল ঃ "মাগো! এত বাঁশি এত হাসিরাশি, এত তোর রতন ভূষণ, তুই যদি আমার জননী মোর কেন মলিন বসন।"

তখন মার বোধন-উৎসব শেষ হইয়াছে। দেখিলাম পূজামন্দিরে করুণাময়ীর প্রতিমা সজ্জিত, সম্মুখে পূজার উপকরণ স্তূপীকৃত; কিন্তু যেন প্রাণহীন! তারপর শুনিলাম—সামর্থ্য-নিয়োজিত পূজারীর অর্থাকাঙ্ক্ষিত প্রাণ "ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, যশো দেহি, ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে" রবে পূজা শেষ করিল। মন্দিরাঙ্গনে "অন্নং দেহি, বস্ত্রং দেহি" রব অন্নপূর্ণার কানে গেল না। বুঝিলাম না ইহা পূজা, কি পিপাসিতের পিপাসা শান্তির দারুণ চাঞ্চল্যের প্রেরণায় অসার প্রাণহীন আয়োজন! আজ দেশময় কেবল তৃষিতের ব্যাকুল চিৎকার 'দেহি দেহি'। এই কি আমাদের সেই মা! মাগো! কোন্ অপরাধে আমাদের আজ এই দুর্দশা? অপরাধের সীমা নাই। এই যে দিগন্ত ভরিয়া যাতনারুদ্ধ বেদনাগীতি, ইহা কি মার কোমল প্রাণে আঘাত করিয়াছে? কেন করিবে? কার কাছে জানাইলাম? মাটির প্রতিমার কাছে না আদ্যাশক্তির চিন্ময়ী মূর্তির কাছে? সত্য যদি হৃদয়ের সকল কালিমা ছাপাইয়া উঠিয়া উত্তর দেয় তবে বলিতে হইবে—"মাটির প্রতিমার কাছে, স্বার্থাসূয়ার বিকট মূর্তির কাছে, বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষার কাছে" আজ পূজার আয়োজন!! আমার অতীত পুরুষের কীর্তি নামে মাত্র বজায় রাখা, পুরোহিতের প্রাপ্য হইতে তাহাকে নিতান্ত বঞ্চিত না করা, সর্বোপরি আপনার গৌরব প্রচার করা। তারপর আবার আপনার প্রাণহীন দৈন্যের রঙ ঢাকিবার জন্য অদৃষ্টের দোহাই স্বরূপ মায়ের ত্রুটি ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হই না। আজ

পূজাবাড়িতে অন্নপূর্ণার আগমনে দীন আতুরের সেবা-মুখরিত আনন্দকোলাহল কোন্ নিরাশায় নিবিড় আঁধারে মিলাইয়া গিয়াছে। আছে শুধু তার উজ্জ্বল স্মৃতিটুকু—যাহা এখনো প্রাণের ভিতর অব্যক্ত আকুলতার তরঙ্গ ছুটাইয়া দেয়। তাই বলি, মা! আমার অপরাধ অপরিমেয়, জানিনা বিধাতার কাছে ইহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান কি আছে। হায়! কে এই আশ্বাসবাণী শুনাইল যে, আমার সেই স্বপ্ন-জীবন আবার বাস্তব-জীবনে পরিণত হইয়া সেই প্রাণ সেই হৃদয় ফিরাইয়া আনিবে? আর অপরাধের বাকি কী? বাস্তব-জীবন আজ স্বপ্নের মতো অচিন্তনীয় অসম্ভাব্য! দেবতার সিংহাসন তাই আজ অসুরের পদভরে নিপীড়িত, বিপর্যস্ত, কলঙ্কিত, চিরতরে বিনষ্ট প্রায়!

এইরূপে মার পূজা শেষ হইল। দেখিলাম—দেশের বিশাল বক্ষ ভরিয়া একটা বিরাট শোকাভিনয়ের করুণ দৃশ্য। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু করিলাম কী? করিব আর কী? করিবার শক্তিই বা কোথায়? আমাদের সকল শক্তি আজ নিষ্পেষণে তরল-বহ্নি অশ্রুতে পরিণত হইয়াছে, তাহাই জীবনের একমাত্র সম্বল। তাই সেই সম্বলই মার চরণে উপহার দিয়া বিসর্জন-উৎসব শেষ করিলাম। কাঁদিলাম সত্য, কিন্তু কাহার জন্য? নিজেরই জন্য, স্বার্থের জন্য। আজ আমার সমস্ত জীবনই স্বার্থে পরিপূর্ণ, দুঃসহ ভারে অবনত। এখন এই 'স্বার্থ', এই 'আমিত্ব' হৃদয়ের সকল স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে, আমার কর্মাকর্ম, পূজা-প্রার্থনা সবই এক অভিনব বর্ণে চিত্রিত করিয়া জীবনগতি এক লক্ষ্যহীন অভিনব পথে মরুর বক্ষে পিপাসিত পথহারা পথিকের ন্যায় সীমাহীন দারুণ প্রান্তরে ছুটাইয়া দিয়াছে। এ গতি রোধিবে কে? আজ আমি 'স্বার্থ' ছাড়া আর সব বিসর্জন দিতে পারি।

তাই বলি, মাগো! যে-হৃদয় স্বার্থাসূয়ার অত্যাচারে সর্বদাই কলঙ্কিত, সেখানে তোর বোধন-উৎসব কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইল মা? এখনো তোর পূজার সময় হয় নাই, তোর পূজার আয়োজনই করিতে পারি নাই। পূজার সময় হইবে তখন—যখন আমার এই উন্মত্ত 'আমি' বিশ্বের 'তুমির' মধ্যে চিরদিনের মতো হারাইয়া যাইবে। "বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর, আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর?" আমার বিধাতা আমাতে কি এখন জাগিয়াছেন? "সেদিন আমার কবে বা হবে? ওরূপ হৃদয় মাঝে ভাতিবে, সেদিন কবে হবে? নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ভাসিব রূপসাগরে। শান্তং শিবমদ্বিতীয়ম্ রাজ রাজ চরণে, কবে বিকাইব?" কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? হৃদয়দেবতার দ্বার রুদ্ধ, আমার প্রাণযন্ত্র বিকল, স্নায়ুমণ্ডলী অনুভূতিবিহীন। তাই সব নীরব নিস্তব্ধ, কোন উত্তর নাই। মা করুণাময়ি! আবার বলিতেছি, তোর পূজার আয়োজন এখনো হয়নি। তোর পূজা করিতে কে আমায় শিখাইবে মা! আমি যে কর্ণধারবিহীন। বিশ্ব জননি! আমার লক্ষ্যহীন শূন্যের মাঝে স্নেহময়ী বরাভয়দাত্রী মাতৃমূর্তি প্রকটিত করিয়া, দৈত্যকুলের ভীতি উৎপাদন করিয়া একবার "মাভৈঃ মাভৈঃ" বাণী শুনা মা! আমার সকল ভয় দূরে পলাইয়া যাক, সকল বন্ধন টুটিয়া যাক, অসার সুখের হাট চিরদিনের মতো ভাঙ্গিয়া যাক। তবে আমার এই কলঙ্কিত প্রাণ পবিত্র

হইবে, নিষ্ঠুর নির্মমতায় দূরে সরাইয়া তেজোগরিমার কমনীয় মূর্তি প্রকাশিত হইবে, আমি তোর চরণে আত্মবলি দিয়া তোর নিখিল বিশ্বে আপনাকে হারাইয়া দিয়া পূজার যোগ্য হইব। মাগো! আমার সকল শোক, সকল দুঃখ, সকল লাঞ্ছনা, সকল কালিমা আজ তোর বরে আমার প্রাণ জাগাইয়া দিক—তবে শোক-বিষাদ অশ্রুই আমার জীবনের সাথী হইলেও ধন্য হইব, আত্মবলি দিয়া আপনহারা হইতে শিখিব, দেশময় তোর পূজার মঙ্গলঘট স্থাপিত হইবে!

"যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার—আঘাত সে যে পরশ তব সেই তো পুরস্কার।" আমি অশ্রুবন্যাকে ভয় করি না মা! ইহাই আমার জীবনের কাম্য—সেও তো তোরই দেওয়া!

এস ভাই! মার কোটি সন্তান আজ এক সঙ্গে মিলিয়া প্রাণে প্রাণ, হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া মার বোধন উৎসবের আয়োজন করি, মার নিখিল বিশ্বে আপনাকে হারাইয়া ফেলি। তবেই জীবনে সার্থকতা আসিবে, জন্মে সফলতা আসিবে। নতুবা এই আসা-যাওয়া, পথের পরিশ্রম ও লাঞ্ছনাই একমাত্র সার হইবে। এস আজ আব্রহ্ম-হিমানীমাতৃভূমির দিগন্ত-প্রসারিত বক্ষ কম্পিত করিয়া প্রাণ খুলিয়া গাহিঃ "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।* □

* ২৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা

ভারতের বৈশিষ্ট্য

স্বামী সুন্দরানন্দ

বর্তমান যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ বাহনে আরোহণ করিয়া এক দেশের ভাবরাশি বিদ্যুদ্বেগে অপর দেশে উপস্থিত হইতেছে। বাষ্পীয় যান ও তড়িৎ সহায়ে নানাবিধ মতবাদ দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। বহুকালের রক্ষণশীলতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া দেশদেশান্তরের সংখ্যাতীত ভাব-প্রবাহে নবজাগ্রত ভারতবর্ষ পরিপ্লাবিত হইতেছে। এই বিচিত্র ভাবসমূহ কেবল যে দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর উপরই প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহা নহে, আপামর জনসাধারণও ইহাদের অমিত প্রভাবে ক্রমেই অধিকমাত্রায় প্রভাবান্বিত হইতেছে। এই ভাবগুলির প্রবল স্রোতের মুখে পড়িয়া অনেক প্রাচীন রীতিনীতি চক্ষের সম্মুখে স্রোতের তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে ভারতবর্ষ ক্রমেই এক অভিনব আকার ধারণ করিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেনঃ "আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়া কী হইবে? যাহা বীর্যবান, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে?"[১]

প্রকৃতপক্ষেও ভারতের এই বাহ্যরূপের পরিবর্তনে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। তবে যাঁহারা কাহাকেও কয়েকটি অর্থহীন দেশাচার বা লোকাচার পরিত্যাগ করিতে দেখিলেই তাহার ধর্ম বা জাতি নষ্ট হইল বলিয়া মনে করেন, বর্তমান যুগের পরিবর্তনে তাঁহাদের ভয় পাইবার অনেক কিছু আছে। ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতিই কালের অবিরাম গতির সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত পরিবর্তিত হইতে হইতে এক অজ্ঞেয় লক্ষ্যের সন্ধানে চলিয়াছে। কালের গতি রুদ্ধ করিয়া উহাকে স্থিতিশীল করা যেমন সম্ভব নয়, জাতির পরিবর্তন বন্ধ করিয়া উহাকে এক অবস্থায় রাখাও তেমন অসম্ভব। সুতরাং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। তবে এই পরিবর্তনের ফলে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল বিশেষত্ব—ভারতের বহুকালার্জিত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য—আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড—আমাদের প্রাণশক্তির উৎস—ধর্মের উপর যাহাতে কোন আঘাত না লাগে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, গঙ্গার অফুরন্ত উৎস হিমালয়স্থিত গঙ্গোত্রী হইতে যতদিন জলধারা নির্গত হইবে ততদিন গঙ্গা যেমন সাগরসঙ্গমে যাইবার পথ খুঁজিয়া লইবে, ঠিক তেমন ভারতের ধর্মরূপ প্রাণশক্তি যতদিন অব্যাহত থাকিবে, ততদিন ভারত নানা প্রকারে পরিবর্তনের ভিতর দিয়াও তাহার জীবনের জয়যাত্রার পথ বাহির করিয়া অগ্রসর হইবেই। কিন্তু পাশ্চাত্যের জড় মতবাদের আঘাতে যদি তাহার প্রাণশক্তিরূপ বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার গতি বন্ধ হইবে এবং

ফলে মৃত্যু ঘটিবে। দেশব্যাপী পাশ্চাত্য মতবাদ-প্লাবনের এই সন্ধিক্ষণে এবিষয় আমাদের দেশবাসীর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ধর্ম বলিতে এখানে সার্বজনীন ধর্মই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের মতে যাহা মানুষের পশুপ্রবৃত্তি বা আসুরিক ভাবকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া দেবভাবের বিকাশ সাধন করে, যাহা জীবত্বকে নষ্ট করিয়া মানুষকে শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে, যাহা মানুষের নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ পরিব্যক্ত করিতে সাহায্য করে, যাহা মানুষের জীবনে সত্য শিব সুন্দরকে রূপায়িত করে, যাহা মানুষকে একত্ব অভেদত্ব সাম্য ও সমদর্শনে অধিষ্ঠিত করে, তাহাই ধর্ম এবং এই ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য।

গভীর পরিতাপের বিষয় যে, ইদানীং এক শ্রেণীর অদূরদর্শী সংস্কারকগণ ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক উন্নতির পরিপন্থী জ্ঞানে এই বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধেই অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন। এই পাশ্চাত্য-ভাবান্ধ ব্যক্তিগণ প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু উহারই নিন্দা এবং পাশ্চাত্য দেশের যাহা কিছু উহারই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। প্রতীচ্য জাতিসমূহের কল্পনাতীত ভোগবিলাস ও তীব্র ইন্দ্রিয়সুখের বিরাট উপকরণ-দর্শনে ইঁহারা মুগ্ধান্তকরণে বলিতেছেন—পাশ্চাত্য জাতি ধর্মের মোহ—পরকালের মৃগতৃষ্ণিকা ত্যাগ করিয়াই জড়জগতে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সুতরাং কল্পিত ধর্মের মোহ একেবারে বর্জন করাই ভাল। এই অভিমতের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ "বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।"[২]

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বর্তমান পরিস্থিতির সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সকলেই স্বামীজীর এই সতর্কবাণীর মর্ম মনেপ্রাণে বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যক্ষ দেখাও যাইতেছে যে, ভোগ-বিলাসের উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিয়াও পাশ্চাত্য জাতির শান্তি নাই—সুখ নাই। জগতের দুর্বল জাতিসকলের যাবতীয় সম্পদ আপনাদের ভোগে নিবেদন করিয়াও তাহারা অতৃপ্ত। ইদানীং ভোগের প্রতিযোগিতার ফলে তাহারা জগতের মহা আতঙ্করূপে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত! বর্তমান যুদ্ধে না হইলেও ভবিষ্যতে এইরূপ যুদ্ধে যে তাহাদের ভোগসর্বস্ব জাতীয় জড়বাদের জতুগৃহ ভস্মে পরিণত হইবে তাহাতে আর সন্দেহের লেশমাত্র নাই! স্যার অলিভার লজ প্রতীচ্য জাতিনিচয়ের এই ভোগের দ্বন্দ্বকে "ভোজনাগারে সমবেত বর্বরদের বিবাদ" (the wrangling of savages round a table) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন! পাশ্চাত্য জাতিসমূহের এই চিত্র স্বচক্ষে দর্শন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ৪৩ বৎসর পূর্বে যে-মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহা বর্তমানে আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "ইউরোপের রাজনীতিক শাসন-সংসৃষ্ট সর্বপ্রকার প্রণালী এক এক করিয়া অনুপযোগী বলিয়া নিন্দিত হইতেছে আর এক্ষণে ইউরোপ অশান্তি-সাগরে ভাসিতেছে—কী করিবে, কোথায় যাইবে বুঝিতে পারিতেছে না। ঐশ্বর্য-সম্পদের অত্যাচার অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের সব ধন—সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক কয়েকজন ব্যক্তির হস্তে—তাঁহারা নিজেরা কোন কার্য করেন না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারী

দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখেন। এই ক্ষমতাবলে তাঁহারা সমগ্র জগৎ রক্তস্রোতে প্লাবিত করিতে পারেন। ধর্ম ও আর যাহা কিছু, সবই তাঁহাদের পদতলে। তাঁহারাই সর্বেসর্বা শাসনকর্তা হইয়াছেন। তোমরা যে প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পার্লিয়ামেন্ট মহাসভা প্রভৃতির কথা শুন—সেগুলি বাজে কথামাত্র। পাশ্চাত্য প্রদেশ শাইলকগণের অত্যাচারে জর্জরীভূত, প্রাচ্যদেশ আবার পুরোহিতগণের অত্যাচারে কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে। উভয়কেই পরস্পরকে শাসনে রাখিতে হইবে। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী পঞ্চাশবর্ষের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে।"[৩] ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতি দেখিয়া বিশ্বের বিশেষজ্ঞগণ সমস্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ভোগের উপকরণ লইয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে যে-প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে, তাহার ফলেই তাহাদের ভোগৈকলক্ষ্য সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে। বার্ট্র্যান্ড রাসেল, রোমাঁ রোলাঁ, ইয়ং হাজব্যান্ড, এইচ. জি ওয়েলস প্রমুখ মনীষীগণের অভিমতের ভিতর দিয়া এ-কথার সত্যতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। চক্ষের সম্মুখে প্রতীচ্য জাতিসমূহের এই অবস্থা দেখিয়াও যাঁহারা তাহাদের ধর্মনীতি ত্যাগ ও সংযম বিবর্জিত জড়বাদের অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণকেই ভারতের জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা জানেন না যে, অমৃতভ্রমে কিরূপ সাঙ্ঘাতিক হলাহল তাঁহারা দেশবাসীকে পান করিতে বলিতেছেন!

পৃথিবীর চিন্তাশীল মনীষীগণ বলেন যে, ভোগকে ধর্মজ্ঞানে মহদুদ্দেশ্যে পরিচালিত করিতে অসমর্থ হইয়াই পাশ্চাত্যজাতি ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায়—অতীতকালে এইরূপে কয়েকটি জাতি ইন্দ্রিয়ভোগকে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া কিছুকাল জগৎ-রঙ্গমঞ্চে মহাশক্তির অভিনয় দেখাইয়া চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহাদের অস্তিত্ব আজ যাদুঘরে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞদের গবেষণার বিষয়! পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ ধর্ম, ত্যাগ ও সংযমকে তাহার জাতীয় জীবনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া আজও বাঁচিয়া আছে। বর্তমানেও তাহার মৃত্যুর কোন লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া দূরের কথা, বরং সর্বাঙ্গে নবজীবনের মঞ্জরী পরিস্ফুট। মানবজাতির উত্থান-পতনের কারণ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, যাহারা ধর্ম, ত্যাগ, সংযম ও সহিষ্ণুতাকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকে, তাহারা আখেরে লাভবান হয়। আর যাহারা অধর্ম, ভোগ, বিলাস ও অসংযমের দিকে ধাবমান হয় তাহারা কিছুকালের জন্য তেজস্বী ও শক্তিমান বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পরিণামে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবাসী যে অনেক প্রলয়ঙ্কর বাহ্য ও আভ্যন্তর বিপ্লবের মধ্যেও আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে ইহার কারণ এইখানে। সত্য বটে, ধর্মজ্ঞানহীন ভোগবিলাসান্ধ পরস্বাপহারী সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহ এইজন্য ভারতের বক্ষের উপর দিয়া বারংবার রক্তের নদী প্রবাহিত করিবার সুযোগ পাইয়াছে, কিন্তু ইহাতে ভারতবাসী উৎসন্ন হয় নাই। সহস্র বিপদের মধ্যেও ভারত প্রহ্লাদের মতো তাহার ধর্মরূপ বিশেষত্বকে প্রাণপণে ধরিয়া অক্ষত দেহে আজও বিদ্যমান। ভারতের বৈশিষ্ট্য তাহার ভোগকে ত্যাগের

মহিমময় আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ঈশোপনিষদ্ বলেন ঃ "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্"—ত্যাগবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ভোগ কর, কাহারও ধনে আশা করিও না। এইরূপ উপদেশমূলে ভারতের ভোগ ত্যাগ-প্রণোদিত ছিল বলিয়াই অসাধারণ ক্ষমতাসত্ত্বেও হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্রাটগণ ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোন জাতিকে রাষ্ট্রনীতিক বা অর্থনীতিক পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ করেন নাই, কোন দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য বেশভূষা ভাষা প্রভৃতিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া উহাকে উৎসন্নের পথে পাঠান নাই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ যখন ঐশ্বর্যের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন সে পৃথিবীর অনেক অনুন্নত জাতিকে ধর্ম দর্শন শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ অকাতরে দান করিয়াছে, কিন্তু বিনিময়ে কোন প্রতিদান চায় নাই। শুধু ইহাই নয়, ভারত তাহার ধর্ম-সংস্কৃতিরূপ বিশেষত্ব সহায়ে অনেক বিজেতা জাতিকে অভিনব আকারে রূপায়িত করিয়াছে। গ্রীকগণ ভারতবিজয় করিতে আসিয়া হিন্দুধর্ম ও দর্শন দ্বারা যে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিল ইহা ঐতিহাসিক সত্য। পরবর্তী কালে এই হিন্দু প্রভাবান্বিত গ্রীকদর্শনই অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতিসমূহের দার্শনিক চিন্তারাশিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সত্যসন্ধ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সেমেটিক ধর্মমত কয়টি ভারতের ধর্মেরই অস্ফুট প্রতিধ্বনি। জগৎকে ধর্মদানই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। ভারতে ইসলামধর্ম হিন্দুর সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব দ্বারা যে অনেকটা প্রভাবান্বিত, এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আরব পারস্য তুরস্ক প্রভৃতি দেশে প্রচলিত ইসলাম ধর্মের তুলনায় ভারতে প্রচলিত ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আশ্চর্যের বিষয় যে, বর্তমানে পরাধীনতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত থাকিয়াও ভারতবর্ষ তাহার দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পাশ্চাত্য দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনোরাজ্যে ক্রমেই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় বেদান্তধর্ম প্রচারে স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ সাফল্য এবং অধুনা রামকৃষ্ণ মিশনের ক্রমবর্ধমান প্রসার এবিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই আলোচনায় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ধর্মকে জাতীয় জীবনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষ আজ পর্যন্ত কেবল বাঁচিয়া আছে তাহা নহে, অধিকন্তু জগতে মানবজাতির সমক্ষে ত্যাগ সংযম সত্য সাম্য সমদর্শন ও শান্তির মহান আদর্শ ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ আবহমান কাল হইতে আধ্যাত্মিকতার পতাকা ধারণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বিশ্ববাসীকে বলিতেছে—এই পতাকার নিম্নে সমবেত হও; ধর্মের পথ, ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। ইউরোপ জড়জগতের সকল বিষয়ে অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াও ধর্মের অভাবেই যে তাহার শক্তিমান ব্যক্তিগণের শক্তি, বিদ্বানগণের বিদ্যা, ধনবানগণের ধন, শিল্পিগণের শিল্প 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' নিয়ন্ত্রিত করিতে অসমর্থ হইয়া ধ্বংসের দিকে চলিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাতে কি প্রমাণিত হইতেছে না যে, ভারতবর্ষ ধর্মকে তাহার জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া ভুল করে নাই? সুতরাং ধর্মকে সর্বপ্রযত্নে

আমাদের রক্ষা করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ "এইটি বিশেষ স্মরণ রাখিবে, যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদসর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িলে হিন্দুর জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া গেল—যে-ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া গেল; সুতরাং ফল দাঁড়াইবে—সম্পূর্ণ ধ্বংস।"[৪]

উপসংহারে ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য তাহার জাতীয় জীবনের বিশেষত্বরূপ ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পাশ্চাত্য দেশাগত রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতিক ও শিক্ষানীতিক মতবাদ গ্রহণের অপরিহার্য আবশ্যকতা আছে। কারণ, বর্তমান যুগে এই সকল বিষয়কে অবহেলা করিয়া কোন দেশের উন্নতিসাধন সম্ভবপর নহে। পরন্তু ভারতের বিশেষত্ব ধর্মের সংরক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও সম্প্রসারণের জন্যও ইহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহা সত্য যে, পাশ্চাত্য জাতি যেমন মরিতে বসিয়াছে ভোগের আতিশয্যে, ভারতবাসী তেমন মৃত্যুমুখে চলিয়াছে ভোগের ঐকান্তিক অভাবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ "ভারতে রজোগুণের প্রকাণ্ড অভাব, পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরের তমোগুণকে পরাহত করিয়া পাশ্চাত্য রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণেরও বিঘ্ন উপস্থিত হইবে ইহাও নিশ্চিত।"[৫] ব্যক্তির ন্যায় জাতিরও জীবনধারণের জন্য সর্বাগ্রে চাই অন্নবস্ত্রের সংস্থান। কারণ, যে-জাতি উদরান্ন সংস্থানে অপারক, সে জাতির মন উদরের চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া ধর্ম নীতি সাহিত্য শিল্প ললিতকলা দেশসেবা প্রভৃতি বিষয়ক উচ্চচিন্তা ও উচ্চকর্মে নিয়োজিত হইতে পারে না। কেবল উদরান্নের জন্য অগণন জনসঙ্ঘের হাহাকারে যে-দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত, যে-দেশে দারিদ্র্য নগ্নমূর্তি ধারণ করিয়া সমগ্র জাতিকে জগতের ঘৃণার পাত্র করিয়া রাখিয়াছে, অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে যে-দেশের অসংখ্য লোক জানোয়ারের মতো জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, যে-দেশের সমাজে অনৈক্য অশিক্ষা অস্পৃশ্যতা সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কারের রাজত্ব; সে দেশে কি আর ধর্মনীতি বা সত্ত্বগুণ থাকিতে পারে? এই দুরবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে আমাদিগকে পাশ্চাত্য জাতির গুণগুলি আয়ত্ত করিয়া তাহাদের ন্যায় সমগ্র দেশবাসীকে ঐহিক জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করিয়া তুলিতে হইবে। প্রতীচ্য জাতির উদ্যম, কার্যকুশলতা, একতাবন্ধন, আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি, উন্নতির তৃষ্ণা, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণ আমাদিগকে অর্জন করিতে হইবে। তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া যে-উপায়ে জড়জগতে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, আমাদিগকেও উহার অনুসরণ করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্মরূপ বিশেষত্বকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। পাশ্চাত্যের গুণগুলি যেমন লইতে হইবে, আমাদের বহুকালার্জিত সম্পদকেও তেমন রক্ষা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে আমাদের উন্নতি-পথের বিঘ্নস্বরূপ দোষগুলি যেমন নির্মমভাবে পরিহার করিতে হইবে,

পাশ্চাত্যের দোষগুলিও তেমন বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। একদিকে কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন সমাজ, অপর দিকে পাশ্চাত্যের নিছক জড়বাদ, এই দুই পথের মাঝামাঝি আমাদিগকে চলিতে হইবে। ভারতে পাশ্চাত্য মতবাদ-প্লাবনের ফলে অমৃত আসিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার নামে গরলও আসিতেছে। দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে অমৃত গ্রহণ করিতেছেন এবং কেহ কেহ অমৃত জ্ঞানে গরলও গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের মতে, পাশ্চাত্য দেশাগত মতবাদের আশ্রয়ে ভারতে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হউক, চূড়ান্ত সাম্যের নির্দেশে অর্থনীতি পরিচালিত হইতে থাকুক, সর্ববিধ ভোগাধিকার-তারতম্যহীন সমাজ গড়িয়া উঠুক, ইহাতে আমাদের উন্নতি ভিন্ন অবনতির কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের ধর্মরূপ বিশেষত্ব যাহাতে অব্যাহত থাকে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে এই সকল বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ "এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার, তাহা শিক্ষা কর; কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দু জীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে। তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব মহিমমণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। আমার দৃঢ় ধারণা—শীঘ্রই সে শুভদিন আসিতেছে। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে। আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। উঠ, তাঁহাকে জাগাও—আর নূতন জাগরণের নব প্রাণে পূর্বাপেক্ষা মহাগৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহার রত্নসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা কর।"৬* □

পাদটীকা

১ ভাববার কথা
২ বর্তমান ভারত
৩ ভারতে বিবেকানন্দ
৪ ঐ
৫ ভাববার কথা
৬ ভারতে বিবেকানন্দ

*৪১ বর্ষ, ১১ সংখ্যা

মানুষ তুমি কে?

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

তোমার সহিত লুকোচুরি খেলায় হারিয়া গিয়াছি। পর্বতে-প্রান্তরে, অরণ্যে-জনপদে তোমার সঙ্গে দৌড়াইয়াছি—সম্পদে-বিপদে, আনন্দে-বেদনায় তোমার সহিত হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি—সভ্যতায়-বর্বরতায়, ঐশ্বর্যে-রিক্ততায়, কর্মে আবার উদাসীনতায় তোমার কাছে-কাছে ফিরিয়াছি—কিন্তু কিছুতেই তোমাকে ধরিতে পারিলাম না, মানুষ। কী রহস্যময় তুমি!

অন্যান্য জীব হইতে বিশিষ্ট অবয়বসন্নিবেশ এবং মস্তিষ্কের তারতম্য লইয়া প্রাণিসঙ্ঘের রঙ্গমঞ্চে যেদিন তুমি প্রথম দেখা দিয়াছিলে, সেইদিনই তো বুঝিতে বাকি ছিল না যে, অভূত-অশ্রুত-অচিন্তিতপূর্ব সম্ভাবনাসমূহকে বাস্তব করিয়া করিয়া, ভবিষ্যতের দূর দূরতর সীমান্তরেখা ধরিয়া ধরিয়া, ঋজু কুটিল বহু বিচিত্র পথে তোমার জীবনগতি অগ্রসর হইয়া চলিবে। সে চলার আজও শেষ হয় নাই। তুমি বুঝি চির-পথিক। চলাই তোমার ধর্ম, চলাতেই তোমার আনন্দ।

কতই না চলিলে—কত উঠিলে, কত পড়িলে। কত বাধা অতিক্রম করিয়া, কত তমস্বিনী রাত্রিকে আলোকিত করিয়া, কত সংগ্রামকে আয়ত্ত করিয়া তুমি তোমার বিজয়ের ইতিহাস রচনা করিয়া আসিলে। কতই না তোমার বিস্ময়কর পরিচয় পাইলাম—কিন্তু তোমার ইতি পাইলাম না, মানুষ। এখনও তুমি বিস্ময়ের বিস্ময়—অনির্দেশ্য প্রহেলিকা।

সহস্র সহস্র বৎসর পশ্চাতের সেই দূর প্রভাতটির কথা ভুলিতে পারি না। উদ্বেল প্রাণ-প্রবাহ তোমার সুদৃঢ় রক্ত-মাংসের দেহপিণ্ডে অজস্র ধারায় ছুটাছুটি করিতেছে, যেমন উহা করে তোমার পূর্বগ আরো অসংখ্য প্রাণিনিচয়ের দেহে—বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু অকস্মাৎ আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল—তোমার মুখে ফুটিয়া উঠিল হাসি—মানুষের প্রথম হাসি—প্রাণ-প্রয়োজনবিমুক্ত তাহার প্রথম আবেগসম্বিৎ। সৃষ্টির আদি হইতে যে সূর্য চন্দ্র তারকা নীহারিকা তাহাদের অপরিমিত আলোকসম্ভার প্রসব করিয়া আসিতেছে, এতদিনে উহা যেন প্রথম সার্থকতা লাভ করিল মানুষের হাসিতে। হাসি ঘোষণা করিল—চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতির্গোলকের অপেক্ষা মানুষ, তোমার দ্যুতি অনেক বেশি শক্তিমান। উহাদের আলোক অন্ধ—তোমার আলো সচেতন।

আরও আশ্চর্য সম্ভাবনা রূপ নিল। নিছক প্রাণ-প্রয়োজনে এতদিন বাহিরের চর ও অচরের, ত্যাজ্য ও গ্রাহ্যের একটা অস্পষ্ট রেখা তোমার কুয়াশাচ্ছন্ন অনুভূতির পটে আঁকিয়া যাইত—উহাকে 'চিন্তা' সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। মন যেন তোমার ঘুমাইয়াই ছিল। অকস্মাৎ এখন উহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তুমি ভাবিতে শিখিলে—হইলে 'মন'স্বী—তোমাতে জাগিল জিজ্ঞাসা, বিস্ময়। চাহিলে ঊর্ধ্বে অগণিত গ্রহতারা খচিত গগনমণ্ডলে—দেখিলে তথায় পৌর্ণমাসী—অমাবস্যার আবর্তন—তাকাইলে প্রভাতসূর্যের পানে, অস্তগামী দিবারশ্মির শেষ রক্তিমছটার দিকে—লক্ষ করিলে মেঘের বর্ষণ, বিদ্যুতের চমৎকার, ধরিত্রীবক্ষে তৃণলতা বনস্পতি পুষ্প ফলের সমারোহ। খুঁজিতে লাগিলে প্রকৃতির এই বিবিধ ঘটনা ও বস্তুপরম্পরার পারস্পরিক সম্বন্ধ, অর্থ। জিজ্ঞাসা বাড়িয়া চলিল, মনন

প্রখরতর হইতে লাগিল, সত্য আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। সেদিনকার সেই প্রথম বিস্ময় ক্রমে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দূর দূরান্তরে, ক্ষুদ্র ও বৃহতে, প্রত্যেক স্তরে, প্রত্যেক আবেষ্টনে আঘাত করিতে লাগিল। রহস্যের পর রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া চলিলে। কত না জ্ঞান, কত না পরিচিতি, কত না বিজ্ঞান, কৃতিত্ব সঞ্চয় করিলে মানুষ, যুগ যুগান্তর ধরিয়া।

তোমার হাসি, তোমার বিস্ময় তোমার কাছে উন্মুক্ত করিয়াছিল দুটি রত্নভাণ্ডার, যাহাদের অধিকারে মানুষ, তুমি মনুষ্যত্বের স্বতন্ত্র আলোকে উত্তরোত্তর দীপ্তিমান হইতে পারিয়াছিলে। হাসি ছিল অগ্রদূত তোমার আবেগ-সঞ্চয়ের—তোমার প্রীতির, তোমার সৌন্দর্য-বোধের, তোমার আনন্দের, মাধুর্যের। বিস্ময় টানিয়া আনিয়াছিল তোমার মনের ঐশ্বর্যনিচয়—তোমার বিবিধ বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিল্প। তুমি যে প্রেমিক, রসবেত্তা—তুমি যে আবিষ্কারক, স্রষ্টা—নিজের এই পরিচয়ের বলেই বিশ্বপ্রকৃতির বিশালতার মধ্যে তুমি হইতে পারিয়াছিলে নির্ভীক—তোমার সাড়ে-তিন-হাত-পরিমিত মর্ত্য দেহের নগণ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া দেহাতীত কোন অদৃশ্য মহিমার রাজসিংহাসনে বসিতে তুমি কুণ্ঠিত হও নাই। কিন্তু সংসারের বিচিত্র নিয়মে আলোকের পশ্চাতে আসিল ছায়া—তোমার গতিবেগকে পিছন হইতে কিসে যেন টানিয়া মন্থর করিয়া দিল—বিকাশমান মানব-মহিমা উঠিতে উঠিতে পড়িয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল। বোধ করি তোমারই ভুলে, মানুষ। তুমি তোমার নিজের পরিচয়কে উপেক্ষা করিয়া বাহিরের পরিচয়ে দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ করিয়াছিলে।

অনাদিকালের আশ্চর্য সৃষ্টিপ্রবাহ যে অন্তহীন রেখাটি ধরিয়া তাহার বহু-লীলায়িত ভঙ্গিমা অনবরত প্রকাশ করিয়া যায়, সেই রেখারই সমান্তরালে আরেকটি রেখাও যে সীমাশূন্য কাল হইতে অশেষ বিশ্ব-প্রকাশের অভিমুখে সর্বদাই প্রসারিত রহিয়াছে, তাহা তুমি লক্ষ্য কর নাই। প্রথম রেখা হইতে তাহা হয়তো সূক্ষ্মতর, অস্ফুটতর—কিন্তু উহা এত অস্পষ্ট নয় যে, দৃষ্টিপথ এড়াইয়া যাইবে। ঐ রেখাটি মাড়াইয়া মাড়াইয়া যে-ছন্দ চলিতেছে তাহা তো কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়—উহাই যে রাখিতেছে সৃষ্টি-নৃত্যের তাল। ঐ ছন্দ, মানুষ, তোমার নিজের ছন্দ। তুমি প্রথম রেখার নর্তনবিলাস দেখিয়া ভুলিয়া গেলে। তোমার আপন পদ-স্থিতি—দ্বিতীয় রেখার ছন্দের দিকে মনোযোগ দিলে না। তাকাইলে নিজের বহির্দেশে—নিজেকে দেখিলে না। এই ভুলই হইল তোমার বৃহত্তম সঙ্কট।

ক্ষণে ক্ষণে সংশয় তোমার দৃষ্টিকে করিয়াছিল তমসাচ্ছন্ন—মোহ তোমার প্রেমকে করিয়াছিল আবিল—ভয়ে তোমার শক্তি হইয়াছিল খর্ব—জড়তা, অবসাদ আসিয়া তোমার ভিতরকার স্রষ্টাকে, আনন্দচারীকে করিয়াছিল অচেতন। নিজেকে হারাইয়া তুমি আপন দীনতায় ম্রিয়মাণ হইয়াছিলে।

আলোকের পশ্চাতে কেন ছায়া? জ্ঞানের সংলগ্ন হইয়া কেন না-জানার কুটিল ভ্রূকুঞ্চন? ভালবাসার পাশাপাশি কেন ঘৃণা, মহত্ত্বের অব্যবহিত সাহচর্যে নিন্দিত স্বার্থমত্ততা? ধীরে ধীরে এইরূপ কত না প্রশ্ন তোমার মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধিকে আকুল করিতে লাগিল। কিন্তু যে আদিম ভ্রান্তিতে তোমার সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, সেই ভ্রান্তিই দ্বিগুণিত হইয়া মীমাংসা তো দূরের কথা, সমস্যাকেই জটিলতর করিয়া তুলিল। তুমি সমাধান খুঁজিতে গেলে প্রথম রেখায়—সৃষ্টিবিলাসে; দ্বিতীয় রেখায়—তোমার আপনার ভিতরে দৃক্‌পাত করিলে না।

সৃষ্টির সহিত স্রষ্টাকে, দৃষ্টির সহিত দ্রষ্টাকে, মননের সহিত মন্তাকে একসঙ্গে বরণ না করিলে সঙ্গীতের তাল কাটিয়া যায়—গান যায় জড়াইয়া। তুমি সৃষ্টিকে বরণ করিলে—স্রষ্টার কথা ভাব নাই; অখিল দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে—কে পিছনে দাঁড়াইয়া দেখে তাহা বিচার কর নাই; মনের নির্মুক্ত গতিবেগে ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে—কে মনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাকাইয়া দেখ নাই। তাই তো দুটি রেখার নৃত্যছন্দ গুলাইয়া গেল—আলোকে আঁধারে মিশিয়া গোলযোগ সৃষ্টি করিল—সত্যমিথ্যার যুগপৎ প্রভাবে বিবেক তমসাচ্ছন্ন হইল। তুমি হইয়া পড়িলে কতকগুলি দ্বন্দ্ব ও পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব ও আচরণের পুঁটুলি। তোমাকে কি বলিয়া যে ডাকিব তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠিল। প্রেমিক বলিয়া ডাকিতে না ডাকিতেই দেখিলাম তুমি অতি নির্দয় হিংসক, তোমায় সত্যান্বেষী মনে করিবার পরক্ষণেই বুঝিলাম মিথ্যায় তুমি সহজে মাতিয়া উঠ—তুমি স্রষ্টা এই ধারণা দৃঢ় হইতে না হইতেই দেখিলাম ধ্বংস-প্রবৃত্তি তোমার প্রকৃতিকে সর্পের ক্রূরদৃষ্টি হানিতেছে। হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাস তোমায় যে-উত্তুঙ্গ শিখরে লইয়া আসিয়াছে, মুহূর্তে তুমি সেখান হইতে পড়িয়া যাও; যুগপৎ তুমি দীপ্তি ও তমিস্রা, উত্থান ও পতন, পরিপূর্ণ ও রিক্ত। হতাশায়, বেদনায় ফুকরাইয়া উঠিলাম—মানুষ তুমি কে?

এই অন্ধকার, এই জটিলতা, এই দ্বন্দ্বাবস্থা যদি কাটাইয়া উঠিতে হয় তাহা হইলে কর্তব্য শুধু এক—বিশ্বপ্রকাশে তোমার নিজের স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করা—তোমার আপন পরিচয়কে আবিষ্কার করা—উহাকে সর্বতোভাবে স্বীকার করা। উহা তো তুমি শুরু করিয়াছিলেই—নিজেকে রসবেত্তা, 'মন'-স্বী বলিয়া জানিয়াছিলেই—কিন্তু নিজের পরিচয়-লাভ সম্পূর্ণ করিলে না। নিজেকে স্বল্পমাত্র আবিষ্কার করিবার ফলে যে-শক্তির উন্মেষ হইল, সেই শক্তি দ্বারা বাহিরের বিশ্বের বিজয় হইতে বিজয়ান্তরে বিচরণ করিয়া তোমার বুদ্ধির বিভ্রম ঘটিল। শক্তির বহিঃপ্রকাশই তোমার সারা মনোযোগ টানিয়া রাখিল—উহার উৎসের দিকে লক্ষ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলে না। কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মতো উদ্দেশ্যহীন পরিভ্রমণে দিবারাত্র শ্রান্ত, বিড়ম্বিত হইতে লাগিলে।

ফিরিয়া চল, মানুষ। আত্মবিস্মৃতির গহন কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া তোমার জ্যোতিষ্মান মুখ বাহির হইয়া আসুক। তোমার প্রথম হাসি, প্রথম বিস্ময় হইতে যে-মানবতার অরুণোদয় হইয়াছিল, উহাকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করিয়া চল। তুমি প্রেমিক, তুমি শিল্পী, তুমি আবিষ্কারক, তুমি স্রষ্টা। পরপর কত না পরিচয় তোমার, কত না সার্থকতা তোমার। চল চল আরও চল। আবরণের পর আবরণ মুক্ত করিয়া চল। তোমার অন্তরতম, সত্যতম পরিচয় যতদিন না লাভ করিতেছ ততদিন বিশ্রাম খুঁজিও না।

সেই অন্তিম পরিচয়ে তুমি জন্ম-বিনাশ-অপচয়-আবিলতা-মুক্ত চিরভাস্বর চেতনসত্তা। নিখিল সৃষ্টির যত স্পন্দন, যত উৎস্ফূর্তি, তোমারই সেই সনাতন সত্যে বিধৃত হইয়া আছে, নিত্য উৎসারিত হইতেছে। এই বিশ্বের যত না জ্ঞান, যত না অন্বেষণ, যত না আনন্দ তোমারই সেই আপন প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া। সেই কেন্দ্রে যদি তুমি দাঁড়াইতে পার, তোমার চরিত্রের সকল দ্বন্দ্ব, সকল বিরুদ্ধতার অবসান হইবে। তখনই তুমি উপলব্ধি করিবে, মানুষ, তুমি কে।* □

---

*৫৪ বর্ষ, ৬ সংখ্যা

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা

স্বামী নিরাময়ানন্দ

আধুনিক রাষ্ট্রনীতির অভিধানে 'ধর্ম' কথাটির অর্থ সাম্প্রদায়িকতা (Communalism)। এই প্রকার মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া জনৈক মনীষী বলিয়াছেন, ঐ অভিধানে 'সাহিত্যে'র অর্থ সাংবাদিকতা (Journalism), 'বিজ্ঞানে'র অর্থ যান্ত্রিকতা (Technology), 'কৃষ্টি'র অর্থ নৃত্যনাটক (Dance-drama)।

সত্য সত্যই চোখে পড়িল ঃ একটি প্রসিদ্ধ প্রকাশক-প্রণীত 'সাধারণ জ্ঞান'-এর পুস্তকে 'Facts about India' (ভারতবিষয়ক তথ্য)-অধ্যায়ে Indian Culture (ভারতকৃষ্টি) শীর্ষকে প্রথমেই লিখিত--ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত, তারপর যন্ত্রসঙ্গীত; অতঃপর ভারতীয় নৃত্যকলা ঃ ভারতনাট্যম্, কথাকলি, কত্থক ও মণিপুরী! ভারতীয় কৃষ্টি শেষ!!

কৃষ্টি যেখানে নৃত্যগীতে পর্যবসিত সেখানে যে বিজ্ঞান বলিতে যন্ত্রপাতি, সাহিত্য বলিতে সংবাদপত্র বুঝাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আর সেখানে 'ধর্ম কি বা কেন?'—এত বুঝিবার সময় বা সামর্থ্য কোথায়? সেখানে ধর্মসম্মেলনের আলোচ্য বিষয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশ্বশান্তি, নিরামিযাহার, সমাজনীতি বা জাতিভেদ দূরীকরণের প্রস্তাব।

অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, মানুষ রাষ্ট্রনীতিক প্রাণী! যুক্তি তাহার পথ-নির্ণায়ক। যুক্তির বাহিরে কিছু অনুসরণ করিলে তাহার অবনতি হইবে। যুক্তিবিরোধী সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি যাহা মানুষের মনকে চালিত করে তাহা ধর্ম-বিশ্বাস!

রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা ধর্মনীতিই আজ পর্যন্ত মানুষকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছে। মধ্যযুগীয় ইউরোপে ধর্মগুরু শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষাতেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান! যুক্তিবাদীরা ইহা মানিতে পারে নাই বলিয়াই নবজাগরণের আন্দোলন (Renaissance), নূতন আধুনিক সমাজবোধের সূত্রপাত। তখন ধর্ম ছিল রাজনীতির অভিভাবক, এখন যুক্তি ও বিজ্ঞানপুষ্ট রাজনীতি সাবালক হইয়া ধর্মকে রাষ্ট্র হইতে নির্বাসনে পাঠাইতে প্রয়াসী!

যে-কোন কারণেই হউক, ধর্মকে যাঁহারা মানবজীবনে অনাবশ্যক বলিয়া, উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদেরও চিন্তার একটা ধারা আছে, হইতে পারে তাহা ভুল। তাঁহাদেরও যুক্তির একটা শৃঙ্খলা আছে, হইতে পারে তাহা দুর্বল। তাঁহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব ইহা গতিশীল মানুষের পায়ে নিগড়স্বরূপ, ইহা মানুষকে রক্ষণশীল করে, সর্বদা পিছনে তাকাইতে বলে। বর্তমান যুগ যুক্তির যুগ, মানব-মনের মুক্তির যুগ! প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল পশুপালক কৃষিজীবী কুটিরশিল্পী মানব

একদিন সূর্যকে মেঘকে বায়ুকে দেবতা মনে করিয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের সে শৈশবত্ব ঘুচাইয়াছে, অতএব ঐ প্রকার আদিম বিশ্বাস এখন নিষ্প্রয়োজন। রাসেলের কথা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারা বলেন ঃ "শিল্প-শ্রমিকদের কল্যাণ—প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষের চেষ্টার উপরই বেশি নির্ভর করে, আদিম-প্রথানুসারী অন্যান্য ব্যক্তিদের কথা স্বতন্ত্র।"

আধুনিক রাষ্ট্র শুধু বহু ধর্মে বিশ্বাসী মানবের বাসভূমিমাত্র নয়, বহু জাতি সমুদ্ভূত ব্যক্তিরও সমাহার। অতএব এরূপ রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রের সংহতি ও কল্যাণের জন্য ধর্ম সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়। ধর্মসম্বন্ধে কথা তুলিলেই তাহা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে পরিণত হইবে। কোন ধর্মমতকেই অভ্রান্ত বা পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অতএব রাষ্ট্রের কর্তব্য মানুষের নৈতিক জীবনের উন্নতির চেষ্টা করা; ব্যক্তিচরিত্রের উন্নতি দ্বারাই সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত মন প্রাচীন দেবতা-বাদে (Theology) বিশ্বাস করিয়া জীবন গঠন করিতে চায় না, সে চায় সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও সহযোগিতা। কর্মের স্বাধীনতা ও সুযোগের সমানতার উপর ভিত্তি করিয়া সে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিতে চায়; বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় অর্থনীতি-চেতন মানুষের সমস্যা-সমাধানে ধর্ম বিফল হইতে বাধ্য। অতএব দেশের জননায়কদের কর্তব্য—সাধু-সন্তের ও ধর্ম-দর্শনের অলস আলোচনায় সময় নষ্ট না করিয়া পূর্বোক্ত নীতি ও চরিত্র-গঠনের উপযোগী সাম্য ও স্বাধীনতা-মূলক সমাজব্যবস্থা-রচনায় মনোনিবেশ করা।

উপরি উক্ত চিন্তাধারার সহিত অল্পবিস্তর আমরা সকলেই পরিচিত, যুক্তিবাদী মনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই আমরা ইহা নিঃশব্দে মানিয়া লইতে পারি না; সন্দেহ উত্থাপন করিব, কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরও আশা করিব।

প্রথম প্রশ্ন ঃ মানুষ রাষ্ট্রনীতিক বা আর্থনীতিক প্রাণী—তাহার প্রমাণ কি? যখন রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি ছিল না তখনও তো মানুষ ছিল, আদিম মানবও মানব। সে ক্রমবিকশিত অ্যামিবা, না দেবতাসম্ভব—এ-কথার কি শেষ নিষ্পত্তি হইয়াছে?

দ্বিতীয় ঃ 'যুক্তির বাহিরে' হইলেই যে 'যুক্তির বিরোধী' হইবে—ইহা কি অনুভবসিদ্ধ? এমন তো কত সিদ্ধান্তে আমরা সহসা উপনীত হই, পরে যাহা যুক্তি দিয়া বুঝি।

তৃতীয় ঃ মধ্যযুগীয় ইউরোপের ধর্ম এবং যুগে যুগে আচরিত ভারত চীন বা আরবের ধর্ম কি একই প্রকৃতির? একথা কি সত্য নয় যে, ইউরোপ এশিয়া হইতে ধর্ম লইয়াছে এবং এশিয়া ইউরোপ হইতে রাজনীতি ও বিজ্ঞান শিখিতেছে? একে অপরের জিনিসটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই বলিয়াই পরবর্তী কালের বিপর্যয় এবং আধুনিক কালে কৃষ্টির এই সঙ্কট। আমাদের মতে এই সঙ্কট হইতে ত্রাণের উপায়, স্বীয় ভাবের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া অপরের ভাবের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা। এই আদান-প্রদানের সাফল্যের উপরই নির্ভর করিতেছে আগামী যুগের সভ্যতা।

আমরা ভারতের অবস্থা অনুধ্যান করিয়া যদি ভারতের ভূমিতে সাফল্যের নিদর্শন দেখাইতে পারি—তবে তাহাই হইবে বর্তমান যুগের সমগ্র মানবজাতির দিগ্‌দর্শন।

বর্তমান ভারতেও যে কৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা শূন্যতা অনেকের চোখে পড়িতেছে—তাহা সত্য না হইলেও প্রতীয়মান। প্রকৃতপক্ষে ইহা নানাভাবতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় মনের স্তরচ্যুতি! আধুনিক বিবিধ পরস্পরবিরোধী মতবাদের ঘূর্ণাবর্তে প্রাচীন ধারাবাহিকতা নষ্ট হইয়াছে। বহুধা-বিভক্ত ভারতের চিন্তাধারায় আজ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সন্দেহই বেশি, প্রাচীন আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিকতা—সাধারণভাবে শ্রদ্ধার বস্তু হইলেও শিক্ষিত ব্যক্তিদের তাহাতে আস্থা নাই। তাহারাই দেশবিদেশে কৃষ্টিপ্রতিনিধিরূপে নিজ নিজ ভাব প্রচারের দ্বারা ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতেছে; তাহারা পাশ্চাত্যে ভারতের প্রতিনিধি নয়, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ভারতেই পাশ্চাত্য কৃষ্টির প্রতিধ্বনি!

বর্তমান ভারতে অনবরত যে ভাবের ও কৃষ্টির সঙ্ঘর্ষ ঘটিতেছে তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন। ইউরোপ গত চারশত বৎসরে যে-পথ অতিক্রম করিয়াছে, ভারত চল্লিশ বৎসরে তাহা অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। সামন্ততন্ত্র (feudal) ও মরমিয়াবাদের (mysticism) সহিত গণতন্ত্র ও যুক্তিবাদ একই রঙ্গমঞ্চে একই দৃশ্যে আবির্ভূত হইয়া পারস্পরিক সংলাপ দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অধিকাংশ নেতারই বক্তৃতা মাইকের মাধ্যমে জনগণের কানে প্রবেশ করিলেও প্রাণে পৌঁছায় নাই! বিভিন্ন দল ও মতের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা তাহারা বুঝে নাই, আর্থনীতিক উন্নতির প্রতিশ্রুতি তাহাদের ক্ষুধা মিটায় নাই। আধ্যাত্মিকতার হাল ধরিবার কেহ নাই, অর্থনীতির দাঁড়ও সমতালে চলিতেছে না। ভারতের সমস্যা জটিল সন্দেহ নাই, তাহা সমাধানের উপায় ভারতের জনগণের মনের ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করিয়া নহে; বহিরাগত জড়বাদ-ভিত্তিক কোন মতবাদ সহায়ে নহে—ভারতের মৃত্তিকাজাত আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিক প্রতিভা সহায়ে জনগণের উন্নয়নে যদি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আগাইয়া আসেন—তবেই জাগ্রত জনগণ বর্ধিত গতিবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

এই প্রসঙ্গে শেষ প্রশ্ন ঃ ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আদর্শ ব্যতীত কি নৈতিক বা চারিত্রিক উন্নতি সম্ভব? ধর্মকে বাদ দিয়া নৈতিক উন্নতির কথা কল্পনা করার অর্থ শকুন্তলাকে বাদ দিয়া 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নয় কি? ধর্ম বলিতে কি বুঝায়?—কতকগুলি প্রথা? কতকগুলি রীতি? কতকগুলি কথায় বিশ্বাস? ধর্মের এ-সংজ্ঞা কে কবে দিল?

আজকাল আরেকটি নবতম মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে ঃ "খ্রীস্ট বা বুদ্ধের ধর্ম জানিবার বা মানিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের নীতি ও মানবতার জন্যই তাঁহাদের মূল্য।" এরূপ মূল্য নিরূপণ মন্দের ভাল; তবে তাঁহাদের ঐ নীতি ও মানবতাই যে ধর্মের ভিত্তি, এইটুকু বুঝিলেই মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন ধর্ম কি করিয়া আসিতেছে? বন্য বর্বর পশু-মানবকে ধর্ম সামাজিক মানবে পরিণত করিয়াছে! মানবের ক্রমবিকাশের

প্রধান শক্তি হিসাবে ধর্ম অনস্বীকার্য এক ঐতিহাসিক সত্য। কে বলিয়াছে যে, এই মহাশক্তির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে?

ধর্ম ব্যতীত মানুষের বর্তমান সমস্যার সমাধান করিবার শক্তি আর কোন কিছুরই নাই, কারণ ধর্মই মানুষের মনুষ্যত্বের, তথা সমাজের কর্তব্যবোধের ধারক ও চালক; মানুষের শরীর মন ও আত্মার—সমগ্র সত্তার স্বাস্থ্য, শক্তি ও শান্তির উৎস এবং আধার! ধর্ম জীবনের ক্রমবিকাশের বিজ্ঞান, এবং প্রকৃত জীবন যাপনের কৌশল! এই বিজ্ঞান ও কৌশলই বংশপরম্পরা বা শিষ্যপরম্পরা আচরিত হইয়া কতকগুলি রীতি ও নীতির আকার ধারণ করিয়া থাকে। পরবর্তী কালে যখন কেহ এগুলি লইয়া তর্ক বিচার করে না, তখন এগুলি প্রথায় পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ্যে উদ্ভূত এই রীতিনীতি বিভিন্ন ধর্মনামে আচরিত হয়, এবং কখনো কোন শক্তিশালী মহাপুরুষ বা সাধকের আবির্ভাব হইলে ঐ ধর্ম নূতন শক্তিলাভ করিয়া বহু মানবকে প্রভাবিত করে এবং দূর দূরান্তরে প্রচারিত হয়। ঐ সাধকের জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করিয়া যে-শক্তি সঞ্চিত হয়—তাহারই আকর্ষণে যাঁহারা আকৃষ্ট হন—তাঁহারাই পরবর্তী কালে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সেই ধর্ম প্রচার করেন—এই ভাবেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি! সম্প্রদায় বলিতেই আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি সঙ্কীর্ণতা মনে করেন, বস্তুত 'সম্প্রদায়' শব্দের অর্থ গুরুপরম্পরা আগত সদুপবিষ্ট ব্যক্তিসমূহ।

কালক্রমে সাধনবিহীন সম্প্রদায়ে ধর্মান্ধতা, মতবাদের মোহ, 'আমার ধর্মই সত্য, আর সব মিথ্যা'—এইসকল সঙ্কীর্ণতা আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজনীতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবার উদ্দেশ্যে ছলে বলে কৌশলে অপর ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করিয়া স্বীয় দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তিই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জননী, ইহা কখনোই ধর্ম নহে, ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিকৃত অবস্থা! পর্যুষিত পরমান্ন দেখিয়া পরমান্নের প্রকৃত আস্বাদ নির্ণয় করা যায় না।

সাম্প্রদায়িকতা-দোষের জন্য ধর্মকে দায়ী করা চলে না, বরং বলা চলে ধর্মের এই বিকৃতির জন্য অসাম্যমূলক সমাজ ও রাজনীতিই দায়ী। বিকৃতি সম্ভব বলিয়া ধর্মকে পরিত্যাগ করা আর পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইবে ভাবিয়া খাদ্যদ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া একই কথা।

ধর্মের উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য সম্প্রদায় প্রয়োজন, কিন্তু তাহাকে সাম্প্রদায়িকতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে ধর্মবিজ্ঞান-লব্ধ কৌশলে। বেদান্তই ধর্মের সেই বিজ্ঞান, যাহার শিক্ষায় আমরা জানিতে পারি 'এক সত্য বহুরূপে প্রতিভাত'—যাহার সহায়ে আমরা বুঝিতে পারি—বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব রহিয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়নিচয় প্রতিটি বিচিত্র—কিন্তু এক প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত! বৈচিত্র্য হইলেই যে সঙ্ঘাত অনিবার্য তাহা তো নয়—বিচিত্র সুরের সামঞ্জস্যই সঙ্গীতের সার্থকতা, বিচিত্র বর্ণের সুষমায় প্রকৃতির সৌন্দর্য, বিচিত্র মানুষের বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়ে মানব-কৃষ্টির নিত্য নব রূপায়ণ!* □

*৫৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা

আত্ম-নিবেদন

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

দেহমনের সীমার পারে আমাদের অস্তিত্বের যে মহিমান্বিত প্রকাশ রহিয়াছে তাহার প্রশান্তিতে অন্তত ক্ষণেকের জন্যও অবগাহন না করিলে, তাহাকে অবলম্বন না করিলে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন যে কি জিনিস, তাহা ধারণাই করা যায় না, নিজেকে পরিপূর্ণরূপে নিবেদিত করা তো দূরের কথা।

এই সত্যটি সুপরিস্ফুট ভগিনী নিবেদিতার জীবনে। তাঁহার আত্মনিবেদন বাহ্যত গুরুর ইচ্ছার নিকট বা ভারতমাতার চরণে হইলেও মূলত উহা বিশ্বমানবকল্যাণেচ্ছার মাধ্যমে শ্রীভগবানে বা পরমজ্ঞানেই সমর্পিত।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ নিবেদিতার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা—উহাই তাঁহার তৎকালীন অস্পষ্ট জীবনাদর্শের পথে শুভ্র আলোক-বর্ষণ করে। স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার ভারতের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প এবং আত্মীয়-স্বজন-স্বদেশ ছাড়িয়া ভারতে আগমন ও স্বামীজীর নিকট ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা-লাভ তাঁহাকে জীবনের চরমাদর্শলাভের জন্য আত্মনিবেদনের পথে ক্রমশ আগাইয়া দিতেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনো তাহা ছিল আংশিক মাত্র, সম্পূর্ণ হয় নাই। এই মহাযজ্ঞশিখায় তাঁহার আমিত্বের পূর্ণাহুতি প্রদানের সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়াছিল আরো কিছুদিন পরে, যখন তিনি স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, আলমোড়ায় বাস করিতেছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনের আদর্শ ছিল ভগবানলাভ। এই আদর্শলাভের নূতন পথ তখন প্রস্তুত করিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাবের অনুসরণে—ভগবানই সব হইয়া রহিয়াছেন জানিয়া 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা', কর্মকে পূজায় পরিণত করা ; ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, "বহু এবং এক যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি, সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা।... তাঁহার (স্বামীজীর) নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও খেত—সাধুর কুঠিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই।" ভগবানলাভের জন্য এই পথেরই নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে ; ভারতকে কর্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া, ভারতকে কায়মনোবাক্যে স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার সেবায় আত্মনিবেদন করিতে বলিয়াছিলেন, ইহাতেই গুরুর সবচেয়ে প্রিয়কার্য করা হইবে ; ভগবানলাভেরও সাধনা ইহা।

পরবর্তী কালের নিবেদিতার জীবন আত্মসমর্পণের পরিপূর্ণ বিভায় সমুজ্জ্বল দেখি আমরা—তাঁহার ভারতপ্রেম স্বদেশপ্রেম, উহার বিভা ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশসেবকদের স্বদেশপ্রেমের বিভাকেও যেন ম্লান করিয়া দিতে চায়। ভারতবাসী তাঁহার নিকট স্বদেশবাসী, অতি আপনজন ; তিনি তাহাদেরই একজন হইয়া

গিয়াছিলেন শুধু আচরণে নয়, চিন্তায়, সংস্কারে পর্যন্ত। ভারতের সেবায় তিনি জীবনপাত করিয়াছেন—ভারতের স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য, ভারতের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের জন্য। রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের নবজাগরণের জন্য তিনি নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়াছিলেন ভারতবাসিরূপে।

কিন্তু কাজটি কি এতই সহজ ছিল? তাঁহারই সমপর্যায়ের জ্ঞান, বুদ্ধি, তেজস্বিতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং হৃদয়বত্তা সম্পন্ন হইয়া কোন ভারতবাসীর পক্ষে এরূপ করা যতটা সহজ, কোন বিদেশীর পক্ষে অপর দেশের সেবার জন্য পরোপকারের মনোভাব লইয়া ইহা করা (যদি এতটা কেহ করিতে পারেনও) যতটা সহজ, একজন বিদেশিনীর পক্ষে ভারতকে কায়মনোবাক্যে স্বদেশরূপে গ্রহণ করিয়া ইহা করা তদপেক্ষা সহস্রগুণে কঠিন—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অসম্ভব। কিন্তু নিবেদিতার ক্ষেত্রে আত্মনিবেদন পরিপূর্ণ ছিল বলিয়াই ইহাও সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

এই আত্মনিবেদন কেবল বুদ্ধির সহায়তা লইয়া করা যায় না। পাশ্চাত্যে এতদিন নিবেদিতা যে-দৃষ্টিতে জীবনকে, ভালমন্দকে দেখিতে শিখিয়াছেন, তাহা একেবারে ভুলিয়া নূতন দৃষ্টিতে সবকিছু দেখিতে হইবে। জন্মগত যে-স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতিপ্রীতি, স্বসমাজপ্রীতি তাহাও ভুলিয়া যাইয়া নূতন দেশকে, নূতন জাতিকে, নূতন সমাজকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এক কথায় এতদিনকার 'জীবন'কে নির্মম হইয়া ত্যাগ করিয়া নবজন্ম লাভ হইবে এই দেহেই। কেবল বুদ্ধি একাজ করাইতে অপারগ। বুদ্ধি যতটা আগাইয়া লইতে পারে, ততদূর তো তিনি আসিয়াছেনই—গুরুর আদেশ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া সব ছাড়িয়া ভারতে আসিয়াছেন ভারতের সেবা করিতে। কিন্তু স্বামীজী যাহা চাহিয়াছিলেন, সে আত্মনিবেদনের পথে কতখানি তিনি আগাইয়াছিলেন তখন? ব্রহ্মচর্যদীক্ষাদানের পরদিবস "স্বামীজী তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'এখন তুমি কোন্ জাতিভুক্তা?' উত্তর শুনিয়া স্বামীজী বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন তিনি ইংরেজের জাতীয় পতাকাকে প্রগাঢ় ভক্তি ও পূজার চক্ষে দেখেন; দেখিলেন যে, একজন ভারতীয় রমণীর তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রতি যে-ভাব, ইহারও এই পতাকার প্রতি অনেকটা সেই ভাব।" ইহা খুবই স্বাভাবিক, ইহা দূষণীয় তো নয়ই, বরং সাধারণ অবস্থায় গুণপদবাচ্য। কিন্তু স্বামীজী যাঁহাকে 'ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের একাধারে সেবিকা, বান্ধবী ও মাতা' হইবার জন্য আনিয়াছেন তাঁহাকে মানবতার এই স্তর হইতেও বহু ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। স্বামীজী ভারতকে এত ভালবাসিতেন শুধু জন্মভূমি বলিয়া নয়, পুণ্যভূমি বলিয়া। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, সেদিক দিয়া তাঁহার কাছে ভারতও যা, ইংল্যান্ডও তাই, আমেরিকাও তাই। ভারতকে তাঁহার এত ভালবাসিবার কারণ, ভারতকে না বাঁচাইয়া রাখিলে আর কোন দেশই জগতে মানবতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না, ভারত যদি মরিয়া যায় "তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে; সমগ্র ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে; তাহার স্থলে দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে—অর্থ সে পূজার পুরোহিত, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার পূজাপদ্ধতি, আর মানবাত্মা তাহার বলি।" তাই ভারতের উন্নতির জন্য স্বামীজীর এত প্রচেষ্টা।

জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণরূপ যে স্বাভাবিক ভরকেন্দ্র, সেখান হইতে মনকে ঊর্ধ্বে উন্নীত না করিলে এরূপ পক্ষপাতিত্বহীন দৃষ্টি লইয়া জগৎকে দেখা; তাহার কল্যাণ-অকল্যাণ বিচার করা যায় না; এভাব লইয়া ভারতের সেবা করা যায় না। কিন্তু এই স্বাভাবিক ভরকেন্দ্র হইতে মনকে সরাইয়া আনা কি এতই সহজ? কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে আচার্য, আত্মীয় প্রভৃতির প্রতি মমতাবোধ—মনের আরেকটি স্বাভাবিক ভরকেন্দ্র—বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল উচ্চতর আদর্শের আলোকে অর্জুনের কর্মপথ-নির্ধারণের সময়। সেখানেও দেখা যায় যুদ্ধারম্ভের বহু পূর্ব হইতে এই যুদ্ধ লইয়া যুক্তির বহু আদানপ্রদান হইয়াছে কৃষ্ণার্জুনের মধ্যে, যাহার ফল অর্জুনকে রণক্ষেত্র পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কার্যকালে দেখা গেল এই স্বাভাবিক ভরকেন্দ্র হইতে মনকে সরাইয়া আনা সম্ভব হয় নাই। রণক্ষেত্রের বহু যুক্তি দেখানো হইল, তাহাতেও হয় নাই। ইহা বুদ্ধির কাজ নহে। ইহার জন্য সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের অনুভূতিকে উন্নীত করিতে হইয়াছিল মনবুদ্ধির সীমানার পারে—অতীন্দ্রিয় রাজ্যে; তবেই অর্জুন সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "করিষ্যে বচনং তব"। নিবেদিতার বেলাতেও দেখা যায়, একটি ভরকেন্দ্র হইতে মনকে সরাইয়া আনিবার জন্য হিমাচলের কোলে বসিয়া স্বামীজী বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফল কিছু হয় নাই। পরে, এক শুভক্ষণে নিবেদিতার মাথায় হাত রাখিয়া স্বামীজী আশীর্বাদ করিলেন। সেই স্পর্শেই নিবেদিতার অনুভূতি উন্নীত হইয়াছিল মনবুদ্ধির অতীত সত্যের রাজ্যে, আর তাহার পর হইতেই নিবেদিতার বুদ্ধি করজোড়ে বলিয়াছিল, 'করিষ্যে বচনং তব'।

এই দিন সত্যানুভূতির কোন্ স্তরে স্বামীজীর কৃপায় নিবেদিতা উন্নীত হইয়াছিলেন, সঠিকভাবে তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়, পূর্ণ আত্মনিবেদন কাহাকে বলে নিবেদিতা এই দিন নিঃসংশয়ে তাহা বুঝিয়াছিলেন। ইহার স্বল্প কয়েকদিন পরে একটি পত্রে (মিসেস হ্যামন্ডকে) তিনি লিখিয়াছেন, "এতদিন ধরিয়া যাহা মহানুভবতা বা নিঃস্বার্থপরতা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, প্রকৃত অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র শুভ্র জ্যোতির তুলনায় তাহা নিতান্তই হালকা ও শুষ্ক অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ সবই আমি উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আশ্চর্য! প্রাথমিক সত্যগুলিকে পরিষ্কাররূপে দেখিতে এত সময় লাগিল!... একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মানসিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন।"

স্বামীজী নিবেদিতাকে যথার্থ 'নিবেদিতা'য় পরিণত করিলেন এই আলমোড়ায়। কাজটি আর কিছুই নহে, নিবেদিতার ভাষায়, "একটি মনকে তাহার স্বাভাবিক ভরকেন্দ্র হইতে সরাইতে হইবে। এর চেয়ে বেশি আর কিছু করা হয় নাই, কখনো কোন ধারণা বা মত জোর করিয়া চাপান হয় নাই, শুধু একদেশিতা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র।" যেদিন স্বামীজীর স্পর্শে নিবেদিতার হৃদয় 'অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র জ্যোতির' সন্ধান পাইল, তাহার পর হইতেই একদেশিতা শূন্যে লীন হইয়াছিল—"এখন হইতে উক্ত শিষ্যা বরাবর স্বামীজীর সর্ববিধ মতামত আপাতদৃষ্টিতে হাজার অসম্ভব বা অপ্রিয় বোধ হইলেও অবাধে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন।"[১]

এই 'অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র জ্যোতি', 'অহং'-এর পূর্ণাহুতি প্রদানের পর জ্যোতি—'যে অনল জ্বলে অবন্ধন শিখা মেলি আর্যবেদিতলে'

তাহার জ্যোতি, গীতায় যাহাকে বলা হইয়াছে 'আত্মসংযম-যোগাগ্নি' তাহার দীপ্তি—চির-উদ্ভাসিত ছিল নিবেদিতার চিত্তে। আলমোড়ায় বাসকালে ধ্যানাভ্যাস সহায়ে ইহার শিখাকে উজ্জ্বলতর করিয়া অনির্বাণ রাখিয়াছিলেন তিনি চিরদিন। ইহাই নিবেদিতাকে 'লোকমাতা' করিয়াছিল, ইহাই তাঁহাকে 'মহাশ্বেতা'র পুণ্যকান্তি দিয়াছিল, ইহাই 'নিবেদিতা'র সর্ববিধ কর্মতৎপরতার, বিপুল বীর্যের, অসীম সাহসিকতা প্রকাশের পটভূমি। ইহাই ভারতীয়তার, ইহাই বিশ্বজনীনতার প্রাণ। ইহাকে বাদ দিয়া দেখিলে নিবেদিতার কোন ক্ষেত্রের কর্মপ্রচেষ্টার মূল্যায়ন যথাযথ হইবে না; এই হোমানলের দীপ্তিতেই তাঁহার কর্মপ্রেরণা প্রদীপ্ত; ভারতের শিক্ষা, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প সব কিছুকেই তিনি উদ্ভাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন ইহারই পুণ্য দীপ্তিতে। অহমিকাশূন্যতার, পরিপূর্ণ স্বার্থত্যাগের এই দীপ্তি ছাড়া ভারতীয়তার, বিশ্বজনীনতারও সর্ববিধ মূর্তিই প্রাণহীন প্রতিমামাত্র, যত নিপুণভাবেই আমরা সেগুলির কাঠামো গড়িয়া তুলি না কেন, যত গঠননিপুণতা ও বর্ণবিন্যাসদক্ষতাই দেখাই না কেন।

নিঃশেষে আত্মাহুতির এই যজ্ঞানলশিখাই; জ্ঞানালোকই নিবেদিতার চোখের সামনে উদ্ভাসিত করিয়াছিল ভারতমাতার মন্দিরদ্বার, যেখানকার পূজারিণী হইবার জন্য স্বামীজী তাঁহাকে ভারতে আনিয়াছিলেন। দেশ সেখানে গুরুর জন্মভূমিমাত্র নহে, ভগবানের মন্দির; ভারতবর্ষ সেখানে মা, বিশ্বজননী। নিবেদিতার ভাষায়, "'আমাদের বর্তমান কর্তব্য'-বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান যে, এমন একটি মন্দির গঠনে সাহায্য করিতে হইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি উপাসক উপাসনা করিতে পারে, যে-মন্দিরের পবিত্র বেদিতে শুধু 'ওঁ' এই শব্দব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে আরেকটি বিরাট মন্দিরের আভাস পাইয়া থাকেন, যে-মন্দির স্ব-স্বরূপে বিরাজিতা এই দেশমাতৃকা স্বয়ং—এবং উহাতে শুধু ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র মানবজাতির ধর্মসাধনার পথগুলি কেন্দ্রাভিমুখী হইতেছে; সেই পুণ্যপীঠের পাদমূলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই প্রতীক, যাহা কোন প্রতীকই নয়, যাহা শব্দাতীত। সকল উপাসনা, সকল ধর্মপদ্ধতি চলিয়াছে ইহারই অভিমুখে।" এই ভারতমাতার পূজাই নিবেদিতা করিয়াছেন বিবিধ কর্মপ্রচারে, ইঁহারই মন্ত্র জপ করিয়াছেন ও তাঁহার বিদ্যালয়ের বালিকাদের জপ করিতে শিখাইয়াছেন—"ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ!—মা, মা, মা!" আলমোড়ায় 'অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র জ্যোতি'তে তিনি যে 'অবাঙমনসোগোচরম্' সত্তার সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই 'শব্দাতীত' সত্তাকেই তিনি দেখিয়াছেন ভারতমাতার মধ্যে; ইহাতে আত্মনিবেদনই ভারতে নিবেদিতার জীবনেতিহাস। এখানে স্বামীজীর ভারতপ্রেম আর নিবেদিতার ভারতপ্রেম একই জাতীয় জিনিস—উহা বিশ্বপ্রেম, উহা ভগবৎপ্রেম, আপাতদৃষ্টিতে সীমিত মনে হইলেও কোন সীমারেখায় উহা আবদ্ধ নহে।

বিশ্বপ্রেম আত্মনিবেদনেরই প্রেমময় রূপ।* □

পাদটীকা

১ স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে

* ৬৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা

বিচারের তীর্থপথে প্রথম পদক্ষেপ

স্বামী ধ্যানানন্দ

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ভাববাদী (idealistic) ঐতিহ্যের জনক বলিয়া অভিহিত ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের কথা অনেকেরই সুবিদিত। 'Cogito ergo sum' (I think, therefore I am—আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি)—তাঁহার এই উক্তিটি প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তৎকালে প্রচলিত কোন ধ্যান-ধারণাই তিনি বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমরা যে-জ্ঞান আহরণ করি, তাহাকে নিরঙ্কুশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ফলে তিনি সকল বিষয়েই সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য, বাহ্য-জগতের অস্তিত্ব, নিজের শরীর, এমনকি যে-গণিতবিদ্যায় তিনি একজন ধুরন্ধর বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাহার সত্যসমূহকেও তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, তিনি যে সন্দেহ করিতেছেন—এই ব্যাপারটি তিনি কোনক্রমেই সন্দেহ করিতে পারেন না, অর্থাৎ সন্দেহের দ্বারা সন্দেহ-ক্রিয়া নিরাকৃত হইতে পারে না—তাঁহার সন্দেহ করা-টি বাস্তবসত্য। কিন্তু সন্দেহ করার অর্থই হইল চিন্তা করা। সুতরাং দেকার্ত বলিলেন ঃ আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি।

যাঁহারা বেদান্তের বিচার-রাগের সহিত পরিচিত, দেকার্তের এই উক্তিটি তাঁহাদের কানে বেসুরো বাজিবে। তাঁহারা বলিবেন, উহা—ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'putting the cart before the horse' তাহার—অর্থাৎ কার্যকারণের নিয়ম উলটানোর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বেদান্ত বলেন, আগে আমি আছি, তাহার পর আমি চিন্তা করি—বস্তুত যখন আমি চিন্তা করি না (যেমন সুষুপ্তিতে বা নির্বিকল্প সমাধিতে), তখনো আমি আছি; আমার চিন্তা করা বা না-করার উপর আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। সুতরাং দেকার্তের 'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি'—এই কথাটি বেদান্তের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আক্ষেপোক্তি দেকার্তের প্রতি প্রযোজ্য নহে। কারণ, তিনি তাঁহার উক্তির ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন যে, উহা ন্যায়শাস্ত্রের হেতু-অবয়ব-বিশিষ্ট একটি বাক্য নহে—'অতএব' শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে হেত্বর্থক প্রতীয়মান হইলেও উহা হেত্বর্থক নহে; ফলত 'আমি চিন্তা করি'—ইহার অর্থই হইল 'আমি আছি'।

দেকার্তের স্বলিখিত এই ব্যাখ্যা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, দেকার্ত মনকেই নিজ অবিনাশী সত্তারূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহাকেই আমরা বলিতে পারি—বিচারের তীর্থপথে প্রথম পদক্ষেপ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে ভগিনী নিবেদিতার কথা। 'The Master as I saw him'—গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন যে, স্বামীজীকে যখন তিনি প্রথম দর্শন

করেন, তাহার অনেক বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, শরীরত্যাগের পর মানুষের অস্তিত্ব বজায় থাকে, এইরূপ কল্পনা করার কোন বাস্তব কারণ থাকিতে পারে না; যদি মন না থাকিলে আমাদের শরীরানুভূতি না হয়, তাহা হইলে শরীর না থাকিলে মনের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া নিবেদিতার এই ধারণা পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং তিনি লোকেদের সহিত কথা বলিবার সময়ে প্রথমে নিজেকে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, তিনি যেন তাহাদের ভিতরকার মনটির সহিতই কথা বলিতেছেন। ইহাতে তিনি যে বিপুল সাড়া পাইলেন, তাহাই তাঁহাকে ক্রমশ বিচারপথে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিল; অবশেষে দ্বাদশ মাসান্তে শরীরাপেক্ষা মনকেই মুখ্য-জ্ঞান করিবার অভ্যাস তাঁহার দৃঢ় হইয়া গেল। তখন আর তিনি শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে মনের নাশ কল্পনা করিতে পারিলেন না। দেহত্যাগকালে চিন্তারাজ্যে কোন আকস্মিক মহাপরিবর্তন উপস্থিত হওয়া অসম্ভব মনে হইল।

নিবেদিতা অবশ্য বিচারের তীর্থপথে এই প্রথম পদক্ষেপ করিয়াই থামিয়া যান নাই। থামিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভবই ছিল, কারণ যোগীশ্বর স্বামীজীকে তিনি শ্রীগুরুরূপে লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত এক বৎসরের পর আর দেড় বৎসরের মধ্যেই স্বামীজীর কৃপায় যিনি আত্মার সন্ধান পাইয়া মন ও আত্মার বিবেক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য স্বামীজী নিবেদিতার মনকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য দীর্ঘকাল নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মানসিক গুরুতর যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর একদিন সন্ধ্যায় আলমোড়ায় নতজানু হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট শিষ্যার মস্তকোপরি আপন:শ্রীকর স্থাপিত করিয়া স্বামীজী প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন যে, নিবেদিতা যেন নবজীবন লাভ করেন। বাস্তবিকই সেদিন নিবেদিতা একাকিনী ধ্যান করিতে করিতে উপলব্ধি করিলেন যে, তিনি এক অনন্ত কল্যাণ-সত্তায় একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন—যে নৈর্ব্যক্তিক সত্তা সম্বন্ধে তিনি পূর্বে শত অহঙ্কারমূলক বিচারের দ্বারাও কোন অনুভূতি লাভ করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা অনেক পরে লিখিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, এমন দিন আসিবে যখন স্পর্শমাত্রেই অপরকে জ্ঞানদান করিবার যে জন্মগত ক্ষমতা তাঁহার প্রাণপ্রিয় নরেন্দ্রনাথে নিহিত আছে, তাহা বিকশিত হইয়া উঠিবে—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ আলমোড়ায় সেই সন্ধ্যাকালে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আলমোড়ায় উপরি উক্ত অনুভূতির অল্প কিছু দিন পরেই নিবেদিতা একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ "একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। শরীর এবং আত্মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।... নিজেকে এত সুখী মনে হইতেছে যে, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।"

নিবেদিতার প্রাথমিক বিচারধারার উল্লেখ করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে আমরা একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আমাদের মুখ্য আলোচ্য—শরীর ও মনের বিবেকের প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাইতেছি। মনের সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটি স্বচ্ছ

হওয়া প্রয়োজন। আমেরিকায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন ঃ "Let us realise we are all mind"—আসুন আমরা সকলে উপলব্ধি করি যে, আমরা মন। স্বামীজী তো চিরকাল আমাদের 'আমি নিত্যমুক্ত আত্মা'— এইরূপ চিন্তা করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং এই বক্তৃতায় মনের সহিত তাদাত্ম্য করিতে বলার কারণ কি? কারণটি স্বামীজী ঐ বক্তৃতার প্রারম্ভেই বলিয়াছেন ঃ যুক্তি-বিচারের দ্বারা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কী তাহা নির্ণয় করা ও স্বরূপের প্রত্যক্ষানুভূতি—এই দুয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যবধান রহিয়াছে, যেমন একটি বাড়ির নক্‌সা ও বাস্তব বাড়িটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকে। বিচারের দ্বারা সরাসরি নিজ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই কঠিন। সকলের জন্য এই পথ নয়। স্থূলদেহাসক্ত মনের পক্ষে ইহা ধারণা করা অতীব দুষ্কর।

ইহা নিশ্চিত সত্য যে, যাঁহারা মনের সহিত নিজ তাদাত্ম্য স্থাপিত করেন— 'আমি মন', এইরূপ ধারণা করেন—তাঁহারা সূক্ষ্ম জড়বাদী ভিন্ন আর কিছুই নহেন, কারণ মন জড় বস্তু। এই কারণে ইঁহারা যে এক শ্রেণীর চার্বাক, তাহাও সত্য, যদিও যাহারা স্থূলদেহের অতিরিক্ত কোন সত্তা স্বীকার করে না, তাহাদের অপেক্ষা ইঁহারা অবশ্যই উন্নত শ্রেণীর চার্বাক।

তথাপি এই ধরনের চার্বাকত্বেরও কিছু উপযোগিতা আছেই। মানুষ সোপান-আরোহণ ক্রমেই প্রাসাদশীর্ষাভিমুখে অগ্রসর হয়। 'আমার বাড়ি', 'আমার গাড়ি', 'আমার বাবা', 'আমার মা', 'আমার শরীর', 'আমার মন'— আপাতদৃষ্টিতে একজাতীয় প্রতীয়মান এই সকল কথার প্রত্যেকটিতে যে দুইটি পদ আছে, তাহাদের সামানাধিকরণ্য নাই—অর্থাৎ পদ দুইটি একই বিভক্তি-যুক্ত নয় এবং সেইহেতু তাহাদের অভেদত্ব সিদ্ধ হয় না। 'আমার বাড়ি', 'আমার গাড়ি' বলিলে কাহারো বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, আমি বাড়ি নই বা আমি গাড়ি নই—বাড়ি বা গাড়ি হইতে আমি ভিন্ন। 'আমার বাবা', 'আমার মা' বলিলে উক্ত ভেদ স্বীকৃত হইলেও, ভেদের তারতম্য হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ পিতা ও মাতার সহিত আমার স্থূলশরীরের সম্পর্ক আছে। এক্ষেত্রে ভেদ বাড়ি-গাড়ির ভেদ অপেক্ষা কম হওয়াই স্বাভাবিক। আবার যখন আমরা 'আমার শরীর' বলি, তখন শরীরের সহিত আমার যে-পার্থক্য সূচিত হয়, তাহা অনেকটা কথার কথা মাত্র, কারণ আমরা মনে প্রাণে বুঝিয়া রাখিয়াছি যে, আমরা আপাদমস্তক শরীরই—স্থূলশরীরের সহিত আমাদের তাদাত্ম্য এতই নিবিড়। যখন আমরা 'আমার মন' বলি, তখন মন হইতে আমার যে-পার্থক্য সূচিত হয়, তাহা বিচারের দিক দিয়া আমাদের আত্মার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও, বাস্তবক্ষেত্রে উহাও নিছক কথামাত্র—সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাহিরে, কারণ অনুভূতিভিত্তিক নয়। সুতরাং সর্বাগ্রে 'আমার শরীর'-কথাটির ব্যঞ্জনা পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার। আমি আকেশ-পদনখাগ্র শরীর নই— আমি মন, শরীরটি আমার যন্ত্রমাত্র। 'আমার গাড়ি', 'আমার বাড়ি' আর 'আমার শরীর' যে প্রায় একজাতীয় কথা, নিরন্তর বিচারের দ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে অঙ্কিত করা প্রয়োজন। শরীরের সহিত আমার সম্পর্ক বর্তমানে যতই নিবিড় হউক না কেন, কিছুকাল পরে বাড়ি ও গাড়ির মতোই

শরীরটিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে—ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য আর কিছুই নাই, এইরূপ বিচারসহায়ে শরীরকে মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু জ্ঞান করিয়া শরীরের প্রতি নির্মোহ হইতে হইবে।

অনাদিকাল হইতে এই মন বিচিত্র নটের ন্যায় বারংবার দেব মনুষ্য পশুপক্ষী বনস্পতি আদি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছে। অতি ক্ষণস্থায়ী এই অভিনয়। মনের আয়ুর তুলনায় স্থূলশরীরের আয়ু আর কতটুকু! বলা যাইতে পারে, মন অনন্তকাল স্থায়ী, অর্থাৎ যতদিন পূর্ণ জ্ঞান না হইতেছে, ততদিন ইহার বিনাশ নাই। গীতায় আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, আত্মা অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য ও অশোষ্য। এই চারিটি বিশেষণই সম্পূর্ণভাবে মন সম্বন্ধে প্রযোজ্য—কোন শস্ত্র এই মনকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। এইভাবে মননের দ্বারা মন সম্পর্কে আমরা একটি পরিষ্কার ধারণায় আসিতে পারি।

বিচারের এই প্রাথমিক স্তরে যদি ঠিক ঠিক আসা যায়, তাহা হইলে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মায়ামোহ ক্ষীণ হয়, অতি কৃপণেরও সযত্ন-সঞ্চিত অর্থের প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয়, যে-দেহ এত প্রিয় তাহার প্রতি আজন্ম-পোষিত আসক্তি চলিয়া যায়, মৃত্যুকে বিভীষিকার পরিবর্তে নবজীবনের অভিনন্দনীয় দূত বলিয়া মনে হয়। জন্মান্তর নিবারিত না হইতে পারে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি না হইতে পারে, কিন্তু বিচারের দ্বারা যেটুকু লাভ হয় বাস্তবজীবনে তাহার উপযোগিতা উপেক্ষণীয় নয়। তবে সাধককে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, শরীর ও মনের এই বিবেকের চরম সার্থকতা আত্মতীর্থে উপনীত হওয়াতেই। প্রথম পদক্ষেপেই রুদ্ধগতি হইলে চলিবে না। বেদের বাণী ঃ ''চরৈবেতি চরৈবেতি''—'এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও' যেন তাঁহাকে সতত উদ্বুদ্ধ করে। উপনিষদের বাণী ঃ ''আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ॥''—'যদি কোন ব্যক্তি 'আমি আত্মা' ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তবে কোন্ কামনায়, কী প্রয়োজনে তিনি শরীরের দুঃখে দুঃখী হইবেন?'—ইহা যেন তাঁহার নিভৃত মনোমন্দিরে মঙ্গলধ্বনির ন্যায় নিরন্তর অনুরণিত হইতে থাকে। তবেই তিনি কৃতকৃত্য হইবেন—'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন', এই মহতী বাণী তবেই তাঁহার মহিমময় জীবনে চিরঈপ্সিত চরিতার্থতায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।* □

*৭৭ বর্ষ, ৭ সংখ্যা

ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভাষা ও ভাব

স্বামী অক্তজানন্দ

চলিতে চলিতে পথের ধারে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম। না—দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কারণ দুর্বার জনস্রোত নিশ্চিন্তে চলিতে দিতেছিল না। বিপুল সেই স্রোতের গতিও ছিল বিচিত্র—পুজোৎসবের আনন্দ-বন্যায় জনসমুদ্র যেন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি শারদীয়া মহাপূজার সমারোহ নানা ভাবে ও রূপে, বহুধা বিক্ষিপ্ত এবং সমস্যাক্লিষ্ট জনমানসকে চমক লাগাইয়া গেল। পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাই বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছিলাম, মিছিল-পুরী মহানগরীর ইহাও এক অভিনব দৃশ্য! ভাবিতেছিলাম, এই তো গতকালও যেখানে দেখিয়াছিলাম পথ-অবরোধকারী জনতার দোর্দণ্ড-তাণ্ডব, শুনিয়াছিলাম বিক্ষোভ-রুষ্ট বহু কণ্ঠের বিভিন্ন বাদ-প্রতিবাদের আওয়াজ, সেখানে সেই জনগণই আজ অন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ—যেন একই কুশীলবদের ভিন্নতর দৃশ্যে অভিনয়। কেবল পথে জনস্রোতের গতিতেই নহে, জানিয়া অবাক হইয়াছিলাম যে, ঐ গতি মাঝে মাঝে যে-সব স্থলে স্থিতিলাভ করিতেছিল, সেই মঠে-মন্দিরে ও পূজামণ্ডপগুলিতে নাকি অভূতপূর্ব জনসমাবেশ ঘটিয়াছিল সদ্যোবিগত এবারকার শারদোৎসবে।

প্রচলিত ও সংশোধিত উভয় মতানুসারেই পূজাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। অস্বাভাবিক এমন পরিস্থিতিতেও কিন্তু মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে এক চুলও দ্বিধা হইতে দেখা গেল না—বরং বহু গুণিত বোধ হইয়াছে। কোন্ টানে মানুষ এমন ভাবে ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল—জনমানসে কেনই বা এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত উদ্বেলতা? কোথায় ইহার রহস্যমূল? কোথায় সরাইয়া রাখিল মানুষ তাহার অজস্র সমস্যার বোঝাগুলিকে? খাদ্যাভাব, জলকষ্ট, খরার দহন, পণ্যের অগ্নিমূল্য, যান-জট, বিদ্যুৎ-বিভ্রাট, চিকিৎসার অব্যবস্থা, শিক্ষা-সঙ্কট আরো শত সহস্র দৈনন্দিন জটিলতাকে কোন্ কৌশলে ঢাকিয়া, মানুষগুলি এমন উচ্ছল প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল? জিজ্ঞাসা ইহাই।

সহসা একটি অতীত স্মৃতি চলচ্চিত্রের মতো মনের পটে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের দুই বিশিষ্ট সন্ন্যাসি-শিষ্য একদা তীর্থপর্যটন প্রসঙ্গে অরণ্য-সমাকীর্ণ পার্বত্য-পথে চলিতেছিলেন। বদরিকাশ্রম দর্শনান্তে তুষারময় এক দুর্গম বন্ধুর উৎরাই বাহিয়া অতি সন্তর্পণে নামিতে নামিতে, একদল মহিলা যাত্রীকেও এমন বিপদসঙ্কুল পথে আরোহণ করিতে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই। মহিলাগণ কাতর কণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিতে থাকেন, তাঁহাদের এক সঙ্গিনী পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যদি সন্ন্যাসী যাত্রিদ্বয় ঐ পথহারা নারীকে কোথাও দেখিতে পান, তবে যেন তাঁহারা আশ্বাস দিয়া বলেন যে, তাহার সহযাত্রিণীরা তাহাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। মহিলাগণ আরো জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, ঐ নারীর ক্রোড়ে থাকিবে একটি শিশু

সন্তান; সুতরাং দূর হইতে দেখিলেও তাহাকে চেনা যাইবে। সত্য-সত্যই কিছু দূরে নামিয়া আসিয়া দিশাহারা সেই যাত্রিণীকে ঠিক দেখা গিয়াছিল—নিশ্চিন্তে ঘুমন্ত একটি তিন-চার মাসের শিশুকে কোলে লইয়া ঐ মাতা খুবই ধীরে ধীরে পিচ্ছিল বরফ-ঢাকা পথ ধরিয়া তীর্থাভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছেন। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদ্বয় অবাক হইয়া ভাবিতেছিলেন—দুঃসাহসিকা ঐ তীর্থাভিলাষিণীর কি নিজ সন্তানের প্রতিও এতটুকু মমতা নাই? দুস্তর এই পথে প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্ঝাকেও উপেক্ষা করিয়া এমন একটি শিশু সন্তানকে বক্ষে লইয়া কিসের জন্য তিনি গৃহের বাহিরে যাত্রা করিয়াছেন? কী সেই দুর্বার আকর্ষণ?

পরিব্রাজক সাধুদ্বয়ের সেদিনকার দৃষ্টিতে যাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা আমরা শুনিয়াছি। তাঁহারা অবলোকন করিয়াছিলেন—ভারতের একখানি সনাতন আদর্শ-চিত্র! তাঁহারা আরো একবার অনুভব করিয়াছিলেন—ভারতে ধর্ম প্রথমে, পুত্র-পরিজন জগৎ-সংসার সব পরে। আদর্শ-বিস্মৃত ইহ-সর্বস্ব বর্তমান যুগেও এইরূপ চিত্র এখনো বিরল হইয়া যায় নাই, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, সনাতন ভারত এখনো মরে নাই, তাহার মৃত্যু নাই। সেই অমর আদর্শই যেন মূর্তিধারিণী হইয়া ঐ তীর্থযাত্রিণীর বেশে, পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের দৃষ্টিতে ধরা দিয়াছিল।

ভারতের জনমানসের অতি সহজ স্বাভাবিক চিত্রপট বুঝি ইহাই। রূপকথার সেই রাক্ষসীর প্রাণ-পেটিকাটি যেমন আকাশে সঞ্চরণশীল পাখির গর্ভে লুক্কায়িত ছিল, বিশাল এই জাতির প্রাণ-সম্পুটও তেমনই সুরক্ষিত রহিয়াছে উহার হৃদয়াকাশে নিহিত ধর্ম-বিশ্বাসে। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচারের পরে ভারত-ভূখণ্ডে প্রত্যাগমনান্তে সর্বপ্রথম পদার্পণ করেন পাম্বানে—১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি। সেখানেই সেদিন ভারতবাসীকে স্বামীজী স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন ঃ "আমার বোধ হয় প্রত্যেক জাতিরই এক একটি মুখ্য আদর্শ আছে। সেই আদর্শ যেন তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নহে; ধর্ম—কেবল ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড। ধর্মের প্রাধান্য ভারতে চিরকাল।"

ভারতের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই 'ধর্ম' বলিতে কিন্তু আমরা অবশ্যই উহার প্রচলিত ইংরেজী প্রতিশব্দ 'রিলিজিয়ন' (Religion) বুঝি না। রিলিজিয়ন অপেক্ষা 'ধর্ম' শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। 'ধর্ম' শব্দের আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক গভীর তাৎপর্যার্থে প্রবেশ না করিয়াও অতিশয় সহজভাবে বলিতে পারি, 'ধর্ম' কথায় আমরা এমন কিছু বুঝি, যাহা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অবশ্য পালনীয় নীতি বা সদাচার—যাহা না থাকিলে মানুষকে 'মানুষ' বলাই চলে না। সদাচার, সচ্চরিত্রতারূপ 'ধর্ম' মনুষ্যমাত্রেরই সর্বপ্রকার সমাজবদ্ধ জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক—এই ব্যাপারে কোন বিবাদের অবকাশ কোথাও নাই। মানুষের ব্যক্তিজীবন, তাহার সমাজ, জাতি এবং রাষ্ট্র এই সদাচার বা সুনীতির উপরই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। সত্য, অহিংসা, অচৌর্য, সংযম, ত্যাগ, মৈত্রী, করুণা ইত্যাদি সুনীতি বা ধর্মলক্ষণগুলিই যুগে যুগে সর্বত্র মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, তাহার জ্ঞাতসারে বা

অজ্ঞাতসারে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, উক্ত ধর্মগুণগুলির বিকাশ ও পরিপুষ্টি কখনো বাহিরের জড় বিষয়রাশির ভজনা সহায়ে সাধিত হইতে পারে না। জড়ের সেবায় জড়ত্ব প্রাপ্তিই সম্ভব—জড়কে অতিক্রম করিবার উপযুক্ত সামর্থ্যলাভ উহা দ্বারা হয় না। ধর্মের প্রেরণা ও প্রকাশ তাই জড়-বস্তুর ধ্যান ধারণায় নহে—চৈতন্যের ভাবনায় বা নিত্য বস্তুর চর্চায়—সত্যের অনুশীলনে বা ঈশ্বরমুখী জীবনচর্যায়। ভারতের চির পুরাতন আদর্শ ইহাই। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে বলা হইত—"ত্রিবর্গো দণ্ড উচ্যতে।"[১] দণ্ড মানে রাজশাসন, সমাজ-নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ, রাজ-শাসনের নীতিতে তিনটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত—ধর্ম (সদাচার বা সচ্চরিত্রতা), অর্থ (ধনোপার্জন) ও কাম (ভোগ-ব্যবস্থা)। চতুর্থ বর্গ বা পুরুষার্থ—মোক্ষ। মোক্ষ কখনো রাজ-নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় ছিল না, থাকা উচিতও নহে। উল্লিখিত ত্রিবর্গের মধ্যে আবার ধর্মই প্রধান। কারণ ধর্মানুসারেই (অর্থাৎ নৈতিক উপায়েই) অর্থোপার্জন এবং ভোগ্য দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও বণ্টন করা উচিত। ইহাই ছিল ভারতের রাজনীতির মূল কথা। এই নীতির ব্যতিক্রম যাহাতে কোথাও না ঘটে, এই সকল ব্যাপারে দুর্নীতি নিবারণই ছিল রাজার কর্তব্য বা রাজধর্ম।

ভারতীয় জনগণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত 'মহাভারত'। সেখানে স্বর্গারোহণ পর্বে, স্বয়ং ব্যাস-কণ্ঠের সোচ্চার আক্ষেপ-ধ্বনি আমরা শুনিতে পাই ঃ

"উর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্মাদ্ অর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে।।"[২]

—বাহু তুলিয়া চিৎকার করিয়া, এই এত যে আমি ডাকিয়া বলিতেছি, তোমরা কি তাহা শুনিতেছ না? ধর্মপথে অর্থও হয়, বিষয়-ভোগও হয়। হায়, তবু কেন লোক ধর্মবিমুখ?

ভারতের জনগণের কর্ণে, বহু দূরাগত সেই ধ্বনি বুঝিবা সময়ে সময়ে এখনো শ্রুত হয়। তাই জানিয়া বা না-জানিয়া, ধর্মের নামে জনসমুদ্রকে অমন উদ্বেল আবেগে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে দেখা যায় কখনো কখনো।

মানুষ কেবল একটি জীবই নহে। রক্তমাংসময় নিছক একটি প্রাণী ছাড়াও তাহার দ্বিতীয় আরেকটি গৌরবময় সত্তা রহিয়াছে—উহা তাহার মনুষ্যত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই মানুষের এই দ্বিতীয়, অর্থাৎ তাহার মহিমান্বিত সত্তার দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে ফিরাইতে চাহিয়াছেন। বলিয়াছেন—"মানুষ; মানহুঁশ। যার 'হুঁশ' আছে, চৈতন্য আছে; যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; সেই 'মানহুঁশ'।"[৩]

মানুষ যখন জীব—তখন তাহার সর্বসিদ্ধি বৈষয়িকচেষ্টায়, সংসার-চর্চায়। কিন্তু মানুষ যখন তাহার স্বীয় মনুষ্যত্ব-গরিমায় সচেতন, তখনই সে প্রকৃত অর্থে 'মানুষ'। এই 'মানুষ' তখন সকল বৈষয়িকতার উর্ধ্বে। সেখানে সে সাময়িক অপেক্ষা চিরন্তনের অধিক প্রয়াসী, অনিত্য অপেক্ষা নিত্যের প্রিয়, জড়কে ত্যাগ করিয়া চৈতন্যের অনুসন্ধানী। এই মানুষই সঠিক অর্থে ধার্মিক। মানুষের জৈবিক সত্তা হইতে স্বতন্ত্র এই আত্মিক সত্তায়, তাহার দৈনন্দিন

জীবনযাত্রার পথরেখা বা আদর্শও ভিন্নতর হইতে বাধ্য। সাধারণ লোকচক্ষে হয়তো বা লাভজনক বলিয়া প্রতীত না হইতে পারে, কিন্তু উহাই মানুষের শ্রেয়। উহাই তাহার পরমার্থ-সম্পাদক। 'আপাত' অপেক্ষা 'চিরন্তন'ই তখন তাহার ঈপ্সিত। মরণ তখন নিছক অভিনয়—অমরত্বেই তখন তাহার স্বাধিকার। মাত্র বাঁচার জন্য সংগ্রামের নামই তখন 'জীবন' বলিয়া স্বীকৃতি পায় না। জীবন তখন হইয়া দাঁড়ায় মরণ-জয়ের সাধনা—অমৃতত্ব লাভের সোপান—সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনা। মানুষ-জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ইহাই। ইহারই অপর নাম 'ধর্ম'।

'ধর্ম' কোন অলস মানসিকতা নহে, নিছক ভাব-বিলাসের সুরেলা কথাও নহে। মানব-জীবনের উৎকর্ষ-সাধনে ধর্ম হইতেছে একান্ত অপরিহার্য স্বাভাবিক উপায়, আধুনিক বিজ্ঞানস্বীকৃত পথ ও প্রেরণা। তাহা না হইলে, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর মুখে আমরা নিশ্চয়ই শুনিতাম না ঃ "যে-আদর্শবাদের প্রজ্বলিত বর্তিকা আমার যাত্রাপথকে আলোকিত করিয়াছে এবং প্রতিনিয়ত যাহা আমাকে সহর্ষে জীবনের সম্মুখীন হইবার সাহস জোগাইয়াছে, তাহা হইতেছে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'।" বিজ্ঞানজগতের যুগ-বরেণ্য পথিকৃতের লেখনী হইতে আরো পাইতাম না ঃ "মনুষ্য-জীবন বা যাবতীয় জৈব-জীবনের অর্থ কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ধর্মের কথা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। আপনারা তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এজাতীয় প্রশ্নের কোন তাৎপর্য আছে কিনা। আমার জবাব হইতেছে এই, যে-ব্যক্তি নিজের এবং স্বজাতীয় অন্যের জীবনকে অর্থহীন মনে করে, সে শুধু দুর্ভাগা নহে, সে জীবন-ধারণের অযোগ্যও বটে!" আমরা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কথাই উল্লেখ করিলাম।

কেবল বিজ্ঞান কেন? ভোগনিষ্ঠ জড়বাদীরাও আজ পুনর্বিবেচনা শুরু করিয়াছেন শুনিতেছি। মানুষের মনুষ্যত্বের সম্মান দিতে হইলে শুধু তাহার রক্ত-মাংসের পুষ্টিসাধন ও পরিতোষবিধানের পথেই সফলতা আসিবে না—মানুষের আন্তর রাজ্যের আলো-বাতাসের পথগুলিকেও উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। এ-যুগের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরেও তাই আবার নূতন চিন্তাস্রোতের আভাস মিলিতেছে। ইদানীং কালের ধর্ম-বিনাশন-যজ্ঞের এক অবিসম্বাদী নায়কের কণ্ঠেও তাহার জীবনের শেষাঙ্কে অস্ফুটস্বরে শোনা গিয়াছিল ঃ "ধর্মকে থামানো যাইবে না, যেমন যাইবে না মানুষের বিবেককে স্তব্ধ করা। ধর্ম হইতেছে বিবেকের ব্যাপার—বিবেক চিরস্বাধীন। উপাসনা এবং ধর্মও তাই স্বাধীন।"

যাহা হউক, ধর্মের লক্ষ্য ও তাৎপর্য যত মহৎ-ই হউক—মানুষের সমাজ, শিক্ষা ও পরিবেশ অনুযায়ী উহার প্রয়োগে বা অভিব্যক্তিতে কিছু বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অকপটে স্বীকার করিতে হইবে যে, নিছক কুসংস্কার ও ভয় হইতে কল্পিত যে তথাকথিত ধর্ম, তাহাকেও মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লওয়া মানব-কল্যাণের অঙ্গ নহে। কিন্তু যে-ধর্ম মানুষকে সংস্কারমুক্ত করে, অভয় করে, শান্তি প্রদান করে—শুধু প্রতিবেশী মানুষ কেন,

জীবজন্তু-কীট-পতঙ্গটিকেও পর্যন্ত আপনবোধ করিতে শিক্ষা দেয়—ভালবাসিতে প্রেরণা দেয়, তাহাকেও জলাঞ্জলি দিবার মতো আধুনিকতাকে কেন আমরা স্বীকার করিব? উহা যুক্তিবাদিতা নহে, উহার নাম আত্মহনন। ঐরূপ আত্মঘাতী শিক্ষা বা ধর্মদ্বেষী আন্দোলনের উদ্দাম তাণ্ডবে সমাজ-জীবনের মাধুর্যের ধারাকে শুকাইয়া ফেলিবার, মানুষের মনুষ্যত্ব দিকটিকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার চেষ্টাই হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল এই প্রকার চলিলে, উহার প্রতিক্রিয়াও মারাত্মক আকারে দেখা দিতে বাধ্য—ইতিহাসে যাহার সাক্ষ্য ভুরি ভুরি মিলিবে।

সমাজের সাধারণ নরনারী ধর্ম মানে, কিন্তু জানে না। তাহারা অন্তরের আবেগ ও অনুভূতিকে সঠিক পথে প্রকাশ করিতে পারে না—কী চায়, তাহাও বুঝে না। ইহার কারণ শিক্ষার অভাব। অসহিষ্ণু ও উন্নাসিক হইয়া বৃহত্তর এই জনসমাজকে অবজ্ঞায় দূরে ঠেলিয়া দেওয়া, অথবা তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগমুখর ধর্মাচরণগুলিকে নেহাতই কুরুচি জ্ঞানে দমিত করার উদ্যোগ বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। সহানুভূতি ও ধৈর্য সহকারে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে, তাহার চিন্তা, ভাব ও কর্মকে—তাহার ধর্মচেতনাকে যথার্থ পথে সঞ্চালিত করিতে সহায়তা করাই হইবে, প্রকৃত অর্থে মানুষের সেবা, সমাজ-কল্যাণ। এই সেবা ও কল্যাণের পথে নিন্দা, সমালোচনা, ঘৃণা ও দ্বন্দ্বের আদৌ কোন স্থান নাই। এই পথের একমাত্র আলোকবর্তিকা 'প্রেম ও সত্যানুরাগ'।

ভারতবর্ষের জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের তাৎপর্য ধর্মে। ধর্মই ভারতবাসীর মজ্জাগত প্রকৃতি, উহা যে নামে বা প্রণালীতেই ব্যক্ত হউক না কেন। ভারতীয় জনগণের সেবায় যাঁহারা আকুল হইয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের আজ ভারতীয় জনচিত্তের এই অনন্যসাধারণ গতিপ্রকৃতিকে সর্বাগ্রে সম্যক্ বুঝা আবশ্যক। এদেশের জাতীয়তার এই বৈশিষ্ট্যকে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়, তথা আধুনিক সমাজবিদ্‌গণ যদি যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, তবে আর তাঁহাদের দ্বারা এই জাতির সেবা কোন্ উপায়ে সফল হইবে?

পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেদিনের ঐ জনপ্রবাহ দেখিতে দেখিতে যখন নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলাম, তখন প্রতিধ্বনির মতো কাহার কণ্ঠস্বরে আবার চমক ভাঙিয়াছিল। দূরাগত সেই প্রতিধ্বনি স্পষ্টই জানাইয়া গেল ঃ "দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক ধক করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামিচিই সার।"

জিজ্ঞাসার জবাব সেদিন এই ভাবেই মিলিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম,—ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভাষা ও ভাব।* □

পাদটীকা

১ মহাভারত, শান্তি পর্ব, ১৫/৩ ২ ঐ, স্বর্গারোহণ পর্ব, ৫/৬২ ৩ কথামৃত, ৩।২০।৩

* ৮৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা

''জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না?''

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মথুরবাবুকে বলিয়াছিলেন ঃ ''দেখ, মা সব আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখানকার (ঠাকুরের নিজের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে, তারা সব আসবে, এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, শুনবে, প্রত্যক্ষ করবে, প্রেমভক্তি লাভ করবে; (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ খোলটি দিয়ে মা অনেক খেলা খেলবে, অনেকের উপকার করবে, তাই এ খোলটা এখনো ভেঙে দেয়নি—রেখেছে।'' শুনিয়া মথুর বলিয়াছিলেন ঃ মা যখন দেখাইয়া দিয়াছেন, তখন তাহা মিথ্যা হইবার নয়, তাহার নিশ্চয়ই আসিবে। মথুর এইভাবে আশ্বাস প্রদান করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। 'তাহারা এখনো আসিল না'—বলিয়া ছটফট করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বরে বাবুদের কুটিরের ছাদে যাইয়া তথা হইতে ''তোরা সব কোথায় আছিস আয়রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারছি না''—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার এই ব্যাকুল আহ্বানের কয়েকদিন পর হইতে ভক্তসকল একে একে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিয়া জগন্মাতা-নির্দিষ্ট সুকৃতিবান যে-সকল অন্তরঙ্গ ভক্ত তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই ছিলেন 'বয়স্ক ভক্ত', আবার অনেকে ছিলেন 'ছোকরা ভক্ত'। তাঁহাদের সকলেই 'অন্তরঙ্গ' হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ 'ছোকরা ভক্ত'-দের অন্য ভক্তদের অপেক্ষা বেশি ভালবাসিতেন। তিনি বলিতেন ঃ ''ছোকরাদের ভালবাসি কেন? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়, ঠাকুরের সেবায় চলে। তাহাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকের শীঘ্র হয় না।'' 'ছোকরা ভক্ত'-দের তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল' দল বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই দলে দুই একজন ছাড়া সকলেই ছিলেন তরুণ যুবক। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে আগমন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তিনি তাঁহাদের জীবন গঠিত করিয়া তাঁহাদের মাধ্যমে যুগোপযোগী নূতন একটি ভাবধারা জগতে ছড়াইয়া দেওয়ার প্রস্তুতি করিতেছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের নেতা নরেন্দ্রনাথই পরবর্তিকালের 'স্বামী বিবেকানন্দ'।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত নরেন্দ্রনাথের যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, নরেন্দ্রনাথ দুই-চারিটি বাংলা গানও গাহিতে পারেন জানিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে একটি গান গাহিতে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই দিন 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ষোলআনা মনপ্রাণ দিয়া গাহিয়াছিলেন। গান শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমদিনের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ পরে

এক সময় বলিয়াছিলেন : "গান তো গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর সহসা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারান্দা আছে, তথায় লইয়া যাইলেন" এবং "...সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় আমাকে পরমস্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া পেট ফুলিয়া রহিয়াছে।'" অন্য এক সময়ে নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন : "দেখলাম, কেশব যেরূপ শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হয়েছে নরেন্দ্রের ভেতর ওরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আবার দেখলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার মতো জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রয়েছে; পরে নরেন্দ্রের দিকে চেয়ে দেখি তার ভেতর জ্ঞানসূর্য উদিত হয়ে মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত সেখান থেকে দূর করেছে।" স্বামীজীর পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলীই শ্রীরামকৃষ্ণের উপরি উক্ত কথাগুলির যথার্থতা প্রমাণ করে।

শিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজীর অকল্পনীয় সাফল্যের সংবাদ ভারতের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে-শিহরণ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহাতে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে যে-আনন্দ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা জাতির নবজাগরণের, পুনরভ্যুত্থানেরই দ্যোতনা করে। ধর্মমহাসভার পর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে সাফল্যের সহিত বেদান্ত প্রচার করিয়া প্রায় চারি বৎসর পর স্বামীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তনের দিন হইতেই ভারতের প্রকৃত নবজাগরণ, নূতন উৎসাহে নবতর সাফল্যের প্রতি অভিযান আরম্ভ হইল বলা যায়। বিদেশে যাওয়ার পূর্বে এবং ওদেশে অবস্থানকালে আলাপ-আলোচনা ও পত্রাদির মাধ্যমে উহার কিঞ্চিৎ আভাস তিনি দিয়া থাকিলেও বস্তুত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজী যেসব বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহার ভারতের নবজাগরণ ও পুনর্গঠন পরিকল্পনার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশাভিমুখে যাত্রার সময় সেভিয়ার-দম্পতিকে তিনি বলিয়াছিলেন : "এখন থেকে আমার শুধু একটি মাত্র চিন্তার বিষয় আছে—আর সে হলো ভারত। আমি তাকিয়ে আছি ভারতের অভিমুখে—শুধু ভারতের দিকে।" ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই স্বামীজী তাঁহার ভারত-পুনর্গঠন-পরিকল্পনার কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামনাদবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন : "আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই ইঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশত্রু এখন ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙিতেছে।" "আমাদের সকলের এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে। আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল

নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। উঠ, তাঁহাকে জাগাও আর নূতন জাগরণে নূতন প্রাণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর।"

ভারতমাতাকে আবার 'শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত' করিবার মহৎ দায়িত্ব দেশের যুবসমাজ সানন্দে গ্রহণ করিবে, এই কাজের জন্য তাহারা জীবনোৎসর্গ করিবে—যুবসমাজের নিকট ইহাই ছিল স্বামীজীর প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশার কথা তিনি তাঁহার বক্তৃতা, কথোপকথন ইত্যাদির মাধ্যমে নানাভাবে প্রকাশও করিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে, যেকোন ত্যাগ স্বীকার করিয়া একমাত্র যুবসমাজই দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ। কলিকাতার যুবকদের আহ্বান করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ—জাগো, কারণ... তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। 'আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী' যুবকদের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতায় এইরূপ শত সহস্র যুবক রহিয়াছে।" মাদ্রাজের যুবকদের উদ্দেশে আহ্বান জানাইয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন ঃ "হে মাদ্রাজের যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না?... তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্ধারণ করিবার এই সময়—যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না তোমরা কর্মশ্রান্ত হইতেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজভাব রহিয়াছে, কাজে লাগো—এই তো সময়। কারণ, নবপ্রস্ফুটিত অস্পৃষ্ট অনাঘ্রাত পুষ্পই কেবল প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণের যোগ্য—তিনি তা গ্রহণ করেন।" "মাদ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্নদান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে?" "যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, আর্ত, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য (আমার) এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা—দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।... তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ কোটি (বর্তমানে প্রায় ৬৯ কোটি) ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে।" মনে রাখিতে হইবে, স্বামীজী যদিও কলিকাতার এবং মাদ্রাজের যুবকদের উদ্দেশ করিয়া দেশোদ্ধারব্রতে ব্রতী হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন, বস্তুত তাঁহার এই আহ্বান দেশের সকল যুবকদেরই উদ্দেশে।

যুবসম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবা-ব্রতের উপযুক্ত হওয়ার জন্য কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন তাহাও স্বামীজী স্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ "বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক।" "যাহাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে একটি মন যা বজ্রের উপাদানে

গঠিত।" আজ্ঞাবহতা ব্রতীর অন্যতম গুণ। তিনি বলিতেন ঃ "সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর; নিজ ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিও না, গুরুজনের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখনো শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না; আর এইরূপ বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করিলে কোন বড় কাজ হইতে পারে না।" সৈনিকের মতো আজ্ঞাবহতার কথাই স্বামীজী বলিতেন। একবার সন্ন্যাস-দীক্ষা দেওয়ার পূর্বে ভাবী সন্ন্যাসীদের তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "তোমরা কি আমার আদেশ অম্লানবদনে মানতে পারবে? আমি যদি তোমাদের বাঘের সামনে বা বিষধর সাপের সামনে যেতে বলি, যদি বলি গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমির ধরে আন, যদি বাকি জীবন আসামের চা-বাগানে কুলি হিসাবে কাজ করার জন্য বেচে দিই, অথবা যদি না খেয়ে মরতে বলি বা তুষানলে পুড়ে মরতে বলি—এই ভেবে যে, এতে তোমাদের মঙ্গল হবে—তবে তোমরা আমার কথা মানতে রাজি আছ কি?" ব্রতীকে আত্মবিশ্বাসী হইতে হইবে। আত্মবিশ্বাসই মানুষের ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। মানুষ তাহার এই অনন্ত শক্তি আত্মবিশ্বাসকে বিকশিত করিবার উপযুক্ত চেষ্টা করে না বলিয়াই বিফল হয়। সারকথা, যাহাদের দেহ সবল, মন সুস্থ, চিত্ত দৃঢ়, চরিত্র নির্মল; মনে পরম শ্রদ্ধা ও প্রবল উৎসাহ—তাহারাই এই কাজের উপযুক্ত ব্রতী।

স্বামীজীর আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার আহ্বান সমাজের সর্বস্তরের মানুষের, বিশেষ করিয়া যুবকদের হৃদয়ে বিপুল সাড়া জাগাইয়াছিল; প্রাণে করিয়াছিল অপরিসীম শক্তিসঞ্চার। যুবসমাজ স্বামীজীকে পাইয়াছিল তাহাদের নেতারূপে, পথপ্রদর্শকরূপে। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বেশ কিছু যুবক তাঁহার জীবিতকালেই 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' ব্রতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামীজীর সেবাব্রতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দের এবং স্বামীজীর কতিপয় সন্ন্যাসী শিষ্যের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে সেবাকার্যের যে-সূত্রপাত হয় তাহাতেও অনেক যুবক অংশ গ্রহণ করেন।

স্বামীজী নিজে কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সাক্ষাৎভাবে যুক্ত না থাকিলেও তাঁহার পরোক্ষ প্রভাব ছিল অপরিসীম। দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে স্বামীজীর প্রভাবের কথা মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের মনীষিগণ—সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৯৭-এ স্বামীজী দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন ঃ "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন।" তাঁহার এই আহ্বানও ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার আহ্বানে উৎসাহিত এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবসম্প্রদায় মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। স্বামীজী ছিলেন ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ঋষি। "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন"—তাঁহার মুখ হইতে এই বাণী উচ্চারিত হইবার ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরেই ১৯৪৭-এ ভারতমাতা পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করেন, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলেও দেশ সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কট হইতে এখনো মুক্ত হইতে পারে নাই। দেশ নানা সমস্যার সম্মুখীন। সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয় ঐক্য ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করিবার অপচেষ্টায় ব্যাপৃত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। জাতীয় আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এই বৃদ্ধির অতি অল্প অংশই জনসাধারণের নিকট পৌঁছায়। ফলে জনসাধারণের অবস্থার কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় নাই। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রের অবস্থাও তথৈবচ। জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। প্রতিটি রন্ধ্রেই ঘুণ ধরিয়াছে। জাতির এই অবক্ষয় কে রোধ করিবে?

স্বামীজীর আশা ছিল যুবসম্প্রদায়ের উপর। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "যুবকগণের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে।" শুধু তাহাই নয়। তাঁহার আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিবার দায়িত্ব দেশের যুবসমাজের উপর তিনি 'দায়স্বরূপ' অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যুবকদের প্রতি ব্যাকুল আহ্বান জানাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না?" শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিয়া একদা 'ইয়ং বেঙ্গল' দল 'মা'-এর কাজের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' দল-এর নেতা স্বামীজীর আহ্বানে 'ইয়ং ইন্ডিয়া'র দল যে আরো বিপুল উৎসাহে সাড়া দিয়া দেশের ও দশের কল্যাণে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিবেন—ইহা আমাদের শুধু আশা নয়, দৃঢ় বিশ্বাস।* □

---

* ৮৮ বর্ষ, ৫ সংখ্যা

'উদ্বোধন'-এর ১০০তম বর্ষে পদার্পণ

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের 'পাঞ্চজন্য' 'উদ্বোধন' নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের অনন্য ঐতিহ্যকে সঙ্গে করিয়া সগৌরবে ১০০তম বর্ষে পদার্পণ করিল। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি (১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ) শনিবার 'উদ্বোধন' আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। শুধু বাঙলা বা ভারতীয় ভাষায় নয়, গোটা পৃথিবীর সাময়িকপত্রের ইতিহাসেই একটি সাময়িকপত্রের ১০০ বছর জীবিত থাকা যথেষ্টই বিরল ঘটনা। আবার কোন সাময়িকপত্রের নিরবচ্ছিন্নভাবে ১০০ বছর প্রচলিত থাকার ঘটনা শুধু বাঙলা ভাষায় কেন, সারা ভারতবর্ষের কোন দেশীয় ভাষাতেই নাই। অর্থাৎ ভারতবর্ষে দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাসে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত কোন সাময়িকপত্রের ১০০ বছরের গৌরবলাভ এই প্রথম। ভারতের সাময়িকপত্রের ইতিহাসের পর্যালোচনা স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়া দেয় যে, এই গৌরবমুকুট আর কোন সাময়িকপত্রের মাথায় উঠিবার সম্ভাবনা নাই। ইহার পর যে-পত্রিকাই শতবর্ষের গৌরবলাভ করিবে তাহাকে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে! নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের ঐতিহ্যের নিরিখে সারা পৃথিবীতেও 'উদ্বোধন'-এর জুড়ি খুব বেশি পাওয়া যাইবে না। সুতরাং 'উদ্বোধন' যে এক বিরল ও অনন্য গৌরবের অধিকারী হইল, সে-কথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

ভারতবর্ষের মধ্যে সাময়িকপত্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ হইয়াছিল বঙ্গদেশেই—অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি শনিবার কলকাতার রাধাবাজার হইতে প্রকাশিত প্রথম ভারতীয় সাময়িক পত্রিকাটির প্রবর্তক ছিলেন একজন ইংরেজ (আইরিশ) শল্য-চিকিৎসক—জেমস অগাস্টাস হিকি। পত্রিকার নাম 'Bengal Gazette' বা 'Calcutta General Adviser'—চরিত্রে সাপ্তাহিক, ভাষা ইংরেজী। আঠার শতকের আটের দশকেই ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া পত্রিকাটি বন্ধ হইয়া যায়। তবে ভারতের প্রথম সাময়িকপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের ঐতিহ্যের নিরিখে দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 'উদ্বোধন'-এর মধ্যে একটি অসাধারণ যোগসূত্র আছে। উভয়ের জন্ম জানুয়ারি মাসে এবং শনিবারে। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে অল্পদিনের ব্যবধানে দুটি সাময়িকপত্র শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি 'দিগ্‌দর্শন' (মাসিক), অপরটি 'সমাচার দর্পণ' (সাপ্তাহিক)। প্রথমটি ছিল দ্বৈভাষিক (বাঙলা ও ইংরেজী), দ্বিতীয়টি পুরাপুরি বাঙলা। বাঙলা তথা ভারতীয় ভাষায় ইহারাই প্রথম সাময়িকপত্র। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে অপর একটি বাঙলা সাপ্তাহিকও প্রথম সাময়িকপত্রের গৌরবের দাবিদার। যাহা

হউক, ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত বাঙলায় অগণিত সাময়িকপত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি অত্যন্ত প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কয়েক বছর বা কয়েক দশক পরে বিলুপ্ত হইয়াছে। এগুলির কয়েকটির সঙ্গে স্বয়ং রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো দিকপাল ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অথবা সম্পাদক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। কয়েকটির সঙ্গে একইভাবে যুক্ত ছিলেন পরবর্তী কালের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রবৃন্দ, যাঁহাদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, সজনীকান্ত দাস, প্রমথ চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'উদ্বোধন'-এর পূর্বে প্রকাশিত দু-একটি বাঙলা সাময়িকপত্র অবশ্য এখনো টিকিয়া আছে, কিন্তু তাহাদের কাহারও ধারাবাহিক প্রকাশের ঐতিহ্য নাই। কোনটি হয়তো বহুবছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হইয়াছে। কোনটির চরিত্র হয়তো সাপ্তাহিক অথবা মাসিক, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের কয়েক মাস পর সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি হয়তো প্রকাশিত হইয়াছে, অথবা কয়েকটি সংখ্যা একত্রে কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

একথা অবশ্যই বলা যায় যে, একটি প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হওয়ায় 'উদ্বোধন'-এর পক্ষে প্রকাশের নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু 'উদ্বোধন'-এর পূর্বে এবং পরেও তো একাধিক পত্রিকা কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র ('প্রতিষ্ঠান' বলিতে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে যেমন ধরা হইয়াছে, তেমনি জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে ধরা হইয়াছে।) হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি তাহা হইলে ঐ ঐতিহ্যের অধিকারী হয় নাই কেন? আসলে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার প্রশ্নটি এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রতিষ্ঠানের স্বকীয় গুণগত মান ও উৎকর্ষ এবং প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের উদ্দেশ্যের একমুখিনতা ও আদর্শের ধারাবাহিকতা রক্ষায় তাঁহাদের আত্মনিবেদিত প্রয়াস। 'উদ্বোধন'-এর সাফল্যের পিছনে যে-প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হইবার সৌভাগ্য 'উদ্বোধন' লাভ করিয়াছে সেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এবং উহার চরিত্রের ভূমিকাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু "এহো বাহ্য"! 'উদ্বোধন'-এর সাফল্যের মূলে রহিয়াছে রা সঙ্ঘের 'গঙ্গাসাগর' 'উদ্বোধন'-এর মহান প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের তাঁহার স্বপ্ন, সাধনা ও প্রেরণা এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের 'গোমুখ' ও 'গঙ্গা'—পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর অমোঘ ও অব্যর্থ আশীর্বাদ। রহিয়াছে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের 'যমুনা' ও 'সরস্বতী'—শ্রীরামকৃষ্ণের অপর দুই সাক্ষাৎ পার্ষদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দের আত্মবিলয়ী অবদান। কথাগুলি ভাববাদীর মতো শুনাইতেছে কি? কিন্তু বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি তো আমাদের হাতেই রহিয়াছে। বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাময়িকপত্রের প্রায় দুশ বছরের ইতিহাস কি প্রমাণ করে নাই যে, কর্মের পিছনে ভাববাদ না থাকিলে, আধ্যাত্মিক আদর্শ না থাকিলে সেই

কর্মের কোন ভবিষ্যৎ নাই?—সেই কর্মের কোন স্থায়িত্ব নাই? বস্তুত, 'উদ্বোধন'-এর প্রবর্তনের পিছনে উহার মহান প্রবর্তকের স্বপ্ন ছিল ভাববাদ এবং বস্তুবাদ, আধ্যাত্মিকতা এবং বস্তুতান্ত্রিকতা, সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণের সমন্বয় ঘটানো। 'উদ্বোধন'-এর প্রথম আত্মপ্রকাশ-লগ্নে স্বামী বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনায় লিখিয়াছিলেন ঃ ''এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধন'-এর জীবনোদ্দেশ্য।''

বস্তুত, ভাববাদ এবং বস্তুবাদ, আধ্যাত্মিকতা এবং বস্তুতান্ত্রিকতা—এই দুইয়ের সমন্বয়ের আদর্শ ভারতবর্ষের চিরায়ত আদর্শ। দেহকে অস্বীকার করিয়া, ক্ষুধাকে অগ্রাহ্য করিয়া আত্মা এবং ধর্মের ভাব ও বাণীকে গ্রহণ কোনকালেই ভারতবর্ষের ঐতিহ্য নয়। বরং দেহ এবং আত্মা, ক্ষুধা এবং ধর্ম—উভয়ের স্বর্ণ-সমন্বয় করিবার বাণী ও আদর্শই ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণী ও আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দ সেকথা বারবার দেশের মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। 'উদ্বোধন' প্রবর্তনের পিছনে তাঁহার সেই চিন্তা যে বিশেষভাবে জাগরূক ছিল তাহা 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা'য় যেমন তিনি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তেমনই করিয়াছিলেন 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁহার 'বিলাতযাত্রীর পত্র' (পরবর্তী কালে 'পরিব্রাজক' শিরোনামে গ্রন্থাকারে ও 'বাণী ও রচনা'য় প্রকাশিত), 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত' প্রভৃতি প্রধান মৌলিক রচনাগুলিতেও। তিনি বলিয়াছিলেন, যখনই ভারতবর্ষ ''গভীর চিন্তা'' এবং ''অদম্য কার্যকারিতা''র সমন্বয়ের পথ ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে তখনই ভারতবর্ষে সামাজিক, বৌদ্ধিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের সূচনা হইয়াছে। মধ্যযুগ হইতে সমকালীন ভারতবর্ষে সেই অবক্ষয়ের প্রবণতা ও ছায়া যে দীর্ঘায়িত হইয়া চলিয়াছে এবং উহার প্রতিরোধ যে আশু কর্তব্য সে বিষয়ে তাঁহার স্বদেশীয়গণকে অবহিত করিবার জন্য 'উদ্বোধন'-কে স্বামীজী তাঁহার যন্ত্র করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধর্মের নামে যে-সর্বনাশা অকর্মণ্যতার স্রোত জাতিকে ডুবাইয়া দিয়াছে তাহার প্রতিরোধের জন্য তখনই প্রয়োজন কর্মের জোয়ারে জাতিকে ভাসাইয়া দেওয়া। প্রয়োজন ''ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার'' হইতে বিদ্যুৎ আহরণ। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা'য় আগুনের অক্ষরে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ ''চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি; আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।''

জাতির অবক্ষয় কোন্ গভীরে নামিয়াছে সেবিষয়ে দেশবাসীকে যে-ভাষায় তিনি সচেতন করিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি অক্ষরে যেন আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইহা যেন ভাষা নয়, অগ্নিশলাকার নির্মম কশাঘাত! চেতনার অঙ্কুশের আঘাতে আঘাতে মগ্নচৈতন্য হইতে জাতিকে তুলিবার যে জ্বলন্ত আকুতি তাঁহার ছিল তাহাকে তিনি বজ্রবাণীতে প্রকাশ করিলেন 'উদ্বোধন'-এর প্রথম রচনায় ঃ

"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে-দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"

আজ হইতে একশ বছর আগে ভারতবর্ষের অবক্ষয়ের এমন নিখুঁত ব্যবচ্ছেদ আর কে করিয়াছেন? ইহার প্রতিটি শব্দের মধ্যে যেমন সত্য-ইতিহাসের তাৎপর্য নিহিত, তেমনই নিহিত সমাজবিজ্ঞানের সুগভীর ব্যঞ্জনা। আবার সাহিত্যের ঐশ্বর্যই কি কম?

স্বামীজী জানিতেন, পাশ্চাত্যের বিদ্যুৎভাণ্ডার হইতে বিদ্যুৎ গ্রহণের ভয়ও কম নয়। পাশ্চাত্যের চমকপ্রদ উন্নতির মূলে যে অদম্য কর্ম উদ্দীপনা রহিয়াছে তাহাকে অন্ধভাবে গ্রহণ করিয়া কর্মের প্রবল তরঙ্গ আমাদের মনকে একান্তভাবে বহির্মুখী ও বস্তুসর্বস্ব করিয়া তুলিতে পারে। আবার পাশ্চাত্যের ভোগবাদী প্রবণতাও আমাদের মনে চূড়ান্তভাবে সংক্রামিত হইয়া আমাদের অধ্যাত্মবাদী স্বভাবকে লুপ্ত করিয়া দিতে পারে। ভারতের স্বাভাবিক বাতাবরণে অন্তর্মুখিনতার ভাব প্রবল, পাশ্চাত্যের স্বাভাবিক লক্ষণ বহির্মুখিনতা। দুটিরই প্রয়োজন। প্রয়োজন দুইয়ের সমন্বয়ের। এই সমন্বয় করিতে পারিলে উহা ভারতের ক্ষেত্রে অশেষ কল্যাণের নিদান হইবে। কিন্তু সমন্বয়ের পরিবর্তে যদি পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রবল হইয়া উঠে এবং আমাদের স্বকীয়তা ক্ষীণ অথবা লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের স্বকীয় ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য হারাইয়া যাইবার সমূহ সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ভাব ও কর্মপদ্ধতির অনুকরণ আমাদের পক্ষে চরম অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। একদিকে যেমন আমাদের আলস্য ও নিশ্চেষ্টতাকে, আমাদের অবক্ষয় ও অধঃপতনের কারণ ও স্তরগুলিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করিয়া স্বামীজী আমাদের সচেতন করিয়াছেন, তেমনই আবার পাশ্চাত্যের প্রতি মোহগ্রস্ত অনুকরণ আমাদের কোন্ গভীর বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে সেবিষয়েও আমাদের সতর্ক করিয়াছেন। সেইসঙ্গে আহ্বান জানাইয়াছেন, আমরা যেন গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্যে সীমান্তরেখাটি কোথায় টানিতে হইবে সে-সম্পর্কে সজাগ থাকি।

'প্রস্তাবনা'য় স্বামীজী বলিলেন ঃ "ভয় আছে যে, পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। এই জন্যে ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে

তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?''

এই বীর্যবাণীই 'উদ্বোধন'-এর শঙ্খধ্বনি। গোটা বাঙালী জাতির মধ্যে এই অগ্নিতরঙ্গ প্রবাহিত করাইবার ব্রত স্বামীজী 'উদ্বোধন'-এর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। শুধু 'প্রস্তাবনা'য় নয়, 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত তাঁহার সমস্ত সুবিখ্যাত রচনাগুলিতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের ভাবটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ ঐবিষয়ে প্রাচ্য তথা ভারতের সতর্কতার প্রয়োজনীয়তার দিকটিও। সেইসঙ্গে তাঁহার প্রতিটি রচনায় ভাব ও ভাষার মধ্যে বীর্য ও ওজস্বিতা এমনভাবে বিচ্ছুরিত যে, শতবর্ষ পরেও তাহা মানুষের হৃদয়-মনকে দুর্বার প্রেরণায় উত্তপ্ত করিয়া তুলে। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে মানুষকে শুধু ইতিবাচক ও সর্বজনীন ভাব দিতে হইবে। কোন সঙ্কীর্ণতা, কোন সাম্প্রদায়িক ভাব, কোন নেতিবাচক ভাব যেন কখনো 'উদ্বোধন'-এ স্থান না পায়। এই আদর্শ তিনি পাইয়াছিলেন তাঁহার আচার্যের নিকট হইতে।

শুধু বলিষ্ঠ ভাব এবং চেতনা সঞ্চারের কাজকেই স্বামীজী 'উদ্বোধন'-এর ব্রত হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। তিনি হাত দিয়াছিলেন বাঙলা ভাষাকে নূতন করিয়া গঠন করিবার কাজেও। বাঙলা ভাষার মধ্যে নূতন প্রাণশক্তি ও ওজস্বিতা সঞ্চার করিবার এবং চলিত বাঙলাকে নূতন ভাবে, নূতন ঢঙে, নূতন শক্তিতে নির্মাণ করিবার ব্রতেও 'উদ্বোধন'-কে তিনি নিয়োজিত করিতে চাহিয়াছিলেন। চলিত বাঙলার রূপ কেমন হইবে সেবিষয়ে স্বামীজী প্রথম 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে আমেরিকা হইতে একটি চিঠিতে লিখিলেন (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০০) ঃ ''ভাষাকে করতে হবে সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছা কর—আবার যে-কে-সেই, একচোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।'' স্বামীজী বলিলেন, ভাষাকে হইতে হইবে সহজ এবং স্বাভাবিক, জোরালো এবং প্রাণবন্ত, ভাবপ্রকাশের ব্যাপারে যাহা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং মানুষের মনকে স্পর্শ করে। স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পড়িয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিলেন ঃ ''চলিত বাঙলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত।... যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।''[১]

'উদ্বোধন' কি শুধু একটি পত্রিকামাত্র? 'উদ্বোধন' স্বামী বিবেকানন্দের শঙ্খ। তাঁহার কণ্ঠস্বর। 'উদ্বোধন' রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের পতাকা। সেই পতাকাকে বহন করার, উহাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরার গৌরবময় দায়িত্ব আমাদের সকলের। সেই দায়িত্ব আমাদের মহান উত্তরাধিকার। 'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। 'উদ্বোধন' তাঁহাদের

বাঙ্ময়-তনু। একই সঙ্গে 'উদ্বোধন' ভারত-সংস্কৃতিরও বাণী-তনু। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-ভাষায় কথা বলিতেন, যে-ভাষা ছিল তাঁহার মাতৃভাষা, যে-ভাষাকে তিনি অমরতা দান করিয়াছেন তাঁহার 'কথামৃত'র মাধ্যমে, সেই ভাষায় একখানি পত্রিকা থাকিলে তাঁহার ভাব ও বাণী সহজে সেই ভাষার মানুষের কাছে পৌঁছাইবে। সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে 'উদ্বোধন'-এর প্রকাশের পরিকল্পনার মূলে সে-চিন্তাও ছিল সন্ন্যাসী-সাংবাদিক-সংগঠক স্বামী বিবেকানন্দের মনে। শতবর্ষ ধরিয়া 'উদ্বোধন' তাহার মহান প্রবর্তকের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও নির্দেশ অনুসারে চলিবার অতন্দ্র প্রয়াসে ব্রতী। ইহাই তাহার সাধনা, তাহার পূজা। 'উদ্বোধন'-এর বুকের মধ্যে রামকৃষ্ণের ব্রহ্মতেজের অগ্নি, শিরা-উপশিরায় তন্ত্রী-ধমনীতে বিবেকানন্দের ক্ষাত্রবীর্যের শোণিতস্রোত এবং সর্বাঙ্গে সারদা জননীর করস্পর্শ! রামকৃষ্ণ-সারদার অপর দুই বীর সন্তান স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের পঞ্জরাস্থি দিয়া 'উদ্বোধন'-এর দেহখানি নির্মিত। 'উদ্বোধন'-এর দেহে তাই স্থবিরতার কোন চিহ্ন নাই। কোনদিন থাকিবেও না। শতবর্ষে পদার্পণ করিয়াও সেজন্যই তারুণ্যের শক্তি 'উদ্বোধন'-এর কণ্ঠে, যৌবনের দীপ্তি 'উদ্বোধন'-এর সর্বাঙ্গে। 'উদ্বোধন' মৃত্যুহীন। যতদিন রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ থাকিবেন, যতদিন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ থাকিবে, ততদিন 'উদ্বোধন'ও থাকিবে।* □

পাদটীকা

১ 'উদ্বোধন', সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৪

* ১০০ বর্ষ, ১ সংখ্যা

গুরু

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

আজকাল ধর্মের আন্দোলন প্রায় সর্বত্রই কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষরূপে ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরাও আজকাল নাস্তিকতা অবলম্বন না করিয়া কোন না কোনরূপে ধর্মান্দোলনে যোগ দিতেছেন। যাঁহারা ধর্ম-চর্চা করেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, আমাদের যেমন আছে, কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া যেমন লোকে করিয়া থাকে, জপ-তপ কর, ঈশ্বরলাভ ইহাতেই হইবে। কুলগুরু ত্যাগ করিতে নাই, তাহাতে মহাপাপ, সুতরাং কুলগুরুর যেরূপ চরিত্রই হউক না কেন, তাহা না দেখিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র লও ও যতটা পার জপ-তপ কর। ইঁহারা নিজেরাও এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে মহাভারত পুরাণাদি পাঠ বা শ্রবণ করিয়া থাকেন, তন্ত্রও কেহ কেহ দেখিয়া থাকেন।

কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা নিজেরা চেষ্টা করিয়া কতকগুলি শাস্ত্র পাঠ করেন। আজকাল গীতা, পুরাণ, উপনিষদ্, বেদান্ত, যোগ শাস্ত্রাদির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এইসকল অনুবাদের সাহায্যে, কেহ কেহ বা কোন পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া শাস্ত্রাদির মর্ম যথাসাধ্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করেন। ঐসকল শাস্ত্র হইতে নিজ মনোমত একটি উপাসনাপ্রণালী লইয়া উপাসনাও করিয়া থাকেন। ইঁহারা গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না অথবা করিলেও উহা যে অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয়, তাহা স্বীকার করেন না। কেহ বা ও সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তাই করেন না। ইঁহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি আছেন, তাঁহারা বলেন, সিদ্ধগুরু না পাইলে গুরু করা না-করা সমান। অতএব যখন সিদ্ধগুরু পাইব, তখন গুরু করিব। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন, কেহ বা বিশেষ কিছুই করেন না।

ভগবান অন্তর্যামী, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি শুনিবেন, যাহা প্রয়োজন, সব তিনিই দিবেন, বাহ্যিক গুরুর আবশ্যক কি? এই কতকগুলি লোকের মত। আবার ইহার বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা বলেন, গুরু নইলে কিছুই হবে না। আর যে-সে গুরুতেও কিছু হবে না, সিদ্ধগুরু আবশ্যক। যাঁহারা কুলগুরু করিয়া প্রচলিত মতে সাধন-ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলে সচরাচর এই উত্তর পাওয়া যায়, গুরু যেমন বলেছেন, সেইরকম করে যাচ্ছি মাত্র; কিন্তু উন্নতি কী হইতেছে না হইতেছে, তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না। মনের অশান্তি গিয়াছে কি? কই, তাও যায় নাই। আর দেখিতেও পাই, বাস্তবিক কই, তাঁহাদের দিন দিন ঈশ্বরানুরাগ তো বৃদ্ধি পাইতেছে না; সংসারের কামিনীকাঞ্চনে যেরূপ অনুরাগ, ভগবানের জন্য তাহার এক কণাও তো তাঁহাদের দেখিতে পাই না।

এই সকল নানারূপ মত-মতান্তর দেখিয়া প্রশ্ন আসিতেছে, মুক্তিলাভ বা ধর্মজীবন লাভের জন্য গুরুর কি কোনরূপ প্রয়োজন আছে? যদি বলেন, আছে, তবে এই প্রয়োজন কি অনিবার্য অর্থাৎ গুরুকরণ ব্যতীত কোনরূপে মুক্তিলাভ কি অসম্ভব? আর গুরুর কিরূপ লক্ষণসম্পন্ন হওয়াই বা আবশ্যক?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হইলে যুক্তি, শাস্ত্র ও মহাপুরুষের বাক্য—এই তিনটির উপর নির্ভর করিতে হয়।

প্রথমত, যুক্তি এসম্বন্ধে কি বলেন, দেখা যাক। যাঁহারা সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা বুঝিবেন, ঈশ্বরোপাসনা বা সাধন-ভজন আপনার নিজেরই কার্য বটে, কিন্তু এমন লোক দেখা যায় না, যিনি পেট থেকে পড়িয়াই নিজে কোন নির্জন স্থানে গিয়া ঈশ্বরচিন্তায় বসিয়া গেলেন, আর উঠিলেন না। ইহা বুঝেনও অনেকে। কারণ, শাস্ত্র বা অন্যান্য অনেক পুস্তক পাঠে এবং নানা লোকের নিকট নানা কথা শুনিয়া তাঁহার ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়াছে—ইহা অস্বীকার করেন এরূপ নির্বোধ কেহ নাই। যাঁহারা গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাঁহাদের বোধহয় এরূপ বুদ্ধি নাই যে, সাধুসঙ্গে—ভাল লোকের কাছে—অনেক সময় থাকিলে—তাঁহার উদাহরণ দেখিয়া অনেক উন্নতি হয়—তাঁহার ঈশ্বরোপাসনায় অনুরাগ, তাঁহার পরোপকারব্রতনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখিয়া আমারও সেইসকল গুণসম্পন্ন হইবার ইচ্ছা হয়। তাঁহাদের বোধহয় আশঙ্কা এই, এক বিশেষ ব্যক্তিকে চিরকাল মানিতে হইবে, তাঁহার উপদেশ চিরকাল শুনিতে হইবে, এ কিরূপ কথা?

ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, যেকোন বিদ্যাই লোকে শিখুক, তাহাতেই কোন-না কোনরূপ শিক্ষাদাতার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। অপরের কোনরূপ সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া শিক্ষা করিতে গেলে শিক্ষা হয় না যে, তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে অনেক বিলম্ব হয়, অনেক কষ্ট পাইতে হয় ও অনেক ভুগিতে হয়। সকল বিদ্যা শিখিবারই নিয়ম এই, আমার পূর্বপুরুষেরা যতটুকু জানিয়াছেন, তাহা আয়ত্ত করিয়া লইয়া তারপর যদি নিজে কিছু তাহার উপর শিক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা। এই যে অপরের নিকট শিক্ষা গ্রহণ, ইহাও কেবল জড়ের ন্যায় কতকগুলি বিষয়ের চর্বিতচর্বণ নহে, ইহাতেও মহাপুরুষকারের আবশ্যক। অপরের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করার অর্থ, তাহা আপনার করিয়া লওয়া। আধ্যাত্মিক গুরু সম্বন্ধেও এইসকল কথা অতি সত্য। কোন বিশেষ উন্নত মহাপুরুষের সহিত বিশেষ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে তাঁহার জীবনে উপলব্ধ সত্যগুলি অনায়াসে নিজ জীবনে আয়ত্ত করিবার সুবিধা হয়।

তারপর প্রকৃত উন্নত গুরুর এক বিশেষ শক্তি থাকে; তাহা এই যে, তিনি শিষ্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন। বুঝিয়া তাহাকে যেপথে পরিচালিত করিলে সহজে তাহার মোক্ষলাভ বা ঈশ্বর প্রাপ্তির সম্ভাবনা, তাহা বলিয়া দেন। আর যদি সেই গুরুর সহিত শিষ্যের সাক্ষাতের সর্বদা সুযোগ থাকে, তবে এই সাধনকালীন নানা প্রকার বিঘ্নের সময় শিষ্যকে বিঘ্ন দূর করিবার উপায় বলিয়া দিয়া এবং তাহার সাধনায় উন্নতি অনুযায়ী উচ্চ

উচ্চ শিক্ষা দিয়া তাহাকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করিতে পারেন। যাঁহারা প্রকৃত গুরুলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মত, সদ্‌গুরুর মন্ত্রদান ও সাধারণ কুলগুরুর মন্ত্রদানের বিশেষ পার্থক্য আছে। সদ্‌গুরুগণ মন্ত্রদানের সময় সেই মন্ত্রের সহিত এক বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন এবং সেই মন্ত্রও সাধকের প্রকৃতি অনুযায়ী দিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টায় ও অল্প সাধনায় সাধক কৃতকার্য হইয়া থাকেন।

প্রকৃত গুরুগণ শিষ্যগণের আরেক উপকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শিষ্যগণের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ শিষ্য বিপথে যাইলেও যাহাতে সে পুনরায় সৎপথে আগমন করে, তাহার জন্য লৌকিক, অলৌকিক নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যদি এরূপ হয় যে, কোন সাধক এইরূপ গুরুর উপদিষ্ট সমুদয় তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আরো উচ্চ তত্ত্বান্বেষী হন, তবে তিনি অন্য উন্নত গুরু অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্তু শিষ্য খুব উন্নত না হইলে এক গুরুতে যাবজ্জীবন নিষ্ঠাই শ্রেয়; নতুবা ভাব ঠিক রাখিতে পারেন না। গুরুর আজ্ঞা মানিবার কথা যাহা আছে, তাহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, সদ্‌গুরু কখনো কোনরূপ অন্যায় আজ্ঞা করেন না; আর কাহাকেও সদ্‌গুরুরূপে গ্রহণ করিবার পূর্বে অনেকদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। তাহা না হইলে যাহাকে তাহাকে ফস্‌ করিয়া সদ্‌গুরু বলিয়া স্থির করা কর্তব্য নহে। যাঁহার যথার্থ সদ্‌গুরু করিবার ইচ্ছা, তাঁহার যতদিন না গুরুকে যথার্থ সাধু বলিয়া ধারণা ও বিশ্বাস হয়, ততদিন দিন-রাত্রি তাঁহার সহিত বাস করিয়া তাঁহার চরিত্র পরীক্ষা করা কর্তব্য।

কেহ কেহ তর্ক করেন, আমি যদি গুরু চিনিয়া লইতে পারিলাম, তবে তো আমিই গুরু হইলাম। এ কথায় বক্তব্য এই, এ-কথা কূট তর্ক মাত্র। বাস্তবিক তুমি কি প্রতিপদেই ভালমন্দ ভেদ করিয়া থাক না? ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা না থাকিলে কাহাকেও সাধু, কাহাকেও বা অসাধু বল কেন? যদি চরিত্রদৃষ্টে কোন ব্যক্তিকে কামজিৎ, জিতক্রোধ, মহাভক্ত, মহাজ্ঞানী, নির্লোভ প্রভৃতি বলিয়া বুঝিবার তোমার সামর্থ্য না থাকে, তবে তোমার উচিত, নিভৃতে বসিয়া করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা, হে ভগবান, আমাকে সদসৎ বুঝিবার শক্তি দাও। অনেকে যে প্রতারিত হইয়া থাকেন; তাহার কারণ, সদ্‌গুরুকে যথাসাধ্য পরীক্ষা না করিয়াই সদ্‌গুরু বলিয়া স্থির করা। একবার যখন তুমি তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলে, তখন তুমি তাঁহার আজ্ঞা সর্বতোভাবে পালনে পরাঙ্মুখ হও কেন? তিনি কি কখনো তোমাকে অসৎ পথে লইয়া যাইতে পারেন? এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে, যাঁহারা কুলগুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া কোন উপকার পাইতেছেন না, তাঁহারা যদি ভগবানলাভে যথার্থ উৎসুক হন, তবে অনায়াসে সদ্‌গুরু অবলম্বন করিতে পারেন। যদি কাহারও সদ্‌গুরুকরণের পর তাঁহার দেহত্যাগ বা দূরদেশাবস্থিতি প্রভৃতি কারণে তাঁহার সঙ্গ না ঘটে, তবে তিনি গুরূপদিষ্ট সাধনপ্রণালী পরিত্যাগ না করিয়া আবশ্যক বোধ করিলে অপর কোন মহাপুরুষের নিকট শিক্ষা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন। কথিত আছে, অবধূত চব্বিশটি উপগুরু করিয়াছিলেন।

এক্ষণে এ-সম্বন্ধে শাস্ত্র কী বলেন, দেখা যাউক। শাস্ত্র লইয়া গুরু সম্বন্ধে বিস্তারিত বিচার করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিলে অপর কোন প্রবন্ধে এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত বিচার করিবার ইচ্ছা রহিল। সর্ব প্রমাণের মূল স্বরূপ শ্রুতি হইতে দুই-চারিটি কথা বলিব।

শ্রুতি বলিতেছেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।।"

তাঁহাকে জানিবার জন্য সমিধ অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদবিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে।

"আচার্যবান পুরুষো বেদ"—আচার্য যাঁহার আছে, তিনিই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। "আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা"—পরমাত্মার তত্ত্ব যিনি বলেন এবং যিনি শিক্ষা করেন, তাঁহাদের উভয়েরই অলৌকিক গুণশালী হওয়া আবশ্যক। "ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ"—হীন আচার্য কর্তৃক কথিত হইলে অনেক চিন্তা করিলেও ইঁহাকে সুন্দররূপে জানা যায় না। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"—যাঁহার পরমাত্মায় প্রগাঢ় ভক্তি, আর পরমাত্মায় যেরূপ ভক্তি, গুরুতেও তদ্রূপ, সেই মহাত্মার হৃদয়ে এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-কথিত তত্ত্বগুলি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিপ্রমাণ আছে।

তন্ত্রেও সদ্গুরু সম্বন্ধে অজস্র অজস্র প্রমাণ রহিয়াছে। ইহা প্রায় সকলেই জানেন। প্রকৃত গুরুর লক্ষণ, নিষিদ্ধ গুরুর বিচার প্রভৃতি বিষয়ে সুন্দর বিচার তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধবাহুল্য করিলাম না। তাহার সমুদয়গুলির সার তাৎপর্য এই যে, সদ্গুরু আশ্রয় করিয়া সাধনা করিলেই সিদ্ধি হইবে। এক আধটি প্রমাণে কুলগুরু যেরূপই হউন না কেন, তাঁহার নিকট দীক্ষা লও—ইহা দেখা যায় বটে, কিন্তু সেটি যে প্রকৃত গুরুগণের অবনতি হইবার পর স্বার্থপর গুরুগণের শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত বাক্য, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ধর্ম কোন সামাজিক ব্যাপার নহে; ইহাতে বাধ্যবাধকতা বা লৌকিকতা কিছুমাত্র নাই। কুলগুরু অর্থাৎ আমার পিতার যিনি গুরু হইয়াছিলেন, তিনি আমার সামাজিক সম্মানার্হ হইতে পারেন; তাঁহাকে আমার সামর্থ্য থাকিলে অর্থদানও যথাসাধ্য আমি করিতে পারি, কিন্তু যখন আমার প্রাণে, হে ঈশ্বর, তোমায় কিরূপে লাভ করিব, এই ব্যাকুলতা জাগরিত হয়, তখন আমি যেখানে সেই ব্যাকুলতার তৃপ্তি হইবে, তথা ব্যতীত আর কোথায় যাইব? যাঁহার নিকট পিপাসা মিটিতেছে, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোথায় জল অন্বেষণ করিব?

মহাপুরুষগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও বলেন, আমরা ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সমীপে তাঁহাদের দত্ত সাধনপ্রণালী দ্বারা শিক্ষিত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা পদে পদে উপদিষ্ট হইয়া, প্রতিপদে তাঁহাদের জীবনে পরীক্ষিত সত্যসকলের আলোকে উৎসাহিত হইয়া তবে এই অবস্থায় আসিয়াছি। তোমারও যদি

যথার্থই উন্নত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাকেও এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে বৈ কি। "সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে" ইহা সকল মহাপুরুষের মত। দেখা যায়, যেখানেই কোনরূপ অলৌকিক ধর্মবিকাশ হইয়াছে, তাহারই পশ্চাতে কোন এক মহাপুরুষ গুরুরূপে সহায় ছিলেন। লোকে চলিত কথায় বলিয়াও থাকে, এ ব্যক্তির গুরুবল আছে। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, ঈশ্বর আছেন, লোকে বলে, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু সদ্‌গুরু বলেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। শিষ্যকেও তিনি দেখিবার পথ দেখাইয়া দেন ও সেই পথে ধীরে ধীরে লইয়া যান। প্রকৃত গুরুর দর্শনমাত্রেই তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাঁহাকে দেখিলেই বোধহয়, তিনি কোন এক অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ পাইয়া তাহাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন ও দিন দিন আরো নিমগ্ন হইতেছেন। তাঁহার নিকট যাইবামাত্রই যেন সংসারের সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়—মনে যেন আর সংসারের লেশমাত্র থাকে না। তাঁহার পবিত্র স্পর্শে নিদ্রিত ব্রহ্মশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিলে সাধক চারিদিকে আনন্দের পাথার দেখিতে পান।

এহেন গুরুর জন্য শিষ্য কিনা করিতে পারে? তাঁহার প্রতি শিষ্যের কৃতজ্ঞতা হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? শাস্ত্রে গুরুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহা কি কখনো গুরুব্যবসায়ীর উপর হওয়া সম্ভব? পরন্তু ব্রহ্মবিদ্‌ পুরুষে সহজেই হইয়া থাকে। যাঁহারা মানুষে ব্রহ্মবুদ্ধি করা উচিত নয়, করিলে ঈশ্বরের অবমাননা হয়, এইরূপ বালসুলভ যুক্তির অবতারণা করিয়া ঘোর দ্বৈতজালে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টের মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান কল্পনা করিয়া গুরুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে একান্ত বিরত, তাঁহাদিগকে আমরা অদ্বৈত বেদান্ত একটু সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সাধনসম্পন্ন হইতে পরামর্শ দিই।

এই গুরু ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীস্টান, সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ—এসকল প্রশ্নই আসিতে পারে না। যিনি ব্রহ্মবিদ্‌, তিনিই গুরু, ব্রাহ্মণাদি উপাধি মাত্র।

আর অধিক কী বলিব? সংসারে অনেক গুরু দেখিয়াছি, তাঁহাদের নিকট উপদেশও লইয়াছি, কিন্তু কোন ফল ফলে নাই। তাহার কারণ, তাঁহাদের ভিতর ব্রহ্মবিদের কোন লক্ষণ নাই। তাঁহাদের সংসারাসক্তি যায় নাই। তাঁহাদের ভিতর বিবেক বৈরাগ্যের প্রভাব দেখি নাই। অন্ধের নিকট রাস্তা জিজ্ঞাসা যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ সাধারণ গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণও নিষ্ফল। তাঁহাদের সে-উপদেশের সঙ্গে সে-শক্তির সঞ্চার নাই। শুনিয়াছি ও বিশ্বাস করি যে, ব্রহ্মবিদ্‌ গুরু মন্ত্রের সঙ্গে এমন শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন যে, তাহাতে শিষ্যের নবজীবন লাভ হয়। সেইদিন হইতে তাহার নূতন বিশ্বাস, নূতন জীবন আরম্ভ হয়। সাধারণ গুরুর নিকট কত উপদেশ শুনিয়াছি, কিন্তু প্রাণে লাগে নাই। এবিষয়ে মহাপুরুষের নিকট একটি গল্প শুনিয়াছি, তাহা এই—

কোন রাজার একসময়ে সংসারের উপর বৈরাগ্য হয়। তিনি শুনিয়াছিলেন, পরীক্ষিৎ সাতদিন ভাগবত শুনিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিকটবর্তী

এক সুপণ্ডিতকে আনাইয়া ভাগবত শুনিতে আরম্ভ করিলেন। দুইমাস কাল নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়াও তাঁহার কিছুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইল না। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন: "পরীক্ষিতের সাতদিন মাত্র ভাগবত শুনিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছিল আর দুইমাস শ্রবণ করিয়াও আমার কোন কিছুই হইল না? ইহার উত্তর যদি আপনি কল্য না দিতে পারেন, তবে আপনি অর্থাদি কিছুই পাইবেন না।" ব্রাহ্মণ রাজার ঘোরতর অসন্তোষ আশঙ্কায় অতিশয় বিষণ্ণচিত্তে গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তর ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন তিনি অতিশয় কাতর হইয়া গালে হাত দিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার এক বুদ্ধিমতী পিতৃভক্তিপরায়ণা কন্যা ছিল। সে পিতাকে এইরূপ বিষণ্ণ দেখিয়া পুনঃপুনঃ কারণ জিজ্ঞাসা করাতে অগত্যা অপত্যস্নেহে বাধ্য হইয়া তাহাকে তাঁহার বিষাদের কারণ বলিতে হইল। কন্যা হাসিতে হাসিতে বলিল : "পিতা, আপনি কিছুমাত্র ভাবিবেন না, আমি কাল রাজাকে ইহার জবাব দিব।" পরদিন কন্যা সমভিব্যাহারে পণ্ডিতমহাশয় রাজসভায় উপস্থিত। বলিলেন : "আমার কন্যা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন।" কন্যা কহিল : "প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে আমি যাহা বলিব, আপনাকে তাহা শুনিতে হইবে।" রাজা স্বীকৃত হইলে ব্রাহ্মণকন্যা প্রহরীদিগকে বলিল : "একটি থামে আমাকে ও অপর থামে রাজাকে বাঁধ।" রাজার আদেশে প্রহরীরা তাহাই করিল। তখন কন্যা রাজাকে বলিল : "রাজন! আপনি আমার বন্ধন শীঘ্র মোচন করিয়া দিন।" রাজা বলিল : "একি অসম্ভব কথা বলিতেছ! আমি নিজে বদ্ধ, তোমার বন্ধন কিরূপে মোচন করিব?" তখন কন্যা হাসিয়া বলিল : "রাজন! এই আপনার প্রশ্নের উত্তর। রাজা পরীক্ষিৎ মুমুক্ষু শ্রোতা আর বক্তা সাক্ষাৎ শুকদেব, যিনি সর্বত্যাগী, ব্রহ্মপরায়ণ, মহাজ্ঞানী। তাঁহার নিকট ভাগবত শুনিয়া রাজা পরীক্ষিতের জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। আর আমার পিতা নিজে সংসারাসক্ত, অর্থের লোভে আপনার নিকট শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মুখে শুনিয়া আপনার কিরূপে জ্ঞানলাভ হইবে?"

এই উপদেশপূর্ণ গল্পটি দ্বারা বুঝা যাইতেছে, সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত কখনো বন্ধন মোচন হইবার সম্ভাবনা নাই।

এ-প্রসঙ্গে আর দুইটি কথা সচরাচর শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন, শিষ্য যেরকমই হউক না কেন, সদ্‌গুরু লাভ হইলে তাহার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। আবার কেহ বলেন, গুরু যেরূপই হউন না কেন, শিষ্যের বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এদুটি কথাই আমরা একেবারে অস্বীকার করি না। তবে বাস্তবিক পক্ষে জগতে এরূপ ঘটনা কদাচিৎ হইয়া থাকে। সাধারণত গুরু শিষ্য উভয়েরই উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। দেখা যায়, একই মহাপুরুষের শিষ্যগণের ভিতর কত তারতম্য হইয়া থাকে। ইহা শিষ্যের যোগ্যতা অনুসারেই হইয়া থাকে। শিষ্য যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বিনয়ী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়, তবে সে অতি সহজেই গুরূপদিষ্ট তত্ত্ব সমুদয় আয়ত্ত করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রাদিতে যেরূপ গুরু শিষ্যের সম্বন্ধের কথা পড়া যায়, তাহাতে বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শিষ্যের যেসকল কর্তব্য নির্দিষ্ট

হইয়াছে, তাহাতে শিষ্যের শরীর মন প্রভৃতি এমন শিক্ষিত (Disciplined) হয় যে, সে একটি মানুষ হয়।

আমাদের দেশে এখন সে গুরুভক্তি একেবারে নাই বলিলেই হয়। অনেকে আবার এই গুরুভক্তিকে তুলিয়া দিবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর। যদি দেশ হইতে এই গুরুভক্তি উঠিয়া যায়, তবে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি অন্তর্হিত হইবে। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার সমাজে রাজত্ব করিতে থাকিবে। গুরুকরণ করিবার পূর্বে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পার, কিন্তু একবার তাঁহাকে গ্রহণ করিলে মনকে এমনভাবে গঠিত করিতে হইবে যে, তাঁহার কথায় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিতে পার। অনেকে মনে করেন, গুরুর উপর এইরূপ নির্ভর করিলে আমাদের মনের স্বাধীনতা একেবারে লোপ পাইবে ও আমরা ক্রমশ জড়পিণ্ডে পরিণত হইব। এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। বাস্তবিক সদ্‌গুরু কখনো কাহারো মনের স্বাধীনতা হরণ করেন না, বরং যাহাতে তাহার মনের স্বাধীনতা লাভ হয়, যাহাতে সে আপন পায়ে আপনি দাঁড়াইতে পারে, যাহাতে সে ইন্দ্রিয়ের বন্ধন, মনের বন্ধন, পরিবারের বন্ধন, সমাজের বন্ধন সব কাটাইয়া মুক্ত-বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ করিতে পারে, তাহাই শিক্ষা দেন। লোকে সামান্য একটু অর্থ কিংবা দৈহিক কোন উপহার পাইয়া লোকের প্রতি কত কৃতজ্ঞ হয়। তবে যাঁহার নিকট তুমি জীবনের সারতত্ত্ব, শ্রেষ্ঠ পদার্থলাভের সন্ধান ও তল্লাভে ক্রমাগত সহায়তা পাইয়াছ, তাঁহার নিকট সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে কেন এত অন্যায় মনে কর? হিন্দুর ন্যায় কৃতজ্ঞ জাতি আর নাই। হিন্দু যেদিন গুরুভক্তি ভুলিবে, সেদিন আর হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না। মহাভারতের সেই গুরুভক্ত উপমন্যুর কথা স্মরণ কর। সেই গুরুভক্তি, সেই অটল শ্রদ্ধা; গুরুবাক্যে সেই অপার বিশ্বাস একদিন ভারতকে শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত করিয়াছিল। যদি কখনো ভারতের আবার উন্নতি হয়, তবে এই গুরুভক্তি সহায়ে হইবে, গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞানে হইবে, কল্পনার ঈশ্বর নহে, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। তাঁহার নিকট প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত হইলে তবে আমরা আবার মহৎ মহৎ কর্ম করিতে সক্ষম হইব। শুধু নিজের মুক্তি সাধন করিতে কৃতকার্য হইব, তাহা নহে, দেশের জন্য, স্বজাতির জন্যও কিছু করিয়া যাইতে সমর্থ হইব।* □

* ৫ বর্ষ, ৫ সংখ্যা

ধর্ম

স্বামী প্রেমানন্দ

ধর্মের কথা মুখে বললে কোন ফল হয় না—কাজে করতে হয়—জীবন দিয়ে করতে হয়। জড় ও চৈতন্যে এই প্রভেদ। জড় যেন কল—তাতে যা জুড়ে দেবে, তাই হবে। তেমনি আমাদেরও শাস্ত্রের কথা শুধু মুখে বললে ধর্ম হয় না; যার ভিতরে উপলব্ধি আছে, তারই ধর্ম হয়; যার ভিতরে ধর্মের বীজ আছে, তারই ক্রমে ধর্মের বিকাশ হয়। যেমন বটের বীজ যেকোন জায়গায় পড়ে থাকলে ক্রমে তা হতে গাছ হয়, তেমনি আমাদের ভিতর কিছু থাকা চাই; তা ক্রমে উপলব্ধি করতে হবে—তদ্ভাবভাবিত হতে হবে। নইলে কেবল কতকগুলি কথা শুনে, মুখস্থ করে বললে ধার্মিক হওয়া যায় না—পণ্ডিত হওয়া যেতে পারে। শাঙ্কর ভাষ্য মুখস্থ করে লোকে পণ্ডিত হতে পারে—ধার্মিক হতে পারে না। পরমহংসদেব বলতেন ঃ "পণ্ডিতরা যেন চিল শকুনি—খুব উপরে উঠে, কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ে। তেমনি পণ্ডিতরা অনেক শাস্ত্র পড়ে খুব লম্বা-চওড়া কথা বলে, কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ে—কামিনীকাঞ্চনে।" ধার্মিক হতে হলে প্রথম দরকার সত্য ধারণা—প্রাণান্তেও সত্যত্যাগ করবে না। যাঁর সত্যনিষ্ঠা আছে, তাঁর কাছে সত্যস্বরূপ ভগবান বাঁধা। সত্যধারণা না থাকলে কিছুই হবে না—সত্যবাক্য, সত্যসঙ্কল্প, সত্যচিন্তা—এ না থাকলে কিছুই নয়। প্রাণপণ করে এই সত্য প্রতিপালন করবে। সত্যের জয় ত্রিকালে; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে সত্যের জয়। ধর্মের কথা সবাই জানে; কিন্তু কে তা পালন করে বলুন! যে সত্য পালন করবে, তারই হবে। অনেকে বলে থাকেন—ব্যবসা বাণিজ্যে সত্য চলে না। এটি আমি মানি না। সত্য যেখানে আছে, সেখানে ভগবান স্বয়ং থাকেন। বিষয়ী গৃহী যদি সত্য রাখেন, তিনি ধার্মিকের অগ্রগণ্য হবেন—তাঁর ব্যবসায়েও উন্নতি হবে। একটি গল্প শুনুন। নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামের দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় খুব সত্যপরায়ণ ছিলেন। একদিন বাজারে গিয়ে মাছের দাম জিজ্ঞাসা করায় মাছওয়ালি বললে ঃ "চার আনা।" তিনি নিজে সত্যবাদী, তাই মাছওয়ালিও মিথ্যা বলে নাই এই বিশ্বাসে আর দর না করে তিনি ঐ দাম দিয়েই মাছটি কিনলেন। একটি লোক তাই দেখে মনে করলে, "এ কেমন লোক? একবারও মাছের দর করলে না!" পরে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলে, ইনিই সাধু নাগমহাশয়; এঁর বিশ্বাস—কেউ ঠকায় না। সেই লোকটি তখন মেছুনিকে বললে ঃ "তুই কেমন লোক! আমরাও তো মাছের দর জানি! এই সাধুর নিকট হতে তুই ডবল দাম নিলি?" মেছুনির ঐকথা মনে লাগল। পরদিন নাগমহাশয় বাজারে গিয়ে একটা মাছের দাম করলেন। সে তখন পাঁচ আনার মাছটার দাম চাইলে দু-আনা। তখন নাগমহাশয় হাতজোড়

করে বললেন ঃ "আমায় কেন বঞ্চনা করছেন, কেন বঞ্চনা করছেন? এর দাম বেশি। ঠিক দাম নিন, ঠিক দাম নিন।" তখন মেছুনি বুঝলে—ইনি সাধারণ লোক নন; তখন তাঁর পায়ে ধরে কান্না। তাই সত্যের কারবারে লোকসান নাই। যদি সত্য থাকে, তবে সকল কল্যাণ হবে—ঐহিক, পারমার্থিক সব হবে।

সত্যের পর সংযম চাই। সত্য যেন Foundation—ভিত্তি—তা হতে সব হয়—সংযম আসে। সত্য থাকলে কলমির দল টানলে যেমন সব দলটা চলে আসে, তেমনি সব আসবে। আমরা কিন্তু এই সত্যটি হারিয়েছি—তাই এই দুর্দশা। এত ভুগেও সত্য হারিয়েই এই অবনতি। যাতে এটি আসে, তার চেষ্টা থাকা দরকার—বালকের বিশেষ—যুবা ও বৃদ্ধদেরও দরকার। কথায় হবে না—কাজে দেখাতে হবে—মন, মুখ—ভেতর, বার—এক করতে হবে। যাকে সাধন-ভজন বলি, তার মূলতত্ত্ব মন মুখ এক করা—ভেতর বার এক হয়ে যাওয়া। আমাদের এটি নেই—ভেতরে এক, বাইরে আর। এটাই মোহ, এটাই অবিদ্যা। যিনি ধার্মিক হতে চান, তিনি মুখে কথা কইবেন না—কাজে কথা কইবেন। তাঁর উপর ভগবান প্রসন্ন, তাঁর ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ নিশ্চিত।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ "নিষ্কাম কর্ম কর, জীবন্মুক্ত হয়ে যাও।" নাগমহাশয় দেখিয়েছেন—এই জীবনেই জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। আমরা এরূপ জীবন প্রত্যক্ষ দেখেছি। আমাদের এই মুক্ত ভাব এ জীবনেই লাভ করতে হবে—প্রাণ দিয়ে—জীবন দিয়ে এই জীবন্মুক্তি লাভ করতে হবে। তা নইলে এই যে লম্বা-চওড়া কথা—ভক্তি—শুদ্ধাভক্তি—আসবে না। জীবন্মুক্ত না হতে পারলে এই ভক্তি আসবে না। আমরা যাই করি না কেন, সকলে সাহস করে বলুন—"আমরা জীবন্মুক্ত হয়ে যাব।" ডুব দিতে হবে, প্রাণ দিতে হবে, নইলে হবে না। মুখের কথা নয়। অনেকে শুনতে চান ভক্তির কথা। শুনতে মজা, কিন্তু কাজে করতে প্রাণ যায়। একজনের খুব ইচ্ছা—প্রেমিক হবে। এখন ধামা মাথায় করে আরেকজন রাস্তা দিয়ে ডেকে যাচ্ছে ঃ "ওগো, কেউ প্রেম নেবে?" তখন ছেলেরা বলছে ঃ "আমরা প্রেম খাব।" যুবারা বলছে ঃ "আমরা প্রেম কিনব।" তখন ফেরিওয়ালা ধামা নামিয়ে বলছে ঃ "কতটুকু প্রেম নেবে? আমি ওজন করে বিক্রি করি। কতটুকু চাই? এক সের?" এই বলে একখানি শাণিত অস্ত্র খুলে বলছে ঃ "তোমার মুণ্ডটা কেটে আন, তার ওজনে প্রেম দিব।" তাই বলি প্রেম নিতে হলে মুণ্ড বলি দিতে হবে। ধার্মিক হওয়া কি কথার কথা? প্রাণ দিতে হয়। শ্রীমতী রাধারানীর কথা শোনেননি? জীবন, মন, লজ্জা, ঘৃণা, কুল, মান—সব দিয়েছিলেন। তেমন জীবন দেখেছি। তাই বলছি, পরমহংসদেব, স্বামীজী, নাগমহাশয়—সাক্ষাৎ জনক। আপনারা যদি ধর্ম চান, তবে এঁদের অনুসরণ করুন। নইলে স্ত্রী, পুত্র, ব্যবসা, বাণিজ্য, সব থাকবে, অথচ ধর্ম চাই—তা হবে না। সব দিতে হবে, তবে ধর্ম হবে।* □

* ১৬ বর্ষ, ৭ সংখ্যা

বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম*

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাংলাদেশের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলায় যে বহু পূর্বকালে, এমনকি আর্যগণের পাঞ্জাবে আসিবার বহু পূর্বেও সভ্যজাতির বাস ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে অতি প্রাচীনকালে মানুষে হাতি পোষ মানাইয়াছে। রামায়ণে বল, মহাভারতে বল, বৌদ্ধ ত্রিপিটকে বল, জাতকে বল, জৈন অঙ্গ গ্রন্থে বল, সব জায়গায় পোষা হাতির কথা শুনা যায়। কিন্তু এই পোষ-মানানোটি বাংলাদেশের লোকেরই কাজ ছিল। যাহারা পোষ মানাইত তাহারা দীর্ঘকায়, কৃশ অথচ বলিষ্ঠ এবং স্বর্ণবর্ণ ছিল। তাহারা ঝাঁকড়া চুল রাখিত, চামড়া পরিত এবং হাতির সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের উপর হইতে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত গমনাগমন করিত। সে-জাতি এখন কোথায় গেল বলিতে পারা যায় না। তবে তাহারা হাতি পোষ মানাইয়া পৃথিবীর একটি বড় উপকার করিয়া গিয়াছে।

ঋগ্বেদে বাংলাদেশের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে তিনটি জাতির নাম পাওয়া যায়। এখানে জাতি শব্দের অর্থ ইংরেজীতে যাহাকে Caste বলে তাহা নহে, কিন্তু Ethnic race। একটির নাম বঙ্গ, একটির নাম বগধ এবং আরেকটির নাম চের। দ্রাবিড় জাতির সাধারণ নাম চের। একথা কেহ কেহ অস্বীকার করিলেও চেররা দ্রাবিড় জাতির যে একটা খুব বড় অংশ ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছোটনাগপুরে অনেক অর্ধসভ্যজাতি আপনাদিগকে চেরদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা বলিয়া থাকে, রোটাসগড়ের নিকটবর্তী স্থান হইতে তাহারা ছোটনাগপুরে আসিয়াছিল; কিন্তু কতকাল পূর্বে, সেকথা তাহারা বলিতে পারে না। কোন কোন Anthropologist বলেন, বঙ্গ বা বং নামে এক দ্রাবিড় জাতি বাংলাদেশে বাস করিত। বগধ জাতি এখনো বাংলাদেশে আছে। রাঢ়ের বাগদীরাই তাহাদের বংশধর। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, উহারা আপনাদের ভিতরে যে-ভাষায় কথাবার্তা কয়—তাহা বাঙলা নয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রমুখ ভদ্রজাতিরা সে-ভাষা কিছুই জানেন না। আবার অনেকে মনে করেন যে, মগধ ও বগধ একই জাতি, অথবা, এক জাতিরই দুই শাখা মাত্র। মগধের কথা কোন কোন বেদে শুনিতে পাওয়া যায়। তথায় বাস করিলে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হইত।

এতদ্ভিন্ন উত্তরবঙ্গে কিরাত, পৌণ্ড্র এবং কৈবর্ত—এই তিনটি জাতি ছিল। বেদের আর্যগণ এই তিনজাতিকে দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিতেন। অর্থাৎ তাহারা আর্যদিগের শত্রু ছিল। কিরাতেরা এখন দার্জিলিং ও কাঠমাণ্ডুর মধ্যে পর্বতময় দেশে বাস করে। নেপালীরা তাহাদিগকে 'কিরান্তী' বলে। মালদহের পুঁড়রা পৌণ্ড্রগণের বংশ। উহাদের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন অতি প্রাচীনকাল হইতে

---

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত বুদ্ধোৎসব সভায় পঠিত।

উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান নগর ছিল। কৈবর্তরা উত্তরবঙ্গে খুব প্রবল ছিল। বল্লাল সেন কৈবর্তদিগকে ভাগ করিয়া একদলকে উত্তরবঙ্গে রাখেন এবং আরেক দলকে উড়িষ্যার প্রান্তদেশে বাস করান। এখনো ঐ দুই স্থলে কৈবর্তের সংখ্যা অধিক। সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় বাংলায় যত জাতি (Caste) আছে তাহাদের মধ্যে কৈবর্তের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক।

বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পূর্বেও বাংলায় এইসকল জাতি বাস করিত। ইহারা কতক পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল; কারণ, জৈনদিগের প্রায় সকল তীর্থঙ্করই বাংলাদেশে বিশেষত রাঢ়ে বহুদিন বাস, তপস্যা, সিদ্ধিলাভপূর্বক আপন আপন ধর্মের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জৈন যতিদিগের অনেক আচার-ব্যবহার, বিশেষত তাহাদিগের পোষাক-পরিচ্ছদ বাঙালীদিগের মতো; বৌদ্ধ যতিদিগেরও তাহাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মদুইটি সাংখ্যদর্শনের ফলে বাহির হইয়াছে। আবার, আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্তক কপিলের আশ্রম বাংলাতেই ছিল। খুলনা জেলায় এখনো 'কপিল মুনি' বলে একটি স্থান আছে। গঙ্গাসাগরের নিকট কপিলের অন্য একটি আশ্রমও আছে। বুদ্ধদেব যে প্রথম প্রথম সাংখ্য পণ্ডিতদিগেরই চেলা হইয়াছিলেন একথা অশ্বঘোষ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কপিলের মতের উপর বুদ্ধদেব কোন্ কোন্ বিষয় নূতন প্রবর্তিত করিয়া নিজ মতের উন্নতি বিধান করিয়াছেন তাহাও অশ্বঘোষ দেখাইয়া গিয়াছেন। কপিল দ্বৈতবাদী ছিলেন কিন্তু বৈদিক ঋষিরা সকলেই প্রায় অদ্বৈতবাদী। শঙ্করাচার্য সাংখ্যকে 'অশিষ্ট' বলিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি মনে করিতেন উহা একটা বেদবহির্ভূত মত। তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সাংখ্যমত নিরাকরণে আমার প্রয়োজন নাই। তবে যে যত্ন করিয়া আমি উহার নিরাকরণ করিতেছি তাহার কারণ, মনু প্রভৃতি কয়েকজন 'শিষ্ট' এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনেকের ইহাকে শিষ্ট বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, এজন্য নিরাকরণ করা আবশ্যক। শঙ্করাচার্যের কয়েক শতাব্দী পরে হেমাদ্রি সাংখ্য ও কাপিল-মতে ভেদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা সাংখ্যশাস্ত্রে পারদর্শী তাহাদের স্থান অতি উচ্চে এবং যাঁহারা কাপিলমতে পারদর্শী তাহাদের স্থান অতি নীচ। এমনকি ব্রাহ্মণদের সহিত কাপিলদের এক পংক্তিতে বসাও উচিত নহে। বাঙালীদের উপর আর্য ঋষিদিগের এবং তাহাদের বংশধরদিগের অনুগ্রহ বড়ই বেশি। তাঁহারা বলেন, তীর্থযাত্রা ভিন্ন বঙ্গদেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হেমাদ্রি লিখিয়াছেন শ্রাদ্ধের পংক্তিতে বাঙালীকে বসিতে দিবে না। এইসকল ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, বাংলাদেশ আর্যদের দেশ ছিল না। তবে বাংলায় ব্রাহ্মণ কবে আসিল? তাম্রশাসন বা পাথরের লেখা না দেখিলে যাঁহারা কিছুই বিশ্বাস করিতে রাজি হন না তাঁহাদের উপকারার্থ এইকথা বলিতে পারা যায় যে, খ্রীস্টীয় ৪৩৬ সালে মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের অধিকারকালে রাজসাহী অঞ্চলে একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হয়। ইহার একশত বা দেড়শত বৎসর পরে ফরিদপুরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ কিছু কিছু জমিজমা লইয়া বাস করে; এটাও তাম্রশাসনের কথা। তবে কোন কোন পণ্ডিত এই তাম্রশাসনগুলিকে জাল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। জাল হইলেও ১০।১২শত বৎসরের পূর্বে ঐ জাল প্রস্তুত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বাংলায় ঐকালে ব্রাহ্মণের

বাসের সম্বন্ধে যে উহা প্রমাণ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চ ব্রাহ্মণের বাংলায় আসা আদিশূরের সময়ে ঘটে। আদিশূরের কোন তাম্রশাসন পাওয়া যায় না—সুতরাং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকদিগের মতে আদিশূরের নামে কোন রাজা থাকাই সম্ভবপর নয়। অতটা বিজ্ঞান কিন্তু সংসারে চলে না। আদিশূর রাজা থাকুন আর নাই থাকুন, কিন্তু পাঁচজন ব্রাহ্মণ যে এককালে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণী হইয়া উঠিয়াছেন, একথা সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। তবে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, সেটা কোন্ কালে? প্রাচীন ঘটকের পুঁথিতে বলে, ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খ্রীস্টাব্দে তাঁহারা বাংলায় আসেন একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; কারণ, তখন সমগ্র ভারতব্যাপী একটা ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। কুমারিল ভট্ট মীমাংসা সূত্রের শবর-ভাষ্যের এক টীকা লিখিয়া পুনরায় বৈদিকধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। মহাকবি ভবভূতি তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। তিনি তখন কনৌজের ব্রাহ্মণগণের নেতা। কনৌজ তখন একজন প্রবল পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী মহারাজার রাজধানী। সুতরাং সেখান হইতে যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আসিয়া অব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচার করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণেরা বাংলায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এদেশে সাতশত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। কিন্তু তাঁহারা নামেই ব্রাহ্মণ, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কিছু জানেন না। তাঁহাদিগের ঐকথাও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কেন না ইতিপূর্বে তাম্রশাসন হইতে দেখাইয়াছি যে, বাংলায় ঐকালে ব্রাহ্মণ বাস করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

কিন্তু সাতশত ঘর অকর্মঠ ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ ঘর কর্মঠ ব্রাহ্মণ লইয়া কিছু বাংলাদেশ হয় না। সুতরাং এদেশে অন্য ধর্মও ছিল এবং সে-ধর্মের প্রবল একটা যাজককুলও ছিল। হিউয়েন সাঙ্ ৬২৯ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে থাকিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাংলাদেশে তখন একলক্ষেরও অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘারামে বা বিহারে বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী ভিক্ষুরাও ছিলেন—অর্থাৎ জৈন প্রভৃতি ধর্মের ভিক্ষুরাও ছিলেন। ভিক্ষুরা রোজগার করিয়া খান না, ভিক্ষা করিয়া খান। তিন বাড়িতে ভিক্ষা পাইলে চতুর্থ বাড়িতে যাইবার তাঁহাদের নিয়ম ছিল না। আবার একবার যে-বাড়িতে ভিক্ষা পাইয়াছেন, একমাসের ভিতরে সে-বাড়িতে পুনরায় আসিতে পারিবেন না, ইহাও তাঁহাদের নিয়ম ছিল। সুতরাং একটি যতিকে প্রতিপালন করিতে হইলে অন্তত একশত ঘর গৃহস্থ বৌদ্ধ থাকা চাই। অতএব লক্ষাধিক ভিক্ষু প্রতিপালনের জন্য অন্তত এক কোটি বৌদ্ধ গৃহস্থ থাকা চাই। ছিলও তাহাই—দেশটা বৌদ্ধধর্মে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধেরা তখন গ্রাহ্যই করিতেন না। অন্য ধর্মাবলম্বীদিগকে তাঁহারা তখন বেশ দাবাইয়া রাখিতে পারিতেন।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম কবে আরম্ভ হয় তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের যাহা মূল স্থান, বাংলা তাহার অতি সন্নিকট। ইহাতে বোধ হয় যে, বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেই এই দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। তিনি নির্বাণের দিনে নিজেই বলিয়া গিয়াছেনঃ "বাংলার রাজকুমার বিজয় আজ সিংহলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিংহলে আমার ধর্ম চিরস্থায়ী হইবে।" সুতরাং বুদ্ধদেবের জীবিতকালে শুধু যে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার হইয়াছিল এমত

নহে, কিন্তু বাংলাদেশ হইতে অন্য দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকও যাইতেছিল।

বাংলাদেশে খুব বড় বড় দুইটি নগর ছিল—একটি পৌণ্ড্রবর্ধন এবং আরেকটি তাম্রলিপ্তি, প্রাচীন নাম দামলিপ্তি অর্থাৎ তামিলদিগের শহর। ভ্রাতা বীতাশোক পাছে মগধ সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করে এইজন্য অশোক তাহাকে বৌদ্ধভিক্ষু করিয়া পৌণ্ড্রবর্ধনের এক বিহারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সুতরাং সেখানেও পূর্ব হইতেই বিহার ছিল। তাম্রলিপ্তি বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। তাহারা এখান হইতে অন্যান্য দেশে বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার করিতে যাইতেন। এই বন্দর দিয়াই অশোক রাজা তাঁহার ছেলে ও মেয়েকে বোধিবৃক্ষের এক ডাল দিয়া সিংহল দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সে-ডালটি এখন দুই-তিন মাইল-ব্যাপী অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং হিউয়েন সাঙের পূর্বে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের কতদূর প্রচার হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেল। যেসকল জাতি বাংলায় বাস করিত—কিরাত, পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, বঙ্গ, বগধ সকলেই বৌদ্ধ হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধদের একটা দোষ ছিল—পশুহত্যা যাহাদের ব্যবসায় ও জীবিকা তাহাদিগকে তাঁহারা শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন না। কিন্তু যাহারা ঐরূপ জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সুব্যবসায় গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে দিতেন। সেইজন্যই বাংলায় হেলে-কৈবর্ত ও জেলে-কৈবর্ত বলিয়া দুইটি জাতি হইয়াছিল। একদলে বৌদ্ধ দীক্ষা পাইত আরেকদল পাইত না। কিন্তু দীক্ষা পাইত না বলিয়া তাহারা যে বৌদ্ধ ছিল না একথা যেন কেহ মনে না করেন। কারণ শিক্ষা-দীক্ষা না পাইলেও কেবলমাত্র 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি', 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি', 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' বলিলেই তাহারা বৌদ্ধ হইতে পারিত অর্থাৎ ভিক্ষু মহাশয়েরা তাহাদিগকে কোনরূপ শিক্ষা-দীক্ষা না দিয়াও তাহাদিগের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন।

এখন যাহারা হিন্দুধর্মের ও ব্রাহ্মণদের প্রধান ভক্ত তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই তখন বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধদের যেসকল সংস্কৃত গ্রন্থ আছে—তাহাদের গ্রন্থকার অনেকেই কায়স্থ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আচার্য, উপাধ্যায়, ভদন্ত, ভিক্ষু, পিণ্ডপাতিক এবং মহোপাধ্যায় প্রভৃতি নামে ভূষিত হইতেন।

গুপ্ত উপাধিধারী বহুসংখ্যক লোকে বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে রামপাল রাজার সময় অভয়াকর গুপ্ত একজন পরম পণ্ডিত এবং প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধেরা তখন কোন ব্রাহ্মণকে আপনাদের দলে টানিতে পারিলে বড়ই আনন্দিত হইত। কেননা তাহা হইলে তাহাদের সংস্কৃত পুস্তক লিখাইবার বড়ই সুবিধা হইত। এখন নেপালে অবিবাহিত ভিক্ষু নাই। ভিক্ষুরা সকলেই বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপাদন করে এবং নামেমাত্র ভিক্ষু হয়। তথাপি যদি একজন ব্রাহ্মণের ছেলে পায় তবে এখনো তাহারা অত্যন্ত আদরের সহিত তাহাকে ভিক্ষু করিয়া লয়। ঐরূপ হইবার কারণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষু ও অন্য জাতি ভিক্ষুর মধ্যে একটি তফাত ছিল—ব্রাহ্মণেরা সুশব্দবাদী হইত অর্থাৎ ব্যাকরণ দুরস্ত করিয়া সংস্কৃত লিখিত কিন্তু অব্রাহ্মণ বৌদ্ধেরা একেবারেই সুশব্দবাদী ছিলেন না, ব্যাকরণের ধারও ধারিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, আমরা দেখিব কেবল অর্থশরণতা অর্থাৎ অর্থটি যাহাতে প্রকাশ হয় অর্থাৎ এখানকার নৈয়ায়িকদের যেমন মত ছিল "অস্মাকানাং নৈয়ায়িকানাং অর্থনি তাৎপর্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা।" সে যাহা হউক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম ছিল। গুপ্ত

উপাধিধারী প্রভাকর গুপ্ত একজন ভারী বিচারমল্ল ছিলেন। তিনি শুভাকর গুপ্তের মত প্রচার করিতেন, সর্ববাদী প্রমথনে শুভাকর সিংহস্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে শুভাকর গুপ্তের দ্বারা একখানা বৌদ্ধদের স্মৃতির গ্রন্থ লেখান। তাহার কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। কর উপাধিধারী অনেকেও বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কয়েকজন তৈলিকপাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বণিকদের তো কথাই নাই। ইঁহারাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ও বিহারের অনেক খরচ চালাইতেন। তদ্ভিন্ন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন, মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেন ও পুস্তক লিখিয়া মঠকে দান করিতেন। ঐরূপে সকল জাতির লোকেই তখন বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মাছ মারিয়া খায় যে-কৈবর্ত সেও বাদ যায় নাই। পাল রাজারা তো বৌদ্ধ ছিলেনই। তাঁহাদের অধীন যত ছোট ছোট রাজা ছিলেন তাঁহারাও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে মানতের বেলা তাঁহারা কোন ধর্মই বাছিতেন না। রোগ শান্তি, ভূত শান্তি, যুদ্ধে জয়-পরাজয় এইসকলের জন্য সবরকমের দেবতার মানত করিতেন, মহাভারতের পাঠ শুনিতেন, ব্রাহ্মণদের বাড়ি যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতেন, হোমের ফোঁটা লইতেন, ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিতেন, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতেন। অথচ তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন। কারণ, ঐসঙ্গে সকালে উঠিয়া তাঁহারা 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি' 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' বলিতেন, সঙ্ঘ-ভোজন করাইতেন, সম্যক সম্ভোজন[১] করাইতেন, স্তূপ নির্মাণ করাইতেন, বিহার নির্মাণ করাইতেন, বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করাইতেন এবং নানাবিধ বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করাইতেন।

বৌদ্ধধর্ম তো শুধু শীল ও বিনয় লইয়া—তাহার মধ্যে দেবদেবীর মূর্তি কোথা হইতে আসিল? ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে এখনো দেবদেবীর প্রাদুর্ভাব তত নাই। কিন্তু বাংলায় খুব ছিল। যাহারা বাংলা হইতে বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছে তাহাদের মধ্যেও খুব আছে। যাহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের দেবদেবীর কথা শুনিলে আশ্চর্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক মহাযান মতে অনেক দেবদেবী আসিয়া জুটিয়াছিল। মহাযান মতটা বড়ই দার্শনিক মত কিনা—একেবারে সাংখ্যবাদ ভাঙিয়া অদ্বয়বাদে উপস্থিত কিনা—তাই উহাতেই দেবদেবী সকলেরা আগেই আসিয়া জুটিলেন। বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ—মহাযান মতে এই তিনটি জিনিস সূক্ষ্ম হইয়া দাঁড়াইল প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ হইলেন উপায়, ধর্ম হইলেন প্রজ্ঞা এবং সঙ্ঘ হইলেন বোধিসত্ত্ব। দেখিতে দেখিতে প্রজ্ঞা ঠাকুরানী বুদ্ধের শক্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; কারণ, উপায় পুংলিঙ্গ এবং প্রজ্ঞা স্ত্রীলিঙ্গ। উভয়ের সংযোগে বোধিসত্ত্বের উৎপত্তি হইল। প্রজ্ঞা নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়, উপায়ও নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চলে না। একটা সকাম সক্রিয় শক্তির দরকার—তিনি হইলেন বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ ও ধর্মের অপেক্ষা বোধিসত্ত্বের পূজা বেশি বেশি হইতে লাগিল। কারণ, নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়ের উপাসনা করিয়া কী হইবে? সুতরাং সকাম সক্রিয় শক্তির উপাসনা হইতে লাগিল—অনেকগুলি বোধিসত্ত্ব ঠাকুর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর প্রধান। বর্তমান কল্পের ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁহার শক্তি পাণ্ডুরা ইঁহাদের দুইজনের সংযোগে উৎপন্ন অবলোকিতেশ্বর—বর্তমান কল্পের প্রধান দেবতা। তাঁহার অনেক মূর্তি, অনেক মস্তক, অনেক হস্ত, অনেক পদ, অনেক নাম, অনেক মন্দির। তাঁহার ভক্তের সংখ্যাও অনেক

বেশি। কারণ এই কল্পে কাহাকেও বুদ্ধ হইতে হইলে তাঁহার কৃপা ভিন্ন হইবার যো নাই। যাহা হউক, বুদ্ধাদির মূর্তিপূজা প্রচলিত হইবার সময় একটা বড় মুস্কিল হইল—কারণ, এখন হইতে শক্তির সহিত জড়িত বুদ্ধমূর্তির উপাসনা আরম্ভ হইল। সুতরাং আমরা অর্থাৎ অভক্তেরা যাহাকে অশ্লীল বলি, সেই অশ্লীল মূর্তিসমূহেরও পূজা হইতে লাগিল। ঐ মূর্তির যে কত বিচিত্র ভঙ্গি আছে তাহা এখনকার লোকে কল্পনা করিতেই পারে না। অনেকে ইহাকে Tantric Buddhism বলেন। তন্ত্রে শিবশক্তি পূজা, যুগলাদ্য মূর্তির উপাসনা—এখানেও বুদ্ধ ও তাঁহার শক্তিপূজা, যুগলাদ্য মূর্তির উপাসনা। সুতরাং এই উপাসনারও নাম হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধোপাসনা। বৌদ্ধধর্মে গোড়ায় যে কঠোরতা, কাঠিন্য ছিল এখন তাহা বেশ সরস হইয়া উঠিল। উহাতে লোকেরও মন ভিজিল। লোকে সহজে নির্বাণের পথ পাইল—ইহারই নাম সহজিয়া ধর্ম। সহজিয়া ধর্মের অর্থ ভগবান বুদ্ধ যখন সহজভাবে থাকেন। যখন তিনি শক্তির সহিত মিলিত, অথচ শক্তির সন্তানসম্ভাবনা উপস্থিত হয় নাই। এইসময় ভগবানের কাছে যাহা বর চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। এইসময়েই তাঁহার করুণার পরমা স্ফূর্তি। সুতরাং ভক্তের পক্ষেও উপাসনার এই প্রশস্ত সময়। এই যে সরস মধুরভাব, ইহা ক্রমে অন্য অন্য ধর্মেও ছড়াইয়া পড়িল। বৈষ্ণবের যুগল মিলনও এই সহজরূপেরই রূপান্তর মাত্র; তবে বৈষ্ণবের সহজিয়া ও বৌদ্ধের সহজিয়া মতে একটু তফাত আছে। বৌদ্ধের সহজিয়া সম্পূর্ণভাবেই রূপক, এবং ঐ রূপক আপনাকে দিয়াও ফলাইতে পারা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবের সহজিয়া ঠাকুর ঠাকুরানীর সহজিয়া—তাহাতে একটু ভক্তিরস থাকে। নিজের দেহের উপর উহার experiment চলে না।

এই যে দেশব্যাপী বৌদ্ধধর্ম, ইহা এখন কোথায় গেল? যখন সহজিয়া ধর্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবে বাঙালী একেবারে অকর্মণ্য ও নির্বীর্য হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেইসময় আফগানিস্তানের খিলজীরা আসিয়া উহাদের সমস্ত বিহার ভাঙিয়া দিল—দেবমূর্তি, বিশেষত যুগলাদ্য মূর্তি চূর্ণ করিয়া দিল—সহস্র সহস্র নেড়া ভিক্ষুর প্রাণনাশ করিল। বড় বড় বিহারে যেসকল যথার্থ পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন তাঁহারাও ঐসঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—তাঁহারাই ঐ ধর্মের অস্থি ও মজ্জাস্বরূপ ছিলেন। অস্থি ও মজ্জার নাশ হইলে দেহেরও নাশ হয়, সেইরূপ তাঁহাদের মৃত্যুতে সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের নাশ হইল। মুসলমান বিজয়ের এক বা দুই পুরুষ পূর্বে বল্লাল সেন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সেন্সাস লইয়াছিলেন। সাড়ে তিনশত ঘর রাঢ়ী ও সাড়ে চারিশত ঘর বারেন্দ্র হইয়াছিল। ইহার উপর কিছু সাতশতী, কিছু পাশ্চাত্য ও কিছু দাক্ষিণাত্য ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ সংখ্যা তখন সবশুদ্ধ দুইহাজার ঘরের অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এতদিন ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। কখনো তাঁহারা হঠিতেন কখনো বা ইঁহারা হঠিতেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-প্রণীত বহুসংখ্যক দার্শনিক পুস্তকে এই ঘোরতর বিচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমান বিজয়ে বৌদ্ধমন্দিরের ও বৌদ্ধদর্শনের একেবারে সর্বনাশ হইয়া গেল। উহাতে ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু বৌদ্ধের বদলে এখন মুসলমান মৌলবী ও ফকির তাহাদের প্রবল বিরোধী হইয়া উঠিল। সুতরাং দেশের যেখানে যাহার জোর বেশি সেখানে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ঐরূপে বাংলার অর্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেল এবং অপর অর্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হইল আর

বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাহারা তখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল—মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষ হইতেই তখন তাহাদের উপর নির্যাতন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া দিলেন অর্থাৎ অসভ্য বাগদী, কৈবর্ত, কিরাতের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন—আর মুসলমানেরা তাহাদের উপর নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কিন্তু এই ধর্মপ্রচার ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের একটু বাহাদুরি দিতে হয়। তাহারা বাংলার রাজশক্তির সাহায্য প্রায়ই পায় নাই, তথাপি পাঁচটি মাত্র প্রাণী আসিয়া অর্ধেক দেশটাকে যে অল্পকালের মধ্যে হিন্দু করিয়া ফেলিয়াছিল ইহা অল্প বাহাদুরির কাজ নয়।

বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে যাহারা অনাচরণীয় ছিল এবং মুসলমানাধিকারের পরে নূতন সমাজে যাহারা অনাচরণীয় হইল—বৌদ্ধধর্ম শেষে তাহাদের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহারা ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভুলিয়া গেল। শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ ভুলিয়া গেল; দর্শন ভুলিয়া গেল। শীল বিনয় ভুলিয়া গেল। তখন রহিল জনকতক মূর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত পুরোহিত। তাহারা আপনার মতো করিয়া বৌদ্ধধর্ম গড়িয়া লইল। তাহারা কূর্মরূপী এক ধর্মঠাকুর বাহির করিল। এই যে কূর্মরূপ ইহা আর কিছু নহে, স্তূপের আকার। কূর্মের যেমন চারিটি পা ও গলা—এই পাঁচটি অঙ্গ থাকে, স্তূপের তেমনি পাঁচটি অঙ্গ থাকিত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারিদিকে চারিটি ধ্যানী বুদ্ধ থাকিতেন এবং দক্ষিণপূর্ব কোণে আরেকটি ধ্যানী বুদ্ধ থাকিতেন—এইরূপে স্তূপটি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের আবাসস্থান হইয়া ধর্মের সাক্ষাৎ মূর্তিরূপে পরিগণিত হইত। সুতরাং কূর্মরূপী ধর্ম ও স্তূপরূপী ধর্ম একই। পঞ্চ বুদ্ধের প্রত্যেকের যেমন একটি করিয়া শক্তি ছিল, ধর্মঠাকুরেরও তেমন একটি শক্তি হইলেন, তাঁহার নাম কামিণ্যা। তিনি সব দেবতার বড়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ভগবতী, বিশালাক্ষী, বাশুলী, কালী, গণেশ, রাজা, কোটাল, মন্ত্রী—এইসকল ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ধর্মঠাকুর আজও যে বাঁচিয়া আছেন, সে কেবল মানতের জোরে। নদীয়ার উত্তর জামালপুরের ধর্মঠাকুরের মন্দিরে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে বারশত পাঁঠা পড়ে। ধর্মঠাকুর প্রত্যেক স্থানেই কোন না কোন রোগের ঔষধ দেন। বড়ালের ধর্মঠাকুর 'ক্ষুদিরাম' রক্ত-আমাশয়ের ঔষধ দেন। সোঁয়াগাছির ধর্মঠাকুর পেটের অসুখের ঔষধ দেন। বৈঁচীর নিকটে অচল রায় পিত্তফোটের ঔষধ দেন। তিনি অনাচরণীয় জাতির হাতে পূজা খাইতে ভালবাসেন। তাঁহার সেবকেরা প্রায় ডোম, হাড়ি ইত্যাদি অনাচরণীয় জাতি। ধর্মমঙ্গলের কালুরায়কে লাউসেন যখন স্বর্গে নিতে চাহিলেন, কালুরায় (ডোম) তখন জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে মদ ও শুয়োরের মাংস পাওয়া যায় কি না। লাউসেন বলিলেন ঃ "না।" কালুরায় উহা শুনিয়া বলিল ঃ "আমি যাইব না।" লাউসেন তখন কালু ডোমের উপর ধর্মঠাকুরের পূজার ভার দিয়া গেল। সেই অবধি ডোমেরা তাঁহার প্রধান পূজক। বাংলাদেশে ইহাই বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণাম।* □

পাদটীকা

১ এক বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানোর নাম সঙ্ঘ-ভোজন আর নিকটবর্তী সকল বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানোর নাম সম্যক সম্ভোজন।

* ১৯ বর্ষ, ৬ সংখ্যা

খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামধর্মের সারকথা

রমণীকুমার দত্তগুপ্ত

খ্রীস্টধর্ম

অবতরণিকা

শ্রীভগবান জন্মরহিত, অব্যয়, নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ও ভূতসমূহের অধীশ্বর হইয়াও লোককল্যাণসাধন ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়াশক্তিদ্বারা যুগে যুগে জন্মপরিগ্রহ করেন। এইরূপে যখনই জগতে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে তখনই শ্রীভগবান কৃপাপরবশ হইয়া মানবজাতির উদ্ধার সাধন করিবার জন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। আর—জগতে এশিয়া-খণ্ডই বিভিন্ন যুগে অবতার পুরুষ, ঈশ্বরকোটি ও লোকোত্তর মহাপুরুষগণের পুণ্যাবির্ভাবে পবিত্র ও ধন্য হইয়াছে। এশিয়ান্তর্গত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ; ভারত বহির্ভূত পারস্য দেশে জরথুস্ট্র; চীনে মহাত্মা লাওজি; জুডিয়াতে প্রভু যীশু এবং আরবে হজরত মহম্মদ আবির্ভূত হইয়া যুগোপযোগী ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। এশিয়াখণ্ড চিরদিনই ধর্মগুরুর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগৎকে ধর্মের বাণী শুনাইয়াছে; উহার কারণ সমগ্র পৃথিবীতে প্রাচ্যদেশীয়গণই বিনাশশীল জগৎপ্রপঞ্চের আপাতরম্য সৌন্দর্যে পরিতৃপ্ত না থাকিয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ভাবে ভাবুক হইতে চায়—তাহারা জগতের সমুদয় নশ্বর পদার্থকেই উপেক্ষা করিয়া এমন কিছু বস্তু দর্শন করিতে চায় যাহা অপরিণামী, অবিনাশী এবং এই দুঃখ ও মৃত্যুপূর্ণ জগতের মধ্যে নিত্য, আনন্দময় ও অমর।

যীশুর আবির্ভাব

এক হাজার আটশত বৎসরের অধিককাল পূর্বে এশিয়া মহাদেশের জুডিয়া প্রদেশে ধর্মের এমন এক গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল—যাহা দূর করিয়া ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান এক দরিদ্র ইহুদীজাতীয় সূত্রধরের গৃহে যীশুখ্রীস্টরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। যীশুর আবির্ভাবের চোদ্দশো বৎসর পূর্বে ইহুদী জাতি অজ্ঞানান্ধকার ও নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। তাহারা বৃষ ও গোবৎসের (bull and calf) আকারে কুলদেবতা (tribal gods)-গণের, সূর্য, কেওয়ান (Kewan) বা স্যাটার্ন (Saturn), বৃক্ষ, সর্প প্রভৃতির পূজা করিত এবং দেবতাগণের প্রীতিলাভার্থ বেদিতে নরবলি প্রদান করিত। ইহুদী জাতির ঈদৃশ কুসংস্কার, অজ্ঞতা, ধর্মের গ্লানি, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরম অবনতি দেখিয়া পরিত্রাতা মুসা (Moses) জিহোবা (Yahveh) নামে একেশ্বরের

বিগত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিক্রমপুর কলমা রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে আহূত ধর্ম সম্মেলনীতে পঠিত।

উপাসনা ও ধর্মনীতিমূলক শিক্ষা, অনুশাসন ও বিধিসমূহ প্রবর্তন করিয়া পতিত জাতির দুর্দশা অপনোদন করিয়াছিলেন। এই মুসা প্রবর্তিত ধর্মই ইহুদী ধর্ম অথবা Judaism নামে অভিহিত। ইহুদী ধর্মের মূলতত্ত্ব আমরা Old Testament নামক ধর্মগ্রন্থের দশ ধর্মানুশাসনে (Ten Commandments) লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। মুসা প্রবর্তিত ধর্মের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ইহুদী জাতি বহুকাল ধর্মনীতির পথে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহুদী জাতি মুসা প্রবর্তিত ধর্ম অনুশাসন ও বিধিসমূহের মূলতত্ত্বটি ভুলিয়া পুনঃ নানাবিধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত হইল। Pharisee ও Sadducee নামে সেইসময় ইহুদীদের দুই ধর্মসম্প্রদায় ছিল। Pharisee-গণ ধর্মের মূলতত্ত্ব অপেক্ষা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানাদি পালনেই সমধিক আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। আর Sadduce-গণ অভিজাত বংশীয় ও ঘোর সন্দেহবাদী ছিলেন। এই দুই সম্প্রদায়ই এরূপ রক্ষণশীল ছিলেন যে, ধর্মের সার্বভৌমিক মহান তত্ত্বসমূহের দিকে মনোনিবেশ না করিয়া কেবল খুঁটিনাটির দিকেই আকৃষ্ট ছিলেন। এই কপট ও ধর্মধ্বজী ধর্মসম্প্রদায়দ্বয়ের হস্ত হইতে ইহুদী জাতিকে উদ্ধার করিয়া ধর্মরাজ্যের পথে উন্নীত করিবার জন্য, ইহুদীজাতির মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম উহার সাকার বিগ্রহ ও ভবিষ্যতের পক্ষে মহাশক্তির আধারস্বরূপ প্রেমাবতার যীশু আবির্ভূত হইলেন।

নিউ টেস্টামেন্ট

যীশু-প্রবর্তিত ধর্মই খ্রীস্টধর্ম। খ্রীস্টধর্মের মূলতত্ত্ব New Testament নামক ধর্মগ্রন্থের Sermon on the Mount বা শৈলোপদেশে নিহিত আছে। হিন্দুগণের বেদ, মুসলমানের কোরান, পারসিকদের জেন্দাবেস্তার ন্যায় খ্রীস্টানগণ বিশ্বাস করেন তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ Bible (বাইবেল) অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বাণী। New Testament সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক Locke (লক) বলিয়াছেন ঃ "It has God for its author, salvation for its end, and truth, without any mixture of error, for its matter." অর্থাৎ, নিউ টেস্টামেন্টের গ্রন্থকার স্বয়ং ভগবান, ইহার উদ্দেশ্য মুক্তি এবং ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় অভ্রান্ত সত্য। কবি Walter Scott বলিয়াছেন ঃ

"Within this ample volume lies
The mystery of mysteries ;
Happiest they of human race
To whom their God has given grace
To read, to fear, to hope, to pray,
To lift the latch, to force the way ;
And better had they ne'er been born
That read to doubt, or read to scorn."

অর্থাৎ, এই মহান ধর্মগ্রন্থে অতি গূঢ় রহস্যের কথা লিপিবদ্ধ আছে। যে-জাতির জীবন পরিচালনার জন্য শ্রীভগবান কৃপাপরবশ হইয়া এই অমূল্য গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন, সেই জাতি ধন্য। যাহারা এই অপূর্ব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হয় অথবা নিন্দাবাদ করে তাহাদের জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল।

খ্রীস্টধর্মে পাপবাদ

খ্রীস্টানগণ যীশুকে ঈশ্বরের তনয় (Son of God) এবং পরিত্রাতা (Saviour) বলিয়া বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর মানবের প্রতি অপার করুণাপরবশ হইয়া পুত্ররূপে মানবের পাপ ও দুঃখের ভার গ্রহণ করিবার জন্য জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। পুত্র সানন্দে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন : "Lo, I come ; I delight to do thy will." অর্থাৎ দেখ, আমি অবতীর্ণ হইলাম; আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রীতিলাভ করি। যীশু এইরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণার্থ মানবী-তনু পরিগ্রহ করিয়া মানবজাতির সমস্ত পাপ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ক্রুশে আত্মত্যাগ মানবজাতির পাপ ও দুঃখ দূরীকরণার্থ। যীশুকে পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে মানব সর্বপাপ ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরাগতি লাভ করিবে—ইহা খ্রীস্টানগণ বিশ্বাস করেন। সাধু পল বলিয়াছেন : "Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shall be saved." অর্থাৎ প্রভু যীশুখ্রীস্টকে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে পরিত্রাণ পাইবে। খ্রীস্টানগণ বলেন, মানবজাতি আদম ও ইভের বংশসম্ভূত; আদম ও ইভ স্বর্গস্থ উদ্যানের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়া পাপাচারণ করিয়াছিলেন এবং স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বর এই অপরাধের জন্য আদম ও ইভকে পৃথিবীতে পাপ ও দুঃখ ভোগ করিবার জন্য স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। তদবধি আদম ও ইভের বংশধর মানবজাতি ভগবানের অভিসম্পাতের ফলস্বরূপ পাপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। মানবজাতির এই পাপ যীশু নিজে গ্রহণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন—যীশুর শরণাপন্ন হইয়া অনুতপ্ত হইলে মানব এই পাপের ভার হইতে মুক্ত হইতে পারে। খ্রীস্টধর্ম এই পাপবাদ স্বীকার করে। কিন্তু হিন্দুধর্ম মানবের জন্মগত দেবত্ব স্বীকার করিয়া মানবকে পাপী বলিতে কখনো প্রস্তুত নহে। তাই উপনিষদের ঋষি ঐশী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জগতে এই আশা ও আনন্দের বার্তা ঘোষণা করিলেন : "হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যলোক নিবাসী ত্রিদশমণ্ডলি, তোমরা সকলে আসিয়া শুন, আমি সেই অনাদি পুরাতন মহান পুরুষকে জানিয়াছি। আদিত্যের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তাঁহাকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইবে, আর অন্য কোন পথ নাই।" উপনিষদের ঋষির এই অভয়বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বর্তমান যুগের আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় জগতের বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণের বিশেষত পাশ্চাত্য জাতিগণের সমক্ষে কম্বুকণ্ঠে মানবের ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন : "হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, পবিত্র ও পূর্ণ। তোমরাই এই মর্তভূমির দেবতা! তোমরা পাপী? ইহা অসম্ভব। মানবকে পাপী বলাই এক মহা কলঙ্ক। তোমরা সিংহস্বরূপ হইয়া আপনাদের মেষতুল্য মনে করিতেছ কেন? এই ভ্রমজ্ঞানকে দূর করিয়া দাও। তোমরা জন্মমরণ রহিত মুক্ত ও নিত্যানন্দময় আত্মা। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও। জড় দাস, তোমরা জড়ের দাস নও। তোমরা চৈতন্য।"

Holy Trinity বা পবিত্র ত্রিত্ববাদ

খ্রীস্টধর্ম একেশ্বরবাদ প্রচার করে। ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বানুকম্পী—তিনি ইচ্ছামাত্রই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত খ্রীস্টানগণ God the Father, God the Son and God the Holy Ghost—পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্রাত্মা ঈশ্বর—এই তিনকে বিশ্বাস করেন। ইহাই খ্রীস্টধর্মে Holy Trinity বা পবিত্র ত্রিত্ববাদ বলিয়া অভিহিত। যীশু জন্মিবার পূর্বে জননী মেরী Holy Ghost কর্তৃক সঙ্গতা হইয়াছিলেন—এই Holy Ghost-এর শক্তিতেই যীশু পবিত্রাত্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার যখন যীশু দীক্ষাদাতা জন (John the Baptist) কর্তৃক জর্ডন নদীর পবিত্র সলিলে দীক্ষিত হন তখন Holy Ghost ঘুঘুর মূর্তি ধারণ করিয়া যীশুতে অনুপ্রবিষ্ট হন এবং স্বর্গস্থ পিতা তখন বলিয়া উঠিলেন ঃ "তুমি আমার প্রিয় পুত্র; তোমাতে আমি প্রীত হইয়াছি।" ঘুঘু পবিত্রতা ও বিনয়ের প্রতীকস্বরূপ। ইহার মর্মার্থ এই, যীশুর দীক্ষার সময় যেমন পবিত্রতা, নম্রতা, জ্ঞান, দিব্যানুভূতি প্রভৃতি Holy Ghost রূপে যীশুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়েও পবিত্রতা, বিনয়, জ্ঞান প্রভৃতি দেবভাবসকল সঞ্চারিত হইয়া সমস্ত পাপ বিধৌত করিয়া দেয়।

পরকাল

খ্রীস্টধর্ম পূর্বজন্মে বিশ্বাস শিক্ষা দেয় না, কারণ উহার মতে মানবের পূর্বজন্মের কোন স্মৃতি বর্তমান থাকে না এবং উহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায় না। খ্রীস্টানগণ পরকালে বিশ্বাস করে। মানব স্বাধীন, অদৃষ্টের দ্বারা পরিচালিত নহে; নিজ কর্মানুসারে মানব শেষ বিচারের দিবস (Day of Judgement) পুরস্কার অথবা শাস্তি পাইয়া থাকে। যীশুর শরণাপন্ন হইয়া সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্যলাভে পরিত্রাণ হয়, আর প্রভু যীশু হইতে বিমুখ হইয়া অসৎকর্মের অনুষ্ঠান করিলে ইহকালে পাপ ও দুঃখের তীব্রজ্বালা ও পরকালে অনন্ত নরকভোগ (Eternal Damnation)।

খ্রীস্টধর্মে প্রেম ও ভক্তি

খ্রীস্টধর্ম প্রেমের ধর্ম, ভালবাসার ধর্ম—ভক্তির ধর্ম। ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ। প্রেমদ্বারাই সেই প্রেমস্বরূপকে লাভ করা যায়। তাই প্রেমিক যীশু বলিয়াছেন ঃ "Thou shall love thy Lord with all thy heart, and with all thy soul and with all thy mind, and with all thy strength." অর্থাৎ তুমি তোমার প্রভুকে কায়মনোবাক্যে, সর্বান্তকরণে এবং যথাশক্তি ভালবাস। খুব ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকিলে এবং মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিলে তিনি দেখা না দিয়া পারেন না। তাই যীশু এই ব্যাকুলতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ "Ask, and it shall be given you ; seek and ye shall find ; Knock and it shall be opened unto you." অর্থাৎ তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর, তবেই পাইবে; তাঁহাকে খোঁজ, তবেই তাঁহাকে পাইবে; দরজাতে ধাক্কা দাও, তবেই দরজা খুলিয়া যাইবে। "For everyone that asketh receiveth ; and he that seeketh findeth ; and to him that knocketh it shall be opened." অর্থাৎ, কারণ

যে-কেহ চায় সেই পায়; যে খোঁজে সেই পায়; যে দরজায় ধাক্কা দেয় তার নিকটেই দরজা খুলিয়া যায়। "হে আমার স্বর্গস্থ পিতা পরমেশ্বর, তোমার নাম জয়যুক্ত হউক" প্রভৃতি উপাসনার যে-স্তোত্র যীশু প্রবর্তন করিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ ভক্তিমূলক। এই উপাসনার স্তোত্রটির ভিতর আমরা ভক্তহৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস ও একান্ত শরণাগতির স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে পাই।

মানবপ্রীতি

যীশু একদিকে যেমন ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন অপরদিকে তেমনি আবার মানবের প্রতি ভালবাসাও শিক্ষা দিয়াছেন। "Thou shall love thy neighbours as thyself." অর্থাৎ তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতো ভালবাসিবে। কেন তিনি প্রতিবেশীকে নিজের ন্যায় ভালবাসিতে বলিয়াছিলেন? উহার কারণ যীশু নিজেই বলিয়াছেনঃ "As ye would that men should do to you, do ye also to them likewise. As the Father has loved me, I also have loved you." অর্থাৎ তুমি যেমন ইচ্ছা কর লোকসকল তোমাকে ভালবাসুক, তুমিও তদ্রূপ তাহাদিগকে ভালবাসিও। ঈশ্বর যেমন আমাকে ভালবাসিয়াছেন, আমিও তোমাকে তেমনি ভালবাসিয়াছি। হিন্দুদের বেদান্তশাস্ত্র কিন্তু 'যত্র জীব তত্র শিব'—এই গভীর তত্ত্বটি শিক্ষা দিয়া জীবসেবা ও জীবকে ভালবাসার যথার্থ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। বেদান্তের এই মহান তত্ত্বের প্রতিধ্বনি করিয়া বর্তমান যুগের আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ জগতে ঘোষণা করিয়াছেনঃ

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।।"

প্রেমিক ও কারুণিক যীশুর সমগ্রজীবন দুর্দশাপন্ন মানবজাতির জন্য করুণা ও দরদে পরিপূর্ণ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার সকল চিন্তা, কার্য ও বাক্য পতিত মানবজাতির দুঃখ অপনোদনের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

ত্যাগ ও অনাশক্তি

খ্রীস্টধর্ম ত্যাগ, বৈরাগ্য ও কামকাঞ্চনে অনাসক্তির মহিমায় উজ্জ্বল। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও অনাসক্তি ঈশ্বরলাভের প্রধান সম্বল—ইহা অন্যান্য ধর্মের ন্যায় খ্রীস্টধর্মও শিক্ষা দেয়। বাইবেল বলিতেছেনঃ "Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal: But lay for yourselves treasurers in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt and where thieves do not break through nor steal." অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ সঞ্চয় করিও না, কারণ উহা ঘুণ ও মরিচা ধরিয়া শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং তস্কর চুরি করিয়া নেয়; স্বর্গীয় সম্পত্তি সঞ্চয় কর, উহা কখনো ঘুণ ও মরিচায় নষ্ট করে না এবং তস্কর অপহরণ করে না। "For where your treasure is, there will your heart be also." অর্থাৎ কারণ যেখানে তোমার বিষয় সম্পত্তি থাকে

সেখানেই তোমার মনটি আসক্ত থাকিবে। যীশু আবার বলিয়াছেন ঃ "No man can serve two masters : for either he will hate the one, and love the other ; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon." অর্থাৎ কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না; কারণ হয় তাহার একজনকে ঘৃণা করিয়া অপরকে ভালবাসিতে হইবে, নয় তাহার একজনকে ভালবাসিয়া অপরকে ঘৃণা করিতে হইবে। তুমি ঈশ্বর ও কাঞ্চন-দেবতা—দুইজনকে একসঙ্গে সেবা করিতে পার না।" জনৈক ধনী যুবক যীশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ "প্রভো, অনন্তজীবন লাভ করিবার জন্য আমাকে কী করিতে হইবে?" যীশু তাঁহাকে বলিলেন ঃ "তোমার এখনো একটি অভাব আছে। বাড়ি যাও, তোমার যাহা কিছু আছে সব বিক্রয় কর এবং ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রগণকে বিতরণ কর—তাহা হইলে স্বর্গে তুমি অক্ষয় সম্পদ সঞ্চয় করিলে। তারপর আসিয়া ক্রুশ গ্রহণ করিয়া আমার অনুসরণ কর।" আবার যীশু বলিয়াছেন ঃ "যেকোন ব্যক্তি নিজের জীবনরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবে, সে উহা হারাইবে, আর যে আমার জন্য জীবন হারাইবে, সে উহা পাইবে।" এই ত্যাগ, অহংশূন্যতা, নিঃস্বার্থপরতাই সকল ধর্মের আদর্শ—আর যীশু এই ত্যাগের কথাই প্রচার করিয়াছেন। হিন্দুদের উপনিষদ্‌-ও তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেনঃ "ধন ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না—একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।" ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, গীতার সারকথা এককথায়—'ত্যাগী' (তাগী) অর্থাৎ 'গীতা' এই শব্দটির দুই অক্ষরের বিপরীত অবস্থান।

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ

খ্রীস্টধর্ম ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের শিক্ষা দিয়া থাকে। যীশু বলিয়াছেন ঃ "Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink ; nor yet for your body what ye shall put on. Is not life more than meat and the body than raiment ? Behold the fowls of the air : for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns ; yet your Heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they ? Therefore take no thought saying, what shall we eat ? Or what shall we drink ? Or wherewithal shall we be clothed ? For your Heavenly Father knoweth that ye have need of all these things." অর্থাৎ তোমার জীবনের জন্য—কী খাইবে, কী পান করিবে, কী পরিধান করিবে—এইসকলের জন্য ভাবিও না। খাওয়া-পরা অপেক্ষা কি তোমার জীবনের মূল্য অধিকতর নয়? আকাশে যেসকল পাখি উড়িয়া বেড়ায় উহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করঃ উহারা বীজবপন করে না, শস্য কর্তন করে না অথবা শষ্য গোলায় সঞ্চিত করে না, তথাপি ঈশ্বর উহাদিগকে খাওয়াইয়া থাকেন। তোমরা কি এইসকল খেচর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীব নও? অতএব, কী খাইবে, কী পরিবে, এই চিন্তা করিও না। কারণ তোমার স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমার এইসকল জিনিসের প্রয়োজন আছে।" আবার যীশু বলিয়াছেন ঃ "But seek ye first the kingdom of

God, and His righteousness ; and all these shall be added unto you." অর্থাৎ কিন্তু প্রথম স্বর্গরাজ্য ও ধর্মের অনুসন্ধান কর; এইসকল জিনিস পরে সবই তোমার আয়ত্তাধীন হইবে। হিন্দুদের গীতাও এই শরণাগতির কথা বলিয়াছেন ঃ

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত!
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।" (১৮।৬২)
"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।" (১৮।৬৬)

অর্থাৎ হে ভারত! তুমি সর্বতোভাবে সেই ভগবানেরই শরণাগত হও; তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পূর্ণ শান্তি ও শাশ্বত ধাম প্রাপ্ত হইবে। তুমি সমুদয় ধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

পবিত্রতা বা আত্মশুদ্ধি

ঈশ্বর শুদ্ধ মনের গোচর। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মানুভূতি হয় না। তাই খ্রীস্টধর্ম পবিত্রতার বা আত্মশুদ্ধির মহিমা প্রচার করিয়াছে। "Blessed are the pure in heart : for they shall see God." অর্থাৎ পবিত্রাত্মা ও শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ ধন্য, কারণ তাঁহারাই ঈশ্বর দর্শন করিবেন। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ঐশ্বর্য, বৈভব, উচ্চপদ বা প্রভুত্বের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—এমনকি পাণ্ডিত্যের কিছু প্রয়োজন নাই। একটিমাত্র জিনিসের প্রয়োজন—তাহা এই—পবিত্রতা বা চিত্তশুদ্ধি। আত্মা স্বয়ং শুদ্ধস্বভাব। উহা ঈশ্বর-প্রসূত। বাইবেলের ভাষায় আত্মা "ঈশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ।" কেবল আমাদের অশুভ কর্মসমূহ সেই শুদ্ধস্বভাব আত্মাকে অজ্ঞান দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আবশ্যক কেবল শুভকর্মানুষ্ঠানদ্বারা সেই অজ্ঞানের আবরণকে অপসারণ করা—তাহা হইলেই আত্মা স্বীয় প্রভায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইবে। তাই যীশু মানবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ "The kingdom of God is within you." অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরেই বিরাজমান।

দীনতা ও সহিষ্ণুতা

খ্রীস্টধর্ম দীনতা ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়া থাকে। মানুষ অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া 'আমি কর্তা' বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া 'ঈশ্বর কর্তা, আমি অকর্তা', 'ঈশ্বর যন্ত্রী, আমি যন্ত্র'—এই দীনতা ও শরণাগতির ভাব না আসিলে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। তাই যীশু বলিয়াছেন ঃ "Blessed are the meek : for they shall inherit the earth." অর্থাৎ দীনভাবাপন্ন ব্যক্তিরাই ধন্য, কারণ তাঁহারাই এই পৃথিবীতে মনুষ্যপদবাচ্য। ধর্মাচরণ করিতে গেলে দুঃখকষ্ট, নিগ্রহ, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য অবশম্ভাবী। কারণ দুঃখ ও নির্যাতনের মধ্য দিয়াই মানুষের দিব্য ও অতিলৌকিক ভাবের বিকাশ হয়। তাই যীশু বলিয়াছেন ঃ "Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake ; for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all

manners of evil against you falsely, for my sake. Rejoice and be exceedingly glad : for great is your reward in heaven." অর্থাৎ ধর্মের জন্য যাহারা নিগৃহীত হয় তাহারা ধন্য ঃ কারণ তাহারাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। যাহারা আমার জন্য সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপবাদ ও দুঃখ সহ্য করিবে তাহারা ধন্য। এইজন্য অতিশয় আনন্দ প্রকাশ কর ঃ কারণ ভগবান এইজন্য তোমাদিগকে পুরস্কার দিবেন।

ক্ষমা ও অহিংসা

বৌদ্ধধর্মের ন্যায় খ্রীস্টধর্ম ক্ষমা ও অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছে। "Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth ; But I say unto you, That ye resist no evil ; but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you." অর্থাৎ তোমরা বলিতে শুনিয়াছ যে চক্ষুর বদলে চক্ষু উৎপাটিত কর, দাঁতের বদলে আরেকটি দাঁত ভাঙিয়া দাও; কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না—যে কেহ তোমার ডান গালে চপেটাঘাত করিবে তুমি তাহাকে তোমার বাম গালও ফিরাইয়া দিবে। তোমার শত্রুদিগকে ভালবাসিও; যাহারা তোমার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করে তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিও, যাহারা তোমাকে ঘৃণা করে, নিন্দা করে ও নির্যাতন করে তাহাদিগের মঙ্গলসাধন করিও ও তাহাদিগের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও। যীশু তাঁহার নিজ জীবনেও এই ক্ষমা ও অহিংসার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। Mary Magdalen, Augustine, Camillus প্রভৃতি ঘোর পাপীকেও ক্ষমা করিয়া নিজ কোলে স্থান দিয়াছিলেন। ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াও নির্যাতনকারীদের অপকর্মের জন্য প্রেমময় শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঈদৃশ ক্ষমার দৃষ্টান্ত আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অতিশয় বিরল।

অদ্বৈততত্ত্ব

সাধনার চরমাবস্থা অদ্বৈতানুভূতি যীশু লাভ করিয়াছিলেন, তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ "Know ye that the kingdom of God is within you", "I and my Father in heaven are one", "Be ye therefore perfect, even as your Father. which is in heaven, is perfect"—অর্থাৎ জানিও, স্বর্গরাজ্য তোমার অভ্যন্তরেই বিদ্যমান। আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা অভেদ। তোমার স্বর্গস্থ পিতা যেরূপ 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' তুমিও সেইরূপ 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' হও। যীশু বাস্তবিকই বিদেহ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মস্বরূপ ছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিসহায়ে অনুভব করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক নরনারী, সে ইহুদী হউক, বা অন্য জাতি হউক, ধনী দরিদ্র, সাধু-অসাধু—সকলেই তাঁহারই ন্যায় সেই অবিনাশী আত্মস্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই তিনি সমগ্র মানবজাতিকে তাহাদের আপন আপন যথার্থ শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

বাইবেলে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয়

বাইবেলের সমগ্র নিউ-টেস্টামেন্টখানি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্মাচার্য যীশু দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই ত্রিবিধ সাধনোপযোগী শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে "Lords' Prayer or Common Prayer" বা সাধারণ প্রার্থনা প্রবর্তন করিয়াছেন উহা সম্পূর্ণ দ্বৈতমূলক—অতি সহজ ভাবের প্রার্থনা, শিশুর প্রার্থনা, অশিক্ষিত ও ধর্মরাজ্যে প্রথম প্রবেশকারীর জন্য বিহিত। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যক্তিদের জন্য তিনি সাধনার দ্বিতীয় সোপানস্বরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। "আমি আমার পিতাতে, তোমরা আমাতে এবং আমি তোমাদিগের মধ্যে বর্তমান"—এই উক্তিতে বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনার শিক্ষা উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার যখন ইহুদীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ "আপনি কে?" তদুত্তরে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেনঃ "আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা এক।" এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, খ্রীস্টধর্মে ধর্মসাধনের ত্রিবিধ সোপান স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর আমাদের মানবজাতির পক্ষে দ্বৈতমূলক প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে শেষ সোপান অদ্বৈততত্ত্বে পৌঁছানই অপেক্ষাকৃত সহজ। বর্তমান কালে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভারত ও ভারতেতর দেশে প্রচলিত বিভিন্নধর্ম, নিজ জীবনে আচরণপূর্বক প্রত্যেক ধর্মে নির্দিষ্ট সাধনের চরম উপলব্ধি লাভের ফলস্বরূপ 'যত মত তত পথ'—এই অপূর্ব ধর্মসমন্বয়ের মহতী বাণী প্রচার করিয়া পরস্পর বিবদমান ধর্মমতসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িক ধর্মবিদ্বেষ ও পরধর্ম অসহিষ্ণুতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

উপসংহার

উপসংহারে, যে সমন্বয়াচার্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ধর্মসমন্বয়ের মহান ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা আজ খ্রীস্টধর্মের অপূর্ব মহিমা কীর্তন করিয়া ধন্য হইয়াছি—সেই সমন্বয়াচার্যের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া তাঁহারই অন্তরঙ্গ লীলাসহচর ও পার্ষদ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় বলিতে চাইঃ "বিভিন্ন দেশীয়, বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন মতাবলম্বী যেসকল অবতারগণের জীবন ও শিক্ষা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে প্রণাম; বিভিন্ন জাতীয় যেসকল দেবতুল্য নরনারী মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম; জীবন্ত ঈশ্বরস্বরূপ যাঁহারা আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কার্য করিতে ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগকেও প্রণাম।"

ইসলামধর্ম

অবতরণিকা

'ইসলাম' শব্দের অর্থ ঈশ্বরের শরণাগতি বা প্রপত্তি। ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেয় এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহের উপাসনা। এই ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ। তিনি ছিলেন রসুল বা ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। আল্লাহের ইচ্ছা মানবজাতির নিকট বহন করিয়া আনিয়াছিলেন মহম্মদ। যিনি ইসলাম ধর্মের অনুরাগী তিনি মুসলমান। 'মুসলমান' শব্দের অর্থ ঈশ্বরের সেবক বা কিঙ্কর।

কুরআন্

আল্লাহের প্রত্যাদেশ-বাণীই পবিত্র 'কুরআন্'। হিন্দুগণ যেমন বেদকে, খ্রীস্টানগণ বাইবেলকে, জরথুস্ট্রপন্থিগণ জেন্দাবেস্তাকে অপৌরুষেয় শাশ্বত ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করেন, মুসলমানগণও তদ্রূপ কুরআন্‌কে অপৌরুষেয় শাশ্বত আল্লাহের বাণী বলিয়া মনে করেন। কুরআন্ বলেন ঃ "এই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে উপাসনা করিবার নিমিত্ত মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহাই মানবজীবনের একমাত্র কর্তব্য (কুরআন্ ৫১।৫৬)। আল্লাহকে উপাসনা কর এবং শয়তানকে পরিত্যাগ কর—এইকথা বলিয়া আমি (আল্লাহ্) নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছি (১৬।৩৬)। নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্বে ধর্মপ্রচারকগণকে প্রেরণ করিয়াছি। তোমার (মহম্মদের) নিকট তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিয়াছি এবং অন্যান্য অনেক আছেন, যাঁহাদের নাম উল্লেখ করি নাই (৪০।৭৮)। ধর্মসংস্থাপন কর এবং উহাতে অনৈক্য ঘটাইও না বলিয়া যে-ধর্ম তিনি নোয়া, এব্রাহাম, মুশা ও যীশুকে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম তিনি তোমার (মহম্মদ) জন্য বিহিত করিয়াছেন (৪২।১৩)।" জনৈক শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে মহম্মদ বলিয়াছিলেনঃ "এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ ছিলেন—তন্মধ্যে তিনশত পনের জন প্রেরিত হইয়াছিলেন।" মহম্মদ ও কুরআনের এইসকল উক্তি হইতে ইহাই স্বীকৃত হয় যে ধর্মসংস্থাপন ও প্রচারের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে লোকোত্তর মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়। কুরআনের বাণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের "ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এবং ভাগবতের "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" উক্তিসকলের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। যাঁহারা বলেন মহম্মদই একমাত্র ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ এবং ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম, তাঁহারা যদি কুরআন্ পাঠ ও উহার মর্মকথা বুঝিবার চেষ্টা করেন তবে তাঁহাদের অন্ধবিশ্বাস দূর হইতে পারে।

ইসলামধর্মের মূল শিক্ষা

আল্লাহকে জানিবার উপায় সম্বন্ধে ইসলামধর্ম কি শিক্ষা দেয়? আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় ইহা ধারণা করিতে এবং তাঁহার শরণাগত দাস হইতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞানই ইসলামধর্ম ও সংস্কৃতির মূলভিত্তি। মহম্মদ বলিয়াছেন ঃ "জ্ঞান উপার্জন কর; জ্ঞানই তোমাদিগকে সদসৎ বিচার করিতে সমর্থ করিবে, তোমাদের স্বর্গগমনের পথ আলোকিত করিবে, মরুভূমিতে তোমাদের বন্ধুর কাজ করিবে, নির্জনতায় প্রধান সহচর হইবে, সুখে পথ-প্রদর্শক এবং দুঃখে শান্তিদাতা হইবে। জ্ঞানই শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার ধর্ম।"

আল্লাহকে জানিতে হইলে তাঁহার ধিকর বা স্মরণ-মনন করিতে হইবে। কুরআন্ বলেন ঃ "হে মুসলমান, ঐশ্বর্য ও সন্তানসন্ততির প্রতি আসক্তি যেন তোমাকে আল্লাহের স্মরণ-মনন হইতে বিমুখ না করে। যে বিষয়ের প্রতি আসক্তিবশত তাঁহার স্মরণ-মনন না করে সে ক্ষতিগ্রস্থ হয় (৬৩।৯)। আমাকে স্মরণ করিও, তাহা হইলে আমিও তোমাকে স্মরণ করিব (২।১৫২)। আমার নিকট প্রার্থনা কর, তোমার ডাকে সাড়া দিব (৪০।৬০)। যে আমাকে স্মরণ

না করে, তাহার জীবন হীন হইবে। কেয়ামতের বা শেষবিচারের দিনে তাহাকে অন্ধ করিয়া সভায় আনা হইবে, কারণ আমার বাণী সে পালন করে নাই (২০।১২৪—১২৬)।'' আল্লাহকে কিভাবে স্মরণ করিবে? আল্লাহের যেসকল নাম আছে উহাদিগের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিবে, জপ করিবে। কুরআন্ বলেন : ''আল্লাহের নামই শ্রেষ্ঠ নাম; অতএব সেই নামেই তাঁহাকে ডাক। যাহারা আল্লাহের নামের পবিত্রতা নষ্ট করে তাহাদিগের সাহচর্য পরিত্যাগ কর, তাহারা কৃতকর্মের ফল ভোগ করিবে (৭।১৮০)।''

আল্লাহকে জানিতে হইলে পরিদৃশ্যমান জগতে, সৃষ্টিবৈচিত্র্যে আল্লাহের অসীম শক্তি, করুণা, মহিমা ও ঐশ্বর্যবিভূতিতে বিশ্বাস ও তাঁহার গুণানুকীর্তন করিতে হইবে। কুরআন্ বলিতেছেন : ''পরিদৃশ্যমান জগতে, সৃষ্টিবৈচিত্র্যে, দিবারাত্রের বিভিন্নতায় আল্লাহের অনন্তশক্তি ও মহিমার প্রকাশ লক্ষ্য কর। জ্ঞানিগণ এই সৃষ্টিবৈচিত্র্যে আল্লাহের মহিমা উপলব্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন, 'প্রভো, তুমি এসকল বৃথা সৃষ্টি কর নাই! তোমার নাম জয়যুক্ত হউক! আমাদিগকে নরকের জ্বলন্ত অগ্নির ধ্বংসকর নিয়তি হইতে রক্ষা কর'।''

আল্লাহকে ভালবাসিবে, ভয় করিবে এবং নিজকে দাসানুদাস ভাবিবে। ইসলাম ধর্মে সকল স্তরের লোকের জন্যই বিধিব্যবস্থা আছে। মোটের উপর সকল মুসলমানকেই (১) দিবারাত্রের মধ্যে পাঁচবার নামাজ পড়িতে হইবে, (২) প্রতি বৎসর পবিত্র রমজান মাসে রোজা করিতে হইবে, (৩) দীনদুঃখীকে দান খয়রাত করিবার জন্য আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে, (৪) জীবনে অন্তত একবার হজ অর্থাৎ মক্কা ও মদিনায় তীর্থযাত্রা করিতে হইবে, (৫) এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে বিশ্বাস করিতে হইবে এবং মহম্মদকে তাঁহার রসুল মানিতে হইবে, (৬) মহম্মদ যেভাবে নামাজ পড়িতেন, আল্লাহ তাঁহাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি যেরূপ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতেন, সেরূপভাবে মুসলমানকে নামাজ পড়িতে হইবে। এগুলি ইসলাম ধর্মের অনুশাসন।

হজরত মহম্মদের মূল নির্দেশ

মহম্মদের বয়স যখন তেষট্টি বৎসর তখন তিনি শেষবারের জন্য মক্কায় তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। শত্রুগণের নির্মম নির্যাতন ও নিজের কঠোর তপশ্চর্যায় তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাঁহার তীর্থকৃত্য সমাপন করিয়া আরাফতের বিশাল প্রান্তরে সমবেত মুসলমানগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : ''আমার জীবনকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই বৎসর আবার তোমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করি না, আজ যাহা বলিব ইহাই তোমাদের নিকট আমার উপদেশ। তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর—'আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়; মহম্মদ তাঁহার রসুল। স্মরণ রাখিও, ইসলাম একটি বিরাট ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ, তোমাদের প্রত্যেকেই পরস্পরের ভাই। অতএব সাবধান, ভ্রাতার বিরুদ্ধাচারণ করিও না। ন্যায়ের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিও না। নারীজাতির সম্মান করিবে এবং তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবে। স্মরণ রাখিও, স্বামীর যেরূপ স্ত্রীর উপর অধিকার

আছে, স্ত্রীরও তদ্রূপ স্বামীর উপর অধিকার আছে। একথা সর্বদা মনে রাখিও যে, ভাল-মন্দ প্রত্যেক কার্যের জন্যই তোমরা আল্লাহের নিকট দায়ী থাকিবে। প্রিয় বন্ধুগণ, তোমাদের দাসগণের প্রতি কৃপালু থাকিবে। তোমরা নিজে যেইরূপ জীবনধারণ কর তাহাদিগকেও তদ্রূপ জীবনধারণ করিতে দাও। যদিও তাহারা গুরুতর অন্যায় আচরণ করে তথাপি তাহাদিগের উপর নির্যাতন করিও না, তাহাদিগকে তিরস্কার বা ত্যাগ করিতে পার। আল্লাহের নিকট একজন দাসের জীবনের মূল্য তোমাদের প্রত্যেকের জীবনের মূল্যের অনুরূপ। (ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) হে পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ, তোমার এই দীন দাস তাহার কার্য সমাপ্ত করিয়াছে। একমাত্র তুমিই জান এই অধম তোমার প্রদত্ত শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছে কিনা।'' মহম্মদের এই উপদেশের মধ্যে মুসলমানগণের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন রহিয়াছে। হজরত একবার পীড়িতাবস্থায় ভজনালয়ের বেদি হইতে এই কয়েকটি শেষ মূল্যবান কথা বলিয়াছিলেনঃ ''মুসলমানগণ, আমার এই কয়েকটি শেষ কথা তোমরা মনে রাখিও। পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হইয়া শান্তিতে বাস কর। সকলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে এবং বিপৎকালে তোমাদের ভ্রাতৃগণের পক্ষ পরিত্যাগ করিবে না। আল্লাহের উপাসনা ও সেবাই কেবল মানুষকে জীবনে সৌভাগ্যশালী ও সুখী করে।'' মহম্মদের এই বাণী সকলেরই প্রণিধানযোগ্য ও পালনীয়।

ইসলামধর্মের উদারতা

কুরআন্ অন্যের আরাধ্য দেবতাকে নিন্দা ও অপমান করিতে নিষেধ করিয়াছেনঃ ''অজ্ঞতাবশত পাছে তাহারা সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া আল্লাহকে নিন্দা করে, তজ্জন্য যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য দেবতার উপাসনা করে তাহাদিগকে নিন্দা করিও না (কুরআন্ ৬।১০৯)।'' এখানে পরধর্মসহিষ্ণুতার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান ফকির ও কবিগণের উক্তিতেও পরধর্মসহিষ্ণুতার কথা পাওয়া যায়। পারস্য কবি সানাই গাহিয়াছেন ঃ ''এক খোদা ভিন্ন দ্বিতীয় নাই—এইকথা বলিয়া ইসলাম ও পরধর্ম উভয়ই খোদার পথ অনুসরণ করিতেছে।'' উর্দু কবি জাফর গাহিয়াছেন ঃ ''কি দেবদূত, কি মানব, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলকেই তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে সৃজন করিয়াছ। যাহা কিছু আছে সবই তুমি। কি কাবা মসজিদে, কি দেবমন্দিরে সর্বত্রই তোমার আরাধনা হইতেছে। তোমার নিকটই সকলে মস্তক অবনত করে। যাহা কিছু আছে সবই তুমি।'' ধর্মে বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধেও কুরআন্ প্রচার করিয়াছেনঃ ''যদি তোমার খোদার মর্জি হইত তবে পৃথিবীর সকল লোক নিশ্চিতই বিশ্বাস করিত; সুতরাং বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত তুমি কি তাহাদিগের উপর জোর জবরদস্ত চালাইবে? (১০।৯৯)।'' ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস ও কার্য দ্বারাই মুসলমান হয়, পরন্তু জন্ম বা বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা নহে। কুরআনে বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা ইসলামে দীক্ষার কোন প্রতিশব্দ নাই। কুরআন্ মতানৈক্যসকল সহ্য করিতে এবং সৎকর্মে পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে মুসলমানগণকে শিক্ষা দেয়। ''তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি

এক অনুশাসন ও উপায় নির্ধারণ করিয়াছি। এবং যদি আল্লাহের মর্জি হইত, তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে লইয়া এক জাতি সৃষ্টি করিতেন; কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন উহা দ্বারাই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; অতএব সৎকার্য দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিতে প্রতিযোগিতা কর; আল্লাহের নিকট মৃত্যুর পর তোমাদের সকলকেই ফিরিয়া যাইতে হইবে; যে-বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ আছে, তখন উহা আল্লাহ জানাইয়া দিবেন (কুরআন্ ৫।৪৮)।"

ইসলামধর্মের বিশ্বাস ও পুণ্য ব্রত

মুসলমানগণ দেবদূতের (angels) অস্তিত্বে বিশ্বাসবান। ইসলাম ধর্মমতানুসারে স্বর্গীয় দূতগণ জ্যোতির্ময়; তাঁহারা পুরুষও নন, স্ত্রীও নন। তাঁহারা নিষ্পাপ এবং আল্লাহের আরাধনা ও তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে নিযুক্ত থাকেন। দেবদূতগণ সৃষ্ট হইয়াছেন ও পরিণামে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং একমাত্র আল্লাহই অনাদি ও শাশ্বত। ইসলাম পরকালে বিশ্বাস করে—ধার্মিকগণ স্বর্গবাসী হন এবং পাপীগণ নরকগমন করে। কুরআনে সাত প্রকার নরকের কথা উল্লিখিত আছে।

ইসলাম শারীরিক শুদ্ধি, তীর্থযাত্রা ও উপবাসের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করে। নামাজ পড়িবার পূর্বে মুসলমান ওজু (এবং অধিকতর অপবিত্র বোধ করিলে অবগাহন) করিবে এবং বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে। হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন: "পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্ধেক ইমান।" মুসলমানগণের নিকট মক্কা অতি পবিত্র স্থান। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তীর্থগমনে পাপকার্য হইতে নিবৃত্তি ও ভবিষ্যতে আর কখনো পাপানুষ্ঠান না করিবার ব্রতগ্রহণ দ্বারা তাঁহাদের পূর্বকৃত পাপসকল স্খালন হইয়া যায় এবং তাঁহারা নবজীবন লাভ করেন। মুসলমানদের একনিষ্ঠ বিশ্বাস এই যে, কাবা মসজিদের 'কৃষ্ণ প্রস্তর' এব্রাহামের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন এবং ইহার চুম্বন পুণ্যকার্য ও প্রিয়জনের চুম্বন ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। মুসলমান রমজানের একমাস উপবাস থাকিবেন। অন্যান্য সময়েও—বিশেষত পূর্ণিমায় ও প্রতিমাসের পূর্ণিমার পরবর্তী দুই দিবসে, মহরমের প্রথম দশ দিন এবং আরো অন্যান্য অনেক সময় ও সোমবারে উপবাস করা মুসলমানের পক্ষে পুণ্যজনক। মুসলমান উপবাসকে সংযমের সহায়ক চিত্তশুদ্ধিমূলক অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করেন।

উপসংহার

ধর্মান্ধতা, মতুয়ার বুদ্ধি ও পরমত-অসহিষ্ণুতাই সমাজের সকল বিরোধ-ব্যবধান, বাদ-বিসংবাদ, অনৈক্য-অমিলন, হিংসা-বিদ্বেষের মূলীভূত কারণ। ধর্মশাস্ত্রসমূহের অনুশাসন এবং মহাজনগণের অনুভূতিলব্ধ বাণীগুলি যদি আমরা নিজ জীবনে ঠিক ঠিক অনুসরণ ও উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে আমাদের সমাজজীবন কী সুন্দর, প্রেমময় ও শান্তিপূর্ণ হয়! বেদ, কুরআন্, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র এবং নানক, কবীর, দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকগণ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তদীয় শিষ্যপ্রশিষ্যগণ পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার বাণী প্রচার করিয়াছেন। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মত, হিন্দুধর্মাতিরিক্ত ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম অনুসরণ করিয়া

পরিণামে সেই একই চরম সত্য ভগবানকে লাভ করা যায় কিনা জানিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি ভিন্ন ভিন্ন গুরুর উপদেশে নির্দিষ্টকাল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত (ইসলাম এবং খ্রীস্টধর্মও) আচরণ করিয়া, প্রত্যেক ধর্মমত, ধর্মাদর্শ ও যোগমার্গের অনুষ্ঠান, আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ অখণ্ড ভাবে গ্রহণ করিয়া, কোন অংশকে অপ্রয়োজনীয় বা অসত্য বলিয়া বর্জন না করিয়া, এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মত ও পথই সত্য এবং সাধককে পরিণামে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে পৌঁছাইয়া দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিভিন্ন ধর্মমত ও আদর্শের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতি এবং আপাতবিরুদ্ধ ধর্মমত ও ধর্মাদর্শের মধ্যে কোন প্রকার অসামঞ্জস্য না দেখিয়া সর্বমত ও সর্বাদর্শকে সত্য বলিয়া গ্রহণের দ্বারাই তাঁহার ধর্মসমন্বয় একাধারে অভূতপূর্ব, অনন্যসাধারণ, বিশিষ্ট ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ মহাকল্যাণের হেতুভূত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধর্মসমন্বয়বার্তার অমোঘ প্রভাব পৃথিবী হইতে সর্বপ্রকার ধর্মান্ধতা, মতুয়ার বুদ্ধি, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা এবং লেখনী, বাক্য ও বলপ্রয়োগ দ্বারা ধর্মপীড়নের মূলে চিরতরে কুঠারাঘাত করিবে এবং সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিতে চিরসম্বদ্ধ করিয়া জগতের প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তিবিধান করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন ঃ "আমায় সব ধর্ম একবার নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান; আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত এসব পথ দিয়ে আসতে হয়েছে। দেখলাম—সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছেই সকলেই আসছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভাল লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকলেই দেখা পায়। আন্তরিক হলে সকলেই ঈশ্বরকে পাবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী এবং কুরআনে উক্ত ইসলামের সারকথাগুলি আমরা কি ঠিক ঠিক ভাবে অনুসরণ ও উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিব? হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির দৃঢ়বন্ধনে সম্বদ্ধ এবং পরস্পরের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহিষ্ণু হইয়া ভারতবর্ষে শান্তিতে বাস করুক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।* □

* ৩৪ বর্ষ, ১২ সংখ্যা; ৪৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা

প্রেমের ধর্ম

এস. ওয়াজেদ আলি

ইসলাম ধর্মের শত্রু,
সে তো সেই সুচতুর প্রেমাস্পদ ছাড়া আর কেউ নয়!
ধার্মিক মুসলমানের, রক্তকামী,
সে তো সেই রক্তপানকারী মাশুক ছাড়া আর কেউ নয়!
আমি প্রেমাস্পদের প্রেমই বুঝি।

সে প্রেম মসজিদেই পাওয়া যাক, আর মন্দিরেই পাওয়া যাক, কিছু তাতে আসে যায় না! সেই প্রেমাস্পদের প্রেমিক যারা, তাদের কাছে মোস্লেম কে, আর অমোস্লেম কে এসবের আলোচনার কোন অর্থই নাই! একবার যাবে নিজের অন্তরের দিকে, একবার যাবে বন্ধুর গলির দিকে! প্রেমিকের জন্য এর চেয়ে ভাল পথ আর নাই! হে ব্রাহ্মণ, ইসলাম তো আমায় ছেড়েছে, তুমি কিন্তু এ পথ-ভ্রষ্টকে ছেড়ো না! প্রতিমার মন্দিরে যেতেও তার যে কোন সঙ্কোচ নাই!

কতবার লোকে আমায় বলেছে, উপবীত পর, ঘোর পৌত্তলিক তুমি! আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, আমার দেহে কোন রগটি আছে, যা উপবীতে পরিণত হয়নি!—আমীর খসরু

হজরত মহম্মদ এসেছিলেন মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে, সমাজজীবনের উন্নয়নের জন্যে, ন্যায় এবং সুবিচারের প্রতিষ্ঠার জন্যে। ধর্মীয় অনুশাসনের সাহায্যে, বিধি-নিষেধের দৃঢ় রজ্জুর সাহায্যে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির জীবনকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর সাধনার প্রধান লক্ষ্যবস্তু। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে আরব জাতির প্রাধান্য, তাঁদের সাম্রাজ্য বিশ্বময় বিস্তৃত হয়ে পড়ল। অভাবিত সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধির ফলে কিন্তু ধর্মে ও সমাজ-জীবনে গ্লানি এসে উপস্থিত হলো। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা ভুলে, মহাপুরুষের আদর্শের কথা ভুলে, সাধারণ ধর্মযাজকেরা এবং ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যাকারেরা আঁকড়ে ধরলেন আক্ষরিক অনুশাসনকে, বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলকে, আর আচারের প্রাণহীন কাঠামোটাকে। ফলে সমাজে এসে দেখা দিল অন্তঃসারহীন টীকার যুগ, প্রেরণাহীন ব্যাখ্যার যুগ। ধীরে ধীরে শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকে ভুলে গেল; শব্দ আর তার আভিধানিক এবং বৈয়াকরণিক অর্থ নিয়েই সাধারণ পণ্ডিতদের মধ্যে মাতামাতি চলতে লাগল।

সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে আরবেরা বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিলেন। গ্রীক সভ্যতা তখনো মরেনি। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, ইউক্লিড, গ্যালিলিও প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তাধারা তখনো পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যে ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। আরবেরা এই চিন্তাধারার সংস্পর্শে এলেন। জীবনের ধারা তাঁদের মধ্যে তখন উদ্দামবেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। মহাপুরুষ মহম্মদ স্বয়ং জ্ঞানের সাধক ছিলেন এবং জ্ঞানসাধনার জন্য শিষ্যদের সবিশেষ উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রীক জ্ঞানের সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান পেয়ে আকণ্ঠ

সে-অমৃত তাঁরা পান করলেন। ফলে চিন্তাশীল সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিনব এক ভাবধারা এসে দেখা দিল—যাকে Rationalism বা যুক্তিবাদ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। "সব তত্ত্বের বিচার যুক্তির সাহায্যে করতে হবে, এমনকি ধর্মেরও", এই হলো এই দলের আদর্শ। যাঁরা এই আদর্শের অনুসরণ করতেন তাঁরা 'মোতাজেলা' নামে ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করেছেন। 'মোতাজেলা'-বাদ একদিন মোস্লেম জগতে সবিশেষ বিস্তার এবং প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। বাগদাদের বিখ্যাত খলিফা আল্ মামুন স্বয়ং মোতাজেলা মত অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর যুগে মোতাজেলাবাদ রাজকীয় ধর্মরূপে পরিগণিত হয়।

তবে জনসাধারণ ছিল আচারপন্থী, গতানুগতিক, আর তাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন সাধারণ মোল্লা মৌলভির দল। তাঁদের মধ্যে এবং মোতাজেলাবাদীদের মধ্যে বাদানুবাদ এবং পরে সঙ্ঘর্ষ চলতে লাগল। রাজশক্তিও শেষে আচারপন্থী শক্তিশালী মোল্লা মৌলভিরদের হস্তগত হলো। মোতাজেলাবাদীদের উপর তখন ভীষণ উৎপীড়ন চলতে লাগল। ফলে মোতাজেলাবাদ শেষে মুসলিম জগৎ থেকে বিতাড়িত হলো। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে গতানুগতিক আচার-ধর্ম একছত্র আধিপত্য লাভ করল। সংস্কারের কাল মেঘে মোস্লেম-জগৎ আচ্ছন্ন হলো।

এইসময়েই কিন্তু নতুন এক ভাবধারা এসে মুসলিম জগৎকে সঞ্জীবিত করে তুলল। এই ভাবধারাকে সুফিবাদ বলা হয়ে থাকে। মোতাজেলাবাদীরা তাঁদের সাধনাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিন্তা এবং যুক্তির উপর। সুফিরা তাঁদের সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন প্রেম এবং প্রেরণার উপর। মোতাজেলাবাদীরা বিজ্ঞান এবং দর্শনের সাহায্যে সত্যের পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছিলেন। সুফিরা প্রেম এবং আবিলতামুক্ত অন্তরে প্রাপ্ত ঐশ্বরিক প্রেরণার সাহায্যেই সত্যস্বরূপ এবং সৌন্দর্যস্বরূপ খোদার মিলনের পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার ফলে মোসলেম-জগতে অভিনব এক ভাবধারা, অভিনব এক সাধন-ধারা এসে দেখা দিয়েছিল। ফলে মরণোন্মুখ মুসলিম সভ্যতা আবার নতুন জীবনলাভ করেছিল। সুফিদের সাধন-ধারা মহাপুরুষদের প্রবর্তিত বিভিন্ন সাধনপদ্ধতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সাধনপদ্ধতিগুলিকে এক-একটি তরিকা বা পন্থা বলা হয়ে থাকে। কোন তরিকার গুপ্ত রহস্য জানতে হলে সে-তরিকার পীরের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়। আমি কখনো কোন পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিনি, সুতরাং সে-রহস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের দাবি আমি করতে পারি না। তবে ভাবসম্পদের দিক থেকে সুফিরা যে-দান বিশ্ববাসীকে, বিশেষত মুসলিমজাতিকে দিয়ে গেছেন, সেটা সত্যই জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার বস্তু।

সুফি-ভাবধারা ইরানে সবিশেষ বিস্তারলাভ করেছিল। যে ফারসি কাব্য-সাহিত্য বিশ্বসভ্যতার অন্যতম গৌরবের বস্তু তার জীবনধারা এই সুফি আদর্শ থেকেই প্রবাহিত হয়েছিল। শামস তবরেজ, রুমি, সাদি, হাফেজ, জামি প্রভৃতি মহাকবিরা সকলেই সুফিপন্থী ছিলেন। ওমর-খৈয়ামের কবিতাও সুফিভাবমূলক. তবে তিনি সুফি ছিলেন বলে মনে হয় না। মধ্যযুগের দরবেশ, আওলিয়া প্রভৃতি সকলেই সুফি মতবাদী ছিলেন।

মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সুফি-মতবাদ ভারতবর্ষে এসে দেখা দেয় এবং ভারতীয়, বিশেষত ভারতীয় মুসলিম জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। খাজা মইনুদ্দিন চিসতি, নিজামউদ্দিন আউলিয়া, শাহ সুফিসুলতান,

শাহজালাল প্রভৃতি বিখ্যাত তাপসেরা সকলেই সুফিমতাবলম্বী ছিলেন। আমীর খসরু, উরফি, ফায়জি, আবুল ফজল, কবীর, সারমুদ প্রভৃতি কবিরা সুফি-আদর্শই প্রচার করে গিয়েছেন। সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম যেমন রাষ্ট্রীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, খলিফা আলামামুনের সময় মোতাজেলাবাদ যেমন রাজকীয় সম্মানলাভ করে, মহামতি সম্রাট আকবরের সময় সুফিবাদ তেমনি সাম্রাজ্যের স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবর আজীবন সুফিমতবাদী ছিলেন এবং পরিণত বয়সে পীর বা ধর্মগুরুরূপে নিজেকে প্রচার করেন।

মধ্যাহ্ন আকাশে পৌঁছবার পরই সূর্য অস্তাচলগামী হয়, পাকার পরই ফল পচতে আরম্ভ করে, পূর্ণ বিকাশের পরই ফুল ঝরতে থাকে। কি সভ্যতা, কি মানবজীবন এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত নয়। পরিণতির পর তারাও পতনের পথে অগ্রসর হয়। অশোকের পর বৌদ্ধধর্ম পতনের পথে গিয়েছিল, আল মামুনের পর মোতাজেলাবাদ পতনের পথে গিয়েছিল, আকবরের পর সুফিবাদও পতনের পথেই গিয়েছে। মৃত্যুর জীবাণু প্রত্যেক আদর্শবাদের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে। আদর্শ পূর্ণপরিণতি লাভ করলে জীবাণুগুলি পুষ্ট হয়, আর তারপর, সেই আদর্শকে বিনষ্ট করে তবে ছাড়ে। যে সুফিবাদ একদিন এই বিশ্বে সগৌরবে বিরাজ করত, এখন সে-আদর্শ পীর-পূজা, কবর-পূজা প্রভৃতি অর্থহীন, অনেকক্ষেত্রে অনিষ্টকর আচারেই পর্যবসিত হয়েছে।

সুফি-আদর্শের বাইবেল হচ্ছে জালালুদ্দিন রুমির 'মাসনাভী' নামক বিরাট কাব্যগ্রন্থ। প্রত্যেক দুই লাইনের মধ্যে মিল রেখে যে কবিতা লেখা হয়, ফারসিতে তাকেই মাসনাভী ছন্দ বলে। রুমির সমগ্র গ্রন্থটি এই ছন্দে লেখা হয়েছে বলেই একে মাসনাভী নামে অভিহিত করা হয়। জ্ঞান, চিন্তা এবং ভাবের ঐশ্বর্যে এ-গ্রন্থ সত্যই অতুলনীয়। মানুষ কিসের সন্ধানে ফেরে, কিসের জন্য তার অন্তরের ব্যাকুলতা, কার বিরহে সে কেঁদে বেড়ায়, এই চিরন্তন সমস্যার আলোচনা নিয়েই রুমি তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধ করেছেন। এসব প্রশ্নের তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তাই হলো সুফিবাদের মূলকথা। মহাকবি বলছেন ঃ

বাঁশীর সুর শোন!

কেন সে নিজের কথা বলে চলেছে?

কিসের বিরহে সে কাঁদছে?

সে বলে, যেদিন হতে ঝাড় থেকে তারা আমায় বিচ্ছিন্ন করেছে, সেইদিন থেকেই আমার এই ক্রন্দন!

আমার বিলাপ শুনে নরনারী সকলেই চোখের জল ফেলতে থাকে! মনের সবকথা কিন্তু আমি খুলে বলতে পারি না!

আমি চাই বুক আমার শতধা বিদীর্ণ হোক, তবে তো আমার বলার সাধ মেটে!

জন্মভূমি থেকে যে দূরে পড়ে আছে, তার একমাত্র সাধনা হলো জন্মভূমিতে ফিরে যাবার সাধনা! আমার অবস্থাও ঠিক তাই!

যেখানে যাই সেখানেই আমি কাঁদি! বড়দের সভায় গিয়েছি, সেখানে কেঁদেছি! ছোটদের সভায় গিয়েছি, সেখানেও আমি কেবল কেঁদেছি!

কেন আমি কাঁদি?

আমার কাঁদার মধ্যেই তার সন্ধান তুমি পাবে!

তবে সাধারণ মানুষ অন্ধ, বধির!

চোখ তাদের আছে বটে কিন্তু তারা দেখতে পায় না!

কান তাদের আছে বটে কিন্তু তারা শুনতে পায় না!

এই আমাদের দেহ থেকে প্রাণ তো দূরে থাকে না; আর প্রাণও দেহ থেকে দূরে থাকে না। অথচ প্রাণ বস্তুটাকে কেউ দেখতে পায় না!

বাঁশীর এই ক্রন্দন, সে কিছু বাতাসের ফুৎকার নয়। লেলিহান, জ্বলন্ত অগ্নিশিখা! এ শিখা যার প্রাণে নাই তার মরাই ভাল!

বাঁশীর মতো বিষ কে কবে দেখেছে? আর বাঁশীর মতো বিষ-পাথরই কে কবে দেখেছে?

বাঁশীর মতো সঙ্গী কে কবে দেখেছে? বাঁশীর মতো দরদী বন্ধু কে কবে দেখেছে?

বাঁশী সেই পথের সংবাদ আমাদের শুনায় যে-পথে আছে বিপদ, যে-পথে আছে মৃত্যু!

মজনুর প্রেমকাহিনী সে আমাদের বলে!

বাঁশীর মুখে দুইটি ঠোঁট!

আমারও বন্ধু দুইটি ঠোঁট আছে। আমার এক ঠোঁট প্রেমাস্পদের অধরোষ্ঠের সঙ্গে মিলিত, আরেক ঠোঁট তোমাদের উদ্দেশ্যে কাঁদছে, বিলাপ করছে, সঙ্গীতের মধ্যে বিষাদের করুণ সুর তুলছে!

দেখবার চোখ যার আছে, সে বুঝতে পারে, তোমাদের কাছে আমার যে এই ক্রন্দন, তার উৎস হচ্ছে অপর প্রান্তে!

আমার বাঁশীর সুর—তাঁর সুরেরই প্রতিধ্বনি!

আমার আত্মার ক্রন্দন—তার ক্রন্দনেরই প্রতিধ্বনি!

যে তথ্য আমি প্রচার করি, তার অর্থ সেই বোঝে যে আপনভোলা মানুষে পরিণত হয়! গানের সমঝদার সেই শ্রোতা শোনবার কান যার আছে!

বিরহের ক্রন্দনে দিনের পর দিন আমার কেটে যাচ্ছে; ক্রন্দন আর বিলাপ এই হলো আমার জীবন!

কেঁদেই আমি জীবন কাটাচ্ছি! তাতে কিন্তু আমার দুঃখ নাই। হে আবিলতামুক্ত পবিত্রতার স্বরূপ—তুমি সগৌরবে এই বিশ্বে বিরাজ কর (তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট)!

যে মৎস্য নয়, সেই অল্প জলে সন্তুষ্ট হয় (মৎস্যের জন্য সমুদ্রের অনন্ত সলিলরাশির দরকার)!

যার কপালে এ ভোগ নাই, বৃথাই তার জীবন!

চিরসুন্দর, চিরসত্যের সঙ্গে মিলন ছাড়া মানুষের জীবন সার্থক হয় না। সুফি কিন্তু বলেন, সে মহামিলনের রত্নমণ্ডিত সৌধে উঠতে হবে নশ্বরের প্রেমের সোপানাবলী অতিক্রম করে। নশ্বর প্রেমাস্পদকে ভালবাসতে হবে। সেই ভালবাসাই অবিনশ্বরের প্রেমের সন্ধান আমাদের দেবে। নশ্বর জীবনকে তাচ্ছিল্য করলে, অবিনশ্বর জীবন আমাদের হস্তগত হবে না। নশ্বর প্রেমাস্পদকে তাচ্ছিল্য করলে অবিনশ্বর প্রেমাস্পদ আমাদের ধরা দেবেন না। সোপান অতিক্রম না করে যেমন হর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় না, নশ্বরের প্রেম অতিক্রম না করে তেমনি অবিনশ্বরের প্রেমে পৌঁছান যায় না।

সুফিবাদের এই মূলতত্ত্বটি মহাকবি জামি সুন্দর এক উপাখ্যানের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন ঃ

এক শিষ্য তার পীরের কাছে গিয়ে বললে আমার সাধনার পথ দেখান!

পীর বললেন ঃ "তুমি কি কারও প্রেমে পড়ে উদভ্রান্ত হয়েছ? তা যদি না হয়ে থাক, তাহলে এক্ষুণি গিয়ে কাউকে ভালবাসতে আরম্ভ কর। তারপর যথাসময় আমার কাছে এস!

"নিশ্চয়ই জেনো, রূপের শরাব পান না করে কেউ অরূপের শরাব উপভোগ করতে পারবে না!

"তবে অবশ্য রূপের জগৎকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না; রূপের জগৎ হলো অপরিহার্য এক সেতু! যত শীঘ্র পার এ সেতু অতিক্রম করে অগ্রসর হও!

"গন্তব্যস্থানে যদি পৌঁছুতে চাও, সেতুর উপর তাহলে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না! যত শীঘ্র পার সেতু অতিক্রম করে অগ্রসর হও!

"খোদাকে ধন্যবাদ, যতদিন এই নশ্বর রূপের জগতে আমি ছিলাম, ততদিন প্রেমের খেলা খুব খেলিয়েছি!

"ধাত্রী আমার নাড়িকে মায়ের নাড়ি থেকে বিযুক্ত করেছিল প্রেমের ছুরিকা দিয়ে!

"মা প্রেমের তাড়নাতেই আমার মুখে স্তন রেখে তাঁর দুগ্ধ দিয়েছিলেন!

"মস্তকের কেশ আমার এখন দুগ্ধের মতোই শুভ্র। মাতৃদুগ্ধের মধুর স্বাদ এখনো কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি!

"কি বার্ধক্যে, কি যৌবনে, প্রেমের মতো জিনিস নাই!

"প্রেমের যাদুই অনবরত আমার মনকে চালিয়ে যাচ্ছে!

"হে জামি! প্রেমের পথেই তুমি বৃদ্ধ হয়েছ! সব ছেড়ে এখন এই প্রেমের পথেই মর!"

প্রেমিক সুফি মানবপ্রেমের মধ্যে ভগবদ্ প্রেমের সন্ধান পেয়েছিলেন, ধর্মের সন্ধান পেয়েছিলেন; জীবনের গুপ্ত রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। আদর্শ মহাকবি সাদি অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

"বিশ্ববাসীর সেবা ছাড়া ধর্ম আর কিছু নয়!

"তসবিহ্-গণনা (মালা জপ করা), জানামাজে বসে প্রার্থনা আর সুফির মোটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে বেড়ান, এসবকে প্রকৃত ধর্ম বলে গণ্য করা যায় না!"

প্রেমিক সুফি পৌত্তলিককে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতেন না। চিরসুন্দরের অপরূপ সৌন্দর্যের একটুখানি আভা প্রতিমার দেহে পড়েছে বলেই তো পৌত্তলিক তার সামনে প্রণত হয়। এই সত্যটিকে মহাকবি ওমরখৈয়াম অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

প্রতিমাপূজককে সম্বোধন করে প্রতিমা বললে ঃ "হে ভক্ত! কেন তুমি আমার সামনে প্রণত হচ্ছ তা কি তোমার জানা আছে? তাঁর সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব আমার উপর এসে পড়েছে!

"তাইতো তুমি আমার প্রেমিক! তাইতো তুমি আমার ভক্ত!"

অক্ষরবাদী আচারপন্থীদের মধ্যে শাস্ত্রের প্রত্যেক বিধানের, শাস্ত্রের প্রত্যেকটি উক্তির চুলচেরা ব্যাখ্যা নিয়ে অনবরত কলহ-কোন্দল চলেছে। সে-কলহের শেষ নাই, সে-কোন্দলের মীমাংসা নাই। ফলে জীবনে এসে দেখা দেয় মারামারি, কাটাকাটি, আর খুনোখুনি! প্রেমের নামে হিংসার তাণ্ডবলীলা,

প্রেমস্বরূপের জন্য ষোড়শোপচারে বিদ্বেষের পূজা; জ্ঞানী সুফির কাছে এ-কলহের কোন সার্থকতা নাই! মহাকবি হাফেজ সুফির আদর্শ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ "বাহাত্তরটি ধর্মসম্প্রদায়ের এই যে কলহ—তারজন্য তাদের ক্ষমা কর! সত্য দেখতে পায়নি বলেই অলীকের পেছনে তারা গিয়েছে।"

প্রকৃত সুফির কাছে হিন্দু, মুসলমান, পারশি, খ্রীস্টান সবই সমান। সবকে ভালবাসতে হবে, সবের দুঃখ দূর করতে হবে, সবের ধর্মের সম্মান করতে হবে. এই হলো সুফির সুমহান আদর্শ। হাফেজের কথায় ঃ "হে হাফেজ! তুমি যদি সত্যস্বরূপের সঙ্গে মিলন কামনা কর, সকলের সঙ্গে তাহলে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন কর! মুসলমানের সঙ্গে 'আল্লা, আল্লা' বল, আর ব্রাহ্মণের সঙ্গে বল 'রাম রাম'!"

এই উদার মনোভাবের সুন্দর একটি নিদর্শন আমাদের এই বাংলাদেশেই বর্তমান আছে। পাঠক, হুগলি জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া গ্রামের নাম শুনে থাকবেন। বাদশাহী আমলে এস্থান সমৃদ্ধ এক জনপদ ছিল। এখনো সেখানে বিরাট এক মসজিদের ভগ্নাবশেষ এবং অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান প্রকাণ্ড এক মিনার দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই পাণ্ডুয়ায় সাহসুফি সুলতান নামক বিখ্যাত এক দরবেশের মাজার বা সমাধি-সৌধ বর্তমান আছে। শাহ্ সাহেব সুলতান জালালুদ্দিন খিলজির সময় বাংলাদেশে এসেছিলেন। মাজারের নিকটে ক্ষুদ্র একটি মসজিদ আছে। সেই যুগের তৈরি সেই মসজিদে এখনো নামাজ হয়ে থাকে। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশেই শাহ্ সাহেবের মাজার!

আমি একবার মোটরযোগে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। মাজার দর্শনের উদ্দেশ্যে মোটর থেকে নামলুম। তখন সন্ধ্যা সমাগত। মসজিদ থেকে আজানের আহ্বান শুনতে পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে আরতির শঙ্খ এবং কাঁসরের ঘণ্টাও বেজে উঠল। এমন অপূর্ব ঘটনা কোথাও দেখিনি। আমাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধ খাদেম বা সেবাইত ছিলেন। তাঁকে এবিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করলুম। তিনি যা বললেন তা শুনে বিস্ময়ে সত্যই অভিভূত হলুম। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম এই যে. মুসলমানের যিনি খোদা তিনিই হিন্দুর ভগবান। তাঁরই উদ্দেশে আজানের ডাক আর শঙ্খের হাঁক। ভাষা, আচার, রীতি এসবই তো বাইরের। অন্তর্যামী মনুষ্যমাত্রেরই অন্তর দেখে বিচার করেন এবং প্রেম ও ভক্তির বন্ধনে বাঁধা পড়েন। সর্বশাস্ত্র তাঁরই মহিমা কীর্তন করে। সেই প্রেমের ঠাকুরকে যিনি জেনেছেন বা চিনেছেন তাঁর ভেদবুদ্ধি থাকতে পারে না।

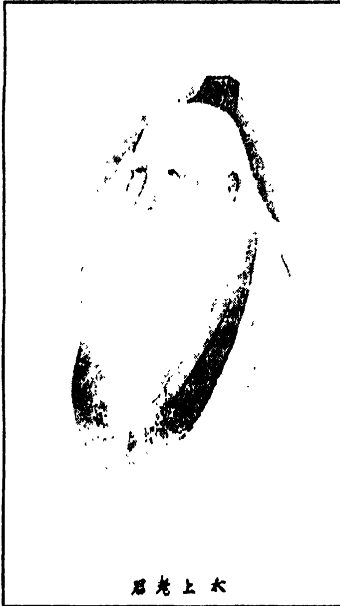
বৃদ্ধ সেবাইতের সহজ সরল বিশ্বাস আমার অন্তর অভিভূত করল। আমি সসম্ভ্রমে আনত হয়ে কবর চুম্বন করলাম। ফিরবার পথে বার বার মনে হতে লাগল, হায়, আমরা বাঙালী যদি আজ এই প্রেমের ধর্মে অভিষিক্ত হতে পারতাম তাহলে সৌহার্দে, প্রেমে, আত্মার আত্মীয়তায় এ-দেশে কী শ্রেয়, শান্তি ও কল্যাণই না বিরাজ করত! বাংলার সরস চিত্রক্ষেত্রে সুফি ও বৈষ্ণবের পারস্পরিক প্রভাব, সংমিশ্রণ ও রসায়ন এক অপূর্ব সহজ প্রেমধর্মের আবির্ভাব সম্ভব করে তুলেছে। এটা যেমনি মানবধর্মী, তেমনি সার্বজনীন। স্বার্থান্ধ লোকের প্ররোচনা না থাকলে, বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলন খুবই সহজ ছিল এবং এখনো আছে আর ভাবীকালেও থাকবে।* □

* ৪৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

তাওধর্ম

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঋষি Lao Tsi লাও-ৎসি[১] চীনদেশে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কিছুপূর্বে আবির্ভূত হন। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক মানব-চিন্তার ইতিহাসে এক অতি লক্ষণীয় যুগ। এইসময়ে ভারতে উপনিষদের যুগের অবসান, ঋষিগণ তাঁহাদের দর্শন লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন; বুদ্ধ ও মহাবীর এইসময়ে ও ইহার অব্যবহিত পরে আবির্ভূত হন; পারস্যে ঋষি Zarathushtra জুরথুশত্র (জরথুস্ট্র) বা Zoroaster জোরোআস্তের দেখা দিয়াছেন; ইহুদী ভাববাদীদের কেহ কেহ এইসময়ে আবির্ভূত হন; এবং প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরাও এইসময় হইতেই প্রকট হইতে আরম্ভ করেন। ৬০৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে উত্তর-চীনে লাও-ৎসির জন্ম হয়—তখন চীনজাতি ও চীনা সভ্যতা উত্তর-চীনে Hwang-ho হবাঙ-হো বা পীত নদীর উপকূল আশ্রয় করিয়াছিল, মধ্য বা দক্ষিণ-চীনে, Yang-tsze-kiang য়াঙ্-ৎসে-কিয়াঙ্ নদীর কূলে ও তাহার আরো দক্ষিণে Si-kiang সী-কিয়াঙ্ নদীর তীরে প্রসৃত হয় নাই। ইঁহার তিরোভাবের সময় জানা যায় না; জীবনের কথাও বেশি সংরক্ষিত হয় নাই। চীন-দেশ অর্থাৎ উত্তর-চীন ঐসময়ে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। লাও-ৎসি এইরূপ একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজকীয় ঐতিহাসিক স্বরূপ রাজ্যের গোপন বা রাজকীয় কাগজপত্রের অধিকারী ছিলেন: প্রাচীন ভারতের ভাষায়, 'পুস্তপাল' ছিলেন। 'কাগজপত্র' না বলিয়া, 'বংশফলক' সমূহের অধিকারী বলা উচিত; কারণ তখন কাগজ আবিষ্কৃত হয় নাই, উত্তরকালে চীনারাই এই অত্যাবশ্যক বস্তুর আবিষ্কার করে; এবং চীনারা লিখন-কার্যে ভারতবাসীদের মতো ভূর্জত্বক বা তালপত্র বা অন্যকোন 'পত্র' ব্যবহার করিত না, গ্রীক ও পারসিকদের মতো 'পুস্ত' বা মেষচর্মও ব্যবহার করিত না, মিশরীয়দের মতো papyrus 'পাপিরস' অর্থাৎ জলজ উদ্ভিদ-বিশেষের বল্কলও তাহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল; তাহারা বাঁশের পাতলা বাঁখারি বানাইয়া লোহার লেখন দিয়া তাহাতে আঁচড় কাটিয়া লিখন-কার্য সমাধা করিত, বাঁখারি বা বংশ-ফলকে উপর হইতে নিচে লেখা নামিত। তিনি যে পণ্ডিত ছিলেন, তখনকার দিনের চৈনিক বিদ্যা বা শাস্ত্রে তাঁহার পুরা



লাও-ৎসি

অধিকার ছিল, ইহা সহজেই অনুমেয়। প্রাচীনকালে, তাঁহার পূর্বে, চীনা দার্শনিকদের চিন্তাধারার অধিকারী তিনি ছিলেন এবং তাঁহার নামের সহিত জড়িত 'তাও'-বাদ অন্তত আংশিকভাবে তিনি তাঁহার পূর্বজ পথিকৃৎদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যুক্তিযুক্ত।

দার্শনিক পণ্ডিত অথবা চিন্তানেতা ঋষি বলিয়া জীবৎকালেই তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়। চীনদেশের সর্বপ্রধান ও সর্বজন-পূজিত চিন্তানেতা, ঋষিকল্প পণ্ডিত ও জ্ঞানী খুঙ-ফূ-ৎসি (Khung Fu-tsze, Confucius রূপে ইঁহার নাম খ্রীস্টান মিশনারিগণ কর্তৃক লাতিন ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে), তিনি ছিলেন লাও-ৎসির সমসাময়িক, লাও-ৎসি অপেক্ষা বয়সে তিনি বিশেষ নবীন ছিলেন। খুঙ্-ফূ-ৎসির দার্শনিক চিন্তা, অন্তর্মুখিতা অপেক্ষা ব্যবহারিকতার পরিপোষক ছিল। খুঙ্-ফূ-ৎসি ছিলেন নীতিবিদ সমাজ-সংস্কারক, শাশ্বত সত্তা বা সত্যের উপলব্ধি তাঁহার বিচার-পদ্ধতির বা আলোচ্য বস্তুর বাহিরে ছিল। লাও-ৎসি ঠিক ইহার বিপরীত ছিলেন; ব্যস্তবাগীশ সমাজ-সংস্কারক, যাঁহারা মানুষকে ভাল করিবার ভার নিজের স্কন্ধে লইয়া জগতে চলেন, লাও-ৎসি তাঁহাদের পথের পথিক ছিলেন না; সার সত্যের উপলব্ধিই মানুষের পরমার্থ, এই বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, রাজ্যের বা সংসারের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে নিস্পৃহ হইয়া জীবনযাত্রা করাই তিনি শ্রেয় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি পণ্ডিত এবং ধীর স্থির আত্মসমাহিত ব্যক্তি, একথা শুনিয়া খুঙ-ফূ-ৎসি একবার তাঁহার নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য গিয়াছিলেন। লাও-ৎসি খুঙ-ফূ-ৎসির এই আগ-বাড়া হইয়া সমাজ-সংস্কারকের বৃত্তি ও উপদেষ্টার পদ-গ্রহণ পছন্দ করেন নাই; অপরকে ভাল করিয়া বেড়াইবার চেষ্টা অপেক্ষা নিজের আত্মার সংস্কৃতি, শাশ্বত সত্যের জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টাই তাঁহার ঈপ্সিত পন্থা ছিল। সেইজন্য তিনি নীতিবাগীশ খুঙ-ফূ-ৎসিকে একটু অসহিষ্ণুতার সহিত ধমকাইয়া দিয়াছিলেন; সংস্কারকের পদ লইয়া ঘুরিয়া বেড়ানোর মধ্যে যে যথার্থ সত্যের সাধনার পথে অন্তরায় স্বরূপ অনুচিত একটু আত্মশ্লাঘা আসিতে পারে, তাহা লাও-ৎসি ধরিয়াছিলেন, হয়তো খুঙ-ফূ-ৎসির মধ্যে তাহা লক্ষ্যও করিয়াছিলেন। সংস্কারক ও রাজনৈতিক খুঙ-ফূ-ৎসি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি লাও-ৎসিকে ঠিকমতো বুঝিতে না পারিলেও, তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া একটু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন; বাহ্য সাংসারিক জগৎ লইয়া ব্যস্ত সমাজরক্ষককে মুহূর্তের জন্য যেন অদৃশ্য জগতের একটা ঝলক আসিয়া বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিল। খুঙ-ফূ-ৎসি বিচলিত হইয়া, তাঁহার নিজ সযত্ন-পোষিত মতের বিপরীত লাও-ৎসির মতবাদটিকে ঠিক ধরিতে না পারিয়া, অথচ তাহার মধ্যে একটা বড় কিছু আছে তাহা কতকটা বুঝিতে পারিয়া, লাও-ৎসির নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিমূঢ়ভাবে নিজ অনুগামী শিষ্যদের বলিলেন ঃ "পাখিরা উড়ে, মাছ সাঁতার কাটে, বন্য পশু দৌড়াইয়া বেড়ায়। যাহারা দৌড়াইয়া বেড়ায়, ফাঁদ পাতিয়া তাহাদের ধরা যায়; যাহারা সাঁতার কাটে, তাহাদের জন্য জাল বোনা যায়; উড়ন্ত পাখির জন্য বাণ ছোঁড়া যায়। কিন্তু গগনবিহারী Dragon বা মহানাগ—সে যে কি করিয়া আকাশ-মার্গী হইয়া বায়ুমণ্ডলে ও মেঘমণ্ডলে সঞ্চরণ করে, তাহা তো জানি না। আজ লাও-ৎসি-কে দেখিলাম। তিনি কি এই মহানাগের মতো?"

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের বিখ্যাত চীনা ঐতিহাসিক Sze-ma Tsien সজ্যু-মা-ৎসিয়েন এই লাও-ৎসি খুঙ-ফূ-ৎসি-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক, অল্প কয়েকটি কথায় লাও-ৎসির যে-জীবনকথা লিখিয়া যান, তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাঁহার সম্বন্ধে উত্তরকালে তাঁহার মতানুসারী দুই-চারিজন অন্য দার্শনিক পরোক্ষভাবে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য ততটা নাই। যাহা হউক, সজ্যু-মা-ৎসিয়েন-এর বৃত্তান্ত হইতে আমরা এই তথ্যটুকু পাই যে, লাও-ৎসি যখন অতি বৃদ্ধ হন, তখন স্বদেশের অবশ্যম্ভাবী নৈতিক অবনতি দেখিয়া, দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য চীনদেশের পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন (Yin Hi) য়িন-হী নামে এক চুঙ্গির কর্মচারী তাঁহাকে বলেন ঃ "মহাশয়, আপনি তো কোথায় চলিলেন ঠিক নাই; দয়া করিয়া আপনার শিক্ষা আমার জন্য পুস্তকাকারে লিখিয়া যান।" লাও-ৎসি তদনুসারে একখানি ছোট পুস্তিকা লিখিয়া রাখিয়া অজ্ঞাত কোনস্থানে চলিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর কাল ও স্থান কেহ জানে না।

সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষ পাদে (অর্থাৎ ৫২৫-৫০০ খ্রীস্টপূর্ব বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে) তাঁহার পরলোকগমন ঘটে। তখন খুঙ-ফূ-ৎসির খুব প্রতিষ্ঠা—খুঙ-ফূ-ৎসির জীবৎকাল ছিল ৫৫৪-৪৭৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। চীনা জাতি ছিল মুখ্যত ইহলোক-সর্বস্ব, আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা সমাজপরায়ণতা এই জাতির কাছে বেশি রোচক ছিল, অন্তত বেশিরভাগ লোকের কাছে; সুতরাং ঋষি লাও-ৎসির গভীর দার্শনিক চিন্তা চীন জাতিকে ততটা প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই, যতটা খুঙ-ফূ-ৎসির সমাজ-সংরক্ষণ-বাদ করিয়াছিল। তথাপি, লাও-ৎসি যে ক্ষুদ্র পুস্তকখানি দিয়া গিয়াছেন—অথবা যে ক্ষুদ্র পুস্তকখানি এখন লাও-ৎসির নামে চলিতেছে, উহাকে তাঁহাদের জাতির শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ বলিয়া বহু ভাবুক ও পণ্ডিত চীনা, জীবনের প্রধান আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন ও আছেন; এবং নানা ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে চীনদেশের বাহিরে ইহার প্রচারের ফলে লাও-ৎসির নামের সহিত জড়িত Tao-Teh-King 'তাও-তেঃ-কিঙ' বইখানি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুস্তকরূপে বিশ্বসাহিত্যে নিজ গৌরবময় আসন করিয়া লইয়াছে ও তৎসঙ্গে চীনজাতির সংস্কৃতির গৌরবকেও বাড়াইয়াছে। সহৃদয় হিন্দুপাঠক অকুণ্ঠিত চিত্তে এই বইকে আমাদের প্রধান বারোখানি উপনিষদের পাশে স্থান দিবেন, নিজ আধ্যাত্মিক সাধনায় অথবা আধ্যাত্মিক রস-আস্বাদনে এই বইয়ের উপযোগিতা স্বীকার করিবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য জাতির ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। এক ইংরেজীতেই ইহার সাত আটটি অনুবাদ মিলিবে। তন্মধ্যে এই বইয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিবার জন্য সবচেয়ে উপযোগী হইতেছে Lionel Giles-এর অনুবাদ—ইহা ক্ষুদ্রাকার পুস্তক, লাও-ৎসির মূল বইয়ের অধ্যায়গুলি ইহাতে নূতনভাবে বিষয় ধরিয়া সাজানো হইয়াছে, সুপরিচিত Wisdom of the East গ্রন্থমালায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, Paul Carus-এর অনুবাদ আছে, উহাতে চীনা মূল, আধুনিক চীনা উচ্চারণ ধরিয়া মূলের রোমান প্রত্যক্ষরীকরণ ও আক্ষরিক অনুবাদও মিলিবে—এই বইখানি বিশেষ উপযোগী সংস্করণ। সম্প্রতি মূলের

সহিত এক চীনা বিদ্বানের কৃত ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে; এবং চীনা গ্রন্থের বিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদক Arthur Waley-কৃত অনুবাদ, ইংরেজী সাহিত্যেরও একটি শ্রেষ্ঠ বই হইয়াছে। আমাদের কোন ভারতীয় ভাষায় মূল চীনা ধরিয়া কোন অনুবাদ এযুগে হয় নাই। প্রাচীনকালে হইয়াছিল—সংস্কৃত ভাষায়; এই সংস্কৃত অনুবাদের কথা পরে বলিতেছি। (Lionel Giles) লায়োনেল গাইলস-এর ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই বই পড়িয়া মুগ্ধ হন এবং তদবলম্বনে বাঙলায় 'চীনের ধূপ' নাম দিয়া একটি ভাবানুবাদ প্রকাশ করেন।

লাও-ৎসির নামে প্রচলিত Tao-Teh-King 'তাও-তেঃ-কিঙ' বইখানি যে তাঁহার লেখা নহে এইরূপ মত কোন কোন চীনা এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য বহু পণ্ডিতের অভিমত এই যে, উহাতে আমরা হয়তো ঠিক লাও-ৎসি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা না পাইতে পারি, কিন্তু ইহাতে তাঁহার দার্শনিক মত ও শিক্ষা অনেকটাই সংরক্ষিত আছে; এবং অন্তত পক্ষে দুই হাজার বছরেরও অধিককাল ধরিয়া এই বই লাও-ৎসির বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে।

'তাও-তেঃ-কিঙ'-এ প্রতিপাদ্য লাও-ৎসির মতবাদের সূক্ষ্ম বিচার করিতে বসিবার মতো শক্তি ও সাহস আমার নাই। সাধারণ পাঠকের চোখে, উপনিষদের অনুরাগী হিন্দুর চোখে আমার এই বই দেখা; ইহার মূল ভাবগুলি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে, এই বই চিরকালের সাথী হইয়া আমার কাছে আছে। কেহ কেহ লাও-ৎসির বইয়ে ভারতের উপনিষদের প্রভাব আছে বলিয়া মনে করেন। চীন ও ভারতের প্রাচীন সংযোগের ঐতিহাসিক বিচার করিয়া এ-সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করি না। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আর্য-ভাষী ভারত এবং চীনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে নাই বলিয়াই মনে হয়; বিশেষজ্ঞদের মতে, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে অথবা পঞ্চম শতকে, মধ্য-এশিয়া অথবা Yun-nan য়ুন-নান বা দক্ষিণ-পূর্ব চীনের পথ দিয়া ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়া থাকিতে পারে মাত্র। আমার মনে হয়, লাও-ৎসির প্রতিপাদিত 'তাও'-বাদ ও আমাদের ব্রহ্মবাদ বা ঋতবাদ, দুইটি বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত একই প্রকারের চিন্তার ফল। এই একধরনের উপলব্ধির দ্বারা বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে ভাব-সাম্য প্রকটিত হয়; এবং এইপ্রকার ভাব-সাম্যের মধ্যে হয়তো আমরা এই উপলব্ধির সত্যতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত বা সম্ভাব্যতা দেখিতে আদিষ্ট হইতেছি।

লাও-ৎসি দর্শনের মূল কথা হইতেছে Tao 'তাও'; 'তাও' আধুনিক উচ্চারণ, শব্দটির প্রাচীন উচ্চারণ 'ধাউ' Dhâu ছিল বলিয়া ভাষাতাত্ত্বিকেরা স্থির করিয়াছেন। চীনা ভাষায় 'তাও' শব্দের মৌলিক অর্থ হইতেছে 'পথ'। ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণমালার সাহায্যে চীনা ভাষা লিখিত হয় না—ভাব-দ্যোতক বিভিন্ন অক্ষর বা বর্ণ, যাহা ধ্বনির অপেক্ষা রাখে না, তদ্দ্বারা চীনা শব্দ লিখিত হয়। চীনা ভাষার তাবৎ শব্দ monsyllabic বা একাক্ষর। Tao শব্দটি যে অক্ষরের সাহায্যে চীনা ভাষায় লিখিত হয়, তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই—"যাহার সাহায্যে কোন পদার্থের মুখ

বা আরম্ভে পৌঁছানো যায়।" নিম্নে এই অক্ষরের প্রাচীন ও আধুনিক রূপ প্রদর্শিত হইল। প্রাচীন রূপে অক্ষরের মধ্যে মূল ভাবচিত্রের প্রকৃতি অনেকটা সংরক্ষিত আছে; পূর্বোল্লিখিত বংশফলকের উপরে লোহার লেখনীর আঁচড়ে লেখা অক্ষর এইরূপ। পরবর্তী রূপটির উদ্ভব হইল খ্রীস্ট-জন্মের আশপাশে, তখন চীনারা পুরাতন বংশফলকের ও লোহার লেখনীর পরিবর্তে রেশমের কাপড় বা পটের উপর তুলির সাহায্যে কালি দিয়া লিখিবার রীতি আবিষ্কার করে। যাহা হউক, মৌলিক অর্থ 'পথ', তাহার প্রসারে 'চলা', তদনন্তর 'বিচার করা' এবং তাহা হইতে ভাবার্থ দাঁড়ায় Reason 'বিচার-শক্তি'; কিন্তু Reason বা 'বিচার-শক্তি' বলিলে যাহা বুঝিব, লাও-ৎসির 'তাও' তদপেক্ষা গভীর ও ব্যাপক বস্তু। বাস্তবিক পক্ষে, ইহার অনুরূপ ভাবের কল্পনা বা প্রকাশ আমরা ভারতের উপনিষদে 'ব্রহ্ম' শব্দের মধ্যেই পাই। উপনিষদে ব্রহ্মের যেমন নির্গুণ ও সগুণ এই দুই অবস্থায় বিচার বিদ্যমান, লাও-ৎসি-ও তদ্রূপ 'তাও'-কে আপন সত্তায় বিরাজমান নির্গুণ রূপে দেখিয়াছেন, এবং তাহাকে সগুণ, বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে প্রকাশমান ও ক্রিয়াশীল রূপেও দেখিয়াছেন।



'ধাউ' Dhâu বা 'তাও' Tạo
= 'ঋত' Rta

'তাও' শব্দের প্রকৃষ্ট সংস্কৃত প্রতিশব্দ লইয়া চীনা ও ভারতীয় পণ্ডিতেরা বহু পূর্বে চিন্তা করিয়াছিলেন। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক Hiuen Tsang হিউএন-ৎসাঙ যখন ভারতে আসেন, তখন ভারত ও চীনের সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক সংযোগ ও সহযোগিতায় মধ্যাহ্নকাল। চীনদেশীয় বিদ্যার্থীরা ভারতে আসিতেন, ভারতীয় বৌদ্ধ গুরু ও উপদেশকেরা চীনে যাইতেন; চীনারা সংস্কৃত শিখিতেন, ভারতীয়েরা চীনে গিয়া চীন-ভাষা শিখিতেন এবং উভয় জাতীয় পণ্ডিতের সহযোগিতায় প্রায় সমগ্র ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র চীনভাষায় অনূদিত হয়। হিউএন-ৎসাঙ ভারতের নানাপ্রদেশে পর্যটন করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুর বা কামরূপে গিয়াছিলেন। তখন সেখানকার রাজা ছিলেন ভাস্করবর্মা; তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বৌদ্ধ চীনা পণ্ডিতকে সমাদর করিয়া নিজ রাজ্যে আহ্বান করেন। ভাস্করবর্মা চীনদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেন, এবং চীন সাহিত্যের কোন শ্রেষ্ঠ বই ভারতীয় পাঠকদের জন্য যাহাতে সংস্কৃতে অনূদিত হয়, তদ্বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। হিউএন-ৎসাঙ রাজার ঔৎসুক্যের কথা স্মরণে রাখেন; এবং চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া ভারতের পণ্ডিতদের উপযোগী একমাত্র পুস্তক হিসাবে লাও-ৎসির 'তাও-তেঃ-কিঙ'-এর সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া ভাস্করবর্মার সভায় প্রেরণ করেন। এসব কথা আমরা চীনা ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ হইতে পাই। ফরাসী চীনবিদ পণ্ডিত (Paul Pelliot) পোল পেলিও চীনা বইয়ে এই খবর পাইয়া ভারতে—আসাম অঞ্চলে—এই বইয়ের জন্য আগ্রহপূর্ণভাবে অনুসন্ধান করান, কিন্তু 'তাও-তেঃ-কিঙ'-এর এই প্রাচীন সংস্কৃত অনুবাদ এখনো মিলে নাই; হয়তো তাহা চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যদি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এই অনুবাদ কখনো পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা এক অপূর্ব বস্তু হইবে—'তাও-

তেঃ-কিঙ'-এর প্রাচীন পাঠ-নির্ণয়ের পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া এই সংস্কৃত অনুবাদ চীনা সাহিত্যেও আদরণীয় হইবে। যাহা হউক, চীনা গ্রন্থে 'তাও-তেঃ-কিঙ' অনুবাদকালে, 'তাও' শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ লইয়া চীন পণ্ডিতদের মধ্যে যে-আলোচনা চলিয়াছিল, তাহারও উল্লেখ আছে; হিউএন-ৎসাঙ এই চীন শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ হিসাবে 'মার্গ' শব্দটি ব্যবহার করেন। (এই সংবাদ আমার বন্ধু, বিশ্বভারতীর চীন-ভবনের সংস্কৃতাধ্যায়ী গবেষক ছাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীন-ভাষার অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তা-ফ চোউ (Ta-fu Chou)-এর নিকট পাইয়াছি)।

আমি নিজে কিন্তু আমাদের সংস্কৃত 'ঋত' শব্দ দ্বারা 'তাও' শব্দের অনুবাদ করিতে চাই। 'ঋত' বৈদিক শব্দ; হিউএন-ৎসাঙ ভারতে বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি এই শব্দ কেন তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গেল, জানি না। 'ঋত' শব্দের উৎপত্তি গমনার্থক 'ঋ'-ধাতু হইতে; 'ঋ'-ধাতুর উত্তর 'ত' (ক্ত) প্রত্যয় করিয়া 'ঋত' শব্দ। বিশেষণ-রূপে ইহার অর্থ, 'সঙ্গত; প্রভাবিত; উচিত, সত্য, সাধু' এবং 'পূজিত, প্রবুদ্ধ, প্রোজ্বল'; বিশেষ্য অর্থে, 'নির্ধারিত ক্রম, ধর্ম, রীতি, দৈবধর্ম, দেবনির্দিষ্ট পথ বা ধর্ম, দিব্য সত্য; ব্রত, প্রতিজ্ঞা; সূর্য; যজ্ঞ' ইত্যাদি। 'ঋ'-ধাতু ধরিয়া ইহার মূল অর্থ হইবে 'গত; তাহা হইতে, করণাত্মক 'গতি', গতিপথ, পথ' এবং তদনন্তর 'দেবদিষ্ট পথ, শাশ্বত ধর্ম' ইত্যাদি অর্থের বিকাশ। যে-পথের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সব কিছু, চালিত বা বাহিত হইতেছে বা গমন করিতেছে, সেই পথই 'ঋত', তাহাই সত্য। বৈদিক 'ঋত' শব্দের প্রাচীন-পারসিক প্রতিরূপ 'অর্ত' ও অবেস্তা-ভাষার প্রতিরূপ 'অষ', সত্য-অর্থে ইরান দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ঋ'-ধাতু হইতে 'ঋত' শব্দ, অর্থ-বিষয়ে স্থূল বা ভৌতিক স্তর হইতে মানসিক বা আত্মিক স্তরে উন্নীত হইয়াছে; কিন্তু গত্যর্থক অনুরূপ 'সৃ'-ধাতু হইতে কৃৎ-ত-প্রত্যয়-যোগে গঠিত আরেকটি শব্দ, অর্থ-বিষয়ে স্থূল বা পার্থিব স্তরেই পড়িয়া রহিয়াছে ঃ 'সৃ—সৃত' তাহা হইতে প্রাকৃতে 'সট', তদনন্তর 'সড', ও এই 'সড' পদে প্রাকৃতে স্বার্থে তদ্ধিত 'ক' বা 'ক্ক' প্রত্যয় জুড়িয়া দিয়া হইল 'সডক্ক' বা 'সড়ক্ক', এবং ইহা হইতেই আধুনিক বাঙলা হিন্দি প্রভৃতিতে পথ-বাচক 'সড়ক' শব্দের উৎপত্তি। আধ্যাত্মিক অর্থে উন্নয়ন, পথ-বাচক চীনা শব্দ 'তাও' (বা 'ধাউ') এবং সংস্কৃত শব্দ 'ঋত' উভয়েই বিদ্যমান; ব্রহ্ম-নির্দিষ্ট এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন সত্য পথ অর্থে 'ঋত' শব্দকে অতএব ব্রহ্ম-বাচক 'তাও'-শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। সুধিগণ এবিষয়ে বিচার করিয়া দেখিবেন।

'তাও' হইতেছে জগতের এবং জাগতিক তাবৎ চেষ্টার অন্তর্নিহিত এক এবং অদ্বিতীয় শক্তি। 'তাও' নিজ অব্যক্ত স্বরূপে অনাদি ও অনন্ত, অপরিবর্তনীয়; পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপনিষদের উক্তি ঃ "তদেজতি তন্নৈজতি, তদ্দূরে তদ্বন্তিকে, তদন্তরস্য সর্বস্য, তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ", 'তাও'-সম্বন্ধে চীনা ঋষির উক্তি দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়। 'তাও' অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ, অপার্থিব, অবাঙমনসোগোচর। অব্যক্ত 'তাও' হইতেছে বিশ্বপ্রপঞ্চের পরিচালক চিদ্-শক্তি, ইহা বিশ্বপ্রপঞ্চের নামরূপহীন রহস্যময় আদিকারণ, বিশ্বের মূলাধার।

আবার 'তাও' মানুষের চিত্তে ব্যক্তরূপ, ব্যক্তগুণ, মানুষী চিদ্‌ বা বোধ বা বিচারশক্তিরূপে ক্রিয়াশীল; 'তাও'-ই জগতে কার্যকর শক্তিরূপে বিচরণ করে। 'তাও' জগতের দ্বারা ব্যক্ত হইলেও, ইহা জগৎ-নিরপেক্ষ ধর্ম বা ঋত। ব্যক্ত হইলে, 'তাও' মানবের মধ্যে 'তেঃ' অর্থাৎ সদগুণরূপে দেখা দেয়। যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপে ভূমা 'তাও'-কে জানেন, জগতের সবকিছু 'তাও'-দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, এই বোধ বা উপলব্ধি বা অনুভূতি যাঁহার হইয়াছে, তিনি সংসারের কোন কিছুর দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না; ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লাভের সঙ্গে সঙ্গে যেমন মানুষের কর্মফল-স্পৃহা বিদূরিত হয়, তেমনি নিজ চিত্তে 'তাও'-এর স্বরূপের উপলব্ধি অন্তে মানুষ নিজজীবনে নৈষ্কর্ম্য-সাধন করে; 'তাও'-গত চিত্ত এবং 'তাও'-গত-কর্ম মহাপুরুষ নিরর্থক কর্মচেষ্টায় আত্মনিয়োজিত না হইয়া, জগতের উদ্বেগময় কর্মস্রোত হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মসমাহিত থাকেন। এই নৈষ্কর্ম্য-সাধন কেবল negative বা অভাবাত্মক নহে, ইহার মধ্যে positive বা ভাবাত্মক অথবা স্থিতি-ময় অবস্থা বা গুণও আছে; মানুষকে যখন তাহার প্রত্যেক চিন্তায় ও আচরণে in tune with the Infinite অর্থাৎ অসীমের সঙ্গে, শাশ্বতের সঙ্গে একসুরে বাঁধা হয়, যখন মানুষ rest in God অর্থাৎ ব্রহ্ম-ধামের অধিকারী হয়, তখনই সে এই নৈষ্কর্ম্য-সাধন করিতে পারে। তখন মানুষের পক্ষে জীবনের সব কাজ সরল ও সহজ হইয়া উঠে; 'তাও'-এর সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া চলিতে পারা যেন তাহার পক্ষে প্রবাসের পরে গৃহে প্রত্যাগমন স্বরূপ হয়—সারল্য, নৈষ্কাপট্য, শুচিতা, সাধুতা, সত্য প্রভৃতি গুণ তাহার জীবনের স্বাভাবিক অলঙ্কার হয়; জীবনের প্রত্যেক কাজ, বলপ্রয়োগ না করিয়া সে সমাধা করিতে পারে; বুদ্ধদেবের উপদেশ, ''অসাধুং সাধুনা জিনে'' অর্থাৎ 'অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে', তাহার প্রাক্-কথন লাও-ৎসি এইভাবে করিয়া গিয়াছেন—'ঘৃণার পরিবর্তে প্রীতি দাও।' আমেরিকার এক নিরক্ষর নিগ্রো জ্ঞানী নিজ নিরুদ্বেগ আনন্দময় জীবনের রহস্য এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—Ah just tries to co-operate wid de Inevitable 'আমি অবশ্যম্ভাবীর সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া চলিবার চেষ্টা করি'; এই মনোভাব, 'তাও'-বাদীরই মনোভাব।

পৃথিবীর সমস্ত জাতির শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে কেবল ভারতের ব্রহ্মবাদ ও চীনের এই 'তাও'-বাদ নিজেকে মিলাইয়া লইতে বা তাহাদের সম্পূর্ণতা দিতে পারে। উপনিষদ্, তথা গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধি মূলক ভারতের অন্য শাস্ত্রের মতো, ঋষি লাও-ৎসির 'তাও-তেঃ-কিঙ' সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এক অমূল্য রিক্থ। ইহার এক প্রামাণিক মূলানুসারী অনুবাদ ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষরূপে অপেক্ষিত। অধুনা-লুপ্ত সংস্কৃত অনুবাদটির জন্য আমাদের মনে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা জাগে—কিন্তু মহাকালের বিধানে এবিষয়ে আমরা এখন নিরুপায়।

নিম্নে 'তাও'-এর সম্বন্ধে লাও-ৎসির একটি শিক্ষাপদ বা অনুভূতি-পদের (ইংরেজী অনুবাদ অনুসরণ করিয়া ও মূল চীনা ধরিয়া) বাঙলা অনুবাদ দিয়া আমার প্রবন্ধের সমাপ্তি করিতেছি। ৮১টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায়ে 'তাও-তেঃ-কিঙ' বিভক্ত; ২৫-এর অধ্যায়ের ভাবানুবাদ এই—

২৫-এর অধ্যায় ।। (অজ্ঞাত) রহস্যের চিত্রণ ।।

নিখিল পদার্থকে পূর্ণরূপে ধারণ করিয়া একটি সত্তা বিদ্যমান।
দ্যৌঃ এবং পৃথিবীর পূর্ব হইতেই ইহা আছে।
শান্ত, আহা! অশরীরী, আহা! (অর্থাৎ কি আশ্চর্যভাবে ইহা শান্ত এবং অরূপ!)
ইহা একা স্তব্ধ হইয়া আছে, এবং ইহা পরিবর্তিত হয় না ।।১।।
ইহা সর্বত্র যায় এবং (কোথাও) বাধা পায় না।
এই হেতু ইহা স্বর্গ-মর্তের মাতা (অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চের আদি কারণ)।
আমি ইহার নাম (নাম-রূপ) জানি না।
(যদি) ইহার বর্ণনা করি, বলি 'তাও' ('ঋত') ।।২।।
যদি ইহার নাম দিতে হয়, বলি 'মহান' (বা ভূমা)।
এই ভূমাকে বলি, এড়াইয়া যাওয়া (বা পলায়নশীল)।
এই এড়াইয়া যাওয়াকে বলি 'সুদূর'।
এই সুদূরকে বলি 'ফিরিয়া আসা' (বা প্রত্যাবর্তন) ।।৩।।
কারণ, ঋত মহৎ।
দ্যৌঃ মহান।
পৃথিবী মহতী।
রাজশক্তি (বা নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালন-শক্তি)-ও মহতী।
জগতে এই চারি মহৎ বস্তু বিদ্যমান।
এবং রাজশক্তি (বা নিয়ামক বা পরিচালক শক্তি) এক অখণ্ড বস্তুরূপে এগুলিতে বাস করে ।।৪।।
মানুষ পৃথিবীকে অনুসরণ করে (অর্থাৎ মানুষ বিশ্বদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়)।
পৃথিবী দ্যৌঃকে অনুসরণ করে।
দ্যৌঃ 'তাও'-কে (ঋতকে) অনুসরণ করে।
'তাও' (ঋত) কিন্তু আপনাকেই অনুসরণ করে ।।৫।।

মন্তব্য—এই প্রবন্ধে ঋষি লাও-ৎসির যে-চিত্র দেওয়া গেল তাহা জাপানি চিত্রকর Keichyu Yamada কেইচ্যু য়ামাদা কর্তৃক অঙ্কিত; কেবল কল্পনার সাহায্যে এই মূর্তি অঙ্কিত, ঐতিহাসিকতা ইহাতে নাই। Paul Carus কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত 'তাও-নীতি' সম্বন্ধে চীনদেশে লোকপ্রিয় একখানি আধুনিক বই Thai-Shang Kan-Ying Phien-এর মুখপত্র হইতে গৃহীত। চীন ও জাপানের লোকেরা কিভাবে লাও-ৎসির মূর্তির কল্পনা করে, তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে। তলায় চীনা অক্ষরে লেখা, ডান দিক হইতে বামে পড়িতে হইবে—Thai Shang Lao Chün 'থাই শাঙ্ লাও চ্যুন্' অর্থাৎ 'মহান উচ্চ প্রভুপাদ লাও'।* □

পাদটীকা

১ নামটি নানাভাবে ইংরেজীতে লেখা হয়—Lau Tzu, Lao Tse, Lao Tsze ইত্যাদি। প্রাচীন উচ্চারণ ধরিয়া আমি এই নামটি বাঙলায় লাও-ৎসি রূপে লিখিলাম।

* ৪৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

বাংলার তন্ত্রসাধনা*

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

আজ বঙ্গদেশে ঘনতমিস্রার অবলেপ। দেশ ছিন্নভিন্ন, দিকে দিকে মরণাতুরের আর্তনাদ, দুর্ভাগ্যের এই মহাশ্মশানে বসে বাঙালী শবসাধনায় নিমগ্ন। এই শবের মধ্যেই মহাশক্তির অবতরণ ঘটবে। এর জন্য প্রয়োজন বীর সাধকের ঃ

"সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে।
কালনৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।।" (বিবেকানন্দ)

এই কথাই তন্ত্রের মর্মকথা। করালিনীর উপাসনা, ভীমার পূজা, রুদ্রাণীর আবাহন—দুর্বলের নতিস্বীকার নয়, শক্তিমানের সেই অমোঘবীর্যে প্রতিষ্ঠা যা হৃদয়ের সকল বাসনা-কামনাকে নির্মূল করে হৃদয়কে শ্মশান করে তুলবে এবং সেই হৃদয়ে শ্যামাসুন্দরীর নৃত্য হবে।

তন্ত্রের তত্ত্ব আলোচনা করার পূর্বে তন্ত্রের সংজ্ঞা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। কাশিকাবৃত্তিতে 'তন্ত্র' শব্দ তন্ ধাতুর উত্তর উনাদি প্রত্যয় ষ্ট্রন্ প্রয়োগ করে ব্যুৎপন্ন হয়েছে। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার। বাচস্পতি, আনন্দগিরি এবং গোবিন্দানন্দের মতে তন্ত্রি ধাতু থেকে তন্ত্র শব্দ ব্যুৎপন্ন। তন্ত্রি ধাতুর অর্থ ব্যুৎপাদন বা জ্ঞান। কিন্তু গণপাঠ্যে দেখা যায় যে, তন্ত্রি ধাতুরও অর্থ বিস্তার হতে পারে। সুতরাং তন্ত্র শব্দের দ্বারা যেকোন বিস্তারিত আলোচনা বুঝানো যায়। সেইজন্য দেখা যায় প্রাচীনকালে যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়া, মতবাদ, তত্ত্ব, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় বুঝানোর জন্য তন্ত্র শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। সাংখ্য-দর্শনের গ্রন্থাদির নাম ছিল ষষ্টিতন্ত্রশাস্ত্র। সেইভাবে, ন্যায়তন্ত্র, ধর্মতন্ত্র, ব্রহ্মতন্ত্র, যোগতন্ত্র, আয়ুর্বেদতন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়।

কিন্তু কালক্রমে তন্ত্র শব্দের সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখা যায়। বারাহীতন্ত্রের মতে ঃ

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ।
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্।।
তথৈবাশ্রমধর্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ।
সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ।।
উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্।
সংস্থানং জ্যোতিষ্যঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ।।
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্।
শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্।।
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্।
রাজধর্ম দানধর্মৌ যুগধর্মস্তথৈব চ।।

---

* কলিকাতা বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের ১০. ৩. ৫৬ তারিখের অধিবেশনে পঠিত।

ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্।
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে।।"

"সৃষ্টি, লয়, মন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদের সংস্থান, তীর্থবর্ণন, আশ্রমধর্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূতাদির সংস্থান, যন্ত্রনির্ণয়, বিবুধদের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্পবর্ণন, জ্যোতিষ-সংস্থান, পুরাণাখ্যান, কোষবর্ণন, ব্রতকথা, শৌচা-শৌচাখ্যান, শিবচক্রবর্ণন, স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম, দানধর্ম, যুগধর্ম, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের বর্ণন ইত্যাদি লক্ষণ যাতে থাকে তাকেই তন্ত্র বলা যায়।"

সংক্ষেপে বলতে গেলে তন্ত্রের চারটি অংশ ঃ (১) জ্ঞান অর্থাৎ দার্শনিক মতবাদ, বীজাদির শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান, মন্ত্রশাস্ত্র ও যন্ত্রশাস্ত্র; (২) যোগ—ধ্যানধারণাদির বর্ণনা ও বিবিধ সিদ্ধিলাভের জন্য মায়াযোগ। (৩) ক্রিয়া—মূর্তি-মন্দিরাদির নির্মাণবিষয়ক আলোচনা, এবং (৪) চর্যা—আচার-ব্যবহার, উৎসব ব্রত প্রভৃতির আলোচনা।

এই আলোচনা থেকে সহজেই এই প্রতীতি হয় যে, তন্ত্রশাস্ত্র একটি বিরাট সমন্বয়-প্রচেষ্টা। বহু ভাবধারার প্রবাহ ভারতের জীবনে বিভিন্ন অববাহিকাকে অবলম্বন করে এসেছিল। তারই সমীকরণের ফল তন্ত্রশাস্ত্র। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এক্স্থানে বলেছেন—"বেদের কর্মকাণ্ড, মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, বৈষ্ণব মতবাদ, চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি সবকিছুই তন্ত্রের মতবাদের অঙ্গরূপে তন্ত্রের মধ্যে বর্তমান।" শুধু তাই নয়, তন্ত্রশাস্ত্রের একটি বিশেষ অংশ যা বামাচার নামে প্রখ্যাত তা আর্য ও অনার্য ভাবধারার সংমিশ্রণ।

এরপর আমরা তন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বহু মনীষীর মতে বৌদ্ধরাই তন্ত্রের স্রষ্টা। হিন্দু সমাজ চিরদিনই বহিঃসংস্পর্শব্যাবর্তক। কাজেই হিন্দুধর্মের বা সমাজের মধ্যে আর্যেতর মতের অনুপ্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু নবীন বৌদ্ধধর্ম ছিল প্রচারধর্মী। বহু নবনব জাতি তাদের আচারব্যবহার, সংস্কৃতি পরিবহন করে বৌদ্ধধর্মে অনুস্যূতি লাভ করে। এই সুযোগে তাতার, মঙ্গল প্রভৃতি জাতিও বৌদ্ধধর্মের কুক্ষিগত হয়। নবদীক্ষিত এইসব অনার্যজাতির বহু আচারব্যবহার এইভাবেই বৌদ্ধধর্মে প্রবেশলাভ করে।

বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা নৈতিকতার দৃঢ়ভূমির উপর। সর্বপ্রকার গুহ্যসাধন বা বিভূতি-লাভাদির বিরোধী ছিল এই ধর্ম। কিন্তু বহির্ভাবধারায় অনুস্যূতির ফলে নানা ক্রিয়াকলাপ, বিভূতি প্রভৃতির অনুপ্রবেশ বৌদ্ধধর্মে ঘটে। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' পাঠে দেখা যায় কিভাবে ক্রিয়াকলাপাদি ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করছিল।

এছাড়া খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বৌদ্ধসঙ্ঘের ভিতর 'একাভিপ্পায়ী' বলে একটি মতবাদের অভ্যুত্থান হয়। আনন্দের করুণ আবেদনে ভগবান তথাগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সঙ্ঘে নারীজাতির স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বিধিনিষেধের দ্বারা সঙ্ঘস্থ স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রিতও করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও প্রকৃতির সহজপ্রবণতা বিধিনিষেধের দ্বারা অবদমিত হয়নি। এরই ফলে এবং নবদীক্ষিত জাতিসমূহের অনৈতিক প্রথার সংমিশ্রণে একাভিপ্পায়ী প্রভৃতি মতের উদ্ভব। এই মতবাদে স্ত্রী-পুরুষের সাহচর্যে নিশাকালে নানারূপ

গুহ্যসাধনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকের বৌদ্ধগ্রন্থ গুহ্যসমাজতন্ত্রে বামাচার তন্ত্রের সকল লক্ষণই পাওয়া যায়। এর অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রজ্ঞাভিষেকের উল্লেখ আছে। এই প্রজ্ঞাভিষেকের মূলকথা শক্তিগ্রহণ। গুরু, শিষ্যের অভিলষিতা, সুন্দরী, যোগপারদর্শিনী শক্তির সঙ্গে শিষ্যকে মিলিত করবেন। এই বিদ্যাগ্রহণ বা শক্তিগ্রহণ ব্যতিরেকে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই। এই শক্তি অপরিত্যাজ্যা। এই শক্তিগ্রহণের নাম বিদ্যাব্রত।

যখন বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তখন পূর্বোক্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান হিন্দুধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে হিন্দুতন্ত্রের সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুতন্ত্র যে বৌদ্ধোত্তর এবং বৌদ্ধতন্ত্র থেকে উদ্ভূত তা বহু মনীষীই স্বীকার করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "আমার বিশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রচলিত তন্ত্রের সৃষ্টি বৌদ্ধরাই করেছে।" পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এইকথাই বলেছেন যে, "তন্ত্রের ব্যাপারে বোধহয় আমরাই ঋণী এবং বৌদ্ধেরা মহাজন।" শ্রীযুক্ত বিনয় ভট্টাচার্যও অনুরূপ মতের পোষক। তিনি বলেন ঃ "হিন্দুগণ বৌদ্ধতন্ত্র হতে উপাদান গ্রহণ করেছিল এবং তাদের বহু প্রথা নিজেদের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এইভাবেই তন্ত্রানুশীলন চরমাবস্থা লাভ করে।"

অনেকে বলে থাকেন যে, হিন্দুতন্ত্র অতি প্রাচীন। নারায়ণীয় তন্ত্রে বলা হয়েছে তন্ত্রের যামল গ্রন্থ থেকেই চতুর্বেদের উৎপত্তি। এইসকল মতবাদের মধ্যে প্রাচীনতার প্রক্ষেপ দিয়ে এবং বেদের সঙ্গে সংযোগসূত্র স্থাপন করে তন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা ব্যতীত অপর কোন সত্য নেই। এ-পর্যন্ত যত হিন্দুতন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে পণ্ডিত Winternitz-এর মতে তার মধ্যে কোনটিই ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকের পূর্বে রচিত নয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন ঃ "তন্ত্রসাহিত্যের কোন গ্রন্থই বোধহয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের আগে রচিত হয় নাই।" কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে রচিত 'গুহ্যসমাজ তন্ত্র' একখানি বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ। সুতরাং বৌদ্ধতন্ত্র যে হিন্দুতন্ত্র থেকে প্রাচীনতর এবং হিন্দুতন্ত্র যে বৌদ্ধতন্ত্র থেকে উদ্ভূত এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ তো গেল তন্ত্রশাস্ত্রের কালিক পরিচ্ছেদের কথা। কিন্তু এর উদ্ভবস্থান কোথায়? একটি প্রবাদবাক্য আছে ঃ

"গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটিকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা।।"

—"এই বিদ্যা গৌড়দেশে প্রাদুর্ভূত, মিথিলায় প্রকটিকৃত, মহারাষ্ট্রে কোন কোন স্থানে প্রকাশিত এবং গুর্জরে বিলয়প্রাপ্ত।" মনে হয় এই প্রবাদবাক্যের অন্তরালে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। কেননা, বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বেই একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি বর্তমান ছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ "মোটের উপর আর্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।" আর্য সভ্যতার অভিঘাত খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে বাংলাদেশে আপতিত হয়। প্রাক্তন বিরাট সভ্যতার উৎসাদন সম্ভব ছিল না বলেই দুই সংস্কৃতির একটি মিলন

প্রচেষ্টাও গুপ্তযুগে আরম্ভ হয় এবং এই প্রচেষ্টা পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে পালবংশের সময়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন ঃ "এই সচেতন যোগসাধন আরম্ভ হইয়াছিল গুপ্ত আমলেই, কিন্তু পূর্ণরূপ গ্রহণ করিল পাল আমলে; এবং বাংলাদেশে তাহা এক বৃহত্তর সমন্বয়ের আশ্রয় হইল আর্যেতর এবং মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান-বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুক্ত হইয়া। এই সমন্বিত এবং সমীকৃত সংস্কৃতিই বাঙালীর সংস্কৃতির ভিত্তি, এবং ইহা পাল আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। সমন্বয় ও সমীকরণের এই রূপ ও প্রকৃতি অন্যত্র আর কোথাও দেখা যায় না।" বাংলার এই বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেই বৌদ্ধতন্ত্র, হিন্দুতন্ত্র, সহজিয়া মতবাদ প্রভৃতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে,- বঙ্গদেশেই তন্ত্রের উদ্ভব। অধ্যাপক Winternitz-ও বলেন ঃ "তন্ত্রের আদিম জন্মভূমি বঙ্গদেশ বলিয়াই মনে হয়।" ডঃ রায়ও বলেন ঃ "আগমশাস্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং তাহা সর্বভারতীয়; কিন্তু তন্ত্র বলিতে পরবর্তী কালে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা বোধহয় পূর্ব ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশেই সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।"

এইজন্যই বাংলা তন্ত্রপ্রাণ। তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব-যুগ থেকেই বাংলায় তন্ত্রসাধনা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। সেইজন্যই গৌড়পাদচার্য এবং মধুসূদন সরস্বতীর ন্যায় বেদান্তের মহাপণ্ডিতের আবির্ভাব বাংলাদেশে হওয়া সত্ত্বেও এদেশে বেদান্তের বিশুদ্ধরূপের প্রচার কোন সময়েই হয়নি। এরজন্য দায়ী বাংলার সমাজ-সংস্থান এবং বাঙালীর প্রকৃতি।

অবশ্য পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তন্ত্র সমন্বয়-শাস্ত্র এবং এর যা পরমতত্ত্ব তা অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ব থেকেই গৃহীত। তন্ত্রমতে নির্গুণ ব্রহ্মই মায়াসংযুক্ত হয়ে জগতের সৃষ্টি করেন। কিন্তু বেদান্তের মায়া 'সদসদভ্যামনির্বচনীয়া'। আর তন্ত্রের মায়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এবং সদ্রূপা। সুতরাং বেদান্তের জগৎ যে-অর্থে মিথ্যা তন্ত্রের জগৎ সেই অর্থে মিথ্যা নয়।

তন্ত্র এই সঙ্গে সাংখ্যযোগের চতুর্বিংশতি তত্ত্বও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সাংখ্যযোগের সঙ্গে এইখানেই সাদৃশ্যের অভাব যে, তন্ত্রমতে প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর একই প্রকারের সত্তা এবং বহির্জগতে যা যথার্থ পরিণাম বলে মনে হয় তা ঈশ্বর-তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য পরিণামমাত্র।

তন্ত্রের দার্শনিক মত সম্যক্ আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তন্ত্রের চরম তত্ত্ব পরাসম্বিত বা নিষ্কল শিব বা নির্গুণ ব্রহ্ম। এঁকে চরম তত্ত্ব বললেও ইনি কোন তত্ত্বের অন্তর্গত নন—ইনি তত্ত্বাতীত। আমাদের দ্বৈতাত্মক জগতে 'অহম্' আর 'ইদম্' এই বোধ রয়েছে। পরাসম্বিতে এই বোধ দুইটির সমবন্ধাবস্থা। এই পরাসম্বিতের স্পন্দ-প্রথম শিবতত্ত্ব। আর এরই বিপরীত দিক শক্তিতত্ত্ব। এই তত্ত্বদ্বয় নিত্যযুক্ত সন্তত-সমবায়িনী। এই তত্ত্বদ্বয় উৎপন্ন বস্তু নয়। প্রলয়েও এরা একই অবস্থায় থাকে। শক্তিতত্ত্ব—'নিষেধব্যাপাররূপা'—পূর্ণজ্ঞানের অভাব এতে হয়। আর শিবতত্ত্ব—প্রকাশমাত্র—অহম্ বোধমাত্র। শক্তিতত্ত্ব—বিমর্শ—অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি। এতে 'ইদম্' বীজ রয়েছে—এই 'ইদম্' বীজই জগৎরূপে পরে পরিবর্তিত হয়। শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব বস্তুগত্যা পৃথক নয়। সেইজন্যই শিবতত্ত্বকে বলা হয় উন্মনী শক্তি—"যত্রগত্বা তু মনসো মনস্ত্বং নৈব বিদ্যতে"—যেখানে গিয়ে মনের মনত্ব থাকে না। যেখানে অহম্

বোধমাত্র থাকে। আর শক্তিতত্ত্বের নাম সমনীশক্তি—'মনঃসহিতত্বাং সমনা'—মনের সঙ্গে যা থাকে। 'সমনা নাম সা শক্তিঃ সর্বকারণকারণম্'। সমনা নামক সেই শক্তি সর্বকারণেরও কারণ। এই শিবশক্তি তত্ত্বদ্বয় থেকে উদ্ভূত হয় সদাশিব বা সদাখ্য তত্ত্ব। এই তত্ত্বে 'অহম্-ইদম্'-এর একত্রানুভূতি। এখানে ইদম্—অহম্-এরই অঙ্গ—পৃথক নয়।

সদাখ্যতত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় ঈশ্বরতত্ত্ব—এতে ইদম্ এবং অহম্-এর সহাবস্থান হলেও ইদম্-অহম্-এর প্রত্যয়ের বিষয়। ঈশ্বরতত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় সদ্বিদ্যাতত্ত্ব বা শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব। এখানে অহম্-ইদম্ সমপ্রভাবসম্পন্ন এবং বিশ্লেষণোন্মুখ। এরপরেই মায়াশক্তি এবং মায়াশক্তির কঞ্চুকের সাহায্যে অহম্-ইদম্ এর বিশ্লেষ ঘটে। মায়াশক্তি তাকেই বলে যার দ্বারা ব্রহ্ম থেকে জগৎকে পৃথক করে দেখা হয়। কঞ্চুকের অর্থ আবরণ। এর সংখ্যা ৫টি। (১) কাল—পরিচ্ছেদকারী শক্তি, (২) নিয়তি—যা স্বতন্ত্রতা আনায়, (৩) রাগ—যা আসক্তি আনে পূর্ণস্বরূপেরও মনে, (৪) বিদ্যা—যা সর্বজ্ঞকে অল্পজ্ঞ করে, (৫) কলা—যা সর্বময় কর্তাকে কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব দেয়। এই মায়া এবং কঞ্চুক—সকলের জন্যই সদ্বিদ্যাতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হয় পুরুষতত্ত্ব এবং প্রকৃতিতত্ত্ব। এখানে অহম্, ইদম্ সম্যক বিশ্লিষ্ট। পুরুষতত্ত্ব অহম্—প্রকৃতি তত্ত্ব ইদম্। পুরুষ বহু। প্রকৃতি সকল-সঙ্কুচদ্রূপা শক্তির সামান্য রূপ। প্রকৃতি তিন গুণের সাম্যাবস্থা। পুরুষের সাহচর্যে ত্রিগুণের বিক্ষোভে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি ও জগৎ সৃষ্টি ঘটে।

তন্ত্রের এই তাত্ত্বিক বিচারে এই কথাই মনে হয় যে, অদ্বৈত বেদান্তে যুষ্মদস্মদ্-প্রত্যয়ের যে মিথুনীকরণকে 'নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ' বলা হয়েছে এবং যুষ্মদ্ বা ইদম্‌কে মিথ্যা বা অধ্যাস বলে অস্বীকার করা হয়েছে সেইখানে তন্ত্র জগতের দিক থেকে একটি ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে। এই ব্যাখ্যা কতটা যুক্তিসহ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে এর উপযোগিতা খুবই আছে।

উপরে যে শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তাই অবলম্বন করে শাক্তমতবাদ এবং শক্তির পূজা প্রতিষ্ঠিত। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" "সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়।" বাংলার তন্ত্রসাধক কালীকুলের সাধক। কালীর উপাসনা বাঙালীর প্রাণের উপাসনা। এই মূর্তিকল্পনায় শবরূপ মহাদেব—শিবতত্ত্ব—তিনি অহম্ বোধে মগ্ন। আর কালী—শক্তিতত্ত্ব—তিনি ক্রিয়াশক্তি—সৃষ্ট্যুন্মুখী। তাঁর মধ্যে সৃষ্টির বীজ রয়েছে। অন্যান্য দেবীমূর্তির কল্পনাতেও এই শিব-শক্তিতত্ত্বেরই প্রকাশ।

এই যে শক্তিতত্ত্ব—এর মূল কিন্তু বেদে। ঋগ্বেদের দশম-মণ্ডলের দেবী-সূক্তে আছে ঃ

"ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।।"

—"আমার দ্বারাই লোক জীবিত আছে। অন্নগ্রহণ ও শ্রবণাদিও করছে। আমাকে যে অবহেলা করে সে বিনষ্ট হয়। তুমি শ্রদ্ধাবান। এইজন্য তোমাকে বলছি।"

এই শক্তিই মানুষকে বদ্ধ করে। চণ্ডীতে আছেঃ

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।।"

—"সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদের চিত্তও বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহে নিক্ষেপ করেন।" কিন্তু "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"—"তিনিই প্রসন্না হয়ে বরদা হলে মানুষের মুক্তিবিধান করেন।"

সেইজন্য দেবীর পূজা করতে হয়। এই সাধন বাহ্যিক পূজাও হতে পারে বা আন্তর ধ্যানজপাদিও হতে পারে। দেবীপূজার গূঢ় রহস্যের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে করা সম্ভব নয় এবং মন্ত্রাদির যে তত্ত্ব তাও এখানে ব্যাখ্যা করার সময় নাই। শুধু এইটুকুই জানাতে চাই যে, বাহ্যপূজার অন্তরালে এবং মন্ত্রাদির ব্যবহারে পরাবাক, বিন্দু, নাদ ও বীজাদিকে অবলম্বন করে একটি বিরাট দার্শনিক পটভূমিকা আছে। মন্ত্রাদি নিরর্থক শব্দমাত্রই নয়। যাঁরা জ্ঞানপিপাসু তাঁরা Sir John Woodroffe-এর পুস্তকাদি এবং তন্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করলে বহু তথ্য অবগত হবেন।

তন্ত্র বলেন যে, মানবের দেহভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতিরূপ। এই দেহে শিব-শক্তি আছেন। পরম শিব সহস্রারে এবং শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে মূলাধারে। অবরোহক্রমে এই জগতের সৃষ্টি। আরোহক্রমে সাধক কুণ্ডলিনীর সঙ্গে পরম শিবকে মিলিত করতে পারলেই মোক্ষ লাভ হবে। এই মিলনসাধনের জন্য তন্ত্রে পূজা, ধ্যান, মন্ত্রজপ, হোম, দীক্ষা প্রভৃতি নির্দিষ্ট হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করছি। পূর্বেই বলেছি যে, তন্ত্র আর্য ও আর্যেতর ভাবধারার সংমিশ্রণ। এর ফলে তন্ত্রের মধ্যে বৈদিক ও অবৈদিক আচার মিশ্রিতভাবে আছে। তন্ত্রে সাধকদের জন্য যেসকল আচার নির্দিষ্ট হয়েছে তা কুলার্ণবতন্ত্রের মতে সাতটি—(১) বেদাচার, (২) বৈষ্ণবাচার, (৩) শৈবাচার, (৪) দক্ষিণাচার, (৫) বামাচার, (৬) সিদ্ধান্তাচার, (৭) কৌলাচার। এগুলির মধ্যে প্রথম চারটি বেদপর এবং শেষ তিনটি আচার অবৈদিক ভাবপূর্ণ। সাধারণত প্রথম চারটি আচার হিন্দুধর্মের--বিশেষ করে বাংলাদেশের মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বাঙালীর ধর্মসাধনাকে প্রাণবন্ত করেছে। তন্ত্রের সঙ্গে ক্রিয়ার সহযোগে একটি সাধনার সহজ পথের আবিষ্কার করেছে। বাঙালী জাতির পূজা, দীক্ষা, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি সকল বিষয়ই তন্ত্রের এইসকল আচারের দ্বারা পরিচালিত।

কিন্তু বামাচার প্রভৃতি—যা গোপনে অনুষ্ঠিত প্রক্রিয়াদির সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়—তা অনৈতিক ভিত্তিভূমির উপর আস্তৃত। এইসকল আচারে পঞ্চমকারের অনুষ্ঠানে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং স্বকীয়া বা পরকীয়া স্ত্রীগ্রহণ করা হয়।

অবশ্য তন্ত্রে অধিকারভেদে তিনটি ভাবকে আশ্রয় করার কথা আছে। দিব্যভাব, বীরভাব, পশুভাব। দিব্যভাবের যাঁরা মানুষ তাঁরা উচ্চস্তরের লোক। তাঁদের পক্ষে মদ্য অর্থে সহস্রার ক্ষরিত সুধাধারা, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে ছেদনপূর্বক নির্বিষয়তালাভই মাংসগ্রহণ, অহঙ্কার দম্ভ প্রভৃতিকে বশীভূত

করাই মৎস্যভক্ষণ, আশা তৃষ্ণা প্রভৃতি অষ্টমুদ্রাকে দমন করাই মুদ্রা গ্রহণ এবং ইড়াপিঙ্গলা-বাহিত বায়ুর সুষুম্নাতে সংযোগই স্ত্রীগ্রহণ। যাঁরা পশুভাবে স্থিত তাঁদের পক্ষে সম্বিদা, গুড়ার্দ্রক প্রভৃতি মদ্যের অনুকল্প, লবণার্দ্রক মাংসানুকল্প, লবণতৈলাক্ত দগ্ধকুষ্মাণ্ড মৎস্যানুকল্প, ঘৃতে ভর্জিত মুগ প্রভৃতি বীজ মুদ্রানুকল্প এবং রক্তচন্দনানুলিপ্ত অপরাজিতা এবং করবী পুষ্পের সংযোগই পঞ্চম মকারানুকল্প।

বীরভাবে কিন্তু মুখ্য পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার আবশ্যিক এবং বামাচারীদের মতে কলিযুগে পশুভাব প্রতিষিদ্ধ। কাজেই যেহেতু দিব্যভাবের সাধক দুষ্প্রাপ্য সেইজন্য অধিকাংশ তান্ত্রিকেরই বীরভাবে মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করেই সাধন করা উচিত—বামাচারীদের মতে। এইভাবে বামাচার বাংলার সমাজে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে।

বামাচার বা বীরভাবের সাধনের অবশ্য একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি আছে। যেসকল লোক সহজাত প্রবৃত্তির অবদমনহেতু মানসিক-অপচারসম্পন্ন (psycho-pathological) তাদের মানবগ্রন্থির মোচনের জন্য বা সংস্কারের উদ্গতির জন্য বীরভাবের সাধনা ফলদায়ক হতে পারে। ভোগের পথে মানুষের মনকে ধীরে ধীরে কিভাবে ঈশ্বরাভিমুখী করা যায় সেই অসাধ্য সাধনেই বীরভাবের প্রচেষ্টা। রূপরসমুগ্ধ অস্বাভাবিক মনোবিশিষ্ট মানুষকে সাহায্য করাই বীরভাবের উদ্দেশ্য। সুস্থমনঃসম্পন্ন স্বাভাবিকবৃত্তিবিশিষ্ট মানবের জন্য কিন্তু এপথ নয়। এপথ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "পায়খানার পথ।" স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "যে জঘন্য বামাচার তোমাদের দেশকে নষ্ট করে ফেলছে অবিলম্বে তা ত্যাগ কর। তোমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান দেখনি। দেশের পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের যতই বড়াই কর না কেন, যখন আমি দেখি আমাদের সমাজে বামাচার কী ভয়ানকরূপে প্রবেশ করেছে, তখন উহা আমার অতি ঘৃণিত নরকতুল্য স্থান বলে বোধ হয়। এই বামাচার সম্প্রদায় আমাদের বাংলাদেশের সমাজকে ছেয়ে ফেলেছে আর যারা রাত্রে বীভৎস ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে তারাই আবার দিনেরবেলা উচ্চকণ্ঠে আচারের কথা বলে।"

সুতরাং এই বামাচার প্রভৃতি কুৎসিত ব্যাপার সযত্নে পরিহার করে তন্ত্রের মধ্যে যাকিছু ভাল জিনিস আছে তা গ্রহণ করতে হবে।

তন্ত্রের সবচেয়ে বড় কথা মাতৃভাবে দেবীর উপাসনা এবং এই উপাসনা করতে হবে নির্ভয় হয়ে। অভয়প্রতিষ্ঠ সাধকই যথার্থ বীরসাধক। মদ্য-মাংসাদিসেবী তথাকথিত বীরভাবালম্বী বীরসাধক নয়। এই বীরসাধক ছিলেন বীরেশ্বর বিবেকানন্দ যিনি ভীষণকে ভীষণতার জন্যই পূজা করতে চেয়েছিলেন, যিনি উপদেশ করেছিলেন তাঁর শিষ্যকে যে, যখন মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাবে তখন "মনে রেখো তিনি যেন তোমার প্রার্থনা শুনতে বাধ্য হন। মায়ের কাছে কোন আর্তভাব যেন প্রকাশ না পায়। স্মরণ রেখো।" এই তো যথার্থ বীরভাবের কথা।

আমাদের দেশের এই দারুণ দুর্দিনে আমরা তো বহুস্থানে দেবীর পূজা বহুভাবে করছি। কিন্তু ফল কোথায়? অঙ্গহীন হলে বা শ্রদ্ধার অভাব হলে পূজার ফললাভ হয় না—বিপরীত ফলও ঘটে। কাজেই পূজা ঠিকভাবে

করতে হলে অভয়প্রতিষ্ঠ হয়েই করতে হবে। তখনই মায়ের অমোঘ আশীর্বাদ আমাদের শিরে বর্ষিত হবে।

স্বামী সারদানন্দের 'ভারতে শক্তিপূজা' থেকে এই বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি উপহার দিয়ে আমার বক্তব্যের উপসংহার করছি।

"অন্য দেশে মা শত হস্তে ধনধান্য ঢালিয়া দিতেছেন। দেখিয়া ঈর্ষায় তোমার অন্তস্থল জ্বলিয়া উঠে। তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট সন্তানসকলের প্রফুল্ল মুখকমলের সহিত ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ, আচ্ছাদনবিরহিত, রোগে জর্জরিত তোমার সন্তানসকলের তুলনা করিয়া তুমি জগদম্বাকেই শত দোষে দোষী কর। অন্যের পদাঘাতপীড়িত হইয়া তুমি অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিতে থাক—কিন্তু দোষ কার? দেখিতেছ না, তাহারা অজ্ঞান সমরে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে—আর তুমি সহস্র বৎসরের অজ্ঞানকে হৃদয়ে অতি যত্নে পোষণ করিয়া নীরব, নিশ্চিন্ত আছ? উহারা বিদ্যারূপিণী শক্তির পূজার অদম্য উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজস্র হৃদয়ের রুধির ব্যয় করিয়াছে, দশের কল্যাণের জন্য আত্মবলি দিয়া দেবীকে প্রসন্না করিয়াছে—আর তুমি অবিদ্যাসেবায় যথাসর্বস্ব পণ করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থসুখ লইয়া বসিয়া আছ। জগন্মাতা তোমায় দিবেন কেন? শাস্ত্র যে তোমায় বারবার বলিতেছেন, তিনি বলিপ্রিয়া, রুধিরপ্রিয়া। দেবীর ঐ ভাব যে তাঁহার ধ্যানমন্ত্রে রহিয়াছে। ঐ শুন, ভারতের তন্ত্রকার তোমায় কিভাবে শক্তির ধ্যান করিতে বলিতেছেন—

"শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্।
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।।"

প্রতিকার্যে মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া স্বার্থসুখ ত্যাগে, আত্মবলিদানে তাঁহার তর্পণ কর। তাঁহাকে প্রসন্না কর, দেখিবে শক্তিরূপিণী জগদম্বা তোমারও প্রতি ফিরিয়া চাহিবেন! তোমার নয়নে দীপ্তি, বাহুতে বল, হৃদয়ে তেজ, অন্তরে অদম্য উৎসাহরূপে প্রকাশিত হইবেন। দেখিবে জগন্মাতার নিত্য সহচরীদল—বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি, মেধা প্রভৃতি—আবার তোমার উপর প্রসন্না হইয়া প্রতি কার্যে তোমার সহায়তা করিবেন।"* □

* ৫৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

সন্ন্যাসী ও সেবাধর্ম

স্বামী অখণ্ডানন্দ

অনেকেই মনে করেন এবং আমাদিগের নিকট বলিয়াও থাকেন যে—"আপনারা সন্ন্যাসী, কোথায় নিভৃতগিরিগুহাবাসী ভগবদ্ধ্যানাবস্থিত তদ্গত-মানস হইয়া জীবনযাপন করিবেন, তা না এই অনাথ-বালক প্রতিপালন-রূপ [আশ্রম-চালনারূপ] বিষম সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন!"

ইহার প্রকৃত উত্তরদানে আমরা সক্ষম কিনা বলিতে পারি না, তবে আমরা যতদূর পারি—সন্ন্যাসী হইয়াও উক্ত কার্য করার বিশেষ আবশ্যকতা-বিষয়ে দুই চারিটি মনের কথা সাধারণকে জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি।

এ জগতে মনুষ্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী জীব আর নাই। মনুষ্যই সমুদয় শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ। মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য কি আছে? তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে?

মনুষ্যাকার ঋষি-হৃদয়েই অপূর্বছন্দোময়ী বেদরাশির প্রকাশ; চিরশান্তিপ্রদ, জ্ঞানগর্ভ উপনিষদ্—মনুষ্যোন্নতির চরম সীমা—এই দ্বিপদহস্তবিশিষ্ট মনুষ্যের বহু তপস্যা, সাধনা ও আদরের ধন! বাক্যমনের অগোচর সর্বব্যাপী মহান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্যসত্তার আবির্ভাব এই মনুষ্যহৃদয়ে! বেদমূর্তি ঋষিবৃন্দ, অবতার, জ্ঞানী, ভক্ত ও কবি প্রভৃতির আবির্ভাব আমরা এই মনুষ্যেই দেখিতে পাইয়াছি।

মনুষ্যের উপমা-স্থান এ-জগতে নাই! নিগূঢ় আত্মতত্ত্ব, যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সত্যের বিকাশস্থল একমাত্র মনুষ্যে! মানুষিক, অমানুষিক, লৌকিক ও অলৌকিক যাবতীয় শক্তি একমাত্র মনুষ্যেই কেন্দ্রীভূত। মনুষ্য এতাদৃশ শক্তিশালী হইয়াও যদি আপন শক্তি-সমষ্টির উন্মেষ করিবার চেষ্টা না করে তো তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। লুপ্ত-গৌরব মনুষ্য-সমাজের উন্নতি কামনা করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই পরম পুরুষার্থ!

মনুষ্যে-মনুষ্যে পরস্পর প্রেমের অসদ্ভাব হইলে ঈশ্বরে প্রেম ও ভক্তি—কেবল কথার কথা মাত্র, ইহা সকল সভ্য জাতিই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। তত্ত্ববেত্তা পুরুষমাত্রেরই জীবনে আমরা বিশ্বপ্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই।

এই ভারতে এই মনুষ্যত্বের জন্য কে জানে কত শত-শত জন আনন্দমনে স্ব-স্ব জীবন অর্পণ করিয়াছে!—যাহার বিশেষ উল্লেখ করিতে হইলে লেখনীশক্তি নিঃশেষিত হইবে। সেই বিপুল প্রবন্ধের অবতারণা না করিয়া আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ভারতের বর্তমান অধঃপতনের কারণ : বৈষম্য ও ভেদবুদ্ধি

জীবন-ধারণোপযোগী সামান্য অন্নবস্ত্রাভাবে যে-ভারতবাসী হতজ্ঞান, সামান্য ঔষধপথ্যাভাবে যে-ভারতবাসী রোগ-শোকে জরজর, সামান্যবাসোপযোগী কুটিরাভাবে যে-ভারতবাসী শীতাতপের নিদারুণ যন্ত্রণায় বিকল-শরীর, সামান্যশিক্ষা-বিহনে যে-ভারতবাসী হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, প্রবলের অত্যাচারে যে-ভারতবাসী সদাকাল উৎপীড়িত এবং সংসারের যাবতীয় দুঃখের আধার-স্বরূপ তাহার এই মহান দুঃখের উপশমোপায় চিন্তা বা নিবারণ চেষ্টা না করিয়া—তাহাকে এক্ষণে বেদান্তের 'তত্ত্বমসি'-আদি মহাবাক্যের ব্যাখ্যা শুনাইতে যাওয়া কি বাতুলতামাত্র নহে?—তাহার নিকট স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে যাওয়া কি হৃদয়বান মনুষ্যের কার্য?

সকল কার্যের উপযুক্ত সময় আছে। ভারতবাসী আজ যে কি কঠিন জীবন-সমস্যায় উপস্থিত, তাহা কি একবার আমাদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত নহে? কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রকৃত অবস্থার বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কেবল জীবনীশক্তিহীন কতকগুলি অস্থিসার পুত্তলিকামাত্র, কি এক ভৌতিক-ক্রিয়াতেই যেন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, কেবল মনুষ্যের আকার ভিন্ন তাহাদিগের মনুষ্যজনোচিত আর কিছুই নাই!

এই অধঃপতনের কারণ কি? একমাত্র সামাজিক বৈষম্যদোষেই এই মহান অনর্থ ঘটিয়াছে। সকল উন্নত জাতিকেই একদিন এই বৈষম্যদোষে উন্নতির চরম স্থান হইতে—অতুল সুখসমৃদ্ধিতে জলধির অতল জলে ডুবাইয়া—পতনের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। মানবজাতির ইতিহাস চিরকাল এই সত্য ঘোষণা করিবে!

যে-জাতিতে বা যে-সমাজে স্বার্থের বশীভূত হইয়া কতকগুলি লোক মনুষ্য-জীবনের প্রধান উপকরণগুলিকে নানা কৌশলে বলপূর্বক নিজস্ব করিয়া সাধারণের উপর প্রভুত্ব-স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছে, তাহাদের অধঃপতিত হইতে হইয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতে যেমন একমাত্র ভেদবুদ্ধি হইতেই যত অনিষ্টের সূত্রপাত, লোক-সমাজেরও যত অকল্যাণ তাহা একমাত্র ভেদবুদ্ধি হইতেই হইয়া থাকে। স্বয়ং শ্রুতি বলিতেছেন :

"ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ।
ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ।
লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ।"

—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক প্রভৃতি তাহাদের ঘৃণা করে, যে তাহাদিগকে আপন আত্মা হইতে ভিন্ন জ্ঞান করে।

এই ভেদবুদ্ধি হইতেই উচ্চনীচ-জ্ঞান ও ব্যবহার-বৈষম্য। আর এই বৈষম্যই যাবতীয় দুঃখের মূল। জাতিগত, সম্প্রদায়গত, কুলগত ও অন্যান্য প্রকার বৈষম্য-দোষেই মনুষ্যসমাজে ঈর্ষা-দ্বেষ প্রবল হয় এবং আপনি আপনাকে নষ্ট করে।

জাতির উন্নতি যুগ ঃ সাম্য ও উদারতায়

কোন জাতিরই উন্নত দশায় এইরূপ বৈষম্য-দোষ থাকা সম্ভব নহে। আর্য জাতির প্রথম অভিব্যক্তি-স্বরূপ বৈদিকযুগে পূর্বোক্ত বৈষম্য-দোষের আদৌ কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদসমূহের আদি সংহিতা-ভাগে এরূপ অনেক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই সমানভাবে কল্যাণ কামনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

বৈদিক কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বৌদ্ধযুগের কথার অবতারণা করিতেছি।—ভগবান বুদ্ধের অভ্যুত্থানের পর ভারতে যে-শান্তি বিরাজ করিয়াছিল, সেই শান্তি ও সেই সর্বজনীনভাব কি ভারতের ইতিহাসের আর কোন অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়? ভগবান বুদ্ধ যে-শান্তি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কি এই মহান অনিষ্টজনক বৈষম্যের মূলোচ্ছেদকারী নহে? সেইসময়ে ভারতগর্ভে যে কত শত সুসন্তানই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই শান্তির ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া জগতে তাঁহারা যে অক্ষয় কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন—তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারে? বৌদ্ধযুগে ভারতে যেসকল মহাসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কীর্তিস্তম্ভ ও বিজয়-পতাকা আজও সমগ্র সভ্যজগতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভারতের এই গৌরব-কাহিনী কি বৌদ্ধধর্মের উদারতার নিদর্শন-স্বরূপ নহে? ভারতের সে সৌভাগ্য-রবি আজ অস্তমিত! সঙ্কীর্ণতা ও বৈষম্যরূপ অমানিশার ঘোর অন্ধকারে আজ ভারত সমাচ্ছন্ন! ভারত পুনর্বার সেই মহাসূর্যের উদয় প্রতীক্ষা করিতেছে! বিশ্বপ্রেমের সেই সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

আমরা সর্বদাই অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে ভগবৎসমীপে এই প্রার্থনা করিতেছি যে ঃ "হে প্রভো! আমাদিগকে তেজ দাও, ওজঃ দাও, বল দাও!—যাহা দ্বারা পুনর্বার আমরা সেই লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে পারি!"

প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্ব-স্ব সুখ সাধনের সমান অধিকার আছে; যে সমাজ-শাসন ইহা স্বীকার করে এবং স্বাধীনভাবে মনুষ্যমাত্রকেই উন্নতির দিকে লইয়া যায়, তাহাই ঈশ্বরাভিপ্রেত এবং সেই সমাজেই চিরশান্তি, সেখানেই মনুষ্যাকারে ভগবান স্বয়ং আসিয়া আবির্ভূত হন। মহাশক্তি তাঁহার হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া থাকেন। মনুষ্যোন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ শাসন কু-শাসন; এবং সেই কু-শাসনের বিষময় ফলেই আজ ভারত মহাদুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত!

উন্নতিচেষ্টার প্রথম সোপান ঃ প্রাথমিক অভাব পূরণ

আমরা এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখিব যে, কী উপায় অবলম্বন করিলে ভারতের উপস্থিত দুঃখের কথঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে, কিসে ভারতবাসী সবলকায় হইয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে এবং আর্য জাতির লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে পারে।

ভারতবাসীর জীবন-মরণ সমান হইয়াছে। ভারতবাসী একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত; তাহাকে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞানের কূটতর্ক, সাংখ্যের জটিল মীমাংসা ও বেদান্তের মায়াবাদ শুনাইলে কি তাহার সেই অভাব পূর্ণ হইবে?

ঐসকল বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় এখন নয়। ঐসকল দুর্বোধ্য বিষয়ের আলোচনা মনে হয় যে 'মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা'!

কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চায় যদি প্রসুপ্ত ভারত জাগিয়া উঠিত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, এরূপ জ্ঞানচর্চার সার্থকতা আছে; তাহা হইলে আর আজ সমগ্র ভারতকে এইরূপ কালনিদ্রা-সম অবস্থায় থাকিয়া মহাবিভীষিকা উৎপাদন করিতে হইত না।

যাহার পেটে অন্ন নাই, পরনের কাপড় নাই, থাকিবার স্থান নাই এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণ-চিন্তায় যে সদাকাল বিব্রত, তাহার চিত্তে কি ঐসকল বিষয় স্থান পায়? তাহার কি অন্নচিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা করিবার সময় আছে?

অতএব আইস, আমরা সর্বাগ্রে তাহার শুষ্ককণ্ঠ সিক্ত করিবার উপায় করি। তাহার প্রদীপ্ত জঠরানল নির্বাপিত করিবার কোন সহজ উপায় উদ্ভাবন করি। 'শরীরমাদ্যং খলু' কারণ, তাহার সংরক্ষণ না করিলে ধর্মজীবন লাভ করিবার কোন উপায় নাই। আবার সকল চেষ্টাই যদি একমাত্র শরীর-সংরক্ষণে পর্যবসিত হয়, তাহা হইলে আর ধর্মজীবন লাভ করা যায় না।

সুতরাং জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি ও যাহাতে তাহারা সহজবোধ্য জীবিকা উপার্জনোপযোগী কার্যে দক্ষতা লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করণান্তর জীবনের অবশিষ্ট কাল মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদনা করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করাই কি আজ দেশের শিক্ষিত, সমর্থ, স্বদেশের কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি-মাত্রেরই কর্তব্য নয়?

ভারতের এই বিষম অন্নচিন্তার কিছুমাত্র উপশম হইলেই ধর্মপ্রাণ ভারত পুনর্বার স্বধর্মে বলীয়ান হইয়া, পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া ধর্মরাজ্যের অশ্রুতপূর্ব অননুভূত তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিবে!* □

* ৬৩ বর্ষ, ৩ সংখ্যা

হিন্দুধর্ম

অরুণেশ কুণ্ডু

'ধর্ম' শব্দটি সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ 'ধারণ করা'—একথা আমরা সবাই জানি। ধর্ম কী ধারণ করে?—হিন্দুধর্ম বলেছেনঃ "যেনাত্মনস্তথাণ্যেষাং জীবনং বর্ধনাঞ্চাপি ধৃয়তে স ধর্মঃ।" অর্থাৎ যার দ্বারা নিজের এবং অপরের জীবন ও সমৃদ্ধি বিধৃত হয়, তা-ই ধর্ম। এই সূত্র ধরে সহজেই বলা যায়—ধর্ম একটি সর্বজনীন ব্যাপার। এটি এমন একটি বিষয় যা সকলের কল্যাণসাধন করে।

এখন দেখা যাক, ধর্মের লক্ষণ কী? মহর্ষি মনুর মতে, ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), ক্ষমা, দম (দমন), অস্তেয় (অচৌর্য), শৌচ (শুচিতা), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী (বুদ্ধি), বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ (মনু-সংহিতা, ৬।৯২)। অর্থাৎ যেকোন ব্যক্তির পক্ষে সদ্যোক্ত দশটি আচরণই ধর্মাচরণ বলে গণ্য হবে এবং এই দশটি আচরণই ধার্মিক লোকের, তিনি যেকোন ধর্ম বা ধর্মমতেই বিশ্বাসী হোন-না-কেন, লক্ষণ।

হিন্দুধর্মের যথার্থ নাম সনাতন ধর্ম। 'সনাতন' শব্দের অর্থ—যা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। আমরা অনুমান করতে পারি, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ যখন থেকে মানুষ তার দ্বিপদ পশুত্বকে অতিক্রম করে চৈতন্যের আলোয় নিজেকে আবিষ্কার করতে শুরু করল, তখন থেকেই যে-আচরণগুলিকে মনুষ্যত্বের লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেগুলি মনু-কথিত ধর্মেরই দশটি লক্ষণ। 'সনাতন ধর্ম' বলতে আমরা সেই ধর্মকেই বুঝব যা মনু-কথিত ধর্মের দশটি লক্ষণকেই আচরণে প্রকাশ করতে বলে। এই ধর্মের মূল আশ্রয় বেদ। সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'বেদ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। বেদকে 'অপৌরুষেয়' এবং 'শ্রুতি' বলা হয়। 'অপৌরুষেয়' এইজন্য যে, এই জ্ঞান কোন ব্যক্তি বা পুরুষবিশেষের বুদ্ধির ক্রিয়া দ্বারা অর্জিত এবং প্রচারিত নয়; জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহু ঋষির হৃদয়ে অনুভব বা উপলব্ধিরূপে সেই জ্ঞান উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। 'শ্রুতি' এইজন্য যে, যখন লিপির আবিষ্কার হয়নি, সেইকালে উপলব্ধ জ্ঞান মুখের ভাষায় পিতা থেকে পুত্রে, গুরু থেকে শিষ্যে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হতো।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চারভাগে বেদ বিভক্ত। বেদের জ্ঞান যাঁদের অনুভবে ও উপলব্ধিতে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের আমরা বলি 'ঋষি' বা 'দ্রষ্টা'। দীর্ঘ সাধনা, কঠোর মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে এইসমস্ত আধিকারিক পুরুষদের মধ্যে বেদের জ্ঞান স্ফুরিত হয়েছিল, উদ্ভাসিত হয়েছিল।

'মানুষ' শব্দের অর্থ মননশীল জীব। মানুষ যেদিন থেকে 'মানুষ' হয়েছে, অর্থাৎ মনন করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই তার মনে প্রশ্ন জেগেছে ঃ 'আমি কে?' 'আমি কী?' 'আমি কেন?' এই মূল দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর রয়েছে সমগ্র বেদে।

সমগ্র বেদ আবার দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম 'কর্মকাণ্ড' এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম 'জ্ঞানকাণ্ড'। সমাজভুক্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম এবং যাগ-যজ্ঞাদির বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে কর্মকাণ্ডে। জীবনের মূল রহস্যের অনুসন্ধান, অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রধান দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনা ও সমাধান আছে জ্ঞানকাণ্ডে। বেদের এই ভাগটি সাধারণত 'উপনিষদ্' বা 'রহস্য বিদ্যা' নামে পরিচিত।

উপনিষদের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, মুণ্ডক, কঠ, কেন, ঈশ প্রভৃতি বারোটি উপনিষদ্ প্রধান। সমগ্র উপনিষদের জ্ঞানকে এককথায় 'বেদান্ত' বলে উল্লেখ করা হয়। 'বেদান্ত' শব্দের অর্থ বেদের অন্ত। 'অন্ত' শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। এক—শেষ এবং দুই—নির্যাস। উপনিষদ্গুলি সাধারণত বেদের শেষ অংশে থাকায় সেগুলিকে যেমন বেদান্ত বলা হয়, তেমনি বেদের সার বা নির্যাস উপনিষদের মধ্যে নিহিত আছে বলেও উপনিষদ্গুলিকে বেদান্ত বলা হয়। বেদ-উপনিষদের ঋষিরা জীবনের রহস্য ও তাৎপর্য সন্ধান করতে গিয়ে এক নিত্য সত্যের আবিষ্কার করেছেন যাঁকে তাঁরা 'ব্রহ্ম' বা 'আত্মা' বলেছেন এবং যে-বিদ্যার চর্চার দ্বারা ব্রহ্মের তত্ত্ব বা আত্মার তত্ত্ব জানা যায়, তাকে 'ব্রহ্মবিদ্যা' বা 'আত্মবিদ্যা' বলেছেন। এই বিদ্যালাভ হলে ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান হয়। এই ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা রয়েছে উপনিষদ্গুলিতে।

ঋষিরা বলেছেন, ব্রহ্মের স্বরূপ হলো "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।১।৩) আর আত্মার স্বরূপ হলো "নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত।" (গীতা ঃ শাঙ্করভাষ্য, উপক্রমণিকা)

ব্রহ্ম ও আত্মা—দুই-ই এক। জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলেন। যিনি জ্ঞান-স্বরূপ, বোধ-স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম, তাঁকে জানলেই পূর্ণজ্ঞান হয়। পূর্ণজ্ঞান লাভ করাই অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটি লাভ হলেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা—অর্থাৎ জ্ঞানচর্চার অন্ত হয়। তাই বেদান্ত হলো জ্ঞানান্বেষণের শেষ ধাপ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ব্রহ্ম অনন্তও বটেন। তাই সেই অর্থে তাঁকে জানা শেষ হতে পারে না। আসলে, তাঁকে জানা, সীমার মধ্যে বস্তুকে যেভাবে জানা হয়, সেভাবে জানা নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মকে জানার অর্থ ব্রহ্মে লীন হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মই হওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন উপমা দিয়েছেন—নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্রের নোনাজলে গলে মিশে সমুদ্রের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল।

চারটি বেদে ব্রহ্মের স্বরূপ চারভাবে সন্ধান করা হয়েছে। অন্বেষণের এই মূল সূত্রগুলিকে 'মহাবাক্য' ধরতে হবে। যেমন—

"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঋগ্বেদ ঃ ঐতরেয় উপনিষদ্, ৩।১।৩); "অহং ব্রহ্মাস্মি" (যজুর্বেদ ঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১।৪।১০); "তত্ত্বমসি" (সামবেদ ঃ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬।৮।৭) এবং "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (অথর্ব বেদ ঃ মাণ্ডূক্য উপনিষদ্, ২)—এই চারটি মহাবাক্য। এই মহাবাক্য চারটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণয়।

ব্রহ্মের স্বরূপ অন্যভাবে বলা হয়—সচ্চিদানন্দ—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। 'সৎ' শব্দের অর্থ—যা আছে, নিত্য, অর্থাৎ তিনকালেই আছে—অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এককথায় অনাদি, অনন্ত। ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু। 'চিৎ' শব্দের অর্থ চৈতন্য, যা উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গ, ইতর প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে প্রাণরূপে প্রকাশিত। বিশ্বচরাচরের সর্বপ্রাণীতে, সর্ববস্তুতে তিনিই বিভু, চৈতন্যরূপে অনুস্যূত হয়ে আছেন। 'আনন্দ' একটি বিশিষ্ট স্পন্দন বা অনুভূতি, যা সমস্ত সৃষ্টির মূল। তিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। বেদ বলছেন—তিনি নিরাকার, নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। শাস্ত্র বলছেন—নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ইচ্ছাই প্রথম স্পন্দন। এই স্পন্দনই ওঁ-কার। সৃষ্টির মূলে এই ওঁ-কার বা অনাহত নাদ। 'নাদ' কথাটির অর্থ শব্দ। বস্তুজগতে শব্দের সৃষ্টি হয় বাতাসের সঙ্গে কোন বস্তুর সঙ্ঘাতের ফলে। ওঁ-কার সেইরকম কোন শব্দ নয়। কারণ, ওঁ-কার সৃষ্টির আগে তো বায়ুর অস্তিত্বই নেই। মূল স্পন্দন ওঁ-কারই বিকারপ্রাপ্ত হতে হতে দৃশ্যমান বিশ্ব-চরাচরের সমস্ত কিছুর মূল উপাদান সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে (ব্যোম্, মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতি) সূক্ষ্মরূপে পরিণত হলো। তারপর এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের বিশেষ সংমিশ্রণ প্রক্রিয়া, যাকে 'পঞ্চীকরণ' বলে, তার দ্বারা স্থূল পঞ্চভূতের (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটি) সৃষ্টি হলো। এরপর মানুষের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক) দ্বারা আস্বাদযোগ্য যাকিছু তার সৃষ্টি হলো। একেই আমরা 'জগৎ' বলি।

সৃষ্টির মধ্যে আমি এবং আমাকে ঘিরে যে-জগৎ তারই পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন উপনিষদের ঋষিরা। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বৃহত্তম—অর্থাৎ সর্বব্যাপক, সমস্ত কিছুকে ঘিরে আছেন। আবার শুধু যে দৃশ্য এবং অদৃশ্য সকল কিছুকে ঘিরে আছেন তাই নয়, সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি অনুস্যূত হয়ে আছেন। এই ব্রহ্ম চৈতন্য-স্বরূপ বলেই এঁকে আত্মাও বলা হয়। কাজেই আত্মাই সর্বব্যাপক সত্তা—যিনি জীবের মধ্যে প্রাণরূপে প্রকাশিত। মানুষের এই যে দেহ, মানুষে মানুষে দেহের এই যে ভেদ, বেদান্তের ভাষায় তাকে বলা হয়েছে—নাম ও রূপের ভেদ। অর্থাৎ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রকাশ-লক্ষণ, "অস্তি-ভাতি-প্রিয়" (বাক্যসুধা, শ্লোক-২০)। 'অস্তি' অর্থে যিনি নিত্য আছেন, 'ভাতি' অর্থে যিনি স্বয়ংপ্রকাশ, যাঁর প্রকাশে এই জগৎ প্রকাশ পাচ্ছে এবং 'প্রিয়' অর্থে জগতের যাকিছু আমাদের ভাল লাগছে, যার থেকে আমরা আনন্দ পাচ্ছি তার মধ্যে ব্রহ্মের আনন্দময় সত্তারই প্রকাশ ঘটছে। এর যে সর্বব্যাপকতা, তা নাম ও রূপের ব্যবধানের দরুণ খণ্ডিত বলে আমাদের বোধ হচ্ছে। বস্তুত, জগতের প্রতিটি জীব বা বস্তু মূলত বা স্বরূপত ব্রহ্ম বা আত্মা বা চৈতন্য। জীবদেহের মধ্যে আত্মার অবস্থানের দরুন তাঁকে জীবাত্মাও বলা হয়। যে মূল দার্শনিক প্রশ্নের উল্লেখ আগে করেছি, উক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা এখন তার উত্তর পেতে পারি। 'আমি কে?' আমি সর্বব্যাপক অখণ্ড চৈতন্য অর্থাৎ ব্রহ্ম বা আত্মা—এই আমার স্বরূপ। 'আমি কী?' আমি নাম-রূপের দ্বারা খণ্ডিত হওয়ার ফলে জীব বা জীবাত্মা। 'আমি কেন?' বেদ বলছেন ঃ "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬)—এক ব্রহ্ম বা

আত্মাই কেবল আছেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাঁকেই বহু বলেন। এক অখণ্ড আত্মাই নাম-রূপের দ্বারা নিজেকে খণ্ডিত করেছেন—বিভাজিত হয়ে আনন্দ আস্বাদন করবেন বলে। এরই নাম লীলা। আমি তাঁর লীলার অঙ্গ।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয়ই বোঝা গেল যে, সনাতন ধর্মের মূলকথা—জগতে দুই নেই; এক ব্রহ্মাই জড় এবং চেতন দুই-ই হয়েছেন। তাই শাস্ত্র তাঁকে বলেছেন ঃ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬।২।১)—তিনি এক এবং দ্বিতীয়-রহিত। এর চেয়ে মহৎ ধারণা আজ পর্যন্ত মানুষের চিন্তারাজ্যে পাওয়া যায়নি। এরই নাম অদ্বৈতবাদ, এই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

বেদান্ত মানুষের স্বরূপ-সন্ধানের পাশাপাশিই তার দুঃখের মূলও সন্ধান করেছে। এবিষয়ে বেদান্তের মূল সিদ্ধান্ত—মানুষ যে স্বরূপত ব্রহ্ম, একথা না জানাই তার দুঃখের কারণ। এই না-জানার নাম অজ্ঞান। দেহ এবং আত্মা যে ভিন্ন, যদিও দেহের মধ্যে আত্মা আছেন বলেই দেহ চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে, এটি বোঝা দুরূহ বলেই এই অজ্ঞান দুরতিক্রমণীয় মনে হয়। আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সাক্ষিস্বরূপ এবং নিরাকার, তাঁকে দেখা যায় না বলে দেহকেই অনেকে আত্মা বলে মনে করেন। কিন্তু আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত বলে দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মার সুখ বা দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ দেহের।

শাস্ত্র-মতে দেহ পাঁচটি কোষের দ্বারা গঠিত—অন্নময় কোষ (স্থূল), প্রাণময় কোষ (সূক্ষ্ম-বায়বীয়), মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। এই কোষগুলি ক্রমশ স্থূল থেকে সূক্ষ্মে এবং আরো সূক্ষ্মে পরিণত হয়েছে। এরমধ্যে মনোময় কোষই স্থূল ও সূক্ষ্মের ভেদরেখার ওপর রয়েছে। আত্মচৈতন্যের আলো শক্তিরূপে মনের ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে। এই শক্তিতে মন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা দেহকে চালাচ্ছে। এই দেহের দুঃখ ত্রিবিধ—একে ত্রিতাপ-দুঃখ বা ত্রিতাপ-জ্বালা বলে। জগতে যতরকমের দুঃখের উপলক্ষ আছে তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এগুলি হলো—আধিভৌতিক (যেকোন সৃষ্ট পদার্থ, অর্থাৎ ভূত বা জাত, তজ্জনিত দুঃখ), আধিদৈবিক (ঝড়, বৃষ্টি, খরা, প্লাবন, ভূমিকম্প, দাবানল প্রভৃতি অতিমানবীয় প্রাকৃতিক অর্থাৎ দৈবীশক্তিজাত দুঃখ এবং আধ্যাত্মিক (মন এবং বুদ্ধিজাত দুঃখ)। এই ত্রিবিধ দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য বেদান্তের উপদেশ—আত্মজ্ঞান (আত্মাকে জানা) বা ব্রহ্মজ্ঞান (ব্রহ্মকে জানা) বা তত্ত্বজ্ঞান ('তৎ'—তাঁকে অর্থাৎ পরম সত্যকে জানা)।

ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। তিনিই যখন সগুণ হন তখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন; তখন তাঁকে ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর শব্দের অর্থ—সর্বশক্তিমান। তাঁর তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সৃষ্টি বা জগৎরূপে তাঁর যে-প্রকাশ ঘটে তার মূলে আছে প্রকৃতি। ঈশ্বরেরই প্রকৃতি—ঈশ্বর থেকে অভিন্ন। সৃষ্টির আগে প্রকৃতিতে তিনটি গুণ সম-অবস্থায় থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রথম স্পন্দন সৃষ্টি হলেই প্রকৃতিতে গুণের অসাম্য ঘটে এবং তারই ফলে সূক্ষ্ম আকাশ থেকে ক্রমে স্থূল গ্রহ-নক্ষত্রাদি জড় ও জীবের সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্টি নিয়ত পরিবর্তনশীল, তাই একে জগৎ (গম্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন) অর্থাৎ যা চলছে বা সংসার (সংসরতি ইতি সংসারঃ)—অর্থাৎ সম্যকভাবে বা অনিবার্যভাবে যা সরে সরে যাচ্ছে বা পরিবর্তিত হচ্ছে—বলা হয়। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতে জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন

সম্পূর্ণত দেহকেন্দ্রিক। দেহ জড় এবং পরিবর্তনশীল অর্থাৎ পরিণামী। দেহের মধ্যে যে-আত্মা তিনিই নিত্য-সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই আত্মাকে জানা, আত্মজ্ঞান তথা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই জ্ঞানলাভ করলেই মানুষ নিত্য আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, সমস্ত দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে।

এক অর্থে বেদান্ত কোন ধর্ম নয়, এটি একটি দর্শন। অন্যভাবে বলা যায়—বেদান্ত একই সঙ্গে দর্শনও বটে, আবার ধর্মও বটে। বেদান্ত একটি সর্বজনীন ধর্মের দর্শন; সেই ধর্মের নাম সনাতন-ধর্ম। এককথায় একে 'সত্য-ধর্ম' বলা চলে। সত্য—অর্থাৎ সৎ-এর ভাব বা নিত্যের ভাব—অর্থাৎ অদ্বৈত তত্ত্ব যাতে প্রকাশিত।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদের উপত্যকায় যে-জনগোষ্ঠী বাস করত পরবর্তী কালে উত্তর-পশ্চিম ভারত-আক্রমণকারী আলেকজান্ডার প্রমুখ গ্রীকরা তাকে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করে। তারা 'স'-কে 'হ' উচ্চারণ করত। সেই থেকেই সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা 'হিন্দু' নামে পরিচিতি লাভ করে। এরা যে-ধর্ম আচরণ করত তা-ই সনাতন-ধর্ম অর্থাৎ বেদের ধর্ম বা বৈদিক-ধর্ম নামে খ্যাত। সাধারণভাবে একেই 'হিন্দুধর্ম' বলা হয়। কালক্রমে এই জনগোষ্ঠী সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই হিন্দুধর্ম বিস্তারলাভ করে।

সনাতন-ধর্ম অর্থাৎ বৈদিক-ধর্ম ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম-ধর্ম নামে পরিচিত হয়। বর্ণ ও আশ্রম হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। হিন্দুরা সমাজের সকল মানুষকে তাদের প্রকৃতিদত্ত কর্মপ্রবণতা অনুযায়ী চারটি ভাগে ভাগ করে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই বিভাজন যে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক, একটু চিন্তা করলেই সেকথা বোঝা যাবে। বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে তিনটি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, তার দ্বারা জীব-জগতের প্রকৃতি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক। মনুষ্যত্বের প্রকাশ। মানুষের মধ্যে এর লক্ষণ—সরলতা, উদারতা, দয়া, মহত্ত্ব প্রভৃতি। যেসব মানুষ নিয়ত উচ্চ-চিন্তা অর্থাৎ ঈশ্বর-চিন্তা বা ব্রহ্মের চিন্তায় নিরত থাকে, যাদের চিন্তা প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার আলোকবর্তিকা, সেই প্রকৃতির মানুষই 'ব্রাহ্মণ'রূপে পরিচিত হলো। রজোগুণের লক্ষণ কর্মোদ্যম। এরই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বীরত্ব, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণাবলীতে: এই প্রকৃতির মানুষ সমাজের সকল মানুষের রক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এরাই রাজপুরুষ। সমাজ, রাষ্ট্র বা রাজ্য এরাই প্রতিপালন করে। এদের বলা হলো 'ক্ষত্রিয়'। তমোগুণের লক্ষণ জড়ত্ব, চিন্তায় বা কর্মে উদ্যোগহীনতা। তমোমিশ্রিত বহুলাংশে রজোগুণসম্পন্ন মানুষেরা ব্যবসাবাণিজ্যাদি কর্ম সম্পাদন করে। মানুষের গ্রাসাচ্ছদনের আয়োজন এই প্রকৃতির মানুষরাই করে থাকে। এদেরই বলে 'বৈশ্য'। যে-প্রকৃতির মানুষের মধ্যে অল্প রজোগুণ এবং বহুলাংশে তমোগুণের প্রভাব, তারা সমাজভুক্ত মানুষের রক্ষা বা প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত না হলেও সমাজভুক্ত বিভিন্ন মানুষকে সেবা করতে পারে। এদেরই বলা হয় 'শূদ্র'।

দেখা যাচ্ছে, এই ব্যবস্থায় সমাজের প্রতিটি মানুষেরই সমাজকে কিছু দেবার আছে এবং সেটি নির্ভর করছে তার গুণ অর্থাৎ প্রকৃতির ওপর।

এইজন্য হিন্দুদের সর্বাধিক জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ 'গীতা'য় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুণ-কর্মানুসারে সমাজভুক্ত মানুষের শ্রেণীবিন্যাসের কথা বলেছেন। এই ব্যবহারিক শ্রেণীবিন্যাসই বর্ণ-ধর্মের যথার্থ রূপ। এখানে অবশ্যই আমাদের একথা মনে রাখা দরকার, মাত্র একটি গুণ সম্পূর্ণভাবে সবসময়ের জন্য সাধারণ কোন মানুষের মধ্যে প্রকাশ পায় না। কম-বেশি তিনটি গুণই সকল মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল, কিন্তু এরই মধ্যে একটি মূল-প্রবণতা থাকে। সেই অনুযায়ীই গুণ-কর্ম বিভাগ। এই বিভাজন একটি পরিণত মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

হিন্দুরা বর্ণনির্বিশেষে সমাজভুক্ত সকল মানুষের জীবনকেই চারটি পর্বে ভাগ করে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই পর্বগুলিকে বলা হয় 'আশ্রম'। এর প্রতিটি পর্বেই মানুষ সংসারে ও সমাজে জীবনধারণের জন্য আনন্দে শ্রমদান করে—এইজন্যই আশ্রম। পৃথিবীতে মানুষ আসে কর্ম করার জন্য। তাই এই কর্মভূমিতে বিস্তৃতভাবে শ্রমদান করা অর্থেও আশ্রম কথাটি ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু মূলকথাটি এই যে, সকলের সব অবস্থার সম্মিলিত শ্রমেই সমাজের শ্রীবৃদ্ধি। সুতরাং সুন্দর আদর্শ সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে আশ্রম-ধর্মই সবচেয়ে উপযোগী। এবং এটি যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বর্ণ ও আশ্রমধর্মকে পরিচালনা করে বেদ। প্রাচীনকালে যখন লিপির আবিষ্কার হয়নি, তখন থেকেই হিন্দুসমাজভুক্ত প্রতিটি মানুষের জন্যই বেদ-অনুশীলনের একটি নির্দিষ্ট রীতি ছিল। চারটি আশ্রমে একজন ব্যক্তি চারভাবে বেদের অনুশীলন করত। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে 'মন্ত্র', গার্হস্থ্যাশ্রমে 'ব্রাহ্মণ', বানপ্রস্থাশ্রমে 'আরণ্যক' এবং সন্ন্যাসাশ্রমে 'উপনিষদ্'।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুগৃহে 'মন্ত্র' চর্চার কালে শুদ্ধ উচ্চারণ ও মন্ত্রগুলি স্মৃতিতে যথাযথভাবে ধারণ করার ওপর জোর দেওয়া হতো। 'ব্রাহ্মণ' ভাগে গার্হস্থ্যাশ্রমে ব্যবহার্য মন্ত্রগুলির অর্থ অনুধাবন এবং প্রয়োগ করা হতো। 'আরণ্যক' ভাগে বানপ্রস্থাশ্রমে, অর্থাৎ আধুনিক পরিভাষায় সংসার জীবন থেকে অবসরকালে গার্হস্থ্যাশ্রমে পালনীয় যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার দার্শনিক তত্ত্ব সন্ধান করা হতো। এই প্রক্রিয়ায় কারো বৈরাগ্য উদ্দীপিত হলে পরিপূর্ণভাবে সংসার ত্যাগ করে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'উপনিষদ্' ভাগে ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ সন্ধানে ব্রতী হতো এবং ভাগ্যবান কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ করে ধন্য হতো।

দেখা যাচ্ছে, ধর্ম সেকালে জীবনচর্যার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। একজন ব্যক্তি জীবনে যাকিছু পেতে চায় বেদের ঋষিরা তারও শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। এগুলিকে বলা হয় 'পুরুষার্থ'—পুরুষ বা ব্যক্তির লভ্য অর্থ অর্থাৎ বিষয় বা প্রয়োজন যথাক্রমে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। সাধারণ মানুষের জন্য প্রথম তিনটি পুরুষার্থ। সাধারণ মানুষের স্বভাবতই দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির ভোগের দিকে আগ্রহ থাকে। কিন্তু এগুলির শুরুতেই আছে ধর্ম—অর্থাৎ সেই শিক্ষা যা ভোগকে সুনিয়ন্ত্রিত করে যথার্থ আনন্দলাভ করতে মানুষকে সাহায্য করে। বিষয়ভোগের অনিবার্য পরিণাম দুঃখ। ধর্মশিক্ষা মানুষকে এবিষয়ে সচেতন করে নিয়ন্ত্রিত ভোগ, জীবনধারণের জন্য যেটুকু অপরিহার্য তাই করবার উপদেশ করে এবং বলে যে, এভাবে চললেই সংসারে মানুষ সুখী হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মবিহীন জীবন উচ্ছৃঙ্খল জীবনেরই অপর নাম এবং তা অশেষ দুঃখের কারণ হয়। একথা আজকের দিনেও সত্য। নিরবচ্ছিন্ন সুখ

অর্থাৎ নিত্য আনন্দলাভের জন্যই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরলাভ।

সভ্যতার বিকাশের শুরুতে মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রকাশরূপে উপাসনা করতে শুরু করে। এগুলিকে দৈবীশক্তি বলা হয়। তারই প্রতীক বিভিন্ন দেবতা যাঁদের নাম আমরা বেদে পাই। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা, বেদে যাঁর যখনই উপাসনা করা হচ্ছে, তখন তাঁকেই সর্বশক্তিমানরূপে ঈশ্বর বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এক ঈশ্বরই ভিন্ন ভিন্ন রূপে জগতে প্রকাশিত হচ্ছেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্নভাবে পূজিত হচ্ছেন।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরা একেশ্বরবাদী। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইন্দ্র-অগ্নি-বরুণাদি রূপকের নামরূপের ভেদের দরুন হিন্দুদের মধ্যেই বিভিন্ন উপাসকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলিকে একত্রে 'বহু ঈশ্বরবাদী' বলে কোন কোন পণ্ডিত বর্ণনা করে থাকেন। সে-তত্ত্বটি সর্বৈব ভুল। কিন্তু মুশকিলটা অন্য জায়গায়। হিন্দুদের মধ্যে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি উপাসকগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষও মূলতত্ত্ব ভুলে গিয়ে নামরূপের ভেদ নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে। ফলে অহিন্দুরা যারপরনাই বিভ্রান্ত হয়। অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পছন্দমতো নাম ও রূপে ঈশ্বরকে উপাসনা করবার যে-স্বাধীনতা হিন্দুধর্ম দেয়, তা আর কোন ধর্মমতেই নেই।

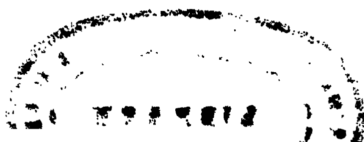
এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে একথা বলা ভাল যে, বেদ অর্থাৎ বৈদিক-ধর্ম অপৌরুষেয় হলেও পৃথিবীর আর সমস্ত ধর্মই ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা বিশেষ যুগে, বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে, বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রচারিত, অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সমস্ত প্রচারকরাই মহান ব্যক্তি এবং বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর অশেষ কল্যাণসাধন করেছেন। এঁরা যা বলেছেন তার মর্মের সঙ্গে সনাতন-ধর্মের সারসত্যের কোন ভিন্নতা নেই। কিন্তু মূলত যুগোপযোগিতার অর্থাৎ কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে ঐগুলিকে 'ধর্ম' না বলে 'ধর্মমত' বলাই সঙ্গত। ধর্মমত কালভেদে যুগোপযোগিরূপে সংশোধিত না হলে কোন একটি বিশেষ মতাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং তা সমাজকে বিপন্ন করে।

বর্তমানে 'মৌলবাদ' কথাটি খুব প্রচলিত। শব্দটি ইংরেজী 'Fundamentalism'-এর বাঙলা প্রতিশব্দ। বিখ্যাত দার্শনিক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল লিখেছেন ঃ "মৌলবাদ কথাটির উৎপত্তি পশ্চিমে। 'ফান্ডামেন্টালিজম'কে একটি 'ইজম'-এ পরিণত করা হয়েছে সর্বপ্রথমে আমেরিকায় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের 'নায়গ্রা কনফারেন্স'-এ। মূলত প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের এক নবতম রূপকে 'ফান্ডামেন্টালিজম' আখ্যা দেওয়া হলো। বলা হলো, শেষোক্ত মতবাদটি অর্থাৎ মৌলবাদ পাঁচটি পয়েন্ট অথবা পাঁচটি বিষয়ে প্রথমোক্ত (প্রোটেস্ট্যান্ট) মতবাদ থেকে ভিন্ন। খ্রীস্টীয় শাস্ত্রের অভ্রান্ততা, যীশুর ঈশ্বরত্ব, মাতা মেরীর মধ্যে কুমারীত্ব ও মাতৃত্বের সুশৃঙ্খল সহাবস্থান, পাপের জন্য অনুতাপে প্রায়শ্চিত্ত এবং যীশুর যুগান্তে সশরীরে দ্বিতীয় আবির্ভাব—এই পাঁচটির ওপর সন্দেহ-বিনির্মুক্ত বিশ্বাস—সেই মৌলবাদের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে এই মৌলবাদীরা সযত্নে যুক্তির আশ্রয় নিতেন এবং সভ্যতার অগ্রগতির পরিপন্থী তাঁরা ছিলেন না।

"মৌলবাদের একটি অনতিদূষণীয় রূপ ছিল এই শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে—একেবারে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য না হলেও তা সামগ্রিকভাবে দোষাবহ ছিল না। মৌলবাদকে তখন কট্টর সংযত নৈতিক জীবনযাপনের দর্শন মনে করা হতো। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে থেকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ভোগোন্মুখতা থেকে বিরত থাকবে এবং অন্যান্য বিলাস-ব্যসন থেকে সংযত হবে—এই ছিল মৌলবাদীদের উপদেশ!... ব্যক্তিগত চারিত্রিক শুচিতা ছিল তাদের লক্ষ্য।"[১]

এবার ভারতীয় পটভূমিতে মৌলবাদ শব্দটি ও তার ভূমিকা আলোচনা করা যেতে পারে। 'মৌল' শব্দটি 'মূল'-এর বিশেষণ-রূপ। 'বাদ' অর্থে সচরাচর আমরা মতবাদ বুঝি। তাহলে 'মৌলবাদ' বলতে এমন একটি মতবাদকে বোঝায় যা মূলকেই আশ্রয় করতে চায়। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটুকু বোঝা যাবে যে, অনেক বৈচিত্র্যের মধ্যেও ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মমতাবলম্বী মানুষের মধ্যে জীবনদর্শনগত একটা মূল ঐক্য আছে যেটি উদার হিন্দুধর্মের প্রেক্ষাপটে ঔপনিষদিক বা বৈদান্তিক ধ্যানধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাসের নিরিখেই বলা যায় যে, হিন্দুরা পরমতসহিষ্ণু। ফলে ইতিহাসের আদিকাল থেকে যেসব আগ্রাসী নরপতি ও জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশ অধিকার করে এদেশে রয়ে গেছে কালক্রমে তারা হিন্দুদের মূল জীবনস্রোতে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে ভারতীয় জনগোষ্ঠীরই অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এমন নয় যে, তাদের ধর্মমতগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হয়েছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়েছে। ভারতীয় হিন্দুরা কখনো ধর্মের নাম করে ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য রক্তপাত বা হানাহানিতে লিপ্ত হয়নি। প্রধান জনগোষ্ঠীর এই মানসিকতাই ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখেছে।

হিন্দুধর্মে 'শাস্ত্র' বলতে বোঝায় প্রধানত শ্রুতি বা বেদকে। বেদ-এর শাসন অর্থাৎ নির্দেশই হলো ধর্মীয় অনুশাসন। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, হিন্দুদের ব্যবহারিক জীবন এবং ধর্মজীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বেদের তত্ত্ব বা নির্দেশ সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে বুঝে সেইমতো আচরণ করা কালক্রমে কঠিন হতে পারে মনে করেই অতি প্রাচীনকালেই বেদের নির্দেশমতো সমাজজীবনে কোন ব্যক্তির কী কী করা উচিত এবং কী কী করা উচিত নয়, এসম্পর্কে নির্দেশনামা তৈরি হয়। উচিত অংশকে বলা হয় 'বিধি', অনুচিত অংশকে বলা হয় 'নিষেধ'। 'বিধিনিষেধ'-এর নির্দেশ-সম্বলিত সূত্রাকারে গ্রথিত রচনাটিকে বলা হয় 'স্মৃতি'—মনু-প্রমুখ আচার্য এগুলির সঙ্কলক এবং নির্দেশক। 'শ্রুতি' বা 'বেদ'-এর মতো 'স্মৃতি'কেও অনেকে শাস্ত্র বলেন। প্রাচীনকালের সমাজে স্মৃতির ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। এর মধ্যে এমন বহু লোককল্যাণকর নির্দেশ আছে যা আজকের সামাজিক পরিস্থিতিতেও সমান প্রযোজ্য। মনে রাখতে হবে, স্মৃতি রচিত হয়েছিল সংশ্লিষ্ট যুগের প্রয়োজনে। তাহলেও স্মৃতির অনেক অংশ সর্বকালীন প্রাসঙ্গিকতাযুক্ত। তবে যেগুলি পরবর্তী কালে প্রযোজ্য নয়, সেগুলি বর্জনের নির্দেশও স্মৃতিকারগণ দিয়েছেন।



কিন্তু কালক্রমে তন্ত্র (যাতে বিশ্ব-সৃষ্টির মূল শক্তিকে মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং সে-রূপে উপাসনার কথা বলা হয়েছে।) ও পুরাণ (যার মধ্যে ঈশ্বরকে সাকার অর্থাৎ নাম-রূপে উপাসনার কথা এবং ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ, তাঁর মাহাত্ম্য ও লীলা বর্ণনা করা হয়েছে।)—এই দুটিকে আশ্রয় করে মূর্তিপূজার মাধ্যমে ধর্মচর্চার যে-ধারা গড়ে উঠেছিল, পরবর্তী কালে তার সূত্র ধরেই উপাসনা-ভিত্তিক নানা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। কিন্তু উপাসনার মূল উদ্দেশ্য যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, তা লোকে ভুলতে শুরু করে এবং নামরূপের সীমার মধ্যে যে খণ্ডতা ও আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্নতা বর্তমান তার দ্বারা সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্বের বীজ ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে আচার-অনুষ্ঠান এবং তজ্জনিত বিভেদই বড় হয়ে উঠতে থাকে।

অন্যদিকে গুণ-কর্ম অনুসারে বর্ণভেদ ও জাতিনির্ণয়ের মূলধারা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। বর্ণ ও জাতি নির্ণীত হতে থাকে, কে কোন্ বর্ণের কুলে জন্মেছে তাই দিয়ে। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং অধঃক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এর প্রভাবে জাতিভেদও প্রবল আকার ধারণ করে। এর ফলে জাতিগত এবং প্রধানত সম্প্রদায়গত বিভেদ ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে; সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বৈরিতা সৃষ্টি করে। হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের সঙ্গে এবং কালক্রমে অন্যান্য ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যেও ব্যবধান গড়ে ওঠে। ধর্মের এই বিকৃত ব্যবহারিক রূপটিই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠীর কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে।

সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে 'মৌলবাদী' বলতে তাদেরই বোঝায় যারা স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের মূল পরিচয়, যা কোন উদার তত্ত্বনির্ভর নয় বরং যা সঙ্কীর্ণ-মানসিকতা-চর্চিত আচার-অনুষ্ঠানের প্রকাশ, তারই সমর্থন করে। ফলে সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ যে প্রকৃতপক্ষে মূলে ফেরা নয়, অথচ প্রকৃত মূলে ফিরতে পারলেই যে মানুষের যথার্থ কল্যাণ, তা এদের বোঝানো যায় না। তথাকথিত মৌলবাদ হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিছু পণ্ডিতম্মন্য বুদ্ধিজীবী মৌলবাদের কথা শুনলেই অজ্ঞতাবশত 'গেল গেল' রব তোলেন। তাঁরা ভুলে যান যে, মানুষ যদি যথার্থই তার মূল অনুসন্ধান করে, তবেই তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় যে, ব্যক্তিমানুষেরা যে যেভাবেই জীবনচর্চা করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষে-মানুষে কোন ভেদ নেই এবং সেই কারণেই দ্বন্দ্বেরও কোন অবকাশ নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে যে-ঐক্য ঐতিহাসিক সত্য, যাকে আমরা 'সংহতি' বলছি, সেই বিপন্ন সংহতিকে আমরা যথার্থ মৌলবাদের চর্চার দ্বারাই বিপন্মুক্ত করতে পারি। 'যথার্থ মৌলবাদ' বেদান্তের অদ্বৈত তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত।* □

পাদটীকা

১ 'মৌলবাদ : কি ও কেন?'—বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, দেশ, ৩০ জুন, ১৯৯০, পৃঃ ১৫

* ৯৫ বর্ষ, ৫ সংখ্যা

আচার্য শঙ্কর ও চৈতন্যদেবের মত তুলনা

রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

আচার্য শঙ্করের জ্ঞানের যাহা চরম ফল এবং গৌড়ীয় গোস্বামী প্রভুপাদগণের ভক্তির যাহা অন্তিম ভাব এই দুইটি মিলাইয়া দেখিলে কিরূপ বোধ হয় এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য। এ-প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিত হেগেলের মতানুযায়ী অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে কতিপয় আপত্তিও বিচারিত হইবে। কারণ আজকাল এই ভাবের কথা অনেকেরই মুখে শুনা যায়। যাহা হউক, এই বিষয়টি আমরা দুই প্রকারে আলোচনা করিব। প্রথম, শাস্ত্র দৃষ্টিতে; দ্বিতীয়, বিচার দৃষ্টিতে। তন্মধ্যে শাস্ত্র দৃষ্টিতে যেরূপ বোধ হয় তাহা এই—গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে যাহা নির্গত তাহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রমাণ। এ-মতটি তাঁহারই উপদেশ ও ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করে, এ-মতের যাহা কিছু সবই তিনি। তাঁহার কথাতেই দেখা যায় যে, জীবের সহিত ভগবানকে অভিন্ন জ্ঞান করা মহাপাপ, জীব প্রাণান্তে ভগবৎ সকাশে সাযুজ্য প্রার্থী হইতে চাহিবে না। যথা—

"সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।।" (চ, চ মধ্য ৬ষ্ঠ)

এবং ভক্তের যিনি ভগবান তিনি জ্ঞানীর ব্রহ্মের অভ্যন্তরে ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতত্ত্ব সেই আনন্দঘন রসময় মূর্তি। ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গের কান্তি। সূর্যের যেমন মণ্ডল ও কিরণ, তদ্রূপ সেই রসময় মূর্তি সূর্যমণ্ডল, এবং ব্রহ্ম তাঁহার কিরণ। যথা—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা।
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাং শবিভবঃ।।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ম্।
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জ গতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।" (স্বরূপ দামোদর করচা)

"যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্র সত্তা
প্যংশো যস্যাং শকৈঃ দ্বৈবির্ভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ
একং যস্যৈব জপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেমতৎ পাদভাজাম।।"
(তত্ত্ব সন্দর্ভ)

"যস্য প্রভা, প্রভবতো জপদণ্ড কোটি,
কোটিস্বশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" (ব্রহ্মসংহিতা)

কিন্তু যদি ঐক্য দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহা হইলে সম্ভবত যেরূপ প্রতীত

হইবে তাহা এই—শঙ্করের জ্ঞানের শেষ ব্রহ্মবস্তুতে একেবারে মিশিয়া যাওয়া। তবে যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন সবিকল্পক সমাধিতে সর্ব বস্তুতে ব্রহ্ম-দর্শন হইয়া থাকে। যথা—জ্ঞাত জ্ঞানাদি-বিকল্পালয়ানপেক্ষয়াদ্বিতীয় বস্তুনি তদাকারা কারিতায়া শ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানম্।। অর্থাৎ সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই বিকল্প ত্রয়ের জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান বুঝায়। "তদামৃন্ময় গজাদি ভাণেঽপি মৃদ্-ভাণবৎ দ্বৈতভাণেঽপি অদ্বৈতং বস্তু ভাসতে।।" অর্থাৎ তখন মৃন্ময় হস্তীতে হস্তিজ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্তিকা জ্ঞান যেমন থাকে তদ্রূপ দ্বৈতজ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান স্ফূর্তি পায়। (বেদান্তসার)

নির্বিকল্পক সমাধিতে আত্যন্তিক ঐক্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। যথা—"জ্ঞাতৃ জ্ঞানাদি ভেদলয়াপেক্ষয়াঽদ্বিতীয় বস্তুনি তদাকারাকারিতায়া বুদ্ধি বৃত্তেরতিতরা মেকীভাবেনাবস্থানম্।।" অর্থাৎ তখন জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অত্যন্ত একীভূত হইয়া অবস্থান করে। (বেদান্তসার)

তৎপরে দেহান্তে, ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ হইয়া থাকে। যথা—

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।।" (গীতা, ২।৭২)

অর্থাৎ হে পার্থ! ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। লোকে ইহাকে পাইয়া বিমুগ্ধ হয় না। এইভাবে অন্তকাল পর্যন্ত থাকিতে পারিলে ব্রহ্ম-নির্বাণলাভ হয়।

পক্ষান্তরে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তানুসারে জীবের যাহা চরম লক্ষ্য তাহা ব্রজগোপীগণের ভাবানুকরণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ। ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বশ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাঁহার ভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণসহ কখনো মিলিত হন কখনো বা আবার অমিলিত হন। মিলন বা সম্ভোগ কালে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণসহ এক হইয়া যান, যেন দুইটি মনকে পিষিয়া মিশাইয়া ফেলা হয়, যথা—

"না সো রমণ না হাম্ রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল মানি।।" (চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, রায় রামানন্দ প্রসঙ্গ।)

"রামানন্দ চরণৌ ধৃত্বা—সখি ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে প্রেমরসেনোভয় মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ।" অথবা—

"অহং কান্তাকান্তস্ত্বমিতি নতদানীং মতিরভূন্মনোবৃত্তিলুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপিহতা। ভবান্ ভর্তা ভার্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতিবিচিত্রং কিমপরম্।।" (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৭ অঙ্ক, ১৫/১৬ সংখ্যক অংশ দ্রষ্টব্য।)

অর্থাৎ তিনি পুরুষও নহেন আর আমি রমণীও নহি। দুটি মনকে মদন পিষিয়া যেন এক করিয়া দিয়াছে। অথবা আমি কান্তা, তুমি কান্ত, তখন এরূপ বুদ্ধি থাকে না, তখন মনোবৃত্তি লুপ্ত হয়, তখন 'তুমি আমি' আমাদের এ-বুদ্ধি অপহৃত হয়। কিন্তু এখনো যে আপনি ভর্তা ও আমি ভার্যা অথবা আমাদের প্রাণ যে এখনো রহিয়াছে, ইহাই অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার।

বিরহকালে তিনি যাহা দেখেন তাহাতেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্তি হয়, কখনো বা নিজেই নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। যথা—

" 'কৃষ্ণময়ী'—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।। উদ্ঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম। বিরহে কৃষ্ণ স্ফূর্তি আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান।" (মধ্য, ২৩ অঃ।)

অন্যান্য গোপীগণ, রাধাকৃষ্ণের ভাবের সহায়তা করিয়া চরিতার্থতা লাভ করেন। কিন্তু আত্ম চরিতার্থতা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে, উহা তাঁহারা না চাহিলেও হইয়া থাকে।

জীব এই গোপীভাবের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে করিতে ব্রজে সিদ্ধ দেহলাভ করিয়া চিরকাল শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে থাকেন। জীবের ইহাই পরম পুরুষার্থ। যথা—

"সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম সর্বত্যজি সেই কৃষ্ণে ভজয়।।
রাগানুগমার্গে তারে ভজে যেইজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।।
ব্রজলোকের কোন ভাব লইয়া যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণে পায় ব্রজে।।
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার।।
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ।।" (মধ্য, ৮ম।)

এই গোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ। যথা—

"মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখি তার কায়ব্যূহরূপ।।" (মধ্য, ৮ম।)

কায়ব্যূহ শব্দটি একটু অপ্রচলিত। ইহার অর্থ—একজন যদি একই কালে বিভিন্ন প্রকারের বহু ভিন্ন দেহ ধারণ করে তাহা হইলে সেই ভিন্ন দেহগুলি কায়ব্যূহ শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে। জীবের উন্নতির গতি এই পর্যন্ত, জীব চরমে শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহত্ব পর্যন্ত লাভ করিতে পারে।

যাহা হউক এক্ষণে জীবভাব ও রাধাভাব কী জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে জীবের উক্ত উন্নতির সীমার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কী সম্বন্ধ। সুতরাং অগ্রে দেখা যাউক শ্রীরাধার স্বরূপ কী? কিন্তু শ্রীরাধার স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে অগ্রে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ কী বর্ণনা করা প্রয়োজন। সুতরাং সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে শ্রীরাধা ও জীবের স্বরূপ-তত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ নানাস্থলে নানা প্রকারে কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় যথা—

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান।।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার।।
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্বৈশ্বর্য সর্বশক্তি সর্বরস পূর্ণ।।

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন।।
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন।।
নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেইসব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়।।
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্তিধর।
অতএব আত্ম পর্যন্ত সর্ব চিত্ত হর।।
লক্ষ্মী কান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ।।
আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন।।
এইতো সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি রাধার তত্ত্বরূপ।।"

এইবার শ্রীরাধার স্বরূপ দেখা যাউক—

"কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম।।
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা করি যারে।
অন্তরঙ্গাস্বরূপ শক্তি সবার উপরে।।
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ।।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি।।
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।।
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তজ্ঞানে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।।
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস তার প্রেমের আখ্যান।।
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরানী।।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য যার।
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।।
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।।"

তাহার পর জীবের স্বরূপ যথা—

"জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
সভার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সভার স্থিতি।।
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তিভেদাভেদ প্রকাশ।।

সূর্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাময়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়।।''

সুতরাং দেখা যাইতেছে সেই অদ্বয় তত্ত্বের ত্রিবিধ শক্তি; যথা, প্রথম—অন্তরঙ্গা, দ্বিতীয়—তটস্থা ও তৃতীয়—বহিরঙ্গা শক্তি। শ্রীরাধা ও গোপীগণ অন্তরঙ্গা শক্তি, জীবনিচয় তটস্থা শক্তি এবং জড়জগৎ বহিরঙ্গা শক্তি। তটস্থা শক্তি জীব, গোপীভাবের অনুগামী সাধনাবলে অন্তিমে গোপীভাব বা অন্তরঙ্গা শক্তির ন্যায় অপার নিত্য আনন্দভোগ করিতে থাকে। এসময় শ্রীরাধিকার ন্যায় জীব সর্বত্র ভগবানকেই দর্শন করিয়া থাকে, ভগবদ্ভিন্ন অন্য বস্তু তাহার ইন্দ্রিয়গোচর হয় না; যথা—

''মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাহা তাহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ।।
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্তি।
সর্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্তি।
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।।'' (মধ্য, ৮ম।)

অন্য সময়ে জীব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির অভিমুখী হইয়া সংসার করে এবং ভক্তিসাধনবলে অন্তরঙ্গা শক্তির অভিমুখী হইয়া অনন্ত সুখ ভোগ করে। এইমাত্র প্রভেদ। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য পক্ষে দেখা গেল, শঙ্করমতে সবিকল্পক সমাধিতে যেমন সাধক সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মবস্তুকে অনুস্যূত দর্শন করেন, তদ্রূপ গৌড়ীয় সিদ্ধান্তেও মহাভাগবত সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন, এবং অনৈক্য পক্ষে দেখা যায় যে, তাঁহার ইষ্টদেব উক্ত সর্ব বস্তুতে অনুস্যূত শঙ্করের মতের ব্রহ্মবস্তুরও মধ্যে আনন্দ-ঘন রসময় মূর্তি। দেহান্তে শঙ্করমতে যেমন ব্রহ্মতত্ত্বে মিশিয়া যাওয়া বুঝায়, গৌড়ীয় মতে তদ্রূপ সিদ্ধ দেহে তটস্থাশক্তি জীব অন্তরঙ্গা শক্তির ন্যায় চিরকাল ভগবৎ সমীপে থাকিয়া ভগবৎ সেবা করিয়া থাকে। সাধারণত গোস্বামীপাদগণ, জীবের চরম এই পর্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকেই আবার সিদ্ধ দেহে জীবের তটস্থা শক্তিত্ব ঘুচাইয়া অন্তরঙ্গা শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে জীব এই অন্তরঙ্গাশক্তিত্ব লাভ করিলে শ্রীরাধাঠাকুরানীর সখী হইয়া যান। কিন্তু আবার কেহ কেহ জীবের শ্রীরাধাত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন। বস্তুত এই শেষ পক্ষটি, বোধহয়, শঙ্করমতের খুব নিকটবর্তী। গৌড়ীয় মতের আচার্য শ্রীরূপের গ্রন্থমধ্যেই এ-কথার আভাস পাওয়া যায়। 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে যথায় শ্রীপাদ রূপগোস্বামী মহাশয় সমর্থারতির পরিচয় প্রদান করিতেছেন তথায় বলিতেছেন যে,

''ইয়মেবরতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাব দশাং ব্রজেৎ।
যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তাণাং ভক্তানাং চ বরীয়সাম্।।'' ৪২ (স্থায়ী ভাব প্রকরণ)

অর্থাৎ এই প্রৌঢ়া রতি মহাভাব দশায় লইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও মুক্তগণের ইহা মৃগ্যা অর্থাৎ অন্বেষণীয় বিষয়। ওদিকে শ্রীরাধাই যে মহাভাব স্বরূপিণী তাহা সকলেই অবগত আছেন। এজন্য এ-রতি শ্রীরাধাঠাকুরানীর ভাব। এখানে ইহা জীবের হয় না একথা বলা হয় নাই, কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী

মহাশয় মৃগ্যা শব্দের অন্বেষণীয় অর্থ স্বীকার করিয়াও "ন তু প্রাপ্যা" এই কথাটুকু যোগ করিয়া দিয়াছেন। আচার্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় এস্থলে "ওকথা শ্রীজীব বলেন" বলিয়া স্বয়ং নিস্তব্ধ রহিলেন; যেন মনে তাঁহার অন্য কিছু ভাব লুকাইয়া রহিল। তিনি তাঁহার টীকামধ্যে এ-বিষয়ে এইভাবে লিখিয়াছেন যথা—"মৃগ্যেব ন তু প্রাপ্যা তন্মার্গণ পরিপাটীনাং দুর্বোধত্বাৎ ইতি শ্রীজীব গোস্বামী চরণাঃ।" সাধারণত গোস্বামী প্রভুপাদগণ জীবের শ্রীরাধাত্ব প্রাপ্তি স্বীকার না করিলেও শ্রীরূপের লেখায় একথা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার গ্রন্থের অস্থিমজ্জায় বরং তদ্বিপরীত কথাই আছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর বিশ্বনাথ নিজ গ্রন্থ ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু-বিন্দুতে স্পষ্টভাবেই লিখিয়াছেন যে, "তদা দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাদিত্ব প্রাপ্নোতি" অর্থাৎ তখন দ্বারকাতে জীব রুক্মিণী আদির পদবী লাভ করেন। সুতরাং বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শ্রীজীবের সময় হইতে জীবের শ্রীরাধাপ্রাপ্তি ঘটে কিনা এ-বিষয়ে একটি মতভেদের সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং এই মতভেদের এক পক্ষে শ্রীজীবের কিছু পরে শ্রীবিশ্বনাথ ছিলেন। কিন্তু শ্রীজীবের ইহা অন্তরের কথা কিনা তাহা বলিবার পক্ষে সন্দেহও যথেষ্ট বিদ্যমান। কারণ বিশ্বনাথ স্বকীয় ও পরকীয় রস বিচারে শ্রীজীবের লেখা হইতে এমন এক কথা বাহির করিয়াছেন যাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীজীবের অনেক কথা যে পরেচ্ছা প্রণোদিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রীজীবের সে-কথাটি এই—

"স্বেচ্ছয়া লিখিতঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎ পূর্বোপরসম্বন্ধং তৎ পূর্বমপরং পরমিতি।।"

অধিক কি শ্রীপাদ কৃষ্ণ কবিরাজ মহাশয়ও চরিতামৃতে কোথাও এমন কথা লেখেন নাই যে, জীব শ্রীরাধা হয় না অথবা শ্রীরাধায় মিশিয়া যায় না। তাঁহার লেখার ভিতর—

"সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ।।" (চ, চ মধ্য, ৮ম)

একথা আছে সত্য কিন্তু এতদ্বারা শ্রীরাধাভাব জীবের হয় না, একথা প্রমাণ হয় না। বরং "সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।" এই কথায় এই-ই প্রমাণ হয় যে, সাযুজ্য অসম্ভব পদার্থ নয়। আবার যদি সর্বজননমস্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের "কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব" কথাটি স্মরণ করা যায় তাহা হইলেও সন্দেহ আদৌ স্থান পাইবার যোগ্য নহে বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক এক্ষণে আমরা বিচার দৃষ্টিতে দেখিব এই উভয় মতের যাহা প্রধান অনৈক্য অংশ তাহার অবস্থা কিরূপ। এ-বিষয়টিকে একে একে ধীরভাবে আলোচনা করা উচিত। এজন্য নিম্নে আমরা প্রধান অনৈক্য অংশের পূর্ণমাত্রা অবলম্বনে একটি তালিকা সঙ্কলন এবং তদনুসারে এ-বিষয়টি বিচার করিব।

১ম। জীবতটস্থাশক্তি, কখন অন্তরঙ্গা শক্তিত্ব লাভ করিবে না।

২য়। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ সাহায্যে ভগবদ্ সেবা প্রভৃতি স্বীকার্য।

৩য়। শঙ্করমতের যে ব্রহ্ম বস্তু, গৌড়ীয় মতে তাহারও অভ্যন্তরে আনন্দ-ঘনমূর্তি বিরাজমান।

এক্ষণে আমরা এতদনুসারে একে একে এই তিনটি বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিব এই উভয়মতের পার্থক্য কিরূপ।

১ম, জীবের তটস্থাশক্তিত্ব। উভয় সম্প্রদায়ই মূলতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব লইয়া কোন বিবাদ করেন না। কিন্তু শঙ্করমতে জীবের সহিত ব্রহ্মের যেরূপ অভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় মহাপ্রভুমতে তাহা স্বীকৃত হয় না। তাঁহার মতে জীব ভগবানের নিত্য তটস্থাশক্তি বলিয়া কোনকালে ভগবানে অন্তরঙ্গা শক্তির ন্যায় মিশিয়া যাইবে না। ইহা চিরকাল, শক্তি ও শক্তিমানের যেরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ; সেইভাবে ভিন্নভিন্নরূপে তটস্থা হইয়া থাকিতে বাধ্য। এখন এস্থলে, প্রথমত, অদ্বৈতবাদিগণ সেই অদ্বয় তত্ত্বে তটস্থা, বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা প্রভৃতি শক্তিভেদ স্বীকার করিতে চাহেন না এবং তৎপরে পারমার্থিক অবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন অদ্বয়তত্ত্বে শক্তিভেদ অসম্ভব, কারণ 'তটস্থা' এই শব্দটির প্রতিই যদি লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইহা নদীর তটের ন্যায় সেই অদ্বয় তত্ত্বের সহিত চিরসংলগ্ন, এবং সন্নিহিত প্রদেশে স্থিত। 'তট', 'জলপ্রবাহ' এবং 'তটভিন্ন বহির্দেশ' ব্যতীত যেমন নদীর নদীত্ব সম্ভবই নহে, এস্থলেও তদ্রূপ ব্রহ্মে তটস্থা শব্দটি প্রযুক্ত হওয়াতে, সেই অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর 'মধ্য', 'সন্নিহিত' এবং 'বহির্দেশ'—এই তিনটি পদার্থই সিদ্ধ হইতে বাধ্য। কিন্তু অদ্বয়তত্ত্বে এরূপ 'দেশ' কল্পনা করিলে অদ্বয়ত্বের হানি হইবে। কারণ তখন 'অদ্বয় তত্ত্ব' ও 'দেশ' এই দুইটি বস্তু সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। আর তাহা হইলে সেই অদ্বয় তত্ত্বটি সসীম হইয়া পড়িতে বাধ্য এবং বেদান্তমতে সসীম বস্তুর যেসকল দোষ স্বীকার করা হইয়া থাকে সেসকল দোষও তাহা হইলে উক্ত ব্রহ্মবস্তুতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন, যদি ব্রহ্মবস্তুকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার ইচ্ছা হয়, যদি ব্রহ্মবস্তুকে অদ্বয়তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জীবকে ব্রহ্মের তটস্থা শক্তি বলিয়া ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে একটু দূরে রাখিবার চেষ্টা সিদ্ধ হইতে পারে না। জীবকে অদ্বয় ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া, শক্তি ও শক্তিমানের যে সাধারণ সম্বন্ধ, জীবের সহিত ব্রহ্মের সেই সম্বন্ধ মাত্র স্বীকার করিতে হইবে। অন্তরঙ্গা ও তটস্থা প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা অদ্বয় তত্ত্বের শক্তির তারতম্য সাধন করা চলিতে পারিবে না। ইহা করিলেই অদ্বয়ত্বের হানি অনিবার্য হইবে।

গৌড়ীয় সম্প্রদায় কিন্তু একথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, সূর্য বলিতে যেমন সূর্যমণ্ডল ও কিরণ এই দুইটি বস্তুই বুঝায় এবং মণ্ডলের শক্তি ও কিরণের শক্তি যেমন একপ্রকার নহে—উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য আছে—তদ্রূপ অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুরও শক্তির তারতম্য অসঙ্গত নহে।

অদ্বৈতবাদী এস্থলে বলিবেন যে, এ-দৃষ্টান্তের দ্বারা ও কথা সিদ্ধ হয় না। কারণ এস্থলে সূর্যমণ্ডল ও সূর্যকিরণ, এই দুই পদার্থের ভেদের কারণ সেই 'দেশ' পদার্থ। মণ্ডল হইতে যতদূরে যাইবে কিরণ ততই তরল হইতে

থাকিবে এবং এই দূরত্বের কারণ দেশ ভিন্ন আর কিছু নহে। সুতরাং পূর্বোক্ত নদীর দৃষ্টান্তের ন্যায় এ দৃষ্টান্তেও দোষ আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৌড়ীয় মতে ইহার উত্তরে বলা হয় যে, দৃষ্টান্তের সর্বাংশ গ্রহণ করা উচিত নহে। যে-অংশে দৃষ্টান্ত কেবল সেই অংশটুকু মাত্র লইতে হয়। নচেৎ চাঁদের মতো মুখখানি বলিলে কি মুখখানি চাঁদের মতো গোলাকার বুঝিতে হইবে? তাহা যেমন কদাচ লোকে বুঝে না, এস্থলেও তদ্রূপ সূর্য দৃষ্টান্তের মধ্যে 'দেশের' অংশটুকু আনিলে চলিবে না। কিরণ ও মণ্ডল উভয়ই সূর্যপদবাচ্য হইয়া, যেমন তাহাদের শক্তির তারতম্যজন্য সূর্যের শক্তির তারতম্য স্বীকৃত হয়, এস্থলেও তাহাই করিতে হইবে।

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, দৃষ্টান্তের সর্বাংশ গ্রাহ্য নহে, একথা সত্য; কিন্তু যে-অংশ দৃষ্টান্তের মধ্যে, অভিপ্রেত অংশের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তাহা গ্রহণ করা প্রয়োজন; নচেৎ সকলেই দৃষ্টান্তের দ্বারা অসম্ভব বিষয়ও প্রমাণ করিতে পারে। দৃষ্টান্তের অভিপ্রেত অংশের সহিত যদি দৃষ্টান্তের অপরাংশের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে অপরাংশ ত্যাগ করিয়া লোকে বক্তার কথা বুঝিতে পারে।

অদ্বৈতবাদীর এই কথা শুনিয়া গৌড়ীয়গণ বলেন যে, তাহা হইলে তোমাদের (অদ্বৈতবাদীর) রজ্জুসর্প দৃষ্টান্তের দ্বারা জগৎকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। কারণ সত্য দেখিয়াই যখন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয় তখন ব্রহ্মবস্তুতে জগদ্দর্শন ব্যাপারও সত্য-জগতের বোধক। ইহাতে জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করে না। যদি বলো দৃষ্টান্তের এ অংশ গ্রাহ্য নহে তাহা হইলে বলিব আমাদের সূর্যমণ্ডল ও কিরণের সহিত যেমন দেশের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এস্থলেও রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তে সর্পের সত্যতারও সেইরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, না তোমাদের ওকথা ঠিক নহে। কারণ, প্রথমত ইহাতে দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্যের সহিত বিরোধ হয়, এবং দ্বিতীয়ত এস্থলে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। আমাদের দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা, আর তুমি যদি সেই দৃষ্টান্তের অপরাংশ লইয়া জগতের সত্যত্ব প্রমাণ করিতে যাও, তাহা হইলে উদ্দেশ্যে বিরোধ ঘটিল। তোমরা দৃষ্টান্তের অপরাংশের দ্বারা খুব জোর আমাদের অন্য সিদ্ধান্তের দোষ দেখাইতে পার, প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা আনিতে পার না। ইহা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। আমরা তোমাদের সূর্যকিরণে 'দেশ' সম্বন্ধ আনিয়া সেরূপ করি নাই। সুতরাং তোমার কথা অসঙ্গত।

তাহার পর, 'সূর্যকিরণ' ও 'দেশে' যেরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, রজ্জুসর্পে সেরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। কারণ, 'কিরণ' ও 'দেশের' সম্বন্ধ নিত্য বা সর্বকালিক, কিন্তু আমাদের রজ্জুতে যে-সর্পজ্ঞান হয়, সে সর্পজ্ঞান পূর্বদৃষ্ট সর্পজ্ঞানমূলক। তৎকালে সে সর্প থাকিতেও পারে নাও পারে। সুতরাং তোমাদের 'সূর্য' ও 'কিরণে' কালগত ব্যবধান নাই এবং আমাদের রজ্জুসর্পে কালগত ব্যবধান আছে। এজন্য আমাদের রজ্জুসর্পের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নহে। আর তাহার পর আমরা রজ্জুসর্পে যে-সর্পজ্ঞান স্বীকার করি তাহা

সত্যসর্পমূলক বলিয়াই স্বীকার করি না। তোমরা যদি আমাদের দৃষ্টান্তের ওরূপ অন্যায় করিয়া অন্য অংশ ধরিয়া আমাদের কথার বিপরীত কথা প্রমাণ করিবার জন্য আগ্রহ করিতে চাহ তাহা হইলে তোমাদের আগ্রহ শান্তির জন্য তোমাদিগকে অন্য অংশের কথা তুলিতে দিলাম, কিন্তু তথাপি এরূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদের বিপরীত কথা প্রমাণ করিতে দিব না। কারণ রজ্জুতে যে-সর্প দেখা হয় সে সর্প তোমরা পূর্বে কখনো দেখ নাই, ইহাও নিশ্চিত। ইহা তোমাদের সর্পজাতিজ্ঞানের অসঙ্গত প্রয়োগ, সুতরাং ভ্রম। সর্প-জাতি-জ্ঞান দ্বারা যেকোন একটা যথার্থ সর্পে সর্প-জ্ঞান হইবার কথা; রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইবার তো কোন কথা নাই। সুতরাং রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তেও যে-সর্প তাহা সত্য সর্প নহে। যদি আমরা তোমাদিগকে আমাদের দৃষ্টান্তের অপর অংশ গ্রহণ করিতে অনুমতি দিই, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমরা, তদ্রূপ করিতে আমাদিগকে অনুমতি দিলে তোমার অদ্বয় ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব হানি হইতে বাধ্য। অগত্যা তোমার সূর্য ও তাহার কিরণ দৃষ্টান্ত দ্বারা অদ্বয় তত্ত্বের শক্তির তারতম্য প্রমাণিত হয় না। (এ-বিষয়ে অন্য কথা পরে দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু অদ্বৈতবাদের বিরোধীগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা বলেন সর্পজাতি-জ্ঞানের রজ্জুতে প্রয়োগই যদি রজ্জুতে সর্প ভ্রমের হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্পজাতি জ্ঞানের জন্যও তো সর্পবস্তু দর্শনের প্রয়োজন, সুতরাং এতদ্দ্বারা সর্পের সত্তা নিবারিত হয় না। অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তরে আরেকটু অগ্রসর হইয়া বলেন যে, শুধু প্রয়োগের ভুলই আমরা বলি না, আমরা সর্পজাতি-জ্ঞানকেও মিথ্যা জ্ঞানের মধ্যে গণ্য করি; কারণ তুমি যে পাঁচটা সর্প দেখিয়া সর্পজাতি-জ্ঞান গঠন কর তাহা যাবতীয় সর্প সম্বন্ধীয় সত্যজ্ঞান নহে—পাঁচটা বা পাঁচ লক্ষ সর্প দেখিয়াও যাহা সর্পজাতি বলিয়া স্থির করা হয়, তাহা হয়তো এক কোটি সর্প দেখিতে দেখিতে অন্যথা হইয়া যাইবে, এবং বস্তুত ব্যবহারেও এইপ্রকার জাতিজ্ঞানের পরিবর্তনই হইতে দেখা যায়। বাস্তবিক সর্পজাতিজ্ঞান একটা মনগড়া পদার্থ। আর কেবল তাহাই নহে, জগতের সকল লোকেরই সর্পজাতি-জ্ঞান একপ্রকারও নহে। সুতরাং সর্পজাতিজ্ঞান ও যথার্থ সর্প মধ্যে যথেষ্ট ভেদ আছে। এজন্য রজ্জুতে যে-সর্পজ্ঞান হয় সে-সর্পজ্ঞান—সত্য-সর্পজ্ঞান নহে।

এখন একথাও যে আপত্তিশূন্য—তাহা নহে। প্রতিবাদী বলিয়া থাকেন—না; ওকথা স্বীকার্য নহে—কারণ রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, হস্তিভ্রম তো হয় না, যে সর্প দেখিয়াছে, রজ্জু ও সর্পের সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়াছে, তাহারই তো রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, অন্যের নহে। সুতরাং যে-সর্পত্ব, রজ্জুতে আরোপ করা হয়, তাহার বিষয় বা আধার যে সর্প তাহা সত্য। অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তরে বলেন—না—ও আপত্তি ঠিক নহে, কারণ ভ্রম জ্ঞান হইতেও ভ্রম হইয়া থাকে। ভ্রম হইতে গেলেই যে তাহার আধার সত্য হওয়া চাই তাহার কোন নিয়ম নাই। যাহার সত্য-বিষয় নাই এমন জ্ঞান হইতেও অন্য ভ্রমের উৎপত্তি সম্ভব, যেমন ভূত দর্শন।

বস্তুত একথার উপর আর কোন কথা উঠিতে পারে না, কারণ ভ্রমজ্ঞান হইতে যখন অন্য ভ্রমজ্ঞান জন্মে সিদ্ধ হয় তখন রজ্জুসর্পজ্ঞানে সর্পের

সত্যতার জন্য আর জেদ করা চলে না। কিন্তু এস্থলেও প্রতিপক্ষকে বলিতে শুনা যায় যে, সত্য বিষয়ক জ্ঞান হইতে যে-ভ্রমজ্ঞান হয় তাহাতেও যেমন পঞ্চভূত বর্তমান, তদ্রূপ অসত্য বিষয়ক জ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান হইতে যে-ভ্রমজ্ঞান জন্মে তাহাতেও সেই পঞ্চভূত বর্তমান; সুতরাং ভ্রমজ্ঞানেরও বিষয় সত্য—মিথ্যা নহে। অদ্বৈতবাদিগণ একথারও উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন এ পঞ্চভূতে বিষয়তাই সত্যের নিদর্শন নহে, কারণ তাহা হইলে বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকুসুমও সত্য; যেহেতু উহাদিগকে পঞ্চভূতাতিরিক্ত বলা কাহার ইচ্ছা নহে। 'দেখ মানুষ মনে মনে যদি কোন একটা জিনিস গঠন করে, বা কোন একটা মূর্তি কল্পনা করে এবং সেই জিনিসের মতো যদি অন্য একটা বস্তু দেখিয়া তাহার ভ্রম হয়, তাহা হইলে সে-ভ্রমের অসম্ভাবনা দেখা যায় না; ধরুন মনে মনে আমি একটা পক্ষবিশিষ্ট বানর কল্পনা করিয়াছি এবং ঘটনাচক্রে কোন এক দূর দেশে একটা মাটির ঐরূপ মূর্তি দেখিয়া তাহাকে যদি জীবন্ত মূর্তি বলিয়া মনে হইল, তাহা হইলে কি এই ভ্রমটা আধার বা বিষয় শূন্য ভ্রম নহে? সুতরাং কোন মতেই প্রমাণ হয় না যে, ভ্রমজ্ঞান মাত্রই সত্য বিষয়ক। অন্য কথায় রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তেও কোন দোষ নাই, পরন্তু সূর্য ও সূর্যমণ্ডলদৃষ্টান্তে যে-দোষ ঘটে তাহাতে অদ্বৈততত্ত্বের অদ্বৈতত্ব হানি রক্ষা পায় না। অদ্বৈত মতে ভ্রমজ্ঞান দ্বারা সত্যজ্ঞানের বাধ অসম্ভব, সুতরাং ভ্রমজ্ঞান দ্বারা অদ্বৈতভাবের হানি অসম্ভব। অন্ধকার আলোককে হটাইতে পারে না কিন্তু একখণ্ড কাষ্ঠ তাহা পারে।

যাহা হউক এক্ষণে দ্বিতীয় বিষয়টি বিচার্য। এই দ্বিতীয় বিষয়টি বলিতে শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ নির্ণয়, অপর কিছু নহে। গৌড়ীয় সম্প্রদায় বলেন শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, না, তাহা নহে। শক্তিমানের কার্যাবস্থায়, শক্তির সহিত তাহার ভেদাভেদ সম্বন্ধ সত্য; কিন্তু শক্তিমানের কারণাবস্থায় তাহা নহে। কারণাবস্থায় উহাদের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বা অভেদ সম্বন্ধই সত্য।

এই বিষয়টি বিচার করিতে হইলে শক্তি ও শক্তিমান কাহাকে বলে দেখা আবশ্যক। দেখা যায় মাটি হইতে ঘট উৎপন্ন হয়, তন্তু হইতে পট নির্মিত হয় ও অগ্নি হইতে জ্বালা জন্মে। এজন্য মাটিতে ঘট-জননী শক্তি, তন্তুতে পটোৎপাদিনী শক্তি এবং অগ্নিতে জ্বালা-জননী শক্তি স্বীকার করা হয়, এই শক্তি মাটি বা ঘট নহে, তন্তু বা পট নহে, অগ্নি বা জ্বালা নহে। তবে উহা মাটি, তন্তু বা অগ্নিতে থাকে মাত্র। এজন্য উক্ত মাটি, তন্তু ও অগ্নিকে শক্তিমান বলা হয় এবং তাহাদের ঘটপট ও জ্বালা জনন সামর্থ্যকে শক্তি নামে অভিহিত করা হয়। এখন দেখা যাউক ইহাদের সম্বন্ধ কি? দেখা যায় এই শক্তিমান পদার্থটি দুইপ্রকারে অবস্থান করে। মাটি, তন্তু ও অগ্নি একসময় মাটির পিণ্ড, সূত্রাকার ও অগ্নিশিখামাত্র আকারে থাকিতে পারে এবং কখনো বা ঘটপট ও জ্বালা আকারে থাকিতে পারে। কারণ মাটি ঘট হইলে তাহার মাটিত্ব নষ্ট হয় না, এখন এই মাটিকে যদি কারণ নামে অভিহিত করা হয় এবং ঘটকে কার্য নামে পরিচিত করা যায়, তাহা হইলে শক্তিমান পদার্থটি

কারণ এবং কার্য এই দুই আকারে থাকিতে পারে—স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য শক্তিমানের সহিত শক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে শক্তিমানের কার্য ও কারণ এই দুই অবস্থাতেই তাহার যেরূপ সম্বন্ধ তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। সুবিধার জন্য এক্ষণে আমরা উক্ত তিনটি দৃষ্টান্তের পরিবর্তে কেবল মাটির দৃষ্টান্তটাই গ্রহণ করি। প্রথম, শক্তিমানের কার্যাবস্থায় শক্তির সহিত শক্তিমানের কি সম্বন্ধ দেখা যাউক।

মাটি যখন ঘটাকারে অবস্থিতি করে তখন তাহা কার্যাবস্থা এবং সেই মাটি যখন পিণ্ড বা যদৃচ্ছা বা ঘট—ভিন্নাকারে অবস্থিতি করে তখন তাহা কারণাবস্থা নামে কথিত হয়। এখন কার্যাবস্থায় অর্থাৎ মাটি যেসময় ঘটাকার ধারণ করিয়াছে সেসময় ঘট-রূপকার্য দেখিয়া সেই মাটির যে ঘট-জননী শক্তি আছে তাহা অনুমান করিতে কাহারো কষ্ট হইতে পারে না। কারণ মাটির সে শক্তি না থাকিলে মাটি হইতে ঘটই উৎপন্ন হইতে পারিত না। বালুকাতে সে শক্তি নাই এজন্য বালুকার ঘট হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে কার্যাবস্থায় শক্তিমানের শক্তি স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। আর এই শক্তি শক্তিমানে থাকে বলিয়া শক্তিমান পদার্থ ও শক্তি পদার্থ এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। যাহা কোন কিছুতে থাকে, তাহা তাহার সহিত ভিন্ন হইতে বাধ্য। আবার ভিন্ন হইয়াও যেহেতু শক্তিমানের দেশবিশেষে বা কালবিশেষে ঐ শক্তির তারতম্য হয় না, সেইহেতু তাহা অভিন্নও বটে। কারণ, কোন কিছু দেশ বা কালের দ্বারা যদি পরিচ্ছিন্ন না হয় তাহা হইলে তাহা কখনোই ভিন্ন বা বহু আখ্যা পাইতে পারে না। সুতরাং শক্তিমানের কার্যাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানে ভেদাভেদ উভয় সম্বন্ধ বিদ্যমান।

এইবার শক্তিমানের কারণাবস্থার শক্তির সহিত শক্তিমানের কী সম্বন্ধ দেখা যাউক। উপরে দেখিয়াছি মাটির ঘটভিন্নাবস্থাই ঘটের পক্ষে মাটির কারণাবস্থা। এখন দেখা দরকার উক্ত কারণাবস্থায় ঘট-জননী শক্তি তাহাতে কিভাবে বর্তমান। মাটির ঘট দেখিয়া যেমন সেই ঘটের মাটির ঘট-জননী শক্তি স্বীকার করা হয়, তদ্রূপ আমরা ঘট ভিন্ন মাটি দেখিলেই বলিতে পারি যে তাহারও ঘট-জননী শক্তি আছে। যে-মাটি দেখিয়া একথা বলি তাহাতে কেহ কখনো ঘট নির্মাণ করুক আর নাই করুক তাঁহাতে ঘট গড়িলেই ঘট হইবে আমাদের অনুমান ঠিক হইবে। সুতরাং মাটি দেখিয়াই তাহাতে শক্তি আছে বলিলে সঙ্গত কথাই বলা হইল আর তাহা হইলে শক্তিমানের কারণাবস্থাতেও কার্যাবস্থার ন্যায় শক্তিমানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইল। কিন্তু ইহার ভিতরে একটা কথা আছে। আমরা যে ঘট ভিন্ন মাটির বা মাটি মাত্রেই ঐরূপ শক্তির অনুমান করি, তাহা আমরা অন্যত্র বা ভিন্নকালে মাটি হইতে ঘট হয় দেখিয়াই করি। অন্য মাটিতে বা অন্য সময় সেই মাটিতে ঘট হওয়া না দেখিয়া কখনোই তাহা করিতে পারিতাম না। সুতরাং এস্থলেও মাটির ঘটাবস্থার জ্ঞানদ্বারাই ঐ মাটির ঘট-জননী শক্তি স্বীকার করা হয়। এস্থলে মাটি কোন কালে ঘট হইয়া অথবা মাটির কোন অংশ ঘট হইয়া আমাদিগকে মাটির ঘটাবস্থার জ্ঞান শিক্ষা দেয়, তাহাতেই মাটির ঐ শক্তি স্বীকার করা

হয়। কিন্তু মাটি যদি কোন কালে বা কোন অংশে তাহার ঘটাবস্থার জ্ঞান আমাদিগকে না শিক্ষা দিত, তাহা হইলে কি ঘটাবস্থার জ্ঞান আমাদিগের হইত, এবং তাহা হইলে কি তাহা দ্বারা মাটির ঐ শক্তি আছে স্বীকার করা সম্ভব হইত? এজন্য ঘটভিন্নাবস্থার মাটি দেখিয়াই তাহাতে ঘট-জননী শক্তি স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে ঘটাবস্থার মাটির ঘট-জননী শক্তি স্বীকার করা হয়; ঘটভিন্নাবস্থার মাটির পক্ষে তাহা স্বীকার করা হয় না। সুতরাং মাটির ঘটভিন্নাবস্থার ঘট-জননী শক্তি স্বীকারের কোন উপায় নাই। স্বীকারের উপায় নাই বলিয়া তখন মাটি ও শক্তি হয় এক, অথবা শক্তি নাই অথবা কেবল মাটিই আছে এই কথা বলিতে হয়। এখন মাটি যদি শক্তিমান পদার্থ হয় মাটির ঘটভিন্নাবস্থা যদি শক্তিমানের কারণাবস্থা হয় এবং মাটির ঘটাবস্থা যদি শক্তিমানের কার্যাবস্থা হয় তাহা হইলে বলা চলে শক্তিমানের কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমান এক বা অভিন্ন। এস্থলে যদি আপত্তি করা যায় যে, কারণ বলিলেই কার্য এবং কার্য বলিলেই কারণও বুঝাইয়া যায়, সুতরাং কার্য সাহায্যে কারণে শক্তি স্বীকার করিলেই তো ভাল। যাহার সহিত যাহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহাকে ছাড়িয়া তাহার লক্ষণ করিবার প্রয়াস কেন? বরং তাহাকে লইয়াই তো লক্ষণ করিলে, লক্ষণ সম্পূর্ণ হইবার কথা। সত্য, কিন্তু এস্থলে একটু কথা আছে। দেখ 'মাটি ও কারণ' এবং 'ঘট ও ঘটকার্য' ইহারা ঠিক এক পদার্থ নহে। মাটি ও কারণ একার্থক নহে, কার্য ও ঘট সমানার্থক নহে। যেহেতু মাটি, ঘট হইলেও তাহা মাটিই থাকে, মাটির কোন একটা ভাব বিনষ্ট হইয়া ঘট হয় মাত্র; কিন্তু ঘট, মাটি হইয়া গেলে ঘট আর ঘট থাকে না। তাহার সবটাই বিনষ্ট হয়। সুতরাং কারণ শব্দে মাটি ও কার্যাবস্থাবিশিষ্ট মাটি এই দুইটি অর্থই বুঝাইতে পারে এবং কার্য শব্দে ঘট ও ঘটের মাটি এই দুইটিই বুঝাইয়া থাকে। এখন কারণ শব্দে যদি কার্যাবস্থা পরিশূন্য কেবল মাটি অর্থই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তাহাও আমরা গ্রহণ করিতে পারি। ইহা তখন বস্তুবোধক শব্দের ন্যায় মাটি মাত্রই বুঝাইবে, সম্বন্ধসূচক শব্দের ন্যায় তাহার সহিত আর কিছু বুঝাইবে না, অর্থাৎ মাটির কোন অবস্থাবিশেষের প্রতি চিত্তকে পরিচালিত করিবে না। 'কারণ' শব্দ সম্বন্ধসূচক শব্দ, ইহা বলিলেই যেমন ইহার সহিত সম্বন্ধ কার্যকে বুঝায়, এস্থলে আর সেরূপ হইবে না। এখন দেখ, কারণ শব্দে কার্যাবস্থাপরিশূন্য বস্তু মাত্র বুঝায় বলিয়া শক্তিমানের কারণাবস্থা বলিলে কার্যাবস্থাপরিশূন্য শক্তিমানকে বুঝাইতে পারে। শক্তিমানের কারণাবস্থা বলিলেই যে কার্যাবস্থা-সম্পর্কীয় শক্তিমান বুঝিতে হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। নিয়ম নাই বলিয়াই তোমার আপত্তি স্থান পাইতে পারে না। অগত্যা, এখন যদি শক্তিমানের কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে তোমার দুইরকম করিয়া তাহা করা উচিত। অর্থাৎ একবার কার্যাবস্থা-পরিশূন্যভাবে এবং আরেকবার কার্যাবস্থা-বিশিষ্টভাবে করা উচিত। আর তাহা হইলে যখন তুমি কার্যাবস্থা-পরিশূন্য শক্তিমানের কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবে, তখন তোমার অগত্যা তাহাদের তাদাত্ম্য বা

অত্যন্ত অভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। অপর পক্ষে অর্থাৎ কার্যাবস্থাবিশিষ্ট শক্তিমানের কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ নির্ণয়কালে তুমি পূর্বের ন্যায় তাহাদের সম্বন্ধকে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বল আমার তাহাতে আপত্তি নাই। তুমি আমার লক্ষণকে ভুল বলিতে পার না।

অদ্বৈতবাদিগণ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব সমর্থন করিবার জন্য আরো প্রবল যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বলেন ঃ "সর্বকারণকারণ" সেই এক মূল কারণে, কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধ স্বীকারের উপায় নাই। পূর্বোক্ত ঘট ও মাটির দৃষ্টান্তে 'আমরা', 'ঘট' এবং 'মাটি' এই তিনটি বস্তু থাকে। ঘট—কার্য, মাটি—কারণ, আমরা সেই দুইটি বস্তু ছাড়া তৃতীয় বস্তু। কিন্তু প্রস্তাবিত যুক্তিতে সমগ্র জগৎ ও আমরা—কার্য এবং সেই অদ্বয়তত্ত্ব—মূল কারণ। যদি সেই মূল কারণ হইতে আমাদের সকলের জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সকলে যখন তাহাতে বিলীন হইব, তখন সেই কারণ-বস্তুত স্বীকারের জন্য থাকিবে কে? ঘট মাটির দৃষ্টান্তে, মাটি হইতে ঘট হয়, এই সংস্কার আসিয়া মাটির কারণাবস্থায় ঘট-জননী শক্তি স্বীকারে অলক্ষিতভাবে আমাদের হৃদয়ে একটা প্রবৃত্তি আসে। কিন্তু এস্থলে সে আশঙ্কা নাই। জগতাদি আমরা সকলে, সেই মূল কারণে লীন হইলে, সেই কারণবস্তুতে শক্তি স্বীকার, কর্তাভাবে অসম্ভব হয়। তখন—"কারণ বলিলে কার্য বুঝায়, সুতরাং কার্যদ্বারা কারণে কেন শক্তি স্বীকার করা হইবে না" এরূপ কথা বলিবারও কেহ থাকে না। যদি বলা যায়, আমরা সেই মূল কারণে লীন হইলেও তাহার সহিত আমাদের পার্থক্য থাকে। তাহাও বলিবার উপায় নাই। কারণ, কোন বস্তু দেখিবার কালে 'আমরা দেখি' এ জ্ঞান সর্বপ্রথমে হয় না, উহা দেখা ক্রিয়ার পর হয়। সর্বপ্রথমে যাহা দেখি, তাহা প্রথমে আমরা হই; তাহার পর তাহাকে আমাদিগ হইতে পৃথক করিয়া দেখি; সুতরাং দেখ, জ্ঞানের প্রথম মুহূর্তে ভেদ নাই, তখন সবই একাকার। এখন কৌশলবলে যদি এ অবস্থাটি রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভেদজ্ঞানের সম্ভাবনাই রহিল না। বস্তুত এ কৌশলও জ্ঞানী সাধকগণের অবিদিত নাই। তাহার পর একথা দৃষ্টান্তের দ্বারাও বুঝা যায়। দেখ সুষুপ্তি বা আমাদের কোন পার্থক্য-জ্ঞান থাকে না। তখন আমরা থাকি, কিন্তু থাকি তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

যদি বলা যায় যে, সুষুপ্তি বা মূর্ছাকালে আমাদের নিজত্ব জ্ঞান না থাকিলে জাগ্রতকালে সেই পূর্বের 'আমি' বলিয়া স্মরণ হয় কোথা হইতে? তাহা হইলে বলিব যে, যাহা স্মরণ হয়, তাহা পূর্বের জাগ্রতের 'আমি' বলিয়া স্মরণ হয়, সুষুপ্তিতে সেই আমি ছিলাম এ অনুভূতি স্মরণ হয় না। সুষুপ্ত থাকাটা অনুমান করিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। যদি বল, সুষুপ্তিতে কি তবে আমি ছিলাম না? আমরা বলিব যে, না তাহাও নহে, আমরা ছিলাম। কিন্তু অব্যক্ত অবস্থায়, অর্থাৎ সত্তামাত্রাবস্থায় ছিলাম। মনে কর, বরফের ঘটি, জল শুদ্ধ জলে ডুবাইয়া রাখিলে, বরফ যদি গলিয়া যায়, তাহা হইলে যেমনটি হয়, এস্থলেও তদ্রূপ হয়। জলের ভিতর জল-শুদ্ধ বরফের ঘটি গলিয়া যাওয়া

সুষুপ্তি এবং আবার সেই ঘটি হওয়া জাগ্রতাদি ব্যক্তাবস্থা। বরফের ঘটি গলিয়া গিয়া যদি আবার সেইরূপ একটি ঘটি হয়, তাহা হইলে যেমন সেই জলই আবার আসে, জাগ্রতেও তদ্রূপ সেই 'আমি' আবার আসে। সুষুপ্তিতে 'আমি' এমনভাবে স্বকারণে মিশে যাই যে, সেসময় কোন পার্থক্য থাকে না। সত্ত্বা-সামান্যে প্রত্যভিজ্ঞা হয় মাত্র। এসময় জ্ঞান ও সত্ত্বা এক পদার্থ।

তাহার পর আরেক কথা—সুষুপ্তিকালে যদি আমাদের এই অভিব্যক্ত 'আমি'র স্থিতি স্বীকার কর, তাহা হইলে বীজভূত সংস্কারগুলিও আমাদের তখন অনুভবগোচর হইত। ঐ সংস্কারগুলিই তো আমাদের নিজত্বের হেতু, উহারা আমাদের সেই চরম অব্যক্ত দেহে তো থাকিতে বাধ্য। কিন্তু আমরা তাহা অনুভব করি না, সুতরাং বলিতে হইবে; এই অনুভব কর্তা আমি তথায় থাকিয়াও ছিলাম না। আর বাস্তবিক এমন মূর্ছাও তো আছে, যাহা হইতে আর উত্থিতও হইতে হয় না; অথবা সে মূর্ছা হইতে উত্থিত হইয়া সে মূর্ছার সংস্কারমাত্রও থাকে না। সে ব্যক্তি যে মূর্ছিত ছিল, তাহাও তাহার মনে হয় না। সুতরাং তখনও কোনরূপ বোদ্ধা ও বুদ্ধির পার্থক্য থাকে, তাহা বলিবার উপায় নাই। কোনরূপ পার্থক্য স্বীকার না করিতে পারিলে ভেদাভেদ সম্বন্ধেও স্বীকার করা অসম্ভব। এজন্য শক্তিমানের কার্যাবস্থায় শক্তির সহিত শক্তিমানের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ এবং কারণাবস্থার অভেদ বা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে সকলকেই বাধ্য হইতে হইবে।

যদি বলা যায় যে, মনঃসংযোগকালে যেমন অন্য বস্তু প্রতীতি হয় না, অথচ বিষয়বিষয়িভাব থাকে, সুষুপ্তিতেও কেন তাহাই হউক না; তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, মনঃসংযোগ যে-বিষয়ে করা হয়, সে-বিষয় আমার অজ্ঞাত থাকে না, অন্য বিষয় অজ্ঞাত থাকে। আবার যদি বল যে, সুষুপ্তিতে অজ্ঞানই বিষয় হয়—অজ্ঞানে মনঃসংযোগ হয়, তাহাও ঠিক নহে। কারণ, জাগ্রতকালে অজ্ঞানে মনঃসংযোগ চেষ্টা করিয়া যেরূপটি হয়, সুষুপ্তিতে সেরূপ হয় না; সকলেই জানেন, সেসময় তাহা হইতে পৃথক ব্যাপার ঘটে। আর অজ্ঞানে মনঃসংযোগ মানেই বা কি? অন্য বস্তুতে মনঃসংযোগই তদ্ভিন্ন বিষয়ে অজ্ঞান নাম গ্রহণ করে। কেবল অজ্ঞানকে বিষয় করা অসম্ভব। সুতরাং অজ্ঞানের বিষয়তা নাই। যদি বল, তবে সুষুপ্তির অজ্ঞান, কোন্ বিষয়ের মনঃসংযোগের ফল? তাহা হইলে বলিব, উহা আত্মবিষয়ে মনঃসংযোগের ফল। যদি বল, আত্মা বিষয় হইলেও তো বিষয়াবিষয়িভাব সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে বলিব যে উহাই নির্বিষয়। নিজের দ্বারা নিজের পরিচ্ছেদ অসম্ভব। ইহা জগতে দেখা যায় না, এজন্যেই নির্বিষয় নামে অভিহিত হয়। আর যদি ইহাকে নির্বিষয় বলিতে আপত্তি হয়, তাহা হইলে অনির্বচনীয় বল, আমাদের কোন আপত্তি নাই। যদি বল, তবে তুরীয় ও সুষুপ্তিতে ভেদ কি? তাহা হইলে বলি, শঙ্করের বিবেকচূড়ামণির সেই কথাটি স্মরণ কর। যথা—

"মোহেন বিস্মৃতে দৃশ্যে সুষুপ্তিরনুভূয়তে।
বোধেন বিস্মৃতে দৃশ্যে তুরীয়মনভূয়তে।।"

মোহ দ্বারা দৃশ্য বিস্মরণ সুষুপ্তি, আর বোধের দ্বারা দৃশ্য বিস্মরণ তুরীয়।

এখন যদি বল যে—যেহেতু শক্তিমানের কার্যাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেহেতু তাহা কারণাবস্থাতেও সূক্ষ্মরূপে থাকিতে বাধ্য। কার্যে যাহা থাকে, তাহা কারণে থাকিতে বাধ্য। কারণে যাহা থাকে না, তাহা যদি কার্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জল হইতে ঘৃত উৎপন্ন হউক না কেন? কিন্তু তাহা কখনো হয় না, তখন কার্যভাবের ধর্মাধর্ম যাহা কিছু সকলই সূক্ষ্মভাবে কারণেও থাকিতে বাধ্য। আমরা স্থূলদর্শী ও বহির্মুখ, তাই সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে তাহা অনুভব করিতে পারি না। অদ্বৈতবাদী একথাতেও আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, কার্যের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বা বৈচিত্র্যভাব প্রভৃতি দেখিয়া, তাহা যেমন কারণ-পদার্থে অনুমান করা হইবে, তদ্রূপ কার্য মধ্যে যে অভেদ-সম্বন্ধ বা নির্বিশেষ অথবা অবৈচিত্র্যভাব প্রভৃতি দেখা যায়, তদ্দ্বারা কারণেও সেগুলি স্বীকার করিতে হইবে। ঐ দেখ, সুষুপ্তি ও মূর্ছা-মধ্যে অবৈচিত্র্য ও নির্বিশেষ-ভাব বিদ্যমান। ঐ দেখ, পূর্বে যে মুড়া গাছটাকে ভূত মনে করিতাম, আর তাহাকে ভূত মনে করি না, ঐ দেখ, বাল্যের কত ভুল ধারণা একেবারে মন হইতে অপসৃত হইয়াছে, আর এখনো যাহারা পূর্বের ভুল বলিয়া আমাদের মনে এক-একবার জাগিয়া উঠে, কালে তাহারাও একেবারে অজ্ঞাত অপরিচিত হইয়া যাইতেছে। এ-ভাবগুলিও তো তাহা হইলে মূল কারণে বা তাহার আশ্রয়ে স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি তাই স্বীকার করা যায় তাহা হইলে তো পূর্বোক্ত ভেদাভেদ ভাবটি সিদ্ধ হইতে পারে না। শক্তির একভাবে যদি শক্তি অজ্ঞাত অপরিচিত হইতে পারে, তাহা হইলে একসময় তাহা সর্বতোভাবে কেন তদ্রূপ হইবে না? ভুল ভাঙা ও ভুলবিস্মৃতির মতো সমস্তটাই যদি হইয়া যায়? আর এরূপ হওয়া তো অসম্ভব নহে? কার্যভাবের মধ্যেই যখন নির্বিশেষ ভাব রহিয়াছে এবং নির্বিশেষ ভাবই যখন সবিশেষ ভাবের পূর্ব বা শেষ ভাব তখন এই রূপ হওয়াই তো সম্ভব। পূর্বোক্ত মূর্ছা ও সুষুপ্তিই তো ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যদি বল মূর্ছাদিও তো আবার ভাঙে, কিন্তু তাহার উত্তরেও বলিতে পারা যায় যে, এমন মূর্ছাও আছে যাহা আর ভাঙে না। সুতরাং এই ভুল ভাঙা ভুল বিস্মৃতি, মূর্ছাও সুষুপ্তি প্রভৃতি স্বীকার করিলে তাহা আমাদিগকে অদ্বয় বা অনির্বচনীয় পক্ষেই আনিয়া ফেলে। অন্য কথায় কার্যকালে ভেদাভেদ এবং কারণ-কালে অভেদ পক্ষেই স্বীকার করিতে বাধ্য করিবে।

যদি বল, সেই অব্যক্ত অদ্বয়তত্ত্বে উক্ত দুটি অবস্থাই থাকুক না, বৈচিত্র্য-অবৈচিত্র্য, সংসার-অসংসার, নির্বিশেষ-সবিশেষ দুই কেন থাকুক না; তাহা হইলে বলিব, উক্ত দুই অবস্থা এক বিষয়ে এককালে থাকা অসম্ভব। জগতেও যেমন উহা নাই, তদ্রূপ তাহার কারণেও থাকিবে না। পরস্পর-বিরোধি-ভাব বুদ্ধির অগোচর।

আর মূল কারণের সম্বন্ধে ওরূপ ব্যক্তাব্যক্ত দুই অবস্থার কল্পনা করা চলে না। কারণ, যে অবস্থাতেই দুই থাকিবে, তাহা মূল-কারণ-পদবাচ্য হইতে পারে না। মূল কারণে একত্ব এবং সকলই অব্যক্ত হয়, এইরূপ জ্ঞান করিতে স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তি হয়। বিচারবলে যদি এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি

হয়, তাহা হইলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার হেতু কি? আর যদি এইরূপই মূল কারণ কল্পনা করা হয় যে, তাহাতে ব্যক্তাব্যক্ত দুই আছে, তাহা হইলে বলিব, একই জিনিসের একই কালে এরূপ দুই অবস্থা অসম্ভব, কারণ ইহারা পরস্পরবিরোধী। আর যদি এরূপ বলা হয় যে, ব্যক্ত মানে স্থূল-ব্যক্ত, আর অব্যক্ত মানে সূক্ষ্ম-ব্যক্ত; যেমন জাগ্রত ও স্বপ্ন, তাহা হইলে বলিব যে, আমরা সূক্ষ্মব্যক্তেরও কারণ অনুসন্ধান করিতেছি এবং তাহাই আমাদের প্রয়োজন, তাহাই আমাদের ব্রহ্ম, তাহাই যথার্থ অব্যক্ত-পদবাচ্য পদার্থ। আর যেহেতু তাহা আমাদের যুক্তিতে সম্ভব, সেইহেতুই তোমার মূল কারণ অপেক্ষা আমাদের মূল কারণ আরো সূক্ষ্ম। যদি বল, এরূপ সম্পূর্ণ অব্যক্ত প্রকৃত পদার্থ নহে, ইহা কল্পনা কেবল, কারণ কেহ ইহা কখনো দেখে নাই, ইহা চির অজ্ঞেয় বিষয়, ইহা বুদ্ধির বিষয় হওয়া অসম্ভব। ব্যক্ত বলিলেই যেমন অব্যক্ত বুঝায়, তদ্রূপ অব্যক্ত বলিলেই ব্যক্ত বুঝায়; আর বুঝায় বলিয়া ইহার বিষয়ও আছে। তাহা হইলে বলিব, যেমন তোমরা কার্য বলিলে কারণ বুঝ, কারণ বলিলে কার্য স্মরণ কর, হাঁ বলিলে না মনে কর, তদ্রূপ ব্যক্তাব্যক্ত বলিলেই এতদুভয় ভিন্ন অবস্থাও কেন বুঝিবে না? ইহা তো সকলের বুদ্ধিতেই আরূঢ় হয়। যেমন তুমি যমক কল্পনা করিবে, অমনি তদ্ভিন্ন অবস্থা মনে উদয় হইবে। সুতরাং ইহা বুদ্ধির আরূঢ়যোগ্য বিষয় নহে বলিতে পার না। এখনো যদি তুমি ইহার উপর আবার উক্তরূপে উভয়-ভিন্নকে উহাদের সহিত সম্বন্ধ কর, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটিবে। অনবস্থাদোষ তুমিও পছন্দ কর না। সুতরাং কার্যাবস্থার বৈচিত্র্য দেখিয়া কারণে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব।

এস্থলে প্রতিপক্ষ আবার আপত্তি উত্থাপন করেন যে, সেই অদ্বয়তত্ত্বে শক্তি বা ধর্ম অথবা একটা 'বিশেষ' স্বীকার না করিলে কি করিয়া আমরা তাহাকে নির্বিশেষ প্রভৃতি শব্দদ্বারা নির্দেশ করিতে পারি। যাহার দ্বারাই নির্দেশ করিবে, যেরূপেই গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিবে, একজন অপরকে বুঝাইবে, তাহাতেই তো লক্ষণ প্রয়োজন হইবে, এবং সেই লক্ষণই তো তাহা হইলে তাহার ধর্ম, শক্তি বা বিশেষ মধ্যে গণ্য হইতে বাধ্য। যাহাকেই জ্ঞান গোচর করা হয় তাহারই তো জ্ঞানগোচরত্ব-ধর্ম স্বীকার করিতে হইবে? অদ্বয়তত্ত্ব যদি তোমার জ্ঞানগোচর না হইবে, উহা যদি না জানিতে পার, তাহা হইলে কি তুমি তজ্জন্য প্রযত্ন কর? এই যুক্তিটি নানাকারে কত প্রাচীনকাল হইতে যে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ সমানভাবে ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, নির্বিশেষ-পদার্থকে নির্বিশেষ বলা হয় বলিয়াই, তাহার নির্বিশেষত্বরূপ সবিশেষত্ব প্রমাণ হয় না। মাটিতে ঘট-জননী শক্তি স্বীকার করিয়া কোন সবিশেষবাদী মৃৎপিণ্ড দ্বারা জল আনয়ন করিতে যান? মরীচিকাতে জলভ্রান্তি দূর হইলে তৃষ্ণানিবৃত্তির জন্য তথায় যাইতে আর কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। হীরকখণ্ডকে কাঁচ বলিলে তাহার হীরকত্ব বিদূরিত হয় না। যিনি নির্বিশেষকে সবিশেষ বলেন, কৈ তিনি সুষুপ্তি বা মূর্ছাবস্থায় থাকিয়া একটু তর্ক করুন না, আমাদের কথার উত্তর প্রদান

করুন না। মিথ্যাজ্ঞান সত্যজ্ঞানের বাধা উৎপাদন করিতে পারে না। অন্ধকার কখনো আলোককে বিতাড়িত করিতে পারে না, ইহাও তদ্রূপ নির্বিশেষ বলিলে বিশেষ-রহিতই বুঝায়, বিশেষরহিতত্বরূপ সবিশেষ ভাব বুঝায় না। যেমন সতী স্ত্রী অসতীত্বের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া সতীত্বরত্ন রক্ষা করিতে পারে না, এস্থলেও তদ্রূপ বিশেষরাহিত্যরূপ সবিশেষ ভাব বুদ্ধিতে যেমন উৎপন্ন হইবে, অমনি আবার নির্বিশেষ বুদ্ধি তাহাকে বাধা দিবে। নির্বিশেষ মানেই যাহা বর্তমান, অতীত, অনাগত সকল কালেরই কল্পিত, অকল্পিত, কল্পনাযোগ্য সকল অবস্থারই বিশেষকে নিষেধ করিয়া থাকে। নির্বিশেষ শব্দের মধ্যে বিশেষ শব্দ এবং সবিশেষ শব্দের মধ্যে বিশেষ শব্দ যদি একার্থক হয়, তাহা হইলে নির্ উপসর্গ দ্বারা যে-বিশেষকে নিষেধ করা হইল সেই বিশেষকে আবার গ্রহণ করা যায় কিরূপে? ইহা বদতাব্যাঘাত দোষ ভিন্ন আর কী বলা যাইতে পারে? আর যদি বল, নির্বিশেষ বলিলে জ্ঞানগোচরত্ব সিদ্ধ হয় না, কিন্তু তাহা অন্য কথা। কারণ, জ্ঞানগোচরত্ব ও সবিশেষভাব এক পদার্থ নহে। ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু তথাপি এক পদার্থ নহে। তাহার পর অদ্বৈতবাদিগণের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মকে লোকে জ্ঞানগোচর করিতে পারে না, লোকে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব জানিয়া ব্রহ্মই হইয়া যাইবে। এই কথাই তাঁহাদের উপদেশ—ইহাই তাঁহাদের আশ্রয়। অদ্বৈতবাদী নির্বিশেষ বোধ, বুদ্ধি বা জ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলেন, ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিয়া ব্রহ্মের উহা ধর্ম বলিয়া ধরা দিতে চাহেন না। নির্বিশেষ বুদ্ধিকে কোন আধার কল্পনা করিয়া সেই আধারের সহিত সম্বন্ধ করিলে তবে উহা সবিশেষত্বের সাধক হয়, নচেৎ নহে। নির্বিশেষ শব্দ দ্বারা যদি শ্রোতার মধ্যে তাঁহারা বিশেষরাহিত্য-বুদ্ধি উৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সুতরাং সকল দিক দিয়াই প্রমাণ হইতেছে যে, শক্তিমানের কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমান এক অভিন্ন পদার্থ।

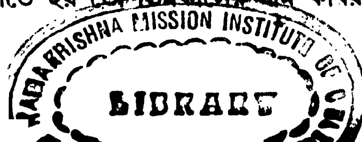
অনেকেই বলেন, "চিনি হতে ভালবাসি না চিনি খেতে ভালবাসি"; কিন্তু যে চিনি নিজে নিজের আস্বাদ পাইয়া থাকে, সে চিনি হইতে কি পৃথক থাকিয়া কেহ সে চিনি খাইতে চায়? সকলেই বোধহয় এই চিনি হইয়া এই চিনি খাইতে চান; যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা ভাবেন না যে, এ চিনি নিজেই নিজের আস্বাদে ভরপুর। ইহা চৈতন্যময় চিনি।

এস্থলে কেহ কেহ বলেন, এই জগদাদি, সকলই বীজাকারে তাহার ভিতরে ছিল। তাহা হইলে বলিব যে, বীজাকারে কোন কিছুর ভিতরে থাকা ও কেবল বীজাকারে থাকা কোন্ কথাটি এস্থলে তোমাদের অভিপ্রেত? যদি কোন কিছুর মধ্যে থাকা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে বলিব, সে-বস্তু ও বীজ ভিন্ন পদার্থ, আর যদি কেবল বীজাকারে থাকা এই পক্ষই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে বীজের অঙ্কুর-উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করার মতো মোক্ষ সাধন করিলেই নির্বিশেষ অদ্বৈত সিদ্ধ হইবে। বীজ বৃক্ষ হইলেই সবিশেষ, নচেৎ নির্বিশেষ। বীজাকারে ছিল, একথা বৃক্ষাবস্থার কথা, বীজের বীজাবস্থার কথা নহে।

এখন যদি শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ নির্ধারিত হইল, যদি জানা গেল, কার্যাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ ভেদাভেদ, এবং কারণাবস্থায় অভেদ, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, জীব কার্যাবস্থায় অর্থাৎ বর্তমান দেহাদি-সম্পন্ন অবস্থায় ভগবানের সহিত ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই এবং কারণাবস্থায় ভগবানের সহিত অভিন্ন হইয়া থাকে। গৌড়ীয় শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে যাহা নিরূপিত হইয়াছিল যে, জীব পরিশেষে ভগবানে শক্তিমানে শক্তির ন্যায় সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে, তাহার অর্থ সুতরাং মিশিয়া যাওয়াই স্থির হইল। আচার্য রামানুজ কারণাবস্থায় জীবকে শক্তিমান ভগবানের শক্তিস্বরূপ স্বীকার করিয়াও তাহাদের ভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করেন। কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায় রামানুজের কথার দ্বারাই রামানুজমতকে স্বমতের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।[১]

সুতরাং বিচার-দৃষ্টিতে যাহা জানা গেল—তাহা শাস্ত্র দৃষ্টি অবিরোধী হইল।

এখন যদি আমরা আচার্য শঙ্কর সম্প্রদায় ও গোস্বামিপাদগণের নিজ নিজ কথা তুলনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই—আচার্য শঙ্কর শক্তিমানের কারণাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ-সম্বন্ধ এবং কার্যাবস্থায় ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার করেন এবং গোস্বামিপাদগণ শক্তিমানের কার্য ও কারণ উভয় অবস্থায়ই ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার করেন; এবং কারণাবস্থায় ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার করায় যে-দোষ উপস্থিত হয়, সেই দোষস্খালনের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের অভীষ্ট ভেদাভেদ-বাদের মূলে এক অচিন্ত্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা না করিলে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইত; কারণ, অদ্বয় বস্তুতে ভেদাভেদ-সম্বন্ধই অসম্ভব কথা; ইহা প্রকৃতপক্ষে অভেদ বা অনির্বচনীয় তত্ত্ব। ভেদাভেদ মানে কি? মনে কর, সর্বপ্রথমে একজন একটা গোরু দেখিল, এসময় গোরু বলিতে সে ব্যক্তি কেবল সেই গোরুর দেহটাকে বুঝে। তাহার পর কিছুদিন বাদে সে ব্যক্তি আরেকটা গোরু দেখিল—এসময় সে কি করিল? সে এটাকেও গোরু বলিয়া যখন বুঝিল, তখনই সে সেই প্রথম গোরুর দেহ ও গোত্ব এই দুইটিকে আলাদা করিয়া বুঝিতে সক্ষম হইল। এসময় তাহার যে গোরুর জ্ঞান, তাহাতে গোত্বধর্ম ও গোরু এই দুইটি জিনিস একও বটে আলাদাও বটে। ভেদাভেদ বলিতে এইপ্রকার সম্বন্ধ বুঝাইয়া থাকে। এখন দেখ, এই যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ এটা আসলে জিনিসটা কি? যে মুহূর্তে তুমি গোত্ব স্মরণ কর, সে মুহূর্তে তুমি কিছু গো-দেহটা ভাব না এবং যেসময় তুমি গো-দেহটা ভাব, ঠিক সেসময় গোত্ব স্মরণ কর না। তুমি ভিন্ন মুহূর্তে দুইটির মূল অন্য এক বস্তুনিষ্ঠ বলিয়া দেখ, সেজন্য বল যে, মূল বস্তুতে ভেদ অভেদ দুই বর্তমান। আর এ কার্যটা তুমি প্রত্যক্ষ কর না, তুমি অনুমান কর মাত্র এবং এ অনুমান প্রত্যক্ষ-বিরোধী। তাহার পর তুমি যে ভেদাভেদ বল, তাহাতে ভেদকেই তুমি অভেদ বা অভেদকেই ভেদ বল না, তুমি উহা তৃতীয় বস্তু সম্বন্ধে বলিয়া থাক। কিন্তু যখন কেহ একই কালে ভেদ ও অভেদ দুইটি ধারণা করিতে পারে না, তখন উহাকে ভেদাভেদ বলা বৃথা। যাহা একই কালে বলা যাইতে পারে, তাহাই বলিলে সত্য কথা বলা হইবে। ভিন্নকালের কথা যদি বলিতে হয় তো ভিন্নকালের নাম করিয়াই বলা উচিত।



যদি বল, একই কালে ভেদ ও অভেদকে তোমরা বলিতে চাহ? আমরা বলি, উহা অদ্বয় বা অনির্বচনীয়। কারণ, বুদ্ধি একই কালে দুই বিরুদ্ধ ভাব ধারণা করিতে পারে না।

যদি বল, না উহাদিগকে একই কালে বুদ্ধি ধারণ করিয়া থাকে, কেননা বুদ্ধির সকলস্থলে কার্যই এই; যখন কোন কিছুর আমরা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, তখন তাহাতেই 'তাহা' ও 'তাহা ভিন্ন' পদার্থের জ্ঞান জড়িত থাকে। একখানা পুস্তকের জ্ঞানে টেবিলের সহিত উহার পার্থক্য ও অন্য পুস্তকের সহিত উহার ঐক্য জ্ঞান না হইলে উহাকে আমরা পুস্তক বলিতে পারি না; সুতরাং সকল পদার্থের জ্ঞানেই 'তাহা' ও 'তাহা ভিন্ন' জ্ঞান বিজড়িত। ইহা যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ আমাদের কোন জ্ঞানই হইল না বলিতে হইবে। সুতরাং সকল জ্ঞানেই এই ব্যাপারটা চলিবে। আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিত কুলভূষণ মহামতি হেগেল মতাবলম্বিগণ প্রায়ই এইপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বলি—না, ওকথা বলিতে পারা যায় না। তুমি পুস্তক জ্ঞানে যে ঐক্যানৈক্য পর্যালোচনা কর, তাহা তোমার পুস্তকাকৃতি কোন একটা কিছুর জ্ঞানকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া তবে তুমি তাহা কর। উহা যদি 'কোন একটা কিছু' রূপে তোমার হৃদয়ে না থাকে, তাহা হইলে তুমি কাহার সহিত ঐক্যানৈক্য সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হও? সুতরাং প্রথম মুহূর্তে 'কোন একটা কিছু' বলিয়া একটা জ্ঞান স্বীকার্য, এবং পরমুহূর্তে পর্যালোচনার জন্য তোমার অভিপ্রেত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, বলিতে হয়। যদি বল, উক্ত 'একটা কিছু' জ্ঞান 'একটা কিছু নয়' জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া সিদ্ধ হয়, সুতরাং একটা কিছু জ্ঞানেও তুলনা করা হইয়া গিয়াছে, এবং তজ্জন্য জ্ঞানমাত্রই তুলনা সিদ্ধ। তাহাও বলিতে পার না, কারণ, আমরা 'একটা কিছু' জ্ঞানের স্থলে প্রকৃত পক্ষে ওরূপ করি না। আমরা অন্য বিষয় হইতে চিত্তটাকে ফিরাইয়া কেবলমাত্র নূতন দৃশ্যের আকারে তাহাকে আকারিত করি মাত্র। আমরা অভাবের ধারণা করিতে পারি না, আমাদের অভাবজ্ঞানও ভাবজ্ঞানেরই প্রকারান্তর। আমরা সর্ববিষয়শূন্য হইলে নিজেকেই বিষয় করিয়া কেবল নিজেকেই ভাবরূপে ভাবিয়া থাকি, কস্মিনকালেও অভাবকে বিষয় করি না। অভাবজ্ঞান কল্পিত বা অনুমিত ব্যাপার ও লক্ষণামাত্র। অভাবস্বরূপ ভাবরূপী আমাদের চির অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। যদি বল, প্রথম মুহূর্তের জ্ঞানে অজ্ঞানের সহিত তুলনা-ব্যাপার বুঝাইয়া দেয়; কারণ, যখনই 'জানিলাম' বলি, তখনই উহা 'না জানার' সহিত সম্বন্ধ করিল, সুতরাং জ্ঞানমাত্রেই অজ্ঞানসম্বন্ধী। আমরা বলি—না, তাহাও বলিতে পার না। কারণ অজ্ঞান কখনো জ্ঞানের বিষয় হয় না। ইহা কল্পিত বা অনুমেয় মাত্র। জ্ঞান, অজ্ঞান-বিরোধী পদার্থ। ইহা চিরকালই পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইয়া থাকে। আলোকের দূরে দূরে যেমন অন্ধকার থাকে, ইহাও তদ্রূপ। অন্ধকারের স্থানে যেমন আলোক আনিবে, অমনি অন্ধকার পলাইবে। যাহার নিকট আলোক থাকে, তাহার নিকট অন্ধকার থাকে না। তাহার নিকট আলোক থাকিতে থাকিতে, কেহ তাহাকে অন্ধকার দেখাইতে পারিবে না। আমরা যে অজ্ঞানকে বিষয়

করি, তাহা একটা বিষয়-জ্ঞান-কালে অন্য বিষয় সম্বন্ধে; কিন্তু যেমন সেই 'অপরের' কথা মনে আসিল, আর তাহার অজ্ঞানতা ঘুচিয়া গেল। যাহা এখনো মনে আসে নাই, তাহাই অজ্ঞান; কিন্তু একথাও অসম্ভব। কারণ, যেমন আমরা ঐকথা বলি, অমনি 'যাহা' রূপে তাহা আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই 'যাহা' রূপ এসময় আর কিছু নহে, ইহা আকাশ বা অন্ধকারের আকারে আমাদের সমক্ষে আসিয়া থাকে। যদি বল, প্রথম মুহূর্তের জ্ঞানমধ্যে তুলনার যোগ্যতা থাকে, নচেৎ তুমি তাহাকে লইয়া তুলনা কর কি করিয়া, এবং তুমি সেই যোগ্যতাবশত তুলনা না করিয়াও স্থির থাকিবে না, সুতরাং ঐ জ্ঞানে তুলনা ব্যাপার, বীজভাবে নিহিত রহিয়াছে। তাহা হইলে বলিব, বীজভাবে নিহিত থাকা ও তুলনা করিয়া জ্ঞান হওয়া এক কথা নহে। যাহা বীজভাবে থাকে, তদ্দ্বারা কার্য হয় না। মৃৎপিণ্ড দ্বারা জলানয়ন হয় না, ঘটদ্বারাই হয়। বটবীজে পথিককে ছায়া দান করে না। এখানে মৃৎপিণ্ড ও বটবীজ বীজাবস্থা, ঘট ও বটবৃক্ষ তুলনার জন্য জ্ঞানের অবস্থা। দেখ, এমন তো কত জ্ঞান হয়, যাহা তুলনার অভাবে ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। স্বপ্নদৃষ্ট অনেক মনোভাব, অনুরূপ বিষয়াভাবে আমরা প্রায় নিত্যই ভুলিয়া যাই; এবং এখনো এমন কত জ্ঞান হইতেছে, যাহার তুলনার এখনো সমাধা হয় নাই। সুতরাং যোগ্যতা ও আবশ্যকতার জন্য সকল জ্ঞানকেই তুলনাসিদ্ধ, অথবা ভেদাভেদ-সম্বন্ধাত্মক বলা ঠিক নহে। যদি বল, বিষয়জ্ঞানে বিষয়ীর সহিত তুলনা বুঝায়। কারণ, 'আমি ভিন্ন' বোধ না হইলে, বিষয়জ্ঞান সম্ভব নহে, অগত্যা এস্থলে আমার প্রথম মুহূর্তের জ্ঞান ও তুলনার জন্য জ্ঞান বলিতে হইবে। আমরা বলিব যে—না, তাহাও নহে। কারণ, আমিই বিষয়াকার ধারণ করিয়া পরে, তাহাকে যখন আমা হইতে পৃথক করি, তখন সেই বিষয়টি আমার নিকট বিষয় বলিয়া প্রতীত হয়, তৎপূর্বে নহে। প্রথম ক্ষণে আমিই বিষয় হই, সুতরাং প্রথম ক্ষণের জ্ঞানে তুলনা নাই। যদি বল, তাহা হইলে আমি আমাকে বোধ করিবার কালে আমাতেও বিষয়বিষয়ী ভাব স্বীকার্য। আমরা বলি. তাহাতে তুলনা বা ভেদাভেদ-ভাব নাই; কারণ, নিজে নিজের পরিচ্ছেদক হইতে পারে না; এজন্য বুদ্ধির স্বভাবের দোহাই দিয়া, জ্ঞান-মাত্রেরই ভেদাভেদ-সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। আর ভেদাভেদ-সম্বন্ধ এককক্ষণ বা একবিষয়ক নহে। পরক্ষণেও যে, ভেদাভেদের মূলে উহা স্বীকার করা হয়, তাহাও ভেদ ও অভেদকে নহে, তাহা তাহার আশ্রয়কে লক্ষ্য করিয়া করা হয়। ঐ আশ্রয় তখন অদ্বৈতভাবে স্বগত-ভেদরহিত এবং বিরোধশূন্যরূপে প্রতিভাত হয়। মন কখনো এককালে দুইটি বিষয় চিন্তা করিতে পারে না। বহু বিষয়কে দেখিলেও এক করিয়াই দেখে। মনের এই প্রকৃতিই জাতিজ্ঞানের জনক বা হেতু আর এই জাতিজ্ঞান আবার ব্যক্তিজ্ঞানের উপকরণ।

তাহার পর আরেক কথা। ভেদাভেদ-সম্বন্ধ মানেই দ্বৈতবাদ। দুইটি বিষয় না হইলে সম্বন্ধই সিদ্ধ হয় না; এবং দুইটি বিষয় হইতে গেলেই ব্যবধান ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। আর সেই ব্যবধানই বিজাতীয় বস্তু হইতে বাধ্য। যদি বল, সমুদয় জ্ঞান পদার্থ-দ্বারা-গড়া বিষয় মধ্যে বিজাতীয় ভেদ কি করিয়া

সম্ভব? তাহা হইলে বলিব, তুমি জ্ঞানের বহুত্ব স্বীকার কর কী দিয়া? বহুত্ব না হইলে সম্বন্ধই অসম্ভব। যাহা বহুত্বসাধক, তাহাই জ্ঞানভিন্ন হইতে বাধ্য। 'দেশ' 'কাল' উভয়ই মান বা কেবল কালকেই মান, একটাকে জ্ঞানভিন্ন না মানিলে পার্থক্য করিবে কী করিয়া? যদি বল 'কাল' চিন্তা বা জ্ঞানের স্বভাব, সুতরাং তাহাকে ছাড়িলে চলিবে কেন, এবং তাহা জ্ঞানের স্বভাব বলিয়া পৃথক নহে। তাহা হইলে বলিব যে, এমন চিন্তা আছে যে সময় কালবোধ থাকে না—যেমন মূর্ছা। আর কালের কালত্ব, পরিমাণ লইয়া। যদি সকলই 'জ্ঞান' হয়, .তাহা হইলে জ্ঞানের পরিণাম 'জ্ঞান' বলিয়া কালের সত্তাই উপলব্ধ হইবার কথা নহে। ওদিকে পরিণামে যদি বৈসাদৃশ্য না থাকে, তাহা হইলে তাহা পরিণামও নহে। তোমার জ্ঞান, জ্ঞানেই পরিণত হওয়ায় বৈসাদৃশ্য স্বীকার করাও চলিবে না। তাহার পর আরো এক কথা আছে। কালজন্য বহুত্ব এক বস্তুরই অবস্থাগত বহুত্ব সংখ্যাগত নহে। সংখ্যাগত বহুত্ব দেশ ভিন্ন অসম্ভব। সুতরাং তোমার জ্ঞানের বহুত্ব অসম্ভব। যদি বল, দেশ ও কাল এই উভয়ই চিন্তার প্রক্রিয়া। ইহারা তো বিষয় নহে যে জ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন করিবে। তাহাও বলিতে পার না; কারণ, চিন্তা-ক্রিয়ার ভিতর দেশকালের সহিত জ্ঞানের বা চিন্তার পূর্বাপর্য সম্বন্ধ নির্ণয় অসম্ভব। আমরাও প্রত্যক্ষ দেখি যে, বিষয় অনুসারে আমরা যেমন চিন্তা করিতে পারি, তদ্রূপ চিন্তা অনুসারে বিষয়লাভও করিতে পারি। পা-নাচান স্বভাব হইলে, প্রথম পা-নাচান ক্রিয়া যেমন ঐ স্বভাবের কারণ, এবং প্রথম নাচাবার প্রবৃত্তি যেমন প্রথম নাচানর কারণ, তদ্রূপ আমি যদি বলি 'দেশকাল', 'জ্ঞান'সহ নিত্য, তাহা হইলে উপায় কি? যাহা বিষয়ীর ধর্ম বলিবে, তাহাতে তদ্দণ্ডেই বিষয়েরই ধর্ম হইবে। কারণ, বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং দেখ, ভেদাভেদ স্বীকার করিলেই দ্বৈতবাদ আসিতে বাধ্য। যদি বল, তাহা হইলে আমার অদ্বৈতবাদই বা সিদ্ধ হয় কি করিয়া? তাহা হইলে বলিব যে, আমরা 'জ্ঞান'স্বরূপে, সর্বসম্বন্ধ-রাহিত্য স্বীকার করি, সুতরাং আমাদের এ বিপত্তি ঘটিতে পারে না। যদি বল, তাহা হইলে আমরা কি দেশকালকে বিষয়িনিষ্ঠ স্বীকার করি না, তাহা হইলে বলিব যে, হাঁ তাহা করি; কিন্তু সেই বিষয়কে 'জ্ঞান-স্বরূপ' বলিয়া স্বীকার করি না। জ্ঞানস্বরূপ বিষয়-বিষয়ী উভয় গ্রাহী পদার্থ। বিষয়িনিষ্ঠ বলাতেই বিষয়নিষ্ঠতাও স্বীকার করিতে সকলকেই বাধ্য হইতে হইবে। সুতরাং 'দেশকালের' বিষয়ত্ব অনিবার্য। আমাদের বোধহয়, এইপ্রকার অগণ্য বিপত্তি বিনাশের জন্য মহামতি জীবগোস্বামী ভেদাভেদের মূলে এক অচিন্ত্য শব্দ বসাইয়া দিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় তাঁহার 'সর্বসম্বাদিনী' নামক শেষ গ্রন্থে এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের যে-অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের এই কথাই সমর্থন করিয়া থাকে। তিনি বলেন ঃ "তস্মাদ্ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাৎ ভেদ এবং স্বরূপাদ্ ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাৎ অভেদঃ, তৌ চ ভেদাভেদৌ অচিন্ত্যৌইতি।" অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভিন্ন করিয়া চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ এবং স্বরূপসহ অভিন্ন ভাবা যায় না বলিয়া ভেদ, তাহা আবার অচিন্ত্য। শঙ্করের অনির্বচনীয়বাদ বা অদ্বয়বাদ এবং গোস্বামী প্রভুপাদগণের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের মধ্যে বিশেষত্ব কী, তাহা পাঠকই

বিবেচনা করুন। অন্যত্র শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় আবার যাহা বলিয়াছেন, তাহও দেখা যাউক। "তস্মাৎ একস্যৈব তত্ত্বস্য স্বরূপত্বং", "স্বরূপত্বপরিত্যাগেনৈব শক্তিত্বঞ্চসিদ্ধম্॥" অর্থাৎ এক তত্ত্বেরই স্বরূপত্ব, এবং স্বরূপত্ব পরিত্যাগ না করিয়া তাহার শক্তিত্ব এই উভয়ই সিদ্ধ হইল। পাঠক ভাবিয়া দেখুন, এই উভয় স্থলেই কেন ওরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করা হইতেছে? ইহার কারণ কি এই নহে যে আমরা তাঁহাকে ভাবিব বা চিন্তা করিব? ভাবিতে পারি না বলিয়াই যখন এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা প্রয়োজন হইতেছে, তখন ভাবিবার জন্যই উহা স্বীকৃত হইয়াছে বলা কি অসঙ্গত? আচ্ছা, আর ভাবুন দেখি ভাবে কে? যে ভাবে, সে কি কার্যাবস্থায় থাকিয়াই ভাবে না? সমাধি, মূর্চ্ছা বা প্রলয়ে কি ভাবনা সম্ভব? সুতরাং গোস্বামী প্রভুপাদের ঐ শক্তি স্বীকারে পুনরায় সেই শক্তিমানের কার্যাবস্থার কথাই আসিয়া পড়িল। একথা কারণাবস্থার কথাই নহে—কারণাবস্থার দৃষ্টিতেও নহে। সুতরাং শাঙ্করমত ও গোস্বামী প্রভুপাদগণের মতের বিরোধে মনে হয়, বিষয়ের ভিন্নতা আসিয়া পড়িল এবং তজ্জন্য এ বিরোধ যথার্থ বিরোধই হইতে পারে না। আমরা যদি এই কথাটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারি, তাহা হইলে গোস্বামী-সম্প্রদায় ভক্তগণের অগণ্য তীক্ষ্ণ যুক্তি শররাশি সহাস্যে সহ্য করিতে পারিব।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীজীবের অচিন্ত্য ভেদাভেদ পক্ষেও অসন্তুষ্ট হইয়া কারণাবস্থার শক্তি ও শক্তিমানের অভেদপক্ষই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অভেদ পক্ষ স্বীকার করিলে জীবের নিত্য সেবাধিকার বিলুপ্ত হয়, এজন্য তিনি বিশেষ নামক এক পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহার দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি 'বিশেষ' সম্বন্ধে বলেন ঃ "বিশেষ ভেদপ্রতিনিধিঃ ন তু ভেদঃ... অভেদেঽপি ভেদপ্রত্যায়কো ধর্মবিশেষঃ—বিশেষঃ। যথা সত্তা সতী, কালঃ সর্বদা অস্তি, ভেদ ভিন্নঃ ইত্যাদি।" অর্থাৎ অভেদেও ভেদ-প্রত্যায়ক ধর্মই বিশেষ। যেমন সত্তা আছে, কাল সদাই আছে, ভেদ ভিন্ন ইত্যাদি। কাল বলিলেই তাহা সদা আছে বুঝায়, সদা আছে বলিলেও কাল বুঝায়; এবং কাল পদার্থটিও বস্তুত অভেদ পদার্থ, তাহার আবার ভেদ কোথায়? কিন্তু তথাপি যখন ব্যবহার নিমিত্ত সেই কালের ভেদকল্পনা করিয়া তাহাকে 'সর্বদা আছে' এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকি, তখন সেই মূল অভেদতত্ত্বেও ভেদ স্বীকার করিয়া শাস্ত্র ও যুক্তির ভিতরে বিরোধ পরিহার করিলে ভালই হইবার কথা। অভেদতত্ত্বেও এই ভেদকল্পনা যখন আমাদের না করিলে নয়, তখন সর্বকারণকারণে তাহার স্বীকার করাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং জীব অন্তিমে এইভাবেই ভগবানের সহিত এক হইয়াও তাঁহার সেবা দ্বারা কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে।

এখানেও পাঠক দেখুন, সেই এক কথাই বিভিন্ন রূপে আসিয়া উপস্থিত হইল। 'কাল সদা আছে' একথা কার্যাবস্থার কথা; একথা ব্যবহার দশার কথা। একথার দ্বারা কারণাবস্থায় বিশেষ পদার্থ স্বীকার করায় প্রকৃত প্রস্তাবে কার্যাবস্থার কথাই বলা হইতেছে। কারণাবস্থায় কার্যাবস্থার কোন সংস্কার আনিলে তাহা কার্যাবস্থারই কথা হইয়া পড়িবে। আচার্য শঙ্কর ব্যবহারিক দশায় অর্থাৎ যতক্ষণ জীবের দেহাদি ব্যবহার থাকে ততক্ষণ একথা সত্য

বলিয়াই স্বীকার করেন। নির্বিকল্প-সমাধি-দশায় বা পারমার্থিক দৃষ্টিতে, কে—কি দিয়া স্বীকার করিবে বলিয়া স্বীকারের উপকরণাভাবে তিনি তাহা অস্বীকার করেন। এক্ষণে কি শাস্ত্র, কি বিচার উভয় দৃষ্টিতে উভয় মতের সম্বন্ধে যাহা ভাবিতে ইচ্ছা হয়, তাহা সুধী পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিলাম, এক্ষণে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সিদ্ধান্ত করুন।

পূর্বোক্ত পথ ছাড়িয়া যদি শঙ্করের বিবর্তবাদ এবং গোস্বামিপাদগণের পরিণামবাদের প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে এ-বিষয়ের আরেকটি দিক আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। শঙ্করের বিবর্তবাদের উদ্দেশ্য যে, মূল কারণ ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়াও জগৎ উৎপন্ন হয়, মহাপ্রভুর পরিণামবাদেরও উদ্দেশ্য তাহাই। তিনিও বলেন, ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় কিন্তু ব্রহ্ম অবিকৃত থাকে। তবে পার্থক্য এই যে, বিবর্তবাদ স্বীকার করায় উৎপন্ন জগতাদি রজ্জুতে সর্পসম মিথ্যা হইয়া যায়। পরিণামবাদে দুগ্ধের দধির ন্যায় জগৎ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই বৈলক্ষণ্য স্বীকারের তাৎপর্য এই যে, শঙ্করমতে ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই অপর কিছু নহে। কিন্তু গোস্বামিপাদ বলেন যে, জগতাদি যদি মিথ্যা হয়, তবে মুক্তি কাহার, পূজা কাহার, উপদেশ কাহার এবং কেই বা তাহা পালন করে, কেই বা বলে—ব্রহ্মই মূল কারণ, অথচ নির্বিকার? এসব যখন না মানিলে চলে না, তখন বিবর্তবাদে দোষ রহিয়াছে। বস্তুত বিবর্তবাদের এ-দোষ অনিবার্য না হউক—দুর্নিবার্য বটে। আবার পরিণামবাদ স্বীকার করায়, জগতাদি সত্য হইল এবং বিবর্তবাদের ঐ দোষ মোচন হইল, কিন্তু অন্য দোষ আসিয়া উপস্থিত হইল। কে ধারণা করিতে পারে যে, একটা পদার্থ হইতে একটা পদার্থ জন্মিল, কিন্তু মূল পদার্থ কমিয়া গেল না, বা বিকৃত হইল না, এখন এই দোষ নিবারণ মানসে প্রভুপাদগণ মতে বলা হইল যে, চিন্তামণি হইতে সুবর্ণের উৎপত্তি হয়, কিন্তু চিন্তামণি যেমন তেমনই থাকে, অথচ সুবর্ণ সত্য। যথা—

"মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার।।" (মধ্য ৮ম, চরিতামৃত)

কিন্তু দুঃখের বিষয় এ চিন্তামণি কেহ দেখে নাই, দেখিতেও পায় না; এ চিন্তামণির কথা কেবল শুনাই যায়। শাস্ত্রে ইহার কথা আছে সত্য। কিন্তু তথাপি ইহা যে অপ্রসিদ্ধ, তাহাও নিশ্চিত। প্রসিদ্ধ বিষয়েই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, অপ্রসিদ্ধ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া অসঙ্গত। শাস্ত্রে আছে বলিয়াও ইহাকে প্রসিদ্ধ বলা চলে না; কারণ, এক ভাগবতগ্রন্থ ব্যতীত ইহার কথা অন্য কোন শাস্ত্র বা বেদবেদান্তে, অথবা ইতিহাস মধ্যে তাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

তাহার পর, এ চিন্তামণির দৃষ্টান্তে আরো গোল আছে। কোন কোন বৈষ্ণব পণ্ডিত বলেন যে, ইহা নিজ উদর হইতে হেমভার প্রসব করে না, পরন্তু লৌহসংসর্গে লৌহকে সুবর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু শেষ অর্থ গ্রহণ করিলে মূলে অদ্বৈততত্ত্বের হানি হয়। কারণ, উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে তাহা হইলে লৌহ ও চিন্তামণি দুইটি পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাহার পর, দ্বিতীয় দোষ এই যে, কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এস্থলে যে 'প্রসব' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, লৌহকে সুবর্ণ করিলে সে শব্দটির সার্থকতাও থাকে না। এজন্য মনে হয়, ভাগবতের কথানুসারে ইহাকে হেমভাবের প্রসূতি বলাই ঠিক।

কারণ ভাগবতের মণিহরণ-প্রকরণে লৌহসংসর্গের কোন কথাই নাই। কিন্তু তাহা হইলে সেই পূর্ব কথাই কেবল মনে আসে যে, যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা পরে কমিয়া যাইতে বাধ্য।

যাহা হউক, দৃষ্টান্তের দোষ ছাড়িয়া দিয়া, যদি দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য ধরা যায়, তাহা হইলে বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। উপায়ের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে উভয় মতের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ধারণ হইবে। গোস্বামিপাদগণের উদ্দেশ্য নহে যে, জগৎ সত্য হউক; শঙ্করসম্প্রদায়েরও উদ্দেশ্য নহে যে, জগৎ মিথ্যা হউক। গোস্বামিপাদগণ জগতের সত্যতা প্রমাণের জন্য যে-আগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ভগবৎসেবার সত্যতার জন্য। শঙ্কর সম্প্রদায় জগৎ মিথ্যা প্রমাণ করিতে যে-আগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্ম সত্য প্রমাণের জন্য। এজন্য উভয়েরই ঐ উভয় বিচারই প্রাসঙ্গিক বিচারমাত্র।

সুতরাং উভয়ের অভীষ্টবাদ বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, পূর্বে যাহা বুঝা গিয়াছে, এস্থলেও তাহার বিরোধ নাই। যদি ভাবা যায়—শঙ্কর শিবাবতার এবং মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রকাশ, তাহা হইলে উভয়েই ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য। উভয়ের প্রবর্তিত মার্গ পৃথক হইলেও গন্তব্য স্থান একই। বলিতে কি, কি এখানে, কি বৃন্দাবনে, আমি এমন কতিপয় বৈষ্ণবকুলভূষণ সুপণ্ডিত ভক্তসাধক দেখিয়াছি, যাঁহাদের হৃদয়ের বিশ্বাস যে, জীব পরিণামে সেই শ্রীরাধাঠাকুরানীর পদবী পর্যন্ত লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেবল সাধকের বুদ্ধিভেদভয়ে একথা জনসমাজে প্রকাশ করেন না এই মাত্র।

সুতরাং এই দুই মতের চরম ফলে পার্থক্য কোথায়, তাহা বিজ্ঞ পাঠকবর্গই মীমাংসা করুন। শঙ্করমতের মিশিয়া যাওয়া মানে যদি একেবারে সর্বতোভাবে 'তাই' হইয়া যাওয়া হয় এবং গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের মতে বস্তুর শক্তির মধ্যে, শক্তির যে বস্তুর প্রতি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক তদ্গতভাব, জীব যদি ভগবানের সম্বন্ধে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, উভয় মতের ঐক্য কি অনৈক্য, এস্থলে তাহা বলাই বাহুল্য।

এইবার উভয় মতের তৃতীয় বিরোধটি আলোচ্য। ইহা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতে উপনিষদের ব্রহ্মের অভ্যন্তরে চিন্ময় আনন্দঘন মূর্তি থাকা সম্ভব, কি না? ইহার উত্তরের জন্য পাঠকবর্গকে আর প্রসঙ্গান্তরে আনয়ন করিব না। ইহার উত্তর দুই এক কথাতেই দিব। শঙ্করের অদ্বয় ব্রহ্মের উপর যদি আর কিছু ধারণা করা সম্ভব না হয় এবং উপনিষদের ব্রহ্ম যদি এরূপ ব্রহ্ম হন, যাঁহার অভ্যন্তরে ভেদাভেদ সম্বন্ধ ধারণা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের ব্রহ্ম ও শঙ্করমতের ব্রহ্ম এক পদার্থ নহে। আর এক পদার্থ নহে বলিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ নাই। দুইজন যদি ভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধে ভিন্নমতাবলম্বী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিরোধ কখনো বিরোধ-পদবাচ্য হইতে পারে না। এজন্য আমাদের বোধহয় উভয় সম্প্রদায়ই আসলে অভিন্নমতাবলম্বী।* □

পাদটীকা

১ সর্বসম্বাদিনী দ্রঃ

* ১৩ বর্ষ, ২ ও ৩ সংখ্যা

বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্বাণতত্ত্ব

প্রমথনাথ তর্কভূষণ

অনেকেরই মনে ধারণা আছে যে, বৌদ্ধশাস্ত্রোল্লিখিত নির্বাণ আর বেদান্তশাস্ত্রোক্ত নির্বাণ এই দুইটি পৃথক পৃথক জিনিস—ইহাদের মধ্যে একরূপতার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব; কিন্তু আমাদিগের মতে এইরূপ ধারণা অতীব ভ্রমাত্মক এবং আমাদের এই মতও এই দুই দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার প্রশস্ত ভিত্তির উপরই স্থাপিত, সুতরাং ইহা আমাদিগের মনের কল্পনা অথবা স্বপ্নমাত্র প্রসূত নহে। আসল কথা এই যে, এই উভয় দর্শনের প্রকৃত রহস্যের প্রতি অনবধানই সাধারণের মনে এই অপসিদ্ধান্তের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। অতঃপর বেদান্তশাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বৌদ্ধদর্শন শাস্ত্রীয় পুস্তকাদিতে নিবদ্ধ বচন ও প্রমাণাদি দ্বারা আমরা এই ভ্রম দূরীকরণের জন্য প্রস্তুত হইব। আরো একটি দ্রষ্টব্য এই যে, অনেকেরই মতে বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী, এমনকি অনেক আচার্যকল্প ব্যক্তিগণও ইহাই বলিয়া থাকেন। অবশ্য যদি ঈশ্বর বলিতে কোন একজন পৃথক ব্যক্তিবিশেষকে বুঝায়, যিনি ইহলোক হইতে প্রকৃষ্টতম দূরবর্তী স্থানে সিংহাসনের উপর আসীন হইয়া জীবনিবহের দণ্ডবিধাতারূপে তাহাদের পূজার্চনাদি পাইয়া থাকেন, তিনি মানবের কেবল শাসক এবং তাহার সহিত অন্য সম্বন্ধ বিবর্জিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবেই অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, সত্য সত্যই বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী। ইহাদের দর্শনে এইরূপ ঈশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা নাই, প্রত্যুত খণ্ডনই আছে, কিন্তু যদি তাহা না হইয়া সর্বভূতান্তরাত্মা সকল প্রাণীর মধ্যে অনুস্যূত, পৃথিবী, সলিল, অনল, অনিল ও আকাশের প্রত্যেকের একমাত্র আশ্রয়, জীবমাত্রের প্রত্যেকের হৃদ্গত—সেই বিরাট অন্তর্যামী পুরুষকেই যথার্থ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে দেখিবে যে বুদ্ধকায়, ধর্মকায় ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত সেই পরমেশ্বরই বৌদ্ধদর্শনে স্বীকৃত ও তিনিই বৌদ্ধসাধকগণের নিকট চিরদিনই পূজা পাইয়া আসিতেছেন। যাক সেকথা। অদ্যকার বিষয় হইতেছে নির্বাণতত্ত্ব। এই নির্বাণের আলোচনার দুইটি বিভাগ। (১) নিষেধমুখ ও (২) বিধিমুখ। নিষেধমুখে অভাবাত্মক নির্বাণের আলোচনাই স্থান পাইয়াছে। আর বিধিমুখে নির্বাণ জিনিসটি যে একেবারে অভাব নহে কিন্তু তাহা পরমার্থসৎ তাহারই সম্যক্ আলোচনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এবিষয়টি যেমন জটিল তেমনই দুরূহ, ইহা অল্প সময় ও অল্প আয়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে—এজন্য অনেক সময় ও গবেষণার প্রয়োজন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা অল্পের মধ্যে যতটুকু সম্ভব ইহার সারাংশটুকু বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ব্যতিরেক মুখে নির্বাণ কী, তাহা বুঝাইতে যাইয়া বৌদ্ধভিক্ষু নাগার্জুন বলেন যে, নির্বাণ সেই পদার্থ, যাহা "অপ্রতীতমসংভ্রান্তমনুচ্ছিন্নমনাগতম্। অনিরুদ্ধমনুৎপন্নমেবং নির্বাণমুচ্যতে॥" যাহা প্রতীতির গোচর নহে, ব্যবহারিক প্রমাণের দ্বারা যাহাকে জানা যায় না, যাহা প্রাপ্তির বস্তু নহে, যাহা অপরিচ্ছিন্ন, যাহা দূরের বস্তু নহে এবং যাহা আগত বা উপস্থিত বস্তু নহে, যাহা অনিরুদ্ধ

এবং অনুৎপন্ন তাহাকেই নির্বাণ বলা যায় অর্থাৎ যত কিছু লোকসিদ্ধ বস্তু হইতে পারে ইহা তাহা সকল হইতেই পৃথক। নির্বাণ যে ঠিক কী বস্তু তাহা বলা যায় না, কারণ আমরা সচরাচর যাহা দেখি বা বুঝি সেগুলির কারণ পরম্পরা বা হেতুর নির্দেশ সম্ভব, কিন্তু নির্বাণ সেরূপ বস্তু নহে। এক্ষণে দেখা যাউক, এই নির্বাণ শব্দের যৌগিক অর্থ কী। পাণিনির মত 'নির্বাণোঽবাতে' অর্থাৎ যে-প্রদেশে বায়ু নিবৃত্ত হইয়াছে তাহারই নাম নির্বাণ। অপর বৈয়াকরণিকগণের মতে প্রদীপের নিবৃত্তি বা উচ্ছেদই নির্বাণ। বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায়ের অভিধর্ম মহাবিভাগ শাস্ত্রে নির্বাণ শব্দের চারি প্রকার অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—(ক) বাণ শব্দের অর্থ—পথ (অর্থাৎ পুনর্জন্মের হেতু), নিঃ শব্দের অর্থ—পরিত্যাগ। পুনর্জন্মের পথকে পরিত্যাগ করাই নির্বাণ। (খ) বাণ অর্থে দুর্গন্ধ বা কুৎসিত বাসনা—নিঃ নিবৃত্তি। মিলিত অর্থ—শুভাশুভ বাসনার নিবৃত্তি। (গ) বাণ—গভীর বন। নিঃ—নির্গত হওয়া। মিলিত অর্থ—রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দুর্ভেদ্য বা গভীর বন হইতে নির্গত হওয়া। (ঘ) বাণ—গ্রন্থি, নিঃ—ছেদ বা নিবৃত্তি। মিলিত অর্থ—জন্ম ও মৃত্যুর গ্রন্থি বা জালের ছেদন।

আরো যথা—"দীপসম ইব নির্বাণং বিমোক্খ আহু চেতনা নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং প্রদীপো।।"

প্রদীপের নির্বাণের ন্যায়ই এই নির্বাণ। এই একদিকের কথা, অপরপক্ষে বিধিমুখে আলোকিত নির্বাণ প্রসঙ্গে ভিক্ষু নাগসেন একস্থলে বলিয়াছেন যে, ভূতদয়া প্রেম ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃষ্টরূপ বিকাশই নির্বাণ। এতদ্ব্যতীত তিনি নির্বাণকে আনন্দস্বরূপও বলিয়াছেন। 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' নামক পুস্তকে নরপতি মিলিন্দ নির্বাণের সহিত অপর কোন বস্তুর সাদৃশ্য আছে কি না জানিতে চাহিতেছেন। এই প্রসঙ্গে মিলিন্দ ও নাগসেনের যে-কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা এইরূপ—

মিলিন্দ—হে শ্রদ্ধেয় নাগসেন, আমি বুঝিলাম যে নিরবচ্ছিন্ন সুখই নির্বাণ; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, উপযুক্ত দৃষ্টান্ত বা প্রমাণের অভাবে এই নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপ আমি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। নির্বাণের সহিত আর কোন বস্তুর গুণগত যদি কোন সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

নাগসেন—নির্বাণের এমন কোন আখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা ইহার প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, কিন্তু কতকগুলি বস্তুর সহিত ইহার কোন কোন অংশে সাদৃশ্য আছে, তাহাই আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি।

মিলিন্দ—তবে অনুগ্রহপূর্বক তাহাই বুঝান।

নাগসেন—এই নির্বাণে পদ্মের একটি গুণ আছে, জলের দুইটি গুণ আছে। ঔষধের তিনটি গুণ আছে, সমুদ্রের চারিটি গুণ আছে, অন্নের পাঁচটি গুণ আছে, দিকের দশটি গুণ আছে, চিন্তামণির তিনটি গুণ আছে, হরিচন্দনের তিনটি গুণ আছে, নবনীতের তিনটি গুণ আছে এবং গিরিশৃঙ্গের পাঁচটি গুণ আছে।

মিলিন্দ—ভগবন্, দয়া করিয়া এই কয়টি দৃষ্টান্তের বিশদ ব্যাখ্যা করুন।

১। পদ্ম জলের দ্বারা বিকৃত বা আর্দ্র হয় না, নির্বাণও তদ্রূপ পাপপ্রবৃত্তি দ্বারা কখনো কলুষিত হয় না। এই কারণে নির্বাণ পদ্মের স্বরূপ।

২। জলের গুণ শৈত্য বা তাপরাহিত্য, নির্বাণও সমরসে শীতল ও ইহা দুষ্প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন তাপকে হরণ করে, জল তৃষ্ণা নিবারণ করে, নির্বাণও কামাদিজনিত তৃষ্ণাকে অপহরণ করে।

৩। ঔষধ বিষদাহকে নিবারণ করে, নির্বাণও কামক্রোধাদি বিষদাহের উচ্ছেদ করে, ঔষধ রোগ নিবৃত্তি করে, নির্বাণও দুঃখ নিবৃত্তি করে, ঔষধ অমৃতের কার্য করে, নির্বাণও লোককে অমর করে।

৪। সমুদ্রে কোন জঞ্জাল ফেলিলে সমুদ্র তাহা বহন করে না বরং উৎক্ষেপই করে, নির্বাণও তদ্রূপ, কারণ দুষ্প্রবৃত্তিরূপ অমেধ্য বস্তু নির্বাণে প্রক্ষিপ্ত হইলে, নির্বাণও তাহাকে দূরে সরাইয়া দেয়। সমুদ্র যেরূপ অসীম শক্তিশালী এবং অপার, নির্বাণও সেইরূপ অসীম শক্তিময় ও অপার, যাহা প্রবিষ্ট হয় তাহাই নিজ সত্তা ছাড়িয়া সমুদ্র হইয়া যায়, নির্বাণে হইলেও সকল পরিচ্ছিন্ন বস্তুই নির্বাণের সহিত এক হইয়া মিশিয়া যায়। যেরূপ অসংখ্য শক্তিশালী জীবের আলয়, নির্বাণও সেইরূপ অসীম শক্তিশালী মহাত্মা অর্হদ্‌গণের আলয়। সমুদ্র যেরূপ প্রতি তরঙ্গের অগ্রে ফেনরূপ শুভ্র কুসুমরাজিতে সর্বদা সুশোভিত, নির্বাণও সেইরূপ পবিত্রতা শান্তি ও বিজ্ঞানরূপ অমল ধবল কুসুমরাজির দ্বারা চিরমণ্ডিত।

৫। অন্ন যেমন জীবের জীবনীশক্তি দেয় নির্বাণও সেইরূপ জন্ম জরা ও মৃত্যু দূর করিয়া শাশ্বত জীবনীশক্তি প্রদান করে, অন্ন যেমন জীবের বলবৃদ্ধি করে, নির্বাণও সেইরূপ বলবর্ধক। অন্ন যেমন জীবদেহে সৌন্দর্য সম্পাদন করে, নির্বাণও সেইপ্রকার অনিমাদি সিদ্ধিরূপ সৌন্দর্যের সম্পাদক হয়। অন্ন ক্ষুধার নিবৃত্তি করে, নির্বাণও সেইরূপ কামের ও মোহের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করে। অন্ন দুর্বলতা দূর করে, নির্বাণও জীবের সকল প্রকার অশক্তি বা দুর্বলতাকে দূর করে।

৬। আকাশ যেমন অনাদি ও অনন্ত, নির্বাণও তদ্রূপ অনাদি ও অনন্ত এবং সকল জীবদেহ যেরূপ আকাশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান বা বিচরণ করে, সেইরূপ নির্বাণকে আশ্রয় করিয়া সকল অর্হদ্‌গণ সংসারে অবস্থান করেন ও বিচরণ করেন।

৭। চিন্তামণি যেমন সকলপ্রকার অভিলাষ পূর্ণ করে, নির্বাণও সেইপ্রকার সকল অভিলাষ পূর্ণ করে। চিন্তামণি যেমন আনন্দপ্রদ, নির্বাণও সেইরূপ আনন্দপ্রদ। চিন্তামণি যেমন জ্যোতির্ময়, নির্বাণও সেইরূপ সর্বদা জ্যোতির্ময়।

৮। হরিচন্দন যেমন দুর্লভ, নির্বাণও তদ্রূপ দুর্লভ, হরিচন্দনের সৌরভ যেমন অতুল, নির্বাণের সৌরভও তদ্রূপ। উহা যেমন সকলের প্রশংসনীয়, নির্বাণও তদ্রূপ প্রশংসনীয়।

৯। ঘৃত যেরূপ কোমল, নির্বাণও সেইরূপ কোমল, ঘৃতের গন্ধ যেমন তৃপ্তিকর নির্বাণের সৌরভও তদ্রূপ। ঘৃত যেমন আস্বাদ্য, নির্বাণও তদ্রূপ আস্বাদ্য।

১০। গিরিশৃঙ্গ যেমন সমুন্নত, নির্বাণও তদ্রূপ, গিরিশৃঙ্গ যেমন কম্পিত হয় না নির্বাণও তদ্রূপ অকম্প্য। গিরিশৃঙ্গ যেমন দুরারোহ, নির্বাণও তদ্রূপ ...। সমুন্নত গিরিশৃঙ্গে যেমন কোন প্রকার লতাগুল্মাদি জন্মে না, তদ্রূপ বাসনারূপ লতা প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। গিরিশৃঙ্গ যেমন

কাহাকেও তুষ্ট বা দুঃখিত করিতে কোন কার্য করে না, নির্বাণও সেইপ্রকার কাহারও রোষ বা ভয়ের কারণ হয় না।

নাগসেনের এইসকল দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায় যে, নির্বাণ সেই অবস্থা যাহার উপর সুখ ও অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত; অথচ তাহা সর্বশূন্যতা ও সর্বনিবৃত্তির আলয়, বাঙ্মনসাতীত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ।

লঙ্কাবতার সূত্রেও নির্বাণকে নিষেধমুখে ও বিধিমুখে বর্ণনা করা হইয়াছে। "নির্বাণ সেই অবস্থা যথায় স্কন্ধাদি শরীরের ধাতু ও ষড়ায়তন নিরোধ প্রাপ্ত হয়", তৎপরে আবার বলা হইয়াছে—"বিষয়বৈরাগ্যাৎ নিত্যং বৈধর্ম্যদর্শনাৎ অতীতানাগত প্রত্যুৎপন্ন বিষয়াননুস্মরণাৎ দীপবীজানলবৎ উপাদানোপরমাৎ অপ্রবৃত্তির্বিকল্পস্য ইতি বর্ণয়ন্তি। অতস্তেষাং নির্বাণবুদ্ধির্ভবতি ন চ মহামতে বিনাশদৃষ্টা নিবার্যতে।" সুতরাং, সব বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াটাই নির্বাণের অবস্থা নহে। এইরূপ পূর্বে নির্বাণকে যেমন নিরোধের দিক দিয়া দেখান হইয়াছে, তদ্রূপ বিধিমুখেও কথিত হইয়াছে যে, নির্বাণ তাহাই যাহা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যোগভূমি হইতে জীবকে তথাগত ভূমিতে লইয়া যায়, যেখানে উপস্থিত হইলে সকল পার্থিব পদার্থই মায়িক এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি উপস্থিত হয় এবং সেই অবস্থায় চিত্ত মন ও বিজ্ঞান সকলই নিবৃত্ত হইয়া যায়। "সর্বপ্রমাণাগ্রহণাপ্রবৃত্তি দর্শনাৎ তত্ত্বস্য ব্যামোহত্বাৎ অগ্রহণং তত্ত্বস্য তদ্ ব্যুদাসাৎ সর্বপ্রমাণ স্বপ্রত্যাত্মার্যধর্মাধিগমাৎ নৈরাত্ম্যাদ্বয়াববোধাৎ ক্লেশদ্বয়াবরণদ্বয়বিশুদ্ধত্বাৎ ভূম্যুত্তরতথাগতভূমিমায়াদিবিশ্ব সমাধি চিত্তমনোবিজ্ঞানব্যাবৃত্তেঃ নির্বাণং কল্পয়ন্তি।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নির্বাণ শূন্যত্ব নহে, তাহা জীবের সম্পূর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা। সে অবস্থায় সকলই এক—সমরস। আবার বৌদ্ধভিক্ষুদিগের সম্বন্ধেও সর্বসাধারণের একটা মস্ত আপত্তি এই যে, তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া তাপত্রয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ভীরুর ন্যায় দূরে পলায়ন করিত—যে সংসার তাহাদিগকে স্নেহ ও যত্নে বর্ধিত লালিত ও পালিত করিয়াছিল—সেই সংসারকেই তাহারা ত্যাজ্য ও হেয় মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিত, ইহাই কি তাহাদের যথেষ্ট ধর্মভাবের পরিচায়ক? কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য কি বস্তুত তাহাই ছিল? নির্বাণ যে সংসার ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, এই ধারণাই তাহাদের ছিল। নাগার্জুন স্পষ্টই বলিয়াছেন ঃ

"নসংসারাস্য নির্বাণাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্।
ন নির্বাণস্য সংসারাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্।।
ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেশ্যতে।
পরমার্থমনাগম্য নির্বাণং নাধিগম্যতে।।"

সংসার হইতে পৃথক করিয়া নির্বাণের স্বরূপপ্রদর্শন হইতেই পারে না। ব্যবহার জগৎ সর্বথা পরিত্যাগপূর্বক পরমার্থ কবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? যদি তুমি নির্বাণই চরম লক্ষ্য করিয়া থাক, যদি তাহাতেই সকল পর্যবসান করিতে চাও তাহা হইলে তুমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইতে চাহিলে চলিবে না—ব্যবহার হইতে বিভিন্ন পরমার্থের ব্যাখ্যা হইতে পারে না—স্বার্থপরতার উপর পরম লক্ষ্যের অর্থাৎ নির্বাণের অধিষ্ঠান হইতেই পারে না—নাগার্জুনের ইহাই শিক্ষা।

"দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা
লোকসংবৃতি সত্যং সত্যং চ পরমার্থতঃ।
যেঽনয়ো র্ন বিজানন্তি বিভাগং সত্যয়োর্দ্বয়োঃ
তে তত্ত্বং ন বিজানন্তি গম্ভীরং বুদ্ধশাসনে।"

বুদ্ধের ধর্মোপদেশ এইরূপেই লোকসংবৃত্তি ও পরমার্থরূপ দুই সত্যকে আশ্রয় করিয়া চলে। যাহারা সত্যের এই দুইটি বিভাগকেই স্বীকার না করে তাহারা সেই গম্ভীর বুদ্ধশাসন বুঝিতেই পারে না। ইহাই হইতেছে বৌদ্ধধর্মের সার—ইহার নাম মানবপ্রীতি, জীবের মৈত্রীর ভাব। ইহা স্বার্থপরতার কলঙ্কে কলুষিত নহে—সংসারের যাবতীয় জীবের উপকারের জন্য আত্মবলিদানই ভিক্ষুজীবনের চরম লক্ষ্য।

এতাবৎ আমরা এইরূপ পুঁথিগত সত্য বা বিবাদের কথা লইয়াই আলোচনা করিয়া আসিলাম, এখন দেখা যাউক, বৌদ্ধাচার্যগণ স্বয়ং এই নির্বাণতত্ত্ব কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বুদ্ধের স্বরূপ কী? মাধ্যমিকশাস্ত্রে নাগার্জুন এসম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন ঃ

"স্কন্ধো নান্যঃ স্কন্ধেভ্যঃ নাস্মিন্ স্কন্ধা ন তে পুমঃ।
তথাগতঃ স্কন্ধবান্ ন কতমোঽত্রঃ তথাগতঃ
বুদ্ধ স্কন্ধানুপাদায় যদি নাস্তি স্বভাবতঃ।
স্বভাবতশ্চ যো নাস্তি কুতঃ স পরভাবতঃ।।
যদি নাস্তি স্বভাবশ্চ পরভাবঃ কথং ভবেৎ।
স্বভাবপরভাবাভ্যাং ঋতে কঃ সঃ তথাগতঃ।।
শূন্যমিতি ন বক্তব্যমশূন্যমিতি বা ভবেৎ।
উভয়ং নোভয়ং চেতি প্রজ্ঞপ্ত্যর্থং তু কথ্যতে।।"

বুদ্ধ যদি স্কন্ধবিরহিত[১] অবস্থাতেই থাকেন তাহা হইলে আমরা কিরূপে তাঁহাকে বুঝিব? স্কন্ধ ব্যতিরিক্ত কেহই থাকিতে পারে না, যাহা নিরুপাধিক তাঁহাকে তথাগত কিরূপে বলা যায়? আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, স্বভাবাস্তিত্ব ব্যতিরেকে কিরূপে পরমার্থাস্তিত্ব ঘটিতে পারে? ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া তিনি কিরূপেই বা থাকেন? শূন্যও নহেন, অশূন্যও নহেন—কিরূপই বা তিনি? কঃ সঃ তথাগতঃ। ক্রমে সিদ্ধান্তপক্ষে ইহার উত্তর হইল, "তথাগতস্তৎস্বভাবো যৎ স্বভাবমিদং জগৎ।" তথাগতের যাহা স্বভাব জগতের স্বভাবও যে তাই, সকল অণু পরমাণুতে জীবে জীবে সেই তথাগতই বিরাজ করিতেছেন—তিনি কি কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন—জগতে তিনি আপনাকেই ছড়াইয়া দিয়া রহিয়াছেন। প্রাণিমাত্রের স্বভাবে তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই।

আবার দেখুন, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক পুস্তকে তথাগত আনন্দকে নির্বাণের স্বরূপ কী বুঝাইতেছেন—

"সমাদপেমী বহুবোধি সত্ত্বান্ বোধর্মি জানস্মি স্থাপেমি চৈন।
সত্ত্বান কোটীন্ অযুতাননেকান্ পরিপাচয়ামী বহু কল্পকোট্যঃ।
নির্বাণভূমিং চুপদর্শয়ামি বিনয়ার্থসত্ত্বান্ বদ্ধাম্যুপায়ম্
ন চাপি নির্বাম্যহু তস্মি কালে ইহৈব ধর্মুপ্রকাশয়ামি।।
তত্রাপি চাত্মানমধিক্ষিপামি সর্বাংশ্চ সত্ত্বান তথৈবচাহম্।
বিপরীতবুদ্ধী নরা বিমূঢ়াঃ তত্রৈব তিষ্ঠন্তু পশ্চি ধূমাং।।

ঋজু যদা তে মৃদুমার্দবাশ্চ উৎসৃষ্ট কামাশ্চ ভবন্তি সত্ত্বাঃ।
ততোঽহং শ্রাবক সঙ্ঘ কৃত্বা আত্মানন্দশেম্যহু গৃধকূটে।।"

বুদ্ধের কার্য জগতের জীবসকলের উদ্ধার, সকলের চিত্তে সেই বোধির জাগরণ, মৈত্রী, করুণা ও মুদিতার জাগরণ। বহুকোটি কল্পান্ত ধরিয়া নির্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধের ইহাই কার্য যে—আধিব্যাধিক্লিষ্ট জীবের উদ্ধারসাধন, তাহাদিগকে জ্ঞানের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়ার উপায় প্রদর্শন; মানুষ অন্ধ, শোকতাপগ্রস্ত, তাহাকে নির্বাণভূমি দেখাইয়া দেওয়াই বুদ্ধের কর্তব্য। যখন লোকে ভাবে যে বুদ্ধ কি আর আছেন, তিনি নাই, তিনি শূন্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইসময়ে তিনি (বুদ্ধ) নির্বাণমার্গের উপদেশ করিয়া থাকেন—জীবহৃদয়ে বুদ্ধই অধিষ্ঠিত আছেন, যখন জগতে শুভযুগ আসে, ঋজুতা ও সরলতা আসিয়া ইহধামে বিচরণ করে, যখনই জীবগণ সত্ত্বগুণপ্রধান হয় তখন তিনি শ্রাবকসঙ্ঘ সংগঠন করিয়া গৃধকূটে আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। জগতের সৃজন, পালন ও রক্ষণের জন্য তিনিই যুগে যুগে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হয়েন। মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই বিশ্বাস।

আমরা উপরে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, বৌদ্ধদর্শন প্রোক্ত নির্বাণে ও আমাদিগের বেদান্তস্বীকৃত নির্বাণ মোক্ষে কোন বৈসাদৃশ্য নাই। বেদান্তে নির্বাণের আলোচনায় আমরা ইহা আরো স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। আরো দেখিলাম যে, বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদীও নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বাণদাতা বুদ্ধে বিশ্বাসী। এ বুদ্ধের সহিত আমাদের পরমেশ্বরতত্ত্বের কোন বৈসাদৃশ্য নাই। তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ, জীবহৃদয়বিহারী পরম কারুণিক, সদিচ্ছার প্রেরক ও মঙ্গলবিধাতা পিতা। জীবের উদ্ধার ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কার্যই নাই। এই তথাগত বুদ্ধের সহিত কি আমাদিগের বেদান্তশাস্ত্র-বর্ণিত অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা ঈশ্বরের কোন পার্থক্য আছে? বাস্তবিকই হিন্দুর ঈশ্বর ও বৌদ্ধের এই তথাগততত্ত্বের কোন পার্থক্য বিদ্যমান থাকিতে পারে না। আজ এই যুগসন্ধির দিনে আধ্যাত্মিক জীবনের পুনর্গঠনের এই শান্ত ঊষার উন্মেষকালে আমরা সকলেরই মধ্যে এই একত্বের অনুসন্ধান পাইয়া মুগ্ধ হইতেছি। সময়ের আবর্তনে আমরা আরো নূতন নূতন তথ্য জানিতে পারিব। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের কারণ আর থাকিবে না, এখন আমাদিগকে পরস্পর বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে এবং একযোগে সকলপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পরিহারপূর্বক বৌদ্ধ হিন্দু ও অপর সকল ধর্মাবলম্বীকেই অকপটভাবে পরমার্থের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তবেই আমরা জগতের সমক্ষে ভারতীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইব।* □

পাদটীকা

১ পঞ্চস্কন্ধ অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, ইহার সহিত কাম, ক্লেশ ও কর্ম লইয়াই বৌদ্ধদর্শনের অবিদ্যা।

* ১৯ বর্ষ, ৭ সংখ্যা

সভ্যতা ও ধর্মবিশ্বাস—মার্ক্স, ফ্রয়েড ও বিবেকানন্দ

অবনীভূষণ ঘোষ

বর্তমান যুগে যেসব মনীষী ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে কার্ল মার্ক্স ও সিগমন্ড ফ্রয়েডের নাম উল্লেখযোগ্য। মার্ক্স প্রধানত বাইরের দিক থেকে আর ফ্রয়েড প্রধানত মনের দিক থেকে ধর্মকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হলেও তাঁদের মতবাদের মধ্যে এমন একটা সংহতি ও ঐক্য আছে যা ধর্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত করেছে বলে আধুনিক পণ্ডিতেরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মার্ক্সবাদীদের মতে দুর্দমনীয় প্রাকৃতিক শক্তির সম্মুখে এলে মানুষ যে-অসহায়তা বোধ করে তারই ফলে ধর্মের উৎপত্তি। বর্বর মানুষ দেখে এইসব শক্তি তার দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে অথচ তাদের ওপর তার কোন হাত নেই। এই অক্ষমতার জন্যে তার অশিক্ষিত মনে জেগে ওঠে এই শক্তিসমূহের এক ভয়াবহ অলৌকিক প্রতিচ্ছবি যা হলো ধর্মের গোড়ার কথা। কালের আবর্তনে প্রাকৃতিক শক্তির পার্শ্বে এসে দাঁড়ায় সামাজিক ও আর্থনীতিক শক্তি—যে শক্তিগুলোও অসভ্য মানুষের কাছে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মতোই দুর্বোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। প্রাকৃতিক শক্তিসম্বন্ধের প্রতিচ্ছবি সামাজিক গুণে বিভূষিত হয়ে নানা দেবতার সৃষ্টি করেছে। ক্রমশ অমূর্ত (abstract) মানুষের কল্পনায় সমস্ত গুণ একই দেবতার ওপর আরোপ করে একমাত্র ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। মার্ক্স বলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে দুর্বিসহ কৃত্রিম বৈষম্য আমরা দেখি তার মূল কারণ ধর্ম। ব্রাহ্মণ যখন তারই মতো আরেকজনের ছায়া মাড়ালে নিজেকে অপবিত্র মনে করে, শত দোষ থাকা সত্ত্বেও শুধু পুরুষ বলেই নারীর কাছ থেকে যখন সে সকল প্রকার ত্যাগের দাবি করে, সর্বহারা মানুষ বিলাসিতায় মগ্ন ধনীর দুলালের দিকে তাকিয়ে 'কপালের লিখন' বলে যখন দুঃসহ বেদনা হৃদয়ে পোষণ করে দিন অতিবাহিত করে, তখন কি মার্ক্সীয় মতের সত্যতা আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটে ওঠে না?

ফ্রয়েডপন্থীরাও মার্ক্সবাদীদের মতো ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে আদিম মানুষের অসহায়তার কথা উল্লেখ করেছেন। ফ্রয়েড বলেন, সংহারকারী প্রাকৃতিক শক্তি ও বিপথগামী সহজাত প্রবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং সমাজ ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ধর্মের সৃষ্টি। বর্বর মানুষ দেখছে, তার আশেপাশে যেসব শক্তিশালী লোক ঘুরে বেড়ায় তাদের সন্তুষ্ট করা যায় ঘুষ দিয়ে অথবা

কৌশলে ভয় দেখিয়ে। অলৌকিক বহির্শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে সে এইকথাই ভেবেছে। যাতে অন্যান্য মানুষের মতো সে-ও রাগ, দ্বেষ, ভালোবাসা ইত্যাদির দ্বারা চালিত হয়, সেইজন্য নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতির ওপর অশিক্ষিত মানুষ প্রথমত নরত্ব আরোপ (humanization) করেছে। তারপর তাকে ভয় দেখিয়ে বা তার কথামতো কাজ করে তাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। ফ্রয়েডের মতে প্রকৃতির প্রতি আদিম মানুষের এই মনোভাবে নতুন কিছুই নেই। বাপমায়ের ওপর—বিশেষ করে বাপের ওপর ছোট ছেলে এইরকমই মনোভাব পোষণ করে। ছোট ছেলের বাপকে যেমন ভয় করবার কারণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে সে জানে বিপদের হাত থেকে বাপই তাকে রক্ষা করবে। বাপের ধারণা থেকেই আদিম মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি করেছে। পাছে আমরা অসংযত সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা নির্বিচারে চলি, সেইজন্যে এই ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় কাজ বলা হয়েছে পাপ-পুণ্যের দণ্ডবিধান করা। নিজের সৎ উদ্দেশ্য তো দূরের কথা এমনকি পরের সর্বনাশের জন্যে মাকালীর কাছে যখন পাঁঠাবলির মানত করি, অন্তরের কোন বাধার জন্যে নয়—নরকের ভয়াবহ শাস্তির কল্পনায় যখন আমরা কোন অন্যায় কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হই, তখন ধর্ম সম্পর্কে ফ্রয়েডের যে মত তা কি আমরা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারি? এইসঙ্গে ফ্রয়েডের আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, মানুষ যখন সমাজ ও সংস্কৃতিকে বাঁচাতে ধর্মের সৃষ্টি করল, তখন পাছে সহজাত প্রবৃত্তির সকলপ্রকার ইচ্ছাকে দমন করলে উলটো ফল হয়, সেইজন্য সে এইসঙ্গে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা করল, যা সমাজের দৃষ্টিতে গর্হিত হলেও ধর্মের নামে করা যেতে পারে। ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য সেবাদাসীর সৃষ্টি ও রাসলীলার বিকৃত ভাবের অনুকরণে কার্যকলাপ ইত্যাদির কথা ভাবলে ফ্রয়েডের এই কথারই সত্যতা প্রমাণিত হয় না কি?

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, একই প্রেরণা এই দুই মনীষীকে ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। মার্ক্স ও ফ্রয়েড উভয়েরই উদ্দেশ্য মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পূর্ণতর সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মান্ধতাকে এই প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক বলে তাঁরা দুইজনই উল্লেখ করেছেন। মার্ক্স বলেছেন ঃ "The abolition of religion as the illusory happiness of the people is a prerequisite for the attainment of real happiness of the people." মানব-সাধারণের মধ্যে সত্যকারের সুখ বা শান্তি আনতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ধর্মবিশ্বাসের মতো একটি ভ্রান্ত ধারণার মূলোচ্ছেদ করা। ফ্রয়েড বলেছেন ঃ "Culture incurs a greater danger by maintaining its present attitude to religion than by relinquishing it." ধর্ম এতদিন সংস্কৃতিকে খানিকটা জিইয়ে রেখেছে সত্য, কিন্তু সে মানুষের উন্নতির পথে বাধা দিয়েছে আরো বেশি; ধর্ম-বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করলে মানুষের সভ্যতা হয়ে উঠবে পূর্ণতর—আরো কল্যাণকর।

কার্ল মার্ক্স ও ফ্রয়েড বিশ্বমানবের হিতের জন্যে ধর্মকে পরিত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন, অপর পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ রুদ্র নির্ঘোষে ভবিষ্যৎ-বাণী

করে গেছেন ঃ "যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয় তবে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে।" স্বামীজীর এই বাণী কী কঠোর সত্যে পরিণত হয়েছে তা আমরা নিজেদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। এখন আমাদের স্বতই মনে জাগে মার্ক্স ও ফ্রয়েডের থেকে ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে স্বামীজীর এইরকম স্পষ্ট বিরোধী মতের কারণ কী? ধর্মবিশ্বাসের ওপর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই এর কারণ বলে আমাদের মনে হয়। মার্ক্স ও ফ্রয়েড যে-ধর্মের কথা বলেছেন তা সাধারণ্যে প্রচলিত গতানুগতিক পুরাণ-সম্মত অনুষ্ঠানবহুল প্রণালীবদ্ধ ধর্ম। প্রকৃত ধর্ম কিন্তু কতকগুলি মত বা কাহিনী নয়, অথবা বিচিত্র অনুষ্ঠান নয়। এ হলো এক দৃষ্টি যা উপলব্ধির দ্বারা পরিস্ফুট হয়; পার্থিব বস্তুকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করি, তেমনি ধর্মবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেহাতীত বস্তুকে আমরা ধারণা করি। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ঃ "Religion is realisation, not talk nor doctrine, nor theories however beautiful they may be. It is being and becoming, not hearing or acknowledging, but, it is the whole human soul becoming changed into what it believes."

ফ্রয়েড ও মার্ক্স সভ্যতার উন্নতি সম্পর্কে যুক্তিবিচারের ওপর খুব জোর দিয়েছেন; মানুষের সকল প্রকার চিন্তাধারা ও অনুষ্ঠানকে যুক্তির ভিত্তিতে দাঁড় করাতে বলেছেন এবং সেই হিসাবে ধর্মবিশ্বাসকে তাঁরা বর্বরযুগের সংস্কারান্ধতার প্রতীকস্বরূপ বলেছেন। পূর্বকথিত প্রণালীবদ্ধ ধর্মের মধ্যে অনেক কিছু যে অযৌক্তিক তা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য; কিন্তু স্বামীজী যে-ধর্মের কথা বলেছেন, তার মধ্যে যুক্তিবিচারেরও স্থান আছে। তিনি বলেছেন ঃ "Is religion to justify itself by the discoveries of reason through which every other science justifies itself ?... In my opinion this must be so, and I am also of opinion that the sooner it is done the better." "অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো ধর্মও কি যুক্তিবিচারের দ্বারা চালিত হবে?... আমার মতে নিশ্চয়ই হবে এবং যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।" তবে মার্ক্স ও ফ্রয়েড যেমন যুক্তিকেই সত্যে পৌঁছবার চরম পথ বলেছেন, স্বামীজী কিন্তু তা স্বীকার করেননি। মানুষের জীবনে যুক্তির সারবত্তা মেনে নিয়েও তিনি বলেছেন, চরম সত্যে পৌঁছতে এমন একটা পথ আছে যা যুক্তিবিচারের বিরোধী নয় কিন্তু যুক্তিবিচারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এই পথ হলো উপলব্ধির পথ—প্রেরণার পথ।

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি আধ্যাত্মিক না হওয়ায় বর্বর মানুষের নীতি 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' আজও সভ্যতা-গর্বিত মানুষের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করছে। আগে ছিল ব্যক্তির স্বার্থ নিয়ে খেয়োখেয়ি, আজ জাতিগত লুব্ধতা নিয়ে হানাহানি। একই জাতির ব্যক্তিদের মধ্যে এই যে সহযোগিতা, এ প্রতিযোগিতার আরেকটা রূপ মাত্র—তবে একটু উঁচুদরের। সহযোগিতা করা হচ্ছে প্রতিযোগিতা দৃঢ় করবার জন্যে। এই অসম দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘর্ষের হাত থেকে বাঁচতে হলে চাই ধর্মবিশ্বাস। "মানুষের এক অংশে এক ক্ষেত্রে

প্রতিযোগিতা যেমন ধর্ম, আরেক অংশে আরেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা তেমনই ধর্ম, তেমনই আবার আরেক অংশে আরেক ক্ষেত্রে তাহার ধর্ম একাত্মতা।"[১] এই একাত্মতা অজ্ঞানে হোক সজ্ঞানে হোক আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করি বলেই পরস্পরের সাথে মিশতে পারি শুধু আনন্দের জন্য। এই আনন্দ আসে প্রাণের তাড়নায় নয়, মনের কৌশলেও নয়, আত্মার প্রেরণায়। এই প্রেরণা হলো মানুষের নিগূঢ় স্বভাবের গতি যার ওপর বিশ্বমানবের স্থিতি। স্বামীজী বলেছেন্ ঃ "Religion is the highest plane of human thought and life." ধর্ম মানুষের জীবনের ও চিন্তাধারার সবচেয়ে বড় অভিব্যক্তি। সভ্যতাকে সার্বজনীন করতে হলে—কল্যাণময় করতে হলে তাকে স্থাপন করতে হবে এই আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির ওপর। তখনই উপনিষদের বাণী আমাদের কাছে সত্য হয়ে দাঁড়াবে—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।* □

পাদটীকা

১ নলিনীকান্ত গুপ্ত

* ৪৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা

কার্যে পরিণত বেদান্ত

স্বামী গম্ভীরানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব ও পূর্ণত্বকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার জীবনবেদ ও সামাজিক পরিকল্পনা বা 'কার্যে পরিণত 'বেদান্ত'-এর কাঠামো রচনা করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্ম-বিষয়ে পূর্বাচার্যেরা অনেক কথা বলিয়াছেন, অনেক বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত ব্রহ্মবাদী স্বামীজীর সামঞ্জস্য বা পার্থক্য কোথায়—তাহা বোঝা আবশ্যক। অদ্বৈতবাদী স্বামীজী এবং পূর্ববর্তী আচার্যদের মধ্যে তত্ত্বগত কোন ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু শঙ্করাচার্য যেখানে তত্ত্বকে বিশুদ্ধরূপে নিষ্কাশিত করিয়া দেখাইতে বদ্ধপরিকর, স্বামীজী সেখানে সেই তত্ত্বকে সর্বানুস্যূতরূপে দেখিয়া কার্যে প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। আচার্য (শঙ্কর) যেখানে প্রতি পদে কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধ দেখাইতেছেন, স্বামীজী সেখানে কার্যক্ষেত্রে উভয়ের সমন্বয়-স্থাপনে যত্নপর। আচার্যের দৃষ্টিতে জ্ঞানের রূপটি যেখানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত স্বয়ং ব্রহ্ম, স্বামীজীর দৃষ্টিতে সেখানে উহা মানবের উন্নতিপথের পথপ্রদর্শক উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভ। অতএব স্বামীজীকে বুঝিতে হইলে শঙ্করাচার্যকেও কিছুটা বোঝা আবশ্যক; আমি সেখান হইতেই আরম্ভ করিতেছি।

স্বামীজীর পথ উপনিষদ্ ও গীতা-নিরপেক্ষ নহে; এইসকলই স্বামীজীর দর্শনের ভিত্তি, অতএব উহাদের সহিতও স্বামীজীর সম্বন্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। সর্বশেষে আমাদের বিবেচ্য স্বামীজীর রচিত পরিকল্পনা। আমরা এইভাবেই স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতেছি।

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বনের বেদান্তকে লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত নরনারায়ণ-সেবার আকর এই অদ্বৈত বেদান্ত; এবং মানব-সমাজের উন্নতির জন্য তিনি যে-পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাও এই অদ্বৈত-ভূমির উপরই প্রসারিত। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে ঃ যে অদ্বৈত বেদান্তকে এক কথায় বর্ণনা করিতে গিয়া আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'—সেই অদ্বৈতবাদের জগদতীত তত্ত্বের সহিত ইহজগতে নরনারায়ণ-সেবার বা সামাজিক অভ্যুদয়ের সামঞ্জস্য হইবে কিরূপে? আধুনিক কালে কোন কোন মনীষী ইহাও বলিতেছেন যে, ভারতের ধর্মগুলি সংসারবিমুখ, উহাদের মূলীভূত দার্শনিক মতগুলির পরিবর্তন না ঘটিলে ঐ ধর্মগুলি কিরূপে জাগতিক উন্নতির প্রেরণা দিবে?

আপত্তি দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্তরের হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি মৌলিক সাদৃশ্য আছে। উভয় প্রশ্নই আমাদের মনে সন্দেহ জাগাইতেছে যে, নেতিমূলক বেদান্ত বা যেকোন সংসারবিমুখ ধর্মমত কোন ইতিমূলক চেষ্টার খোরাক জোগাইতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয় বটে, অথচ চরম নেতিপরায়ণ অদ্বৈত বেদান্তই স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদের এবং কার্যধারার ভিত্তি। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও

তাঁহাকে সযত্নে অদ্বৈতমতে উপদেশ দিলেন এবং স্বয়ং অদ্বৈতের শেষ সীমা নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হইয়া ঘোষণা করিলেনঃ "অদ্বৈত সব শেষের কথা; অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।" অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতানুভূতি এবং ব্যবহারিক ক্রিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখিতেন না।

পূর্বাচার্যদের জীবনেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই অবিরোধই লক্ষিত হয়। শঙ্করাচার্য জ্ঞানী ছিলেন—এই বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই এবং বর্তমান যুগে তিনি অদ্বৈত দর্শনের সর্বপ্রধান আচার্য—ইহাও সর্ববাদিসম্মত; অথচ জ্ঞানলাভের পরও তিনি অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য গ্রন্থরচনা, মঠস্থাপন, বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া, তীর্থভ্রমণ, ভক্তিমূলক স্তোত্রাদি রচনা প্রভৃতি কার্য করিলেন। এই অসামঞ্জস্যের একটি সমাধান প্রয়োজন এবং সেই সমাধানের মধ্যেই দ্বৈতাদ্বৈতের মিলনক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে।

অদ্বৈতবাদী আচার্য দেখিলেন, জ্ঞানলাভের পরও ব্রহ্মজ্ঞানীরা উপদেশাদি দিয়া থাকেন। বস্তুত উপদেষ্টাকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার না করিলে তদুপদিষ্ট জ্ঞানের প্রামাণ্যই ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব জ্ঞানীদের জীবন দেখিয়া এবং শাস্ত্রের বচন শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইল যে, 'জীবন্মুক্তি' নামক এমন একটি অবস্থা আছে, যেখানে পূর্ণ জ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়াও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ক্রিয়া করা সম্ভবপর, অথচ যুক্তি-দৃষ্টিতে দ্বৈতাদ্বৈতের মিলন অসম্ভব। তাই এই অবস্থার ব্যাখ্যাকল্পে 'প্রারব্ধ', 'অজ্ঞানলেশ', 'বাধিতের অনুবৃত্তি' ইত্যাদি কথার অবতারণা করা হইল। আবার কেহ কেহ বলিলেন, জ্ঞানীর নিজের দৃষ্টিতে—তিনি কিছুই করেন না, কিন্তু অপরের দৃষ্টিতে—করেন বলিয়া মনে হয়। ব্যাখ্যা যাহাই হউক, আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে জ্ঞানীর ক্রিয়া আছে, যদিও সে-ক্রিয়া ঠিক আমাদের মতো নহে; উহা লোক-সংগ্রহ প্রভৃতি উদ্দেশ্যের দ্বারা, প্রারব্ধের দ্বারা বা ভগবদাদেশের দ্বারা নিয়মিত। এই কাজ থাকা ও না-থাকার অবস্থা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে প্রকাশ করিলেনঃ

> "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
> পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।।" (৫।৮)

আর দৃষ্টান্ত দিলেন ঃ

> "ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।" (৩।২২)

আরেকটা দৃষ্টান্ত পাই রাজর্ষি জনকের জীবনে—

> "কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।।" (৩।২০)

ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য বলিলেন যে, 'সংসিদ্ধি' কথাটি চিত্তশুদ্ধি বা জ্ঞানলাভ দুই অর্থেই গৃহীত হইতে পারে। যদি বলি 'চিত্তশুদ্ধি'ই অর্থ, তবে জনকের পক্ষে কর্মদ্বারা সংসিদ্ধিতে অবস্থিত হওয়া কিছু অযৌক্তিক নহে। আর যদি জ্ঞানলাভই সংসিদ্ধির অর্থ হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞানলাভের পরও কোন কারণে জনকের কর্মত্যাগ হয় নাই, কর্মসহই তিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এখানেও জ্ঞানীর পক্ষে কর্মের সম্ভাবনা রহিয়া গেল। এই কর্ম ও কর্মশূন্যতার মাপকাঠি হিসাবে শঙ্কর গ্রহণ করিলেন—ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান থাকা বা না-

থাকা। যেখানে ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান নাই, সেখানে 'নৈতৎ কর্ম যেন জ্ঞানেন সমুচ্চীয়তে'—উহা তো কর্মই নয় যে, উহাকে জ্ঞানের সহিত জুড়িয়া জ্ঞান-কর্ম-সংমিশ্রণের তর্ক তুলিবে। আর বহির্দৃষ্টিতে যে-অবস্থা ক্রিয়াযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়, সত্যদৃষ্টিতে উহা জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা। রাজর্ষি জনক সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যাহাই হউক, অদ্বৈত বেদান্তের অনুভূতিতে উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষেও কর্মসম্ভাবনার একটি যুক্তি এখানে পাওয়া গেল। আবার মনে রাখিতে হইবে, প্রাচীন আচার্যগণ যখন জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় অস্বীকার করিলেন, তখন তাঁহাদের বিচার চলিয়াছিল জাগতিক ক্ষেত্রে নহে, প্রত্যুত তাত্ত্বিক ভূমিতে। তত্ত্বদৃষ্টিতে জ্ঞানের সহিত কর্মসন্ন্যাসের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকিলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বাহ্য ত্যাগের উপর তাঁহারা তেমন জোর দেন নাই। স্বয়ং শঙ্করাচার্যের বিচারধারাও এখানে প্রধানত মানসিক অবস্থাকে লইয়াই ব্যাপৃত। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে 'আমি কর্ম করিতেছি' এবং 'আমি নিষ্ক্রিয় আত্মা'—এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে পর্বতপ্রমাণ অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান বর্তমান। তবু উপনিষদের চিন্তাধারা ও ব্যবহারক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শঙ্কর-ভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরি মুণ্ডকোপনিষদের "তপসা বাপ্যলিঙ্গাৎ" (৩।২।৪)—সন্ন্যাসরহিত তপস্যা জ্ঞানলাভের কারণ নহে—এই শ্রুতির ব্যাখ্যাকল্পে বলিলেন ঃ "শ্রুতিতে তো ইন্দ্র, জনক, গার্গী প্রভৃতির আত্ম-লাভের কথা আছে? সত্য কথা। সন্ন্যাস বলিতে যে সর্বত্যাগরূপ আন্তর-সন্ন্যাস বুঝায়, তাহা তাঁহাদেরও ছিল; কারণ স্বত্বাভিমান তাঁহাদের ছিল না। বস্তুত এখানে সন্ন্যাসের বাহ্যচিহ্ন-ধারণরূপ অর্থ গ্রহণীয় নহে।"

আবার সিদ্ধ-ব্যক্তির অবস্থা আপনাতে আরোপ করিয়া সাধক সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া থাকে—ইহাই চিরাচরিত প্রথা। তাই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ-লক্ষণের ভূমিকা করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য লিখিলেন ঃ "অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে সর্বত্রই কৃতার্থ ব্যক্তিদের যাহা লক্ষণ তাহাই সাধনরূপে উপদিষ্ট হয়, কারণ ঐগুলি যত্নসাধ্য।" ফলত জীবন্মুক্ত পুরুষ কর্তব্যাতীত হইলেও নানা কারণে তাঁহারা কর্তব্যপরায়ণ বলিয়া যে লোক-প্রতীতি হয়, সেই সিদ্ধাবস্থা আপনাতে আরোপ করিয়া সাধক অগ্রসর হইতে পারেন। এইজন্য গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বাচার্যদের এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের কর্মে থাকিয়াও 'কর্ম না-করা'-রূপ আচরণের অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন।

এইসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন স্বতই মনে জাগে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যখন জগৎ 'বাধিতের অনুবৃত্তি'রূপে প্রকাশিত হয়, তখন উহার সহিত তাঁহারা কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকেন? মায়া-রচিত বিশ্বকে তাঁহারা স্বপ্নবৎ অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, অর্থাৎ মনোরাজ্যে তাহার স্বপ্নসদৃশ ছায়াপাত হইলেও তাহার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া অবজ্ঞাভরে মনকে তাহা হইতে সরাইয়া লইতে পারেন, অথবা তাহাকে ঐশী-শক্তির বিকাশ মনে করিয়া তাহার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিয়াও উদাসীন থাকিতে পারেন। শঙ্করাচার্য মায়াকে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তৃতীয়ত—এই ঔদাসীন্যের স্থলে মায়োপহিত ভগবানের এই অপূর্ব রূপের প্রকাশ দেখিয়া তাহার সহিত একটি প্রীতির সম্বন্ধও স্থাপন করিতে পারেন। অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে এই সর্বপ্রকার মনোভাবই দেখা যায়। শঙ্করাচার্যের নামে এমন বহু ভক্তিমূলক স্তোত্র প্রচলিত

আছে, যাহা সন্ন্যাসীরাও শ্রদ্ধাসহকারে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারই একটি স্তোত্রে আছে ঃ

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ।।" (বিষ্ণুষট্পদী, ৩)

মধুসূদন সরস্বতীও সজ্ঞানে জ্ঞান এবং ভক্তির মিলনসাধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নামে এই শ্লোকটি প্রচলিত আছে ঃ

"অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢাস্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন।।"

শ্রীধরস্বামীও এই পথেরই পথিক। আর শ্রীমদ্ভাগবতকার লিখিয়াছেন ঃ

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।" (১।৭।১০)

এই আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, অদ্বৈতভাব-পরম্পরার ক্ষেত্রেও এমন কয়েকটি স্থল আছে যেখানে সিদ্ধের জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির একই সঙ্গে বিকাশ অন্তত ব্যবহারিক দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠে এবং সাধকের জীবনে উহা সজ্ঞানে গৃহীত হইয়া থাকে। আর সহজেই মনে হয় অদ্বৈতবাদী স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার উপর এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ ক্রিয়া করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মতে এই সক্রিয় অদ্বৈতবাদই সর্বপ্রকার ধর্ম, নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার মূল এবং অটুট ভিত্তি হইতে পারে। আর কোন মতবাদের মধ্যে সেরূপ সার্বভৌমিক উদার দৃষ্টি *এবং সত্যের প্রতি অবিচল অভিযানের জন্য আহ্বান পাওয়া যায় না। সিদ্ধির* স্থিরতার সহিত সাধনার অবিরাম অগ্রগতি একমাত্র অদ্বৈতের মধ্যে নিহিত আছে, সে-আলোচনায় আমরা ক্রমে অগ্রসর হইতেছি। প্রথমে অধ্যাত্মক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদের প্রয়োগের কথাই ধরা যাক।

উপনিষদুক্ত অদ্বৈত সাধনার আলোচনায় অগ্রসর হইলে দুইটি বিশেষ বাক্য আমাদের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে—বৃহদারণ্যকের 'নেতি নেতি' এবং ছান্দোগ্যের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই দুইটি বাক্য আপাতত বিরোধী মনে হইলেও শঙ্করাচার্যের মতে উভয়ই একার্থক। প্রথম বাক্য নেতি-মুখে যেমন ব্রহ্মের পরিচয় দেয়, দ্বিতীয় বাক্যও তেমনি ব্রহ্মেরই পরিচয় দেয়, সর্বের নহে। তত্ত্বের দৃষ্টিতে তাহাই বটে। কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রেও কি তাহাই? তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে জ্ঞান স্ববিরোধী অজ্ঞানের নাশক হয়। এই অজ্ঞান-নাশের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের সহকারী বলিয়া বা সহগামী বলিয়া আর কোন কিছু স্বীকৃত হইতে পারে না। একমাত্র জ্ঞান অনন্যনিরপেক্ষভাবে অজ্ঞানের নাশ করে। অজ্ঞান নষ্ট হইলে ব্রহ্ম স্বতঃপ্রকাশিত হন; তাঁহার প্রকাশের জন্য আর কোন ইতিমূলক প্রচেষ্টা নিরর্থক।

মন্দান্ধকারে রজ্জুতে যে-সর্পভ্রম হয়, সে-ভ্রম নিরাশের জন্য আলোক আনা আবশ্যক; কিন্তু তদ্দ্বারা রজ্জুতে প্রকাশরূপ কোন নূতন ধর্মের আবির্ভাব হয় না। নেতিমুখে বিচার করিয়া যখন সর্বত্যাগ হইয়া গেল, তখন ব্রহ্ম আপনিই প্রকাশ পাইবেন।

এদিকে ছান্দোগ্য বলিলেন ঃ "এই সমস্ত জগৎ স্বরূপত ব্রহ্মই; কারণ তাঁহা হইতেই উহা জাত হয়, তাঁহাতে লীন হয় ও তাঁহাতে জীবিত থাকে।

অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। মানুষ ভাবরূপী। সে ইহজীবনে যেরূপ নিশ্চয়শীল হয়, দেহত্যাগের পর সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব সে তদ্ভাবে-ভাবিত-হওয়া-রূপ দৃঢ় উপাসনা অবলম্বন করিবে।" আর উপাসনার পদ্ধতি দেখাইতে গিয়া উপনিষদে বলা হইল ঃ "হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার এই আত্মাই ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক, কিংবা শ্যামাকতণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর; হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার এই আত্মাই পৃথিবী হইতে বিশালতর, অন্তরীক্ষ হইতে বৃহত্তর, দ্যুলোক হইতে বৃহত্তর—এই সমস্ত লোক হইতে বিশালতর। যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া বিদ্যমান,... ইনিই হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম।" স্তরে স্তরে বিবিধরূপে আত্মার সহিত ব্রহ্মের এই যে ঐক্যস্থাপন ও ঐক্যানুভূতি, ইহাই ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে ধ্বনিত হইয়াছে ঃ

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।" (ঈশ উপনিষদ্, ১)

উপনিষদের উপাসনাতত্ত্বের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্ব-স্থাপনের একটি ক্রমিক ধারা এবং তদলম্বনে অদ্বৈতবাদের উপর মানব-জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার ইঙ্গিত পাইলেন। তিনি দেখিলেন এবং উল্লেখ করিলেন কিভাবে ছান্দোগ্যোপনিষদের সত্যকাম জবাল স্বীয় গুরু হারিদ্রুমত গৌতমের আদেশে গভীর অরণ্যে গোরু চরাইতে গিয়া এই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-এর সাক্ষাৎকার পাইলেন। বৃষ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন ঃ "পূর্ব দিক ব্রহ্মের এক অংশ, পশ্চিম দিক এক অংশ, উত্তর দিক এক অংশ, দক্ষিণ দিক এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের 'প্রকাশবান' নামক চারিকলা-বিশিষ্ট এক চতুর্থাংশ।" অগ্নি তাঁহাকে উপদেশ দিলেন ঃ "পৃথিবী এক অংশ, অন্তরীক্ষ এক অংশ, দ্যুলোক এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের 'অনন্তবান্' নামক চতুষ্কল একটি চতুর্থাংশ।" হংস তাঁহাকে উপদেশ দিলেন ঃ "অগ্নি এক অংশ, সূর্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিদ্যুৎ এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের 'যতিষ্মান্' নামক একটি চতুর্থাংশ।" মদ্‌গু তাঁহাকে উপদেশ দিলেন ঃ "প্রাণ এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, শ্রোত্র এক অংশ, মন এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের 'আয়তনবান্' নামক চতুষ্কল একটি চতুর্থাংশ।" শঙ্করাচার্যের মতে এখানে বৃষ ইত্যাদি শব্দে দিকের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। এই মত অস্বীকার না করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা লইয়া সত্যকাম যখন গোচারণরূপ সাধারণ কর্মের মধ্যেও ব্রহ্মদর্শনে বদ্ধপরিকর হইলেন, তখন বৃষ অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃত প্রাণী ও বস্তুগুলিও মুখর হইয়া তাঁহাকে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মে'র সন্ধান দিতে বাধ্য হইল। ছান্দোগ্যের পরবর্তী উপাখ্যানটিও অনুরূপ। গুরু শিষ্যকে উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন। তবু শিষ্যের পরিচর্যায় তুষ্ট অগ্নিসকল তাঁহাকে ব্রহ্মোপদেশ দিলেন ঃ "প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম"; আর প্রত্যেক অগ্নি পৃথক পৃথক উপদেশ দিলেন। গার্হপত্য অগ্নি বলিলেন ঃ "পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য আমার তনু। আদিত্য-মণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন তিনিই আমি।" অন্বাহার্যপচন (দক্ষিণাগ্নি) বলিলেন ঃ "জল, দিক্‌সমূহ, নক্ষত্রবৃন্দ ও

চন্দ্রমা (আমার তনু)। চন্দ্রমণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি।'' আহবনীয়াগ্নি বলিলেন ঃ ''প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক ও বিদ্যুৎ (আমার তনু), এই যে বিদ্যুন্মধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি।'' এখানেও স্বাভাবিক ভাবে শিষ্যের হৃদয়মধ্যে স্বতই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মে'র প্রকাশ সঙ্ঘটিত হইল।

ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, ভূমা। বহু রূপে বহু শব্দে তাঁহার এই সর্বব্যাপিত্বের বর্ণনা আছে এবং বেদান্তে স্বীকৃত হইয়াছে। বিভিন্ন উপনিষদে বিবিধরূপে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মোপসনার দ্বারা সর্বত্র আত্মানুভূতির বিধি রহিয়াছে। এবং অনুভূতির মধ্যে একটি ক্রমিক অগ্রগতিও স্বীকৃত হইয়াছে—ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের দিকে এই অবিরাম অভিযান। দৈনন্দিন সাধারণ বস্তুও এই সর্বব্যাপী দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে পারে নাই। 'তৈত্তিরীয়'-তে অন্ন, প্রাণ, মন প্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনার বিধান দেওয়া হইয়াছে। এইসকল দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অন্তত ঔপনিষদিক যুগে ব্রহ্মোপাসনাকে এইভাবে জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া এক করিয়া লওয়া হইয়াছিল—সমস্ত জীবন এক উপাসনায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ইহার আরো ইঙ্গিত বা প্রমাণ পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের পুরুষ-যজ্ঞে। সেখানে (৩।১৬) বলা হইয়াছে ঃ ''পুরুষই যজ্ঞ, তাহার প্রথম চব্বিশ বৎসর আয়ুই প্রাতঃসবন; বসুগণ পুরুষযজ্ঞের প্রাতঃসবনে অনুগত আগত, প্রাণসমূহই বসু। অতঃপর যে চুয়াল্লিশ বৎসর আয়ু উহা মাধ্যন্দিন সবন।... অতঃপর যে আটচল্লিশ বৎসর আয়ু উহা তৃতীয় সবন ইত্যাদি। তারপর বলা হইয়াছে (৩।১৭)—সেই পুরুষ-যজ্ঞের অনুষ্ঠাতার যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এবং সুখের অভাব ইহাই তাঁহার দীক্ষা। অতঃপর তাহার আহার, পান ও আনন্দোপভোগ দীক্ষার পরবর্তী কালে লভ্য আহারাদির তুল্য। তাঁহার তপস্যা, দান, আর্জব, অহিংসা ও সত্যবাদিতা পুরুষ-যজ্ঞের দক্ষিণা। ইহা যেন কতকটা আপনাদের সুপরিচিত বাংলা গানেরই অনুরূপ ঃ

''শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় করি মাকে ধ্যান।
আহার করি মনে করি আহুতি দেই শ্যামা মাকে।''

ইহার পরে 'তৈত্তিরীয়'-তে যখন মন্ত্রোচ্চারিত হইল ঃ ''মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব'' তখন স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে উহার সহিত সুর মিলাইয়া বলা সহজ হইয়া পড়িল ঃ ''দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব, আর্তদেবো ভব'' ইত্যাদি। ইহা উপনিষদের চিন্তাধারারই পরিণতি এবং ইহা অদ্বৈত বেদান্তের চতুঃসীমার মধ্যেই সাধনের আধুনিকতম ব্যবস্থা।

কিন্তু ইহাতেও বিবেকানন্দের প্রাণে শান্তি আসিল না। উপনিষদের যুগে যে-চিন্তাধারা এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, উহার পরিসমাপ্তি উহাতেই হইতে পারে না, উহার গতিবেগ এখানেই অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহার মর্মার্থ অনুধাবন করিলে আমাদিগকে আরো দূরে, বহু দূরে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে ঃ

''ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।'' (৪।৩)

ইহা শুধু শাস্ত্রে নিবদ্ধ না থাকিয়া সামাজিক এবং প্রাত্যহিক জীবনে উপলব্ধ হওয়া এবং কার্যে পরিণত হওয়া আবশ্যক। আবার পুরুষসূক্তে

ব্রহ্মের প্রাতিস্বিক প্রকাশের ঊর্ধ্বে যে সামূহিক দৃষ্টি বর্ণিত হইল তাহাও প্রণিধানযোগ্য। মন্ত্রে বলা হইল ঃ

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রাপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।" (ঋগ্বেদ, ১০।৯০।১)
"সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।" (গীতা, ১৩।১৩)

এই যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে বিরাটের বিকাশ, ইহা শুধু ধ্যানের বিষয় বা তত্ত্বের প্রকাশক না হইয়া বাস্তব জগতে পূজার বিষয় হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মবাদ ও জীবনের মধ্যে যে-বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসান বাঞ্ছনীয়। বিবেকানন্দ তাই লিখিলেন ঃ

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মনপ্রাণশরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

বিবেকানন্দের সাধনায় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এক অবিচ্ছেদ্য রূপ ধারণ করিল। ইহা কল্পনাপূর্বক প্রতীকে দেবতার আরোপ নহে; অথবা গুণবিশেষ অবলম্বনে মনকে বা প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করা নহে। এখানে সর্বজীবে চৈতন্যরূপী সাক্ষাৎ ব্রহ্মের দর্শন এবং তদনুরূপ উপাসনার মন্ত্র উচ্চারিত হইল। আরোপ এখানে অনাবশ্যক; এখানে সত্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার। আবার ইহা অধুনা-প্রচলিত মানবতার পূজাও নহে; কারণ পূজ্য এখানে 'মানবতা' নহে, পরন্তু সহস্রশীর্ষা বিরাট পুরুষ, যিনি পূজকের সহিত অভিন্ন। বিবেকানন্দ যেখানেই দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, যেখানে তিনি জীবের সেবায় সাধককে আহ্বান করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের উপর। শঙ্কর-দর্শনে নেতি-মার্গে সকলকে বাদ দিয়া যে-সাধনার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছিল, এখানে তাহাও পূর্তিলাভ করে; কারণ সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতে গেলেই সর্বের সর্বত্ব অনেকখানি খর্ব হইয়া যায়; সর্বত্র আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্রহ্মদর্শন এবং সর্বাতীত অদ্বৈতের দর্শন একার্থক হইয়া দাঁড়ায়। তখন দ্বৈতজনিত নানাত্ব-দর্শনের ফল তিরোহিত হইয়া যায়।

"যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।।" (ঈশ-উপনিষদ্, ৭)

সর্বত্র আপনার সহিত অভিন্ন ব্রহ্মদর্শনের ভিত্তিতে জ্ঞানভক্তির এই মিলন বিবেকানন্দের নরনারায়ণ-সেবাকে কর্মযোগ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'কর্মযোগ'-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, কর্তৃত্ববুদ্ধি ও ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেই কর্মযোগী বলা চলে; তজ্জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস অত্যাবশ্যক নহে। কর্তব্যবোধে কর্ম করাকেও কর্মযোগ বলা চলে, এবং সেহিসাবে বুদ্ধদেব একজন শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী। ইহা একটি অতি চরম মাত্র। ইহা ছাড়িয়া দিয়া সেশ্বর কর্মযোগের কথা ধরিলেও বিবেকানন্দ-এ সেবাধর্মের সহিত পার্থক্য সুস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। গীতায় কর্মযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় পাই এই কয়টি শ্লোকে ঃ

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।। (৯।২৭)
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।।" (৬।১)

এখানে কর্মফল ত্যাগ ও ভগবানে সমস্ত কর্ম অর্পণের কথা পাইলাম; ইহাই সাধারণত কর্মযোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আবার কর্ম বলিতে অনেকে শাস্ত্রীয় যজ্ঞাদি বা লোকহিতকর কার্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। স্বামীজীর দৃষ্টির সম্মুখে কিন্তু আছে সর্বপ্রাণী এবং সর্বকর্ম; আর সেখানে শুধু ঈশ্বরে ফলার্পণ নহে, পরন্তু যাহাদের সেবা করিতেছি তাহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে সম্মুখে বিদ্যমান। আবার সেবক নিজেও ব্রহ্ম। এখানে কর্তা ব্রহ্ম, উপাদান ব্রহ্ম, দাতা ব্রহ্ম, গ্রহীতা ব্রহ্ম, কর্ম ব্রহ্ম, ফলও ব্রহ্ম। গীতারই একটি শ্লোকে বলা হয় ঃ

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।" (৪।২৪)

গীতায় স্বামীজীর এই ভাবটি বিভিন্ন প্রকরণে বিভিন্নরূপে বিকীর্ণ হইয়া আছে বলিয়া এবং ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যায় গীতাশাস্ত্র গতানুগতিক কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতিতে বিখণ্ডিত হইয়া আছে বলিয়া স্বামীজীর পরিকল্পিত সেবার রূপ ও আদর্শটি পূর্ণাঙ্গরূপে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন, গীতায় সর্বব্যাপী ভগবানের বিশ্বরূপদর্শন আছে; কিন্তু বিশ্বরূপ-দর্শনটিকে শুধু দর্শনরূপে গ্রহণ না করিয়া উহাকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে রূপপ্রদানের বিধি বা ইঙ্গিত দেখানো হয় নাই। সর্বত্র সমদর্শন, সর্বভূতের হিতসাধনের কথা থাকিলেও একই স্থানে কর্মযোগের প্রকরণে সমদর্শন ও হিতসাধনের কথা না থাকায় প্রকৃত অর্থবোধ হয় না। যেমন—

"সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে।।" (৬।৩১)

এখানে ভজন আছে; সেবা নাই, পূজাও নাই। এ-ভজন কতকটা মানসিক দর্শনমাত্র, যেমন ঠিক পূর্বের শ্লোকে আছে ঃ

"যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।।" (৬।৩০)
(ন প্রণশ্যামি—ন অপ্রত্যক্ষতাং গচ্ছামি)

আর আছে ঃ

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।।" (১২।৪)

স্বামীজীর দর্শনে সর্বভূতে হিত নয়, সর্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা বা সেবা। দৃষ্টি ও ফলের তফাত অত্যন্ত অধিক।

ফলত স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গির সহিত উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য অধিকতর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু স্থলবিশেষে তিনি উপনিষদের চিন্তাধারা অবলম্বনে আরো দূরে অগ্রসর হইয়াছেন। সর্বভূতে সর্বক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শন হইলে জীবনের মধ্যে পুণ্য ও পাপের অবিচ্ছেদ্য গণ্ডি টানিয়া মানুষ হইতে মানুষকে আর পৃথক করা চলে না। অদ্বৈতবাদী বলেন, মানুষ ভালই আছে, সে আরো ভাল হইতে পারে; তাহার গতি উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতরের

দিকে, অপকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টের দিকে নহে। সত্য কথা বলিতে গেলে—পাপ বা পাপী বলিয়া কিছু বা কেহ নাই; আছে শুধু ব্রহ্মের স্বল্প বা অধিক বিকাশ। সমাজের কর্তব্য পাপীকে শাস্তি দেওয়া নহে, প্রত্যুত তাহার অজ্ঞান দূর করিয়া অন্তর্নিহিত সত্যব্রহ্মকে প্রকাশ করার অবকাশ দেওয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ছাত্রকে শুধু নূতন নূতন তথ্য শুনাইয়া বা তাহা গলাধঃকরণ করাইয়া স্বকর্তব্য শেষ করিতে পারে না। সেবক হিসাবে বালক-নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণ আত্মার বিকাশের পথের বাধা অপসারিত করাই তাঁহার প্রধান কর্তব্য। ভালবাসা অবলম্বনে তিনি সেই আত্মবিকাশের পথে বালক-নারায়ণের পূজারী হইবেন। গুরু অধ্যাত্মপথে শিষ্যের পরিচালক না হইয়া তাহার সত্যের পথে চলিবার সখা হইবেন। সেখানেও তিনি শিষ্য-নারায়ণের পূজারীর আসন গ্রহণ করিবেন। ব্যক্তিজীবনে প্রতিক্ষেত্রও তেমনি মন্দিরে এবং প্রতি কার্য পূজায় রূপান্তরিত হইবে। সে-মন্দিরের গঠন হইবে প্রতি ক্ষেত্রে বিচিত্র, আর সে-পূজা হইবে প্রতি স্থানে বিভিন্ন। ধর্মের কোন বাঁধা-ধরা রূপ থাকিবে না। এখানে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী। এখানে প্রত্যেকের ধর্ম অর্থাৎ আত্মবিকাশের ধারা হইবে সম্পূর্ণ নিজস্ব। শুধু তাহাই নহে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা অধর্ম বলিয়া মনে হয় বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে স্থলবিশেষে তাহাও ধর্ম হইতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের পক্ষে হিংসাত্মক যুদ্ধই কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন; আর স্বামীজী কাহাকে কাহাকেও বলিয়াছিলেন, গীতা অপেক্ষা ফুটবলের মাধ্যমে তোমরা সহজে ভগবানের কাছে পৌঁছিবে। এই চিন্তাধারার মধ্যে ছিল একটি গতিশীলতা। স্বামীজীর ধর্ম একটি সজীব, গতিশীল বস্তু—যে ক্রমেই স্বীয় চরম আদর্শের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বস্তুত এই অবিরাম অগ্রগতি তাঁহার দৃষ্টিতে ধর্মের প্রকৃষ্ট কষ্টিপাথর। যেখানে চলা নাই, সেখানে তিনি সত্ত্বগুণ না দেখিয়া জড়তাই দেখিয়াছেন। কারণ বর্তমান যুগে সত্ত্বের নামে জড়তারই অভিনয় চলিয়াছে। ধর্মক্ষেত্রে ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়ত্বের সহিত মানবের পরিপূর্ণতা লাভার্থে এই অবিরাম গতি স্বীকার করা স্বামীজীর একটি নিজস্ব ব্যাপার। সকলেরই ভিতর পূর্ণব্রহ্ম—শুধু বিকাশের পার্থক্য। একদিন এই পার্থক্যকে সমূলে বিনাশ করিয়া সকলেই স্বীয় পূর্ণ ব্রহ্মত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বর্তমানে আমাদের উচিত এই পূর্ণ ও সর্বব্যাপী অথচ অপ্রকাশিত ব্রহ্মের প্রকাশে সর্বতোভাবে সর্বক্ষেত্রে সাহায্য করা এবং নিজ জীবনেও তাহারই সাধন করা। স্বামীজীর এই ভাব লক্ষ্য করিয়া Romain Rolland লিখিয়াছেন ঃ "Religion is never accomplished. It is ceaseless action and the will to strive—the outpouring of a spring—never a stagnant pond." অবশ্য ইহা একপক্ষপাতী দৃষ্টি। স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধিও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সে অন্য কথা। স্বামীজীর আরেকটি মনোভাব লক্ষ্য করিয়া Rolland লিখিয়াছেন ঃ "It is the quality of thought and not its object which determines its source and allows us to decide whether or not it emanates from religion. If it turns fearlessly towards the search for truth at all costs with single-minded sincerity prepared for any sacrifice, I should call it religious; for it presupposes faith in an end to human effort

higher than the life of the individual, at times, higher than the life of existing society and even higher than the life of humanity as a whole.''

ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বামীজীর পরিকল্পিত সমাজে স্বামীজীর দৃষ্টিতে অসাম্য থাকিতে পারে না। বর্তমানে সমাজ যাহা এবং যেরূপ হউক না কেন বেদান্ততত্ত্বের প্রয়োগের ফলে তাহাকে বর্তমানের সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিতেই হইবে; আর বেদান্তের তথ্যগুলি শুধু পুঁথিগত হইয়া থাকিবার জন্য নহে; উহাদিগকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেই হইবে। ভারতের অবনতির কারণ আদর্শের ন্যূনতা নহে; প্রত্যুত আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার ঐকান্তিকতার অভাব। শাস্ত্র বলিলেন ঃ

''বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।'' (গীতা, ৫।১৮)
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।। (গীতা, ১৩।২৯)

কিন্তু কার্যত আমরা বলিলাম ঃ ''দূরমপসর রে চণ্ডাল!'' গীতায় শ্রীভগবান বলিলেন ঃ ''সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ''(৯।২৯); কিন্তু আমরা 'পারিয়া পঞ্চম' সৃষ্টি করিয়া বলিলাম, ইহারা চলমান শ্মশান। প্রকৃতপক্ষে অস্পৃশ্যতার সহিত বেদান্তের কোন আপস হইতে পারে না। ইহা সমাজের একটি ব্যাধি এবং প্রকৃত বেদান্তীর কর্তব্য হইবে—ইহা হইতে সমাজকে মুক্ত হইতে সাহায্য করা। আত্মায় স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। অতএব নারীজাতির প্রগতির মুখে বাধাপ্রদান অসহনীয়। আবার আত্মা স্বাধীন। অতএব নারীরা কি করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে কি কর্তব্য, তাহা তাঁহারাই স্থির করিবেন। পুরুষের কর্তব্য শুধু শিক্ষাদি দ্বারা অজ্ঞান নাশপূর্বক দূর হইতে তাঁহাদিগকে সাহায্য করা। নারী ভগবতীরই রূপ সুতরাং তাঁহারা আমাদের পূজনীয়া। বর্তমান যুগে যে-সাম্যবাদ প্রভৃতির কথা শুনিতে পাই, স্বামীজীর যুগে তাহার সূত্রপাত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই বিষয়ে তিনি কি বলিতে চাহেন, তাহা জানিবার জন্য স্বতই আমাদের আগ্রহ হয়। ইহারও সমাধান তিনি বেদান্ত অবলম্বনেই করিতে চাহিয়াছিলেন। গীতা বলিয়াছেন ঃ ''ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।'' (৫।১৯) বেদান্তের এই সাম্যের কথা স্বামীজী বহু স্থলে বলিয়াছেন এবং ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা চাই বা না চাই, সাম্য নানা বেশ ধরিয়া ভাবী সমাজে আত্মপ্রকাশ করিবেই। কিন্তু আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত স্বামীজী এই সাম্যকে শুধু অর্থসাম্য বা জাতিসাম্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এইসব সাম্য স্থলবিশেষে এবং সমাজবিশেষে কারণ-পরম্পরায় অনিবার্য হইলেও আত্মিক সাম্যই আমাদের অভিপ্রেত। আর সে-সাম্যের সামাজিক নিকটতম রূপ হইতেছে কৃষ্টিসাম্য। আত্মার অধিকতর বিকাশের দ্বারা অর্থাৎ নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক ঊর্ধ্বতনের দ্বারাই এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক; উচ্চতরদিগের নিম্নে টানিয়া আনিয়া যে সাম্য, তাহা স্বামীজীর মনঃপূত ছিল না এবং স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাহার নিন্দাও করিয়াছেন।

এই বেদান্ততত্ত্ব অবলম্বনে তিনি ধর্মের দ্বন্দ্বও শেষ করিতে চাহিয়াছিলেন। *ব্রহ্ম যদি এক হন এবং তাঁহার প্রকাশের ভঙ্গি যদি বিচিত্র এবং রূপ যদি*

বিভিন্ন হয়, তবে বিবাদের স্থান কোথায়? একত্বের ভূমিতে স্থাপিত বৈচিত্র্য অবলম্বনে তিনি জাতিবর্ণনির্বিশেষে এক মনুষ্য-সমাজ স্থাপনে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই ভাব লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক Floyd Ross লিখিয়াছেন ঃ "The oneness of mankind is something which modern man everywhere needs to learn, if he is to move creatively into one world, where the richness of divinity does not mean an anarchy of foolish competition ; but each person needs to find the meaning of that oneness in his own selfhood before he can go far in helping to build 'One World'."

একের বহুরূপে প্রকাশের তথ্য ভারতবর্ষ সুদূর অতীত হইতেই অবগত আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে গৌড়পাদও স্বীকার করিয়াছেন যে, অদ্বৈত মত স্বীকার করিলে পরমতের সহিত বিরোধ করার কথাই উঠিতে পারে না। আর বস্তুত অদ্বৈত অবলম্বনেই বিরোধের নিষ্পত্তি হইতে পারে। গৌড়পাদ-কারিকার সিদ্ধান্ত ঃ

"স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে।।"

শঙ্করাচার্য দেখাইয়াছেন যে, মূল তত্ত্বকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াও অপর সব মতবাদের অনেকখানি অংশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় গুরুর পথ অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, শুধু অপরমতকে সহ্য করাই যথেষ্ট নহে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশও আবশ্যক। এই অদ্বৈতভিত্তির উপরই সর্বধর্মসমন্বয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াও তিনি ভক্তি, জ্ঞান, যোগ, কর্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্মপ্রকাশ সম্বন্ধে ঔদার্য ও শ্রদ্ধা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, অদ্বৈত অবলম্বনই সর্বপ্রকার বিবাদ-নিষ্পত্তি সম্ভবপর।

শুধু তাহাই নহে। তাঁহার মতে সমস্ত নীতির সর্বোত্তম ভিত্তি হইতে পারে এই অদ্বৈতবাদ। ভগবানের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব বা মানবতার একত্ব বা সাম্য প্রভৃতি মতবাদ অবলম্বনে যে সৌভ্রাত্রের সৌধ গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা এ-যাবৎ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এখন আত্মার মহত্ত্ব ও একত্ব অবলম্বনে উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় আগত, এবং ইহার অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দ! মানবাত্মার মহত্ত্ব স্বীকারের দ্বারা মানবকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে যে-মর্যাদা দান করা হয় তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সত্যকারের মিলন ঘটিতে পারে। এই মিলন হইবে দাবি-দাওয়ার ফলে নহে, পরন্তু স্বীয় আত্মার বিকাশ এবং অপরের আত্মার পূজা অবলম্বনে।

মানবের অগ্রগতির মূলে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন আত্মবিশ্বাস অর্থাৎ আত্মার অমরত্ব, নির্গুণত্ব, অবিকারিত্ব প্রভৃতিতে আস্তিক্যবুদ্ধি। এই আত্মবিশ্বাসের ফলে যে আত্মশ্রদ্ধা জাগরিত হয়, তাহাই মানবকে হীন কর্ম হইতে নিবৃত্ত করে এবং উচ্চতর কর্মের প্রতি প্রেরণা দিয়া থাকে।

মানবজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে বিরাট পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, আমরা এখানে তাহার কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন মাত্র করিলাম, অনুসন্ধিৎসুকে পূর্ণ জ্ঞানের জন্য তাঁহার আকর-গ্রন্থেই যাইতে হইবে।* □

*৬০ বর্ষ, ৩ ও ৪ সংখ্যা

সুফিদর্শন প্রসঙ্গে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সুরা ও সাকি

ওমর খৈয়ামের সঙ্গে ইউরোপ এবং আমাদের পরিচয় উনিশ শতকে এডোয়ার্ড ফিটজিরাল্ড মারফত। কিন্তু ফিটজিরাল্ডের ওমর বেহেড মাতাল এবং দুর্দান্ত প্রেমিক এক কবি, যিনি ঘোর অদৃষ্টবাদী—তাই তাৎক্ষণিকতার অনুগামী, কতকটা চার্বাকপন্থীও। অসামান্য প্রতিভাধর এক পারসিক গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মরমী সাধক কবির মৃতদেহে ফিটজিরাল্ড নিজের ভূতটিকে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন; তাঁর ক্ষমতাও অবশ্য কম নয়।

অনেকের মতে কবিতার ট্র্যানশ্লেসন হয় না, ট্র্যান্সক্রিয়েশন হতে পারে এবং এতে আমার অন্তত দ্বিমত নেই। তাই শুদ্ধ কবিতার দিক থেকে হয়তো ফিটজিরাল্ড ক্ষমার্হ। কিন্তু ওমর-হত্যার পাতক থেকে তিনি নিষ্কৃতি পাবেন কিনা সন্দেহ, মহাকালের কাছে। কারণ ওমরের কবিতা আসলে এক দার্শনিক মতবাদের সাকার বিগ্রহ।

ওমর খৈয়াম মানেই সুরা ও সাকি, এই ধারণার জন্য প্রাথমিকভাবে ওই ভিক্টোরীয় ভদ্রলোক দায়ী হলেও বাকি সবটাই আমাদের রোমান্টিক কল্পনাবৃত্তির তুখোড় কারচুপি। তাছাড়া রমণী সম্পর্কে মধ্যযুগীয় সংস্কারের জের অবচেতনায় ক্রিয়াশীল। পুরুষশাসিত সমাজে ভোগী পুরুষের চোখে প্রেমিকার বিমূর্ত সত্তা খৈয়ামী সাকিতে মূর্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল—যে-প্রেমিকা তার মুখে সুরা ঢেলে দেবার জন্য সুরাহি নিয়ে সতত পার্শ্বচারিণী। সে যেন ক্রীতদাসী, ব্যক্তিত্বহীন নিছক রমণী।

বাংলায় আমরা এই সাকিকে সখিরূপেই দেখেছি। তন্বীশ্যামাশিখরদশনাপক্কবিম্বাধরোষ্ঠী পীনোন্নতপয়োধরা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা বলিব্যাকুলা দয়িতারূপিণী। কিন্তু হায়, কে জানত 'সাকি' সরাইখানার শরাব-পরিবেশক বালকভৃত্য! 'বয়' ব্যাপারটা এই সাকি-ট্র্যাডিশন থেকেই উদ্ভূত। এ-ট্র্যাডিশনের শেকড় খুঁজলে মিলবে সারা পশ্চিম এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের দেশের সুপ্রাচীন যুগে। এবং ব্যাপারটা অশালীন। বাইবেল এবং কোরানে এই বিকৃত পচনশীল ট্র্যাডিশনের শহর সডোম ঐশ্বরিক শাপে ধ্বংস হওয়ার গল্প আছে।

ওমরের কবিতার শরাব ও সাকি নিছক রূপক এবং তাঁর এসব রুবাই (চতুর্দশপদী) সমগ্র রচনার খানিকটা অংশমাত্র। আসলে ওমর তাঁর কবিতায় এক অধ্যাত্মচিন্তাকেই শরীর দিয়েছেন। শরাব পরমজ্ঞান এবং সাকি মানবজীবন। ওমর বলেছেন ঃ "অন্তত যা-কিছু কুড়োতে পার, কুড়িয়ে নাও। খালি হাতে গেলে লোকসান বই লাভ নেই।" অর্থাৎ জীবনের ধন কিছুই যাবে না

ফেলা। ওমর পরমজ্ঞান সংগ্রহে মানবজীবনের সাহায্য ও সাহচর্য চেয়েছিলেন এবং তাঁর এই দার্শনিক প্রত্যয়টি সমকালীন এক জটিল ও বিশাল দর্শন-ভাবনার ঐতিহাসিক ভূমিতে জাত। সেই দর্শন-ভাবনার নাম সুফিবাদ।[১]

সুফিবাদের উৎস

সুফিবাদ সম্পর্কে ইউরোপে প্রচণ্ড গবেষণা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। পণ্ডিতরা বিশ্বের তাবৎ দেশের প্রাচীন দর্শনভাবনা, অকাল্ট বা গুপ্তবিদ্যা, ভারতীয় বেদান্ত, ভক্তিবাদ, যোগ, তন্ত্রসাধনার মধ্যেও সুফিবাদ আবিষ্কার করেছেন। এমনকি শেক্সপীয়ার, ফ্রয়েড, যুং, চসার, দান্তে, হ্যানস অ্যান্ডারসন—সবেতেই সুফিতত্ত্বের নির্যাস খুঁজে পেয়েছেন। পাওয়ারই কথা। কারণ সুফিবাদের মূলে আছে মানুষের হাজার-হাজার বছরের পুরোনো একটা মৌলিক প্রশ্ন, যে-প্রশ্নে মানুষ নিরন্তর জর্জরিত—আমি কে? সুফিবাদী ওমরের কবিতায় আছে ঃ "প্রতিটি চক্রান্ত আমাকে ঘিরে—আমি তো আমারই। আমি যা, আমি তাই।" এই মৌলিক প্রশ্নেরই আরেকটি সাফ-সাফ জবাব রবীন্দ্রনাথে পাই ঃ "আমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ।" আমি আছি, তাই বিশ্বজগৎ আছে। যা-কিছু ঘটছে, তা আমাকে কেন্দ্র করে। অদ্বৈতবাদী দর্শনে তারই এক চরম উচ্চারণ ঃ "সোঽহম্"। এবং সুফি মনসুর হাল্লাজের মৃত্যুকালীন উক্তিতে তারই অবিকল প্রতিধ্বনি ঃ "আনাল হক্"। আমিই সত্য, আমিই ঈশ্বর। সুফি দার্শনিক ইবনে-আল-ফরিদ বলেছিলেন ঃ "দ্রাক্ষালতা সৃষ্টিরও আগে আমি দ্রাক্ষারস পান করেছি।" আমি—এই সত্তাকে শাশ্বত সত্যের প্রতীক করে তোলাই সুফিবাদের লক্ষ্য। কখনো সুফিদের দর্শনচিন্তায় 'আমি' উপনিষদের সেই পরমাত্মা। জীবাত্মা এই মানবজীবন—দেশকালে বিধৃত এবং ঐতিহাসিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ওমন খৈয়ামের সাকি সে।

'সুফি' শব্দের উৎস বা ব্যুৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ। কেউ বলেন, সুফিবাদের জন্ম ইসলামপ্রবর্তক হজরত মহম্মদের সমকালেই। ইসলামী অধ্যাত্মচিন্তার মধ্যে তার বীজ ছিল নিহিত। তাঁদের মতে, 'আসহাব-উস-সাফা' (Companions of the Bench বা সোজা কথায় সভাসদ্‌বর্গ) থেকে সুফি শব্দের জন্ম। হজরতের প্রায় সমকালীন সাধক হাসান বসরির অদ্বৈতবাদী ভাবনায় এর পরোক্ষ প্রমাণ মেলে। আবার কেউ বলেছেন, সুফ অর্থাৎ পশম থেকে সুফি। খ্রীস্টান সাধুরা মোটা পশমের আলখাল্লা পরতেন। মুসলিম সাধুরাও দেখাদেখি সুফের আলখাল্লা পরেন এবং তার ফলে সুফি আখ্যা পান।

আধুনিক পণ্ডিতরা কিন্তু 'সুফি'র উৎস সম্পর্কে অত্যন্ত যুক্তিবাদী অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন দুটি দিকে। একটি হলো সুপ্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সফিস্টরা—Sophia বা Sophos (ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা) থেকে যে-সফিজমের উদ্ভব, তার প্রবক্তা ছিলেন তাঁরা। ঠাট্টা করে এদের বলা হয় তর্কবিলাসী। দ্বিতীয় উৎসটি হলো হিব্রু কাব্বালীয় তন্ত্রের Ain Sof—অর্থাৎ পরম অসীম। কাব্বালা-তন্ত্রের অনুগামীরা মনে করতেন, বাইবেলের বাক্যসমূহের অন্তর্নিহিত অন্য গোপন

অর্থ আছে এবং সাধনায় সে-অর্থ লভ্য। আশ্চর্য ব্যাপার, সুফিদেরও ধারণা, কোরানের বাক্যসমূহেরও গভীরতর গোপন অর্থ আছে, যা সাধকদেরই লব্ধ।

সুফিবাদ সম্পর্কে গবেষকদের অনেকে আরো পিছিয়ে গিয়ে প্রাচীন মিশরের পৌরাণিক সাধু (এবং দেবতাও) হার্মিস-সংক্রান্ত চিন্তাধারায়[২] এবং কেউ কেউ পিথাগোরাসের উক্তিতেও সুফিবাদের মূল আবিষ্কার করেছেন। তবে গ্রীক Sophos—যা থেকে থিওসফি কথাটার উদ্ভব, 'সুফি' শব্দের জনক হওয়ার মধ্যে যুক্তি আছে। সফিস্টদের আচার-আচরণ এবং চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে প্রথম যুগের সুফিদের অসামান্য মিল দেখা যাবে। (ফিলসফার শব্দের উৎসেও ওই Sophos।) তাঁরা গ্রীক দার্শনিকদের মতোই পথে-ঘাটে তত্ত্ব প্রচার করতেন। সুফিদের চিন্তাধারায় যে বিশ্বব্যাপী উপাদান সংগ্রহের নজির ছড়িয়ে আছে, তাতে ভুল নেই। সুফিরাই কেউ কেউ গ্রীক পিথাগোরাস এবং কিংবদন্তীখ্যাত সম্রাট সলোমন বা সোলেমান (বাইবেল ও কোরানে যাঁর কথা আছে)-কে গুরু বলেছেন। মোগল যুগে দারা শিকোহ্কে দেখা যাবে হিন্দুগুরুর কাছে বেদান্ত শিখতে। কারণ সুফিবাদে বেদান্তের প্রতিধ্বনি আছে এবং দারা ছিলেন সুফি মতবাদের অনুগামী। আবার সুফিগুরুদের অ-মুসলিম শিষ্যও কম ছিলেন না। রুমির শিষ্যরা কেউ ছিলেন খ্রীস্টান, কেউ জোরাস্ট্রিয়ান (জরথুস্ত্রবাদী), কেউ ইহুদি। কিংবদন্তীখ্যাত খিজির, সুফিদের এক গুরু, ইহুদি ছিলেন বলে শোনা যায়। সুফি 'সোঽহং'বাদের প্রবক্তা মনসুর হাল্লাজ নিজেকে অনেকসময় খ্রীস্টান বলতেন। সুফিদের একটি গোষ্ঠীকে বলা হয় Spanish School এবং তাঁরা সবাই মুসলিম ছিলেন না। যেমন জুডা হালেভি, মোজেস বেন এজরা, যোশেফ বেন যাদিক, স্যামুয়েল বেন টিব্বন, সিমটব বেন ফালাকেরা। এঁরা ইহুদি এবং সুফিবাদী চিন্তাধারার প্রবক্তা ছিলেন। কাব্বালীয়-তন্ত্র থেকে সুফিবাদে ঝুঁকেছিলেন।

সুফি আল-গজ্জালীর চিন্তাধারায় পণ্ডিতরা প্রতীক ব্যাখ্যায় ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। কার্ল গুস্তাফ য়ুংয়ের 'আদিপ্রতিমা' (Archetype)-তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিও সুফিবাদে দেখা গেছে। ইহুদি কাব্বালীয়-তন্ত্র এবং ইহুদি মরমিয়াবাদের প্রতি ফ্রয়েড কতটা ঋণী, তা অধ্যাপক ডেভিড বাকান 'Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition' (New York, 1958) বইয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে সুফিবাদী মনোবিশ্লেষণপদ্ধতি প্রতিধ্বনিত দেখে অবাক লাগে। অর্থাৎ সুফিরা চারদিক থেকে তত্ত্ব সংগ্রহ করে নিজেদের মূল দার্শনিক প্রশ্নটিকে বর্ণাঢ্য করে সাজিয়ে তুলেছেন।

সুফিদের একটি গোষ্ঠী গুপ্তবিদ্যা বা অকাল্টের প্রবক্তা। এঁদের সঙ্গে চীনা তাও ধর্ম, বৌদ্ধ এবং হিন্দু তন্ত্রবাদীদের অসামান্য মিল। মানুষের শরীরে এঁরা ব্রহ্মাণ্ড এবং পরমব্রহ্মকে খুঁজে পান। বাংলায় বাউল-ফকিরদের দেহতত্ত্বের গানে এই মতবাদ স্পষ্ট। বাংলার বাউলদর্শনে বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদর্শনের সঙ্গে তন্ত্রবাদ এবং রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব মিলেমিশে গেছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে সুফিবাদকেই প্রকট হতে দেখা যাবে। বাউলগুরু লালন সুফিবাদী ছিলেন।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা, বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সুফিবাদেরই সারাৎসার যেন। কেউ কেউ সুফিবাদকেই রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্বের উৎসে স্থাপন করেছেন। সুফিদের একটি গোষ্ঠীর ইশ্‌ক্ (প্রেমজ সংরাগ) এবং মাশুক (প্রেমিক)-তত্ত্ব একই। তার চেয়ে আশ্চর্য, হিন্দু সাধিকা মীরাবাঈয়ের মতো এক মুসলিম সাধিকা রাবেয়া-আল-আদাউইয়া (মৃত্যু ৭১৭ খ্রীস্টাব্দ) ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদজ্ঞানে উন্মাদিনী হয়ে ওঠেন।

প্রাচীন সুফিদের কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করলে বোঝা যাবে, সুফিবাদ ইসলামের অভ্যুদয়ের শুরু থেকেই অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং একাদশ শতাব্দী থেকে বিশাল বৃক্ষটি দেখা গিয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে বাদশাহী মদতে সুফিবাদ অভিজাত শ্রেণীর ধর্মবিলাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত সুফিবাদ সহজিয়া। হাসান বসরী (বসরানিবাসী) হজরতের জামাতা আলির শিষ্য ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ "আমি আছি। কিন্তু আমার থাকা ঝড়ের সমুদ্রে একটুকরো কাঠ আঁকড়ে ভেসে থাকার মতো।"

মিশরের জুন্নুন (মৃত্যু ৮৬০ খ্রীস্টাব্দ) বলতেন ঃ "নীরবতাই সুফির অবস্থা বর্ণনা করতে পারে। পার্থিব যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্নতা তার কাম্য বলে সে পার্থিব বস্তুর সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত।"

রাবেয়া বলতেন ঃ "সুফির নরককে ভয় নেই, স্বর্গের প্রতিও লোভ নেই!"

জুনায়েদ (মৃত্যু ৯১০ খ্রীস্টাব্দ) বলতেন ঃ "মানুষের সারাৎসারেই সুফির বসতি।"

পারস্যের সুফিকবি ওমর খৈয়াম-এ (মৃত্যু ১১২৩ খ্রীস্টাব্দ) এইসব চিন্তারই বিরাট এক পরিণামকে প্রত্যক্ষ করা যাবে। "এই ব্রহ্মাণ্ডবৃত্ত এক যেন অঙ্গুরীয় এবং আমরা সেই বৃত্তের গায়ে কারুকার্য মাত্র...।"

সুফি গোষ্ঠীসমূহ

সুফিরা মরমী সাধক। পরমসত্তার রহস্যসন্ধানী। তাঁদের দর্শন মুখ্যত তিনটি School-এ বিভক্ত। ওয়াজুদিয়া, শহুদিয়া এবং ইজাদিয়া।

ওয়াজুদিয়া মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি সত্তাই অস্তিত্ববান এবং এই সত্তা ঈশ্বর। তাঁর বহুমুখী বিকাশ ঘটেছে। (এক থেকে বহু ঃ উপনিষদ্ উল্লেখ্য।) অরূপ নানারূপে ব্যক্ত।

শহুদিয়া মতে, বিশ্ব একটি দর্পণ এবং তাতে পরমসত্তার গুণাবলী প্রতিফলিত নানারূপে। এটি সর্বেশ্বরবাদী দর্শন। (এও উপনিষদে পাওয়া যাবে) জড়-অজড় সর্বভূতে স্থানকালব্যাপী ব্রহ্মের অস্তিত্বের স্বীকৃতিই শহুদিয়া স্কুলের সারকথা। কিন্তু ব্রহ্মের সেই অস্তিত্ব বিশ্বদর্পণের প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের (এমনকি প্লেটোরও) মায়াবাদ শহুদিয়া মতে প্রচ্ছন্ন।

ইজাদিয়া মতে, পরমসত্তা ও বিশ্ব পৃথক। অনস্তিত্ব থেকে পরমসত্তা অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব-অস্তিত্বকে। নেতি থেকে ইতির সৃষ্টি। কিন্তু স্রষ্টা ও

সৃষ্টি আলাদা। হিন্দু দ্বৈতবাদী দর্শন তুলনীয়। পিথাগোরাস আত্মার বিচ্ছিন্নতা ও নিত্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ইজাদিয়াদর্শনও তাই বলে।

আদি-খ্রীস্টানদের নাইসিনীয় গোষ্ঠীর Homoousian-তত্ত্বে পিতা (ঈশ্বর) এবং পুত্র (যিশু) অভিন্ন সত্তা। এঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ছিলেন ইজাদিয়া স্কুলের অনুরূপ তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁরা পিতা ও পুত্রকে পৃথক সত্তা (Substance) মনে করতেন।

কিন্তু এতো গেল শুদ্ধ সুফিদর্শনের কথা। সুফিদর্শনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকে চারজন সুফিগুরু চারটি সাধনপন্থা নির্দেশ করে গেছেন। এই গোষ্ঠী চারটির নাম ঃ চিশতী, কাদিরী, নাখ্‌শ্‌বান্দী এবং সুহরাওয়ার্দী।

এছাড়া অপ্রধান কিছু গোষ্ঠী আছেন। তাঁরা পুরোপুরি সুফি নন। যেমন কালান্দরী, কুবরাভী, মেভলেভী। এঁরা শুধু দরবেশ নামেই খ্যাত। মাদারিয়া গোষ্ঠীও তাই।

চিশতীদের গুরু ছিলেন দশম শতকের সিরীয় সুফি খাজা আবু ইশহাক চিশতী। তাঁর মতবাদ থেকে সম্প্রদায় গড়ে ওঠে পারস্যের খোরাশান প্রদেশের চিশ্‌ত্‌ শহরে। তাই চিশতী পদবি। এঁরা বাঁশি এবং ঢোল বাজিয়ে লোক জড় করে মত প্রচার করতেন গাথা গেয়ে। (উল্লেখ্য, স্প্যানিশ শব্দ Chistu গানবাজনাসহযোগে কৌতুক বোঝায়। ইংরেজী Jester শব্দের সঙ্গে এর সম্পর্কও লক্ষণীয়। অবশ্য Jester-এর ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে ল্যাটিন Gerere-তে পৌঁছান হয়েছে। কিন্তু সে নেহাত পণ্ডিতী কচকচি।)

কাদিরীদের গুরু আবদুল কাদির জিলানী (মৃত্যু ১১৬৬ খ্রীস্টাব্দ)। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে জিলান অঞ্চলের নিফ শহরের লোক ছিলেন। তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের গল্প প্রচলিত আছে। ইনি গুপ্তবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন তান্ত্রিকদের মতো।

নাখ্‌শ্‌বান্দীদের (কারুকার্য বা নকশার মানুষ) গুরু ছিলেন খাজা বাহাউদ্দিন নাখ্‌শ্‌বান্দী (মৃত্যু ১৩৮৯ খ্রীস্টাব্দ)। চিশতীদেরই একটি শাখা থেকে এই স্কুলের উদ্ভব।

সুহরাওয়ার্দীদের গুরু ছিলেন বারো শতকের সুফি দার্শনিক শেখ জিয়াউদ্দিন জাহির সুহরাওয়ার্দী।

সুফিদের আরো একটি সম্প্রদায়ের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। ইংরেজী Assassin শব্দটি ঘাতক অর্থে প্রচলিত। এর মূলে আছেন ক্রুসেডের যুগের সনাতনপন্থী মুসলিম 'আসাসিন'রা। মূল শব্দটির অর্থ সনাতনপন্থী। দশম শতকে হাসান বিন-সাবাহ্‌ নামে এক মুসলিম নেতা সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করে খ্রীস্টানদের সঙ্গে লড়াই করেন। এঁর পদবি ছিল শেখ আল-জাবাল অর্থাৎ পর্বতসমূহের নেতা। ইংরেজীতে তাঁকে বলা হতো Old man of the mountain এবং ভারতের ইসমাইলী খোজা সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু আগা খান তাঁরই বংশধর।

আসাসিনরা সনাতনপন্থী হলেও সুফি মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আমার সন্দেহ শব্দটির সঙ্গে হিব্রুহাসিদিন (ধর্মভীরু) শব্দের সম্পর্ক আছে। আরবি

এবং হিব্রু ভাষাগোষ্ঠিতে ভাইবোন সম্পর্ক। খ্রীস্টান ধর্মযোদ্ধারা মনে করতেন, হাসানশিষ্যদের সাঙ্ঘাতিক মাদক খাইয়ে হত্যালীলায় প্রবৃত্ত করা হচ্ছে। আসাসিনদের সেই কল্পিত মাদক বহু পরবর্তী যুগে 'হাশিশ' হয়ে গেছে। আসাসিন থেকেই হাশিশ শব্দ ইউরোপীয় অভিধানে ঢুকে গেছে। কিন্তু আরবি হাশিশ মানে গবাদিপশুর খাদ্য জলাভূমির ঘাস।

সুফিদর্শনের সারাৎসার

আফগানিস্তানের জালালুদ্দিন রুমি (মৃত্যু ১২৭৩ খ্রীস্টাব্দ), খোরাসানের হাকিম সানাই (চতুর্দশ শতক) এবং আল-গাজ্জালি (মৃত্যু ১১১১ খ্রীস্টাব্দ), স্পেনের আল আরাবি (মৃত্যু ১২৪০ খ্রীস্টাব্দ) প্রমুখ সুফি দার্শনিকরা মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির অনুগামী ছিলেন। মনের বিভিন্ন স্তর এবং অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা বর্ণনা দিয়েছেন সাঙ্কেতিক ভাষায়। এ পদ্ধতিকে আধুনিক Psychotherapeu-tic বলা যায়। বিভিন্ন মানসিক স্তরের অবস্থা ব্যাখ্যায় আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের (চতুর্মাত্রিক বিশ্ব) প্রয়োগ যেমন স্পষ্ট, তেমনি মহাকাশ ভ্রমণ এবং একালের Para-psychology-র বিবিধ ঘটনা প্রকট। আধুনিক বিজ্ঞানের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়সমূহ (কিংবা অপবিজ্ঞানেরও) কিভাবে সুফিদের মাথায় এল? এ-প্রশ্নের জবাব খুব সোজা। মানুষ যখন থেকে নিজের অবস্থা ও পরিবেশকে ছাড়িয়ে চিন্তা করতে শিখেছে, তখন থেকেই তার ভবিষ্যৎ বাস্তব সুনির্দিষ্টভাবে তৈরি হয়ে গেছে। সুপ্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় এভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশাল ব্যাপ্তির ধারণা (ব্রহ্মার প্রতি রোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড), কালসম্পর্কে বোধ, মহাকাশযান, বিধ্বংসী ও ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহ—একালে যা বিজ্ঞানের এক্তিয়ারভুক্ত, প্রায় সবই দেখা গেছে। প্রাচীন মানুষ সম্পর্কে আমাদের ভুল সিদ্ধান্ত আছে। অবশ্য একথা সত্য নয় যে, প্রাচীনযুগে মহাকাশযান বা পরমাণুবোমা বাস্তবত ছিল। সেটা অসম্ভব সবদিক থেকেই। কিন্তু মানুষের চিন্তায় তা ছিল। তা থেকেই কল্পনার বিস্তার ঘটেছে।[৩] সুফি দার্শনিক আল আরাবির উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ 'চিন্তাশীল মানুষের অস্তিত্ব চল্লিশহাজার বৎসর যাবৎ।' এ উক্তিতে সংখ্যা মানুষের চিন্তার কালগত ব্যাপ্তিকেই প্রকাশ করছে।

সুফি চিন্তাধারার অনুপ্রেরণা ও উপাদান ইসলামধর্ম এবং বহুলাংশে বাইরের উৎস থেকে সংগৃহীত হলেও সামগ্রিক সুফি-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এর কেন্দ্রে আছে গোঁড়া ইসলামী শরিয়তপন্থী চিন্তার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ। তার মানে, সুফিরা প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামের বিরোধী। সব দেশের মরমী সাধকরাই তাই। স্বয়ং হজরতের যুগে হাসান বসরী বলেছিলেন ঃ "ইসলাম কী এবং মুসলিম কারা? আমি বলব ইসলাম আছে কেতাবে এবং মুসলিম আছে কবরে।" এ-একটা ক্ষুব্ধ জবাব নিঃসন্দেহে। হাসান শুধু এইটুকু বলে ক্ষান্ত হননি। তিনি বলেছিলেন ঃ "ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ একরকম জিনিস; কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধে পাপ জঘন্যতম।" শরিয়তিকেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামে ঈশ্বর এবং মানুষের সংজ্ঞা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ

করে মানুষকে শয়তান-তাড়িত আত্মরক্ষা-তৎপর সত্তা হিসাবে সীমিত করা হয়েছে। কিন্তু সুফি দার্শনিক আবু হাসান আল শাধিলি বলেছেন ঃ "জ্ঞানের যাত্রা 'কে আমি' এই প্রশ্ন থেকে 'আমি জানি না কে আমি' এইদিকে।" আমি ঈশ্বরসৃষ্ট একজন মানুষ এবং বান্দা বা সেবক, একথা বললেই মানুষের কিছু বলা হয় না। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ইসলাম মানুষকে বান্দাতে সীমাবদ্ধ রাখে।

সুফিদের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধিতা কী ধরনের, তা বাঙালী সুফি লালন শাহের গানে প্রকাশিত হয়েছে স্পষ্ট করেই ঃ "তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে।"

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি অঞ্চলের বাউল চমৎকার শেখের একটা গান শুনেছিলাম। "মরা মানুষ পড়ল ধরা শ্রীমতী ভাগীরথীতে।" বহতা মহাজীবনস্রোতে খণ্ডিত সীমাবদ্ধ ব্যক্তি-মানুষ মৃতের মতো ভাসমান। মানুষ সম্পর্কে এই ধারণা ইসলামবিরোধী।

ভারতে যে সুফি-সন্তরা বাইরে থেকে এসেছিলেন, তাঁদের জীবনযাত্রা ধর্মাচরণ সবই ছিল প্রতিষ্ঠানবিরোধী। মুখ্যত এদেশে চিশতীদেরই প্রাধান্য বরাবর। চিশতী সুফিরা কেউ কেউ বাদশাহ-আমিরদের গুরু হয়ে ওঠেন। এখন তাঁদের সমাধি ঘিরে বিশাল ব্যাপার ঘটে। কিন্তু অসংখ্য সুফি সাধক সাধারণ মানুষের মধ্যে কাটিয়ে গেছেন। বহু জায়গায় তাঁদের নিরাভরণ সাদাসিধে সমাধি চোখে পড়বে। কোথাও সাঁজবাতি জ্বলে, কোথাও জ্বলে না। বহু সমাধি বা আস্তানা ধানক্ষেত বা জঙ্গলের তলায় নিশ্চিহ্ন। ভারতের মতো এত বেশি সুফির কবর কোন মুসলিম দেশেও দেখা যায় না। এর একটিই কারণ। ভারতে তাঁদের ওপর জুলুম হয়নি। ভারতের সহিষ্ণুতা, অপরকে আত্মসাতের শক্তি তাঁদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু মুসলিম দেশে তাঁদের প্রতি অত্যাচার এবং কঠোরতম শাস্তির দৃষ্টান্ত খুব সামান্য নয়। "কখনো আমি মরুহরিণের রাখাল, কখনো খ্রীস্টান সাধু, কখনো জরথুস্ট্রীয়। আমার পরম ভালবাসার পাত্র তিনজন। কিন্তু তারা একজনই। তিনের মধ্যে এক।" (ইব্‌ন্ আল আরাবি) এমন কথা বললে সনাতনপন্থী ইসলাম তা বরদাস্ত করতেই পারে না। এ-যুগের ঠাকুর পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ'-এর প্রতিধ্বনি। আরাবির আরেকটি উক্তিতেও রামকৃষ্ণদেবের প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। "সুফি তিনটি 'আমি'কে ত্যাগ করেছে। 'আমার জন্য' বললে যে-আমি বোঝায় তাকে, 'আমার সঙ্গে' বললে যে-আমি বোঝায় তাকে এবং 'আমার সম্পত্তি' বললে যে-আমি বোঝায় তাকে।" নাখ্‌শ্‌বান্দী গোষ্ঠীর সুফিগুরু বাহাউদ্দিন বলেছেন ঃ "যা বহু ভাবছ, তা এক। যা ভাবছ সহজ, তা জটিল। যাকে জটিল ভাবছ, তা সহজ।" আবার রামকৃষ্ণদেবকে মনে পড়ে যায়।

বাংলার বাউলের এই গানটিতে সুফিচিন্তার সর্বধর্মসমন্বয়কারী দিকটি লক্ষ্য করা যাবে।

"রাম কী রহিম করিম কালুল্লা কালা।
যারে মা ফাতেমা বলি
তিনিই হলেন দুর্গা কালী
তাঁর পুত্র কার্ত্তিক গণেশ গো।
যেন হাসান-হোসেন মদিনায় করেন খেলা।।"

বোঝাই যায়, নিরক্ষর বাউলের রচনা। কিন্তু এই গানে আরাবি এবং বাহাউদ্দিনের তত্ত্ব ছাপ ফেলেছে। তবে নিরক্ষরতা-সাক্ষরতার প্রশ্নে মনে পড়ে যায় রুমির এই প্রখ্যাত উক্তি ঃ

"সুফির কেতাব সাক্ষরতা নয় কিংবা অক্ষরও নয়। তা হলো প্রকৃত বোধ বা আক্‌ল্ (আক্‌ল্ থেকে 'আক্কেল' এসেছে)।" বৈষ্ণব সহজিয়াসাধনার মধ্যেও এই সহজতার সুর শোনা যাবে। তাঁদের মতো সুফিরাও তাঁদের তত্ত্ব প্রচার করেছেন কখনো কবিতায়, কখনো গল্পে, কখনো নৃত্যগীতের মাধ্যমে। এসম্পর্কে গাজ্জালীর একটি গল্প বেশ মজার। "এক শিষ্য সুফিগুরুর কাছে সুফিনৃত্যে যোগ দেবার অনুমতি চেয়েছিল। গুরু বললেন, তিনদিন নির্জলা উপবাস কর। তারপর উৎকৃষ্ট আহার্য প্রস্তুত কর। তারপর সেই আহার্য এবং নৃত্যের মধ্যে নৃত্যকে যদি বেছে নিতে পার, তবে তুমি অনুমতি পাবে।"

সুফির আহার সম্পর্কে হারিস মুহাসিবি নামে সুফি দার্শনিক বলেছেন ঃ "যদি কোন সুফি দরবেশকে আপ্যায়িত করতে চাও, মনে রেখো, শুকনো রুটিই তাঁর জন্য যথেষ্ট।"

হাসান বসরী বলেছেন ঃ "একদিন তাপসী রাবেয়াকে দেখতে গেলাম। দেখলাম, একদল জন্তু-পরিবৃতা হয়ে তিনি বসে আছেন। কাছে যেতেই জন্তুরা পালিয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এ কী রাবেয়া! তোমায় ওরা ভয় করছিল না। অথচ আমাকে দেখেই যে পালিয়ে গেল।' রাবেয়া বললেন, 'মূর্খ হাসান! তুমি যে মাংস খাও। কিন্তু শুকনো রুটি ছাড়া আমি কিছু খাই না।' "

দার্শনিক আবু সাইদ বলেছেন ঃ "সুফি হওয়া সহজ নয়। সুফি হতে গেলে তোমার মাথার ভেতর যা আছে ফেলে এস। ফেলে এস কল্পিত সত্যকে। পরিত্যাগ কর পূর্বসংস্কার এবং শর্তাবলী। সুফি হতে গেলে যা সব ঘটবে, তার মোকাবিলার জন্য তৈরি হও আগে।"

তাপসী রাবেয়ার প্রার্থনা ঃ "হে প্রভু! যদি আমি নরকের ভয়ে তোমাকে চাই, আমাকে নরকে নিক্ষেপ কর। যদি স্বর্গলাভের বাসনা থেকে তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করি, তাহলে স্বর্গ আমাকে দিও না।" কারণ তাঁর কামনার বস্তু মীরার মতোই—ঈশ্বর।

রাবেয়া ছিলেন এক ক্রীতদাসী নিগ্রো যুবতী। কাজুইনবাসী ধর্মগুরু সালিহ্-এর কাছে একদিন উপদেশ নিতে গেছেন। সালিহ্ বললেন ঃ "তাঁর দরজায় ক্রমাগত করাঘাত কর, দরজা খুলে যাবে।" রাবেয়া বললেন ঃ "কী আশ্চর্য! দরজা তো তাঁর সতত উন্মুক্ত।..."

সুফি হাকিম জামি বলেছেন ঃ "বুদ্ধি এবং শিক্ষাদীক্ষার পেছনে হন্যে হয়ো না। বুদ্ধি এক হয়রানি, শিক্ষাদীক্ষা নির্বুদ্ধিতা। শুধু বল, আমি কে?" আত্মানং বিদ্ধি।

মনসুর হাল্লাজ, যিনি সুফিকুলশ্রেষ্ঠ এবং পরমতত্ত্বের নির্ভীক প্রবক্তা, যখন শূলবিদ্ধ অবস্থায় শাস্তিভোগ করছেন, তখনও তিনি বলছেন ঃ "আমাল হক্।" আমিই ঈশ্বর। সোঽহম্! যখন তাঁর ওষ্ঠ ছেদন করা হলো, তখন কণ্ঠমূলে তিনি উচ্চারণ করছেন, সোঽহম্। যখন তাঁর কণ্ঠমূল বিদ্ধ হলো, তখন তাঁর চেতনায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আমাল হক্। সোঽহম্।

ই. জি. ব্রাউনি 'A Literary History of Persia' (London, 1909, p. 442) গ্রন্থে বলেছেন ঃ "সুফিচরিত্র কী প্রবল ভাবাবেগদীপ্ত!" "...So different from the cold and bloodless theories of the Indian Philosophies !" সুফিরা নিশ্চয় ভাবাবেগদীপ্ত ছিলেন। তবে ভারতীয় দর্শনের আপাতশীতলতা ও রক্তশূন্যতার আবরণ ভেদ করতে পারলে ব্রাউনি সাহেব দেখতেন সুফিদর্শন ও ভারতীয় দর্শন—বিশেষ করে ভক্তিবাদ এবং বেদান্তে কী অসামান্য মিল এবং বেদান্তদর্শন এক অত্যুজ্জ্বল অগ্নিশিখা—যার উত্তাপ সকলের সহনীয় নয়।* □

পাদটীকা

১ ওমরের কবিতার মূলানুগ অনুবাদ রবার্ট গ্রেভস করেছেন ১৯৬৭ সালে ওমর আলি শাহের সহযোগিতায়। সুফিদর্শন বুঝতে বইটি সাহায্য করে। প্রকাশকের নাম মনে নেই।

২ মিশরীয় কিংবদন্তী সাধু হার্মিস ছিলেন রাখালদের গুরু। চোরেরাও তাঁকে গুরু বলে মানত। গ্রীসে ইনি হন দেবাদিদেব। তবে মিশরেও পরবর্তী সময়ে তিনি দেবতা '[illegible]' হয়ে ওঠেন। রোমানরা হার্মিসকে বুধগ্রহ মনে করত। হার্মিস থেকে হার্মিট শব্দ এসেছে। নির্জনে তপস্যারত সাধু বোঝায়।

৩ 'রামায়ণ'-এর পুষ্পক বিমান এবং 'মহাভারত'-এর ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপত-অস্ত্র, নারায়ণ-অস্ত্র, ব্রহ্মশিরাস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে আধুনিককালের বিমান এবং তেজস্ক্রিয়-অস্ত্রের প্রভূত মিল আছে। বস্তুত, রামায়ণ-মহাভারতে ঐসব আকাশযান বা অস্ত্রের গঠনগত ও প্রায়োগিক বৃত্তান্ত শুধু উল্লেখেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, রীতিমতো বিস্তারিতভাবে বর্ণিতও হয়েছে, যে-বর্ণনা আবার আধুনিক সমরশস্ত্র-কৌশলের খুব কাছাকাছি। পুষ্পকরথের রামায়ণ-বর্ণিত গতিপথের সঙ্গে আধুনিক বিমানের উড়ানপথের আশ্চর্য ভৌগোলিক সৌসাদৃশ্য বিস্ময়কর। তাই ভারতীয় 'ইতিহাস'-এর ঐসব বর্ণনাকে ঐতিহাসিক সত্য না-বলে শুধুই কল্পনার সৃষ্টি বলাটাই বোধহয় কষ্টকল্পনা। এবিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ সদর্থক গবেষণাও বহু হয়েছে এবং হচ্ছে।—সম্পাদক

* ৮৫ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

উপনিষদে ভক্তিবাদ

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনা মূলত গঙ্গার পাবনী ধারার মতো ত্রিপথগা। এই তিনটি পথ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি নামে পরিচিত। কোন কোন স্থলে এই তিনটিকে ত্রিবিধ যোগরূপে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। যেমন শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্বয়ং ভগবান বলেছেন ঃ

"যোগস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও আমরা মুখ্যত এই ত্রিবিধ যোগেরই বিস্তৃত বিবরণ পাই। অষ্টাদশ অধ্যায়াত্মক এই গীতাকে অনেকে তিন ষটকে বিভক্ত করে থাকেন অর্থাৎ ছয়-ছয় অধ্যায়ের এক-একটি সমষ্টি, যার প্রথম ছয় অধ্যায়ে আছে কর্মযোগের বিবরণ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তিযোগের বিবরণ এবং শেষের ছয় অধ্যায়—ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত জ্ঞানযোগের বিবরণ। প্রখ্যাত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শ্রীমন্‌ মধুসূদন সরস্বতী তাঁর 'গূঢ়ার্থ-দীপিকা' নামক গীতার অনুপম টীকা রচনার প্রারম্ভে ভূমিকারূপে শ্লোকাকারে গীতার মূল বিষয় ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিন ষটকে বিভক্ত গীতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ভক্তি প্রসঙ্গে বড় সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন ঃ

"উভয়ানুগতা সা হি সর্ববিঘ্নাপনোদিনী।
কর্মমিশ্রা চ শুদ্ধা চ জ্ঞানমিশ্রা চ সা ত্রিধা॥" (শ্লোক ঃ ৭)

গীতার প্রারম্ভে প্রথম থেকে ছয় অধ্যায় পর্যন্ত কর্মযোগের কথা এবং শেষে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশে জ্ঞানযোগের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মাঝখানে রাখা হয়েছে ভক্তিযোগকে, সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ের মধ্যে যা নিবদ্ধ। মধুসূদনের মতে ভক্তিযোগকে এই মধ্যবর্তী করে রাখার কারণ এই যে, ভক্তি উভয়েতেই অর্থাৎ কর্ম এবং জ্ঞান—এই দুইয়ের মধ্যেই অনুগত, দুইয়ের সঙ্গেই মিলিত। কারুর সঙ্গেই তার ঝগড়া নেই, বিবাদ-বিসংবাদ নেই—যেমন বিরোধ আছে কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে। কর্মের অপর নাম অজ্ঞান; তাই তার সঙ্গে জ্ঞানের চিরন্তন বিরোধ; যেমন আলো ও অন্ধকারের বিরোধ 'পর্বতবদকম্প্যং'—পর্বতের মতো অটল, অবিকম্প এই বিরোধ—বলেছেন ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁর ঈশ উপনিষদ্‌-ভাষ্যে এবং অন্য নানা স্থলে। তাই তাঁর মতে জ্ঞান ও কর্মের কখনো কোথাও সমুচ্চয় বা সমাহার বা সম্মিলন ঘটতে পারে না, যেমন দিন ও রাত্রি কখনো একত্র সহাবস্থান করতে পারে না। কঠ উপনিষদেও (১।২।৪) যেন এই বিরোধেরই আভাস দেওয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে ঃ

"দূরমেতে বিপরীত বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।।"

কিন্তু ভক্তির সঙ্গে এই দুইয়ের কারুরই বিরোধ নেই। মধুসূদন বলছেন, ভক্তির তাই ত্রিবিধ রূপ ঃ এক, কর্মমিশ্রা অর্থাৎ কর্মের সঙ্গে মিলিতা ভক্তি; দ্বিতীয়, জ্ঞানমিশ্রা অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্গে যুক্তা ভক্তি; আর তৃতীয়, এই দুইয়ের সঙ্গে যেখানে কোন মিশ্রণ বা মিলন নেই, তাই হলো শুদ্ধা ভক্তি যা উভয়-নিরপেক্ষ, স্ব-স্বরূপে অবিমিশ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের কথায় সেই ভক্তিই আসল ভক্তি, যা 'জ্ঞানকর্মাদপাবৃত' অর্থাৎ জ্ঞান এবং কর্ম—এই উভয়ের সংস্পর্শশূন্য, সম্পর্কবর্জিত।

উপনিষদে ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রারম্ভে গীতার আলোচনা অনেকের কাছে অবান্তর মনে হতে পারে, কিন্তু এই আলোচনার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু স্মরণ করাবার জন্য যে, আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত সংস্কৃতি ও সাধনার মূল হলো বেদ এবং সেইজন্যই মনুসংহিতায় বলা হয়েছে ঃ

"বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্।"

বেদ যেমন শ্রুতি, ভগবদ্‌গীতা তেমনি স্মৃতি। স্মৃতি কখনো শ্রুতিবিরোধী হতে পারে না, সর্বদাই তা শ্রুতির অনুগামী বা অনুসারী। তাই গীতাতে যে-তিনটি যোগের কথা বলা হয়েছে, তার মূল কিন্তু আছে শ্রুতিতেই। শ্রুতি বা বেদের তিনটি কাণ্ড—কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনাকাণ্ড। আমরা সাধারণত মনে করি, বেদের শুধুমাত্র দুটি কাণ্ড—কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের মূলে আছে যাগযজ্ঞ, যা বৈদিক মন্ত্রাশ্রিত এবং জ্ঞানকাণ্ডের মূলে আছে বেদের অন্ত্যভাগ—উপনিষদ্, যাকে আমরা সেই কারণেই 'বেদান্ত' নামে অভিহিত করে থাকি। অনেকের তাই ধারণা, উপনিষদে শুধু আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলা হয়েছে, সেখানে ভক্তির কোন স্থানই নেই। ভক্তিবাদ মধ্যযুগে কিছু সন্ত, ভক্ত, মহাজনদের দ্বারা প্রচারিত। পাঞ্জাবে গুরু নানক, বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য, মহারাষ্ট্রে তুকারাম, উত্তর ভারতে সুরদাস, মীরাবাঈ, কবীর, তুলসীদাস, দক্ষিণ ভারতে অলোয়ারগণ প্রভৃতি নানা ভক্তের আবির্ভাবে এই ভক্তিবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে।

উপনিষদেই কিন্তু এই ভক্তিবাদের মূল বিধৃত আছে, তা পরবর্তী কালে সন্তদের দ্বারা পল্লবিত হয়েছে। সেই মূল হলো উপনিষদের উপাসনাকাণ্ড, যা বিভিন্ন বিদ্যার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত গূঢ়ভাবে অনুশীলিত হয়েছে। ভক্তিরই মতো এই উপাসনাকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের মধ্যবর্তী। তাই এই উপাসনাকাণ্ড সেতু বা সংযোজকরূপে কর্মকে জ্ঞানে উত্তীর্ণ করে থাকে। উপাসনা বা ভক্তি তাই অপরিহার্য এবং উপনিষদের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড নিয়ে অনেক আলোচনা এখনো অব্যাহত আছে, বিদেশেও বেদান্ত বা উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, মায়াবাদ ইত্যাদি নিয়ে অনেক গবেষণা ও অনুশীলন হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, কিন্তু উপাসনাকাণ্ড সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন। তার একটি প্রধান কারণ অবশ্য এই যে, উপাসনা অত্যন্ত গুহ্য এবং একান্তভাবে গুরুমুখগম্য ছিল। তাই উপাসকসম্প্রদায়ের বিলোপের ফলে উপাসনারূপ বিদ্যারও বিলোপ

ঘটে গিয়েছে। ভগবান শঙ্করাচার্য জ্ঞানকাণ্ডকে তার যথাযথ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন বটে, কিন্তু উপাসনাকাণ্ড সম্বন্ধে সাধারণের কাছে কিছু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে যাননি, যদিও তিনি নিজে প্রতিষ্ঠিত চার ধামে চারটি মঠেই শ্রীযন্ত্র স্থাপন করে তার পূজা বা উপাসনা নিজেই প্রবর্তন করে গিয়েছেন।

উপাসনার মূলে আছে উপাস্য-উপাসক ভেদ আর জ্ঞানের মূল বা প্রতিষ্ঠা হলো অভেদে। উপাসনার ফলেই এই জ্ঞান জন্মায়। তাই বেদান্তে বারংবার বলা হয়েছে, 'অকৃতোপাস্তি'-র পক্ষে অর্থাৎ যে উপাস্তি বা উপাসনা করেনি তার পক্ষে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের প্রারম্ভেই তাই স্মরণ করিয়েছেন যে, এই ব্রহ্মজ্ঞানের অবসান বা চরম পরিণতি হয় অনুভবে যে-অনুভব এক বাস্তব বস্তুবিষয়ক, কাল্পনিক নয়, "অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানস্য।" আর ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভক্তিসূত্রকার বলেছেন যে, ভক্তি হলো 'সূক্ষ্মতমমনুভবরূপম্'। উপনিষদে 'ভক্তি' শব্দের উল্লেখ বা ব্যবহার করা হয়নি, সেখানে আমরা পাই 'হৃদা' বা 'শ্রদ্ধয়া' প্রভৃতি শব্দ। যেমন কঠ উপনিষদে (২।৩।৯) আত্মোপলব্ধির উপায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।"

ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কোন রূপ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ায় না, যেমন জগতের বাহ্য বিষয়সমূহ এসে উপস্থিত হয়। কারণ, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা কখনো দৃশ্যবস্তু নন, তিনি নিত্যদ্রষ্টা। তিনি বাইরে নন, তিনি অন্তরে। তাই তাঁকে চোখ দিয়ে কেউ দেখতে পায় না। এই কঠ উপনিষদে (২।১।১) অন্যত্র আরেকটি শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

"কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যাগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"

কোন এক বিরল ধীর ব্যক্তি দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে অর্থাৎ অন্তরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তাঁকে দেখে থাকেন, যিনি 'প্রত্যাগাত্মা' বা অন্তরাত্মা।

অন্তরে তাঁকে দেখবার বা জানবার তিনটি করণ বা উপায়—হৃদয়, বুদ্ধি এবং মন। মন দিয়ে আমরা প্রথম তাঁর চিন্তা করতে পারি, তারপর বুদ্ধি বা মনীষা দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চয় করতে পারি, সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি এবং শেষে হৃদয় দিয়ে তাঁকে অন্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে একাত্ম হতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ তাই যথার্থই বলেছেন ঃ

"সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে
তার অন্তরের পরিচয়।"

সুতরাং অন্তরের পরিচয়ের একমাত্র উপায় অন্তর মিশানো বা ''হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব''। এরই নাম ভক্তি। গীতায়ও তাই বারংবার শ্রীভগবান তাঁকে জানবার উপায় হিসাবে এই ভক্তিকেই নির্দেশ করেছেন ঃ

''ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।'' (১৮।৫৫)

বা

''ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।।'' (১১।৫৪)

উপনিষদ্ ভক্তি শব্দের ব্যবহার না করলেও সেই ভক্তিকেই 'হৃদা' বা 'হৃদয়' শব্দের দ্বারা নির্দেশ করেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে সাধনাকে যথার্থ শক্তিশালী ও সফল করার জন্য ''বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া উপনিষদা''—এই তিনটি উপায় অবলম্বন করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে শ্রদ্ধাই এই ভক্তির সূচক, যা ঠিক মধ্যস্থলে এখানেও উল্লিখিত হয়েছে। বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনার প্রক্রিয়া বা technique সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান প্রথম অর্জন করতে হয়, তারপর তার সঙ্গে হৃদয়ের যোগস্থাপন হয় শ্রদ্ধা দ্বারা এবং তার ফলেই তার 'উপনিষদ' বা রহস্য উদ্ঘাটিত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটে থাকে। সুতরাং 'হৃদা' বা 'শ্রদ্ধয়া'—এইসব শব্দের দ্বারা উপনিষদ্ যে ভক্তির কথাই বলেছেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। আর পরবর্তী কালে তো সুস্পষ্টভাবেই এই পরাভক্তির উল্লেখ আমরা দেখতে পাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (৬।২৩) উপসংহারে ঃ

''যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।''

—এই উপনিষদে যে যে বিষয় বলা হলো মহাত্মারা সেইসব বিষয় একমাত্র তার কাছেই প্রকাশ করেন, যার যেমন দেবতাতে তেমনি গুরুতে পরাভক্তি আছে। অর্থাৎ দেবতা ও গুরুর প্রতি পরাভক্তিই এই ঔপনিষদ্ জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। কঠ উপনিষদে যেমন বলা হয়েছে শ্বেতাশ্বতরেও (৪।২০) তারই প্রতিধ্বনি করে একইভাবে বলা হয়েছে ঃ

''ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।''

অতএব হৃদিস্থ বা অন্তরস্থ সেই পরমাত্মাকে 'হৃদা' বা হৃদয় দিয়ে জানা মানেই ভক্তি দিয়ে জানা, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই তদ্গত হয়ে জানা, অনুরাগে ও ভক্তিতে একীভূত হয়ে জানার স্বরূপটি বোঝাতে গিয়ে তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৩।২১) জাগতিক প্রেমের বা অনুরাগের সেই পরম নিবিড় আলিঙ্গনের ছবিটিই যাজ্ঞবল্ক্য তুলে ধরেছেন ঃ

''তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরং তদ্ বা অস্যৈতদাপ্ত-কামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্।''

সুতরাং সেই পরম নিবিড় অনুভব যে একমাত্র গভীর অনুরক্তি বা ভক্তির দ্বারাই সাধ্য, উপনিষদের সর্বত্রই তার ইঙ্গিত বা ইশারা আছে। ভক্তি শব্দের উল্লেখ না থাকলেও সেই পরম প্রেমকেই যে উপনিষদ্ এই মর্ত্য কামের, আমাদের চিরপরিচিত মৈথুনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ভক্তিসূত্রে নারদ তাই ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ "সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা"। উপনিষদে সাধনার পরাকাষ্ঠারূপে এই পরম প্রেম বা ভক্তিকেই উপস্থাপন করা হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে বিঘোষিত হয়েছে যে, সেই মতি বা জ্ঞান বা অনুভব অন্য কোনকিছুর দ্বারাই লভ্য বা প্রাপ্য নয়, তা লাভ করা যেতে পারে শুধুমাত্র তাঁকে অর্থাৎ সেই নিজের আত্মাকে বা পরমাত্মাকে বরণের দ্বারা ঃ

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।"
(কঠ উপনিষদ্, ১।২।২৩)

শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে এর মর্মোদ্ঘাটন করতে গিয়ে অপরূপভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এ হলো আত্মা দিয়ে আত্মাকে চাওয়া। বরণকারী আত্মা নিজের আত্মাকেই লাভ করে থাকে। আর একমাত্র যে নিষ্কাম, সে-ই আত্মাকে বরণ করতে সক্ষম। কামনা থাকলে সে তো অন্যাকে চাইবে, বা বরণ করবে, সেই অনন্য, অভিন্ন আত্মাকে বরণ করা তার পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না। শঙ্কর বলছেন ঃ "নিষ্কামশ্চাত্মানমেব প্রার্থয়তে; আত্মনৈবাত্মা লভ্যতে ইত্যর্থঃ।" অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা যদি আমরা গ্রহণ নাও করি, দ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতেও পাই সেই একই কথা অর্থাৎ 'এষঃ' বা এই পরমাত্মা বা ভগবান 'যম্' যাকে অর্থাৎ যে-জীবাত্মাকে বরণ করেন, আপন বলে গ্রহণ করেন—একমাত্র সেই তাঁকে পায়। সুতরাং তাঁকে পায় বা নিজেকে পায়—যেভাবেই বলি, মূলে কিন্তু আছে 'বরণ'—সর্বতোভাবে তাঁকে গ্রহণ, সম্পূর্ণ সমর্পণ, যার অপর নাম 'ভক্তি'।

এখন উপনিষদে উপাসনা বা ভক্তিসাধনার ক্রমটি বিশদভাবে আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রধানত অবলম্বন করতে হবে ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌কে, কারণ একমাত্র এই উপনিষদেই প্রায় সমস্ত বিদ্যা বা উপাসনার ধারা ক্রমানুসারে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, উপনিষদে 'বিদ্যা' শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত বা প্রযুক্ত হয়েছে—এক, বিশুদ্ধ জ্ঞান, যা কোথাও কোথাও পরাবিদ্যা নামে উল্লেখ করা হয়েছে—"যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"—যার দ্বারা সেই অক্ষরস্বরূপকে বা ব্রহ্মকে জানা যায়। আর দ্বিতীয় হলো উপাসনারূপ বিজ্ঞান বা প্রক্রিয়া, যার মধ্যে উপলব্ধিরূপ জ্ঞান এবং তার জন্য প্রয়াস বা ক্রিয়া উভয়ই সমবেত বা সংযুক্ত হয়ে আছে। এই দৃষ্টিতেই ঈশ উপনিষদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই দুইকে মিলিয়ে বা সমুচ্চিত করে অমৃতত্বলাভের জন্য প্রয়াসী হতে ঃ

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।।" (শ্লোক ঃ ১১)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের কখনো কোন সমুচ্চয় বা সংমিশ্রণ হতে পারে না, কারণ এখানে বিদ্যা বলতে যে বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বোঝায়, তার সম্পূর্ণ বিপরীত বা বিরুদ্ধ হলো অবিদ্যা, যার অপর নাম কর্ম। শঙ্করাচার্য তাই ঈশ উপনিষদের এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ করেছেন দেবতাজ্ঞান অর্থাৎ যে-দেবতার আমরা উপাসনা বা আরাধনা করি, তার জ্ঞান; এবং 'অবিদ্যা' বলতে তাঁর মতে বোঝায় সেই দেবতাবিষয়ক কর্ম, পূজার্চনা, যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদি। উপাসনা তখনই সার্থক হয় যখন আমরা যাঁকে উপাসনা করছি তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি অর্থাৎ অন্ধের মতো কিছু না বুঝে বা যান্ত্রিকভাবে পূজাদি ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান না করে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করে সজ্ঞানে সেই দেবতার উপাসনা করি।

উপাস্য এই দেবতাটি কে? উপনিষদ্ তারও পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে ঃ

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপসু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ২।১৭)

এই দেবতা কোন সুদূর স্বর্গে অবস্থিত নন, তিনি এই বিশ্বভুবনে সর্বত্র অনুস্যূত বা আবিষ্ট বা প্রবিষ্ট। দার্শনিক পরিভাষায়, তিনি সর্বানুগ বা 'immanent', সর্বাতিগ বা 'transcendent' নন। ভক্তি বা অনুরক্তিরূপ উপাসনা দ্বারা আমরা যাঁকে পেতে চাই তিনি সগুণ ঈশ্বর, নির্গুণ ব্রহ্ম নন। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই বিদ্যা ও অবিদ্যাকে, জ্ঞান ও কর্মকে মিলিয়ে উপাসনার কথা যে-উপনিষদে বলা হয়েছে তার নাম ঈশ উপনিষদ্, যেখানে একমাত্র ঈশের দ্বারা সবকিছু ব্যাপ্ত—এই অনুভবে জাগ্রত হওয়ার উপদেশ সর্বপ্রথমেই উদ্ঘোষিত হয়েছে। এখানে ব্রহ্ম বা আত্মার কথা বলা হয়নি, যা অন্যত্র সব উপনিষদে বলা হয়েছে, কিন্তু 'ঈশ' বা ঈশ্বরকেই বা সগুণ ব্রহ্মকেই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঈশ উপনিষদের উপসংহারেও আমরা তিন দেবতার কাছে শরণাগতির জন্য নির্দেশ দেখতে পাই—এক. সূর্য বা পূষণ; দুই. বায়ু; আর তিন, অগ্নি। একজন পৃথিবীর, একজন অন্তরীক্ষের, আর অপরজন দ্যুলোকের অধিষ্ঠাতা। এই তিন ভুবনে অধিষ্ঠিত বা অনুস্যূত দেবতাকেই এখানে ভক্তি বা উপাসনার দ্বারা, আকুল প্রার্থনার দ্বারা উপলব্ধির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। "সত্যের মুখ খুলে দাও, আবরণ অপসারণ কর, আমাকে সুপথে নিয়ে চল"—এই এখানকার প্রার্থনা। এখানে ধ্যেয় ব্রহ্মেরই উপাসনা, জ্ঞেয় ব্রহ্মের ধারণা বা উপলব্ধি ভক্তের বা উপাসকের লক্ষ্য নয়।

ভক্তি বা উপাসনামার্গে তাই অশেষ কল্যাণ গুণের যিনি করুণালয়, সেই 'অশেষগুণম্'-এরই আরাধনা, 'গুণহীনম্'-এর নয়—তা তিনি শিবই হোন বা বিষ্ণু বা কৃষ্ণই হোন। মহাকবি কালিদাসকেও আমরা দেখি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর প্রারম্ভে শিবের অষ্টমূর্তিতে প্রত্যক্ষ বা প্রকটমূর্তির কাছে প্রার্থনা জানাতে ঃ

"প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ।"

তেমনি আরেকটি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে উপাসনা বা ভক্তিধারার। তা হলো, সর্বত্র সশক্তিক দেবতার উপাসনা বা যুগলের উপাসনা—তা সে রাধা-কৃষ্ণরূপেই হোক, সীতা-রামরূপেই হোক অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণ বা গৌরী-শঙ্কররূপেই হোক। সেই রসতমস্বরূপকে লাভ করতে হলে মিথুনের বা যুগলের আরাধনার মধ্য দিয়েই লাভ করতে হয়। কালিদাস এরও ইঙ্গিত দিয়েছেন যখন "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ"—বাক্ ও অর্থের মতো অবিনাভাবে সম্পৃক্ত বা সংযুক্ত "জগতঃ পিতরৌ"—"পার্বতীপরমেশ্বরৌ"-কে রঘুবংশের প্রারম্ভে বন্দনা করেন।

এর উৎস কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদেই আমরা প্রথম খুঁজে পাই, যেখানে প্রারম্ভেই বলা হয়েছে সেই পরম তত্ত্বের বা ওঁকারের তিনটি বিভাবের কথা ঃ

"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ।" (১।১।৩)

আবার,

"তদ্ বা এতন্ মিথুনং যদ্ বাক্ চ প্রাণশ্চ, ঋক্ চ সাম চ।" (১।১।৫)

এবং সর্বশেষে

"তদ্ বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং যদ্ধি কিঞ্চানুজানাত্যোমিত্যেব তদাহ। এষো এব সমৃদ্ধির্যদনুজ্ঞা।" (১।১।৮)

অর্থাৎ মূলে, পরম স্বরূপে তিনি রসতম, অষ্টম; যিনি সৃষ্টির সপ্তস্তরের ঊর্ধ্বে নিত্য বিরাজমান। তারপরই তিনি মিথুন বা যুগল—বাক্ এবং প্রাণের, ঋক্ এবং সামের। সবশেষে তিনিই হচ্ছেন অনুজ্ঞারূপিণী, যাঁর অনুজ্ঞা বা সম্মতি নিয়ে, যাঁর ইচ্ছার ইঙ্গিতে সৃষ্টির এই অনন্ত সমৃদ্ধি প্রবাহিত বা প্রকাশিত।

অতএব ভক্তি বা উপাসনামার্গের যে-নির্দেশ আমরা উপনিষদে, বিশেষ করে সমস্ত বিদ্যা বা উপাসনার আকর ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই, সেখানে পরম তত্ত্বকে সবকিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্তরূপে উপলব্ধিরই বর্ণনা দেখতে পাই। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (৩।১৪।১)—এই হলো এখানকার মহামন্ত্র। তিনি হলেন "সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তো" (৩।১৪।৪)—সবকিছুকে সর্বতোভাবে আদান বা গ্রহণ করে, সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে বিরাজমান। এখানে 'নেতি নেতি'র পথ নয়, সবই 'ইতি ইতি'-রূপে সর্বানুস্যূতরূপে দেখার পথ, বিশ্বরূপে যিনি বিরাজমান তাঁকে জানার পথ। এখানে ব্যক্তের উপাসনা, অব্যক্তের নয়। ভক্তের কাছে তিনি concrete of concretes, বাস্তবের চেয়েও বাস্তব, abstract বা অবাস্তব নন। উপনিষদ্ তাই অতি সুস্পষ্টভাবে ভক্তির বা উপাসনার ধ্যেয় বা লক্ষ্যকে নির্দেশ করে দিয়েছেন।

আর দ্বিতীয় যেটি নির্দেশ করেছেন, সেটি হলো এই সাধনার ক্রমিকতা। জ্ঞানের পথ হলো অক্রমের পথ, সদ্যোমুক্তির পথ। যে-ক্ষণে জ্ঞান হলো, সেই ক্ষণেই তার প্রাপ্তি বা মুক্তি—"অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" (কঠ উপনিষদ্, ২।৩।১৪)। এখানে আর কোন কালের ব্যবধান নেই। আর উপাসনা বা ভক্তির পথে "এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি"। এখান থেকে প্রয়াণের পর কালক্রমে, ভবিষ্যতে প্রাপ্তি। তাই এটি ক্রমমুক্তির পথ, সোপান-

আরোহণক্রমে যেমন যেমন উপাসনা, ভক্তি, অনুরক্তি গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয় তেমন তেমন নিবিড় থেকে নিবিড়তর প্রাপ্তি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বিবিধ বিদ্যার পরিচয়দানের মাধ্যমে এই ভক্তিসাধনার বা উপাসনার ক্রমটি বড় সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। প্রথম যে-বিদ্যাটি দিয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের আরম্ভ, তার নাম উদ্‌গীথবিদ্যা। নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং সে-তাৎপর্য উপনিষদ্ নিজেই উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন শব্দটির অক্ষরগুলির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। 'উদ্‌গীথ' শব্দটির তিনটি অংশ ঃ উৎ-গী-থ। এখানে 'উৎ' অক্ষরটির অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা হলো উত্থান বা ওপরে ওঠা। 'গী' অক্ষরটি বোঝায় বাক্‌কে বা শব্দকে বা গানকে। আর শেষ 'থ'টি ইঙ্গিত করছে স্থিতিকে বা অবস্থানকে। সুতরাং সমগ্র 'উদ্‌গীথ' শব্দটির অর্থ দাঁড়াল—যে-শব্দ বা গান মানুষকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় এবং সেখানে স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। ইংরেজীতে এটির অনুবাদ করলে দাঁড়াবে ঃ The uplifting music by which one is stationed there.

ভক্তিসাধনায় কীর্তন বা নামগানের স্থান সর্বোপরি রাখা হয়েছে। সে কীর্তন মানুষকে ঊর্ধ্বে উন্নীত করে, শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয় এবং সেইখানে সাধককে বা ভক্তকে স্থিত করে। সেই কীর্তনেরই মূল রূপের ইঙ্গিত পাই আমরা উপনিষদে এই উদ্‌গীথের মধ্যে। উদ্‌গীথ হলো সামের সার, যে-সাম আবার ঋকের ছন্দোময়ী বাণীর সার—"ঋচঃ সাম রসঃ, সাম্ন উদ্‌গীথো রসঃ।" প্রথমে ছন্দের আশ্রয় নিতে হয় 'ঋকে', ছন্দ থেকে উঠতে হয় সুরে বা গানে অর্থাৎ 'সামে', আবার সাম থেকে শেষে গিয়ে পৌঁছাতে হয় 'উদ্‌গীথে' বা উদ্‌গানে, যে-গান মানুষকে নিয়ে যায় চেতনার সেই ঊর্ধ্বভূমিতে এবং সেখানেই তার অবস্থানকে সুনিশ্চিত করে। পরবর্তী কালে ভক্তিসাধনার যে নবধা বিভাগ দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে—"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ।" উপনিষদেই যে তার মূল তা সুস্পষ্টভাবে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যখন বলা হয়েছে যে, ওঁকারকে প্রথম 'শোনানো', তারপর 'শংসন' বা কথন এবং শেষে উচ্চৈঃস্বরে গান বা 'কীর্তন' ঃ

"ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্‌গায়তি।" (১।১।৯)

নবধা ভক্তির আরম্ভ যেমন শ্রবণ-কীর্তনে, অবসান তেমনি আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও শেষ যে-বিদ্যাটির উপস্থাপন করা হয়েছে তার নাম 'দহরবিদ্যা', যেখানে হৃৎপদ্মের গভীর গহন শূন্যতার মাঝে অর্থাৎ সেই হার্দাকাশে প্রবিষ্ট হয়ে সেই পরম স্বরূপের অন্বেষণ, তাঁর সম্বন্ধে বিজিজ্ঞাসা ঃ "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।" (৮।১।১) এই বিদ্যার উপসংহারে যে অসাধারণ মন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে তাতে এই প্রপত্তি বা শরণাগতি বা আত্মনিবেদনের সুরই অপরূপভাবে ঝঙ্কৃত হয়েছে ঃ

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামম্।" (৮।১৩।১)

এখানে ভক্তসাধক একবার 'শ্যাম' থেকে অর্থাৎ সেই ঘন কৃষ্ণ নির্গুণ রূপ থেকে 'শবল' বা চিত্রবিচিত্র, নানাবর্ণে সমুজ্জ্বল সগুণ রূপে প্রপন্ন হচ্ছেন, নিমজ্জিত হচ্ছেন, নিজেকে ঢেলে দিচ্ছেন আত্মনিবেদনের দ্বারা;



আবার সেই 'শবল' থেকে, সগুণ থেকে 'শ্যামে', সেই নির্গুণে ডুব দিচ্ছেন, হারিয়ে ফেলছেন নিজেকে। ভক্তিসাধনার এই হলো চরম উপলব্ধি, পরম প্রাপ্তি—একবার নির্গুণ থেকে সগুণে, আবার সগুণ থেকে নির্গুণে বারংবার আত্মনিমজ্জন। এই সমাহার বা সম্মিলন "উভয়ং সহ"—দুই প্রান্তেই সহজ গতাগতি, যা পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সাধনায় রাধার মধ্যে কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণের মধ্যে রাধার অন্যোন্য সম্প্রবেশ বা সম্মিলনের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদে সমস্ত বিদ্যার উপসংহারে চরম ফল বা উপলব্ধির এই বর্ণনায় তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

বিদ্যা, উপাসনা বা ভক্তিসাধনার উপক্রম এবং উপসংহারের যে-পরিচয় আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদ্ থেকে লাভ করলাম, তার থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, পরবর্তী কালে নবধা ভক্তির যে-ক্রম বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রে উপস্থাপিত হয়েছে, তার বীজ বা মূল এই উপনিষদেই নিহিত। সমস্ত বিদ্যাগুলির আলোচনা এখানে সম্ভবও নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। তবে তাঁর ক্রমিকতা কয়েকটি বিদ্যায় পর পর উপস্থাপনরীতির একটু বিশ্লেষণ করলে আপনিই যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ভক্তিসাধনা হলো ভাবভিত্তিক, হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অনুভবমূলক। এই ভাব বা অনুভব যেমন যেমন গাঢ় হয়, গভীর হয়, তেমন তেমন চেতনা যেন এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উন্নীত হতে থাকে। ভক্তিসাধনায় এই ক্রমিকতা যেমন হৃদ্য তেমনি আস্বাদ্য। এখানে 'ততো ভূয়ঃ' 'ততো ভূয়ঃ'—তার চেয়েও বেশি, তার চেয়েও বড় বা ব্যাপক—এই ক্রম ধরে এগিয়ে যেতে যেতে শেষে ভূমায় অর্থাৎ সবচেয়ে ব্যাপক বা বিস্তৃত সেই মহাব্যাপ্তির মধ্যে ব্রহ্মচেতনায় গিয়ে পৌঁছানো, যা ছান্দোগ্যর সপ্তম অধ্যায়ে নারদ-সনৎকুমার সংবাদের মধ্য দিয়ে ছাব্বিশটি খণ্ডের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

সেখানে গিয়ে পৌঁছালে এই মহানুভূতি, সকলানুভূতি জেগে ওঠে যে, ওপরে নিচে, পিছনে সামনে, ডাইনে বামে সর্বত্র 'সে'। পরক্ষণেই উপলব্ধি হয়, সর্বত্রই 'আমি'। শেষে 'সে' আর 'আমি' যখন মিলে যায় তখন দেখি যে আত্মাই সর্বত্র বিরাজিত।

"আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বমিতি।" (৭।২৫।২)

সর্বত্র কেবল এই আত্মাই আত্মা—এই উপলব্ধি যাঁর জাগে তাঁর শুধু আত্মাতেই রতি, আত্মাকে নিয়েই খেলা, আত্মাতেই তাঁর রমণ, আত্মাতেই তাঁর আনন্দ।

"স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" (৭।২৫।২)

পরবর্তী কালে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের যে-রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে তা এই আত্মক্রীড়া, আত্মমিথুনেরই বাস্তব রূপমাত্র এবং সেইজন্য সেইসব স্থলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে নানাভাবে, যেমন "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ" অথবা "রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব।" এখানে নিজের প্রতিবিম্ব নিয়েই নিজের খেলা, অন্য বা অপর কেউ নিজের

থেকে আলাদা বলে এখানে নেই। একেই বলে ভূমা বা সর্বব্যাপক—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা" (৭।২৪।১)—যেখানে অন্য বলে কিছু দেখে না, অন্য বলে কিছু শোনে না, অন্য বলে কিছু জানে না। এই অন্যত্ব ঘুচিয়ে অনন্য হওয়া, একাত্ম হওয়াই ভক্তির চরম লক্ষ্য, যার ঔপনিষদ্ নাম হলো ভূমা। আর সেই ভূমাই হলো সুখ বা আনন্দের পারাবার, সেই ভূমাই হলো অমৃত। আর আমরা যারা "অল্প লইয়া থাকি" তারা কেবল অন্যকেই দেখি, অন্যকেই শুনি, অন্যকেই জানি অর্থাৎ নিজের থেকে আলাদা করে আমাদের সবকিছু দেখা শোনা, জানা। আর তাই আমাদের সুখ নেই, দুঃখের শেষ নেই, কারণ "নাল্পে সুখমস্তি।"

ভক্তিসাধনার লক্ষ্য হলো এই আনন্দ, এই রসের উপলব্ধি। চিৎ বা জ্ঞান, সৎ বা সত্তামাত্র তার লক্ষ্য নয়, যদিও সেই পরম সৎই যখন চরম চিৎ বা বোধের মধ্যে ধরা দেন তখনই এই অপার আনন্দের—ভূমানন্দের অভিব্যক্তি ঘটে; কারণ, সচ্চিদানন্দ এক অখণ্ড অবিভাজ্য বস্তু বা তত্ত্ব। যে সৎ সেই চিৎ এবং সেই আনন্দ। তবে লক্ষ্য বা আগ্রহ বা ঝোঁক প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ভূমায় সবকিছুর পর্যাবসান দেখিয়ে সেই ভক্তিসাধনার, উপাসনার পরম লক্ষ্যটি সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করেছেন।

আরেকটি বিষয়ও এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার আছে। তা হলো, এখানে বারংবার ব্রহ্মলোকের উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রহ্মের নয়। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মকে পাওয়া নয়, যিনি উপনিষদের ভাষায় "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।" অর্থাৎ অবাঙ্‌মনসগোচর। ভক্ত লাভ করতে চান ব্রহ্মলোক, যেখানে ব্রহ্মকে অবলোকন করা যায়, দেখা যায়, শোনা যায়, ধরা যায় এবং যে-ব্রহ্মলোকের মধ্যে এই সমগ্র বিশ্বের যত লোক আছে—পিতৃলোক, মাতৃলোক, ভ্রাতৃলোক, স্বসৃলোক, সখিলোক অর্থাৎ জাগতিক যতরকম সম্বন্ধের লোক বা অনুভূতির ভূমি বা স্তর আছে সেসবই অন্তর্ভূত বা সমাহৃত। এছাড়াও আমাদের যতরকম কামনা—তা সে গন্ধমাল্যের বা অন্নপানের বা গানবাজনার—গীতবাদিতের বা স্ত্রীলোকের কামনাই হোক, যখন যে-কামনাই হৃদয়ে জাগুক—সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রই সেইসব কামনা তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে থাকে এবং সমস্ত কামনা তাঁর সম্পন্ন বা চরিতার্থ হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি মহীয়ান, পরম মহিমামণ্ডিত হয়ে থাকেন।

"যং যমন্তমভিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে, সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে।" (৮।২।১০)

তাই ব্রহ্মলোক সর্বকামাবাপ্তির ভূমি, ব্রহ্মের মতো অকাম বা নিষ্কামে স্থিতিমাত্র নয়। পরবর্তী কালে ভক্তিসাহিত্যে এই কারণেই আমরা সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ইত্যাদি বিবিধ প্রকার মুক্তির বর্ণনা দেখতে পাই, যার উৎস বা মূল এই ব্রহ্মলোকের কল্পনায়। এখানে ব্রহ্মের মধ্যে নিয়তই তাঁর সঙ্কল্প বা ইচ্ছা সক্রিয় অর্থাৎ তিনি ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে নিত্য সংযুক্ত—শক্তিহীন বা নিষ্ক্রিয় নন। এই ইচ্ছাশক্তির জন্যই তাঁর ঈশ্বরত্ব, অনন্ত ঐশ্বর্যময়ত্ব, ঈশানত্ব, অবাধ নিয়ন্তৃত্ব। পরবর্তী যুগে আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রে এই ইচ্ছাশক্তিকে চেনানো

হয়েছে "ইচ্ছাশক্তিরুমা কুমারী"রূপে। ইনিই সেই উমা হৈমবতী, যার বহুশোভমানা রূপের উল্লেখ আমরা কেন উপনিষদে পাই। ইনিই সেই কৌমারী বা আদ্যাশক্তি, যাঁকে কোথাও পরাবাক্ বা বিমর্শরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথম যে উদ্গীথবিদ্যার প্রসঙ্গে ওঁকারের রসতম, মিথুন ও সমৃদ্ধ—এই তিনটি বিভাবের পরিচয় দিয়ে উপাসনার সূত্রপাত করা হয়েছিল, শেষে এখানে এসে ভূমাবিদ্যার ব্রহ্মালোকের বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার পূর্ণ ছবিটি যেন তুলে ধরা হয়েছে। উদ্গীথ বা কীর্তন বা নামসাধনা দিয়ে ভক্তিপথের উপাসনা প্রথম প্রবর্তিত হয়। তারপর নাম থেকে রূপ ফুটে ওঠে, "নাদ অন্তর্গতং জ্যোতিঃ" প্রকাশ পায়। সেই জ্যোতি বা প্রকাশেরই বা কত গাঢ় থেকে গাঢ়তর রঙ ক্রমশ ফুটে ওঠে! প্রথমে দেখি তার "রোহিতং রূপম্"—রক্তিমাভায় রঞ্জিত রূপ, পরে দেখি তার "শুক্লং ভাঃ"—শুভ্র স্বচ্ছ দীপ্তি, শেষে দেখি তার "নীলং পরঃ কৃষ্ণম্"—গাঢ় নীলিমায় ঘোর কৃষ্ণরূপ, যেন নবনীরদনিন্দিতকান্তি। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, শেষের এই রূপটি সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না, শুধু "অত্যন্তসমাহিতদৃষ্টের্দৃশ্যতে"—যিনি একান্ত সমাহিতদৃষ্টি, নির্নিমেষ নয়নে যিনি এই রূপের পারাবারে নিজেকে নিমজ্জিত করতে পারেন—একমাত্র তাঁরই চোখে পড়ে এই ঘন শ্যামরূপ। সেইজন্যই বলা হয় : "শ্যামমেব পরং রূপম্"। উদ্গীথ বিদ্যার অধ্যাত্মরূপটি যেমন বাগাশ্রিত বা নামাশ্রিত, তার অধিদৈবতরূপটি তেমনি আদিত্যের দিব্য রূপাশ্রিত। তারই আরো বিশদ বিবরণ আমরা পাই মধুবিদ্যায়, যা ছান্দোগ্যের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত। সেই অধ্যায়েই আমরা আরো পাই গায়ত্রীবিদ্যার কথা, যার গানে হয় ত্রাণ এবং যা আদিত্যের প্রকাশ থেকে নিয়ে যায় অন্তরের সেই আকাশে, যা শক্তিতে পূর্ণ ও অপ্রবর্তি। গায়ত্রীবিদ্যাই শেষে নিয়ে যান শাণ্ডিল্যবিদ্যায়, যেখানে উপলব্ধি করি "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং সেই আত্মা বা ব্রহ্ম হলেন "সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তো।" (৩।১৪।৪)

উপনিষদ্ অবলম্বনে ভক্তিবাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় অন্তত সুপরিস্ফুট যে, ভক্তি কোন নতুন ধারণা বা চিন্তাধারা নয়, যা একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে যেন প্রবর্তিত এবং তদনন্তর সমাদৃত হয়ে আসছে। এর উৎস বা বীজ এক হিসাবে বৈদিক কর্মকাণ্ডে বা যাগযজ্ঞের মধ্যেই নিহিত, যেখানে দেবতার উদ্দেশে তাঁর প্রাপ্য 'ভাগ' হবিরূপে উৎসর্গ করা হয়। প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর একটি বিশিষ্ট মরমী লেখায় অপরূপভাবে 'ভক্তি' শব্দটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, 'ভক্তি' শব্দের মৌলিক অর্থ হলো 'ভাগ'; যেমন, উদ্গীথকে বলা হয় সামভক্তি বা সামের একটি ভাগ বা অংশ। আর দেবতাকে তাঁর এই 'ভাগ' যে দান করে সেই হলো 'ভক্ত'। ভক্তের এই দানের মূলে থাকে তার প্রেম বা অনুরাগ। সেইজন্যই প্রেমী বা অনুরাগীকে আমরা এখন ভক্ত বলে থাকি। ভগবানকে যে যতটা দিতে পারে তারই ওপর নির্ভর করে তাঁর কাছ থেকে কতটা সে নিতে পারবে এবং আমরা যতটা নিতে পারব ততটাই দিয়ে থাকেন তিনি।

তবে সবটাই নির্ধারিত হয় 'আমাদের' আমরা কতটা দান বা উৎসর্গ করতে পারলাম তার ওপর। সুতরাং যজ্ঞভাবনা বা তার অন্তর্নিহিত উৎসর্গভাবনার মধ্যেই, 'ভাগ' দেওয়ার মধ্যেই ভক্তির জন্ম। তাই বেদ বা উপনিষদ্ই ভক্তির মূল ভিত্তি, ভক্তি কোন আধুনিক বা অর্বাচীন মতবাদ নয়। কুমারস্বামী লিখছেন ঃ

"One of the strangest controversies in the history of Orientalism turned upon the 'origin of *bhakti*', as if devotion had at some given moment been a new idea and thenceforth a fashionable one. It would have been simpler to observe that the word *bhakti* means primarily a given share, and therefore also the devotion or love that all liberality presupposes ; and so inasmuch as one 'gives God his share' *(bhagam)* i.e. sacrifices, one is his *bhakta.* Thus in the hymn, 'if thou givest me my share' amounts to saying 'If thou lovest me'... God gives as much as we can take of him, and that depends on how much of 'ourselves' we have given up."

(দ্রঃ Hinduism and Buddhism, p. 20)

উপসংহারে তাই অবশ্যই ভক্তির উৎস সম্বন্ধে উদ্ভট যে তর্ক বা বিসংবাদ লক্ষ্য করা যায় তার সম্পূর্ণ নিরসন ঘটে যখন 'ভক্তি' শব্দটিরই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে এইভাবে দৃষ্টি দিই। কুমারস্বামী যেমন অপরূপভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, 'ভক্তির' মূল অর্থই হলো 'ভাগ' বা 'অংশ' এবং সেই ভাগ বা অংশ দানের মধ্যেই নিহিত আছে প্রেম বা অনুরক্তি। তেমনি মনে রাখা দরকার, ভক্তির ভিত্তিই হলো এই ভাগ। 'তিনি' এবং 'আমি'—এই বিভাগের ওপরই ভক্তি প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিষয়, আমি আশ্রয়। ভক্তি আমাতে আশ্রিত, আমার মধ্যে নিহিত। আর সে-ভক্তির বিষয়, অবলম্বন হলেন তিনি। তাঁকে ঘিরেই আমার ভক্তি। সঙ্গে সঙ্গে এটিও মনে রাখা দরকার যে, এই বিভাগ কিন্তু সেই একেরই বিভাগ। তিনিই নিজেকে এই দুই অংশে বিভক্ত করেছেন—"স... আত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১।৪।৩) এবং যেহেতু তা নিজেরই দ্বিধাকরণ, সেই কারণেই সেই দুটি অংশ বা ভাগ আবার একীভূত হবার জন্য এত ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতার নামই ভক্তি বা অনুরক্তি, যা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। "আ পিপীলিকাভ্যঃ মিথুনম্।" সৃষ্টির উর্ধ্বমূল থেকে একেবারে অধোদেশে পিপীলিকা পর্যন্ত সবই মিথুন-আক্রান্ত অর্থাৎ দুইভাগে বিভক্ত। সৃষ্টির সমৃদ্ধি ও ব্যাপ্তির মূলে আছে এই মিথুন বা দ্বিধাভাব এবং এই মিথুনকে অবলম্বন করেই দুইয়ের পরস্পরের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ, অনুরক্তি। ভক্তিকে আশ্রয় করেই আবার সেই রসতমে গিয়ে উপনীত ও মিলিত হওয়া যায়।

একমাত্র উপনিষদেই তাই ভক্তির যথার্থ পরিচয়লাভ করা যায়, মূল খুঁজে পাওয়া যায়। এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।* □

---

* ৯৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

প্রাচীন বঙ্গ-পরিচিতি

অশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিভাগ ও উহার পরিচয়-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে গবেষণার আর অন্ত নাই। বরেন্দ্র, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, হরিকেল, বজ্জ, সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রদ্বীপ, গৌড়, বঙ্গ ইত্যাদি প্রাচীন বঙ্গদেশের বিভাগসমূহ লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন পণ্ডিতদের গভীর গবেষণামূলক আলোচনার ফলে অধুনা প্রাচীনকালের বঙ্গদেশ-বিভাগের উপর যথেষ্ট আলোকপাত হইয়াছে। সকলেই যে একমত তাহা নহে, বরঞ্চ বিভিন্ন পণ্ডিতের মতের বৈষম্যই দেখা যায়, তবুও কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা একমত।

দেশ-বিভাগের পূর্বে উত্তরবঙ্গ বলিতে যাহা বুঝাইত প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন বলিতে মোটামুটি তাহাই বুঝাইত। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ যে-পুণ্ড্রবর্ধন দেখিয়া গিয়াছিলেন তাহা পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্বে করতোয়া নদী দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্র যে দুইটি বিভিন্ন জাতি এবং শেষেরটি প্রয়াগের পূর্বে ও মগধের (দক্ষিণ বিহার) পশ্চিমে বাস করিত, তাহার কোন যুক্তি নাই—বিভিন্ন গুপ্তসম্রাটের শিলালিপি হইতেই বুঝা যায় যে দুইটি একই জাতি। খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুন্ড্র নামটিই পৌণ্ড্র নামে পরিচিত হইয়াছিল। এ-বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। বৈগ্রাম, দামোদরপুর-লিপি হইতে জানা যায় যে, ইহা গুপ্তসম্রাটগণের প্রধান ভুক্তি ছিল। বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলা যে ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা বেশ জোর করিয়াই বলা যায় এবং ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উত্তরোত্তর কালে ইহার সীমানা বিস্তারলাভ করিয়াছে। যেমন, ধর্মপালের খালিমপুর অনুশাসন পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল (বোধহয় ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চল) পুণ্ড্রবর্ধনেরই একটি অংশবিশেষ ছিল। সেনরাজগণের সময়ে খড়িমণ্ডল (বর্তমান খড়িপরগনা, ২৪ পরগনা) ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রিকাণ্ডশেষের সাক্ষ্য-অনুসারে বা সিলিমপুর ও মাধাইনগর লিপি-অনুযায়ী বরেন্দ্রভূমি পুণ্ড্রবর্ধনেরই অংশমাত্র। খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে বারেন্দ্রী পুণ্ড্রবর্ধনের একটি জেলা বলিয়া পরিগণিত হইত। সন্ধ্যাকর নন্দীর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিলে বারেন্দ্রীর সীমানা পশ্চিমে গঙ্গা হইতে পূর্বে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ইহা ধরিয়া লইতে হয়। ইহা হইতে অনুমান করা বিশেষ কষ্টকর হয় না যে, উত্তর-দক্ষিণে বরেন্দ্রভূমির বিস্তার পুণ্ড্রবর্ধন অপেক্ষা অনেক কম ছিল। তাহা হইলেই ডক্টর রায়চৌধুরীর মত (বরেন্দ্রভূমি = অধুনা রাজসাহী-বিভাগ) গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের মতে বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর, রাজসাহী এবং বোধহয় পাবনা জেলা লইয়াই পুরাতন বরেন্দ্রভূমি গঠিত ছিল। বরেন্দ্রভূমির বিভিন্ন স্থানের মধ্যে কান্তাপুর (বর্তমান দিনাজপুর জেলার কান্তনগর) ও নাটারি (বর্তমান রাজসাহী জেলার নাটোর) উল্লেখযোগ্য।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে ভাগীরথীর দক্ষিণভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অজয় নদের উত্তরভাগ পর্যন্ত যে ভূখণ্ড তাহারই প্রাচীন নাম ছিল বজ্জ। অবশ্য কোন কোন সময়ে ইহার উত্তর সীমানা ভাগীরথীকে অতিক্রম করিয়া কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সেন-আমলের পূর্বে ইহা বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু লক্ষ্মণসেনের সময়ে ইহা কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।[১] দীক্ষিতের মতে কঙ্কগ্রামটি বর্তমান কাঁকজোল।[২] লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম অংশ বা বর্তমান কান্দী মহকুমা ইহার অন্তর্গত ছিল। ইহা ছাড়া যে বীরভূম জেলা, সাঁওতাল পরগনা ও কাটোয়ার উত্তরভাগ বজ্জভূমির অন্তর্গত ছিল, সে-বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তামিল-গ্রন্থ 'শিলপ্পধিকারম্'-এ বজ্জের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। টীকাকারের মতে শোণনদীর পার্শ্বে বজ্জের অবস্থিতি এবং উহার চারিধারে অগাধ জলরাশি ছিল। বঙ্গদেশের বজ্জভূমির সহিত তামিল-গ্রন্থে উল্লিখিত বজ্জের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। অশোকের অনুশাসনের বজ্জভূমিকের সহিতও ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। বজ্জের সংস্কৃত শব্দ বজ্র; তাহার অর্থ কঠিন বা বীর। সুতরাং বজ্জভূমি বা বজ্রভূমির অর্থ বীরভূমি বা বীরভূম বলিয়া ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন মহাশয় যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা খুবই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

বজ্জভূমির দক্ষিণভাগে অবস্থিত প্রদেশের নাম ছিল সুহ্ম। কেহ কেহ মনে করেন যে অজয় নদই দুই প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমানা ছিল, কিন্তু ডক্টর রায়চৌধুরী মহাশয় যথাযথভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে অজয় মধ্যবর্তী সীমানা-নির্দেশক ছিল না। খারিই বজ্জ ও সুহ্মের মধ্যবর্তী সীমানাসূচক ছিল।[৩] বিভিন্ন বিভিন্ন শিলালিপি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভূরিশ্রিস্টি (বর্তমান ভূরশুট), নবগ্রাম (হাওড়া এবং হুগলী জেলায়) এবং দামুন্যা (বর্ধমান জেলায় দামোদরের পশ্চিমে) ইহার অন্তর্গত ছিল, ইহার পশ্চিম সীমানা দামোদর ছাড়াইয়া হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতের সভাপর্বে ভীমের দিগ্বিজয়ের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইহার একপ্রান্ত সমুদ্রের অত্যন্ত নিকটে ছিল; সেই প্রান্তটি নিঃসন্দেহে দক্ষিণ প্রান্ত। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মহাভারতের সময়ে তাম্রলিপ্তি সুহ্মভূমির নিকটে ছিল কিন্তু পরবর্তী কালে দণ্ডীর সময়ে (খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে দশকুমারচরিতের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। কপিশা বা কাঁসাই নদী উৎকল ও সুহ্মভূমির মধ্যবর্তী সীমানাসূচক হইলেও হইতে পারে। এই সম্পর্কে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। কালিদাসের সময়েও ইহার দক্ষিণ সীমানা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তবুও ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় কেন যে বলিতেছেন ইহার দক্ষিণ সীমানা রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত, তাহা বিশেষ বুঝা গেল না। কাব্যমীমাংসা, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ বা বৃহৎসংহিতা এই বিষয়ে নূতন কোন আলোকসম্পাত করিতেছে না। ইহা ভারতবর্ষের পূর্বদিকে অবস্থিত এইটুকু মাত্র তাহারা বলিতেছে। তবে ইহাদের মতে তাম্রলিপ্তি সুহ্মের অন্তর্গত ছিল না বোধহয়; কারণ তাহা হইলে নামোল্লেখের মধ্যে সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তি এই দুইটির নাম পৃথক করিয়া হইল কেন? প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, মার্কণ্ডেয়-পুরাণের

ব্রহ্মোত্তর পাঠটি ভুল। পার্জিটারের সুহ্মোৎকলা পাঠটি যদি অগ্রাহ্যও করা যায় তাহা হইলেও মৎস্যপুরাণের সুহ্মোত্তরা পাঠটি শুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতে দোষ কি? যাহা হউক—উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বর্তমান হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, বর্ধমানের বহুলাংশ ও মেদিনীপুরের উত্তরপূর্বাংশ প্রাচীন সুহ্মভূমির অন্তর্গত ছিল।

পরবর্তী কালে (কাহারো মতে দশম শতাব্দীতে, কাহারো মতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে) বজ্জভূমি ও সুহ্মভূমি যথাক্রমে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় এই নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল এবং এই দুইটি মিলিয়াই প্রসিদ্ধ রাঢ়দেশ। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে রাঢ় ও সুহ্ম সমানদেশ-বোধক, কিন্তু এই মতটি অনায়াসেই অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে।

অধুনা পূর্ববঙ্গের একমাত্র উত্তরাংশ ছাড়া প্রায় সমস্তটাই প্রাচীন 'বঙ্গ' এই বিভাগের অন্তর্গত ছিল। এমনকি ইহার পশ্চিম সীমানা মেদিনীপুর জেলার কাঁসাই নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জৈন উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনার মতানুযায়ী তাম্রলিপ্তি বঙ্গেরই একটি নগরী।[৪] অবশ্য পালরাজাদিগের বা সেনরাজাদিগের আমলে ইহার পশ্চিম সীমানা আরো সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে; কারণ তাম্রলিপ্তি বা তমলুক তখন বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এবং বালেশ্বর জেলার কিছু অংশ লইয়া বর্ধমানভুক্তি গঠিত ছিল। তাম্রলিপ্তি যে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নহে এই সম্পর্কে মহাভারতও প্রমাণ। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায় দেশবিভাগের মধ্যে বঙ্গের নামোল্লেখ করেন নাই। বৃহৎসংহিতার মতে ইহা ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে পূর্বদেশের মধ্যে 'রঙ্গেয়' এই নামটি পঠিত আছে। ইহার পাঠ হইবে 'বঙ্গেয়'। পার্জিটার বলিতেছেন যে, ইহা বর্তমান বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও নদীয়াকে লইয়া গঠিত ছিল; কিন্তু তাঁহার মত সমর্থনযোগ্য নহে। ইদিলপুর-অনুশাসন পাঠ করিলে মনে হয় যে, বিক্রমপুর বঙ্গেরই অন্তর্গত ছিল। ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে ইহা ভাগীরথীর পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং বোধহয় চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 'বঙ্গা লৌহিত্যাৎ পূর্বেণ' (লৌহিত্য = ব্রহ্মপুত্র নদ) ইহা যদি একেবারে অস্বীকার করা না যায় তাহা হইলে বলিতে হয যে, ক্রমশ মধ্য বাংলাদেশ ছাড়িয়া পূর্ব বাংলাদেশের দিকেই বঙ্গের সীমানা বিস্তারলাভ করিতেছিল এবং এইসময়ে যশোহর, খুলনা ও ইহাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নাম উপবঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতে থাকে।

অনেক পণ্ডিতের মতে সমতট ও বঙ্গ একই ভূখণ্ডের পরিচায়ক। শেষের নামটির বহুদিন পর্যন্ত প্রচলন ছিল এবং প্রথম নামটি বহুকাল পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে—মাত্র এইটুকু হইল এই দুইটির মধ্যে প্রভেদ। 'সমুদ্রতট-সন্নিকটবর্তী ভূভাগ' ইহাই হইল সমতট শব্দের অর্থ। হিউয়েন সাঙের বিবরণী পাঠ করিলেও ইহা জানিতে পারা যায়। সমতটের বিস্তার পাঁচশত মাইল পরিমিত ছিল. সুতরাং ইহা যে ২৪ পরগনা, খুলনা হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিপুরার পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল, সে-বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। কেন না হিউয়েন সাঙ্ বলিতেছেন যে, ইহার রাজধানী ছিল কর্মান্ত (ত্রিপুরা জেলার বড় কামতা)। ফার্গুসনের মতে সমতটের কেন্দ্র কর্মান্ত নহে—

ঢাকা, ওয়াটারের মতে ফরিদপুর। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে প্রত্যন্ত দেশের মধ্যে সমতটের নামোল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ইহার রাজধানী-সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই।

গৌড়—এই নামটির সহিত বোধহয় সকলেরই পরিচয় আছে। বিশেষত পঞ্চগৌড় শব্দটির সহিত উত্তরবঙ্গের লোকেরা বিশেষভাবে পরিচিত। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে ইহার উল্লেখ আছে যদিও এই সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কৌটিল্য এবং পতঞ্জলিও গৌড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনির কথা বাদ দিলেই কিঞ্চিদধিক খ্রীস্টপূর্ব তিন শতাব্দী হইতেই গৌড়ের খ্যাতি যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এমনকি খ্রীস্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গৌড় বলিতে রাঢ় দেশেরও অনেক অংশ বুঝাইত। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর জৈন লেখকদিগের মতে বর্তমান মালদহের লক্ষ্মণাবতী গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৫] অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়নৃপতির কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা) রাজধানী ছিল ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এইসব হইতে মনে হয় যে, বর্তমান মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং বীরভূম ও বর্ধমান অঞ্চল গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হরিকেলের অবস্থান-সম্পর্কে জোর করিয়া কিছু বলা যাইতে পারে না। ইটসিঙ, রাজশেখর প্রভৃতির মতে ইহা পূর্বভারতের পূর্বসীমানায় অবস্থিত। নোয়াখালি, চট্টগ্রাম অঞ্চল ইহার অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীপ্রমোদলাল পাল মহাশয় সর্বপ্রথম বলেন যে, বর্তমান শ্রীহট্টই পুরাতন হরিকেল. এই সম্পর্কে তিনি মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের দুইটি পাণ্ডুলিপির প্রতি পণ্ডিতগণের আকর্ষণ করেন। কিন্তু ভোজবর্মণের বেলাব-লিপির সাক্ষ্য-অনুযায়ী হরিকেল ট্ট-অঞ্চলে অবস্থিত হইতে পারে না। কাজেই সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে গেলে দুইটি হরিকেলের অস্তিত্ব স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় নাই।

চন্দ্রদ্বীপ-ভূভাগ উল্লিখিত সকলের অপেক্ষা ছোট। এই সম্পর্কে ডক্টর রায়চৌধুরী, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়[৬] যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের আলোচনাও উল্লেখযোগ্য. এইচ. বেভেরিজ তাঁহার 'ডিস্ট্রিক্ট অফ বাখরগঞ্জ' নামক পুস্তকে বলিতেছেন যে, "Chandradvipa was the name of a small principality in the district of which the capital was at first at Kachua and subsequently removed to Madhavpasa." বিশ্বরূপ সেনের মধ্যপাড়া-অনুশাসনের যে অপূর্ণ অংশটি রহিয়া গিয়াছে তাহা 'চন্দ্রদ্বীপ'রূপেই পূরণ করিতে হইবে।

মোটামুটি প্রাচীনকালের বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ-সম্পর্কীয় একটি ছবি খাড়া করা গেল; অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মন এইদিকে আকৃষ্ট হইলে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।* □

পাদটীকা

১ এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, ২১ খণ্ড, পৃঃ ২১৮
২ ঐ. পৃঃ ২১৪
৩ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২
৪ ইন্ডিয়ান এন্টিক্যোয়ারী, ১৮৯১, পৃঃ ৩৭৫
৫ জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৯০৮, পৃঃ ২৮১
৬ ইন্সক্রিপসন্স অফ বেঙ্গল, ৩য় খণ্ড

* ৫৪ বর্ষ. ৪ সংখ্যা

ফরাসীবিপ্লবের দুশো বছর

তরুণ সান্যাল

এক এক দেশের জাতীয় মর্মবস্তু এক এক ধরনের, বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে তিনি বলেছেন ঃ "রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসীজাতির মেরুদণ্ড... কেউ কারুর ওপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পারে না, এইটিই ফরাসী-চরিত্রের মূলমন্ত্র।... [ফরাসীদের ভাব] 'রাজ্যশাসন সামাজিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার'।"[১]

এই মূল্যায়নটি ফরাসীচরিত্র বিষয়ে বিশেষভাবে সত্য হয়ে উঠেছে ফরাসীবিপ্লবের সময় থেকে। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখে পারী শহরের সবচেয়ে নিপীড়িত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র মারমুখী আক্রমণে বাস্তিল দুর্গের পতনের দিন থেকেই ফরাসীবিপ্লবের সূত্রপাত। এ-বছর[২] সে-বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী। পৃথিবীর নানা দেশে ঐ বিপ্লবের তাৎপর্য ও উত্তরাধিকার নিয়ে নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে। খোদ পারী শহরে খুব জাঁকজমক করে ঐ বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। আমাদের দেশেও নানা সভাসমিতির আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী প্রভৃতি দিয়ে ফরাসীবিপ্লবের তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ ঐ যে 'রাজনৈতিক' ও 'সামাজিক স্বাধীনতা'র কথা বলেছেন, সে-বিষয়ে অর্থাৎ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ওপর আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্ব পড়ছে বেশি করে।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কার্যত ঐ বিপ্লবের যুগ। আবার তার প্রতিক্রিয়া ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দ। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের সম্রাট হওয়া, ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের পতন—এই পুরো সময়টা জুড়েই ঐ বিপ্লবের সক্রিয় প্রতিক্রিয়ার নানা ফলাফল প্রত্যক্ষগোচর হয়েছিল। আর ফরাসীরা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে-জনশক্তির সামর্থ্য বুঝতে পেরেছিল, তার নানা প্রকাশ ঘটেছে ফ্রান্সে ১৮৩০, ১৮৪৮, ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের নানান পর্যায়ের বিপ্লবে। (১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপের নানা দেশে, বিশেষভাবে বহুবিভক্ত জার্মানীতে বহু ব্যর্থ বিপ্লবও ঘটে।) ফরাসীজাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এমনই অদম্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে দখলদার নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে লেখক-শিল্পী-কবির পাশাপাশি প্রতিরোধ-সংগ্রামে সাধারণ শ্রমিক, কৃষক অস্ত্রধারণ করেছে। কোন কোন ইতিহাসকার মনে করেছেন, ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে পারীতে যার সূত্রপাত, সেই বিপ্লবের প্রাণশক্তি সীমান্ত পার হয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে গেছে। অসমাপ্ত ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের বাব্যুকপন্থীদের 'সাম্যবাদী' বিপ্লব পূর্ণতায় নিষ্পন্ন করেছে রুশদেশ রাশিয়ার পেট্রগাদে, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৭ নভেম্বর। সে বিপ্লবের প্রভাব-প্রক্রিয়া এখনো চলেছে দেশে দেশে মানুষের সামাজিক মর্যাদা, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী অর্জনের সংগ্রামে।

কেউ কেউ অবশ্য মনে করেছেন, ফরাসীবিপ্লবের কোন উত্তরাধিকারই নেই। যেমন ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার। তাঁর মতে, ফরাসীবিপ্লব শুধু মনে পড়িয়ে দেয় সন্ত্রাসের কথাই, রক্তপাতের কথা, তার বেশি কিছু নয়। তিনি হয়তো মনেই রাখেননি, ব্রিটেনের অলিভার ক্রমোয়েলের নেতৃত্বে পিউরিটান বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা। 'ঈশ্বরের প্রতিনিধি' বলে দাবি করেছিলেন সামন্ত প্রভুদের প্রতিনিধি প্রথম চার্লস। ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল পার্লামেন্ট। সে গৃহযুদ্ধেও যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছিল। এমনকি শেষপর্যন্ত রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর্বে যুদ্ধে পরাস্ত পার্লামেন্ট-বাহিনীর নেতা ক্রমোয়েলের কঙ্কাল কবর থেকে তুলে এনে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রীরা ফাঁসিতে লটকেছিল প্রতিশোধস্পৃহায়। তবে, শেষপর্যন্ত পার্লামেন্টেরই প্রাধান্য মেনে নিতে হয়েছিল ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে 'গৌরবান্বিত বিপ্লবে', যা ছিল না সামন্ত প্রভুদের গৌরবের, অথবা যা ছিল না বিপ্লবও। এমনকি ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের মার্কিন স্বাধীনতা-যুদ্ধেও কম রক্তপাত হয়নি।

রক্তপাত বা সন্ত্রাসের দিকটিই বিপ্লবের মূল বিষয় নয়। এবং বিপ্লব ও রক্তপাত সমার্থকও নয়। শুধু এইটুকুই মনে করিয়ে দেওয়া, ফরাসীবিপ্লবের আগেও রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটেছে, রক্তপাত হয়েছে। ফরাসীবিপ্লবও সেই পথের পথিক। তবে তার গুণগত তাৎপর্য আরো অনেক গভীর ও ব্যাপক। কেননা, ফরাসীবিপ্লবের পথান্বেষণ ছিল নিছক মার্কিনদেশের মতো পররাজ্যের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা অর্জন নয়, বা ব্রিটেনের ক্রমোয়েলপন্থীদের মতো সামন্ত আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়া নয়। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী—লিবার্টি-ইকোয়ালিটি-ফ্রেটারনিটির দাবি, মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেবার দাবি। আর কে না জানে, ফরাসীবিপ্লবই বোধ এনেছিল জাতীয়তার, আধুনিক জাতিগঠনের—যার প্রভাব গোটা মহাদেশীয় ইউরোপে ছড়িয়ে গেছে। ছড়িয়ে গেছে দেশে-দেশান্তরে। স্বামীজী লিখেছেন ঃ "প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারী নগরী হতে ইউরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে। সেইদিন হতে ইউরোপের নতুন মূর্তি হয়েছে। 'এগালিত্তে, লিবার্তে, ফ্রাতের্নিতে'র (Egalite, Liberte, Fraternite—সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্বের) ধ্বনি ফ্রান্স হতে চলে গেছে; ফ্রান্স অন্যভাব, অন্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে, কিন্তু ইউরোপে অন্যান্য জাত এখন সেই ফরাসীবিপ্লব মক্স করছে।"[৩]

ফরাসীবিপ্লবের আগে, ফরাসীসমাজটি ছিল তিনটি বর্গে বিভক্ত—প্রথম বর্গ, দ্বিতীয় বর্গ ও তৃতীয় বর্গ (First Estate, Second Estate, Third Estate)। প্রথম বর্গে ছিল ক্যাথলিক যাজকেরা। দ্বিতীয় বর্গে ছিল ভূম্যধিকারী সামন্তপ্রভুরা। তৃতীয় বর্গে ছিল উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি নানা পেশার মানুষ, কারখানার মালিক, শহুরে মজুর, গ্রামীণ চাষী, কারখানার মজুর প্রভৃতি। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গেরই ছিল সামাজিক অধিকার, সুযোগ-সুবিধা। তৃতীয় বর্গ থেকেই রাষ্ট্র যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করত। রাজা ষোড়শ লুই সাত বছরের যুদ্ধ, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতির জন্য যখন প্রবল

ঋণগ্রস্ত, প্রবল মুদ্রাস্ফীতি যখন ফ্রান্সে, তখন ঐ তিন বর্গের প্রতিনিধিদের সভা ডেকেছিলেন। ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দের পর সেই প্রথম সভা ডাকা হলো। একসঙ্গে তিন বর্গ যাতে না মিলতে পারে, সেজন্য পৃথক পৃথক বর্গের পৃথক পৃথক অধিবেশনের নির্দেশ দিলেন রাজা ষোড়শ লুই। কিন্তু তৃতীয় বর্গের নেতা মিরাবো রাজদূতকে বললেন ঃ "আপনার প্রভুকে বলবেন, জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি, কেবল বেয়নেটই আমাদের নড়াতে পারবে, অন্য কিছু নয়।" শেষপর্যন্ত তৃতীয় বর্গ জাতীয় সভা গঠন করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গের কিছু প্রতিনিধিও তাতে যোগ দেয়। কিন্তু রাজার প্রয়োজন কর-হার বৃদ্ধি। যাজক বা মঠপ্রভুরা বা সামন্তদের ওপর কর না বসিয়ে তৃতীয় বর্গের ওপর কর বসাবার জন্য অর্থমন্ত্রী নেকর-এর ওপর রাজাজ্ঞা এল। জনপ্রিয় মন্ত্রী তাঁর অক্ষমতা জানালেন। এদিকে কোষাগার শূন্য, কিন্তু রাজা, রানী বা সভাসদদের বিলাস-ব্যসনের কমতি নেই, দেশে খরার ফলে খাদ্য উৎপাদন কম, রুটির দর হয়েছে আকাশছোঁয়া, মজুরদের কাজ নেই। পারী শহরে তখন সঙ্কটের পর্ব চলছে। রাজা, যাজক ও অভিজাতশ্রেণীর ওপর গরিব-গুরবোদের রাগ উঠল চরমে। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে বাস্তিল কারাদুর্গ আক্রমণ করে কয়েদীদের মুক্ত করে দেয়, কারাপ্রধানকে হত্যা করে, যে-কারারক্ষীরা তাদের ওপর গুলি চালিয়েছিল তাদের হত্যা করে। অবশ্য বন্দীদের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দী কেউ ছিল না। তবে বাস্তিল ছিল আগে রাজবন্দীদের নিপীড়ন করার কারাগার। তারিখটা ছিল ১৪ জুলাই, ১৭৮৯। এরপর দ্রুত পালা বদলের নাটক। ৪ আগস্ট জাতীয় সভা সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাল। আড়াই কোটি ফরাসী জনগণের আশি শতাংশের বাস ছিল গ্রামে। তারা মুক্তির নিঃশ্বাস নিল। ২০ আগস্ট 'মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র' জাতীয় সভা গ্রহণ করল। ফরাসী দেশে সর্বজনের 'মান' ও 'হুঁশ'-এর সম্মান জানানো হলো তাতে। ধর্মের 'যত মত তত পথ' স্বীকৃত হলো, ক্যাথলিক মঠপ্রভুদের হাতে থেকে 'স্বর্গের চাবিকাঠি'টি কেড়ে নেওয়া হলো। অক্টোবরে রাজারানীকে কার্যত বন্দী করে এক বিশাল ভুখামিছিল ভার্সাই প্রাসাদ থেকে পারীতে এল। নভেম্বরে মঠের সম্পত্তি জাতীয়করণ করা হলো। 'অভিজাত' ব্যাপারটাই আইন করে তুলে দেওয়া হলো। যাজকদের যেসব বিশেষ অধিকার ছিল তা বাতিল হলো। বলা হলো পোপ বা রাজার নির্দেশে নয়, দেশবাসীর সাধারণ ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের চলতে হবে। রাজতন্ত্র ও পোপতন্ত্র বাতিল হলো ফ্রান্সে। নতুনভাবে নির্বাচিত হলো জাতীয় সভা। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি রাজার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলো, ২১ জানুয়ারি সেই দণ্ডাদেশ কার্যকর হলো। দেশে গড়ে উঠল সাধারণতন্ত্র। ইউরোপের নানান রাজবংশ বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ভালসির রণাঙ্গনে ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিপ্লবীবাহিনী বিদেশী রাজাদের সৈন্যবাহিনীকে 'লা মার্সাই' সঙ্গীত গাইতে গাইতে পরাভূত করল। পরদেশী রাজকীয় বাহিনীর প্রধান ব্রানসউইক লিখেছিলেন ঃ "ওরা কি মানুষ? আমাদের কামানের গোলায় কাতারে কাতারে ওরা মরছে, আর ঐ শবদেহগুলি

মাড়িয়ে অকুতোভয়ে ওরা গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে লড়াই করতে।'' কার্লাইল লিখেছিলেন ঃ ''এ কী গান!... মানুষের শিরায় শিরায় রক্ত ফুটতে থাকে এই গানে।... চোখে জল আর আগুন নিয়ে গান গাইতে গাইতে বেপরোয়া মানুষ স্বৈরাচার, পাশবশক্তি এমনকি মৃত্যুকেও জয় করে নেবে।'' কার্লাইল কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের সমর্থক ছিলেন না।

বিদেশী রাজাদের আক্রমণই ক্ষুধিত ও ক্রুদ্ধ ফরাসীদের দেশের অভ্যন্তরের অন্তর্ঘাতের শক্তির বিরুদ্ধে নির্মম করে তোলে। বিপ্লববিরোধীরা বিদেশী রাজশক্তিকে সহযোগিতা দিতে চোরাগোপ্তা খুনখারাবি চালাতে থাকে। ঘরে-বাইরে প্রতিক্রিয়াকে পরাস্ত করার জন্য ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ মার্চ গড়ে উঠল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বিপ্লবী ট্রাইবুনাল। বিপ্লববিরোধী সন্দেহে বহু নিরপরাধীও অভিযুক্ত হয়। দণ্ড হয় চরম—মৃত্যু। ভঁদে প্রভৃতি জায়গায় প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ দেখা দিল। জাতীয় সভায় দুটি গোষ্ঠী তখন ক্ষমতা দখলের জন্য তৎপর। জিরদাঁরা ছিলেন নরমপন্থী। ধনী ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি এমনকি ভূম্যধিকারীদের পক্ষ নিয়ে তাঁরা কথা বলতেন। দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদন চলুক, সরকারের বাজেয়াপ্ত করা জমি চাষী ন্যায্য দামে কিনে নিক, জমিদারেরা ক্ষতিপূরণ পাক, উৎপাদন সঙ্কটে মজুরদের মজুরি হ্রাস ঘটানো হোক, বিপ্লবী সন্ত্রাসের তেমন প্রয়োজন নেই, এমন সব কথা এঁরা বলতেন। অন্যদিকে জ্যাকোবিনপন্থীরা সপাটে সুযোগসন্ধানীদের নিকেশ করার কথা বলতেন। মজুরের মজুরি কমানো চলবে না, বাজারের দরদাম বেঁধে দিতে হবে এবং ভূস্বামীদের ক্ষতিপূরণের কথাই ওঠে না, তাঁরা বলতেন। এঁদের পাশে ছিলেন পারীর জনতা। ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দের সংবিধান বিচার, আইন ও প্রশাসন বিভাগ আলাদা করলেও বিপ্লবীশক্তির প্রাধান্য তিন ক্ষেত্রেই স্বীকার করা হলো। বিপ্লবের পর জনতার তৎপরতায় রোবস্‌পীয়র জন-নিরাপত্তা পরিষদে নির্বাচিত হন। জনতা বিপ্লব বিরোধীদের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাস' ঘোষণা করে। বিপ্লবী ন্যায়পরায়ণতার গিলোটিনে শেষপর্যন্ত প্রাণ দিলেন দাঁতো, এমনকি শেষপর্যন্ত রোবস্‌পীয়রও। তবে ইতিমধ্যে স্বীকার করা হয়েছে 'যুক্তিবাদ'। ফরাসী উপনিবেশগুলি থেকে ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া হলো। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকেই বিপ্লবী চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে অন্যান্য শক্তিগুলি ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবরে বিপ্লবের অছি পরিষদের শুরু। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের প্রথমে নেপোলিয়ন ক্ষমতা দখল করলেন। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ—এই দশ বছর প্রথম ফরাসীবিপ্লব আঁকা-বাঁকা পথে এগিয়েছে, পিছিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানে সে-বিপ্লব পরাস্ত হয়েছে। কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের গণতান্ত্রিক চিন্তার পরাজয় ঘটেনি। তা দেশে দেশে ছড়িয়ে গেছে।

ফরাসীবিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ঐতিহাসিকরা ধরেছেন ঃ জাতিসৃজন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি। আবার এসবের সঙ্গে কেউ দেখেছেন 'সমাজতন্ত্র' বিষয়েও মনোভাবের বিকাশ। মেট্রিক হিসাবনিকাশের দিকটিও ফরাসীবিপ্লবের উত্তরাধিকার। কিন্তু ফরাসীবিপ্লব কার বা কাদের উত্তরাধিকারী?

মহাদেশীয় ইউরোপে পঞ্চদশ শতকের মাঝখান থেকেই নতুন নতুন ভাবধারার বিকাশের দিক লক্ষ্য করা যায়। এই সময়টার নাম রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। ইটালীর কিছু কিছু নগর-রাষ্ট্রে ক্যাথলিক খ্রীস্টধর্মের বহুবিধ কুসংস্কার ও প্রথা, তথা ধর্মীয় কর্তাদের নির্দেশিত জীবনচর্যাবিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। খ্রীস্টীয় মঠ-প্রভুদের কাছে ধর্মীয় লেখক ছাড়া অন্যান্য লেখকদের রচনা অপবিত্র জ্ঞান করা হতো তখন। কিন্তু ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্যে'র পূর্বাঞ্চলের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল শহর তুর্কিদের আক্রমণে পর্যুদস্ত হবার পর, বহু মনস্বী ব্যক্তি পুরনো গ্রীক-চিন্তার বাহন বইপত্র নিয়ে ইটালীর ফ্লোরেন্স, পিসা প্রভৃতি নগরে আশ্রয় নেন। নতুন করে ক্লাসিকাল গ্রীক ন্যায়শাস্ত্র, সৌন্দর্যতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যয়নের সূত্রপাত ঘটে। বিশেষভাবে ফ্লোরেন্সের ধনী মেদিচি পরিবার সেই নতুন বিদ্যাচর্চার আনুকূল্য দিতে থাকে। ক্রমে বাইবেলকেন্দ্রিক ধর্মীয় সন্ন্যাসীদের বিশ্ববিশ্লেষণ অবাস্তব গণ্য হতে থাকে। ব্যক্তিসাপেক্ষতা, ঐচ্ছিকতা বিষয়ে আগ্রহ, পরলোক নয় ইহলোকেই সুখলাভের ইচ্ছা এবং গ্রীক মডেলে সৌন্দর্যের ধারণার উদ্ভব পুরনো প্রথাপীড়িত উদ্ভিদপ্রতিম সমাজের গোড়া ধরেই টান দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন ঃ "প্রাচীন গ্রীকদের বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প বর্বরাক্রান্ত ইটালীতে প্রবেশ করলে... প্রাচীন ইটালী নবজীবনে বেঁচে উঠতে লাগল। এর নাম রেনেসাঁস (renaissance)—নবজন্ম। কিন্তু সে নবজন্ম হলো ইটালীর। ইউরোপের অন্যান্য অংশের তখন প্রথম জন্ম।... ইটালীর পুনর্জন্ম গিয়ে লাগল বলবান অভিনব নূতন ফ্রাঁ জাতিতে।... ইউরোপের সৌভাগ্য এই নূতন ফরাসীজাতি আদরে সে তেজ গ্রহণ করলে। নবীন রক্ত, নবীন জাত সে তরঙ্গে মহাসাহসে নিজের তরণী ভাসিয়ে দিলে, সে স্রোতের বেগ ক্রমশই বাড়তে লাগল, সে একধারা শতধারা হয়ে বাড়তে লাগল।"[৪]

এই নবজাগরণেরও দুটি ধারা ছিল। এক, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে উচ্চমূল্য দেওয়া; দুই, যৌথ জীবনচারণাকে উচ্চমূল্য দিয়ে ভূস্বামী ও মঠপ্রভুদের খাজনালাভের শোষণভিত্তিক ব্যবস্থার উৎসাদন। ধর্মসংস্কারের লুথারীয় আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার সংগ্রামে শহীদ হলো জার্মানীর কৃষকবিদ্রোহের ধর্মীয় নেতা টমাস মুনৎজার। মুনৎজারের সংগ্রামের অঞ্চল জার্মানীর থুরিঙ্গিয়া প্রদেশটি ছিল ফরাসী সীমান্তে। তাছাড়া ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও চলেছে ধর্মসংস্কার বনাম প্রতিধর্মসংস্কারের মধ্যে রক্তাক্ত লড়াই। যেসব দেশে, বিশেষভাবে ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডে প্রোটেস্টান্ট মত জয়ী হয়, সেসব দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তিলাভের বুর্জোয়া আশা যথেষ্ট চরিতার্থ হতে থাকে। জাতীয় রাষ্ট্রের ভাষা বৃদ্ধি পায়। কার্যত ক্যাথলিক ধর্মের প্রথা ও সংস্কারের বাইরে বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিকশিত হবার সুযোগ ঘটে। কিন্তু গ্রামে চাষী ও শহরের গিল্ডগুলির মজুরদের কোন সুরাহা এসব দেশে ঘটেনি। ব্রিটেনে বরং গ্রাম থেকে চাষী উৎখাত হয়েছে এসময়। চাষের জমিতে বেড়া দেবার আন্দোলন ও সাধারণ চাষীর গোচারণ দখল প্রভৃতি গ্রাম থেকে চাষী উৎসন্ন করতে থাকে এবং শহরে উঞ্ছজীবীদের ভিড় বাড়তে

থাকে। ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রমোয়েলের লড়াই নিছকই বুর্জোয়া বনাম সামন্তবাদের লড়াই ছিল। তবে ভূস্বামীরাও পুঁজিপতি হচ্ছিল বলে শহরের উঞ্ছজীবীদের সঙ্গে বা গ্রামের উৎখাত চাষীদের সঙ্গে বুর্জোয়া বাহিনীর খুব একটা যোগ ছিল না। ব্রিটেনে ঐ লড়াইয়ের ফল হিসেবে আইনের শাসন স্থিরীকৃত হয়। আইনসভা, বিচারবিভাগ ও প্রশাসন কর্তৃত্ব আলাদা আলাদা হয়ে পরস্পরকে বিকাশ ঘটাতেও যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি নিজ নিজ বিভাগের স্বাধীনসত্তা রক্ষা করার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাবিভাজন-ভিত্তিক আইনের শাসনকে কার্যকর রেখেছে।

কিন্তু ফ্রান্সে তেমনটি ছিল না। রাজা চতুর্দশ লুই ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। তিনি ক্ষমতার বিভাজনে বিশ্বাসই করতেন না। বরং বলতেন 'আমিই রাষ্ট্র'। ভূস্বামী ও যাজকদের তিনি নিজ পক্ষপুটে রাখতেন। ভূস্বামীরা ভূমিদাসদের শোষণ করত চরমভাবে, আর যেকোন বিক্ষোভকে দমিয়ে দেবার কাজ ছিল মঠপ্রভুদের। বাইবেলে বলা আছে, 'সীজারের পাওনা সীজারকে দাও, ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে'। সেটা ভাঙিয়েই তারা চাষীকে লেখাত এই রাজা তোমাদের ইহলোকের কর্তা, ঈশ্বর যেমন স্বর্গের কর্তা। ঈশ্বরভজনার অর্থ, ধর্মাচরণের অর্থ রাজ-ভজনাও বটে। আর ঈশ্বর-ভজনাতো অবশ্যই মঠ-ভজনা।

রাজকোষ সর্বস্বান্ত করে চতুর্দশ লুই মারা যান। তিনি অবশ্য বলেছিলেন ঃ "আমার পরেই আসবে প্রলয়।" ইতিমধ্যে ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব হয়েছে, পৃথিবীর দেশে দেশে চলেছে ব্রিটেনের পণ্যবাহী পোত। শিল্পবিকাশের জন্য যা জরুরি, সেই পুঁজির সঞ্চার, পণ্য বনাম টাকার বিনিময় ব্যবস্থা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমবিভাজন, ফ্রান্সে তখন অনুপস্থিত, বরং পুঁজি গঠন না ঘটিয়ে রাজা, মঠ ও সামন্ত প্রভুরা জাতীয় সঞ্চয় নয়-ছয় করছিল। কৃষকদের কেনবার ক্ষমতা অতি খাজনায় বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাজার ব্যবস্থাও তেমন গড়ে ওঠেনি। আর অনড় সামাজিক বর্গের অস্তিত্ব শ্রমবিভাজন ও উৎপাদন উপকরণের স্বচ্ছন্দ সঞ্চালন অনুপস্থিত রাখে। রুশো ও ভলতেয়ার, দিদেরো ও দেকার্ত প্রমুখ দার্শনিকগণ নতুন যুক্তিবাদের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁরা নিপীড়িতও হয়েছেন। রুশো বললেন, মানবিক নিপীড়ক রাজার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের অধিকার রয়েছে। ভলতেয়ার ধর্মের সংসারশূন্যতা ও অভিজাতদের তথাকথিত আভিজাত্যকে হাস্যকরভাবে চিত্রিত করে, তাঁর 'কাঁদিদ' (Candide) গ্রন্থে এক সমসমাজের দেশ এলদোরেদোর স্বপ্ন তুলে ধরেন। দেকার্ত প্রমুখ দার্শনিকেরা দেখালেন, ঈশ্বরের প্রশাসনিক নিয়ম এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নিয়ম এক নয়। ফলে কথায় কথায় ধর্মীয় প্রধানেরা রাষ্ট্রশাসনে নাক গলাবেন ঈশ্বর, খ্রীস্টীয় ধর্ম ও শয়তানের ভয় দেখিয়ে, তা চলবে না। বরং রাষ্ট্রের জনগণের সাধারণ ইচ্ছার অনুবর্তী হতে হবে তাদেরও। বিশপ বা উচ্চশ্রেণীর ধর্মযাজকেরা প্রায় সকলেই ছিলেন অভিজাত পরিবারের। কিন্তু নিচুতলার পাদ্রীদের বড় অংশই এসেছিলেন সমাজের নিচুতলা থেকে। তাঁরা অনেকেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। ক্ষমতা বিভাজনের

তত্ত্বে তাঁদের অনেকেই সমর্থক ছিলেন। ফলে ফরাসীবিপ্লবের ভগীরথ ছিলেন নানা শ্রেণী ও শ্রেণী-অংশ। ফলে, বিপ্লবের পর্যায়ে বিপ্লবের গতিপথ নিয়ে টানাপোড়েনের অন্ত ছিল না।

মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান ধর্ম নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন ঃ "ইউরোপে যাকিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই খ্রীস্টানধর্মের বিপক্ষে বিদ্রোহদ্বারা। আজ যদি ইউরোপে খ্রীস্টানীর শক্তি থাকত, তবে 'পাস্তের' (Pasteur) এবং 'কক' (Koch)-এর ন্যায় বৈজ্ঞানিকসকলকে জীবন্ত পোড়াত। এবং ডারউইন-কল্পদের শূলে দিত। বর্তমান ইউরোপে খ্রীস্টানী আর সভ্যতা—আলাদা জিনিস। সভ্যতা এখন তার প্রাচীন শত্রু খ্রীস্টানীর বিনাশের জন্য পাদ্রীকুলের উৎসাদনে এবং তাদের হাত থেকে বিদ্যালয় এবং দাতব্যালয়সকল কেড়ে নিতে কটিবদ্ধ হয়েছে। যদি মূর্খ চাষার দল না থাকত, তাহলে খ্রীস্টানী তার ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ করতে সমর্থ হতো না এবং সমূলে উৎপাটিত হতো। কারণ নগরস্থিত দরিদ্রবর্গ এখনই খ্রীস্টানী ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু।"[৫]

কার্ল মার্কস 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' বইতে এহেন কৃষকদের 'এক বস্তা আলু'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এবং শহরের শ্রমিক বা প্রোলে-তারিয়েতদের সত্যিকারের বিপ্লবী গণ্য করেছিলেন। যাজকদের প্রচারিত ধর্মকে মার্কস বলেছিলেন 'জনগণের আফিম'।

বলা বাহুল্য, মধ্যযুগীয় গসপেল অনুসারী মৌলবাদ জনগণকে করেছিল মূঢ়, শোষণের কাছে আত্মনিবেদিত। স্বামী বিবেকানন্দের এই মূল্যায়ন কতখানি সত্য তা বোঝা যাবে, যখন দেখি চাষীদের কিছুটা জমির সমস্যা মেটবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকেই তারা বিপ্লবী কার্যকলাপে হাত গুটিয়ে বসেছে। এমনকি ফ্রান্সের দক্ষিণে তাদের একাংশ বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেছিল।

ফরাসীবিপ্লব ঘটানোর পিছনে ছিল শহুরে গরিবেরাই। এমনকি 'প্রাকাম' ফ্রাঁসোয়া নোয়েল ব্যাবুক, দার্মে, মারসেল প্রভৃতি নেতারা সঁ কুলোত গরিবগুরবো ও জ্যাকোবিনদের একাংশ নিয়ে সমসমাজ গড়ার জন্য দক্ষিণপন্থী ডিরেক্টরদের সরিয়ে আবার এক অভ্যুত্থান করার চেষ্টা করেছিলেন ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে। সে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ব্যাবুক গিলোটিনে গেলেন, তবে বিপ্লবের ধারায় স্পষ্ট হলো ঃ একদল চায় বিপ্লবকে বুর্জোয়া শাসনের প্রয়োজনে, অন্যদল চেয়েছে নিপীড়িতদের প্রয়োজনে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি রেনেসাঁসেরও ছিল ঐ দুটি ধারাই। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বলা যায়, ফ্রান্সের বিপ্লব শেষপর্যন্ত ক্ষত্রিয়শাসনকে হারিয়ে দিয়ে বৈশ্যশাসন আনল আবার। বৈশ্যশাসন শূদ্রশাসনের স্বপ্নকেও আপাতভাবে হারিয়ে দিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ফরাসীবিপ্লবের পর অ্যানার্কিজম, সিন্ডিক্যালিজম, নানা কল্পনামূলক সোস্যালিজমের চিন্তানায়কদের উদ্ভব হয়েছে ঐ ফ্রান্সেই। মার্কস নিজেও শিক্ষা নিয়েছেন ঐ ফরাসীবিপ্লব ও ফরাসী-সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ থেকে। লেনিন বলেছিলেন মার্কসবাদের আছে তিন উৎস ঃ ব্রিটিশ পোলিটিক্যাল ইকনমি, জার্মান দর্শন ও ফরাসী সমাজবাদী চিন্তা।

তাহলে ফরাসীবিপ্লবে রেনেসাঁসের দুটি ধারার জড়াজড়ি করে থাকা রূপ ছিল। দুটি ধারার প্রতিটিই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিকে জয়ী দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু কার্যত বুর্জোয়া রাষ্ট্রই শেষপর্যন্ত সে-দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে তারা নিয়েছে 'লা মার্সাই'—গরিবগুরবোদের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গান। কিন্তু সে-দেশ হয়ে উঠল একসময় ধনবাদী—সাম্রাজ্যবাদী। এই সেদিনও তার উপনিবেশ ছিল বিস্তৃত। কিন্তু ফরাসী গরিবদের বিপ্লবের স্বপ্ন শেষ হয়নি। তা সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে এবং দেশের পক্ষে বহুবিধ আন্দোলন ও সংগ্রামে রূপ পেয়েছে। শেষ লড়াই এখনো বাকি।

ভারতে উনিশ শতকের রেনেসাঁসেরও মোটামুটি দুটি ধারা ছিল। একদিকে ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী, বুদ্ধিবাদী ও নানান সংস্কারমুখী ধারা। অন্যদিকে ছিল বহুবিধ কৃষকবিদ্রোহ। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কর্মে ও দর্শনে বুদ্ধিবাদীদের জ্ঞান ও বিদ্যা, আধুনিক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন দরিদ্র মানুষের সমসমাজের সাধনা। ভারতে তিনিই ছিলেন প্রথম সোস্যালিস্ট, যিনি শূদ্র-প্রাধান্যের ঐতিহাসিক বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর আদর্শ বিকশিত হয়ে গণআন্দোলনের তাৎপর্যে ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনেও সমাজতান্ত্রিক মাত্রা যুক্ত করেছিল। ভারতের সেই সম্ভাবিত সমাজের দেহটি ভেবেছিলেন তিনি জাত-পাত উত্তীর্ণ ইসলামীয়, এবং সর্বমানুষ একই উৎস থেকে উত্থিত বলে তারা হবে অন্তরে বৈদান্তিক। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে ফরাসীবিপ্লবের শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে জনশিক্ষা ও জনসেবায় সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন, একদল দায়বদ্ধ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের দিয়ে। ভারতে সর্বত্যাগীদের কল্যাণমুখী আবেদন এখনো যথেষ্ট। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লবের সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি তিনি আগে গড়তে চেয়েছিলেন। মার্ক্স বলেছেন, ভাবাদর্শও বস্তুগত শক্তির তুল্য। এবং সে-বিচারে সত্যিকারের সমাজবিপ্লবীর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও সংগঠনের বিরোধ থাকার কথা নয়। রুশো ও ভলতেয়ার, মন্তেস্কু ও দিদেরোর মতো স্বামীজীর স্বপ্নেও ছিল 'মুচি-মেথর', যারা 'এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে' সমর্থ, সেই সঁ কোলেত বা আধুনিক ভাষায় 'সাবালটার্ন'দের দেশ। তাঁর ব্রতও কি ভারতে আমরা সফল করতে পেরেছি?* □

পাদটীকা

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১৫৯
২ প্রবন্ধটি ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত।—সম্পাদক
৩ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৯৪
৪ ঐ, পৃঃ ১৯২-১৯৩
৫ ঐ, পৃঃ ২১৩

* ৯১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

বিপ্লব আন্দোলনের আদিপর্ব ও কলকাতা

জীবন মুখোপাধ্যায়

ইংরেজের সীমাহীন শোষণ, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ এবং বিভিন্ন বৈদেশিক প্রভাবের ফলে ভারতে বিপ্লবী চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটে। একদা মনে করা হতো যে, সুদূর বোম্বাই থেকে বাংলায় বিপ্লব-চেতনার আগমন ঘটেছে, কিন্তু তা ঠিক নয়। বাংলার মাটিতেই বিপ্লববাদী রাজনীতির বীজ নিহিত ছিল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ার সুবাদে বহু বিষয়ের মতো বিপ্লববাদী রাজনীতির ধ্যান-ধারণা ও কর্ম-কৌশলগত নানা দিকেই মহানগরী কলকাতা ছিল সমগ্র ভারতের পথপ্রদর্শক।

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ইটালী স্বৈরাচারী অস্ট্রীয় শাসনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং রাজনৈতিক ঐক্য অর্জন করে। আই.সি.এস.-এর স্বর্ণ-সিংহাসন থেকে বিতাড়িত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসময় দেশসেবায় নিয়োজিত হয়ে কলকাতায় ইটালীয় ঐক্যের প্রাণ-পুরুষ ম্যাৎসিনী ও তাঁর দল 'ইয়ং ইটালী'-র ভাবধারা প্রচারে সচেষ্ট হন। তাঁর প্রচারের ফলে ম্যাৎসিনীর আদর্শ কলকাতায় প্রবলভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং 'কারবোনারি' নামে গুপ্তসমিতির আদর্শ কলকাতার ছাত্রসমাজকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। বিপিনচন্দ্র পাল লিখছেন ঃ "কারবনরাইদের কথা কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীকে একরূপ পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। দলে দলে মিলিয়া তাঁহারা কারবনরাইদের অনুকরণে নিজেদের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট গুপ্তসমিতি (বা Secret Society) গড়িবার চেষ্টা করেন।"[১] তাঁর মতে স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ধরনের বেশ কয়েকটি গুপ্তসমিতির সভাপতি ছিলেন। বলা বাহুল্য, নামে গুপ্তসমিতি হলেও, এই সমিতিগুলির বিশেষ কোন রাজনৈতিক কার্যক্রম ছিল না বা সমিতির সদস্যরা গুপ্তহত্যা বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না।[২] এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এই সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে কোন সাল-তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

'জাতীয়তার পিতামহ' রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ির যুবকদের নিয়ে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার বুকে গড়ে ওঠা গুপ্তসমিতিকেই বাংলার প্রথম গুপ্তসমিতি বলা যায়। এই সমিতির নাম ছিল 'সঞ্জীবনী সভা'। গুপ্ত ভাষায় তাকে বলা হতো 'হাঞ্চু পামু হাফ্'। এই সমিতির অধিবেশন বসত এক পোড়ো বাড়িতে। অধিবেশনের কার্যবিবরণী লেখা হতো গুপ্ত ভাষায় সমিতির প্রধান নিয়ম ছিল মন্ত্রগুপ্তি। সমিতির অনুষ্ঠানে রহস্যের ত্রুটি ছিল না। ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথা, খোলা তলোয়ার প্রভৃতি নিয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথ একদা এখানে ভারত উদ্ধারের দীক্ষা

নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সমিতির সদস্যদের বোমা-পিস্তলের রক্ত-রাঙা পথে অগ্রসর হতে হয়নি—তাঁরা উত্তেজনার আগুন পুইয়েই দেশ-উদ্ধারের কাজ শেষ করেছিলেন।

বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা ও হেয়ার স্কুলের শিক্ষক শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে 'স্বাধীনতার সাধক দল' বলে একটি গুপ্ত-দল গড়ে তোলেন এবং এক বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশিষ্ট দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল-সহ মোট ছজন তরুণকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। দীক্ষাগ্রহণকারীকে তলোয়ারের সাহায্যে নিজের বুক চিরে রক্তের সাহায্যে যে-প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হতো তাতে লেখা থাকত, একমাত্র স্বায়ত্তশাসনই বিধাতা-নির্দিষ্ট শাসন। দুঃখ-দারিদ্র্য ও দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হলেও তাঁরা কখনোই সরকারের দাসত্ব স্বীকার করবেন না। এই প্রতিজ্ঞাপত্রের অন্যত্র ছিল, নিজেদের ও দেশবাসীর স্বাস্থ্য, শক্তি ও শৌর্যবৃদ্ধির জন্য তাঁরা ব্যায়ামচর্চার প্রচার করবেন। নিজেরা অশ্বারোহণ ও বন্দুক-চালনা অভ্যাস করবেন এবং দেশের মধ্যে যাতে এই সব বিদ্যার বহুল প্রচার হয় তার চেষ্টা করবেন।[৩] বিপিনচন্দ্র লিখছেন, শিবনাথ শাস্ত্রীই "আমাদের স্বদেশচর্যার প্রথম দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন।"[৪]

এরপর দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় আর কোন গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়নি। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণে খেলাৎচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের গৃহে রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র শিকদার, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধারমণ দাশ প্রভৃতি ছাত্রদের উদ্যোগে 'আত্মোন্নতি সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও সন্নিহিত এলাকার পথে-ঘাটে ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার, অশ্লীল গালিগালাজ ও বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও নিজেদের মানসিক উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী ও ম্যাৎসিনী, গ্যারিবল্ডীর জীবনীপাঠের সঙ্গে সঙ্গে লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, অসিচালনা প্রভৃতির শিক্ষাও এখানে চলত। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই সমিতি যথার্থ বৈপ্লবিক রূপ পরিগ্রহ করে।[৫]

কেবলমাত্র 'আত্মোন্নতি সমিতি'-ই নয়—ভীরু বাঙালীর কলঙ্ক দূর করার জন্য কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এসময় বিভিন্ন স্থানে 'আখড়া' তৈরি করেন। সেখানে ডন-বৈঠক, মুগুর, কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো। ছাতুবাবু, লাটুবাবু, অম্বু গুহ, ক্ষেতু গুহ-র আখড়া, পাড়ায় পাড়ায় জিমন্যাস্টিকের দল গঠন এবং এ-প্রসঙ্গে গৌর মুখার্জী, নারায়ণ বসাক প্রভৃতির উদ্যোগের কথা স্মরণীয়। এসময় সোহংস্বামী, প্রফেসর বোস, কৃষ্ণ বসাক প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালীর উদ্যোগে কিছু সার্কাস পার্টিও গড়ে ওঠে। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের খুল্লতাত গৌরহরি মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলকাতার বেশ কয়েকটি কলেজেও তখন ব্যায়ামচর্চার আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্কটিশ চার্চ কলেজেও এই ধরনের একটি ব্যায়াম-কেন্দ্র ছিল। এই ব্যায়াম-কেন্দ্রটিই পরে বিপ্লবী 'অনুশীলন সমিতি'-তে রূপান্তরিত হয়।

সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন তত্ত্বের আদর্শে' ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের দোল পূর্ণিমার দিন (সোমবার, ২৪ মার্চ) হেদুয়ার নিকটবর্তী ২১ নং মদন মিত্র লেনে আনুষ্ঠানিকভাবে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র) ছিলেন এই সমিতির প্রথম সভাপতি। ইতিমধ্যে বরোদা রাজকলেজের উপাধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় বিপ্লবী সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে তাঁর অনুচর যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান। তিনি ১০৮সি, আপার সার্কুলার রোডে তাঁর আখড়া গড়ে তোলেন। উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য হেতু দুই প্রতিষ্ঠান এক হয়ে যায় এবং 'অনুশীলন সমিতি' নামেই পরিচিত হয়। এই যুগ্ম-দলের সভাপতি হন প্রমথনাথ মিত্র, সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ ও অরবিন্দ ঘোষ এবং কোষাধ্যক্ষ হন সুরেন ঠাকুর। সমিতির সদস্যরা নানা ধরনের ব্যায়ামচর্চা, লাঠিখেলা, অসিচালনা, অশ্বারোহণ, সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা এবং গীতা, স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী, দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ করতেন। 'আত্মোন্নতি সমিতি'-র সদস্যরাও এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।[৬] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরানী 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' ও 'বীরাষ্টমী ব্রত' প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে এবং বিভিন্ন স্থানে শরীরচর্চার আখড়া তৈরি করে বাংলার যুবসমাজের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির বিস্তারে সাহায্য করেন।[৭]

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে বাংলার যুবসমাজ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। স্বদেশী বয়কট ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ বাংলার যুবসমাজকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। কলকাতার দর্জিপাড়া, পটলডাঙ্গা, গ্রে স্ট্রীট, খিদিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অনুশীলন সমিতির বহু শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া কলকাতার নানা পল্লীতে অসংখ্য সমিতি ও সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এইসব সমিতিগুলির মধ্যে বলরাম বসু স্ট্রীটের 'এ্যাথলেটিক ক্লাব', হোগলকুড়িয়া লেনের 'রায়বাগান ক্লাব', জগন্নাথ সেন লেনের 'বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব', নয়নচাঁদ দত্ত লেনের 'যুবক সমিতি', ছিদাম মুদি লেনের 'মডেল অ্যাথলেটিক এ্যাসোসিয়েশন', মল্লিক লেনের 'আর্যকুমার সমিতি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, এইসব সমিতির কার্যকলাপ একেবারে নিরীহ ছিল না। সরকারি রিপোর্টে বলা হচ্ছে ঃ "In these clubs youngmen and boys went through a course of physical training, drill and discipline and set to work to train themselves in *lathi* exercise and wrestling. The members of these clubs were called National Volunteers, and the idea seems to have been that they would form a trained body able to resist force by force, and available for purposes of offence and defence."[৮]

'অনুশীলন সমিতি' ও সার্কুলার রোডের বিপ্লবকেন্দ্রের জন্য ধনবান ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে টাকা সংগ্রহ করা হতো। হেমচন্দ্র মল্লিক, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন হালদার, সুরেন ঠাকুর, অবিনাশ চক্রবর্তী প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে অর্থ সাহায্য করতেন। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখছেন ঃ "যতীনদা কয়েকজন মাতব্বরের টাকারই ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তরুণদের হৃদয় জয় করতে পারেননি।"[৯] এই

কাজ করার জন্য বারীন্দ্রের শিক্ষক সখারাম গণেশ দেউস্কর ও অন্যান্য আরো দু-তিনজনসহ বারীন্দ্রকুমার সকাল-সন্ধ্যে দু-বেলা গঙ্গার ধার, হেদুয়া, কলেজ স্কোয়ার এবং কলকাতার বিভিন্ন পার্কে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা জুড়তেন। উৎসাহী যুবকদল জমত মৌমাছির চাকে এবং সেখান থেকেই সংগ্রহ করা হতো আগামী দিনের বিপ্লবকর্মীদের। এছাড়া, বিপ্লবীকর্মী সংগ্রহের উর্বরক্ষেত্র ছিল স্কুল, কলেজ, হস্টেল, খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার।

ইতিমধ্যে অনুশীলন সমিতির অপেক্ষাকৃত তরুণ সদস্যরা পি. মিত্রের ''নীরব শরীরচর্চার নীতি''-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। তাঁরা বিপ্লববাদী রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এই দলে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু প্রমুখ যুবকেরা। একাজে তাঁদের বিশেষভাবে উৎসাহ দেন অরবিন্দ ঘোষ ও সখারাম গণেশ দেউস্কর। বারীন্দ্রকুমার লিখছেন ঃ '''যুগান্তর' বলে খোলাখুলি বিপ্লবপন্থী কাগজ বের করার প্রস্তাব শুনে পি. মিত্র মশাই ঘোর আপত্তি তুললেন। বন্ধুবান্ধব ও কর্মীমহলে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, বারীন দিস্তা দিস্তা কাগজ লিখে ভারত উদ্ধার করবে। আমি পালটা জবাবে বলেছিলাম, পি. মিত্র সাহেব বাঁশের লাঠি ঘুরিয়েই দেশ উদ্ধারের পালা সারবেন।''[১০]

মাত্র তিনশ টাকা মূলধন নিয়ে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৩ মার্চ ২৭ নং কানাই ধর লেন থেকে প্রকাশিত হলো বাংলার প্রথম বিপ্লববাদী পত্রিকা 'যুগান্তর'। 'যুগান্তর' ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং তার দাম ছিল এক পয়সা। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাস থেকে পত্রিকার নামটি নেওয়া হয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন ঃ ''শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল।''[১১] ভয়-ভীতি ত্যাগ করে 'যুগান্তর' দেশবাসীকে সরাসরি বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছিল। তার ছত্রে ছত্রে ছিল বিপ্লবের ধ্বনি। বলা হয়, বিপ্লবই ছিল এই পত্রিকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন ঃ '''যুগান্তরে'র সুর এত চড়া ছিল যে, তৎকালের অন্য কোন পত্রিকাই ইহাকে হারাইতে পারে নাই।''[১২] এই চড়া সুরের কল্যাণেই ''হু হু করিয়া দিন দিন যুগান্তরের গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার, দশ হাজার হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে ঠেকিল।''[১৩] এত সংখ্যা বিক্রির পরেও কিন্তু হকারদের ঠেকিয়ে রাখা দায় হতো। শোনা যায় যে, মাত্র এক পয়সা মূল্যের একটি পত্রিকা এক টাকা দামেও বিক্রি হতো।

ইতিমধ্যে সরকারি দমননীতি তীব্র আকার ধারণ করেছে। সরকারি অত্যাচারে জনসাধারণ ও যুবসমাজ প্রবল ক্ষুব্ধ। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম', 'নবশক্তি' প্রভৃতি স্বদেশী সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে সরকার একের পর এক মামলা দায়ের করে সম্পাদকদের জেলে পাঠাতে লাগলেন। 'যুগান্তর' কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন, এভাবে বৃথা শক্তিক্ষয় করে লাভ নেই। বাক্যবাণে বিদ্ধ করে

সরকারকে ধরাশায়ী করা যাবে না। সুতরাং "এতদিন যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে। এই সঙ্কল্প হইতেই মানিকতলা বাগানের সৃষ্টি।"[১৪] বিপ্লবী নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন ঃ "দেশকে দেশের যুবকমণ্ডলীকে 'যুগান্তর' অগ্নিদীক্ষা দিল প্রায় দু-বৎসর ধরে। তারপর যুগান্তরের দল যখন স্থির করল যে, এবার আর 'প্রচার' নয়, এখন দরকার 'প্রয়োগ' তখনই স্থাপিত হলো মুরারিপুকুর বা মানিকতলা।"[১৫]

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে অরবিন্দ ঘোষের নির্দেশে তাঁর পৈত্রিক বাগানবাড়িতে শুরু হলো বিপ্লব-সাধনার কাজ। তৎকালীন কলকাতার অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে এই বাগানটি স্থাপিত ছিল। 'যুগান্তর'-এর পুরনো সদস্যরা সশস্ত্র-বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য মানিকতলার বাগানে চলে গেলেন, আর অপেক্ষাকৃত নতুনদের হাতে রইল পত্রিকাটির দায়িত্ব। একদলের কাজ হলো সশস্ত্র বিপ্লবের বাণী প্রচার করে মৃতপ্রায় জাতির মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটানো, আর অপর দলের কাজ হলো ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োগ। প্রাচীন ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, গীতা-উপনিষদের শাশ্বত বাণীর যথার্থ অনুগামী, ত্যাগব্রতী এই বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ না করলে চরিত্রগঠন হয় না, আত্মবিশ্বাস আসে না, শত্রুর কামানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে সাহস হয় না। তাই বাগানের দৈনন্দিন জীবনের সকল কর্মপদ্ধতির মধ্যে অবশ্য করণীয় ছিল—ধ্যান, গীতা, চণ্ডী ও স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী এবং বিপ্লবাত্মক সাহিত্য পাঠ। ধর্মজীবনে পথনির্দেশ করার জন্য উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ ও দেবব্রত বসু (পরবর্তী কালে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) ভারতের বহু তীর্থস্থানে ভ্রমণ করলেন।

'যুগান্তর' গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের মূল লক্ষ্য ছিল এক সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করা। ব্যাপক সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান—সন্ত্রাসবাদ নয়। নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন ঃ "পূর্বে এই টেররিস্ট কর্মধারায় আমাদের আস্থা ছিল না।"[১৬] কারণ এতে হিংসা ও প্রতিহিংসা চলে অন্তহীন ধারায়—সমস্যার কোন সমাধান হয় না। তাই বিপ্লবীরা একটি নতুন সেনাদল গঠন করে ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বীজবপনে সচেষ্ট হলেন। মানিকতলার বাগানে শুরু হলো পিস্তল ছোঁড়া ও রাইফেল চালানোর মহড়া—চলতে লাগল বোমা প্রস্তুতির কাজ। 'যুগান্তর' দলের উল্লাসকর দত্ত বোমা তৈরির জন্য নিজের বাড়িতেই একটি ছোটখাট ল্যাবরেটরি তৈরি করেন এবং একদিন বোমা তৈরি করতেও সক্ষম হলেন। মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র দাস বোমা তৈরির কৌশল শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে প্যারিসে যান এবং ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এবারে প্রশ্ন ঃ বিপ্লব আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা কোথা থেকে আসবে? বিপ্লবীরা প্রথমে দেশহিতৈষী ও ধনবান ব্যক্তিদের দানের ওপর নির্ভর করতেন, কিন্তু তার পরিমাণ ছিল নগণ্য। ফলে বিপ্লবীরা পরে ধনবান ব্যক্তির গৃহে ডাকাতি, সরকারের ক্যাশ লুঠ প্রভৃতির

পথ বেছে নেন। কিন্তু ডাকাতি করা কি যুক্তিসঙ্গত? অরবিন্দ ঘোষ বললেন, মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কোন কাজই নীতিবিরুদ্ধ নয়। সুতরাং বাংলার বুকে শুরু হলো রাজনৈতিক ডাকাতি। অবশ্য ডাকাতির পরে বিপ্লবীরা ধনবানদের জানিয়ে দিতেন যে, স্বাধীনতা অর্জন করে সার্বভৌম সরকার সুদ-সহ তাঁদের সব লুণ্ঠিত অর্থ ফেরত দেবেন। এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ডাকাতি করা সম্পর্কেও বিপ্লবী সমিতিতে যথেষ্ট কঠোর বিধিনিষেধ প্রচলিত ছিল এবং তা ভঙ্গ করলে বিপ্লবীদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো।[১৭]

সরকারি দমননীতির ব্যাপকতার ফলে জাতীয় জীবন যখন দারুণভাবে উৎকণ্ঠিত তখন "বাগানের কর্মগতির মুখ ঘুরে গেল। Military Organization-এর পরিবর্তে হলো Terrorist Organization।"[১৮] এপ্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "পুলিশের হাতে এক তরফা মার খাইয়া দেশশুদ্ধ লোক হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছে যাও, সেই বলে—'নাঃ এ আর চলে না। ক-বেটার মাথা উড়িয়ে দিতেই হবে।' তথাস্তু।"[১৯] নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন ঃ "দেশের মধ্যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আকুতি জেগে উঠল—এই অত্যাচার উৎপীড়ন একদিকে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, এর উত্তর কেবল নিঃশব্দে সহ্য করা? প্রত্যুত্তরের আয়োজন চলল তাই। প্রথমত এতে সাধারণের মধ্যে সাহস বেড়ে যায়—যদিও অত্যাচারের মাত্রা কমে কিনা তাতে সন্দেহ থাকে। দ্বিতীয়ত লোকেরা পায় তৃপ্তি।"[২০]

গোলা-গুলি-বোমা এবং দেশপ্রেমিকের বলিষ্ঠ সাধনা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে বিপ্লববাদের পদধ্বনি শোনা যেতে লাগল। বিপ্লবীদের প্রধান লক্ষ্য হলেন বাংলার ছোটলাট, বঙ্গভঙ্গ পরিচালনার অন্যতম পুরোহিত সার এন্ড্রু ফ্রেজার। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁর ট্রেন উড়িয়ে দেবার জন্য চন্দননগরের কাছে রেল লাইনে কয়েকটি ডিনামাইট কার্তুজ রেখে দেওয়া হয়। কার্তুজ ফাটার শব্দ হলো ঠিকই, কিন্তু তাতে লাটসাহেবের ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটল না। ঐ বছর ৬ ডিসেম্বর মেদিনীপুরের নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে আবার ট্রেন উড়াবার চেষ্টা হলো। এবার বোমা ফাটল, ট্রেনটাও বাঁকল, ইঞ্জিনও জখম হলো, কিন্তু গাড়ি উড়ল না। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট বি. সি. এ্যালেনকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। মারাত্মকভাবে আহত এ্যালেন সাহেব প্রাণে বেঁচে যান। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৪ মার্চ গুপ্তচর সন্দেহে কুষ্ঠিয়ার পাদ্রী হিকেনবোথামকে লক্ষ্য করে গুলি চলে। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ এপ্রিল চন্দননগরের ফরাসী মেয়র তার্দিভেলের গৃহে বোমা পড়ে।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের কার্যকলাপ বিপ্লবীদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। তিনি প্রাণভয়ে বিহারের মজঃফরপুরে বদলি হয়ে যান, কিন্তু 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর নির্দেশে বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষের আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে মজঃফরপুরে যাত্রা করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে তাঁরা বোমা ছোঁড়েন। গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু তাতে

কিংসফোর্ড ছিলেন না। নিহত হন দুই নিরপরাধ মহিলা। ১ মে ক্ষুদিরাম বসু পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং ১১ আগস্ট তাঁর ফাঁসি হয়। ২ মে বিহারের মোকামাঘাট স্টেশনে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জীর নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করতে গেলে তিনি পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। বলা বাহুল্য, মজঃফরপুরের ঘটনা সমগ্র জাতির প্রাণে এক নতুন শিহরণ এনে দেয়। মানিকতলা বাগান ও বিপ্লববাদী রাজনীতির ইতিহাসে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়।

মজঃফরপুরের ঘটনার সূত্র ধরে ২ মে ভোর হবার আগেই ৩২ নং মুরারিপুকুর রোডের বাগানবাড়ি-সহ কলকাতার মোট আটটি স্থানে ব্যাপক খানাতল্লাস হয়। এছাড়া, কলকাতার বাইরে অন্যান্য স্থানে ব্যাপক খানাতল্লাসের পর শেষ পর্যন্ত ছত্রিশজন আসামীর বিরুদ্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, যুদ্ধযাত্রা ও নরহত্যার অভিযোগ এনে শুরু হয় বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা। ইতিহাসখ্যাত এই মামলায় সরকার পক্ষের উকিল ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের সুবিখ্যাত কৌঁসুলি নর্টন সাহেব। আসামী পক্ষের মোকদ্দমা পরিচালনা করতে থাকেন সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। টাকার অভাবে তাঁকে ধরে রাখা গেল না। অতঃপর চিত্তরঞ্জন দাশ আসামীদের পক্ষে এগিয়ে এলেন। এই মামলায় আসামীর সংখ্যা ছিল ৩৬ জন, সাক্ষী ছিল ২০৬ জন। দলিলপত্রের সংখ্যা ছিল ৪০০০ এবং প্রামাণ্য বস্তু হিসাবে ৫০০০ বোমা-পিস্তল-রিভলভার-গোলা-গুলি ও বিষাক্ত অ্যাসিড আদালতে হাজির করা হয়।

আলিপুর জেলে বন্দী বিপ্লবীদের কাছে আদালতে যাওয়া ছিল মজার ব্যাপার। আদালতে যাওয়ার পথে গাড়িতে উঠে তাঁরা গান ধরতেন ঃ

"আও মর্দানা জঙ্গি জোয়ানা
জলদি লেও হাতিয়ার।
গোরে তুম পর জুলুম কর্তি হ্যায়
দিন পর দিন দুনিয়া ভার ধরতি হ্যায়
সারে রূপিয়া তুমসে লেকর—আব বনে সাওকর।..."

আবার কখনো গাইতেন ঃ

"স্বদেশের ধূলি স্বর্গরেণু বলি
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞানে।।"

আদালতে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত নানা বিষয়ে আলোচনা হতো, কিন্তু বিপ্লবীরা এসম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে নিজেদের মধ্যে হৈ-হট্টগোল ও গল্প-তামাসা করতেন। ওতে আদালতের কাজের ব্যাঘাত ঘটত। বিচারক অরবিন্দ ঘোষকে অনুরোধ করতেন বিপ্লবীদের থামাবার জন্য। পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সামসুল আলমের ওপর বিপ্লবীরা ক্ষিপ্ত ছিলেন। তাঁকে দেখলে তাঁরা গান ধরতেন ঃ

"ওগো সরকারের শ্যাম, তুমি আমাদের শূল
তোমার ভিটেয় কবে চরবে ঘুঘু—
তুমি দেখবে চোখে সর্ষে ফুল।"

কারাগারের অভ্যন্তরে গান-হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব ও রঙ্গ-রসে তাঁদের সময় কাটত। অরবিন্দ ঘোষ লিখেছেন ঃ "ইহাদের আচরণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বঙ্গে নূতন যুগ আসিয়াছে।... এই বালকগণকে দেখিয়াই বোধ হইত যেন অন্যকালের অন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারচেতা দুর্দান্ত তেজস্বী পুরুষসকল আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই নির্ভীক চাহনি, সেই তেজঃপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাশূন্য আনন্দময় হাস্য। এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, মনের প্রসন্নতা, বিমর্ষতা, ভাবনা বা সন্তাপের অভাব, সেকালের তমঃক্লিষ্ট ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের নূতন জাতির, নূতন কর্ম-স্রোতের লক্ষণ।"[২১] এক কথায়, কারাভ্যন্তরে মৃত্যুভয়হীন চিত্তে আমোদপ্রমোদের মধ্যেই তাঁরা দিন কাটাতেন।

ইতিমধ্যে আলিপুর বোমার মামলায় বন্দী শ্রীরামপুরের জমিদার-সন্তান নরেন গোঁসাই পুলিশের কাছে দলের তথ্যাদি ফাঁস করে দিতে থাকেন। এতে দলটির সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে জেলের অভ্যন্তরে পিস্তল সংগ্রহ করে চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত ও মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৩১ আগস্ট নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন। কারাভ্যন্তরে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরাধীনে রক্ষিত বিশ্বাসঘাতককে হত্যা সমগ্র বিশ্বের বিপ্লববাদের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। নরেনের মৃত্যুতে ইউরোপের বিপ্লবীরাও বাহবা দেন। প্যারিসের সোস্যালিস্ট কমিউনিস্ট মুখপত্র 'Humanite' লিখেছিল, ভারতীয় বিপ্লবীরা শত্রুপুরীর মধ্যে রক্ষিবেষ্টিত স্বদেশদ্রোহীকে যেভাবে হত্যা করেছে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে তা প্রথম। একটি ব্রিটিশ পত্রিকা সেদিন কানাইলাল ও সত্যেন বসুকে গ্রীক ইতিহাসের বিখ্যাত হারমোডিয়াস ও এরিস্টগিটন-এর সঙ্গে তুলনা করে।[২২]

নরেন গোঁসাইকে হত্যার অভিযোগে কানাইলাল (১০ নভেম্বর, ১৯০৮) ও সত্যেন্দ্রনাথের (২১ নভেম্বর ১৯০৮) ফাঁসি হয়। বলা বাহুল্য, তাঁরা বীরের মতো ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে জীবনের জয়গান গেয়ে যান।[২৩] এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, স্বামী বিবেকানন্দের শৌর্যদীপ্ত আদর্শ ও গীতোক্ত আত্মার অমরত্ববাদ কানাইলাল তথা বাংলার বিপ্লবীদের প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।[২৪]

৬ মে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ঐতিহাসিক আলিপুর বোমার মামলার রায় বের হয়। অরবিন্দ ঘোষ-সহ সতের জন মুক্তিলাভ করেন। অনেকে নানা মেয়াদের কারাদণ্ড পান, অনেকের দ্বীপান্তর হয় এবং কয়েকজনের ফাঁসির হুকুম হয়। বিপ্লবীরা হাসিমুখে দণ্ডাজ্ঞা মেনে নেন।[২৫] আসলে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম পর্বের ওপর যবনিকা পাত হয়—যদিও মামলা চলাকালীন একাধিক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ নভেম্বর ছোটলাট এণ্ড্রু ফ্রেজারের ওপর কলকাতায় গুলি চলে, ৯ নভেম্বর পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। ১০ ফেব্রুয়ারি আলিপুর কোর্টের অভ্যন্তরে সরকারি উকিল আশুতোষ বিশ্বাস নিহত হন এবং

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সামসুল আলম কলকাতা হাইকোর্টে নিহত হন। বলা বাহুল্য, বঙ্গীয় বিপ্লববাদের মধ্যমণি অরবিন্দ ঘোষের অনুপস্থিতিতে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং আলিপুর বোমার মামলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় বিপ্লব আন্দোলনের আদি পর্বের অবসান ঘটে ও দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়।[২৬]* ☐

পাদটীকা

১ সত্তর বৎসর—বিপিনচন্দ্র পাল, ১৩৬২, পৃঃ ২২১-২২২

২ Memories of My Life and Times–B. C. Pal, 1973, p. 200

৩ সত্তর বৎসর, পৃঃ ২২২-২২৫

৪ নবযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল, ১৯৬৪, পৃঃ ১২৬

৫ বিস্তৃত আলোচনার জন্য : নিঃসঙ্গ—সতীশচন্দ্র দে, ১৯৫৬; ভারতে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৮৩ এবং বাংলায় বিপ্লবী প্রচেষ্টার বিস্মৃত অধ্যায়—সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, ১৯৬৭ দ্রষ্টব্য।

৬ বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : অনুশীলন সমিতির ইতিহাস—জীবনতারা হালদার, ১৯৭৭; বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ১৯৮২; ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতাসংগ্রাম—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৮৩

৭ বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : জীবনের ঝরাপাতা, সরলা দেবী চৌধুরানী, ১৩৮২ এবং জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী—যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৩৬১, পৃঃ ৪-৭

৮ উদ্ধৃত : জাগরণ ও বিস্ফোরণ—কালীচরণ ঘোষ, ১ম খণ্ড, ১৩৭৯, পৃঃ ১১৮

৯ বারীন্দ্রের আত্মকথা—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উদ্ধৃত : যুগনায়ক অরবিন্দ—জীবন মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২, পৃঃ ৮৪

১০ অগ্নিযুগ—বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৩৫৫, পৃঃ ১৪৩

১১ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৮৩, পৃঃ ২৫

১২ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ—উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১, ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা

১৩ নির্বাসিতের আত্মকথা—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৩, পৃঃ ৪

১৪ ঐ, পৃঃ ১৪৮

১৫ স্মৃতির পাতা—নলিনীকান্ত গুপ্ত, ১ম খণ্ড, ১৩৭০, পৃঃ ৪৯

১৬ ঐ, পৃঃ ৩৫

১৭ বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়, ১৯৮৩, পৃঃ ৮৮-৮৯

১৮ স্মৃতির পাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫

১৯ নির্বাসিতের আত্মকথা, পৃঃ ১৭

২০ স্মৃতির পাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫

২১ কারাকাহিনী—অরবিন্দ ঘোষ, ১৯৭৩, পৃঃ ২৯২

২২ যুগনায়ক অরবিন্দ—জীবন মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২, পৃঃ ১৮৩

২৩ বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল—শ্রীমতিলাল রায়, ১৯৬৭, পৃঃ ৫-৬; মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই—সুধীরকুমার মিত্র, ১৩৫৪, পৃঃ ১০৯-১১২ এবং ফাঁসির সত্যেন—ব্রজবিহারী বর্মন, পৃঃ ৯৪-১১১

২৪ দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দ : মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ১৯৮৮, প্রস্তাবনা।

২৫ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান—উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৯-৪০

২৬ বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার বিস্মৃত অধ্যায়—সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৮-৭৭

* ৯১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

বঙ্গাব্দ প্রসঙ্গ

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪০২ বঙ্গাব্দ শেষ হয়ে শুরু হলো ১৪০৩ বঙ্গাব্দ। নববর্ষের প্রথম দিন ১ বৈশাখ রবিবার। খ্রীস্টীয় ও হিজরী ক্যালেন্ডারের হিসাবে দিনটি হলো যথাক্রমে ১৯৯৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১৪ ও ১৪১৬ হিজরী সনের জেল্কদ মাসের ২৫ তারিখ। বঙ্গাব্দ, খ্রীস্টাব্দ ও হিজরী সনের উপর্যুক্ত তারিখগুলি যথাক্রমে ১.১.১৪০৩, ১৪.৪.১৯৯৬ এবং ২৫.১১.১৪১৬ রূপে লেখা যায়। উল্লিখিত তারিখগুলির পর পর তিনটি অংশের প্রথমটি মাসের দিনসংখ্যা, দ্বিতীয়টি মাসের ক্রমিক সংখ্যা ও শেষ অংশটি বছরের সংখ্যা নির্দেশ করে। ওপরের বর্ণনানুসারে বঙ্গাব্দের ১৪০২, খ্রীস্টাব্দের ১৯৯৫ ও হিজরী সনের ১৪১৫ বছর শেষ হয়ে গেছে। খ্রীস্টাব্দ ও হিজরী সনের বছরসংখ্যা তথা বয়স নিয়ে কোন মতপার্থক্য না থাকলেও বঙ্গাব্দের বছরসংখ্যা তথা বয়স নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের ওপর প্রকাশিত বক্তব্যগুলিই এই মতভেদের কারণ। ফলে এই অব্দ বা সনের উৎপত্তি নিয়েও বিভ্রান্তির অন্ত নেই।

বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সন নিয়ে লেখালেখি ও আলোচনা বহুকাল ধরেই চলছে। কিন্তু এর উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সর্বজনগ্রাহ্য মত এখনো জনমনে প্রস্ফুটিত হয়নি, বরং এর উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত এর যথার্থ সূচনাকাল, সঠিক বয়স ও প্রকৃত প্রবর্তককে অস্পষ্ট করে রেখেছে। অথচ বঙ্গাব্দ বঙ্গদেশের অব্দ, বাঙালীর অব্দ—বাঙালী ঐতিহ্য ও বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রতীক। খ্রীস্টাব্দ ও হিজরী সনের মতো এই অব্দের সূচনাকালেরও একটা নির্দিষ্ট তারিখ ও বার আছে, একটা আদি বিন্দু আছে। এই অব্দ বা সন সম্বন্ধে বহু বছর ধরে প্রকাশিত শতাধিক বর্ণনার সারাংশ দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক।

গত বৈশাখ ১৪০২ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এবং অন্যত্র এযাবৎকালের আলোচনার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত অব্দ বা সনের প্রবর্তক হিসাবে যে-চারটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো ঃ (১) সম্রাট আকবর, (২) সুলতান হুসেন শাহ, (৩) তিব্বতী শাসক স্রং-সন-গাম্পো ও (৪) গৌড়াধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক। এক বাঙলা পুঁথির তারিখ "সাকে ১৭২৩ যবনঃ নৃপতে সকাব্দা ১২০৮" সম্ভবত প্রথম মত-দুটির উৎস।

বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সন সম্বন্ধে আলোচনার সিংহভাগ জুড়ে আছে আকবরের নাম, তাঁর রাজ্যাভিষেক তথা সিংহাসনারোহণের বছর ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের হিজরী সংখ্যা ৯৬৩ ও ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ। পি. এম. বাকচির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা (১৩১৮, ১৩৪৮, ১৪০০ সাল), ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালের 'Chro-

nology of Nepal' (Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. XXII, 1936) শীর্ষক বর্ণনা, 'Report of the Calendar Reform Committee'-র (Govt. of India, 1955) বর্ণনা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত 'ভারতকোষ' (প্রথম খণ্ড)-এর 'অব্দ' শীর্ষক অংশ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', মুহম্মদ আবু তালিব রচিত ও বাঙলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'বাংলা সনের জন্মকথা' গ্রন্থ, ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রীর 'The Scientific Base of Indian Astrology' (1993) গ্রন্থ, ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় অব্দ প্রসঙ্গ ও নববর্ষ' ('শারদীয়া জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত', অক্টোবর ১৯৯০) শীর্ষক প্রবন্ধ, ডঃ রমাতোষ সরকারের 'প্রসঙ্গ বঙ্গাব্দ' (১ বৈশাখ ১৪০০, বাঙলা একাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ) পুস্তিকা, হরিপদ মাইতির 'বঙ্গাব্দ' ('দেশ', ১৩ আগস্ট ১৯৯৪) শীর্ষক প্রবন্ধ প্রভৃতিতে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের প্রবর্তক হিসাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্রাট আকবরের পক্ষে মতপ্রকাশ করা হয়েছে।

'বিশ্বকোষ' প্রথম ও একবিংশ ভাগ (বি. আর. পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লী) 'অব্দ' ও 'সংবৎসর' শীর্ষক বর্ণনা, ত্রিদিবনাথ রায়ের 'বাংলা সন' ('মাসিক বসুমতী', আশ্বিন ১৩৫৬) শীর্ষক প্রবন্ধ, অশোক হালদারের 'বঙ্গাব্দ' ('আনন্দবাজার পত্রিকা' রবিবাসরীয়, ২৬.৪.১৯৮৭), 'উদ্বোধন'-এর চৈত্র ১৪০০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বঙ্গাব্দের জন্মরহস্য প্রসঙ্গে' শীর্ষক আলোচনায় হুসেন শাহ বাঙলা সনের প্রবর্তক। 'Le Nepal' গ্রন্থের লেখক মঁশিয়ে সিলভাঁ লেভির মতে তিব্বতী শাসক স্রং-সন-গাম্পোর নামের অংশ 'সন' শব্দ থেকে বাঙলা সনের উৎপত্তি ও তিনি এর প্রবর্তক। 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার পূর্ব-উল্লিখিত প্রবন্ধে, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার সঙ্কলিত 'The History of Bengal', Vol. I (1943) গ্রন্থের 'Relations of Tibet with India' শীর্ষক বর্ণনা প্রভৃতিতেও এ-মতের উল্লেখ দেখা যায়।

চতুর্থ মতানুসারে গৌড়াধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক বঙ্গাব্দের প্রবর্তক। প্রখ্যাত গণিতাচার্য ও পঞ্জিকাবিদ্ নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী পরিচালিত 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'য় (১৩৮০ সাল) এ-মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ড° অজিতকুমার ঘোষের '১৪০০ সালের গলায় শতনরী হার' ('বিধাননগর সংবাদ', ১৪০০ সাল, ১ বৈশাখ সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধ, ডঃ সুখময় সরকারের 'বাঙলা বর্ষ-গণনা প্রসঙ্গে' ('উদ্বোধন', পৌষ ১৪০০) শীর্ষক নিবন্ধ, বঙ্গাব্দ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ডঃ অতুল সুরের বক্তব্য ('দেশ', ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫), ডঃ প্রসিতকুমার রায়চৌধুরীর 'বাংলা সন ১৪০০, সাল না অব্দ' ('বিভাসন', অক্টোবর-ডিসেম্বর '৯৩) শীর্ষক প্রবন্ধ, প্রলয় ভট্টাচার্যের 'আজ পয়লা বৈশাখ ১৪০০ বঙ্গাব্দ' ('ওভারল্যান্ড', ১৪ এপ্রিল ১৯৯৩) প্রবন্ধ, ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অজিতনাথ রায়ের বক্তব্য ('উদ্বোধন', আশ্বিন ১৪০২) এবং গত বৈশাখ ১৪০২ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই মত পোষণ করা হয়েছে। দেবসহায় ত্রিবেদীর 'The Fasli Era' (Journal of Indian

History, Vol. XIX, 1940) শীর্ষক প্রবন্ধেও এই মত নিয়ে আলোচনা দেখা যায়।

বলা হয়, আকবরের সিংহাসনারোহণের বছর ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের হিজরী সংখ্যা ৯৬৩ বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের প্রথম বছর এবং (১৫৫৬—৯৬৩) অর্থাৎ ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই অব্দ বা সনের গণনা শুরু। তাই আকবরই এর প্রবর্তক। কিন্তু যে-আকবর জিজিয়া কর তুলে দিয়ে হিন্দুদের প্রীতিভাজন হন, যিনি নিজে হিজরী সনের অবলুপ্তি ঘটান—তিনি কেন ৯৬৩ হিজরীকে বঙ্গাব্দের প্রথম বছর করে হিন্দুদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের বিরাগভাজন হতে যাবেন আর তারাই বা কেন ৯৬৩ হিজরীকে বঙ্গাব্দের প্রথম বছর বলে মেনে নেবে? আর আকবর বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হলে ৯৬৩ হিজরীতে ১ বঙ্গাব্দই হতো (যেমন হয়েছে 'তারিখ-ই-ইলাহী' অব্দের ক্ষেত্রে ১ অব্দ), ৯৬৩ বঙ্গাব্দ কখনোই নয়। তাছাড়া ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে বঙ্গাব্দ শুরুর কথা সত্যি হলে হিসাবেরও প্রচণ্ড গরমিল দেখা দেবে। কারণ, ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের কোন নির্দিষ্ট তারিখ থেকে ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্য এপ্রিল (৩১ চৈত্র ১৪০০ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান হয়ে যাবে ১৪০০ সৌর বছরের পরিবর্তে ১৪০১ সৌর বছর। অতএব ঐতিহাসিক জয়সোয়ালের হিসাব (১৫৫৬-৯৬৩=৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ) গোঁজামিল ছাড়া আর কিছু নয়। এই হিসাবেরই প্রতিচ্ছবি দেখা যায় উল্লিখিত পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন ও 'ভারতকোষ'-এর বর্ণনায়। তাই বলা যায়, আকবর বঙ্গাব্দের প্রবর্তক নন, ৯৬৩ হিজরী সংখ্যার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকেও এই অব্দ বা সনের গণনা শুরু হয়নি।

সুলতান হুসেন শাহ বাঙলা সন প্রবর্তন করেন বলে যে মত আছে তাও মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, পিতা হুসেন শাহ-প্রবর্তিত কোন অব্দ বা সন থাকলে তাঁর সুযোগ্য পুত্র নসরৎ শাহ কখনোই 'নছরৎশাহী সন' নামে আলাদা একটি অব্দ প্রবর্তন করতেন না। পরন্তু হুসেন শাহ-প্রতিষ্ঠিত কোন মসজিদের প্রতিষ্ঠাফলকে বাঙলা সনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সমসাময়িক কোন বইপত্র বা নথিতেও হুসেন শাহ কর্তৃক বাঙলা সন প্রবর্তনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বলা যায়, হুসেন শাহ বাঙলা সন প্রবর্তন করেননি।

শেরশাহ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের নির্মাণকর্তা, আকবর 'তারিখ-ই-ইলাহী' অব্দের প্রবর্তক, জব চার্নক আধুনিক কলকাতা নগরীর পত্তনকার—এসব ঐতিহাসিক সত্য, প্রমাণোত্তীর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের প্রবর্তক হিসাবে আকবর, হুসেন শাহ বা স্রং-সন-গাম্পোর নাম কোন ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এর পিছনে কোন প্রমাণ বা বিশ্বাস নেই। আর আকবর ও হুসেন শাহর সঙ্গে বঙ্গদেশের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয় যথাক্রমে ৯৮৩ বঙ্গাব্দ (১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ) ও ৯০০ বঙ্গাব্দ (১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দ) থেকে।

সমকালের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'-র ব্লকম্যান-কৃত ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থে আকবর কর্তৃক হিজরী সনের অবলুপ্তি, 'তারিখ-

ই-ইলাহী' অব্দ প্রবর্তন প্রভৃতির কথা থাকলেও বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সন প্রবর্তনের কোন উল্লেখ নেই। আকবরের রাজস্ব সচিব টোডরমলের 'আসল-ই-জমা তুমার' গ্রন্থেও আকবর কর্তৃক উল্লিখিত অব্দ বা সন প্রবর্তনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বর্তমান কালের কিছু বইপত্র, প্রাচীন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলক প্রভৃতিতে আকবর তথা হুসেন শাহের পূর্বে বঙ্গদেশে 'বঙ্গাব্দ'-এর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ও উত্তরজীবনে খ্যাতিমান প্রশাসক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে '১০২ বঙ্গাব্দ'-এর উল্লেখ; ১৩২০ বঙ্গাব্দে বরিশাল থেকে প্রকাশিত ও বৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড-রচিত 'চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস' গ্রন্থে 'বঙ্গাব্দ ৬০৬ সাল' বলে বর্ণনা; উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও স্বামী সারদেশানন্দ রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মসাল হিসাবে বাঙলা ৮৯১ সনের উল্লেখ; কলকাতার বৌবাজার স্ট্রীটে (বর্তমানে বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট) অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালী (ফিরিঙ্গি কালী নামেও পরিচিত) মন্দিরের বর্তমান প্রতিষ্ঠাফলকে 'স্থাপিত ৯০৫ সাল' বলে উল্লেখ; ১৩২৪ বঙ্গাব্দে শিলচর থেকে প্রকাশিত ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি-রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (উত্তরাংশ ঃ তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ) গ্রন্থে 'সন ৯০৬ বঙ্গাব্দ'-র উল্লেখ; ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত ও প্রবোধচন্দ্র বসু (প্রবুদ্ধ) রচিত 'ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বাঙলা ৯৭৩ সালের উল্লেখ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্ থেকে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ' (দ্বিতীয় খণ্ড) পুস্তকে প্রকাশিত বাঙলা ৯৮৫ সালে হাতে লেখা কাশীদাসের আদিপর্বের একখানি পুঁথির ফটো কপি প্রভৃতি বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে ও আকবর তথা হুসেন শাহ কর্তৃক এই অব্দ বা সন প্রবর্তনের কাহিনীকে ভিত্তিহীন করে দেয়।

উপর্যুক্ত বঙ্গাব্দ, বাঙলা সন বা সালগুলি পরবর্তী কালে খ্রীস্টাব্দ থেকে রূপান্তরিত (convert) করে লেখা—একথা কেউ কেউ বললেও তা ঠিক নয়। কারণ, খ্রীস্টাব্দ ব্যবহারকারী পর্তুগীজরা ১৫৩৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বঙ্গদেশে খ্রীস্টাব্দের ব্যবহার শুরু করে। কারণ, ঐ বছরেই শেরশাহের বিরুদ্ধে পর্তুগীজদের সাহায্যলাভের আশায় বাংলার সুলতান মামুদ শাহ তাদের সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন। কার্যত ইংরেজ আমলের সূচনা থেকেই বঙ্গদেশে খ্রীস্টাব্দের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

মঁশিয়ে সিলভাঁ লেভি বাঙলা সনের প্রবর্তক হিসাবে স্রং-সন-গাম্পোর নাম বললেও তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ দশকের মধ্যভাগে তিনি যদি কোন সন বা অব্দ প্রবর্তন করতেন তবে তা তিব্বতসহ তাঁর বিজিত সমস্ত অংশেই বলবৎ হতো। তাছাড়া ঠিক ঐসময় থেকে তিব্বতে কোন সন বা অব্দ প্রচলিত হয়েছে বলেও জানা যায় না।

এবার চতুর্থ মত অর্থাৎ শশাঙ্কের প্রসঙ্গ। শশাঙ্কের বংশপরিচয় এখনো অজ্ঞাত। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, গুপ্ত প্রশাসনে সামন্ত হিসাবে তাঁর শুরু, মহাসামন্তে উত্তরণ ও পরে দ্বিতীয় গুপ্ত বংশীয় রাজা মহাসেন

গুপ্তের অধীনতামুক্ত হয়ে গৌড় নামক স্বাধীন রাজত্বের সূচনা করেন তিনি। সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী হওয়ায় সমসাময়িক গ্রন্থে শশাঙ্ক সম্বন্ধে কোন সঠিক বিবরণ নেই। ঐতিহাসিকগণও শশাঙ্ক সম্বন্ধে নীরব। ফলে শশাঙ্ক সম্বন্ধে জনমনে এক বিরাট অস্পষ্টতা রয়েই গিয়েছে। বাণভট্ট, হিউয়েন সাঙ বা আবুল ফজলের মতো কোন লেখক বন্ধুও তাঁর ছিল না। আত্মভোলা. প্রচারবিমুখ, শৈবধর্মাবলম্বী শশাঙ্ক অমিত শক্তির অধিকারী হয়েও গৌড়বঙ্গে স্বাধীন রাজত্বের সূচনাকালের স্মারক হিসাবে করাননি কোন প্রতিষ্ঠাফলক, লেখেননি কোন আত্মজীবনী, রাখেননি কোন লিখিত বিবরণও। চার দশকেরও বেশি তাঁর পরাক্রমশালী রাজত্বকাল। তিনিই বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম নরপতি। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণে ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁর রাজ্যসীমা বঙ্গদেশের বাইরেও বিস্তারলাভ করেছিল। কান্যকুব্জ, উড়িষ্যা, গঞ্জাম প্রভৃতি তিনি জয় করেছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুযায়ী নিজ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রেখে ও স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করে এবং 'মঞ্জুশ্রী মূলকল্প'-র গ্রন্থকারের মতে পুত্র মানবদেবকে উত্তরাধিকারী রেখে মৃত্যুবরণ করেন তিনি (৬৩৭ খ্রীস্টাব্দ)। ডঃ কালিদাস নাগ রচিত 'স্বদেশ ও সভ্যতা' (৩য় সংস্করণ, ১৯৭২) থেকে জানা যায়, ''ষষ্ঠ শতকের শেষ অথবা সপ্তম শতকের প্রারম্ভে মহারাজ শশাঙ্ক গৌড়ে একটি স্বাধীন শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন।'' ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায়-প্রণীত 'ভারত পরিচয়' (নতুন সংস্করণ, ১৯৭২) থেকে জানা যায়, ''ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে ও সপ্তম শতকের প্রারম্ভে পূর্ব ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করে গৌড়রাজ্য। এই খ্যাতির মূলে ছিল মহারাজ শশাঙ্কের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।'' ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'শশাঙ্ক' ('ভারতকোষ', পঞ্চম খণ্ড) শীর্ষক বর্ণনা থেকে জানা যায়, ''খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে অথবা তাহার কিছু পূর্বেই তিনি (শশাঙ্ক) বাংলার স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা হন।'' অতএব বলা যায়, ১৪০০ বছরের অধিক বয়সী বঙ্গাব্দের প্রকৃত সূচনাকাল মহারাজ শশাঙ্কের আমলে হওয়াই সম্ভব। কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন, শশাঙ্কের আমলেই যদি বঙ্গাব্দের সূচনা হয়ে থাকে তাহলে প্রথম প্রায় হাজার বছর পর্যন্ত ঐ অব্দের প্রচলন-সংক্রান্ত নিদর্শনের অভাব কেন? বঙ্গদেশের প্রাচীন মন্দিরগাত্রে, বঙ্গভাষায় লেখা প্রাচীন পুঁথিপত্রে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের উল্লেখ মেলা কষ্টকর কেন?

সমসাময়িক গ্রন্থে 'ঘোরতর বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী' বলে বর্ণিত ও মরণোত্তর কালে যিনি 'কুষ্ঠব্যাধির শিকার' আখ্যায় ভূষিত সেই শৈবধর্মাবলম্বী শশাঙ্কের স্বাধীন রাজত্বের সূচনাকাল এবং ঐসময় থেকে প্রচলিত কোন সৌর অব্দের হিসাব কে রাখবে? মাৎস্যন্যায়ের যুগে বা পরবর্তী কালে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পাল ও সেন রাজাদের আমলে শশাঙ্ক বা বঙ্গাব্দ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া কি সম্ভব? পরন্তু পাল ও সেন রাজাদের পৃথক পৃথক অব্দ থাকায় তাঁরাই বা কেন বঙ্গাব্দকে লালন-পালন করে টিকিয়ে রাখতে যাবেন? আর বঙ্গদেশের প্রাচীন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে ও বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন পুঁথিপত্রে বঙ্গাব্দের

উল্লেখ? বঙ্গদেশে কটা প্রাচীন মন্দিরের (খ্রীস্টীয় ষোড়শ অব্দের পূর্বেকার) অস্তিত্ব ও কখানা প্রাচীন পুঁথির হিসাব এখন পাওয়া যায়? বলতে গেলে সেসবই তো প্রাকৃতিক কারণে এবং সম্ভবত বিধর্মীদের আক্রমণে নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে গেছে।

কোন বাদশাহী ফরমানে, সুলতানী নির্দেশনামায় বা রাজদত্ত দলিলপত্রে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সন প্রবর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কোন তাম্রশাসনে, মুদ্রায় বা অন্য কোন প্রাচীন পুঁথিপত্রে বঙ্গাব্দের সূচনাকাল সংক্রান্ত তথ্য মেলে না। বঙ্গাব্দের জন্মলগ্নের কোন জীবিত সাক্ষীও নেই। সম্ভবত এসব কারণেই ঐতিহাসিকগণ বঙ্গাব্দ সম্পর্কে নীরব। অনেকে আবার বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে আকবরের পক্ষে মত প্রকাশ করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন। তাই ঐসব ব্যক্তিরা নতুন করে আর বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চান না। সম্রাট আকবরকে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের প্রবর্তক হিসাবে মোটামুটি প্রতিপন্ন করে ঢাকার বাঙলা একাডেমি থেকে একাধিক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এবঙ্গে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক ও প্রবর্তনকাল নিয়ে কোন সার্থক গবেষণা হয়েছে বলে জানা যায় না। বঙ্গাব্দের উৎসভূমি গৌড়বঙ্গে বঙ্গাব্দের অবস্থা যেন 'নিজভূমে পরবাসী'র মতো। তাই বঙ্গাব্দের একটা বিজ্ঞানভিত্তিক সূচনাকাল নির্ধারিত হওয়া একান্ত দরকার এবং তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গাণিতিক পদ্ধতিই সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আর অব্দ, শতাব্দ, অধিবর্ষ প্রভৃতির সঠিক হিসাব ও প্রয়োগবিধি একাজের প্রধান সহায়ক।

কালবোধক বর্ষনির্ণায়ক সংখ্যাই অব্দ। কোন শাসক, ধর্মপ্রচারক বা মহাপুরুষের জীবনের বিশেষ কোন ঘটনা থেকে অব্দের সূচনা ও প্রত্যেক অব্দেরই আরম্ভ ১ থেকে। অব্দ দুপ্রকার—সৌর ও চান্দ্র অব্দ। বুদ্ধাব্দ, খ্রীস্টাব্দ, শকাব্দ, গুপ্তাব্দ, বঙ্গাব্দ, হর্ষাব্দ, মল্লাব্দ প্রভৃতি সৌর অব্দ। হিজরী চান্দ্র অব্দ। সূর্যের চারদিকে ডিম্বাকার (উপবৃত্তাকার) আপন কক্ষপথে পশ্চিম থেকে পূর্বে পৃথিবীর একবার পরিভ্রমণকাল অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড বা ৩৬৫.২৪২১৯৯ দিন সময়কে ১ সৌর অব্দ বা বছর বলে। সৌর অব্দে উল্লিখিত বর্ষমান বহু-পরীক্ষিত সত্য ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত। খ্রীস্টাব্দ, বঙ্গাব্দ প্রভৃতি অব্দগুলি সৌর বর্ষমানে গণিত। পৃথিবীর চারদিকে প্রায় গোলাকার আপন কক্ষপথে পশ্চিম থেকে পূর্বে চন্দ্রের ১২ বার পরিভ্রমণকাল অর্থাৎ ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড সময়কে ১ চান্দ্র অব্দ বা বছর বলে। হিজরী চান্দ্রমানে গণিত। এক অমাবস্যা থেকে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কে ১ চান্দ্র মাস ও এক সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে ১ সৌর দিন বলে।

সৌর অব্দের বর্ষমান পূর্ণসংখ্যক দিন না হওয়ায় এ অব্দের দিনসংখ্যাও প্রত্যেক বছর সমান থাকে না। সাধারণভাবে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা বা ৩৬৫.২৫ দিন হিসাবে বছর ধরে ৩৬৫ দিন হিসাবে সৌর বছর গণনা চলে ও প্রতি চতুর্থ বছরের দিনসংখ্যা ১ দিন বৃদ্ধি করে ৩৬৬ দিন করা হয় এবং ঐ ৩৬৬ দিনের বছরকে অধিবর্ষ (Leap-year) বলে। কিন্তু এভাবে চললে প্রতি বছরে

১১ মিনিট ১৪ সেকেন্ড ও প্রতি ৪০০ বছরে ৭৪ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট ২০ সেকেন্ড সময় বেশি গণনা হয়ে যায়। তাই প্রতি ৪০০ বছরে ৩টি করে অধিবর্ষ কমে যায়। কিন্তু এভাবে চললেও প্রতি ৩৩২৩ বছরে ২৩ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড সময় বেশি গণনা হয়ে যায়। তাই ঐ সময়ে আরো ১টি অধিবর্ষ কম হয়, অর্থাৎ ঐ সময়ে মোট অধিবর্ষের সংখ্যা হয় প্রায় ৮০৫টি। কোন অব্দের অধিবর্ষ গণনার সঠিক নিয়ম জানা থাকলে গাণিতিক নিয়মে ঐ অব্দের আদিবিন্দু নির্ধারণ করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক অব্দ খ্রীস্টাব্দের বিষয়টি ধরা যাক। ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর রবিবারে ঐ খ্রীস্টীয় বছরটি শেষ হয়েছে। সাধারণ বুদ্ধির বিচারে ঐদিনেই খ্রীস্টাব্দের ১৯৯৫টি বছর পূর্ণ হয়েছে বলা যায়। খ্রীস্টাব্দের পূর্বাপর অধিবর্ষ (জুলীয় ও গ্রেগোরিয়) গণনা-পদ্ধতি মেনে উল্লিখিত ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর থেকে পিছন দিকে (১৯৯৫ x ৩৬৫ + ৪৯৮ – ১০ – ৩) বা ৭,২৮,৬৬০ (সাত লক্ষ আটাশ হাজার ছয়শ ষাট)-তম দিন থেকেই শুরু খ্রীস্টাব্দের। উল্লিখিত ৭,২৮,৬৬০ সংখ্যাকে ৭ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় ১,০৪,০৯৪ এবং ২ ভাগশেষ থাকে। অতএব ১ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি শনিবার ছিল।

১৪০০ বঙ্গাব্দের ৩১ চৈত্র (১৪ এপ্রিল ১৯৯৪) দিনটির গুরুত্ব বঙ্গাব্দের আদিবিন্দু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অপরিসীম। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পঞ্জিকাকারগণ ১৪০০ বঙ্গাব্দ বছরটিকে অধিবর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সরকারি ও বেসরকারি মতে উপর্যুক্ত ৩১ চৈত্র দিনটি আবার বঙ্গাব্দের চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিন বলেও স্বীকৃত। সাধারণ মানুষও মনে করে, উল্লিখিত দিনেই বঙ্গাব্দের ১৪০০ বছরের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাই ঐ দিন থেকে বঙ্গাব্দের অধিবর্ষ গণনার নিয়ম মেনে ১৪০০ সৌর বছর পিছিয়ে (১৪০০ x ৩৬৫ + ৯৭ x ৩ + ২৪ + ২৫) বা ৫,১১,৩৪০ (পাঁচ লক্ষ এগার হাজার তিনশ চল্লিশ)-তম দিন থেকে শুরু বঙ্গাব্দের। উল্লিখিত ৫,১১,৩৪০ সংখ্যাকে ৭ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় ৭৩০৪৮ এবং ৪ ভাগশেষ থাকে। অতএব ১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ছিল সোমবার এবং খ্রীস্টীয় ক্যালেন্ডারের হিসাবে তারিখটি হলো ৫৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল সোমবার। যেহেতু বঙ্গাব্দের সূচনার দিনটি সোমবার, যেহেতু সোমবার দিনটি শৈবধর্মাবলম্বীদের নিকট পরম পবিত্র এবং যেহেতু বঙ্গাব্দের সূচনাকালে অর্থাৎ ৫৯৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্গদেশে মহাপরাক্রমশালী রাজা শশাঙ্ক ভিন্ন আর কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির সন্ধান মেলে না—যিনি বঙ্গাব্দের সূচনা করতে পারেন অথবা যাঁর আমল থেকে বঙ্গাব্দের সূচনা হতে পারে। তাই সঙ্গত কারণেই শৈবধর্মাবলম্বী মহারাজ শশাঙ্ক বঙ্গাব্দের প্রবর্তক এবং তাঁর আমল থেকে বঙ্গাব্দের সূচনা—একথা বলা যায়।

এখানে বঙ্গাব্দের অধিবর্ষ গণনার নিয়মটি বিশদভাবে বলা দরকার। নিয়মটি হলো : সাধারণভাবে প্রতি ৪ বছর অন্তর অধিবর্ষ হয়। বঙ্গাব্দ বছরসংখ্যা থেকে ৭ বিয়োগ করার পর বিয়োগফলকে ৪১ দ্বারা ভাগ করলে যে-ভাগশেষ থাকে তা যদি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হয় তবেই ঐ বছর অধিবর্ষ হবে

এবং ঐ বছরের চৈত্র মাসের দিনসংখ্যা ৩০ স্থলে ৩১ দিন হয়ে ঐ বছরের দিনসংখ্যা দাঁড়াবে ৩৬৬; কিন্তু ৪০০, ৫০০ ও ৬০০ দ্বারা বিভাজ্য বছরগুলি কখনই অধিবর্ষ হবে না। বঙ্গাব্দের ১ থেকে ১০০, ১০১ থেকে ২০০ এবং ১ থেকে ৪০০, ৪০১ থেকে ৮০০ বছর—এই ক্রমে প্রতি ১০০ ও ৪০০ বছরে অধিবর্ষের সংখ্যা হবে যথাক্রমে অনধিক ২৫ ও ৯৭টি করে। উপর্যুক্ত নিয়মে যদি কখনো কোন ৪০০ বছরে ৯৮টি অধিবর্ষ আসে তবে সর্বশেষ অর্থাৎ ৯৮তম অধিবর্ষটি ৩৬৫ দিনের সাধারণ বর্ষই হবে, অধিবর্ষ হবে না।

উল্লিখিত নিয়মে, ১৪০০ বঙ্গাব্দ বছরটি অধিবর্ষ। বঙ্গাব্দের ১ থেকে ৪০০, ৪০১ থেকে ৮০০, ৮০১ থেকে ১২০০, ১২০১ থেকে ১৬০০ পর্যন্ত প্রতি ৪০০ বছরে অধিবর্ষের সংখ্যা হলো ৯৭টি এবং ১৩০১ থেকে ১৪০০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অধিবর্ষের সংখ্যা ২৫টি। এই নিয়মেই বঙ্গাব্দের পরবর্তী অধিবর্ষ হবে ১৪০৫ বঙ্গাব্দ বছরটি এবং পরে, প্রথম পর্যায়ে হিসাবের পরিধি ৪৩,২০০ বঙ্গাব্দ (যদি ততদিন বঙ্গাব্দ চালু থাকে) পর্যন্ত বিস্তৃত করলে ঐ সময় পর্যন্ত বঙ্গাব্দের সঠিক অধিবর্ষ-সংখ্যা (৪৩,২০০÷৪০০x৯৭-১৩) বা ১০,৪৬৩-র সঙ্গে প্রদত্ত অধিবর্ষ গণনার সূত্রানুসারে ঐ সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত অধিবর্ষ-সংখ্যা যথাযথভাবেই মিলে যাবে। উল্লিখিত নিয়মানুসারেই ১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ৫৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল সোমবার, ৩৫১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৯ এপ্রিল মঙ্গলবার, ৭০১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ১২৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ এপ্রিল বুধবার, ১০৫১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ১৬৪৪ খ্রীস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ও ১৪০০ বঙ্গাব্দের ৩১ চৈত্র ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ছিল।

বঙ্গাব্দের উৎসমুখ তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। এজন্য কে বা কারা দায়ী তা অনুসন্ধান করার থেকে জরুরী হলো খ্রীস্টাব্দ ও হিজরী সনের মতো বঙ্গাব্দেরও একটা সর্বজনগ্রাহ্য সূচনাকাল তথা আদিবিন্দু নির্ধারণ করা। শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেও এই অব্দের একটা বিজ্ঞানভিত্তিক ও বিতর্কমুক্ত আদিবিন্দু নির্ধারিত হওয়া একান্ত দরকার। ব্যক্তিবিদ্বেষ নয়, ব্যক্তিপ্রীতি নয়, খোলা মন এবং নিরপেক্ষ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কৌতূহলী ও অভিজ্ঞজনেরা এগিয়ে এলেই বিষয়টির নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত হবে।* □

* ৯৮ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

ভারতবর্ষের জাগরণ, মুক্তিপ্রচেষ্টা এবং রামকৃষ্ণ মিশন

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইংরেজ এদেশে আসার অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে ভারতবর্ষের জীবনে একপ্রকার জড়তা সমাজ ও রাষ্ট্রকে যেন নিশ্চল ও স্থবির করে রেখেছিল। আমাদের পল্লীসমাজ-ব্যবস্থায় বহু গুণ থাকলেও মানুষের মন তাতে অতি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকত বলে স্বেচ্ছাচারী শাসকরা বাধা পেত না, মানুষ নিজের মহিমা ও পৌরুষ সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে বরং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ত, কুসংস্কার ও প্রাচীন বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকত। এদেশের চেয়ে ভাল সামরিক সংগঠন আর জোরালো অস্ত্রশস্ত্র এবং আরো বড় হাতিয়ার হিসাবে এদেশের চেয়ে উন্নত উৎপাদনী প্রথা ও মজবুত অর্থব্যবস্থা আয়ত্ত ছিল বলে ইংরেজ ভারতবর্ষের জীবনধারায় ওলটপালট এনে দিতে পারল। বিদেশী বণিকের দল জুলুম করে, নতুন জমিদারী প্রথা সৃষ্টি করে, খাজনার ভারে গ্রামবাসীর শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়ে পল্লীসমাজকে নষ্ট করল। ভারতের অজস্র দৌলত লুঠ করে তারা নিজের দেশের ধনিক-শিল্প গড়ল, কলকব্জা বসিয়ে কারখানা চালাতে লাগল। এখানকার কুটির শিল্পকে পিষে মেরে তারা এদেশে কৃষি ও শিল্পকর্মের মধ্যে যে স্বাভাবিক যোগসূত্র ছিল তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। শুধু ভারতবাসীর অনৈক্য ও পরস্পর-বিরোধ, আর ইংরেজের চক্রান্ত ও প্রবঞ্চনার জন্যই ভারতজয় ঘটেনি; এখানকার সমাজের কাঠামো ছিল এমন যে, দেশটা যেন আগে থেকে ইংরেজদের শিকার হয়ে তৈরি ছিল। কিন্তু এই ধ্বংসলীলার মধ্য থেকেই বিজেতাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুনর্গঠন শুরু হয়েছিল; নির্মম আঘাত বিনা অধঃপতিত ভারতবর্ষের নিদ্রাভঙ্গে বিলম্ব হতো; আর ইংরেজ-শাসন সেই আঘাত দিয়েই ভারতবর্ষের অগ্রগতিতে ইতিহাসের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। তাই ১৮৫৩ সালে মনীষী কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন যে, ইংরেজের অস্ত্র ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের চেয়ে প্রসারিত ও সুসংহত রাষ্ট্রিক ঐক্য স্থাপন করেছে, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের কল্যাণে তা আরো দৃঢ় ও স্থায়ী হবে, রেলপথ বিস্তারের ফলে শিল্পোৎপাদনের বিকাশ ইংরেজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটবে; কিন্তু ভারতের সমাজক্ষেত্রে যে নতুন বীজ বপন করা হয়েছে তার ফল ভারতবাসী পাবে না, যতদিন তারা নিজেরাই শক্তিশালী হয়ে ইংরেজের শাসনশৃঙ্খল চূর্ণ না করে। তাই ভারতবর্ষের জনজাগরণ ও মুক্তিপ্রচেষ্টার বিবরণ সম্পর্কে এবার আমরা মনোযোগ দেব।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত প্রকৃত চক্ষুষ্মান চেতনা এবং সুপরিকল্পনা ও সংগঠন ব্যতিরেকেই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের

পৌনঃপুনিক অভ্যুত্থানের কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। ১৮৫৭ সালের পরও এই ধারা চলতে থাকে; কিন্তু যাদের বাদ দিয়ে আধুনিক যুগে জাতীয় মুক্তিপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, সেই শিক্ষিত ও মোটামুটি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভূমিকা তখন স্পষ্ট হতে আরম্ভ হয়, ভবিষ্যতে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের সম্ভাবনা তখন সূচিত হয়। পাশ্চাত্যের ভাবধারা আয়ত্ত করার আগ্রহ ও প্রয়াস ছিল এই শিক্ষিতদের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য। সাধারণ ভারতবাসীর মনে ইংরেজ সম্বন্ধে যে জাতিবৈরীর ভাব প্রবল ছিল, শিক্ষিত শ্রেণীর ক্ষেত্রে তা ছিল অল্প, বরঞ্চ ইংরেজের নানা গুণ তাদের প্রায় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু ইংরেজের গুণ আয়ত্ত করতে গিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সর্বস্তরে মুক্তির একান্ত প্রয়োজনও ক্রমে তাদের কাছে অকাট্য হয়ে উঠল, ধীরে হলেও অনিবার্যভাবে দেশের জাতীয় স্বাধীনতা সকলেরই পরম লক্ষ্য বলে স্থিরীকৃত হলো। এই দুই ধারা মিলিত হয়ে তবেই জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছে।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আসে, ইংরেজ-শাসনের প্রধান কেন্দ্র প্রথমে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে। শিক্ষা, চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে যে-পরিবর্তন তখন লক্ষ্য করা যায়, তাকে কোন কোন লেখক ইউরোপে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে Renaissance (রেনেসাঁস বা পুনর্জন্ম) নামে যে বিপুল আলোড়ন দেখা গিয়েছিল তার সঙ্গে তুলনা করেছেন। অবশ্য ইউরোপে যে গভীর, ব্যাপক ও বেগবান ধারা তখন সেখানকার জীবনকে নবরূপে সঞ্জীবিত করেছিল, তার পাশে বাংলাদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিক উত্তেজনা ছিল একেবারে নিষ্প্রভ। কিন্তু আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশে পাশ্চাত্যের কর্ম ও চিন্তা যে প্রখর প্রভাব বিস্তার করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ''পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার, দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে''—রবীন্দ্রনাথের এই কথার যাথার্থ্য তখন দেখা যেতে আরম্ভ করেছিল। আর ভারতবর্ষের যে নিজস্ব সমন্বয়-প্রতিভা বারবার ইতিহাসে লক্ষ্য করা গিয়েছে, তারই মূর্ত প্রতীকরূপে তখন আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাশ্চাত্য চিন্তার স্পর্শে বাংলায় যে-নবজাগরণ সঙ্ঘটিত হয়, তার বিবরণে সর্বাগ্রগণ্য হলেন রামমোহন রায়।

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসভা' (১৮২৮) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে খ্যাতিলাভ করে। পরবর্তী কালে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও ব্রাহ্ম আন্দোলন সমাজসংস্কার ব্যাপারে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রভূত সহায়তা করে। দেশে ও সমাজে সৎ ও বিবেকবান কর্তব্যপরায়ণতার ধারা প্রবর্তনে ব্রাহ্মসমাজের অবদান অল্প নয়। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাব যে বাংলার সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল তার প্রমাণ হলো বোম্বাইয়ের প্রার্থনাসমাজের প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭)। মহারাষ্ট্র অঞ্চলে এর প্রতিপত্তিও সমধিক ছিল।

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রখর প্রতিকূলতার মনোভাব সৃষ্টির দিক থেকে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-১৮৮৩) অনুপ্রেরণা ও সংগঠনশক্তির প্রতীক আর্যসমাজ আন্দোলনের গুরুত্ব ব্রাহ্মসমাজ বা প্রার্থনাসমাজের চেয়ে বেশি।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্রাহ্ম ও অনুরূপ ভাবধারার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু পশ্চিমের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দিকে না তাকিয়ে বিশুদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে জাতি ও সমাজকে সুগঠিত করে তোলা ছিল দয়ানন্দের দিবারাত্রের স্বপ্ন।

১৮৮২ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত থিওজফিক্যাল সোসাইটি শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে শিক্ষাবিস্তার ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকল্পে সক্রিয় থেকে জাতীয় আন্দোলনে কিছু অবদান রেখেছিল। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি মূল্যবান হলো রামকৃষ্ণ পরমহংসের (১৮৩৬-১৮৮৬) ভাবধারা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, জাতীয় মুক্তিপ্রচেষ্টার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল শিক্ষা সকল ধর্ম ও শীলের সারবস্তু সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করায় সারা দেশে যেন নতুন উপলব্ধির সঞ্চার হতে লাগল।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) এই বাণী যেন নতুন কর্মসাধনাকে অনুপ্রাণিত করল। সর্বজনের কাছে একান্ত সহজবোধ্য ভাষা ও ভাবের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মকে সর্বগ্রাহ্য মানবতার রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ ঐতিহ্যে যিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করার কোনই সুযোগ পাননি, সেই শিশুপ্রতিম মানুষটির মাহাত্ম্য দেখে শুধু যে এদেশের অনেকে তাঁকে 'অবতার' বলে পূজা করেছে তা নয়, ম্যাক্সমূলার থেকে রোমাঁ রোলাঁ পর্যন্ত বহু ইউরোপীয় মনীষীও আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়েছেন। অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে কণ্ঠ উত্তোলন করা কেবল নয়, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে শ্রদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণ অকুণ্ঠে প্রকাশ করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্মমহাসভায় এবং পাশ্চাত্য জগতের অন্যত্র হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে দৃপ্ত ভাষণ দিয়ে অবনত ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন; বজ্রনির্ঘোষের মতো এই তেজস্বী সন্ন্যাসীর মুখ থেকে যেন ভারতবর্ষের অপরাজেয় সত্তার মহিমা দিক থেকে দিগন্তে প্রচারিত হলো। ক্লৈব্য বর্জন করে ভারতবাসী আবার জগৎসভায় তার যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করুক—বারবার এই আহ্বান বিবেকানন্দের মুখঃনিসৃত হয়ে দেশকে যেন মাতোয়ারা করেছিল। ইংরেজ সরকার এদেশে রাজদ্রোহ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য যে 'রাওলাট' কমিটি নিযুক্ত করে, ১৯১৮ সালে তার রিপোর্টে বিবেকানন্দের নামে নিন্দাবাদে তাই বিস্ময়ের কিছু নেই।

"নিশ্চল নির্বীর্যবাহু কর্মকীর্তিহীনে, ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে প্রাণ দাও, প্রাণ দাও" বলে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ যে-আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা-ই যেন প্রকাশ পেয়েছিল বিবেকানন্দের উদাত্ত বাণীতে ঃ "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার সমাজ, বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস

অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই... বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।' "

১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। সেবাধর্মে অধ্যাত্মবলের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পেয়ে, জাতির অধঃপতন, সমাজজীবনের গ্লানি ও আড়ষ্টতা এবং যুগোপযোগী সংস্কারসাধনে অক্ষমতা নিজের ব্যাপক অনুভূতি দিয়ে প্রত্যক্ষ করে এই ধর্মবীর কর্মবীররূপে পরাধীন নির্বীর্যতার বিরুদ্ধে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন : "সংগ্রামই জীবন, সংগ্রামহীনতাই মৃত্যু।" ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর ও আচারগত সঙ্কীর্ণতাকে ধিক্কার দিয়ে এই প্রথম গৈরিক-পরিহিত সাধুর কণ্ঠ থেকে মানুষের অধিকার ও জনসেবার গরিমার কথা শোনা গেল।[1]* □

পাদটীকা

১ সৌজন্য : গুণেন্দ্রনাথ মজুমদার, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

* ৯৯ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

বড় বউ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

একুশ বৎসর বয়সে গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃবিয়োগ হয়। গোপীমোহন বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। বিষয়কর্ম শিখিতেছিলেন, সম্পূর্ণ শিখিতে পারেন নাই। যত্ন পরিশ্রমে, তাহা যেন করিলেন, কিন্তু তাঁহার তিনটি নাবালক ভাই আছে, বিমাতাও জীবিতা আছেন। প্রথম চিন্তা, বিমাতা তাঁহার সহিত এক সংসারে থাকিবেন কিনা? তাহার উপর নাবালক ভাই মানুষ করা। অর্থ আছে, কুপথগামী না হয়! লেখাপড়া শেখে, অংশমতো যে-সম্পত্তির অধিকারী হইবে, তাহা ভোগ করিতে পারে, কৃতী হয়, বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীর মান-মর্যাদা রক্ষা করে, এইসকল চিন্তা দিবানিশি তাঁহার মনোমধ্যে উঠিতে থাকে। বাড়িতে দুইটি বিধবা ভগিনীও আছে, এদুইটি তাঁহার সহোদরা। তাহাদের নিমিত্ত তাঁহার পিতা কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই; সেও এক চিন্তা বটে! কিন্তু তাহাদের ভার তিনি স্বয়ং লইলেই চলিয়া যাইবে, তাঁহার অংশ হইতে তাহাদের খরচপত্র নির্বাহ হইলে আর কোন আপত্তি থাকিবে না। ভগিনী দুইটি 'চতুর্থী' করিবে, সেইকথা উপলক্ষে তাঁহার বিমাতার সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন এবং তাঁহার মনে যেসকল চিন্তা তাহাও খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন : "মা, আপনার উপর এখন দুনো ভার পড়িল! আমাকে মানুষ করিয়াছেন, আর বড় দেখিতে শুনিতে হইবে না; কিন্তু আপনার আর তিনটি সন্তানকে মানুষ করিবার ভার আপনারই উপর! কেননা আমাদের পিতা নেই!" বিমাতা উত্তর করিলেন : "কেন গোপীমোহন, তুমি বড় ভাই রহিয়াছ, তোমাকে তিনি মানুষ করিয়া গিয়াছেন, আমার ভয় কি? তুমিই দেখিবে শুনিবে!" কিন্তু একথা শুনিয়াও গোপীমোহন নিশ্চিন্ত হইলেন না, সরল ভাষায় সরলভাবে বলিতে ত্রুটি করিলেন না; বলিলেন : "মা, সংসারে চক্রী-লোকের অভাব নেই! অর্থ বড় বিবাদমূলক, ইহাতে বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা!" আরো বলিতে যান, কিন্তু সরলপ্রকৃতি বিমাতা এককথায় তাঁহার মনোভাব বুঝিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া গোপীমোহনকে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন : "গোপীমোহন, ভয় করিও না—যিনি তোমাকে মানুষ করিয়াছেন, তিনি আমাকেও তাঁহার সেবার অধিকারিণী করিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই উপদেশে সংসার চিনিয়াছি। যদিও না চিনিতাম, তাঁহার শেষ কথা আমার ইষ্টমন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, তুমি আপনার ধর্ম কর্ম লইয়া থাকিও, গোপীমোহনকে তোমার গর্ভের জ্যেষ্ঠ সন্তান মনে করিও, সাংসারিক কোন কার্যে ব্যস্ত থাকিও না, তাহারই উপরে ভার দিও। সে যদি তোমার ছেলেদের বঞ্চিত করে, করুক—তুমি কিছু দেখিও না! এই মনে বুঝিও যে, আমি তোমাকে বঞ্চিত করিলাম। যদি এইরূপ বুঝিয়া চল—আমি

স্বামী—আমার কথায় তোমার ঐহিক পারমার্থিক মঙ্গল হইবে। অশৌচ অবস্থায় দেবকার্যের অধিকার নাই। আমি আমার স্বামীর অভিমত কার্য করিব। আশীর্বাদ করি, যেন তুমিও তোমার কার্য নির্বিঘ্নে সমাধা করিতে পার।'' গোপীমোহনের দ্বিগুণ চিন্তা বাড়িল। বিমাতা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সপত্নী-সন্তান যথার্থই ভার গ্রহণ করিবে, কোন কথা কহিলেন না।

গোপীমোহন সংসারধর্ম করেন। ভাইগুলিও বশ, কথামতো চলে, স্কুলে যায়। বাড়িতে যখন মাস্টার পড়াইতে আসে, গোপীমোহন সেইখানেই বসেন। স্কুলের মাস্টারদের সহিতও আলাপ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কখনো কখনো নিমন্ত্রণাদি করিয়া বাটীতে আহারাদি করান এবং ভাইগুলির কথা বারংবার বলেন। মধ্যম ও তৃতীয় ভ্রাতা—কিশোরীমোহন, রাধামোহন—একরকম লেখাপড়া শিখিতে লাগিল; যত চেষ্টা সেরূপ নয়—যাহাই হউক একরকম শিখিতে লাগিল। কিন্তু ছোট প্যারীমোহন—কিছুই শিখিতে পারে না। মাস্টারেরা বলিতে লাগিল ঃ ''ওটা পাগল, ওটার কিছুই হবে না!'' ইহাতে গোপীমোহন সর্বদাই চিন্তিত থাকেন, ধমক দেন, কাছে বসাইয়া শেখান; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। সকল চেষ্টাই বিফল হইল; বুদ্ধিবিকাশের লক্ষণ আর কিছুই দেখা গেল না, বরং গাঢ় জড়তা বয়সের সহিত বাড়িতে লাগিল। ললিতাদেবী—গোপীমোহনের স্ত্রী; তিনিও বিশেষ যত্ন করিয়া, কত বুঝাইয়া, নিজে শিখাইবার চেষ্টা করিয়া দশমবর্ষীয় প্যারীমোহনকে 'প্রথম ভাগ' শিখাইতে পারিলেন না। প্যারীমোহনের সম্বন্ধে একদিন ললিতাদেবী গোপীমোহনকে বলিলেন ঃ ''ওর তো কিছু হইল না, বিধাতার বিড়ম্বনা কি করিবে বল? আর পীড়নে কোন ফল নেই; কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হইতে দেওয়া উচিত নয়—ছোটঠাকরুন দেবসেবা করেন; প্যারীমোহন যত পারে, তাঁহার সেই কার্যে সহকারী হউক; ফুল তুলুক, বিল্বপত্র আনুক, চন্দন ঘষুক।'' গোপীমোহন সম্মত হইলেন। ললিতাদেবী শাশুড়ির নিকট একথা প্রস্তাব করিলেন; শাশুড়ি বলিলেন ঃ ''মা, আর কেন আমাকে তোমাদের কাজে জড়াও?'' কিন্তু ললিতাদেবী নিরস্ত হইলেন না। তিনি তাঁহার পুত্রবৎ দেবরকে সঙ্গে রাখিয়া যেসকল সাংসারিক কার্য তিনি করেন, তাহারই দু-একটা কার্য করিতে বলেন। প্যারীমোহনের পক্ষে ইহা একটা আশ্চর্য মন্ত্র হইল। যে-প্যারীমোহন পাঁচ বৎসরে বর্ণের ছবি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, দুই-তিনদিনে ললিতাদেবী যেসকল সাংসারিক কার্য করেন, তাহা বুঝিতে পারিল এবং ললিতাদেবীর চক্ষের উপর সেই বৃহৎ সংসারের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। ললিতাদেবী তাঁহার স্বামীকে বলিয়া, সরকারের সহিত তাহাকে বাজারে পাঠাইতে লাগিলেন। দু-একদিনেই বাজার সরকার বুঝিতে পারিল যে, অভাগীর ব্যাটা প্যারীমোহন বাজার করা বেশ বোঝে—এ গাড়লকে ঠকাইয়া দু-পয়সা রোজগার করিবার যো নাই। সরকার যখন বাজার করে, তখন প্যারীমোহন কোন কথা বলে না, যেন অন্যমনে আছে, কিন্তু দস্তুরী বাটার সমস্ত কথা, বড় ভাজ-কে আসিয়া খবর দেয়। ভাজের কাছেই আবদার! আর কারো কাছে বড় কথাবার্তা কহে না। ভাজকে বলিল যে, আমি বাজার করতে পারি। ললিতাদেবীও দু-দশ টাকার বাজারে তাহাকে গাড়ি করিয়া একা পাঠাইতে লাগিলেন; দেখিলেন,

সে যেরূপ সামগ্রী আনে, আর কেহই সেরূপ পারে না। ক্রমে বিষয়-আশয়ের তত্ত্বাবধান ব্যতীত, অপর সাংসারিক যাবতীয় কার্য সমস্তই প্যারীমোহন করিতে লাগিল। শান্ত, নীরবে কার্য করে। ভাজের সহিতই তাহার কথা। একদিন চুপি চুপি বলিল ঃ "বউদিদি, বড়দাদাকে বলিও, মেজদাদা ও সেজদাদাকে আরো ভাল কাপড় দিতে।" ললিতাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কেন?" আর কিছু উত্তর করিল না—বোকা হইয়া রহিল। কিন্তু ললিতাদেবী কথাটি বোকার কথার ন্যায় বুঝিলেন না; গোপীমোহনকে প্যারীমোহনের কথা বলিলেন।

গোপী—কেন? আমি তো আমাদের অবস্থানুযায়ী বস্ত্র দিই। তবে খোসপোশাকী হয়, এ আমার ইচ্ছা নয়।

ললিতা—যদি উহাদের ইচ্ছা হইয়া থাকে—ছেলেমানুষ পাঁচজনকে সাজগোজ করিতে দেখে—

গোপী—কাকে দেখে? কার সহিত মিশিতে দিই? নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ আমি স্বয়ং রাখি, পাছে পাঁচটা বখাটে বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে উহাদের দেখা হয়। স্কুলের ভাল ভাল ছেলে আনাইয়া, প্রতি রবিবারে উহাদের সহিত আমোদ করিবার নিমিত্ত ভোজ দিই। তুমিও বোকার কথায় এত জেদ করিতেছ কেন?

ললিতা—নিতান্ত বোকা কিরূপে বুঝিব? যেরূপ সংসারের কার্য করিতেছে, এরূপ যে কেহ পারে, তাহা আমার ধারণা নাই।

গোপীমোহন ঈষৎ রাগিয়া বলিলেন ঃ "তোমাদের আদরেই তো গেল!" একথা আর বাড়িল না। অন্য আরেকদিন গোপীমোহনকে ললিতাদেবী বলিলেন ঃ "তোমার কাজ কেন ওকে একটু একটু শেখাও না?" গোপীমোহন ক্রোধের সহিত উচ্চ হাস্য করিলেন, বলিলেন ঃ "তোমার দেখছি, দেওরের উপর সমস্ত ভার দিয়া বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে! ক-এ আঁকড়ি দিতে জানে না, তাকে আমি বিষয়-কর্ম শেখাব? এ তোমার কুটনো কোটা বাটনা বাটা নয়!" ললিতাদেবীর উত্তর, গোপীমোহন আশ্চর্য হইয়া শুনিলেন যে, প্যারীমোহন এখন পত্র লিখিতে পারে। ললিতাদেবী বাপের বাড়িতে যেসব পত্র পাঠান, তাহা আর সরকারকে ডাকাইয়া লিখাইতে হয় না। ললিতাদেবী যদিচ পড়িতে জানিতেন, কিন্তু সাদায় কালি দিতে হইবে বলিয়া লিখিতে শেখেন নাই। গোপীমোহন আরো শুনিলেন যে, প্যারীমোহন রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া ললিতাদেবীকে শুনায়! হিসাবপত্র মুখে মুখে করিতে পারে। ললিতাদেবীর নিকট টাকা লইয়া দু-পাঁচখানা ইংরেজী বই কিনিয়াছে। কাহার নিকট শিক্ষা পাইয়াছে, জানেন না, কিন্তু পড়িতে পারে নিশ্চয়। শেষ যে বইখানি কিনিয়াছে, তাহাতে চিঠি লেখা শেখা যায়। মাঝে মাঝে যেন দু-একখানা চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। এসকল কথায় গোপীমোহনের আনন্দের সীমা রহিল না। আদর করিয়া প্যারীমোহনকে ডাকাইলেন; কিন্তু প্যারীমোহন দাদার নিকট আসিয়া একেবারে জড়ভরত হইয়া গেল। গোপীমোহন বারবার জিজ্ঞাসা করিয়া, কথার উত্তর না পাইয়া ললিতাদেবীকে বলিলেন ঃ "বাঃ বেশ কালিদাস!" সেদিন গেল। ললিতাদেবী ছাড়েন না। গোপীমোহন একখানি খাতা দিয়া বলিলেন ঃ "তোমার 'হিসাবী মুহুরীকে' দিয়া এগুলি ঠিক দেওয়াও দিকি!" সেই খাতাখানিতে ভুল ছিল, রেওয়া মিলে না, সে নিমিত্ত অবকাশ

মতো স্বয়ং হিসাব দেখিবেন বলিয়া, তাঁহার শয়নকক্ষে খাতাখানি আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পরদিনই ললিতাদেবী বলিলেন ঃ "তোমার খাতায় ভুল আমার কালিদাস ধরিয়াছে। একুশ টাকা দশ আনা খরচ পড়িয়াছে, তাহার জমা নাই।" এই ভুল ধরিতে যথেষ্ট জমা খরচ বোধ থাকা আবশ্যক। প্যারীমোহন তাহা ধরিয়াছে শুনিয়া, গোপীমোহন বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। ললিতাদেবী বলিলেন ঃ "ভাল, তোমার এরূপ কাজ যত আছে, তাহা আমাকে দাও, কেমন না প্যারী পারে দেখ!" পরীক্ষায় স্থির হইল যে, যেসকল খাতাপত্র গোপীমোহন ললিতাদেবীর নিকট হিসাব নিকাশ করিতে দিয়াছিলেন, সত্যই যদি প্যারীমোহন তাহা রেওয়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে মুহুরীয়ানায় প্যারীমোহন অদ্বিতীয়! কেননা, একটি জমা খরচ, গোপীমোহন কয়েকদিন চেষ্টা করিয়া নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। কাজকর্ম তো দেবেন, সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু প্যারীমোহন তো তাঁকে 'যম' দেখে! তাহার উপায়? সে উপায় ললিতাদেবী করিলেন। "যা তোমার আবশ্যক, পত্রে প্যারীমোহনকে হুকুম দিও।" গোপীমোহন হুকুম লিখিলেন, "প্যারী, তোমার দেওয়ানজীর নিকট গিয়া, জমিদারীর কাজকর্ম শিখিতে হইবে। কাল হইতেই কাজে যাইও।" দিনকতক বাদেই ললিতাদেবী আবার গোপীমোহনকে বলিলেন ঃ "দেখ, প্যারী বলে যে, সে জমিদারীর কাজকর্ম করিতে পারে। সে কি বলে, আমি বুঝিতে পারি না।" এবার ললিতাদেবীও স্বয়ং বিস্মিত! কেননা, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, তাঁহার স্বামী যে-কার্য করেন, তাহা বালক সমস্ত সাংসারিক কার্য করিয়া, কিরূপে অল্পদিনের মধ্যে শিখিল! কিন্তু গোপীমোহন অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি দেখেন যে, দেওয়ানজী স্বয়ং প্যারীমোহনের নিকট অবনতশির, তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ভয় করে! দেওয়ানজী দু-একটা প্যারীমোহনের নামে নালিশ করিয়াছিল যে, ছোটবাবু ছেলেমানুষ, এসব বোঝেন না, এমনি সব আলগা কথা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার উত্তর কি দিব? সেইসব নালিশ শুনিয়া গোপীমোহন বুঝিতেন যে, প্যারীমোহন ছাঁকাজালে দেওয়ানজীকে ধরিয়াছে, সেরূপ তিনি স্বয়ং পারেন না। দিনকতক এইরূপে চলে। একদিন ললিতাদেবী গোপীমোহনকে বলিলেন ঃ "প্যারীমোহন তালুক দেখিতে যাইতে চায়। তাহার মনের সন্দেহ—সকলই বেবন্দোবস্ত হইয়া আছে।" গোপীমোহনের আনন্দ হইল; প্যারী কার্যক্ষম বুঝিয়াছেন, কেননা, কলিকাতার জায়গা, জমি, বাড়ি, ঘরদোরের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছে। কিন্তু ছেলেমানুষ একা যাবে! কাহার সহিত না বুঝিয়া দাঙ্গা ফ্যাসাদ করিবে! দুই-একখানা তালুকও সেরূপ সুশাসিত নয়। শেষ প্যারীমোহনকে যে-তালুকে কোনো ভয়ের কারণ নেই, সে তালুকে পাঠাইলেন। প্রতি পত্রে বুঝিতে পারিলেন যে, প্যারী আশ্চর্য দক্ষতার সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছে, অশাসিত মহল শাসিত হইয়াছে। প্যারীমোহনকে ফিরিয়া আসিতে পত্র লিখিলেন, সে পত্রের উত্তর তাঁহার নিকট আসিল না; উত্তর ললিতাদেবীর নিকট আসিল। মর্ম এই যে, দাদাকে বুঝাইয়া আর দিনকতক তাহাকে জমিদারীতে রাখিতে হুকুম হয়। নিতান্ত আবশ্যক, গঙ্গায় একটি চর উঠিয়াছে। সেই চর লইয়া অপর এক জমিদারের সহিত বিবাদ বাধিতেছে, প্যারীমোহনের

বাসনা—সে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলে। কারণ, সে চর করগত হইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। এসকল কথা গোপীমোহনকে বলিতে নিষেধ করিয়াছে। কারণ, বিবাদের কথা শুনিলে গোপীমোহন স্বয়ং উপস্থিত হইবেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ ক্লেশ হইবে। অবশ্য ললিতাদেবী কথা গোপন করেন নাই, চিঠিখানি স্বামীকে পড়িতে দিয়াছিলেন। পত্র পড়িয়া পরদিন গোপীমোহন, প্যারীমোহন যে-তালুকে আছেন, তথায় রওনা হইলেন। আয় বৃদ্ধির নিমিত্ত যত হউক আর না হউক, প্যারীমোহনের নিমিত্ত আকুল হইলেন, না জানি বালক কি ফ্যাসাদ বাধাইয়াছে। পত্র পহুঁছিতে যতদিন প্রায় ততদিনে তিনি স্বয়ং পৌঁছিবেন, এই ভাবিয়া তিনি রওনা হইলেন। পহুঁছিয়া দেখেন, স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষ পক্ষে শতশত লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা চর দখল করিতে জমায়েত হইয়াছে। প্যারীমোহন ঘোড়সওয়ার হইয়া হুকুম দিতেছে, "মার!" এবং স্বয়ং ঘোড়া হাঁকাইয়া আগে ছুটিল, লাঠিয়ালেরা পশ্চাৎ ছুটিল! ঘোরতর দাঙ্গা হইতে লাগিল। বিপক্ষ-পক্ষ প্যারীমোহনের আক্রমণে হটিয়া গিয়া তাহাদের সীমানায় দাঁড়াইল। গোপীমোহন বলিলেন: "কি করিতেছিস?" অমনি প্যারীমোহন অশ্ব হইতে নামিয়া পূর্ববৎ জড় হইয়া গেল; ওদিকে বিপক্ষদলে আরো লোক জমায়েত হইল। তাহারা আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। লাঠিয়ালরা গোপীমোহনের মুখ চাহিয়া বলিল: "হুজুর, হুকুম দেন, ছাতু করিয়া দিই!" হুজুর হুকুম দিলেন না। বিপক্ষ দল আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্বপক্ষের লাঠিয়ালরা হুকুম না পাইয়া পৃষ্ঠ দিল। বিপক্ষ-দল হইতে একটি সড়কি আসিয়া গোপীমোহনের মাথায় বিঁধিয়া গেল। প্যারীমোহন চকিতের ন্যায়, দাদাকে অশ্বের উপর উঠাইয়া পলাইল। সড়কি বাহির হইল, কিন্তু রক্তমোক্ষণে গোপীমোহন অতিশয় কাহিল! প্যারীমোহন অতি সন্তর্পণে বাড়ি আনিলেন। আঘাত হেতু হইয়া গোপীমোহন পক্ষাঘাতপীড়ায় শয্যাগত হইলেন। এইরূপে ছয়মাস যায়। সংসার ক্রমে বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। কিশোরীমোহন ও রাধামোহন এখন সাবালক, একজন 'এল এ' দুইবার ফেল ও আরেকজন এন্ট্রান্স দুইবার ফেল হইয়া পড়াশুনা বন্ধ করিয়াছে। এখন গান, বাদ্যশিক্ষা হয়। প্যারীমোহন ললিতাদেবীকে বলিল: "মেজদাদা, সেজদাদা ঢের টাকা খরচ করিতেছে, আমি আর টাকা রাখিতে পারিব না।" ললিতাদেবী বলিলেন: "কেন, চাইলেই তুই দিবি কেন? যদি তোরে কিছু বলে, তুই ওঁর নাম করবি, যে উনি মানা করেছেন।" প্যারীমোহন বলিল: "দাদাকেও মানবে না।"

প্যারীমোহন ঠিক বুঝিয়াছিল। গোপীমোহন শয্যাগত হইবার পর নানান ধরনের লোক মেজবাবু, সেজবাবুর নিকট যাওয়া আসা করে। সময় নাই, অসময় নাই, বাবুদিগের জুড়ি হুকুম হয়। এসকল কথা গোপীমোহনের কানে গিয়াছে। ভাইদের তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। বাবুদ্বয় ইয়ার বকসি লইয়া সর্বদাই বলেন যে, তাঁহার বড়দাদা বাল্যকালাবধি শাসন করিয়া ছোটটাকে পাগল করিয়াছেন এবং তাহাদেরও খেতে পরতে না দিয়া পিঁজরায় পুরিয়া রাখিয়া একরকম উল্লুক বানাইয়াছেন। ইয়ার বকসির উত্তর: "এরূপ বেরসিক ভাই কারো দেখি নাই!" মোসাহেব কতক কতক



কর্মচারীরাও পরামর্শ দেয় যে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই চিরকাল আছে; হুজুর সাবালক হয়েছেন, আপনার সম্পত্তি আপনি বুঝে লওয়া ভাল। এইরূপ উপদেষ্টা ও শ্রোতা সংযোগে যেরূপ হয়, তাহাই হইতে লাগিল। যেরূপ কুৎসিত ধুমধাম হয়—হইতে লাগিল! গোপীমোহন সমস্তই শুনিলেন—চক্ষে জল পড়ে! ললিতাদেবী যতদূর চাপিয়া রাখিতে পারেন, রাখেন। একদিন শুনিলেন যে, পূজার দালানে একজন বেশ্যা মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছে ও মুরগির হাড়গোড় ছড়ান ছিল। ক্রোধে অধীর হইয়া গোপীমোহন ভ্রাতৃদ্বয়কে ডাকাইলেন। উভয়ে চক্ষু লাল করিয়া উপস্থিত হইল; খুব ব্যাজার ভাব! গোপীমোহন গাঙ্গাইয়া গাঙ্গাইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তাহারাও উত্তর দিতে লাগিল। উত্তর শুনিয়া গোপীমোহন যেমন তর্জন করিয়া উঠিতে যান, অমনি তাঁহার প্রাণবায়ু পিতৃলোকে উপস্থিত হইল। পিতৃস্থান অপবিত্র হইয়াছে শুনিয়া বংশধর প্রাণত্যাগ করিলেন।

ললিতাদেবী তাঁহার নিজের সহোদরকে ডাকাইয়া পার্টিশন স্যুটের নালিশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উকিলকে বিশেষ উপদেশ—যেন পার্টিশনে পূজাবাড়ি তাঁহার জিম্মায় থাকে বা প্যারীমোহনের অংশে পড়ে। একদিন প্যারীমোহন তাঁহাকে বলিলেন ঃ "বউদিদি, আমি আমার অংশ লইব না। আমি দাদাদের দিলাম।" ললিতাদেবী তিরস্কার করিতে লাগিলেন ঃ "মূর্খ, ওরা কি তোকে খেতে পরতে দেবে? দূর করে তাড়িয়ে দেবে!" প্যারীমোহন চুপ করিল। ললিতাদেবী বুঝিলেন আর বুঝাইতে পারিবেন না। তাহার পর মিষ্ট করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন ঃ "তোর অংশ থাকিলে, তোর পিতৃপুরুষের নাম থাকিবে! আমার জীবনস্বত্ব বই তো নয়! তোর থাকিলে ঠাকুরসেবা চলিবে। ওরা তো শালগ্রাম নুড়ি বলিয়া ফেলিয়া দেবে!"

প্যারী—বউদিদি, তার যো নেই। বাবার উইলে পূজার খরচ দিতেই হবে। বড়দাদার উপর ঠাকুরসেবার ভার ছিল, এখন তোমার উপর হবে। পরে তুমি যাহাকে বলিয়া যাইবে, সে ভার সে পাইবে।

ললিতাদেবী জানিতেন, বুঝিলেন সত্য কথা। শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "তোর চলিবে কিসে?"

প্যারী—তাহার ভাবনা নেই।

ললিতা—কিসে?

প্যারী—তোমার মনে আছে? আমি একদিন শালগ্রামকে দেখিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ঃ "ও নুড়িটে কি? তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?"

ললিতা—না।

অনেকদিনের কথা সত্যই স্মরণ ছিল না।

প্যারী—তুমি বলিয়াছিলে ঃ "ঠাকুর। ইনি সকলের কর্তা। ইনি সব করিতে পারেন ও সব করিতেছেন। এঁর হুকুম ভিন্ন গাছের পাতাটিও নড়ে না।" অন্য কেহ বলিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না। তুমি বলিলে, আমি অমনি দেখিতে পাইলাম, সত্যই ঠাকুর।

ললিতা—ঠাকুর তো তোকে আর হাতে করে এনে খেতে দেবে না!

প্যারী—দেবে!

ললিতাদেবী কণ্টকিতকলেবরা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কিসে জানিলি?"

প্যারী—আমায় পড়া শেখালে কে? আমায় কাজকর্ম শেখালে কে?

ললিতা—তোরে কি ঠাকুর শিখিয়েছে?

প্যারী—হ্যাঁ। আমি একদিন ঠাকুরকে চুপি চুপি বলিয়াছিলাম ঃ "ঠাকুর, আমি বড় বোকা; আমাকে মানুষ করে দেবে?" এই দেখ, ঠাকুর আমাকে মানুষ করিয়াছেন। আমার যা যখন হয়, আমি ঠাকুরকে মনে মনে বলি, আর ঠাকুর সব বলে দেয়! ঠাকুর আমায় বলেছেন, আমায় খেতে দেবেন।

ললিতা—তুই কি ঠাকুরকে বলেছিলি, "ঠাকুর, আমাকে খেতে দিও!"

প্যারী—তা কেন বলব? তোমায় কি কখনো বলি যে, তুমি আমায় খেতে দিও, তুমি তো আপনি দাও। ঠাকুর আমাদের কুলদেবতা; ঠাকুরই তো খেতে দিচ্ছে।

ললিতাদেবীর আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। তত্রাচ বলিলেন ঃ "তোর টাকা, তুই যাকে খুশি দিবি, সৎকার্য করিবি।"

প্যারী—কে করে বল? খবরের কাগজে পড়েছিলেম, টাকার নিমিত্ত বাপকে গুলি করিয়াছে! চক্ষের উপরে দেখিলাম, পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা বধ হইল! আমি বুঝিয়াছি, টাকাতে এইসব কার্যই হয়, আর কিছু হয় না। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছি, ঠাকুর হাসে!

ললিতা—কেন তুই বে করবি নে, ঘরসংসার করবি নে? পিতৃপুরুষের নাম লোপ করবি?

প্যারী—বউদিদি, ঠাকুর যদি মনে করেন, দাদাদেরই ভাল করবেন। আর যদি মনে করেন, আমি একশটা বিয়ে করলে মেরে ফেলবেন! ঠাকুর বলেছেন, ওসব ঠাকুরের কাজ। আমি ওসব করব না।

ললিতাদেবীর আর উত্তর সরিল না।

ঘোরতর মকদ্দমা চলিতেছে। আর মকদ্দমা চলিলে, কিশোরীমোহন, রাধামোহন জাল উইল আদালতে দাখিল করিয়াছে—তাহা প্রমাণ হইবে। অনন্যোপায় হইয়া কিশোরীমোহন, মাকে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছে। তিনি বড় বউকে বুঝাইয়া বিপদ হইতে রক্ষা করুন। কিন্তু বড় বউ-এর ধনুক-ভাঙা পণ, শাশুড়ির বাক্যেও অটল রহিলেন। শেষ পুত্রস্নেহে ব্যাকুল হইয়া বৃদ্ধ মাতা তৃতীয় পুত্রকে, বউকে বুঝাইতে অনুরোধ করিলেন। প্যারীমোহনও ভাজ-কে বলিল ঃ "দাদাদের ছেড়ে দাও।" ললিতাদেবী উত্তর করিলেন ঃ "তুই ভাবিসনি, আমাদ্বারা আমার শ্বশুরের ছেলেদের কোনো অনিষ্ট হবে না। আমি তাদের ভালর নিমিত্তই করিতেছি!" শেষ দাঁড়াইল, উভয় ভ্রাতা অর্ধেক সম্পত্তি বউ-এর নামে লিখিয়া দিয়া, জাল হইতে নিস্তার পাইল। মনে ভাবিয়াছিল, বউ-এর জীবনস্বত্ব বই তো নয়। যখন দান বিক্রয়ের অধিকার নেই, আমরাই তো পুনর্বার পাইব।

বড় ভাজ-এর আনুগত্য করিতে আসে; ললিতাদেবী দূর-দূর করিয়া তাড়ান। সকলে মনে করে, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতেছে। সমস্ত আয় সৎকর্মে খরচ করেন। বিধবা ননদ দুইটিকে বিশেষ যত্নে রাখেন। হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যান, পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন। সুলোকে বলে, যে-বাড়িতে

বিপদ সে-বাড়িতে যান। কিন্তু পুরুষ দেখিয়া তাদৃশ সমীহ্ করেন না। সকলের সহিত মুখ তুলিয়া কথা কন; ইহাতে কুলোকেরাও নানা কথা কয়। বিষয় কার্য প্যারীমোহনই করেন। এইসময়ে প্যারীমোহনের মার হঠাৎ বৃন্দাবন-লাভ হইল। ললিতাদেবী দুইটি ননদকে দিয়া সমারোহে 'চতুর্থী' করাইলেন। কিশোরীমোহন রাধামোহনও শ্রাদ্ধ-শান্তি করিল। প্যারীমোহন ঐ সঙ্গে দান উৎসর্গ করিল, কিন্তু সে সমস্তই ললিতাদেবীর ব্যয়ে। ললিতাদেবী, তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, যত ব্যয় করিতে পারে যেন করে। প্যারীমোহনের কাজে লোকে শতশত আশীর্বাদ করিয়া গেল।

যে-খরচের নিমিত্ত কিশোরীমোহন ও রাধামোহনের অর্থের আবশ্যক হইয়াছিল, গণনার ভিতর এত অর্থ নেই যাহাতে তাহার কুলান হয়। শীঘ্রই উভয়ে সর্বস্বান্ত হইল। অন্ন জোটে না! এমনকি দুই-একদিন কোনক্রমে কাটিয়েছে! এসময়েও অর্থ সাহায্য চাহিতে গেলে, ললিতাদেবী দেখাই করেন না। ইহাতে তাঁহার মহা নিন্দা হইতে লাগিল। নিন্দুকের জিহ্বা যাহা সৃষ্টি করিতে পারে, পাঁচটা ব্রহ্মা তাহা পারেন কিনা সন্দেহ; আর কল্পনাশক্তিতে ব্রহ্মার চৌদ্দ-পুরুষ হার মানেন। সন্তানতুল্য প্যারীমোহনের নাম, ললিতাদেবীর সহিত কুভাষায় একত্রিত হইতে লাগিল! কিন্তু তেজস্বিনী ললিতাদেবী যেরূপ ভাবে চলিতেছেন, সেইরূপ ভাবেই চলিতে লাগিলেন। দেনার দায়ে উভয় ভ্রাতারই জেল হইল। ছুট্‌লি জোচ্চুরির দাবিও দুই-একটা নয়, পেটের দায়ে একে ওকে ঠকাইতে হইয়াছে। একদিন ললিতাদেবী স্বয়ং জেলে গিয়া উপস্থিত। ভ্রাতাদ্বয় কাকুতি মিনতি করিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিল। ললিতাদেবী ঘৃণার সহিত থামাইলেন। বলিলেন ঃ "চুপ কর! তোমাদের ঋণে মুক্তি দিব, যাহা জুয়াচুরি করিয়াছ তাহা হইতেও বাঁচাইব; কিন্তু আমার অবর্তমানে যে-সম্পত্তির তোমরা অধিকারী হইবে, যদি এই দণ্ডে দেবোত্তর করিয়া দাও, তবে; নচেৎ নয়। এবং সেই দেবোত্তর সম্পত্তি যতদিন প্যারীমোহন বর্তমান থাকিবে, সেই রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। তারপর সে যাহাকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেবে, সে-ই করিবে। পরে তোমাদের পুত্র সন্তানেরা মানুষ হইলে, তাহারা সেই ভার পাইবে। তোমরা দুই ভাই কোন সংস্রবে থাকিতে পারিবে না। আপাতত তিনশত টাকা করিয়া তোমাদের মাসোহারা দিব।" অগত্যা জেলের ভয়ে, পেটের জ্বালায় উভয়কে সম্মত হইতে হইল।

সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর হইল। ললিতাদেবী তীর্থ যাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে কথা প্যারীমোহনকে বলিলেন। প্যারীমোহন বলিল ঃ "কি সম্বল লইয়া যাইবে?"

ললিতা—আমার তো কিছু নেই, ঠাকুরকে দিয়াছি, তবে কি লইয়া যাইব?

প্যারী—তোমার চলিবে কিসে?

ললিতা—ভাই, তুমি তো শিখাইয়া দিয়াছ—ঠাকুর দিবেন।

প্যারী—ঠাকুরের অনুমতি লইয়াছ কি? আরেক কথা, তুমি কি কুলদেবতাকে কেবল তোমার সম্পত্তি দিয়াছ? কায়, মন, জীবন কি অর্পণ কর নাই? তুমি কুলনারী, তুমি একা তীর্থে যাইলে কুলদেবতার তো নিন্দা হইবে না?

ললিতাদেবী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন ঃ "আমি আর তীর্থে যাইব না!"

প্যারী—সেই ভাল! তুমি না থাকিলে, ঠাকুরের সেবাকার্য ভাল হইবে না।

ললিতা—বুঝেছি, ঠাকুর যেদিন কাজে জবাব দিবেন, সেইদিন যাইব, নচেৎ আমার যাবার উপায় নাই।

ললিতাদেবী প্যারীমোহনের দাড়ি ধরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। প্যারীমোহন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। একাহারেই বিধবা কুলদেবতার সেবায় নিযুক্তা রহিলেন।

একদিন রাধামোহন বলিতেছে ঃ "মেজদাদা, উকিল বলে, 'দেবোত্তর হইতে সম্পত্তি ছাড়াইয়া লওয়া যায়'। তুমি কি বল?"

কি?—ওকথা মুখে আনিও না, উকিলের কথাতেই জালের সাজা হইত। ধর্মে ধর্মে বাঁচিয়া গিয়াছি, এবার ফাঁসি যাইতে হইবে! আমি এখন বুঝিতেছি, বউ আমাদের ভাল করিয়াছে, ছেলেপিলে মানুষ হবে—মানসম্ভ্রম থাকবে। যাহা বিষয় লইয়াছিলাম, তাহা তো দুইদিনেই ফুঁকিয়া দিয়াছি। এ পাইলেও দুই দিনে না হয় দশ দিনে ফুঁকিয়া দিব!

রাধামোহন—তবে যাউক!

কি?—রেখো। কুকর্মে সুখ নেই, তুই কি আজও বুঝিস নি?

রাধামোহন—কাজেই বুঝিতে হইবে।

কালে রাধামোহনও বুঝিল।

ঠাকুরের সম্পত্তি প্যারীমোহনের জিম্মায়।

প্যারীমোহন ঠাকুরবাড়িতেই থাকিয়া ঠাকুরের কর্ম করেন। ঠাকুরবাড়িতেই থাকেন। ঠাকুরের ভোগের সামগ্রী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিজনের নিমিত্ত যথাযোগ্য পাঠাইয়া, সমস্ত অতিথি সেবার পর যাহা বাকি থাকে—তাহাই খান। আদর্শ চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া শতশত লোক, তাঁহার নিকট উপদেশের নিমিত্ত আসিতে লাগিল। প্যারীমোহন কিছুই বলিতেন না, কেবল একটি শ্লোক আওড়াইয়া প্রণাম করিতেন—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।।
যাঁহার কৃপায় সরে মূকের বচন।
পঙ্গু যাঁর কৃপাবলে পর্বত লঙ্ঘিয়া চলে
করি সে পরমানন্দ মাধবে বন্দন।।

দুইটি ভাইপো প্যারীমোহনের কাছে থাকিত। তাহারা শ্লোকটি শিখিয়াছিল ও আনন্দে পাঠ করিত। শুনিয়া সকলে ভরসা করিত, বাঁড়ুয্যে বংশের কুলদেবতার পূজা বহুদিন থাকিবে।* □

*১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী*

সরলাবালা সরকার

আজ যথার্থই পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যখন গৃহে ছিলাম, তখন এই পথটি বড় লোভনীয় বলিয়া মনে হইত। পাখি যেমন খাঁচার পথ খুঁজে, তেমনি মন দিবানিশি পথের চিন্তাই করিত। কেবলই মনে হইত, 'কবে আমি পথে বাহির হইব?' আজ এতদিনের যেই সাধ পূর্ণ হইয়াছে, যথার্থই আমি পথে বাহির হইয়াছি।

আমি আজ পথে বাহির হইয়াছি! ভাবিলে যেন আশ্চর্য হইতে হয়। কিন্তু জগতে 'আশ্চর্য' বলিয়া কোন কথা নাই। আমি যে পথে বাহির হইয়াছি, একথা যেন আমি নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু এইতো তারকেশ্বরের রাজপথ, চৈত্রের গাজন উপলক্ষে সন্ন্যাসীর দল পথে ভিড় করিয়া চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে গগনভেদী স্বরে 'বম্ বম্ মহাদেব' ধ্বনি উঠিতেছে। সেই পথেরই একপ্রান্তে আমি দাঁড়াইয়া আছি। দাঁড়াইয়া আছি কেন, না, সন্ন্যাসীর ভিড়ে পথে চলিতে পারিতেছি না, নহিলে আমার অতি উৎকণ্ঠিত মন কখনো এমনভাবে পথপ্রান্তে আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দিত না।

মনের এই দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি যে কতদিন হইতে হইয়াছে, ভাবিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। মনে হয় যেন আমার জ্ঞানের সঞ্চারের সঙ্গে-সঙ্গেই এই উৎকণ্ঠারও সঞ্চার হইয়াছে, ক্রমশ তাহা নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে আর এই পূর্ণ একবিংশতি বৎসরে সেই উৎকণ্ঠা আর সকল ভাবের আশ্রয়ই পরিহার করিয়া কেবলমাত্র একইভাবে একাগ্র হইয়া এতই বলশালী হইয়াছে যে—আমি কুলকন্যা, কুলবধূ—আজ আমাকে পথের বাহির করিয়াছে।

দ্বাদশ বৎসরে বিবাহান্তে প্রথমে শ্বশুরগৃহে গিয়া রুগ্ন স্বামীর শুশ্রূষার ভার পাইয়াছিলাম। পুতুল খেলায় যেমন আমার তন্ময়তা ছিল, দেখিলাম পীড়িতের শুশ্রূষায়ও মন ঠিক সেইরকমই লাগিয়া গিয়াছে। তখন কি চিন্তা ছিল? কখন স্বামীকে পথ্য দিতে হইবে, কখন ঔষধ খাওয়ার সময়, কোনটি ত্রুটি হইল, এইসকল বিষয়গুলিই তখন আমার চিন্তার বিষয় ছিল। আমি প্রায় সর্বদাই স্বামীর প্রয়োজনমতো তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকিতাম। নববধূর এরূপ আচরণ অনেকে পছন্দ করিতেন না। এইরূপ আচরণে যে আমার নিন্দা হইত না তাহা নহে। কতবার স্বকর্ণে নিন্দা শুনিয়াছি—কিন্তু কি যে বিচিত্র স্বভাব, নিন্দা হইবে এজন্যও কিছুমাত্র শঙ্কা হইত না।

---

* রচনাটির সূচনায় সন্ন্যাসিনী সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন : "ইনি যোগিনী-মা নামে পরিচিতা ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার জীবনকাহিনীর কতক কতক অংশ তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছি, তদবলম্বনে এই রচনা লিখিত হইল।" সন্ন্যাসিনী যোগিনী-মায়ের পূর্বাশ্রমের পরিচয় এই রচনা থেকে জানা যায় না। তবে তিনি ছিলেন উচ্চকোটির এক সাধিকা এবং কাশীতে বাস করতেন। তাঁর নিজের মুখের কথা বলে রচনাটি উত্তমপুরুষের জবানিতে লেখা। কারো কারো মনে সংশয় জাগতে পারে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে সুপরিচিতা 'যোগীন-মা' কিনা। না, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম স্ত্রীভক্ত এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গিনী 'যোগীন-মা' নন।—সম্পাদক

পিত্রালয়ে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ ছিলেন। মা বলিয়াছিলেনঃ "চুরি করিলে শ্যামসুন্দর পাপ দেন, মিথ্যা কথা বলিলে শ্যামসুন্দর পাপ দেন।" কিন্তু আমি মাঝে মাঝে চুরি করিয়া—ঘরে চাল আলু আর পোস্ত থাকিত তাহাই লইয়া—ভিখারিদের দিতাম।—"শ্যামসুন্দর যদি পাপ দেন?" তখনই শ্যামসুন্দরের কাছে যাইতাম, বারবার প্রণাম করিয়া বলিতাম ঃ "শ্যামসুন্দর পাপ দিও না", "শ্যামসুন্দর পাপ দিও না।" শ্যামসুন্দরের দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি হাসিতেছেন, "নাঃ, শ্যামসুন্দর আমায় কখনো পাপ দেবেন না। না-হলে হাসছেন কেন?"—আমাদের সেই শ্যামসুন্দর! যে-কাজটায় বিপদে পড়ি—শ্যামসুন্দর সহায় আছেন। দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে বলি ঃ "শ্যামসুন্দর, দুধ যেন উথলে পড়ে না।" কড়ি খেলতে বসে বলি ঃ "শ্যামসুন্দর, আমার যেন ভাল 'দান' পড়ে।"

আমাদের সেই শ্যামসুন্দর! স্কুলে গিয়া শুনিলাম—মেম বলিতেছে ঃ "মাটির ঠাকুর সত্য নহে, মিথ্যা; একমাত্র ঈশ্বরই সত্য। তোমরা বল, প্রতিমা-পূজা করিব না।" মেয়েরা সমস্বরে বলিত ঃ "প্রতিমা-পূজা করিব না।" শুনিয়া রাগে আমার শরীর জ্বলিতে লাগিল। শ্যামসুন্দর তো মাটির ঠাকুর, শ্যামসুন্দর নাকি মিথ্যা? স্কুলের ছুটি হইলে সকল মেয়েদের একত্র করিয়া বলিলাম ঃ "ভাই, তোমরা বলতো শ্যামসুন্দর সত্য না মিথ্যা?" আমার কথায় সকল মেয়ের মুখ শুকাইয়া গেল, তাহার একথা মোটেই ভাবে নাই। আমি বলিলাম, খুব রাগিয়াই বলিলামঃ "শ্যামসুন্দর সত্য, সত্য, সত্য, কখনো মিথ্যা নয়। কাল স্কুলে গিয়া মেমের সম্মুখে এইকথা বলিবে।" তখনই মেমের হস্তস্থিত সেই সুগোল লম্বা বেতগাছটি সকলের স্মৃতিপথে উদিত হইল। সে বেতকে কে না ভয় করে? আবার আমার রাগকেও ভয় আছে। কয়েকজন সকাতরে বলিল ঃ "ভাই, মেম তাহলে মারবে।" মার খাবার ভয়? শঙ্কা কাহাকে বলে, সে-জ্ঞান বিধাতা আমায় দেন নাই। কেন? না, সকল মেয়েই প্রহার যে কেমন মধুর তাহা বেশ জানে, কেবল আমিই জানি না। প্রহারের সঙ্গে আমার এ-পর্যন্ত কোন পরিচয় নাই। আমি বলিলাম ঃ "আমি সকলের আগে দাঁড়াইব। মেম যদি মারে, আমি মার খাইব, বলিব যে আমিই সকলকে শিখাইয়াছি।"—মেয়েরা আমার উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আবার ভয়ও পাইতে লাগিল। যাহা হউক শেষে তাহাদের ভয় সারিয়া গেল।

পরদিন বিদ্যালয়ে ধর্মগ্রন্থ-পাঠের সময় আমি সকলের আগে দাঁড়াইয়াছি, মেয়েরা আমার কিছুদূরে পিছনে। মেমের হাতের কাছে সেই সুগোল লম্বা চকচকে বেতগাছটি আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া আমার ভয় হইবে কি, "শ্যামসুন্দরকে মিথ্যা বলিয়াছে?" তাহাই মনে করিয়া রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলিতেছিল। যাই মেম বলিল ঃ "মাটির ঠাকুর সত্য নহে, মিথ্যা" তৎক্ষণাৎ আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলামঃ "মাটির ঠাকুর সত্য, সত্য, সত্য।" আমার পিছন হইতে মেয়েরাও সেইসঙ্গে যোগ দিল। মেম একেবারে নির্বাক, রাগ করিবে কিনা তাহা যেন বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, অবশেষে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আমাকে নিকটে ডাকিয়া মৃদু মিনতির স্বরে বলিল ঃ "শরৎ, বালিকা নষ্ট করিও না!"

মেয়েরা ভাবিয়াছিল, আমাকে খুব মার খাইতে হইবে, কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত হইল। সেইদিন হইতে মেমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হইয়া গেল।

আমি দুপুরবেলায় জলখাবারের ছুটির সময় বাড়ি হইতে কোঁচড়ে করিয়া কাঁচা পেয়ারা আনিয়া সকল মেয়েদের সঙ্গে একত্রে যখন খাইতাম, মেমকেও দুটি-একটি দিতাম। অবশেষে মেমের পেয়ারার উপর অতিশয় লোভ দেখিয়া একদিন এক ঝুড়ি পেয়ারা আনিয়া দিয়াছিলাম।

শ্যামসুন্দরের কথা যখন উঠিল, তখন সেই গোয়ালার ছেলের কথা আরো দু-একটি বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। মা কথায় কথায় বলিতেন ঃ "শ্যামসুন্দর গোয়ালার ছেলে।" মার কথায় প্রথম প্রথম আশ্চর্য হইতাম, ভাবিতাম—ব্রাহ্মণ হইয়া আমরা গোয়ালার ছেলের প্রসাদ কেমন করিয়া খাই? তারপরে দেখিলাম শ্যামসুন্দর গোয়ালার ছেলে হইলে কি হয়, শ্যামসুন্দরই বাড়ির রাজা। যখন ধানভাঙা হইতেছে, তখন শুনি যে শ্যামসুন্দরের জন্য চাল হইতেছে; যখন ডালভাঙা হইতেছে, তখন শুনি যে, শ্যামসুন্দরের ডাল, হাত দিতে নাই; এইরকম তরিতরকারি দই সবই শ্যামসুন্দরের; বেশি কথা কি, খাবার জিনিস মাত্রই শ্যামসুন্দরের। তবে আর শ্যামসুন্দরের প্রসাদ না-খাইয়া উপায় কি, প্রসাদ না খাইলে কি উপবাস করিয়া মরিব? মাকে যখন বলিলাম ঃ "মা, শ্যামসুন্দর যে গোয়ালার ছেলে, প্রসাদ খাইলে জাত যায় না?" মা শুনিয়া হাসিলেন, বলিলেন ঃ "এখনো কি আর গোয়ালাই আছে, বামুন-বাড়িতে থেকে থেকে বামুন হয়ে গিয়েছে।" মা আমাদের চেয়েও শ্যামসুন্দরকে বেশি ভালবাসিতেন। একদিন ভোগ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। মা স্নান করিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইতে ছিলেন, ঘুম ভাঙিবামাত্র উঠিয়াই বলিলেন ঃ "ভোগে চুল আছে; আজ শ্যামসুন্দরের খাওয়া হয় নাই।" আমায় হাত দিয়ে দেখিয়ে গেল যে, ভোগে এই এত বড় একগাছি চুল আছে, আমার খাওয়া হয় নাই।" ভোগ আনিয়া ভাঙিয়া দেখিলেন, যথার্থই ভোগের ভিতর চুল, দেখিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন—"বেলা কি কম হয়েছে, শ্যামসুন্দর উপবাসী আছেন।" আমাদের যদি কোনদিন খাওয়া না-হয়, মা কি তাহলে কাঁদেন? জ্বর হয়ে যে কতদিন উপবাস করে থাকি, মা একদিনও তো কাঁদেন না। আর আজ শ্যামসুন্দরের খাওয়ার বেলা হয়ে গেল বলে মার এত কান্না!

শ্যামসুন্দরকে আমরা যখন-তখন গিয়া প্রণাম করিতাম। বাবা-মাকে কখনো প্রণাম করি নাই; ঠাকুরের নিকট বাবা-মা যেমন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন, কেবল সেইরকম প্রণাম করিতে শিখিয়াছিলাম। শ্বশুরবাড়ি গিয়া প্রণাম করিতে হয়, মা অনেক করিয়া বলিয়াছেন। কেমন করিয়া প্রণাম করিতে হয়, আমি তো জানি না; সকলের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, সকলে দেখিয়া হাসিয়া খুন, "এ আবার কি প্রণাম?" আবার কেহ-বা "এত বড় মেয়ে প্রণাম করিতেও জানে না?"—বলিয়া নিন্দা করে।

কথায়-কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। নিন্দা হইবে এ-ভয় আমার কোনকালে ছিল না, সেজন্য অনেকের প্রিয় হইতাম আবার অপ্রিয় হইতাম। স্বামী কিছুদিন ভুগিয়া সেবার আরাম হইলেন, মনে হইল যেন বেশ সুস্থ হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন ঃ "তুমি এবার আমায় বাঁচাইলে।" আমি হাসিতে লাগিলাম, "আমি বাঁচাইলাম! বেশ তো কথা! আমি কি শ্যামসুন্দর নাকি?" স্বামী আরাম হইলেন, কিন্তু ভাল করিয়া খাইতে পারিতেন না। আমার উপর রাঁধিবার ভার ছিল। রাঁধিতে গিয়া আমার কান্না আসিত, এত

অল্প তেল-ঘিয়ে কেমন করিয়া রাঁধিব? স্বামী রান্নাঘরে আসিয়া দেখেন, আমি কাঁদিতেছি; কান্নার কারণ জানিয়া ভাঁড়ার হইতে লুকাইয়া তেল-ঘি আনিয়া দিতেন। সকলে রান্নার খুব সুখ্যাতি করিত, কিন্তু যিনি লুকাইয়া তেল-ঘি আনিয়া দিতেন, অর্ধেক সুখ্যাতি তাঁহার হওয়া উচিত ছিল।

ছয়মাস কাটিয়া গেল। ছয়মাস পরে আমি একখানি পত্র পাইলাম, সেখানি আমার স্বামীর কোন ডাক্তার-বন্ধু লিখিয়াছেন। তাঁহার পত্রে জানিলাম, আমার স্বামী ক্ষয়রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। আরো তিনি আমায় লিখিয়াছেন, আপনার স্বামীর জীবনের স্থায়িত্বের অনেকটা আপনারই উপর নির্ভর করিতেছে। কেন, তিনি তাহা একেবারে খুলিয়া লেখেন নাই, তবে তাহার কিছু আভাস পাইয়াছিলাম।

আমার বয়স তখন ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। আকস্মিক বজ্রপাতের তুল্য এই পত্রখানি পাইয়া সহসা আমি বালিকাকাল হইতে একেবারে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইলাম। বৈধব্যই যে আমার অদৃষ্টের অখণ্ডনীয় বিধিলিপি, সেইদিন তাহা বুঝিলাম। সে বিধিলিপি কতদিনে পূর্ণ হইবে, স্বামীর আয়ু—আর কতদিন তাহা আমি জানি না, শ্যামসুন্দর জানেন; কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র ত্রুটিতেও যেন তাঁহার এই অল্পাবশিষ্ট দিন আরো হ্রাস না হইয়া যায়, সেজন্য আমি সেইদিন হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। একটি-একটি দিন যাইত; আর ভাবিতাম, জানি না আর কতদিন! সে কী দারুণ উৎকণ্ঠা! প্রতি মুহূর্ত সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণামের প্রতীক্ষায় রহিতাম। আমি যে এ-অবস্থায় প্রতি যাপন করিতাম, স্বামী তাহা অনুভবও করিতে পারিতেন না। তখন এতই কপটতা শিখিয়াছিলাম।

যেদিনের প্রতীক্ষায় দিনে-দিনে পলে-পলে এই দারুণ উৎকণ্ঠা বহন করিতেছিলাম—সেদিন আসিল, আবার সেদিন অতীতও হইয়া গেল। কিন্তু আমার কি উৎকণ্ঠার শেষ হইল? তাহা তো নয়! মন যখন শোকের জড়তা হইতে কিছু পরিমাণে মুক্ত হইল, তখন প্রথমেই মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল, "এ-জীবন কিসের জন্য?" কেন যে বাঁচিয়া আছি, বাঁচিয়া থাকিয়া যে কি লাভ হইবে, এইরূপ প্রশ্নের অঙ্কুশে মন দিবানিশি আহত হইতে থাকিল। গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইব, তখন এই আবার এক নূতন কামনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইব, এই এক নূতন উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল।

এ-জীবন এইভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। অতিশয় বেগবতী নদী যেমন উপলখণ্ডের বাধা মানে না, মনও সেইরূপ নিন্দা প্রশংসার বাধা মানে নাই, সামাজিক নিয়মেরও বাধা কখনো মানিয়া চলে নাই। কিন্তু একটু বিশেষত্ব ছিল—মন যাহা মনে করিত 'ইহাই বিধি', প্রাণপণে তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিত। তাহা কেবল এইদিকেই লক্ষ্য থাকিত, যাহা নিয়ম তাহা যেন সর্বাঙ্গসুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হয়। এইজন্য দীক্ষা লইবার পর পূজার্চনায় যখন মন নিবিষ্ট হইল, তখন সে এক বিষম রাজসিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। পূজায় ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য প্রভৃতি ষোড়শোপচারের কোন অঙ্গহানি হইত না। পঞ্চদেবতা, নবগ্রহ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতির পৃথক পৃথক পূজা করিতে দিবা অবসানপ্রায় হইত। মা আমার, আমার জন্য অনাহারে প্রসাদ লইয়া বসিয়া

থাকিতেন, কোনদিন একটুও অনুযোগ করিতেন না। কিন্তু আর সকলেই, এমনকি, পিতা পর্যন্ত আমার এই বিষম বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হইতেন।

তবুও তো মনের সেই উৎকণ্ঠার অনলদাহ নিবিল না! তৃপ্তি কোথায়?—কিছুদিন মন মন্ত্রদীক্ষা পাইয়া 'একটা কিছু পাইয়াছি'—বলিয়া যেন কতক শান্ত ছিল, কিন্তু আবার যত দিন যাইতে লাগিল, 'দীক্ষা লইয়া কি পাইলাম' মনে ক্রমশ এই বিচার উঠিতে লাগিল। পূজার্চনার নিরূপিত সময় ক্রমেই যত বাড়াই, ব্যাকুলতাও তত বাড়িয়া যায়। "কোথায় তুমি হে উপাস্য, আমার আকাঙ্ক্ষার নিধি! এ-জীবনে ধরা তো দিলে না। তবে আর এ বৃথা জীবন বহন করিয়া ফল কি? প্রতিদিন এই সকাল, এই সন্ধ্যা, এই আহার নিদ্রা নিত্যকর্ম ইহা ভিন্ন জীবনে আর কি আছে? পূজার্চনা—সেও তো নিয়মিত নিত্যকর্ম মাত্র! এমন জীবন আর আমার সহ্য হয় না।" একদিন স্নান করিতে গিয়া মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিলাম, 'এ-জীবন আর রাখিব না।' দুর্দম মনোবেগ আজ আমাকে আত্মহত্যারূপ পাপের পথে প্রবৃত্ত করিল। সাঁতার দিতে আমি মৎস্যের মতো পটু, তবে কেমন করিয়া ডুবিব? জল লইবার জন্য যে-কলসি আনিয়াছিলাম, তাহাই গাত্রমার্জনী সাহায্যে দৃঢ় করিয়া গলায় বাঁধিলাম, বাঁধিয়া ধীরে-ধীরে নদীতে নামিয়া নিশ্চিন্তমনে জলে ডুবিলাম। জলে ডুবিতেছি বলিয়া মনে কোন বিশেষ ভাবের উদয় হইল না।

জলে ডুবিয়াই প্রথমে সমস্ত শরীরে কী যেন এক ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হইল! মনে হইতে লাগিল, আমার সমস্ত লোমকূপ দিয়া তড়িৎপ্রবাহ নির্গত হইতেছে, আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন শত-শত তারা জ্বলিতেছে, পদতল হইতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত কী যেন এক তড়িৎপ্রবাহ ছুটাছুটি করিতেছে! আমার নিজের অনিচ্ছাতেও গলার কলসি খুলিয়া ফেলিবার জন্য কতই চেষ্টা করিলাম। তখন জলে ডুবিয়া মরিতেছি অথবা কি করিতেছি তাহা বোধ ছিল না; তখন সেই দুঃসহ অনির্বচনীয় যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা হইতে পাইবার চেষ্টা—ইহাই কেবল অনুভবের আয়ত্তে ছিল।

কিন্তু সে-যন্ত্রণা আর অধিকক্ষণ রহিল না, তাহার পরেই যেন স্বপ্নের আবেশের মতো একটা ভাবের শীতলস্পর্শে সকল যন্ত্রণা জুড়াইয়া গেল। মনে হইল যেন অগাধ স্বপ্নসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছি। জীবনের প্রতিদিনের কত শত ঘটনা ধীরে ধীরে স্বপ্নের মতো আমার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, কোন ঘটনা সুখের রাগে রঞ্জিত ও কোনটি দুঃখাশ্রুতে অভিষিক্ত। কিন্তু সেসকল অতীত সুখ-দুঃখ এখন আর মনকে স্পর্শ করিতেছে না, অতি লঘু মেঘের মতো কেবল মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে মাত্র। কেবল এক অপূর্ব শান্তিপ্রবাহ এই সলিলপ্রবাহের মতো অথবা জননীর বাহুবেষ্টনের মতো আমার প্রাণ-মন বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আঃ, সে কী শান্তি! যেন আমি বহুদিনের পরিশ্রান্ত, আমার চক্ষে আজ মধুময় নিদ্রার আবেশ আসিয়াছে। ক্রমশ সেই সুষুপ্তি-সমুদ্রে আমি একেবারে ডুবিয়া গেলাম। ডুবিয়া গিয়া এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম। সে কি স্বপ্ন, না প্রত্যক্ষ দর্শন? তাহা আমি এখনো নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। স্বপ্নই হউক অথবা সত্যই হউক যাহা দেখিলাম, সোহাগা যেমন স্বর্ণের সঙ্গে একেবারে গলিয়া মিশিয়া যায়, আমার জীবনের সঙ্গে তাহা যেন একেবারে মিশিয়া গেল। যে-স্বপ্ন নিবিড় আনন্দতুলিকায়

চিত্রিত; এমন আনন্দ, যে, সে কেবল অনুভবের সামগ্রী, বাক্য তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না।

গভীর স্বপ্নে ডুবিয়া আমি যে কোথায় ছিলাম, তাহা কিছুই জানিতে পারি নাই। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম, আমি জলের উপর ভাসিতেছি, গলায় কলসি কি জানি কেমন করিয়া খুলিয়া গিয়াছে। এত দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছিলাম, তাহা কেমন করিয়া খুলিল ভাবিয়া আশ্চর্যবোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক, সেদিন আত্মহত্যার বাসনা একেবারে ডুবাইয়া দিয়া গৃহে ফিরিলাম।

তাহার পর জীবনের আরেক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমার কোন আত্মীয় কাশীধামে গিয়া কিছুদিন যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। তিনি গৃহে আসিলে কেহ কেহ তাঁহার নিকট 'ক্রিয়া' লইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল। এই 'ক্রিয়া' পদার্থটি কি জানিবার জন্য আমারও মন কিছু উৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা 'ক্রিয়া' লইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল, তাহারা যখন কেহই প্রার্থনা করিয়া প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হইল না, তখন অগত্যা আমারও সেবিষয়ে ঔৎসুক্য পরিহার করিতে হইল। কিন্তু একদিন, কেন জানি না, তিনি নিজেই আমার নিকট আসিয়া বলিলেন : "তুমি ক্রিয়া লইবে?" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম : "তাহাতে ফল কি হইবে?" উত্তরে তিনি বলিলেন : "বাহ্য বিষয় হইতে মন বিনিবৃত্ত হইয়া যাহাতে ভগবৎপাদপদ্মে সংলগ্ন হয়, এই 'ক্রিয়া'র ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য।" অনেকে প্রার্থনা করিয়াও যাহা পায় নাই, আমি শ্যামসুন্দরের কৃপায় অযাচিতভাবে তাহাই পাইলাম ভাবিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইল। যে অবধি তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইলাম, নিদ্রা সেই অবধি একেবারে আমাকে পরিত্যাগ করিল। পরীক্ষা সম্মুখে উপস্থিত হইলে বিদ্যার্থী যেভাবে রজনী যাপন করে, সমস্ত রজনী 'ক্রিয়া' লইয়া আমি সেইভাবেই যাপন করিতাম। কখনো বা গুরুদেবের চরণ সন্নিধানে উপস্থিত হইবার জন্য মনে প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইত। রাত্রিকালে—আমি রমণী—আমার পক্ষে এরূপভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া নিতান্তই অবিধেয় ভাবিয়া মনকে সংযত করিতাম। কিন্তু আমি যে রমণী, তাহা তো সকল সময় স্মরণ থাকিত না। আমার এই ক্রিয়া লইবার কথা কেবল আমার মা ও ছোট ভাই চণ্ডী জানিতেন। মাকে বলিতাম : "মা, তুমি আমার ঘরের দরজায় শিকল দিয়া রাখিও। কি জানি হঠাৎ যদি আমি মনের ভুলে বাটী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাই, তবে লোকে তোমাদের নিন্দা করিবে।"

আমার সেসময়ের মনের অবস্থা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? ঘরে আগুন লাগিলে গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য লোকের যেমন আগ্রহ হয়, আমারও গৃহত্যাগ করিবার জন্য সেইরূপ মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সংসার যেন দাবানলের মতো মনে হইত; লোকে যেসকল সাংসারিক বিষয়ে আলাপ করিত, তাহা যেন আমার কর্ণরন্ধ্র দগ্ধ করিত। নিদ্রা তো পূর্বেই গিয়াছিল, তখন আহারেও বিষম বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। লোকের সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। একবাটি ঘি আমার সমস্ত দিনের আহার ছিল, কিন্তু ঘি পুষ্টিকর দ্রব্য বলিয়া শরীর বিন্দুমাত্র দুর্বল হয় নাই। মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন সহসা একদিন একখানি মাসিকপত্রের পাতা উলটাইতে উলটাইতে একটি প্রবন্ধ চোখে পড়িয়া গেল। প্রবন্ধটির নাম 'করমেতি বাঈ'। প্রবন্ধটি

পড়িতে আরম্ভ করিয়া আর ছাড়িতে পারিলাম না। ক্রমশ যখন পড়িলাম, কৃষ্ণের উদ্দেশে গৃহত্যাগিনী বালিকা করমেতি আত্মীয়-স্বজনের চক্ষে পড়িবার ভয়ে গলিত উষ্ট্রের উদরগহ্বরে কেবল কৃষ্ণ-নামামৃত পান করিয়া তিনদিন যাপন করিলেন, তখন আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিল; হাত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল, ইহা বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু তাহার পর আর বিন্দুমাত্রও জ্ঞান ছিল না।

সাতদিন সেইরূপ অচৈতন্য অবস্থায় চলিয়া গিয়াছিল। বাবা সপরিবারে নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, বাড়িতে কেবল একা আমি ছিলাম। আমি কাহারও সহিত মিশিতে ভালবাসি না বলিয়া কেহ আমার বড় একটা উদ্দেশ লইতেন না। কেবল একজন—তাঁহাকে আমি মাসিমা বলিতাম—তিনিই মাঝে মাঝে আমার খোঁজ লইতেন। সাতদিন পরে তিনিই আসিয়া আমার উদ্দেশ লইয়াছিলেন।

গৃহে আর কিছুতেই থাকিব না। এতদিনে সমুদায় দ্বিধা একেবারেই ছিন্ন হইয়া গেল। এবার কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে চলিলাম। সে কোথায়? কোথায় তাঁহার উদ্দেশ পাইব? তখনই মনের ভিতর হইতে উত্তর পাইলাম, করমেতি যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে—সেই বৃন্দাবনে!

শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া গৃহের বাহির হইলাম। শ্যামসুন্দর! তুমি তো এই ঘরেই ছিলে, তবে ঘর ছাড়িয়া আবার কোথায় তোমাকে খুঁজিতে চলিলাম? আমি তাহা জানি না। ঘরে যখন ছিলাম, তুমিই আমাকে গৃহে রাখিয়াছিলে; আজ যে পথে বাহির হইয়াছি, তুমিই আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছ। কোথায় লইয়া যাইতেছ, তুমিই তাহা জান।

আজ আমি রাজপথে দাঁড়াইয়া আছি। আমার গৃহ নাই, আশ্রয় নাই, সঙ্গীও কেহ নাই। একি আনন্দ, একি মুক্তি! এই যে বিচিত্র লোকপ্রবাহ রাজপথ দিয়া চলিয়াছে, ইহার মধ্যে আমি নিঃসঙ্গ, আমি একক। সঙ্গের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিঃসঙ্গের পরিপূর্ণতায় আমার চিত্ত আজ ভরিয়া উঠিয়াছে।

আমি পথের একধারে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একটি ছোট ছেলে আসিয়া আমার আঁচল ধরিয়া টানিল। ছেলেটির বয়স ছয়-সাত বৎসর হইবে। কী যে তাহার সুন্দর মুখখানি—যেন ভালবাসায় মাখা! আঁচল ধরিয়া টানিয়া সে আমাকে কী যেন বলিতেছিল, কিন্তু আমি তাহা শুনিতে পাইলাম না, কেবল 'বম্ বম্ মহাদেব জয় শিব শঙ্কর' ধ্বনিই কানে আসিতেছিল। আমি তাহার কথা শুনিতে পাইতেছি না দেখিয়া সে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। অল্প দূরে দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা ছোট একখানি বাড়ি ছিল, সেই বাড়ির দরজায় নিয়া আসিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "কেন বাবা, তুমি আমাকে এখানে আনিলে?" সে হাসিয়া বলিল ঃ "মা তোমায় ডাকছেন, ঐ দেখ মা আসছেন।" তাহার নির্দেশমতো চাহিয়া দেখিলাম, দরমা-ঘেরা উঠান দিয়া মা আসিতেছেন, মা-ই বটে, মুখের দিকে চাহিলেই 'মা' বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে। মা আসিয়া হাসিয়া বলিলেন ঃ "আমি ঐ জানালা দিয়া দেখিলাম, আপনি ওখানে দাঁড়াইয়া আছেন। আমার মনে হইল, যেন আপনার আজকালের ভিতর কিছুই আহার হয় নাই। তাই খোকাকে দিয়া আপনাকে ডাকাইয়াছি। দয়া করিয়া আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন

কি?'' আমি মায়ের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ''যথার্থই আমি দুইদিন অনাহারে আছি'', আশ্চর্য হইয়া ভাবিলাম, ''ইনি তাহা কি করিয়া জানিলেন!'' রাজপথ দিয়া তো কত লোক যাতায়াত করে, কে কাহাকে দেখে, কেই বা কাহার উদ্দেশ লয়? এমন কে আছে, যে পথের লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, ''তুমি কি অনাহারে আছ?''—এই বিশাল জনতার একপার্শ্বে যে একজন গৈরিকবস্ত্রধারিণী দাঁড়াইয়া আছে, গৃহস্থবধূর তাহার দিকেই বা দৃষ্টি পড়িল কেন?

শ্যামসুন্দরের এই বিচিত্র লীলার কথা ভাবিতেছি, এমন সময় শিশুর জননী আমাকে পুনরায় বলিলেন ঃ ''মা, গৃহী বলিয়া কি আপনি আমার গৃহে ভিক্ষা লইতে ইতস্তত করিতেছেন?—মা, আজ দশমী, আপনি বোধ হয় দুই-তিনদিন অনাহারে আছেন, আমি করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, আজ আপনি এই গৃহে ভিক্ষা লইয়া কৃতার্থ করুন।'' তিনি এই কথা বলিয়া জোড়হাতে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমিও জোড়হাত করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। বলিলাম ঃ ''মা, তোমার অন্ন গ্রহণ করিলে আমার কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। যথার্থই আমি দুইদিন অনাহারে আছি। তুমি তোমার সন্তানকে যাহা খাইতে দিবে দাও।''

বাড়ির উঠানের একপাশে ঢেঁকিশাল, সেখানে ছোট একটি উনান ছিল। শিশুর জননী অতি সত্বর সেইস্থান মার্জন করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। একটি ছোট ঘড়ায় এক ঘড়া জল, পিতলের একটি জলপাত্র, একটি মালসা, আতপ চাল, কাঁচকলা ও কিছু মাখন, রন্ধনের এইসকল উপকরণ আনিয়া দিলেন। আমি সেই পবিত্র অন্ন রন্ধন করিয়া শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করিলাম। সে অন্নে যেন অমৃতের আস্বাদ ছিল। সেই অন্ন আহার করিয়া আমার শরীর ও মনের সমস্ত জড়তা দূর হইয়া গেল।

আহার শেষ হইলে গৃহস্থবধূ আবার আমার নিকটে আসিলেন। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ''মা, যদি তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ না কর, তবে আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তুমি এখন কোথায় যাইবে?''

আমি বলিলাম ঃ ''আমি পশ্চিমের পথে চলিয়াছি, যেদিন যতদূর পারি চলিব।''

গৃহস্থবধূ বলিলেন ঃ ''তবে মা, তুমি আজ রাত্রিটা এখানে যাপন কর। কাল আমাদের একজন পরিচিত লোক বর্ধমান যাইবেন। তাঁহার সঙ্গে তুমি বর্ধমান পর্যন্ত যদি যাও, তাহা হইলে তোমার পথ চলার অপেক্ষা একটু শীঘ্র যাওয়া হইবে।''

সে-রাত্রি সেই গৃহেই থাকিলাম। পরদিন যখন বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন প্রায় অপরাহ্ণ। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়া যেখানে কাঁকরঢালা পথে পাদচারীরা চলিতেছে, সেখানে একটি আলোকস্তম্ভের কাছে আমি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া লোকের ব্যস্তগতি আর যাওয়া-আসা দেখিতেছিলাম। কেবলি কি যাওয়া আর আসা? আর কিছু নয়? আমাকে এখন কোথায় যাইতে হইবে? যাওয়া-আসা দেখিয়া সেকথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

দিনের আলো ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। একজন আসিয়া আলোক জ্বালিয়া দিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে আরেকটি ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া

দাঁড়াইলেন। তিনি যে অনেকক্ষণ হইতে আমাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, আমি পূর্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। তিনি একটু সঙ্কোচের সহিত আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ "মা, আপনি কোথায় যাইবেন?" প্রশ্ন করিবার তাৎপর্য আমি প্রথমে ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন ঃ "আপনি অনেকক্ষণ এখানে একা দাঁড়াইয়া আছেন দেখিতেছি। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। বর্ধমানে কি কেহ আপনার আত্মীয় আছেন?" আমি বলিলাম ঃ "আমি আজ প্রথম বর্ধমানে আসিয়াছি। এখানে আমার পরিচিত কেহ নাই।"

তিনি বলিলেন ঃ "তবে আপনি রাত্রে কোথায় থাকিবেন, তাহা বোধকরি এখনো স্থির করেন নাই। যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আমি আমার কোন পরিচিতের গৃহে যাহাতে আপনি রাত্রি-যাপন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি। সেখানে আপনার কোন অসুবিধা হইবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "সে কোথায়? স্টেশন হইতে কতদূর?"

তিনি বলিলেন ঃ "বেশি দূর নয়।"

আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। যিনি 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে যাইতে আমার কিছুই দ্বিধা হইল না। কিছুদূর চলিয়া অবশেষে একটি বাড়ির নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন ঃ "এই বাড়ি"—বলিয়া দরজার কড়া নাড়িলে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তিনি আমাকে দুয়ারে রাখিয়া আগে ভিতরে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে ডাকিলঃ "আসুন মা, উপরে আসুন।"

আমি তাহার সহিত উপরে গিয়া দেখিলাম, দ্বিতলের বারান্দায় একখানি আসন পাতা আছে। স্ত্রীলোকটি আমাকে সেই আসনে বসিতে বলিয়া নিজে মাটিতে বসিল।

আমি তখন তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার হাতে দুগাছি সোনার বালা, পরিধানে একখানি রেশমী বোম্বাই শাড়ি, কিন্তু সধবার চিহ্ন সিন্দূর অথবা লৌহ কিছুই নাই। দেখিয়া আমার আশ্চর্য বোধ হইল। কোন বিধবা যে এইরূপ প্রৌঢ় বয়সে অলঙ্কার ধারণ করিবেন অথবা বোম্বাই শাড়ি পরিবেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, অথচ এ রমণীর সধবার চিহ্ন সিঁথিতে সিন্দুর অথবা হাতে লোহাও নাই। এ তবে আমি কোথায় আসিলাম?

আমি সেই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি আসিয়াছিলেন, তিনি কোথায়?" রমণী বলিল ঃ "তিনি স্টেশনে কাজ করেন, তাঁহার সময় নাই বলিয়া আপনাকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "এ বাড়ি কার?"

স্ত্রীলোকটি বলিল ঃ "আপনি বর্ধমানের বামা কীর্তনীর কি নাম শুনিয়াছেন? আমি সেই বামা কীর্তনী, এ বাড়ি আমার।"

স্ত্রীলোকটি এইকথা বলিবামাত্র আমার সম্মুখবর্তী গৃহ ও গৃহসজ্জার দিকে দৃষ্টি পড়িল। আমি যে কোথায় আসিয়াছি, এতক্ষণে তাহা বুঝিলাম।

আমি বলিলাম ঃ "মা, তোমার কল্যাণ হউক। আমি চলিলাম। তোমার গৃহে রাত্রিবাস করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইও না।" বলিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া কীর্তনী আসিয়া আমার

সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর জোড়হাত করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে বলিলঃ "তুমি যে আমার গৃহে একরাত্রি বাস করিবে, এ আশা আমার নিতান্ত দুরাশা। আমি তোমাকে সে অনুরোধও করিতাম না। কিন্তু মা, আমি শুনিলাম বর্ধমানে তুমি আজ নূতন আসিয়াছ, এখানে তোমার চেনা লোকও কেহ নাই। আজ একাদশী, তুমি সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছ। এইজন্য আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আজিকার রাত্রি তুমি এখানে থাকিয়া আমার গৃহ পবিত্র ও আমাকে উদ্ধার কর। মা, তুমি যাঁর পূজা কর, তিনি তো পতিতপাবন; তবে তোমার পতিতকে এত ঘৃণা কেন মা?"

কীর্তনী এমন আন্তরিকভাবে করুণস্বরে এই কথাগুলি বলিল যে, শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আমি তাহা নিবারণ করিতে পারিলাম না।

কীর্তনী আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, দেখিলাম তাহার চোখেও জল আসিয়াছে। গদগদ স্বরে বলিল ঃ "মা, আমি নিতান্ত হীনা, কি দিয়া তোমার আতিথ্য সৎকার করিব জানি না। তুমি যদি দয়া করিয়া আজ এ-গৃহে থাক, তবে আমি রাত্রে তোমাকে কীর্তন গাহিয়া শুনাইয়া আমার জীবন সার্থক করিব—ইহাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।"

পিপাসায় আমার প্রাণে দাবানল জ্বলিতেছে, কে তুমি মা তাহাতে শীতল বারি ঢালিবার আশা দিতেছ? আর আমি কোথায় যাইব? সেই শীতল বারান্দায় শয়ন করিয়া সারারাত্রি কীর্তনসুধা পান করিয়া শীতল হইলাম। সে যে কী মধুর কীর্তন আমি জীবনে আর ভুলিতে পারিব না! কীর্তন গাহিতে গাহিতে কীর্তনী কখনো চোখের জলে ভাসিতেছে, আবার কখনো তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সুরের ঝঙ্কারে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতেছে। ক্রমে যেন সমস্তই নিস্তরঙ্গ একাকার হইয়া গেল। কোথায় আছি তাহা আর মনে রহিল না। কোথা দিয়া রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। যেন এক নিমেষে রাত্রি ফুরাইয়া গেল।

প্রভাতের অরুণালোকে চারিদিক যখন আলোকিত হইল, তখন কীর্তনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে কীর্তন শেষ করিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণে ও রোদনে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহার মুখের যে কী শোভা! আমার তখন তাহাকে দেখিয়া আর মানবী বলিয়া মনে হইল না। যেন কোন ব্রজবালা ছলনা করিয়া এই বেশ ধারণ করিয়াছেন। কীর্তনী আমাকে বলিল ঃ "মা, কাল হইতে তুমি উপবাসী আছ, আজ অনাহারে কেমন করিয়া তোমাকে বিদায় দিব। যদি কীর্তন শুনিয়া আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে দয়া করিয়া আজ এখানে অন্নগ্রহণ কর।"

কীর্তনীর কথা শুনিয়া সহসা আমার জননীর কথা মনে পড়িল। মা বার-বার বলিতেন ঃ "বেশ্যার ও বিষয়ীর অন্নগ্রহণ করিলে দ্বাদশ বৎসর কৃষ্ণভক্তির উদয় হয় না।" মা যাহা বলিতেন তাহা আমি ধ্রুব-সত্য বলিয়া জানিতাম। জানিতাম—মার কথা কখনো মিথ্যা হয় না।

কিন্তু এখন আমি কি করিব? আজ যিনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া আমাকে এই কীর্তনসুধা পান করাইলেন, তাঁহার সকাতর অনুনয় আমি কেমন করিয়া উপেক্ষা করিব? কেমন করিয়া বলিব, "তুমি পতিতা, তোমার গৃহে

আমি অন্নগ্রহণ করিতে পারিব না।'' ইনি পতিতা?—একথা যে আমি মনেও ধারণ করিতে পারি না। আমার এখন মনে হইতেছে যে, ইহার পদধূলিতে সর্বাঙ্গ ভূষিত করিলে বুঝি বা আমার শ্মশানহৃদয়েও কৃষ্ণপ্রেমমন্দাকিনী প্রবাহিত হইবে। কৃষ্ণলীলামৃতসমুদ্রে যার চিত্ত দিবানিশি মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সে কি আবার পতিতা হয়? তার কি আবার পাপ-পুণ্য থাকে?

তবুও জননীর কথা বারবার মনে বাজিতে লাগিল। তাহাও ভুলিতে পারি না। মা যখন একথা বলিতেন, তখন তো কোনদিন মন দিয়া সেকথা শুনি নাই। এতদিন পরে আজ সহসাই বা কেন সেকথা মনে পড়িল! শ্যামসুন্দর, আজ তুমি আমাকে একি বিষম পরীক্ষায় ফেলিলে!

আমি যে মনে মনে ইতস্তত করিতেছি, কীর্তনী তাহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া বলিলেন ঃ "মা, তবে কি পতিতার—তোমার সেবা করিবার ভাগ্য হইবে না?" এমন করুণস্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল যে, আমার মনের বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া গেল। "দ্বাদশ বৎসর কৃষ্ণভক্তি হইবে না", না হউক, তবুও আমি এখানেই অন্নগ্রহণ করিব—মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বলিলাম ঃ "আমার জন্য কিছু চাল ও রন্ধন করিবার একটি নির্জন স্থান দিবে। সেখানে আমি রন্ধন করিয়া লইব।"

কীর্তনীর বাড়ির কাছে একটি পুকুর ছিল, সেখানে স্নান করিয়া আসিলাম। তাহার কাছেই একখানি ছোট ঘর। স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলাম, সেখানে রন্ধনের দ্রব্যাদি ও একখানি নূতন কাপড় আছে। কাপড় ছাড়িয়া সেই কাপড় পরিলাম। রন্ধন করিয়া যখন শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করিতে গেলাম, তখন দেখিলাম, অন্নের ভিতর একগাছি চুল আছে। সে-অন্ন আর শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করা হইল না। কীর্তনী জানিতে পারিলে দুঃখিত হইবেন জানিয়া মালসা সহিত অন্ন পুকুরের জলে ডুবাইয়া দিলাম ও তাহার পর কীর্তনীর নিকট বিদায় লইয়া তাহার বাটী হইতে বাহির হইলাম।

গেরুয়া কাপড় পরিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। গেরুয়া রঙ দিয়া ছোপানো কাপড়খানিকে আমার বর্ম বলিয়া মনে হইত। পথে বাহির হইয়া শত-শত লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে কখনো নিমেষের জন্য মনে যদি কোন সঙ্কোচ উপস্থিত হইত, পরিধানের গেরুয়া কাপড়খানির দিকে দৃষ্টি পড়িলে, সেই মুহূর্তেই সকল সঙ্কোচ কাটিয়া যাইত। এই সংসারের সঙ্গে পূর্বে আমার যে-সম্বন্ধ ছিল, এখন তো আর সে-সম্বন্ধ নাই। যেদিন আমি গেরুয়া কাপড় পরিয়াছি, সেইদিন হইতে আমার নিকট জগৎ ভিন্ন-বেশ ধারণ করিয়াছে। এখন আর ভাই-বোন, স্বামী-পুত্র, পিতা-মাতা কিছুই আমার নাই, এখন জগৎ আমার নীলমণিময়! মায়ের কি আর সন্তানের কাছে সঙ্কোচ থাকে? মনে আছে, গেরুয়া পরিবার বহুদিন পরে, একদিন স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, স্বামী আসিয়াছেন। স্বামী যেন কত দূরদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য আমি দিবানিশি কাঁদিয়াছি, আজ বহুদিন পরে তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার খুবই আনন্দ হইতেছে, কিন্তু গেরুয়া কাপড় যে পরিয়াছি, তাহাও বেশ মনে আছে। একবার ভাবিতেছি, স্বামী তো আসিয়াছেন, এখন কি আবার আমি হাতে বালা পরিয়া, সেই বৌ-বৌ খেলা করিব?—তাহা তো কিছুতেই হইবে না। তাই স্বামীকে—খুব যেন আমি জ্ঞানী—এইরকম

ভাবের বড় বড় কথা বলিতেছি। বলিতেছি ঃ "তুমি এসেছ বলে যে আবার হাতে বালা পরিয়া বৌ হইব, তাহা তো আর হইবে না, আমি যে এখন মা। আমার তো স্বামী-পুত্র-পিতা-ভ্রাতা নাই, সকলেই আমার সন্তান। তোমাকে আমি তো আর কিছুই ভাবিতে পারিব না!" বলিতে বলিতে আবার লজ্জাও করিতেছে, তিনি আমার মুখে এইসব বড় বড় কথা শুনিয়া কী না জানি ভাবিতেছেন!—দেখিলাম, তিনি যেন আশ্চর্য হইয়া নির্বাকভাবে আমার দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার মুখ যেন বড়ই ম্লান। বোধ হয়, তিনি মনে দুঃখ পাইয়াছেন, দেখিয়া আমারও দুঃখ হইল। কিন্তু কী করিব, উপায় তো নাই! গেরুয়া কাপড় যখন পরিয়াছি, আর কি আমি ঘর-সংসার করিতে পারি? এখন মনে হয়, সে যেন খেলার ঘর! তা আমি কিছুতেই পারিব না। এইকথা ভাবিতে ভাবিতে দেখি—তাঁহার মুখ আর ম্লান নাই, তিনি যেন হাসিতেছেন। তাঁহার হাসি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, ঘর-সংসার পাতিয়া খেলা করার আর তাঁরও ইচ্ছা নাই।

এখন অনেকবার মনে হয়, এ গেরুয়া কাপড়ের বিড়ম্বনা কেন? পথে বাহির হইলে যখন 'মাতাজী' বলিয়া কেহ নির্দেশ করে, কেহ 'ভৈরবী' বলে, কেহ-বা আসিয়া প্রণাম করে, তখন গেরুয়া কাপড়ের প্রতি রাগ হয়; কিন্তু তবুও আমি এই গৈরিকবস্ত্র বড় ভালবাসি, এ আমার বর্ম! আমার রাগ-বিরাগ, শোক-দুঃখ কিছুই মনে আসিয়া বাজিতে পারে না, আমি যে গেরুয়া কাপড়ের বর্ম পরিয়া আছি! আজ পথে বাহির হইয়া কি যেন অভাব মনে হইতে লাগিল। পথ যে গৃহ নহে—পথ—এ বোধ তো এতক্ষণ ছিল না; এখন যেন পথে বাহির হইয়া সহসা আপনাকে দিশাহারা মনে হইল। নিমেষের জন্য যেন খেই হারাইয়া গেল; কি করিব, কোথায় যাইব, কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। এক নিমিষমাত্র! তাহার পরেই পথে চলিলাম। এমন সময় দেখি—কীর্তনী আমার গেরুয়া কাপড়খানি হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। "মা, তুমি কাপড়খানি ফেলিয়া আসিয়াছ"—বলিয়া সে আমার হাতে কাপড় দিল। তাই বটে! আমার পরিহিত বস্ত্রখানি তো গেরুয়া কাপড় নয়! আবার আমি কীর্তনীর গৃহে গিয়া বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া আসিলাম।

স্টেশন কোন্ দিকে, তাহা মনে ছিল না; কিন্তু পথে দুই-একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই, তাহারা স্টেশনের পথ দেখাইয়া দিল। কিন্তু স্টেশনে কেন আসিলাম? আসিয়াই এইকথা আমার মনে হইল। স্টেশনে যাত্রীরা সকলেই ব্যস্ত, পোঁটলা-পুঁটলি, স্ত্রী-পুত্র লইয়া উদ্বিগ্ন ও ট্রেন ধরিতে পারিবে না—এই আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত। পশ্চিমে যাইবার হাঁটা-পথ কোন্ দিকে, দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই বিশেষ কোন উত্তর দিল না। তাহারা যেরূপ ব্যস্ত, তাহাতে তাহাদের পক্ষে উত্তর দিবার সময়ও ছিল না। আমি আর বেশি লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না; কেননা, সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; অন্ধকার রাত্রি, হয়তো পথ চিনিয়া চলিতে পারিব না। বরং এখানেই কোন একস্থানে বসিয়া রাত্রিটা কাটাইয়া ভোর হইলেই পথ চলিতে আরম্ভ করিব। আবার ভাবিলাম, অনর্থক বসিয়া রাত্রি কাটানো অপেক্ষা চলিলে বরং অনেকটা পথ চলা হইবে। যদি বাঁধা রাস্তা হয়, পথে গর্ত না থাকে, অন্ধকারে চলিবার আর বিশেষ কি ব্যাঘাত হইবে? এত কথা যে মনে হইল,

ইহার কারণ এই যে, অস্থির মন চলিবার জন্যই ব্যগ্র, কিন্তু শরীর মনের সে-কথায় কিছুতেই সায় দিতে চাহে না। আচ্ছা, এই দেওয়ালের কাছে হেলান দিয়া একটু বসি, ভিড় কমিলে কাহারো নিকট পথ জানিয়া লইব। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া, স্টেশনের কোণের দিকে যেখানে বেশি লোক-চলাচল নাই, সেখানে গিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিলাম। বসিবামাত্র পিঠের কাছে কি একটা শক্ত জিনিসের মতো বোধ হইল, আঁচলে যেন কি বাঁধা আছে। খুলিয়া দেখিলাম, কয়েক আনা পয়সা!

"শ্যামসুন্দর, আমি যে আর চলিতে পারিতেছি না, তাহাও তুমি বুঝিতে পারিয়াছ!"

মনে হইল—এই ট্রেনেই উঠিয়া চলিয়া যাই; কিন্তু কোথায় যে টিকিট কিনিতে হয়, জানি না। তখন প্রথম ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে, ট্রেন ছাড়িবার আর বেশি সময় ছিল না। টিকিটের ঘর খুঁজিতে খুঁজিতেই গাড়ি চলিয়া গেল, সে ট্রেনে আর যাওয়া হইল না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পশ্চিমের গাড়ি আবার কিছুক্ষণ পরে আসিবে। যেখানে টিকিট বিক্রয় হয় খুঁজিয়া লইলাম, সেখানে গিয়া সেই কয়েক আনা পয়সা দিলাম। টিকিট-বিক্রেতা জিজ্ঞাসা করিল ঃ "কোথাকার টিকিট?" বলিলাম ঃ "এই পয়সায় পশ্চিমের পথে যে স্টেশন পর্যন্ত ভাড়া হয়, তাহারই একখানি টিকিট দাও।" শুনিয়া সে কিছু আশ্চর্য হইয়া আমার দিকে চাহিল; কিন্তু কোন কথা না বলিয়া আমার হাতে টিকিট দিয়া স্টেশনের একজন লোককে ডাকিয়া বলিল ঃ "ভিড় কম এমন একটা গাড়ি দেখে এঁকে উঠিয়ে দিস।"

যে-গাড়িতে উঠিয়াছিলাম, তাহাতে একটিও লোক ছিল না। ট্রেন ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময় একদল ছেলে আসিয়া উঠিল। তাহাদের বয়স উনিশ-কুড়ি-বাইশ-তেইশ এইরকম হইবে। তাহাদের সঙ্গে বোঁচকা-বুঁচকি কিছুই ছিল না; কাহারো হাতে ছড়ি, কাহারো হাতে ছাতা, একজনের সঙ্গে হুঁকা আর তামাক সাজিবার সরঞ্জাম ছিল। সে ট্রেনে উঠিয়াই তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল। আমি একপাশে গিয়া বসিয়াছিলাম; আমাকে প্রথমে তাহারা দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া "বাঃ রে বাঃ! এ যে দেখছি ভৈরবী ঠাকরুন"—বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গীরা 'হো হো' করিয়া শিয়ালের মতো সেই চিৎকারে যোগ দিল। তাহার পর খুব জোরে হাততালি পড়িতে লাগিল। আমি নিস্তব্ধ হইয়া কোণে বসিয়া তাহাদের এই কাণ্ড দেখিতেছি আর মনে মনে "তৃণাদপি সুনীচেন" "তৃণাদপি সুনীচেন" ঘন-ঘন জপ করিতেছি। আগ্নেয়গিরি যেমন ফাটিয়া যায় তেমনি আমার মনের ভিতর রাগ ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে—আমি "তৃণাদপি সুনীচেন" মন্ত্র পড়িয়া তাহাকে থামাইয়া রাখিতে চাহিতেছি। কিন্তু শুধু শিয়ালের মতো চেঁচাইয়া তাহারা নিরস্ত হইল না। একজন তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে করিয়া 'ভৈরবী ঠাকরুন! তামাক ইচ্ছা করুন' বলিয়া আমার হাতে দিতে আসিল। যথাসম্ভব সংযতভাবে উত্তর দিলাম ঃ "আমি ভৈরবী নই।" কিন্তু ক্রমশ তাহারা যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল, তাহাতে সংযম রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। অবশেষে একজন যখন আমার গৈরিক বস্ত্রাঞ্চলে হাত দিল, তখন 'তৃণাদপি' মন্ত্র স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল! আমি তাহাদের

কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই; কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তাহারা খুবই রাগিয়া গিয়াছিল। একজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল: "তোর তো বড়ই সাহস দেখছি, আমরা এগার জন, আর তুই একা—তোর গার্জেন কে আছে? যদি আমরা তোর উপর অত্যাচার করি, কে তোকে রক্ষা করতে পারে?" এইকথা শুনিবামাত্র আমার সমস্ত শরীর দিয়া যেন একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, সম্মুখে নৃমুণ্ডমালিনী অট্ট-অট্ট হাসি মুক্তকেশা রণরঙ্গিনী কালীমূর্তি। আমার মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছিল, চুল খুলিয়া গিয়াছিল, কিছুই আমি জানিতে পারি নাই। কেবল মনে পড়ে—দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়াছিলাম—"আমাকে কে রক্ষা করিবে? আয়, তোরা আয়। দ্যাখ, আমি তোদের কতজনকে খেতে পারি?" ইহার পর যে কি হইয়াছিল, তাহা আমার কিছুই মনে পড়ে না।

যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম—আমি বেঞ্চের উপর শুইয়া আছি। একজন আমার মাথায় জল দিতেছে, আরেকজন বাতাস করিতেছে। আমি উঠিয়া বসিলাম। বসিবামাত্র 'মা! মা! মা!' বলিয়া সেই এগারটি ছেলে আমার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িল। কক্ষের যে-বাতাস কিছু আগে অশ্রাব্য বাক্যের দুর্গন্ধে দূষিত হইয়াছিল, তাহাই আবার 'মা! মা! মা!' এই স্বর্গীয় সঙ্গীতের সুরভিতে পরিপূর্ণ হইল। আমি যে কোথায় আছি, কিছুক্ষণ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেই 'মা! মা! মা!' ধ্বনিতে কান ও প্রাণ ভরিয়া গিয়াছিল। ঠাকুর, কী শীতল জল দিয়াই তুমি কি দাবানল নিবাইলে! এ জল না হইলে তো সে আগুন নিবিত না! তাহারা আমার পায়ে পড়িয়া আছে, আমি তখনো কোন কথা বলিতে পারিতেছি না। জোড়হাতে তাহারা কেবল বলিতেছে: "মা! ক্ষমা কর; মা অধম সন্তানের দোষ ক্ষমা কর।" আমি বলিলাম: "উঠ বাবা গোপাল, আর আমার তোমাদের উপর রাগ নাই।" কিন্তু আমার শরীর এত দুর্বল যে, আমি যেন পড়িয়া যাই, কোনরকমে কাঠে ভর রাখিয়া বসিয়া আছি। তাহারা বলিল: "মা, এই তুমি—তোমার কী মূর্তিই দেখেছিলাম! কালীমূর্তি দেখেছি, কিন্তু কালী যে কেমন, তাহা আজ জীবন্ত দেখেছিলাম। তোমার সে ভয়ঙ্করী মূর্তি এখনো ভাবতে ভয় হচ্ছে। তোমার সে-মূর্তি দেখে আমাদের আর জীবনের আশা ছিল না।" এইরকম তাহারা কত কথা বলিল। শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, শ্যামসুন্দর আমার, আজ মাকালী হইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। মা নহিলে আর কে সন্তানকে রক্ষা করে? মা, মা, মা! শক্তিরূপা মায়ের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম!

ট্রেন স্টেশনে আসিয়া থামিল; তাহারা সকলে একই স্টেশনে নামিবে। সকলের একই গ্রামে বাড়ি। আমাকেও তাহাদের সঙ্গে নামিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল। বলিল: "মা, অপরাধী সন্তানগণের বাড়িতে পায়ের ধূলা দিয়া যদি পবিত্র কর, তবে নিশ্চয়ই জানিব—তুমি আমাদের মার্জনা করিয়াছ।" আমি বলিলাম: "বাবা, আমি অন্তরের সঙ্গে তোমাদের ক্ষমা করিয়াছি; সন্তানের উপর কি মার রাগ থাকে?" কিন্তু তাহারা কোনমতেই বুঝে না। অবশেষে বলিল: "মা, তুমি রাত্রে একা এই গাড়িতে যাবে, পথে নানা ভয়। বরং রাত্রি কাটাইয়া সকালে তোমার স্নানাহার হইলে, আমরা ট্রেনে তুলিয়া দিয়া যাইব।" আমি বলিলাম: "বাবা, রাত্রে আমার ভয় কি?

তোমরা একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 'তুমি অসহায়া, তোমার অভিভাবক কে আছে?' এখন দেখ—তোমরাই আমার অভিভাবক হইয়াছ, আমার পাছে কোন অনিষ্ট হয়, সেজন্য ভাবিতেছ। তোমরা স্বচ্ছন্দমনে বাড়ি যাও, আমার অভিভাবক আমার সঙ্গে-সঙ্গেই আছেন। আমার কোনখানেই কোন ভয় নাই।" আমি যখন কিছুতেই নামিলাম না, তখন তাহারা আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

এই ছেলেগুলির সঙ্গে বহুকাল পরে আরো একবার দেখা হইয়াছিল। তখন আমি মুঙ্গেরে সীতাকুণ্ডের নিকট থাকিতাম। সেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ছিলেন, গৃহীও অনেক আসিতেন। ঐ এগারজনও একত্রে, বোধ হয় আমোদ করিবার উদ্দেশে, সেইসময় একবার মুঙ্গেরে আসিয়াছিল। তাহারা সীতাকুণ্ড-দর্শনে আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইল। আমার তাহাদের কথা স্মরণ ছিল না, তাহাদের চিনিতেও পারি নাই। কিন্তু তাহারা প্রত্যহই আসিয়া আমার কাছে বসিয়া ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিত। একদিন কতকগুলি লেখা কাগজ আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল ঃ "মা, ইহাতে এক অপূর্ব সতীর কাহিনী আছে, দয়া করিয়া পড়িয়া দেখিবেন।" কিছুদূর পড়িয়াই আমার রেলগাড়ির কথা স্মরণ হইল; দেখিলাম—সেই ঘটনাটিকে সাজাইয়া, গুছাইয়া ও অতিরঞ্জিত করিয়া উপন্যাসের মতো লেখা হইয়াছে। তখন তাহাদের চিনিতে পারিলাম এবং কি জানি, তাহারা মুঙ্গেরে হয়তো এইরূপ অতিরঞ্জিতভাবে কত কি বলিয়া বেড়াইবে—তাহাদের পক্ষে সেইরূপভাবে বলিয়া বেড়াইবারই সম্ভাবনা—ভাবিয়া, সেই রাত্রে সীতাকুণ্ড ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম।

যাহা হউক, স্টেশনে ছেলের দল নামিয়া গেলে, আমি আর বসিতে পারিলাম না; অবসন্নভাবে বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলাম। শরীর এতই অবশ হইয়াছে যে, হাতখানি যে তুলি, এমন ক্ষমতাও আর আমার নাই; পিপাসায় কণ্ঠতালু হইতে বুক পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে, মাথা তুলিবার পর্যন্ত ক্ষমতা নাই, কিন্তু ইহার পরের স্টেশনেই আমাকে নামিতে হইবে, সেই পর্যন্ত আমার টিকিট। পরের স্টেশনে যখন গাড়ি আসিয়া থামিল, তখন বেশ সহজভাবেই উঠিয়া গাড়ি হইতে নামিলাম। স্টেশনটি ছোট, দুটি-একটি আলো টিম-টিম করিয়া জ্বলিতেছে। গভীর রাত্রি, স্টেশনে লোকের মধ্যে কেবল স্টেশন-মাস্টার ও একটি কুলিকে দেখিতে পাইলাম। যাত্রীর মধ্যে কেবলমাত্র আমি একা নামিলাম। নামিয়া এই রাত্রে আর কোথায় যাইব, স্টেশনেই এক পার্শ্বে বসিয়া রাত্রি কাটাইব ভাবিলাম; ভাবিয়া স্টেশনের এক পার্শ্বে গিয়া আবার দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিলাম। স্টেশন-মাস্টার দুই-একবার লণ্ঠন হাতে করিয়া আমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিলেন। অবশেষে একবার আমার কাছে আসিয়া, হাতের লণ্ঠনটি তুলিয়া ধরিয়া আমাকে দেখিলেন, দেখিয়া চলিয়া গেলেন। আবার ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "আপনি কি রাত্রে স্টেশনেই থাকিবেন?" আমি কোন উত্তর দিলাম না। পিপাসায় আমার গলা এত শুকাইয়া গিয়াছিল যে, উত্তর দিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ উত্তরের আশায় দাঁড়াইয়া থাকিলেন; অবশেষে, কি ভাবিয়া জানি না, আমাকে বলিলেন ঃ "আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে—আপনার বড় পিপাসা হয়েছে, এই জমাদার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, এ মাজা ঘটিতে জল এনে দিলে

আপনি খাবেন কি?" প্রশ্ন শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম, অতিকষ্টে উত্তর দিলাম ঃ "হাঁ।" স্টেশন-মাস্টার দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পরে জমাদারকে সঙ্গে নিয়া আসিলেন। জমাদারের হাতে খুব বড় একটা ঘটি, তাহাতে এক ঘটি জল; জল খাইয়া দেখিলাম—জল নহে, অতি সুশীতল সরবত।

একথা এতদিন পরেও বলিতে গিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে! শ্যামসুন্দরের লীলা আমি ভাবিতে গেলে সবই ভুলিয়া যাই, বলিয়া কি বুঝাইব? এ কী অপরূপ লীলা!—সেই রাত্রি, সেই স্টেশন, আর সেই জলের ঘটির কথা ভাবিলে, আমার মনে যে কী তরঙ্গ উথলিয়া উঠে, সে কি বলিয়া বুঝাইতে পারি? এমন একবার নয়, কত শতবার ঠিক এইরকমই হইয়াছে। এক-বস্ত্রে পথে বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু জীবনে অভাব কাহাকে বলে, জানি না।

মনে করিতে গেলে, কত কথা মনে পড়ে। একবার এলাহাবাদে ওপারে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক সাধু মহারাজ থাকিতেন। আমি ভিক্ষার্থে কোথাও যাই না, অন্নের জন্য কোন চেষ্টা করি না দেখিয়া, একজন দয়ার্দ্র হইয়া প্রতিদিন একটি লোটায় করিয়া ডালে-চালে মিশাইয়া চুলায় বসাইয়া রাখিয়া যাইতেন। আমার সকল দিন সমানভাবে যাইত না। যেদিন উঠিতাম, উঠিয়া চুলায় আগুন দিয়া খিচুড়ি করিয়া লইতাম। যেদিন না উঠিতাম, সেদিন চাল-ডাল সহিত লোটা চুলায় বসানো থাকিত, চুলা জ্বালা হইত না। একদিন দশমী, সেদিন আমি আর উঠি নাই, পরদিন প্রাতে স্নানে গিয়া শুনিলাম, আজ একাদশী, শুনিয়া নিশ্চিন্তভাবে আসিয়া যথাস্থানে বসিলাম। তাহার পরদিন প্রাতে দেখি—ভয়ানক ক্ষুধা উদরে যেন আগুন জ্বলিতেছে। এত সকালে কি খাইব, কোথায়ই বা খাইতে পাইব? ভাবিলাম—গঙ্গায় যাই, স্নান করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল খাইলেই ক্ষুধার শান্তি হইবে। কিন্তু স্নান করিয়া ক্ষুধা আরো বাড়িয়া গেল, অঞ্জলি ভরিয়া যত জল খাই, জঠরানল যেন ততই জ্বলিয়া উঠে—সে যে কী ক্ষুধা, তাহা বলিয়া বুঝানো যায় না। মনে হইল—কিছু না খাইলে আর আমি গঙ্গার গর্ভ হইতে উঠিতে পারিব না। কিন্তু গঙ্গার গর্ভে আহার্য কোথায় পাইব? পানীয়—সুস্বাদু গঙ্গাবারি আছে—যত ইচ্ছা খাইবার বাধা নাই, কিন্তু তাহাতে তো আমার ক্ষুধার শান্তি হয় না! দেখি যে. জলের উপর একটি আমলকী ফল ভাসিতেছে। ফলটি খুব সুপক্ক ও খুব বড়, এত বড় আমলকী ফল আর কখনো দেখি নাই। গঙ্গাগর্ভে দাঁড়াইয়াই ফলটি নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইলাম। ফলে যেন অমৃতের আস্বাদ! আমলকী ফল যে এত রসভরা ও মিষ্ট হয়, আগে তাহা জানিতাম না।

ফল খাইয়া তীরে উঠিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িলাম। কিছুক্ষণের জন্য ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়াছিল, কিন্তু আবার সেই ক্ষুধানল জ্বলিয়া উঠিল। কি আর করি, "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ, যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা—" এই মন্ত্র জপ করিতে-করিতে চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখি, পথের ধারে প্রকাণ্ড এক বটগাছ, তাহার আপাদমস্তক লাল-লাল ফলে ভরা। এমন সুন্দর লাল-লাল ফল, কত পাখি খাইতেছে, আমিও কেন খাই না? এইকথা যেমন মনে হইল, অমনি বটগাছের উপর উঠিলাম। শাখা-প্রশাখার জালে আচ্ছন্ন, ঘনপল্লবাবৃত বটগাছে উঠিয়া মনে হইল—কে যেন এই পল্লবদল

দিয়া আমার বিশ্রামের জন্য শয্যা পাতিয়া রাখিয়াছে। দুটি-একটি বটফল মুখে দিয়া গাছের ডালের উপর দেহভার রাখিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

এত গভীর নিদ্রা যে, কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি, কিছুই মনে নাই। আমার পা ধরিয়া কে যেন ধীরে ধীরে ঝাঁকাইতেছিল—তাহাতেই আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘুম ভাঙিলে দেখিলাম—গাছের নিচে আমার পূর্ব-পরিচিত একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, সে-ই আমার পা ধরিয়া নাড়া দিতেছিল। এলাহাবাদে একজন ভদ্রলোকের বাড়ি আমি কখনো কখনো যাইতাম, মেয়েটি সেই বাটীর বিধবা বধূ। আমাকে 'সন্ন্যাসিনী দিদি' বলিয়া ডাকিত, কিন্তু এত লজ্জাশীলা যে, কখনো মুখ ফুটিয়া আমার সঙ্গে কথা বলিত না। আজ তাহাকে এইভাবে গাছের তলায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, আমি বড়ই আশ্চর্য হইলাম। গাছ হইতে নামিয়া বলিলাম ঃ "একি! তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে?" আমার কথা শুনিয়া সে একটু সলজ্জ হাসি হাসিল। দেখিলাম—সে এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে, পিঠময় ভিজা চুল, পরিধানে গরদের কাপড়, একহাতে একটি জলের ঘটি, আর এক হাতে গামছা দিয়া বাঁধা একখানি পিতলের রেকাবি; গাছতলায় রেকাবিখানি নামাইয়া রাখিয়া সে আমার পা ধরিয়া নাড়া দিতেছিল। আমার কথার কিছু উত্তর না দিয়া সে রেকাবি বাঁধা গামছা খুলিল। দেখি যে, ছানা, মুগের ডাল ভিজানো, আখ, সন্দেশ এই সমস্ত রেকাবিতে সাজানো; তাহার উপর তুলসীমঞ্জরী। আমি দেখিয়া হাসিলাম, বলিলাম ঃ "পাগলী, কোথা থেকে এই সমস্ত জিনিস নিয়ে এখানে এলি, আমি এখানে আছি, তাই-বা কি করে জানলি?" সে আনন্দপূর্ণ মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল ঃ "মা, জ্যাঠাইমা গঙ্গাস্নানে এসেছেন—আমিও সেইসঙ্গে এসেছি। চুপি চুপি পুল পার হয়ে তোমার জন্যে ঠাকুরের নৈবেদ্য নিয়ে এপারে তোমাকে খুঁজতে এলুম। এখানে এসেই বটগাছের পাতার ভিতর থেকে তোমার পা ঝুলছে দেখতে পেলুম। ভাগ্যে এখানে এসেছিলুম!" আমি তাহার কথা শুনিয়া অবাক, বলিলাম ঃ "করেছিস কি? এতক্ষণে সকলে তোকে খুঁজছেন, আর না দেখতে পেয়ে কত ভাবছেন। শাশুড়ির আঁচল না ধরে পথ চলতে পারিস না, এখন একা একা কি করে চলে এলি? একি সাহস তোর?" সে আমার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল ঃ "কে জানে, কেন আমার মনে হলো যে, এধারে এলেই তোমাকে দেখতে পাব। যদি দেখতে না পেতাম, তাহলে কি কষ্ট হতো, আর ভয়ও খুব হতো। সকালে মা যখন বললেন, 'গঙ্গা নাইতে যাব,' আমার তখনি তোমার কথা মনে হলো, ভাবলাম—কাল তুমি উপোস করে আছ, মা এই যে আমার জন্য কত কি গুছিয়ে রেখেছেন, ভোরে উঠে ফল সাজিয়ে ঠাকুরের ভোগ দিয়েছেন—তোমায় কে খেতে দেবে? একটু সরবতও হয়তো তুমি পাবে না। তাই ভেবে মাকে বললুম আমিও গঙ্গায় যাব। মনে হলো— নাইতে গেলেই তোমাকে দেখতে পাব। কোথায় তুমি আছ, কি করে তোমার দেখা পাব—এসব কথা মনেই হলো না, মনে মনে জানতুম—নিশ্চয়ই তোমাকে দেখতে পাব। তাই চুপি চুপি নৈবেদ্যের থালা আর সরবতের ঘটি সঙ্গে নিয়ে এসেছি, মাকে কিছু বলিনি। পথে মা দেখে বকতে লাগলেন। তখন 'ঘাটে জপ করে জল খাব' বলে তবে তাঁকে শান্ত করেছি। তোমাকে যদি না দেখতে পেতাম, তাহলে কী যে হতো!"

আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম, আর হাসিমাখা মুখ দেখিতে লাগিলাম। বাড়িতে থাকিতে সে কখনো আমার সঙ্গে কথা বলিত না, কেবল হাসিত। তাহার সেই লজ্জামাখা হাসি আমার বড় মিষ্ট লাগিত; আমি কেবল তাহার হাসিই দেখিতাম, কথা কখনো শুনি নাই। ও যে এত কথা বলিতে পারে, তাহাও জানিতাম না। তাহার হাসি দেখিয়া, আর কথা শুনিয়া আমার যেন অর্ধেক ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল। গাছের তলায় তাহাকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদ পাইতে বসিলাম। সেখানে যে দু-একজন উপস্থিত ছিল, তাহারাও প্রসাদ পাইল, আমরাও পাইলাম। তবুও সে প্রসাদ যেন অফুরান। আমার উদর একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহার শাশুড়িদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে গেলাম। গিয়ে দেখিলাম—তাঁহারা এত ব্যস্ত হইয়াছেন যে, সে জলে ডুবিয়া গিয়াছে মনে করিয়া পাগলের মতো হইয়াছেন। তাহাকে দেখিতে পাইয়া, আর আমাকে তাহার সঙ্গে দেখিয়া তাঁহারা আনন্দে তিরস্কার করিবার কথাও ভুলিয়া গেলেন। আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহারা অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমাতে তো আর আমি ছিলাম না, কেমন করিয়া যাইব? সেদিন কোথা দিয়া যে দিবারাত্র গিয়াছে, সে জ্ঞান আমার ছিল না, কেবল সেই একটি মাত্র কথাই মনে ছিল—সেই তাঁর হাতে করিয়া প্রসাদ বহিয়া আনিবার কথা! তুমি—তুমি আমার কত যত্নের নিধি—তুমি কিনা হাতে করিয়া প্রসাদ বয়ে আনলে! তা তোমার বহিবার অভ্যাস কিছু নূতন নয়—গোয়ালার ছেলে, দুধের ভার তো চিরদিনই বহিয়াছ। দুধের ভার কেন, কোন্ ভার বা না-বহিয়া থাক'? নদীতে যেমন একই জলে ঢেউ-এর উপর ঢেউ উঠে, তেমনি সেই একই কথার নূতন নূতন করে ঢেউ উঠছে আর সকল অঙ্গে কদম ফুলের মতো কাঁটা দিয়ে উঠছে। দুই চোখ দিয়ে কেবলই জল পড়ছে—কেন কাঁদি, কিসের জন্য কাঁদি, সে বুদ্ধি তখন হারিয়ে গেছে। শেষে সব বুদ্ধিই হারিয়ে গেল, দিন-রাত্রির জ্ঞান হারিয়ে গেল, কেবল জড়ের মতো পড়েছিলাম। আজ আমি বলতে বলতে আবার সব ভুলে যাচ্ছি। কি বলব, কার কথা বলব? জীবনের কথা বলতে গেলে, সেই এক কথাই বারবার আবৃত্তি করতে হয়। কেবল শ্যামসুন্দর! শ্যামসুন্দর!! শ্যামসুন্দর!!! এছাড়া আর আমার বলবার কোন কথাই নাই। আমার কথা আমি কেমন করে বুঝিয়ে বলব, সে যে আমাকে একেবারে পাগল করে দেয়, বুঝিয়ে বলবার মতো বুদ্ধি আর আমার থাকে না।

কাশীতে আর একদিন—সে বেশিদিনের কথা নয়—আমার জ্বর হয়ে ভারী অরুচি হয়েছে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, "একটু যদি লেবুর আচার পাই, তবে দুটি ভাত খেতে পারি। হিন্দুস্থানীরা বেশ আচার করে, এখন অরুচির মুখে বোধ হয় ভাল লাগত।" ভোরবেলায়—তখনো রৌদ্র উঠে নাই, দেখি যে শ্যামবিহারী খালি পায়ে একটি ভাঁড় হাতে করে দুয়ারে এসে উপস্থিত। শ্যামবিহারী জাতিতে ক্ষত্রিয়, কাশীতে ডাক্তারী করে, প্রণবাশ্রমে যাওয়া-আসা করিত, সেখানে তাহার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এই ভোরে, খালি পায়ে ভাঁড় হাতে করে শ্যামবিহারী আমার দুয়ারে কেন, এইকথা মনে করছি, এমন সময়

শ্যামবিহারী ভাঁড় নিয়ে এসে আমার কাছে রাখলে, ভাঁড়ে লেবুর আচার, জারক-লেবু, আরো নানারকম আচার। শ্যামবিহারী ভাঁড় নামিয়ে খুব বিনয় করে বললেঃ "মাতাজি, আমি শোলিতে (শুদ্ধ বস্ত্রে) এই আচার এনেছি, আপনি দয়া করে গ্রহণ করবেন।" আমি আচার দেখে কী যেন হয়ে গেলাম, শ্যামবিহারীকে আর দেখতে পেলাম না, দেখলাম—যেন শ্যামসুন্দর নিজে ভাঁড় হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন।

একথা বললে লোকে আমাকে পাগল বলে মনে করবে। ছেলেবেলায় একবার মেমের কাছে বলেছিলামঃ "মাটির ঠাকুর সত্য, সত্য, সত্য;" আজ আবার বলছি—শ্যামসুন্দর যে নিজে হাতে করে আচার এনেছিলেন, একথাও তেমনি সত্য, সত্য, সত্য! এখন যখন বেদান্ত পড়ি, আর ভাবি—ভাঁড়ও নাই, আচারও নাই, শ্যামবিহারীও নাই, কেবল শ্যামসুন্দর আছেন! আমিও নাই, তুমিও নাই, এক ছাড়া কিছুই নাই—তখন সৃষ্টিপ্রপঞ্চ কুয়াশার মতো সূর্যালোকে মিলিয়ে যায়; কিন্তু তখনই যদি শ্যামসুন্দরের সেই আচারের ভাঁড় হাতে করে নিয়ে আসার কথা মনে পড়ে, সে কি মিথ্যা বলে, মায়া বলে মনে হয়? সে যে প্রত্যক্ষ সত্য। সেই এক ছাড়া দুই আর কিছু নাই—এ যেমন সত্য, সে আচারের ভাঁড় হাতে করে নিয়ে এসেছিল, সেও তেমনি সত্য, দুই-ই একসঙ্গে সত্য। এর কোনখানে মায়ার নামগন্ধ নাই।

সেদিন রাত্রে স্টেশনে যে মিছরির সরবতে আমার পিপাসা-শান্তি হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট অমৃত বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাহার আস্বাদও যেন অমৃতের মতো, আর অমৃতের মতোই—এতক্ষণ যে শরীর আমার বোঝা হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাতে আবার নূতন শক্তি আনিয়া দিল। সরবত খাইয়া আমার মনে হইল যে, এখন আমি অনায়াসে দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাইতে পারি। সরবতের ঘটি আমার কাছে রাখিয়া স্টেশন-মাস্টার চলিয়া গিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "কেন মা, তুমি এমনভাবে একা পথে বাহির হয়েছ?" এমনভাবে সেকথা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার সেই বাৎসল্যমাখাস্বরে আমার আবার ছেলেবেলার কথা, বাবার কথা, মনে পড়িয়া গেল। স্টেশন-মাস্টারের নাম হরিবাবু; পরে তাঁহার নাম জানিয়াছিলাম, এখনো আমার সে নাম মনে আছে।

স্টেশন-মাস্টার যে টিকিট দিয়াছিলেন তাহাতে অনেকদূর পর্যন্ত পথ চলিবার ভাবনা আর ভাবিতে হয় নাই। পথে মাঝে মাঝে হাঁটিয়া চলিবার কথা ভাবিয়াছি, কিন্তু আমাকে এক পাও হাঁটিয়া চলিতে হয় নাই। বৃন্দাবনের কাছাকাছি একটি বড় স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হয়, সেখান হইতে ভাড়া দশ-আনা কি বারো-আনা পয়সা। সেখানে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন আর হাঁটিয়া যাইবার কথা মনে স্থান পাইল না, তখন মনে হইল, আমি যেন পাখির মতো এই মুহূর্তেই উড়িয়া বৃন্দাবনে যাইতে পারি। ট্রেন আসিয়া এখনই চলিয়া যাইবে; আমার টিকিট নাই, টিকিট কিনিবার মূল্যও নাই। এইটুকু পথ মাত্র, এতদূর আসিয়া এখানে আর বিলম্ব আমার কোনমতেই সহিল না। জীবনে আমি সেই প্রথম ভিক্ষার্থিনী হইলাম। প্রথম ভিক্ষার্থিনীও বটে, শেষ ভিক্ষার্থিনীও বটে; আর কখনো আমাকে ভিক্ষা চাহিতে হয় নাই। স্টেশনে অগণ্য লোক যাতায়াত করিতেছে—তাহাদের সকলের নিকটেই আমি

আজ ভিক্ষার্থিনী, কে এমন দয়ালু আছে যে, আজ আমার বৃন্দাবন পৌঁছিবার পাথেয় দিয়া প্রাণ বাঁচাইবে? আমার সম্মুখ দিয়া গাড়ি চলিয়া যাইবে, আমি যদি যাইতে না পারি, তবে—মনে হইতেছিল, গাড়ির চাকার তলায় পড়িয়া এখনই শরীরের ভার হইতে মুক্ত হইব। আমি সেই জনসঙ্ঘের নিকটে জোড়হাতে বলিলাম : "বাবা, দয়া করিয়া তোমরা কেহ আমাকে টিকিট কিনিয়া দাও বৃন্দাবন যাইব।" আমার কথা শুনিয়া সেই লোকের ভিড়ের ভিতর হইতে একজন হিন্দুস্থানী যুবক আসিয়া তখনই ভাড়ার কয়েক আনা পয়সা আমার হাতে দিল। সেই যে কয়েক আনা পয়সা তখন আমার কাছে তাহার যে মূল্য, দরিদ্রের নিকট মহামূল্য রত্নের মূল্যও তাহা অপেক্ষা অধিক নয়। ভিক্ষাদাতাকে যেন আমার বরদাতা দেবকুমার বলিয়া মনে হইল।

আমাকে পয়সা দিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল : "বৃন্দাবনে তোমার কে আছে? সেখানে কি তোমার কোন পীড়িত আত্মীয়কে দেখিতে যাইতেছ?" আমি বলিলাম : "না বাবা, আমি কানাইলালের দর্শনে যাইতেছি।" সে আমার কথা শুনিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই যে, "কানাইলাল? সেই নন্দ গোয়ালার ছেলে? সে তো চোর আর লম্পট! মূর্খেরাই তাহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করে। তাহার জন্য এত কষ্ট করিতেছ?" তাহার এই কথা শুনিয়া আমার পদতল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত যেন আগুন ছুটিয়া গেল। "এই নাও তোমার পয়সা" বলিয়া তাহার পয়সাগুলি তাহার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। তখন চারিধারে বেশ একটু ভিড় জমিয়া গেল, গোলমাল হইতে লাগিল। এইসময় একজন বাঙালী ভদ্রলোক "মা, তোমার টিকিট নাও"—বলিয়া একখানি টিকিট আনিয়া আমার হাতে দিলেন। দিয়া বলিলেন : "কেন মা, অবোধের উপর রাগ করিতেছ? ওরা মূর্তি-পূজাদ্বেষী, ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক করিবার সুবিধা পাইলে ওরা আর সহজে ছাড়ে না। ওদের স্বভাবই ঐরকম।" যিনি টিকিট দিলেন, লজ্জায় আমি আর তাঁহার মুখের দিকে যেন চাহিতে পারিলাম না। গাড়িতে উঠিয়া ভাবিতে লাগিলাম, "আমার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। কেন আমি লোকের কাছে হাত পাতিয়াছিলাম! আমার নিজের যে কি প্রয়োজন আমি তারই বা কি জানি? তুমি যদি না নিয়ে যাইতে, বৃন্দাবনে কি আমি নিজের চেষ্টায় আসিতে পারিতাম? এতদিন আমি যে কখনো কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করি নাই, তাহাতে কবে আমার কি অভাব হইয়াছে? আজ এমনই পাগল হইয়াছিলাম যে, তোমাকেও ভুলিয়া গেলাম? আমার এ শাস্তি হইবে না কেন? ও ব্যক্তির কি দোষ, আমি যখন তাহার নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছি, তখন সে তো আমায় যাহা ইচ্ছা বলিতেই পারে।" সেইদিন গাড়িতে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, "এ জীবনে আর লোকের নিকট আঁচল পাতিব না।" ঠাকুর আমার সে প্রতিজ্ঞা আজ পর্যন্ত অটুট রাখিয়াছেন।

বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। পথে চলিতেছি আর পথের ধুলায় পড়িয়া প্রণাম করিতেছি। পথের ধুলাসকল গায়ে মাখিতেছি, আর চোখের জলে কেবলই ধুলা ভিজিয়া যাইতেছে। "জয় জয় বৃন্দাবন, জয় জয় গোবর্ধন, জয় জয় যমুনা," পাগলের মতো এইসব কত কি বলিতেছি, আর পথে চলিয়াছি। সে যে আমার কী দিন—সে আনন্দ কি আর পাইব? কোথায় যাইতেছি—কোথায়

যাইব, সেসব কিছুই মনে নাই, কেবল চলিয়াছি। যত গাছ দেখি, সবই তমাল-তরু মনে হয়; পাতা দেখি আর মনে হয়—এ ব্রজের নব-কিশলয়। এক-একবার গাছের তলায় গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি—তখন ভাবি, আমার নন্দদুলাল বুঝি এই গাছে উঠিয়া খেলা করিতেছেন। যেন পাতার ভিতর হইতে রাঙা নূপুর-পরা পা-দুখানা ঝুলিতেছে। এই যে-সব পথ হয়তো ব্রজদুলাল বাঁশী হাতে করে গোরুর পাল নিয়ে এই পথ দিয়াই গিয়াছেন। পথে বোধ হয়, এখনো গোরুর ক্ষুরের চিহ্ন আছে। এই সেই বৃন্দাবন, সত্য-সত্য বৃন্দাবন, আজ আর আমার স্বপ্ন নয়। "চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম।"

গোবিন্দের মন্দির কোথায় সে-কথা আমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না। মনে জানি, ঠাকুর যখন বৃন্দাবনে আনিয়াছেন, নিজেই ডাকিয়া লইয়া যাইবেন। দুইদিন কিছুই খাই নাই। জানি, নিশ্চয়ই ঠাকুর ডাকিয়া নিয়া গিয়া প্রসাদ দিবেন। "তুমি যদি নিজে ডাকিয়া প্রসাদ না দাও, আমি আর কিছুই খাব না, না খাইয়া মরি সেও ভাল।" ভাবিয়া একটি নির্জন-স্থানে গিয়ে বসিয়া রহিলাম। সে জায়গাটির নাম 'ষষ্ঠীর বন'। ক্রমে সেই নির্জন বনে অনেক লোকসমাগম হইতে লাগিল, সবই প্রায় যাত্রীর দল। কত আসিতেছে, কত যাইতেছে। কেহ আসিয়া দুটি-একটি করিয়া পয়সা দিয়া প্রণাম করিতেছে। আমি নির্বাকভাবে বসিয়া আছি। আবার কেহ কেহ আসিয়া আমার সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি মূর্খ, কোন প্রশ্নের অর্থই বুঝি না, কিন্তু তখন যে কেমন করিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছি, নিজেই কিছু বুঝিতে পারিলাম না। একজন, দুইজন, ক্রমে অনেকে আসিয়া দাঁড়াইল, শেষে যেন একটি বিচারসভা বসিয়া গেল। যে যাহাই বলিতেছে, আমি তাহারই উত্তর দিতেছি।

আমি যে নিজে কিছু বলিতেছি না, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কে যেন আমাকে বলাইতেছে, আমি কেবল মুখে যাহা আসিতেছে, তাহাই বলিয়া যাইতেছি।

দিন যত শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, লোকের সংখ্যাও ততই কমিতে লাগিল, শেষে সে-স্থান প্রায় নির্জন হইয়া আসিল। আমি প্রথমে যেখানে আসিয়া বসিয়াছিলাম, এখনো সেই একই স্থানে বসিয়া আছি। এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আমার কাছে আসিলেন। তাঁহার কাপড় 'ফের' দিয়া পরা। গৃহস্থঘরের মেয়েরা যে ফের দিয়া কাপড় পরেন, আমি তাহা জানিতাম না; কিন্তু তাঁহার মুখে চোখে এমন একটি ভাব ছিল যে, তাঁহাকে পতিতা বলিয়া আমার কিছুতেই মনে হইল না। রমণী আমার কাছে আসিয়া বলিলেন ঃ "মা, সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, রাত্রে আপনি কোথায় থাকিবেন?" আমি বলিলাম ঃ "ঠাকুর যেখানে রাখেন, সেখানে থাকিব।" তখন রমণী বলিলেন ঃ "মা, এই নির্জন স্থানে রাত্রিবাস করা সম্ভব নয়, আপনি যদি দয়া করিয়া আমার গৃহে আসেন, তবে আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়া যাই।" রমণীর কথার উচ্চারণ ও সুরের টান শুনিয়া মনে হইল, তাহার বাড়ি আমাদের দেশে নয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "মা, তুমি কে ও কোথায় তোমার বাড়ি, ফের দিয়া কেন কাপড় পরিয়াছ, এইসকল কথার উত্তর পাইলে আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারি।" আমার কথা শুনিয়া রমণী একটু লজ্জিতভাবে হাসিলেন, বলিলেন ঃ

"আমাদের বাড়ি ঢাকায়। আমি স্বামীর সহিত তীর্থদর্শনে আসিয়াছি, আমার স্বামী ঐ গাছতলায় দাঁড়াইয়া আছেন, তিনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে এইরকম কাপড় পরে। বৃন্দাবনে আমাদের বাসাবাড়ি করা হইয়াছে, আপনি যদি সঙ্গে যান, সেখান হইতে গোবিন্দ-দর্শনেরও সুবিধা হইবে।" আমি তাঁহার সেই সরল কথাগুলি শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম ও বিনাবাক্যে তাঁহার সঙ্গে চলিলাম।

পথে চলিতে চলিতে ভদ্রলোকটি ক্রমশ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গি এমন সম্ভ্রমসূচক যে, তাহাতে আমার মনে বড়ই তৃপ্তি হইল। আমি যে আজই বৃন্দাবনে আসিয়াছি, এখনো গোবিন্দ-দর্শন অথবা স্নানাহার কিছুই হয় নাই, তাহাও ক্রমশ তিনি জানিয়া লইলেন। গৃহিনী আমাকে বাসায় লইয়া গিয়াই ফলমূল-মিষ্ট ইত্যাদি দিয়া জলযোগের আয়োজন করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম ঃ "মা, আমি এখনো গোবিন্দ-দর্শন পাই নাই আর তাঁহার প্রসাদও পাই নাই, কেমন করিয়া খাইব।" গৃহিনী আমার কথা শুনিয়া লোক সঙ্গে দিয়া আমাকে গোবিন্দ-দর্শনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

যখন মন্দিরে গেলাম, তখন ঠাকুরের আরতি হইতেছে। খুবই ভিড়, কিন্তু ভিড়ে আর আমার কি করিবে, সমস্ত ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম—শ্রীমুখের সম্মুখে পঞ্চপ্রদীপ নৃত্য করিতেছে। মুহুর্মুহু প্রদীপালোকে যেন রূপতরঙ্গ উছলিয়া উঠিতেছে। নাকে নোলক দুলিতেছে। আমি জ্ঞান হারাইয়া উচ্চৈস্বরে বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতের—

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো!
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো!!

শ্লোক পড়িতেছি, আর একদৃষ্টে মুখচন্দ্রমা দেখিতেছি। কি করিতেছি, কোথায় আছি, এ কোন্ স্থান, কিছুই আমার মনে নাই। লোক আছে কি নির্জন স্থান, সে বোধও আমার নাই। আমার মাথার কাপড় খুলিয়া গিয়াছে, আমি তাহা জানি না। ঠাকুরের সম্মুখে নগ্নমস্তকে দাঁড়াইতে নাই। বৃন্দাবনের এই নিয়ম। আমার মাথার কাপড় খুলিয়া গিয়াছে দেখিয়া চারিপাশ হইতে অনেকেই 'নঙ্গা শির' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। কেহ কেহ বা আমাকে গালিও দিতেছে, কিন্তু সেসকল শব্দের একবর্ণও আমার কানে যাইতেছে না। অবশেষে একজন আমার পিছন হইতে সজোরে আমাকে এক ধাক্কা দিল। আমি 'নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণু' পড়িতেছি, আর নাকে সেই নোলক দুলিতেছে দেখিতেছি, জগৎ আছে কি না আছে যেন তাহারও ধার ধারি না—সহসা সেই প্রবল ধাক্কায় সচেতন হইলাম। সচেতন হইয়া আমার মতো স্বভাবের পক্ষে যাহা হওয়া সম্ভব তাহাই হইল, অর্থাৎ আমার ভয়ানক রাগ হইল। আমার সেই ক্রুদ্ধ নয়নের দৃষ্টি দেখিয়া যে ধাক্কা দিয়াছিল, সে একটু অপ্রস্তুত হইয়া আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, ঠাকুরের সম্মুখে খালি মাথায় থাকার জন্যই সে আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে। অনেকে আমার মাথায় কাপড় দিবার জন্য চিৎকার করিয়া বলিয়াছিল, আমি শুনি নাই, তাই সে আমাকে ধাক্কা দিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছে। যে ধাক্কা দিয়াছিল, সে গোবিন্দজীর পূজারী। আমি রাগিয়া তাহাকে বলিলাম ঃ "আমি খালি মাথায় আছি বলিয়া তুমি আমাকে সাবধান করিতেছ, কিন্তু তোমার মাথায় কাপড়

কই? স্বামীর সম্মুখে রমণীর বিনা অবগুণ্ঠনে থাকিতে নাই, এজন্য যদি মাথায় কাপড় দিবার দরকার হয়, তবে তুমি কেন বিনা অবগুণ্ঠনে আছ? এ বৃন্দাবন, ললিতা দেবীর রাজ্য, এখানে নন্দের নন্দন ছাড়া আবার অন্য পুরুষ কে আছে যে সে বিনা অবগুণ্ঠনে থাকিবে?'' আমার কথা শুনিয়া পূজারী প্রথমে যেন থতমত খাইয়া গেল, কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে একটু বাঁকা-হাসি হাসিয়া ঠাকুরের গলা হইতে একছড়া মালা লইয়া আমার দিকে ছুড়িয়া দিল। মালাগাছি আসিয়া আমার মাথায় পড়িল, আমি মালা লইয়া তখনই কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া সেই মালার জন্য কতই কাঁদিলাম। ''গোবিন্দ আমাকে নিজের গলার প্রসাদী-মালা দিলেন, আমি সেই মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম!'' এইকথা ভাবিতেই আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গোবিন্দ-দর্শনের পর বৃন্দাবনে প্রথম রাত্রি আমার এইভাবে কাঁদিতে-কাঁদিতে কাটিল।

তার পরদিন সকালবেলায় বৃন্দাবনে প্রথম প্রভাত। সারারাত্রি জাগিয়া এত যে কাঁদিয়াছি, সে কথা আর আমার একটুও মনে নাই, বরং মনে হইতেছে, যেন অনেক দুঃখের পর চিরদিনের আকাঙ্ক্ষিত-নিধি পাইয়া সুখের স্বপ্নে রজনী কাটাইয়াছি। দর্শন মিলিয়াছে, আর আমার কিসের অভাব, দুঃখই বা কি আছে? শিশুকাল হইতে এ জীবনপ্রবাহ কত পথেই না বহিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এইটুকু জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য কত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, কতই না আয়োজন! আজ মনে হইতেছে, যে-উদ্দেশ্যে এত আয়োজন, আজ তাহা সার্থক হইয়াছে, আজ সাগরের আশ্রয় পাইয়া অবিরাম গতিধারা বিরাম লাভ করিয়াছে। আজ যেন আর আমার কিছু চাহিবার নাই, কিছু পাইবারও নাই। আমার চিরদিনের সকল বাসনা সকল কামনা কুড়াইয়া আজ গোবিন্দের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

সকালে ঘরের বাহিরে আসিয়াই প্রথমে কুমারকে দেখিতে পাইলাম। কুমার সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় পূর্বনাম ত্যাগ করিয়া 'কুমার ভিক্ষু' এই নাম লইয়াছিল, এইজন্য 'কুমার' এই নামই তাহার পরিচয়। জীবনে বহুদেশ ভ্রমণে, বহুলোকের সঙ্গে পরিচয়ে—মানব-প্রকৃতিতে নানা বিচিত্রভাব দেখিয়াছি। কিন্তু সেই বহু লোকের ভিতরও কুমারের মতো এমন নিতান্ত শিশুস্বভাব আমি আর কাহারও দেখি নাই। বারান্দার এক কোণে বসিয়া কুমার একখানি ইংরেজী খবরের কাগজ পড়িতেছিল, আমাকে দেখিয়া একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, আবার নিবিষ্টমনে পড়িতে লাগিল। সেই একবার দৃষ্টিতেই আমি তাহার চোখের চাহনি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, সে ঠিক পাঁচ বৎসরের ছেলের আলাভোলা সরল চাহনি। কুমারের বেশভূষায় তাহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া চিনিতে পারিবার উপায় ছিল না। আমি কিছুক্ষণ আশ্চর্য হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলাম, সে তখন একমনে কাগজ পড়িতেছিল, আমি যে দাঁড়াইয়া আছি, সে খেয়ালও তাহার ছিল না। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া হঠাৎ আমার দিকে চাহিয়া যেন নিতান্ত পরিচিতের মতো জিজ্ঞাসা করিল ঃ ''তুমি ইংরেজী জান?'' 'তুমি!' অন্য কেহ এমনভাবে জিজ্ঞাসা করিলে হয়তো আমি রাগ করিতাম, কিন্তু কুমারের কথায় রাগ হইল না। আমি উত্তর দিলাম ঃ ''না।'' কুমার আবার কাগজ পড়িতে পড়িতে বলিল ঃ ''জানলে বেশ হতো।''

কুমারের সঙ্গে এইরূপে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তাহার পর কতদিন তাহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার যে সেই বিচিত্র বালক-স্বভাব—তাহার আর কোন পরিবর্তন দেখি নাই। কুমারের নিকট তাহার জীবনের পূর্ব ইতিহাস যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সংসারাশ্রমে সে যেমন দুঃখ পাইয়াছিল, তেমন দুঃখ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে, কিন্তু তাহার সেই সদানন্দভাব দেখিলে সেকথা কেহ মনেও করিতে পারিত না। কুমার কখনো আমাকে মান্য করিয়া কথা বলে নাই, কখনো মা বলিয়াও ডাকে নাই—'মা' এই শব্দ একদিনও আমি তাহার মুখে উচ্চারিত হইতে শুনি নাই, কিন্তু মায়ের নিকট সন্তানের দাবি আবদার সে যেমন মিটাইয়া লইতে জানিত, অতি বড় দুষ্ট-দুরন্ত ছেলেও তাহা পারে না। সে ছেলে এমনই আলাভোলা যে, নিজ শরীরের শীত, রোগ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা—কোন বিষয়েই খেয়াল নাই, জননীকে সর্বক্ষণই তাহার জন্য সচেতন থাকিতে হয়। কুমারের ভাব দেখিয়া মনে হইত, জগৎই যেন তাহার মায়ের কোল, কাজেই নিজের অভাব অসুবিধার কথা ভাবিবার তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কুমারের কথা বলিতে গিয়া আরেকটি ছেলের কথা মনে পড়িল—কুমারকে দেখিবার দুই-তিনদিন পরেই তাহাকে দেখিতে পাই। ছেলেটির নাম অসিতনাথ, পদ্মাতীরের দেশের কোন জমিদারের ছেলে। কুমার যেমন সদানন্দ, সে তেমনি সদাই মলিন। তাহার মুখ এত মলিন যে, দেখিলে মনে হয়, সে যেন চিরদিন কেবল দুঃখই পাইয়া আসিয়াছে; অথচ, সে জমিদারের এক ছেলে—কত আদরের ছেলে, তাহার দুঃখের কোন কারণই নাই। কুমার কোন সঙ্কোচ-সম্ভ্রমের ধার ধারে না, পাঁচ বৎসরের ছেলের মতো সকলের কাছেই তার নিঃসঙ্কোচ সরলভাব। অসিতনাথ এত লাজুক যে, মুখ তুলিয়াও মুখের দিকে চাহিতে পারে না। আমি প্রতিদিন গোবিন্দ-দর্শন করিতে যাইবার সময় মন্দিরের দ্বারে তাহাকে দেখিতে পাইতাম। আসিবার সময়ও দেখিতাম, সে দাঁড়াইয়া আছে। তিন-চারিদিন প্রতিদিনই তাহাকে এইভাবে দেখিতাম। অবশেষে একদিন মন্দিরের বাহিরে আসিতেই সে আমাকে প্রণাম করিল, 'গোপাল, গোপাল' বলিয়া আমিও তাহাকে করজোড়ে নমস্কার করিলাম। সে তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। কী যে সে মলিন মুখ—কেবল চোখের জলে ভাসিতেছে! তেমন মলিন মুখ দেখিলে নিতান্ত নিষ্ঠুরেরও হৃদয় গলিয়া যায়। আদর করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "কাঁদ কেন বাবা, নীলমণি আমার!" তখন তাহার আর ধৈর্য রহিল না, একেবারে শিশুর মতো কাঁদিয়া উঠিল। কি কথা আমাকে বলিবার জন্য কত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার এইভাব দেখিয়া মন্দিরের দুয়ারে অনেক লোক আসিয়া জড় হইল, সে তখন অনেক কষ্টে সংযত হইয়া আবার আমাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি তাহার এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সেদিন রাত্রে বিশ্রামঘাটে যমুনা আরতি দেখিতে গিয়াছিলাম। আরতি হইয়া গেল, ক্রমে ক্রমে লোকের ভিড়ও কমিয়া গেল, ক্রমশ ঘাট নির্জন হইয়া গেল। আমি বাড়ি না ফিরিয়া যমুনার ঘাটেই বসিয়া রহিলাম। বসিয়া বসিয়া যে কত সময় চলিয়া যাইতেছে, কত রাত্রি হইতেছে, সেকথা একেবারেই মনে ছিল না। অন্ধকার নির্জন রাত্রে ঘাটে বসিয়া আমার চণ্ডীর কথা মনে

পড়িল। চণ্ডী—আমার দিদিগতপ্রাণ ছোট ভাই, সর্বদা কেবল দিদিকে আগলাইয়া বেড়ানোই তাহার কাজ ছিল। পাছে কেহ দিদিকে বকে, পাছে কেহ দিদির উপর রাগ করে, দিদিকে দোষ দেয়, সর্বদাই তাহার এই ভয়। যেদিন রাত্রে প্রথম 'ক্রিয়া' লইতে যাই—আমি যে ক্রিয়ার দীক্ষা লইতে যাইতেছি কেহ জানিতে পারে, ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না—চণ্ডী আমাকে বলিল ঃ "দিদি, তুমি আমার কাপড় পরিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারিবে না।" দুই ভাই-বোনে এই পরামর্শ করিয়া আমি চণ্ডীর কাপড় পরিয়া বাহির হইলাম। ফিরিয়া আসিবার সময় যদি বাবার সম্মুখে আসিয়া পড়ি এইজন্য চণ্ডী দুয়ারে পাহারা দিতেছিল, তবুও আমি আসিয়াই বাবার সম্মুখে পড়িলাম। তখন চণ্ডীর যে ভয়! বাবা পাছে আমাকে বকেন, এই ভয়ে চণ্ডীর মুখ একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। বাবা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কোথায় গিয়াছিলে?" ভাবিয়াছিলাম—"সত্য কথা কিছুতেই বলিব না" কিন্তু উত্তর দিবার সময় মুখে বাহির হইল—"দীক্ষা নিতে"। বাবার রাগ কিছু বেশি ছিল বলিয়া অনেক সময় আমি—যদি বাবা রাগ করেন, এই ভয়ে তাঁহার কথার উত্তরে খুব বড়গোছের একটা মিথ্যা কথা বলিব ভাবিয়াছি, কিন্তু বলিবার সময় ঠিক কথাটাই বলিয়া ফেলিতাম, কখনো মিথ্যা বলিতে পারি নাই। বাবা শুনিয়া বলিলেন ঃ "দীক্ষা নিতে? আবার কি দীক্ষা নেবার খেয়াল হলো?" এই কথা বলিয়া যখন আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন, তখন চণ্ডী একেবারে আমার বুকের ভিতর আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল ঃ "বাবা যদি তোমার কাপড় দেখতে পেতেন, যদি জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুই কেন কালাপেড়ে কাপড় পরেছিস'? আমার এমন ভয় হয়েছিল! ঠাকুরকে কেবল বলছিলাম, 'হে ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি, বাবা যেন দিদির কাপড় দেখতে না পান'।" আর এক রাত্রের কথাও মনে পড়িল, যে-রাত্রে চণ্ডীর দেহ বুকে লইয়া সৎকারের জন্য শ্মশানে গিয়াছিলাম। বিশ্রামঘাটে অন্ধকার রাত্রে আবার সেই অন্ধকার রাত্রে গঙ্গাতীরের শ্মশান মনে পড়িল। আমার সংসারের যত কিছু বন্ধন সেই রাত্রে চণ্ডীর চিতায় সবই পুড়িয়া গিয়াছিল। আজ যে আমি পথে বাহির হইয়াছি—চণ্ডী যদি তেমন করিয়া আমাকে সকল সংস্কারের বাহির না করিত, তবে আমি এমনভাবে পথে বাহির হইতে পারিতাম কিনা কে জানে!

পিতার দেহত্যাগের অতি অল্পদিন পরেই চণ্ডীও দেহত্যাগ করিয়া যায়। সংক্রামক রোগী বলিয়া, সে রাত্রে—চণ্ডীর সৎকারের জন্য পাছে অনুরোধ করি—এই ভয়ে একটি লোকও আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন নাই, বাড়িতে কেবল পুত্রশোকে উন্মাদিনী আমার মা ও অভিভাবকের মধ্যে আমি। মায়ের করুণ বিলাপ শুনিতে শুনিতে কি জানি কি অমানুষিক বলে বলী হইয়া ষোল বৎসরের বালকের মৃতদেহ বুকে করিয়া অন্ধকার রাত্রে একা শ্মশানে গিয়াছিলাম। যখন চিতা জ্বলিয়া উঠিল—যে-দেহ, যে-মুখ, যে-চোখ, এত প্রাণের প্রিয় ছিল, সেই দেহ যখন আমারই সম্মুখে ভস্মীভূত হইতে লাগিল, তখন মনের যে-ভাব হইয়াছিল—যে-ভাব একদিন আমার সংসারমোহ ঘুচাইয়া দিয়াছিল—চণ্ডীর কথা মনে পড়িয়া আজ আবার সহসা সেইভাব মনে জাগিয়া উঠিল।

নৌকারোহী যেমন নিতান্ত নির্লিপ্ত উদাসীনভাবে নদীর দুইধারের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যায়, সেইরূপ গত জীবনের কত কথা মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল, কিন্তু মনকে আর স্পর্শ করিতে পারিল না, মায়ের কথা মনে পড়িল। যদি যথার্থই স্নেহ দিয়া কোন শরীর গঠন সম্ভব হয়, তবে আমি বলিতে পারি, মা আমার স্নেহের প্রতিমা! ছেলেবেলায় যদি কেহ আমাকে 'কালো মেয়ে' বলিত, মা অমনি আমাকে বুকে করিয়া কত আদর করিতেন, কতবার আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন, যেন সে নিন্দা আমার গায়ে হাত বুলাইয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিতেন। আবার যদি কেহ বলিত, "মেয়ের কি সুন্দর চুল, যেন শ্যামা ঠাকরুন"—তাহা হইলে একদিকে আনন্দ আবার শ্যামা-মার সহিত তুলনার জন্য ভয় দুই একসঙ্গে হইয়া মাকে যে তখন কী সুন্দর দেখাইত! তাড়াতাড়ি জোড়হাতে মা প্রণাম করিতেন, বলিতেনঃ "ও আমার শ্যামা-মায়ের দাসী।" সেই চুল আর কালো রঙের জন্য মার আবার এক নূতন বিপদ হইত। দুর্গোৎসবে কি অন্য কোন ব্রতোপলক্ষে কুমারী-পূজার সময় আমাকে কুমারী করিবার জন্য সকলেরই ভারী আগ্রহ ছিল। মার দৃঢ় বিশ্বাস—যাহাকে কুমারী-পূজা করা হয়, সে কুমারী নিশ্চয়ই বিবাহের পর বিধবা হইবে। আমাকে মা কত আর সাবধান করিয়া রাখিবেন, যখন পথে খেলা করিতেছি, তখন হয়তো কুমারী করিবার জন্য কেহ কোলে করিয়া তুলিয়া নিয়া যাইত। টাটের উপর পা রাখিয়া ঠাকুর হইয়া পূজা লইতে আমার বড়ই আমোদ হইত। যখন পরনে রাঙা কাপড়, হাতে লাল শাঁখা, কপালে সিন্দূরের ফোঁটা পরিয়া বাড়ি আসিতাম, মা দেখিয়াই কপালে করাঘাত করিতেন—"এই আমার সর্বনাশ করে এসেছে!" মা এখনো বলেন যে, "যখনই টাটে পা রেখে পূজা করেছে, তখনই জানি, আমার কপাল ভেঙেছে! তাই কি যে-সে পূজা করেছে? যাঁরা ডাকলে মা জাগ্রত হয়ে সাড়া দেন, তাঁরাই কিনা আমার দুধের মেয়ের পা-পূজা করে আমার এই সর্বনাশ করলেন?" মায়ের বিশ্বাস যে, আমার যে বৈধব্য—সে কেবলই সেই কুমারী-পূজার জন্যই হইয়াছে, না হইলে মায়ের যে এমন সুলক্ষণা মেয়ে, তাহার বৈধব্য কখনোই সম্ভব নয়।

মা এদিকে এত স্নেহপরায়ণা, বালিকার মতো অল্পেই শঙ্কিতা, বালিকার মতো সকল বিষয়ে সরলবুদ্ধি অথচ কর্তব্যে একেবারে পাথরের মতো দৃঢ়চিত্তা। আমার বয়স যখন নয়-দশ বৎসর, তখনই মা আমাকে এক পীড়িতা বৃদ্ধার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মায়ের আদেশে সমস্ত দিন, এমনকি অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমাকে তাহার নিকট থাকিয়া সেবা করিতে হইত, কেবল স্নানাহারের জন্য কিছুক্ষণ বাড়ি আসিতাম।

বালিকাকাল হইতেই আমি সকল বিষয়ে শঙ্কাহীন, আবার শরীরে এত সামর্থ্য যে, লোকে সে-কথা শুনিলে বিস্মিত হইয়া থাকে। পথে বাহির হইবার পরে কতবার নিজেই নিজের শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য হইয়াছি। একবার হাঁটা-পথে খণ্ডগিরি দর্শনে যাইতে যাইতে পথে একজন রমণীর পায়ে আঘাত লাগিয়া তিনি আর চলিতে পারিলেন না, সেই যাত্রীদলের আমিও একজন সঙ্গী। নির্জন পথের মধ্যে সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সকলেই তাঁহাকে লইয়া বিপন্ন হইলেন। সেখানে গাড়িও পাইবার উপায়

নাই। অগত্যা আমি সেই রমণীটিকে কাঁধে করিয়া চড়াই-উতরাইয়ের পথে আড়াই ক্রোশ চলিয়াছিলাম। বহিয়া চলিবার সময় বিশেষ কিছু কষ্ট হয় নাই, কিন্তু পরে উরুতে ফোঁড়া হইয়া কিছুদিন ভুগিতে হইয়াছিল। আর একবার মথুরা স্টেশনে এক ভদ্রলোক পরিবার লইয়া নিতান্ত বিপন্ন, কোন গাড়িতেই তিলমাত্র স্থান নাই, তিনি কেবল একবার এদিক একবার ওদিক স্ত্রী-পুত্র-বোঁচকা-বুঁচকি সঙ্গে লইয়া ক্রমাগত ছুটাছুটি করিতেছেন। একটি গাড়িতে কিছু জায়গা ছিল কিন্তু সে-গাড়ির দুয়ারে তিনটি গুণ্ডা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাহাকেও গাড়িতে উঠিতে দিতেছে না। তাহাদের যেমন অসুরের মতো আকৃতি, প্রকৃতিও সেইরূপ। যদিও লোক তিনটির বেশভূষা ভদ্রলোকের মতো কিন্তু আচরণ নিতান্ত অভদ্র। ভদ্রলোকটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুয়ার খুলিয়া দিবার জন্য কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিতেছেনঃ "আজ রাত্রে ট্রেন না-পাইলে আমায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া স্টেশনে রাত্রি কাটাইতে হইবে। আমি অনেক দূর হইতে আসিতেছি।" কিন্তু লোকগুলি সে-কথায় কর্ণপাতও করিতেছে না। ট্রেন ছাড়িবার আর অধিক বিলম্ব নাই। ব্যাপার দেখিয়া আর আমার সহ্য হইল না। আমি গিয়া সে-লোক তিনটিকে খুব জোরে এক ধাক্কা দিলাম। সেই এক ধাক্কাতেই তিনটি অসুরতুল্য লোক তিনদিকে ছিটকাইয়া পড়িল। তখন ভদ্রলোকটি বিনা বাধায় পরিবার লইয়া গাড়িতে উঠিলেন।

এই যে আমার এত সাহস ও বল—এমন সময়ও আসিয়াছে যে, সে-সাহস ও বল কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই, কিন্তু মা—তখন শান্ত প্রসন্নভাবে সে-বিপদে কর্ণধার হইয়াছিল। প্রসব হইবার সময় প্রসূতি যদি কষ্ট পায়, মা দিন কি রাত্রি, যেকোন সময় অথবা যেকোন জাতির বাড়ি হউক না কেন, শুনিবামাত্র সেখানে উপস্থিত হইতেন। সুপ্রসব করাইতে মায়ের দৈবীক্ষমতা ছিল, লোকে বলিত, মা গায়ে হাত দিলেই প্রসূতির আর কোন ভয় নাই। কথাপ্রসঙ্গে আমার মনে পড়িল, ঘরের বাহির হইবার অনেকদিন পরে একবার মাকে সঙ্গে লইয়া তীর্থপর্যটনে আসিয়াছিলাম। কোন এক স্টেশনে নামিয়া আর গাড়ি ধরিতে পারি নাই। রাত্রিটুকুর মতো আশ্রয়ের জন্য স্টেশন-মাস্টারের বাড়ি গিয়া শুনিলাম, তাহাদের বড় বিপদ, স্টেশন-মাস্টারের স্ত্রীর প্রসববেদনা হইয়া সকাল হইতে শিশুর পা বাহির হইয়া এ-পর্যন্তও প্রসব হইতে পারে নাই; শুনিয়া আমার চক্ষুস্থির হইল! কিন্তু মা তখনই সেই বিপন্না প্রসূতিকে দেখিতে চলিলেন। কিন্তু যে-পর্যন্ত না নির্বিঘ্নে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, আমি বারান্দায় বসিয়া কেবল জপ করিয়াছি। কি রকম একটা হৃদয়ের দৌর্বল্য আসিল—প্রসূতির ঘরের ত্রিসীমানাতেও আমি পা দিতে পারি নাই।

চণ্ডীর কথা, মার কথা—আরো কতজনের কথা স্মৃতিবায়ুতে চালিত হইয়া মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। মনে পড়িল—ক্রিয়া লইবার পর যখন দক্ষিণা কি দিব গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেনঃ "তোমার শুচি-অশুচিবোধের সংস্কারটি আমাকে দক্ষিণা দাও।" পূজা-অর্চনায় সর্ববিষয়ে শুচিতা রক্ষা করিবার একান্ত চেষ্টায় আমার শুচিবাই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার জন্য কতসময় অনর্থক গিয়াছে, কত কষ্টও পাইয়াছি। গুরুদেব বোধ হয় তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ শুনিয়া আমার ভয় হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনের ভয় দূর করিয়া এই ভাবিয়া মনকে দৃঢ় করিলাম,

"আমি যদি দিতে না পারিতাম, গুরুদেব তবে কখনো তাহা চাহিতেন না। তিনি যখন চাহিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই দিবার শক্তিও আমি পাইব।" সেইদিন—সেইদিনই বা বলি কেন, সেই মুহূর্ত হইতেই আমার শুচি-অশুচির সংস্কার দূর হইয়া গেল। কিন্তু শুচিতারক্ষাকল্পে দিনে ও রাত্রে অনেকবার স্নান করিয়া ভিজা চুলে থাকিয়া চক্ষু দুটি নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, ক্রমে একেবারে সমস্তই অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। গুরুদেব তখন গৃহে ছিলেন না, পত্রদ্বারা তাঁহাকে জানাইলাম, "আমি অন্ধ হইতে বসিয়াছি।" দুটি মাত্র ছত্র লিখিয়া তিনি সে পত্রের উত্তর দিলেন, প্রথম ছত্রটি এই—"অন্ধ হইলেই চক্ষুষ্মান হয়।" দ্বিতীয় ছত্রে একটি টোট্‌কা ঔষধের কথা লেখা ছিল। সেই ঔষধ ব্যবহার করিয়াই আমার চক্ষু আরাম হইয়া গিয়াছিল। আর একবার আমাকে সাপে কামড়াইয়াছিল, গুরুদেব যখন এ সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি আহার করিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য আমিই খিচুড়ি রাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম। সংবাদ শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেনঃ "খিচুড়িটা না-খেয়ে আর যাচ্ছি না, সে যদি না-বাঁচে তবে কাল তো আর এমন রান্না খাইতে পাইব না।" তাহার পর আমার কাছে আসিয়া বলিলেনঃ "তোমাকে নাকি সাপে কামড়াইয়াছে? সাপ কি তোমাকে কামড়াইতে পারে? কেমন করিয়া কামড়াইবে, তোমার কাছে আসিলে যে সাপ—সাপই থাকিবে না, তখনি সে তার হিংসা করা স্বভাব ভুলিয়া যাইবে।" লোকে বলিত, গুরুদেব সর্পাঘাতের চিকিৎসা খুব ভাল জানিতেন। তাঁহারই চিকিৎসায় আমি সুস্থ হইয়াছিলাম।

এসব যেন এক-একটা ঢেউ, যেমন জলের ঢেউ জলে উঠিয়া জলেই মিশায়, তেমনি অনন্ত কালসাগরের ঢেউ তাহাতে উঠিয়া তাহাতেই মিশাইতেছে। এই যমুনার বুকে কত ঢেউ উঠিয়াছে, সে-ঢেউ এখন কোথায়? জলের ঢেউ জলে মিশিয়া গিয়াছে।

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া উঠিব মনে করিতেছি, এমন সময় কে একজন আসিয়া 'মা!' বলিয়া আমার পায়ের তলায় পড়িল। সে 'মা' ডাক কী ব্যাকুল, কী আর্তস্বরেই উচ্চারিত হইয়াছিল! "আহা বাছারে আমার! কার এত দুঃখ?" আমি প্রথমে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, চিনিতেও পারি নাই, তাহার পর লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সে অসিতনাথ! অসিতনাথ আমাকে সেদিন যত কথা বলিল, তাহার তিনভাগ কেবল "মা! মা! মা!" তাহার জীবনে যে কত অপরাধ, সেই কথাই সে যেন শতমুখে বলিতে চায় কিন্তু কিছুই বলিতে পারে না। কেবলই বলে, "মা, আমি যে কত পাপী তা তো তুমি জান না। আমি যে মনে মনে তোমার কাছেও অপরাধী হয়েছিলাম!" এই তার কথা, আর কেবল সেই এক কথা—"মা! মা!" মাটিতে পড়ে আছে, আমি যত আদর করি, "ওঠ বাপ আমার, গোপাল আমার!" ততই আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলেঃ "ওমা, আমায় আদর করো না মা, আর আমায় আদর করো না। তুমি জান না আমি কেমন ছেলে। আমি তোমার মাতৃদ্রোহী ছেলে। তোমার পা-ছুঁয়ে যে পায়ের ধুলো নেব, সে সাহসও আমার হয় না, এমনই নরক আমার মন।" একে তো তার এই পাগলামি, সেইসময় আবার নদীর ধারের জঙ্গলের ভিতর হইতে আরেকজন লোক বাহির হইয়া আসিয়া "মা, আমার অপরাধও ক্ষমা কর" বলিয়া উপস্থিত।

সে সেই গোবিন্দের পূজারী। তাহার নিকট শুনিলাম, অনেকদিন হইতে গোপনে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, আজ রাত্রে একা যমুনার ঘাটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মনে দুষ্টবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল, কিন্তু অসিতনাথের 'মা মা' জপ শুনিয়া সেভাব সে ভুলিয়া গিয়াছে। 'মা' বলিয়া সে আমার পায়ের ধুলা লইল, অন্ধকার রাত্রে এমনভাবে আর যেন আমি নির্জনস্থানে না থাকি, সেজন্যও বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া চলিয়া গেল।

''চিন্ময় ভূমি বৃন্দাবন, তোমাকে আমি প্রণাম করি''—বলিয়া তখন সেই যমুনাপুলিনে আমি বারবার প্রণাম করিলাম। এই বৃন্দাবন গোবিন্দের লীলানিকেতন, এখানে কি আবার শঙ্কা ভয় আছে? যে বৃন্দাবনের প্রতিরেণুও কৃষ্ণময়, সেখানে কি আবার নির্জন সজন আছে, সেখানে কি অন্ধকার আলোক, দিবা রজনীর কোন বিভেদসীমা আছে! ব্রজবাসীর মনেও কি গোবিন্দচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তার উদয় হয়? এ যে একেবারেই অসম্ভব। তখনই বুঝিতে পারিলাম, না, এ আর কিছু নয়, ঠাকুরের এ আর এক নূতন খেলা। তোমার এ খেলায় কি আর আমি ভয় পাই? তুমি যত কেন মুখোশ পরিয়া এস না, আমি তোমাকে ভাল করিয়াই চিনিয়া নিয়াছি।

তার পরদিন শ্রীমন্দিরে গিয়ে আবার আমি গোবিন্দের প্রসাদীমালা পাইলাম। সেই পূজারীই 'মালা নাও মা' বলিয়া আমাকে মালা আনিয়া দিল।

ইহার কয়েক বৎসর পরে কাশীতেও একবার এইরকম ধরনের ঘটনা ঘটিয়াছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একটা বাড়িতে আমি থাকিতাম, কুমারও সেই বাড়িতে থাকিত। কুমার দিনরাত্রি তাহার গ্রন্থরাশি লইয়া থাকিত, আমি কুমারকে রাঁধিয়া দিতাম। গঙ্গায় স্নান করিতে যাইবার সময় প্রতিদিনই একটি লোক আমার অনুসরণ করিত, যতক্ষণ স্নান করিতাম, ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত, আবার স্নান শেষে বাড়ি ফিরিবার সময়ও বাড়ি পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিত। প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলাম, বুঝি তাহার অন্য কিছু কাজ আছে; কিন্তু শেষে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, আমার অনুসরণ করা ভিন্ন তাহার অন্য কিছুই কাজ নাই। তাহাকে যখন দেখিতাম, সাপ দেখিলে লোকের শরীর যেমন শিহরিয়া উঠে, আমার শরীরও সেইরূপ শিহরিয়া উঠিত। এত একমনে 'গোপাল গোপাল' জপ করিতাম, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে 'গোপাল' ভাবিতে পারিতাম না। সে আমার কিছুদূরে থাকিলেও আমার মনে হইত, তাহার গায়ের বাতাস লাগিয়া যেন আমার গা পুড়িয়া যাইতেছে। তাহার সঙ্গ এড়াইবার জন্য আমি প্রাতঃস্নান ছাড়িয়া দিলাম, মধ্যাহ্নেও স্নানের সময় বাড়ির বাহির হইয়া দেখি, সে যেন আমারই জন্য বাড়ির বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, আমি যেই ঘাটের দিকে চলিলাম, সেও আমার সঙ্গে চলিতে লাগিল। প্রতিদিনই আমি স্নানের সময় পরিবর্তন করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার সঙ্গ এড়াইতে পারিলাম না। অবশেষে আমার এমনই বিরক্তবোধ হইল, মনে হইল যে, এ-যন্ত্রণা অপেক্ষা কাশী ছাড়িয়া যাওয়াই ভাল। কিন্তু আবার একটু লজ্জাও হইল, এতদিন আমি একদিনের জন্যও কাহাকে ভয় করি নাই, আজ কি এই লোকটির ভয়ে কাশী ছাড়িতে হইবে? সে যা-খুশি তাই করুক, আমার তাহাতে কি আসে যায়, এই ভাবিয়া মন স্থির করিলাম।

কিন্তু ইহার পর আবার এক নূতন উপদ্রব উপস্থিত হইল। একজন অপরিচিতা রমণী গঙ্গাস্নানের সময় নানা কথায় আমার সঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন আরম্ভ করিল। শাস্ত্রে লেখা আছে, চক্ষু মনের দর্পণ, আমি একথা খুবই সত্য বলিয়া মানি। যাই আমি তাহার চোখের দিকে চাহিলাম, অমনি সেই দর্পণে তাহার মনের ভাবের সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলাম। এমন অনেকদিন ঘটিয়াছে, অনেকের চক্ষুতেই তাহার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছি, এবং সে-দেখা কখনোই ভুল হয় নাই। সে রমণী যে-উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিয়াছিল, সে যখন তাহার মনের কথা আমার নিকট খুলিয়া বলিল, তখন বুঝিতে পারিলাম, চোখে আমি যে মনের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছি, তাহা ভুল দেখি নাই।

এবার আমার যথার্থই রাগ হইল। খুব রাগিয়া বিশ্বনাথকে বলিলাম: ''বিশ্বনাথ, এইসব কি তোমার ভূত-প্রেতের দল? থাকুক তোমার সোনার কাশী, আর আমি কাশীতে বাস করিতে চাহি না। কালই আমি কাশী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।'' তার পরদিন সকালে গঙ্গাস্নানে গিয়াছি—যথানিয়মে সে লোকটিও সঙ্গে আসিয়া ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছে। গঙ্গার জলে স্নান করিতে নামিয়াছি, এমন সময় দেখি—মৃতদেহের মতো কি যেন স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে। ''যদি কোন নৌকাডুবি লোক হয়?'' বিদ্যুতের মতো এইকথা যেই আমার মনে উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ আমি সেই দেহ ধরিবার জন্য সাঁতার দিলাম। সাঁতারে আমি মাছের মতো পটু, দেখিতে দেখিতে সেই দেহের নিকটবর্তী হইলাম। তীরে যাহারা ছিল—যাহারা স্নানের জন্য গঙ্গাগর্ভে নামিয়াছিল, সকলেই আমার এই কীর্তি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। কেহ কেহ চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল: ''ছি, ছি, কর কি? ও যে মড়া ভেসে যাচ্ছে। মড়া ধরতে যাচ্ছ কেন?'' সে কথা আমার কানেও গেল না। আমি দুই হাতে সেই দেহ জড়াইয়া বুকে ধরিয়া স্রোতের প্রতিকূলে আবার কূলের দিকে আসিতে লাগিলাম। এত স্রোত যে, অনেক কষ্টে একটুখানি যদি অগ্রসর হই, আবার অনেকটা পিছনে সরিয়া যাইতে হয়। তীরের লোকেরা ভাবিয়াছিল, আমি ডুবিয়া মরিব, আর ভাবিয়াছিল, হয়তো আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। বাস্তবিক আমার মতো শরীরে শক্তি না থাকিলে ও আমার মতো সন্তরণপটু না হইলে আর কেহ বোধহয় কূলে পৌঁছিতে পারিত না। যখন কূলের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম, তখনো কেহ মড়া ছুঁইবার ভয়ে আমাকে সাহায্য করিল না। কূলে উঠিয়া সিঁড়ির উপর দেহটিকে শোয়াইলাম। একটি আঠারো-উনিশ বৎসরের ছেলে, সরল সুন্দর মুখ, যেন চোখ বুজাইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া কে বলিবে, এ-দেহে প্রাণ নাই! সে মুখ দেখিয়া আমার প্রাণের মধ্যে কী যে করিয়া উঠিল—আমি জগতের লোককে তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। ''বাবারে ও নীলমণি!''—বলিয়া আমি একেবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলাম। আমার কান্না শুনিয়া সেখানে চারিদিক হইতে লোকের ভিড় জমিয়া গেল। ''কি হইয়াছে, কি হইয়াছে'' জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্রমশ ''একটি ছেলে জলে ডুবিয়া গিয়াছে'' এইকথা চারিদিকে প্রচার হইয়া গেল। আমি সিঁড়ির উপর শায়িত দেহের মাথার নিকট বসিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতেছি। কেন যে কাঁদিতেছি, তাহাও জানি না, কেবল ''বাবারে নীলমণি আমার!''—এইকথা ছাড়া আর কোন কথা আমার মুখে

আসিতেছে না। আমার সেই উন্মাদের মতো ভাব দেখিয়া যাহাতে ছেলেটির প্রাণরক্ষা হয়, অনেকেই সে চেষ্টায় উদ্যোগী হইল। কোথা হইতে যে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইল, আগুন, গরম কাপড়, দুধ এসমস্ত সামগ্রী কে যে কোথা হইতে আনিয়া উপস্থিত করিল, কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না। সকলেই ছেলেটিকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি কেবল বসিয়া কাঁদিতেছি, চোখের জলের বিরাম নাই।

কোথায় আছি, কি করিতেছি, সবই ভুলিয়া গিয়াছি, সেই মুখখানির দিকে চাহিতেছি, আর আমার বুকের ভিতর সমুদ্র উথলিয়া উঠিতেছে। তিন-চার ঘণ্টা চিকিৎসার পর যখন ছেলেটি একবার চোখ মেলিল, তখন চারিধারে "চোখ চাহিয়াছে—চোখ চাহিয়াছে"—বলিয়া একটি আনন্দধ্বনি উঠিল। ডাক্তার আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ "আর কেন মা কাঁদ, তোমার ছেলে এযাত্রা বাঁচিয়া গেল।" গরম দুধ ও উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে ক্রমশ ছেলেটির কথা বলিবার শক্তি হইল, তখন সে অতি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল ঃ "আমার বাড়ি নেপালের কাছে, সেখানে আমার বৃদ্ধ বাপ-মা আছেন। আমি শিক্ষার্থী হইয়া বারাণসীতে আসিয়াছি। আমার গতরাত্রে
হয়। যে-বাড়িতে ছিলাম, সেই বাড়ির লোক আমি মরিয়া গিয়াছি
আমাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল।" তাহার সেই পরিচয়ে সকলে স্তম্ভিত হইল। সে যখন বলিল ঃ "বাড়িতে আমার বৃদ্ধ বাপ-মা আছেন", তখন অনেকেরই চোখে জল আসিল। ছেলেটি প্রাণ পাইল কিন্তু এখনো তাহার চিকিৎসার দরকার, সুস্থ হইয়া বল পাইতে এখনো তাহার তিন-চারদিন লাগিবে। আমি কি উপায় করিব, আকুল হইয়া ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন ঃ "মা, তোমার কোন ভাবনা নাই, যাহাতে হাসপাতালে ছেলেটি যত্নে থাকিতে পারে, সে চেষ্টা আমি করিব।" তাহার পর লোক পাঠাইয়া ছেলেটির জন্য খাটুলি আনাইয়া তাহাতে করিয়া তাহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে লইয়া চলিলেন, আমিও সেই আর্দ্র বস্ত্রেই সঙ্গে-সঙ্গে চলিলাম। চিকিৎসালয়ে লইয়া গিয়া ছেলেটিকে শয্যায় শয়ন করানো হইল, ডাক্তার তাহার ঔষধ পথ্যের ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। আমার মনে পড়িয়া গেল যে, আমি স্নান করিতে আসিয়া ছিলাম। মনে পড়িয়া গেল যে, কুমারকে আমি রাঁধিয়া দিলে তবে সে খাইতে পাইবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়াই রাঁধিবার ঘরে গেলাম। ভাত নিয়া যখন কুমারকে খাইতে দিলাম, কুমার স্বচ্ছন্দে বসিয়া খাইতে লাগিল। কেন যে আমার এত দেরি হইয়াছে, সেকথা একবারও জিজ্ঞাসা করিল না। আমি যখন বলিলাম ঃ "কুমার, আজ বড় দেরি হয়ে গিয়েছে।" কুমার বলিল ঃ "দেরি হয়ে গিয়েছে? ওঃ, তাই আমার এত খিদে লেগেছে।" কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসা করিল না—কেন দেরি হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহার পরদিন হইতে আর আমার সেই অনুসরণকারী লোকটি কোনদিন আমার অনুসরণ করে নাই। যদি দৈবাৎ পথে কখনো তাহাকে দেখিতে পাইতাম, সে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত।* □

---

* ১৫ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা

নাট্য-সাহিত্যের মর্মকথা

সুরেশচন্দ্র মজুমদার

সত্যের তেজোবলেই সাহিত্য শক্তিশালী হইয়া থাকে; আবার সত্যের সহিত যদি সাহস সংযুক্ত হয়, তবে সে-সাহিত্য অমোঘবীর্য সৃজন করে। মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া অসম্ভব। সত্যই জীবনের ভিত্তি, মানব হৃদয়ের সাহস। ধর্ম বল, কাব্য বল, সবই সত্যের উপর নির্ভর করে। মিথ্যার হাটে মূর্তি কেনা চলিতে পারে, কিন্তু দেবী পাওয়া যায় না। এই সত্য ও সাহস আমরা কেমন করিয়া পাইতে পারি? ধর্মের পথ অবলম্বন না করিলে—অসত্য উপেক্ষী না হইলে, এ-শক্তির কখনো সঞ্চার হইবে না। সেজন্য শুদ্ধ, সংযমী এবং প্রশান্তচেতা হওয়া চাই। কিন্তু এসকল করিবার সাহস আমরা সম্পূর্ণ হারাইয়া বসিয়াছি। ধর্ম জিনিসটাকে এখন আমরা কুসংস্কার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি; সত্যকার ঈশ্বর বিশ্বাস অধিকাংশ লোকেরই নাই। এ অবস্থায় সৎ সাহিত্যের সৃজন অসম্ভব। ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাস জাগ্রত না হইলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে না।

বর্তমানে বাঙলা ভাষার নাটকের একটা বড় রকমের দুর্ভিক্ষ চলিতেছে বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। ইহার কারণ কী, একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। নাটক সাধারণত জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবিই হইয়া থাকে; যথার্থ নাটকে সামাজিক চিত্র যাহা আছে, কবি তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তুলেন। যাহা সর্বদা চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই, তাহার ভিতরের প্রাণ কোথায় প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। নাটকেই কবি সমাজের শিক্ষকের স্থান গ্রহণ করেন। সুতরাং বর্তমানে বাংলার নাট্যসাহিত্যের বেগ যে এতটা মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে এইকথাই স্বতঃ মনে উদিত হয় যে, হয় আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে, নতুবা দক্ষ চিত্রকরেরই অভাব হইয়াছে।

ঐতিহাসিক নাটক জনগণের দেশাত্মবোধের পরিচয়ই প্রদান করিয়া থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে দেশাত্মবোধের অভাব হইয়াছে; ইহা বলিলে নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপ করা হইবে; সুতরাং বাধ্য হইয়াই এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যাঁহারা নাট্য-সাহিত্য রচনায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের হৃদয় সাহস ও সত্যবলে উদ্ভাসিত নহে; তাঁহারা যাহা অহর্নিশ প্রত্যক্ষ করেন, ভীরুতা ও স্বার্থের জন্য তাহার হুবহু চিত্র অঙ্কিত করেন না বা করিতে সাহস করেন না। বাঙলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচনা করেন; তাহার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়া দেশের মধ্যে বেশ একটা সাড়া আনিয়া দিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রও কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন,

কিন্তু সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিই নাট্যাকারে গ্রথিত হইয়া বাঙালীকে যথার্থ দেশাত্মবোধের অমর ধারায় সর্বপ্রথম অভিষিক্ত করে। ইহার পরই কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের যুগ। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার প্রতাপাদিত্য নাটকে বাংলার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা নিপুণভাবেই চিত্রিত করিয়াছিলেন। আর কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙালীকে যে অমূল্য গ্রন্থরাজি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার নাম চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার রচিত 'রাণা প্রতাপ', 'দুর্গাদাস', 'মেবারপতন', 'নূরজাহান', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' এবং 'সিংহল বিজয়' বাঙালীর প্রাণে স্বদেশ ভক্তির একটা প্রবল বন্যা বহাইয়া দেয়। 'স্বদেশী আন্দোলন' হইতে আরম্ভ করিয়া এইসময় বাঙালী জাতির প্রাণে দেশসেবার যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল—দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ-স্বরূপ বিরাজিত রহিবে। একথা বলা বাহুল্য যে, বাঙালীর প্রাণের কথা যথার্থভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছিল বলিয়াই এই নাটকগুলি দেশবাসীর এত আদরের বস্তু হইয়াছিল। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল যে এমন নির্ভয়ে দেশাত্মবোধের রুদ্র-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন ইহা তাঁহার কত বড় মহাপ্রাণতার পরিচয় তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের অনেকেরই নাই। যিনি 'আমার দেশ' ও 'আমার জন্মভূমি' রূপ গীতদ্বয়ে বাঙালীকে অবিনশ্বর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় স্বদেশপ্রেমের পুণ্যপ্লাবনে কিরূপ পরিপ্লুত ছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়! দ্বিজেন্দ্রলাল বহুদিন হইল মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শূন্য আসন আজ পর্যন্তও শূন্যই রহিয়া গেল। বাংলার রঙ্গমঞ্চে এখনো নাটক অভিনয় পুরোদমেই চলিতেছে বটে কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক রচনায় আর যে তেমন কেহ অগ্রসর হইতেছেন না, ইহা দেশের দুর্ভাগ্যের কথা নহে কি? যে-বাংলার যুবকগণ দেশপ্রেমের জন্য অসীম কষ্ট ও অনন্যসাধারণ ত্যাগের পরিচয় দিতেছে, সে-বাংলায় দেশাত্মবোধের আগুন নিভিয়া গিয়াছে একথা কেহ নিশ্চয়ই বলিবেন না। তবে কবির তুলিকায় এইসব চিত্র কেন চিত্রিত হয় না? মধ্যে কিছুদিন সামাজিক নাটকের একটা প্রবল বন্যা দেখা দিয়াছিল; কিন্তু এখন বোধহয় সমাজ সংস্কারের নেশাটা অনেকেরই কাটিয়া গিয়াছে—তাই এখন বাংলার রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটকেই ভরপুর দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, নূতন সৃষ্টির ক্ষমতা বর্তমানের অধিকাংশ কবিরই নাই; কেবল পুরাণের সাহায্যে তাঁহারা ব্যবসা রক্ষা করিতেছেন মাত্র। ব্যবসা কথাটা এইজন্য বলিলাম যে, বাংলার নাট্যকারগণ স্বাধীনভাবে ঠিক সাহিত্যসেবার জন্য নাটক রচনা করিতে সাহস পান না; কেননা রঙ্গালয়গুলির উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন—জনশিক্ষা নহে; এবং যে-নাটকে যথেষ্ট অর্থোপার্জন হইবার সম্ভাবনা না থাকে, সেরূপ নাটক ইহারা কখনো অভিনয় করে না; আবার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হইলে কোন নাটক যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন, উহা জনসাধারণ কর্তৃক আদৃত হয় না। সুতরাং নাট্যকারগণ নিজের ইচ্ছামতো চিত্র না আঁকিয়া জনসাধারণের রুচির উপরই নির্ভর করিতে বাধ্য হন। সুতরাং ইহা বলাই বাহুল্য যে, নাট্যকারের পবিত্র কর্তব্য ইঁহারা

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথাযথ পালন করিতে পারেন না। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে আদৌ কল্যাণজনক নহে।

ইংলন্ডের সাহিত্যের ইতিহাস দেখিলে আমরা কী দেখিতে পাই? রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে ইংলন্ডে নাটক চরম উৎকর্ষ লাভ করে—সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করে। সেসময় ইংলন্ডে নবজীবনের একটা প্রবল বন্যা আসিয়াছিল, নূতন শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। যতদিন ইংলন্ডে এই নবজীবনের স্রোত বহিয়াছিল, ততদিন ইংরেজী নাটকেরও খুব প্রতিপত্তি ছিল; কিন্তু যেই সে নবজীবন স্রোতে ভাটা ধরিল, অমনি ইংরেজী নাটকেরও গৌরব-রবি কিছুদিনের জন্য অস্তমিত হইল। নূতন সৃষ্টির ক্ষমতা আর তাঁহাদের রহিল না; বৈচিত্র্যহারা জীবনে তাঁহাদের শক্তির উৎস শুকাইয়া গেল। নাট্যশালায় তাঁহারা ফরাসী নাটক অনুবাদ করিয়া চালাইতে লাগিলেন। আমাদের বাঙলা নাটকেও আজকাল নূতন সৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে; হয় পুরাণের সাহায্যে, নাহয় উপন্যাসগুলি নাট্যাকারে পরিণত করিয়া আসর রক্ষা করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহা জাতির দুর্ভাগ্যের লক্ষণ সূচিত করে নাকি?

প্রথমেই বলিয়াছি সত্য ও সাহসই সাহিত্যসেবার মূলমন্ত্র; সত্য প্রকাশ করিবার সাহস না থাকিলে সাহিত্যসেবায় অগ্রসর হওয়া বৃথা। জাতির এই জীবনমরণের সন্ধিস্থলেও আমরা পূর্ণমাত্রায় প্রেমচর্চাই করিতেছি—কেহ বা বিশ্বপ্রেম—কেহ বা পরকীয়া প্রেম। চন্দ্রিকা শালিনী মধুযামিনীতে মলয় সমীরে বসিয়া প্রেমের শিহরণে প্রাণে আনন্দের ফোয়ারা সৃজন করা ছাড়া অন্যকথা আমরা আর ভাবিতে পারি না। নাটকেও আমরা সত্য প্রকাশ না করিয়া এই চিত্রই ক্রমাগত অঙ্কিত করিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে বাহবাও লুটিতেছি। দেশবাসী কি এখনো সতর্ক হইবেন না? দেশে সত্য বা প্রতিভার আদর নাই—আছে শুধু ইতরোচিত ন্যাকামির। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নহে বলিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিও দেশে খুব কমই আদৃত হয়; অথচ রবীন্দ্রনাথ যে নাটক রচনায় অনভিজ্ঞ একথা বলিলে নিশ্চয়ই তাঁহার অমর্যাদা করা হয়। তবে কেন এরূপ হয়? অন্য কোন লেখক হইলে বলিবার অবকাশ থাকিত যে, ঐ পুস্তকগুলিতে নাটকোচিত গুণাবলীর অভাব পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে তো তাহা বলা যায় না। তবে কি ইহা দেশবাসীর কুরুচির ফল, না তাহাদের প্রতিভার আদর করিবার অক্ষমতা? যাহা হউক, নাট্যকারগণ যদি রঙ্গালয়ের কর্তাদের মুখ চাহিয়া নাটক রচনা করেন? তবে, তাঁহারা উৎকৃষ্ট নাটক রচনা অতি অল্পই করিতে পারিবেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, বাজারে জিনিসের চাহিদা পূর্ব হইতে থাকে না, উহা সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়। সাহিত্যক্ষেত্রেও চাহিদার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে অনন্তকাল পর্যন্ত বসিয়াই থাকিতে হইবে। সুতরাং যাঁহারা লোকশিক্ষার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, রঙ্গমঞ্চের কর্তাদের মুখ চাহিয়া না থাকিয়া তাঁহারা নিজে যাহা ভাল মনে করিবেন, তাহাই তাঁহাদের দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। ফ্রান্সের অমর কবি ভিক্টর হুগোর 'হারনাই' নাটকের কথা

এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এই নাটকখানি গতানুগতিকের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফ্রান্সকে নবজীবনের সুধাধারায় অভিষিক্ত করে। প্রথম যেদিন রঙ্গমঞ্চে এই নাটকখানির অভিনয় হয়, সেদিন নবীন ও গতানুগতিকের দলের মধ্যে তুমুল সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া যায়, পুলিশকে অতিকষ্টে শান্তিরক্ষা করিতে হয়। দুই পক্ষের ভীষণ হুঙ্কারের মধ্যে নাটকখানির অভিনয় আরম্ভ হয়। জনৈক প্রকাশক ইহার চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ের পূর্বেই ভিক্টর হুগোর নিকট যাইয়া নাটকখানি প্রকাশের স্বত্বের জন্য ছয় হাজার ফ্রাঙ্ক দিবেন বলিয়া তাঁহার হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন। বলিলেন, প্রথম অঙ্কের অভিনয় দেখিয়াই তিনি দুই হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে ইচ্ছা করেন; দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে চারি হাজার, তৃতীয় অঙ্কের পরে ছয় হাজার দিতেছেন। পঞ্চমাঙ্ক পর্যন্ত দেখিলে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে ইচ্ছা হইবে কিন্তু সে সামর্থ্য তাঁহার নাই। দরিদ্র হুগোর পক্ষে ছয় হাজার ফ্রাঙ্ক স্বপ্নাতীত; তিনি সানন্দে তাহাই গ্রহণ করিলেন। 'হারনাই' নাটক নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মূর্তিমান বিপ্লব হইলেও কিছুদিন পরে, সকলেই ইহার শিক্ষা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। এইজন্যই আমরা বলিতে চাই যে, নাট্যকারের হৃদয় সত্য ও সাহসের তেজোবলে বলীয়ান থাকা একান্ত কর্তব্য। সত্যের অবতারণাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য ও শক্তি। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের কথাও আপনাদিগকে মনে করিতে বলি। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের মতো গভর্নমেন্টের চাকুরি করিতেন; কিন্তু তাঁহার নাটকে দেশের যে-মর্মব্যথা তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বাংলায় নীলকরদের অত্যাচার চিরতরে থামিয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহার সামান্য সাহসের পরিচায়ক নহে। এইরূপ সাহস ও অকুতোভয়তা যদি বর্তমানের নাট্যকারগণ দেখাইতে পারেন; যদি দেশের মর্মব্যথা তাঁহারা যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে পারেন; যদি মূক জনগণের অন্তরের কথা তাঁহারা ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে পারেন; তবে বাংলার নাট্য-সাহিত্যের তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।* □

* ৩৫ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

সংস্কৃত কাব্যে বাংলার খাবার

বিমানবিহারী মজুমদার

যখন খাইতে পাওয়া যায় না, তখনই খাবারের কথা বেশি করিয়া মনে হয়। আজ বাস্তবরাজ্যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য, ও কাহারো কাহারো পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই, আজ সাহিত্যের মধ্যেও মন খাবারের খোঁজ করিতেছে। খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দুইজন বাঙালী কবি বড় বড় সংস্কৃত কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর। ইঁহার বাড়ি ছিল কাঞ্চনপল্লীতে, বর্তমানে যাহার নাম কাঁচড়াপাড়া। ইনি বেশ বড়লোকের ছেলে। ইঁহার পিতা শিবানন্দ সেন। প্রতিবৎসর হাজার হাজার বাঙালী যাত্রীকে সঙ্গে লইয়া পুরীতে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে যাইতেন। সঙ্গের লোকজনদের নৌকা পারাপারের খরচা, এক রাজ্যের সীমান্ত ছাড়িয়া অন্য রাজ্যে প্রবেশ করিবার শুল্ক প্রভৃতি শিবানন্দ সেন নিজেই দিতেন। কথিত আছে, কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভ করিয়া সাত বৎসর বয়সেই সংস্কৃত শ্লোক রচনাপূর্বক মহাপ্রভুকে উপহার দিয়াছিলেন। বড় হইয়া ইনি কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য ও নাটক লিখিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী' নামক কাব্য এতকাল অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি নবদ্বীপের হরিবোল কুটিরের হরিদাস বাবাজী মহোদয় গ্রন্থখানির প্রাচীন টীকা ও স্বকৃত বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে ৮৫ হইতে ১১৮ শ্লোকে বসন্ততিলক ও পুষ্পিতাগ্রা বৃত্তছন্দে শ্রীরাধার রন্ধনের একটি মনোরম বর্ণনা আছে। ষোড়শ শতাব্দীর অপর যে বাঙালী কবির সংস্কৃত কাব্যে সমসাময়িক বাঙালীর খাবারের বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি হইতেছেন সুপ্রসিদ্ধ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ। চরিতামৃত রচনার বহুকাল পূর্বে ইনি 'গোবিন্দলীলামৃত' নামে সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। ঐ কাব্যের তৃতীয় সর্গের ৮৫ শ্লোক হইতে ১১০ শ্লোকে নানারূপ খাদ্যদ্রব্যের পাকপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই কাব্য হইতে মিলাইয়া ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর ভোজনবিলাসের পরিচয় দিব। কবিকর্ণপূর বাংলাদেশে বসিয়া লিখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রদত্ত তালিকা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তালিকা অপেক্ষা বিস্তৃত। কবিরাজ গোস্বামী বহুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন; কাজেই তাঁহার কাব্যে বাংলাদেশে উৎপন্ন সকল শাকসবজির নাম নাই।

শাক—কবিকর্ণপূর বাথুয়া (বাস্তুক), নটে (মারিষ) নতির পাতা বা পটলশাক, কলায়লতার শাক (কলায়বল্লী শিখা), ছোলার শাকের কচি ডগা (চনকাগ্র শিখা), মটরশাক, কোমল লাউডগা (তুম্বীশিখা) এবং পদিনার শাকের উল্লেখ করিয়াছেন (৮৭)। এই শাকগুলি শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্য ভালো সরিষা তৈলে ভাজিয়াছিলেন। পদিনার শাক ভাজিলে খাইতে কেমন হয় পরীক্ষা করিয়া

দেখি নাই; আমরা পদিনার চাটনি খাইতেই অভ্যস্ত। ছোলার শাক ও মটর শাকের যে ঘণ্ট হইতে পারে সেকথা কবিকর্ণপূর উল্লেখ করেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী নালিতা পাতা, মেথি সলফোর শাক (শতপুষ্পী), মেটরি (মিষি), সুষনি (বিতুন্ন) ও নটেশাকের (মারিষ) কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এইসকল শাক শ্রীরাধার বিভিন্ন প্রকারের রন্ধনের গুণে সুধার গর্বকেও হরণ করিয়াছিল। অনেক বাঙালীর ছেলের এখনো এই মত যে, শাক যদি ভাল করিয়া রান্না হয়, তাহা হইলে শুধু তাহাই দিয়া ভাত খাওয়া যায়। কবিরাজ গোস্বামী কলমি ও নালিতা পাতা রাঁধার উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন। পাকা তেঁতুলের রস দিয়া কলমি শাক এবং কাঁচা আম দিয়া কৃষ্ণ নালিতা পাতার শাক রুচিপ্রদ হয় (গোবিন্দলীলামৃত, ৩।১০৫)। এই দুই কবির তালিকায় পালং, কঙ্কা, মূলার শাক ও পুঁইশাকের নাম পাওয়া যাইতেছে না।

ভাজি—সাধারণ ভাজির সঙ্গে কবিকর্ণপূর বর্ণিত ভাজির কিছু পার্থক্য আছে। তিনি লিখিয়াছেন—

বার্তাকু সূরণক মানক কর্করোথৈ
রম্ভামুঘোত্থ কণিশৈঃ কচুভিঃ পটোলৈঃ।
কুষ্মাণ্ডকৈর্লবলবৈঃ শিতসূচিরাজী
বেধেন নীরসতমৈর্বিবিধাঽস ভাজী॥

অর্থাৎ বেগুন, ওল (সূরণক), মান, কাঁকরোল, গর্ভমোচার কলাগুলি, কচু, পটোল ও চালকুমড়া (কুষ্মাণ্ড) ছোট ছোট করিয়া বানাইয়া সূক্ষ্ম সূচীসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রস বাহির করিয়া নানাপ্রকার ভাজি তৈয়ারি হইল। কবিরাজ গোস্বামী কতকগুলি বেসন-ভাজার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—গর্ভমোচার ও থোড়ের কোমল আগা, মানকচুর আগা, সাগরকন্দের ও পানিকচুর (অম্লকচু) আগা এবং আলু, কুষ্মাণ্ড, ঢ্যাঁড়স (ডিণ্ডিশ) সমূহের গোল গোল চাকাগুলি ডালের বেসনে চুবাইয়া ঘিয়ে ভাজা (গোঃ ৩।৯২-৯৩)। এইখানে আলুক শব্দ লইয়া কিছু গোল আছে, কেননা উহা গোলআলু হইতে পারে না। গোলআলু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে স্যার টমাস রো ভারতবর্ষে প্রবর্তন করেন বলিয়া কথিত আছে। এখানে আলুক অর্থে সাগরকন্দ বা শকরকন্দ আলুও হইবে না, কেননা তাহার স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। চুপড়ি আলু লতায় হয়, উহা মেটে রঙের। কিন্তু উহা বেসন ভাজা খায় বলিয়া শুনি নাই। সুতরাং এ-স্থানে আলুক অর্থে রাঙাআলু ধরিতে হইবে। রাঙাআলু—সাগরকন্দ আলু অপেক্ষা আকারে ছোট ও অধিক সুঘ্রাণবিশিষ্ট হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ডালের বড়া ঘিয়ে ভাজিয়া লইবার কথাও বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে বকফুল-ভাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় খাদ্য। কাঞ্চন ফুলের কলিকা ঘিয়ে ভাজিয়া দধিতে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীরাধা একটি খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

রসা, রায়তা, তরকারি—কবিকর্ণপূর তরকারির মধ্যে কুষ্মাণ্ড, আলু, মান, ওল, লাউ, বেগুন, মূলা, পটল, শিম, ঢ্যাঁড়স, কাঁচাকলা, গর্ভমোচা ও থোড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় শিম নাই, তবে ঝিঙ্গার (জ্যোৎস্নিকা) কথা আছে। কবিকর্ণপূর অনেক রকমের তরকারি রান্নার প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—(১) ভাল কাসুন্দি, আদা-বাটা ও

নারিকেল-বাটা দিয়া কাঁঠালের বিচির দুই রকমের ব্যঞ্জন। (২) কুষ্মাণ্ড, আলু, কচু, মূলা, মান প্রভৃতি দ্বারা ভাল ভাল তরকারি, (৩) নতির পাতার শুক্তনি; উহা ভাল কাসুন্দি ও আদা-বাটা দিয়া নতিপাতা মাখিয়া গরম সরিষা তেলে ছাড়িয়া রাঁধিতে হয়।

যস্মিন্ প্রতপ্ত-কটু তৈল্যা-তিক্তপত্রীঃ।
সৎকাসমর্দদলিতার্দ্রক-সাধুমৈত্রীঃ।।

(৪) বেগুনের ছোট ছোট টুকরা করিয়া লইয়া উহার সহিত ছোট মুগ-বড়া দেওয়া হইল, আদার কুচি ও নারিকেল-বাটা তাহাতে দিয়া সরিষার তৈলে ভাজিয়া সুখদ আরেক ব্যঞ্জন তৈয়ারি হয়। (৫) বেগুন, কাঁচাকলা, নারিকেল, ছানা এবং মাসকলাইয়ের বড়ি মিশাইয়া মরিচ অথবা চিনি দিয়া কটু অথবা মধুর ছানাবড়া প্রস্তুত হয়। (৬) ডালের মধ্যে নারিকেল ও মূলার পুরু পুরু খণ্ড দিয়া প্রচুর ঘৃত, হিং, আদা-বাটা ও গুড় সহযোগে 'মাসসূপ' নামে এক ব্যঞ্জন তৈয়ারি হইত। (৭) মুগ-ডালের মধ্যে নারিকেল-বড়া, এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ, হিং ও আদা দিয়া, উহা নারিকেল শস্য উত্তমরূপে পেষণ ও মর্দন করিলে যে দুধ বাহির হয় তাহার মধ্যে চিনি ও দুধ দিয়া রাঁধিলে 'মুগসূপ' তৈয়ারি হয়। (৮) মোচার ভিতরের শস্যগুলিকে পরিষ্কার করিয়া কুটিয়া তাহাতে দুধ, হিং ও মরিচ দিয়া রাঁধিলে 'মরিচাঘ্য' ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। (৯) মান ও মূলাকে ছোট ছোট করিয়া কুটিয়া একটি তরকারি। (১০) এঁচোড়ে ছোলার ডালের বড়া এবং হিঙ্গুমরিচাদি সংযোগে অন্য এক তরকারি হয়। (১১) দুধলাউ বা দুগ্ধালাবু তৈয়ারির উপায় সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

সৌক্ষ্মেণ জীরক-নিভং পরিকৃত্য তুম্বীং
সিদ্ধাঞ্জকেন পয়সা চ নিধায় কম্বীম্।
আলোড্য দত্তঘনসারমপাচি দুগ্ধাহ-
লাবুঃ সিতামরিচ জীরকহিঙ্গুমুগ্ধাঃ।।

লাউকে জিরার মতন করিয়া বানাইয়া জল ও দুধে সিদ্ধ করিয়া হাতা দিয়া বারবার নাড়িয়া কর্পূর, চিনি, মরিচ, জিরা, হিং প্রভৃতি দিয়া দুগ্ধালাবু প্রস্তুত করিলেন। ইহাকে কবিরাজ গোস্বামী দুগ্ধতুম্বী বলিয়াছেন. তবে ইহাতে তিনি হিং দিতে বলেন নাই। তিনি অনুরূপ প্রণালীতে 'ক্ষীরকু' প্রস্তুত করিবারও উপদেশ দিয়াছেন। (১১) তাঁহার 'গোবিন্দলীলামৃত' কাব্যে রাই (রাজিকা) ও দধি সংযোগে কুমড়া, ঝিঙ্গা ও লাউয়ের রায়তা তৈয়ারির কথা আছে। (১২) তিনি নালিতার পাতা চূর্ণ দিয়া বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বটিকার সহিত কচু, মান, আলু, সাগরকন্দ সহযোগে চই বা চবিকা প্রস্তুতের বর্ণনা করিয়াছেন।

অম্ল—অম্ল বা অম্বল রাঁধিবার বিবিধ উপায় উভয় কাব্যেই বর্ণিত হইয়াছে। কবিকর্ণপূর নিম্নলিখিত অম্লের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—(১) পাকা কুমড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সরিষার তেলে ভাজিয়া ঘোল, আদা, মৌরি ও হিঙ্গু দিয়া ছানা ও বড়ার সহিত মিশাইয়া একরকমের কোমল অম্ল। (২) মূলা ও পাকা লতা চাকা-চাকা করিয়া বানাইয়া তাহাতে ঘোল, গুড় এবং পাকা তেঁতুল (পক্ব-ভব্যখণ্ড) দিয়া একপ্রকার অম্ল। (৩) ঘোলের মধ্যে চণকচূর্ণ বা ছোলার বেসন, হলুদ ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ করিয়া তাহাতে টাবা লেবুর রস, আদা ও

হিঙ্গু প্রক্ষেপ করিয়া উহার মধ্যে বেশ তুলতুলে মোটা বড়া দিয়া কাঞ্জিক বটি বা দইবড়া তৈয়ারি হয়। (৪) গরম ঘিয়ে ভাজা সরিষার চূর্ণ দিয়া তাহাতে আমসি সহযোগে একরকমের অম্ল। (৫) জল বা রসে মিষ্ট আম মর্দন করিয়া আদাবাটা দিয়া চিনি ও দুধ সহযোগে এক উপাদেয় অম্লবর প্রস্তুত হয়। (৬) আমচুরে ভাজা তিল বাটিয়া একরকমের অম্ল (৭) চালতা ও ভাজা তিল দিয়া আরেক রকমের। (৮) পাকা আমড়ার ও (৯) কাঁচা আমড়ার অম্লে দুধ, চিনি ও হিঙ্গু মিশ্রিত অম্বল। কবিরাজ গোস্বামী বার-রকমের অম্লের বর্ণনা দিয়াছেন—

চিঞ্চাম্রাতকচুক্রাম্রৈস্তত্তদ্ব্যাদিযোগতঃ।
ঈষন্মধুরগাঢ়াম্লভেদাম্লো দ্বিষড়্‌বিধঃ।। (৩।৯১)

অর্থাৎ তেঁতুল, আমড়া, আমরুল ও আম এই চার রকমের অম্ল মুগের বড়া ও অন্যান্য দ্রব্য সংযোগে ঈষদম্ল, মধুরাম্ল, মধ্যাম্ল ভেদে বার রকমের অম্ল হইয়াছে।

পিঠে, পায়েস প্রভৃতি—শাক, ভাজি, তরকারি, ডাল, অম্বল ছাড়া নানা রকমের পিষ্টক ও পায়সের বর্ণনাও এই দুই কাব্যে আছে। পিষ্টকগুলির নাম বড় সুন্দর—তবে প্রস্তুত-প্রণালী সবসময়ে বলিয়া দেন নাই। কবিকর্ণপূরবর্ণিত কয়েকটি পিষ্টকের নাম—হংসকেলি, শোভারিকা, বেণী, চন্দ্রকান্তি, ললিতা। আজকালেও যেসব মিঠাই আমরা খাই, চারশ বছর পূর্বেও তাহাদের অনেকগুলি প্রচলিত ছিল, যেমন—

জীলাবিকা মউহরী পুরু পূপগূজা
নাড়ীচয়াঃ কৃত সরস্বতিকাদি পূজাঃ।
খর্চূরদাড়িমক শর্করপালমুক্তা
লাড্ডুৎকরান্ বিদধিরেহথ কলাভিযুক্তাঃ।। (কবিকর্ণপূর, ৩।১১৫)

জীলাবিকা নিশ্চয়ই জিলাপি, পুরু সম্ভবত পুরি, পূপ হইতেছে পুয়া, গূজা মানে গজা এবং খর্চূর খইচুড়, দাড়িমক কাহাকে বলে জানি না। 'চিত্রা' নামে একটি পিষ্টক তৈয়ারির প্রণালী কবিকর্ণপূর নিম্নলিখিতভাবে দিয়াছেন ঃ দুধের সহিত ভাজা তিল, চালের গুঁড়া ও নারিকেল দিয়া পুর তৈয়ারি হইল, একটি গরম জলপূর্ণ ঘটের মুখে কাপড় বাঁধিয়া দেওয়া হইল, তারপর ঐ কাপড়ের ভিতর দিয়া ঘটের মুখ হইতে যে-বাষ্প উঠিতেছে, তাহাতে পুরগুলি দিয়া সরা ঢাকিয়া দেওয়া হইল। ঐ পুরগুলি শক্ত হইলে ঘন করিয়া জ্বাল দেওয়া দুধে ছাড়িয়া দিলে 'চিত্রাঘ্য' পিষ্টক প্রস্তুত হয়। কবিরাজ গোস্বামী কলা, নারিকেল ও ক্ষীরসার সহযোগে নানাপ্রকারের পিষ্টক তৈয়ারির কথা বলিয়াছেন। শ্রীরাধা যে-কর্পূরকেলি ও অমৃতকেলি পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার নির্মাণ-কৌশল নাকি তাঁহার সখীরাও জানিতেন না। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামী উহার প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণনা করিতে পারেন নাই।

আমাদের দেশের তরি-তরকারি শাক-পাতা মিঠাই-মিষ্টান্নের নাম কেমনভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে তাহাও কৌতূহলোদ্দীপক। আজকালকার শিক্ষিত মেয়েরা মাছ, মাংস, ডিম রাঁধার দিকেই বেশি ঝোঁক দেন, নিরামিষ দিয়াও যে অতি সুন্দর ও পুষ্টিকর আহার্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহার ইঙ্গিত এই প্রবন্ধ হইতে মিলিলে সুখী হইব।* □

* ৪৫ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানবজাতির ইতিহাসে দেখা যায় যে, দেশ ও কালভেদে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন রকমের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের কোন কোনটি কালের আবর্তে পড়িয়া লুপ্ত হইয়াছে, আবার দুই একটি যেন কালকে জয় করিয়া আজও পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। এসব সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনটি জড়বাদী, কোনটি আধ্যাত্মিক, কোনটি ধর্মমূল ও আস্তিক কোনটি ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিক কোনটি মানবিক, আবার কোনটি যান্ত্রিক। আমরা আরো দেখিতে পাই যে, কোন এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোন এক দেশ ও জাতির মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে এবং তাহাদেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরূপে লোকসমাজে ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যথা—গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানবেতিহাসে গ্রীক জাতিরই বিশিষ্ট অবদানরূপে ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতি এক অতি প্রাচীন সংস্কৃতি। স্মরণাতীতকাল হইতে ইহা ভারতবর্ষে বিরাজমান আছে এবং কালের কোলে থাকিয়াও কালগ্রাসে কবলিত হয় নাই। ভারতের বক্ষে লালিত ও পালিত বলিয়া ইহাকে ভারতীয় সভ্যতা বলা হয়। আবার ভারতীয় আর্যজাতির মধ্যে ইহা জন্ম ও প্রসারলাভ করিয়াছে বলিয়া ইহাকে আর্য-সংস্কৃতি বলে। পরবর্তী কালে ভারতীয় আর্যদের এবং ভারতবাসী সাধারণের হিন্দু আখ্যা হওয়ায় ইহার আরেক নাম 'হিন্দু'-সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির মূল উৎস বেদ ও উপনিষদ্ বিধায় ইহাকে বৈদিক সংস্কৃতিও বলা হইত এবং এখনো বলা হয়। কিন্তু অধুনা কোন কোন জননায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক বলেন যে, এ-সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি বলা চলিবে না। ইহাকে কেবল ভারতীয় সংস্কৃতিই বলিতে হইবে। ইহার কারণটি আমাদের মতো সামান্য লোকের বুদ্ধিগম্য নহে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ কী, ইহা কোন্ জাতীয় ও কোন্ জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি, এবং উহাকে হিন্দু-সংস্কৃতি বলা বিধেয়, না অবিধেয় তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝিতে হইলে, সংস্কৃতি বলিতে আমরা কী বুঝি এবং উহার লক্ষণ ও উপাদান কী তাহা জানা আবশ্যক। সংস্কৃতি শব্দটি ইংরেজী 'Culture' শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দরূপে আজকাল ব্যবহৃত হয়। ইহার জার্মান প্রতিশব্দ হইতেছে 'Kultur' এবং তাহার অর্থ হইতেছে জার্মানজাতি-সম্মত সভ্যতা অর্থাৎ সভ্যতা বলিতে জার্মানরা যাহা বুঝে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় 'সংস্কৃতি' শব্দটি পাওয়া যায় না, কিন্তু সংস্কার শব্দটি পাওয়া যায় এবং তাহার অন্যান্য অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হইতেছে মার্জন এবং আরেকটি হইতেছে শাস্ত্রাভ্যাসজন্য ব্যুৎপত্তি। বোধহয় এই দুইটি অর্থ

লক্ষ্য করিয়া বাঙলাভাষায় 'Culture' শব্দটির প্রতিশব্দরূপে 'সংস্কৃতি' শব্দটির চলন হইয়াছে। এখন ইংরেজী 'Culture' পদটি ফরাসী ও ল্যাটিন 'Cultura' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন এবং এই শব্দটির অর্থ হইতেছে কর্ষণ বা কৃষি। এই ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ হইতে বুঝা যায় যে ইংরেজী 'Culture' শব্দের অর্থ হইতেছে শিক্ষা-দীক্ষা-প্রসূত সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি ও সুরুচি। এখন Culture শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা সংস্কৃতি শব্দের এরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারি। সংস্কৃতি শব্দের অর্থ হইতেছে জ্ঞানানুশীলনজন্য মানুষের দেহ ও মনের এক বিশেষ অভ্যুদয় বা উৎকর্ষ।

সংস্কৃতির উল্লিখিত সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ইহার মধ্যে প্রধানত দুইটি বিষয় আছে। একদিকে সংস্কৃতি বলিতে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ বুঝায়। সংস্কৃতি দ্বারা মানুষের দেহ, মন ও হৃদয়ের একপ্রকার মার্জিত ও উন্নত অবস্থার আবির্ভাব হয় এবং তাহার দৈহিক ও মানসিক প্রবৃত্তিগুলির একটি বিশেষ অভ্যুত্থান ঘটে। সংস্কৃতিহীন মানুষ প্রায় পশুর মতো জীবনযাপন করে। সে যেকোন প্রকারে আহার্য সংগ্রহ করিয়া অপক্ক অবস্থায়ই তাহা গ্রহণ করে এবং প্রায় পশুর ন্যায় তাহার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সন্তান উৎপাদন করে। এই দুই কাজেই তাহার জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের জীবন এই দুই কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। অবশ্য তাহাকেও আহার্য সংগ্রহ করিতে হয় এবং কামক্রোধাদি পাশবিক প্রবৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হইতে হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে এগুলির সংস্কার ঘটে এবং অন্যান্য উচ্চপ্রবৃত্তিরও আবির্ভাব হয়। মানুষের পাশবিক বৃত্তিগুলির এরূপ সংস্কার এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃত্তিগুলির আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা সংস্কৃতির অন্তর্গত যে আরেকটি প্রধান বিষয় আছে তাহা বুঝিতে পারিব। এটি হইল মানুষের বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানানুশীলন। বিদ্যার্জন ও জ্ঞানানুশীলনের দ্বারাই ব্যক্তি বা জাতি সংস্কৃত হয় এবং পশুত্বের নিম্ন স্তর হইতে মনুষ্যত্বের উচ্চ স্তরে উঠে। এইজন্যই যেসব মনুষ্য বা মানবজাতির মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনের অভাব আছে, তাহাদিগকে আমরা বন্য, বর্বর, অসভ্য অর্থাৎ সংস্কৃতি-বর্জিত বলি।

এখন কোন্ বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের দ্বারা কোন্ মানুষ বা মনুষ্যজাতি সংস্কৃতিরূপ উৎকর্ষ লাভ করে তাহা দেখিতে হইবে। সংস্কৃতি যে যে বিদ্যা বা জ্ঞানরাজির ফলস্বরূপ, আমরা সেগুলিকে সংস্কৃতির অঙ্গ বা উপাদান বলিতে পারি। এবিষয়ে একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, সংস্কৃতির পাঁচটি প্রধান অঙ্গ আছে, যথা—ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, দর্শন এবং ধর্ম। যে-ব্যক্তি কোন ভাষা বা সাহিত্য জানে না, বিজ্ঞানের কিছুই বুঝে না, চারুকলার রসাস্বাদন করিতে পারে না এবং ধর্ম ও দর্শনের মর্মগ্রহণ করিয়া জীবনে তাহা অনুসরণ করে না তাহাকে আমরা বর্বর ও অসভ্য বলিয়া থাকি। সেইরূপ যে-জাতির কোন পরিপুষ্ট ভাষা ও সাহিত্য নাই, কোন বিজ্ঞান-সম্পদ নাই, কোন চারুকলা, দর্শন বা ধর্মও নাই তাহাকেই আমরা অসভ্য জাতি বলিয়া গণ্য করি। কোন ব্যক্তি বা জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন্ স্তরে আছে তাহা আমরা তাহাদের সংস্কৃতির স্বরূপ ও লক্ষণগুলি

দেখিয়া নির্ণয় করি। এই হিসাবে পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আমরা জড়বাদী বা যান্ত্রিক বলিতে পারি, কারণ সেখানে জড়বাদের ভিত্তিতে এক যান্ত্রিক শিল্পযুগের প্রবর্তন হইয়াছে। অবশ্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে তাহার মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুশিল্প প্রভৃতির অল্পবিস্তর স্থান আছে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, সংস্কৃতিমাত্রই পঞ্চাঙ্গ; এই পঞ্চ অঙ্গ লইয়াই একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতির বিকাশ হয় এবং তাহার স্বরূপ ও লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়।

এই দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও লক্ষণ কিরূপ বলিতে হয়, তাহাই এখন আলোচনা করিব। অন্যান্য মহতী সংস্কৃতির ন্যায় ভারতীয় সংস্কৃতিরও পাঁচটি প্রধান অঙ্গ আছে। ভারতের একটি নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য আছে। অন্ততপক্ষে প্রাচীন ভারতে দেবভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ভারতীয়দের নিজস্ব বলিয়া পরিগণিত হইত। আধুনিক কালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যেসব ভাষার উৎপত্তি ও প্রচলন হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন। এখন যে হিন্দি ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা যদি যথাসম্ভব সংস্কৃতানুগ হয় তবে এদেশের অন্য ভাষাভাষীদেরও উহাকে স্বীকার করিতে বিশেষ আপত্তি হইবে না। তারপর প্রাচীন ভারতে অনেক বিজ্ঞানেরও অভ্যুদয় হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয়গণ জ্যোতিষ, রসায়ন, জীববিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানের বহু আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের একটা নিজস্ব চারুকলাও ছিল, যদিও এখন উহার সহিত বিদেশীয় কলার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তারপর ভারতীয় আর্যদের যে একটা ধর্ম ও দর্শন ছিল এবং এখনও আছে তাহা সুধীমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির পঞ্চ অঙ্গের মধ্যে দর্শন ও ধর্মকেই প্রধান বলিতে হয়। সাধারণত ধর্ম ও দর্শনকে দুইটি পৃথক বিষয় বলিয়া গণনা করা হয়। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে উহারা এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং প্রায় সমভাবাপন্ন। ভারতীয় দার্শনিকদের নিকট দর্শন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিপ্রসূত মতবাদমাত্র নহে, পরন্তু উহা জীবনে পরমার্থলাভের জন্য অত্যাবশ্যক আধ্যাত্মিক বিদ্যা, মানুষের জীবনসমুদ্রে পথপ্রদর্শক ধ্রুবতারা। আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গি। বোধহয় সেইজন্যই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিও আধ্যাত্মিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে জড়বিজ্ঞানের প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য উহাকে যদি কেহ বৈজ্ঞানিক ও জড়বাদী সংস্কৃতি বলেন, তবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বলিতে হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হইতেছে বেদ ও উপনিষদ্। ভারতীয় আর্যগণ বেদ ও উপনিষদের মধ্যে যে-আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন তাহাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গগুলিতে অল্পবিস্তরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের একটি আধ্যাত্মিক রূপ দিয়াছে। বেদ ও উপনিষদের মূল তত্ত্ব ও উপদেশ এই যে, দৃশ্যমান জীবজগৎ এক অদ্বয়, সর্বব্যাপী চৈতন্যময় পুরুষের বিকাশ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার এক পাদ মাত্র, তাঁহার অপর তিন পাদ ইহাকে অতিক্রম করিয়া পরম ব্যোমে অমৃতরূপে

বিরাজ করিতেছে। জীব, জগৎ, গ্রহ, নক্ষত্র ও দেবতাগণ তাঁহার বিকাশ, তাঁহাতেই অবস্থিত এবং তাঁহার অনুশাসনে পরিচালিত। আব্রহ্মস্তম্ব যে সূক্ষ্ম ভগবদনুশাসনের অধীন তাহাকে ঋগ্বেদে 'ঋত' বলা হইয়াছে। মীমাংসা-দর্শনে যে অপূর্ব অর্থাৎ কর্মফলপ্রসবিনী শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে যে অদৃষ্টের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা ঋতেরই ভাবান্তর। পরবর্তী কালে ইহাই কর্ম ও কর্মফলের নিয়মরূপে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সকল সংসারী জীবাত্মা কর্মফল-অনুসারে ইহলোকে ও পরলোকে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। কর্মফল ও পরলোকে বিশ্বাস ভারতীয় দর্শনগুলির একটি সমান তন্ত্র। জীব যতদিন অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে ততদিন তাহার দুঃখভোগ অনিবার্য। মানুষ দুঃখনিবৃত্তির যত চেষ্টাই করুক না কেন, জন্ম জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে কাহারো পরিত্রাণ নাই। মানুষের জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হইতেছে তত্ত্বজ্ঞান। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ বুঝিতে পারে যে এই জড়জগৎ অনিত্য, ইহা পরমার্থ নহে, জীব স্বরূপে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ ও মুক্ত আত্মা, জীবাত্মা ঈশ্বর বা পরমাত্মার অংশ অথবা স্বরূপত জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে মানুষের আর রাগ-দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কলহ ও হিংসার বৃত্তি থাকে না। কারণ মানুষ তখন দেখিতে পায় যে, এক ভগবানই সর্বজীবে বিরাজমান, সে তখন নিজ আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে নিজ আত্মায় দেখিতে পায়। এইরূপ হইলে কে আর কাহার হিংসা করিবে, কে আর কাহার দ্বেষ করিবে? যে-মানুষের জীবন ভারতের বেদ ও উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়াছে এবং যিনি আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার বাণী হইবে মৈত্রীর বাণী, তাঁহার ভাব হইবে করুণার ভাব এবং তাঁহার চেষ্টা হইবে সর্বজীবের কল্যাণের প্রচেষ্টা।

বেদ ও উপনিষদের মূলতত্ত্ব ও উপদেশগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির সকল অঙ্গেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদিগকে স্বাভাবিক করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই বেদোপনিষদের মর্মবাণী শুনিতে পাওয়া যায়। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যেও উহাদের প্রভাব দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয়দের বিজ্ঞান ও চারুকলার মধ্যে উহারা অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মগুলি যে বেদ ও উপনিষদের ভাবধারা ও প্রত্যয়রাজির ব্যাখ্যা ও আলোচনামুখে প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা সুধীমাত্রেই জানেন। এবিষয়ে অন্য একটি প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭) বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বা ভিত্তি লক্ষ্য করিলে উহাকে বৈদিক সংস্কৃতি বলিতে হয়। আবার যে-আর্যজাতির মধ্যে এই সংস্কৃতির আবির্ভাব ও প্রসার হইয়াছিল তাহা দৃষ্টে ইহাকে আর্য সংস্কৃতি বলিতে হয়। অবশ্য ভারতীয় অনার্য জাতির সংস্কৃতির কোন কোন অংশ যে উহার অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহা স্বীকার্য। পরবর্তী কালে ভারতীয় আর্যদের এবং ভারতবাসী-সাধারণের হিন্দু নাম হইয়াছে এবং তাঁহাদের

আবাসভূমিকে হিন্দুস্থান আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে হিন্দু-সংস্কৃতি বলিতে কাহারো সঙ্কোচ বোধ করা উচিত নয়। অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, আজ কোন কোন দেশবরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক ভারতের 'হিন্দুস্থান' নাম প্রত্যাখান করিয়া ইংরেজী 'ইন্ডিয়া' নামটি পছন্দ করিয়াছেন এবং আর্য সংস্কৃতিকে 'হিন্দু-সংস্কৃতি' না বলিয়া কেবল 'ভারতীয়-সংস্কৃতি' বলিবার উপদেশ দিতেছেন। ইহার দ্বারা অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কিনা জানি না, তবে সত্যের যে অপলাপ করা হইবে তাহা বলিতে পারি। একথা সত্য যে, নব্য ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে অন্যান্য জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের কিছু অবদান আছে। কিন্তু এইগুলি অতি সামান্য এবং কোন কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের এবং চারুকলার কোন কোন শাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ যে ধর্ম ও দর্শন তাহার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটে নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতভূমিকে 'মহামানবের সাগরতীর' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এ-বর্ণনা অসত্য নহে। ভারততীর্থ অনেক জাতির ও অনেক ধর্মের লোকের সঙ্গমস্থল। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় সংস্কৃতি এক মিশ্র বস্তু এবং উহা বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে বা সমবায়ে গঠিত। ভারতীয় সংস্কৃতির একটা নিজস্ব সত্তা ও বিশিষ্ট ধারা আছে। এক উদার বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। যে-জাতির ধর্ম ও দর্শনের মুখ্য উপদেশ এই যে, এক ভগবান সর্বভূতে বিরাজমান এবং আব্রহ্মস্তম্ব সকল জীবই এক বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন, তাহার সংস্কৃতি যে কেবল অপর জাতি ও ধর্মের প্রতি সহনশীল হইবে তাহাই নহে, পরন্তু উহা সকল ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতিকে নিজের বিশাল বক্ষে ধারণ করিতে এবং তাহাদের সহিত এক মহামিলনসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে। এই মহামিলনের সূত্র ধরিয়া ভারতভূমি 'মহামানবের সাগরতীরে' পরিণত হইয়াছে বা হইবে। ইহাই ভারতের চিরকালের সাধনা এবং মানবজাতির ইতিহাসে ইহাই তাহার অমূল্য অবদান। বোধহয় ভগবানের এরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই ভারতের জন্ম ও কর্ম এবং নবজাগরণের সূচনা। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা বৈচিত্র্যের মধ্যে যে-একের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই এই ভারতভূমিতে সর্বমানবের এক মিলনসূত্র রচিত হইয়াছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এক সার্বভৌম ও বিশ্বজনীন সংস্কৃতিতে পরিণত হইয়াছে। এই সংস্কৃতিকে নানা বর্ণে রঞ্জিত পতাকার মতো নানা জাতি ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গঠিত মিশ্র বা বহুরূপী সংস্কৃতি বলিলে উহার স্বরূপের অপলাপ করা হইবে মনে করি।* □

* ৫৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা

‘কথামৃত’ ঃ সাহিত্যামৃত

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীম-কথিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ পাঠে সাহিত্যামৃতের স্বাদও পাওয়া যায় এবং তা কী কারণে, কিছু উদাহরণ দিয়ে সেকথা বলাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। ‘কথামৃত’-এ ধর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা আছে, আছে ঈশ্বরভক্তি, মানবপ্রীতির কথা, আছে বিশ্বাস-আত্মসমর্পণের আলোচনা, আছে আত্মোপলব্ধি-অতীন্দ্রিয়ানুভূতির ব্যাখ্যা ইত্যাদি অনেক কিছু। কিন্তু এই দুরূহ বিষয়গুলি যে-ভাষা ও বাকশিল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার একটি নিজস্ব সাহিত্যমূল্য আছে। ‘কথামৃত’-এর সাহিত্যমূল্য বিচার করার চেষ্টা করব মূলত তিনটি মানদণ্ডে। প্রথম ইংরেজী সাহিত্যে “The noblest monument of English Prose”—এই সম্মানে যে-গ্রন্থখানি ভূষিত হয়েছে সেখানি কী কী সাহিত্যগুণের জন্যে এই সম্মান পেয়েছে, আমরা দেখার চেষ্টা করব। দেখব, সেই গুণগুলি ‘কথামৃত’-এ কতখানি আছে। দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ধারণা ‘কথামৃত’-এ কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে। এবং তৃতীয়, সর্বকালীন মহৎ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ‘কথামৃত’-এ আছে কিনা।

যে-গ্রন্থটিকে ইংরেজী সাহিত্যে গদ্যরচনার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে সম্মানিত করা হয়েছে সেটি একটি ধর্মগ্রন্থ, ইংরেজী বাইবেল-এর একটি বিশিষ্ট সংস্করণ যা ‘The Authorised Version of the English Bible’ বলে পরিচিত এবং ইংরেজী ভাষাভাষী খ্রীস্টীয় জগতে বহুল প্রচারিত এবং ব্যবহৃত। এই গ্রন্থের প্রকাশ ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে। মূল বাইবেলের ভাষা হিব্রু। তারপর তার অনুবাদ হয় গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায়। তারপর ইংরেজীতে। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস কয়েকজন পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেছিলেন অনুবাদের কাজে। এইসব পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টা হচ্ছে ‘The Authorised Version’—সংক্ষেপে ‘A.V.’। যে-যে সাহিত্যগুণের জন্য ‘A.V.’-কে ইংরেজী গদ্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে সেগুলির উল্লেখ করেছেন জন লিভিংটন লাওয়েস (John Livington Lowes) এবং তার অনেকগুলিই কথামৃত-এ পাওয়া যায়। এবং যেহেতু লাওয়েস-এর ‘A.V.’-র সাহিত্যিক-মূল্যায়ন আজও অবিসম্বাদিত, সেইহেতু ঐ নিরিখে যদি কথামৃত-এর সাহিত্যমূল্য আলোচনা করি তাহলে বোধহয় খুব ভুল করব না।

লাওয়েস-উল্লিখিত ‘A.V.’-র সাহিত্যিক-গুণাবলী তাঁর নিজের ভাষাতে উদ্ধৃত করাই যুক্তিযুক্ত ঃ

“A pithiness and raciness, a homely twang, a terse sententiousness, an idiomatic flavour, a singular nobility of diction, picturesque imagery and pictorial vocabulary, a vocabulary concrete in character, a vividness of diction, simplicity and limpid clearness, majesty and stateliness and a language of elevated thought and feeling, hence rhythmic.”

Pithiness অর্থাৎ সংক্ষেপে দৃঢ়তার সঙ্গে বলার যে-গুণ, এবং raciness অর্থাৎ বলার ভঙ্গিতে একটা সজীবতা, সরসতা, একটা সুমিষ্টতা। ঠাকুর যখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেন—"ব্রহ্ম আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। যেমন অগ্নির কোন রঙই নাই। তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ শক্তিরই গুণ"[১] ইত্যাদি তখন আমরা সংক্ষেপে, দৃঢ়তার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি শুনতে পাই। আবার এই আলোচনা প্রসঙ্গেই স্পষ্ট কণ্ঠে বলছেন ঃ "ব্রহ্ম—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণেরই অতীত। তিনি যে কি, মুখে বলা যায় না। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি করে করে যা বাকি থাকে আর যেখানে আনন্দ সেই ব্রহ্ম।" এই দুরূহ তত্ত্বটি কত সহজ করে বোঝাচ্ছেন গল্প বলে ঃ "একটি মেয়ের স্বামী এসেছে; অন্য অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সহিত বাহিরের ঘরে বসেছে। এদিকে ঐ মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না—ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে, ঐটি কি তোর বর? তখন সে একটু হেসে বলছে—না। আরেকজনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি কি তোর বর? সে আবার বলছে—না। আবার একজনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি কি তোর বর? সে আবার বলছে—না! শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে—ঐটি তোর বর? তখন সে হাঁ-ও বললে না, না-ও বললে না—কেবল একটু ফিক্ করে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কারা বুঝলে যে, ঐটিই তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেখানে চুপ।"[২] ইংরেজীতে একটি প্রচলিত কথা আছে—'from the sublime to the ridiculous'। কিন্তু এই বিদ্রূপাত্মক কথাটি যে প্রশংসাত্মকও হতে পারে তার উদাহরণ এই সাদামাটা বর-কনের গল্পটি। "যতো বাচঃ নিবর্তন্তে"—ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই গূঢ় উক্তিটি, যা sublime, তাকে বোঝানো হলো একটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী উদাহরণ দিয়ে। এখানেই 'কথামৃত'-এর raciness আর homely twang অর্থাৎ একটা ঘরোয়া ঝঙ্কার বা সুরের আমেজ।

এরপর terse sententiousness অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বা গভীর অর্থবহ এবং শব্দাড়ম্বরপূর্ণ। কথা হবে অল্প, কিন্তু শব্দগাম্ভীর্য থাকবে এবং তার তাৎপর্য হবে গভীর। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত শশধরকে বলছেন ঃ "আনন্দ তিন প্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ... ব্রহ্মানন্দলাভের পর ঋষিদের স্বেচ্ছাচার হয়ে যেত। চৈতন্যদেবের তিনরকম অবস্থা হতো—অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা, বাহ্যদশা।" কিংবা "সমাধি কাকে বলে? যেখানে মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জড়সমাধি হয়... ভক্তিযোগের সমাধিকে চেতনসমাধি বলে।"[৩] এরকম বহু উদাহরণ আছে। কথা অল্প, শব্দের একটা ঝঙ্কার আছে এবং অর্থ গভীর, সহজে বোধগম্য নয়। ইংরেজীতে একে বলা হয় "where more is meant than meets the ear"। আর সেইজন্যেই পরমহংসদেব এসব গূঢ় অর্থ বোঝাতে সঙ্গে সঙ্গে হালকাচালে ভারি কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন উপমা, গল্প, প্রবাদবাক্য, পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদির সাহায্যে। যেমন, চেতনসমাধি বোঝাতে গিয়ে বলছেন ঃ "এতে সেব্য-সেবকের 'আমি' থাকে—রস-রসিকের 'আমি'—আস্বাদ্য-আস্বাদকের 'আমি'। ঈশ্বর সেব্য—ভক্ত সেবক;

ঈশ্বর রসস্বরূপ—ভক্ত রসিক; ঈশ্বর আস্বাদ্য—ভক্ত আস্বাদক। চিনি হব না, চিনি খেতে ভালবাসি।"[৪]

তারপর idiomatic flavour অর্থাৎ ভাষাগত বিশেষত্ব অনুযায়ী বাক্যবিন্যাস। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বোঝাতে চাইছেন "যে-সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য সে বীরপুরুষ"—তখন বলছেন "খুব শক্তি না থাকলে হয় না। যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নেই।" কিংবা যখন বলছেন, "ভক্তিলাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আর আঠা লাগে না।" এইরকম সাধারণ্যে প্রচলিত দেশের মাটির গন্ধমাখা বাকভঙ্গিমা সারা 'কথামৃত'-এ ছড়ানো। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ বাংলার মাটিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। বাংলার অশিক্ষিত জনসাধারণ যেসব প্রচলিত কথা বা উপমা ব্যবহার করে তার অধিকাংশের মধ্যেই একটা সহজ কবিত্বের আমেজ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সহজভাবেই সেসব ব্যবহার করেছেন গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বোঝাতে।

'কথামৃত'-এর আরেকটি সাহিত্যগুণ singular nobility of diction অর্থাৎ তার ভাষা-কৌলিন্য। সহজ গ্রাম্যভাষাও যেমন আছে, তেমনি আছে ভাবানুযায়ী উচ্চমার্গের ভাষা। যখন ভক্তদের সঙ্গে 'অদ্বৈতবাদ', 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', 'বিজ্ঞান' আলোচনা করছেন তখন বলছেন ঃ "তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদান্তে কি আছে? ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ ভক্তের 'আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লীলাও সত্য... নিত্য বল্লেই লীলা আছে বুঝায়। লীলা বল্লেই নিত্য আছে বুঝায়। তিনি জীবজগৎ হয়েছেন চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি। যখন সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন—তখন তাঁকে শক্তি বলি... যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার ততক্ষণ নিত্যেতে পৌঁছানো যায় না। মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার যো নাই—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—ইন্দ্রিয়ের এইসকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই। বিচার বন্ধ হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়।"[৫]

আবার 'কথামৃত'-এর প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদে যেখানে দক্ষিণেশ্বরের 'কালী বাড়ি ও উদ্যান' বর্ণনা করা হয়েছে সেখানেও ভাষা-কৌলিন্য সমস্ত পরিবেশকে গৌরবান্বিত করেছে।

এখন আসা যাক ভাষার চিত্রকল্পনায় (picturesque imagery)। বাক্‌শিল্পের মাধ্যমে চিত্রশিল্পে উত্তরণ (pictorial vocabulary)। শ্রীম উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তৎকালীন উপন্যাস রচয়িতাদের ভাষা ও ভঙ্গি ছিল তাঁর আয়ত্তে। তিনি নিজে ছিলেন একজন শিক্ষক। ভাষার ওপর তাঁর স্বচ্ছন্দ অধিকার। 'কথামৃত'-এর প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদের ভাষা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। সেখানে আমরা নহবত, বকুলতলা, পঞ্চবটীর বর্ণনায়, কিংবা প্রথম ভাগেরই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি-মন্দিরে' এই অংশে কথার মাধ্যমে শ্রীম-র অসাধারণ ছবি আঁকার পরিচয় পাই। এইসব অংশ নিজস্ব সাহিত্যগৌরবে সমৃদ্ধ।

বাক্‌শিল্পে বাস্তবতা (vocabulary concrete in character) বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সজীবতা 'কথামৃত'-এর সাহিত্য-মূল্যায়নের আরেকটি বিচার্য বিষয় এবং এখানেও 'কথামৃত' সসম্মানে উত্তীর্ণ। বেশি দূর যেতে হবে না। গ্রন্থের শুরুতেই পড়িঃ "চক্‌মিলান উঠানের পশ্চিমপার্শ্বে দ্বাদশমন্দির, আর তিন পার্শ্বে একতলা ঘর। পূর্বপার্শ্বের ঘরগুলির মধ্যে ভাঁড়ার, লুচিঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিশালা... বিষ্ণুঘরের রান্না নিরামিষ। কালীঘরের ভোগের ভিন্ন রন্ধনশালা। রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড় বড় বঁটি লইয়া মাছ কুটিতেছে... উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্মচারীদিগের থাকিবার স্থান... উঠানের উত্তরে একতলা ঘরের শ্রেণী। তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ি। চাঁদনীর ন্যায় সেখানেও দ্বারপালেরা পাহারা দিতেছে।"[৬] কিংবা উল্লেখ করা যেতে পারে তৃতীয় ভাগে অষ্টাদশ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে 'বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ' বর্ণনাটি।

ভাষার সজীবতা (vividness of diction) বা স্পষ্টতা, simplicity, limpid clearness, অর্থাৎ ভাষার সরলতা, স্বচ্ছ নির্মলতা—এসবের বহু উদাহরণের মধ্যে দু-একটি উল্লেখ করছি। প্রথম ভাগে, প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দিরের বর্ণনা, বাসন-মাজার ঘাট, গাজীতলা, দুই ফটক প্রভৃতির বর্ণনা কিংবা তৃতীয় ভাগের একবিংশ খণ্ডের প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্যামপুকুরে কালীপূজা দিবসের ও সেদিন রাত্রের ঘটনা বর্ণনা।

আবার এরই পাশাপাশি আছে ভাষার ভাবগাম্ভীর্য, সমারোহ (majesty and stateliness)। 'শ্রীশ্রীভবতারিণী মা কালীর' বর্ণনায় সেটি স্পষ্ট হবে ঃ

"দক্ষিণের মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালীপ্রতিমা। মার নাম ভবতারিণী। শ্বেতকৃষ্ণমর্মর-প্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চবেদী। বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব শব হইয়া দক্ষিণ দিকে মস্তক—উত্তর দিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী-চেলিপরিহিতা নানাভরণালঙ্কৃতা এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরমূর্তি। শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরি, পঞ্চম, পাঁজেব, চুটকি—আর জবা-বিল্বপত্র... ত্রিনয়নীর বামহস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়। কটিদেশে নরকর-মালা, নিমফল ও কোমরপাট্টা... বেদীর অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে কালো প্রস্তরের বৃষ ও ঈশান কোণে হংস। বেদীতে উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণ শিলা... দেবী প্রতিমা দক্ষিণাস্যা। ভবতারিণীর ঠিক সম্মুখে, অর্থাৎ বেদীর ঠিক দক্ষিণে, ঘটস্থাপনা হইয়াছে। সিন্দূর রঞ্জিত, পূজান্তে নানা কুসুমবিভূষিত পুষ্পমালা শোভিত মঙ্গলঘট।"

এই ভাষা শ্রীম-র নিজস্ব ভাষা। এ-ভাষা উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতিমান উপন্যাসকারের ভাষা, প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যকারের ভাষা। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, সামান্যতম বস্তুরও নিখুঁত বর্ণনা, বর্ণবৈচিত্র্য, প্রভৃতি সাহিত্যগুণ এই অংশে ও অন্যত্র 'কথামৃত'-এর বিভিন্ন পরিচ্ছেদে লক্ষ্য করা যায়। এইসব অংশেই 'language of elevated thought and feeling'-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যা নিয়ে এসেছে একটা ছন্দময়তা (rhythm)। "কালীবাড়ি আনন্দনিকেতন হইয়াছে! রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে

ভাগীরথীর বহুদূর পর্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতন মানুষ অহর্নিশ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন। আনন্দময়ীর নিত্য-উৎসব। নহবত হইতে রাগ-রাগিণী সর্বদা বাজিতেছে।'' শ্রীম-র ভাষায় ধ্বনিতে সে রাগ-রাগিণী আমরা আজও শুনছি।

সাহিত্যের মূল্যায়ন বা সমালোচনা নানা দিক থেকে করা যেতে পারে--ঐতিহাসিক বা সামাজিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে, লেখকের জীবনভিত্তিক অর্থাৎ লেখকের নিজের সাহিত্য-কর্মের গতিপ্রগতির বিচারে, কিংবা তুলনামূলক অর্থাৎ সমশ্রেণী-পর্যায়ভুক্ত অন্য লেখার সঙ্গে তুলনা করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া সমালোচনা হতে পারে subjective অর্থাৎ পাঠকের বইটি নিজের কেমন লেগেছে সেইদিক থেকে সমালোচনা করতে পারেন, কিংবা objective অর্থাৎ সাহিত্যের প্রচলিত বা স্বীকৃত কোন মানদণ্ডে বিচার করে। আমরা এতক্ষণ এই শেষোক্ত বিচার-পদ্ধতি অনুসারেই অগ্রসর হয়েছি। উৎকৃষ্ট গদ্যসাহিত্যের কতকগুলি লক্ষণ সামনে রেখে--যে-লক্ষণগুলির জন্য ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বাইবেলকে ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ গদ্যসাহিত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে--আমরা শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর সাহিত্যমূল্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছি। এখন একটু অন্যভাবে দেখা যাক।

যে-কোন গ্রন্থের সাহিত্যমূল্য নির্ধারণ করতে হলে প্রথমেই দেখতে হয় তার বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গি, এবং এই দুয়ের সমতা রক্ষা করা হয়েছে কিনা। তারপর বিচার্য এ-গ্রন্থের উদ্দেশ্য কী এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে কতখানি সফল হয়েছেন গ্রন্থকার। সাহিত্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজী সাহিত্যিক-সমালোচক ডি-কুইন্সি (De Quincey) সাহিত্যকে ভাগ করেছেন 'Literature of Knowledge' আর 'Literature of Power', এই দুই শ্রেণীতে। প্রথমটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান বিতরণ করা, বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করা, নানাবিধ তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করে নিত্য পরিবর্তনশীল, ক্রমবর্ধমান নব নব আবিষ্কার ও চিন্তাসমৃদ্ধ জ্ঞানজগতের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে দেওয়া, যা সাধারণত করে থাকে বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী। দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য আমাদের মনকে অধিকার করা, অভিভূত করা, আলোড়িত করা, আনন্দরসসিক্ত করা, নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করা, আমাদের হৃদয় জয় করা। ডি-কুইন্সি বলেছেন, 'Literature of Power'-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে 'to move', অর্থাৎ আমাদের মনকে নাড়া দেওয়া, আলোড়িত করা, উদ্বুদ্ধ করা। 'Literature of Knowledge'-এর আবেদন মস্তিষ্কে--বুদ্ধির জগতে, আর 'Literature of Power'-এর আবেদন হৃদয়ে, ভাবের জগতে। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর সবসময়ে দুর্ভেদ্য নয়, সময় সময় দুই-এ মিলেমিশে এক হয়ে যেতে পারে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদির গ্রন্থ মনকে স্পর্শ করতে পারে লেখকের লেখনী-চাতুর্যে বা কৌশলে। আবার গল্প, উপন্যাস, কাব্য, নাটক যার মূল আবেদন হৃদয়ে বা ভাবের জগতে, তা হতে পারে--শিক্ষাপ্রদ। 'কথামৃত' সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, এতে আছে--প্রচলিত একটি ইংরেজী প্রবচনে যেমন বলা হয়,

'the best of both worlds'—এটি একাধারে শিক্ষার, জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার আবার আনন্দের, রসের, সৌন্দর্যের অনন্ত খনি।

আগেই বলেছি, যে-কোন গ্রন্থের সাহিত্যমূল্য-বিচারে দেখতে হয় তার বিষয়বস্তু এবং তার প্রকাশভঙ্গি। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে বিষয়বস্তু একজনের মুখ-নিঃসৃত এবং তার প্রকাশ অন্যজনের লেখনী-নিঃসৃত। শ্রীম নিজে ছিলেন একজন মাস্টার, এবং এ-ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন মাস্টারের মাস্টার। অকৃপণভাবে বর্ষণ করেছেন গুরু তাঁর কথামৃত আর স্বর্ণপাত্রে তা ধারণ করেছেন শিষ্য, এবং পরে সে-অমৃত বিতরণ করেছেন সর্বসাধারণের কাছে! এ এক অত্যাশ্চর্য যুগলবন্দী অনুষ্ঠান। গুরু এমন বিদ্যে রাখেননি যে ঐসকল সারগর্ভ গভীর আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ও তত্ত্ব নিজের কলমে লিখে রাখেন! আর শিষ্যেরও যতই সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি থাক, তাঁর নেই সেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও স্বত উৎসারিত জ্ঞান যা তিনি লিপিবদ্ধ করতে পারেন। এক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক। এবং আশ্চর্যের কথা, সব ব্যাপারটাই যেন পূর্বপরিকল্পিত। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নরেন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন তাঁর বাণী ও আদর্শ সারা পৃথিবীতে প্রচারের জন্য, ঠিক তেমনই শ্রীম-কে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন তাঁর অমৃতবাণী লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য। দুজনকেই তিনি প্রথম দর্শনেই চিনেছিলেন। একদিন সমাধিভঙ্গের পর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম-কে বলেছিলেন ঃ "সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণ্ড দেখলাম একটা শালগ্রাম। তার মধ্যে দেখলাম তোমার দুটি চোখ।" আরেকদিন বলেছিলেন ঃ "তুমি আপনার লোক, এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র।" মহেন্দ্রনাথ যে ঠাকুরেরই কাজ করবেন তার আভাস 'কথামৃত'-এর একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। এখানে যে-কথাটি বলতে চাইছি তা হচ্ছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থের সাহিত্যিক-মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করছি এই গ্রন্থে ভাব ও ভাষার সমন্বয়, যা হচ্ছে সাহিত্য-শিল্প-কর্মের কৃতিত্বের প্রথম শর্ত। অথচ, আশ্চর্যের কথা এই যে, এক্ষেত্রে ভাব (এবং ভাষাও) একজনের, উপস্থাপন অন্যজনের। এই অন্য একজন তাঁর স্মৃতির পেটিকায় সযত্নে সেই বস্তু সংগ্রহ করে এনে নিজের দিনপঞ্জি বা ডায়েরীতে লিখে রেখেছেন। এ-খবর কিন্তু বাইরের কেউই জানতেন না এবং সংগ্রহকারক নিজেও জানতেন না যে, তাঁর এই একান্ত নিজস্ব দিনপঞ্জি একদিন একখানি মহান গ্রন্থরূপে প্রকাশ পাবে এবং সর্বত্র সমাদৃত হবে।

'কথামৃত' যখন সেই মহান কথকের মহাপ্রয়াণের প্রায় দ্বাদশবর্ষ পরে তৎকালীন মাসিক পত্রিকা 'তত্ত্বমঞ্জরী', 'উদ্বোধন' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু হলো তখন দেখা গেল যে ভাব, আর ভাষা সেখানে একাত্ম হয়ে গেছে। 'কথামৃত'-এর ভাব বা বিষয়বস্তু গভীর কিন্তু যিনি সেই ভাবের বক্তা তিনি আক্ষরিক অর্থে নিরক্ষর। সেই গভীর ভাবকে তিনি অতি সহজ সরল চলতি ভাষায়, এমনকি তথাকথিত 'গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট' সাধারণ মানুষের সহজ বোধগম্য ভাষায়, অনেক সময় গল্প করে, নেচে, গেয়ে প্রকাশ করেছেন। আরেকজন শ্রোতা যিনি পণ্ডিত, অধ্যাপক, দার্শনিক; তিনি সেই ভাবের সামিল হয়ে বক্তার কথাগুলিকে মনের টেপরেকর্ডার বা ক্যাসেটে ধরে রাখলেন, তারপর সেই কথাগুলিই হুবহু ইংরেজীতে, যাকে বলে verbatim,

লিখে গেলেন—তার জীবন্ত বাস্তব নিখুঁত পরিবেশ সৃষ্টি করে—অর্থাৎ, দিনটি, সময়টি, কে-কে উপস্থিত ছিলেন, তাদের পরিচয়, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য মানুষ ও ঘটনা সমস্ত সুন্দরভাবে মূলভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি তা বর্ণনা করলেন! অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়। শুধু প্রশ্ন ঃ এই দুই-এ এক হওয়া কী করে সম্ভব হলো? এর উত্তর ঃ এখানে বক্তার মধ্যে শ্রোতা ('কথামৃত'-এর লেখক) নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ "তাঁহার (শ্রীম-র) অন্তরটা শ্রীরামকৃষ্ণময় হইয়াছিল... তাঁহার ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্যভাব ত্যাগ করিয়া তিনি রামকৃষ্ণময় হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।" এ-প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করি ২১ আষাঢ় ১৩০৪ তারিখে লেখা শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ-পত্র। শ্রীমা লিখেছিলেন ঃ "তোমার নিকট যে-সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ-সমস্ত কথা বলিতেছেন।" লক্ষণীয়, শ্রীম 'কথামৃত'-এর মধ্যে বা ঐ গ্রন্থ প্রকাশকালে কোন সময়েই নিজের পরিচয় দেননি। সবসময় নিজেকে গোপন রেখেছেন। মহৎ শিল্পের অন্যান্য শর্তের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, শিল্পী নিজেকে শিল্পের মধ্যে ডুবিয়ে দেবেন, সৃষ্টিই বড় হয়ে উঠবে স্রষ্টা নয়। ইংরেজীতে কথা আছে—Art lies in concealing art, অর্থাৎ শিল্পের প্রকাশে এমন কোন আত্মসচেতন কলা-কৌশল থাকবে না যা-নাকি শিল্পকে পেছনে ফেলে শিল্পীকে প্রাধান্য দেয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' কথাশিল্পের এই মহৎ গুণের অধিকারী। তাই সাহিত্য-মূল্যায়নে এই গ্রন্থ একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবি রাখে। অথচ এর লেখক সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে এই কর্মে লিপ্ত হননি। যা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত 'নোট' তা আজ সৎ ও উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে 'কথামৃত'-এর আগে শ্রীম-র ইংরেজীতে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে লেখা চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বামীজী শ্রীম-কে লিখেছিলেন ঃ "I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you—this great work... Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely hidden."

এরপর সাহিত্য-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে 'কথামৃত'র বিচার করা যাক। 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "আত্মা পুত্রস্নেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্তারূপে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়, তাই পুত্রস্নেহ তার কাছে মূল্যবান। সৃষ্টিকর্তা যে তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু-বা ইতিহাস জোগায়, কিছু-বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায়, কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করে।"[৭] আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ঠাকুর শ্রীম-কে বলেছিলেন ঃ "তুমি আমার আপনার লোক, এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র।" এ-ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ পিতারূপে পুত্রের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। আর শ্রীম ঠাকুরের জীবনের উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করলেন, অবশ্য 'মহেন্দ্রনাথ'-কে গোপন রেখে।

সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি উক্তি'র পরিপ্রেক্ষিতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থের যদি সাহিত্য-মূল্যায়ন করা যায় তাহলেও দেখা যাবে 'কথামৃত' সসম্মানে উত্তীর্ণ। 'সাহিত্যের মূল্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য, তবুও বহুশত আছে যা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে যা উজ্জ্বল। জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে... সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেখানেই সাহিত্যের অমরাবতী। কিন্তু জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন-রসিকও বটে। সে বিশেষ করে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি জীবনের স্বাক্ষর না পায়, যদি সে বিশেষ কালের বিশেষত্বমাত্র প্রকাশ করে বা কেবলমাত্র রচনাকৌশলের পরিচয় দিতে থাকে তাহলে সাহিত্যে সেই রসের সঞ্চয় বিকৃত হয় বা শুষ্ক হয়ে মারা যায়। যে-রসের পরিবেশনে মহারসিক জীবনের অকৃত্রিম আস্বাদনের দান থাকে সে-রসের ভোজে নিমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে না।"[৮] রবীন্দ্রনাথ-নির্ধারিত সাহিত্যের এই মানদণ্ডে 'কথামৃত'র বিচার করলে দেখা যাবে 'জীবন মহাশিল্পী' এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে একটি মহাজীবনের প্রতিকৃতি অঙ্কনে। "লক্ষ লক্ষ মানুষের বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য" হওয়ার মধ্যে যে "বহুশত আছে যা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে যা উজ্জ্বল" তার মধ্যে এক অনন্যসাধারণ জ্যোতির্ময় পুরুষ 'কথামৃত'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং এই চরিত্রের রূপায়ণে শিল্পী "কেবলমাত্র রচনাকৌশলের পরিচয় দিতে" আগ্রহী নন, তাই সাহিত্যরসের বিকৃতি এখানে ঘটেনি, এবং সেই কারণে "সে-রসের ভোজে নিমন্ত্রণে উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা" নেই। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে একটি মহাজীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে উঠেছে। তাই এটি মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত আরো একটি মাপকাঠিতে যদি 'কথামৃত'-এর বিচার করি তাহলেও দেখব যে, এই গ্রন্থ এক বিশেষ সাহিত্য-মর্যাদার অধিকারী। 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।... আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিত কলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ।"[৯] 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ শ্রীম-র এই আনন্দ, একটি মহাজীবনের উপলব্ধির আনন্দ, সেই জীবনের সঙ্গে সর্বতোভাবে একাত্ম হয়ে যাওয়ার আনন্দ, তাকে প্রকাশ করার আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ উক্ত "বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ" এই গ্রন্থে তা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত।

পুনরায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-উপলব্ধি দিয়ে 'কথামৃত'-এর বিচার করা যাক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের পথে'র উৎসর্গপত্রে অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে (৮ আশ্বিন, ১৩৪৩) লিখছেন ঃ "এতদিন যা উলটো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই

সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।''[১০] এই আনন্দ, নিরাবিল আধ্যাত্মিক আনন্দই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'র মূল সুর। আনন্দেই এর শুরু, আনন্দেই এর শেষ। 'কথামৃত'-এ প্রবেশ করা এক আনন্দের হাটে প্রবেশ করা। এর প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম অংশতেই পড়ি ঃ ''শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি মধ্যে—চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দির... শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা—'আনন্দ-নিকেতন'। আজ রবিবার। ভক্তদের অবসর হইয়াছে, তাই তাঁহারা দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে কালীবাড়িতে আসিতেছেন। সকলেরই অবারিত দ্বার।'' আর এই পরিচ্ছেদের শেষে—''কালীবাড়ি আনন্দ-নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতন মানুষ অহর্নিশি ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব। নহবত হইতে রাগ-রাগিণী সর্বদা বাজিতেছে।'' সমস্ত গ্রন্থখানির মূল সুর, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় keynote, লেখক ধরিয়ে দিলেন ঐ কথাটিতে, আনন্দ, আনন্দময়, আনন্দময়ী। আনন্দময়ীর আবাসনে এক আনন্দময় পুরুষের সান্নিধ্যে আসছেন অগণিত নরনারী পরমানন্দের সন্ধানে। এই মহামিলনের নানাদৃশ্য, নানা আলোচনা, নানা গল্প, নানা কাহিনী, নানা সঙ্গীত 'কথামৃত'কে এক বিশিষ্ট সাহিত্যের মাত্রা দিয়েছে।

'কথামৃত' একাধারে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও কাব্যের সমন্বয়। বীজাকারে সবকটিই 'কথামৃত'-এ উপস্থিত। গল্পের তো ছড়াছড়ি। তা নিয়ে আর বলার কিছু নেই। আর 'কথামৃত'র কথা শুরুর আগে প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের পরিচ্ছেদে যে-পরিবেশের বর্ণনা শ্রীম করেছেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শুরুর কথা মনে করিয়ে দেয়। স্মরণ করা যেতে পারে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'আনন্দমঠ', 'বিষবৃক্ষ', 'মৃণালিনী' প্রভৃতি উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের বর্ণনা। রচনাভঙ্গি তদানীন্তন উপন্যাসের রচনাভঙ্গির অনুরূপ। আরো লক্ষণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পরিচ্ছেদের শিরোনামার মতো 'কথামৃত'-এও পরিচ্ছেদ-শিরোনামা আছে আলোচ্য বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দেবার জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক পরিচ্ছেদের শুরুতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন, শ্রীম-ও 'কথামৃত'-এর প্রথমাংশে বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এবং সার্থক উপন্যাসের মতো যেখানে যেমন প্রয়োজন সেই মতো সাধু ও চলিত ভাষার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আমি এখানে ঠাকুরের ভাষার কথা বলছি না, যেখানে শ্রীম ব্যক্তি, প্রকৃতি, পরিবেশ, স্থান-কাল ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন সেইসব অংশের ভাষার কথা বলছি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

''পঞ্চবটীর মধ্যে সাবেক একটি বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটি অশ্বত্থ গাছ। দুইটি মিলিয়া যেন একটি হইয়াছে। বৃদ্ধ গাছটি বয়সাধিক্যবশত বহুকোটরবিশিষ্ট ও নানা পক্ষী সমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাসস্থান হইয়াছে। পাদমূল ইষ্টকনির্মিত, সোপানযুক্ত, মণ্ডলাকার-বেদী সুশোভিত; এই বেদীর উত্তরপশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধনা

করিয়াছিলেন; আর বৎসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন। আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখীবৃক্ষ অশ্বত্থের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। ডালটি একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। মূল তরুর সঙ্গে অর্ধসংলগ্ন হইয়া আছে। বুঝি সে আসনে বসিবার এখনও কোন মহাপুরুষ জন্মেন নাই।"[১১]

এই সাধু ভাষা ও বর্ণনা উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের শুরুর কথা স্মরণ করায়। এর পাশাপাশি বিষয়ানুযায়ী ঘরোয়া ভাষা ঃ

"প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। অতি কোমলাঙ্গ, অতি সন্তর্পণে তাঁহার দেহ রক্ষা হয়। তাই পথে যাইতে কষ্ট হয়—প্রায় গাড়ি না-হলে অল্প দূরও যাইতে পারেন না। গাড়িতে উঠিয়া ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল—আকাশে মেঘ, পথে কাদা; ভক্তেরা গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা দেখিলেন রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

"গাড়ি বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

"উপরে যাইবার সিঁড়ি; তৎপরে বৈঠকখানা।"[১২]

উপন্যাসকারের একটি প্রত্যাশিত গুণ দৃষ্টির স্বচ্ছতা, সামান্যতম কিন্তু ব্যঞ্জনাসহ খুঁটিনাটির উল্লেখ এবং বাক্যবিন্যাসের কৌশল। যে-দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো, তার প্রথমটিতে বটবৃক্ষের সখীবৃক্ষ অশ্বত্থের ভাঙা ডাল, ভাঙা কিন্তু মূল তরুর সঙ্গে অর্ধসংলগ্ন, এবং তার পরই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা-বেদী, আজ শূন্য কিন্তু ঠাকুরের স্মৃতির সঙ্গে সংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন নয়—এই আভাস দেওয়া হয়েছে। তেমনি, একটি উপমায়—বৎসহারা গাভীর ব্যাকুলতা—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মূল কথাটি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে মাতৃহারা সন্তানের মাতৃদর্শনের ব্যাকুলতা। আর দ্বিতীয়টিতে ছেলেদের পথে পথে ভেঁপু বাজানো—এই অতি সাধারণ দৃশ্যটির উল্লেখ করে আর টিপটিপ বৃষ্টির কথা বলে সেকালের কলকাতার রথের দিনের একটি সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে। উপন্যাসকারের শৈলী শ্রীম-র ছিল এসব থেকে তা বেশ বোঝা যায়।

আর নাটক? 'কথামৃত'র এক একটি পরিচ্ছেদ এক একটি নাটকের দৃশ্য বলা যায়। যেখানে নাটকে প্রত্যাশিত সংলাপ। পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন, তার মধ্যে নাটকীয় সঙ্ঘর্ষ—ভাবের বৈচিত্র্য, মতান্তর, সঙ্ঘাত, সঙ্গীত, নৃত্য, হাস্যরস, ছোট ছোট কাহিনী সবই আছে। আর আছে নানা রঙের, নানা রসের, নানা ভাবের চরিত্র এবং তাদের নানা-বেশ, নানা-ভঙ্গি। এক-একটি নাটকীয় চরিত্র, অবশ্যই ক্ষুদ্র পরিসরে। এবং এইসব চরিত্র একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের চারিধারে ঘূর্ণায়মান। কোথাও কোথাও, নাটকে যেমন চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে ঘটনা বা ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে, এখানেও তা আছে—নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের উদাহরণই যথেষ্ট। অর্থাৎ 'কথামৃত'-এ নাটকের উপকরণ যথেষ্ট আছে।

আর প্রবন্ধ? ঠাকুরের এক-একটি ছোট ছোট উক্তি নিয়েই তো এক-একটি প্রবন্ধ লেখা যায়। প্রবন্ধের বীজ কথামৃতে অজস্র। যেমন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল" বা "চৈতন্যলাভের পর আনন্দ।"

আর কাব্য ?

মুখহলসা, ভেতরবুঁদে, দীঘল ঘোমটা নারী
পানাপুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী।

কিংবা,

লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো।

অথবা,

লজ্জা, ঘৃণা ভয়
তিন থাকতে নয়—

এরকম তো কতই আছে। তাছাড়া এখন যাকে গদ্যকাব্য বলা হয় তা-ও আছে। শুধু একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

"মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে যখন সব ত্যাগ করতে লাগলাম, তখন বলতে লাগলাম, 'মা, এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি; এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য; এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"[১৩]

আর 'কথামৃত'-এর অজস্র গানের মধ্যে কাব্য তো আছেই।

আমরা দেখেছি 'কথামৃত'-এর শুরুতে ঃ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা—আনন্দ-নিকেতন।" শ্রীম সমাপ্তি টেনেছেন পঞ্চম ভাগ, অষ্টাদশ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদে, যে-পরিচ্ছেদের শিরোনামা—'অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ডাক্তার রাখাল—ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য' এবং ঠাকুরের শেষ লিপিবদ্ধ কথা ঃ

"শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—এক একবার ভাবি দেহটা খোল মাত্র; সেই অখণ্ড (সচ্চিদানন্দ) বই আর কিছু নাই।

"ভাবাবেশ হলে গলার অসুখটা একপাশে পড়ে থাকে। এখন ঐ ভাবটা একটু একটু হচ্ছে, আর হাসি পাচ্ছে।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও হরিশের সেবা]

"ঠাকুর কয়েকদিন প্রতাপের ঔষধ খাইতেছেন। গভীর রাত্রে উঠিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণ আই-ঢাই করিতেছে। হরিশ সেবা করেন, ঐ ঘরেই ছিলেন; রাখালও আছেন, শ্রীযুক্ত রামলাল বাহিরের বারান্দায় শুইয়া আছেন। ঠাকুর পরে বলিলেন... 'মধ্যম নারায়ণ তেল দেওয়াতে ভাল হলাম তখন আবার নাচতে লাগলাম।'"

অর্থাৎ, অসুস্থ অবস্থায়ও ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য, সচ্চিদানন্দ অনুভূতি—'হাসি পাচ্ছে', এবং একক নৃত্য। এই পরিচ্ছেদের তারিখ দেওয়া আছে ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫। এরপরও ঠাকুর বছরখানেক মর্ত্যশরীরে ভক্তদের মধ্যে ছিলেন। এর পরবর্তী সময়ের কোন কোন দিনের ঘটনা পূর্ববর্তী তৃতীয় ভাগে আছে। কিন্তু 'কথামৃত'র সমাপ্তি ঘটিয়েছেন এই সচ্চিদানন্দ অনুভূতি ও আনন্দ নৃত্যের মাঝেই। এখানেও কি আমরা শ্রীম-র সাহিত্যশিল্প বোধের পরিচয় পাই না? শ্রীম অবশ্যই সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'কথামৃত' লিখতে বসেননি। তবুও আমরা যখন 'কথামৃত'র সাহিত্যমূল্য বিচার করব তখন একথা বলতেই হবে যে, তিনি এমনই এক দৃশ্যে তাঁর অমরগ্রন্থের যবনিকা টেনেছেন যেখানে রচনার শুরু এবং শেষ একই বিন্দুতে এসে মিলেছে।

'কথামৃত'র শুরু আনন্দে, শেষও আনন্দে। 'কথামৃত'-এর কেন্দ্রে এক আনন্দময় পুরুষ যিনি পরমানন্দ বিতরণ করেছেন, যাঁর প্রার্থনা ছিল ঃ "মা, আমায় রসে-বশে রাখিস।" নিপুণ সাহিত্যকারের মতোই শ্রীম-র জানা ছিল কোথায় থামতে হয়, যা নাকি অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের জানা নেই।

আর এই আনন্দময় পুরুষের যে-চিত্র আমরা 'কথামৃত'-এ পাই, সে-সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে আরেকবার রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি। 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "বঙ্কিমের উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের অসামান্য পাণ্ডিত্য; সেইটে অপর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করার জন্যে বঙ্কিম তার মুখে ষড়দর্শনের আস্ত আস্ত তর্ক বসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু পাঠক বলত, আমি পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত প্রমাণ চাই নে, আমি চন্দ্রশেখরের সমগ্র ব্যক্তি রূপটি স্পষ্ট করে দেখতে চাই। সেই রূপটি প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাষায়, ভঙ্গিতে, আভাসে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে। সেইখানেই বঙ্কিম হলেন কারিগর।"[১৪] ঠিক এইভাবেই 'কথামৃত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্ররূপ শ্রীম ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর "ভাষায়, ভঙ্গিতে, আভাসে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে, বলা-না-বলার অপরূপ ছন্দে।" এখানেই শ্রীম হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মাপকাঠিতে সাহিত্যের 'কারিগর'—অবশ্যই নিজের অজান্তে, কারণ শ্রীম সাহিত্যসৃষ্টির জন্য 'কথামৃত' রচনা করতে বসেননি. আমরা শ্রীমকে বলব 'unconscious artist', এবং সেইজন্যই সত্যকারের শিল্পী। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই আমাদের শেষ প্রশ্ন ঃ "পূর্বপুরুষের সাহিত্যই হোক, নবযুগের সাহিত্যই হোক, চিরকালের প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে—হে গুণী, কোন অপূর্ব রূপটি তুমি সকল কালের জন্যে সৃষ্টি করলে?"

নিঃসন্দেহে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' একখানি 'সকল কালের জন্যে' সৃষ্টি এবং যে কথক শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব রূপটি শ্রীম এঁকেছেন সেটিও সকল কালের সকল মানুষের জন্যে। বিশ্বজনীনতা মহৎ সাহিত্যের একটি বিশেষ গুণ।

আমরা আগেই বলেছি, সাহিত্যবিচার হতে পারে ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ আলোচ্য গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক বা সামাজিক মূল্য কতখানি সেই বিবেচনায়। এদিক দিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' তদানীন্তন, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একটি নির্ভরযোগ্য অথচ সুখপাঠ্য প্রতিচ্ছবি। ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে পরমহংসদেবের আবির্ভাব। একদিকে অজ্ঞতা, মূঢ়তা, ধর্মের নামে সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি, অনাচার, কুসংস্কার; অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম ঝলকে বিভ্রান্ত কিছু মানুষ, হয় নাস্তিক কিংবা ধর্মত্যাগী, কিছু অনুসন্ধিৎসু মানুষ নতুন ধর্ম-সম্প্রদায় গঠনে উৎসাহী এবং পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত—সব মিলিয়ে এক নৈরাজ্যের অবস্থা। এই অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, ভাঙনের যুগে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বর তাঁর আশ্রম, তাঁর বাণীপীঠ। এখানে এলেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ—পণ্ডিত-মূর্খ, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, তার্কিক-বিশ্বাসী, ধনী-দরিদ্র, শহরের বাবু, গ্রামের সরল প্রকৃতির লোক, এলেন সাধু-সন্ন্যাসী, বাঙালী-অবাঙালী, এলেন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও কত সাধু-সন্ত-জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁদের কাছে গেলেন। এই যাতায়াত,

এই কথোপকথন, তর্ক-বিচার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ, সমাজ, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু, ইত্যাদির একটি প্রামাণ্যচিত্র ফুটে উঠেছে শ্রীম-র টুকরো টুকরো কাহিনীতে, বর্ণনায়, বিভিন্ন চরিত্রের কথাবার্তা ও ব্যবহারের মাধ্যমে। অশান্ত জিজ্ঞাসু যুবক নরেন্দ্রনাথ, মাঝবয়সী সদা-মাতাল গিরিশচন্দ্র, ভক্ত-বিশ্বাসী বিদ্বান মহেন্দ্রনাথ (শ্রীম), অবিশ্বাসী তার্কিক বিজ্ঞানী আরেক মহেন্দ্রনাথ (ডাঃ সরকার), বিষয়ী জমিদার যদু মল্লিক, বিষয়-নিরাসক্ত আরেক জমিদার বলরাম বসু, জ্ঞানী ভক্ত বিজয় গোস্বামী, পাণ্ডিত্যাভিমানী শ্যামাচরণ, আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী, নববিধানের কেশবচন্দ্র সেন, গোঁড়া হিন্দু সমাজের শশধর তর্কচূড়ামণি, তীক্ষ্ণধী ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যাকার, সাহিত্য-সম্রাট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্মনিরপেক্ষ, দয়ার সাগর, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বহুর মধ্যে শুধু এই কয়জনের উপস্থিতি ও আলোচনার মাধ্যমে তদানীন্তন সমাজের একটি পরিষ্কার জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে 'কথামৃত' গ্রন্থটিতে। এদিক থেকেও 'কথামৃত'র সাহিত্যমূল্য কম নয়। এখানে বলা যেতে পারে "more is meant than meets the ear", যা কানে শুনি তার চেয়ে বেশি অর্থ বহন করে সেইসব দৃশ্য ও সংলাপ যা শ্রীম লিপিবদ্ধ করেছেন। মহাকাব্যের মতো 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থের কাহিনী ও চরিত্রের ব্যাপ্তি। একটি মহাজাতির যুগসন্ধিক্ষণের প্রতিচ্ছবি।

তবে সাহিত্য বিচারে 'কথামৃত'র ত্রুটিও নিশ্চয় আছে। যেহেতু শ্রীম-র উদ্দেশ্য সাহিত্যসৃষ্টি নয়, সেই কারণে সাহিত্যশিল্পের কিছু লক্ষণ এখানে অনুপস্থিত। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সুচারু গঠন কারুকার্যের, যাকে ইংরেজী সমালোচনায় বলা হয় 'architectonic'—তার অভাব। 'কথামৃত' একটি সুপরিকল্পিত, সুসংহত, সুবিন্যস্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যকর্ম নয়। সনাতন সাহিত্য বিচারে একটি সাহিত্য সৃষ্টির তিনটি সুনির্দিষ্ট অংশ থাকে—আদি, মধ্য ও অন্ত। 'কথামৃত'-এ তা নেই। 'কথামৃত' হঠাৎ মাঝখানে আরম্ভ হয়ে হঠাৎ-ই মাঝখানে থেমে গেছে। আবার এক-একটি খণ্ডিত কাহিনীও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোথাও একটি কাহিনী পরিচ্ছেদের মাঝখানে থেমে গেছে, কোথাও তার জের পরবর্তী অংশে টানা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যাশা পূর্ণ হয় না। ছবি অসম্পূর্ণ থাকে। চরিত্র সামগ্রিক রূপ নেয় না। ঘটনার পারম্পর্য থাকে না। 'কথামৃত'-এ পুনরুক্তি দোষ আছে। একই কাহিনী, গান, আলোচ্য বিষয়, ভাষা বারবার এসেছে—স্বাভাবিক ভাবেই। এ-সবেরই উৎস হচ্ছে ঐ গোড়ার কথায়—শ্রীম সাহিত্যসৃষ্টি করার জন্য লেখেননি এবং ঠাকুর কথা বলেছেন বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে—উদ্দেশ্য একই। মানুষকে ঈশ্বরমুখী করার। তথাপি 'কথামৃত' সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তবে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের যে প্রধান শর্ত তা কিন্তু এখানে যে পালিত হয়েছে তা পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করবেন, সেটি হলো 'unity of impression'। 'কথামৃত'-এ বহু কাহিনী, বহু ঘটনা, বহু রকমের চরিত্রের আনাগোনা। আর এই বহুর মধ্যেই প্রকাশ হয়েছেন এক—এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ, যাঁকে ঘিরে আছে অসংখ্য তারকা।

পরিশেষে একটি কথা। শ্রীম-র 'কথামৃত'র কথা উঠলেই জেমস বসওয়েল (James Boswell) প্রণীত 'The Life of Samuel Johnson'-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। কথোপকথনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন মিল এই দুই গ্রন্থের মধ্যে নেই। স্যামুয়েল জনসন ও শ্রীরামকৃষ্ণ, জেমস বসওয়েল ও শ্রীম—এই নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করাও অপরাধ। কারণ, ঐ দুই ইংরেজ মনীষীর ব্যক্তিগত জীবন গভীরভাবে নৈতিক কালিমা-লিপ্ত। যৌনজীবন-সংক্রান্ত এমন কোন অপরাধ নেই যা বসওয়েল করেননি। অভিজাত পিতার বখাটে সন্তান বসওয়েল সৈনিকজীবনে, আইন ব্যবসায়ে, কবি ও নাট্য সমালোচক হিসেবে, সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে লন্ডনে এসে জনসনের সান্নিধ্যলাভ করেন এবং জনসনের প্রথম প্রত্যাখ্যানের অবমাননা সহ্য করে তাঁর জীবনের শেষ বাইশ বৎসরের কথা লিপিবদ্ধ করেন। বসওয়েলের আগেও জনসনের অন্তত তিনখানি জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর বসওয়েল 'Gentleman's Magazine' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন এই মর্মে যে, অপেক্ষা করুন; আরো মালমশলা নিয়ে শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে 'The Life of Samuel Johnson'। আর বহু সম্মানিত, পাণ্ডিত্যের প্রবাদপুরুষসম ডঃ জনসন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নৈতিক গ্লানিমুক্ত ছিলেন না। ডঃ জনসনের জীবনীতে বসওয়েল অনেক অপ্রীতিকর তথ্যই গোপন করেছেন। ১৭৬৩-র ১৬ মে তারিখে বসওয়েল জনসনকে প্রথম দেখেন এবং তাঁর সম্বন্ধে প্রথম ধারণা ঃ "Mr. Johnson is a man of most dreadful appearance. He is a very big man, is troubled with sore eyes, the palsy, and the king's evil (scrofula). He is very slovenly in his dress and speaks with a most uncouth voice... His dogmatic roughness of manners is disagreeable. I shall remark what I remember of his conversation." এবার মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।* □

পাদটীকা

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।৫।১
২ ঐ, ৩।৫।১
৩ ঐ, ৩।৯।৩
৪ ঐ
৫ ঐ, ৪।২৩।৩
৬ ঐ, ১।১।১
৭ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৭শ খণ্ড
৮ ঐ, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৩
৯ ঐ, পৃঃ ২৯১
১০ ঐ
১১ কথামৃত, ১।১।১
১২ ঐ, ১।১১।২
১৩ ঐ, ৩।১৭।১
১৪ রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫০২

* ৯০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমসাময়িক কলকাতার থিয়েটার

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

"কলিকাতায়, আমাদের শৈশবে দেখিয়াছি, বড় শিয়ালের উৎপাত ছিল। সর্বত্র এঁদোপুকুর ও বাঁশঝাড় থাকায় শিয়ালের উৎপাত ছিল। এমনকি রাতে আমাদের উপরের ঘরে গিয়া তক্তপোশের নিচে থেকে হাঁড়ি চুরি করিয়া লইয়া পলাইত। হাঁড়ি মাথায় করিয়া দুপায়ে তাকে ধরিয়া বেশ সতর্কে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইত। পরদিন কানাচে খালি হাঁড়ি পাওয়া যাইত। কখনো কখনো ছোট ছেলেকেও লইয়া যাইত। ভাদ্রমাসে হন্যে শিয়াল হইত এবং দু-একজনকে কামড়াইয়াছে প্রায় শোনা যাইত।

"কলিকাতার চারদিকে নালা, পগার ও নর্দমা ছিল এবং চারিদিকে বাঁশঝাড়, কেলে হাঁড়ি ও আবর্জনা পড়িয়া থাকিত। গর্মিকালে বিশেষত আমের সময় মাছি খাইয়া প্রায় বমি হইত..."

বিবেকানন্দ-অনুজ মহেন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতি!

এরও বছর পঁচিশ আগে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে একদিন কামারপুকুর থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন সতের বছরের তরুণ গদাধর। অবশ্য তাঁর কাছে এই কলকাতাই তখন রীতিমত আধুনিক শহর।[১] কলকাতা তখন আখড়াই, হাফআখড়াই, তরজা ছেড়ে থিয়েটারের পথে এগিয়ে চলেছে। এই পথটা প্রথম দেখিয়েছিল ইংরেজরাই। তাদের চেষ্টায় অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের চিত্তবিনোদনের জন্য লালবাজারে 'দি প্লে হাউস' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'প্লে হাউস'কে অনুসরণ করে 'দি নিউ প্লে হাউস' অথবা 'দি ক্যালকাটা থিয়েটার' নামে আরো একটি ইংরেজী মঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল। এসব মঞ্চ পুরোপুরি ইংরেজ-নিয়ন্ত্রিত। শ্বেতাঙ্গরাই সেখানে অভিনয় করত, অভিনীত হতো ইংরেজী নাটক এবং দর্শকরাও কেবলমাত্র ইংরেজ। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পুরুষরাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করত। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে চৌরঙ্গীর একটি বাড়িতে শ্রীমতী ব্রিস্টো প্রাইভেট থিয়েটার খুলে অভিনয় শুরু করেন। তিনি প্রথম ইংরেজ-ললনা যিনি কলকাতার মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

মঞ্চে প্রথম বাঙলা নাটক অভিনয়ের কৃতিত্বও একজন বিদেশীর। ইনি রুশ দেশীয় পর্যটক হেরাশিম লেবেডফ। কলকাতার ডোমতলায় মঞ্চ বেঁধে ইনি এম. জডরেলের 'দি ডিসগাইজ'-এর বাঙলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' অভিনয় করান। এতে কিন্তু মেয়েরাই স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। সম্ভবত ঝুমুর, যাত্রা দল থেকে এইসব অভিনেত্রী সংগৃহীত হয়েছিল।

ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল-কলেজে কিছু কিছু ইংরেজী নাটক অভিনীত হতে থাকে। ক্রমশ কলকাতার বাবু-শ্রেণীও নাট্যসচেতন হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের উদ্যোগে ইংরেজী বা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ তাঁদের বাড়িতে বাঁধা মঞ্চে অভিনীত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে-বছর কলকাতায় পদার্পণ করেন (১৮৫৩) সেই বছরই ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর প্রাক্তন ছাত্ররা তাদের স্কুলগৃহে মঞ্চ তৈরি করে শেক্সপীয়ারের 'ওথেলো' নাটক মঞ্চস্থ করে। মঞ্চের নাম হয় ওরিয়েন্টাল থিয়েটার। এই ষষ্ঠ দশকেই একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, মেট্রোপলিটন থিয়েটার। 'নাট্যশালা' বা 'রঙ্গমঞ্চ' নাম হলেও এগুলি কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। কোন বিশেষ ধনী ব্যক্তির উৎসাহে তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণে বা বৈঠকখানায় দু-একটি নাটক অভিনীত হতো। নাটক সম্পর্কে উৎসাহ জেগেছে অথচ অভিনয় করার উপযোগী নাটক নেই—খাঁটি নাট্যকারেরও আবির্ভাব হয়নি। সুতরাং রাজা বা জমিদার শ্রেণীর কেউ কেউ নাটকরচনায় পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে নাটক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করতেন। এই ষষ্ঠ দশকেই কুড়িগ্রামের জমিদার কালীচরণ রায়চৌধুরী ঘোষিত প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক লিখে ৫০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। বলতে গেলে, এইসময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। রামনারায়ণ এরপর আরো কয়েকখানি নাটক লেখেন। তাঁর 'রত্নাবলী' নাটকটি যখন বেলগাছিয়া মঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা হলো তখন শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের সুবিধার্থে (বাবুদের আত্মীয় বন্ধুরাই তখন দর্শনের অধিকার লাভ করতেন এবং স্বভাবতই বন্ধুদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা কম ছিল না।) ইংরেজী সংক্ষিপ্তসার রচনার জন্য একজন ইংরেজী অনুবাদকের প্রয়োজন হয়। রাজাদের বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্তের ওপর সংক্ষিপ্তসার অনুবাদের ভার দেওয়া হয়। তিনি নাটকটি পড়ে রীতিমতো হতাশা ও বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং একরকম চ্যালেঞ্জ নিয়েই স্বয়ং বাঙলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। রামনারায়ণ সংস্কৃত পণ্ডিত—সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুসরণ করেই তিনি নাটক লিখতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদনের সঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। সুতরাং সেই প্রথম পাশ্চাত্যরীতিতে মৌলিক বাঙলা পৌরাণিক নাটক রচিত হলো 'শর্মিষ্ঠা'। পরপর তিনটি নাটক (শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী) ও দুটি প্রহসন (একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ) লিখে মধুসূদন বাঙলা নাট্যসাহিত্যে কালান্তর আনলেন। সপ্তম দশকের গোড়াতেই আবির্ভাব শক্তিশালী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের। একে একে মনোমোহন বসু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের আবির্ভাবে নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও নাটক দেখার স্পৃহা জাগ্রত হয়েছে, কিন্তু তাদের সে-সুযোগ তখনো আসেনি। ক্রমশ অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ব্যবস্থাপকরা কিছু কিছু সাধারণ দর্শককে নাটক দেখার অধিকার দেবার কথা চিন্তা করতে শুরু করলেন। প্রথম দিকে এই দর্শনের অধিকার লাভ করার জন্য পূর্বাহ্নে নিজের যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে ব্যবস্থাপকদের কাছে দরখাস্ত পেশ করতে হতো। দরখাস্তের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তির প্রশংসাপত্র যোগ করতে হতো যাতে দরখাস্তকারীর অধিকার সাব্যস্ত হয়। ব্যবস্থাপকরা আবেদনকারীদের গুণাগুণ বিচার করে কিছু লোককে নির্বাচিত করে তাদের অনুমতি-পত্র দিতেন। সে পত্র পাওয়া তখনকার দিনে এতখানি গৌরবজনক ছিল যে, তাঁরা এইরকম

অনুমতি-পত্র পেয়ে প্রত্যেক লোককে দেখিয়ে বেড়াতেন এবং কিভাবে সেটি লাভ করেছেন তার কাহিনী শোনাতেন।

সাধারণ দর্শকের এই দুঃখমোচন হলো ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায়। এই সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার একটা পটভূমিকা আছে। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি কয়েকজন যুবক বাগবাজারে একটি দল তৈরি করে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের যাত্রাপালা শুরু করেন। যখন পালা বেশ সুখ্যাতি অর্জন করল তখন তাঁদের থিয়েটার করার শখ হলো; কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জার জন্য যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন। সে অর্থ সংগ্রহ করা বা নিজেদের উপার্জন থেকে দান করা সম্ভব নয় বলে তাঁদের চেষ্টা সহজে ফলবতী হওয়া সম্ভব ছিল না। সেইসময় দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক নাটক—দৃশ্যপটের বাহুল্য নেই, পোশাক-পরিচ্ছদও সাধারণ। সকলের চেষ্টায় তারজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহ সম্ভব হলো এবং ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে শারদীয়া পূজার সময় বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে 'সধবার একাদশী' অভিনীত হলো। সম্প্রদায়ের নাম হলো 'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার'। পরপর কয়েকটি অভিনয় হলো সাফল্যের সঙ্গে। 'সধবার একাদশী'র পর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (দীনবন্ধু মিত্র) অভিনয় করেও এঁরা সুখ্যাতি লাভ করেন। প্রীত জনসাধারণের তাগিদে 'লীলাবতী' নাটক মঞ্চস্থ হলো এবং থিয়েটারের নাম পরিবর্তিত করে রাখা হলো 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। 'লীলাবতী'র সাফল্যে উল্লসিত সম্প্রদায় টিকিট বিক্রি করে রীতিমত অভিনয় করার কথা চিন্তা করতে শুরু করল। এই নিয়েই মতান্তর ঘটল গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে। গিরিশচন্দ্র টিকিট বিক্রি ও নামকরণ দুটোতেই আপত্তি জানালেন; কারণ তাঁর মতে, সামান্য পুঁজিতে শ্রীহীন দৃশ্যপট ও অন্যান্য যা ব্যবস্থা করা যাবে তাতে সেই থিয়েটারকে জাতীয় নাট্যশালারূপে (ন্যাশনাল থিয়েটার) অভিহিত করা জাতীয় দৈন্য প্রকটিত করার সামিল। শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে এ নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য শোনাও যেতে পারে আর এরই জন্য দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী আদায় প্রতারণা ভিন্ন আর কিছু নয়। গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়েই ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে স্টেজ বেঁধে সাধারণ রঙ্গালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন হলো—টিকিটের মূল্য দু-টাকা, একটাকা ও আট আনা। স্ত্রীভূমিকায় অবতীর্ণ হলো পুরুষরা। ১৮৭৩-এর ১৬ আগস্ট বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রীর আবির্ভাব মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে। মধুসূদনের ইচ্ছানুসারেই বেঙ্গল থিয়েটার নারী চরিত্রে স্ত্রীলোকের অভিনয়ের সূত্রপাত করে এবং এই শর্তেই মধুসূদন অসুস্থ অবস্থায় তাদের [illegible] 'মায়াকানন' নাটক রচনা করেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং বাঙলামঞ্চে স্ত্রীলোকের অভিনয় দেখে যেতে পারেননি—বেঙ্গল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটনের আগেই ২৯ জুন ১৮৭৩ তাঁর মৃত্যু ঘটে।

১৮৭২ থেকে যেমন শুরু হয়েছে সাধারণ রঙ্গালয়ের জয়যাত্রা, ১৮৭৩ থেকেই তেমনি বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ের দুর্যোগ। সেকালে ভদ্র পরিবারের মেয়েরা মঞ্চে অভিনয় করবেন এটা অবাস্তব কল্পনা, সুতরাং তাদের সংগ্রহ করতে হয়েছিল পতিতা-শ্রেণী থেকে। সমকালীন অভিজাত শ্রেণী এব্যবস্থা

সুচক্ষে দেখেননি। তাঁরা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং নানা বিপত্তির মধ্যে দিয়েই বাঙলার থিয়েটারকে তখন এগোতে হয়েছে। সেকালে আর এক মারাত্মক ব্যাধি ছিল দলাদলি। এক ন্যাশনাল থিয়েটারই ভেঙেছে বেশ কয়েকবার। এরসঙ্গে থিয়েটারের অর্থ জোগানদারদের ব্যক্তিগত খাম-খেয়ালও সংযুক্ত হয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের পথ অমসৃণ করে তুলেছিল।

বর্তমানকালের বিলাসবহুল, সুসজ্জিত, সুমার্জিত থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে বসে সেকালের সাধারণ রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে কোন ধারণা করা যাবে না। তখন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা কলকাতাতেই নেই। রাস্তায় রেড়ির তেলের আলো জ্বলে—থিয়েটারে গ্যাসের আলোর বন্দোবস্ত। আবহসৃষ্টির অনুকূল কোন ব্যবস্থাই নেই। স্থির মঞ্চ—প্রতি দৃশ্যের পর পর্দা ফেলে দৃশ্যপট পালটাতে হয়। অভিনয় রীতি ছিল বিশিষ্ট শিল্পিকেন্দ্রিক এবং উচ্চগ্রামে বাঁধা। শব্দ প্রক্ষেপণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অভাবে সব শিল্পীকেই কণ্ঠের ওপর নির্ভর করতে হতো। দর্শকশ্রেণীর রুচি তখনও যাত্রাপালায় অভ্যস্ত। সুতরাং ঢালাও নাচগান ও স্থূল ভাঁড়ামি ছাড়া থিয়েটার জমত না। তখন কলকাতায় জনসংখ্যা কম, তদুপরি অভিনেত্রীদের যোগদানের ফলে একটি শ্রেণী থিয়েটার থেকে শতহস্ত দূরে থাকতেন। তাই দেখতে পাওয়া যায় সেকালের মঞ্চ-সফল নাটকেরও একটানা ২০।২৫টির বেশি অভিনয় হতো না। মঞ্চের প্রতি বিতৃষ্ণা খানিকটা কমে গিয়েছিল ১৮৮৪-তে 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ের পর। এইসময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ধর্মীয় জগতের মানুষের যাতায়াতে থিয়েটার কিছুটা কৌলীন্য লাভ করে।

থিয়েটার হতো শনিবার ও রবিবার অথবা বিশেষ বিশেষ ছুটির দিনে। রাত নটায় শুরু হয়ে ছ-সাত ঘণ্টা অভিনয় চলত। কর্পোরেশনের নতুন আইনে যখন রাত্রি একটার পর অভিনয় নিষিদ্ধ হলো তখন থিয়েটার কর্তৃপক্ষের রীতিমত মাথায় হাত। প্রতিবাদের ঝড় উঠল, কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ কিছু হয়নি। সত্যই চার ঘণ্টায় থিয়েটার শেষ করা তখনকার কালে দুরূহ ব্যাপার ছিল। রাত আটটার আগে অভিনয় আরম্ভ করারও প্রশ্ন নেই, কারণ যে ক্ষুদ্র দর্শকশ্রেণী গড়ে উঠেছিল, তাঁরা সারাদিনের কাজকর্ম সেরে তবে থিয়েটারে আসার ফুরসত পেতেন। তাছাড়া মেয়েরা তাঁদের রান্নাবান্না প্রভৃতি কাজকর্ম সেরে আহারের পাট চুকিয়ে তবেই থিয়েটারে আসার সুযোগ পেতেন। মেয়েদের বসার ব্যবস্থা ছিল দোতলায় চিকের আড়ালে। তাঁদের সঙ্গে আনীত শিশুদের শয়নের জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট রাখতে হতো—রাখতে হতো শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য থিয়েটার কর্তৃপক্ষ-নিযুক্ত পরিচারিকা। রাত ১২টার পর থিয়েটার শেষ হলে যানবাহন বলতে ছিল একমাত্র ঘোড়ার গাড়ি—তারও সংখ্যা সামান্য। সুতরাং দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তর কলকাতায় যারা থিয়েটার দেখতে আসত তারা শেষ অঙ্কের মাঝামাঝি সময়েই উঠে পড়ত। দোতলার পরিচারিকাকে খবর দিলে সে মেয়েদের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করত 'অমুক জায়গার অমুক বাড়ির মেয়েরা উঠে এস—তোমাদের বাড়ির লোক ডাকছে।' একবার এইরকম সংবাদ পেয়ে এক মহিলা শিশুকক্ষে গিয়ে নিজের শিশুটিকে কোলে নিয়ে স্বামীর (বা বাড়ির

লোকের) সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন। কিছুক্ষণ পরেই থিয়েটার ভাঙতে অন্য এক মহিলার আর্তনাদ, কান্নাকাটি। সেই মহিলার শিশুটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি শিশু তখনো অবশিষ্ট আছে বটে এবং সেই মহিলার সন্তানটির মতোই তাকে দেখতে, কিন্তু তার গলায় রয়েছে একটি মাদুলি—যা তাঁর ছেলের ছিল না। কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গণলেন—তাঁরা গিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করারও চেষ্টা করতে লাগলেন—ভুল করে যে ছেলে নিয়ে গেছে, সে নিশ্চয় ফিরে আসবে। এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কাটল—থিয়েটারের কেউ বাড়ি যেতে পারছে না—স্বামী ভদ্রলোকও ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছেন—এমন সময় বহুদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখা গেল—দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে আসছে। অবশেষে সত্যই সেই ঘোড়ার গাড়িতে এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এলেন—তাঁর কোলে একটি শিশু। উভয় মহিলা অশ্রুভারাক্রান্ত হাসিমুখে স-মাদুলি ও নির্মাদুলি শিশু বিনিময় করলেন। কর্তৃপক্ষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

তখনকার শিল্পীরা বেতনভোগী হলেও তাদের বেতন ছিল আজকের তুলনায় হাস্যকর। ভ্রাম্যমাণ ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেছিলেন মাত্র পঁচিশ টাকার মাসিক বেতনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্পীদের সঙ্গে দর্শকদের একধরনের হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠত। একবার থিয়েটার শেষে দেখা গেল বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে—দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে যেতে পারছেন না। তাঁদের চিত্ত বিনোদনের জন্য অর্ধেন্দু মুস্তাফি মুখে মুখে নাটক তৈরি করে ফেললেন এবং নাচ গান সব মিলিয়ে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন। বৃষ্টি থামল—নাটকও শেষ হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো বাবু-থিয়েটারে গিয়েছিলেন কিনা বলা শক্ত। না যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তখন তাঁর সাধনার কাল—তাঁর পরিচয়ও বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি। সুতরাং যেখানে কেবলমাত্র বাবুদের বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবদেরই নিমন্ত্রণ হতো সেখানে তাঁর উপস্থিতি ঘটেনি বলেই মনে হয়। ১৮৭২-এ যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শুরু হয়েছে এবং তাঁর খ্যাতিও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে, ভক্তসমাগমও আরম্ভ হয়েছে তখনই একমাত্র তাঁর থিয়েটারে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে—কিন্তু সেটাও ঘটেছে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার বারো বছর পরে। তার আগে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে কেশবচন্দ্রের 'লিলিকটেজ'-এ ধর্মমূলক নাটক 'নববৃন্দাবন'-এর অপেশাদারী মঞ্চাভিনয় দেখেন। এখানে নরেন্দ্রনাথও অভিনয় করেছিলেন। সম্ভবত সেটিই তাঁর প্রথম থিয়েটার দর্শন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তিনি উপস্থিত হয়েছেন ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪—স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'য়। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।[২] *□

পাদটীকা

১ মহেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর শৈশব বলতে ৮ থেকে ১০ বছর বয়স অনুমান করে নিতে পারা যায়। সুতরাং ১৮৭৭ বা তার পরবর্তী কালের বর্ণনা বলেই মনে করা যেতে পারে।

২ উনিশ শতকের শেষাংশে ও পরবর্তী কালে কলকাতার নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগাযোগ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনার জন্য লেখকের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থ এবং 'বাঙলা নাট্যসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা' প্রবন্ধ ('উদ্বোধন', ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৮৭) দ্রষ্টব্য।

* ৯১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা

ভারতের বাইরে ভারত-সংস্কৃতি

সন্তোষকুমার অধিকারী

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের মানুষ তার ধর্ম ও সংস্কৃতির পণ্য বহন করে ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। খ্রীস্টজন্মের আনুমানিক ছয়শ বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছে এই বিজয়যাত্রা। হিন্দু-সংস্কৃতির বাহক হয়ে হিন্দু বণিক ও রাজকুল—শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ—দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে হাজির হয়েছে দক্ষিণে সিংহলে, দক্ষিণ-পশ্চিমে মালদ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে দ্বীপে, ইন্দোচীনে ও জাপানে এবং সুবর্ণ দ্বীপ বা সুমাত্রা থেকে নিউগিনি ও উত্তরে ইস্টার আইল্যান্ড পেরিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। তারা ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে বহন করে নিয়ে গিয়েছে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি, ভারতের চিন্তা, ভারতের শিল্পকলা এবং রাষ্ট্রনীতিকেও। পূর্ব এশিয়ায় কম্বোজ (বা কম্বোডিয়া) ও চম্পায় (বা দক্ষিণ ভিয়েতনামে) হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়েছে দ্বিতীয় শতকেই। চতুর্থ শতকের মধ্যেই হিন্দু-ধর্মচেতনা স্থানীয় চাম ও অন্যান্য উপজাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। যবদ্বীপ (জাভা) ও বালিতে হিন্দুমন্দির যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনি স্থাপিত হয়েছে সংস্কৃত-চর্চাকেন্দ্র। শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভাব ঘটেছে বৌদ্ধধর্ম-ভাবনা ও শিল্পরীতির। আশ্চর্য! আগন্তুক সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় উপজাতিক সংস্কৃতির কোন বিরোধ ঘটেনি, বরং সমন্বয় ঘটেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে অন্তহীন বিশালতায় পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলি মোচার খোলার মতো ভেসে রয়েছে। উত্তরে হাওয়াই, দক্ষিণে নিউজিল্যান্ড এবং পূর্বে ইস্টার আইল্যান্ড—এই ত্রিভুজের মধ্যে রয়েছে পলিনেশিয়া। দ্বীপগুলি ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন। মরুভূমির মধ্যে উট যেমন মানুষের একমাত্র ভরসা, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তেমনি ভেলা (raft) পলিনেশিয়ার মানুষদের একমাত্র সম্বল। বালসা-গুঁড়ির দীর্ঘ ভেলায় সওয়ার হয়ে তারা তরঙ্গের বুকে ভেসে পড়ে। ফেয়ারফিল্ড অসবোর্ন লিখেছেন ঃ "আদিম যুগের ভেলায় চড়ে নক্ষত্র দেখে তাদের দীর্ঘ ও দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রা পলিনেশিয়ার' অধিবাসীদের পৃথিবীর আদিম ও শ্রেষ্ঠ নাবিকরূপে চিহ্নিত করেছে।"[১] বস্তুত পলিনেশীয় নাবিকেরা যে-সমুদ্রপথ তৈরি করেছে সেই পথ ধরেই হিন্দু বণিক ও সন্ন্যাসীরা সাগর পাড়ি দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পলিনেশীয়রা অস্ট্রিক গোষ্ঠিভুক্ত, উড়িষ্যার প্রাচীন অধিবাসীরা, যারা কলিঙ্গ নামে অভিহিত, তারাও অস্ট্রিক গোষ্ঠিভুক্ত। উড়িষ্যা, মালয় ও পলিনেশিয়ার মধ্যে নৌ-চলাচল ছিল এবং সেইসঙ্গে ছিল সংস্কৃতির আদানপ্রদানও।

পুরীর জগন্নাথদেবের মূর্তির সঙ্গে পলিনেশীয়দের বাহুহীন মূর্তিগুলির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পলিনেশিয়ার শিল্পদর্শন—ত্রিভুজাকার স্তূপ ও বাহুহীন মূর্তি।[২]

প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তৃতি বুঝতে হলে, মনে রাখতে হবে যে, ভূপৃষ্ঠের আয়তনের অর্ধেক জুড়ে আছে এই মহাসাগর। বিষুবরেখার উত্তরে মাইক্রোনেশিয়া আর দক্ষিণে মেলানেশিয়া; এদের পূর্বদিকে পলিনেশিয়া। তার মধ্যে রয়েছে সামুয়া, তাহিতি, নিউজিল্যান্ড, ইস্টার আইল্যান্ড প্রভৃতি দ্বীপগুলি।

মহাসমুদ্রের বুকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা হাজার মাইল ব্যবধানে স্থিত এই দ্বীপগুলিতে যারা বাস করে তাদের পূর্বপুরুষ যে এশিয়ার লোক একথা ঐতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন। প্রশান্ত মহাসাগর ঘোরার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে থর হেয়েরডাল লিখেছেন ঃ "The Malaya people... possesses rudimentary evidence of early contact with a palaeo-Polynesian stock."[৩] (মালয়ের অধিবাসীদের... প্রাচীন পলিনেশিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের প্রাথমিক পরিচয়ের প্রমাণ আছে।) পলিনেশীয়দের পূর্বপুরুষরা পূর্ব এশিয়ার উপকূলবর্তী এলাকা ত্যাগ করে দ্বীপে দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছিল সভ্যতার বিকাশের পূর্বেই। পলিনেশীয় নাবিকদের দেবতা কেন বা কানে (Kane) সূর্যের স্থানীয় নাম। হেয়েরডাল বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, সিন্ধু উপত্যকার মানুষের মতো পলিনেশিয়ার ইস্টার আইল্যান্ডের অধিবাসীরাও কানে গোল রিং ঝোলাতো। তিনি লিখেছেন ঃ "Was it pure coincidence that remote oceanic islands like Maldives and Easter Islands had been found and settled by navigators whose Gods and nobles were supposed to wear big discs in their earlobes?"[৪] (এটা কি নিছক দৈব সঙ্ঘটন যে, মালদিভ ও ইস্টার আইল্যান্ডের মতো দূরবর্তী সামুদ্রিক দ্বীপে যে সমুদ্রচারী নাবিকেরা ছিল, তাদের দেবতা ও অভিজাত সম্প্রদায় কানের লতিতে গোল রিং পরার রীতি গ্রহণ করেছিলেন?)

মহাসমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে থাকা এই পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ভারত-সংস্কৃতির ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল প্রাচীনকাল থেকেই, হয়তো সিন্ধু-সভ্যতার যুগ থেকেই। ঐতিহাসিক হেয়েরডাল এই দ্বীপগুলিতে ঘুরেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন ইস্টার আইল্যান্ডে অগণিত প্রস্তরমূর্তি; মূর্তিগুলির কানের নিচের দিক (লতি বা lobe) লম্বা এবং ঘাড়ের দিকে প্রলম্বিত। শুধু ইস্টার আইল্যান্ডে নয়, এমন লম্বিত কর্ণের নিদর্শন পেরুতেও তিনি দেখেছেন। যাঁরা বুদ্ধের প্রাচীন মূর্তি দেখেছেন, তাঁদের মনে পড়বে যে, বুদ্ধমূর্তির কানও লম্বা এবং বুদ্ধের সময়েরও অনেক আগে মহেঞ্জোদারোর মূর্তিতেও এই লম্বিত কর্ণের বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। হেয়েরডাল এপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "The Indus Valley mariners were of long ears... The Hindu nobility had later copied the custom from them, and afterwards Buddha and his followers had spread it far and wide in Asia"[৫] (সিন্ধু-সভ্যতার যুগের নাবিকরা লম্বা কানযুক্ত ছিল।... হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষেরা পরবর্তী কালে তাদের এই লম্বকর্ণের বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করত এবং আরো পরে বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যদের দ্বারা এর বিস্তারলাভ ঘটে সারা এশিয়াতে।)

জানা গিয়েছে যে, সিন্ধু-সভ্যতার কাল থেকেই ভারতীয় মহাসমুদ্রে ভ্রমণ করেছে। নৌবিদ্যায় তাদের এই পারদর্শিতার সঙ্গে পলিনেশীয় নাবিকদের যে যোগাযোগ ছিল, তাও এখন স্বীকৃত। তাই এই লম্বকর্ণের বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষ থেকে পলিনেশিয়ায় এবং সেখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতেও গিয়ে পৌঁছেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের দুস্তর বুক অতিক্রম করা, বিশেষভাবে ইন্দোনেশিয়া অথবা ইন্দোচীন থেকে যাত্রা করে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছান প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বলে অনেকেই মনে করেন। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল থর হেয়েরডাল বালসা কাঠের তৈরি ভেলা 'কোন-টিকি'র সাহায্যে পেরু থেকে যাত্রা করে প্রথমে মহাসাগরের বুকে এক হাজার মাইল দূরে ইস্টার আইল্যান্ডে পৌঁছেছিলেন। পরে ৪৩০০ মাইল পথ ঘুরে ১০১ দিনে রারোইয়ার মাটি ছুঁয়েছিলেন। হেয়েরডাল দেখেছেন যে, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইন্দোনেশিয়ায় এইভাবে ভেলাতে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু ইন্দোনেশিয়া বা মালয় থেকে আমেরিকা পৌঁছান দুরূহ ব্যাপার বলে তাঁর মনে হয়েছে।

পলিনেশিয়ানদের তৈরি এই বালসা-ভেলা তৈরির জন্য বালসা-গুঁড়িগুলি কাঁচা অবস্থাতেই কেটে সমুদ্রে নামানো হলে সেগুলি জলসহ ও মজবুত হয়ে থাকে। দু-ফুট মোটা গুঁড়ি দিয়ে ভেলা তৈরি হলে সে-ভেলা গভীর সমুদ্রে ঝড়-তুফানেও অক্ষত থাকে। এই ধরনের এক-একটা ভেলা ৭০ ফুট পর্যন্ত লম্বা ও সাড়ে ৬ ফুট চওড়া হয়। একটি ভেলাতে একশো জন নাবিক থাকতে পারে।

প্রাচীন নথিপত্র থেকে দেখা গেছে যে, প্রাচীনকালের এই বালসা-ভেলা প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর উপকূল ঘেঁষে জাপান বা ফিলিপাইন্স থেকে যাত্রা করে হাওয়াই ও অ্যালেন্টিয়ান দ্বীপের মাঝ দিয়ে উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার কূলে পৌঁছাতে পারত এবং সেখান থেকে তারা এগিয়ে যেত প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণদিকে, যার একদিকে দক্ষিণ আমেরিকার গুয়াতেমালা থেকে পেরু পর্যন্ত উপকূল, অন্যদিকে পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ। হেয়েরডাল লিখেছেন ঃ

"The island studded coast of British Columbia offers... a feasible geographical stepping stone from the Philippine sea to Polynesia. ... It (the British Columbian Archipelego) is the only area known to receive natural drift from South-East Asia."[৬] (ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে ছড়িয়ে রয়েছে অগণিত দ্বীপ। এই দ্বীপগুলিতে পা রেখে ফিলিপাইন সাগর থেকে পলিনেশিয়া যাওয়ার সম্ভাব্য পথ। এই দ্বীপপুঞ্জই হলো একমাত্র স্থান, যেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রকৃতির অনুকূল গতি প্রবাহিত হয়েছে।)

এইভাবেই চীনের উপকূল বেয়ে জাপান কারেন্ট ধরে উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার কূলে পৌঁছেছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ। সেখান থেকে আবার তারা এগিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়াতেমালা ও পেরুর পথে, অথবা ফিরে এসেছিল পলিনেশিয়ার হাওয়াই বা ইস্টার

এই যাওয়া-আসার স্রোত শুরু হয়েছে সিন্ধু-সভ্যতার কাল থেকেই। খ্রীস্টজন্মের অন্তত তিন হাজার বছর আগে সিন্ধু-সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল বিকাশ। একই সঙ্গে সুমের-সভ্যতা (টাইগ্রিস নদীর তীরে) এবং মিশর-সভ্যতার (নীল নদের তীরে) আবির্ভাব। সেই প্রাচীন যুগেই অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেই ব্যাবিলন-মেসোপটেমিয়া, হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো, তাম্রলিপ্ত এবং সুবর্ণ দ্বীপের (সুমাত্রা-জাভা) মধ্যে নৌ-চলাচল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। হেয়েরডাল লিখেছেন ঃ "Until we can prove differently from archaeological remains, civilized man suddenly appeared 5000 years ago, when he began to build cities like Amri, Kot-Digi, Mahenjodaro and Harappa in the Indus Valley. He was already a sea-fearer too building port, along the river banks and along the coasts of the Indian Ocean."[৭] (প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে আমরা যদি বিপরীত প্রমাণ কিছু না পাই, তাহলে একথাই সত্য যে, পাঁচহাজার বছর আগে হঠাৎ সভ্য মানবের আবির্ভাব ঘটেছে, যে-মানব আমরি, কোট-দিগি, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার মতো শহর তৈরি করেছে সিন্ধু নদীর উপত্যকায়। সেই মানুষই আবার সমুদ্র পরিভ্রমণ করেছে এবং নদী ও ভারত মহাসাগরের কূলে কূলে বন্দর গড়ে তুলেছে।)

সিন্ধু-সভ্যতা ভেঙে পড়ার পর আর্য ও দ্রাবিড়-সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ("by acculturation of the two different cultures") হিন্দুধর্ম নতুন করে জেগেছে। তারই পথ বেয়ে পরবর্তী কালে জন্ম নিয়েছে বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মসম্প্রদায়। খ্রীস্টজন্মের তিনশো বছর আগেই নবজাগ্রত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়েছে বহির্ভারতের বিভিন্ন স্থানে সিংহলে ও মালদিভ দ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুবর্ণ দ্বীপ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে পলিনেশিয়া এবং ফিলিপাইন ও জাপান হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো ও পেরুতে।

ভারত মহাসাগরের জাভা অথবা ফিলিপাইন্সের ম্যানিলা থেকে পোত বা ভেলা ভাসিয়ে হিন্দু বণিকেরা যে একসময়ে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়াতেমালা ও পেরুতে পৌঁছেছিল, এ-ঘটনাকে অনেকে অবিশ্বাস্য মনে করেন। গত ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় থাকার সময়ে আমি বিশ্ববিখ্যাত ভৌগোলিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ থর হেয়েরডালকে একটি চিঠি দিই। আমার চিঠির উত্তরে তিনি লিখেছেন ঃ "আপনার চিঠিটি আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি।... প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও মায়াসভ্যতার মধ্যে আরো অনেকের মতো আপনিও যে অন্তরঙ্গ মিল লক্ষ্য করেছেন, আপনার এই বিবৃতিতেও আমি আকৃষ্ট। এই মিল এত বেশি যে, আমার মনে হয়েছে—ভারত মহাসাগর থেকে সমুদ্রযাত্রীর দল দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে মেক্সিকো উপসাগরে পৌঁছেছিল সেই একই বাতাস ও স্রোতের গতি ধরে। তার সহায়তায় আমি আফ্রিকা থেকে বার্বাডোজ দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছেছিলাম ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে।..."

হেয়েরডাল তাঁর চিঠিতে বলেছেন যে, তিনি নিজেও ১৯৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দে মেসোপটেমিয়া থেকে রেড-সি হয়ে সিন্ধু সভ্যতার যুগের নাবিকদের মতো

ভেলায় করে রওনা হয়ে আফ্রিকা ঘুরে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তিনি উড়িয়ে দেননি, সে-পথ ইন্দোনেশিয়া থেকে জাপান সাগরের স্রোত ধরে উত্তর দ্রাঘিমার পথ।

'ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অফ ইন্ডিয়ান কালচার'-এর ডিরেক্টর লোকেশচন্দ্র ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে জাপানে এক প্রাচীন বৌদ্ধবিহারে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কার করেছেন।[৮] একাদশ খ্রীস্টাব্দের প্রাচীন কোকিজী মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। লোকেশচন্দ্র ঐ মন্দিরে এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে যেসব হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে সরস্বতী ও কার্তিকেয়র মূর্তি রয়েছে। তাছাড়া জাপানে এবং থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্কক শহরে বিভিন্ন ধরনের গণপতি মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে সংস্কৃতভাষা-চর্চা একসময়ে যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, তার নিদর্শন কিছু কিছু এখনো বর্তমান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্পেনীয় ধর্মযাজকেরা ফিলিপাইন্সের প্রাচীন পুঁথিগুলি নষ্ট করে দিয়েছেন। অন্যদিকে সেলিবিস ও মোলাক্কাস দ্বীপপুঞ্জে, এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের নিউগিনিতেও যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছিল, তার নিদর্শনও পাওয়া যাচ্ছে। সেলিবিস দ্বীপে ব্রোঞ্জের একটি বিরাট বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

ভারতীয় বণিকদের ডিঙাগুলি মালয়ের অস্ট্রিক নাবিকদের সঙ্গে একসময়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর কোন একসময়ে ম্যানিলার পথে জাপান সমুদ্র দিয়ে পশ্চিম আমেরিকায় এবং সেখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়াতেমালা ও পেরুতে গিয়ে পৌঁছেছে,[৯] অথবা সরাসরি নিউগিনি থেকে যাত্রা করে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ হয়ে পেরুতে গিয়ে উঠেছে—এরূপ অনুমান করার কারণ আছে।

হিন্দু বণিকেরা যে জাভা থেকে যাত্রা করে মেক্সিকোয় গিয়ে পৌঁছেছিল, তার একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শনও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মেক্সিকোর ইউকাতানে মাটির তলা থেকে দশম শতকের (৯২৩ খ্রীস্টাব্দ) একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে। ঐ লিপিতে বলা হয়েছে যে, ভারতের একটি বাণিজ্যতরী জাভা হয়ে মেক্সিকো এসেছিল ৯২৩ খ্রীস্টাব্দে।[১০]

এই অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হয়েছে ঃ "Archaeological evidence of Indian influence on the peninsula includes Sanskrit inscriptions found in Perai, opposite to the island of Penang, which have been dated to the fourth century... The most interesting archeaological site on the peninsula comes, however, from a later era–the tenth century Candi Sungai Batu Pahat in Kedah, a temple dedicated to a deceased ruler, which combines Hindu and Buddhist motifs in its design."[১১] (এই উপদ্বীপে ভারত-সংস্কৃতির প্রভাবের যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে পেনাঙ দ্বীপের বিপরীত দিকে পেরাইতে প্রাপ্ত সংস্কৃত শিলালিপিগুলি চতুর্থ শতাব্দীর বলে জানা গিয়েছে।... উপদ্বীপটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আরো পরবর্তী

কালে দশম শতকে কেদাতে প্রাপ্ত একটি মন্দির; নাম চণ্ডী সুঙ্গাই বাটু পাহাং। হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পের উপকরণকে একত্র করে ব্যবহার করেছিলেন এমন একজন মৃত রাজার উদ্দেশে মন্দিরটি উৎসর্গীকৃত।)

স্থানীয় কিংবদন্তী ও উপকথা এবং নানাস্থানে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে থাকা শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেই মালয় উপদ্বীপে হিন্দু-সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত, 'মালয়' নামটি প্রাচীন ভারতের 'মালব' উপজাতির নামানুসরণে এসেছে। এই মালব উপজাতির নাম 'মুদ্রারাক্ষস' গ্রন্থে এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতেও পাওয়া যায়। রাজপুতানার জয়পুরে মালবদের নামাঙ্কিত অজস্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অস্ট্রোনেশিয়া গোষ্ঠীর এই মানুষেরা ভারত থেকে মালয় পৌঁছেছিল, একথা ডঃ মজুমদারের অনুমান।[১২] চীনা ও আরব পর্যটকদের রচনা এবং কিংবদন্তী ও উপকথা থেকে ডঃ মজুমদার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেই দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় বণিকেরা বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল।[১৩] ভারতীয়দের প্রভাবে সেইসব জনপদ তাক্কোলা, জাভা, তাম্রলিঙ্গ, কোক্কোনগর, কলসপুরা ইত্যাদি ভারতীয় নামে আজও পরিচিত। দূর ইন্দোচীনে কম্বোজ, চম্পা ও শ্যাম যখন হিন্দু রাজাদের অধীনে চলে গিয়েছে তখন মাঝখানে মালয় উপদ্বীপ যে তার আগেই ভাগ্যান্বেষী হিন্দুবণিক ও রাজকুলের দ্বারা অধ্যুষিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মালয় উপদ্বীপে কেদা, পাহাং, কান্তোলি প্রভৃতি হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্ব ঐতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন। সুঙ্গাই বাটু এস্টেটে (কেদা পাহাড়ে) একটি হিন্দুমন্দির আবিষ্কার করেছেন আই. এইচ. এন. ইভান্স। মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষা করে তিনি বলেছেন যে, সুঙ্গাই বাটুর আদিবাসীদের অনেকে নিঃসন্দেহে হিন্দু ছিল। তারা ছিল শিব ও দুর্গার উপাসক।

ইভান্স লিখেছেন ঃ "They certainly show that some early inhabitants of Sungai Batu were Hindus, and worshippers of Siva or related deities, for we have obtained images of Durga, Ganesha, the Nandi on which he rides and of the yoni always associated with the worship of Siva."[১৪] (এই নিদর্শনগুলি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, সুঙ্গাই বাটুর প্রাচীন অধিবাসীরা হিন্দু ছিল। তারা শিব এবং শিবের সঙ্গে যুক্ত দেবদেবীর উপাসক ছিল। কারণ, আমরা এখান থেকে দুর্গা, গণেশ ও শিবের বাহন নন্দীর মূর্তি পেয়েছি। তাছাড়া শিবের উপাসনার সঙ্গে সদা-যুক্ত যোনি-চিহ্নও দেখা গিয়েছে।)

মালয় উপদ্বীপের নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা যে অজস্র শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি সংস্কৃতভাষায় লেখা এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে রচিত। এগুলির মধ্যে দুটি লিপি বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ সম্বলিত। একটিতে রক্তমৃত্তিকার (রাঙামাটির) মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের কথা বলা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ একসময়ে রাজা শশাঙ্কের (গৌড়) রাজধানী ছিল। এই কর্ণসুবর্ণের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধবিহার ছিল। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ এই

বিহারটিকে 'রক্তমৃত্তিকা' নামে অভিহিত করেছেন। মুর্শিদাবাদ শহর থেকে বারো মাইল দক্ষিণে রাঙামাটিতে বৌদ্ধবিহারের যে-ধ্বংসস্তূপটি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেইটিই যে হিউয়েন সাঙ বর্ণিত রক্তমৃত্তিকা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চীনের সুঙ্গ বংশের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, মালয়ের পাহাঙ রাজ্যের রাজা ছিলেন সরিৎপাল বর্মা। ৪৪৯ খ্রীস্টাব্দে (পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে) তিনি চীনের রাজদরবারে তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন।[১৫] চীনসম্রাট পাহাঙ-এর রাজপ্রতিনিধিকে সসম্মানে গ্রহণ করেছিলেন।

অষ্টম খ্রীস্টাব্দে মালয় 'শ্রীবিজয়'-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। শ্রীবিজয়-রাজ্য শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে মুসলিম আক্রমণে মালয়ের হিন্দু-কীর্তিগুলি ধ্বংস হয়ে যায়; অধিবাসীরাও মুসলিমধর্ম গ্রহণ করে।* □

পাদটীকা

১ দ্রঃ 'অতীত ভারতীয় শিল্পে সাগরিকা সভ্যতার অবদান'—পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'তরুণের স্বপ্ন', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৯

২ ঐ

৩ The Early Man and the Ocean—Thor Heyerdahl, Doubleday & Co., New York, pp. 153-154

৪ The Maldive Mystery—Thor Heyerdahl, Adler & Adler, Bethesda, U.S.A., 1986, pp. 6-8

৫ Ibid, pp. 6-8

৬ Early Man and the Ocean, p. 46

৭ The Maldive Mystery, p. 256

৮ The Statesman, 1 Feb., 1988

৯ The Early Man and the Ocean, p. 38

১০ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ মার্চ, ১৯৮৯

১১ Malaysia—Ed. Frederick M. Burge, Foreign Area Studies Centre—American University, Malaysia, 1984, p. 9

১২ Ancient Indian Colonies in the South East Asia-R. C. Majumdar, Vol. II, pp. 19-25, 47

১৩ Ibid, pp. 69-70

১৪ দ্রঃ Papers on the Ethnology and Archaeology of the Malaya Peninsula—I.H.N. Evans, Cambridge, ১৯২৭

১৫ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সিগনেট প্রেস, ১৩৫৪, পৃঃ ২৪৮

* ৯৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা

যুবক বঙ্গের নেশন-রাষ্ট্র

বিনয়কুমার সরকার

সেকালের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বিনয়কুমার সরকারের লেখা, বলা এবং চিন্তার একটি বিশিষ্টতা ও মৌলিকতা ছিল। একালের পাঠক-পাঠিকাদের সে-সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তাঁরা তাঁর এই নিবন্ধের ভাষা, ভঙ্গি এবং চিন্তায় অবাক হতে পারেন। তাঁরা তাঁর চিন্তাকে অপ্রাসঙ্গিক, এমনকি দেশের পক্ষে ক্ষতিকরও ভাবতে পারেন। তবে, তাঁর সময়ে তাঁর বক্তব্য ও চিন্তাকে অনেকেই গুরুত্ব দিতেন। সেজন্যই ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে লেখা তাঁর এই নিবন্ধটি 'উদ্বোধন'-এর ৩৪ বর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, তৎকালীন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক লেখকের মৌলিক ভাবনাকে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর ঐতিহ্য অনুসারে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত রচনার বক্তব্য 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের মত-নিরপেক্ষ। বর্তমান সঙ্কলনে এই নিবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত করার সময় আমরা ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক যে মৌলিক চিন্তাভাবনা সাধারণ বাঙালী ও বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের কাছে তুলে ধরেছিলেন, সেটি এখানে উপস্থাপন করতে চেয়েছি। পুনশ্চ উল্লেখ করছি যে, লেখকের বক্তব্য সম্পর্কে আমরা সহমত—একথা যেন কেউ না ভাবেন।—সম্পাদক

আজ যুবক বাংলা দুনিয়ার ভিতর অন্যতম বিপুল শক্তি। দেশবিদেশের নরনারী যুবক বাংলাকে একটা বিশেষ রূপেই উল্লেখযোগ্য শক্তি সমঝিয়া থাকে। বাঙালীর স্বদেশসেবা আর স্বার্থত্যাগ আজকালকার জগতে অন্যতম আধ্যাত্মিক ক্ষমতা হিসাবে সম্মানিত হইতেছে। ১৯০৫ সনের ভাবরাশি বাঙালী জাতিকে সাতাশ-আঠাশ বৎসরের কাজের ফলে জগতের জাতি-মজলিসে অনেক দূর ঠেলিয়া তুলিয়াছে। বর্তমান সময়ে এইকথা মনে রাখিয়া বাঙালী জাতিকে আগামী তিন, পাঁচ বা সাত বৎসরের জন্য কর্মপ্রণালী বাছিয়া লইতে হইবে। বাঙালী জাতি বিশ্বের রাষ্ট্রমণ্ডলে একটি মজবুত ও কর্মঠ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে পারে একথা প্রত্যেক বাঙালীর মাথায় গভীরভাবে বসা আবশ্যক।

ঘটনাচক্রে বাঙালী জাতি নিজেকে অন্যান্য ভারতীয় জাতির সঙ্গে নেহাত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। বাঙালীরা প্রায় আধা শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ, ভারতীয় ঐক্য, ভারতীয় সত্তা, ঐক্য-গ্রথিত ভারত, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি শব্দ প্রচার করিয়া আসিতেছে। এই প্রচারের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে খানিকটা একতা আর একপ্রাণতা আসিয়াছে তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ভারতীয় ঐক্য বিষয়ক চিন্তা আজকাল একমাত্র বাংলাদেশে নয়, বাংলাদেশের বাহিরে অন্যান্য ভারতীয় নরনারীর অন্তরে অন্তরেও যারপরনাই বদ্ধমূল। এইরূপ চিন্তার সার্থকতা কিছু-না-কিছু আছেই, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু তাহার একটা কুফলও খুব বড়। এই কুফলের দৌরাত্ম্যে আমরা অনেক বিষয়ে দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। ভারতীয় ঐক্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে একমাত্র বাঙালী নয়, অবাঙালী ভারতীয়েরাও অনেক বিষয়ে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। ফলত ভারতীয় ঐক্যের প্রচার করা আর নানা কর্মক্ষেত্রে দুর্বলতা ডাকিয়া আনা প্রায় একার্থক হইয়া পড়িয়াছে।

যখনই আমরা ভারতের গৌরব, ভারতের কৃতিত্ব, ভারতের কীর্তি প্রচার করি তখনই নিজ পরিচিত পল্লী, শহর বা জনপদ ইত্যাদি ভুলিয়া গিয়া ভারতবর্ষের কোন-না-কোন পল্লী, কোন-না-কোন শহর, কোন-না-কোন জনপদের উল্লেখ করিয়া সন্তুষ্ট থাকি। কঙ্কন প্রদেশে কোন একজন ভারতীয় নারী একটা কিছু উঁচুদরের কাজ করিল, তৎক্ষণাৎ আমরাও বাংলাদেশে ভারতীয় গৌরবের একটা নয়া পরিচয় পাইয়া শ্লাঘা বোধ করি। কখনো বা পাঞ্জাবের কোন চাষীর কীর্তি, কখনো বা মাদ্রাজের কোন ধর্মপ্রচারকের কাহিনী, কখনো বা মারাঠাদের জনসেবা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান—এইসকল অতি দূরদেশবর্তী নরনারীর কার্যাবলী আমাদিগকে পাইয়া বসে। আর আমরাও তাহাতেই ফুলিয়া উঠিতে লজ্জাবোধ করি না। ইহা যে একমাত্র বাংলার দোষ তাহা নহে। মারাঠারাও কখনো বা কোন উঁচুদরের বাঙালী কাজ অথবা মাদ্রাজীর চিন্তা লইয়া বেশখানিকটা গুলতান করিয়া আনন্দ বোধ করেন। এই ধরনের পরের উপর নির্ভর করা, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, পরের কৃতিত্বকে নিজের কৃতিত্ব সমঝিয়া রাখা ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে নরনারীর চরিত্রগত হইয়া পড়িতেছে। এই ধরনের পরমুখাপেক্ষিতা অথবা পরের উপর নির্ভরশীলতা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

ভারতবর্ষের ৩৫ কোটি লোক—সকলেই আমরা ভারতবাসী একথাটি জানিয়া রাখা বা বুঝিয়া রাখা যুক্তিযুক্তও বটে আর তাহাতে লাভের সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া পদে পদে ৫ কোটি বাঙালীর পক্ষে অন্যান্য ৩৫ কোটি ভারতীয় নরনারীর শক্তি, স্বাস্থ্য, সাহস ও কর্মনিষ্ঠার উপর ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। আর তাহাতে লোকসান ছাড়া লাভের সম্ভাবনাও নাই। বাঙালীদের মতো মারাঠাদের ঠিক এইরূপ চিন্তা করা উচিত, পাঞ্জাবীদেরও ঠিক এইরূপ চিন্তা করা উচিত, মাদ্রাজীদেরও ঠিক এইরূপই চিন্তা করা উচিত। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই চাই আজ স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শক্তিসাধনা ও কর্মসাধনা, স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র সাহসিকতা ও কর্মনিষ্ঠার দিগ্বিজয়।

এই শক্তিযোগ আর কর্মনিষ্ঠা বাড়াইয়া তুলিতে হইলে আধ কোটি, এক কোটি, দেড় কোটি, আড়াই কোটি, তিন কোটি, পাঁচ কোটি লোককেই স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রভাবে—অন্যান্য ভারতীয় নরনারীর কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর না করিয়া নিজ নিজ গণ্ডির ভিতর নানাবিধ কৃতিত্ব দেখাইতে হইবে।

আজ আমি আমার নিজের দেশের কথা বলিতেছি। বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ— সমীপবর্তী ভবিষ্যৎই—আমার একমাত্র আলোচ্য বিষয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা কী করিতেছে বা না করিতেছে সে-সম্বন্ধে আলোচনা বর্জনীয় নয়। কিন্তু তাহারা কিছু করুক বা না করুক বাঙালী জাতিকে স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতে হইবে, নিজের জীবন খুলিয়া ধরিতে হইবে। এশিয়া মহাদেশের ভিতর বাঙালী জাতিকে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তারূপে জীবনধারণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এই ধরনের দশ-বিশটা ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন এককে পরিণত করিয়া তোলা অথবা তাহাদের জন্য এই ধরনের স্বাধীন একক হইবার উপযুক্ত চিন্তাপ্রণালী গড়িয়া তোলা যুবক ভারতের পক্ষে একটা সর্বোচ্চ

স্বদেশসেবা ও সমাজদর্শন বিবেচনা করিতেছি। বলা বাহুল্য, বাঙালী জাতি একমাত্র ভারতের ভিতরই যে স্বাধীন সত্তারূপে বিরাজ করিবে তাহা নহে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুনিয়ায়ও বাঙালী জাতি একটা স্বতন্ত্র সত্তারূপে ঠাঁই পাইবে। জগতের রাষ্ট্রশক্তির ভিতর বাঙালী জাতি গড়িয়া তুলিবে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-রাষ্ট্র। জগতের আর্থিক শক্তিপুঞ্জের ভিতর আর্থিক বাংলা স্বতন্ত্র এককরূপে তাহার ব্যক্তিত্ব প্রকটিত করিবে। ঠিক এইধরনেই স্বতন্ত্র আর্থিক একক ও রাষ্ট্রিক এককরূপে ভারতের অন্যান্য জাতিও নিজ নিজ জীবন গড়িয়া তুলুক, কম-সে-কম তাহাদের চিন্তা-প্রণালী এইরূপ স্ব-স্ব-প্রধান জীবনবিকাশের অনুরূপ হইতে থাকুক।

কথাটা ঢাকঢাক গুড়গুড় না করিয়া বলিয়া ফেলিতেছি। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস যেদিন হইতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেদিন হইতে ভারত, ভারতীয় ঐক্য নামক একটি বোল, ভারতবর্ষের নানাস্থানে, প্রায় সকল স্থানেই প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই ভারতীয় ঐক্যবিষয় ধারণাকে বর্তমান ভারতের নানা কর্মক্ষেত্রের উন্নতির পক্ষে বিশেষ কণ্টকস্বরূপ দেখিতেছি। এই কথা আমি পনের-বিশ বৎসর ধরিয়াই ভিন্নভিন্ন উপলক্ষে প্রচার করিয়া আসিতেছি। চীনদেশে থাকিবার সময় চীনের অবস্থা আলোচনা করিতে করিতে এই তথাকথিত ভারতীয় ঐক্যের বিশ্লেষণও বিশেষভাবে করিয়াছিলাম। একটা বিশাল মহাদেশ, যেখানে পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারী বাস করে, সেই ধরনের মহাদেশকে একটা ঐক্যগ্রথিত নরনারীর রাষ্ট্র বিবেচনা করা ইউরেশিয়ার মধ্যযুগে সুপ্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে ইউরোপের বাদশারা গোটা ইউরোপকে অথবা আধখানা ইউরোপকে অথবা সিকিখানা ইউরোপকে নিজ নিজ তাঁবে আনিয়া ঐক্যগ্রথিত ইউরোপের উপর একাধিপত্য চালাইতেন, অথবা চালাইতে চেষ্টা করিতেন। তখনকার দিনে চিন্তাবীর কবি, দার্শনিক ইত্যাদি লোকেরাও এইরূপ ঐক্যগ্রথিত ইউরোপ সম্বন্ধে আদর্শ প্রচার করিতেন। আমাদের ভারতীয় বাদশারা অনেকেই রাজচক্রবর্তী, সার্বভৌম অথবা এই ধরনের কিছু হইতে চেষ্টা করিতেন। তাহা ছাড়া ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি রাজশাস্ত্রের প্রচারকেরাও এইরূপ সর্বগ্রাসী বিশাল ঐক্যবিশিষ্ট সাম্রাজ্য কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু সেসব কি ইউরোপে, কি এশিয়ায় পাগলামি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মধ্যযুগের তথাকথিত ইউরোপীয় ঐক্য আর তথাকথিত ভারতীয় ঐক্য কথার কথা মাত্র ছিল। তাহাতে হয়তো বা সামাজিক লেনদেনে, ধর্মের আচারপ্রচারে বিশেষত বড়ঘরের কৌলীন্য-প্রথায় একটা ঐক্য বা সাম্য অতি দূরদূর দেশের ভিতরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঐক্য, নরনারীর রাষ্ট্রগত একতা ইত্যাদি বলিলে বর্তমান যুগে যেধরনের জনগণ-নিয়ন্ত্রিত স্বরাজের কথা উঠে সেসব চীজ মধ্যযুগের ইউরোপে অথবা ভারতীয় বাদশাতন্ত্রে দেখা যাইত না। সেইসব ঐক্য ছিল রাষ্ট্রীয় গোলামির আর রাষ্ট্রীয় যথেচ্ছাচারের নামান্তর মাত্র। যাহা হউক উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে এই সেকেলে ঐক্যের মায়ামৃগ আর কাহাকেও প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই।

নেপোলিয়নের পরবর্তী যুগে ইউরোপীয়ানরা বুঝিয়া লইয়াছে যে, ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই ঐক্য কায়েমী করা সম্ভবপর নহে। কাজেই তাহারা খোলাখুলি ইউরোপকে টুকরা টুকরা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন, স্ব-স্ব প্রধান স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তিতে বাঁটিয়া লইয়াছে। এই ভাগ-বাটোয়ারার কাজ যে সম্পূর্ণ হইয়াছে সেকথা এখনো বলা চলে না। এখনো বহুদিন ধরিয়া ভার্সাই সন্ধির পরেও স্বতন্ত্র-একক গড়িয়া তুলিবার অবস্থা ইউরোপে থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা আহাম্মকের মতো সেই মধ্যযুগের বুলি আর মধ্যযুগের কাজটা একালেও বেমালুম চালাইয়া যাইতেছি। তথাকথিত ভারতীয় ঐক্যের আলেয়ার পিছনে না ছুটিয়া অথবা আজকালকার তথাকথিত ফেডারেশনের খপ্পরে না পড়িয়া ভারতবাসীর উচিত ছিল সোজাসুজি ভারতবর্ষকে ভিন্নভিন্ন স্ব-স্ব প্রধান স্বাধীন শক্তিকেন্দ্রে টুকরা-টুকরা করা। ভারতে বিচক্ষণ রাষ্ট্র-সমঝদার থাকিলে তাঁহারা ভারতকে ঐক্যে গ্রথিত করিবার কথা না ভাবিয়া তাহাকে ছোট-ছোট শক্তিশালী কতকগুলো স্বাধীন দেশে পরিণত করিবার ফিকির ঢুঁড়িতে চেষ্টা করিতেন।

ভারতবর্ষ গোটা ইউরোপের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ। গোটা ইউরোপ বলিতে ইউরোপীয়ান রাশিয়াও অন্তর্গত করিতেছি। অথবা যদি ইউরোপীয়ান রাশিয়াকে বাদ দিই, তাহা হইলে ইউরোপের যতটুকু থাকে তাহার প্রায় বারো-আনা হইল আমাদের ভারত। ভারতীয় নরনারীকে যেখানে-সেখানে যখন-তখন একটা ঐক্যগ্রথিত অথবা ফেডারেলী-কৃত ভারতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে ঠিক তেমনই আহাম্মকির পরিচয় দেওয়া হয় না কি—যেমন ইউরোপের তিন-চতুর্থাংশের নরনারীকে একটা ঐক্যগ্রথিত ইউরোপীয় রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-সঙ্ঘ বা সংযুক্ত-ইউরোপ গড়িয়া তোলার জন্য প্রাণপাত করিতে বলিতে হয়? দুইটিই আমার চিন্তায় সমান বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। যেসব লোক ভারতবাসীকে এইরূপ তথাকথিত ঐক্যগ্রথিত ভারত গড়িয়া তুলিবার পরামর্শ দিয়া আসিতেছে তাহারা ভারতের বন্ধু নহে। তাহারা আমাদের স্বদেশসেবকগণকে এমন একটা পথের কথা বলিয়াছে, যে-পথে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিলেও কোনদিন কূলে আসিয়া পৌঁছানো যাইবে না। ইউরোপীয়ানরা যে-পথে চলিয়াছে সেপথে তাহারা একটা চলনসই স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। তাহাতে ইউরোপের মোটের উপর লাভই হইয়াছে। ছোট-ছোট জনপদে এই ধরনের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং আত্মকর্তৃত্বলাভই ভারতবাসীর পক্ষেও বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু যে-পথে চলিলে এইধরনের সাফল্য লাভ হইতে পারিত, সেইপথ মাড়াইতে না দেওয়াই যেন ভারতীয় ঐক্য সম্বন্ধে পরামর্শদাতাদের মতলব ছিল। ভারতীয় ঐক্যের প্রচারকেরা যদি বিদেশী হন, তাহা হইলে যে তাঁহারা আমাদের শত্রু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর যদি তাঁহারা ভারতসন্তান হন, তাহা হইলে তাঁহারা অবুঝ—এই কথাই আমি বলিতে চাহিতেছি। পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতীয় নরনারীকে এমন একটা কাজ করিতে বলা হইতেছে, যাহা ইউরোপের ঠিক ততগুলি লোক সমাধা করিতে পারে নাই। আসল কথা ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে তাহারা ইউরোপের ভিতর যে-যে কাজ, যে ধরনের কাজ প্রাণপণে এড়াইয়া আসিয়াছে—যেধরনের কাজ তাহারা কোনমতেই

যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে নাই, ঠিক সেইধরনের কাজ—একটা অসম্ভব, অসাধ্য, যুক্তিহীন কাজ—ভারতের সন্তানকে ঘাড়ে লইবার জন্য অহরহ বক্তৃতা করা হইতেছে।

আমার বিশ্বাস—আমরা ভারতবাসীরা অনেকদিন ধরিয়া রাষ্ট্রজীবনের যথার্থ বস্তু সম্বন্ধে অন্ধতা পরিপোষণ করিয়া আসিয়াছি। কতকগুলি শব্দের পিছনে ছুটিয়া তাহার গুণগান করিতে করিতে আমরা আমাদের আসল কর্তব্য ভুলিয়া গিয়াছি। এখন হইতে আমাদিগকে চোখ খুলিয়া, নিজের চোখে দুনিয়া দেখিয়া—কী সম্ভব কী অসম্ভব তাহা সম্বন্ধে গোঁজামিল না রাখিয়া, সোজা পথে কাজে নামিতে হইবে।

আজকালকার বোম্বাই প্রদেশ আয়তনে ইউরোপের ইতালি অথবা নরওয়ের সমান। আসাম প্রদেশ গ্রীসের চেয়ে কিছু বড়, চেকোশ্লোভাকিয়ার চেয়ে কিছু ছোট। মাদ্রাজ আর পোল্যান্ড আয়তনে প্রায় সমান-সমান। আর আমাদের বাংলাদেশ চেকোশ্লোভাকিয়া ও লিথুয়ানিয়া—এই দুইটি ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রের সমান। মজার কথা—একালের ইউরোপে যাঁহারা সব করিতকর্মা রাষ্ট্র-ধুরন্ধর অথবা রাষ্ট্র দার্শনিক তাঁহারা ইউনিট বা ঐক্যের স্বপ্ন দেখেন না, অথবা একটা ফেডার‍্যাল কাঠামো কল্পনা করেন না। ইউরোপকে তাঁহারা বহুসংখ্যক ইউরোপে বিভক্ত দেখিতে চাহেন, আর করিয়াছেনও তাহাই।

ইউরোপে আজকাল ত্রিশ-বত্রিশটি ভিন্ন-ভিন্ন স্বাধীন দেশ বিরাজ করিতেছে। তাহাদের কেহ বড়, কেহ মাঝারি, কেহ ছোট। ইউরোপের মতো গঠনমূলক রাষ্ট্রকৌশল যদি আমাদের থাকিত তাহা হইলে আমাদের ভারতীয় মহাদেশে কম-সে-কম দুই ডজন স্ব-স্ব প্রধান স্বাধীন জাতি বা রাষ্ট্র দেখিতে পাইতাম। ভারতবর্ষের আয়তন লক্ষ্য করিয়াই এই সংখ্যা উল্লেখ করিলাম। ইউরোপে যদি গোটা ত্রিশেক স্ব-স্ব প্রধান স্বাধীন দেশ থাকিতে পারে, আর তাহাতে যদি একটা তথাকথিত আন্তর্জাতিক হযবরল, গণ্ডগোল বা অরাজকতা বিরাজ করিতেছে এইরূপ না বলা যায়—তাহা হইলে ভারতবর্ষে গোটা চব্বিশেক স্বাধীন রাজ্য চলিতেছে এইরূপ দেখিলে দুনিয়ার কোন লোকই তাহাকে একটা অরাজকতা, গণ্ডগোল বা হযবরল বলিতে অধিকারী নয়। ইউরোপকে যে-মাপে মাপিতেছি, আমি ভারতকেও ঠিক সেই মাপেই মাপিতে চাই।

আচ্ছা, এবার আয়তনের কথা ভুলিয়া গিয়া লোকসংখ্যার কথা ধরা যাউক। প্রশ্ন এই—কতগুলি লোক থাকিলে এক-একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে? এই সম্বন্ধে কোন নিয়ম আছে কি? নাই। ইউরোপের দৃষ্টান্তে আবার আমরা ভারতের সম্বন্ধে কর্তব্য বিশ্লেষণ করিতে পারিব। বুলগেরিয়ায় প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ লোক। অর্থাৎ এক কোটিরও কম লোক লইয়া বুলগেরিয়ার নরনারী একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়াছে। তাহা হইলে ভারতের আসামী বেচারারা কী দোষ করিল? বস্তুত এইধরনের অল্পসংখ্যক লোক লইয়া আসামেও একটা স্বতন্ত্র রাজ্য কেন গড়িয়া উঠিবে না? এই মাপে বিচার করিলে বুঝিতে পারি যে, স্পেনের সমান দরের একটা রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারে আমাদের পাঞ্জাবীরা। আর গ্রেটব্রিটেনের সমান সংখ্যক লোক লইয়া মাদ্রাজীরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে অধিকারী। যুক্তপ্রদেশ আর বাংলাদেশ—দুই

মুল্লুকেই প্রায় পাঁচকোটি লোক, গ্রেটব্রিটেনের কিছু বেশি আর জার্মানির কিছু কম। কাজেই যুক্তপ্রদেশের নরনারী আর বাঙালী জাতি বেশ দুইটি বড় বড় রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে অধিকারী। ইউরোপীয়ান রাশিয়া বাদ দিলে ইউরোপের যতটুকু বাকি থাকে তাহার লোকসংখ্যা আমাদের গোটা ভারতের লোকসংখ্যার সমান। কাজেই ইউরোপের দেখাদেখি ভারতেও আমাদের লোকেরা যদি গোটা ত্রিশ-বত্রিশ স্ব-স্ব প্রধান রাষ্ট্র গড়িয়া তোলে তাহা হইলে মহাভারত অশুদ্ধ হইতে পারে না; রাষ্ট্রনৈতিক তর্কশাস্ত্রে অথবা রাষ্ট্রনৈতিক কর্তব্যজ্ঞানে ভারতবাসীকে ইউরোপীয়ানদের চেয়ে নিম্নপদস্থ বিবেচনা করা চলিতে পারে না। করিতে গেলে গা-জুরি দেখানো হইবে মাত্র। ইউরোপ-সুলভ অনৈক্যই চাই আজ ভারতে। ইউরোপীয়ান পণ্ডিত আর রাষ্ট্রিকেরা এইকথা বলিবেন না। কিন্তু এই কথা বলাই যুবক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশসেবকগণের পক্ষে একমাত্র কর্তব্য। নয়া-বাঙলার গোড়াপত্তনের কাজে সর্বপ্রথম জরুরি কাজ এই নবীন বস্তুনিষ্ঠ রাষ্ট্রদর্শন। যুবক বাঙলার স্বদেশসেবা, স্বার্থত্যাগ ও উন্নতি-নিষ্ঠা এই নবীন দর্শনের কর্মকাণ্ডে মূর্তিমন্ত হইয়া উঠুক।

ইউরোপীয় অনৈক্যের মতোই আমি ভারতে অনৈক্য চাই। বস্তুত এই ভারতীয় অনৈক্য দেখিয়া ভারতবাসীর লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

এবার আরেকটা কথা বলিব—আরো গভীর। ইউরোপের এই যে ত্রিশ-বত্রিশটি ছোট-ছোট স্বাধীন দেশ তাহাদের প্রত্যেকটার ভিতরে কোনপ্রকার ঐক্য আছে কি? বিলকুল না। অথচ আমরা ভারতে আহাম্মকের মতন বুলি আওড়াইয়া থাকি যে, ইউরোপের ভিন্ন-ভিন্ন দেশগুলি বাস্তবিক এক-একটা ঐক্যগ্রথিত দেশ। ইংরেজীতে একটা শব্দ ব্যবহৃত হয়—সেটা ঐক্যগ্রথিত অথবা একতাশীল লোকসমষ্টির প্রতিশব্দ বিশেষ। তাহাকে বলে—'নেশন'। আমাদের রাষ্ট্রিক মহলে, সাংবাদিক মহলে, সাহিত্যিক মহলে, পণ্ডিত-মহলে, সর্বত্রই একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, ইউরোপের ছোট-ছোট স্বাধীন দেশগুলি বাস্তবিকই এক-একটা 'নেশন' অর্থাৎ জীবনের সকলপ্রকার কর্মক্ষেত্রে পুরোপুরি ঐক্যবিশিষ্ট সমষ্টি। আসল কথা অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় একদম উলটা। ইউরোপের 'নৃ-তত্ত্বে' হাতেখড়ি হইবামাত্র 'চিচিং ফাঁক' হইয়া যাইবে। ইউরোপ সম্বন্ধে ইউরোপীয়ানরা আমাদিগকে যাহা কিছু শিখাইয়াছে অথবা ইউরোপ সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বুঝিয়া রাখিয়াছি কিংবা বলিয়া থাকি তাহার প্রায় আগাগোড়া ভুল। বিশেষ আশ্চর্যের কথা এই যে—ইউরোপের প্রত্যেক প্রদেশের ভিতরকার অসংখ্য অনৈক্য সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত ভারতীয় পণ্ডিত বা রাষ্ট্রিক মহলে আসল তথ্যপূর্ণ জ্ঞান জন্মিল না। এক-একটা তথাকথিত ইউরোপীয়ান নেশন-রাষ্ট্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। কী দেখিতে পাই? প্রায় প্রত্যেকটার ভিতরেই দেখিতে পাই একাধিক ভাষার প্রভাব অথবা আধিপত্য। আবার প্রত্যেকটিতে দেখিতে পাই একাধিক 'জাতির' প্রভাব অথবা আধিপত্য। 'জাতি' অনুসারে রাষ্ট্র ইউরোপের একপ্রকার কোথাও নাই। ভাষা হিসাবে রাষ্ট্র ইউরোপের একপ্রকার কোথাও নাই। প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বহু ভাষার জয়জয়কার। আবার প্রত্যেক রাষ্ট্রে বহু জাতিরও জয়জয়কার। ইহাই হইল ইউরোপের রাষ্ট্রীয় বিধানের গোড়ার কথা।

ধরা যাউক ফ্রান্স। ফ্রান্স এমন একটা দেশ যেখানে অনেক বিষয়ে কতকগুলি ঐক্য আছে। ফ্রান্সকে অনেক বিষয়ে আমরা ঐক্য-বিশিষ্ট লোকসমষ্টির সুবিস্তৃত জনপদ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। করিলে বেশি ভুল হইবে না। কিন্তু তবুও বাস্তবিক পক্ষে, ফ্রান্সের 'জাতিগত' ঐক্য বা সামঞ্জস্য নাই বলা উচিত। আছে 'জাতিগত' বৈচিত্র্য। এখানকার লোকসংখ্যা ৪,০৭,৫০,০০০। এই কিঞ্চিদূর্ধ্ব চার কোটি নরনারীর ভিতর ১৭,০০,০০০ জার্মান, ১০,০০,০০০ কেল্ট, ৬,০০,০০০ ইতালিয়ান, ২,৫০,০০০ স্পেনিস। তাহা ছাড়া অন্যান্য কুচাকাচা প্রায় ৬,০০,০০০। অধিকন্তু ফ্রান্সের যাহারা আসল 'ফরাসী' তাহাদের ভিতরও অসংখ্য 'জাতি', 'উপজাতি' রহিয়াছে।

এইবার একটা ছোট দেশের কথা ধরা যাউক—নাম বেলজিয়াম। এখানে চল্লিশ লক্ষ ফ্লেমিশ নরনারীর সঙ্গে ঘর করে ত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার হ্বালুন-জাতীয় নরনারী। তাহার উপর আছে লাখখানেক জার্মান, অধিকন্তু লাখচারেক অন্যান্য জাতীয় লোকও বেলজিয়ামে বাস করে। অর্থাৎ ফ্লেমিশ জাতীয় লোক এখানে অর্ধেকের সামান্য কিছু বেশি।

একটা প্রশ্নে নৃতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রতত্ত্বও আসিয়া পড়ে। সেটা এই—'জাতি' ('রেস') কাহাকে বলে? জাতি শব্দে কি রক্তের কথা বুঝিতে হইবে? তাহা হইলে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এত বেশি ভজকট আসিয়া পড়ে যে, তাহার কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। কেন না, পৃথিবীর প্রত্যেক জনপদের প্রত্যেক বিঘাতেই রক্ত-সংমিশ্রণ অর্থাৎ দো-আঁসলা জাতির অস্তিত্ব দেখিতে পাই। কাজেই তথাকথিত খাঁটি স্বদেশি-রক্ত নামক বস্তু পৃথিবীর কোথাও চক্ষুগোচর হয় না; সুতরাং অমিশ্র রক্তওয়ালা নরনারীর দলকে এক-একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের কেন্দ্র অথবা উপাদান বিবেচনা করিতে হইলে পৃথিবীর কোথাও 'নেশন' বা ঐধরনের একটা রাষ্ট্র বা দেশ গড়িয়া তোলা সম্ভবপর নয়। জগতের সর্বত্রই বিরাজ করিতেছে মিশ্র বা দোঁ-আঁসলা জাতি। পৃথিবীর সর্বত্রই দো-আঁসলা 'জাতি' লইয়াই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে বাধ্য। 'জাতি' শব্দটা তাহা হইলে অনেকসময় ছাড়িয়া দেওয়াই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ। তাহার বদলে হয়তো বা 'ভাষা' শব্দটা ব্যবহার করিলেও চলিবে। অথবা জাতি 'রেস' শব্দটাকে ভাষার প্রতিশব্দ-স্বরূপ ব্যবহার করিলেও অনেকসময় কাজ চলিয়া যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক—ভাষা হিসাবেও 'নেশন'-রাষ্ট্র ইউরোপে আছে কি-না। থাকিলে কয়টা আছে? ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম দুই দেশের নাম করিয়াছি। এই দুইটিই বনিয়াদি দেশ—অর্থাৎ মহা লড়াই-এর পূর্বেও ইহাদের অস্তিত্ব ছিল আর এই দেশ দুইটি নামজাদাও বটে। দেখিলাম—জাতি হিসাবে অর্থাৎ প্রকারান্তরে ভাষা হিসাবেও এই দেশ দুইটি বাস্তবিক ঐক্যগ্রথিত নেশন-রাষ্ট্র নয়।

এইবার কতকগুলি নয়া রাষ্ট্রের কথা বলিব। এইসব রাষ্ট্র লড়াইয়ের পর ইউরোপে কায়েমি হইয়াছে। লড়াইয়ের পূর্বে এইসব দেশের নাম কেহ জানিত না। বিচিত্র কথা, লড়াইয়ের খতম হইয়াছে যেসব সন্ধিতে, সেইসকল সন্ধিতে এই অর্বাচীন দেশগুলিকে তথাকথিত 'নেশন'-রাষ্ট্র নামে খুব লম্বা গলায় প্রচার করা হইয়াছে। এইরূপ তথাকথিত 'নেশন'-দেশের ভিতর

একটি আজকাল বেশ সুপরিচিত। তার নাম পোল্যান্ড। এইবার তাহা হইলে পোল্যান্ডের ভিতর একটু পায়চারি করিয়া আসা যাউক। দেখি—এখানকার নরনারীরা তাহাদের হাড়ে-মাসে কোন্ কোন্ জাতির পরিচয় দেয়। শহর-পল্লীর লোকজনের সঙ্গে একটু-আধটু গা-ঘেঁষাঘেষি করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই তথাকথিত নেশন-দেশের ভিতর খাঁটি পোলিশ হাড়মাসের লোক শতকরা মাত্র ৫২.৭; অর্থাৎ প্রায় আধাআধি লোকই এই দেশের 'খাঁটি স্বদেশী' নয়। এদেশের লোকসংখ্যা ২,৭০,০০,০০০। ইহার ভিতর শতকরা একুশ জন লোক উক্রেন রক্তের লোক, শতকরা এগারো জন ইহুদীর বাচ্চা, শতকরা ৭.৩ শ্বেতরুশ, শতকরা সাতজন জার্মান! তাহা ছাড়া অন্যান্য মোৎফারাক্কা জাতি শতকরা একজন ধরিতে হইবে।

এইবার আরেকটা নয়া রাষ্ট্রের কথা বলিব। চেকোশ্লোভাকিয়া। এই দেশটায় নামের সঙ্গেই দুই-দুইটি জাতি বা রক্ত বা হাড়মাস গাঁথা আছে। বুঝিতে হইবে যে, কম-সে-কম দুইটা ভাষা এই তথাকথিত 'নেশন'-রাষ্ট্রের গোড়া দখল করিয়া বসিয়া আছে। আসল কথা, যতরকম রক্ত ততগুলা ভাষা। এইবার দেখা যাউক এই দেশের ভিতর শহরে, পল্লীতে কোন্ কোন্ রঙের কোন্ কোন্ রূপের লোকেরা বাস করে। একটা জাতির নাম চেক্। ইহারা হইতেছে শতকরা ৪৪.৪। যে-জাতির নাম দেশটার দ্বিতীয় অংশে পাই সে জাতির অর্থাৎ শ্লোভাক রক্তের লোক এই মুল্লুকে শতকরা মাত্র ১৪.৮। ইহাই হইল তথাকথিত নেশন-রাষ্ট্রের কারচুপি। অবশিষ্ট লোকগুলি কাহারা? তাহাদের ভিতর গোটা লোকসংখ্যার শতকরা ২৭.৪ হইল জার্মান, শতকরা ছয়জন ম্যাজিয়ার।

বুঝা যাইতেছে সোজা কথা। এই যে নবীনতম রাষ্ট্র যাহার ভিতর নাকি নেশন-ধর্ম প্রচুর পরিমাণে বর্তমান, তাহাতে 'মাইনরিটি' অর্থাৎ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ নরনারীর সমষ্টি বেশ পুরু। আর মধ্যযুগে ও প্রাচীনকালে তো এইধরনের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দলের অস্তিত্ব খুব বেশিই ছিল। বুঝিতে হইবে যে, কি সেকালে, কি একালে একাধিক জাতি এবং একাধিক ভাষা প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বনিয়াদে রহিয়াছে। এসম্বন্ধে গোঁজামিল রাখিয়া চলা আহাম্মকির চূড়ান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। দুর্ভাগ্যের কথা, ভারতে আমরা এই গোঁজামিল আর এই আহাম্মকি অনেকদিন ধরিয়া চালাইতেছি। যুবক বাঙলার রাষ্ট্রবীরদের এখন উচিত তাঁহাদের মগজ হইতে এই আহাম্মকিটা ঝাড়িয়া ফেলা। সেয়ানার মতো সেয়ানার সঙ্গে কোলাকুলি করিতে অভ্যস্ত হওয়া আজ তাহাদের পক্ষে বিশেষ জরুরি। ইউরোপীয়ান পণ্ডিতদের প্রচারিত বুজরুকিগুলি শুনিবামাত্র হতভম্ব হইয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। জোরের সহিত, সাহসের সহিত পাকা-খেলোয়াড়ের মতন ইউরোপের দেশগুলি সম্বন্ধে মতামত প্রচার করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া ভারতীয় রাষ্ট্রকর্মীদের পক্ষে নেহাত আবশ্যক। বিশেষত আজ তাহাদিগকে ভারতবর্ষের মানচিত্র লইয়া বিশেষভাবে মাথা খাটাইতে হইবে। এইজন্য ইউরোপের মানচিত্রটা নখদর্পণে রাখিয়া কাজে প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। ইউরোপের মানচিত্রটা ইউরোপের রাষ্ট্রিকেরা

যেধরনে টানিয়াছে ভারতের কর্মবীরেরাও ভারতবর্ষের ম্যাপকে সেইধরনে টানিতে পারিলেই ওস্তাদির পরিচয় দেওয়া হইবে।

সোজাসুজি বুঝিয়া রাখা আবশ্যক যে, তথাকথিত জাতিগত-ঐক্য অনুসারে পৃথিবীর কোন মুল্লুকে রাষ্ট্র কায়েম করা অসম্ভব। জাতিগত ঐক্যের সূত্র অনুসারে হওয়া উচিত—যেখানে-যেখানে নয়া-নয়া ভাষা সেখানে-সেখানে নয়া-নয়া রাষ্ট্র। অথবা যেখানে-যেখানে নয়া-নয়া হাড়-মাংস বা রক্ত সেখানে-সেখানে নয়া-নয়া রাষ্ট্র। এই দুই সূত্র কার্যে পরিণত করা অসম্ভব। একথাটি ভারতবাসীকে নিরেটভাবে বস্তুনিষ্ঠভাবে ইউরোপের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। কাজেই বাংলাদেশে বাঙালী জাতি যে-রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে সেই রাষ্ট্রে কতকগুলি অ-বাঙালী জাতি ও অ-বাঙালী ভাষা থাকিবেই থাকিবে। ইহা প্রথম হইতেই বুঝিয়া লওয়া দরকার। চেকোস্লোভাকিয়ার মতো, পোল্যান্ডের মতো, বেলজিয়ামের মতো বা ফ্রান্সের মতো বাংলাদেশেও একটা রাষ্ট্র কায়েম করিতে হইলে, অ-বাঙালীর অস্তিত্ব হটানো সম্ভব হইবে না। অ-বাঙালী জাতির হাড়-মাস এবং অ-বাঙালীর ভাষা নিজের কর্মক্ষেত্রের ভিতর পুষিয়াও বাংলার নরনারীর পক্ষে একটা রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা সম্ভব। এইরূপ একাধিক ভাষা ও একাধিক জাতি লইয়া ঘর করিতে থাকিলে বাঙালী জাতিকে বিশেষরূপে নিন্দনীয় অথবা দুর্বল বিবেচনা করা চলিবে না। সংসারের অন্যান্য দেশ, জাতি বা রাষ্ট্রগুলিকে যে-মাপকাঠিতে বিচার করা হইয়া থাকে, বাঙালীজাতিকে তাহা হইতে পৃথক অথবা তাহার চেয়ে বড় বা কঠিন কোন মাপকাঠিতে বিচার করিতে যাওয়া বেকুবি অথবা 'বজ্জাতি' ছাড়া আর কিছু নয়।

এইবার তাহা হইলে ধর্মের কথা কিছু বলি। যুবক বাংলার রাষ্ট্রবীরগণ বস্তুনিষ্ঠভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, রাষ্ট্রগঠনে ধর্মের ঠাঁই সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক কিছু বুজরুকি শিখিয়াছেন। ইউরোপের নৃ-তত্ত্বে ধর্মের দম্ভল, ইউরোপীয় রাষ্ট্রে ধর্মের প্রভাব, ইউরোপের নরনারীর ভিতর ধর্মভেদ ইত্যাদি বস্তু তলাইয়া মাজাইয়া বুঝিয়া দেখা দরকার। ইউরোপে এমন কোন তথাকথিত 'জাতি'-রাষ্ট্র আছে কি, যেখানে আমরা বলিতে পারি যে, বাস্তবিক তাহাতে রাষ্ট্রের সীমানা আর ধর্মের সীমানা এক, অর্থাৎ এমন কোন রাষ্ট্র ইউরোপে আছে কি যেখানে একাধিক ধর্মের অস্তিত্ব বা প্রভাব নাই? আমাদের দেশে সাধারণত আমরা বিবেচনা করি যে, ইউরোপের দেশগুলিতে ধর্ম সম্বন্ধে ভেদাভেদ বা গোলযোগ কিছু দেখা যায় না। সেখানকার রাষ্ট্রগুলিকে সবই একধর্মাবলম্বী নরনারীর দেশ বিবেচনা করা আমাদের দস্তুর। আসল অবস্থা ঠিক তাহার উলটা। আবার আমাদিগকে শিখানো হইয়া থাকে যে, আমাদের দেশে যতদিন একাধিক ধর্মের অস্তিত্ব বা প্রভাব থাকিবে ততদিন আমাদের দেশে রাষ্ট্র বা জাতি-রাষ্ট্র বা স্বাধীনতা ইত্যাদি কিছুই আসিতে পারে না। এই মত বর্তমান যুগের সমাজদর্শনে একটি প্রকাণ্ড মিথ্যা। এত বড় বুজরুকি আমরা পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর বৎসর ধরিয়া বেমালুম হজম করিয়া যাইতেছি, ইহাতে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়। আসল কথা কী? আমরা যাহা শিখিয়াছি, আমাদিগকে যাহা শিখানো

হইয়াছে ঠিক তাহার উলটা আসল বস্তুনিষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ধরা যাউক, হাঙ্গারি দেশ—এটা একটা নয়া-রাষ্ট্র। লড়াইয়ের পূর্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। এদেশে কটা ধর্ম? খ্রীস্টান রোমান ক্যাথলিক শাখা এখনকার লোকসংখ্যার শতকরা ৬৩ জন নরনারীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। খ্রীস্টানদের প্রোটেস্টান্ট শাখা নিয়ন্ত্রিত করে শতকরা ২১.৩ জন লোককে। এভাঞ্জেলিস্ট নামক আরেক শাখা নিয়ন্ত্রিত করে শতকরা ৬.২ জন নরনারীকে। 'অর্থডক্স' (গোঁড়া) গ্রীক শাখা নামক খ্রীস্টান ধর্মের এক বড় সম্প্রদায় হাঙ্গারি দেশের শতকরা ২.১ জন লোকের ধর্মনিয়ন্তা। তাহা ছাড়া আছে ইহুদী। ইহুদীরা অখ্রীস্টান, তাহাদের আওতায় বসবাস করে শতকরা ৬.২ জন নরনারী—বাকি থাকে শতকরা একজন, তাহাদিগকে অন্যান্য ধর্মের যজমানরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। কী দেখিলাম? দেখিলাম ঘোর ধর্মবৈচিত্র্য। ভারতে আমাদের অনেকের বিশ্বাস যে, ইউরোপীয়ান দেশে ধর্ম-সংক্রান্ত গোলযোগ কিছু নাই। ইহাও ভুল। প্রথমেই জানিয়া রাখা উচিত যে, খ্রীস্টান ধর্মের আইনে ক্যাথলিক শাখার পুরুষ প্রোটেস্টান্ট শাখার নারীকে বিবাহ করিতে পারে না। যে দুই সম্প্রদায়ে বিবাহ হয় না, বলা বাহুল্য সেই দুই সম্প্রদায়ে পারিবারিক মেলামেশা আর সামাজিক লেনদেন অনেক বিষয় সঙ্কুচিত থাকিতে বাধ্য। অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে যে, পরসম্প্রদায়-বিশেষ পরধর্মের বিরুদ্ধে মতামত, নিন্দাপ্রচার ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। ইউরোপের যেকোন দেশে, শহরে অথবা বিশেষভাবে পল্লীতে যেসকল ভারতবাসী বসবাস করিয়াছে এবং কিছু ঘনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন পরিবারের সংশ্রবে আসিয়াছে তাহারাই জানে যে ক্যাথলিক পরিবারের সঙ্গে প্রোটেস্টান্ট পরিবারের সামাজিক অসহযোগ একটা প্রথম স্বীকার্য। ঝগড়াঝাঁটি কত আছে, কত খুঁটিনাটি লইয়া এই দুই সম্প্রদায়ে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, আর তাহার প্রভাব পার্লামেন্টে, নগরশাসনে, সামাজিক বৈঠকে, সাহিত্য-সমালোচনায়, সংবাদপত্রে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কতরকম ঝগড়া, চুকলি হাজির হয়, নেহাত হাঁড়ির খবর যাঁহারা না জানেন তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন না। তাহা সত্ত্বেও ওসব দেশের দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক পত্রে ক্যাথলিক-বিরোধী অথবা প্রোটেস্টান্ট-বিরোধী দল, আন্দোলন এবং মতামত যে-সে লোকের নজরে পড়ে। তাহার উপর আসিয়া জোটে ইহুদী সমস্যা। একে প্রোটেস্টান্ট-ক্যাথলিক দ্বন্দ্ব, তাহার উপর দুই-এরই বিশেষত ক্যাথলিকদের ইহুদী-বিদ্বেষ, বুঝিতে হইবে ইউরোপের প্রত্যেক দেশে, সে যত ছোটই হউক—একটা ধর্মগত ত্র্যহস্পর্শ লাগিয়াই আছে। বলা বাহুল্য, মামুলি ধর্মের বিধানে ইহুদীর সঙ্গে ক্যাথলিকের বিবাহ নিষিদ্ধ। তাহা ছাড়া খাওয়া-দাওয়ায় আর অন্যান্য সামাজিক উঠা-বসায় এক জাতি আরেক জাতির মুখ দেখে না। ইহুদী পরিবারে খ্রীস্টানদের নিমন্ত্রণ কোনদিন আমার চোখে পড়ে নাই। আবার খ্রীস্টান গৃহস্থের ঘরেও আমি বহুসংখ্যক অতিথির ভিতর একজনও ইহুদী দেখি নাই। একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, ইহুদীরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে খুব বড়। চিত্রকর, গায়ক, উকিল, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সমালোচক, সাংবাদিক আর ব্যাঙ্কার এই কয়মূর্তিতে ইহুদীরা ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে পরিগণিত। তাহা

সত্ত্বেও সামাজিক লেনদেনে ইউরোমেরিকা জাতিবিদ্বেষ ধ্বংস করিতে পারে নাই। এক হিসাবে ইহুদীদের 'জল' ইউরোপের সাধারণ খ্রীস্টান সমাজে একপ্রকার 'অচল' বলিলেই ভারতবাসী তাহাদের সামাজিক অবস্থা বুঝিতে পারিবে। বহুসংখ্যক ইউরোমেরিকান প্রোটেস্টান্ট, ক্যাথলিক ও ইহুদী পরিবারের ভিতরকার কথা আমার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অন্তর্গত। কাজেই অনেক কিছু দেখিবার শুনিবার সুযোগ হইয়াছে। ধর্মবিদ্বেষ ঐসকল দেশের একটা মস্ত বড় কথা। আর তার প্রভাব রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেও খুব বেশি। যাহা হউক, বুঝা গেল ধর্মগত ভেদ, ধর্মবিদ্বেষ, ধর্মকলহ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের ছোটছোট দেশগুলি এক-একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। অর্থাৎ ধর্মের ঐক্য স্বাধীনতার ভিত্তি নয়। ধর্মের অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীতে মানুষ স্বাধীন জাতি, দেশ বা রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ। আর তাহাই ইতিহাসের চোখে স্বাভাবিক কথা। এইসকল ধর্মগত অনৈক্য আছে বলিয়া হাঙ্গারিকে আধুনিক ইউরোমেরিকার রাষ্ট্রবীরেরা স্বাধীনতা সম্বন্ধে অযোগ্য বিবেচনা করে কি? এইসকল অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও হাঙ্গারির নরনারীকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই কি? মনে রাখা আবশ্যক, হাঙ্গারি মাত্র আশি লক্ষ নরনারীর বাসভূমি অর্থাৎ এই সামান্য সংখ্যক লোক যেখানে বাস করে সেরূপ ছোট দেশেও ধর্মের অনৈক্য গণ্ডগোল ও ঝগড়া কোঁদল প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান। আর তাহা সত্ত্বেও সেইসব নরনারীকে স্বাধীন রাষ্ট্রের নরনারী বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে।

এইসকল কথা বুঝিতে পারিলে যুবক ভারতের গঠনমূলক ভবিষ্যপন্থী কর্মবীরেরা ধর্মগত ঐক্যের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। আর তাহা হইলে দুনিয়ার ছোট বড় মাঝারি দেশে যে-প্রণালীতে ও যে-পথে রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা হইয়াছে, সেই প্রণালীতে এবং সেই পথে ভারতবর্ষেরও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন স্ব-স্ব প্রধান ছোট বড় মাঝারি রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার দিকে ভারতবাসীর মতিগতি খেলিতে থাকিবে। আর তাহা হইলেই সুরু হইবে ভারতে যথার্থ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অ, আ, ক, খ। ১৯৩২ সনের যুবক বাঙলা এই নবীন দর্শন স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছে কি? দেখা যাউক আগামী তিন বৎসরে এই প্রশ্নের কী জবাব দেয়।* □

* ৩৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আমি যেদিকেই তাকাই না কেন, বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখি। একবার কলিকাতার রাস্তায় বাহির হউন, দেখিবেন—মুটে, মজুর, মটর ও রিক্সাচালক, ঘোড়া ও গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান হইতে আমাদের ঘরের পাচক, ভৃত্য, দারোয়ান প্রভৃতি সকলেই অবাঙালী। রাস্তায় পাহারাওয়ালা, এমনকি জল ও পান-বিড়িওয়ালা পর্যন্তও অবাঙালী। ইলেকট্রিক সরঞ্জাম ও মেরামতাদি কাজে পাঞ্জাবি এবং জল, গ্যাস, ড্রেন ইত্যাদি প্লাম্বিং (plumbing)-এর কাজে উড়িয়া মিস্ত্রিদের একচেটিয়া। কিন্তু যখন বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে যাই, তখন দেখি, ঐ সমস্ত কার্যে যাহারা নিযুক্ত তাহারা সকলেই স্ব-স্ব প্রদেশবাসী। কথাটা বড় সামান্য বোধ হয়, কিন্তু গত আদমসুমারীর রিপোর্ট দেখিয়া বুঝা যায় যে, কেবল শ্রমজীবিগণ প্রতি মাসে মনিঅর্ডার যোগে পাঁচ-সাত টাকা করিয়া প্রতি বৎসরে বাংলা ও আসাম (প্রধানত বাংলা) হইতে সাত-আট কোটি টাকা উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিমে পাঠায়। ইহা হইল প্রথম কথা।

দ্বিতীয়ত, সকাল ৮টা হইতে বেলা ১০টা বা ১১টা অবধি একবার হাওড়ার পুলের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দেখিবেন, পিল্-পিল্ করিয়া পিপীলিকা সারির মতো বাঙালীবাবুরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছেন, যেহেতু সময়মতো অফিসে হাজিরা দেওয়া চাই-ই। এইসময় শিয়ালদহ স্টেশনেও একদিকে রানাঘাট, অপরদিকে দক্ষিণে জয়নগর ও মগরাহাট হইতে আগত ডেলি প্যাসেঞ্জাররূপ মসিজীবিগণকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে দেখা যাইবে। কিন্তু একবার স্ট্র্যান্ড রোডে, বিশেষত ক্লাইভ স্ট্রীটের দিকে তাকান, দেখিবেন, বড় বড় অফিস, রয়াল এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির গগনভেদী অট্টালিকা। ইহার ভিতর বাঙালীবাবুরাও যাতায়াত করিতেছেন কিন্তু কেরানীভাবে। আর এই সমুদয় সওদাগর অফিস ও ব্যাঙ্কে, মারোয়াড়ি, ভাটিয়া (ইউরোপীয়গণের তো কথাই নাই) প্রভৃতি যাতায়াত করেন ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে এবং তাঁহারাই এইসকল অফিসের মালিক। এইসকল ব্যাঙ্কে প্রতিদিন যে লাখ-লাখ টাকা এবং কোনদিন বা ক্রোর টাকার আদান-প্রদান হয়, ইহার মধ্যে খুব কম টাকারই বাঙালীর চেক পাইবেন, প্রায় সকল চেকই অবাঙালী ও ইউরোপীয়গণের।

এখন একবার বড়বাজারের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সেখানে বড় বড় কুঠিতে মারোয়াড়ি ও ভাটিয়াগণ বিরাজ করেন এবং সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁহাদের করতলগত। পুনর্বার চিত্তরঞ্জন এভিনিউর দিকে লক্ষ্য করুন, দেখিবেন, উভয় পার্শ্বে ৫তল ৭তল হর্ম্যশ্রেণী। ইহার ভিতর কদাচিৎ পৈত্রিকসূত্রে দুই-একটি বাঙালীর বাড়ি দেখা যায়। সম্প্রতি যে বিবেকানন্দ

রোড হইয়াছে, তাহাতেও এইপ্রকার অবাঙালীরা অবস্থান করেন। কদাচিৎ কখনো বা ভুলক্রমে দুই-একটি বাঙালীর বাড়ি দৃষ্টিগোচর হয়।

এতদ্ভিন্ন যেসকল রপ্তানি ব্যবসায় আছে, যেমন ধরুন কোটি-কোটি টাকার কাঁচা চামড়ার ব্যবসায় ইত্যাদি, সেসমস্তও অবাঙালীর একচেটিয়া অধিকারে।

আমার এইসমস্ত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এবং আমার আত্মচরিতে দফায় দফায় দেখাইয়াছি যে, এইপ্রকারে প্রতি মাসে বাংলা হইতে অবাঙালী কর্তৃক অন্যূন দশ কোটি টাকা অর্থাৎ বৎসরে একশত বিশ কোটি টাকা শোষিত হইয়া বাংলার বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে—প্রধানত বোম্বাই, বিহার ও উত্তর-পশ্চিমে চলিয়া যায়। এই তো গেল অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান বাংলার প্রধান শহর তথা কলিকাতা বন্দরের কথা।

এখন একবার মফঃস্বলের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। পূর্বনঙ্গ বিশেষত উত্তরবঙ্গের রেলওয়ে স্টেশন ও বহতানদীর তীরস্থিত বন্দরে যান, দেখিবেন, কোথাও বা স্টীমার এবং কোথাও বা শত শত বহরের পাট বোঝাই হইয়া রেলওয়ে মালগাড়িতে চালান হইতেছে। গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, সরিষাবাড়ি, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানের স্টীমার ও বহর হইতে রেলগাড়িতে এবং রেলওয়ে হইতে স্টীমার ও বহরে আমদানি মালের নামান উঠান প্রভৃতি সমস্ত কাজই কয়েক সহস্র পশ্চিমা কুলির একচেটিয়া দখলে। এইসমস্ত পাট বা অপর ক্ষেত্রজ পণ্য, যেমন ধান, চাউল, সরিষা এবং নদীয়া মুর্শিদাবাদের ভূষিমাল অর্থাৎ কলাই প্রভৃতি সমস্তই অবাঙালীর করতলস্থ। অবশ্য এখনো সাহা, তিলি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের হাতে ইহার কিছু কিছু ব্যবসা আছে, কিন্তু তাহাও দিন দিন তাহাদের হাত হইতে অপসারিত হইতেছে। এই তো গেল কেবলমাত্র রপ্তানি ব্যবসায়ের কথা। ইহা ছাড়া পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে যত পারঘাটা (ফেরিঘাট) আছে, উহা সমস্তই পশ্চিমাদের দখলে। আমি অনেক সময় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানদিগের নিকট অভিযোগ করিয়াছি যে, কেন এই সমুদয় পারতপক্ষে বাঙালীদের দেওয়া হয় না? কিন্তু সর্বত্রই এক উত্তর পাইয়াছি যে, বাঙালী ওয়াদামতো তো টাকা দিতেই পারে না বরং আদায়ী টাকা খাইয়া ফেলে!

এখন আমদানি পণ্যের বিষয় উল্লেখ করা যাউক। ম্যাঞ্চেস্টার, জাপান ও বোম্বের বস্ত্রাদি ও যাবতীয় লৌহ-নির্মিত মাল—যেমন কড়ি, বরগা, এ্যাঙ্গল (angle), করোগেট, কেরোসিন তৈল, কলের তৈল, নারিকেল তৈল, চিনাবাদাম ও মহুয়ার তৈল, চিনি, মশলা এবং বিলাসের দ্রব্য—যথা মোটরগাড়ি, সাইকেল, সিগারেট, সিনেমার ফিল্ম প্রভৃতি কোটি কোটি টাকার মাল সমস্তই ইউরোপীয়, মারোয়াড়ি প্রভৃতি অবাঙালীর করায়ত্তে। এইপ্রকারে দেখা যাইতেছে যে, কয়েক শত কোটি টাকার ব্যবসা হইতে বাঙালী নিজ কর্মদোষে ও ঔদাসীন্যে বঞ্চিত। এককথায় বলিতে গেলে, ৬০।৬৫ বৎসর পূর্বে কবি যে বলিয়াছিলেন, "*নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে*", ইহা অন্য অর্থে এখন প্রকৃতই বাঙালীর প্রতি প্রযোজ্য।

এতক্ষণ আমি অর্থনীতির দিক দিয়া বলিতেছিলাম, এখন একবার সমাজ-সংস্কারের দিক দিয়া কিছু বলিব। একথা বোধহয় সকলে স্বীকার করিবেন

যে, বাংলাদেশ পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রণী এবং এখানে মহাত্মা রামমোহনের সময় হইতে ঈশ্বরচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহারা সমাজের পূর্ণ ব্যবস্থার জন্য তীব্র আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু এখনো অস্পৃশ্যতা, মন্দির-প্রবেশে অনধিকার প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি আমাদের সোনার বাংলা কলুষিত করিতেছে। একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি বিড়াল মরা-ইন্দুর উদরস্থ করিয়া এবং আঁস্তাকুড় ঘুরিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতেছে এবং আগন্তুক জামাইয়ের পাত হইতে মাছের মুড়া মুখে করিয়া দৌড় মারিতেছে। ইহাতে হাঁড়ি-কুড়ি ও জলের কলসি ফেলা যায় না। কিন্তু যদি তথাকথিত কোন অস্পৃশ্য লোক চৌকাঠের সীমানা অতিক্রম করিয়া রন্ধনগৃহে পদার্পণমাত্র করে, তাহা হইলে রন্ধনপাত্রাদি ও জলের কলসি অপবিত্র হয় বলিয়া গোঁড়া হিন্দুগণ তাহা ফেলিয়া দিতে ক্রটি করেন না। আমি বলিয়া থাকি যে, এই হতভাগ্যদের দেহ হইতে অস্পৃশ্যতারূপ বিষ বিকীর্ণ হইয়া অর্জুনের শর-সন্ধানের ন্যায় সেই রন্ধনপাত্রে প্রবেশ করে কি? মনস্বী স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম এখন জলের কলসি ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। ছুঁৎমার্গরূপ মহাব্যাধি আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। বাস্তবিক আমার বলিতে লজ্জা হয় যে, এইসমস্ত ব্যবস্থাদি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এখনো আমাদের মধ্যে দেশাচাররূপে প্রচলিত রহিয়াছে। এই কথা ভাবিলে আমাদের শত ধিক্কার আসে। এই কি আমাদের উন্নত শিক্ষার ফল?

আরেকটি কথা। প্রতি ১০ বৎসর অন্তর যে আদমসুমারি হয়, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, এই বাঙালী হিন্দু জাতি তাহাদের লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক নিয়মাদির প্রভাবে কেন সংখ্যায় হ্রাস পাইতেছে এবং মুসলমানগণই বা কেন সংখ্যায় ক্রমাগত বাড়িতেছে। আমাদের বিবাহাদি বিষয়ে কঠোরতা যদি শিথিল না করা হয়, তাহা হইলে হিন্দু এইরকম কমিতে কমিতে একেবারে লোপ পাইবার আশঙ্কা আছে। ৩০ বৎসরের অধিককাল হইল উপেন্দ্রনাথ মুখার্জী (Col. U. N. Mookherjee) "বাঙালী ধ্বংসোন্মুখ জাতি" শীর্ষক প্রস্তাবে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং ইদানীং রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ইহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু কে কার কথা শুনে? এই অচলায়তনের প্রাচীর না ভাঙিতে পারিলে বাঙালী হিন্দুর বাঁচিবার আর আশা নাই। অবশ্য ইহা আমি কখনো বলিতে চাহি না যে, সব একেবারে ভাঙিয়া-চুরিয়া অসংযত উচ্ছৃঙ্খল সামাজিক নিয়মাদির প্রচলন করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, একদিকে যেমন বাঙালীর আয় কমিতেছে, অপরদিকে তদনুপাতে অতিরিক্ত ব্যয় ও বিলাসিতা বাড়িতেছে। আমাদের ছেলেবেলায় কোন আসর বা মজলিসে এক ছিলিম তামাক দিলে বারো চৌদ্দজনে ধূমপান করিত। কেহ-বা একটি পাতার নল করিয়া নিজের আভিজাত্য রক্ষা করিত। ইহাতে প্রথমত তামাকের নিকোটিন নামক বিষাক্ত পদার্থ নলিচা বহিয়া হুঁকার খোলের জলের ভিতর পরিত্যক্ত হইত। দ্বিতীয়ত এক ছিলিম তামাকের দামই বা কত? গৃহে সেবনীয় তামাক কাটিয়া ঝোলাগুড়ের সঙ্গে মাখিয়া প্রস্তুত করা হইত। তদ্দ্বারা এক ছিলিম তামাকে বোধহয় এক পয়সার বার ভাগেরও একভাগ দাম পড়িত

না, অথচ কত লোকের মনস্তুষ্টি হইত। কিন্তু এখন সিগার ও সিগারেটের প্রচলন এবং চা-পানের অভ্যাস যে-পরিমাণে বাড়িতেছে, তাহা দেখিলে ভয় হয়। অনেকে এমনকি কেরানী পর্যন্তও প্রতিদিন এক প্যাকেট সিগারেট এইপ্রকারে উড়াইয়া দেন। ইহাতে একদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে পাঠান হয় এবং অপরদিকে স্বাস্থ্যের প্রভূত হানি হয়। আমি বিড়ির কথা বলিব না, কেননা ইহার ব্যবহার তথাকথিত সভ্যতার বাহিরে। এইজন্য ইহা সাধারণত মুটে মজুর ও গাড়োয়ানের মধ্যে প্রচলিত। এই প্রসঙ্গে সিনেমা দেখার বাতিক উল্লেখযোগ্য। "This curse is ruining us morally, economically and physiologically." এই অভিশাপ আমাদের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিক ধ্বংস সাধন করিতেছে। সিনেমা দর্শকগণ আবদ্ধবায়ুতে অবস্থানের জন্য স্বাস্থ্যহীন হইতেছে, উজ্জ্বল আলোকে ক্ষীণদৃষ্টি হইতেছে এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণের ছবি দেখিয়া নৈতিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিক অধঃপতন বরণ করিয়া লইতেছে। ইহার উপর বেশভূষার তো কথাই নাই।

বাঙালী এখন যাহা কিছু করে তাহা পেটের উপর বাণিজ্য করিয়া। কথায় বলে, 'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন'। এখন শিক্ষিত বাঙালীর মাসিক ৪০।৫০ টাকা আয় হওয়া কঠিন, নাহয় একশত টাকাই হইল। আজকাল কলিকাতায় যেপ্রকার বাড়ি ভাড়া বাড়িয়াছে, তাহাতে এই শ্রেণীর লোক এঁদো বাড়িতে আলো-বাতাস বিবর্জিত সেঁতসেঁতে ঘরে বাস করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে স্বাস্থ্যের যে কী প্রকার অপচয় হয় তাহা সরকারি দপ্তরখানা হইতে প্রকাশিত জন্ম-মৃত্যুর হিসাব-নিকাশের খতিয়ান দেখিলেই বুঝা যায়। কলিকাতা শহরে জন্মিবার এক বৎসরের মধ্যেই শতকরা ৩৩জন শিশু মারা পড়ে। আর বাকি শিশুরা রুগ্ন অবস্থায় আধমরা হইয়া বাঁচিয়া থাকে।

এইজন্য দেখা যায় যে, ক্ষয়-রোগ (Tuberculosis) সমাজের মধ্যে অতি ভীতিপ্রদ বেগে বিস্তার করিতেছে এবং সমগ্র জাতিকে সমূহ ধ্বংসের দিকে লইয়া চলিয়াছে। এমনকি এই ভীষণ ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া সুদূর পল্লীগ্রামেও বিস্তার লাভ করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ, অপুষ্টিকর খাদ্যজনিত শারীরিক ব্যাধিপ্রবণতা, মুক্ত বাতাস ও সূর্যকিরণের অভাব এবং তৎসঙ্গে অনিয়মিত অসংযত জীবনযাপন।

বাঙালী কেন যে এই কঠোর জীবন-সংগ্রামে দিন-দিন হটিয়া যাইতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, আমরা বাল্যকাল হইতেই উপরচালাকি বা ফাঁকিদারি দ্বারা কাজ ফতে করিতে চাই। রীতিমতো পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জন করা যেন এখন রেওয়াজের বাইরে। "ওরে! তুই কি বাঙাল যে ওদের ন্যায় গাধার মতো খাটবি? পরীক্ষকের চোখে ধুলো দিয়ে পাশ করতে জানিস নে?" কলিকাতার ছেলেরা এই কথা হামেশা বলিয়া থাকে। আমাদের ছেলেবেলায় অভিধান দেখিয়া প্রত্যেক কথার মানে স্থির করিয়া লইতাম। এমনকি ওয়েবস্টারের অভিধান ও প্রকৃতিবাদ অভিধান দেখা আমাদের প্রথা ছিল। কিন্তু এখন সমস্তই রাজকীয় পথ! সব সময়েই মানের বই বা নোটের শরণাপন্ন হওয়া এখন প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করার আগে উহার বড় বড় নোট-বুক সংগ্রহ করা হয়।

কথায় বলে "বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি!" পাঠ্য-পুস্তক অপেক্ষা নোট-বুকের কদর বেশি দেখিয়া এই প্রবাদ-বাক্য সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহা ছাড়া পাঠ্য-পুস্তক পড়া তো একরকম উঠিয়াই গিয়াছে। সহজ (Made Easy), সংক্ষেপ (Abridged), সংক্ষিপ্ত চিত্র (Brief outline) বা টীকা-টিপ্পনি পড়িয়াই কাজ হাসিল করা হয়। কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক যদি একটু বেশি রকমের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে ছেলেরা অধৈর্য হইয়া উঠে এবং সে অধ্যাপক অপ্রিয় বা ছাত্রদের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। সুতরাং অধ্যাপককে সামলাইয়া চলিতে হয়। নতুবা যে-দিনকাল, ছাত্রদের ধর্মঘটেরও ভয় আছে। "ও মশায়, ওসব বাজে বিষয় পড়ান কেন? ওতো পরীক্ষার পাশে লাগবে না,"—এরূপ কথা ছাত্রদের মুখে লাগিয়াই আছে। যে-শিক্ষক যত নোট দিতে পারেন তিনি ছাত্রসমাজে তত প্রশংসার ভাজন হন। এইরূপ গোড়াতেই কাঁচা থাকার দরুন প্রকৃত শিক্ষা হয় না। ছাত্রেরা কেবলমাত্র পল্লবগ্রাহী হইয়া পড়ে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইহাতেই পাওয়া যায় যে, এখন বাঙালী গ্র্যাজুয়েটগণ মাদ্রাজী, মারহাট্টী, পাঞ্জাবী প্রভৃতিদের সঙ্গে নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতেছেন। আজকাল আই.সি.এস., হিসাবরক্ষকের কার্য (Accountantship), আয়-ব্যয় বিভাগ ও রেলওয়ে বিভাগের উচ্চপদ সমস্তই ঐসমস্ত প্রদেশবাসিগণ একপ্রকার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। ইহার ফলস্বরূপ এই বাঙলাদেশেই অনেক ম্যাজিস্ট্রেট, সাবডিভিশনাল অফিসার, হাকিম প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশবাসী।

কথায় বলে, 'যত চতুর তত ফতুর!' কাক মনে করে বড় চতুর কিন্তু সকলের বিষ্ঠা খাইয়া মরে! আমার বাল্যকালে মারোয়াড়ি প্রভৃতিকে 'ছাতুখোর' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইত! উড়িয্যাবাসীকে 'ল্যাজবিহীন জন্তু' বলা হইত বা ভেড়ার সঙ্গে তুলনা করা হইত! কিন্তু এই তথাকথিত 'ছাতুখোরদের' নিকট আজ বাঙালী যে সমস্ত ব্যবসা ও বাণিজ্য হইতে একপ্রকার পরাভূত ও বিতাড়িত তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আর এই তথাকথিত 'ল্যাজবিহীন জন্তুরাই' (উড়িয্যাবাসীরা) আজ অনেক বিষয়ে উন্নত হইয়া বাঙালীর উপর টেক্কা দিতেছেন। কোন বাঙালী যুবককে যদি বলি যে, আর চাকরির আশা করিও না, ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টা কর, সে অমনি মুখের উপর উত্তর দিবে ঃ "মশায়, ব্যবসা করব যে, ক্যাপিটাল (মূলধন) পাবো কোথায়? মূলধন আপনি যোগাড় করে দেবেন?" উত্তর শুনিয়া মনে হয় যেন সোনার-চাঁদ যদি একতোড়া টাকা পান তাহা হইলেই ব্যবসায়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন। তিনি ভুলিয়া যান যে, কত কঠোরতা, দৃঢ়তা ও একাগ্রতা অর্জন করিলে ব্যবসায়ে বা কারবারে সাফল্যলাভ করা যায়। মারোয়াড়ি বা পশ্চিমা বালক নয়-দশ বৎসর হইতে তাহার পিতা বা অভিভাবকের নিকট হাতে-কলমে শিক্ষানবিশী করিয়া ব্যবসায়ের সকল সন্ধান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। মারোয়াড়ি বা পশ্চিমারা প্রথমত পাঁচ-সাত শত টাকার মাল, যেমন কাপড় বড়বাজার হইতে পিঠে করিয়া রেলওয়ে স্টেশনে আনে ও সঙ্গে লইয়া যায়, এবং রেল হইতে নামিয়া—যেমন গোয়ালন্দে, পুনরায় পিঠে কাপড় লইয়া স্টীমারে উঠে। তাহার পর ধরুন, নারায়ণগঞ্জে আবার স্টীমার হইতে নামিয়া রেলে উঠে, পরে রেল

হইতে নামিয়া তাহারা সেই কাপড় পিঠে করিয়া গ্রামে গ্রামে ফেরি করিতে আরম্ভ করে এবং অতি সুলভে—প্রায় কলিকাতার দরে জিনিস বিক্রয় করিতে থাকে। দিনান্তে তাহারা দুই-তিন পয়সার ছাতু খাইয়া কাটায়। কিন্তু ব্যবসা করিতে হইলে প্রথমেই বাঙালী যুবক দুই-চারি হাজার টাকার মাল আনিতে বাধ্য হয় এবং দোকানপাট করিয়া শুরু করে। তাহাকে ঘরভাড়া, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, লাইসেন্স, কর্মচারীর মাহিনা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি সাজসরঞ্জামের জন্য ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং সে টাকায় অন্যূন দুই আনা মুনাফা না করিয়া মাল ছাড়িতে পারে না। কাজেই মারোয়াড়িদের নিকট প্রতিযোগিতায় সহজেই পরাস্ত হয়। এই শ্রেণীর ব্যবসায়ী যুবক অনেকেই বলেনঃ "মশায়, কী দুঃখের বিষয়, বাঙালী বাঙালীকে ছেড়ে মারোয়াড়ি বা পশ্চিমাদের কাছে জিনিস ক্রয় করে। এ-জাতির উন্নতি কিসে হবে?" কিন্তু নিজে যে অকর্মণ্যতা ও বিলাসিতার জন্য তাহাদের ন্যায় সুলভে জিনিস দিতে পারে না, তাহা দেখে না। মারোয়াড়ি ও ইংরেজরা খরিদ্দারকে লক্ষ্মী মনে করে এবং তাহাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে। খরিদ্দার যদি অযথা হয়রানিও করে, তথাপি কিছু বলে না। আশা রাখে যে, আজ না কিনিলেও আরেকদিন কিনিতে পারে। কিন্তু বাঙালী দোকানদারের সে ধৈর্য নাই। সে সহজে খরিদ্দারের সঙ্গে ভদ্র-ব্যবহার রাখিতে পারে না।

মারোয়াড়ির যে-প্রকার কষ্টসহিষ্ণুতা আছে, তাহার দশভাগের একভাগও বাঙালীর নাই। সে যত অল্পখরচে চালাইতে পারে, তাহা বাঙালীরা কখনো পারে না এবং সেজন্য মারোয়াড়ি কখনো মূলধন ভাঙিয়া মহাজনকে ডুবায় না। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব হইতেই মারোয়াড়ি ও পশ্চিমারা বাংলাদেশে আগমন করিয়াছে। এমনকি তিন চারিশত বৎসর পূর্বেও জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে জৈন-মারোয়াড়িগণ আড্ডা গাড়িয়াছে এবং এখনো পুরুষানুক্রমে ব্যবসালব্ধ ধন দ্বারা বড় বড় জমিদারি ক্রয় করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। তাহাদের পূর্বপুরুষেরা একসময়ে লোটা-কম্বল সঙ্গে করিয়া বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। আমি দেখিয়াছি যে, সুদূর সিকিম ও ভুটানের প্রান্তদেশে গ্যাংটকের মতন জায়গায় মারোয়াড়ি বণিক গাধা, খচ্চর বা তিব্বতী ঝব্বুর পৃষ্ঠে মাল চাপাইয়া গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরস্থ অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়া বাঘ ভালুকের ভয় না রাখিয়া ব্যবসা করিতে শুরু করে এবং অচিরে ধনশালী হইয়া উঠে। শুধু কলিকাতা শহরে নয়, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট প্রভৃতি মফঃস্বল শহরেও যত 'সেলাই জুতি' সকলেই বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসে, কিন্তু আমাদের দেশের চর্মকারগণ ঐসব শহরের প্রান্তে হীন অবস্থায় ভিক্ষাজীবি হইয়া অতি কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাঙালীরা হিন্দু-মুসলমান, ইতর-ভদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেই আলস্যপরায়ণ ও শ্রমবিমুখ। এমনকি পূর্বে কলিকাতায় গঙ্গার ঘাটে পূজার্চনার জন্য বাঙালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষৌরকর্মের জন্য বাঙালী নাপিত মিলিত, কিন্তু এখন সেখানেও বাঙ্গালীরা কুঁড়েমির জন্য পশ্চিমা—নাহয় উড়িয়া ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়িয়া বাঙালী যজমানের পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-শান্তি করে ও পশ্চিমা-নাপিতে বাঙালীর ক্ষৌরকর্মাদি ও অঙ্গমর্দন করে। আমি হামেশা এই কলিকাতা শহরে দেখি,

কোন বাঙালী ভদ্রলোক বা যুবক একটি গঙ্গার ইলিশ মাছ গঙ্গার ঘাট বা কোন বাজার হইতে ক্রয় করিয়া তাহা হাতে করিয়া আনিতে নারাজ। এর জন্য হয় মুটে এবং আজকাল রিক্সা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। আমার স্নেহভাজন রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের নিকট জানিতে পারিলাম যে, সে কয়েকদিন আগে দেখে যে, বাগবাজারের ঘাটে গঙ্গার ইলিশ ক্রয় করিয়া একটি সুসভ্য যুবক বাসে উঠিল মাত্র গ্রে স্ট্রীটের মোড়ের আগে নামিবে বলিয়া। এইটুকু পথ না হাঁটিয়া বৃথা তিন পয়সা খরচ করিল। ইহা অপেক্ষা আলস্য ও অযথা পয়সা খরচের আর কী দৃষ্টান্ত হইতে পারে?

আরেকটি কথা। আমার বাল্যকালে অর্থাৎ ৬০।৬৫ বৎসর পূর্বে ভবানীপুর ও চেতলা প্রভৃতি স্থান হইতে জেনারেল এসেমব্লি বা বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ ও ডাফ কলেজ বা ফ্রি চার্চ কলেজে (যাহা নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে অবস্থিত ছিল) ছাত্রগণ অবাধে দুইবেলা পদব্রজে যাতায়াত করিয়া অধ্যয়ন করিত। কিন্তু আজকাল ট্রাম ও বাসের ছড়াছড়ি। এখন বালক বা যুবকগণ এক মাইল হাঁটিতে হইলে বিভীষিকা দেখে, কাজেই এক আনা দিয়া বাসে চড়িয়া বসে। আমি অনেক বিলাতি চিকিৎসকের স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। তাঁহারা অভিযোগ করেন যে, বিলাতে কেরানিগণ সমস্তদিন আবদ্ধ বায়ুর ভিতর পরিশ্রম করিয়া যখন গৃহের দিকে ফিরেন, তখন দেখেন মোড়ে মোড়ে ট্রাম বাস ও টিউব বা সুড়ঙ্গের মধ্যে রেল, এবং এজন্য পদব্রজে বাড়ি ফিরিবার পরিশ্রম করিতে বিমুখ হন। ইহার ফলে কোনপ্রকার শারীরিক পরিশ্রম হয় না। যদি খোদ বিলাতেই এইরূপ হয়, তবে আমাদের দেশে ইহা আরো কত অনিষ্টকর। এখানে আমরা বাল্যকালে দেখিতাম যে, বাগবাজার অঞ্চল হইতে লালদীঘি বা হাইকোর্টে প্রত্যহ অসংখ্য কেরানী হাঁটিয়া যাতায়াত করিতেন, কিন্তু এখন হয় বাসে নয় ট্রামযোগে অফিস করেন। ইহাতে পয়সা ও স্বাস্থ্য দুই-ই নষ্ট হয়। আর এইসমস্ত বাসের মালিক, ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর সকলেই অবাঙালী—পাঞ্জাবী। শুনিতে পাই, তাহারা বাঙালী যাত্রীদের উপর অনেক দুর্ব্যবহার করে। ইহাও দেখিতেছি যে, এইসকল পাঞ্জাবীরা ভবানীপুরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তাহারা পারতপক্ষে বাঙালীর কোন জিনিস কেনে না, এমনকি সুদূর পাঞ্জাব হইতে ডাক্তার ও ধোপা-নাপিত পর্যন্তও আমদানি করিয়াছে। অথচ সেই বাসেই চড়িতে হইবে। এইপ্রকারে ছয় পয়সা করিয়া বার-পয়সা প্রত্যহ ব্যয় হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখি যে, এই স্বল্পবেতনভুক কেরানীর ছেলেপিলের হয়তো সকালে-বিকালে এক পয়সার মুড়িও জোটে না।

আরেকটি কথা। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে এখনকার নব্যতন্ত্রের কি বালক, কি বালিকা, কি যুবক, কি যুবতীর সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়; প্রতি বৎসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যে স্বাস্থ্য-বিবরণী বাহির করা হয়, তাহা পাঠ করিলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। স্কুল ও কলেজের ছেলেদের মধ্যে শতকরা বেশিরভাগ ছাত্রেরই দাঁত ক্ষয়িষ্ণু, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, হজমশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত, বক্ষদেশ অপ্রশস্ত। ইহা ছাড়া অনেকের ম্যালেরিয়া-বর্ধিত প্লীহা, নানাপ্রকার ব্যাধিজনিত এবং অপুষ্টিকর আহারের (Malnutrition) জন্য শারীরিক দুর্বলতাও

আছে। যদি অল্পবয়সেই ছাত্রেরা এইরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য হয়, তাহা হইলে যখন সাংসারিক জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, তখন কী প্রকারে ইহারা এই ভীষণ প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিবে? কথায় আছে, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।" আজকাল শারীরিক ব্যায়ামের বড়-বড় কথা শুনি। আমি আজ ২৭।২৮ বৎসর নিত্য ময়দানে বেড়াই। প্রত্যহ প্রায় দেড়-দুই ঘণ্টা কাটাই। ইডেন গার্ডেনেই বলুন, আর প্রিন্সেপ্সঘাটেই বলুন, আজকালের রেওয়াজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংলগ্ন ময়দানের কথাই ধরুন, সব জায়গায় দেখি, মারোয়াড়ি ও ভাটিয়াগণ দখল করিয়াছে। আজকাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বেড়াইবার পক্ষে বেশি ফ্যাসান হইয়াছে। সেখানে রাস্তার দুইধারে মোটরগাড়ি কাতার দিয়া দাঁড়ায় এবং ভাটিয়াগণ অর্থাৎ গুজরাটবাসিগণ—যাঁহাদের মধ্যে কোন পর্দা-প্রথা নাই, তাঁহারা সস্ত্রীক ঐস্থানে পদব্রজে বেড়ান, কিন্তু কদাচিৎ দুই-একখানা বাঙালীর মোটর দেখি। আবার অতি প্রত্যূষে শত-শত মারোয়াড়ি ও ভাটিয়াগণ তথায় খুব দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ান ও এইরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করেন, কদাচিৎ বা বাঙালী দেখা যায়। কিন্তু ক্রিকেট বা ফুটবল প্রতিযোগিতায়—বিশেষত যদি মোহনবাগান বনাম কলিকাতা বা মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ইত্যাদির খেলা হয়, তখন কিন্তু ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বাঙালী দর্শকের সমাবেশ হয়। খেলোয়াড় তো মাত্র ১১জন বনাম অপর ১১জন। আবার ইহার মধ্যেও অনেক খেলোয়াড় ভাড়াটিয়া। প্রতিদিন যে দর্শনি (Gate-money) সংগ্রহ হয়, তৎসহ আনুষঙ্গিক বাস ও ট্রামের ভাড়া ধরিলে সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রতি খেলায় ব্যয়িত হয়, অর্থাৎ পরের মুখে ঝাল খাইয়া নিজের তৃপ্তি লাভ হয়! অথবা যেমন সিনেমাতে 'All quiet on the Western front'-নামক গ্রন্থ অবলম্বনে চলচ্চিত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি দেখিয়া বাঙালীবাবুরা তাহাতে ভাগ লইতেছেন মনে করিয়া বীরত্বের আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

আমি প্রায় প্রতি বৎসরই একবার করিয়া ঢাকায় যাইয়া থাকি এবং রমনাতে অবস্থান করি। এই বয়সেও প্রত্যহ ৫ ঘটিকার পূর্বে প্রত্যূষে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া সেখানে একবার প্রশস্ত রাস্তা ও বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে চক্র দিয়া আসিতাম। সেইসময় দেখিতাম যে, ইহার চারিদিকে ঢাকা-হল, জগন্নাথ-হল, মোসলেম-হল প্রভৃতি হোস্টেলে বা ছাত্রনিবাসে শ্রীমানেরা তখনো নিদ্রার ক্রোড়ে মগ্ন। কদাচিৎ তাঁহারা এইপ্রকারে প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করেন। কিন্তু কোন ক্রিকেট ম্যাচ থাকিলে তখন বাজার একেবারে নরক গুলজার! সে তো পরস্মৈপদী, অপরে খেলিবে যাহা কিছু পরিশ্রম করিবে, নিজেদের কেবল হুজুগে তৃপ্তিলাভ! ফলকথা যেদিক দিয়া দেখি না কেন, বাঙালী পুরুষের—বিশেষত মহিলাগণের স্বাস্থ্য দিন দিন অবনত হইতেছে।

এইসব ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি এই বৃদ্ধ বয়সে এক-একসময় অবসন্ন হইয়া পড়ি। ভাবি, হায়! বাঙালীর কি এই পরিণাম! বাঙালী জাতি কি এইভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দিন-দিন পরাজিত ও পশ্চাৎপদ হইয়া একেবারে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইবে? বাঙালী কি এইভাবে নিজ বাসভূমে পরবাসী, পরাশ্রয়ী, পরপ্রত্যাশী হইয়া হ্রাস পাইতে পাইতে জীবন-সংগ্রামে হটিয়া শেষে বিনষ্ট হইবে? তবে যেন একটু আশার সঞ্চারও হইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের

দিকে এখন বাঙালীর একটু একটু জাগরণ লক্ষ্য হইতেছে। ইদানীং চারি-পাঁচ বৎসরের মধ্যে অন্যূন বারটি কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে, আরো দুই-তিনটি স্থাপিত হইতে চলিয়াছে এবং অন্যান্য ব্যবসাক্ষেত্রেও বাঙালীর কিছু কিছু প্রতিপত্তি দেখা যাইতেছে। এই যে বেকার-সমস্যা, অর্থাৎ চাকরি মেলা দুঃসাধ্য—ইহাও একপ্রকার শাপে বর, অর্থাৎ বাঙালী এখন বাধ্য হইয়া ব্যবসাক্ষেত্রের দিকে মন ফিরাইতেছে। আমার প্রবন্ধ পড়িয়া অনেকে হয়তো ভাবিবেন যে, আমি এই পরিণত বার্ধক্যের সময় আতঙ্কবাদী (Cynic) হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা নহে, আমি এখনো যেখানে বাঙালীর উদ্যমের চিহ্ন দেখিতে পাই—বিশেষত ব্যবসাক্ষেত্রে, সেইখানেই উৎসাহে ঝাঁপ দিয়া পড়ি, নিজের এই বৃদ্ধ বয়স ও ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও যথাশক্তি সাহায্য করিতে ত্রুটি করি না, এবং এইরূপ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণকে আশা ও উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করি না। এই প্রসঙ্গে বাঙালী আলামোহন দাসের ব্যবসার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বাল্যকালে দারিদ্র্যবশত মুড়ি ফেরি করিয়া জীবনযাত্রা-নির্বাহ করিতেন এবং কলিকাতার পথিপার্শ্বস্থ গৃহসংলগ্ন রোয়াক বা বারান্দাতে ইষ্টক মাথায় দিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। অর্থাভাব হেতু অবৈতনিক ছাত্রহিসাবে তিনি মাত্র ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও তৎসঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ অনুপ্রেরণার বলে বাঙালীর আদর্শস্থানীয় এই কর্মবীর আজ ভারত জুট মিল ও তৎসংলগ্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণের বিরাট কারখানা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ধৈর্যশীল পাঠকবৃন্দ হয়তো ইহাকে বৃদ্ধের প্রলাপোক্তি মনে করিয়া ক্ষমা করিয়া যাইতেছেন, সুতরাং এইক্ষণে আরেকটি বিষয়মাত্র উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যেসকল বিরাট প্রতিভাশালী মনীষিগণ এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যথা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ, ধর্মবীর স্বামী বিবেকানন্দ, নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র, বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির বার্তাবহ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, পুরুষসিংহ আশুতোষ প্রভৃতি মনস্বিগণের সমকক্ষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি বঙ্গেতর অন্যান্য প্রদেশে অতি দুর্লভ। ইহাতেই বুঝা যায় যে, এই পুণ্যভূমি বঙ্গদেশে—যে-দেশে এত অধিক সংখ্যক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, সে দেশ শ্রীভগবানের কৃপা হইতে কখনো বঞ্চিত হইবে না. ইহাই আশার কথা। বাঙালী আবার উঠিবে। বাঙালী আবার জাগিবে। দুঃখিনী বঙ্গমাতা আবার শত বীণাবেণুরবে জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবেন। ব্রহ্মার্পণমস্তু।* □

* ৪০ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

জাতিভেদপ্রথার বিবর্তন ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

ভারতে জাতিভেদপ্রথার উৎপত্তি বৈদিক যুগেই (আনুমানিক ২০০০-৬০০ খ্রীস্টপূর্ব) হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। এই প্রথার উদ্ভব হয়েছিল অংশত নৃতাত্ত্বিক কারণে এবং অংশত সমাজের ব্যবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে ভারতীয় আর্যসমাজে কোন বৃত্তি বা জীবিকাই বংশানুক্রমিক ছিল না। একই পরিবারের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করতে পারতেন (ঋগ্বেদ, ৯ঃ১১২)। কিন্তু ঐসময়কার আর্যেরা অত্যন্ত গাত্রবর্ণ-সচেতন ছিলেন এবং শ্বেতকায় আর্য ও কৃষ্ণকায়, খর্বনাসা অনার্যদের পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। এই পার্থক্য শুধু গাত্রবর্ণের জন্য নয়, বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে প্রভেদ বজায় রাখার জন্যও তাঁরা মেনে চলতেন। পরাজিত অনার্যদের তাঁরা 'শূদ্র', 'দাস', 'দস্যুবর্ণ' প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিলেন। গাত্রবর্ণের পার্থক্য থেকে এই সামাজিক প্রভেদের উৎপত্তি হওয়ার জন্যই বোধহয় সংস্কৃত ভাষায় আদিতে 'জাতি' শব্দের পরিবর্তে 'বর্ণ' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, 'বর্ণাশ্রম' কথাটির মধ্যেও 'বর্ণ' কথাটির অবস্থিতি লক্ষণীয়। ('জাতি' শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়নি।) কালক্রমে বিজেতা আর্যদের মধ্যেই তিনটি বর্ণের উৎপত্তি হলো। যজন-যাজন এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা (বিশেষত শাস্ত্র-অধ্যয়ন) নিয়ে যাঁরা থাকতেন তাঁরা ব্রাহ্মণ নামে, যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা উপভোগ যাঁরা করতেন তাঁরা ক্ষত্রিয় বা রাজন্য নামে, এবং কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন ও অন্যান্য যাবতীয় বৃত্তি যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা বৈশ্য নামে পরিচিত হন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত বিখ্যাত 'পুরুষসূক্তে'র মধ্যেই চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সূত্রে বলা হয়েছে যে, 'পুরুষ' বা স্রষ্টার মুখ হলেন ব্রাহ্মণ, রাজন্য বা ক্ষত্রিয়েরা তাঁর বাহুরূপে নিষ্পন্ন হলেন, বৈশ্যেরা হলেন তাঁর উরু এবং শূদ্রেরা তাঁর পদদ্বয় হতে জাত হলেন। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।" (ঋগ্বেদ, ১০ঃ৯০)। কিন্তু চারটি বর্ণের সৃষ্টি হলেও এর মধ্যে প্রথম তিনটি বর্ণই 'দ্বিজবর্ণ' হিসাবে উপবীত ধারণের অধিকারী ছিলেন এবং এঁদের মধ্যে বিবাহ ও পানাহারের ব্যাপারে কোন ভেদাভেদ ছিল না। জন্মের দ্বারাই সবসময় বর্ণ নির্ধারিত হতো না, এবং কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ বংশানুক্রমিক ছিল না। তবে শূদ্রদের থেকে অপর তিনটি বর্ণের প্রভেদ ভালোভাবেই বজায় রাখা হয়েছিল। শূদ্রেরা বেদাধ্যয়ন বা যাগযজ্ঞ করতে পারতেন না, এমনকি তাঁদের শবদেহ দাহ করাও চলত না।[১]

জাতিভেদপ্রথার বিবর্তনের ইতিহাসে খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ হতে ৩০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আনুমানিক নয় শত বৎসর কালকে আমরা দ্বিতীয় পর্ব বা যুগ বলে

গ্রহণ করতে পারি। এই যুগের সূচনায় ভারতীয় আর্যসমাজে সর্বোচ্চ স্থান লাভের জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে এক সঙ্ঘাত লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু এই যুগে রচিত বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে, ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি সমাজে সর্বজনস্বীকৃত ছিল না। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যই সুস্পষ্টভাবেই স্বীকৃত। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অনেকে মনে করেন যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের প্রতিবাদই সূচিত হয়েছে এবং এই দুই বর্ণের লোকেই অন্তত প্রথমদিকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[২] তবে প্রথম তিন বর্ণের মধ্যে বিবাহ তখনো প্রচলিত ছিল এবং এক বর্ণের লোকে বৃত্তি-পরিবর্তনের দ্বারা অপর বর্ণে স্থানলাভ করতে পারতেন। অবশ্য সবর্ণ বিবাহই ক্রমশ আর্যসমাজে জনপ্রিয় হচ্ছিল।

আলোচ্য যুগে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ ব্যবস্থায় দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথমত, আইনের দৃষ্টিতে উচ্চবর্ণের লোকদের নিম্নবর্ণীয়দের তুলনায় অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ঋণের টাকার ওপর সুদের হার ব্রাহ্মণদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কম এবং শূদ্রদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ছিল। আবার ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে দেখা যায়, যে-অপরাধে শূদ্রদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেত, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেদের সেই অপরাধেই অনেক লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রীস্টান যাজক এবং সন্ন্যাসীরা যেমন বিশেষ কতকগুলি অধিকার ভোগ করতেন, এই যুগের ব্রাহ্মণেরাও তেমনি বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে এবং দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ সুযোগের অধিকারী ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, মৌর্যসম্রাট অশোক (খ্রীস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২) এই বিশেষ অধিকার লোপ করে তাঁর সাম্রাজ্যে 'দণ্ডসমতা' ও 'ব্যবহারসমতা' প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করলে ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতই তাঁর ওপরে অসন্তুষ্ট হন এবং সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবার চেষ্টা করেন।[৩] তবে এ-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই যুগে অসবর্ণ বিবাহের ফলে এবং বহু বিদেশাগত এবং ভারতীয় আদিম অনার্য জনগোষ্ঠিকে আর্যসমাজে স্থান দেওয়ার ফলে নানা মিশ্রবর্ণ বা উপবর্ণের উৎপত্তি হয়। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা এই মিশ্রবর্ণগুলিকে বোঝাবার জন্য 'জাতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বর্ণ এবং জাতি কথাদুটির অর্থ আদিতে পৃথক ছিল, পরে অবশ্য এদুটি প্রায় সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অসবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে স্মৃতিকারেরা 'অনুলোম' বিবাহ, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পাত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহ অনুমোদন করেন, এবং এই ধরনের বিবাহের ফলে জাত সন্তানদের পিতৃবর্ণের অধিকার দেন। 'প্রতিলোম' বিবাহ, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পাত্রী ও নিম্নবর্ণের পাত্রের বিবাহ স্মৃতিকারেরা অনুমোদন না করলেও সমাজে এধরনের বিবাহ যে ঘটত তার অনেক প্রমাণ আছে। বিদেশাগত আক্রমণকারী এবং ভারতীয় অনার্য জনগোষ্ঠীগুলিকে তাদের নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি এবং চিরাচরিত বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ

রেখে হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হয় এবং এক-একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবেই তারা সমাজে গৃহীত হয়। স্মৃতিকারেরা অনেক সময় তাঁদের অসবর্ণ বিবাহের ফলে উৎপন্ন মিশ্রবর্ণরূপে পরিচিত করেন, যদিও এ-প্রচেষ্টা সবসময় বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। হিন্দুসমাজে এইভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে বহু আর্যেতর জনগোষ্ঠী স্থান পায়, এবং প্রতিটি জাতির সামাজিক মর্যাদা এবং বৃত্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। অবশ্য ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য, কর্মফল, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি হিন্দুসমাজের কয়েকটি মৌলিক ধ্যান-ধারণা ও আচার তাদের গ্রহণ করতে হয়েছিল।[৪] আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের অবলুপ্ত করে দিয়ে বিজয়ী ইউরোপীয়রা যেমন তাঁদের সামাজিক সমস্যার সমাধান করেছিলেন, ভারতে বিজয়ী আর্যেরা সেভাবে কখনোই বিজিত লোকেদের উচ্ছেদ করেননি। তার ফলে সামাজিক প্রভেদ ও বৈষম্য আমাদের দেশে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে সত্য, কিন্তু অন্য ধরনের সমাধান মানবিক হতো কিনা সন্দেহ।

খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে জাতিভেদপ্রথা ক্রমশ কঠোর হতে থাকে। অসবর্ণ বিবাহ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে পানাহার সমাজের চক্ষে হেয় হয়ে পড়ে। শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচারও প্রবল হয়ে ওঠে। কতকগুলি খাদ্য ও পানীয়, যথা গোমাংস, অশুদ্ধ বলে গৃহীত এবং উচ্চবর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে কতকগুলি বৃত্তি অপবিত্র বলে বিবেচিত হয় এবং যাঁরা ঐসব বৃত্তির অনুসরণ করতেন তাঁরা সমাজে হেয় বা অপাঙ্‌ক্তেয় হন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ক্রমাবনতির সঙ্গে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। ক্ষত্রিয়েরা রাজশক্তির অধিকারী ছিলেন বলে সমাজে স্বভাবতই তাঁদের বেশ কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্মৃতিকারেরা ক্রমশ ক্ষত্রিয়দের সংখ্যা কমিয়ে আনবার চেষ্টা করতে থাকেন, ক্ষত্রিয়মর্যাদাকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাজবংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে। অনুরূপভাবে বৈশ্যদের সংখ্যাও হ্রাস করা হয়। কালক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বংশধরেরা অধিকাংশই শূদ্র পর্যায়ে নেমে আসেন এবং বিভিন্ন বৃত্তি-আশ্রয়ী উপবর্ণ বা জাতিরূপে পরিচিত হন। ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি এর ফলে আরো বৃদ্ধি পায়। হূন, গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকারীর দল এইসময়ে ভারতীয় হিন্দুসমাজে ধীরে ধীরে আশ্রয় পেতে থাকেন। চন্দেল্লা প্রমুখ ভারতীয় আদিম অনার্যগোষ্ঠীর লোকেরাও স্থানে স্থানে নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা করেন। যেখানে এঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করে কোন বিশেষ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে ঐ রাজবংশের লোকেরা ক্ষত্রিয়মর্যাদা লাভ করার জন্য স্থানীয় ব্রাহ্মণসমাজের আনুকূল্য প্রার্থনা করেন এবং ঐ আনুকূল্য লাভের জন্য ব্রাহ্মণদের নানাভাবে সন্তুষ্ট করে তাঁদের সামাজিক প্রাধান্য আরো দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিজবর্ণের মর্যাদা একমাত্র ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য হয়। অন্যদিকে শূদ্রদের মধ্যে চণ্ডাল, শবর, নিষাদ প্রভৃতি কয়েকটি নিম্নজাতির লোকেরা অস্পৃশ্য হিসাবে চিহ্নিত হন। শহর বা গ্রামের ভিতরে তাঁদের বসবাস করতে দেওয়া হতো না। এঁদের কারো ছায়া স্পর্শ করলেও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা নিজেদের অপবিত্র বলে বিবেচনা করতেন। এই অস্পৃশ্যতার অভিশাপ ভারতীয় হিন্দুসমাজ থেকে আজও কার্যত সম্পূর্ণ দূর হয়নি।[৫]

বর্ণের সঙ্গে বৃত্তির যোগাযোগের কথা আগেই বলা হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা প্রতিটি বর্ণ ও জাতির জন্য এক বা একাধিক বৃত্তি নির্দেশ করেন। গীতাতেও বলা হয়েছে যে, ভগবান গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন ("চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।" (গীতা, ৪।১৩) আধুনিক ঐতিহাসিকেরা কেউ কেউ মনে করেন যে, বৃত্তি ও বর্ণের এই যোগ প্রথম ইংরেজ রাজত্বকালে এসে ছিন্ন হয়েছে। শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০-১৯০০' বইয়ে লিখেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে "গ্রামের কৃষক কারিগর ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও অন্যান্য বর্ণের লোকেরা বংশপরম্পরায় কৌলিক বৃত্তি পালন করত, কদাচ তার ব্যতিক্রম ঘটত না।"[৬] কিন্তু এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার মনুই (আনুমানিক কাল—খ্রীস্টপূর্ব ২০০-২০০ খ্রীস্টাব্দ) যেসব ব্রাহ্মণ স্বকুলোচিত বৃত্তিতে জীবিকা উপার্জনে অসমর্থ, তাঁদের ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যদের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করবার অনুমতি দিয়ে গেছেন, তবে শূদ্রদের বৃত্তি ব্রাহ্মণ কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করতে পারবেন না, এই ছিল তাঁর নির্দেশ। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্যদের এবং বৈশ্যরা শূদ্রদের বৃত্তি আপৎকালে গ্রহণ করতে পারতেন। অবশ্য ব্রাহ্মণদের বৃত্তি কোন নিম্নবর্ণের লোকে গ্রহণ করতে পারতেন না।[৭] মনুর এই নির্দেশ থেকেই বোঝা যায় যে, খ্রীস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতেও বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের বৃত্তি পরিবর্তন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না, সমাজে এরকম ঘটনা ঘটত। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার দেখিয়েছেন কিভাবে গুপ্তযুগে পশ্চিম ভারতের একদল রেশম শিল্পী তাঁদের বাসস্থানের ও বৃত্তির পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে অধিকতর মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন।[৮] খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত সংস্কৃত গদ্যকাব্য 'দশকুমারচরিতে' বিন্ধ্যপর্বতনিবাসী এক ব্রাহ্মণ দস্যুদলের কথা আছে যাঁরা বংশানুক্রমিকভাবে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।[৯] অনুরূপভাবে এ-যুগের বহু ঐতিহাসিক সূত্রে ব্রাহ্মণ রাজা ও সেনাপতি এবং ক্ষত্রিয় ব্যবসায়ীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। একথা অবশ্যগ্রাহ্য যে, বৈদিক যুগ বা পৌরাণিক যুগের তুলনায় পরবর্তী যুগে বৃত্তি পরিবর্তন ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছিল। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকেরা এখন স্বীকার করেন যে ব্যক্তিগত রুচি, প্রভাব-প্রতিপত্তি-কামনা, অর্থনৈতিক প্রেরণা ইত্যাদির ফলে প্রত্যেক বর্ণেরই কিছু কিছু লোক বৃত্তি পরিবর্তন করতেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন যে, পাল-চন্দ্র এবং সেন-বর্মণ আমলে, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু ব্রাহ্মণ রাজা, সামন্ত, সেনাপতি, রাজকর্মচারী ও কৃষিজীবির বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, অম্বষ্ঠবৈদ্যেরা মন্ত্রী হয়েছেন, করণ-কায়স্থেরা সৈনিক বৃত্তি ও চিকিৎসা বৃত্তির অনুসরণ করেছেন এবং কৈবর্তেরা রাজকর্মচারী ও রাজ্যশাসক হয়েছেন।[১০] বাংলাদেশের বাইরে ভারতের অন্যত্রও এধরনের উদাহরণ একেবারে বিরল ছিল না।

বৃত্তির সঙ্গে বর্ণের বা জাতির যোগ কিন্তু তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ছিল। কতকগুলি জাতির নাম থেকেই তাদের বৃত্তি বোঝা যেত, যেমন—কুম্ভকার, কর্মকার, তন্তুবায়, তৈলিক ইত্যাদি। এইসব

বৃত্তি-পরিচালিত জাতিগুলির (trade castes) সঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের trade guild-গুলির কিছুটা সাদৃশ্য আছে। জাতিভেদপ্রথার সামাজিক বিধিনিষেধগুলিও এইসব জাতির মধ্যে কঠোরভাবে পালিত হতো।[১১] বৃত্তির সঙ্গে বংশানুক্রমিক জাতিভেদপ্রথার এই সংযোগ সমাজের পক্ষে যে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর ছিল তা বলা যায় না। এই ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক শোষণ, মনুষ্যত্বের অবমাননা ইত্যাদি সবই হয়তো ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কও স্বীকৃত হয়েছিল। সমাজের প্রয়োজনে স্বীয় গুণ বা প্রতিভা অনুসারে যে-ব্যক্তি যে-কাজ করে, সে-কাজেই সে বংশানুক্রমিকভাবে নিযুক্ত থাকবে, এবং সমাজও সেই ব্যক্তিকে ও তার বংশধরদের জীবিকার অভাবে মরতে দেবে না, এই নীতিই ছিল জাতিভেদপ্রথার ভিত্তি। ভারতের কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজে এইভাবে একটি প্রতিযোগিতা-বিহীন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, এবং মোটের ওপর এই ব্যবস্থা যে কয়েক হাজার বৎসর ধরে ভারতীয় জনসমাজকে সন্তুষ্ট রেখেছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকদের জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলনগুলি স্থায়ী সাফল্য লাভ করতে পারেনি। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর মতে "বর্ণব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভারকেন্দ্রের স্থৈর্যের বশেই ভারতীয় সংস্কৃতির স্থৈর্য সম্ভব হইয়াছিল।"[১২]

মধ্যযুগে, ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে (খ্রীঃ ১২০০–১৭৫৭), জাতিভেদপ্রথার ওপরে বর্ণিত কাঠামো মোটের ওপর একই রকম ছিল। ইসলাম ধর্মে সামাজিক সাম্যের ভাব হিন্দুধর্মের তুলনায় অনেক বেশি ছিল সন্দেহ নেই। বংশগত জাতিভেদপ্রথা ইসলামের মৌল নীতির বিরোধী। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর মুসলমান রাজত্বে বাস, এবং হিন্দু ও মুসলিম রাজপরিবারগুলির মধ্যে কিছু কিছু বৈবাহিক আদান-প্রদান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুসমাজে জাতিভেদপ্রথায় একটুও ভাঙন ধরেনি। অধিকতর সামাজিক মর্যাদা লাভ এবং জিজিয়া কর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিম্নজাতির কিছু কিছু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় হিন্দুসমাজের বৃহত্তর অংশ যে তাঁদের ধর্ম ও জাতির প্রতি আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিন্দুসমাজের ওপর ইসলামিক সঙ্ঘাতের প্রতিক্রিয়া দুই ধরনের হয়েছিল। একদিকে আমরা লক্ষ্য করি যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (১৫২০–৭৫) প্রমুখ স্মৃতিকারেরা জাতিভেদপ্রথাকে কঠোরতর করে হিন্দুসমাজকে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলার বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন, যাতে বহিরাগত ভাবধারা তার মধ্যে আদৌ প্রবেশ করতে না পারে। অপরদিকে আমরা দেখি যে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে একদল ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা এই দুই পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়ের লোককে কাছে টেনে আনার চেষ্টা করেছেন, দুই ধর্মের মূলগত ঐক্যের ওপর জোর দিয়ে। রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য, দাদু, রবিদাস, মীরাবাঈ প্রমুখ ভক্তি-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রায় সবাই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য, পুরোহিত-প্রাধান্য এবং জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন, কিন্তু জাতিভেদপ্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তি যথেষ্ট দৃঢ় থাকায় তাঁদের প্রচারকার্য বিশেষ

সাফল্যলাভ করতে পারেনি। হিন্দুসমাজের আপামর জনসাধারণ এইসব মহাপুরুষের অনুচরদের এক একটি নতুন জাতি বলে গণ্য করে, পরোক্ষভাবে তাঁদের সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টাকে পরাহত করে। কবীরপন্থী, শিখ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি কালক্রমে এক একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবেই বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান পায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজেরও প্রায় এই দশা হয়েছিল।[১৩]

জাতিভেদপ্রথার সর্বগ্রাসী প্রভাব মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলমান সমাজকেও স্পর্শ করেছিল। ভারতীয় মুসলমানদের অনেকেই ছিলেন ধর্মান্তরিত হিন্দু। সুতরাং পুরাতন সংস্কার বা সামাজিক রীতিনীতি যে তাঁদের ওপর কিছুটা প্রভাব রেখে যাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ভারতীয় মুসলমান সমাজ প্রধানত 'আশরফ' (মাননীয়) ও 'আজলাফ' বা আতরাফ এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। 'আশরাফ'রা ছিলেন বিদেশাগত মুসলমানদের বংশধর, এঁদের মধ্যে চারটি প্রধান ভাগ ছিল—সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মুঘল। 'আজলাফ'রা ছিলেন মূলত ধর্মান্তরিত ভারতীয় হিন্দু। এঁদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা সবচেয়ে বেশি ছিল ধর্মান্তরিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের, বিশেষত রাজপুতদের। তারপর আসতেন ধর্মান্তরিত শূদ্রেরা, যেমন জোলা, দরজি, কুমোর, তেলি, ধোবি, হাজাম (নাপিত) ইত্যাদি। হিন্দুসমাজে থাকলে এঁরা সৎশূদ্র নামে পরিচিত হতেন।[১৪] বাংলাদেশের মুসলমানসমাজে এই ধরনের বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগের কথা মুকুন্দরাম-রচিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে (রচনাকাল—আনুমানিক ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দ) সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।[১৫] সমাজের সর্বনিম্নস্তরে ছিলেন ভাঙি, চামার প্রভৃতি অস্পৃশ্য হিন্দু যাঁরা কোন না কোন কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের বলা হতো 'আরজাল'। যদিও হিন্দুসমাজের মতো কঠোর বংশানুক্রমিক জাতিভেদপ্রথা মুসলমান সমাজে কোনদিনই ছিল না, এবং শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচার হিন্দুদের মতো মুসলমানেরা কখনো করেননি, তবু বিবাহের ব্যাপারে মুসলমান সমাজে বংশগৌরবের ব্যাপারটি যথেষ্ট বিবেচিত হতো এবং সৈয়দ, শেখ, পাঠান বা মুঘলেরা নিম্নস্তরের মোমিন, পটুয়া প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে এক মসজিদে প্রার্থনায় যোগ দিলেও একাসনে অন্নগ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। শেখ ও সৈয়দদের বংশমর্যাদা অনেকটা হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণদের মতোই ছিল। অপরদিকে মুসলমান ভাঙি বা চামারেরা পরিষ্কার বেশভূষা থাকলেও মসজিদে প্রবেশ করতে পারতেন না, বা প্রবেশ করলেও সামনের সারিগুলিতে কখনোই আসন নিতে সাহস করতেন না। মুসলমান ভাঙিদের কোরান পাঠের অধিকার থাকলেও তাঁরা কোরান পড়াতে পারতেন না।[১৬] হিন্দুদের দেখাদেখি এদেশের মুসলমানেরাও আহারাদির ব্যাপারে কতকগুলি আচার-বিচার মেনে চলতেন। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপের মুসলমান মুলুক-পতি চৈতন্যের অনুগামী যবন হরিদাসকে এইসব আচার-অনুষ্ঠান লঙ্ঘন করার জন্য ভর্ৎসনা করছেন দেখা যায়।

"আমরা হিন্দুর দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত।।
জাতি-ধর্ম লঙ্ঘি কর অন্য-ব্যবহার।
পরলোকে কেমতে বা পাইবে নিস্তার।।"[১৭]

বলা বাহুল্য, এসবই হিন্দু পরিবেশের প্রভাবে হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতেও মুসলিম সমাজে এই ধরনের স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দু-বৌদ্ধ রাজত্বকালের মতো মধ্যযুগেও আমরা হিন্দুসমাজে, বিশেষত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে, বৃত্তি পরিবর্তনের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাই। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই তখনো শাস্ত্রচর্চা ও অধ্যাপনা করতেন, কিন্তু যজন-যাজনরত মূর্খ বিপ্রেরও সমাজে অভাব ছিল না। মুকুন্দরাম তাঁর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে' কালকেতুর নতুন রাজধানী বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজা ঘরে ঘরে
চাউলের কোচড়া বান্ধে টান।।"[১৮]

সমসাময়িক কালের মূর্খ ব্রাহ্মণদের কটাক্ষ করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও (১৪৮৬-১৫৩৩) পরাঙ্মুখ হননি।

"প্রভু কহে, 'সন্ধিকার্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার'।।"[১৯]

আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত জয়নারায়ণ সেনের 'হরিলীলা' পাঠে মনে হয় যে ব্রাহ্মণেরা সেইসময় শুধু শাস্ত্রচর্চা বা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করতেন না, অন্তত তাঁদের মধ্যে কিছু লোক রাজনীতিচর্চাও করতেন।

"দক্ষিণে বসিয়া বেদবেত্তা দ্বিজগণ।
রাজনীতি কহে, কহে ব্রহ্মনিরূপণ।।"[২০]

বৈদ্যেরা প্রধানত চিকিৎসা-বৃত্তি গ্রহণ করলেও কেউ কেউ ব্রাহ্মণদের মতোই অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নবদ্বীপ-নিবাসী, চৈতন্য-অনুচর মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের মতোই বড় বৈয়াকরণ ছিলেন। চৈতন্যদেব তাই তাঁকে পরিহাস করে বলছেন—

"প্রভু বোলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দড়।।
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই বিষমের অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি।।"[২১]

আবার চৈতন্যদেবের পরিচিত বারাণসী-প্রবাসী চন্দ্রশেখর জাতিতে বৈদ্য হলেও কায়স্থদের ন্যায় লিখনবৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা-নির্বাহ করতেন।[২২] শ্রীখণ্ড অঞ্চলের বহু বৈদ্য আবার গৌড় সরকারের কর্মচারী ছিলেন।[২৩] কায়স্থেরা সাধারণত মসীজীবী ও রাজকর্মচারী হলেও কখনো কখনো রাজ্যশাসনের এবং প্রজাপালনের দায়িত্ব পালন করতেন। বাংলার বারভূইঞাদের মধ্যে অনেকে জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, আবুল ফজলের রচিত 'আইন-ই-আকবরী'তে (১৬শ শতাব্দী) বাংলাদেশে বহু কায়স্থ রাজার নাম পাওয়া যায়। সমাজে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠবর্ণের মর্যাদা পেলেও কায়স্থদের বৈষয়িক প্রতিপত্তি বোধহয় বেশিই ছিল।[২৪] আবার কাশীরাম দাস, গুণরাজ খান, কানা হরিদত্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকেরা কায়স্থবংশোদ্ভব ছিলেন। গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের লোকেরা একদিকে যেমন

ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী হতেন (বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি তার প্রভূত সাক্ষ্য বহন করছে), অপরদিকে তেমনি বিদ্যাচর্চা ও গ্রন্থরচনার প্রতিও তাঁদের যথেষ্ট অনুরাগ দেখা গিয়েছিল। ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন প্রমুখ বণিকেরা মধ্যযুগে গ্রন্থ রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন।[২৫] তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেদের মধ্যে গোপজাতির কিছু লোকের পশুপালনবৃত্তি ত্যাগ করে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাণিজ্যে মনোনিবেশ এবং তৈল ব্যবসায়কে কেন্দ্র করে তেলি ভিন্ন কলু নামে একটি নতুন জাতির আত্মপ্রকাশ ষোড়শ শতাব্দীর বাংলায় একটি লক্ষণীয় সামাজিক পরিবর্তন।[২৬] মধ্যযুগের শেষদিকে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা যে আর ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সমকালে বা তার কিছু পূর্বে মাঝি কায়েত, রামনারায়ণ গোপ, ভাগ্যমন্ত ধুপী প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকেরা পুঁথি-লেখক বলে উল্লিখিত হয়েছেন।[২৭] রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন যে বাল্যকালে (জন্ম ঃ ১৮২৬) ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রামে তিনি যে-গুরুমশাইয়ের কাছে প্রথম লেখাপড়া শেখেন, তিনি আগুরি জাতির লোক ছিলেন।[২৮] তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেরা মধ্যযুগে কখনো কখনো ধর্মগুরুর ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়েছেন। চৈতন্যদেবের অনুবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বহু ব্রাহ্মণ নরহরি সরকার ও নরোত্তম ঠাকুরের মতো অব্রাহ্মণের মন্ত্রশিষ্য হয়েছেন বলে জানা যায়। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়' বইয়ে মধ্যযুগের বহু কায়স্থ সাধক ও ধর্মগুরুর নাম উল্লেখ করেছেন।[২৯] অষ্টাদশ শতাব্দীতে সদ্‌গোপ জাতীয় রামশরণ পাল কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের প্রধান অধ্যক্ষ হন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বহু উচ্চজাতির লোকও ছিলেন। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব ব্যাপকভাবে দেখা দেবার আগেই এসব ঘটনা ঘটে গিয়েছে।* □

পাদটীকা

১ R. C. Majumdar, Ancient India (Delhi, 1960), pp. 48-49, 87-89
২ Romila Thapar, A History of India, Vol. I, Penguine Books, 1966, pp. 67-68
৩ R. C. Majumdar, Ancient India, pp. 202, 471
৪ Ibid, p. 202; J. N. Bhattacharya, Hindu Castes And Sects, Calcutta, 1968, p 4
৫ R. C. Majumdar, op. cit., pp. 470-472; Romila Thapar, op. cit., p. 153.
৬ বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০-১৯০০', কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ৯
৭ 'মনুসংহিতা', ৯।৩১৯, ১০।৮০-৮২, ৯৫-৯৯, ১০১-১০২
৮ Romila Thapar, op. cit., p. 153
৯ 'দশকুমারচরিত', পূর্বপীঠিকা, দ্বিতীয়োচ্ছ্বাস
১০ নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ', কলিকাতা, ১৩৫২ সন, পৃঃ ১১৩-১৪
১১ M. Monier Williams, Hinduism, Calcutta, 1951, pp. 107-108
১২ নির্মলকুমার বসু, 'হিন্দুসমাজের গড়ন', কলিকাতা, ১৯৪৯, পৃঃ ১৪৯, ১৫১-১৫৩
১৩ তদেব, পৃঃ ১৫১
১৪ Ghaus Ansari, Muslim Caste In Uttar Pradesh, Lucknow, 1960, pp. 35-37
১৫ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী (সং) মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', কলিকাতা, ১৯৫২, পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬
১৬ Imtiaz Ahmad, Caste And Social Stratification among the Muslims, Delhi, 1973, pp. xxviii–xxxi, 113-131

১৭ বৃন্দাবনদাস, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত', বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৮
১৮ মুকুন্দরাম, 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', পৃঃ ৩৪৯
১৯ বৃন্দাবনদাস, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত', পৃঃ ৪৮
২০ দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯১৪, পৃঃ ১৪৮৭
২১ বৃন্দাবন দাস, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত', পৃঃ ৪৮
২২ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (আঃ ১৬০৬-১৫ খ্রীস্টাব্দ), উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩৫৯ সন, পৃঃ ১৯৫
২৩ সুকুমার সেন, 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী', বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃঃ ১৬
২৪ H. S. Jarrett, Ed., Abul Fazl's Ain-i-Akbari, Calcutta, 1949, Vol. II, p. 147; R. P. Chandra, The Indo-Aryan Races, Calcutta, 1969, pp. 104-106
২৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস—মধ্যযুগ', কলিকাতা, ১৩৭৩ সন, পৃঃ ৩০৫-৩০৬
২৬ H. R. Sanyal, 'Continuities of Social Mobility in Traditional and Modern Society in India' in The Journal of Asian Studies, February, 1971, pp
২৭ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৬
২৮ রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', কলিকাতা, ১৯১৬, পৃঃ
২৯ নগেন্দ্রনাথ বসু, 'কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়', কলিকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৮৬

* ৮২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা

আশাপূর্ণা দেবী

রাজমিস্ত্রিরা ঘরবাড়ি, প্রাসাদ, প্রাচীর, মন্দির, মসজিদ—যেকোন কিছু নির্মাণের কালে সর্বাগ্রে চুন-বালি-সুরকি-সিমেণ্ট দিয়ে একটি 'মাখা মসলা' তৈরি করে নেয় (ওদের ভাষায় 'তাগাড়') গড়নের ইঁট, পাথর টালিদের নক্সামাফিক জুড়ে তোলবার জন্যে।

গোল, চৌকো, কোনাচে, তেকোনা যেকোন গড়নেরই ইঁট, পাথর হোক না কেন তাদেরকে ঠিকমত খাঁজে খাঁজে বসিয়ে জুড়ে জুড়ে খাড়া করে তুলতে ঐ মাখা মসলাটিই প্রধান উপকরণ।

মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সমাজগঠনের আদি পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত 'সমাজ' নামক বস্তুটির অজস্র ভাঙা-গড়া, আর অসংখ্য নক্সার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়—সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা মিস্ত্রির হাতের ঐ মাখা মসলাটির মতোই।

যুগে যুগে কালে কালেই সমাজসংস্কারকেরা পুরনো সমাজকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে যত্নবান হন। পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে, আর নিজস্ব মৌলিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে যখনই যিনি বা যাঁরা 'নতুন সমাজ' গড়ে তোলবার কাজে হাত দিয়েছেন, তখনই নারীর এই ভূমিকাটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সমাজ জীবনের সুবিধে-অসুবিধে, স্বস্তি-শান্তি, নিরাপত্তা-সুরক্ষা ইত্যাদির মুখ চেয়ে (অবশ্য সবটাই পুরুষ সমাজের চিন্তাভাবনার মুখ চেয়ে) যে-নক্সাটি বানানো হয়ে থাকে তার সমস্ত অসমান কোনাচে খোঁচ-খাঁচগুলিকে ঠিকভাবে গেঁথে তুলতে উপকরণ ঐ নারীসমাজ! সে কখনোই কোন পরিকল্পনার শরিক নয়, তার ইচ্ছে-অনিচ্ছে মতামতের কথা চিন্তাও করা হয় না কখনো। বিনা দ্বিধায় তাকে ঐসব অসমান খাঁজের মধ্যে ঢেলে ঢেলে নতুন নক্সা গড়ে তোলা হয় মাত্র।

যখন যে-নেতার আবির্ভাব ঘটে তখন তাঁর ভাবনাতেই ভাবিত হয় সমাজ। গড়ে ওঠে সমাজ মানসিকতা।

যদি কেউ বলেন 'নারী দেবী' তো নারী দেবী।

যদি কেউ বলে ওঠেন, 'নারী নরকের দ্বার!' তো ভাবা হোক নারী নরকের দ্বার।

যদি বলা হয় 'শতপুত্রের জননী হওয়াই নারীর গৌরব' তো নারী সেই গৌরব অর্জনের চেষ্টায় লাগে। আবার কখনো যদি বলা হয়, 'না না, একটির বেশি দুটি না।'... তো অপ্রতিবাদে সেই নির্দেশনামায় স্বাক্ষর দিতে আসে। কারণ সে জানে নির্দেশ মানাই তার কাজ।

আর নির্দেশদাতারাও জানেন, এখন এইরকমই দরকার। এতেই সমাজের ভারসাম্য ঠিক থাকবে। সমাজ জীবনে হাজার হাজার বছরের ভাঙাগড়ার ইতিহাসের প্রায় এই একই ছবি।

একটি মাত্র যুগে নারীকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে সমাজকে আলোকিত করতে দেখা গিয়েছিল। সেটি হচ্ছে বৈদিক যুগ। কিন্তু সে-যুগে সাধারণীদের জীবন কেমন ছিল জানা নেই। তা সেই বৈদিক যুগ তো আপন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে অচিরেই বিদায় নিয়েছিল। কেন সে ক্রমোন্নতির পথ ধরে নারী মহিমার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করে চলতে পারল না—তা পণ্ডিতজনেই জানেন। আপাতদৃষ্টিতে তো দেখা যায় তারপর একটি গভীর অন্ধকার যুগ। সেই অন্ধকারের পথ পেরিয়ে অনেক দূরে এসে পৌঁছে আমরা আমাদের মেয়েদের উজ্জ্বল আদর্শ দেখতে চাইলেই, সেই সুদূর অতীতে চোখ ফেলি, যেখানে গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী! যেখানে নারী-কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে, 'যে ঐশ্বর্যে আমার অমৃতত্বলাভ হবে না, তা নিয়ে আমি কি করব?'

সেই আলো থেকে কোন্ পরিবেশ বেচারী নারীসমাজকে এমন গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছিল, যার থেকে আর উদ্ধার হলো না তার? বস্তুর মোহই তার সমগ্র শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, ফেলেই রাখল!

আর সমাজচিন্তাধরদের কাছে 'শিশু' 'নারী' 'বৃদ্ধ' সকলেই একই শ্রেণীতে পড়ে গেল।

আত্মরক্ষায় অসমর্থ, অসহায় পরমুখাপেক্ষী একটি গোষ্ঠী! শিশু, নারী, বৃদ্ধ!

অথচ আবার নারীর কাছে পাহাড়-প্রমাণ প্রত্যাশা!

এও একটি রহস্য!

কই, 'সমাজ জীবনে, সমাজ গঠনে বা সমাজ রক্ষণে পুরুষের ভূমিকা কী?' এ নিয়ে তো কখনো কোথাও তেমন প্রশ্ন উঠতে দেখা যায় না।

কারণ তার সম্পর্কে চিন্তা ভাবনাটি যেন সব শেষ হয়ে গেছে।

তার পক্ষে একটি মাত্রই নির্দেশ, সে যেন 'মানুষ' নামের যোগ্য হতে পারে। এইটি হতে পারাই তার পক্ষে পরম ও চরম।

অবশ্য ওই একটিমাত্র স্থিরীকৃত নির্দেশে সবই আছে। তাই সে একটি প্রশ্নাতীত ভূমিকায় স্থির আছে। তবে সবাই যে 'মানুষ' নামের যোগ্যতা অর্জন করছে, তা তো নয়। পারলে ভাল, না পারলে আর কী করা যাবে?

কিন্তু নারী সম্পর্কে?

অহরহ চিন্তা ভাবনা, আর প্রশ্ন।

প্রশ্নের শেষ নেই।

নারীর করণীয় কী, কর্তব্য কী, আদর্শ কী, সমাজ জীবনে বা সমাজ গঠনে তার ভূমিকা কী, ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন।

শুধু আজই নয়—

এ প্রশ্নের ধারা চলে আসছে যুগ-যুগান্তরের পথ বেয়ে।

একথা কোনদিন বলা হয়নি—তারও শুধু 'মানুষ' নামের যোগ্য হলেই চলবে।

হয়তো—এর একটিই কারণ, নারীও যে সমগ্র মানব সমাজের একজন এবং 'অধিকাংশই'—সমাজ একথা কোনদিন ভাবতে শেখেনি।

মেয়েদের নিয়ে সদাই তাই এত চিন্তা ভাবনা।

তাকে কোথায় রাখলে মানায়, কীভাবে রাখলে সুবিধে হয়, কোন্‌দিকে চাপান দিলে বা নামিয়ে দিলে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

আদ্যিকাল থেকে এই চিন্তা ভাবনার ইতিহাস দেখলে মনে হয় সে যেন এক সুস্থির মানবসমাজের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়া একটা গোলমেলে বস্তু মাত্র।

তাই নারী সমাজ আজও উদ্বাস্তু।

আজ পর্যন্ত স্থির হলো না এই 'জাগতিক' জগতে তার যথার্থ জায়গাটি কী? আজও তার পায়ের তলায় একটি শক্ত ভূমি নেই।

যা নাকি সমাজগঠনের আদি পর্ব থেকে পুরুষের জন্য স্থিরীকৃত হয়ে আছে।

অন্ধকার অতীতে অরণ্যচারী বন্য মানবগোষ্ঠী একদা যেদিন তাদের এলোমেলো জীবনের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল, তখনো তার প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল দলের মেয়েগুলোকে নিয়েই।

অবশ্য ভাল ভাব নিয়েই।

বহিঃপৃথিবীর রুক্ষ কর্কশ নিরাপত্তাহীন পরিবেশের আওতা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে কী করে তাদের নিরাপদে নিরাপত্তায় রাখবে এই ভাবনা।

পাহাড়ের গুহায়? না বৃক্ষ কোটরে? নাকি ঘন অরণ্যের অন্তরালে? তা সেখানেও তো হিংস্র প্রাণীরা। তাহলে? সঙ্গে করেই নিয়ে বেড়াবে?

কিন্তু সেটাই তো হয়ে আসছিল এতদিন, পশুপক্ষী জীবজন্তুর মতোই। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে একসঙ্গে ঘুরেই তো বেড়িয়েছে। তবে? নতুন ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থাটা কী হলো? সদা জাগ্রত চিন্তা চেতনার রূপটি দিতে পারে কোন্ পদ্ধতি?

এ প্রশ্নের উত্তর ওই নারীজাতির কাছেই।

নারী জননী, নারী ধাত্রী, নারী পালয়িত্রী! সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি রহস্যের ধারক বাহক নারী। তাই তখনো পর্যন্ত সেই অবোধ মানুষগুলোর কাছে নারী একটি বিস্ময়। আর বিস্ময়ের বস্তু বলেই মূল্যবান।

অতএব নিয়মের রীতিতে মূল্যবান বলেই তাকে ভালভাবে রক্ষা করার চিন্তা। আততায়ীর হাত থেকে, বহিঃশত্রুর হাত থেকে এবং দুরন্ত দুর্দান্ত আদিম প্রকৃতির নিষ্ঠুর আক্রমণের হাত থেকে।

এই নিয়েই ভাবনা করেছে সেই অরণ্যচারী মানবগোষ্ঠী। নারীর জন্য, আর তার শিশুর জন্য চাই, নিরাপদ আশ্রয়। তবে তাদের জন্যে ঘর বাঁধো, তাদের জন্যে আহরণ করে আনো খাদ্য, পানীয়, আরাম আর সুবিধার আয়োজন।

পুরুষ ঝড়ে, জলে, রোদে, ঘামে জীবন-সংগ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলুক ক্রমোন্নতির পথে, আর নারী তার গড়ে তোলা ঘরে তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকুক সেবা, যত্ন, মমতা, সান্ত্বনার সম্ভার নিয়ে।

সমাজ গঠনের মূলে তো এই চিন্তা ভাবনা।

যার ফলে দাঁড়াল, এই নারী পৃথিবীর জন্যে নয়, নারী নিজের জন্যে নয়, নারী কেবলমাত্র পুরুষের জন্যে। মানবগোষ্ঠীর ক্রমোন্নতির অগ্রগতির জয়যাত্রার যে-ঘটনাপ্রবাহ বয়ে চলেছে, নারী তার শরিক নয়; সহায়কমাত্র। যদিও সে সহায়তার স্বীকৃতি দেখা যায় না। পুরুষ তো আপন শক্তির নিত্য নতুন উন্মোচনের উল্লাসে মদমত্ত।

তারপর তো হাজার হাজার বছর কেটে গেল।

গুহা থেকে বেরিয়ে পড়া মানুষ অবিরত জয়ের সাধনায় এগতে এগতে চাঁদে গিয়ে হাজির হয়েও ক্ষান্ত হলো না। মহাকাশ জয়ের সাধনায় লাগল উঠে পড়ে। হতেও থাকছে সফল, কিন্তু 'সমাজগঠনের' আদি পর্বের সেই নকসার কি খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেছে? আজকের সমাজেও নারী সম্পর্কে ভাবভাবনা কি প্রায় সেই একই নেই?

'সংসার, সন্তান', আর জয়োন্মত্ত পুরুষের সংগ্রামী জীবনে একটু 'শান্তি স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান' এই তো হচ্ছে নারী জীবনের প্রধান করণীয়। অথবা এইটুকুই তার করণীয়ের গণ্ডি, এমন মনোভাবই কি আজও সমাজের গভীর গোপনে বদ্ধমূল নেই?

নারীও যে একটি পরিপূর্ণ মানুষের অধিকার পাবার অধিকারী, এবং সুযোগ পেলে সেই ভূমিকা ভালভাবেই পালন করতে পারে এটা এখনো যেন সব সমাজে স্বীকৃত নয়।

যদিও এই হাজার হাজার বছরে জগতে আর সমাজে বহু রূপান্তর ঘটেছে। দেশে দেশে কালে কালে বহিরঙ্গে অনেক বদল হয়েছে। কিন্তু হিসেব করলে দেখা যাবে যুগে যুগে এই রূপান্তরের আর পালাবদলের খেসারত জুগিয়ে এসেছে মেয়েরাই। তাদের নিয়েই ভাঙাগড়া। তাকে কখন কোন্ পরিবেশে কোথায় রাখলে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, এই নিয়েই যা-কিছু বদল।

কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে—মেয়েগুলো তো জড়বস্তু নয়, এই হাজার হাজার বছরে ওই মেয়েগুলোর মধ্যেও অনেক চিন্তা ভাবনা জন্ম নিয়ে চলেছে। তারা আর এই স্রোতের শ্যাওলার অবস্থায় থাকতে চাইছে না। নিজের জন্যে একটি কায়েম ভূমি চাইছে। পায়ের তলার জন্যে একটু শক্ত মাটি।

তাই কিছু লড়াকু মেয়ে 'অন্দর, অন্তঃপুর, অবগুণ্ঠন, হারেম, বোরখা' সবকিছুর জটিলজাল ছিন্ন করে পৃথিবীর হাটে বেরিয়ে পড়ে নারী সমাজের জন্য আদায় করে ছাড়ছে আইনের শক্তি সহায়তা, পৃষ্ঠবল।

অবশ্য এর সঙ্গে কিছু কিছু উদার মহান সমদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের সদিচ্ছার অবদানও আছে বৈকি! সমাজ যখন পুরুষশাসিত, তখন দাক্ষিণ্যটুকু যা আসবে তা সেই পুরুষের হাত থেকেই তো সবকিছু! স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতার চিন্তা পুরুষের মধ্যেই প্রথম এসেছে। তারাই প্রথম ভেবেছেন, রথের দুটো চাকার মধ্যে একটা পঙ্গু হয়ে থাকলে, সে রথ এগোবে কী করে?

তা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, মেয়েদের দাবিদাওয়ার সবকিছুই তো পূরণ হয়েছে, কোথাও তো অধিকারের ভেদ দেখা যায় না। অবশ্য ধর্মীয় আচারের গোঁড়ামিতে আবদ্ধ কোন কোন সমাজ ব্যতীত। সেটা আলাদা ব্যাপার।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তো সমাজের কোন ক্ষেত্রেই নারীপুরুষের অধিকারের তারতম্য দেখা যায় না। প্রাচ্যের থেকে পাশ্চাত্যের দেশগুলি অবশ্যই এ বিষয়ে অগ্রসর। অথচ—আশ্চর্য এই—

সেইসব দেশগুলিতেই নারীসমাজ অসন্তোষ অস্থিরতা বিদ্রোহ আর প্রতিবাদে সোচ্চার।

তাহলে রহস্যটা কী?

পায়ের তলায় শক্ত মাটি পেয়েও, কেন আজকের মেয়েরা সমাজে নিজের সঠিক ভূমিকা স্থির করে নিতে পারছে না?

কেন অনেক পেয়েও মনে হচ্ছে 'কিছুই যেন পাওয়া হয়নি।'

অথচ এই কর্মচঞ্চল বৃহৎ পৃথিবীতে আজ তো মেয়েরা সব কর্মযজ্ঞে হাত লাগাচ্ছে। সব কর্মকাণ্ডের শরিক হচ্ছে। সমকক্ষতায় আর দক্ষতায় তো তাক লাগিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীকে! অনন্তকালের অনভ্যাসের ঘাটতিটি তো ধরা পড়তেও দিচ্ছে না।

তবে?

কেন এখনো নারীকণ্ঠ অভিযোগে সোচ্চার? কেন অসন্তোষ অশান্তি বিদ্রোহ?

এ প্রশ্নের উত্তরও শোনা যায়। 'মেয়েরা আইনের কাছে সমান অধিকার পেয়েছে, কিন্তু সমাজের কাছে সমান মর্যাদা পাচ্ছে না।'

এইখানেই আসে মেয়েদের মধ্যে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন।

কেন পাচ্ছে না সেই মর্যাদা? যা তার প্রাপ্য? 'প্রাপ্য' কিন্তু পাচ্ছে না। তাহলে ত্রুটিটা কোথায়? ঘাটতিটা কার মধ্যে?

ভেবে চিন্তে এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছতে হয়, ঘাটতিটা নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই।

পুরুষ জাতটি এযাবৎকাল যাদেরকে 'সম্পদ সম্পত্তি', আর নিজস্ব একটি 'বস্তু'র মতো ভেবে এসেছে, তাদের হঠাৎ 'পূর্ণ একটি মানুষ' বলে ভেবে উঠতে পারছে না। বরাবরের সঞ্চিত অবহেলা অবজ্ঞার স্তূপ সরিয়ে ফেলতে পারছে না।

'মেয়েদের দ্বারা কিছু হয় না' এই ভাবনাটি ছিল সুখকর। মেয়েদের দ্বারা সবই তো হয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে, এমনকি তার মূল ভূমিকা ঘরসামলানোর মধ্যে থেকেও। এ অভিজ্ঞতাটি বিরক্তিকর। যেন বরাবরের একটি হেরে থাকা পার্টি হঠাৎ জিততে শুরু করেছে।

মজ্জাগত সংস্কার, যা সেই কোন্ অতীতকাল থেকে চিন্তায়, চেতনায়, রক্তে বদ্ধমূল হয়ে চেপে বসে থেকেছে, তাকে চট করে মুছে ফেলতে পারা শক্ত বৈকি। তাই আজও আমাদের এদেশে 'পণপ্রথা'র এই ভয়াবহ রূপ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

অপরপক্ষে সেই একই সমস্যা নারীসমাজের মধ্যেও।

একদিকে সে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের দাবি নিয়ে লড়াইয়ে নামে, মর্যাদার ঘাটতিতে ক্ষিপ্ত হয়। অপরদিকে যুগযুগান্তরের অভ্যস্ত সংস্কারে 'পুরুষের চোখের মুগ্ধদৃষ্টি'র আকাঙ্ক্ষায় 'মোহিনী' হতে চায়, 'মনোহারিণী' হতে চায়, পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায় সযত্ন সচেষ্ট হয়।

তার এই দুর্বলতাটি জগতের চোখে ধরা পড়ে বৈকি!

স্বভাবতই সেখানে 'মর্যাদার দৃষ্টি' সৃষ্টি হয় না।

অথচ এই বিপুল বিশ্বে পৃথিবীর সব প্রান্তে যুগ যুগ ধরে পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা এই মেয়ে জাতটি জেনে এসেছে মালিক পুরুষ, প্রভু পুরুষ এবং অত্যাচারী পুরুষকেও বশ মানাবার হাতিয়ার হচ্ছে তার লাবণ্যলালিত্য, সুষমা সৌন্দর্য কটাক্ষ ভ্রূভঙ্গি!

ওই হাতিয়ারটিকে 'অপ্রয়োজনীয়' বলে অবজ্ঞায় ফেলে দেবার মতো মানসিক মুক্তি আজও মেয়েদের মধ্যে আসছে না।

অবশ্য ব্যতিক্রম তো আছেই; থাকবেও।

কোনদিনই মোহিনী মোহনিয়া হতে চায়নি, সমাজে এমন দৃঢ় বলিষ্ঠ মেয়েরাও চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবে।

কিন্তু আলোচনা তো অনেককে নিয়ে।

আজকের মেয়েরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে উচ্চপদ-অধিকারে অনেক উঁচুতে উঠে গেলেও, সেই চিরকালের সংস্কারের কাছে আজও বন্ধনগ্রস্ত। আজও তার সমস্ত শক্তির সম্বলের থেকে বেশি ভরসা রাখে তার রূপকে। মনোহারিত্বকে।

এই দুর্বলতার প্রকাশ বড় শোচনীয়ভাবেই ধরা পড়ে, মেয়েদের 'কাজ'-এর সঙ্গে 'সাজ'-এর সামঞ্জস্যহীনতায়।

মেয়েদের এ 'দুর্বলতা' কমতে তো দেখা যায় না, বরং যেন বেড়েই চলেছে।

বরং যেসব অবোধ মেয়েরা আজও অন্ধকারে পড়ে আছে, যারা জানেও না নারীর অধিকার আর নারীর মর্যাদার লড়াইয়ে পৃথিবী তোলপাড়, তাদের মধ্যে এ দুর্বলতা কম। হয়তো বা 'অভাবেই' কম। জগতের এত সব দেখছে না বলেও কম।

কিন্তু শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত অগ্রসর নারী সমাজের মধ্যে এই রূপসী রূপময়ী হবার চিন্তা চেষ্টাটি বড় শোচনীয়ভাবেই প্রকটিত! যেটা দুঃখের, লজ্জার!

একটু স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেই এ-সত্য ধরা পড়ে, সমগ্র পৃথিবীতে আজ প্রসাধন ব্যবসায়ীরাই ক্রমশ ধনী থেকে আরো ধনী হয়ে উঠছে। সবচেয়ে জমজমাটি কারবার নারীর বসনভূষণ, সাজসজ্জা আর অঙ্গরাগের বিপুল সম্ভারের।

দেখলে লজ্জা করে, কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতাদের নির্লজ্জ প্রচারে দেখতেও হচ্ছে অহরহ, সর্বত্র! পথে, ঘাটে, ছবিতে, টি.ভি.-তে, কাগজে, পত্তরে, এককথায় যত্রতত্র প্রচার কার্য চলেছে—

'হে নারী, দেখো তোমায় রূপসী আর মনোহারিণী করে তোলবার জন্যে আমাদের কত আয়োজন। তিল তিল করে তোমায় তিলোত্তমা করে তুলতে পারি আমরা!... তোমার লাবণ্য লালিত্য কোমলতা কমনীয়তা, সবই আমার ভাঁড়ারে মজুত!... তোমার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। কটাক্ষ থেকে ভ্রূভঙ্গি পর্যন্ত সবকিছুর দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দাও। দেখো তোমায় কী অপরূপা করে তুলতে পারি।'

এ প্রচার তো বেড়েই চলেছে। দেখে লজ্জায় দুঃখে মাথা কাটা যায় না কি? কিন্তু সেই প্রতিবাদ কোথায়? উচ্চমানের পত্রপত্রিকাগুলি পর্যন্ত তাদের দামী কাগজের অর্ধেকটা ধরে দিচ্ছে এই বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে।

একদা এক মেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করেছিল। "প্রসাধনে মেয়েদের চিরন্তন অধিকার। আড়াই হাজার বছর আগে অজন্তার যুগেও মেয়েরা কিভাবে প্রসাধনের সাধনা করত, তার নজির পাথরে খোদাই হয়ে আছে।"

তার কাছে আমার দুটি উত্তর অথবা প্রশ্ন ছিল। সেই মেয়েদের প্রসাধন ছিল আপন মনে সঙ্গোপনে। উন্মুক্ত পৃথিবীর সামনে, ব্যবসায়ী পুরুষের কাছে হাত পেতে নয়। আর সেই মেয়েরা কি সমান অধিকার আর সমান মর্যাদার লড়াইয়ে নেমেছে সেদিন?

আজ এই যে পৃথিবীজুড়ে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বিজ্ঞাপনের খেলা চলছে, তার শিকার কারা? বেশির ভাগই শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত অভিজাত ঘরের মেয়েরাই। শুধু ধনী দেশেই নয়, আমাদের এই গরিব দেশেও।

বহু কোটি টাকা উসুল হবার আশা না থাকলে ব্যবসায়ীরা নিশ্চয় কোটি টাকা নিয়োগ করে না। কোথা থেকে উসুল হয় সেটি?

ক্রমশই বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে চলে যাচ্ছে দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, সঙ্গীত।

কিসে তাদের এত বাড়বাড়ন্ত?

সামান্য একটি কেশতৈল বা মুখে মাখার ক্রিমের দৌলতে কী করে এমন লাভের বাড়াবাড়ি? এর কতটুকু লাগে সমগ্র সমাজের? আর কতখানি লাগে কেবলমাত্র নারীসমাজের?

তাই একান্তে প্রশ্নঃ "এই মেয়েরা, আর কতদিন এই দুর্বলতার শিকার হবে?"

পুরনো অভ্যাসের জাল-জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে কবে তোমরা মাথা তুলে দাঁড়াবে?

শ্রদ্ধা আর মর্যাদা অর্জন করতে হলে প্রথম প্রয়োজন ত্যাগের, নির্মোহের। লড়াই করে আন্দোলন করে অধিকার লাভ হতে পারে—মর্যাদা লাভ হয় না।

অথচ দেখা যাচ্ছে—ওইটিই পাওয়া সবচেয়ে জরুরি।

আজকের প্রগতিশীল পৃথিবীতে নারীসমাজও অনেক অধিকার পেয়েও শূন্যতা বোধ করছে। তার কারণ এখনো সমাজ পুরুষশাসিত।

রাজ্যে রাষ্ট্রে প্রশাসনে, নারীকে কর্ণধার হতে দেখা আর আশ্চর্য নয়। বহির্জগতে কর্মকেন্দ্রে কোন নারীকে পদমর্যাদার সর্বোচ্চশিখরে দেখতে পাওয়াও অসম্ভব নয়। তবু দেশে, রাজ্যে, এদেশে, বিদেশে সমগ্র মেয়েরা হাড়েহাড়েই জানে, আসল ক্ষমতা কাদের হাতে।

কাজেই মেয়েদের মধ্যে অনেক পেয়েও না পাওয়ার শূন্যতা। এর আর প্রতিকার কই?

তবে যদি কখনো এমন দিন আসে মেয়েরা তার দুর্বলতার জাল-জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আর চিরকালের শাসকগোষ্ঠীর চিত্তে এ চৈতন্যের উদয় করাতে পেরেছে—"এই পৃথিবীখানা যে কেবলমাত্র আমারই জন্যে আমার এ-ধারণাটিতে বোধহয় ভুল ছিল। ঈশ্বরের সৃষ্ট এই পৃথিবী বোধহয় নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই।"

অথবা উভয়েই পৃথিবীর জন্যে। একে অপরের প্রভুও নয়, দাসও নয়।

তাহলে হয়তো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দুটো জাত একসঙ্গে হাত মিলিয়ে আজকের এই বিক্ষুব্ধ সমাজকে ভেঙে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলবে, একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তুলবে। যেখানে স্বীকৃত হবে রথের দুখানা চাকাই সমান দরকারী, আর দুখানাই সমান মজবুত হওয়া দরকার।

হয়তো কোন একদিন আসবে সেদিন। কোন একটা ভুল চিরকাল চলে আসছে বলেই যে চিরকাল চলবে, তা নাও হতে পারে।

কিন্তু সেই নতুন সমাজে নারীর ভূমিকাটি কি 'নতুন' আর আলাদা হবে?

মনে তো হয় না।

সে তার চিরকালের ভূমিকাটিতেই স্থির থাকবে। সেই রাজমিস্ত্রির হাতের তৈরি 'জোড়ানোর মসলা'র ভূমিকায়।

সমাজে সংসারে যেখানে যত অসমান অমসৃণ ভাঙাচোরা তেকোনা কোনাচে টুকরো একত্রে জড়ো হয়ে ঠেলাঠেলি করে কর্কশধ্বনি তুলবে, সেখানেই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে মিলিয়ে দেবার, খাপে খাপে বসিয়ে দেবার কাজে নিজেকে লাগিয়ে দেবে।

কারণ বিশ্বরাজমিস্ত্রি তাকে সেইভাবেই গড়ে রেখেছেন। সে জানে সৃষ্টিকর্তার তার কাছে অনেক প্রত্যাশা। সে 'ঘর' চায়, সংসার চায়, স্বামী সন্তান নিয়ে একটি সুখী জীবন চায়। বাইরে যতই সমান অধিকারের লড়াইয়ে নামুক, তার অন্তরের গভীর স্বপ্ন, শান্তি, স্বস্তি আনন্দময় সুন্দর একটি সংসারের। সেটিকে পেতে আর টিকিয়ে রাখতে তার চিরদিনই আত্মবিলোপের সাধনা। সমাজে সংসারে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি রাখতে, সামাজিক জীবনের দায় বহন করতে, পরিবার জীবনে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে মেয়েরা সবসময় নিজের চাহিদাটিকেই তুচ্ছ করে চলে। জীবনের এই ছাঁচটিকে অটুট রাখতে হয়তো কত অভিনয় করে চলতে হয় তাকে, চেপে রাখতে হয় আপন ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা। কারণ সে ঘর চায়, জীবন চায়।

হয়তো নারী হৃদয়ের এই 'চাওয়াটি' বিশ্বস্রষ্টার কোন নিগূঢ় অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্তই। নারীর কাছে তাঁর অনেক প্রত্যাশা। তাই তিনি নারী-হৃদয়ে মজুত রেখেছেন বাড়তি অনেকখানি স্নেহ, করুণা, মমতা, ক্ষমা, ধৈর্য, সহনশীলতা, শুভবোধ, কল্যাণবোধ, আর ওই আত্মবিলোপের শক্তি।

তাই মনে হয়, সহজাত প্রবণতাতেই ভবিষ্যতের বিজয়িনী নারীও নতুন সমাজ গঠনের শরিক হতে পেলেও, সেই তার চিরকালের পুরনো ভূমিকাতেই রয়ে যাবে, বুঝে বা না বুঝে এযাবৎকাল যে ভূমিকা সে পালন করে এসেছে। তবে হয়তো সেটাই পালন করে চলবে স্বেচ্ছায় সানন্দে। কারণ সে জানে আর মানে সমাজজীবনে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্বটি তারই।

আসল কথাটিই এই—

সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা নিজেকে গৌণ রাখা, নিজস্ব সত্তার বিলোপ সাধন। তাতেই 'সমাজ' নামক বস্তুটির শান্তি, স্বস্তি, স্থিতি, শৃঙ্খলা। নারী এইটি মেনে নিয়েছে বলেই সমাজের অস্তিত্ব বজায় আছে। ব্যতিক্রম ঘটলে সে অস্তিত্বটি আর থাকবে না।

ছন্নছাড়া স্ত্রীপুরুষের দল, নিতান্তই প্রাণিজগতের মতো পৃথিবীর হাটে ঘুরে বেড়াবে, আর হয়তো ধীরে ধীরে আবার সেই সমাজবন্ধনহীন গুহাজীবনের দিকেই ফিরতে থাকবে।

কারণ নারীকে ঘিরেই সমাজগঠনের পরিকল্পনা। আর নারীর আত্মবিলোপকারী সহনশীলতার ওপর ভিত গেড়েই সেই সমাজকে টিকিয়ে রাখা।* □

* ৮৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা

নিশীথরঞ্জন রায়

গদাধরের (১৮৩৬-১৮৮৬) বাল্য এবং কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছিল পল্লীর শান্ত পরিবেশে। বাইরের জগতের সঙ্গে প্রায় নিঃসম্পর্কিত পরিবেশ। সেই অঞ্চলে বহিরাগত বলতে বোঝাত তীর্থযাত্রীর দল, সাধু-সন্ন্যাসী, বৈরাগী-বাবাজী, ফকির-দরবেশ, ভ্রাম্যমাণ যাত্রা আর কথকতার গায়ক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের স্ত্রী-বিয়োগের (১৮৪৯) পর একদিকে মানসিক সন্তাপ, অপরদিকে সংসার চালনার জন্য অধিক অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন—এই দুটি কথা ভেবে রামকুমার চতুষ্পাঠী স্থাপনের উদ্দেশ্যে কামারপুকুর ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায় (১৮৫০)। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর সেইসময় গ্রামেই থেকে গেলেন। কিন্তু মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর যখন অগ্রজকে জানালেন যে, পড়াশুনোর দিকে গদাধরের তেমন ঝোঁক নেই তখন রামকুমার তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ঝামাপুকুরে (১৮৫৩)। একটানা প্রায় সতের বছর গ্রামীণ আবহাওয়ায় কাটিয়ে গদাধর পদার্পণ করলেন কলকাতায়।

কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুরে—অজ পাড়াগাঁ থেকে রাজধানী শহরে। গদাধর চতুষ্পাঠী আর ঘর-সংসারের কাজে সাহায্য করবেন, আর সেই সঙ্গে টোলে পাঠাভ্যাসও করবেন—এই ছিল কনিষ্ঠের কাছে রামকুমারের প্রত্যাশা। কিন্তু তা পূরণের কোন লক্ষণ নেই। আতপতণ্ডুল, কাঁচকলা আর ফলমূলের ছাঁদাবাঁধার উপযোগী বিদ্যার প্রতি গদাধরের অনীহা যথাপূর্বম। সুতরাং পরিবেশ নতুন হলেও, ঝামাপুকুর তাঁর জীবনে রচনা করতে পারেনি কোন নতুন অধ্যায়। নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হলো আরো পরে।

গদাধরের ঝামাপুকুর বাস শুরু হবার তিন বছর পর (১৮৫৫) জানবাজারের স্বনামধন্যা রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠা করলেন গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে জগৎ-বিখ্যাত কালীমন্দির। রামকুমারের ওপর ন্যস্ত হলো নব-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে যথাবিহিত পূজার্চনার দায়িত্ব। রামকুমার এই দায়িত্বভার গ্রহণ করায় গদাধর ঝামাপুকুর ছেড়ে মন্দির প্রাঙ্গণেই বসবাস শুরু করলেন। এখানেই তাঁর দিব্যজীবনের প্রকাশ। একবছর পরে রামকুমার লোকান্তরিত হলে একুশ বছর বয়সে গদাধর গ্রহণ করলেন ভবতারিণীর পূজার দায়িত্ব (১৮৫৭)। এখানেই ঘটে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে গদাধরের সাধক-জীবনের উত্তরণ। ক্রমে তাঁর ঈশ্বরভক্তি আর জীবপ্রেমের খ্যাতি অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীদের আরেকটি আকর্ষণের বিষয়বস্তু হলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন কলকাতাবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

রামকুমারের দেহত্যাগের বছরে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের বিদ্রোহ দমনের শেষে ইংরেজ-প্রভুত্ব আরো জাঁকালো হয়ে দেখা ততদিন প্রায় গোটা দেশ জুড়ে ইংল্যান্ডের সার্বভৌম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজ-শাসনাধীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা—লন্ডনের পরেই যার স্থান। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল ভারতের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের নরনারী; তাছাড়া ছিল বিদেশাগত বহু নরনারী।

সেদিনকার কলকাতার বাঙালীসমাজের কৃষ্টি নতুন স্রোতে বইতে শুরু করেছে। উনিশ শতকের তিন দশক থেকে ইংরেজী চালচলনের অন্ধ অনুকরণের যে প্রবল ঢেউ বাঙালী-মানসিকতার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল তা ততদিনে থিতিয়ে এসেছে। বাঙালী আগের তুলনায় অনেক বেশি আত্মসচেতন, নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কেও শ্রদ্ধাশীল। পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যপন্থীদের মধ্যে যে-সঙ্ঘাত একদিন কলকাতার বিদ্বজ্জনসমাজকে পরস্পর-বিরোধী দুটি শিবিরে বিভক্ত করেছিল তাদের মধ্যেও ফিরে এসেছিল সমঝোতা। সমাজজীবন থেকে অনাচার অসাম্য দূর করার যে-প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেছিলেন রামমোহন, সেই আন্দোলন তখনো গতিসম্পন্ন ছিল। প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ এবং পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে সমাজসংস্কারকামী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনও ছিল গতিশীল; যদিও রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন নরমপন্থী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে নরমপন্থীদের নেতৃত্বের দুর্গে ফাটল ধরতে দেখা যায়।

একদিকে বহু সাধনপদ্ধতির অনুশীলন, অপরদিকে নিজের অন্তর্নিহিত অপার্থিব ঐশ্বর্য অবলম্বন করে ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে গদাধরের যখন রূপান্তর ঘটছে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে, তখন কলকাতার বৌদ্ধিক জীবনের চেহারাটি একটি স্থিরচিত্রে পর্যবসিত হয়নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরস্পর-বিরোধী মতবাদের প্রাবল্য। কিছুটা আশাভঙ্গ, আবার সেইসঙ্গে নতুন আশার আলো। সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে অগ্রগতি। প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে প্রতিক্রিয়াপন্থী রক্ষণশীলতার চিরকালীন দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রসার, ইংরেজ সরকারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসাম্য। পুঁজিবাদীদের প্রাধান্য। শিক্ষিত এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনসমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান, সামাজিক জীবনে সংস্কার আন্দোলনের সীমিত সাফল্য। সর্বোপরি সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে একদিকে অশিক্ষা, অপরদিকে দারিদ্র্যের ভয়াবহ প্রসার—সব মিলিয়ে উনিশ শতকের তিন দশক থেকে শুরু করে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত—এই সময়-সীমাটিতে কলকাতার জীবনে নানা বিষয়ে আদর্শগত বিরোধ এবং নতুন ও পুরাতনের মধ্যে চিরকালীন সঙ্ঘাত কলকাতার সমাজজীবনে সৃষ্টি করেছিল একদিকে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা, অন্যদিকে সেই অস্থিরতা থেকে পরিত্রাণের উপায়-সন্ধান।

সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনের দ্বন্দ্ব আর অস্থিরতার চিত্রটিই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। 'ইংরেজ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না'—এই কথাটি নির্বিবাদে মেনে নেওয়া হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে সেযুগে কিছু কিছু দাবি-দাওয়া অবশ্যই ছিল। কিন্তু এইসব দাবি-দাওয়ার মধ্যে উগ্রতা ছিল না। তখনো বিশ্বাস ছিল, গণতন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত ইংল্যান্ডের সরকার ভারতীয়দের কিছু কিছু

অধিকার মেনে নিতে অসম্মত হবে না। এই অবস্থায় ভারতীয় জনগণের দৃষ্টির বেশির ভাগ দখল করে নিয়েছিল ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সমাজবিষয়ক সমস্যা এবং তাদের সমাধানের প্রশ্ন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে খ্রীস্টধর্মের প্রচার জোরদার করতে গিয়ে মিশনারী সম্প্রদায় ভারতীয় ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে। রামমোহন স্বতন্ত্র ধর্মমত প্রবর্তনের প্রয়াসী না হলেও পরবর্তী কালের ব্রাহ্মনেতারা তাঁদের ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্যের দাবি তুলে হিন্দুধর্মের ঐক্য কিছু পরিমাণে হলেও ব্যাহত করেছিলেন। ইসলামধর্মের অনুগামীরাও ক্রমশ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অধিক মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠছিলেন। আবার হিন্দুধর্মের প্রবক্তারাও জনসমক্ষে যেসব ব্যাখ্যা তুলে ধরছিলেন তার মধ্যেও ছিল নানা অসঙ্গতি এবং পরমত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা। বাংলার পল্লীবাসীরা এতে বিচলিত হননি, তাঁরা নিজ নিজ বিশ্বাস এবং সংস্কার অনুযায়ী যে-ধরনের জীবনযাপন করছিলেন তা নিস্তরঙ্গই ছিল, অশান্ত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু রাজধানী শহর কলকাতার কথা স্বতন্ত্র। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে এখানে অজস্র প্রশ্ন, বহু বাদবিতণ্ডা, তর্কযুদ্ধ, পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা। সব মিলিয়ে এখানে দেখা দিয়েছিল দ্বন্দ্ববিদীর্ণ এক অস্বস্তিকর পরিবেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর-বাসের প্রথম কটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল কঠোর অধ্যাত্ম সাধনায়। তখন তাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল মন্দিরে সমাগত দর্শনার্থী আর রমতা সাধুসন্তদের মধ্যে। বাইরের জগতের সম্পর্ক তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। আত্মানুসন্ধান আর ঈশ্বর-উপলব্ধির দুশ্চর সাধনায় তিনি এমনই মগ্ন ছিলেন যে, তাঁর বাহ্যজ্ঞান অনেক সময় লোপ পেয়ে যেত। ক্রমে দর্শনার্থীরা শুধু বিগ্রহ দর্শনেই ক্ষান্ত থাকতেন না, তাদের দৃষ্টি ক্রমে আকৃষ্ট হলো ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদ, আত্মপর অভেদ-দৃষ্টি, সহজ সরল ভাষার উপদেশামৃত বিতরণকারী এই আত্মভোলা, নিরভিমানী সাধকপ্রবরের প্রতি। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে দর্শনার্থীদের মধ্যে অনেকে পরিণতি লাভ করলেন ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী—ভক্তরূপে। ক্রমে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃততর হতে লাগল। কলকাতা থেকে আগত দর্শনকামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। অনেকে আসতেন তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন নিয়ে, কেউ আসতেন আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সদুত্তর লাভের উদ্দেশ্যে, পার্থিব সমস্যার সমাধানের জন্যও কেউ কেউ খোলাখুলিভাবে তুলে ধরতেন তাঁদের ব্যাকুলতা সর্বত্যাগী এই অবতারপুরুষের কাছে। তাঁর দর্শনে মনের দুঃখভার দূর হবে, লাভ করবেন অপার্থিব শান্তি—এমনি বিশ্বাসও তাঁদের পৌঁছে দিত মন্দির-অঙ্গনে। রকমারি দর্শনার্থী, তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের ভিড় লেগে থাকত তাঁর ঐ ঘরটিতে।

এই সময়কার কলকাতার সমাজজীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমরা পাই না। কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী অর্ধশতকের তুলনায় ছয় থেকে আট দশকের মধ্যে শহরের জনসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোম্পানীর আদি যুগে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তাঁরা ছিলেন প্রথমে স্বাধীন ব্যবসায়ী, পরে কোম্পানীর কোলাবরেটর (Collaborator)। সেইসময়কার কলকাতার সমাজে কাঞ্চন-কৌলীন্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। মহারাজা নবকৃষ্ণের মতো অব্রাহ্মণও সেদিন ছিলেন সমাজপতি অথবা দলপতি। উনিশ শতকের

মাঝামাঝি থেকে সমাজচিত্র ভিন্নতর হতে থাকে। ততদিনে বড় মাপের ব্যবসাবাণিজ্য গুটিয়ে অনেকেই জমিদারির মালিক হয়ে নিশ্চিততর জীবনযাপনের দিকে ঝুঁকেছেন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রসার এবং ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের সংখ্যা বাড়ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণ ও যুবকরা উচ্চশিক্ষার এই সুযোগ গ্রহণ করেছিল বেশি মাত্রায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই উত্থান কলকাতার সমসাময়িক সমাজজীবনে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মানুষদের ক্রমবর্ধমান ভিড় এখানকার জনসমাজের চেহারা দ্রুতগতিতে পালটে দিতে শুরু করেছিল। কলকাতায় গড়ে উঠেছিল এক মিশ্রসমাজ—বহু ভাষাভাষী মানুষের এক মিলনক্ষেত্র। ধর্মাচরণের দিক থেকেও এদের মধ্যে ছিল লক্ষণীয় মাত্রায় বৈচিত্র্য। একই নগরের অধিবাসী—এই পরিচয়টুকুই ছিল তাদের পরস্পরকে এক সূত্রে ধরে রাখার উপাদান, এককথায় urban বা শহুরে মানসিকতা। তবু তাদের সমস্যা ছিল। জনবিস্ফোরণের সমস্যা এবং এই সমস্যা থেকে উদ্ভূত নাগরিক জীবনের উপযোগী স্বাচ্ছন্দ্যভোগের অপ্রতুলতা, প্রগতিবাদী বনাম রক্ষণশীলদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্য, নানাধরনের সামাজিক অনাচার আর সর্বোপরি ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধের সঞ্চার। হিন্দুধর্মের মধ্যে আচারসর্বস্বতা এবং একাধিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনের বিভিন্নতা সাধারণ মানুষের মনে সৃষ্টি করে চলেছিল বিভ্রান্তি এবং অসহিষ্ণুতা। সমাজ-সংস্কারবাদীদের মধ্যেও ছিল মতের বিভিন্নতা। এই অনভিপ্রেত পরিবেশের অবসান ঘটানোর জন্য রামমোহন চেয়েছিলেন পৌত্তলিকতার অবসান। পরবর্তী কালের ব্রাহ্মনেতারা চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন। তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের বিধি-বিধানকে কঠোরতর করে তুলতে। এমনি অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরের দিব্য-জ্ঞানের অধিকারী সাধকপ্রবর শোনালেন অভয়বাণী। সাধারণ মানুষের মনে তখন বিভ্রান্তির অন্ত নেই। 'কস্মৈ দেবায়?'—এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাচ্ছিলেন না তাঁরা। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাঁরা শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করেছিলেন তাঁরাও যেমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক সুধীজনরাও ঘটাতে পারছিলেন না তাদের সংশয়ের অবসান।

কলকাতাবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথায় ফিরে আসি। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহাগ্নি নির্বাপিত হওয়ার পর ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ কিছু কিছু অধিকার দানের যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কার্যক্ষেত্রে তা পালন করা হয়নি। সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা সত্ত্বেও তাদের প্রবেশ অধিকার অব্যাহত ছিল না। শ্বেতাঙ্গদের জাতিবৈরের সহজ শিকার ছিল ভারতীয় প্রজারা। শোষণ আর অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল নিরর্থক। অথচ ইংরেজদের সার্বভৌম আধিপত্য বল্গাহীনভাবে বেড়ে চলেছে। এসবই ছিল অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র—কোথাও ছিল না স্বাচ্ছন্দ্যবোধের লেশমাত্র সুযোগ।

কলকাতা শহরের ইতিহাস খুব পুরনো নয়। কিন্তু যতটুকু ইতিহাস আমরা জেনেছি তাতে বিষয়বস্তু হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে এখানকার শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত 'হোয়াইট টাউন'। ইংরেজী সূত্রে দিশি পাড়ার বিবরণ প্রায় অনুপস্থিত। ইংরেজ-বাসিন্দাদের পরেই কলকাতার সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ছিলেন second class citizens। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে ছিল তিনটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের একটি প্রতিবেদনে এই শ্রেণী-বিভাগের উল্লেখ রয়েছে। এই গণনায় কলকাতার নাগরিকদের তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে যথাক্রমে স্থান লাভ করেছেন ৭, ২৮ এবং ৪০ জন শহরবাসী। এই তালিকা দেখে মনে হয় যে, বংশগৌরব অপেক্ষা কাঞ্চনগৌরবই ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিয়ন্তা। প্রথম শ্রেণীর সাতজনের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন রাজবল্লভ, নন্দকুমার-পুত্র গুরুদাস— এঁদের ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরা প্রায় সকলেই ছিলেন কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্যের তল্পি-বাহক, সাহেব আদমীদের দেওয়ান হিসাবে হোমরাচোমরা। তৃতীয় শ্রেণী বলে যাঁরা চিহ্নিত তাঁদের জীবন শুরু হয়েছিল হয় কোম্পানীর মাঝামাঝি স্তরের কর্মচারী কিংবা অর্থশালী ব্যবসায়ী রূপে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনটি তালিকারই বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে ব্রাহ্মণেতর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা।

অনুমান করা যেতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করতেন কোম্পানীর অনুগৃহীত অথবা স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ভারতীয় পরিবার যাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই বেশি। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশ অধিকতর স্বীকৃতি পেতে থাকে। তাঁরা সরকারি চাকুরিসূত্রে অথবা চিকিৎসক, আইনজীবী এবং মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে শুরু করেন।

রামকৃষ্ণদেবের খ্যাতি যখন তুঙ্গে তখনো কলকাতার সমাজজীবনে এই ধারাটিই অক্ষুণ্ণ ছিল। সেইসময় কলকাতা থেকে যাঁরা তাঁর কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন তাঁদের পূর্ণ তালিকা পাওয়া সম্ভব নয়। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী অধরলাল সেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক, সাপ্তাহিক বসুমতী এবং দৈনিক বসুমতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষক এবং 'রামকৃষ্ণ পুঁথি'র লেখক অক্ষয়কুমার সেন, নাট্যাচার্য এবং বহু নাট্যগ্রন্থের রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিক্ষকপ্রবর 'রামকৃষ্ণকথামৃত'-এর লেখক স্বনামধন্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 'মাস্টার' নামে পরিচিত)। অভিজাত জমিদারবংশের সন্তান পরম বৈষ্ণব বলরাম বসু, সওদাগরী অফিসের মুৎসুদ্দি সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের করণিক মনোমোহন মিত্র, চিকিৎসক 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত'-এর লেখক রামচন্দ্র দত্ত। ঠাকুরের 'রসদ্দার' হিসাবে পরিচিত রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস-প্রমুখ বিচিত্র ব্যক্তিত্ব যাঁরা গ্রথিত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেবের প্রতি অহেতুকী ভক্তিতে। শ্রীরামকৃষ্ণকে সমর্পিতপ্রাণ আর যেসব গৃহিশিষ্য দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন

'সাধু নাগমহাশয়' নামে সুপরিচিত দুর্গাচরণ নাগ, গায়ক নীলকণ্ঠ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, নবগোপাল ঘোষ, বিপিনবিহারী ঘোষ, প্রমথনাথ কর, শম্ভুচরণ মল্লিক, চুণীলাল বসু, মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, ভাই ভূপতি, কিশোরীমোহন রায়, অ্যাটর্নি দীননাথ বসু, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীলেখক শশিভূষণ ঘোষ, মহিম চক্রবর্তী, জয়গোপাল সেন, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশান মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এবং সকলেই ছিলেন সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। 'রামকৃষ্ণকথামৃত'-এর লেখক লিখেছেন—"ঠাকুরের ভক্তরা অসংখ্য—তাঁহারা কেহ প্রকাশিত আছেন, কেহবা গুপ্ত আছেন—সকলের নাম করা অসম্ভব।"

কলকাতার সে-যুগের বনেদি পরিবারের অধিকাংশই বসবাস করতেন উত্তর কলকাতায়—পুরনো আমলের সুতানুটি অঞ্চলে। বাগবাজার, বেলগাছিয়া, শ্যামপুকুর, চিৎপুর, কুমারটুলি, পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো, আহিরিটোলা, শ্যামপুকুর, শোভাবাজার, পোস্তা, সিঁদুরিয়াপট্টি, বৌবাজার, তালতলা, সিমলা, ঝামাপুকুর, কাঁকুড়গাছি, বাদুড়বাগান—এসব অঞ্চলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অবারিত গতি। এছাড়া ছিল দক্ষিণ কলকাতায় কালীঘাট, ভবানীপুরে গৌরী মা-র মাতুলালয় এবং বেলতলায় মধুসূদন ভট্টাচার্যের বাড়ি। তাছাড়া ছিল চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, এশিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট উইলিয়ামসহ গড়ের মাঠ। ঠাকুর যেমন ভক্তদের টানতেন দুর্বার শক্তিতে, তেমনি ভক্তরাও আকর্ষণ করতেন ঠাকুরকে। এদের অনেকের বাড়িতেই ঠাকুর যেতেন। তাছাড়া সেদিনকার কলকাতার খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে দূরত্ব রচনার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মাইকেল মধুসূদন—এঁরা সকলেই ছিলেন ঠাকুরের দর্শনধন্য।

এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পরমহংসদেবের কাছে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁর ওপর স্থাপন করেছিলেন অচলা ভক্তি, তাঁরা তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পরিণতি লাভ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ তাঁর ত্যাগী শিষ্যরূপে। তাঁদের কেউ কেউ জন্মেছিলেন শহর কলকাতায়, কেউ কেউ শহরতলীতে। এঁদের অনেকেরই বাল্য এবং কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবেশে।

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে—একদিকে ঠাকুরের অধ্যাত্মসাধনা এবং সেই সাধনার উপলব্ধ ফল বিতরণের প্রচারধর্মিতার অভাব সত্ত্বেও তার ব্যাপকতা এবং গভীরতা, অপর দিকে কলকাতা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু আলোচিত রেনেসাঁস আন্দোলন পরস্পরের পরিপোষক বলে গণ্য হতে পারে। সামগ্রিক বিচারে রামকৃষ্ণদেবের গুরুত্ব এবং প্রভাব শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা পরিব্যাপ্ত ছিল ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবনদর্শনের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের মধ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অনেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনে সার্থকতার সন্ধান। আবার আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অতি-সচেতনতা আমাদের একশ্রেণীর কলকাতাবাসীর মনে যে-ধারণাটিকে বদ্ধমূল করে তুলেছিল তা অন্ধ গোঁড়ামির নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য এই দুটি বিশিষ্ট জীবনদর্শনের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনার সাধু প্রচেষ্টাও এই যুগের অপর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা ছিলেন রামমোহন

এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতারা। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যত মহানই হোক না কেন, জনমানসে তা ব্যাপকভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁরা যতটুকু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, অধ্যাত্মক্ষেত্রে তা ততটুকু গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। হয়তো বা হিন্দুধর্মের উপাস্য দেবদেবীর মূর্তিপূজার বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরা জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারেননি। কলকাতায় যখন পরস্পর-বিরোধী এইসব শক্তির মধ্যে সঙ্ঘাত চলছিল তখনই আবির্ভাব ঘটল রামকৃষ্ণদেবের। সব কটি প্রধান ধর্মের বিধি-বিধান তিনি নিজে আচরণ করলেন, এই পরম সত্যটিই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, "যত মত তত পথ।" সব ধর্মমতের লক্ষ্যই ঈশ্বর-উপলব্ধি এবং যে-আচরণবিধি মেনেই তাঁর উপাসনা করা হোক না কেন, লক্ষ্য এবং উপাস্য এক এবং অদ্বিতীয়। জনগণের কাছে তিনি তাঁর উপলব্ধ সত্যটিকে তুলে ধরলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ ভঙ্গিতে, সহজবোধ্য ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করতেন জটিল ধর্মতত্ত্ব যার সারবত্তা অতি বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতজনেরাও মেনে নিতে বাধ্য হতেন। ঈশ্বরোপলব্ধির এই সাধনার ক্ষেত্র ব্যবহারিক জীবন পর্যন্ত প্রসারিত—এই কারণে স্বাভাবিক ভাবেই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সমাজসেবার আদর্শ—জীব ও শিবের মধ্যে অভিন্নতা অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা। তাঁর মতবাদের মধ্যে এই কারণেই কলকাতার তৎকালীন চিন্তানায়করা খুঁজে পেলেন প্রকৃত পথের নির্দেশ। রামকৃষ্ণদেব-প্রচারিত সমন্বয়ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সেযুগের যাবতীয় প্রশ্ন আর সংশয় সমাধানের নির্ভুল ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া গেল।

উনিশ আর বিশ—এই দুই শতকের ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব আলোড়ন এবং আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার প্রত্যেকটির সূচনা কলকাতাকে কেন্দ্র করে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ঠাকুর ছিলেন স্বয়ংসিদ্ধ অধ্যাত্মাশ্রয়ী ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রকাশ যেখানেই হতো, সেখানেই ঘটত জ্যোতির বিচ্ছুরণ। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এমনি ঘটতে দেখা গেছে বিভিন্ন যুগে। এঁদের প্রত্যেকের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। তবু ইতিহাসের বিচারে মহাবীর, বুদ্ধ, নানক এবং চৈতন্যকে কেন্দ্র করে যে প্রচণ্ড আলোড়ন ঘটে গিয়েছিল তা তুলনাহীন। এঁরা প্রত্যেকেই পর্যটনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তরের অধিবাসীদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিলেন লোকশিক্ষাদাতার ভূমিকায়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সাড়ে তিনশো বছর পরে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি প্রচারধর্মী ছিলেন না; পর্যটনের পথটিকেও তিনি বেছে নেননি। তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল এমনই একটি স্থান যেখানে মিলিত হয়েছিল গোটা দেশের বিভিন্ন মানুষের প্রতিনিধিবর্গ এবং যা ছিল উনিশ-বিশ শতকের যাবতীয় চিন্তা এবং কর্মধারার উৎস। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ঠাকুরের বাণী যাদের উদ্দেশে বর্ষিত হয়েছিল সেই তদানীন্তন কলকাতার শিক্ষিত মানুষ এবং যে-স্থানটি ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র—কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর এবং মূল কলকাতা—ফসল উৎপাদনের পক্ষে তা ছিল অত্যন্ত অনুকূল।* ☐

* ৯১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা

আত্মঘাতী কিশোর-কিশোরীঃ ভারতের বর্তমান প্রেক্ষিত

বেলা দত্তগুপ্ত

আমাদের দেশে আত্মহননের ঘটনা, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে, বর্তমানে এক আশঙ্কাজনক আকার ধারণ করেছে বলে অনেকেই মনে করেছেন এবং এর কারণ অনুসন্ধানেও তৎপর হয়েছেন। কিন্তু কারণ খুঁজে বের করা খুব যে সহজসাধ্য তা মনে হয় না। কারণ আত্মহননের ইচ্ছা শুধুমাত্র মানসিক দুর্বলতা, আক্ষেপ, প্রক্ষোভ থেকেই আসে না; আসে, সমাজের বহুবিধ অবাঞ্ছিত ব্যবস্থার কারণেও। তবে সমাজকে সর্বদাই কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সমাজবিজ্ঞানীরা সহমত নন। তাঁদের ধারণায়, আত্মহননের বাসনা মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির অন্তর্গত, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে"—এই উদ্দীপ্ত উচ্চারণসত্ত্বেও। এই স্বাভাবিক ইচ্ছা সামাজিক কার্য-কারণে অনেক বেশি জোরদার হয়—একথা তাঁরা বলে থাকেন।

বৌদ্ধিক জগতের এই বিপরীত ধ্যান-ধারণার প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধটি কোন নির্দিষ্ট বা একটিমাত্র মাত্রায় আলোচনা করা সঙ্গত হবে না। বুঝতে হবে আত্মহননের দেশ-কালগত তুলনামূলক প্রেক্ষিতটি। সেক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক, অর্থনীতিক, রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক মাত্রাগুলির একান্ত প্রয়োজন হবে। বিভিন্ন দেশের আত্মহননের পরিসংখ্যানও প্রয়োজন, যা থেকে আমরা আমাদের দেশের বাস্তবিক অবস্থাটি কী তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। তা না হলে ইতস্তত প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে আমাদের একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে।

সর্বপ্রথমেই একটি পরিসংখ্যান দিয়ে প্রবন্ধটির সূত্রপাত করছি। কারণ, এই পরিসংখ্যানের সূত্রেই আমরা বুঝতে পারব যে, আমাদের দেশে আত্মহননের অনুপাত অন্য দেশের চেয়ে কত কম। আর সেই সাথে আমরা আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান আত্মহননের আশঙ্কা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি। একথা সত্য যে, আমাদের দেশের চাইতেও কম আত্মহননের দেশ আছে, তবে প্রায় কোন দেশই আত্মহননের বিষমুক্ত নয়। কিছু প্রাক্-অক্ষরিক সমাজ এখনো বর্তমান, যেখানে মানুষ আত্মহননের প্রয়োজন অনুভব করে না। এ-সম্পর্কে পরে আলোচনায় আসছি। এখন বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা-প্রতি আত্মহননের অনুপাত বিষয়ক একটি সারণি পেশ করা হচ্ছে।

প্রতি ১,০০,০০০ জনসংখ্যা পিছু আত্মহননের হার

দেশ	আত্মহননের হার	দেশ	আত্মহননের হার
১। হাঙ্গেরী	৪৫.৩	১১। চেকোশ্লোভাকিয়া	১৮.৯
২। জার্মানী	৪৩.১	১২। সুইডেন	১৮.৫
৩। শ্রীলঙ্কা	২৯.০	১৩। কিউবা	১৭.৭
৪। অস্ট্রিয়া	২৮.৩	১৪। কানাডা	১২.৯
৫। ডেনমার্ক	২৭.৮	১৫। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১২.৩
৬। ফিনল্যান্ড	২৬.৬	১৬। স্কটল্যান্ড	১১.৬
৭। বেলজিয়াম	২৩.৮	১৭। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস	৮.৯
৮। সুইজারল্যান্ড	২২.৮	১৮। ভারত	৫.৯
৯। ফ্রান্স	২২.৭	১৯। পাপুয়া নিউগিনি	০.২
১০। জাপান	২১.২	২০। অ্যান্টিগুয়া	০.১

এগুলোর সারণি থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আত্মহননের হার ভারতে অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক কম। এখানে পাপুয়া নিউগিনি ও অ্যান্টিগুয়ার পরিসংখ্যান উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো এই যে, এখনো উপজাতি-অধ্যুষিত এসব অঞ্চলে আত্মহনন (সামাজিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত কারণজনিত) তেমন প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। আগেই বলা হয়েছে যে, উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে আত্মহননের মাত্রা অত্যন্ত নগণ্য।

প্রদত্ত সারণিতে পাপুয়া নিউগিনি ও অ্যান্টিগুয়ার উল্লেখ সুচিন্তিতভাবেই করা হয়েছে। আগেই বলেছি যে, আত্মহননের আলোচনা একমাত্রিক হওয়া সম্ভব নয়—নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এমনকি ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট থেকেও হতে পারে।

নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতটি আলোচনার সময় দেখা যাচ্ছে যে, সমাজের অনুন্নত, উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় আত্মহননের তেমন প্রচলন নেই, গুরুত্বও দেওয়া হয় না। আফ্রিকার কিছু কিছু অঞ্চলে, যেমন নাইজেরিয়ার টিভ উপজাতির মধ্যে আত্মহননের কোন ধারণাই নেই। অনুরূপ অবস্থা আন্দামানের উপজাতিদের মধ্যেও দেখা গেছে। প্রখ্যাত সমাজনৃবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন তাঁর 'দ্য আন্দামান আইল্যান্ডার' বইটিতে আন্দামানীদের মধ্যে আত্মহননের কোন ঘটনা বা প্রবণতা দেখতে পাননি, কোন উল্লেখও নেই ঐ বইটিতে। অনুরূপভাবে অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিদের মধ্যেও আত্মহননের ঘটনা বিরল। এসব উপজাতিদের অধিষ্ঠান নিঃসন্দেহে প্রাক্ অক্ষরিক এবং প্রাক্ শিল্প সমাজেই ছিল। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রাক্ অক্ষরিক সমাজ অবশ্যই আছে, কিন্তু এসব সমাজ শিল্পোন্নত সমাজের পাশাপাশি বসবাস করার ফলে সেখানে সংস্কৃতিগত অভিস্রবণ বা osmosis ঘটেছে এবং উন্নত সংস্কৃতির অনেক কিছুই উপজাতি সমাজে ঢুকে পড়েছে। ফলে বর্তমানের প্রাক্ অক্ষরিক সমাজের উপজাতিদের মধ্যে আত্মহননের ধারণা থাকাটা অসম্ভব নয়। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক সংখ্যাতীত গবেষণায় উপজাতিদের মধ্যে আত্মহননের বিষয়টি একেবারেই স্থান পায়নি।

প্রকৃতপক্ষে আত্মহননের কয়েকটি ধ্রুপদী ঘটনা ও উদাহরণ ছাড়া, সামগ্রিকভাবে ও সমাজলগ্নভাবে এবিষয়ে আলোচনা উনবিংশ শতকের শেষপ্রান্তে এসে শুরু

হয়—কি ইউরোপে, কি আমাদের দেশে। ঐতিহাসিক ও ধ্রুপদী কয়েকটি আত্মহননের ঘটনার মধ্যে ধরা যেতে পারে অ্যাজাক্সের আত্মহনন। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে নিজের তরবারিতে নিজেকে বিদ্ধ করে জীবননাশ করেন অ্যাজাক্স। সক্রেটিসের স্বহস্তে হেমলক বিষপান ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। এছাড়াও জুডিও-খ্রীস্টান পুঁথিতে—বাইবেলে বর্ণিত কিছু চরিত্র যথা স্যামসন, জুডাস, সল আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৯৬-৫৫ অব্দে রোমক কবি লুক্রেসিয়াস আত্মহনন করেন। তিনি বস্তুবাদী কবি ছিলেন এবং তাঁর দেবদ্বিজে অর্থাৎ ধর্মে মতি খুব সামান্যই ছিল।

এইসব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রের কথা বাদ দিলে, সাধারণভাবে সামাজিক মানুষ আত্মহননের পথে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না—এ-নিয়ে খুব কম মানুষই মাথা ঘামিয়েছেন। আত্মহনন যে একটি বৌদ্ধিক অনুশীলনের বিষয় হতে পারে, এ-সম্বন্ধে প্রথম সজাগ হন ফ্রান্সের প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ এমিল দুর্খেম। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'দ্য সুইসাইড' বইটি প্রকাশিত হয়। বইটিতে লেখক আত্মহনন সম্বন্ধে এক নবতর ধারণার সূচনা করলেন। আত্মহননের প্রেষণা হিসাবে বাইবেলীয় বক্তব্য ছিল যে, মানুষ প্রতিহিংসা, লজ্জা, যুদ্ধে পরাজয় ইত্যাদির ক্ষেত্রেই আত্মহনন করে থাকে। এমিল দুর্খেম এই ধ্রুপদী ব্যাখ্যার ধার-পাশ দিয়েও গেলেন না। তিনি বললেন, সমাজ-সম্পৃক্ততা বা সমাজ-আলগ্নতার অভাব হলেই মানুষ আত্মহননের কথা চিন্তা করে। কারণ, ঐ দুটির অভাবে মানুষের কাছে সবই শূন্যবৎ মনে হয়। তখন জীবন থাকল কি গেল, কোন হেরফের হয় না তার কাছে।

সমাজ-সম্পৃক্ততা বা সমাজ-আলগ্নতার অভাব কেন এবং কখন বোধ করে মানুষ? এটাই সবচেয়ে মূল্যবান প্রশ্ন এবং এর মধ্যেই নিহিত বর্তমান প্রবন্ধের মূল প্রশ্ন—কিশোর-কিশোরীরা কেন এখন বেশি বেশি আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এর উত্তর সম্পূর্ণ সমাজকেন্দ্রিক। কোন্ সমাজ? বর্তমানের শ্রেণীবিভক্ত, মুনাফাসর্বস্ব এবং ক্রমবর্ধমান ভোগ্যপণ্যের সমাজ।

যদিও মনস্তাত্ত্বিকদের মতে আত্মহনন মানুষের স্বভাবেরই অন্তর্গত, এই স্বভাবের পূর্ণ স্ফূর্তি ঘটে উপরি উক্ত সমাজকাঠামোর আবহে। 'স্বভাবের অন্তর্গত' বলতে কী বোঝায়? এটাও জানা প্রয়োজন। ফ্রয়েডের মতে মানুষের মধ্যে দুটি পরস্পরবিরোধী মনোভাব বর্তমান—ইরস (Eros) এবং থানাটস (Thanatos)। একটি জীবনের, প্রেমের, সঙ্ঘবদ্ধতার পরিচায়ক; অন্যটি মৃত্যুর দ্যোতক। তবে আত্মহননের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক ও বিশ্লেষকরা আত্মহননের একান্তভাবে মনস্তাত্ত্বিক দিকটি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে সমাজের দায়বদ্ধতার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

'সমাজের দায়বদ্ধতা' বলতে তাহলে আমরা কী বুঝব? দায়বদ্ধতা বলতে বোঝায় সমাজের অন্তর্গত বা সমাজভুক্ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সমাজের অবদান। সমাজকাঠামো—কি উপরি-কাঠামো কি অব-কাঠামো—যদি মানুষের বিকাশের অনুকূল না হয়, তবে মানুষের বাঁচার স্পৃহা সঙ্কুচিত হতে বাধ্য। এই উপরি-কাঠামো এবং অব-কাঠামোর মধ্যে বিধৃত আছে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন পরিবার, অর্থনীতিব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। সমাজের এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্থিতীয় নয়,

এদের গতিময়তা আছে এবং সমাজকাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে এই গতিময়তার যোগসূত্র বর্তমান। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবয়ব, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ইত্যাদির পরিবর্তনের সাথে সমাজ-অন্তর্ভুক্ত মানুষেরও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। কখনো এই পরিবর্তন আসে অত্যন্ত দ্রুতবেগে, কখনো আবার লঘু পদসঞ্চারে। অন্তর্ভুক্ত মানুষের পক্ষে এইসব প্রাতিষ্ঠানিক গতিময়তার সঙ্গে তাল রাখা সম্ভব হয় না। ভারসাম্যের অভাব ঘটে, ব্যক্তিজীবনে বিচ্যুতি দেখা দেয় এবং এই পথ ধরেই আসে আত্মহনন। এক-একটি প্রতিষ্ঠান ও তার পরিবর্তন বা গতিময়তার স্বরূপ কিছুটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব এবার।

সমাজনির্মাণ (Social formation)-এর ছকে দেখা যায় যে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব অনেকগুলি ধাপ পেরিয়ে, যথা—আদি সমাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ইত্যাদি। ঐসব সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, শান্ত ও প্রতিযোগিতাহীন ছিল। যতটুকু প্রতিযোগিতা ছিল তা সমাজের সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করত না। ধর্মের আবহে, পরিবারের গণ্ডিতে, গ্রামীণ পরিবেশে একে অন্যের সহায়তা করে হাসিকান্নায় দিন যাপন করত। পৃথিবীর অন্য দেশ সম্বন্ধে এটি যেমন সত্য ছিল, আমাদের দেশের পক্ষেও ঠিক তেমনই সত্য ছিল। ভারতের অনড়, পরিবর্তনহীন গ্রামসমাজের কথা ইতিহাসে লেখা হয়েছে। সম্পূর্ণ অনড়, অচল না হলেও চলিষ্ণুতার মাত্রাটি তত প্রখর ছিল না, সন্দেহ নেই। তবে পল্লবায়িত জীবন যে ছিল না, তার প্রমাণও ইতিহাসে বিধৃত আছে। এই পরিবেশে মানুষ—কি পরিবারে, কি পরিবারের বাইরে—একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। একের সঙ্গে একের যোগফল দুই হতো না, হতো এগারো। এভাবেই সমাজ চালিত হয়েছে পশ্চিমী দেশগুলিতে—শিল্পবিপ্লবের আগে এবং ভারতে বিদেশীদের অনুপ্রবেশের পূর্বে।

শিল্প-বিপ্লব এক নিমেষে পশ্চিমী দেশগুলিতে বিরাট পরিবর্তন এনে দিল। গ্রাম উজাড় করে মানুষ পাড়ি জমাল শিল্প-শহর এবং অন্যান্য শহরের উদ্দেশে। রুজি-রোজগার, বাসস্থানের জন্য যে প্রতিযোগিতায় নামতে হয় এই প্রথম বুঝল, জানল মানুষ। তাছাড়া রুজি-রোজগার যে নারী, পুরুষ, শিশুর জন্য কত কষ্টকর, সে-সম্বন্ধেও এই প্রথম উপলব্ধি করল মানুষ। গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমাতে গ্রামের ভিটে গেল, বাস্তু গেল, এমনকি পরিবারও গেল। কত স্ত্রী, কত সন্তান পথেই হারিয়ে গেল, তা গুনে শেষ করা যাবে না। শহরের হাড়ভাঙা কাজের শেষে দেহে মনে যে-ক্লান্তি ও অবসাদ নামল, তা মুছিয়ে দেওয়ার, ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য পিপে পিপে 'জিন' (মদ) আসতে লাগল ফরাসি দেশ থেকে। বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রকর উইলিয়াম হোগার্থ (১৬৯৭-১৭৬৪) এর 'Gin Mania' ছবিটি থেকে এই 'জিন'-আসক্তির তথ্য পাওয়া যাবে। তারপর শুরু হলো চাকরির জন্য কিশোর, যুবা ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কিশোর-যুবাদের বাবা-মা কোথায় ছিটকে গেছে কোন হিসেব নেই তার। তাদের কোন স্থায়ী বাসস্থানও নেই। লন্ডনের টেমস নদীর পারে সদ্য গড়ে ওঠা সব মালগুদামের ছাদগুলো এদের রাত্রির আবাস হয়ে ওঠে। শীত নিবারণের মতো যথেষ্ট পোশাক, আচ্ছাদন না থাকায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি কিশোর-যুবা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে থাকত, যাতে পরস্পরের দেহের উত্তাপ সঞ্চারিত হতে পারে প্রত্যেকের দেহে। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই এরা নেমে

আসত লন্ডনের পথে এবং বিভিন্ন রকমের অপরাধে লিপ্ত হতো। আত্মহনন এসবের মধ্যে একটি। শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ১৮৭১-১৮৭৫-এর মধ্যে আত্মহননের চিত্রটি নিম্নে দ্রষ্টব্য।

লন্ডন শহরে উল্লিখিত পাঁচ বছরে আত্মহননের অনুপাত প্রায় সমানই ছিল।

এর আগে বলা হয়েছে, এমিল দুর্খেম ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে আত্মহনন সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণমূলক প্রথম বই প্রকাশ করেন। কিন্তু আদমসুমারির সুবাদে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে অনেক আগে থেকেই জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান রাখা হচ্ছে। এই আদমসুমারির তথ্যই আমাদের জানায় যে, আত্মহনন কিভাবে সমাজে শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবে একটি স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিল।

বছর	জনসংখ্যা	আত্মহনন		প্রতি দশ লক্ষের অনুপাত		
		পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	মোট
১৮৭১	২২,৭৮২,৮১২	১১০৩	৩৯২	৪৮.৪	১৭.২	৬৫.৬
১৮৭২	২৩,০৬৭,৮৩৫	১০৯৫	৪১৯	৪৭.৫	১৮.২	৬৫.৬
১৮৭৩	২৩,৩৫৬,৪১৪	১১২৯	৩৮৯	৪৮.৩	১৬.৭	৬৫.০
১৮৭৪	২৩,৬৪৮,৬০৯	১২০৪	৩৮৮	৫০.৯	১৬.৪	৬৭.৩
১৮৭৫	১১৬,৮০০,১২৯	৫৭১৫	২০০৫	৪৮.৯	১৭.২	৬৬.১

শিল্পবিপ্লবের সূত্রে শুধু পরিবারেই ভাঙন দেখা দেয়নি, ভাঙন নেমে এসেছিল মানুষের চিরাচরিত ভাবনার জগতে, ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং অর্থনীতিক আচার-আচরণে। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশ বা শক্তি গড়ে উঠল, শুরু হলো উপনিবেশ দখলের লড়াই এবং তারপর বিভিন্ন দেশ বা শক্তিতে লড়াই। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আণবিক বোমার আঘাত জাপানের হিরোসিমা-নাগাসাকিতে। জীবনযাত্রা, সমাজের মূল্যবোধ, নতুন দর্শনের উদ্ভব (Existentialism বা অস্তিবাদ) সমস্ত ইউরোপের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়ে গেল। সমাজ ও মানুষের 'আপন-পরের বাহির-ঘরের' যে-সম্পর্ক তা সঙ্কুচিত হতে হতে বিন্দুতে এসে পৌঁছাল অথচ পরিবার, এমনকি স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের একক পরিবারও নয়—শুধুমাত্র সহবাস বা 'live-together'-এ পর্যবসিত হলো মানব-মানবীর যৌনজীবন। এই সহবাসের সূত্রে সন্তান আসা বা আনা অবৈধ। সুতরাং, শুধুমাত্র সাময়িক ভোগের উপকরণ হয়ে উঠল একদা পরিবারের শান্তিময় নীড়। এই অবস্থায় মানুষ তৃপ্ত হয় না, শান্ত হয় না; শান্তি খোঁজে মৃত্যুতে, মাদকদ্রব্যে—যা মৃত্যুরই সামিল। ফ্রয়েডীয় মৃত্যু-এষণা বা Thanatos প্রবল হয়ে দেখা দিল। সে কিন্তু ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক কারণে নয়—সমাজের ক্রমাবনতির সূত্রে, যে-ক্রমাবনতি মানুষকে বাঁচার মর্যাদা দেয় না, মুনাফার পণ্য করে তোলে।

এই মুনাফা-সর্বস্বতার সর্বপ্রথম শিকার হয়েছে আমাদের পরিবারগুলি। পরিবারের সঙ্গে মুনাফা-মৃগয়ার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র না থাকলেও এই মৃগয়ায় সামিল হয়েছেন পরিবারের বাবা-মা। ক্রমবর্ধমান সামাজিক প্রতিযোগিতায় প্রথমে নিজেরা শিকার হয়েও তাঁরা সেই মনোভাব সঞ্চারিত করছেন সন্তানদের মধ্যে, তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলছেন কিভাবে 'সর্বোত্তম' হয়ে সংসারে বেঁচে থাকা যায়, অর্থাৎ 'Survival of the fittest'-এর মানসিকতা। জনসংখ্যা

সীমিত রাখার এবং অঢেল সমাজ (affluent society) এর সমস্ত সুবিধাভোগের অভিপ্রায়ে বর্তমানের পরিবার দুই প্রজন্মের পরিবার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একসন্তান-সর্বস্ব—ছেলে অথবা মেয়ে। এক্ষেত্রে আগামী প্রজন্ম অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে যাতে 'দুধে ভাতে' থাকতে পারে তার জন্য জন্মাবধি তাদের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর অথবা একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী তৈরি করার প্রয়াসে মা-বাবা মশগুল। এসব ছেলেমেয়েরা নির্বান্ধব, ভাই-বোনের এবং ঠাকুমা-দিদিমার স্নেহসঙ্গহীন। মা-বাবা চাকরি করেন। কাজের জায়গায় চাপ, কর্মস্থলজনিত নানা দায়দায়িত্ব, সুতরাং সন্তানেরা মা-বাবা, ভাই-বোন, ঠাকুমা-দিদিমা কারোর সঙ্গই পায় না। মা-বাবা তাদের সন্তানদের একাকীত্বের কথা যে বোঝেন না তা নয়, কিন্তু চাকরি, উন্নতি, অঢেল সমাজের ইসারায় তারা এই সাময়িক আবেগ ভুলে যান। ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে দামি দামি উপহার ও পোশাক-আশাকের ব্যবস্থা হয় সন্তানের। ছেলেমেয়েরা নিঃসন্দেহে এদিক থেকে অত্যন্ত ধনী। কিন্তু ভালবাসার ঘাটতি থেকেই যায়। সেই দারিদ্র্য আর কোনমতেই কাটে না তাদের। অভিমান বুকে নিয়েই আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে ওঠে। আর সেই অভিমান ভুলিয়ে দেবার অস্ত্রও তো মা-বাবার হাতেই। কানে ক্রমাগত মন্ত্র জপ হচ্ছে—"পরীক্ষায় ভাল ফল, জয়েন্ট এন্ট্রান্স, আই.আই.টি., স্টেটস, গ্রীনকার্ড ইত্যাদি।" ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন জীবনে এ একধরনের কল্পবিজ্ঞানের মহড়া। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মানসিক ঝোঁক (tendency) কোন্‌দিকে সেকথা একবারও মা-বাবারা ভাবেন না। যে-ছেলে বা মেয়ের ঝোঁক সৃজনাত্মক কিছু করার, তাকে চাপ দেওয়া হয় ইঞ্জিনীয়ার, কম্পিউটার সায়েন্স, ডাক্তারি ইত্যাদি পড়বার জন্য। ছেলেমেয়ে বিফল হলে তাদের শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহের সীমা থাকে না। সমাজের এই প্রতিনিয়ত 'ইঁদুর দৌড়ে' ব্যর্থ ছেলেমেয়েরাই আশ্রয় খোঁজে আত্মহননের 'নিবিড় শান্তিতে'। 'শ্রমের মর্যাদা' দেশ মানতে পারেনি, সুতরাং সেদিকে শিক্ষাও দিতে পারেনি। আমাদের ছেলেমেয়েরাই বিদেশে গিয়ে 'odd jobs' করে নিজেদের পড়াশুনার খরচ চালায়। একশো ভাগ বিফল হয়ে কাউকেই ফিরতে দেখিনি। খবরের কাগজে তো প্রায়ই দেখা যায়, আমাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে নিজেদের স্ফুরণের সুযোগ পেয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। গভীর সঙ্কটের মধ্যেও তারা কিন্তু আত্মহননের কথা ভাবেনি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ফ্রয়েডিয় ফর্মুলা দিয়ে আত্মহননের ব্যাখ্যা সবসময় করা চলে না। আত্মহননের মূল কারণ প্রোথিত আছে সমাজকাঠামো ও সামাজিক চাহিদার মধ্যে। এই সূত্রে একটি অসাধারণ শিল্পোন্নত প্রাচ্য দেশের কথা জানা যাক।

দেশটি হলো আধুনিক জাপান। জাপান সম্বন্ধে তার ঐতিহ্যের কথা বিশেষ করে আত্মহননের ঐতিহ্যের কথা একটু জেনে নেওয়া ভাল। সমগ্র পৃথিবীতে জাপানই একমাত্র দেশ যেখানে সামাজিক লজ্জা ঢাকতে মানুষ বিনা দ্বিধায় আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এটা তাদের সামুরাই বা সৈনিক শ্রেণী পরিচালিত রাষ্ট্রের এক বিশেষ ধরন। যুদ্ধে পরাজিত হবার চেয়ে বড় গ্লানি আর কিছু থাকতে পারে না, অতএব বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই, নিজের জীবন শেষ করে দাও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপানের বহু কবি, সাহিত্যিক

'হারাকিরি' বা আত্মহত্যা করেছিলেন। এদের মধ্যে মিশিমা, কাওয়াবাতার নাম উল্লেখ্য। প্রসঙ্গত কাওয়াবাতা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সে-দেশে সামাজিক পট পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হবার গ্লানি এখনকার সমাজের ছেলেমেয়েদেরও কুরে কুরে খায়। ওখানকার শিক্ষাব্যবস্থাও এজন্য দায়ী কিছুটা। আমাদের স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় অসাধারণ ভাল ফল না করলেও ছাত্রছাত্রী সে-ঘাটতি পরে পুষিয়ে নেয়। কিন্তু জাপানে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষাটিই জীবনের সবকিছুর নিয়ামক। ঐ পরীক্ষায় খুব ভাল না করলে কোন ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পর্যন্ত মাড়াতে পারবে না। ফলে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার ফল বেরোবার পর জাপানে ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যার 'মড়ক' লেগে যায়। এখানেও সেই একই কথা যে, সমাজকে যদি আমরা ক্রমাগত প্রতিযোগিতামূলক করে তুলি তাহলে ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের আত্মহননের পথ থেকে সরিয়ে নিতে পারব না।

পরিবার ও সমাজের এধরনের রূপ সম্পূর্ণ নতুন। তাই আত্মহননের চেহারাও সম্পূর্ণ আলাদা। অভাব, বার্ধক্য, নৈরাশ্য থেকে আত্মহনন হয়। প্রতিযোগী সমাজে আমার অবস্থান কেমন হতে পারে, সেই আশঙ্কাই আমাকে নিয়ে যায় সেই সংশয়ের প্রান্তে—"to be or not to be"।

এই প্রতিযোগী সমাজের আধিব্যাধিগুলিও ভিন্ন রূপ। নেশার বিষয়টি চিরকালের, সর্বকালের। কিন্তু নেশার বস্তুতে অতীত ও বর্তমানে আকাশ-পাতাল ভেদ দেখা যায়। বর্তমানে গবেষণাগারে প্রস্তুত সব মাদক ও নেশাদ্রব্যের ক্ষমতা আগেকার নেশাদ্রব্যের চেয়ে অনেকগুণ বেশি এবং অনেক বেশি আকর্ষক। হেরোইনের আস্বাদ একবার পেলে সে-ছেলে বা মেয়ের জীবন বাঁধা পড়ে হেরোইন-শৃঙ্খলে, অনুরূপভাবে অন্যান্য নেশার সামগ্রীও। এইসব সামগ্রী কোন্ কোন্ দেশে 'Sixth Column'-এর মতো প্রবেশ করে এবং দেশের জান-মান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলে। নেশাদ্রব্যের যোগান ঠিকমতো না পেলে অনেক ব্যর্থ কিশোর-কিশোরী আত্মহত্যা করে। এসব সামগ্রীর ঢালাও কারবার আছে দেশে-বিদেশে, যেমন আছে যৌনতা-উদ্দীপক ছবি ও সাহিত্যের। শোনা যায় যে, এসব খাতে ন্যূনতম লগ্নি হলো ১০,০০০ বিলিয়ন ডলার। এই ধরনের বিপথে পরিচালনা করার সব 'অপশক্তি' সমাজে বর্তমান এবং এদের ক্ষমতা ক্রমবর্ধমান। এই 'অপশক্তি'র চক্রে পড়া ছেলেমেয়েদের জীবনও অত্যন্ত বিপন্ন। এদের মধ্যেও আত্মহননের ধারা অব্যাহত থাকতে দেখা যায়।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি যে, ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক কারণের চেয়ে সমাজতাত্ত্বিক কারণগুলিই বর্তমান কিশোর-কিশোরীর আত্মহননের নিয়ামক। পশ্চিমী ধাঁচের আধুনিক, অঢেল সমাজ যদি চিন্তাভাবনা না করে কোন দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে এসব বিচ্যুতির মধ্য দিয়েই যেতে হবে সে-সমাজকে। এক্ষেত্রে না কিশোর-কিশোরী, না তাদের বাবা-মা—কেউই আত্মহননের পরিবেশের জন্য দায়ী নয়। দায়ী মুনাফাসর্বস্ব, প্রতিযোগিতাকীর্ণ সমাজ, যেখানে মানবিক মূল্য ও বোধ দুই-ই ক্ষয়িষ্ণু।* □

* ৯৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

৫০ ঃ মধ্যবিত্ত কোন্ পথে?

হোসেনুর রহমান

ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো। এই পঞ্চাশ বছর ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুখকর হয়নি। প্রাপ্তি যে কিছুই হয়নি তা নয়, তবে ব্যর্থতার পাল্লাই যেন বেশি ভারী। এই প্রাপ্তি ও ব্যর্থতার দাঁড়িপাল্লায় মধ্যবিত্তর অবস্থাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সে-অবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হোসেনুর রহমান।

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত। দেশ আজ উৎসবমুখর। রাজনৈতিক দলগুলি স্বাধীনতার উৎসবকেও নিজেদের প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে ব্যস্ত। দেশের মানুষ সবসময় বুঝতে পারে না, তারা নিত্য বেঁচে থাকার দায় মিটিয়ে কোন্ উৎসবে কতটা মুখর হতে পারে। 'দেশের মানুষ' বলতে বহুস্তরের মানুষকে বোঝায়। একথা খুব শোনা যায়, গত পঞ্চাশ বছরে ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী এক বাস্তব সত্য। এই মানবগোষ্ঠী যে কেবল দেশের ভবিষ্যৎ তাই নয়, বিদেশের ভরসাও বটে। গত পাঁচ বছরে বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করেছে। এই বিশ্বায়ন-স্পৃহা বাণিজ্যের—মানব-মনের নয়।

এবার সাধারণ সমাজসচেতন শিক্ষিত ভারতবাসীর কথায় আসি। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর—এ এক অভিনব অনুভূতি বৈকি। ভাবতে দেহ-মনে শিহরণ জাগে। ১৯৪৭ সালে মানুষ যে-ধারণা নিয়ে দেশ ও পৃথিবীকে দেখেছিল, যে যন্ত্রণা, আনন্দ, বিষাদ নিয়ে নব দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিল—আর আজ যে-অস্থিরতা নিয়ে 'ঠাণ্ডাযুদ্ধ' শেষের (যদি অবশ্য শেষ হয়ে থাকে) পৃথিবীতে সে বাস করছে তা প্রায় অবিশ্বাস্য এক ইতিহাস। আজ যারা ভারতবর্ষের তরুণ নাগরিক তারা অনেক বেশি পরিমাণে বিশ্বাস করে যে, জীবনের, স্বাধীনতার, শিল্পসাহিত্যের ব্যাপ্তি ঘটেছে অপ্রত্যাশিতভাবে। সেই অর্থে তারা বিশ্বনাগরিক। অর্থাৎ বিশ্বচেতনায় সমৃদ্ধ। বিশ্বায়নকে বলেছি বাণিজ্যের, বহুজাতিক সংস্থার বিস্তৃতিলাভের বিশ্বস্ত এক কৌশলমাত্র। আর বিশ্বচেতনা? সেই পরম বিশ্বাস ঃ মানুষের মন বিশ্বজনীন, দেহ নয়। এই দুইয়ের সম্মিলন ঘটে বিশ্বচেতনার তাগিদে। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বচেতনার কর্ণধার। আমেরিকায় তিনি যে একাধিক রামকৃষ্ণ-বেদান্তচর্চা কেন্দ্র নির্মাণ করলেন, পরে পৃথিবীর অন্যত্র—সেই তো global civil society-র সূচনা।

এই চিন্তার আরেকটা দিক আছে। সেটা মর্মান্তিক সত্য। আজকের তরুণ শিক্ষিত নাগরিক দেশের অন্তর্দেশে এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছে। তারা ২৫০ মিলিয়ন মধ্যবিত্ত (ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ৯৫০ মিলিয়ন) নামক শ্রেণীর কাছাকাছি কোনমতে জীবনধারণ করে এবং জানতে চায় তাদের

জীবনে স্বাধীনতার অর্থ কী? নিজের মতো করে নিজেই তা বলতে পারে : যে-মানুষ অন্যের পীড়ন থেকে মুক্ত, স্বজীবন স্বকালকে নিজের বুদ্ধি ও যুক্তিতে ধরতে পারে—সে-ই যথার্থ স্বাধীন। সেই মানুষ আবিষ্কার করতে পারে ভারতবর্ষে আজ এই ক্ষুদ্রকায় মধ্যবিত্ত কতটা সমৃদ্ধ, কতটা সৃষ্টিশীল, কতটা মুক্ত, উদার।

পঞ্চাশ বছরে এই মানুষের চিন্তা ও জীবনযাত্রার ধারায় বাস্তববুদ্ধির পরিবর্তন ঘটেছে প্রভূত পরিমাণে। মধ্যবিত্তের জীবনের, বিশ্বাসের, যুক্তির কাছাকাছি থেকেও এই জনগোষ্ঠী অনেক দূরে বাস করে। একটি দেশের মধ্যে প্রধানত দুটি দেশের বাস। এই দুটি পৃথিবী বৈষম্যবাদের নতুন অর্থ, নতুন বিভাজন, নতুন দূরত্ব নির্মাণ করেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। আপাতদৃষ্টিতে ধনবান ও মধ্যবিত্ত যখন বক্তৃতা করে, নির্বাচনের বাজার গরম করে, বিধানসভা-লোকসভা উজ্জ্বল করে (পঞ্চাশ বছর পরে কি আর করে?), তখন যেন দুই ভারতবর্ষ এক হয়ে যায়। আবার যদি ধনবান ও মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করা যায় তখন দেখা যায় কী দুস্তর দূরত্ব!

এখন দেখা যেতে পারে মধ্যবিত্তের বিত্ত ও চিত্তবৃত্তির অভিব্যক্তি কেমনতর। ১৯৪৭-এর পর আমাদের সমাজের বহিরঙ্গে আশাতীত পরিবর্তন ঘটেছে। পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, ঘরবাড়ির অঙ্গসজ্জা—এসব বদলেছে বহুল পরিমাণে। দেশের নগরায়ন ও শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে এইসব পরিবর্তন অনেকাংশে অনিবার্য হয়ে এসেছে। আরেকটি বড় পরিবর্তন—মেয়েরা অফিসপাড়া আক্রমণ করেছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার—সর্বত্র মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জীবনে ও জগতে স্বাধিকার দাবি করেছে। এই দাবি যতটা প্রয়োজনের তাগিদে ততটা কোন তাত্ত্বিক মতবাদের প্রভাবে নয়। আর এত বড় পরিবর্তন নরনারীর সম্পর্কে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেছে—এমন কথা বলা সম্ভব নয়। দু-পক্ষই এখনো বহুলাংশে রক্ষণশীলতার শিকার। শহুরে জীবন, মহানগরে বসবাস একপ্রকার অভিনবত্ব দিয়েছে, কিন্তু কোন গভীরত্ব দিতে পারেনি। গ্রাম থেকে যারা শহরে চলে এল, কোনমতে শহরে টিকে থাকতে পারাটাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য তারা শহরবাসী হয়েছে বটে, কিন্তু এই নবাগতের দল (কিংবা ঢল) শহরের স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছে প্রায় দূরবর্তী মানুষ থেকে গেছে। এমন কলকাতা মহানগরকে নৃ-বিজ্ঞানী নির্মলকুমার বসু "Premature metropolis" বলেছিলেন একাধিক কারণে। এমন মহানগরকে বলা যেতে পারে, "A dichotomy, a population centre separated into inner and outer parts."

অর্ধশতাব্দী ধরে এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষের শহরে মিলেমিশে এক বহুত্ববাদী সমাজ তৈরি করল। শহর এবং শহরতলি দুটো ভয়ানক ভিন্ন পৃথিবী যেন! শহর ছাড়িয়ে যারা বাস করে, শহরেও ঠিক নয় আবার গ্রামেও নয়—এই ঘরেও নয় বাইরেও নয় জগতে তৈরি হয় slums, crime, disease। তারপরও যাকে inner city বলা হচ্ছে সেই অন্তর্দেশ বহিরাগতদের কোন প্রকার আশ্রয় বা কাজ দিতে পারল এবং এমন কিছু সুযোগও তৈরি করা গেল যা বহিরাগতদের social contact এবং group activity গড়ে তুলতে

সাহায্য করল। এর অর্থ ঃ মহানগরগুলি ছিন্নমূল মানুষদের নতুন urban-industrial জগতে যুক্ত হওয়ার পরিবেশ তৈরি করতে পারল। এইভাবে মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, দিল্লী, ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় অর্থনৈতিক শক্তিপুঞ্জ উৎপন্ন করল—the dynamics of urbanization। নিত্যনতুন ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রমিক-কর্মসূচী, শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান সুযোগ গ্রামের মানুষকে শহর সম্বন্ধে উল্লসিত করল। এখানে বলা দরকার, এই শহরায়নের ইতিবৃত্ত সমস্ত জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সমস্ত মহানগরেই এই আসা-যাওয়া, এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। মানুষ যেখানে একদিন জন্মগ্রহণ করে সেখান থেকে একদিন বেরিয়ে পড়ে। তারপর এক বিশাল পৃথিবীর উদ্দেশে তার যাত্রা শুরু হয়। নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ। আধুনিক মানুষ আজ নবজীবনে অভ্যস্ত।

গত পঞ্চাশ বছরে ভারতবর্ষের এই জনজীবন কতটা বিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে ভাবলে অবাক হতে হয়। এই বিবর্তনের বড় একটা ফসল মধ্যবিত্ত। প্রত্যেক সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী চিন্তা, সৃজনশীলতা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। আবার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই তার সংগ্রহ আর সঞ্চয়, স্বজন ও সম্পদ-রক্ষার জন্য কী পরিমাণ ভীত, সন্ত্রস্ত, সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে পারে! গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস, বিশেষত গত পনের বছরের ইতিহাস ভারতবর্ষের জীবনে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা বলতে হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার পৃথিবীর মানুষকে এমন এক নতুন পৃথিবীর স্বাদ দিয়েছে যে, আমরা তার হিসেব এখনো করে উঠতে পারিনি। আপাতত মধ্যবিত্ত ব্যস্ত 'মোবাইল ফোন' নিয়ে। তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত নামের পাশে ঠিকানা, তারপর ফ্যাক্স, ই-মেল ইত্যাদি নতুন সব সামাজিক-অলঙ্কার প্রদর্শন নিয়ে। ইতিমধ্যে বিশ্বায়ন-স্পৃহা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তকে প্রলুব্ধ করেছে। অবশ্য এই বিশ্বায়নে কোন বিশ্বচেতনার প্রকাশ নেই। আছে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার-আকাঙ্ক্ষা।

গত পাঁচ-ছয় বছর ভারতবর্ষের জীবনে বিস্ময়কর এক সময়। বহুজাতিক সংস্থা আর বিশ্বায়নের শ্লোগান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একপ্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত করেছে। হঠাৎ স্ফীতকায় মধ্যবিত্ত তার শক্তি ও সামর্থ্যের সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেছে বিদেশী গাড়ি, টিভি, সাউন্ড সিস্টেম, ওয়াশিং মেশিনের এক কাল্পনিক জগতে। জনৈক মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী এই মধ্যবিত্তের দিকে তাকিয়ে সময়োচিত মন্তব্য করেছেন ঃ "এ তো দেখছি ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত আমেরিকার মধ্যবিত্তকে অনুকরণ করছে। এ যে বড় ভয়ের কথা!" এদিকে বিদেশের বণিক সম্প্রদায়ের চোখ এই মধ্যবিত্তের দিকে, আবার মধ্যবিত্তের লোলুপ দৃষ্টি বিদেশী পণ্যসম্ভারের দিকে। এই ছ-বছরে অত্যন্ত সুসংবদ্ধ, সুসম্পর্কিত এক সম্পদশালী 'ইংলিশ স্পিকিং মাইনরিটি' আরো ধনবান হয়েছে। এদের কেউ হিমালয়ের পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র 'ক্ষুধিত পাষাণ' নির্মাণ করতেই পারে। প্রাইভেট হেলিকপ্টারে চেপে হঠাৎ সেই প্রাসাদে গিয়ে অবতরণ করতেই পারে। অথচ তারই পাশে এক নিবিড় দরিদ্রতম ভারতবর্ষ বাস করছে। কোন পরিবর্তন তাদের দারিদ্র্যকে এতটুকু ছুঁতে পারেনি। অন্যদিকে যাদের আমরা 'elite' বলছি তাদের সমৃদ্ধি যেন ঈশ্বরকেও ঈর্ষান্ধ করতে



পারে! আজ ভারতবর্ষের ধনী-দরিদ্র ডিভাইডার মনে করিয়ে দিচ্ছে, সীমান্তপারে পাকিস্তানে এখনো যে উজ্জ্বল সামন্তশ্রেণী সগৌরবে বিরাজ করছে, তাদের কথা। গান্ধী-জওহরলাল সামন্তশ্রেণীকে সমূলে নির্মূল করতে চেয়েছিলেন এ দেশে। পারেননি শুধু নয়, নতুনতর সামন্তশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে এদেশে। পাকিস্তানেও ফিউডাল কালচার বড় বেশি প্রকট। কারণ, সেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজও কোন সামাজিক ক্ষমতায় পরিণত হয়নি। মধ্যবিত্ত-শূন্যতাই অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের এক বিশিষ্ট পরিচয়, গ্লানিও বটে। তাই পাকিস্তানে ধনী বড় বেশি ধনী, দরিদ্র বড় বেশি দরিদ্র। আজ ভারতবর্ষেও এই ট্রেন্ড প্রতিদিন বিশেষ দ্রষ্টব্য হয়ে উঠছে।

বিদেশী বণিক সম্প্রদায় এই পাঁচ-ছয় বছরে বুঝতে পারছে, ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত ছোট এবং আদৌ ধনসমৃদ্ধ নয়। ৯৫০ মিলিয়ন ভারতবাসীর মধ্যে কোনমতে ২৫০ মিলিয়নকে মধ্যবিত্ত বলা সম্ভব। ৯৫০ মিলিয়নের দেশে মাত্র তিন মিলিয়ন ফ্রিজ বিক্রি হয়, একে খুব যৎসামান্য বলা হয়েছে। মাত্র ৩৫ মিলিয়ন মানুষের ঘর-বাড়ি আছে। তারাই নাকি ফ্রিজ কেনার স্বপ্ন দেখতে পারেন! অর্থাৎ আরো সতর্ক অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা আমাদের উচ্চাশা হওয়া সমীচীন।

ইতিমধ্যে বিদেশী গাড়ি, বিদেশী মদ, হাজার হাজার টাকা দামের বিদেশী জুতো কারখানা ও দোকানঘরে পাহাড়-প্রমাণ জমে উঠেছে। যারা লগ্নি করেছে তাদের হাত এখন মাথায়। মুম্বাই মহানগরে বাড়িভাড়া হঠাৎ নিচের দিকে বেশ নেমে আসছে। বিদেশী টেলিভিশন সেট দোকানে পড়ে আছে। বিদেশী কর্পোরেট ব্যক্তিত্বরা—যারা দিল্লী, মুম্বাইয়ের পাঁচতারা হোটেল ভরিয়ে দেবে ভাবা গিয়েছিল, তারা তাদের 'ভারতদর্শন' কেবলই স্থগিত করে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তের পরিচয় এরকম ঃ যার আয় মাসে ১৫,০০০ টাকা তিনি মধ্যবিত্ত। এই মধ্যবিত্ত কি গাড়ি কেনেন, শীততাপনিয়ন্ত্রিত হন? ওয়াশিং মেশিন কেনেন? পকেটের পয়সায় দূরবর্তী পাহাড়ের রাজ্যে বেড়াতে যান? বিদেশী নিগম এই দেশে উড়ে এল খোলামেলা বাজারে ডানা মেলে দেবে বলে। পোড়া কপাল! এদেশে সাধারণ মধ্যবিত্তের সব ফুরিয়ে যায় খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান রক্ষা করতে। এদের মধ্যে যারা গাড়ি কেনার আকাঙ্ক্ষা রাখেন তারা কোনমতে অ্যাম্বাসাডর, মারুতি কেনার কথা ভাবতে পারেন। এই ভাবনায় মধ্যবিত্ত একদিন কাতরবোধ করত না। কারণ, তাকে অনেক বই কিনতে হতো। পত্র-পত্রিকা পড়তে হতো। আর্ট ফিল্ম দেখতে হতো। হঠাৎ সেদিন বিমল করের 'জতুগৃহ' ছোট পর্দায় দেখছিলাম। মনে পড়ে গেল ষাটের দশকের মধ্যবিত্ত বাঙালীকে। ধনী, সুশিক্ষিত, সংবেদনশীল নায়কের সঙ্গে কথা বলছেন আরেকটি চরিত্র ঃ ওরা যদি মানুষ হয় তাহলে ঐ অন্ধকার বাড়ি থেকেই হবে। হঠাৎ বিশ্বায়ন আর খোলাবাজারের প্রতাপে বাঙালী এই সাংস্কৃতিক-নৈতিক মনোবল হারিয়ে ফেলল কি করে?

একদিন আমরা বিশ্বাস করতাম, আমি আমার জগতে মনের আনন্দে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা অথবা হাসপাতালে ডাক্তারির কাজ নিয়ে আছি। আজ কেন পারছি না? প্রযুক্তি, দীর্ঘজীবন, বাড়তি সুযোগ, বহুবিধ

উন্নয়নস্পৃহা মানুষকে 'আরো চাই'-এর জগতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যারা মধ্যবিত্তের স্তরে উন্নীত হতে পারেনি, যারা সমাজের নিচের তলায় বাস করে, যারা মধ্যবিত্তের জানালা দিয়ে দূরদর্শনের পর্দায় চোখ মেলে দেয়, যারা মধ্যবিত্তের ঘর সামলাতে আসে, তাদের আজ কাজে আসতে কেন এত বিলম্ব—গৃহিণী জানতে চাইলে তারা বলে ঃ "মেয়েকে ইস্কুলে দিতে গিয়েছিলাম। তারপর আবার নাতনিকে ট্রিপল অ্যান্টিজেন দিতে শিশু হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল।" এদের মেয়েদের কেউ কেউ আজকাল (এখনো সংখ্যায় যৎসামান্য) কলকাতার সেরা বাঙলা মিডিয়াম স্কুলে পড়তে যায় এবং পরীক্ষায় ভাল ফলও করে। এমন সব স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আনন্দে সচকিত হয়েছি, দেখেছি কারা পুরস্কার নিচ্ছে, কারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে! বুঝতে পেরেছি, সবটাই হারিয়ে যায়নি। এও বুঝতে পারছি, পঞ্চাশ-ষাটের দশকে মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা এসব প্রথম শ্রেণীর স্কুল আলো করে থাকত। আজকাল তারা কোথায় যায়? প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলে। আবার একটা ভয়ও পেয়েছি। এই গরিবের মেয়েরা দ্রুত মধ্যবিত্তকে অনুকরণ করছে। বর্ধমান, কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, বোলপুর, রানাঘাট, মেদিনীপুর যখন তখন যেতে হয়। রাস্তায় যখন গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়, জনাকীর্ণ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখি নবীন-নবীনাদের পোশাক, আর ভাবি কলকাতা তার সব স্বভাব কি করে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিয়েছে। দামী মিলের দামী বস্ত্রাদির পরিত্যক্ত জিনিসে আর নকলে এই অভাজনদের প্রাণ ভরে ওঠে। টিভি দেখতে দেখতে অহেতুক চাহিদা বাড়তে থাকে, বাহুল্য আতিশয্যে, যা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় তার প্রতি ঝোঁক বাড়তে থাকে। মধ্যবিত্তের বৈভব যে অতিবড় অতিকথন, সে যে বড় অন্তঃসারশূন্য—একথাটাই এরা ধরতে না পেরে সোনার হরিণের পিছনে ছোটে। আসল কথা, আসল জিনিস নজর থেকে সরে যায়। ইতিহাস বদলায়। কিন্তু ইতিহাসের স্বভাবে পুনরাবৃত্তি সহ্য হওয়ার নয়। মানুষ যে নিত্য পরিবর্তনশীল। কিন্তু কোথায় কার পুনরাবৃত্তি-স্পৃহা অবিচল থেকে যায়? সব মানুষের দোষত্রুটি আর ভুল করবার প্রবণতা প্রায় এক। এবং এ থেকে যা উৎপন্ন হয় সেগুলোও প্রায় এক ছাঁচের। তারপরও ইতিহাসের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিভিন্নতা থেকে যায় অশেষ পরিমাণে। ইতিহাসের নিয়মগুলো নিয়ম, আইন নয়। কারণ, নিয়মগুলো প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর তাবড় ইতিহাসবিদ্ স্বীকার করেন, প্রথম অপরিহার্য নিয়ম হলো পরিবর্তন। তা টেকনলজিক্যাল হতে পারে, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক হতে পারে। সময় এই পরিবর্তন দাবি করে। দ্বিতীয় অনিবার্য জিনিস হলো সঙ্ঘাত, সঙ্ঘর্ষ, যুদ্ধ। এই দুই অপরিহার্য অবিরাম ইতিহাসের গতি উৎপন্ন করে চলে তৃতীয় এক অপরিহার্য-কে। তা হলো—সবকিছুই অস্থায়ী। তাহলে ইতিহাসের প্রধান কাজ হলো প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা, বলিষ্ঠভাবে সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে রক্ষা করে চলা এবং বুদ্ধি ও শুদ্ধি দিয়ে পরিবর্তনকে প্রণাম করা।

আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষ (কিংবা পৃথিবীর কোন দেশের) কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে প্রভূত জ্ঞান অর্জন (যদি তা আদপে করা সম্ভব

হয়ে থাকে কোনদিন) করে সমাজ ও ইতিহাসের অনুশাসন আয়ত্ত করতে শেখেনি। তবুও তারা রামায়ণ, মহাভারত, জাতককাহিনী, পুঁথি-পুরাণ পড়ে দেশের ইতিহাস, ট্র্যাডিশন সানন্দে বুঝেছে। এবং সমৃদ্ধ হয়েছে। যেমন ইংরেজী ভাষার যত মানুষ বাইবেল পড়ে, অনুভব করে যত সুশিক্ষিত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে তত আর অন্যকিছুর দ্বারা হতে পারেনি। একা রাজা হরিশচন্দ্র গান্ধীজীর মেরুদণ্ড তৈরি করেছিলেন। সেই গান্ধীজীকে গীতা দিয়েছিল পরিপূর্ণতা।

মধ্যবিত্ত মানুষ মানবিভ্রান্তির যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত। হালকা, সস্তা, নকল সোনার আলোকে সূর্যের আলোর চেয়ে দামী মনে করছে। মনে করছে বিভূতিভূষণ (দু-জনই), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা সব বোকা মানুষ ছিলেন। শরৎচন্দ্র তো ছিলেনই। কারণ, এঁরা জীবন ও জগৎকে সোনার চেয়ে দামী জানতেন। একটি নাম মনে পড়ছে। অধ্যাপক ও লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। আমরা আমাদের নিজেদের ক্লাস পালিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছি। 'দেশ' পত্রিকায় 'সুনন্দর জার্নাল' পড়তে পড়তে আনন্দ, তৃপ্তি এবং আরো জিজ্ঞাসা প্রাপ্ত হয়েছি। ছাত্রছাত্রীরা গভীর অনুরাগ নিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনেছে। আবার কবে এমন অভিজ্ঞতা হবে ভাবতে ভালবেসেছে। এমন অভিজ্ঞতাই নাকি মানুষকে 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' 'সুদূরের পিয়াসী' করে। মানুষ কেবলই সুখের নীড় রচনা করে বেঁচে থাকতে পারে না। 'নষ্টনীড়ে'ও জীবনের ঐশ্বর্য ও বেদনা আছে, জীবনই ট্র্যাজিডিকে মহত্তম উপলব্ধি নিয়ে শ্রদ্ধা করতে পারে। জীবনটা যে প্রতিমুহূর্তে গড়ে তোলার এক নিরন্তর সাধনা।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকেও এই জীবনকে মধ্যবিত্ত ভালবেসেছে। একটা দৃষ্টান্ত। আমার ছাত্রজীবনে এমন শিক্ষক পেয়েছিলাম যে, জীবন ভরে উঠেছিল। পরে যেদিন স্বেচ্ছায়, পরমানন্দে অধ্যাপনার জীবন বেছে নিলাম সেদিন স্কুলজীবনের শিক্ষকদের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল বারবার। মনে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার জগদানন্দ রায়কে। শিক্ষক জগদানন্দ নিশ্চয়ই ধনবান ছিলেন না। কিন্তু তিনি মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক বিরল নিদর্শন ছিলেন। শিক্ষক কাকে বলা হবে? প্রকৃত শিক্ষক তিনি, যিনি কোন বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক নন—গোটা মানুষটিই শিক্ষক অর্থাৎ তাঁর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, কথাবার্তা, হাসি-খেলা, রুচি-মর্জি, তাঁর গুণগ্রাম, তাঁর মুদ্রাদোষ—সমস্ত মিলিয়ে যে-ব্যক্তিত্বটি সেটিই তাঁর শিক্ষকচরিত্র। বাংলাদেশে শিক্ষকচরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ বিদ্যাসাগর—সে কি শুধু তাঁর অধ্যাপনার কৃতিত্বগুণে? তিনি সংস্কৃত কলেজে 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' পড়াতেন, না পাণিনির ব্যাকরণ পড়াতেন—সে-খবর নিয়ে আজ কে মাথা ঘামায়? প্রতিদিনের বাক্যে, কর্মে, চিন্তায় তিনি যে মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাতেই তাঁর শিক্ষকজীবনের পূর্ণ মহিমা প্রকাশ পেয়েছে।

শিক্ষক, ডাক্তার, লেখক মধ্যবিত্ত সমাজের সবচেয়ে বড় মূলধন। একদিন বাঙালী এই মূলধনের জোরেই ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার অর্জন করেছিল। বাঙালী কোনদিন ব্যবসায়, ধনের বিজ্ঞাপনে, শেয়ার বাজারের বৈভবে ভারতসভায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেনি। আজ বরং আমরা অনেকেই বেশ ধনবান (যদিও

মুম্বাই-ব্যাঙ্গালোরের তুলনায় তা যৎসামান্য)। সেই ধনচ্ছটায় ভারতবর্ষে আমাদের গৌরব কি কিছুমাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে? একথা জোরের সঙ্গে বলা দরকার, ভারতবর্ষের এক-একটি অঞ্চল এক-একটি গুণের অধিকারী এবং এইসব গুণের সমাহারই ভারতবর্ষকে এত বৈচিত্র্য, এত মাধুর্য, এত সহিষ্ণুতা দিয়েছে। আর আজ? কেবলমাত্র অর্থের মহিমাই মধ্যবিত্ত জীবনের পরম ঐশ্বর্য হয়ে উঠেছে। শিক্ষক, ডাক্তার, লেখক—সবাই কত ধনী, কত বাড়ি-গাড়ি, রাষ্ট্রীয় খেতাবের স্মারকচিহ্ন হয়ে উঠেছে। অন্তঃসারশূন্য মানুষ বড় গাড়ি চেপে, ইংরেজী বলে, ক্লাবচর্চা করে আর যাই করুন আপন স্বকীয়তায় অগ্নিবীণা হয়ে উঠতে পারেন না।

আশার কথা, দরিদ্রপল্লীতে ভারতসন্তানেরা আজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করছে। স্বাধীন ভারতবর্ষ এই অধিকার, সুযোগ, সমানাধিকারের বোধ সর্বসাধারণকে দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের সংবিধানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এখন এই নিম্নবিত্ত শ্রেণী আগামী পঞ্চাশ বছর মধ্যবিত্ত ও ধনী সমাজকে বহুবিধ বিষয়ে নতুন অভিজ্ঞতা দেবে। স্বামী বিবেকানন্দের বহুকাঙ্ক্ষিত 'শূদ্ররাজত্ব' আজ আর দূরে নেই। কিন্তু স্বামীজীর বহুকাঙ্ক্ষিত সেই শূদ্ররাজত্ব যেন আমাদের দৈন্যে ধনী ও মধ্যবিত্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়ে দাঁড়ায়!

শোষণ, স্বজনপোষণ, কায়েমী স্বার্থ যেকোন শ্রেণীর পক্ষেই অসামাজিক আচরণ। নৈতিক মনোবল, সামাজিক বিচার, আইনের শাসন কল্যাণ-রাষ্ট্র নির্মাণের এবং মানব-উন্নয়নের এক ও অদ্বিতীয় অবলম্বন। আজ ও আগামীকালের শূদ্ররাজত্ব এসব অনুশাসন স্মরণ করেই অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করবে—এই আজকের মানুষের একান্ত অভিপ্রায়। ভারতবর্ষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়ে মানবমৈত্রী, শান্তি, অহিংসাব্রতকে ধর্মব্রত বলে মনে করেছে চিরকাল। মধ্যবিত্ত মানুষ একদিন এই মহৎ জীবনাদর্শকে জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে জেনেছিল।* □

* ৯৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

ভারত-শিল্প (চিত্রকলা)

অসিতকুমার হালদার

আদিম অবস্থায় মানুষ কেবল পশুর মতো তাদের আহার্য অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকত। এখনো তার নমুনা পৃথিবী থেকে মুছে যায়নি। আফ্রিকা ছাড়াও ল্যাপল্যান্ড, গ্রীনল্যান্ডের শ্বেতকায় অসভ্য মানুষেরও অভাব নেই। পরে মানুষের মধ্যে যখন সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম রসানুভূতি জাগল, তখন তারা কেবলমাত্র আহার্য বস্তু অন্বেষণকেই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য না করে তাদের আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি প্রভৃতিকে সুন্দর করে গড়তে ও সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল—তখন তাদের কাছে রূপরস গন্ধটি একটি প্রবৃত্তিমাত্র না হয়ে সত্য হয়ে উঠল। এখনো পর্যন্ত সেই পৃথিবীর প্রাচীন অধিবাসীদের সর্বপ্রথম শিল্পচর্চার নিদর্শন ভারতের গুহাগহ্বরে কয়েক স্থানে পাওয়া গেছে। রায়গড় সিঙ্গনপুরে, হোসেঙ্গাবাদ বেলেরিতে ও নিজামরাজ্যে কয়েকটি গুহার গায়ে আদিম মানুষের ছবি আঁকার চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলি প্রায় সবই শিকারের বা যেসব জন্তুদের মধ্যে তাদের সদাসর্বদা বাস করতে হতো তাদের প্রতিমূর্তি। সমগ্র ভারতবর্ষে যদি আজ কোন উপায়ে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তবুও ভারতবর্ষ সভ্যজগতের কাছে স্থান পেতে পারে না যতক্ষণ না তার শিল্পকলার উৎকর্ষতা জগতের নিকট দেখাতে পারে। শিল্পকলাই মানুষকে অমর করে রাখে। বিজ্ঞান যেমন প্রত্যক্ষ-বোধকে জাগিয়ে তোলে শিল্পকলাও তেমনি সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয় এবং চিত্তের প্রসার দেখায়।

আমাদের এই বাংলাদেশেই শিল্পী—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দেশকে প্রথম দেশের শিল্পকলার সৌন্দর্য ধরে দেন। তার পূর্বে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশের শিল্পকলাকে সার বার্ডউডের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাচ্ছিল্য করাটাই 'ফ্যাসান' ছিল। যাইহোক, এই কারণেই শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম যতদিন দেশের গৌরব ও তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেশের শিল্পের গৌরব করব, ততদিন থাকবে একথা জোর করে বলা যায়।

আমাদের প্রাচীন শিল্পকলা সাধারণের না বোঝবার কারণ আমাদের এখন সৌন্দর্যরুচি বিলাতি শিক্ষার আবহাওয়ায় বিলাতিভাবাপন্ন হয়ে গেছে। আমরা আর নানান ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো পদ্মপলাশলোচন, মরালগতি প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যবর্ণিত ভাব প্রকৃতির ভিতর খুঁজে পাই না বা দেখতে জানি না। এখন মেমসাহেবী পছন্দে দেশ ছেয়ে গেছে। অতি প্রাচীন যুগের চিত্রকলার কথা 'বিষ্ণুধর্মোত্তরম্', 'উত্তরচরিত', 'শিল্পরত্নম্' প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

'ভিত্তিচিত্র' অর্থাৎ দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা যে প্রাচীন যুগে বিশেষ প্রচলিত ছিল তা সেইসব গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। 'শিল্পরত্নম্' গ্রন্থে কিভাবে ঘর তৈরি করতে হয় এবং ছবি কিরূপ তুলিতে কিভাবে দেয়ালের গায়ে জমি তৈরি করে আঁকতে হয় বিশদভাবে সব লেখা আছে। আমরা অজন্তাগুহার দেয়ালে আঁকা ছবিরও আগেকার আঁকা ছবি সুবগুজার জঙ্গলে মধ্যবিভাগে যোগীমারা গুহায় দেখতে পাই। এই ছবিগুলি খ্রীস্টপূর্ব ২০০ বা ৩০০ বৎসরের আগেকার বলে ঐতিহাসিকেরা নির্ধারিত করেছেন। এর মধ্যে রথের, হাতির, নাচের ছবিগুলি এখনো বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। তবে অজন্তার মতো বড় রঙের বাহুল্য এই প্রাচীনতম ছবিগুলিতে নেই। এলামাটি, গেরিমাটি ও কালো রঙে সাধারণত এগুলি একটি পাহাড়ের গায়ে স্বাভাবিক গুহার ছাদে আঁকা আছে। পাহাড়টি বিন্ধ্যগিরিরই একটি অংশ। গুহাটি ১০/১২ ফুট মাত্র লম্বা চওড়ায়। এই গুহায় ছাড়া সেসময়কার আঁকা ভারতের অতি প্রাচীন চিত্রকলা আর কোথাও এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তবে প্রাচীন গ্রন্থপাঠে এবং সেই ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় যে, তখন ছবি আঁকার চলন এদেশে খুবই ছিল, তারই একটা ছাপ এই গুহাটুকুতে এখনো পর্যন্ত রয়ে গেছে।

অজন্তার চিত্রকলার বিষয় এখন সকলেই কিছু-না-কিছু খবর রাখেন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে একজন ইংরেজ উচ্চরাজকর্মচারী শিকার খেলতে গিয়ে পথ হারিয়ে দৈবাৎ অজন্তার গুহাগুলি আবিষ্কার করেন। পর্বত কন্দরে নির্জন স্থানে এগুলি অবস্থিত এবং মোঘলযুগে এর খোঁজ কেউ পেয়েছিল বলে জানা যায় না। নিজামরাজ্যে এই চিত্রশালার পীঠস্থান শিল্পী ও দেশের কর্মী মাত্রেরই দর্শনীয়। ইউরোপের ভ্যাটিকান গ্যালারিও আমাদের অজন্তা। অজন্তা অবশ্য ভ্যাটিকানের চেয়ে অনেক প্রাচীন। এগুলির সঙ্গে ব্যাজেনটাইন ও রোমের প্রাচীন চিত্রকলার বরং তুলনা করা যেতে পারে, তবে ব্যাজেনটাইন ও রোমের চিত্রকলা অজন্তার মতো প্রাণবন্ত ও উন্নত নয়, যদিও প্রাচীন হিসাবে সমসাময়িক। অজন্তায় ২৯টি গুহা আছে, ১ম থেকে ৭ম খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধরাজাদের দ্বারা তৈরি। এগুলি বর্ষাকালে বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের বছরে তিনমাসকাল অবকাশ বিনোদনের জন্যে তৈরি। তাঁরা কিভাবে ছবি এঁকে তাঁদের অমূল্য সময়কে অমর করে রেখে গেছেন গুহাবলীর দেয়ালের জীবন্ত ছবিগুলি প্রত্যক্ষ না দেখলে কালিকলমে লিখে বোঝানো যায় না।

তাঁরা আনন্দের সঙ্গে শিল্পে তাঁদের প্রাণ-পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা কেউই তাঁদের নামধাম ছবির গায়ে লিখে রেখে যাননি। তাই ইউরোপীয় প্রাচীন শিল্পীদের নামের মালার মতো আমরা আজ আমাদের প্রাচীন শিল্পীদের নামের মালা জপ করতে না পেলেও, তাদের কাজ যে আমাদের প্রেরণা যোগাতে পারে, সেইটিই আমাদের এখন দেখবার প্রয়োজন। তাই অজন্তায় গিয়ে অজন্তার শিল্পকলার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেওয়ার দরকার হয়। ইউরোপীয় চিত্রকরদের ছবি বিলাতের আর্ট গ্যালারিতে দেখবার সময় বোঝা যায় যে, চিত্রকরেরা যেসব জীবন্ত লোককে মডেল করে সামনে বসিয়ে ছবি এঁকেছেন তাঁদের অনেকক্ষণ নানা ভঙ্গিতে থাকার দরুন একটা ব্যথার ভাব যা হয় সেটিও

ছবিগুলির মধ্যে যেন ফুটে রয়েছে। অজন্তায় তা নেই, আছে ছন্দে-ছন্দে ও রেখা ও রঙের টানে শিল্পীর প্রাণের আনন্দের পরিচয়। ছবিগুলিতে প্রধানত বুদ্ধের জীবনী ও তখনকার রাজাদের সব ইতিহাসের ছবি আঁকা আছে। কোথাও রাজসভার জাঁকজমক, কোথাও ভিখারি বিদায়, কোথাও রান্নাঘরে বাটনা বাটতে গিয়ে চোখে ঝালের ঝাঁজ লেগেছে, কোথাও শঙ্খনিনাদে তূরী ভেরীর সঙ্গে রাজা হাতির পিঠে সমারোহে মিছিল করে বেরিয়েছেন বিজয়-যাত্রায়, কোথাও বা জাহাজে চড়ে সমুদ্রাভিযান হচ্ছে, কোথাও কমলদল দলছে হাতিরা, কোথাও পলাশ গাছের গুঁড়ির গা বেয়ে সার সার পিঁপড়ে উঠছে, কোথাও দাঁড়িপাল্লায় দোকানি জিনিস ওজন করছে, কোথাও রানী মূর্ছিতা হয়ে আছেন—এমনি অসংখ্য মানুষের জীবনের ঘটনা পরের পর তাঁরা তুলির টানে রেখায় রেখায় এঁকে গেছেন। ছাদের উপরে নানান শঙ্খ-পদ্ম-লতায় আঁকা ছবি, দেয়ালের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত, এমনকি বারান্দার থামেও এঁকে ভরানো আছে। অজন্তার ছবিগুলি গোবরমাটি, তুঁষ প্রভৃতি দিয়ে পাথরের দেয়ালের ওপর জমি তৈরি করে আঁকা। প্রাচীন ইতালিতে চুন-বালির পলেস্তারায় আঁকা হতো, তাই বেশিদিন টিকত। কিন্তু অজন্তার গুলি যে কি করে এতদিন টিঁকে আছে এই এক আশ্চর্য দৈব ঘটনা। অজন্তা থেকে ১৫০ মাইল দূরে গোয়ালিয়র রাজ্যে বাগগুহায় কতকগুলি এই প্রকারের প্রাচীন গুহা আছে। তার মধ্যেও অজন্তারই মতো খুব উঁচুদরের চিত্রকলা আছে। তার নাচের দলের ও মিছিলের ছবিগুলি একেবারে জীবন্ত। ঘোড়াগুলি এমন সুন্দরভাবে আঁকা যে সমসাময়িক অন্য কোন দেশে সেরূপ ঘোড়ার ছবি আঁকা হয়েছে কিনা জানা যায় না। এগুলি ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৌদ্ধযুগে আঁকা হয় বলে অনুমান করা হয়। চিত্রের গায়ে যে প্রাচীন লিপি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে তা দেখলে তার বয়স অনুমান করা যায়।

বাগগুহা ছাড়া পুড্ডুকোটে—সিওনাভাসালে সপ্তম খ্রীস্টাব্দে আঁকা অজন্তার ধরনের ছবি জৈনগুহার মধ্যে পাওয়া গেছে। এরপর ভারতবর্ষে আর এই ধরনের দেয়ালের গায়ে আঁকা ছবি আর কোথাও পাওয়া যায় না। এর রেওয়াজ লঙ্কাদ্বীপে সিগিরিয়া দাম্ভোলে পাওয়া যায়। সিগিরিয়ার ছবিগুলি ঠিক অজন্তার ধরনে পাহাড়ের গায়ে পঞ্চম খ্রীস্টাব্দে আঁকা। দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দের ছবি পোলানারওয়ায় লঙ্কাদ্বীপে পাওয়া যায়। সেখানে আরো পরবর্তী কালের আঁকা ছবি দেখতে গেলে কেলানিয়া বিহার কলম্বোয় এবং দেগালদুরুয়ার বৌদ্ধবিহার কান্দিতে গিয়ে দেখতে হয়। তবে তিব্বতে ও নেপাল মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকার প্রথা এখনো পর্যন্ত চলে আসছে।

ভারতবর্ষে ঠিক এই ধরনের চিত্রকলা যখন চলছিল তখন চীনদেশের মারফত জাপানে খোটানে, কোরিয়ায় যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে চিত্রকলারও প্রচলন হয়েছিল তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। চীনের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সহস্র বৌদ্ধ গুহাবলীতে, খোটানে এবং জাপানে হেরিওজির প্রাচীন মন্দিরের গায়ে অজন্তার ধরনের আঁকা ছবি আজও ভারতের শিল্প প্রভাবের পরিচয় দিচ্ছে। চীন ও জাপান এ-বিষয়ে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করেন।

ঠিক এর পরে মধ্যযুগে গুজরাট ও রাজপুতানায় আমরা জৈন পুঁথির ওপর একপ্রকার ছবি আঁকার প্রথা দেখতে পাই। আগেকার শিল্পকলার বনেদের ওপর এগুলি গাঁথা নয়; সুতরাং শিল্পকলা হিসাবে এর মূল্য খুবই কম। তবে ক্রমশ মোঘল রাজ্যের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতানায়, কাঙড়া রাজ্যে যে প্রাচীন চিত্রাবলী পাওয়া যায় তা থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৌদ্ধ আমলের চিত্রকলার জের তখনো যেটা ছিল সেটা পারস্য চিত্রকলার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ রূপ নিয়েছিল। এর ইতিহাস ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে যোগযুক্ত। বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাব অনেকদিন যাবৎ ছিল, তাই বাংলার প্রাচীনকালের পটে বৌদ্ধ চিত্রকলার ধরন ও রেখা রঙের টান দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া কালীঘাটের পোটোদের আঁকার পদ্ধতিও ঠিক সেই একই ধারায় চলছে যদিও অবনতির সোপানে।

রাজপুতানার চিত্রশিল্পে বোঝা যায় তখন খালি যে ছবি আঁকার পদ্ধতিরই বদল মোঘল আমলে হয়েছিল তা নয়। দেশের পোশাক-পরিচ্ছদও বদলে গিয়েছিল যথেষ্ট। অজন্তার প্রাচীন ছবিতে দেখা যায় রাজন্যের দেহ মুক্তার জড়োয়ার গহনা দিয়ে ঢাকা এবং তাঁদের ভৃত্যের জামা-টুপি ধরাচূড়া পরা। আর রাজপুত ছবিতে মোঘল জোব্বা মোঘল দরবারী ভাব। তাই আধুনিক শিল্পীরা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির পৌরাণিক চিত্র আঁকতে গেলে অজন্তার ধরনে ছবি আঁকেন, মোঘল আমলের জোব্বা পাগড়ি আঁকেন না।

মোঘল রাজ্যের গোড়াপত্তন করলেন বাবর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দরবারে শিল্পকলারও প্রতিষ্ঠা হলো। হুমায়ুনের সময়ও তার জের চলেছিল বটে কিন্তু আকবরের সময়েই চিত্রকলার এক বিশেষ রূপ ধরা পড়ল। এতদিন খালি পারস্য চিত্রকলারই জের চলেছিল মোঘল দরবারে। আকবর ভারতের শিল্পকলার নবজাগরণ আনলেন ভারতীয় শিল্পীদের তাঁর দরবারে আহ্বান ও প্রতিপালন করে। তিনি নিজে যেমন স্বদেশের কথা ভুলে গিয়ে হিন্দু রাজকন্যাকে বিবাহ করে ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে মেনে নিলেন তেমনি পারস্য ও ভারতীয় শিল্পের মিলন ঘটিয়ে তুললেন। মোঘল চিত্রকলা বলতে আমরা এখন যা বুঝি তাঁরই আমলে তাঁর গোড়াপত্তন হয়েছিল। তাঁর সময়কার বড় বড় শিল্পীদের আঁকা ছবি সাহানামা, রাজামনামা প্রভৃতি হাতে-লেখা প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সাজাহান ও জাহাঙ্গীরের সময়েও চিত্রকলার বেশ উন্নতি হয়েছিল। পরে আউরঙজেবের গোঁড়ামির দরুন চিত্রশিল্পের অবনতি শুরু হলো। মোঘল চিত্রকলায় বেশিরভাগ তখনকার দরবারের ইতিহাস ও বিলাসের কথাই জানা যায়, তাছাড়া সঠিক চেহারা আঁকারও তখন খুব বেশি রেওয়াজ ছিল। তাই আমরা আকবর শাহ প্রভৃতির সঠিক প্রতিকৃতি এখন জানতে পারি। অসূর্যম্পশ্যা পর্দানশিন রানীদের ছবিগুলি অবশ্য সব কল্পনায় আঁকা। আকবরের ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদের দেয়ালে, জয়পুরের প্রাচীন প্রাসাদের ও গলতার ছত্রির ওপর আঁকা ছবিগুলি মোঘল আমলের ভিত্তিচিত্রের পরিচয় দেয়। রাজপুতানায় প্রত্যেক ধনী গৃহস্থের শয্যাপ্রকোষ্ঠকে সুখভবন বলে এবং এই সুখভবনের দেয়ালে নানা তীর্থস্থানের ছবি আঁকার প্রথা আছে। এখন ইংরেজী সভ্যতার

হাওয়ায় এসব ব্যাপার ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এগুলি চুনের আরকাসী বা পঙ্খের কাজকরা দেয়ালের ওপর একপ্রকার বিশেষ প্রণালীতে আঁকা ভিত্তিচিত্র। মোঘল ও রাজপুত চিত্রকলা সূক্ষ্মত্ব হিসেবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ। এত সূক্ষ্ম তুলি চালানোর প্রথা পৃথিবীতে পারস্য ছাড়া আর কোথাও নেই। মোঘল চিত্র দেখতে হলে তাই আতপফলক (magnifying glass) দিয়ে দেখতে হয় নইলে তার সূক্ষ্ম কারিগরী খালি চোখে ধরা পড়ে না। মোঘল কাঙড়া ও রাজপুত চিত্রকলা এখন বেশিরভাগ ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে আর কিছু কিছু আমাদের দেশের নানাস্থানের মিউজিয়ামে ও শিল্পবিদ্যালয়গুলিতে রাখা আছে।

ঠিক মোঘলরাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিল্পকলার অধঃপতন দেখা যায়। বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা, লাহোর প্রভৃতি স্থানের শিল্পবিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজ শিল্পীরা ইউরোপীয় আদর্শে চিত্রবিদ্যা এতদিন শেখাচ্ছিলেন। তারপর শিল্পী শ্রীযুক্ত ই. বি. হ্যাভেল ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার শিল্পবিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম দেশি ধরনের ছবি আঁকার পথ দেখান। তাঁহাদেরই শিষ্য ও নাতিশিষ্যেরা আজ লাহোর, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, বোলপুর, জয়পুরে ভারত শিল্পকলার প্রচার করছেন। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যাঁরা গোড়ায় গোড়ায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের বিষয়ে হ্যাভেল সাহেবের Indian Sculpture and Paintings এবং ভিন্সেট স্মিথের History of Indian Art পুস্তকে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে।* □

* ৩৮ বর্ষ, ২ সংখ্যা

কীর্তন ও উচ্চসঙ্গীত

দিলীপকুমার রায়

কীর্তন ও হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতের প্রেরণা, বিকাশধারা ও প্রগতি সম্বন্ধে কিছু বলতে ইচ্ছা জেগেছে অনেকদিন থেকেই। সে-ইচ্ছা প্রবলতর হয়েছে আরো এইজন্যে যে, কিছুদিন হলো দু-একটি বন্ধু সম্প্রতি কীর্তনের নিন্দা করে আমাকে পত্রাদি লিখেছেন এবং মাসিক পত্রিকাদিতেও সময়ে সময়ে চোখে পড়েছে—কখনো বা কীর্তনভক্তদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রতি অবজ্ঞা, কখনো বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবিদ্‌দের কীর্তনের প্রতি বেদরদী কটাক্ষ।

এতে মনে বেদনা বোধ করেছি। কেন না, আমি আজ এ দুই সঙ্গীতেরই ভক্ত—মনে-প্রাণে অনুরাগী। যেখানেই প্রেম, সেখানেই ব্যথা অপরিহার্য, যেহেতু আধুনিক জগতের সমালোচনা মূলত প্রেমের অনুকূল নয়—অশ্রদ্ধারই অনুকূল। কিন্তু প্রেমের একটা ধর্ম এই যে, ব্যথা যেখানে আসে সেখানে শ্রদ্ধার স্বপক্ষে (অনেক সময় নিষ্ফল জেনেও) দুকথা বলতে ইচ্ছা হয়। আমি সংক্ষেপে এই কাজই সারবঃ কীর্তন (ও সেই প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্পর্কে) বলব দু-একটি দরদী কথা, শ্রদ্ধার কথা। (প্রসঙ্গত আরো বলে রাখি কীর্তনের তথা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রচলিত রূপ, রস সম্বন্ধেই আজ বলব, এ-উভয়ের ভবিষ্যৎ বিভাগের ইঙ্গিত সম্বন্ধে কোন সারগর্ভ কথা উল্লেখ করার স্থানাভাব বলে। তাই কীর্তন কেন প্রকৃতিতে একঘেয়ে নয়, কোন্ কোন্ পথে তার উত্তরোত্তর বিকাশ ফলপ্রসূ হবে সেসব সম্পর্কে আলোচনা আজ মুলতুবি রাখতেই হবে।)

সঙ্কোচ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত কথা দু-একটি বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি। প্রথম কথা এই যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ আমার আশৈশব, বহু গুণী ও সুরসাধকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় সে-অনুরাগ ও ভক্তি আমার মনে যে-শিকড় গেঁথেছে তা আমার শিথিল হবে না—হওয়া এখন অসম্ভব বলে। সুরেন্দ্রনাথ, অঘোর চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ রাও, অন্ধ শরৎ, রাধিকাপ্রসাদ, বিরু মিশ্র, আলাউদ্দীন, হাফেজ আলি, আবদুল করিম, চন্দন চৌবে, ডিমিরবরা, মোতিবাঈ, দুর্গাবাঈ, অঙ্গনবাঈ প্রমুখ গুণীর গানবাজনা—এমনকি বালক চন্দ্রশেখরের অপূর্ব তুলসীদাসের ভজন গানের স্মৃতি এ-প্রবাসেও আমার চিত্তজগতে আনন্দের মায়ালোক সৃজন করে—গান গাইবার সময়ে আজও এসব গায়ক-গায়িকা সঙ্গীতশিল্পীদের সবাইকেই নমস্কার করে থাকি। এ-ঘোর অশ্রদ্ধার যুগের এ শ্রদ্ধার জন্যে লজ্জিত আমি নই—গীতার কথায় যে আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষ যাকে গভীর শ্রদ্ধা করে তারই সত্তা পায়। তাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত আমার কাছে নমস্য থাকবে চিরদিনই। জগতে দুটি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম প্রাক্‌যৌবনেঃ ইউরোপীয় হার্মণি ও

ভারতীয় মেল্লাতি ঃ স্বরনির্ঝর ও স্বরপ্রবাহিনী ঃ বহু-স্বরিকার বহু ধ্বনি-কল্লোল ও এক স্বরিকার অপূর্ব রেখাতরঙ্গ। জেনেছিলাম প্রত্যক্ষ অনুভবে যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বিশুদ্ধ ধ্বনিরেখার তরঙ্গে গরীয়ান, এক্ষেত্রে সে অদ্বিতীয়, অপরূপ, মনোহর, চিত্তন্মাদী যেমন বহু ধ্বনির কল্লোল-সম্পদে হার্মণি অপরূপ, অদ্বিতীয়। অর্থাৎ কিনা, ইউরোপ থেকে চৌদ্দ বৎসর আগে যখন ফিরি তখন এই মনে হতো।

কিন্তু তারপরে আরেকটি মহৎ সঙ্গীতের সঙ্গে আমার মিতালি ঘটেছে। তারই ফলে আজ সঙ্গীত বলতে শুধু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকেই আমি একমাত্র শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত মনে করতে পারি না। কীর্তনকেও মনে করি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের অন্যতম—ভারতের গৌরব। অথচ একটু 'কিন্তু' আসে এখানে। এইজন্য যে, কীর্তন অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ সঙ্গীত নয় ঃ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতন শুধু সুর নিয়েই তার কারবার নয় ঃ কাব্যে ও সুরে, ভাবে ও রূপে, পদাবলীতে ও আঁখরকারুতে সে এক অতুলনীয় সৃষ্টি! হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সুরের জগতে যেমন মনোহর কীর্তনও তেমনি তার নিজের জগতে মনোহর। এই জগৎটি কি? এই নিয়েই দুটো কথা বলতে আজ প্রয়াসী হব।

মনে পড়ে, এ-সম্পর্কে প্রথমেই বাল্যকালে পিতৃদেব ওজস্বী সুরকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কথা। হিন্দুস্থানী গানের তিনি শুধু বোদ্ধা ছিলেন না—হিন্দুস্থানী সঙ্গীত থেকে তিনি বহু সুরসম্পদ এনে বাঙলা গানকে সমৃদ্ধ করে রেখে গেছেন ঃ কত সমৃদ্ধ সে-কথা আজও আমরা পুরো বুঝিনি—তবে সত্য স্বীকৃত হয়ই—তাই একদিন না একদিন স্বীকৃত হবেই। সে যাই হোক—যা বলছিলাম ঃ এহেন দ্বিজেন্দ্রলাল—যিনি ছিলেন আমার সঙ্গীতের প্রথম দীক্ষাগুরু, যাঁর প্রেরণায় বিশুদ্ধ গানকে প্রথম ভালবাসতে শিখি। তাঁর সঙ্গে বাল্‌প্রগল্‌ভতার গুণে প্রায়ই তর্ক করতাম, বলতাম ঃ "হিন্দুস্থানী গান—অপূর্ব, মানি। কিন্তু কীর্তনকেও বড় বলেন কেন আপনি? ও যা একঘেয়ে...।" তাতে তিনি হেসে বলতেন ঃ "ওরে বড় হ, তখন বুঝবি—কীর্তন বুঝতে হলে চাই হৃদয়ের গভীরতা—ছেলেবয়সে এ-গভীরতা আসে না—আর শুধু সুর সাধনায় কীর্তন বোঝা যায় না—চাই প্রেমের সাধনা, ভক্তির সাধনা।"—বলে প্রায়ই একটি নজির দিতেন মনে আছে। বলতেন ঃ "শুনেছিস তো, তোর ঠাকুর্দা, আমার বাবা, দেওয়ান কার্ত্তিক রায় ছিলেন তাঁর সময়ে বাংলার একজন মস্ত খেয়ালী কোকিল-কণ্ঠ গায়ক। হিন্দুস্থানী গানে আমার বাল্যদীক্ষা তাঁর কাছেই। তিনি নানান্ শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের কাছে আজীবন খেয়াল শিখেছিলেন। এহেন তিনি পরিণত বয়সে একদিন এক মস্ত কীর্তনীর কীর্তন শোনেন। শুনে কি করেছিলেন জানিস?—সাশ্রুনেত্রে তাঁকে প্রণাম করে বলেছিলেন, 'গোঁসাইজী বৃথাই আজীবন খেয়াল শিখে নষ্ট করেছি—যদি কীর্তন শিখতাম'...!"

মনে আছে, শুনে বিস্ময়ের আমার অবধি ছিল না। কারণ আর তো বলার জো ছিল না যে, শুধু অ-সঙ্গীতজ্ঞরাই কীর্তন ভালবাসে। সাক্ষাৎ অমন ওস্তাদ খেয়ালী ঠাকুর্দা। সাক্ষাৎ বাবা—তাঁরও বাবা! ও বাবা! সহজ কথা নয়। না চমকে পারা যায়?

কিন্তু চমকে গেলেও তবুও খটকা থাকতই। কেন কীর্তন ভাল লাগে এঁদের? ঐ সেন্টিমেন্টাল, একঘেয়ে, অশ্রুচ্ছ্বাসী কীর্তন! তাজ্জব ব্যাপার বৈকি!

কিন্তু অতঃপর নানা গুণী গায়ক-গায়িকার কাছে হিন্দুস্থানী গানের দীক্ষা নিতে নিতে কীর্তনের কথা আর বড় একটা মনে হতো না। এমন সময়ে—বিলাত থেকে ফেরার পরে—একদিন রায়বাহাদুর প্রবীণ কীর্তনজ্ঞ খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে তর্ক করতে গিয়ে ঘা খেলাম। তিনি মৃদু হেসে বললেন যে, যে জানে না তার চুপ করে থাকাই ভাল। বললেন ভাল কীর্তন আমরা শুনিই নি তাই কীর্তনের প্রশংসা শুনে এত আশ্চর্য লাগে। বললেন কীর্তন চর্চা করতে, ভাল কীর্তন শুনতে। বললেনঃ "কীর্তনেও সুরের বহু বৈচিত্র্য আছে, কীর্তনের সাধনা করলে দেখতে পাবে নানা সুর-বৈচিত্র্য আমদানী করার পথ সেখানেও সমানই খোলা।" শেষে বললেনঃ "সাধারণত আজকের দিনে অনেক বাজে গায়ক বাজে হুহুঙ্কার করে যেমন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মর্যাদাহানি করেছে তেমনি কীর্তনেরও করেছে সর্বনাশ। সুরে অদীক্ষিত লোক বেসুরো গেয়ে-গেয়ে সঙ্গীতজ্ঞ লোকের মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে যে, সুরের দিক দিয়ে কীর্তন অতি বাজে, অপলকা, অশ্রু-সর্বস্ব সুতরাং কীর্তনের সঙ্গীত গৌরব 'অসিদ্ধ' সুর কৌশলস্য 'প্রমাণাভাবাৎ'।"

মিত্র মহাশয়ের নাম উল্লেখ করলাম এইজন্যে যে, তাঁর মতন কীর্তনজ্ঞ সুকুমারমতি সুশীল মানুষের কথার মূল্য আছেই। আরো এইজন্যে—সকৃতজ্ঞে স্বীকার করছি যে, তাঁর উপদেশেই আমি কীর্তন শিখতে ব্রতী হই—নানা জায়গায় ছুটি কীর্তন শুনতে—ভালো কুলীন কীর্তন। শুনে মুগ্ধ হই। তখন বুঝি—কেন কীর্তনে পিতামহ আর্দ্র হয়ে উঠেছিলেন, কেন কীর্তন শুনে পিতৃদেবের চোখে জল আসত—তাঁরা ভাল কীর্তন শুনেছিলেন। আমাদের অধিকাংশেরই কীর্তন সম্বন্ধে রায় অশ্রদ্ধেয় একথা বুঝলাম এক মুহূর্তে। বুঝলাম—কেন ও কোন্ মাপকাঠিতে সঙ্গীতজগতে (ভালো) কীর্তন এক অপূর্ব সৃষ্টি। কি হিসেবে অপূর্ব সে-সম্বন্ধেই আজকে আমার যা মনে হয় বলব। কেবল মুস্কিল এই যে, এ-সম্বন্ধে ছোট একটিমাত্র প্রবন্ধে কিছুই বলা হয় না। 'উদ্বোধন'-এর কর্তৃপক্ষ আমাকে অল্প কয় পৃষ্ঠার মধ্যেই কীর্তন সম্বন্ধে লিখতে অনুরোধ করেছেন যে। তাই বক্তব্যকে হয়তো যথেষ্ট ফুটিয়ে তুলতে পারব না এ-অল্পপরিসরে। অনুরোধ রইল যেন দরদী রসজ্ঞবৃন্দ কল্পনা দিয়ে এ-ত্রুটি আমার সেরে নেন। ইচ্ছা রইল ভবিষ্যতে এ-ত্রুটি পূরিয়ে নিতে—কীর্তনের আরো নানা গুণবৈশিষ্ট্যের কথা লিখেঃ তবু সঙ্কোচ হয়ই পাছে ছোট্ট পরিসরে স্তুতি করতে গিয়ে কীর্তনের মর্যাদার হানি করে বসি।

আমাদের দেশে বলে সঙ্গীত দুরকমঃ এক, মার্গসঙ্গীত ওরফে রাগসঙ্গীত; একে ইংরেজী ভাষায় বলে ক্ল্যাসিকাল মিউজিক। দুই, দেশী সঙ্গীত; একে বলা হয় আধুনিক সঙ্গীত অথবা লোকপ্রিয় সঙ্গীত—মডার্ন মিউজিক, পপুলার মিউজিক। নাম নিয়ে তর্ক নয়, আসল কথাটা এই যে, ক্ল্যাসিকাল চীজ এ নয়। কীর্তনকে, বাউলকে তাই লোকসঙ্গীতের পর্যায়েই সচরাচর ফেলা হয়ে থাকে।

এতে করে কীর্তনের পরে খুবই অবিচার করা হয়। কারণ কীর্তন যেখানে লোকপ্রিয় ও যেজন্য লোকপ্রিয় সেজন্যে সে বড় নয়। পপুলারিটি বা লোকপ্রিয়তা কোন বড় শিল্পকলার মহত্বের পক্ষে প্রামাণিক নয়। এমনকি, কীর্তন অধিকাংশ স্থলেই পপুলার হয় তার ছোট আবেদনটুকুরই জন্যে একথা বোধহয় অকুতোভয়ে বলা যেতে পারে অর্থাৎ কিনা তার মাতামাতি, ঝাঁপাঝাঁপি, হৈ-চৈ, রৈ-রৈ এরজন্যে—যেমন কিনা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতও অধিকাংশ ক্ষেত্রে করতালি পায় তার তালের, তানের হুহুঙ্কার, কসরতের বাহবাস্ফোট—এককথায় মল্ললীলার আড়ম্বরের জন্যে। সব বড় শিল্পেরই অবনতি হয় অরসিকদের অন্ধতায়, অসংখ্য ছোট গ্রহীতার সঙ্কীর্ণতার মাধ্যাকর্ষণে। সস্তা আবেদন ব্যাপক গভীর রস হৃদয়ের অনুভূতির গভীরতার অপেক্ষা রাখে। মানুষ স্বতই চায় আদর আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই সস্তা পথেই সে নগদ বিদায়ের জন্যে লুব্ধ হয়ে ওঠে। সুরের ভাবের ছন্দের গভীর আবেদন লোকপ্রিয় নয়—অন্তত লোকশিক্ষার ও সংস্কৃতির এ ব্যাপক দৈন্যের যুগে তো নয়ই। ভবিষ্যতে আশা করি জনসাধারণও বিদগ্ধ রসিক গভীর বোদ্ধা হবেন—কিন্তু সে-আশা বহুদূর এ নিশ্চয়। তাই উপস্থিত বলা যায় বৈকি যে, বড় জিনিস, বড় বিকাশ, বড় আবেদন অন্তত বহুদিন ঠিকমতো গৃহীত আদৃত হবে না অর্থাৎ যেজন্যে তারা বড় সেজন্যে প্রতিষ্ঠা পাবে না। পাবে অবান্তর কারণে।

সে যাইহোক যা বলছিলাম। কীর্তনকে পপুলার বলেই বলা হয় প্রায়ই—দেখ, এত লোকের ভাল লাগল, কাজেই এ বড়, যা সবাইয়ের ভাল লাগে তাই তো মহৎ—টলস্টয় বলেছেন—ইত্যাদি।

কিন্তু এ-কথায় 'সবাইয়ের' মনে এ ডেমোক্রেসির যুগে আত্মগৌরবের হিল্লোল বইলেও ডেমোক্রেসির সস্তা নৌকা যে আজ বানচাল হবার জো হয়েছে একথা সব চিন্তাশীল মানুষই স্বীকার করছেন। অন্তত, সর্বসাধারণের কীর্তন ভাল লাগাটাই যে কীর্তনের মহত্ত্বের প্রামাণিক হিসেবে গ্রহণ করা চলে না একথা অপ্রতিবাদ্য। Vox populi vox dei একথায় যে মন আর সাড়া দেয় না—উপায় কি? গণতন্ত্রের মহিমা সম্বন্ধে যে-স্বপ্ন আমরা দেখছিলাম তা প্রায় ভেঙেছে বৈকি। যাইহোক, ফিরে আসি কীর্তন ও বাউলের কথায়।

সবাই জানেন কীর্তন ও বাউল এ-দুয়ের নাম প্রায়ই একনিঃশ্বাসে করা হয়ে থাকে। কিন্তু ওদের মধ্যে প্রভেদ আসমান জমিন' বাউলই হলো সত্যকার লোকপ্রিয়সঙ্গীত। অল্প এর গণ্ডি, অল্প এর কল্পনা, অল্প এর প্রতিভা, অল্প এর উচ্চাশা। এ মিষ্টি সহজ আবেদনে সুললিত—যাকে ইংরেজীতে বলে 'প্রেটি' বাংলায় বলে—চিকণ বা চটকদার। এ থেকে যেন কেউ আমাকে ভুল না বোঝেন। কারণ এ থেকে বাউলকে আমি অবজ্ঞা করি এ-সিদ্ধান্ত করলে সেটা ঠিক হবে না। বাউল আমার বেশ লাগে—ঐ যে বললাম, মিষ্টি জিনিস। কিন্তু বাউল হলো একতারা, একমুখী, অল্পসুখী। পক্ষান্তরে কীর্তন হলো বহুতন্ত্রী, বহুবল্লভ, বহুঝঙ্কার, বহুছন্দিত। রেশ এর যে কত তা বলে শেষ করা যায় না। সুরের ভাবের সুষমার ভবিষ্যৎ এর উজ্জ্বল। নানা বিকাশ সম্ভাবনার ইঙ্গিতই এর মধ্যে—প্রাণ-সম্পদ এর অজস্র। শুধু কথায় নয় আঁখরে, তানে, তালে, ছন্দে, নাট্য পরিকল্পনায় কীর্তন মহীয়ান। তাই

কীর্তনকেও আমার মতে ক্ল্যাসিকাল বা মার্গসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা উচিত—দেশী সঙ্গীতের পর্যায়ে ফেললে অবশ্য আমার আপত্তি নেই যদি না কীর্তনের গরিমা বর্ণনা করা হয় এই বলে যে ও লোকপ্রিয়। একথা জানা এবং মানা দরকার যে, কীর্তন একটি অতি উচ্চবিকশিত সমৃদ্ধ সঙ্গীত—কৌলিন্য ও শালীনতায় সে অচল প্রতিষ্ঠ।

কিন্তু কীর্তনের ক্ল্যাসিসিজম বা কৌলিন্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সমশ্রেণীর নয়। কীর্তনের যে কৌলিন্যতার জাতই আলাদা। কী জাত কীর্তনের? বলি।

রবীন্দ্রনাথ কীর্তন সম্বন্ধে একটি পত্রে লিখেছেন: "বাংলাদেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না, সে বন্ধন হোক না সোনার, বাদশাহি হাটে তার দাম যতই উঁচুই হোক। অথচ হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জন করেনি। সেসমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সঙ্গীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগ এমনই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।"

কীর্তন সম্বন্ধে এ হলো লাখ কথার এককথা। কেবল এর মধ্যে একটি ভুল কথা আছে যে, কীর্তন হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীর কাছে হাত পেতেছে। কীর্তন সুর-সম্পদে একেবারেই স্বকীয়—রাগসঙ্গীতের সঙ্গে ওর নাড়ির যোগ নেই। তবে সে যাক, ওর আসল কথাটি অপ্রতিবাদ্য—কীর্তনের যে প্রেরণা তার উদ্ভব অন্তর্নিহিত গভীর ও দুর্নিবার হৃদয়াবেগ থেকে—বাইরের কোন কলাকারু বা এস্থেসিস থেকে নয়। এর মানে নয় অবশ্য যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রেরণা নেই। আছে যথেষ্ট। প্রতি মহীয়ান শিল্পেই হৃদয়ের, প্রাণের আবেগ থাকবেই নইলে সে শিল্পের কোঠায়ই পড়ে না। কিন্তু হলে হবে কি, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যে-হৃদয়াবেগ তার ভঙ্গি, ছন্দ, ধারা ও প্রেরণা কীর্তনসঙ্গীতের সগোত্র নয়—একেবারেই না। এখানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলতে গজলাত্মক লোকপ্রিয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কথা বলছি না এটা মনে রাখা দরকার, বলছি ক্ল্যাসিকাল ধ্রুপদ খেয়ালাত্মক উচ্চসঙ্গীতের কথা। এ-সঙ্গীতে রাগের রূপ-আলপনা একটা মস্ত কথা; এত মস্ত যে, সেখানে হৃদয়ের আবেগ রূপের আবেগের পিছনে লুকিয়ে থাকে। ভাবটা এই যে, রূপ যদি ফোটে তবেই আবেগ সার্থক। কীর্তনে ঠিক উলটো; এখানে রূপ ফুটেছে না বলি না (তাহলে শিল্পই হয় না, যেহেতু শিল্পের কাছে রূপ মস্ত কথা—অন্তত গৌণ তো নয়ই) কিন্তু ভাব যে আবেগকে ছাপিয়ে সে নিজেকে উদ্ঘাটিত করছে না। এ-কথা বলতে ঠিক কি বুঝছি সেটা ছন্দের ওরফে তালের প্রসঙ্গ অবতারণা করে চেষ্টা করি প্রাঞ্জল করতে। (একটু টেকনিক্যাল আলোচনা ক্ষমণীয়—কিন্তু শিল্পের আলোচনায় টেকনিকের আলোচনাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া চলে না যে।)

সবাই জানেন, হিন্দুস্থানী গানের উৎকর্ষের সঙ্গে তার তালের নৈপুণ্যের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ধ্রুপদে চৌতাল সুর ফাঁকতাল ধামার জাতীয় কল্লোলিত ছন্দকে যদি বাদ দেওয়া যায় তবে সুরের ইমারত ধ্বসে পড়ে বললেও বোধকরি অত্যুক্তি হয় না। এসব সঙ্গীতের স্থাপত্যশিল্পের তাল বাহিরলঙ্কার নয়—ইমারতেরই উপাদান। ধ্রুপদী তালের জলদগম্ভীর কদম, তথা—কনট্রাস্টে-বাঁট,

আড়ি কুআড়ির বক্রগতিতে যিনি দুলে উঠেছেন তিনিই জানেন একথা কত সত্য। মনে আছে বিশ্বনাথ রাও বা অঘোর চক্রবর্তী বা ধ্রুপদে আমার গুরু পূজনীয় রাধিকা গোস্বামীর উদাত্ত লয়ে যখন তিনি সমে ফিরি-ফিরি করতেন—মন আনন্দে উঠত অধীর হয়ে। সে ছন্দকারুতে কোন অহঙ্কার নেই, জাহিরিপনা নেই, মাতামাতি নেই—অথচ তবু তাল যেন সুরের সঙ্গে চলেছে হাত ধরাধরি করে, সই পাতিয়ে। পরমহংসদেব বলতেন দুধ ও দুধের সাদা রঙকে আলাদা করে ভাবাই যায় না—এও তেমনি। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ধ্রুপদ সঙ্গীতের বাঁধুনিতে তাল ও সুরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। খেয়াল টপ্পা ঠুংরিতে তালের এই বাঁধাবাঁধি থেকে গান অপেক্ষাকৃত মুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তবুও একথা বললে বোধ করি কোন সঙ্গীতজ্ঞই আপত্তি করবেন না যে, হিন্দুস্থানী গানে—এক আলাপ ছাড়া—তালের সঙ্গে সুরের সম্বন্ধ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ।

কীর্তনে তালের অভিব্যক্তি ঠিক এ-ধারায় হয়নি। এখানে ফের বলি—কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝেন। কীর্তনে তালের বিভূতি নেই এমন কথা বলছি না আমি মোটেই। কীর্তনের তাল নৈপুণ্যও চমৎকারিত্বের অভাব নেই। গরাণহাটি বা মনোহরসাহী কীর্তনের তেওট, মাধ্যম, দশকুশী বিলম্বিত ঝাঁপতাল প্রভৃতিতে তালের মাধুর্য অবর্ণনীয়। কিন্তু তবু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তালের সঙ্গে কীর্তনের তালের এই তফাত সর্বত্রই লক্ষিত হয় যে, কীর্তনের তাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তালের মতন স্বাতন্ত্রবাদী নয়, বহির্মুখী নয়। কীর্তনে তালও সুরের মতন অন্তর্মুখী—নিজেকে রাখে যথাসম্ভব গোপনেই যেন, চলে যেন অনেকটা অন্তঃশীলা ছন্দে। বহু সুন্দর তালের এ-ভঙ্গি কিন্তু সেইজন্যেই আবার অত্যন্ত কঠিনও। কারণ যেখানে তালের লয় আপনাকে পদে পদে জানান দিয়ে যায় সেখানে তাল রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু যেখানে তালের লয় অন্তর্গূঢ় সেখানে তাল রাখাও সহজ নয় তালের রস পাওয়াও কঠিন। অথচ তবু এ-তালের সুষমা কবিকল্পনা নয়, এ-ও কংক্রীট, বাস্তব। অর্থাৎ কীর্তনের তালেরও রস পাওয়া যায়—শ্রদ্ধার সঙ্গে শিখলে, এ আমার অনুমানও নয়—অন্তরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ সাক্ষ্য। কীর্তনের তেওট দশকুশীর ছন্দে অপূর্ব রস পেয়েছি যে আমি।

কিন্তু তবু বলব—কীর্তনের তাল বা ছন্দের রস হিন্দুস্থানী তালের রসের সমজাতীয় নয়। এখানে কীর্তনের ছোট বা চুটকি তালের কথা বলছি না যেমন জলদ জপ তাল, ধামালি তাল ছোট দুপেকা প্রভৃতি তাল। বলছি ওর কল্লোলিত বিলম্বিত তালগুলির কথা। এসব তালের রচনা নৈপুণ্য অতি সুন্দর।

কিন্তু একটু কথা আছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাল অতি স্পষ্টভাবে সজাগভাবে অলঙ্কৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তালের নানা ভঙ্গি নানা লীলায়ন অতি আশ্চর্য কৌশলে প্রয়োগ করা হয়—মনের মধ্যে তালের ছন্দের দুলকি চালে শিহরণ জাগাতে। এ-ও কম কথা নয়। ইউরোপে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞরাও দেখেছি বিস্মিত হতেন আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের—বিশেষ করে বিষমপদী তাল নৈপুণ্যে। একথা আমি অকুতোভয়ে বলতে পারি যে, তালের জালবুনুনির যে-কৌশল হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতজ্ঞের নখদর্পণে সে-নৈপুণ্য

বিশ্বের বিস্ময়। আলাউদ্দীন খাঁর তালের ইন্দ্রজাল—তার মহিমার ব্যাখ্যান হয় না—তার তুলনা সত্যই নেই। বিশ্বনাথ রাওয়ের তালের সাধনা ছিল অদ্ভুত। জগদ্বিখ্যাত ফিলাডেলফিয়া অর্কেস্ট্রার নায়ক স্টকভ্‌সকি—যিনি একশো কুড়িটি বাদকের জুড়ি হাঁকান আমেরিকায়—তিমিরবরণের সরোদের তাল নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে গোয়ালিয়র থেকে লিখেছিলেন আমাকে ঃ "আমরা তালে তোমাদের কাছে শিশু।" এ-দৃশ্যত অবান্তর কথার অবতারণা করলাম শুধু দেখাতে যে, কীর্তনের তাল ঠিক এ-শ্রেণীর বিস্ময় জাগাবে না। কিন্তু সে প্রত্যাশাই যে এর কাছে করা অসঙ্গত। কারণ বলেছি, কীর্তনে তাল আত্মবিজ্ঞপ্তি চায়ই না—ছন্দ সেখানেও আছে, কিন্তু স্ব-প্রধান নয়। ছন্দ তো নয়ই—এমনকি সুরও নয়। কীর্তনে তাল ও সুর উভয়েই অন্তরের ভাব গাঢ়তার আবেগোচ্ছলতার অনুবর্তী, তারা বাইরের কোন কারুকলার কাছে হাত পাতেনি—তার দরকারই হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—ফের বলি পুনরুক্তি ক্ষমণীয়—'হৃদয়াবেগ'ই যে কীর্তনের অন্তপ্রেরণা। কীর্তন মূলত যে অন্তর্মুখী সঙ্গীত, ভাবমুখী সঙ্গীত। তালে বিস্ময় জাগানো চমক জাগানো ওর স্বধর্মই নয় যে। কীর্তনের ভাবঘন প্রেমগাঢ় অন্তর্লোকে সব আগে ডেকেছিল ভক্তির বান, প্রেমের বান—তাই সে বাধা মানেনি, সুরে ছন্দে আঁখরে কাব্যে এঁকেবেঁকে যথেচ্ছ গতিতে পথ কেটে বেরিয়ে চলেছে উধাও অসীমের পানে অকূলের অভিসারে। তাই না সুর ও তাল তার আজ্ঞাবহ—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতন অনুশাসক নয়; পরিচারক, ব্যজনীকার—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতন সখী নয়।

বস্তুত, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও কীর্তনের তুলনা করাই উচিত নয়। ও দুই আলাদাজাতীয় সঙ্গীত। আমি তাই ব্যথিত হই উভয় ক্ষেত্রেই যখন দেখি কীর্তনীরা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে কালোয়াতি বলে অবজ্ঞা করেন তখনও, আবার যখন দেখি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতজ্ঞরা কীর্তনকে অ-সঙ্গীত বা চুটকি সঙ্গীত বলে অনাদর করেন তখনও। কেননা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও কীর্তন উভয়ই উচ্চসঙ্গীত—চুটকি সঙ্গীত নয়। কেবল এ-দুয়ের বিকাশধারা আলাদা আলাদা পথ কেটে নিয়ে চলেছে—এদের প্রেরণা আলাদা বলে—লক্ষ্য আলাদা বলে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত চেয়েছে—স্বরশুদ্ধি, ছন্দনৈপুণ্য, রূপকৌশল। কীর্তন চেয়েছে ভক্তির প্রেমের তরঙ্গ—সুরের কল্লোল, আঁখরের আলপনায়, ছন্দের অন্তঃশীলা কিঙ্কিণি ধ্বনিতে। কেউই কারুর চেয়ে কম নয়—উভয়েই নিজের নিজের ক্ষেত্রে অতুলনীয়। তবু যে এ-তুলনা করলাম সে শুধু দেখাতে যে, ওদের লক্ষ্য ভিন্ন—দেখাতে যে এ-তুলনা পরস্পরের সঙ্গী—প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। তাই আরেকটি মাত্র অবশ্য উল্লেখনীয় কথা বলেই ইতি করব। কারণ সেটি হচ্ছে কীর্তনের প্রধান সম্পদ ঃ কীর্তনের নাট্যস্থাপত্যকারু—dramatic architectonies—তার কথা না বললে কীর্তনের একটি প্রধান কথাই না বলা থেকে যায়।

এই স্থাপত্যকারুতে কীর্তন জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—যেমন সুরের অতি সূক্ষ্মতায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এক ইউরোপের অপেরার সঙ্গে কীর্তনের খানিকটা তুলনা হয় দুই-ই নাট্যসঙ্গীতবর্গীয় বলে। কিন্তু অপেরাও কীর্তনের সমকক্ষ নয় ভাব-ব্যাখ্যানে। কারণ অপেরায় যন্ত্রসঙ্গীতই প্রধান—অনির্বচনীয়তাই

তার লক্ষ্য। পক্ষান্তরে কীর্তন অনির্বচনীয় হয়েও যেহেতু সে সঙ্গীত নয়—কাব্যও, সেহেতু বচনীয়ও বৈকি। অপেরার কথা অতি অকিঞ্চিৎকর—আখ্যানভাগ প্রায়ই ছেলেমানুষি। পক্ষান্তরে কীর্তনের কথা অপূর্ব মনোহর, কাব্য উদাত্ত, মর্মস্পর্শী, সনাতন অথচ নিত্য পুনর্ণব ঃ

"আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি তবে যে পরাণে মরি
চণ্ডীদাস কহে, পরশরতন গলায় বাঁধিয়া পরি।
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত ভালো মন্দ নাহি জানি
কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্য সম—তুহারি চরণখানি।"

অথবা

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন ন তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়া রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন ন গেল।"

এই উচ্ছল প্রেম নাট্যসঙ্গীতের সুবিস্তীর্ণ অনুভব-গ্রামে নিজেকে প্রকাশ করেছে ধ্বনি ও অধ্বনির মিলনে, রূপ ও অরূপের সমন্বয়ে। অপেরায় এ-বস্তু নেই—এ আধ্যাত্মিকতার কাছেই সে আসতে পারে না। তবে এখানেও স্মরণীয় যে, অপেরার লক্ষ্যও এ নয়। অপেরা ওদের দেশের সঙ্ঘবাদী জীবনের ধ্বনি-প্রতিবিম্ব। তাই তার গোড়াকার কথা হলো ব্যূহরচনা—organisation—সুরের, যন্ত্রের, বহুকণ্ঠের, বহুযন্ত্রের। এক কথায়, অপেরা চেয়েছে—current ও cross-current এর—প্রাণশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের কল্লোল, জনতার বহুমর্মর, হৃদয়ের অজস্র রূপব্যঞ্জনা—ধ্বনি সমবায়ে, জাগতিক মানবিক নানা বিরুদ্ধ গতির সুর-সমন্বয়ে। কীর্তন চেয়েছে ঐকান্তিক ভাগবত প্রেম-প্রীতি যদিও একটিমাত্র পথে নয়—হৃদয়াবেগের নানামুখী ভঙ্গিতে শাখায়িত হয়ে, পল্লবিত হয়ে, পুষ্পিত হয়ে; অভিমানে, সখ্যে, দাস্যে, পূজায়, বেদনায়, মৃদুহাস্যে, আনন্দে, বিরহে, মিলনে, অশ্রুতে—সর্বোপরি অসীমের পায়ে ঐকান্তিক সর্বহারা আত্মসমর্পণে, শরণাগতিতে। আধ্যাত্মিক নাট্যসঙ্গীত হিসেবে তাই কীর্তনের দোসর নেই। কথকলি, জাভার নৃত্য প্রভৃতি কীর্তনের নাট্যরসের তুলনায় অগভীর—ছেলেমানুষি। কারণ অতি স্পষ্ট। কীর্তনের লক্ষ্য মানুষ নয়, কীর্তনের লক্ষ্য ভাগবত করুণা নানা ভাবে, নানা আবেগে, নানা রূপে, নানা চেষ্টায়, নানা রঙে, নানা ঢঙে। মানুষের হৃদয়রাজ্যের গভীরতম অনুভূতি প্রেম। এ প্রেমের ঢল নেমেছে কীর্তনে দুর্নিবার প্লাবনে, অশ্রান্ত কল্লোলে, উদ্দাম গতিবেগে। তাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগশুদ্ধির বাঁধাবাঁধির সব বাঁধকে সে খড়কুটোর মতন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তাই সে সুরশাসকদেরকে বলতে পারল ঃ "কার সাধ্য রোধে মোর গতি।" বলতে পারল তালনিয়ন্তাদেরকে ঃ "আমি কাউকে মানি না।" বলতে পারল ক্ল্যাসিকাল ঐতিহ্যকে ঃ "তোমাকে আমি পেলেও ঢেলে সাজাব মনে রেখো কিন্তু—কোন আপত্তিই শুনব না—শুনব না—শুনব না।" এককথায় কীর্তন আপন ধারায়, আপন স্রোতে সৃষ্টি করতে পেরেছে এক বিপুল পটভূমিকা—হৃদয়কে কেন্দ্র করে, প্রেমকে প্রতিমা করে, ভক্তিকে আরাধ্য করে।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, প্রেমের ভক্তির আবেগকে যাঁরা অবিশ্বাসের চোখে দেখেন তাঁদের কাছে কীর্তনের ভাব বিলাসিতা মনে হবেই। কেননা শুধু মস্তিষ্ক বা মনের বিচার দিয়ে কীর্তনের নাগাল মিলবে না। কীর্তনের যে-নাট্য রূপ, যে-মেলতিক রূপ, যে-ছন্দের রূপ সে-সবের কলাকারু নেই একথা অবশ্যই বলি না—কিন্তু তার মহিমা ও প্রবলতা হলো একান্তভাবেই অন্তর্মুখী—অন্তর থেকেই তার উদ্ভব, অন্তরের প্রতি আবেগের ভাগবত উদ্বোধন ও উচ্ছল আত্মোৎসর্গেই তার সার্থকতা। তাই শুধু সুরজ্ঞ হলে যেমন কীর্তন গাওয়া যায় না তেমনি বোঝাও যায় না। কীর্তনের রসজ্ঞ হতে হলে, হতে হবে প্রেমপন্থী ভক্তিবল্লভ; ভাগবত ভক্তিকে বাদ দিয়ে, কীর্তনের বিচার হলো হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকের সমালোচনার মতনই বিড়ম্বনা।

শুধু আরেকটি কথা মাত্র পরিশেষে। কীর্তন সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা হলো না—তার কাব্যশিল্প, নাট্যশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, আঁখরে নিত্য নতুন কল্পনাশিল্প, রচয়িতার মূল সুরমূর্তি বজায় রেখেও গায়কের নিজের সুরকারু ও ভাবপ্রতিভাকে ফলিয়ে তোলার শিল্প—কত কী। এর প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদা প্রবন্ধ লেখা যায়। সে কাজ পরে করার ইচ্ছা রইল। এখানে শুধু একটি কথা না বলেই পারছি না। সেটি এই যে, কীর্তন মহান সঙ্গীত হলেও তার বিকাশ যে আর হতে পারে না এমন নয়, যেমন ধরা যাক সুরের দিকে। এ-পর্যন্ত কীর্তন মূল ভাবপ্রধান, কাব্যপ্রধান হয়ে এসেছে। কিন্তু ভাব রূপের অন্তরায় নয়—সাথী। কাব্য সুরের পরিপন্থী নয়—মিতা। কীর্তন এ-যাবৎ সুরের সূক্ষ্ম শ্রুতিবিলাসের পথে যায়নি—যেমন গেছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত। কিন্তু তাই বলে সুরের সূক্ষ্ম কারুকলা কীর্তনের রস বা প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ হবার কোন কারণই নেই। খগেন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বেশ সুন্দর করে বলেছিলেন এ-কথাটি ঃ "দিলীপ, কীর্তনে সুরের কাজ কেন হবে না বলো দেখি? কণ্ঠ সাধনায় সুর সাধনায় সিদ্ধগুণী কীর্তন গাইলে তা আরো অপরূপ হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই। কীর্তনের ভাব বজায় রেখে সুরের আরো বিকাশ খুবই সম্ভব এবং সেই কাজই করা উচিত তোমাদের—যারা হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে সুরের সাধনা করেছ, কিন্তু এজন্যে আগে ভালবাসতে হবে কীর্তনকে—চিনতে হবে তার মহত্তম বিকাশকে—জপ করতে শিখতে হবে তার মূল মন্ত্রটিকে। এ-প্রেম বিনা কীর্তনের জগতে কোন নব সৃষ্টিই করা যাবে না। আমার খুব দুঃখ হয় দেখে যে, সুরে-অসিদ্ধ লোক কীর্তনে সুর সৃষ্টি করতে পারে না বলে সেই অক্ষমতাতেই ধরা হয় কীর্তনের স্বকীয় সুর বন্ধ্যাত্বের নিদর্শন।"—কথাটা মনে লেগেছিল এবং তারপরে কীর্তনে নানা রচনা করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাইতো খগেন্দ্রনাথের কথাগুলি উদ্ধৃত করলাম। কীর্তনে ভাব ও সুরের এক নব সমন্বয়ে সুরসাধক নব নব সৃষ্টি করতে পারেন একথা আমি কীর্তন রচনা করতে করতে নিত্যই বুঝছি আরো বেশি করে। সে-সব সম্বন্ধে কিন্তু ব্যাখ্যা অর্থহীন—হাতেকলমে করে তবে দেখাতে হবে কীর্তনের কোন্ কোন্ পথে বিকাশ হতে পারে। (এ আমার থিওরি মাত্র নয় পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা। আমার যন্ত্রস্থ 'গীতশ্রী' স্বরলিপি-পুস্তকে এর কিছু আভাস দেবার প্রয়াস পেয়েছি।) অবশ্য এ-বিকাশ হয়তো সব সময়ে কীর্তন

হবে না। কিন্তু নাই হলো। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ যে বাঙলা সঙ্গীত রচনা করেছেন তা হুবহু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নয় বলেই তা 'সৃষ্টি'। কীর্তনের কাব্যশ্রী ও প্রেমশ্রীর সঙ্গে সুরশ্রী এসে মিললে সে-সমন্বয়ে যে অভিনব ত্রিবেণী-সঙ্গমের উদ্ভব হবে সে-ও হবে এমনই এক নবসৃষ্টি যেমন বাংলার শ্রেষ্ঠ সুরকারত্রয়ীর বাঙলা গান হয়েছে অভিনব সৃষ্টি আধুনিক বাংলা সঙ্গীতে—যা বাংলার গৌরব। আর এ-গৌরবের ভিত্তি হলো বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ ভাবপ্রবণতা রসাদ্রতা। তাই রবীন্দ্রনাথ আমার কীর্তন সম্বন্ধে এ-প্রবন্ধটি পড়ে ২৯.৭.১৯৩৬ তারিখে একটি পত্রে আমাকে লিখেছেন ঃ "কীর্তনসঙ্গীত আমি অনেককাল থেকেই ভালবাসি। ওর মধ্যে ভাব প্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোন সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায়-প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সঙ্গীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তন সঙ্গীতে বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।... কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরোঁ প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে—রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক। আমি কল্পনা করতে পারিনে হিন্দুস্থানী গাইয়ে কীর্তন গাইছে, এখানে বাঙালীর কণ্ঠ ও ভাবার্দ্রতার দরকার করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি বলা যায় না যে, এতে সুর-সমবায়ের পদ্ধতি হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সীমা লঙ্ঘন করে না! অর্থাৎ ইউরোপীয় সঙ্গীতের সুরপর্যায় যেরকম একান্ত বিদেশী, কীর্তন তো তা নয়। ওর রাগরাগিণীগুলিকে বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে উপদ্রব করা হয় না। কিন্তু ওর প্রাণ, ওর গতি, ওর ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"

একথা অংশত সত্য সন্দেহ কি? কিন্তু তবু একথা বলা চলে না যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতজাতীয় রাগরাগিণীর উপাদানই কীর্তনের মূল উপাদান। আর তাই জন্যেই কীর্তনী রাগরাগিণী নিয়ে কোন নতুন রাগের জাতি চিহ্নিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, কীর্তনের অভিব্যক্তি আলাপের দিকে নয় নাট্যসঙ্গীতের দিকে—তাই তো কীর্তনের মূল উপাদান হলো—ঐ যাকে কবি বলেছেন 'ভাবরস হৃদয়াবেগ'। এরই আলোয় সে স্বতন্ত্র সুরের পথ কেটে নিয়ে চলেছে। এ-পথের মহিমা বুঝতে হলে এই গভীর ভাবরস ও হৃদয়াবেগকে পরমাত্মীয় বলে চিনতে হবে। শুধু সুরের আত্মীয়তায় সে বোধ ঠিকমতন হয় না। কীর্তনের রসিক হতে, ঐ যে বললাম, চাই সব আগে হৃদয়াবেগের দাম দিতে শেখা—হৃদয়াবেগের দর্পণে তার ফলিত মূর্তির রসগাঢ়তার মর্মজ্ঞ হতে শেখা এ অনুশীলনের মূল ভাগবত প্রেমের অনুশীলন—ভক্তির সাধনা—আর যেহেতু প্রেম ভক্তিই আধ্যাত্মিক জগতের সবচেয়ে বড় দিশারি সেহেতু কীর্তনের চেয়ে যথার্থ আধ্যাত্মিক সঙ্গীত আজ পর্যন্ত মানব হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে এমন ভাবঘন মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারেনি।* □

* ৩৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

ব্যবহারিক শিল্প

নন্দলাল বসু

ব্যবহারিক শিল্প বলতে মানুষের থাকবার জন্য শহর, গ্রাম ইত্যাদি, বসবার, শোবার আসন শয্যা প্রভৃতি, আহার্য দ্রব্যাদির জন্য তৈজসপত্রাদি, পরিধান বস্ত্র, অঙ্গের ভূষণ, উৎসবের আয়োজন, উদ্যান শিল্প ইত্যাদি মোটামুটি বোঝায়।

ব্যবহারিক শিল্পের দুটি দিক, একটা ব্যবহারের আরেকটা সৌন্দর্যের। সৌন্দর্যের দিকটা অনেকে অনাবশ্যক মনে করেন; কেউবা অতিরিক্ত প্রয়োগ করেন; কেউবা বিকৃতভাবে ব্যবহার করেন; কেউবা indifferent-ভাবে গ্রহণ করেন।

আজকের লেখায় আমরা সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা ও তার সম্যক ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করব। জীবনধারণের জন্য যেসব বস্তু প্রয়োজন, তা দুই কারণে আমরা ব্যবহার করি। একটি প্রাণধারণের জন্য, দ্বিতীয়টি আনন্দ পাবার জন্য। একটি স্থূল দেহের প্রয়োজন সাধন করছে, আরেকটি সূক্ষ্ম মনের ক্ষুধা নিবারণ করছে।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আদিমকাল হতে দুদিকেরই উৎকর্ষ সাধন করে আসছে। মানুষ যত উন্নত হচ্ছে, ততই কি করে সমাজবদ্ধ হয়ে আনন্দে ও শান্তিতে বাস করতে পারে তার চেষ্টা হচ্ছে। কেবলমাত্র বেঁচে থাকলেই সব শেষ হলো, কেউ বলছে না। তা যদি হয় তবে সৌন্দর্যবোধ অর্ধেকের ওপর এই আনন্দের ক্ষুধা যোগাচ্ছে। সৌন্দর্যবোধ ৬৪ কলার সাধনের ভিতর দিয়ে হচ্ছে।

যখন দেখি কোন ব্যক্তি ও জাতি সৌন্দর্যবোধ অনাবশ্যক মনে করছে, অতিরিক্ত চাচ্ছে বা বিকৃত করছে, তখনই ধরে নিতে হবে সে-ব্যক্তি বা জাতি মনের সমতা ও সুস্থতা হারাচ্ছে। মনের এই অসুস্থতার কারণ দারিদ্র্য, লোভ, অহঙ্কার, ভয়, শিল্পের অনুশীলনের অভাব ইত্যাদি।

যারা দরিদ্র তাদের সবসময়ই অন্নচিন্তায় কাটে এবং কখনো যদি সময় পায় অত্যন্ত চিন্তার দরুণ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেজন্য যতক্ষণ মানুষ সুস্থ ও সবল হওয়ার জন্য অন্ন ও বস্ত্র না জোটাতে পাচ্ছে, ততক্ষণ সৌন্দর্যবোধের কথাই উঠছে না। কিন্তু দেখা যায় এই মুমূর্ষু অবস্থায়ও বড় বড় শিল্পী জন্মাচ্ছেন, এটি ব্যক্তিগত প্রকাশ। এ থেকে বোঝা যায়, সৌন্দর্যবোধ ও তার প্রকাশ মানুষের একটা সহজ প্রবৃত্তি (instinct)।

দেখা যায়, কোন জাতি ও ব্যক্তি লোভের বশীভূত হয়ে সৌন্দর্যবোধের অনাবশ্যকতা ও বিকৃতি আনয়ন করছে। সভ্য ব্যবসাজীবী জাতিসকল ও যাঁরা

এঁদের পদানুসরণ করছেন, তাঁদের পক্ষে অর্থসংগ্রহ করাই মুখ্য হওয়ায় সৌন্দর্য চর্চার সময়ের অভাব হয়ে পড়ছে এবং যদিও কিছু শিল্পদ্রব্য সৃষ্টি করছেন তাও ব্যবসায়ের সুবিধা হবে বলে সৃষ্ট হচ্ছে। এর সাক্ষ্য আধুনিক সভ্যজাতি-সকল কর্তৃক ভারতবর্ষে প্রেরিত সস্তা ও কুশ্রী ছবি, শাল, র‍্যাপার, পুতুল, মাদুর ইত্যাদি। শুনি, এসব নাকি তাঁরা নিজে ব্যবহার করেন না। এসব কেবল অপর অজ্ঞ, দরিদ্র, পদানত জাতির রুধির শোষণের জন্য তৈয়ার করা হয়। এইসব সস্তা, বিকৃত, কুরুচির পরিচায়ক বস্তুসকল অর্থের লোভে ব্যবসায়ীরা তৈয়ার করতে এত ব্যস্ত যে, তাঁদের নিশ্বাস ফেলবার সময় নাই। তাঁরা সবসময়েই busy, অবশ্য অনেক বড় বড় জ্ঞানী ও শিল্পী তাঁদের ভিতরও আছেন। কিন্তু ব্যবসায়ীদের এই কুরুচি-স্রোত বন্ধ করা তাঁদের সাধ্যাতীত।

অহঙ্কারবশত একটি জাতি অপর একটি জাতির বুকের ওপর কুরুচির ছাপ দিতে কুণ্ঠিত হয় না। একটি জাতি যখন অপর একটি জাতিকে ভয় করে, তখন এরূপ ঘটনা প্রায়ই হয়ে থাকে। অবশ্য সব জাতিই এইরূপ করছেন বা করবেন তা বলা যায় না। সুন্দর বস্তুর ধ্বংস ও তৎপরিবর্তে কুরুচির পরিচায়ক দম্ভের স্তম্ভ ওঠানো বর্বর জাতির ধর্ম। বিজিত দেশের স্থাপত্য ও অপরাপর সুন্দর বস্তু থাকতেও অহঙ্কার ও অজ্ঞতাবশত তাদের তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, এবং তৎপরিবর্তে যা দেওয়া হয়েছে তা জগদ্বাসীর হাস্যোদ্রেকের কারণ হয়েছে।

অনেক ভদ্রলোক আছেন যাঁরা ট্রেনে বা গ্রামে চলাফেরার সময় সাহেবি পোশাক পরেন। এতে তাঁরা গরিব ও অজ্ঞ লোকদের ভয় দেখিয়ে সম্মান ও নিজকার্য উদ্ধার করে থাকেন। আবার সভ্যদেশ হতে প্রত্যাগত কোন কোন ভদ্রলোক স্বদেশী পোশাক পরতেই লজ্জাবোধ করেন। এরূপ করার কারণ স্বদেশী পোশাক যে দেখতে কুৎসিত ও কার্যোপযোগী নয় তা নয়, এটি বিজিত জাতির পোশাক বলেই লজ্জা অনুভব করা হয়। জাপানীরা বাহুর শক্তিতে যেকোন বলশালী জাতির সমকক্ষ হয়েও নিজেদের সুন্দর বেশ, স্থাপত্য ও চিত্র-শিল্প বর্জন করে বিদেশী পোশাক, স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প গ্রহণ করছেন। এর কারণ বিদেশীর বাহুবলের মোহ, ওঁরা বাহুবলের উপাসক। কাজে কাজেই বিদেশীরা এঁদের সৌন্দর্যবোধেরও আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। নিজেদের সৌন্দর্যবোধের গৌরব ভুলে গেছেন। সময় সময় অনেকে সৌন্দর্যের উপাসককে opium eater আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হন না। অবশ্য আধুনিককালে অনেক জায়গায় এর বদল আবশ্যক হয়েছে, কিন্তু তা সোজাসুজিভাবে নকল না করে চিন্তা করে উদ্ভাবন করার একটি বস্তু। কালে আমরাও হয়তো এপথ অনুসরণ করব। শিল্পের অনুশীলনের অভাবে শিল্প সৃষ্টি যথাযথ, কালোপযোগী, সুন্দর হলো কিনা বিচার করা যায় না। ঠিক সৌন্দর্যবোধ পূর্বসৃষ্ট সুন্দর বস্তুর কেবলমাত্র অনুকরণের দ্বারা সম্ভব নয়। যা একটি কালের উপযোগী তা অপর একটি কালের অনুপযোগী হতে পারে। প্রকৃত সৌন্দর্যবোধ শিল্পকলার অনুধাবন ও নিয়ত চিন্তাসাপেক্ষ, কারণ একদিনে কোন জাতির সৌন্দর্যবোধের একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি হতে পারে না। একই বস্তু এক জায়গায় সুন্দর ও

অপর এক জায়গায় অসুন্দর দেখায়। এর সাধন করা ও বিচার করা বড় কঠিন। একই বস্তুর ভিন্ন দেশের সৌন্দর্যবোধ ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন হবার কারণ ঃ

১। আবহাওয়া (climate), ২। ভৌগোলিক অবস্থা, ৩। ধর্মের আদর্শ, ৪। জাতির মেজাজ, ৫। শিল্প প্রকাশের আধারের ভিন্নতা, ৬। সংস্কৃতি (culture)।

কোন নতুন দেশের সৌন্দর্যবোধ বিচার করতে গেলে সেইসব দেশের সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়গুলি জানবার আবশ্যক হয়, কিন্তু সবসময়ে এগুলি জানা সম্ভব হয় না। কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দিয়ে বিচার করা চলতে পারে, যথা ঃ

১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ২। সুসম্পন্নতা, ৩। হস্তকৌশল ও নিপুণতা, ৪। ভাবযুক্ততা, ৫। সতেজভাব, ৬। বাহুল্যবর্জিত ও সরল, ৭। গোঁড়ামিবর্জিত, ৮। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ৯। সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা, ইত্যাদি।* □

* ৩৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

ভারতীয় সঙ্গীতের কথা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

আমাদের আলোচনার বিষয় হলো ভারতীয় সঙ্গীতের একটি দিক মাত্র। চির-প্রস্ফুটিত কমলের মতো সহস্রদল বিস্তার করে সঙ্গীত তার সুষমা ও সৌরভ বিতরণ করছে। কাজেই সকল দিকের পরিচয় একটি প্রসঙ্গে প্রদান করা কারো সাধ্য নয়।

ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ অপার্থিব বলে মনে হলেও সত্য সত্য তাকে অনুভূতি দিয়ে কতটুকু আমরা বুঝি বা জানি তা এখনো ঠিক বলতে পারি না। তবে এটুকু সত্য যে, ভারতের সমস্ত জিনিসেরই পিছনেই এক একটি বড় আদর্শ আছে, ধর্ম বা অনুভূতিই তার প্রাণ এবং একনিষ্ঠ সাধনা তার ভিত্তি। ধর্ম বা অনুভূতিকে বাদ দিয়ে শুধু 'art for art's sake' বা উদ্দেশ্যবিহীন কোন বিদ্যা ও কর্ম ভারতের নিজস্ব হতে পারে না; ধর্ম, বিজ্ঞান ও সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতাই সবার হওয়া চাই বৈশিষ্ট্য এবং চরম পরিণতি।

সঙ্গীতের বেলায়ও তাই। সকল জিনিসের মতো এরও পিছনে ভাব ও অভিব্যক্তির একটা ইতিহাস আছে। বেদ, ব্রাহ্মণ ও প্রাতিশাখ্যের যুগের কথা বাদ দিলে মহর্ষি ভরতের সময় থেকেই বলা যায় ইতিহাসের দিকটা শিথিল হয়ে দর্শন ও পরবর্তী বিকাশের দিকটাই কেবল বড় হয়ে উঠেছে। এটাও হলো অবশ্য ভারতীয় ধারার বৈশিষ্ট্য। সব কিছুকেই ভারত পার্থিব করেও অপার্থিব বলেই চিরদিন দেখতে ও ধরতে চায়।

ধারাবাহিক ইতিহাসের কথা বাদ দিলে উদাহরণ রূপে বলা যায় যেমন, প্রামাণিক গ্রন্থ আমাদের সঙ্গীতরত্নাকরের কথা। গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেব ভরতকেই অবশ্য অনুসরণ করেছেন, মঙ্গলাচরণ করাই গ্রন্থকারদের চিরকালের রীতি ছিল। শার্ঙ্গদেব ঃ "ব্রহ্মগ্রন্থিজ মারুতানুগতিনা—" ইত্যাদি করে মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করেই "বন্দে নাদতনুং" বলে দ্বিতীয় প্রকরণে আবার "গীতং নাদাত্মকং" কথারই উল্লেখ করেছেন। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গও তাই; যেমন ঃ "ন নাদেন বিনা গীতং"—নাদব্যতীত গান হতেই পারে না। শব্দতত্ত্বের আলোচনাই সঙ্গীতে তখন প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে নাদব্রহ্ম কেবল শব্দ নয়। শব্দের উৎপত্তিস্থান। এই ওঙ্কারতত্ত্ব নাদব্রহ্ম বা বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতিকে বাদ দিয়েও সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে অনুভব করা যায়। নাদ দর্শনকারদের মতেও হলো অব্যক্ত বা প্রকৃতি। প্রকৃতির অন্য নামই ব্রহ্ম বা আত্মা। মহর্ষি পতঞ্জলি এই শব্দতত্ত্বের চরম উৎকর্ষ দেখাতে গিয়ে তাঁর মহাভাষ্যে স্ফোটবাদের আলোচনা করেছেন এবং বেদান্তের ব্রহ্মের সঙ্গে তার সমান আসন না হলেও তিনি তত উচ্চেই মূল শব্দ স্ফোটকে স্থাপন করবার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গীতের গ্রন্থকারেরা সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে এই শব্দতত্ত্বের আলোচনার মুক্তির কথাই তুলেছেন। আধ্যাত্মিকতাই তাঁদের আলোচনার একমাত্র প্রাণ, সাধকও হবেন তার অনুগামী, আর একথাই হলো তাঁদের সকলেরই প্রাণের কথা।

কিন্তু ইতিহাসের কথাও তো একেবারে বাদ দিলে চলবে না? রত্নাকরকার সপ্তস্বরের সমষ্টি যে সঙ্গীত, তা পেলেন কোথা থেকে? বলবেন, আবহমান সৃষ্টি যে-রীতিতে চলে আসছে তা থেকে। কিন্তু এটাও ঠিক সদুত্তর বলা যায় না। নাদ বা অব্যক্ত থেকে সঙ্গীতের সৃষ্টি—একথা মানা হিন্দুমাত্রেরই উচিত; কিন্তু শার্ঙ্গদেব, মতঙ্গ, নারদ, ভরত প্রভৃতির কাল থেকে সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের তো একটা সময় বা অভিব্যক্তির ব্যবধান মানতে হবে? নাদ জিনিসটা তো আর আকাশ থেকে উৎপন্ন হয়েই সপ্তস্বররূপে প্রকাশ পায়নি? অথচ আকাশ থেকেই তার সত্য সত্য কিন্তু সৃষ্টি। সাতটি স্বরে আসতে শব্দকেও ভিন্ন ভিন্ন রূপে একদা পথ বেছে নিতে হয়েছে। সে-পথের গতিও আবার সৃষ্টিক্রম বা evolution theory-কে অতিক্রম করে যেতে পারে না। ক্রমগতি বা ক্রমিক বিকাশই হলো তার অভিব্যক্তির রূপ ও ইতিহাস।

বিচিত্র ধারাকে অবলম্বন করে একই কেন্দ্রে চলাটাই হলো ভারতীয় ধারার বৈশিষ্ট্য। সঙ্গীতের বেলাও তার সুতরাং ব্যতিক্রম হবে কেন? আবার সঙ্গীত অপার্থিব হলেও পার্থিবকে সে একেবারে অতিক্রম করতে পারে না, পার্থিব সৃষ্টিকে অবলম্বন করেই সে সৃষ্টির এলাকাকে অতিক্রম করেছে। কাজেই পার্থিবকে উড়িয়ে দেওয়া যেমন যায় না, তার নিয়ম-কানুনকেও এড়িয়ে যাওয়া তেমন যায় না; অভিব্যক্তির পারম্পর্য একটা সৃষ্টি করে যাবেই জগতের সকল জিনিস। তারপর একথাও সত্য যে, কেবলই নাদতত্ত্বের অবতারণা, ময়ূর থেকে ষড়জের উৎপত্তি, ছয় থেকে উৎপন্ন বলেই ষড়জ—এইসব কথায় সত্যকার প্রাণের শান্তি কখনোই আসে না।

তবে কথা হতে পারে, উৎপত্তির ইতিহাসই বা দেন না কোন্ গ্রন্থকার? নজির দেখানো যেতে পারে যেমন, নারদ বলেছেন ঃ "স্বরশাস্ত্রানাং সর্বেষাং বেদনিশ্চয়ম্।" শার্ঙ্গদেব বলেছেন ঃ "সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ" ইত্যাদি। অবশ্য বেদ থেকে সঙ্গীতের উৎপত্তি, একথা কেউই অস্বীকার করেননি। কিন্তু ঐতিহাসিকের প্রশ্ন তো আর এ নয়? তিনি চান বেদই সঙ্গীতের মূল হলেও কিরকম ভাবে সে-সঙ্গীত ক্রমবিকশিত হলো? ভরত থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী গ্রন্থকারেরা কেউই বড় এ-বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাননি—একথা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিক থেকেই স্পষ্ট বলা যায়। তবে সঙ্গীতের পরবর্তী উন্নতির কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বেদ অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব থেকে সঙ্গীত যেভাবে জন্মলাভ করল, সেকথাও বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করা সঙ্গীতশাস্ত্রের ভিতর অপরিহার্য বৈকি? পরবর্তী গ্রন্থকারেরা এদিক দিয়ে কিন্তু ততটা লক্ষ্য রাখেননি বলা যায়।

আলোচনার বিষয় কিন্তু সমুদ্রবিশেষই এবং নীরসও বটে। রাগরূপের বিন্দুও এতে নাই, আছে কেবল ইতিহাস আর অভিব্যক্তির কথা। কিন্তু একথাও সঙ্গীত-সাধকদের জানবার বিষয় বটে। বেদ সঙ্গীতের উৎস ও মূল, বেদ থেকেই সঙ্গীতের জন্ম, কাজেই বেদের সময় সঙ্গীতের রূপ ও ধারা কিরকম ছিল, সেটা না জানায় আনন্দ থাকে কি? জানা আমাদের সকলেরই উচিত এবং পুঁথি-পত্রও তার জন্য অনেকই আছে। তবে কথা হলো, সত্যিই তা হতেও আসলের সন্ধান মেলে কি? না। নারদীশিক্ষাকারও অবশ্য স্পষ্ট রীতির কথা কিছু উল্লেখ করেননি। উচ্চ, নীচ, মধ্য; উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত,

আর্চিক, গাথিক, সামিক ও স্বরান্তরের কথা সর্বত্র উল্লেখ আছে অস্বীকার করা যায় না। বৈদিক ও তৎপরবর্তী স্বরনামেরও উল্লেখ আছে। এক, দুই ইত্যাদি করে পাঁচ, ছয়, সাত স্বরেরও পরিচয় আছে, তবে বিকাশের কোন ধারা নাই। বেণুর ও সামগানকারীদের স্বর-পর্যায়েও গোলমাল আছে সামান্য। ''ঋগ্বেদে সামবেদে চ''—ঋক ও সামবেদে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি স্বরনামেরই প্রচলন ছিল। ''সামগাঃ''—সামগানকারীরা সাত স্বরেই গান করতেন। সে সাত স্বরের নাম ছিল ঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, ক্রুষ্ট ও অতিস্বার বা অতিসর্য। তাণ্ড্য, কৌথুমীয় এবং শতপথ প্রভৃতি শাখা বা ব্রাহ্মণে ঐ সপ্তস্বরের প্রচলন ছিল। তবে সামপ্রাতিশাখ্য বা পুষ্পসূত্রে আবার দেখা যায় ঃ ''সামানি ষটসু চান্যানি সপ্তসু দ্বে তৃ কৌথুমাঃ।'' টীকাকার অজাতশত্রুও সেকথা সমর্থন করেছেন। কৌথুমীয় শাখায় সাত স্বরে গান করা হলেও ''ষটসু অন্যানি'', ''পঞ্চসু এব তু গায়ন্তি''—ছয় বা পাঁচ স্বরেও অন্যান্য শাখারা গান করতেন। গানের রীতি ও তদনুযায়ী সম্প্রদায়ও ছিল যে বিভিন্ন, তার প্রমাণ এথেকেই স্পষ্ট পাওয়া যায়। ঋক্-প্রাতিশাখ্যের ১৩ অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকেও 'যম' অর্থাৎ সাত স্বর ও 'স্থানানি'—মন্দ্র, মধ্যম, উত্তম বা তার—এই তিন গ্রাম বা স্থানের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য ২৩ অধ্যায় ৫ শ্লোকেও একথার উল্লেখ আছে। তাছাড়া নারদী এবং পাণিনীয়-শিক্ষাকার দুজনেই উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরের কথা উল্লেখ করে তা থেকে সাত স্বরের উৎপত্তির পরিচয় দিয়েছেন। ঋক্‌তন্ত্রেও তাই। কাজেই দেখা যায়, বৈদিক যুগেও সাত স্বরের প্রচলন ছিল। তবে এক, দুই, তিন ইত্যাদি স্বরে গান করবার রীতিকেও তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি।

কিন্তু আমাদের কথা হলো, এথেকেও পূর্ব প্রশ্নের উত্তর ঠিক পাওয়া যায় না। পাঁচ, ছয়, সাত স্বর ছিল বৈদিকযুগে, প্রাতিশাখ্য বা বৈদিক ব্যাকরণ তার নজির দেখিয়েছেন, একথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু সঙ্গীতের যে ছন্দ, অথবা ছন্দোময় যে সঙ্গীত, ছন্দের ক্রম-অভিব্যক্তির কথাও প্রাতিশাখ্যকারেরা অস্বীকার করতে পারেন নি। যেমন, তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য ১৮ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ ''স্বরিত উদাত্ত একাক্ষর ওঙ্কার ঋগ্বেদে''—ঋগ্বেদে ওঙ্কার গান করা হতো এক অক্ষরে এবং তদুপযোগী সময় দিয়ে। যজুর্বেদে ছিল ভিন্ন রকম, সামবেদেও তাই।

প্রাতিশাখ্যের কথা ছেড়ে দিলেও যদি রত্নাকরকার শার্ঙ্গদেবের কথাই ধরা যায়, তাহলেও দেখা যায়, আর্চিকাদি স্বরের কথা উল্লেখ করেছেন তিনিও যদিও তা গ্রাম—মূর্ছনার প্রকরণে। কিন্তু এথেকে সম্প্রদায় ও রীতির ইঙ্গিত অবশ্যই পাওয়া যায় তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যেমন ''আর্চিকশ্চ গাথিকশ্চ'' ইত্যাদি ৩৯ শ্লোকের টীকায় কল্লীনাথ উল্লেখ করেছেন ঃ ''আর্চিক ইতি। যজ্ঞপ্রয়োগেষু ঋচাম একস্বর আশ্রয়ত্বাৎ।'' অর্থাৎ যজ্ঞবেদির সামনে একস্বরে ঋক্‌ছন্দ বা গাথা গান করা হতো। গাথিককে দুই স্বরের, সামিককে তিন ও স্বরান্তরকে চার স্বরের গাথা বা গান বলা হয়েছে। সিংহভূপালের মতও তাই। সিংহভূপাল নারদের মত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, সাত রকম ভাবেই গানের রীতি সমাজে তখন প্রচলিত ছিল; যেমন আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, উড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ। কল্লীনাথ অবশ্য সামিকের বেলায় বলেছেন ঃ

"সাম্নাং তু ত্রিস্বরত্বং সপ্তস্বরবত্ত্বেঽপি"। ত্রিস্বরকে তিনি মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন গ্রাম বলেছেন। কিন্তু কল্লীনাথের মত আমরা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করতে পারি না। কারণ তাঁর পূর্ব ও পরবর্তী অনেক গ্রন্থকারই তিন স্বরের গান প্রচলিত ছিল—একথা স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরত্রয়ও তার নিদর্শন। এই তিন স্বরকে স্বরত্রয় বলা ছাড়া গ্রাম বলা সমীচীন নয়। অবশ্য প্রাতিশাখ্যেও গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আমাদের কথা হলো স্বতন্ত্র; সপ্ত স্বরের প্রচলন বৈদিক হলেও তা ঋগ্বেদাদির সময়েই চলতি ছিল কি-না, তা ভালভাবে অনুশীলন করা দরকার। ঋক্, সাম ও তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যে আমরা সপ্ত স্বর ও তিন গ্রামের কথা পাই। কিন্তু প্রাতিশাখ্যের কাল হলো বেদের অনেক পরে। তারপর একথাও ঠিক যে, আর্চিকাদি বা উদাত্তাদি স্বরেও যজ্ঞকালে গাথা গান করা হতো। ঋগ্বেদের সূর্য, ইন্দ্র বরুণাদি দেবতাদের স্তুতিগানেও স্বর ব্যবহৃত হতো। ধরে নেওয়া যেতে পারে সেগুলি এক, দুই বা তিন স্বরেই প্রচলিত ছিল। তবে এ-থেকে অভিব্যক্তির ইঙ্গিত কতকটা পাওয়া যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু পারম্পর্যের কোন নজিরই পাওয়া যায় না।

এছাড়া শত-শত প্রশ্নের কথা আরো অনেক তোলা এখানে যেতে পারে। গোড়াকার দিকে এক, দুই বা তিন স্বর প্রভৃতি গানের বেলায় প্রচলন থাকলেও ষড়জাদির ভিতর কোন্ নির্দিষ্ট স্বরগুলির সেসব গানে ব্যবহার হতো তারও ঠিক ঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। নারদীশিক্ষাকার উল্লেখ করেছেন, মধ্যম ছিল প্রথম, দ্বিতীয় ষড়জ; অর্থাৎ মা গা রে সা এই বিপরীত গতিতে স্বরের উৎপন্ন হয়েছিল। পরে যখন হলো পাঁচ স্বর, পঞ্চম তাতে যোগ হয়েছিল। তারপর সাত স্বরের সময়ে ধৈবত ও নিষাদ সংযুক্ত করা হয়। এর ভিতরও মতভেদের আবার অন্ত নাই। বৈদিক উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের সঙ্গে বর্তমান স্বরের ঐক্য দেখানোর বেলায়ও তাই।

বাস্তবিক সঙ্গীতে আলোচনা করবার বিষয় যথেষ্টই আছে। এখানে কেবল কতকগুলি problem তোলা হলো মাত্র। সুমীমাংসা এর কখনো কিন্তু হয়নি কোথাও। সঠিক নজির না পাওয়াই হলো তার প্রধান কারণ। পপ্‌লে (Popley) ও স্ট্র্যাংগয়েজ (Strangways) এর কতকটা আলোচনা করেছেন দেখা যায়। স্যার উইলিয়ম জোন্স (Sir William Jones) ও ক্যাপ্টেন উইলিয়ার্ডের (Captain Williard) কথাও উল্লেখযোগ্য। তবে একথাও সত্য যে, অনেকের কাছে সামান্য নজির থাকলেও আর সমস্তগুলিই কিন্তু সম্পূর্ণ আনুমানিক। পারম্পর্য বা যোগসূত্রের সন্ধান কেউই এখনো স্পষ্টভাবে দিতে পারেননি। দক্ষিণ-ভারতে এর আলোচনা এদিকের উত্তর-ভারতের চেয়ে বেশি হয় বলেই আমাদের ধারণা। সেখানে practical—কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে theoretical অনুশীলনেরও প্রচলন আছে। তবে উত্তর-ভারতেও যে একেবারেই নাই, একথা আমাদের বক্তব্য নয়। আজকাল উভয় দিকের জাগরণই যেন আবার এসব দিকে আরম্ভ হয়েছে বলা যায়।

ভারতীয় সঙ্গীতের পরবর্তী বিষয় তান, মূর্ছনা, অলঙ্কার, রাগ, রাগিণী, শ্রুতি প্রভৃতির আলোচনাও যেমন দরকার, তার গোড়াকার ইতিহাস বা অভিব্যক্তির ধারা সম্বন্ধে জানাও তেমন দরকার। গোড়াকার যোগসূত্রের সন্ধান না জানলে

রাগ, রাগিণী বিস্তারের কোন ক্ষতি হয় না সত্য, কিন্তু গোটা সঙ্গীতের রূপসম্বন্ধে জ্ঞান অসম্পূর্ণই থেকে যায় বলে আমাদের ধারণা। কেবল অনুমানের ওপর যোগসূত্র রচনা করা যায় না। 'নাদ' বা শব্দের মূল কেন্দ্র যে সত্যই অপার্থিব তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নাদব্রহ্মের পরিণতি হলো সম্পূর্ণ বৌদ্ধিক যুগে অর্থাৎ intellectual period-এ। সূক্ষ্ম উপনিষদের তত্ত্ব যেমন ঋক্, সাম ও যজু প্রভৃতি বেদের বহু পরে সৃষ্টি বিকাশের মুখে হয়েছে, বেদকে অবলম্বন করেই অবশ্য মানুষ করেছে তাকে সৃষ্টি চিন্তাশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, সঙ্গীতে নাদতত্ত্বের বেলায়ও তাই; পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা একে প্রথম থেকেই মুক্তির সোপান বলে দেখাতে চেয়েছেন। নচেৎ নারদী, মাণ্ডুকী, স্বরভক্তি প্রভৃতি শিক্ষার লিখন-প্রণালী হলো ভিন্ন রকমের। অবশ্য সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্যই তাই। শব্দতত্ত্বের অনুশীলনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বের অনুভূতি লাভই হলো সঙ্গীত-সাধনার চরম লক্ষ্য। কিন্তু সব কথা সত্য হলেও, কেবল সূক্ষ্ম নিয়েই তো জগতে চলাফেরা নয়? সূক্ষ্মের পরিণতিতেই স্থূল এবং স্থূল থেকেই সূক্ষ্মে যাওয়া যখন প্রকৃতির নীতি ও ধারা, তখন স্থূল স্বরমূর্তি সঙ্গীতের উৎপত্তি যে বেদ থেকেই, বেদেই তার আসল রহস্য রয়েছে নিহিত, সেকথা আমাদের জানা অবশ্যই দরকার। বেদে সঙ্গীতের বীজ ও তন্ত্রে তার প্রকাশ আরো উজ্জ্বল। তন্ত্র ও বেদ মূলত একই, তন্ত্র বেদেরই প্রচ্ছন্ন মূর্তি। বেদের আগে তন্ত্র নয়, বেদের ক্রিয়া নানা কারণে মন্থর হয়ে গেলে তাকে ভিন্ন আকারে তন্ত্রেই বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। তন্ত্র বেদেরই ছায়ামূর্তি। অবশ্য এর আলোচনাও একটি পৃথক ও প্রয়োজনীয় জিনিস। নাদতত্ত্ব সঙ্গীতের প্রাণ হলেও এজন্য বেদ ও তন্ত্রের অনুশীলনও একান্ত অপরিহার্য। এদুটির ভিতরই আমাদের সঙ্গীতের আসল ইতিহাস লুকানো রয়েছে। বেদাঙ্গ শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ প্রভৃতির কথা তুলতে গেলেও ঐ একই কথা। বেদাঙ্গের অনুশীলনও সঙ্গীতের দিক দিয়ে প্রয়োজন; কারণ বেদের সকল কিছুই অন্য আকারে বেদাঙ্গেই পরে স্থান পেয়েছে। বেদাঙ্গই বেদের প্রদীপ বা দর্পণ।

বর্তমান সঙ্গীতের রূপ হলো অবশ্য অনেক উন্নত। প্রাচীনের সঙ্গে এর অমিলও রয়েছে অনেক। এ-পার্থক্যের জন্য বার আনা দায়ী কিন্তু পারস্য-প্রভাব ও মোগল-দরবারই। তবে মুসলমান অবদান আবার সঙ্গীতের উৎকর্ষই করেছে বরং বহু অংশে। কিন্তু প্রাচীনকেও এর সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধা দিতে হবে; বর্তমানকে বাঁচিয়ে তুলেই তার মূল অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গীতও হলো একটি উপকরণ। ভারতীয় সঙ্গীত বিদেশ থেকে কিছুই ধার করেনি, বিদেশই ভারতের কাছে এ-বিষয়ে বরং অনেক ঋণী। বিদেশের লোক একথা স্বীকার না করলেও আমাদের সেকথা সকলকে শোনাতে হবে। অনুশীলন চাই এজন্য পরিপূর্ণ। সঙ্গীতের সকল দিক দিয়ে জাগরণ সৃষ্টি করা তাই আমাদেরই ওপর নির্ভর করছে। অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতবিদ্যারও অনুশীলন করা দেশের প্রত্যেকেরই উচিত। সঙ্গীতশাস্ত্র ও সাধকেরও ভারতে অভাব নাই। অভাব যা দেখছি শ্রদ্ধা ও প্রচেষ্টার। এত বড় বিদ্যার আদর কিন্তু ঠিক ঠিক এখনো ভারতে হয়নি। মোগল আমলের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।* □

* ৪৬ বর্ষ. ২ সংখ্যা

বাংলার বাস্তুশিল্পে পোড়ামাটির কাজ

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সহজলভ্য ও অনায়াস-নমনীয় মৃত্তিকাকে তার শিল্পচর্চার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে এসেছে। নদীবহুল পলিমাটির দেশ বাংলাতে এই মাধ্যম বরাবরই জনপ্রিয় ও বহুব্যবহৃত। এখানে পাথর দুষ্প্রাপ্য, তার ব্যবহারও সীমাবদ্ধ, কিন্তু ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে মূর্তি, খেলনা, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করার উপযোগী মাটির অভাব হয়নি কখনো। ফলে মাটি পুড়িয়ে ইঁট বানিয়ে একদিকে বসতবাটী, মন্দির বিহার ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে, অন্যদিকে সেইসব গৃহসৌধের সজ্জার জন্য কলাকুশল শিল্পীর হাতে পোড়ামাটির টালিতে ফুটে উঠেছে দেবলোক ও মানবসংসারের অনশ্বর চিত্রমালা। এখানে বলা দরকার, বন্যা, বৃষ্টিপাত আর নিয়ত গতি পরিবর্তনশীল নদনদীর দেশ বাংলায় সুপ্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি বলতে বিশেষ কিছু নেই। বস্তুত মুসলমান-পূর্ব যুগের স্থাপত্য নিদর্শনের সংখ্যা খুবই অল্প। মুসলমান-যুগ বা মধ্যযুগের যেসব বাস্তুকর্ম ধ্বংসের হাত এড়াতে পেরেছে, বাংলার শিল্পেতিহাস রচনায় তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থাপত্য নিদর্শনগুলির বেশিরভাগই মন্দির বা দেবালয়, যেগুলির অলঙ্করণে পোড়ামাটির বা টেরাকোটার ব্যবহার বাহুল্যে শুধু নয়, নান্দনিক বিচারেও বিশেষ মনোযোগের যোগ্য। তাছাড়া এইসব মন্দির ও মন্দির-টেরাকোটার ভাস্কর্যে বাঙালী তার শিল্প-মানসের নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখেছে।

মধ্যযুগীয় বাংলার দেবালয়গুলিকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ 'চালা', 'রত্ন', 'দালান'। উড়িষ্যায় ও অন্যত্র এই দেবালয়গুলির নির্মাণশৈলী 'বাংলারীতি' বা 'গৌড়ীরীতি' নামে পরিচিত। গ্রাম-বাংলার চালাঘরের আদলে তৈরি মন্দির 'চালা-মন্দির', চালার সংখ্যা অনুযায়ী দোচালা, চারচালা ও আটচালা মন্দির; দোচালা মন্দির 'এক-বাংলা' নামেও পরিচিত, এ ধরনের মন্দির দুটি-একটি ছাড়া দেখা যায় না; চন্দননগরের নন্দদুলালের মন্দিরটি দোচালা। দুটি দোচালাকে পাশাপাশি যুক্ত করে শীর্ষে কখনো কখনো চূড়া বসিয়ে যে-মন্দির তৈরি হতো তার নাম জোড়-বাংলা; বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত জোড়-বাংলা মন্দিরটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। চারচালা, আটচালা মন্দিরের উদাহরণ পর্যাপ্ত, সংখ্যায় আটচালা মন্দিরই সর্বাধিক। রত্নমন্দিরের 'রত্নের' অর্থ 'শিখর', মন্দিরের ছাদের মাঝখানে একটি শিখর থাকলে সেটি হবে 'একরত্ন', চার কোণে ছোট চারটি শিখর থাকলে সেটি হবে 'পঞ্চরত্ন' মন্দির। মন্দিরের তলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিখরের সংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং সেই অনুসারে মন্দির হয় 'নবরত্ন', 'ত্রয়োদশরত্ন', 'সপ্তদশরত্ন', 'পঞ্চবিংশরত্ন'। 'দালানরীতির' মন্দিরের ছাদ সমতল, এর সামনে থাকে ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দা। এছাড়া বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাসমঞ্চটিতে এক অভিনব স্থাপত্যরীতির পরিচয় মেলে, পিরামিডাকৃতি এই সৌধটি প্রথাগত অর্থে দেবালয় নয়।

বাংলার মন্দিরগুলির বেশিরভাগই সাধারণ বাঙালীর কুঁড়েঘরের আদর্শে তৈরি; ফলে এগুলি হ্রস্বাকৃতি। কিন্তু আয়তনে ছোট হলেও এই ইঁটের ইমারতগুলিকে বাঙালী শিল্পী পোড়ামাটির সুচারু কারুকর্মের অলঙ্করণে নান্দনিক গুণে বৃহৎ করে তুলেছেন। সংখ্যায় অজস্র এইসব পোড়ামাটির কাজ দেখতে দেখতে মনে হয়, পোড়ামাটির বা টেরাকোটা শিল্পেই বুঝি বাঙালীর শিল্প-প্রতিভা সবচেয়ে সহজ ও স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তিলাভ করেছে।

বাংলার মন্দির-টেরাকোটাগুলি প্রধানত পোড়ামাটির ছাঁচে তৈরি। ছাঁচ থেকে টালিগুলি বেরিয়ে আসার পর টালির মূর্তিগুলির চোখ, ভ্রূ, অলঙ্কার, পরিচ্ছদ ইত্যাদি এঁকে নেওয়া হতো; আঁকার উপকরণ নরুণ বা বাঁশের পাতলা চাঁচাড়ি। এই নকশি কাজ শেষ করে শিল্পীরা টালিগুলিকে মসৃণ করে নিয়ে প্রথমে রোদে শুকিয়ে এবং পরে ভাটিতে পুড়িয়ে নিতেন। তারপরে ঐ টালিগুলি বসিয়ে দিতেন মন্দিরের গায়ে, প্রধানত কার্নিস বরাবর কার্নিসের ঠিক নিচে দুই বা ততোধিক সারিতে। সেরা জাতের টালিগুলি লাগানো হতো প্রবেশ-খিলানের উপরে ও দুপাশে। খিলানের ভারবহনকারী দুটি পূর্ণ ও দুটি অর্ধস্তম্ভ শিল্পীর দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হতো না। প্রবেশ-তোরণের দুপাশের দেওয়ালগুলিও অনেকসময় পোড়ামাটির অলঙ্করণে সুশোভিত হতো। একটি টালিতে একটি মূর্তি বা একটি চিত্র সম্পূর্ণ না হলে একাধিক টালিতে সেই মূর্তি বা চিত্রের বাকি অংশ রূপায়িত হতো। স্বভাবতই এ-ধরনের টালিগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে উদ্দিষ্ট মূর্তি বা চিত্রের রূপায়নের কাজ সম্পূর্ণ করতে শিল্পীরা যথেষ্ট শ্রম ও মনোযোগ নিয়োগ করতেন। মধ্যযুগীয় বাংলার বহু মন্দিরই পোড়ামাটির কাজের উৎকর্ষে প্রশংসনীয়। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে এতগুলি টেরাকোটা-মন্দির ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা যায় না। পুনরুক্তির সুরে বলতে হয়, বাঙালী তার প্রিয় দেবদেবীর জন্য মন্দির নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, সেই দেবালয়গুলিকে পোড়ামাটির আর পঙ্খের কাজে সাজিয়ে সুন্দর করে তুলতেও চেষ্টার ত্রুটি করেনি। সময়ের বিচারে, বাংলারীতির পুরানো টেরাকোটা-মন্দিরগুলির বেশিরভাগই চৈতন্য-পরবর্তী যুগের। সতেরো শতকের অনুরূপ মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুপুরের শ্যাম রায় ও জোড়বাংলা মন্দির, নদীয়ার মাটিয়ারি, শ্রীনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে রাঘব রায় প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি, বীরভূমের ঘুরিষার রঘুনাথজীর মন্দির। আঠারো ও উনিশ শতকের দেবালয়গুলির মধ্যে উল্লেখ করা যায় বাঁকুড়ার সোনামুখীর শ্রীধর মন্দির, হুগলীর আঁটপুরের রাধাগোবিন্দের মন্দির, হাওড়ার অমরাগড়ির গজলক্ষ্মী ও দধিমাধবের মন্দির দুটি, কোচবিহারের ধলিয়াবাড়ির সিদ্ধনাথ শিবের মন্দির। ওপার বাংলার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত—দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তজীর মন্দির; এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত।

এইসব বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ দর্শকদের চোখ টানে, মন ভরায়। অতীত বাংলার অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত শিল্পীদের কলাকুশলতার নিদর্শন এই কাজগুলি এখনো যেন তাদের পূর্ণ মূল্য পায়নি! সামগ্রিকভাবে এই মন্দির টেরাকোটাগুলি বাংলার সম্পদ, বাঙালীর গৌরব। এদের বিষয়-বৈচিত্র্য ব্যাপক, দেবলোক ও মানবসংসারের এমন কোন বিষয় নেই, যা এইসব টেরাকোটাতে চিত্রিত হয়নি। টেরাকোটাগুলি দেখতে দেখতে দর্শক একসময় অনুভব করেন—দেবলোক ও মানবসংসার একাকার হয়ে গেছে, কাহিনী-কিংবদন্তীর মানুষগুলি

রক্তমাংসের শরীর নিয়ে তাঁর সামনে সঞ্চরণশীল, স্বকর্ণেই যেন শুনতে পান, অরূপ-বীণা রূপের আড়ালে নয়, রূপের সামনেই বেজে চলেছে। পরিচিত প্রিয় দেব-দেবীর মধ্যে দেখা মেলে শিব, বিষ্ণু, নানা লীলায় প্রকটিত বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, মহিষমর্দিনী এবং গৌর-নিতাইয়ের; রামায়ণ-মহাভারতের বহু গল্পের—বহু কাহিনী-দৃশ্যের, যেমন লঙ্কাকাণ্ডের; প্রতিদিনের চেনাজানা মানুষের সংখ্যাও কম নয়—জমিদারবাবু ও তাঁর পারিষদবর্গ, ইউরোপীয় নাবিক, গোরা-পল্টন, সাহেব-মেমসাহেব, কলসি-কাঁখে বাঙালী বধূ, বাজারের মেছুনি, বেদে-বেদেনী, কীর্তনীয়া, বাদক-বাদিকা, শিকারী, নাপিত, কামার, পশুপাখি, ফুল-লতা-পাতা? তাও আছে। সিংহ, গোরু, ঘোড়া, হরিণ, হনুমান, সাপ, ময়ূর, মায় রাজস্থানের উট পর্যন্ত; শালবৃক্ষ, পদ্ম, হংসলতা। নানা ধরনের আকর্ষণীয় জ্যামিতিক নকশারও ঘাটতি নেই। এককথায় স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যের সুন্দর মেলবন্ধনের দৃষ্টান্ত হিসাবে অধিকাংশ টেরাকোটা-মন্দির শিল্পরসিকদের প্রশংসা দাবি করতে পারে।

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বহু উপকরণ এইসব পোড়ামাটির কাজে বিদ্যমান। সেকালের অভিজাত ও জমিদারদের সঙ্গে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের জীবনযাত্রার ছবি বহু টেরাকোটা প্যানেলে সজীবতায় মূর্ত। অভিজাত ও জমিদারদের পালকি, নৌকা ইত্যাদিতে প্রমোদভ্রমণ, অনেক সময় পাত্রমিত্রপারিষদ্‌সহ ফরসিসেবন, ভৃত্যভৃত্যাদের সেবাগ্রহণ ইত্যাদি রূপচিত্রের সঙ্গে সহাবস্থান ঘটেছে গৃহস্থবধূর ঢেঁকিতে ধানভানা, কামারের হাপর চালানো ও গরম লোহা পেটানো, তাঁতি-মেয়ের চরকায় সুতা কাটা প্রভৃতি দৃশ্যের। আঠারো-উনিশ দশকের নিদর্শনগুলিতে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদের সাক্ষাৎ মেলে, তাঁদের কেউ জাহাজের নাবিক, কেউ সৈন্য, কেউবা বিলাসপ্রিয় সাহেব-মেম। সমকালীন মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, আচার-অনুষ্ঠানেরও খবর পাওয়া যায় এইসব টেরাকোটা থেকে। মেয়েদের ঘাগরা-চেলি-ওড়না-শাড়ি, পৌঁছা-বাজু-বেশর-চন্দ্রহার-নথ-নোলক, পুরুষদের শ্যামলা-কোট-পাদুকা-ধুতি-চাদর—এসবই রূপায়িত হয়েছে টেরাকোটার নারী ও পুরুষ মূর্তিতে। আর দেখা যায়—কন্যা-সম্প্রদান, বধূবরণ, সিঁদুর-দান, পাশাখেলার মতো সামাজিক জীবনের নানা বিষয়ক ভাস্কর্য চিত্র। ধর্মীয় ঔদার্য যে সাধারণভাবে বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তারও পরিচয় আভাসিত কিছু কিছু পোড়ামাটির কাজে। দৃষ্টান্ত সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরের বিগ্রহ শালগ্রামশিলারূপী বিষ্ণু, কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রবেশ-খিলানটির দুপাশে কালী-মূর্তি, মন্দিরের সামনের দিকে শিব-বিবাহের একাধিক ভাস্কর্য ও দক্ষিণের দেওয়ালে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশসমেত এক মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি উৎকীর্ণ। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা যে সেকালের বাঙালীকে বিশেষ আচ্ছন্ন করেনি এটি তার একটি নির্ভুল প্রমাণ।

সামগ্রিকভাবে বাংলার টেরাকোটা-শিল্প কারিগরী কুশলতায়, শিল্পসুষমায় এবং শিল্পীদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সমাজ-সচেতনতার বৈভব কলারসিক মাত্রেরই অভিনন্দনের যোগ্য। সারল্য-শোভনবিনীতদর্শন মন্দিরগুলির গায়ে এদের অবস্থান। বাংলার গৌরব, বাঙালীর সম্পদ এই টেরাকোটাগুলির মধ্যে সূর্যালোকের দীপ্তি নেই, কিন্তু সন্ধ্যাদীপের স্নিগ্ধ প্রশান্তি আছে। আর এই প্রশান্ত মাধুর্যে বাংলার রূপ-প্রকৃতি বাঙালী মানসতাও সহজ বাঙ্ময়।* □

* ৮৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা

ললিতকলা ও ধর্ম

ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা

ললিতকলা ও ধর্মের পরস্পরের মধ্যে প্রতিকূলতা অথবা নিবিড় সম্বন্ধ— কোন্‌টি আছে আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমাদের সকল চাওয়ার শ্রেষ্ঠ চাওয়া হলো ধর্ম। ধর্মকে পেলে মানুষ সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে থাকে। বিশ্বসৃষ্টির আনন্দ, সৌন্দর্য, রসময়তা উপলব্ধির অধিকারী হয়ে থাকে। ললিতকলা-স্রষ্টা শিল্পীরাও বিশ্বসৃষ্টির আনন্দ, সৌন্দর্য ও রসময়তার সন্ধানী। শিল্পীরা তাদের রূপসৃষ্টিতে সেই সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। ধর্ম আচরণকারী ধার্মিক কঠিন, নীরস, শুষ্ক, সৌন্দর্যবোধহীন, অপ্রেমিক ব্যক্তি নয় বরং তার ঠিক উলটো। যথার্থ শিল্পীর মধ্যেও এই গুণগুলি দেখা যায়। ধর্ম ও ললিতকলা একে অন্যকে প্রকাশ করতে সহায়তা করে। শিল্পকলার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ভারতে বা ইউরোপে প্রাচীনকালে কয়েক শতাব্দী ধরে ধর্মকেই অবলম্বন করে শিল্পসৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধ ও জাতকের গল্পকে নিয়ে অজন্তা গুহার প্রাচীর-চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছে। গুপ্তযুগে পাথর দিয়ে অপূর্ব সব বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছে। রাজপুত-চিত্রে কৃষ্ণ, রাধা বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে আছে। ইউরোপীয় প্রাচীন চিত্রে, গির্জার প্রাচীরে যীশুখ্রীস্টের জীবনী অবলম্বনে শিল্পীরা বহু চিত্র অঙ্কন করেছেন। অতীতে একসময়ে শিল্পীদের অঙ্কন বিষয় প্রধানত ধর্মীয় চরিত্র অথবা ঘটনাদি ছিল। ধর্মের সঙ্গে শিল্পীদের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। পরবর্তী কালে এর ব্যতিক্রম হতে দেখা যায়। ধর্মের স্থান অধিকার করল শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক সম্রাট বা রাজারা। মুঘল আমলে দিল্লির সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, ওমরাহদের চিত্রশিল্পীরা অঙ্কন করত। দীর্ঘকাল এইভাবে চলে আসছিল। সিন্দবাদের কাঁধে যেমন সেই বৃদ্ধ দৈত্যটি চেপেছিল তেমনি শিল্পের কাঁধে কখনো ধর্ম কখনো সম্রাট ইত্যাদি চড়ে বসেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিল্পীরা এই কাঁধে-চড়া বৃদ্ধটির থেকে মুক্তি পেলেন। তাঁদের অঙ্কন বিষয়বস্তুতে আমূল পরিবর্তন এল।

ভারতীয় শিল্পধারায় শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের আগমন এবিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। শিল্পীরা তাঁদের কল্পনাশক্তির, কবিমনের সন্ধান পেলেন। ধর্ম ও সম্রাটদের বিষয়কে বাদ দিয়ে শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টির নিজস্ব আনন্দ, রসসৃষ্টি, এই বিশ্বের সৌন্দর্যকে নিরীক্ষণ করবার প্রতি মনোযোগ দিলেন। শিল্পীর নিজের মনের কথাকে ছন্দের মাধুর্যে সুন্দর করে রূপদানের প্রতি সচেতন হলেন। এই শতাব্দীর শিল্পীরা চিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেমন স্বাধীন হলেন তেমনি নিজেকে প্রকাশ করবার অপূর্ব ক্ষমতাকে লাভ করলেন। পূর্বে ধর্ম ও সম্রাটদের বিষয়ের মধ্যে একটা গুরুত্ব বা অসামান্যতা ছিল, এখন সামান্য বিষয়কেও অসামান্যতা প্রদানের ক্ষমতা শিল্পীরা আয়ত্ত করেছেন।

এখন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না, কিন্তু শিল্পীর কাজের গুণের ওপর নির্ভর করে সামান্যকে অসামান্যে পরিণত করা। শিল্পীরা এখন কত শক্তির অধিকারী, সামান্য মানুষকেও রচনার কলা-কৌশলের দ্বারা দেবত্বে পৌঁছে দিতে পারেন। এখানেই শিল্পীর যথার্থ মুক্তি ও স্বাধীনতা। এই গুণের অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা ও গৌরব যে-কয়েকজন শিল্পীর মধ্যে ছিল তাঁদের দেখেছি কোন প্রকার ঔদ্ধত্য বা গর্ব ছিল না, তাঁরা ছিলেন বিনয়ী, সংযত, নম্র, স্নেহশীল, ভক্তের পর্যায়ের লোক। তাই মনে হয় ধর্ম ও চারুকলার মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে।

শিল্পীরা আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতালাভ করে কোন্ পথ ধরে তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে অগ্রসর হবেন একথা ভাববার সময় এসেছে। অতি আত্মকেন্দ্রিক হওয়া, অসংলগ্ন কতকগুলি মানবাকৃতির দ্বারা চিত্রপট ভর্তি করে উচ্চমানের চিত্ররচনার দাবি করা আজকাল শিল্পীদের মধ্যে একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনকয়েক পূর্বে ভাল-শিল্পী বলে সুপ্রচারিত এক শিল্পীর চিত্র প্রদশনীতে গিয়ে দেখলাম একটি বড় আকারের চিত্রে বসা একটি মানুষের ঘাড়ে তিনটি মাথা, গা, হাত, পায়ের যা রঙ অন্য একটি হাত তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙের, ঐ হাতটির রঙ সম্পূর্ণ সাদা। দর্শকদের কাছে শিল্পীকে দার্শনিক ব্যাখ্যার দ্বারা চিত্রটিকে বুঝিয়ে দিতে দেখা যাচ্ছিল। কথায়ই যদি ব্যাখ্যা করে ছবিকে বুঝাতে হয় তবে ছবির মান রইল কোথায়? এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর রেনয়ের কথা মনে এসে যায়। শিল্পীর কাছে তাঁর চিত্রের ব্যাখ্যা জানবার জন্য অনেকে প্রশ্ন করে রেনয়কে। শিল্পী তখন বলেছিলেন, দেখ, কথার দ্বারা ছবির সব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, যদি তাই হতে পারত তবে শিল্প হতো না, অন্য কিছু হতো। শিল্পের দুইটি প্রধান গুণ, প্রথমত তাকে বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত তাকে নকল করা যায় না। প্রদশনীর চিত্রগুলি দেখে একটা কথাই মনে হচ্ছিল—চিত্র-রচনায় সৌন্দর্য ও রসসৃষ্টির উদ্দেশ্য যেন লোপ পেয়ে গেছে, তার পরিবর্তে কতকগুলি technique বা করণ-কৌশলের কসরত দেখিয়ে শিল্পীরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। করণ-কৌশলের ওপর প্রাধান্য দেওয়া বর্তমান ইউরোপের শিল্পীদের কাজের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও রসসৃষ্টির গুণের অভাব বড় বেশি দেখা যায় না। যার জন্য ঐসব শিল্পীদের কাজ দেখে নৈরাশ্যের পরিবর্তে মনে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ আধুনিক নামধারী ভারতীয় শিল্পীদের কাজে ইউরোপীয় শিল্পীদের করণ-কৌশলের নকল কসরতই চোখে পড়ে কিন্তু রসসৃষ্টির গুণের অভাব থেকে যাচ্ছে। তাতে করে ছবি দেখে যে-আনন্দ পাবার কথা তার বদলে ছবিতে শিল্পীর করণ-কৌশলের মারপ্যাঁচের বাহাদুরির দিক থেকে কতদূর সাফল্য লাভ করেছেন তার প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। তাতে রসিক দ্রষ্টার মন ভরে না। মনে পড়ে, বহু পূর্বে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির বাৎসরিক চিত্র-প্রদশনীতে এক একটি ছবি সমস্ত মনকে নাড়া দিয়ে আনন্দে অভিভূত করে দিত। দীর্ঘ সময় দিয়ে ছবিটিকে দেখতে হতো। প্রদশনীর গৃহ ত্যাগ করবার পরেও মনের মধ্যে ছবির ছাপ থেকে যেত। এমন ছবিও ছিল

যার স্মৃতি এখনো মনে জেগে আছে। ভাল ছবি দেখার সুযোগ পাওয়া একটা সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করি।

সেইসব দিনের শিল্পীদের শিল্পরচনার মধ্যে বড় একটা আদর্শকে প্রকাশ করবার, রসসৃষ্টি করবার, মনের ভাবকে সুন্দর করে দেখানোর প্রয়াসই প্রাধান্য লাভ করত, করণ-কৌশল তাকে ফুটিয়ে তোলবার সাহায্য করলেও নিজেকে জাহির করত না। ভারতীয় দেব-দেবীর বিষয়কে অবলম্বন করে তখন অনেক চিত্র আঁকা হলেও প্রকৃতি, মানুষ, পশু, পাখির বিষয়েও বহু চিত্র আঁকা হয়েছে। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের চিত্রগুলির মধ্যে দেব-দেবীর চিত্র কিছু কিছু পাওয়া যায়। শিল্পাচার্য নন্দলালের দেব-দেবীর চিত্র অনেক আছে, শিল্পী অসিতকুমার হালদারও প্রথমদিকে মা যশোদা, কৃষ্ণ, কৃষ্ণের রাসলীলা, বৌদ্ধ বিষয়, কুনাল ইত্যাদির কতকগুলি চিত্র এঁকেছেন, শিল্পী ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার বৈষ্ণববিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ সুদাম, শ্রীচৈতন্য জীবনী অবলম্বনে ধারাবাহিক অপূর্ব বহু চিত্রাদি অঙ্কন করেছেন। দেব-দেবীর, মহাপুরুষদের আখ্যান বা জীবনীর সৌন্দর্য যেখানেই শিল্পীদের মনকে আকর্ষণ করেছে সেখানেই তা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ছবির রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ধর্ম বা মহাপুরুষদের জীবনের সৌন্দর্য স্বভাবতই শিল্পীদের মনকে আকর্ষণ করে থাকে।

সাধক যেমন সাধনার পথকে অবলম্বন করে চলেন, শিল্পীকেও কতকটা সেই পথে চলতে হয়। বিশ্বসৃষ্টির সৌন্দর্যকে জানতে হলে যে-পথে চলতে হয় তাকে সাধনা বলা যায়। যে এই পথের পথিক সে অনায়াসে প্রকৃতির ভাষা বোঝবার ক্ষমতা লাভ করে। প্রকৃতির নীরব ভাষা তাকে অনেক কিছু বলে থাকে।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন এমন একজন শিল্পী যিনি পুঁথিগত কথার চেয়ে সম্যক উপলব্ধির কথাই তাঁর ছাত্রদের বলতে ভালবাসতেন। শিল্পীদের ধ্যানধারণার কথা বলতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন যে, যখন তাঁর বেশ বয়স হয়ে এল তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নাকি বলেছিলেন ঃ "অবন, এবার একটু ধ্যানধারণা কর, বয়স তো হয়ে এল।" "রবিকাকার কথামতো একদিন খুব ভোরবেলায় বাড়ির তেতলার ছাদে গিয়ে আসন পেতে পূর্বমুখী হয়ে চোখ বুজে ধ্যান করতে বসলাম। অনভ্যাসবশত হঠাৎ চোখ খুলে গেলে দেখতে পেলাম পূর্বাকাশে নব-অরুণোদয়ের রক্তিম আভা আকাশ ও খণ্ড মেঘগুলিকে রাঙিয়ে দিয়ে অপূর্ব এক দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। মন বিস্ময়ে পুলকিত হয়ে উঠল। হাঁ-করে তাকিয়ে রইলাম, ভাবলাম আমি শিল্পী মানুষ, এমন সুন্দর দৃশ্যকে না দেখে চোখ বুজে ধ্যান করব? তবে তো বিশ্বস্রষ্টার এমন সুন্দর প্রকাশ বৃথাই যাবে। আসন ছেড়ে উঠে পড়লাম এবং মনে মনে বললাম, 'যোগীর ধ্যান চোখ বুজে, আর শিল্পীর ধ্যান চোখ খুলে।'" বিশ্বস্রষ্টার এমন সুন্দর বিশ্বসৃষ্টিকে চোখ খুলে, মন দিয়ে দেখার মধ্যেই শিল্পীদের ধ্যানধারণা রয়ে গেছে।

আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি—একবার একজন শিল্পী-ছাত্র অবনীন্দ্রনাথের নিকটে গিয়ে অনুরোধ করেছিলেন শিল্প বিষয়ে কতকগুলি ভাল পুস্তকের নাম

বলতে যা-পড়ে শিল্প বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করা যায়। অবনীন্দ্রনাথ সেই ছাত্রটিকে দুটি পাতার বইয়ের কথা তখন বলেছিলেন—একটি পাতা নীল, অপরটি সবুজ। এই দুপাতার বই পড়লে শিল্প বিষয়ে অন্য পুস্তক পড়ার প্রয়োজন হবে না। গুরু শিল্পী-ছাত্রটিকে ঠিক বইয়ের কথাই সেদিন বলেছিলেন। একটি পাতা—নীল আকাশ, দ্বিতীয় পাতাটি সবুজ পৃথিবী; এই দুইটি পাতা সারাজীবন পড়েও শেষ করা যায় না। এই পড়াতে কী যে আনন্দ সেকথা সহস্র কথাতেও বলে শেষ করা যায় না। কবিরা প্রেরণা পেলেন তার থেকে, সঙ্গীত রচয়িতা কথা, সুর পেলেন ঐ একই আনন্দের উৎস থেকে, দার্শনিক জ্ঞানের দ্বারা খুঁজলেন তার অর্থ। এই সবের উপলব্ধির পিছনে রয়েছে মানুষের মন। মন যদি আমাদের না থাকত—তাহলে মানুষ পশু পর্যায়ের সামিল হতো। এই বিশ্বচরাচরের উপলব্ধি মানুষ মনের দ্বারা, কল্পনার দ্বারাই করে থাকে। মনের গতি সর্বত্র, তাই বুদ্ধ বলেছেন "মনোময় জগৎ"।

ধর্মের গতিপথ যে উদ্দেশ্যে চলেছে, শিল্পের মূল উদ্দেশ্যও সেই পথেই চলেছে বলে মনে করি।* □

* ৮৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

মনস্তত্ত্ব

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

মনের বহির্মুখী বৃত্তি স্বতই নিরতিশয় প্রবলা। মানব প্রথমেই বহির্জগতের বৈচিত্র্য ও কার্যকলাপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। মনের এ অবস্থায় দ্রষ্টা, দৃশ্যের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া প্রথমেই কাব্য যুগের অভ্যুদয় করিয়া দেয়। বহির্জগতের অন্বেষণ শেষ হইলে মন ক্রমে অন্তর্মুখী হইতে থাকে। এ-অবস্থাতেই অন্তর্জগতের অন্বেষণ আরম্ভ হয়। তখনই মন কি, বুদ্ধি কি, ঈশ্বর কি ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসায় জীবের ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়। মনের এই অন্তর্মুখী বৃত্তির উপক্রম হইতেই দর্শন-যুগের আরম্ভ হয়। মনোবিজ্ঞান (Psychology), দর্শন (Philosophy) ও ধর্ম (Theology) এই দর্শন-যুগের প্রধান বিদ্যা। ইংরেজী মতে মনের বহির্দৃষ্টি অবজেকটিভ (Objective) ও অন্তর্দৃষ্টি সাবজেকটিভ (Subjective)।

মন যখন বহির্জগৎ উপেক্ষা করিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করে, তখন প্রথমতই 'মন কি?'—এবিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা এ প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে এ প্রশ্নের মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

বর্তমান যুগের প্রথম পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেকার্ট (Descartes) বলেন ঃ "Mind is a self-knowing principle."—যে নিজকে নিজে জানে, তাহার নাম মন। এরূপ সংজ্ঞা দ্বারা কিছুই বোধগম্য হইতে পারে না। মন যদি নিজেকে নিজে জানেন, তবে তিনিই দ্রষ্টা ও তিনিই দৃশ্য হইয়া পড়িতেছেন। এক পদার্থ দ্রষ্টা (Subject) ও দৃশ্য (Object) কিরূপে হইতে পারে? যাহা দ্বারা জানা যায় সেই করণই মন বলিয়া, সার উইলিয়ম হ্যামিল্টন বলিতেছেন, জ্ঞানের প্রত্যেক ক্রিয়ায় মনই প্রধান সহকারী কারণ। (The mind itself is the universal and principal concurrent cause in every act of knowledge.) মনস্তত্ত্ববিদ হ্যামিল্টনের সংজ্ঞা সমধিক পরিস্ফুট। তিনি বলিয়াছেন, মনের কার্য দেখিয়াই মনের সংজ্ঞা কল্পিত হয়। নতুবা অন্যরূপে 'মন কি', তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন, মনের কার্য দেখিয়াই মনের সংজ্ঞা হইতে পারে। (Mind can be defined only from its manifestations.) হ্যামিল্টন আরো বলেন, জাগ্রত অবস্থাই মন; জড়ের সহিত বিস্তৃতি গুণের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত জাগ্রত অবস্থার সেই সম্বন্ধ। (Consciousness is, in fact, to the mind, what extension is to matter or body.) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ বলেন, মন দেহাদির গুণ বা ধর্ম, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; শুক্র শোণিতের রাসায়নিক ক্রিয়োৎপন্ন। ইঁহারা প্রায় ভারতীয় চার্বাক-মতবাদিগণের ন্যায়। অ্যারিস্টটল (Aristotle) যাহাকে র‍্যাসন্যাল (Rational) বা এনিম্যাল সোল (Animal soul) বলিতেন, তদ্দ্বারা মনকেই উপলক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বস্তুত পাশ্চাত্য দর্শন-মতে,

অনেকস্থলে, Soul-কে (আত্মাকে) Mind (মন) বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। আবার মনকেও পক্ষান্তরে আত্মা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য কোন কোন পণ্ডিত আবার মন ও দেহ এ উভয়ের এককে অস্বীকার করিয়া একত্ববাদী হইয়াছেন। কেহ মনোবাদী হইয়া আইডিয়ালিস্ট (Idealist) নামে আখ্যাত হইয়াছেন। কেহ জড়বাদী হইয়া রিয়ালিস্ট (Realist) নাম ধারণ করিয়াছেন। যাঁহারা মন ও দেহকে দুই স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও আবার চারি সম্প্রদায়ে প্রবিভক্ত। ডেকার্ট, ডিলাফোর্জ ও মেলব্রন্স প্রভৃতি দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মন ও জড়শরীরের কার্য সম্পাদিত হইতেছে। উঁহারা উভয়েই নিষ্ক্রিয়। এই মতকে 'ডকট্রিন অব অকেজনাল কজেস' (Doctrine of Occasional Causes) বলে। লেবনিজ ও উলফ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, মন ও শরীরের ক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক করিয়াই ঈশ্বর উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন। উহারা অন্যোন্যশ্রয়ী নহে। কিন্তু দুইটি সমান ঘড়ির মতো উভয়েই একরূপ ক্রিয়া হইতেছে। শরীর ও মনের এই অন্যোন্য-কার্যকারিতা সৃষ্টিকাল হইতে ঈশ্বরই বিধান করিয়া দিয়াছেন। এই মতকে 'ডকট্রিন অব প্রি-এস্টাব্লিসড হারমনি' (Doctrine of Pre-established Harmony) কহে। কার্ডওয়ার্থ, লেকলার্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, কোন একপ্রকারের সূক্ষ্মপদার্থ মন ও শরীরের সংযোগ করিয়া দিয়াছে। এই মতকে 'ডকট্রিন অব প্ল্যাস্টিক মিডিয়ম' (Doctrine of Plastic Medium) কহে। ইউলার ও স্কুলমেন-মতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, বাহ্যপদার্থ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইলে মনের কার্য হয়। মন যেন ঠিক মাকড়শার মতো দেহজালের মধ্যদেশে অবস্থান করিতেছেন। এই মতকে 'ডকট্রিন অব ফিজিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স' (Doctrine of Physical Influence) বলে।

জার্মান দার্শনিক ক্যান্ট মনের কার্যকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—জ্ঞান (knowledge), অনুভব (feeling) ও ইচ্ছা বা ক্রিয়া (willing)। ইনি বলেন, এই তিনের সমষ্টিই মন। জ্ঞান, অনুভব ও ইচ্ছাশক্তি সকলেই অন্যোন্যাশ্রয়ী। বস্তুত, ক্যান্ট-উক্ত এই ত্রিবিধ শক্তির সম্যক আলোচনা, উপরি উক্ত শক্তিত্রয়-সংমিশ্রণে নানা জাতীয় মনোভাবের ক্রমবিকাশ-প্রতিপাদন এবং অবশেষে এই শক্তিত্রয়ের কারণতা অনুসন্ধান করিয়া শরীরবিদ্যায় পর্যাপ্তি করাই অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পরমপুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ বলেন, এই শক্তিত্রয়-বিকাশের ক্রমভেদ আছে। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ (Evolutionists) এমতের সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, মানবজীবনের প্রথমেই অনুভবশক্তির (feeling) প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। হাস্য, ক্রন্দন, প্রফুল্লতা, তৃপ্তি, সহানুভূতি, সরলতা ও নির্ভীকতা শৈশব জীবনের নিত্য সহায়। সেসময় জ্ঞানের বিকাশ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়। যদিও যুক্তি-বিচারে আমরা অনুমান করি যে অনুভবের মূলেও অত্যল্প জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, তথাপি সেই জ্ঞান এত অল্প যে, তাহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কেহ বলেন, মস্তিষ্কই মনের আধার বা মস্তিষ্কই মন। মনের কার্য বেশি হইলে প্রস্রাবের সহিত মস্তিষ্কের অংশ বিগলিত হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বয়সের সঙ্গে যখন মস্তিষ্ক বৃদ্ধি হয়, তখনই মনের সমধিক ক্রিয়া হয়। তখন ক্রমেই জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির সমধিক স্ফুরণ হইয়া থাকে। পৌনঃপুনিক অনুভবই জ্ঞানের অনন্য কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। তবে দেশ, কাল, পাত্র, শিক্ষা এবং পৈত্রিক সংস্কারাদিও মনের গঠনে বিস্তর সাহায্য করে। ইঁহারা বলেন, বহির্জগৎ ইন্দ্রিয়-পঞ্চকের সংস্পর্শ মাত্র ধমন্যাদির পরিস্পন্দন দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়, তৎপরে বস্তু-জ্ঞান জন্মে। মস্তিষ্কই দেহরাজ্যের রাজধানী এবং মস্তিষ্ক-ক্ষয়ে জ্ঞান-ক্ষয়। কিন্তু, এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, মস্তিষ্ক জড় পদার্থ হইয়া জ্ঞান, অনুভব ও ক্রিয়া কিরূপে উৎপাদন করিতে পারে? শৈশব ও অসভ্য-জীবন একরূপ। এজন্য, শৈশব ও অসভ্য সমাজে ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণের মতে অনুভব-শক্তি প্রধান। বেদুইনেরা এই ঘোর সাহসী, এই আবার কাপুরুষ। পেলগ্রেভ সাহেব বলেন, আফ্রিকার আদিম অধিবাসিগণ আধ পয়সার জন্য এখনি একজনকে হত্যা করিয়া পরমুহূর্তেই অন্যজনকে দশটাকা দান করিবে। মনের অনুভব-শক্তি ইন্দ্রিয়াদিপথে পরিচালিত, এজন্য অসভ্য ও শিশুর অনুভবশক্তি প্রবল। নেটালের অধিবাসিগণের ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল যে, কুকুরের ন্যায় তাহারা মৃগানুসরণ করিতে পারে। যুগমান জাতি দূরদর্শনে দূরবীক্ষণ-স্বরূপ। সুতরাং পাশ্চাত্য মতে আমরা দেখিতে পাইলাম, অনুভব-শক্তিই মনের প্রথম স্ফুরণাবস্থা। দ্বিতীয়াবস্থা জ্ঞান ও তৃতীয়াবস্থা কর্ম।

বস্তুত, পাশ্চাত্য মত যে ভ্রম, তাহা বলিবার উপায় নাই। 'মন কি', যদিও তাঁহারা এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নাই, যদিও বস্তু-জ্ঞানের ক্রমপদ্ধতি-প্রকাশে তাঁহারা সাংখ্যের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী হইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহাদের পরীক্ষার ফল (Result) যে একান্ত সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুভবের পরে জ্ঞান, জ্ঞানের পর কর্ম, একথা উচ্চ-দর্শনানুমোদিত।

কণাদোক্ত নয় দ্রব্যের মধ্যে মন নামক পদার্থের উল্লেখ আছে। ইঁহারা আত্মাকে মন হইতে পৃথক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। চক্ষুরাদি যেমন বহিষ্করণ বা বাহ্য-কার্য-সহায় মন তেমনি অন্তঃকার্য-সম্পাদক যন্ত্র-বিশেষ, এইজন্য মনকে অন্তঃকরণ কহে। ইহাই সুখদুঃখাদি সাক্ষাৎকারের হেতু। কণাদ বলেন, মনের আটটি গুণ আছে, যথা—সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ। মন নিত্য নহে, তবে প্রলয় বা মোক্ষের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী বলিয়া মন প্রায় নিত্যের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। বৈশেষিক-মতে মন জড়, কিন্তু আত্মার যোগে সে বুদ্ধি-নামক চৈতন্য পদার্থ উৎপন্ন করে। এই আত্মা ও মনের সংযোগ ধ্বংস হইলেই চৈতন্যের লোপ বা মোক্ষ হয়। গৌতমও মনকে জড়-পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইনিও মন ও আত্মাকে ভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ন্যায়-মতে আত্মা অনাদি-নিধন, কিন্তু মন উৎপন্ন, প্রধ্বংসী। গৌতম মানস জ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গৌতম জ্ঞানকে জড় মনের গুণ বলিয়া আত্মাকেও প্রকারান্তরে জড় বলিয়াছেন। বস্তুত, কণাদ ও গৌতম উভয়েই মন সম্বন্ধে একমতবাদী।

সাংখ্য দর্শনই এ জগতে মনস্তত্ত্বের পরিস্ফুট ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কপিল বলেন, পুরুষ-সান্নিধ্যবশত প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ

সাত্ত্বিক প্রকাশই মহত্তত্ত্ব। “মহদাখ্যমাদ্যং কার্যং তন্মনঃ।” কপিল এই সমষ্টি মহৎকে মন আখ্যাও দিয়াছেন। সুষুপ্তির পরে জাগ্রত অবস্থা যেরূপ, প্রকৃতি ক্ষোভের পর মহত্তত্ত্ব সেইরূপ। হ্যামিল্টনোক্ত কনশাসনেশের (consciousness) সমষ্টি ও মহত্তত্ত্ব এইজন্য একরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সাংখ্যমতে ব্যষ্টি মহত্তত্ত্বই মন বা অন্তকরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিই বুদ্ধি নামে উক্ত হয়। মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারে পরিণত হইলে প্রচুর-সত্ত্ব অহঙ্কার হইতে মন, প্রচুর-রজঃ অহঙ্কার হইতে দশেন্দ্রিয় ও প্রচুর-তমঃ অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের ভোগ উৎপন্ন হয়। বাহ্যজগৎ ইন্দ্রিয়দ্বারে আঘাত করিবামাত্র স্নায়ুর পরিস্পন্দন উপস্থিত হয়, পরে মস্তিষ্কের কোমলাংশে যে ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র আছে তাহাতে ঐ আঘাত-পরিচালিত হয়। ইন্দ্রিয় মনের নিকট তাহা অর্পণ করিলে, মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে অর্পণ করে, বুদ্ধি আত্মার নিকট উপস্থিত করিলে আত্মা তথা হইতে বুদ্ধিপথে আদেশ প্রেরণ করেন এবং পূর্বোক্ত পথে প্রতিক্রিয়ারূপ আদেশ প্রচলিত হইয়া বস্তু-জ্ঞান জন্মায়। সুতরাং, মন একটি অন্তর্যন্ত্র যদ্দ্বারা বস্তু-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাংখ্য-মতেও মন জড়, কিন্তু আত্মার সন্নিকটস্থ ও প্রচুর সত্ত্ব-প্রধান বলিয়া চৈতন্যাত্মক বলিয়া অনুমিত হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বার চক্ষুরাদিতে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের স্থান মস্তিষ্কে; মনের স্থান সর্বত্র। তবে হৃৎ-পুণ্ডরীক ও দ্বিদলই মনের প্রধান স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পতঞ্জলিও সাংখ্যমত গ্রহণ করিয়াছেন। জৈমিনি মনকে ভৌতিক বলিয়াও ইহার অনশ্বরত্ব স্বীকার করেন। বেদান্ত-মতে মনের স্বরূপ প্রায় সাংখ্যেরই অনুরূপ। তবে একটু প্রভেদ এই যে, বৈদান্তিকগণ মনকে আধ্যাসিক বলেন। মায়া-শক্তি যেমন পরমাত্মাতে জগদিন্দ্রজাল কল্পনা করে, ব্যষ্টি-পক্ষে মনরূপ অবিদ্যাও তেমনি জীবাত্মাদি কল্পনা করিয়া বদ্ধ হইয়াছে। শঙ্কর বলেন, “নহ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা”—মন ভিন্ন অবিদ্যা কিছুই নাই। কেবল জাগ্রত অবস্থা (consciousness)-কেই ইঁহারা মন বলিয়া নির্দেশ করেন না। জাগ্রত (conscious), স্বপ্ন (semiconscious) ও সুষুপ্তি (unconscious) অবস্থাও মনের বিষয়। কেবল তুরীয় অবস্থা (super conscious) মনের বিষয় নয়। সে অবস্থায় মন লুপ্ত হইয়া যায়; তখনই পরমাত্মানুভূতি হয়। বেদান্ত বলেন, মনের প্রথম স্পন্দনাবস্থায় বাসনা জন্মে, তাহা হইতে সৃষ্টি বিজৃম্ভিত হয়। এই বাসনার লোপ হইলেই মনের স্পন্দন হ্রাস হইয়া আত্মতত্ত্বে মিশিয়া যায়। বহুজন্মেও মনের এই স্পন্দনাবস্থা লুপ্ত হয় না বলিয়া বাসনা-পূরণে জীব পুন পুন নানা যোনি ভ্রমণ করে। অবশেষে বাসনার নিবৃত্তি হইলে মনরূপ উপাধির লোপ হয়; কাজেই জ্ঞান বা পরমাত্মা প্রকাশিত হন। সমষ্টি-মায়োপহিত চৈতন্যের যেমন ঈশ্বর-সংজ্ঞা হইয়া থাকে; ব্যষ্টি-অবিদ্যোপহিত চৈতন্যের তেমনি মন-সংজ্ঞা হয়। এই মনের লোপই মোক্ষ বা তুরীয়াবস্থা। বেদান্ত বলেন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কিছুই হয় নাই, হইবে না, কেবল—‘মনরূপ মায়া উপাধি লইয়া ভাঙি, গড়ি, ধরা আমরা সবে’। শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম ও গুরুসেবা দ্বারা মনের নিঃশেষ লয় করিলে পরমাত্মা আপনি প্রকাশিত হন। ইহাই মনস্তত্ত্বের একপ্রকার অস্ফুট ইতিহাস।* □

* ১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ
কয়েকটি স্থূল কথা
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

জ্যোতিষ শাস্ত্র কাহাকে কহে?—যে-গ্রন্থে নভোমণ্ডলের সমস্ত জ্যোতিষ্মান পদার্থের স্থিতি, গতি, আকৃতি, প্রকৃতি, গুরুত্ব (পরিমাণ-mass) এবং দৈনন্দিন অথবা অন্যপ্রকার বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়, তাদৃশ গ্রন্থকেই জ্যোতিষ শাস্ত্র কহে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিভাগ।—পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই শাস্ত্রকে পাঁচ ভাগে বিভাগ করেন। যথা—(১) বর্ণনাত্মক (Descriptive) জ্যোতিষ, (২) প্রক্রিয়াত্মক (Practical) জ্যোতিষ, (৩) অনুমানাত্মক (Theoretical) জ্যোতিষ, (৪) জ্যোতিষ্কি কলাশাস্ত্র (Celestial mechanics) এবং (৫) জ্যোতিষ্কি পদার্থবিজ্ঞান (Astro-physics)। হিন্দুদিগের ফলিত জ্যোতিষ ইহাদের অন্তর্গত নহে। উপরোক্ত পঞ্চবিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর বিভাগসমূহ আছে। এতদ্ব্যতীত যন্ত্র নির্মাণ ও বেধার্থ (অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র নক্ষত্রাদির স্থান দর্শনার্থ) যন্ত্রাদির যথাযথ স্থাপন করাকেও জ্যোতিষের আরেকটি পৃথক বিভাগ ধরা হয়।

উপরোক্ত কোন এক বিভাগে পারদর্শী হইতে হইলে সেই বিভাগটি যেমন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়, তদ্রূপ অন্যান্য বিভাগের সমুদয় সিদ্ধান্তগুলির সহিতও সুপরিচিত থাকা আবশ্যক। বিশেষত আজকাল জ্যোতিষ সম্বন্ধে এত নূতন নূতন আবিষ্কার ও উন্নতি হইতেছে যে, পূর্বে এরূপ আর কখনো হয় নাই। সেই কারণে সমস্ত বিভাগের মূল ব্যাপারগুলি যদি অবগত না হওয়া যায়, তাহা হইলে কোন এক বিশেষ বিভাগে সম্পূর্ণরূপে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারা যায় না। মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় মহতী আবিষ্ক্রিয়াসমূহ প্রতিনিয়ত হইতেছে না বটে, তত্রাচ যেসকল সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাই আশ্চর্যজনক। সহস্র সহস্র বৎসরের পরিশ্রম এবং গভীর গবেষণার ফলস্বরূপ মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় নিয়ম সকল আবিষ্কৃত হয়; এবং ইহাও সত্য যে, আধুনিক আবিষ্কার সমূহের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণই সর্বপ্রধান।

বর্ণনাত্মক জ্যোতিষ শাস্ত্র।—এই বিভাগে সমস্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল কথা ও সিদ্ধান্তগুলি এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হয়, যাহাতে উহা সাধারণ লোকের বোধগম্য হয়। ইহাতে জটিল গণিত বা কোন কঠিন বিষয় আলোচিত হয় না। পত্রিকাতে ও বক্তৃতাদিতে যে-জ্যোতিষের প্রসঙ্গ দেখা যায়, তাহা এই বর্ণনাত্মক জ্যোতিষ। এতদ্দ্বারা সাধারণ কৃতবিদ্য লোকেরা নভোমণ্ডলের আশ্চর্যজনক তত্ত্বসকল অবগত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। জ্যোতিষীদের কঠিন পরিশ্রমলব্ধ

জ্ঞান এইরূপে কতিপয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, সর্বসাধারণে ছড়াইয়া পড়িয়া সাধারণ পাঠকের মানসিক সম্পত্তির দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে।

প্রক্রিয়াত্মক জ্যোতিষ শাস্ত্র।—বেধার্থ (অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি দর্শনার্থ) জ্যোতিষ্কি যন্ত্রাদি কি প্রকারে ঠিক ঠিক স্থাপন করিতে হয়, উহাদিগকে কিরূপে ব্যবহার করিতে হয় এবং কি কি প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত দর্শনাদি হইতে জ্যোতিষ্কি সমস্যা সমূহের সমাধান হয়; এই সমস্ত প্রক্রিয়াত্মক জ্যোতিষের অন্তর্গত। (ক) নক্ষত্রগুলির স্থাননির্ণয়, (খ) চন্দ্র, সূর্য, গ্রহাদির পরিমাণ এবং তদঙ্গে যেসব চিহ্নাদি (markings) আমরা দেখিতে পাই তাহার অনুধ্যান ও তত্ত্বনির্ণয়, (গ) ধূমকেতু এবং নীহারিকার (nebula) তত্ত্বানুসন্ধান, (ঘ) যমক নক্ষত্র বা নক্ষত্রযুগ্মের (double stars) স্বরূপানুসন্ধান এবং তাহাদিগের পরিমাণ নির্ণয়, (ঙ) নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার পরিমাণ নির্ণয় এবং (চ) উহাদের ছায়াচিত্রাদি (photograph) কি প্রকারে গ্রহণ করিতে হয়, এইসকল প্রক্রিয়াত্মক জ্যোতিষের অন্তর্গত।

(ক) জ্যোতিষ্ক পদার্থদিগের স্থান নিরূপণ, অর্থাৎ উহারা কখন কোথায় অবস্থিতি করিতেছে তন্নিরূপণ, প্রথমেই আবশ্যক; কারণ উহা হইতেই তাহাদিগের গতিবিধি কিভাবে, কত দ্রুত হইতেছে তাহা জানিতে পারা যায়। গতি হইতেই আবার উহাদিগের গুরুত্ব বা ওজন গণনায় সিদ্ধ হইয়া মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপাদি অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়।

নক্ষত্রেরা পরস্পরের সম্বন্ধে অচল, ইহা পুরাকাল হইতে বিদিত আছে। সুতরাং উহাদের স্থানকেই জ্যোতিষ শাস্ত্রে মূল স্থান (basis of reference of position) ধরা হয়, অর্থাৎ উহাদিগের অবস্থানের সহিত তুলনা করিয়া, যেসব জ্যোতিষ্ক পদার্থের গতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের স্থান নিরূপণ করা হয়। কোন গ্রহের (রাশিচক্রে গমনশীল নভঃ পদার্থের) কোন এক বিশেষ সময়ে কোথায় স্থিতি জানিতে হইলে, কোন এক নির্দিষ্ট নক্ষত্র হইতে উহা কতদূরে ও ঐ নক্ষত্রের কোন্ দিকে আছে দেখিতে হয়; তাহা হইলেই ঐ গ্রহের স্থিতির নির্দেশ করা হইল। অতএব নক্ষত্রগুলির স্থান নিরূপণ সর্বাগ্রে আবশ্যক। মাধ্যাহ্নিক সমতলে (plane of meridian) ঘুরিতে পারে এমন একটি ছোট দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঠিক করিয়া বসাইতে পারিলে, উহা দ্বারাই নক্ষত্রসমূহের স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে। এইরূপে সমগ্র নক্ষত্রের বেধ (দর্শন) সামান্য পরিশ্রমসাপেক্ষ নহে। এক ব্যক্তি উত্তর গোলে (Northern Hemisphere) ৩২৪,১৯৮ সংখ্যক নক্ষত্রের নিরূপণ করিয়া, উহাদিগকে তালিকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ তালিকাকে আরজিলাণ্ডারের তালিকা কহে (Argelander's Catalogue)। ছায়াচিত্র দ্বারা (photographic process) সমস্ত নভঃ পদার্থের স্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়। এমন উপায় সকল বিগত ১৫ বৎসর হইতে ক্রমশ উদ্ভাবিত হইতেছে।

জার্মান জ্যোতির্বিদ্ বেসেল্ (Bessel) সাহেব (১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দ–১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দ) নক্ষত্রসমূহের বেধ ও উহাদের স্পষ্টীকরণ (অর্থাৎ যেখানে বা যে-সময়ে চর্মচক্ষুদ্বারা উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তন্নির্ণয়) করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তই এখনো সকল জ্যোতির্বিদেরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া

থাকেন এবং তাঁহাকে প্রক্রিয়াত্মক জ্যোতির্বিদের অগ্রগণ্য বলিয়া নির্দেশ করেন।

(খ) আকাশের যেকোন দিকেই হউক সহজে ঘুরাইতে পারা যায়, এমন একটি বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহাদির বিষয় অবগত হওয়া যায়। চন্দ্র এবং গ্রহাদির বিষয়ে আমাদের বর্তমান যেসমস্ত জ্ঞান, তাহা এইরূপ দর্শন দ্বারা জানা গিয়াছে। সূর্যের বিষয় সূক্ষ্মরূপে অবগত হইবার জন্য এখন স্পেকট্রোস্কোপ (spectroscope) যন্ত্রের বিশেষ ব্যবহার হয়।

(গ) ধূমকেতু নিরীক্ষণ করিতে হইলে, ছোট একটি দূরবীণ এমন হওয়া চাই, যাহাতে লক্ষ্য পদার্থ বেশি বড় না দেখায়। ঐ দূরবীণকে আবার এমন করিয়া বসান চাই, যেন উহাকে প্রয়োজনমতো যেকোন দিকে ঘুরাইতে পারা যায়। সমস্ত বৎসরের তন্ন তন্ন অনুসন্ধানের ফলে, চারটি কিংবা পাঁচটি ধূমকেতু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। স্বল্পমাত্র বিষয় জানিতে হইলেও মানুষকে কত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাই এই ব্যাপারে মনে হয়!

(ঘ) যমক নক্ষত্র বা নক্ষত্র যুগ্মের (Double stars) অনুসন্ধান ও উহাদের পরিমাণ নির্ণয়। লক্ষ্য পদার্থ অত্যন্ত বৃহৎ দেখায়, এমন একটি বড় দূরবীণের সাহায্যে এই কার্য নিষ্পন্ন হয়। এই কার্য কিছু সময়সাপেক্ষ। নিরূপিত হইবার পর, সেইগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, অনেক অপূর্ব তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহাদিগের গতিবিধি দেখিলে স্থির প্রমাণিত হয় যে, মাধ্যাকর্ষণ আমাদের দৃশ্য-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই একভাবে কার্য করিতেছে। নক্ষত্র-যুগ্ম বা যমক সমূহের পরিমাণ, সূর্যের পরিমাণের ন্যায় নির্ণয় করিতে পারা যায়, আর ইহা হইতেই জানা গিয়াছে যে, নক্ষত্র সমূহের মধ্যে এমন এমন নক্ষত্র আছে, যাহারা আমাদের সূর্য অপেক্ষা অনেক বড়।

(ঙ) নক্ষত্রাদির উজ্জ্বলতার ন্যূনাধিক্য দেখিয়া, রূপ-পরিবর্তক বা অস্থিরজ্যোতি নক্ষত্র সমূহের (variable stars) অনুসন্ধান করা হইয়াছে। এই অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, অনেক স্থলে একটি জ্যোতিসম্পর্কহীন সূর্য (Dark Sun) এবং একটি উজ্জ্বল সূর্য (Bright Sun), পরস্পরের গুরুত্ব-কেন্দ্রের (Centre of gravity) চতুর্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়াই, ঐরূপ প্রতীয়মান হয়।

(চ) ড্রাই প্লেটের (Dry plate) সাহায্যে নভোমণ্ডলের ছায়াচিত্র গ্রহণ প্রক্রিয়ার অনেক উন্নতি করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা কত শত অল্প জ্যোতিষ্মান্ ধূমকেতু, ক্ষীণজ্যোতি নীহারিকা ও নক্ষত্রনিচয়ের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে।

অনুমানাত্মক জ্যোতিষ।—কতকগুলি প্রধান গ্রহনক্ষত্রাদির বেধ দ্বারা গ্রহাদির কক্ষ গণনা, উহাদের স্ফুটগণনা এবং যে-শক্তি বা পদার্থের দ্বারা প্রতিহত হইয়া গ্রহাদির গণনালব্ধ স্থাপনের কখনো কখনো পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার অনুসন্ধান, গ্রহকক্ষের শোধন ইত্যাদি এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহার আলোচনায় গণিতশাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই এবং গণনা পদ্ধতির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। গণনাগুলিও অতি দীর্ঘ ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ। এই সমস্ত গুরুতর গণনাকার্য বড় বড় শাসনকর্তাদিগের আজ্ঞাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহাদির স্থান এবং গ্রহণ ইত্যাদির গণনা ও পঞ্চাঙ্গ নির্ণয় (পঞ্জিকা করা), এই বিভাগের অন্তর্গত।

জ্যোতিষ্ক-কলা-শাস্ত্র।—যখন কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধিক উন্নতি হয়, তখন উহার অন্তর্গত ঘটনাগুলির মধ্যে এমন নিয়ম সকল পরিলক্ষিত হয়, যদ্দ্বারা কোন সময়ের ঘটনা দেখিয়া, ভবিষ্যতে উক্তপ্রকার ঘটনা কখন হইবে বা অতীতকালে সেইরূপ ঘটনা কখন হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—কোন একটি জিনিস অত্যুচ্চ স্থান হইতে নিচে পড়িতেছে। পতনকালে ঐ পদার্থ কোন একসময়ে জমি হইতে কত উচ্চে রহিয়াছে ও কত দ্রুত জমির দিকে আসিতেছে তাহা জানিতে পারিলে, পতন কার্য সমাপ্ত হইবার পূর্বে কোন বিশেষ সময়ে উহার সংস্থান ও গতি কি হইবে, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি কেননা পদার্থ সমূহের পতন যে-নিয়মে সঙ্ঘটিত হয়, তাহা আমাদের জানা আছে।

কিন্তু ধর, যদি কোন অজ্ঞাত ফুলের বীজ দেওয়া থাকে তাহা হইলে ইহার বর্ণ কি হইবে—যদি আমাদের বলিতে হয়, তাহা আমরা বলিতে পারিব না; কেননা এ বিষয়ের স্বাভাবিক নিয়মগুলি আমরা বিদিত নহি।

যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের গতি কিভাবে হয়, তাহার নিয়ম নিউটন সাহেব (Newton) দুই শতাব্দী পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই নিয়মের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, কেবল পার্থিব বস্তু নহে, আকাশস্থ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহাদিরা মাধ্যাকর্ষণের বশীভূত হইয়াই পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং এই সমস্ত পদার্থের (কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) স্থান, গতি, আকৃতি, পরিমাণ যদি জ্ঞাত হওয়া যায়, ভবিষ্যতে উহাদের পরিমাণ ইত্যাদি কত হইবে, গণিতের দ্বারা তাহা অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয় জ্যোতিষ্ক-কলা-শাস্ত্রের অন্তর্গত। ইহা দ্বারা প্রথমত, বিমানচারী জ্যোতিষ্ক সকলের ভবিষ্যৎ অবস্থা ও পরিবর্তনাদি বলিতে পারা যায় এবং দ্বিতীয়ত, সাধারণ মূল সূত্রগুলির সত্যাসত্যও নির্ণীত হয়। সাধারণ মূল সূত্রগুলি জানিয়া তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে গিয়াই নেপচুন (Neptune) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইউরেনস গ্রহের গতির গণনাপ্রাপ্ত স্থান হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিয়াই আডামস এবং লেভেরিয়ার (Adams and Leverier) সাহেবদ্বয় একই সময়ে কঠোর গণিত প্রক্রিয়া দ্বারা বুঝিয়াছিলেন যে, আকাশের এক নির্দিষ্ট স্থানে কোন এক অজ্ঞাত গ্রহ থাকার জন্যই ইউরেনস গ্রহের গতির উক্ত প্রকার পার্থক্য হইতেছে। তাঁহাদের এই অনুমানের সাহায্যে আকাশমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে ইহার অর্ধঘণ্টার মধ্যেই গেল সাহেব নেপচুন গ্রহ দেখিতে পান। আরো এই জ্যোতিষ্ক-কলা-শাস্ত্রের সহায়ে আমরা এমন সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছি, যাহা প্রত্যক্ষ দর্শনাদি দ্বারা কখনো জানিতে পারি নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তর যে অতি কঠিন এবং ঘন ইহা প্রত্যক্ষত জানা যায় না। উক্ত কলাশাস্ত্রের অন্তর্গত জোয়ার ভাঁটার নিয়ম, অয়নের পুরোগমনের নিয়ম (precession of equinoxes) এবং পৃথিবীর স্বীয় অক্ষের চতুর্দিকে ঘূর্ণনের নিয়ম হইতে উক্ত বিষয় যে ঠিক, তাহা জানা যাইতে পারে।

জ্যোতিষ্কি-পদার্থ-বিজ্ঞান।—স্পেক্‌ট্রোস্কোপ (Spectroscope) যন্ত্র দ্বারা জ্যোতিষান্তর্গত এই বিভাগের আবিষ্কারের অত্যাশ্চর্য ফললাভ হইয়াছে। কোন্ কোন্ দ্রব্যের রাসায়নিক সংযোগে সূর্যমণ্ডল নক্ষত্রমণ্ডলাদি গঠিত, নক্ষত্রলোক ভূতলে আসিতে কত বৎসর লাগে, নভস্থ জ্যোতিষ্মান পদার্থ সমূহের মধ্যে কোন্‌গুলি বাষ্পীয় ও কোন্‌গুলি কঠিন, উহাদের উত্তাপ কত, এইসব উক্ত পদার্থ-বিজ্ঞান হইতে জানা যায়। আরো নভস্থ জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রবিশেষের দিকে আমাদিগের সূর্য কত দ্রুত গতিতে ধাবিত বা অপসৃত হইতেছে (পিছাইয়া পড়িতেছে), তাহাও এই জ্যোতিষ্কি-পদার্থ-বিজ্ঞান হইতে জানা যায়।

জ্যোতির্বিদ্‌গণের অশেষ পরিশ্রমের ফলে যেসকল জ্যোতিষ্কি তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত রত্ন পাওয়া গিয়াছে তাহার কতকগুলি সংক্ষেপত নিম্নে লিখিত হইল ঃ

১। **গ্রহাদির গতি**।—আমাদের এই পৃথিবী প্রায় গোলাকার; ইহা স্বীয় অক্ষের চতুর্দিকে এক অহোরাত্রে একবার মাত্র পরিভ্রমণ করে এবং সূর্যের চতুর্দিকে এক বৎসরে একবার পরিভ্রমণ করে। দীর্ঘবৃত্ত-কক্ষে (Ellipse) ইহা পরিভ্রমণ করে; এই কক্ষে এক নাভিতে (Focus) সূর্য অবস্থান করে। সূর্যকেন্দ্র আর ভূকেন্দ্র যোগ করিলে যে রেখা হয়, উহা সমান সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অঙ্কিত করে। অর্থাৎ অদ্য বেলা ৯টা হইতে ১০টার ভিতর সূর্যকেন্দ্র ও ভূকেন্দ্র যোগলব্ধ রেখা দ্বারা যে ক্ষেত্রফল লাভ হয়, অন্য কোন দিনেও ঐ একঘণ্টার মধ্যে ঐরূপ করিলে ঠিক সেই ক্ষেত্রফল লাভ হইবে। অন্যান্য গ্রহের যে গতি, তাহা পৃথিবীর ন্যায়ই জানিবে; তবে উহাদের ভগন কাল (এক নক্ষত্র হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় সেই নক্ষত্র আসিতে যে সময় লাগে) ভিন্ন ভিন্ন। এই তত্ত্বগুলি হইতেই নিউটন মাধ্যাকর্ষণ বাহির করিয়া গিয়াছেন।

মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম এই যে, প্রত্যেক পরমাণু অন্য পরমাণুকে উভয়ের পরিমাণের বা ওজনের (mass) গুণফল অনুযায়ী এবং উভয়ের মধ্যের দূরত্বের বর্গফলের উৎক্রমানুযায়ী (inversely) আকর্ষণ করে। সূর্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে (Solar System) এই নিয়মের সত্যতার যত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, এত প্রমাণ আর কোন নিয়মের পাওয়া যায় নাই। শুধু সূর্য সম্প্রদায়েই যে এই নিয়মের কার্য দৃষ্ট হইতেছে তাহা নহে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও এই নিয়ম সমভাবে কার্য করিতেছে, এবিষয়ে অনেক যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যেখানে কোন পদার্থ আছে, আর উহার গতি আছে, সেইখানেই এই নিয়মের কার্য হইয়া থাকে। যদি কেহ কখনো কোথাও এই নিয়মের বিপর্যয় প্রমাণ করিতে সক্ষম হয়েন, সেই দণ্ডেই তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের ভিত্তি পর্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারিবেন।

২। **সূর্য**।—সূর্য একটি অতি বৃহৎ, অত্যুষ্ণ, গোলাকার পদার্থ। ইহার অন্তর্দেশে তরল বা তদপেক্ষা ঘন বা সম্ভবত কঠিন পদার্থ থাকিলেও, বহির্দেশ গ্যাস পদার্থের আবরণে আবৃত। গ্রহেরা স্বীয়-স্বীয় কক্ষে যেদিকে পরিভ্রমণ করে, সূর্যও সেইদিকে স্বীয় অক্ষের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। স্পেক্‌ট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে, সূর্যের নিম্নমণ্ডলে (Lower atmosphere) লৌহবাষ্প, ক্যালসিয়াম (Calcium), সোডিয়াম (Sodium)

এবং অন্যান্য ত্রিশটি পার্থিব মূলধাতুর (elements) বাষ্প আছে। এই সৌর পদার্থ এবং উহার পরিবারবর্গ-স্বরূপ গ্রহাদিতে যেসব মূলধাতু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলে খুব অনুমিত হয় যে, সূর্য ও সূর্যের পরিবারবর্গ এক বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রতিদিন সূর্য হইতে যে-প্রকার আলো এবং উত্তাপ নির্গত হইতেছে, তাহাতে সূর্যের শক্তির হ্রাস দিন দিন হইয়া আসিতেছে। যতই শক্তি সূর্যেতে সঞ্চিত থাকুক না কেন, কালে ঐ শক্তির যে সমস্ত নিঃশেষ হইবেই হইবে, তাহা বুঝিতে জ্যোতির্বিদ্‌গণের বাকি নাই। আভ্যন্তরিক পরমাণু সমূহের সঙ্কোচে এবং সূর্যে যে অসংখ্য উল্কাপাত হয়, তাহাদের সঙ্ঘর্ষে ঐ ক্ষতির কিয়ৎপরিমাণে পূরণ হইলেও, হ্রাসের তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ অতি অল্প। এই সমস্ত ব্যাপার হইতে অনুমান করা যায় যে, পুরাকালে সূর্যের পরিমাণ আরো অধিক ছিল।

৩। **নক্ষত্র**।—এক একটি নক্ষত্র এক একটি সূর্য। উহারা এত দূরে অবস্থিত যে, ছোট ছোট হীরক খণ্ডের ন্যায় দেখায়। আরো উহাদের বাস্তবিক গতিও আমাদের নিকট এতই সামান্য প্রতীত হয় যে, উহাদিগকে যেন অচল বলিয়া বোধ হয়। নক্ষত্রগুলি যে আমাদের নিকট হইতে কত অধিক দূরবর্তী, তাহা এই একটি কথা হইতেই বুঝা যাইবে যে, যে-নক্ষত্রটি আমাদের অতি নিকটবর্তী, উহা পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব অপেক্ষা ২৭৫,০০০ গুণ অধিক দূরবর্তী। অন্যান্য নক্ষত্র আরো অধিক দূরে স্থিত। এমনকি, কোন কোন নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে আসিতে শত বৎসর অতিবাহিত হয়।

আকাশ পথে যে অসংখ্য নক্ষত্র-পুঞ্জ একত্রিত দেখা যায়, উহাকে আকাশগঙ্গা বা মন্দাকিনী (Milky way) কহে। তাহারা নানা দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং এক সেকেন্ডে তাহাদিগের গতি একশত মাইলেরও অধিক। স্পেক্‌ট্রোস্কোপ দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সূর্যের মধ্যে যেসকল মূলধাতু (element) আছে, নক্ষত্র সকলের মধ্যেও তাহার অনেকগুলি বর্তমান। নক্ষত্রগুলি আমাদের সূর্যের ন্যায় পৃথক অবস্থিত নহে। প্রায়ই যুগ্মভাবে কিংবা আরো অধিক সংখ্যাতে একত্রিত থাকে, কিংবা যেসব নক্ষত্রের পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সূর্য অপেক্ষা অনেক বড় আর কতকগুলি সূর্য অপেক্ষা ছোট। সূর্য হইতে যত আলোকের উদ্গম হয়, তদপেক্ষা শত গুণ অধিক আলো অনেক নক্ষত্র হইতে উদ্গত হইতেছে।

৪। **নীহারিকা**।—ইহারা গ্যাসাত্মক পদার্থ। আকাশের চতুর্দিকে ইহারা বিক্ষিপ্ত আছে। ইহাদের আয়তন, নক্ষত্রের আয়তন অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ অধিক। ইহাদের আকার অনেক প্রকার হয়। ইহাদের কতকগুলি কোন কোন নক্ষত্রের চতুর্দিকে বায়ুমণ্ডলের ন্যায় অবস্থিত; কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ সর্পিলের (spiral) ন্যায় জড়ান জড়ান। কতকগুলি অতি ক্ষীণ ও ছিন্ন ভিন্ন এবং কতকগুলি লম্বা লম্বা, রুক্ষ দাগের ন্যায় প্রতীত হয়।

৫। **জ্যোতিষ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ বা অতিবৃদ্ধি মত**।—আজকাল অনেকের বিশ্বাস যে, একটি নীহারিকা, সম্ভবত একটি সর্পিল নীহারিকা হইতে সূর্য সম্প্রদায়ের বিকাশ হইয়াছে। এই মত এখনো সাব্যস্ত হয় নাই; তবে বুদ্ধি

এবং কল্পনা, এই মত পোষণার্থে সর্বত্র প্রযুক্ত হইতেছে। এই মত স্থাপনার্থ এমন অনেক অদ্ভুত ঘটনার অনুমান ও কল্পনা করা হইয়াছে যে, তাহাদের তুলনায়, একটি মহাদ্বীপের (Continent) সৃষ্টি একটি সামান্য ঘটনা মাত্র। তত্ত্বান্বেষিগণ দেশকালের বাধা একেবারে না মানিয়া অতি সাহসের সহিত অনুমান পক্ষ সহায়ে, জগতের মূল তত্ত্বের অন্বেষণে ধাবমান হইয়াছেন। নীহারিকা হইতে যে সূর্য সম্প্রদায়ই কেবলমাত্র হইয়াছে, তাহা নহে; যাবতীয় নভঃ পদার্থ এই নীহারিকা হইতে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে, কেমন করিয়া নীহারিকাবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থার বিকাশ হইয়াছে এবং কোটি বৎসর পরে কি অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহারও নিশ্চয় করিয়া বলিবার প্রয়াস হইতেছে।

অবশ্য এই বিষয় অতি জটিল এবং গুরুতর, কিন্তু আরেক দিক দিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, একবার যদি কোনরূপে ঐ মত প্রমাণিত হয়, তবে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির মীমাংসা সরল হইয়া যাইবে। কারণ, তখন বুঝা যাইবে যে, একই আকার এবং একই পদার্থ হইতে দৃষ্টিগোচর যাবতীয় আকার ও পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। যাবতীয় পদার্থের বিশেষ আলোচনা দ্বারা উক্ত মতের সত্যতা যতই স্থিরীকৃত হইবে, ততই সূর্যমণ্ডল, সূর্যসম্প্রদায়, নক্ষত্রমণ্ডল এবং নীহারিকা সমস্তই এক পদার্থের বিকাশ বলিয়া প্রমাণিত হইয়া, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর প্রতিধ্বনি করিতে থাকিবে।

৬। **জ্যোতিষ শাস্ত্র আমাদের কি কাজে লাগে?**—বর্তমান সময়ে অনেকের ধারণা যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্র আমাদের কোন কাজেই লাগে না। এই ধারণা বিষম ভুল; প্রতিদিন যে আমাদের সময় নিরূপিত হয়, তাহা এই জ্যোতিষ শাস্ত্রের ফলে। এই সময়ের নিরূপণ না হইলে রেলগাড়ি নিরাপদে চালান যায় না; সমুদ্রে জাহাজ নিরাপদে যাইতে পারে না। প্রদেশের সীমা ঠিক ঠিক চিহ্নিত করিতে পারা যায় না; এমনকি, ইহার সাহায্য ব্যতীত গতিবিজ্ঞান (Dynamics) শাস্ত্রের মূল নিয়মগুলিও উদ্ভাবিত হইত না। জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের বৃদ্ধি—ইহার আরেকটি সুফল। পূর্বে লোকের জ্ঞান যে অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা এই জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায়ই, বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনদিগের মতে পৃথিবী একটি সমতল চেপ্টা জিনিস এবং সূর্যসম্প্রদায়ের কেন্দ্রে এই পৃথিবী অচলভাবে অবস্থিত; সূর্য যেন একটি চকচকে ধাতু পাত্র। বর্তমান ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। হিপার্কস, টালেমি, টাইকোব্রাহী, কোপারনিকাস, কেপলার এবং নিউটন ইত্যাদি মহাত্মাদিগের অধ্যবসায়ে, আমাদের ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধীয় জ্ঞান এতদূর পরিবর্তিত ও বৃদ্ধি হইয়াছে।* □

* ১০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা

কোন্ পাঁজি মেনে চলব?

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনধারায় পঞ্জিকার ব্যবহার যে অপরিহার্য, সেকথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কী সামাজিক জীবন, কী ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান, সব কাজেই মানুষের পঞ্জিকা ছাড়া চলে না। যাঁরা স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবহার পদে পদে মেনে চলেন, তাঁদের তাগিদ তো আরো বেশি। তাছাড়া ফলিত জ্যোতিষে আস্থা আছে এমন মানুষ ও গনৎকার-জ্যোতিষীর কাছে পঞ্জিকা এক মহামূল্যবান পুস্তিকা। আজকাল অনেক রাজনীতিবিদ্‌কেও দেখা যায় পঞ্জিকার দেওয়া শুভাশুভ সময় মেনে চলতে। এমন কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন যাঁরা ধর্মানুষ্ঠানাদির জন্য শুভাশুভ সময় বা দিন ইত্যাদির ধার ধারেন না, তঁাদের কাছে অবশ্য এই পঞ্জিকার কোন মূল্যই নেই—তবে আমাদের দেশে এখনো এমন মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাছাড়া একথা ভুললে চলবে না যে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই পঞ্জিকা শুধু বৈষয়িক ও ধর্মীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও পঞ্জিকা অপরিহার্য—কেন না পঞ্জিকার দেওয়া পূজা পার্বণের তারিখ অনুযায়ী সরকারকে কতকগুলো ছুটি আগের থেকে ঘোষণা করতে হয়। তাই, পঞ্জিকার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো জাতির ধর্ম ও সামাজিক জীবনকে অপ্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু যেসব তথ্যাদির ওপর নির্ভর করে পঞ্জিকা তৈরি হচ্ছে, তা কি নির্ভুল এবং শাস্ত্রসম্মত? এই বিষয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার দিন এসেছে।

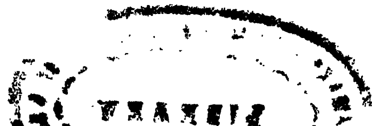
একেবারে সৃষ্টির প্রথমে আদিম মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন—(১) দিনের আকাশে সূর্যের অবস্থান, সূর্য অস্ত গেলে রাতের আবির্ভাব, এবং রাত্রের আকাশে চন্দ্র ও নক্ষত্রের অবস্থান। এইভাবে দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিনের আবির্ভাব। (২) চন্দ্র আকাশে ক্ষয় হতে হতে একেবারে লুপ্ত হলো, তার মানে অমাবস্যা। তারপর একটু একটু করে বড় হতে হতে আবার পূর্ণচন্দ্রের আকার নিল, তার মানে পূর্ণিমা—এইভাবে অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, আবার পূর্ণিমার পর অমাবস্যা। (৩) সূর্যের একটা বার্ষিক গতি প্রতীয়মান হয়, আর তারই দরুন ঋতুর পর ঋতু অতিক্রম করে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে সূর্য একই জায়গায় ফিরে আসে। এই তিনটির ওপর ভিত্তি করেই ক্রমশ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে—সময়কে মাপব কেমন করে? এর জন্যে তো একটা মাপকাঠি দরকার। সত্যি বলতে কি, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের একেবারে গোড়ার কথা। কাল নিরবধি চলেছে। তাকে মাপবার জন্যে মানুষ অনেকগুলি মাপকাঠি তৈরি করল। আকাশে যে-তিনটি মূল ব্যাপার লক্ষ্য করার কথা

বলা হলো, তারই ওপর ভিত্তি করে আগের কালের জ্যোতির্বিদ্‌রা আমাদের দেশে পঞ্জিকা প্রণয়ন করেছিলেন। তাই পঞ্জিকার মাধ্যমেই আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের কাছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিচয় শুরু হয়।

পঞ্জিকা প্রণয়নের তাগিদ আগেকার মানুষের মনে আরেকটা বিশেষ কারণেও এসেছিল। অনেক আগে থেকেই প্রাচীন মানুষের নজরে এসেছিল যে, কৃষি নির্ভর করে বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন জলবায়ুর ওপর। আর তার সঙ্গেই গড়ে ওঠে মানুষের নানারকম পর্ব ও ধর্মানুষ্ঠান, যেগুলো সংস্কৃতির উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করে। মানুষ আগের থেকেই জানতে উৎসুক হলো, অমাবস্যা কবে হবে, পূর্ণিমা কবে হবে—তার কারণ প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানগুলো ঐসব কোন-না-কোন দিনের সঙ্গেই বেশির ভাগ জড়িয়ে থাকত। তারা জানতে চাইত, বর্ষা শুরু হওয়ার আর কতদিন বাকি, শীতের প্রকোপ কতদিন পরে পড়বে, কখন বীজবপন করতে হবে, কখন শস্য কাটতে হবে—এইসব নানারকম জিজ্ঞাসার তাগিদেই প্রাচীন মানুষের মনে বোধহয় পঞ্জিকা প্রণয়নের একটি পরিকল্পনা দেখা দেয়।

এখন কথা হলো, পঞ্জিকা নামটি এল কেমন করে? পঞ্জিকা নামটি এসেছে পঞ্চাঙ্গ থেকে। পঞ্চাঙ্গ মানে হলো এইসব পুস্তিকার পাঁচটি প্রধান অঙ্গ, যেমন—বার, তিথি, নক্ষত্র, করণ ও যোগ। এছাড়া আমাদের দেশের প্রচলিত পঞ্জিকায় দেওয়া থাকে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহের অবস্থান, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ বিষয়ক তথ্য প্রভৃতি। আর দেওয়া থাকে এইসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে গণনা-করা—বিবাহ, উপনয়ন ও নানান পূজাপার্বণের তারিখ ও সময়।

এখন পাঁচটি প্রধান অঙ্গের সঙ্গে পরিচয় করানো যাক। প্রথমেই হলো বার। পঞ্জিকার কোন তারিখ খুললেই সেটি কি বার অর্থাৎ সোমবার থেকে রবিবারের মধ্যে কোন্‌টি তা দেওয়া থাকে। এরপরেই আসে তিথি। তিথির জায়গায় সেই তারিখে লেখা থাকে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ অথবা কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া ইত্যাদির কতক্ষণ পর্যন্ত সময়। তিথি কী? সূর্যের সঙ্গে সংযোগের হিসেবে চান্দ্রমাসের গড় মান হলো ২৯.৫৩ দিন। এখন চান্দ্রমাস কাকে বলা হয়? এক অমাবস্যা থেকে ঠিক পরের অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কে সাধারণত এক চান্দ্রমাস বলা হয়। চান্দ্রমাসের নাম কিভাবে দেওয়া হয়? আমরা জানি ১২টি সৌরমাস, যেমন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ইত্যাদি। এখন সৌর বৈশাখ মাসের মধ্যে সাধারণত কোন-না-কোন দিনে অমাবস্যা পড়বে, সেই অমাবস্যা থেকে যে-চান্দ্রমাস শুরু হবে তার নাম হবে চান্দ্র বৈশাখ। এইরকম করে ১২টি চান্দ্রমাস পাওয়া যায়। এই চান্দ্রমাসের গড় মান ২৯.৫৩ দিনকে একটা পুরো সংখ্যা ৩০ ধরা হয়, আর এই চান্দ্রমাসকে যদি ৩০টা সমান অংশে ভাগ করা যায়, তাহলে এরই এক একটা অংশ হলো তিথি। তার মানে তিথিকে বলা যেতে পারে চান্দ্রদিন। অমাবস্যাকে আদি তিথি হিসেবে ধরা হয়, যখন চন্দ্র ও সূর্যের একত্র অবস্থান হয়। তারপরই শুরু হয় শুক্লপক্ষের প্রতিপদ। চন্দ্র সূর্যের সাপেক্ষে ১২ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করলেই প্রতিপদের শেষ এবং শুক্লা দ্বিতীয়া তিথির আরম্ভ। এইরকম করে একটি



চান্দ্রমাসে ৩০টি তিথি হয়—১৫টি শুক্লপক্ষীয় আর ১৫টি কৃষ্ণপক্ষীয়। তিথি কোন তারিখের যেকোন সময়ে শুরু হতে পারে, দিনে অথবা রাত্রিতে। সাধারণত হিন্দু পঞ্জিকার যেকোন তারিখে সূর্যোদয়ের সময় যে-তিথি চলছে সেইটাই সেই সৌরদিনের তিথি বলে গণ্য হবে। তিথির মান ২০ ঘণ্টা থেকে প্রায় ২৭ ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। তার কারণ হলো চন্দ্রের জটিল গতি—চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এক কক্ষপথে ঘুরে চলেছে, কিন্তু সেই কক্ষপথে তার গতি সব জায়গায় সমান নয়, কখনো ধীরে কখনো জোরে—আর সেইজন্যেই তিথির মানের এত তফাত। পঞ্জিকাতে যেসব তথ্য দেওয়া থাকে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তিথি, এবং তারপরেই নক্ষত্র।

যেকোন তারিখে নক্ষত্র স্থানে লেখা থাকে সেই তারিখে অশ্বিনী, ভরণী অথবা কৃত্তিকা ইত্যাদি নক্ষত্র কত সময় পর্যন্ত থাকবে। এখন নক্ষত্র বলতে কী বুঝব? মূলত ২৭ দিনে চন্দ্র রাশিচক্রের (প্রকৃতপক্ষে চান্দ্র মার্গের) ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে আসে। এই চান্দ্ররাশিচক্রকে সমান ২৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রত্যেকের ব্যবধান হলো ১৩ ডিগ্রি ২০ মিনিট। এই চান্দ্ররাশিচক্রের এক একটি ভাগকে এক একটি নক্ষত্র বলা হয়। প্রতি নক্ষত্রের প্রধান উজ্জ্বল তারাকে 'যোগতারা' বলা হয় এবং এই যোগতারার নাম অনুসারেই সেই নক্ষত্রের নামকরণ। এইভাবে ২৭টি নক্ষত্র। কোন্ দিন কোন্ নক্ষত্র বললে বুঝতে হবে চন্দ্রের অবস্থান সেই দিন কোন নক্ষত্রের ১৩ ডিগ্রি ২০ মিনিট সীমানার মধ্যে।

এরপর আসে করণ। করণ হলো তিথির অর্ধাংশ। যেকোন তিথির প্রথম অর্ধাংশ একটি করণ, আর দ্বিতীয় অর্ধাংশ অন্য একটি করণ। তাই একটি চান্দ্রমাসের ৩০টি তিথিতে ৬০টি করণ—এগুলোর আলাদা আলাদা নাম নেই। মোট ১১টি নাম আছে। এর মধ্যে ৭টি সাধারণ, যেমন, বব, বালব, কৌলব ইত্যাদি, আর বাকি ৪টি করণের নাম হলো শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিন্তুঘ্ন। এই চারটি বিশেষ বিশেষ তিথির বিশেষ বিশেষ অর্ধাংশে প্রযোজ্য। কৃষ্ণ চতুর্দশীতে একটি, অমাবস্যায় দুটি এবং শুক্ল প্রতিপদের প্রত্যেকটিতে একটি বিশেষ করণ আছে—বাকি ৫৬টি করণ প্রথম ৭টি সাধারণ করণের পৌনঃপুনিক ক্রম মাত্র।

পঞ্জিকার শেষের অঙ্গটি হলো যোগ। সূর্য ও চন্দ্র দুইয়ের নিরয়ন স্ফুট (Longitude) যা দেওয়া থাকে তাদের যোগফলকে ১৩$^১/_৩$ দিয়ে ভাগ করলে যা বাকি থাকবে তাই যোগ। যোগ মোট ২৭টি, যেমন—বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান, সৌভাগ্য ইত্যাদি। পঞ্জিকাতে তারিখ অনুযায়ী প্রত্যেক দিন তিথি নক্ষত্রের মতো যোগেরও অন্তকাল থাকে।

পঞ্জিকার মূল পাঁচটি অঙ্গ সম্পর্কে যে-পরিচয় দেওয়া হলো তা থেকে একটা কথা বুঝতে কারো বিশেষ অসুবিধা হবে না যে, এই পুস্তিকার মূল তথ্যাদি গণনার ভিত্তি হলো জ্যোতির্বিজ্ঞান। তাছাড়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়, চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্তের সময়, সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগুলির দৈনন্দিন আকাশে অবস্থান এবং গ্রহণের সমস্ত তথ্যাদির গণনাও নির্ভর করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলীর ওপরে। আর এটাও জেনে রাখা দরকার যে, আমাদের সমস্ত

উৎসব ও পূজাপার্বণের তারিখ ও সময় যা পঞ্জিকাতে দেওয়া থাকে তার গণনা একান্তভাবে নির্ভর করে তিথি, নক্ষত্র ও যোগের অন্তকালের ওপর। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিথি, নক্ষত্র, যোগ প্রভৃতির গণনা ভূ-কেন্দ্রিক ভিত্তিতে হয়ে থাকে—তার অর্থ হলো এইসব তথ্য গণনার সময় মহাকাশের পটভূমিকায় আমাদের পৃথিবীকে একটা বিন্দু বলে পরিগণিত করা হয়। এর ফলে তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ গণনা করে যে সময় পাওয়া যায়, সেগুলো পৃথিবীর ওপরে অবস্থিত সমস্ত স্থানের পক্ষেই প্রযোজ্য অর্থাৎ কলকাতা, দিল্লি, মস্কো অথবা টোকিও, সমস্ত শহরের জন্যেই ঐ একই সময় নির্দিষ্ট হবে। কিন্তু কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন পঞ্জিকায় দেওয়া তিথির সময়ের পার্থক্য তাহলে কেন? এরকম তো হওয়ার কথা নয়। বর্তমানে এর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন আছে।

আমাদের দেশে বর্তমানে দুরকম পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে—দৃক্‌সিদ্ধ এবং অদৃক্‌সিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে বহুল প্রচলিত পঞ্জিকা বলতে গেলে দুটি—গুপ্তপ্রেস এবং পি.এম. বাগচী। এই দুই পঞ্জিকাই অদৃক্‌সিদ্ধ বা প্রাচীনপন্থী। ভারত সরকারের 'রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ'কে (বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পঞ্জিকা) বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত একমাত্র দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা হলো বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা। এখন, এই দুরকম পঞ্জিকার মধ্যে কোন্‌টি বিজ্ঞানভিত্তিক তা ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

তাহলে দেখা দরকার, দুরকম পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতি কার কিরকম। অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার গণনার ভিত্তি হলো 'সূর্যসিদ্ধান্ত' গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি আনুমানিক ৪০০ খ্রীস্টাব্দে এই ভারতেই রচিত হয়েছিল। যে প্রাচীন সময়ে সূর্যসিদ্ধান্ত রচিত হয়েছিল তখন দূরবীনের আবিষ্কার হয়নি (দূরবীন এসেছে সপ্তদশ শতাব্দীতে), মানমন্দির বলে বিশেষ কিছু গড়ে ওঠেনি—তাই তখনকার ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌রা যা রচনা করেছিলেন তা আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। ৫০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থটিকেই ভারতে পঞ্জিকা গণনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে এদেশে জ্যোতির্বিদ্যার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। বিশেষ করে ভাস্করাচার্য ১২ শতকে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে যখন দেখা গেল যে, সূর্যসিদ্ধান্তের গণনা মহাকাশের গ্রহের অবস্থান আর ঠিকমত নির্ণয় করতে সক্ষম হচ্ছে না, তখন সারা ভারতে আবার নতুন করে সূর্যসিদ্ধান্তের সূত্রাবলীর ওপর ভিত্তি করে এক নতুন সারণী (table) তৈরি করে, এতে কিছু সংস্কার করা হয়। বাংলাদেশে রাঘবানন্দ চক্রবর্তী নামে এক গণিতবিদ্ সূর্যসিদ্ধান্তের গ্রহ-গতিতে কিছু বীজ (correction) প্রয়োগ করে এক সারণীগ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থ অনুসারেই পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রচলিত অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাগুলির গণনা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাগুলির অশুদ্ধ গণনার কারণ এই যে, ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে এদেশে যে পঞ্জিকা সংস্কার করা হয় তারপরে এদিকে সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের সূত্রাবলীর সংস্কারে আর কেউই নজর দেননি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে এইসকল পঞ্জিকাকারের ব্যবহৃত সূত্রাবলী বহুলাংশে ভ্রমপূর্ণ। তাছাড়া সূর্যসিদ্ধান্ত

গ্রন্থে অয়নচলনের (Precession of equinoxes) কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে অয়নচলনের আবিষ্কার মহাকাশে গ্রহগুলির অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্ণয় করার ব্যাপারে একটা বিরাট পদক্ষেপ। তাই বর্তমানে সূর্যসিদ্ধান্তের সূত্রাবলী দিয়ে গ্রহ অবস্থান গণনা করলে তা আকাশের প্রকৃত গ্রহ অবস্থানের সঙ্গে আদৌ মিলতে পারে না, যথেষ্ট পার্থক্য হয়। প্রতি বৎসর এই পার্থক্য বেড়েই চলেছে।

এই হলো অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতি। তাহলে দৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতিই বা কেমন, সে সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। সারা বিশ্বে মাত্র আটটি দেশ থেকে অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইফেমারিস (Astronomical Ephemeris) প্রকাশিত হয়ে থাকে—ভারত এদের অন্যতম। এইরকম গ্রন্থে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলির দৈনন্দিন অবস্থান সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলী অনুযায়ী ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে গণনা করা হয়। সারা বিশ্বে যত মানমন্দির (Observatory) আছে, সেইসব মানমন্দির থেকে দূরবীন দিয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতিষ্কদের গাণিতিক অবস্থান মিলিয়ে দেখা হয়। যদি কখনো কোন গ্রহের ক্ষেত্রে, গাণিতিক অবস্থানের সঙ্গে নিরীক্ষিত (Observed) অবস্থানের কোন পার্থক্য দেখা যায়, তখন কেন এই পার্থক্য হলো সে-সম্বন্ধে গবেষণা শুরু হয়ে যায় এবং প্রয়োজনে প্রচলিত গণনার সূত্রাবলীর সংস্কার করা হয়। এর জন্যে রয়েছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা—ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিয়ন (International Astronomical Union)। এই ইউনিয়নের কাছে বিশ্বের যেকোন মানমন্দির থেকে এই ব্যাপারে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলে সেটা জানানো হয়। তখন প্রচলিত সূত্রাবলীর কোথায় কতটুকু সংস্কার করতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে থাকে এই ইউনিয়ন। তাছাড়া আটটি দেশের ইফেমারিস সেন্টার, যেখানে এইসব গণনার কাজ করা হয়, তার প্রত্যেক কেন্দ্রেই একই সূত্রাবলীর সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এইসব তথ্যাদি কম্পিউটার যন্ত্রে গণিত হয়ে থাকে বলে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য বা ভ্রান্তি থাকে না। দৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকা সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলির অবস্থান সম্পর্কে তথ্য এবং আরো নানারকম প্রয়োজনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্যাদি এইসব অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইফেমারিস গ্রন্থ থেকে নিয়ে থাকেন। তাই দৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকার তথ্যাদি সম্পূর্ণ জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক।

আগেই বলা হয়েছে যে, পঞ্জিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো তিথি। অদৃক্সিদ্ধ বা সাধারণ পঞ্জিকায় যে, তিথি নক্ষত্রের সময় দেওয়া থাকে তাতে ৫-৬ ঘণ্টা পর্যন্ত ভুল হয়ে যাচ্ছে এবং গ্রহস্ফুটে অর্থাৎ গ্রহ অবস্থানে ১১ ডিগ্রি পর্যন্ত পার্থক্য নজরে পড়ছে। এসম্বন্ধে অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকার পণ্ডিতদের একটিই বক্তব্য—সেটা হলো 'বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়'—এর মানে হলো তিথি বৃদ্ধি ৬৫ দণ্ডের অধিক হবে না, আর তিথি হ্রাস ৫৪ দণ্ডের কম হবে না। বর্তমান বিজ্ঞানভিত্তিক গণনায় দেখা যায় যে, তিথির সময়ের সীমা বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ের সংজ্ঞা মেনে চলতে পারে না। এখানে একটা কথা ভেবে দেখুন যে, পূর্ণিমা তিথির সময় সারা পৃথিবীর সমস্ত স্থান থেকে একরকমই তো হবে, তার মধ্যে

পার্থক্য থাকবে কেন? অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার পণ্ডিতদের কাছ থেকে এ-কথাটির যুক্তিযুক্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

আজকের দিনে শুধুমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির সুযোগ নিয়ে যখন পৃথিবী থেকে প্রক্ষিপ্ত বস্তুকে চন্দ্রপৃষ্ঠের বিশেষ স্থানে সংস্থাপিত করা সম্ভবপর হয়েছে, ২০০ ইঞ্চি দূরবীন দিয়ে নিরীক্ষণ করার সুযোগ এসেছে, তখন ভুল গণনা পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গণনা না করার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে? এটা একটা জিজ্ঞাসা। অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার পণ্ডিতদের আরেকটি কথা—পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলী দিয়ে তিথিনক্ষত্র গণনা করলে হিন্দুর ধর্মকর্ম একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। বিজ্ঞান কি কখনো কোন দেশ বা কোন মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে? একথা এখানে উল্লেখ করার একটা কারণ আছে। সমস্ত অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাকে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ-সম্পর্কিত গণনার তথ্যাদির জন্য নির্ভর করতে হয় পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিজ্ঞান-সূত্রাবলীর ওপর। অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকায় সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানের ভিত্তিতে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের যে সময় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে প্রকৃত সময়ের বিস্তর ব্যবধান ঘটে। এখন সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কখন লাগবে বা কখন ছাড়বে তার সময় যদি পঞ্জিকায় ভুল প্রকাশিত হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে ও নিজের ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করে সহজেই গলদটি ধরে ফেলতে পারবেন। তিথি বা নক্ষত্রের সময় যা দেওয়া থাকে তা তো আকাশের দিকে তাকিয়ে বোঝা যাবে না যে শুদ্ধ হলো বা অশুদ্ধ হলো!

একমাত্র গ্রহণের সময় দিয়েই পঞ্জিকার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করা যায়। সেইজন্যে বোধহয় প্রচলিত অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার পণ্ডিতরা তাঁদের পঞ্জিকার অন্যান্য অংশে যথাপূর্ব সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণনার তথ্য লিপিবদ্ধ করে, মাত্র গ্রহণ-অংশটি আধুনিক অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইফেমারিস গ্রন্থ থেকে নিয়ে থাকেন। গ্রহণ-গণনার বেলায় আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলী, আর তিথিনক্ষত্র গণনার ক্ষেত্রে প্রাচীন আমলের সূর্যসিদ্ধান্তের সূত্রাবলী—এ কেমন শাস্ত্রসম্মত বিধি? তাছাড়া সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে কোথাও বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ের উল্লেখ নেই; আর প্রাচীন শাস্ত্রকাররা কোথাও লেখেননি যে, দৃক্‌সিদ্ধমত অগ্রাহ্য। তবুও এমন চলছে কেন? এটা এক বিরাট প্রশ্ন।

আরেকটা জিনিস এই পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্য করার মতো যে, বেশকিছু সুশিক্ষিত মানুষও এই অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাই বংশপরম্পরা ব্যবহার করে চলেছেন। এটা ঠিক যে সাধারণ পুরোহিতদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বা এবিষয়ে তেমন আলোকপ্রাপ্ত নন, আর তাই তাঁদের নির্দেশমতই শিক্ষিত মানুষও আমাদের সমাজে আজও অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা ব্যবহার করে চলেছেন। কিন্তু এরকম হবে কেন? কিছু একটা বহুদিন ধরে চলে আসলেই কি তা ন্যায্য হতে পারে? এটা অবশ্য ঠিক যে, লোকে যে-পঞ্জিকা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তার রদবদল করতে বিচলিত হয়—কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিতরের যথার্থ ভ্রমটুকু জানার পর অন্তত সুশিক্ষিত লোকের কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে সেই ভ্রম সংশোধনের। বলা যেতে পারে সতীদাহ প্রথাও অনেকদিন এদেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু রাজা রামমোহনের চেষ্টায় এই

অভিশাপ সমাজের বুক থেকে আস্তে আস্তে দূরীভূত হওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। এব্যাপারে আরেকটা জিনিস ভেবে দেখার মতো। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ওপর আমাদের দেশের হিন্দুসমাজের অধিকাংশ মানুষের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা আজও অটুট আছে এবং সেই হিসেবে রামকৃষ্ণ মিশনের ওপরও যথেষ্ট আস্থা আছে। রামকৃষ্ণ মিশন তো তাঁদের পূজাপার্বণের জন্যে অনেকদিন আগে থেকেই অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা বর্জন করে দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা গ্রহণ করে ফেলেছেন। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে একমাস অন্তর দুবার দুর্গাপুজোর কথা অনেকেরই নিশ্চয় এখনো মনে আছে। রামকৃষ্ণ মিশন দৃক্‌সিদ্ধ মতে যথারীতি দুর্গাপুজো করেছিলেন এবং বেলুড় মঠে লাখ লাখ মানুষের ভিড় হয়েছিল সে পুজো দেখার জন্যে। তবে কেন আমরা পারব না? এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিশ্চয়ই যেতে পারে। পুরোহিতদের কাছে নিবেদন যে, তাঁরা যেন ভেবে দেখেন আমাদের পঞ্জিকার নির্দেশগুলি তখনই শাস্ত্রসম্মত হয়ে উঠবে—যখন তার ভিত্তি হবে শুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য। সাধারণ বয়স্ক মানুষ যাঁরা অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা বহুদিন ধরে ব্যবহার করে আসছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ যে অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার ভ্রমপূর্ণ তথ্যের পূর্ণ আলেখ্যটি পাওয়ার পরে তাঁরা কোন্ পঞ্জিকা অনুসরণ করে চলবেন তা যেন ভালভাবে ভেবে দেখেন। সবশেষে আমার অভিমত হলো—পঞ্জিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য গণনার ভার সম্পূর্ণরূপে এদেশের বিজ্ঞানীদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক, আর পঞ্জিকা-পণ্ডিতরা সেই বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য নির্ভর করে পঞ্জিকার ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও পূজাপার্বণের তারিখ ও সময় নির্দেশ করার ভারটুকু গ্রহণ করুন! তাহলেই সবদিক থেকে মঙ্গল হবে।

একদিন জগদ্বিখ্যাত বাঙালী বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা পঞ্জিকায় অশুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য প্রকাশনা বন্ধ করার জন্যে যে আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করে গিয়েছিলেন, শুধুমাত্র দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ নিশ্চয়ই করতে পারেন। বঙ্গাব্দের হিসেবে এই নববর্ষে আমরা একটা কাজ করতে পারি—পঞ্জিকাকারদের বলতে পারি, ভারত সরকারের পজিসন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টার থেকে যে নির্ভুল জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে, তাই কাজে লাগান। আর সাধারণ মানুষকে বলতে পারি—আপনারা দাবি করুন যে, পঞ্জিকায় প্রকাশিত তিথি, নক্ষত্রের তথ্য যেন সম্পূর্ণ নির্ভুল হয়। যিনি যে মতাবলম্বীই হোন না কেন, ভুল তথ্য কারো কোন যথার্থ উপকারে আসতে পারে না।* □

* ৮৮ বর্ষ, ৫ সংখ্যা

বিজ্ঞানমনস্কতা, ভগবদ্বিশ্বাস ও কুসংস্কার

বিশ্বরঞ্জন নাগ

বিজ্ঞানমনস্কতা, ভগবদ্বিশ্বাস ও কুসংস্কার—এই তিনটি বিষয় নিয়ে সম্প্রতি বিভিন্ন স্তরে আলোচনা হচ্ছে। অনেকের মতে বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি ভগবানে বিশ্বাস করতে পারেন না। যেবিষয় পরীক্ষায় ধরা পড়ে না, বিজ্ঞানীর নিকট সেবিষয়ের অস্তিত্ব নেই। এধরনের অস্তিত্বহীন বিষয় যিনি মেনে নেবেন, তাঁকে বিজ্ঞানমনস্ক বলা যাবে না। এই যুক্তিতে এঁরা আইনস্টাইনকেও সত্যিকারের বিজ্ঞানমনস্ক বলে স্বীকৃতি দিতে রাজি নন, কেননা আইনস্টাইনও ভগবানের কথা বলেছেন। বিজ্ঞানমনস্কতার এই সংজ্ঞা মেনে নিলে আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা বহু বিজ্ঞানীকেই আর বিজ্ঞানমনস্ক বলা যাবে না। আইনস্টাইন যেমন ভগবানের কথা বলেছেন, তেমনি টাইকো ব্রাহে (Ticho Brahe), কোপারনিকাস, কেপলার (Keplar), গ্যালিলিও—এঁরাও ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তী কালের ডালটন (Dalton) একজন নিয়মনিষ্ঠ খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। লাপ্লাস (Laplace), নিউটন—এঁরাও ভগবান আছেন মনে করতেন। এমনকি এঁরা মনে করতেন যে, ভগবানের সৃষ্টি বলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ম মেনে চলছে। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো ভগবানের তৈরি সেই নিয়মগুলি আবিষ্কার করা।

বিজ্ঞানমনস্কতা ও ভগবদ্বিশ্বাসের তথাকথিত বিরোধ স্বীকার করে নিলে আমাদের দেশে শতকরা নব্বই ভাগ লোকের বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের রাষ্ট্রপতিরা কুম্ভস্নান করেন, দেশনেতারা সাগরমেলায় যান, কট্টর কম্যুনিস্ট নেতারা পূজাকমিটির সদস্য এমনকি প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন, তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা কালীমন্দিরে-শিবমন্দিরে গিয়ে পূজা দেন। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই পূজামণ্ডপে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন। সরস্বতীপূজা আমাদের ছাত্রজীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আবার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও তাঁদের ধর্মীয় আচরণ পালন করেন।

মুষ্টিমেয় তথাকথিত যুক্তিবাদীরা বলেন, তাঁরা কোন ধর্মকে মানেন না। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় এবং আনুষঙ্গিক আচরণকে নিন্দা করাই তাঁদের যুক্তিবাদিতার পরিচায়ক বলে তাঁরা মনে করেন। এঁদের বিজ্ঞানমনস্কতার ধারণাকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এঁরা একটি বিশেষ দর্শনে বিশ্বাস করেন এবং সেই দর্শনের ভিত্তিতে এঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন—বিজ্ঞানমনস্ক হতে হলে ভগবানে বিশ্বাস করা চলবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ সত্য বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশেষ কোন দর্শনকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানে সিদ্ধান্ত করলে সে-সিদ্ধান্তের ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। প্লেটোর বিজ্ঞান ছিল দর্শনভিত্তিক; তৎকালীন দর্শনকে ভিত্তি করেই পত্তন হয়েছিল পৃথিবীকেন্দ্রিক মতবাদের। এই 'বৈজ্ঞানিক' ভুল তত্ত্বকে সরিয়ে সৌরকেন্দ্রিক সঠিক তত্ত্বকে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের বহু কষ্ট সহ্য করতে

হয়েছিল। গ্যালিলিওর জীবন তো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। অতি আধুনিক কালেও দেখা গেছে, বিশেষ দর্শনকে ভিত্তি করে কৃষিবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে সরকার মেনে নেওয়ায় একটা গোটা দেশের কৃষিব্যবস্থায় বিপর্যয় এসেছিল। একথা অনস্বীকার্য যে, দর্শন বিজ্ঞানের ভিত্তি হওয়া উচিত নয়। বিজ্ঞানই সঠিক দর্শনের ভিত্তি হওয়া উচিত। বিজ্ঞানমনস্কতা ও ভগবদ্বিশ্বাসের তথাকথিত দ্বন্দ্ব সম্পর্কেও আমাদের বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে প্রথমে বিজ্ঞানমনস্কতার সংজ্ঞা ঠিক করে নিতে হবে। সে-সংজ্ঞা হবে—বিজ্ঞানমনস্কতা সেই মনোভাব, যে-মনোভাবকে আশ্রয় করে বিজ্ঞানী বিজ্ঞানচর্চায় সফল হন। সফলতা পেতে হলে বিজ্ঞানীকে একটি নির্দিষ্ট ধারায় কাজ করতে হয়। প্রথম ধাপ হলো, কোন ঘটনার আভাস পেলে ঘটনাটির সত্যাসত্য নির্ণয়। বারবার পরীক্ষা করে বিজ্ঞানী নিশ্চিত হবেন যে, ঘটনাটি সত্যিই ঘটে। দ্বিতীয় ধাপে, বিজ্ঞানী ঘটনাটি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। তাঁর যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপজোকের চেষ্টা করবেন। কি অবস্থায় ঘটনাটি ঘটে সে-ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হবেন। অনেক সময়ে পর্যবেক্ষণের ভুলে পরবর্তী সিদ্ধান্তও ভুল হয়েছে। তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিশ্চিতভাবে জেনেই পরীক্ষাটির ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে হয়। তৃতীয় ধাপে, বিজ্ঞানী চেষ্টা করেন তাঁর জানা তথ্যাদি দিয়ে ঘটনাটির কার্য-কারণ বোঝার। এইসময়ে বিজ্ঞানী নানারকম অনুমান বা hypothesis করেন। অনেক সময়ে অজানা নতুন তথ্যাদিও বিজ্ঞানী প্রারম্ভিক অনুমান (initial hypothesis) হিসাবে ধরে নিতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞানীর অনুমানভিত্তিক ব্যাখ্যা যতই যুক্তিগ্রাহ্য হোক, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিজ্ঞানীকে পরীক্ষার কথা ভাবতে হবে। তাঁর অনুমানের ভিত্তিতে সব জানা ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে হবে। বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত তত্ত্বটি আরো প্রতিষ্ঠালাভ করে যদি এমন হয় যে, তিনি তাঁর তত্ত্বের ভিত্তিতে এমন কোন প্রাকৃতিক ঘটনার অনুমান (prediction) করলেন যেটি তখনো অজানা; কিন্তু ভবিষ্যৎকালে সেটি আবিষ্কৃত হয়ে তাঁর তত্ত্বের আরো একটি উদাহরণস্থল হয়ে দাঁড়াল: নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব, ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ তত্ত্ব, বোরের কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আধুনিক কালের সালাম-ওয়াইনবার্গের দুর্বল আকর্ষণের (Weak inter-action) তত্ত্ব এই ধারাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব অনেক ঘটনাই বিজ্ঞানের চোখে সম্ভব ও সত্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। গ্রহ-নক্ষত্র আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য হলো—নক্ষত্ররা স্থির থাকে, গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। আপাতদৃষ্টিতে কোন বস্তু অন্য বস্তুতে সংযোগ না ঘটিয়ে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করতে পারে না। অভিকর্ষ তত্ত্বানুসারে বিশ্বের সকল বস্তু—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা থেকে আরম্ভ করে বহির্বিশ্বের প্রান্তের নক্ষত্রও পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ করে যাচ্ছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে তো সাধারণ অভিজ্ঞতার কোন মিলই নেই। প্রথম হলো, পরমাণুর জগতে যেখানে কোয়ান্টাম তত্ত্ব কাজ করে সেখানে ঘটনাগুলি কোন

কার্য-কারণ মেনে ঘটে না। সম্ভাবনার সূত্র (Law of probability) মেনে ঘটনাগুলি ঘটে। এমনকি কোন ঘটনা ঘটে না যদি কোন পর্যবেক্ষক না থাকে। পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণ করলেই কোন বিশেষ ঘটনা ঘটবে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, কোন ঘটনার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই—পর্যবেক্ষণ করলেই ঘটনার অস্তিত্ব সম্ভব হবে। আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টির (unaided vision-এর) যে-জগৎ, তাতে একথা অবিশ্বাস্য শোনালেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুকণার ক্ষেত্রে এটি 'বৈজ্ঞানিক সত্য'।

বিজ্ঞানের এই কার্যধারাকে মেনে নিলে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, সাধারণ জ্ঞানের যুক্তিতর্ক দিয়ে বিজ্ঞানের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ঘটনাকেও বিজ্ঞানী সত্য হিসাবে মেনে নেন যদি পরীক্ষায় তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাই সত্য, ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না এমন ঘটনা সত্য নয়—এটা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নয়। বিজ্ঞানী বহু ঘটনার বিশ্লেষণ করেন যা মানুষের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার বাইরে। তবে ঘটনাটি তাঁর যন্ত্রপাতির আওতায় থাকতে হবে এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাপজোকের যোগ্য হতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ঘটনাকে যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অনুশীলন করা না যায় ততক্ষণ বিজ্ঞানী তাকে সত্যও বলবেন না, অসত্যও বলবেন না। কেননা আজ যা অনুশীলন করা যাচ্ছে না, পরবর্তী কালে নতুন জ্ঞানের ভিত্তিতে তা অনুশীলন করা যেতে পারে।

দ্বন্দ্ব সেইসব ঘটনা নিয়ে, যে-ঘটনাগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এবং বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না। তথাকথিত যুক্তিবাদীরা বলবেন, এই ধরনের ঘটনার সত্যতার সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়াই বিজ্ঞানমনস্কতার বিরোধী। যিনি বিজ্ঞানমনস্ক, তিনি হয়তো ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করবেন না, কেননা বিজ্ঞানের যন্ত্রে ভগবানকে দেখা যায় না। আবার জ্যোতিষশাস্ত্রের সত্যতার সম্ভাবনাকেও তিনি স্বীকার করবেন না, কেননা কোন যুক্তিতর্ক দিয়েই বোঝা যায় না—জন্মসময়ের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান কিভাবে একজন জাতকের দৈহিক ও চারিত্রিক গঠন এবং ভাগ্য ঠিক করে দিতে পারে। অথচ বহু ঘটনাই প্রকৃতিতে ঘটছে, যা এখনো পর্যন্ত যন্ত্রপাতির ধরাছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু তার সত্যতা না মেনে উপায় নেই। প্রাণিজগতের তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়শক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। যেমন, চার-পাঁচদিন আগে কোন ব্যক্তি যে-রাস্তায় হেঁটে গেছে, তার জামা-কাপড়ের গন্ধ শুঁকে বিশেষ জাতের কুকুর সে-রাস্তা চিনে নিতে পারে। হিসাব করলে সেই রাস্তায় ঐ গন্ধের পদার্থের অণু-পরমাণু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকা কি করে যোজন যোজন দূরের খাবারের হদিশ পায় বা বিশেষ ঋতুতে পাখিরা কিভাবে হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে নির্দিষ্ট জলাশয়ে হাজির হয় তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এখনো জানা নেই। সাধারণ অভিজ্ঞতায় হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকার কথা নয়। অথচ হিসাব করলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের যা মাত্রা, তাতে কোন কার্যকরী অণুর না থাকারই সম্ভাবনা। এইসব ক্ষেত্রে ঘটনার ব্যাখ্যা না থাকলেও যুক্তিবাদীরা বলবেন, ঘটনাগুলোর সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ আছে, কাজেই কোন সময়ে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ হলে ঘটনাগুলোর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে।

তথাকথিত যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্কদের মত হলো, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই সত্যকে জানবার একমাত্র উপায় এবং এই বিজ্ঞানের ভিত্তি হলো বস্তু। বস্তুকে জেনে, বস্তুর ওপরে পরীক্ষা করেই সত্যকে জানা যাবে। কিন্তু বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ আবিষ্কারগুলোকে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, বস্তুকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানীর চিন্তা আরম্ভ হলেও সত্য ধরা দিয়েছে বিজ্ঞানীর চিন্তাজগতে। একের সঙ্গে দুই যোগ করে তিন হয়—এভাবে অঙ্ক কষে বিজ্ঞানের সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হয়নি। অভিকর্ষ তত্ত্ব, আপেক্ষিক তত্ত্ব, তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ তত্ত্ব, কোয়ান্টাম তত্ত্ব—সবই বিজ্ঞানীদের মনোজগতে আবিষ্কৃত সত্য। প্রকৃতিতে বিভিন্ন ঘটনা ঘটে চলেছে। পর্যবেক্ষণ করে ঘটনাগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যায়, কিন্তু যে-নিয়ম বা বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলির দ্বারা ঘটনাগুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা কেবল পর্যবেক্ষণের মধ্যে সীমায়িত মনোভাব নিয়ে আবিষ্কৃত হয়নি। সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে বিজ্ঞানীদের মনোজগতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ কোন যুক্তি অবলম্বন করে সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হয়নি। বলা যেতে পারে, সূত্রগুলি যেন স্বপ্রকাশিত হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানীর মনে। সত্য যদি এভাবেই প্রকাশিত হয় তাহলে আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতিই সত্যকে জানবার একমাত্র পথ নাও হতে পারে। আমাদের দেশের প্রত্যক্ষদ্রষ্টারা কিভাবে সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তা জানা নেই। উপনিষদে আমরা দেখি—ঋষি প্রার্থনা করছেন যে, সত্যের মুখ যেন তাঁর কাছে অপাবৃত (উন্মোচিত) হয়। এই অর্থে তাঁরা পরম সত্যকে হয়তো 'দর্শন' করেছিলেন, হয়েছিলেন 'সত্যদ্রষ্টা'। আদি বিশ্ব এবং চরম সত্য সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের বর্ণনা পড়লে মনে হয় বেদ, বেদান্ত ও ভাগবতের রচয়িতারা একই সত্যকে জেনেছিলেন।

অধুনা পদার্থবিদ্‌রা জড়বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই বিশ্বসৃষ্টির আদি অবস্থা নিয়ে গবেষণা করছেন। সেই গবেষণার ফলাফল নিয়ে বহু বিজ্ঞানী সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বই লিখেছেন। এরকম বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাদের থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। ফ্রিটজফ কাপরা (Fritjof Capra) তাঁর বই 'The Tao of Physics'-এ লিখেছেন ঃ "Finally both (metaphysical & scientific) approaches recognise that consciousness may be an essential aspect of the universe that will have to be included in a future theory of physical phenomena." [পরিশেষে, (ধর্ম ও বিজ্ঞানের) উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই স্বীকার করা হয় যে, প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করার জন্য আগামীকালের তত্ত্বে হয়তো 'চেতনা'কে বিশ্বের একটি অপরিহার্য উপাদানরূপে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।] হকিং (Hawking) তাঁর 'A Brief History of Time' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "It would be very difficult to explain why the universe should have begun just the way except as the act of God who intended to create beings like us." [ভগবান আমাদের মতো প্রাণী সৃষ্টি করবেন বলেই বিশ্বের শুরু ঠিক এভাবে করেছিলেন—এছাড়া অন্য কোনভাবে বিশ্বের শুরুর ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন।] পল ডেভিস (Paul Davies) তাঁর 'God and the New Physics'-এ লিখেছেন ঃ "It [New Physics] makes redundant the idea of God—the Creator, but it does not rule out a universal mind existing as part of that unique

physical universe, a natural as opposed to supernatural God, the entire physical universe would then be the medium of expression of the mind of a natural God." [সৃষ্টিকর্তা ভগবানের ধারণা আধুনিক পদার্থবিদ্যায় অনাবশ্যক হয়ে পড়ে, কিন্তু অনুপম প্রাকৃতিক বিশ্বের অংশ হিসাবে কোন সার্বিক মনের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না। অতিপ্রাকৃত ভগবানের পরিবর্তে কোন প্রাকৃত বা যুক্তিসম্মত 'ঈশ্বর' থাকতে পারেন। অখণ্ড প্রাকৃতিক বিশ্বকে তখন সেই প্রাকৃত ভগবানের মনেরই প্রকাশমাধ্যম বলে ভাবা যেতে পারে।] তিনি আবার লিখেছেন ঃ "The universe is a mind : a self-observing as well as self-organizing system. Our own minds could then be viewed as localised 'islands' of consciousness in a sea of mind, an idea that is reminiscent of the oriental conception of mysticism where God is then regarded as the unifying consciousness of all things into which human mind will be absorbed losing its individual identity, when it achieves an appropriate level of spiritual advancement." [বিশ্ব একটি মন—যে নিজেকে দেখছে আবার নিজেকে গড়ছে। আমাদের ব্যক্তিগত চেতনাগুলিকে সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী মনের সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি দ্বীপ বলে ভাবা যেতে পারে। এই ধারণা স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচ্য অতীন্দ্রিয়বাদের সেই মতকে, যে-মতে ঈশ্বরকে বিভিন্ন খণ্ডিত ব্যক্তিচৈতন্যের সমষ্টিরূপে মনে করা হয়। আধ্যাত্মিক প্রগতির উপযুক্ত স্তরে উন্নীত হয়ে মানুষের মন তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সেই অখণ্ড চৈতন্যসত্তায় লীন হয়ে যায়।] প্রায় একই কথা ক্যাফাটস (Kafatos) তাঁর 'The Conscious Universe' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "Although, we may on the deepest level of awareness sense or 'feel' the underlying unity of the whole, science can only deal with correlation between the parts. It can say nothing about the character of the undissectable whole from which the parts are emergent phenomena. This whole is literally indescribable in the sense that any description, including those of ordinary language, divides the indivisible." [যদিও আমরা আমাদের বোধের গভীরে 'সমগ্রে'র অন্তর্নিহিত ঐক্যকে বুঝতে পারি বা অনুভব করতে পারি, কিন্তু বিজ্ঞানে শুধুমাত্র বিভিন্ন 'অংশে'র পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করা সম্ভব। অবিভাজ্য পূর্ণ, যা থেকে অংশের জন্ম, সে-সম্পর্কে বিজ্ঞান কিছুই বলতে পারে না। এই 'অখণ্ড' আক্ষরিক অর্থেই অবর্ণনীয়, কেননা সাধারণ ভাষা বা অন্য যেকোন বর্ণনা এই অখণ্ডকে খণ্ডিত করে।]

যাঁরা বেদান্ত পড়েছেন বা 'কথামৃত' পড়েছেন তাঁরাই লক্ষ্য করবেন যে, বেদান্তের ব্রহ্মের বর্ণনা ("সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম") বা শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ লোককে বোঝাবার জন্য যেভাবে ব্রহ্মের কথা বলেছেন ("ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত, ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না।"), তার সঙ্গে আধুনিক পদার্থবিদ্‌দের পূর্ণের বর্ণনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

আবার দেখা যাক, মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানীমহলে জনপ্রিয় তত্ত্ব 'বিগ ব্যাং' (Big Bang)-এর বর্ণনা। ক্রীজ (Crease) এবং মান (Mann) 'The Second Creation'-এ লিখেছেন ঃ "There may have been a

tiny chance that nothingness would suddenly be convulsed by the presence of something. This something was inconceivably small... smaller than the smallest quark, which contained the staff of everything we see around us. The universe consisted of only one type of particle—that interacted with itself in that tiny terrifying space. Detonating outward, it may have doubled in size every 10^{-35} seconds or so, taking but an instant to reach literally cosmic proportions." [কোন কিছুর উপস্থিতিতে মহাশূন্যের ক্ষুভিত হওয়ার সামান্য সম্ভাবনা ছিল। এই কোন কিছু ধারণাতীতভাবে ক্ষুদ্র ছিল। এমনকি ক্ষুদ্রতম কোয়ার্কের (বস্তুকণা) চেয়েও তা ক্ষুদ্র ছিল—কিন্তু এর মধ্যেই ধরা ছিল আমরা আমাদের চারপাশে যাকিছু দেখি সে-সবের উপাদান। তখন বিশ্ব ছিল শুধু একটিমাত্র কণা—যেটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র জায়গায় নিজের সঙ্গে বিক্রিয়া করছিল। এই কণা বিস্ফোরিত হয়ে প্রতি 10^{-35} সেকেন্ডে দ্বিগুণ হয়ে আক্ষরিক অর্থে মুহূর্তের মধ্যে মহাজগতের আকার পায়।]

বিজ্ঞানের এই ধারণার সঙ্গে তুলনা করা যায় শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত সৃষ্টিবর্ণনাঃ "সকল পদার্থ ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল। তাহার পর সেইসকল হইতে একটি অচেতন অণ্ড উৎপন্ন হইল।... ঐ অণ্ড বহির্ভাগে ক্রমশ দশগুণ বর্ধিত প্রধানাদি জলাদি দ্বারা পরিবৃত। সেই অণ্ডেই ভগবান হরির মূর্তিস্বরূপ লোকসমূহ বিস্তৃত আছে। আবার তিনি দশাঙ্গুলি পরিমিত হইলেও এই বিশ্ব আবৃত করিয়া আছেন। মায়ার অধীশ্বর সেই ভগবান বিবিধ রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া আত্মমায়া দ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত কাল, অদৃষ্ট ও প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াছিলেন।" আধুনিক বিজ্ঞানীরা লিখছেনঃ "It is sometimes said that the universe as we know it was created by the explosion of a primeval egg. ... Just as the Big Bang represents the creation of space, so it represents creation of time." [অনেক সময়ে বলা হয় যে, আমাদের পরিচিত বিশ্ব একটি আদিম অণ্ডের বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়েছিল।... 'বিগ ব্যাং' যেমন স্থানের সৃষ্টি বোঝায় তেমনি কালেরও সৃষ্টি বোঝায়।] আধুনিক বিজ্ঞানীদের সৃষ্টিবর্ণনার সঙ্গে ভাগবৎকারের বর্ণনার সাদৃশ্য যেকোন যুক্তিবাদীকেই স্বীকার করতে হবে।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ (Relativity) বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই তত্ত্বেই প্রথমে ভাবা হয় যে, সময় স্থানভেদে বিভিন্ন হতে পারে এবং পদার্থ ও শক্তি অভিন্ন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'The real nature of man' বক্তৃতায় বলেছেনঃ "It is possible to demonstrate that what we call matter does not exist at all. It is only a certain state of force [energy]. Solidity, hardness or any other state of matter can be proved to be the result of motion." [দেখানো যায় যে, আমরা যাকে পদার্থ বলি তার কোন অস্তিত্বই নেই। এ শুধুমাত্র শক্তির একটা রূপ; দৃঢ়তা, কাঠিন্য বা পদার্থের অন্য কোন রূপ যে গতি-জনিত, তা প্রমাণ করা যায়।] 'ব্ল্যাক হোল' (কৃষ্ণ গহ্বর)-জাতীয় মহাশূন্যের তথাকথিত 'সিঙ্গুলারিটি'তে (গাণিতিক উৎসবিন্দু), যেখানে নতুন পদার্থ জন্ম নিচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞানে ভাবা হয় যে, সময় সেখানে স্তব্ধ হয়ে থাকে। সাধারণের

মধ্যে বহুল-প্রচারিত কথা 'ব্রহ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছর' এরই প্রতিধ্বনি। আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা যে আমাদের আচার্যগণের চিন্তাজগতে প্রকাশিত হয়েছিল এ-তথ্য অস্বীকার করা যায় কিভাবে? সময় যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হতে পারে এবং শক্তি যে পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে এসব তো আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় না। আইনস্টাইনের আগে বিজ্ঞানীরা এধরনের চিন্তাকে জ্যোতিষের মতোই আজগুবি বলতেন। বর্তমানে কিন্তু এই তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার ভিত্তি। এ-তত্ত্ব পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ধর্মপুস্তকে নেই, ছিল শুধু আমাদের দেশের আচার্যগণের চিন্তায়।

রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুটিকে অনেকেই বলবেন 'মীথোলজি' (Mythology) বা পুরাণ। মহাকাব্য দুটিতে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনাই রূপক এবং গল্প। সেখানে অনেক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়, যেসব ঘটনার আজ থেকে দুদশক আগেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। যেমন দ্রোণ ও দ্রোণীর জন্মকথা, সত্যবতীর জন্মকথা, বরুণ-বাণ দিয়ে অগ্নিবাণ ধ্বংস করা। কিন্তু আজ নলজাতক শিশু (Test-tube baby) বিকল্প মা (Surrogate mother) এবং 'পেট্রিয়ট মিসাইল' (Patriot missile) নামক বিধ্বংসী অস্ত্র (উপসাগরীয় যুদ্ধে তার ব্যবহার হয়েছিল) আবিষ্কারের পরে আর ঘটনাগুলিকে গল্প বা অপ্রাকৃত বলা যায় না। স্বীকার করতে হচ্ছে, রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত বহু ঘটনাই বিজ্ঞানভিত্তিক। তবে রামায়ণ ও মহাভারতের লেখক হয়তো কল্পনা করেছিলেন, সাক্ষাতে দেখেননি। কিন্তু যে-ঘটনা ঘটে না, অথচ সহস্র সহস্র বছর পরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় ঘটানো সম্ভব হয় (যাকে আজ আমরা 'কল্পবিজ্ঞান' বলি), সেই ঘটনা যিনি কল্পনা করতে পারেন তাঁর কল্পনাকে নমস্কার না জানিয়ে উপায় নেই।

আসলে আমরা এক আত্মবিস্মৃত জাতি। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞানরাশিকে অবহেলা করে পাশ্চাত্যের অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই সম্পূর্ণ বলে মনে করি। 'Education Council'-এর সভায় মাত্র এক ভোটে অ্যাডামস (Adams)-কে হারিয়ে মেকলে (Mecaulay) যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করতে সমর্থ হলেন তখন তিনি তাঁর পিতৃদেবকে লিখেছিলেন ঃ "এ যা হলো তাতে এদেশে (ভারতে) আর পাদ্রী পাঠাতে হবে না। এরা (ভারতবাসীরা) অনন্তকাল আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে।" মেকলের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে এতটা সত্য হবে তা মেকলেও বোধহয় ভাবতে পারেননি। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও বিদেশের বিজ্ঞানী প্রশংসা না করলে ভারতীয় বিজ্ঞানী স্বীকৃতি পান না। বিদেশী পত্রিকায় ছাপা না হলে ভারতীয় বিজ্ঞানীর গবেষণাপত্র গণ্য হয় না। দেশের কবিরাজী ঔষধকে হেয় প্রতিপন্ন করাই আমাদের ডাক্তারদের 'উন্নত' শিক্ষার পরিচয়। অথচ আমরা চীনের আকুপাংচার (Acupuncture) নিয়ে মাতামাতি করি। দেশীয় বহুল-ব্যবহৃত ভেষজ থেকে বিদেশীরা যখন রক্তচাপের অমোঘ ঔষধ আবিষ্কার করে তখন সেই ঔষধ আমরা সাদরে গ্রহণ করি। আবার বিদেশীরা যখন যোগাসনের প্রশংসা করে তখন আমরা পাড়ায় পাড়ায় যোগব্যায়াম কেন্দ্র খুলে বসি। শোনা যাচ্ছে, আমেরিকার ব্যবসায়ীরা জ্যোতিষীর সাহায্য নিয়ে অর্থলগ্নী করছে। এবারে হয়তো জ্যোতিষও আমাদের বিজ্ঞানমনস্কদের কাছে স্বীকৃতি পাবে।

কিন্তু যেকোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের মতোই স্বীকার করতে হবে যে, জড়জগৎকে অনুশীলন করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা যে চরম সত্যের আভাস পাচ্ছেন, তা আমাদের দেশের ঋষি ও মনীষীদের মনোজগতে বহুকাল আগেই ধরা পড়েছিল। এপ্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। পল ডেভিস তাঁর 'God and the New Physics'-এ লিখছেন : "We must not suppose that science teaches us that everything anyone would ever want to take seriously is identifiable as a collection of particles moving about in space and time. ... Physics can, perhaps, explain the content, origin and organisation of the physical universe, but not the laws (or superlaw) of Physics itself." [আমাদের ধরে নেওয়া উচিত নয় বিজ্ঞান আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, শুধুমাত্র সেই জিনিসকেই সঠিক ভাবা যায়, যে-জিনিস স্থান ও কালে চলমান কতগুলি কণার সমষ্টি। ...পদার্থবিদ্যা হয়তো প্রাকৃতিক বিশ্ব কি দিয়ে তৈরি, কিভাবে উৎপন্ন হলো এবং কিভাবে সংগঠিত তার ব্যাখ্যা দিতে পারে। কিন্তু পদার্থবিদ্যা নিজের নিয়ম (বা অতিনিয়ম) ব্যাখ্যা করতে পারে না।] এফ. ররলিক (F. Rohrlich) তাঁর গ্রন্থে 'From Paradox to Reality' লিখছেন : "The electron is considered to be only a theoretical entity inferred from observation. It does not command a right to be called 'real', it is only an abstract mathematical construct and does not refer to anything real. ... Only the immediate experiences are real and everything else is inferred and depends on the theory one happens to choose for its explanation." [ইলেকট্রনকে পরীক্ষা থেকে অনুমিত একটি তাত্ত্বিক ব্যাপারই ভাবা চলে। বাস্তব বলে দাবি করার এর কোন অধিকার নেই। এটা শুধুমাত্র একটা বিমূর্ত গাণিতিক ধারণা এবং তা বাস্তব কোন জিনিসকে বোঝায় না।... শুধুমাত্র আমাদের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাই বাস্তব। বাকি সব অনুমান এবং যে-তত্ত্ব দ্বারা পরীক্ষার ফল ব্যাখ্যা করা হয়, তার ওপরে নির্ভরশীল।] ররলিক আরো লিখছেন : "We have a certain feeling about what is reasonable and what is not reasonable. And here we run into our natural tendency to extrapolate, to assume that the world outside our usual bounds is similar to the world we are used to. We tend to be prejudiced about what to expect. We believe we know what nature is going to be like even in new and heretofore unknown domains. And we are often wrong in that." [কোন্‌টা যুক্তিগ্রাহ্য এবং কোন্‌টা যুক্তিগ্রাহ্য নয় সে-সম্পর্কে আমাদের একটা নির্দিষ্ট ধারণা আছে। এর ফলে আমরা আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতাবশত সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নিই যে, আমাদের ধারণার বাইরের জগৎও আমাদের পরিচিত জগতের মতোই। সে-জগৎটা কি হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে আমাদের পক্ষপাত এসে যায়। আমরা বিশ্বাস করি যে, নতুন এবং এখনো পর্যন্ত অজ্ঞাত এলাকায় প্রকৃতি কিরকম হবে তা আমরা জানি। এবং অনেক সময়েই এসম্পর্কে আমাদের ভুল হয়।] ক্যাফাটস 'The Conscious Universe' গ্রন্থে লিখছেন : "The truth of classical physics as Descartes viewed them were literally revealed truths." [ডেকার্তে যেমন মনে করতেন, চিরায়ত পদার্থবিদ্যার

সত্যগুলি আক্ষরিক অর্থে স্বপ্রকাশিত সত্য।] কাজেই জড়জগৎভিত্তিক সত্যও যদি মনোজগতেই প্রকাশিত হয় তাহলে ঋষিদের মনোজগতে প্রকাশিত সত্যকে পরীক্ষা না করে অসত্য বলা যায় না। ঋষিরা ঠিক কোন্ পথে এগিয়েছিলেন তা সম্যক্ জানা নেই। কিন্তু সত্য এক, যদিও সত্যে পৌঁছাবার পথ বিভিন্ন হতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা এক পথে এগোচ্ছেন, ভারতের মুনি-ঋষিরা অন্য পথে এগিয়েছিলেন। কিন্তু পথ অন্য এবং তাঁদের আবিষ্কৃত সত্যগুলি অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ অভিজ্ঞতার বিরোধী বলেই তা আজগুবি—এমন ভাবার কোন কারণ নেই। এপর্যন্ত যে-কয়টি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো সেগুলিতে দেখা যাবে যে, যেসব ব্যাপার আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের আওতায় পড়ে না, যাদের যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাপজোক করার প্রশ্নই ওঠে না—যেমন মন, চৈতন্য, ঈশ্বর প্রভৃতি—আধুনিক বিজ্ঞান যেন চরম লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে সেগুলিকে মেনে না নিয়ে পারছে না। মানছে কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে। এবং গবেষণার এইসব স্তরেই শোনা যাচ্ছে আমাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রের নিশ্চিত প্রতিধ্বনি। এখনো যদি ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এইসব সত্যের চর্চাকে বিজ্ঞানমনস্কতার বিরোধী বলে মনে করেন তাহলে তাঁরা বিজ্ঞানমনস্কই থাকবেন, সত্যকে আস্বাদন করতে পারবেন না।

এসব কথা বলা সত্ত্বেও আরেকটা কথা থেকে যায়। মুনি-ঋষিদের জ্ঞানের কথা সত্য হলেও তাঁদের নাম করে আমরা যেসব সংস্কারকে আশ্রয় করি বা দেশীয় বলে যেসব চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যবহার করি সেগুলি সবক্ষেত্রে সঠিক হবে—এমন ভাববার কারণ নেই। এর মধ্যে অনেক সংস্কার ক্ষতিকারকও হতে পারে। সেগুলিকে কুসংস্কার বলতেই হবে। কুসংস্কারগুলোকে দেশ থেকে দূর করার জন্য যাঁরা কাজ করছেন তাঁদেরও প্রশংসা করতে হবে।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা সত্যকে জেনেছিলেন। সেই সত্যকে তাঁরা পরমব্রহ্ম বলতেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই পরমব্রহ্মের স্বরূপ—তাঁদের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই বিজ্ঞানবিরোধী নয়। কাজেই ভগবদ্বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানমনস্কতায় কোন বিরোধ নেই। বিরোধ নেই আপাতদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য বিভিন্ন অনুশাসন বা কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশের সঙ্গেও। তবে ঋষিবাক্য বলে প্রচলিত সব সংস্কারই যে সত্যনির্ভর হবে তা বলা যায় না। যেসব সংস্কার ক্ষতিকারক বলে প্রমাণ করা যায়, সেগুলি নিঃসন্দেহে 'কুসংস্কার'। স্বাস্থ্যের হানিকর সংস্কার, ভিত্তিহীন ঔষধ এবং এগুলোর ব্যবহারের বিরোধিতা আমাদের করতেই হবে। তবে এধরনের কুসংস্কার শুধুমাত্র 'এদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই' বলেই দূর করা যাবে না। আমাদের বুঝতে হবে মানুষ কেন এইসব সংস্কারকে আশ্রয় করে। আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থা এমন যে, ছাত্র জানে না সে ভালভাবে পড়াশুনা করলেও পরীক্ষায় পাস করবে কিনা। কর্মপ্রার্থী জানে না যে, সে যোগ্যতা অর্জন করলেও কাজ পাবে কিনা। রোগী জানে না, অর্থব্যয় করেও যে সত্যিকারের চিকিৎসার সুযোগ পাবে কিনা। তাই লোকে জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হয়, 'প্রতারক ধর্মগুরু'র আশ্রয় নেয়, রত্ন, মাদুলি ধারণ করে, জলপড়া ও মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করে।

মানুষের ক্ষতিকারক কুসংস্কারগুলিকে দূর করতে হলে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থা এমন করতে হবে যে, পরীক্ষার্থী জানবে পড়াশুনা ভালভাবে করলেই পরীক্ষায় পাশ

করবে। কর্মপ্রার্থী জানবে যে, সে কাজ শিখলে উপযুক্ত কাজ পাবে। রোগী জানবে, চিকিৎসা-শাস্ত্রানুসারে যতটা করা সম্ভব তার জন্য তা করা হবে। তাহলেই ক্ষতিকর কুসংস্কারগুলোকে মানুষ ত্যাগ করতে পারবে। একাজে বিজ্ঞানই হবে আমাদের সহায়। বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে পারলেই সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানকে মেনে নেবে এবং বিজ্ঞানমনস্কতা স্বীকৃতি পাবে।

বিজ্ঞানমনস্কতা এলেও মানুষের মন থেকে ভগবদ্বিশ্বাস বা কোন শুভ শক্তির ওপরে আস্থা রাখার প্রবণতা যাবে না। কারণ, চরম যুক্তিবাদী মানুষও তার ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ভবিষ্যৎ অনেক সময়েই নির্ধারিত হয় এমন সব ঘটনা দিয়ে যার ওপরে মানুষের কোন হাত থাকে না। তাই দেখা যায়, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পোলভল্টার সার্গেই বুবকা গত বার্সিলোনার অলিম্পিকে একটা লাফও ঠিকভাবে দিতে পারলেন না। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলেই ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য মানুষ অন্য শক্তির আশ্রয় খোঁজে। আমরা দেখি, উপসাগরীয় যুদ্ধে বিজয়ের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট গীর্জায় প্রার্থনা করেন। খেলার মাঠে নামবার আগে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দল প্রার্থনা করে। মন্ত্রীরা দিনক্ষণ দেখে শপথ নেন। ব্যবসায়ীরা নতুন বছরের খাতা কালীবাড়ি ঘুরিয়ে আনে। নতুন বাড়ি আরম্ভ করার আগে গৃহস্বামী ভিতপূজা করেন। যাত্রার আগে মানুষ ভগবানকে স্মরণ করে। এই ধরনের বিশ্বাসভিত্তিক কাজকর্মের কার্যকারিতা আছে কি নেই তা বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার করা সম্ভব নয়। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, কার্যকারিতা নিশ্চিত নয়, তাহলেও কি বিজ্ঞানীদের এসব বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রচার করা সঠিক? এসব বিশ্বাস চলে গেলে মানুষকে সাইকিয়াট্রিস্টের আশ্রয় নিতে হয়। সমস্যা ভুলবার জন্য মানুষ ড্রাগের শিকার হয়। এর চেয়ে কালীবাড়িতে মানত করা বা পূজা দেওয়া নিশ্চয়ই বেশি ক্ষতিকারক নয়! ভুয়ো বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচার করে বা তথাকথিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে দূর করতে গিয়ে মানুষকে তার অভ্যস্ত সুস্থ পরিবেশ থেকে অসুস্থ পরিবেশে ঠেলে দেওয়া সুবিবেচনার কাজ নয়। বিজ্ঞানমনস্কদের উচিত মানুষের সুস্থ বিশ্বাসকে ধ্বংস না করে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুসন্ধান করা।

এখন প্রশ্ন, বিজ্ঞানের বিশ্লেষণমূলক পথ কি ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? অন্যভাবে বলতে গেলে, ধর্ম কি বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির মোকাবিলা করতে পারে? আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী আগে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, সেই ধর্মেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে যে-ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুক্তি-বিচারে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তবে, আরেকটি কথাও তিনি যোগ করেছিলেনঃ সব ধর্মের যা মূলসত্য (অর্থাৎ সনাতন ধর্ম) যে শুধু বিজ্ঞানসম্মত তাই নয়, তথাকথিত অন্যান্য বিজ্ঞান যেমন—পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতির থেকেও ধর্মবিজ্ঞান বেশি শক্তিশালী; কারণ তা মানুষের অন্তরে নিহিত সত্যের ধারণার অনুপন্থী, যা অন্যান্য জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ইংল্যান্ডে দেওয়া বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেনঃ "Are the same methods of investigation, which we apply to sciences and knowledge outside, to

be applied to the science of Religion ? In my opinion, this must be so, and I am also of [the] opinion that the sooner it is done the better. If a religion is destroyed by such investigations, it was then all the time useless, unworthy superstition ; and the sooner it goes the better. I am thoroughly convinced that its destruction would be the best thing that could happen. All that is dross will be taken off, no doubt, but the essential parts of religion will emerge triumphant out of this investigation. Not only will it be made scientific–as scientific, at least, as any of the conclusions of physics or chemistry—but will have greater strength, because physics or chemistry has no internal mandate to vouch for its truth, which religion has."[১] [বহির্জগতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তত্ত্বানুসন্ধানের যে-পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত হয়, ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি সেই একই পদ্ধতি অবলম্বিত হবে? আমার মতে তাই হওয়া উচিত। আমি এও মনে করি, যত শীঘ্র তা হয়, ততই মঙ্গল। এরূপ অনুসন্ধানের ফলে কোন ধর্ম যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে—সেই ধর্ম বরাবরই অনাবশ্যক কুসংস্কার-মাত্র ছিল; যত শীঘ্র তা লোপ পায়, ততই মঙ্গল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর বিনাশেই সর্বাধিক কল্যাণ। এই অনুসন্ধানের ফলে ধর্মের ভিতরে যাকিছু খাদ আছে, সেসবই দূরীভূত হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু ধর্মের যা সারভাগ তা এই অনুসন্ধানের ফলে বিজয়গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াবে। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের সিদ্ধান্তগুলি যতখানি বিজ্ঞানসম্মত, ধর্ম যে অন্তত ততখানি বিজ্ঞানসম্মত হবে শুধু তাই নয়, বরং আরো বেশি জোরালো হবে; কারণ, জড়বিজ্ঞানের সত্যগুলির পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো আভ্যন্তরীণ আদেশ বা নির্দেশ কিছু নেই, কিন্তু ধর্মের তা আছে।]

স্বামীজীর এই বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের প্রতিযোগী বা বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক। আজ থেকে একশো বছর আগেই সনাতন ধর্ম ও আধুনিক বিজ্ঞানের নিবিড় মিলন প্রত্যক্ষ ও ভবিষ্যৎ দর্শন করে শিকাগোয় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ

"...the Hindu is only glad that what he has been cherishing in his bosom for ages is going to be taught in more forcible language, and with further light from the latest conclusions of science."[২] [হিন্দু যুগ যুগ ধরে যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করে আসছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নতুনতর আলোকে আরো জোরালো ভাষায় প্রচারিত হওয়ার উপক্রম দেখে তার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হচ্ছে।]* □

পাদটীকা

১ 'Complete Works', Vol. I, 1986, p. 367

২ Ibid., p. 15

* ৯৬ বর্ষ, ৩ সংখ্যা

ডায়াবিটিস ও কিছু নতুন তথ্য

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

ডায়াবিটিস (Diabetes) একটি সমস্যাবহুল ব্যাধি এবং তা সার্বজনীন। খুব কম পরিবারেই আছে যাদের নিকট বা দূর সম্পর্কের (রক্ত-সম্পর্কের কথা বলছি) কেউ না কেউ এই অসুখে আক্রান্ত হয়নি। এই বংশগত অসুখটির প্রকোপ ভারতবাসীর মধ্যে খুবই বেশি। সম্ভবত জেনেটিক (genetic) প্রবণতাই এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। ডায়াবিটিসের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়ার আজও কোন চিকিৎসা নেই, কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির দ্রুত অগ্রগতির ফলে রোগটি ভালভাবে আয়ত্তে আনা আজ সম্ভব হয়েছে। চিকিৎসক, রোগী ও তার পরিবার, খাদ্যতত্ত্ববিদ (dietician) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই রোগের প্রকাশ ও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সমস্যাগুলির প্রতিরোধ (prevention) ও চিকিৎসা আজ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। এই নিবন্ধে তারই আলোচনা করছি।

ইনসুলিন ও ডায়াবিটিস

পাকস্থলীর পিছনে রয়েছে অগ্ন্যাশয় বা প্যাংক্রিয়াস (pancreas) গ্রন্থি। তার মধ্যে বিটাকোষগুলি (Beta Cells of the islets of Langerhans) যে অন্তঃরস (hormone) তৈরি করে রক্তে পাঠায়, তার নাম 'ইনসুলিন' (insulin)। ইনসুলিন রক্ত থেকে গ্লুকোজের (glucose)—যাকে চলতি কথায় আমরা বলি 'ব্লাড সুগার' (blood sugar)—বিভিন্ন শারীরিক কোষে অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করে এবং রক্তে সুগারের পরিমাপ একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বজায় রাখতে সাহায্য করে। গ্লুকোজ শরীরে কর্মশক্তি যোগায়। ইনসুলিনের আংশিক বা সামগ্রিক অভাবে শরীরের কোষগুলি গ্লুকোজ ব্যবহার করতে পারে না, ফলে ডায়াবিটিস রোগের সূত্রপাত ও বৃদ্ধি হয়। রক্তে সুগার বাড়ে। কারণ, ইনসুলিনের অভাবে শুধু যে দেহকোষগোষ্ঠী তা ব্যবহার করতে পারে না তাই নয়, যকৃত বা লিভারও গ্লাইকোজেন (glycogen) থেকে গ্লুকোজ তৈরি করে রক্তে পাঠাতে পারে না। ফলে রোগী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে, আনুষঙ্গিক আরো অনেক উপসর্গ দেখা দেয় এবং সেগুলি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

দু-ধরনের বা টাইপের (type) ডায়াবিটিস আজ সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রথম টাইপটি (type I) দেখা যায় অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। এতে পারিবারিক ইতিহাস নাও থাকতে পারে এবং ইনসুলিনের অভাবই এর মূল কারণ (quantitative lack of insulin)। অগ্ন্যাশয়ের ঐ বিটাকোষগুলি কোন ভাইরাস জাতীয় সূক্ষ্ম জীবাণু অথবা স্বয়ংক্রিয় শারীরিক প্রতিক্রিয়ার (autoimmune reaction) দ্বারা বিনষ্ট হলে এই অসুখের সূত্রপাত হয়। ইনসুলিনের অভাবে এই ধরণের ডায়াবিটিস-রোগীরা আগে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই মারা যেত,

পরে বৈজ্ঞানিক ব্যান্টিং ও বেস্ট (Banting & Best)-এর গবেষণাপ্রসূত ইনসুলিন আবিষ্কার ও ব্যবহারের পর থেকে এবং ইনসুলিন সম্বন্ধে ধারণার ক্রমোন্নতির ফলে আজ অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

টাইপ-২ (type II) বা দ্বিতীয় টাইপের ডায়াবিটিস পারিবারিক বা বংশগত অসুখের অন্যতম। ডায়াবিটিস-রোগীদের শতকার ৯০ ভাগের টাইপ-২ ডায়াবিটিস। রোগীদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি দেখা যায় এবং প্রায় ৭০% রোগীর বয়স ৪০-এর ওপর ও তারা মেদবহুল ও স্থূলাঙ্গ হন। এই রোগের শুরুতে ইনসুলিনের অভাব না থাকলেও লিভার গ্লাইকোজেন থেকে বেশি পরিমাণে সুগার তৈরি করে রক্তে পাঠায় এবং তার জন্য রক্তে সুগারের পরিমাণ বেড়ে যায়। এছাড়া শরীরের যেসমস্ত কোষগুলির ওপর ইনসুলিন কাজ করে তাদের বাইরের আস্তরণে ইনসুলিন-গ্রাহক (receptor) পরমাণুদের সংখ্যা ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। তারা ইনসুলিনের কর্মপ্রয়াসে সহযোগিতা করে না—এই অবস্থাকে বলা হয় ইনসুলিন-প্রতিবন্ধক অবস্থা (insulin resistant state)। তার জন্য রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অবশ্যই বেড়ে যায় এবং তার সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় শারীরিক প্রক্রিয়াগুলিও (metabolism) ক্রমশ ব্যাহত হয়। প্রথমদিকে রক্তে সুগার বেশি হওয়ার সঙ্কেত পেয়ে অগ্ন্যাশয়ের বিটাকোষগুলি বেশি পরিমাণ ইনসুলিন তৈরি করে রক্তে পাঠায়; কিন্তু ইনসুলিনের প্রতিবন্ধক অবস্থার জন্য রক্তে সুগারের পরিমাণ কমে না। তখন ঐ কোষগুলি আরো বেশি ইনসুলিন রক্তে পাঠিয়ে দেয় সুগার কমানোর প্রচেষ্টায়। এইভাবে ক্রমশ বিটাকোষগোষ্ঠী নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং অত্যধিক সুগারের বিষক্রিয়ায় (toxic effects of hyperglycemia) তারা চিরতরে বিনষ্ট হয়। তখন শরীরে ইনসুলিনের পুরো অভাব প্রকাশ পায়। অনেকের আবার শরীরে ইনসুলিনের অভাব হয় অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিনের রক্তে মেশার পথে বাধা পাওয়ার জন্য। মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে, প্রথম প্রথম—এমনকি কোন ক্ষেত্রে অনেকদিন পর্যন্ত এই দ্বিতীয় টাইপের রোগীদের রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ স্বাভাবিক বা তার চেয়ে বেশিও থাকতে পারে; কিন্তু ইনসুলিনের প্রতিবন্ধক অবস্থার জন্য তার দ্বারা রক্তে সুগার কমে না। যে-অসুখটি প্রথমে ছিল ইনসুলিনের ওপর নির্ভরহীন (Non-insulin dependent diabetes বা NIDDM), তা পরে সামগ্রিকভাবে বাইরে থেকে যোগানো ইনসুলিনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল (insulin dependent diabetes বা IDDM) হয়ে পড়তে পারে।

এই টাইপ-২ ডায়াবিটিসের প্রকোপ ভারতীয়দের মধ্যে, যারা বিদেশে আছে তাদের মধ্যেও খুবই বেশি দেয়া যায়। ইংল্যান্ডে একটি সমীক্ষায় জানা যায় যে, প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে যাদের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তাদের ডায়াবিটিসের হার নেটিভ ইংরাজদের তুলনায় ৪ গুণ বেশি! তার জন্য বংশগত বা জেনেটিক কারণ তো বটেই, তার সঙ্গে রোগপ্রকাশে জোরদার হয়েছে পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিও (environmental factors)। মেদবৃদ্ধি, শারীরিক পরিশ্রমবিমুখতা, চলাফেরার বদলে বেশি সময় বসে কাটানো (sedentary life style)—এসবই রোগপ্রকাশের বিশেষ অনুকূল। এদেশে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবিটিসের সম্পর্কও লক্ষ্য করা যায়। ডায়াবিটিসের হার ৬০ বছর

বয়স্কদের মধ্যে ১০% এবং ৮০ বছর বয়স্কদের মধ্যে ১৬ থেকে ২০% ধরা হয়। এছাড়া আরো কত যে পরিসংখ্যানের বাইরে আছে তা সঠিক জানা যায় না। বলা হয়, আরো ৪০% বয়স্কদের সুগার সমস্যা (sugar problem) আছে।

লক্ষণগুলি কি কি?

অত্যধিক জলপিপাসা, বারবার প্রস্রাব হওয়া, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া (ছানিপড়া), শরীরে ঘন ঘন ফোড়া হওয়া, মূত্রাশয়ের প্রদাহ ও জীবাণুসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাধি, চুলকানি বিশেষ করে ইন্দ্রিয়স্থানে, শারীরিক দুর্বলতা ও ওজন হ্রাস পাওয়া—এইসব টাইপ-১ ও অনেক সময় টাইপ-২ অসুখের লক্ষণ। পারিবারিক ইতিহাসে যাদের ডায়াবিটিসের প্রবণতা থাকে, বিশেষ করে তাদের পক্ষে শারীরিক বা মানসিক অবস্থার ওপর অস্বাভাবিক চাপের প্রতিক্রিয়ারূপে ডায়াবিটিস সরাসরি আত্মপ্রকাশ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ হার্ট অ্যাটাক, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা, কোন কঠিন অসুখে (যেমন নিউমোনিয়া) আক্রান্ত হওয়া অথবা সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনার ফলে দেহে বা মনে আঘাত পাওয়া ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। নবজাত শিশুর ওজন ৯ পাউন্ড বা তার বেশি হলে মাতার ডায়াবিটিসের সম্ভাবনা আছে ভাবতে হবে।

রোগটি সমস্যাবহুল কেন?

যুক্তরাষ্ট্রে ডায়াবিটিসের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আর্থিক ক্ষতির মূল্য বছরে প্রায় ১৩ হাজার কোটি ডলার ($130 billion)। শরীরের প্রায় সমস্ত অংশই ডায়াবিটিসের দ্বারা পীড়িত হতে পারে। আমেরিকায় দৃষ্টিহীনতার প্রধান কারণ ডায়াবিটিস এবং কিডনির অসুখের ক্ষেত্রেও তাই। ডায়ালিসিসের (dialysis) সাহায্যে আজ বহু লোক 'কিডনী ফেলিওর' (kidney failure) নিয়ে জীবনধারণ করছেন। ডায়াবিটিস এই কিডনী ফেলিওরের প্রধান কারণ। উচ্চ রক্তচাপ (high blood pressure–hypertension) ডায়াবিটিসের বহুজনবিদিত আনুষঙ্গিক জটিলতা। কোলেস্টেরল সমস্যা (cholesterol problem) ডায়াবিটিসে প্রায় সর্বদাই প্রকট। এতে 'গুড' কোলেস্টেরল বা HDL থাকে কম, 'ব্যাড' কোলেস্টেরল বা LDL থাকে বেশি এবং ট্রাইগ্লিসারাইডস (triglycerides)-ও বেশি পরিমাণে হয়। কিন্তু ঠিকমত চিকিৎসা হলে অবশ্যই এগুলি আয়ত্তে আনা আজ সম্ভব।

বিভিন্ন আকারের ধমনীগুলি (arteries), বিশেষ করে সঙ্কীর্ণ আয়তনের ধমনী ডায়াবিটিসের শিকার হয়। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ধমনীর ভিতরের দেওয়ালে কোলেস্টেরল জমে ওঠে। কিন্তু মধ্যাকৃতিবিশিষ্ট ধমনীগুলি, যেমন হার্টের (coronary), মস্তিষ্কের (cerebral) ও পায়ের ধমনীতে তা জমলে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়। ফলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, হাঁটাচলার ক্রমাবনতি, দুরারোগ্য ক্ষত ইত্যাদির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সঙ্কীর্ণ আয়তনের সরু বা সূক্ষ্ম ধমনীগুলি ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হলে তাদের দেওয়ালগুলি পুরু ও রুগ্ন হয়ে পড়ে এবং রক্তবাহিত প্রোটিন যেমন অ্যালবুমিন দেওয়ালের মধ্য দিয়ে ধমনীর বাইরে ক্ষরিত হয়। ফলে ধমনীগুলির আয়তন আরো সঙ্কুচিত হওয়ার জন্য রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়। সেজন্য নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায়। হার্টের মাংসপেশীর অসুখ (cardiomyopathy), কিডনীর অসুখ (nephropathy), চোখে রেটিনার অসুখ (retinopathy) ও নার্ভের অসুখ (neuropathy)—

এসবই ডায়াবিটিসে ঐ সূক্ষ্ম ধমনীগুলির দুরবস্থার সাক্ষী। নানা আকারের ধমনীর অসুখ ও নার্ভের অসুখ পায়ে দুরারোগ্য পচনশীল ক্ষত (gangrene) সৃষ্টি করতে পারে এবং তার জন্য অনেক সময় পা ব্যবচ্ছেদেরও (amputation) প্রয়োজন হয়। আশার কথা, চিকিৎসার দ্বারা রক্তে সুগারের মাত্রা যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক মানের কাছে যদি ধরে রাখা যায়, তাহলে এই ধরনের জটিল উপসর্গগুলি আজ অনেক ক্ষেত্রেই আয়ত্তে আনা সম্ভব।

ডায়াবিটিস-রোগীদের হার্ট অ্যাটাক হলেও অনেক সময় বুকের ব্যথা নাও থাকতে পারে (painless বা silent heart attack), কিন্তু তার জন্য হার্টের জটিল উপসর্গগুলি অব্যাহত থাকে। এদের মৃত্যুর হার যাদের ডায়াবিটিস নেই কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হয়েছে—তাদের তুলনায় অনেক বেশি। হার্ট ফেলিওর (heart failure), শক (shock), হার্টের ক্রিয়াশক্তির সম্পূর্ণ বিলোপ (collapse)—এসবই ডায়াবিটিসের নির্মমতার মর্মন্তুদ সাক্ষী।

সমস্ত পরিপাকযন্ত্র—খাদ্যনালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র, লিভার (gastro-intestinal tract and liver)—এসবই ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হতে পারে। ফলে নানা ধরনের পেটের অসুখ হয়। পুরুষের ইন্দ্রিয়দৌর্বল্য ডায়াবিটিসে প্রায়শই দেখা যায় এবং তার জন্য বিবাহিত জীবনে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা

ডায়াবিটিসের টাইপ-১ প্রথম থেকেই ইনসুলিনের ওপর নির্ভরশীল। তাই ইনসুলিনের প্রয়োজন রোগনির্ণয়ের শুরু থেকেই। তবে চিকিৎসার প্রথম পদক্ষেপ হবে বয়স এবং শারীরিক কর্মতৎপরতা অনুযায়ী উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা। তার জন্য বহু ধরনের খাদ্যতালিকা খাদ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ দিয়ে থাকেন। তবে মোটামুটিভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীদের বা আরো কম বয়স্কদের প্রয়োজন যথেষ্ট খাদ্য-ক্যালরীর (food calories) এবং তা দেহের ব্যবহারযোগ্য (metabolize) করার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ইনসুলিন সরবরাহ করা। প্রথম প্রথম রক্ত ও পরে মূত্র পরীক্ষা করেও দেখা হয় সুগার ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা। ঠিক তখনকার অবস্থা এর থেকে জানা গেলেও গত ২ বা ৩ মাস ধরে রক্তে সুগার কতদূর সুনিয়ন্ত্রিত ছিল তা জানতে হলে গ্লাইকেটেড (glycated) বা গ্লাইকোসিলেটেড (glycosylated) হিমোগ্লোবিন (hymoglobin)—যাকে বলা হয় HbA_1C—মাপা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এর পরিমাপ রক্তের ৬ শতাংশের নিচে থাকে। তার বেশি হলে বুঝতে হবে, রক্তে সুগার গত কয়েক মাস ধরে ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। সকালে খালিপেট অবস্থায় নেওয়া রক্তে সুগারের পরিমাপ প্রতি ডেসিলিটারে ১২০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা বাঞ্ছনীয়। আজকাল আবার বলা হচ্ছে, ১১০ বা তারও নিচে এর স্বাভাবিক পরিমাপ। বাস্তব ক্ষেত্রে চিকিৎসাব্যবস্থা (খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ও দৈহিক ওজন কমানো দিয়ে শুরু) আরম্ভ করতে বলা হয় যদি রক্তে সুগার প্রতি ডেসিলিটারে ১৪০ মিলিগ্রামের বেশি থাকে। এটা অবশ্য ১০ থেকে ১৪ ঘণ্টা উপবাসের পর রক্তে মাপা সুগারের পরিমাণ। স্বাভাবিক অবস্থায় যাদের ডায়াবিটিস নেই তাদের খাওয়ার ২ ঘণ্টা পরে (post prandial) রক্তে সুগারের পরিমাণ প্রতি ডেসিলিটারে ১৪০ মিলিগ্রামের নিচে থাকে। ডায়াবিটিস-রোগীর ক্ষেত্রে এর পরিমাপ যদি ১৮০

মিলিগ্রাম ছাড়িয়ে যায়, তাহলে আমেরিকান ডায়াবিটিস অ্যাসোসিয়েশন চিকিৎসা করতে পরামর্শ দেন। নির্দেশ দেওয়া হয়, এই পরিমাপটি চিকিৎসার দ্বারা ১৮০ মিলিগ্রামের নিচে রাখার। রাত্রে শোওয়ার আগে স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় রক্তে সুগার প্রতি ডেসিলিটারে ১২০ মিলিগ্রামের নিচে থাকে এবং ঐ সংস্থা চিকিৎসা শুরু করতে পরামর্শ দেন যদি এই মাপটি ১৬০ মিলিগ্রামের বেশি হয়। লক্ষ্য হলো—প্রতি ডেসিলিটারে সুগারের পরিমাণ রক্তে ১০০ থেকে ১৪০ মিলিগ্রামের মধ্যে ধরে রাখা। হিমোগ্লোবিন A_1C যদি ৮%-এর বেশি হয়, তাহলে চিকিৎসা করে তা ৭%-এর নিচে রাখতেও এই সংস্থা উপদেশ দেন।

ডায়াবিটিস কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লিকেশন্স ট্রায়াল (Diabetes Control and Complications Trial–DCCT) ৯ বছরের গবেষণায় প্রমাণ করেছে যে, ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় (intensive therapy) রক্তে সুগার কমিয়ে স্বাভাবিক সীমায় রাখতে পারলে চোখে রেটিনার অসুখ এবং অন্যান্য সঙ্কীর্ণ আয়তনের ধমনীর দুরবস্থা (small vessel disease) আয়ত্তে আনা আজ সত্যিই সম্ভব। তার জন্য দিনে ৩ অথবা ৪ বারও ইনসুলিন নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে সুগার অত্যন্ত কমে বাড়ে (brittle diabetes), সেখানে পাম্পের সাহায্যে ইনসুলিন ত্বকের ঠিক নিচের স্তরে একটানাভাবে ফোঁটায় ফোঁটায় ঢেলে দেওয়া হয় (continuous subcutaneous insulin pump)। এই পদ্ধতিতে খাওয়ার আগেও প্রয়োজন হলে রোগী পূর্বনির্দেশমত বোতাম টিপে সঠিক পরিমাণ ইনসুলিন নিজে নিতে পারে।

বহু বছর অনুশীলন করে বৈজ্ঞানিক ক্লাইন (Klein) দেখিয়েছেন যে, রক্তে হিমোগ্লোবিন A_1C যত বাড়ে (অর্থাৎ ব্লাড সুগার গত কয়েকমাস ধরেই নিয়ন্ত্রিত থাকছে না), পায়ে অ্যামপুটেশনের (amputation বা ব্যবচ্ছেদ) হারও সেই অনুপাতে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ডায়াবিটিসে রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার বেড়ে থাকলেও সেই একই অবস্থা তিনি লক্ষ্য করেছেন। করোনারি অসুখের ক্ষেত্রেও তাই—হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ে যদি রক্তে সুগার সুনিয়ন্ত্রিত না হয়। তাই আজ সবাই উঠেপড়ে লেগেছেন রক্তে সুগারের পরিমাণ দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য (stricter control of blood sugar)। কিভাবে তা করা সম্ভব তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করা

ডায়াবিটিসের চিকিৎসার প্রথম সোপান হলো দেহের ওজন কমানো। এটা অবশ্যই টাইপ-২ স্থূলাঙ্গ (obese) ব্যক্তিদের পক্ষে প্রযোজ্য। খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়াম করে ওজন কমানো কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হলেও এটাই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী প্রাথমিক চিকিৎসা এই দ্বিতীয় টাইপের ডায়াবিটিস-রোগীদের জন্য। এমনকি ৫ থেকে ১০ পাউন্ড ওজন কমলেও উপকার বুঝতে পারা যাবে। আদর্শ ওজন নির্ণয় করা হয় 'বডি মাস ইনডেক্স' (Body Mass Index–BMI) থেকে। এটি মাপা খুবই সহজ। দেহের ওজন কিলোগ্রামে মেপে সেটিকে দৈহিক উচ্চতার বর্গমিটার দিয়ে ভাগ করা হয় (Weight in Kg $\div$ Height in m^2)। এই BMI যদি ২৫-এর বেশি হয়, তাহলে ওজন কমানোর প্রয়োজন। এটি ২০ থেকে ২৫-এর মধ্যে রাখাই বাঞ্ছনীয়। শুধু খাবারের ধরন (quality) পরিবর্তন করলেই চলবে না, তার পরিমাণও

(quantity) কমিয়ে আনতে হবে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে প্রায়ই বয়স্কদের ওজন বাড়ে যদি না সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

কত ক্যালরি কম খেতে হবে?

২৫ বছরের ওপর বছর-প্রতি দৈনিক গড়ে ১০ ক্যালরি করে খাদ্য-ক্যালরি কম খেলে শরীরের ওজন বজায় রাখা সহজ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ৬০ বছর বয়স্কের (৬০-২৫=৩৫; ৩৫x১০=৩৫০) দিনে ৩৫০ খাদ্য-ক্যালরি ২৫ বছর বয়স্কের তুলনায় কম প্রয়োজন হয়। যদি প্রতিদিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ১০০ খাদ্য-ক্যালরিও সঞ্চিত হয় তাহলে ১ বছরে ১০ পাউন্ড বাড়তে পারে।

কি খাদ্য যতদূর সম্ভব পরিহার্য

চিনিবহুল রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট (refined carbohydrate) দ্বারা তৈরি খাবার যতদূর সম্ভব পরিহার করা ভাল।

কি ধরনের খাদ্য বাঞ্ছনীয়?

শাকসবজি, ভাত, ডাল, রুটি, আলু, মাছ বা মুরগীর মাংস—এসবই উপযুক্ত খাদ্য। রোজ কিছু ফলও খাওয়া প্রয়োজন। তবে খাদ্যের পরিমাণ ও খাদ্য-ক্যালরি চিকিৎসক এবং খাদ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্দেশ অনুযায়ী অনুসরণ করতে হবে। বিভিন্ন মানুষের দৈহিক প্রয়োজন বিভিন্ন। কারো প্রয়োজন ১৫০০ থেকে ১৮০০ ক্যালরির। কারো বা তার কম কিংবা বেশি। তাই এবিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শমতো চলা দরকার। আরো মনে রাখতে হবে, কোলেস্টেরল সমস্যা এবং উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবিটিসের সঙ্গে প্রায়শই জড়িত থাকে। তাই খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের তারতম্য সেইমতো করা প্রয়োজন। স্নেহবহুল খাদ্য (দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্য, ঘি, মাখন, পনীর, মাংস, ডিমের কুসুম, কাজুবাদাম, নারকেল তেল, তাল থেকে তৈরি তেল ইত্যাদি) ও নুন খাওয়া যতদূর সম্ভব কমানো বাঞ্ছনীয়। ভাজার বদলে শেঁকা (baking) বা সিদ্ধ খাবারে ক্যালরি কম থাকে।

ব্যায়ামের ব্যবস্থা কি?

সপ্তাহে ৩ বা ৪ দিন ২০ থেকে ৩০ মিনিট যতদূর সম্ভব পা চালিয়ে হাঁটা ভাল ব্যায়াম। যাদের হার্টের অসুখ ধরা পড়েছে বা পায়ে বাতের জন্য বা ধমনীতে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ার জন্য হাঁটাচলার অসুবিধা হচ্ছে তাদের চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যায়ামের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সম্ভব হলে এইসব ক্ষেত্রে সাঁতার কাটা খুবই ভাল ব্যায়াম। খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়ামের সাহায্যে দৈহিক ওজন কমলে ইনসুলিনের প্রতিবন্ধক অবস্থার (টাইপ-২ ডায়াবিটিসে) ক্রমোন্নতি হয়। এমনকি অনেক সময় ডায়াবিটিসের চিকিৎসার জন্য তখন ওষুধের দরকার তেমন নাও হতে পারে।

কি ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কখন?

যদি খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়ামের দ্বারা ওজন কমানো সত্ত্বেও কয়েক মাসের মধ্যে রক্তে সুগারের পরিমাণ পূর্ব লক্ষ্যমত না কমে, তাহলে যারা মেদবহুল নয় তাদের জন্য সালফোনাইল ইউরিয়া (sulfonyl urea) জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এটি পূর্বব্যবস্থার সঙ্গে যোগ করা হয়—তার পরিবর্তে নয়। গ্লাইবিউরাইড (glyburide) বা ঐ শ্রেণীর অন্যান্য ওষুধ টলবিউটামাইড

(tolbutamide), টোলাজামাইড (tolazamide), ক্লোরপ্রোপামাইড (chlorpropamide), গ্লিপিজাইড (glipizide) ইত্যাদি সকালে খাওয়ার আগে একবার বা প্রয়োজন হলে সন্ধ্যায় খাওয়ার আগে আরেকবার সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে। চিকিৎসকের নির্দেশমতো ওষুধের ডোজ (dose) অনুসরণ করতে হবে। সালফোনাইল ইউরিয়া জাতীয় ওষুধগুলি অগ্ন্যাশয়ের বিটাকোষগুলিকে তৈরি ইনসুলিন পাঠাতে সাহায্য করে। তাই যে অবস্থায় ইনসুলিনের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়, যেমন বিটাকোষগুলি যদি বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এই ওষুধে কোন কাজ হবে না। তখন অবশ্যই বাইরে থেকে ইনসুলিন সরবরাহ করতে হবে।

মেটফরমিন (metformin) বা গ্লুকোফাজ (glucophage)

যারা মেদবহুল কিন্তু রক্তে সুগার বাড়লেও ৩০০ মিলিগ্রামের নিচে থাকে, তাদের জন্য মেটফরমিন ভাল ওষুধ। দিনে ৫০০ মিলিগ্রাম থেকে শুরু করে ২ বা ৩ গ্রাম পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক সময় সালফোনাইল ইউরিয়ার একক ব্যবহারে রক্তে সুগার নিয়ন্ত্রিত না হলে মেটফরমিন বা একারবোজ যোগ করা হয়ে থাকে। মেটফরমিন লিভারের ওপর কাজ করে গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ তৈরি কমিয়ে দেয় এবং দেহের বিভিন্ন কোষে, বিশেষ করে মাংসপেশীতে গ্লুকোজ অনুপ্রবেশে ও তার উপযুক্ত ব্যবহারে সাহায্য করে। ওষুধটি অগ্ন্যাশয়ের বিটাকোষগুলি থেকে সালফোনাইল ইউরিয়ার মতো ইনসুলিন নিষ্ক্রান্ত হতে সুযোগ দেয়, ক্ষুধা কমায়—ফলে শরীরের ওজনও কমে যায়। শরীরের ওজন কম হলে ইনসুলিন-গ্রাহক পরমাণুরাও কর্মতৎপর হয় এবং ইনসুলিন-প্রতিবন্ধক অবস্থার উন্নতি হয়। সালফোনাইল ইউরিয়া ও মেটফরমিনের যুগ্ম ব্যবহারে রক্তে প্রতি ডেসিলিটারে সুগার প্রায় ৭০ মিলিগ্রাম কমে যায় এবং দেখা যায় যে, হিমোগ্লোবিন A_1C-ও ২% কমে। লিভার, কিডনী কিংবা হার্টের অবস্থা ভাল না থাকলে কিন্তু মেটফরমিন ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন।

ট্রগলিটাজোন (troglitazone) বা রেজুলিন (rezulin)

ইনসুলিন-প্রতিবন্ধক অবস্থার আয়ত্তে আনার জন্য আজকাল যে-ওষুধগুলি ব্যবহার হচ্ছে তাদের মধ্যে ট্রগলিটাজোন বা রেজুলিনের স্থান সর্বপ্রথম। অন্য ওষুধগুলি (মেটফরমিন, একারবোজ এমনকি সালফোনাইল ইউরিয়া) পরোক্ষভাবে ইনসুলিন-প্রতিবন্ধক অবস্থায় সাহায্য করে। কিন্তু ট্রগলিটাজোনের প্রাথমিক কাজই হলো প্রত্যক্ষভাবে ইনসুলিন গ্রাহক পরমাণুগুলির সংখ্যা ও তাদের ইনসুলিন-গ্রহণশীলতা (insulin sensitivity) বাড়িয়ে দেওয়া। এই গ্রাহক পরমাণুগুলি (insulin receptors) বিশেষ করে লিভার, মাংসপেশী ও শরীরের চর্বিকোষ গোষ্ঠীতে (adipose tissue) সন্নিবেশিত থাকে। ইনসুলিন প্রতিবন্ধক অবস্থার উন্নতি হলে রক্তে সুগারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করতে নিজ দেহজাত ইনসুলিনই তখন কার্যকরী হতে পারে। তাই এই জাতীয় ওষুধগুলি সত্যিই সম্ভাবনাবহুল। দেখা যায় যে, প্রতিদিন ২০০ থেকে ৪০০ মিলিগ্রাম ট্রগলিটাজোন ব্যবহার করলে বাইরে থেকে যোগানো ইনসুলিনের ডোজ কম লাগতে পারে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ইনসুলিন নেওয়ার প্রয়োজনই তখন হয়

না। কিন্তু লিভার খারাপ থাকলে ট্রগলিটাজোন ব্যবহার করা যাবে না। কিডনীর অবস্থা খারাপ থাকলেও ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

একারবোজ (acarbose)

খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিপাকে যে-ওষুধগুলি বাধা দেয় এবং রক্তে গ্লুকোজ সরবরাহ কমে যায়, তাদের মধ্যে একারবোজ অন্যতম। পরোক্ষভাবে একারবোজও ইনসুলিন-প্রতিবন্ধক অবস্থার উপশম করতে সাহায্য করে। এককভাবে অথবা সালফোনাইল ইউরিয়াদের সঙ্গে যুগ্মভাবে ব্যবহার করলে হিমোগ্লোবিন A_1C, ১ থেকে ১.৫% পর্যন্ত কমতে দেখা যায়। খাওয়ার পরে যাদের রক্তে সুগারের পরিমাণ বেশ বেড়ে যায়—তাদের পক্ষে সালফোনাইল ইউরিয়াতে তেমন উপকার না হলে একারবোজ যোগ করা হয়। তাতে অনেক সময় ২% পর্যন্ত হিমোগ্লোবিন A_1C কমতে দেখা গেছে। যাদের কিডনীর অবস্থা স্বাভাবিক নয় অর্থাৎ রক্তে ক্রিয়াটিনিন (creatinine) প্রতি ডেসিলিটারে ১.৬ মিলিগ্রাম বা তার বেশি, তাদের মেটফরমিন ব্যবহার না করে একারবোজ ব্যবহার করাই সমীচীন।

ইনসুলিন

রক্তে প্রথম থেকেই সুগারের পরিমাণ প্রতি ডেসিলিটারে ৪০০ মিলিগ্রাম বা তার বেশি থাকলে অথবা ট্যাবলেট জাতীয় পূর্বোক্ত ওষুধগুলিতে ভাল ফল না পেলে ইনসুলিনের ব্যবস্থা সাধারণত করা হয়। এছাড়া বিশেষ বিশেষ শরীরের অবস্থায়ও ইনসুলিনের প্রয়োজন হয়। যেমন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা, অস্ত্রোপচার, জটিল অসুখ যেমন নিউমোনিয়া ইত্যাদির সময়ে রক্তে সুগার নিয়ন্ত্রণে ইনসুলিন অবশ্যই উপযুক্ত ওষুধ। ইনসুলিনের অসুবিধা হলো, ইঞ্জেকশন নিতে হবে এবং একাধিকবার। রোগী যখনই সম্ভব নিজেই নিজেকে ইঞ্জেকশন দেয়। আজকাল আর জান্তব (গরু, শুয়োর) অগ্ন্যাশয় থেকে তৈরি ইনসুলিন বড় একটা ব্যবহার হয় না—মানুষের দেহজাত ইনসুলিনই ব্যবহার হচ্ছে। তার জন্য অ্যালার্জি ও অন্যান্য উপসর্গ তুলনামূলকভাবে কম হয়। ডায়াবিটিস যতই সাঙ্ঘাতিক হবে এবং রক্তে সুগার নিয়ন্ত্রণ করা ট্যাবলেট দ্বারা সম্ভব হবে না তখন ইনসুলিনের সাহায্য নিতে হবে। অবশ্য আগেই বলেছি, প্রথম টাইপের ডায়াবিটিসে শুরু থেকেই ইনসুলিনের প্রয়োজন হয়। আশার কথা, নতুন গবেষণা দ্বারা ক্যাপসুলের সাহায্যে ইনসুলিন ব্যবহার (ট্যাবলেটের মতো) ভবিষ্যতে সম্ভব হতে চলেছে।

ইনসুলিনের নানা প্রকারভেদ আছে। রেগুলার (regular) ইনসুলিন ইঞ্জেকশন খাওয়ার অন্তত আধঘণ্টা আগে নেওয়া প্রয়োজন। এটা বেশির ভাগ রোগীর পক্ষে অসুবিধাজনক। আরো একটি উদ্বেগের কারণ হলো, ঠিক খাওয়ার সময়ে যদি খাওয়া না হয় বা যদি খাবার আসতে দেরি হয়, যেমন কোন রেস্তোঁরায় বা হাসপাতালে, তাহলে রক্তে ইনসুলিনের প্রভাবে সুগার বেশ কমে গিয়ে হাইপোগ্লাইসিমিয়া (রক্তে সুগারের পরিমাণ স্বাভাবিকের অনেক নিচে নামা) অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। হাইপোগ্লাসিমিয়ায় রোগী অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে, তবে তাড়াতাড়ি ঘন সুগার-মিশ্রিত জল খাওয়ালে সুস্থ হয়ে ওঠে। হাইপোগ্লাইসিমিয়ার লক্ষণগুলি আগে থাকতেই শেখানো হয়। ট্যাবলেট জাতীয় ওষুধগুলি, বিশেষ করে আগে বর্ণিত সালফোনাইল ইউরিয়া-গোষ্ঠীও

হাইপোগ্লাইসিমিয়ার কারণ হতে পারে। তবে নতুন তিনটি মেটফরমিন, ট্রগলিটাজোন এবং একারবোজে তার সম্ভাবনা খুবই কম। ওষুধ খাওয়ার বা ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নেওয়ার পর সময়মত খাদ্য না খেলে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার উপসর্গ দেখা দেয়। রোগী তখন তাড়াতাড়ি সঙ্গে রাখা কিছু সুগার কিউব বা মিষ্টিজল খেয়ে নিয়ে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, ঘাম হওয়া, শরীর কাঁপা, পেট খালি ভাব, ঘন ঘন হাই ওঠা—এসমস্তই হাইপোগ্লাইসিমিয়ার লক্ষণ। বেশিক্ষণ হাইপোগ্লাইসিমিয়া থাকলে জ্ঞান হারানোর সম্ভাবনা, তাই এই বিষয়ে আগে থাকতে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এব্যাপারে চিকিৎসক বা ডায়াবিটিস নার্সের পরামর্শমতো চলা অবশ্যকর্তব্য।

রেগুলার ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নেওয়া ছাড়াও মধ্যম মেয়াদী (medium duration) ও দীর্ঘমেয়াদী ইনসুলিনের (নানা ধরনের) ব্যবস্থাও চিকিৎসক দিয়ে থাকেন। অনেক সময় ট্যাবলেটের সঙ্গেও ইনসুলিন যোগ করা হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, প্রথম ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ উপরি উক্ত তিনটি নতুন ওষুধের যেকোনটি এককভাবে শুরু করে দেখা উচিত। যদি খালি পেটে মাপা রক্তে সুগারের পরিমাণ তার পরেও প্রতি ডেসিলিটারে ১৪০ মিলিগ্রামের নিচে না নামে অথবা হিমোগ্লোবিন A_1C-ও ৮%-এর নিচে না থাকে তাহলে সালফোনাইল ইউরিয়া ঐ ওষুধটির সঙ্গে আরো ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের জন্য যোগ করা দরকার। এর পরেও যদি পূর্বনির্ধারিত মাত্রায় রক্তে সুগার বা হিমোগ্লোবিন A_1C না কমে তাহলে সালফোনাইল ইউরিয়া বন্ধ করে লেন্টে (lente) ইনসুলিন বা দীর্ঘমেয়াদী NPH ইনসুলিন শুরু করা সমীচীন। সঙ্গে ট্রগলিটাজোন বা রেজুলিন যুক্ত থাকা ভাল। ইনসুলিনের ডোজ প্রতিটি রোগীর নিজস্ব প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে। চিকিৎসক শুরু করেন ৮ থেকে ১০ ইউনিট প্রতি সন্ধ্যায় খাওয়ার আগে একবার করে এবং ডোজ বাড়ান সকালে রক্তে সুগারের পরিমাণ অনুযায়ী। প্রয়োজন হলে ইনসুলিন-পাম্পও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় টাইপের ডায়াবিটিসে ইনসুলিন দেওয়া সত্ত্বেও যদি হিমোগ্লোবিন A C ৮.৫%-এর বেশি থাকে এবং প্রতিদিন ৩০ ইউনিটের বেশি ইনসুলিনেও কাজ না হয়, তাহলে তাদের পক্ষে ট্রগলিটাজোন রোজ ২০০ থেকে ৪০০ মিলিগ্রাম যোগ করা প্রশস্ত।

লাইসপ্রো ইনসুলিন কি?

লাইসপ্রো (LISPRO) ইনসুলিন মানবদেহজাত ইনসুলিন পরমাণুর সামান্য পরিবর্তিত অবস্থা। এতে লাইসিন ও প্রোলীন (lysine & proline) নামক দুইটি অ্যামাইনো অ্যাসিড (amino acid) ইনসুলিন-পরমাণুতে একে অপরের স্থান বদল করেছে। ফলে ত্বকের নিচে ইঞ্জেকশন করলে খুব তাড়াতাড়ি ইনসুলিন রক্তে মেশে এবং তার সুগার-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রায় ৪ ঘণ্টা থাকে। রেগুলার ইনসুলিনের ক্ষেত্রে ইঞ্জেকশনের পর সেটি রক্তে মিশতে কিন্তু ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময় নেয়—তবে তার সুগার-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। তার জন্য হাইপোগ্লাইসিমিয়ার সম্ভাবনাও লাইসপ্রো ইনসুলিনের চেয়ে রেগুলার ইনসুলিনে বেশি থাকে। লাইসপ্রো ইনসুলিনের ব্যবহার সম্প্রতি চালু হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী অভিজ্ঞতা সময়সাপেক্ষ।

প্রতিটি রোগীর দৈনিক ইনসুলিনের প্রয়োজন ও ডোজ আলাদা। এগুলি পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করে নির্ণয় করা হয় (trial method)। চিকিৎসক, ডায়াবিটিস নার্স, খাদ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ, রোগী ও পরিবার—সকলেই ডায়াবিটিস চিকিৎসায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা

ডায়াবিটিস অসুখে রক্তে সুগারের পরিমাণ সুনিয়ন্ত্রিত হলে (হিমোগ্লোবিন A_1C ৭%-এর নিচে) এবং বহুদিন ধরে তা বজায় রাখতে পারলে জটিল উপসর্গগুলিকে প্রতিরোধ বা উপশম করা আজ অনেকাংশেই সম্ভব। কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনার ও রক্তের উচ্চচাপের চিকিৎসা তার সঙ্গে চালাতে হবে। কোলেস্টেরল কমানোর জন্য খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়াম ছাড়াও স্ট্যাটিন (statin) জাতীয় ওষুধের (lovastatin, pravastatin, simvastatin এবং সম্প্রতি শক্তিশালী atorvastatin) প্রয়োজন প্রায়ই হয়ে থাকে। লক্ষ্য হলো—LDL বা মন্দ কোলেস্টেরল (bad cholesterol) প্রতি ডেসিলিটারে ১০০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা এবং ট্রাইগ্লিসারাইডস সম্ভব হলে ২০০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা। প্রতিদিন একটি করে এন্টেরিক কোটেড (enteric coated) অ্যাসপিরিন (aspirin) ট্যাবলেট (পাকস্থলীর জন্য বাধা না থাকলে বা অ্যালার্জি না থাকলে) ব্যবহার করা প্রয়োজন। রক্তের উচ্চচাপের উপশমের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শমতো ওষুধ নিয়মিত খাওয়া অবশ্যই দরকার এবং তার জন্য যদি বিশেষ কোন শারীরিক বাধা না থাকে তাহলে বিশেষ করে অ্যাঞ্জিওটেনশিন (angiotensin), কনভার্টিং (converting), এনজাইম (enzyme), ইনহিবিটরস (inhibitors) জাতীয় ওষুধ চিকিৎসকের নির্দেশমত খাওয়া ভাল। এতে শুধু রক্তের উচ্চচাপই নয়, হার্ট এবং কিডনীও উপকৃত হতে পারে। তাই ব্লাড প্রেসার কমানোর জন্য এই পর্যায়ে ক্যাপটোপ্রিল (captopril), এনালাপ্রিল (enalapril), লাইসিনোপ্রিল (lisinopril) জাতীয় ওষুধগুলি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন প্রতিটি ক্ষেত্রে। কিডনির অবস্থার ক্রমাবনতি হলে এই মূল্যবান ওষুধগুলি ব্যবহার করা কঠিন হয়ে পড়বে। তবে সুচিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চললে ও ঠিকমত ওষুধের ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার হবে, সন্দেহ নেই।

ভবিষ্যতে কৃত্রিম অগ্ন্যাশয় (artificial pancreas) ব্যবহৃত হবে, হয়তো ব্যাপকভাবেই। অগ্ন্যাশয় ট্রানসপ্লানটেশনও বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে, কিন্তু বাধা এখনো প্রচুর রয়েছে। পরে সুযোগমতো এবিষয়ে আলোচনার অবকাশ রইল।* □

*১০০ বর্ষ, ৬ সংখ্যা

ঈশ্বরতনয় যীশু

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

পুষ্পমধ্যে যেরূপ সহস্রদল পদ্ম, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে যেরূপ সুধাকর চন্দ্র, পশুকুলের মধ্যে যেরূপ পশুরাজ সিংহ, তদ্রূপ মানবজাতির মধ্যে কখনো কখনো এরূপ পুরুষ জন্মলাভ করেন, যাঁহাদের অলৌকিক জীবন ও কার্যাবলী তাঁহাদিগকে Super-man—মহাপুরুষ বা অবতার প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়া মানব সাধারণের মধ্যে চিরপূজ্য ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে। তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন আমাদেরই মতো এই রক্তমাংসের তনু লইয়া, তাঁহারা বর্ধিত হয়েন আমাদেরই মতো খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহারাও জর্জরিত হয়েন আমাদেরই মতো এই জরা-ব্যাধির প্রপীড়নে, কিন্তু মানবের এই সাধারণ দৃষ্টির অন্তরালে তাঁহাদের মধ্যে এমন একটি হৃদয় ও মনের অস্তিত্ব বিরাজ করে যাহা জগতের সমগ্র নরনারীর অপরিসীম দুঃখে সদাই কাতর, এবং যে-দুঃখের অপনোদন নিমিত্ত তাঁহারা পৃথিবীর সমুদয় বেদনা-ভার অনন্তকালের জন্য ভোগ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। মনের এই অসীম শক্তি ও হৃদয়ের এই অপূর্ব বিশালতার বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহাদের ভক্তগণ তাঁহাদিগকে ঈশ্বরাংশ সম্ভূত Son of God বা ঈশ্বরপুত্র অথবা স্বয়ং ঈশ্বর বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। আমরা আজ যাঁহার আগামী জন্মদিবসের (Christmas-Eve) পুণ্যস্মৃতি লইয়া আনন্দোৎসব করিতে যাইতেছি, তিনি উক্ত অমানব পুরুষগণের মধ্যে অন্যতম; যিনি অর্ধ পৃথিবীর পাপ-ভার অদ্যাপিও মোচন করিতেছেন, যাঁহার শক্তি অর্ধ পৃথিবী এখনো শাসন করিতেছে। কিঞ্চিৎন্যূন প্রায় দুই সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, এই দেব-মানব এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের একটি প্রাচীনতম জাতির মধ্যে কোন ক্ষুদ্র সূত্রধার পরিবারে মাতা মেরির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাপুরুষের আবির্ভাবের পর দীর্ঘ বিংশ শতাব্দী কালগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে কত রাজ্য-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব ও ধর্ম-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে; কত শক্তিমান নরপতি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সৈন্যাধ্যক্ষ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক উঠিয়াছে ও ধ্বংস হইয়াছে, সেইসঙ্গে মানব মনেরও কত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তাই কাল-সমুদ্রের উপকূলে দাঁড়াইয়া আমরা এই মহাপুরুষের অস্তিত্ব লইয়া আজ কত সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ন্যাজারেথবাসী 'যীশু' নামক কোন ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন না। তাঁহার জন্ম, কর্ম সকলই কাল্পনিক—মিথ্যা। ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পর যখন তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণ পৃথিবীর সর্বত্র তাঁহার বাণী ঘোষণা করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রচারকার্যে এশিয়া মাইনরে আগমন করেন। তাঁহারাই বর্তমান খ্রীস্টধর্ম নামক এই নব ধর্মের জন্মদাতা। ইহার অনেক অকাট্য প্রমাণও তাঁহারা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও আমাদের অনুমাত্র ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের

ব্যক্তিত্ব যদি স্বীকার না করি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও যদি অপ্রামাণিক হইয়া যায় তথাপি গীতার অলৌকিক শিক্ষা কোথায় যাইবে? নচিকেতার উপাখ্যান যদি মিথ্যা হয় তথাপি প্রসিদ্ধ কঠোপনিষদের অসীম শক্তিপূর্ণ উপদেশাবলী কোথায় বিলুপ্ত হইবে? তদ্রূপ ভগবান যীশুর অস্তিত্ব যদি বাস্তবিকই কেবল কাল্পনিক ও কবিত্বপূর্ণ হয়, তথাপি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া শোক-তাপহারী ধর্মের যে অপূর্ব বাণী ঘোষিত হইয়াছিল, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অপূর্ব শিল্পীর তুলিকা স্পর্শে মানব-চরিত্রের যে নিখুঁত ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার স্মৃতি ধরিত্রী বক্ষ হইতে কখনো মুছিয়া যাইবে না। আমরা দেখিতে পাই সত্যের অনুকরণ করিয়াই মিথ্যার সৃষ্টি। যদি তৎকালে বাস্তবিকই ঐরূপ একজন শক্তিমান মহাপুরুষের আবির্ভাব না হইয়া থাকে তাহা হইলে শত-শত বৎসর ধরিয়া এরূপ একটি ধর্মবিশ্বাস কোটি কোটি মানব মনে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে কোন্ শক্তিতে?

যাহা হউক, সকলেই দেখিবেন অবতার জীবন কেমন একটি সাধারণ-অসাধারণত্বের, দেব-মানবত্বের মিলনভূমি, এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধভাবের অপূর্ব সম্মিলন অবতার জীবনকে বড়ই মধুর করিয়া তুলে। খ্রীস্ট জীবনেও এই সত্য আমরা উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাইব। খ্রীস্ট যখন জন্মলাভ করিলেন তখন তদ্দেশে হেরড নামক এক নিষ্ঠুর নরপতি রাজত্ব করিতেন। ভবিষ্যদ্বক্তাগণের মুখে তিনি শুনিলেন, বেথেলহেমে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ইহুদীদিগের ভবিষ্যৎ রাজা। রাজা ভীত হইয়া এই শিশুর অন্বেষণে অনুচর পাঠাইলে সৌভাগ্যবশত যীশুর জনক-জননী উহা জানিতে পারিয়া শিশুপুত্রকে লইয়া মিশরদেশে পলায়ন করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর পিতা বসুদেব রাজা কংসের ভয়ে নবজাত পুত্রকে লইয়া যেরূপ পলায়ন করিয়াছিলেন— ইহাও অনেকাংশে তদ্রূপ। মিশরে কয়েক বৎসর অবস্থানের পর পিতা-মাতা যীশুকে লইয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্বক পুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। বর্তমান সময়ের অনুরূপ তখন পল্লীতে পল্লীতে স্কুল পাঠশালার এরূপ বাহুল্য ছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে যীশু যে 'গ্রীক', 'লাটিন' ও 'হিব্রু' ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার জীবনী পাঠে জানিতে পারি। কিন্তু যীশু-পরিবারের সাংসারিক অবস্থা সেরূপ স্বচ্ছল না থাকায় তিনি অধিক দিন বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলেন না। সুকুমার বয়সেই শিক্ষা পরিত্যাগপূর্বক গৃহকর্মে মনোনিবেশ করিতে হইল। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। অদ্যাবধি আমাদের দেশে নানা স্থান হইতে নরনারী যেরূপ কাশী, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিতে যায়—সেইসময় ইহুদিদেশে 'জেরুজালেম' নামক স্থানে অনেকে তীর্থ দর্শন মানসে গমন করিতেন। যীশুর মাতা-পিতাও পুত্রকে লইয়া তদ্দর্শনে গমন করিলেন। এইস্থানেই যীশুর 'গুরুভাবের' সর্বপ্রথম প্রকাশ। যীশুকে খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের সহিত তথায় গভীর শাস্ত্রালাপে নিযুক্ত দেখিয়া যীশুর মাতা-পিতা ও পণ্ডিতবর্গ সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ-প্রকাশ যেন মেঘবক্ষে বিদ্যুতের মতো ক্ষণিক। কেন না, আমরা দেখিতে পাই এই ক্ষণিক প্রকাশের পর সুদীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষ পুনরায় আত্মগোপন। নিজ জীবিকা অর্জনের জন্য সূত্রধারের কর্মে কঠোর পরিশ্রম করিয়া অতি সাধারণভাবেই যীশুর এই দীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল।

তখন ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। চতুর্দিকে অরাজকতা। দুর্বলের উপর প্রবলের ভীষণ অত্যাচার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকগণ কেবল যেন-তেন-প্রকারেণ প্রজাবর্গের ধন-দারাপহরণে সদা ব্যস্ত, জনসাধারণের নৈতিক জীবন তখন পশুজীবন হইতে কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে, ইহুদিগণও তখন প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ধর্মনামধেয় কেবল কতকগুলি নিয়মের অনুগমনকারী স্বদেশের এইরূপ ভীষণ পতনাবস্থার আবেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া আমাদের যীশুও গৃহকর্মে আত্মবিস্মৃত। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। যীশু আর অধিকদিন এরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলেন না। শীঘ্রই হৃদয়ে প্রবল বৈরাগ্যের সূচনা হইলে, বিষয় তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। যে-বস্তুর জন্য তাঁহার স্বজাতি ও জ্ঞাতিবর্গ সর্বদাই পাপাচারে রত, যীশুর সেইসমস্ত দ্রব্যে অতি অনিত্য বুদ্ধি আসিয়া তাঁহাকে গৃহকর্মে উদাসীন করিল। যীশু ভাবিলেন, 'এই পশুবৎ সাধারণ জীবন হইতে আর কি উৎকৃষ্টতর জীবন নাই? এই পাপময় মর-জগৎ ব্যতীত আর কি দ্বিতীয় স্বর্গরাজ্য নাই? ওগো কে আছ, আমায় পথ দেখাও—এই অন্ধকারময় কারাগার হইতে আমায় আলোকের রাজ্যে লইয়া যাও'। তৃষ্ণার জল মিলিল, 'জন' নামক এক উচ্চ সাধুপুরুষ আসিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। সমুদ্রের ঝিনুক স্বাতিনক্ষত্রের বিন্দু পরিমাণ বারি পান করিয়া যেরূপ অনন্ত সাগর গর্ভে ডুবিয়া যায় যীশুও তদ্রূপ সাধু-প্রদত্ত এই অমৃতবিন্দু পান করিয়া চত্বারিংশ দিবস গভীর সাধনসমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। ঐসময়ে প্রবল প্রলোভনসমূহ সাধনপথ হইতে যীশুকে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা পাইল; কাম আসিল ফুলশর হস্তে, লোভ আসিল তাহার সরস রসনা লইয়া—এইরূপে ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য প্রভৃতি সকল রিপুই আসিল—কিন্তু ব্যর্থ হইল তাহাদের সকল প্রচেষ্টা। যীশু সিদ্ধিলাভ করিলেন—স্বর্গের দ্বার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইল। *গৌতম সিদ্ধিলাভ করিয়া যেরূপ সকল নরনারীকে সম্বোধনপূর্বক* বলিয়াছিলেন—"তোমরা সকলেই চেষ্টা কর, সকলেই 'বুদ্ধত্ব' লাভ করিতে পারিবে—বুদ্ধত্ব কেবল একটি অবস্থা মাত্র—মানবসাধারণের উহাতে সমান অধিকার"—তদ্রূপ ভগবান মেরিতনয় যীশুও সাধনায় সিদ্ধিলাভপূর্বক স্থির থাকিতে পারিলেন না; যে-অমৃতের সন্ধান তিনি পাইলেন, তাহা জগতের জরামরণগ্রস্ত যাবতীয় নরনারী মধ্যে বণ্টন করিবার নিমিত্ত উদগ্রীব হইলেন। অদূরেই দেখিলেন, দুইজন ধীবর জাল পাতিয়া মৎস্য ধরিতেছে—তিনি তাহাদিগকে বলিলেন ঃ "Follow me and I will make you fishers of men."—"আমার অনুসরণ কর, আর মৎস্য ধরিতে হইবে না—আমি তোমাদিগকে জাল পাতিয়া মনুষ্য ধরিবার বিদ্যা শিখাইব।"

এইসময় হইতে যীশুর গুরুভাব ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তিনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এই অমৃতের বার্তা বহন করিতে লাগিলেন। একদিন যীশু দেখিলেন, শত-শত নরনারী তাঁহার উপদেশামৃত পান করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিতেছে। তদ্দৃষ্টে তিনি একটি পর্বতশিখরে আরোহণপূর্বক সেই অসংখ্য তৃষিত মানবকুলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

"Blessed are the poor, in spirit : for their is the kingdom of heaven.

"Blessed are they that mourn : for they shall be comforted.

"Blessed are they that hunger and thirst after rightousness : for they shall be filled.

"Blessed are the pure in heart for they shall see God.

"Blessed are they which are persecuted for righteousness sake : for their is the kingdom of heaven.

"Ask, and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you.

"Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal.

"But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust can corrupt and where thieves do not break through and steal.

"No man can serve two masters :—ye cannot serve God and mamon.

"If thy right hand offend thee cut it off and cast it from thee, for it is profitable for thee, that one of thy members should perish and not that thy whole body should be cast into hell."

তাঁহার এই উপদেশাবলীই পরে 'Sermon on the Mount' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

যীশু অভিজাতবর্গকে ঘৃণা করিতেন, গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে গ্রাহ্য করিতেন না—তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন পতিতদের মধ্যে—সমাজে যাহাদের কোন স্থান নাই, উচ্চাভিমানিগণ পশুবৎ যাহাদিগকে ঘৃণা করে, যাহাদের দুঃখে কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করে না, রোদনে কেহ উত্তর দেয় না। ভগবান বুদ্ধের মতো এই নীচ অস্পৃশ্যদিগকে স্বীয় অঙ্কে স্থান দিয়া যীশু জগতের সকল নরনারীর হৃদয় চিরকালের নিমিত্ত কিনিয়া লইয়াছেন। বুদ্ধদেব যেরূপ সেই আম্রপালী নাম্নী বারবনিতার গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়াছিলেন, যীশুও তদ্রূপ একদিন তৃষ্ণার্ত হইয়া মেরি ম্যাগডেল (Mary Magdaly) নাম্নী জনৈকা পতিতা রমণীকে বলিলেন ঃ "বৎসে! আমার তৃষ্ণা দূর কর—আমি তোমার জীবনের তৃষ্ণা দূর করিব।" এইরূপে পতিতগণের সহিত যীশুর অবাধ সংমিশ্রণের জন্য পুরোহিতকুল তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। তাহারা যীশুর নিকট কোন অভিযোগ করিতে সাহসী না হইয়া একদিন তদীয় শিষ্যবর্গকে অবিমিশ্র ঘৃণার সহিত জিজ্ঞাসা করিল ঃ "কিহে বাপুরা—তোমাদের গুরুদেব তো বেশ লোক! যত পাপী আর পতিতাদের সহিত বন্ধুত্ব!" শিষ্যগণের মুখে ঐকথা শ্রবণপূর্বক যীশু উত্তর করিলেন ঃ

"They that be whole need not a physician but they that are sick :— I am not come to call the righteous, but sinners to repentence."

সুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার প্রয়োজন নাই—পীড়িতদের জন্যই চিকিৎসকের আবশ্যক—তাই ধার্মিকদিগকে আমি না ডাকিয়া পাপীদিগকেই নিকটে আহ্বান করি। এইসমস্ত অতি সামান্য নগণ্য ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই যীশু তাঁহার দ্বাদশজন প্রধান শিষ্যকে বাছিয়া লইয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমস্ত

অবতারগণের লীলার প্রধানতম সহায়কগণ এই সাধারণ মানবের মধ্য হইতেই উঠিয়াছেন। যীশুর সর্বপ্রধান শিষ্যগণ কুলি, মালি, জেলে। বুদ্ধদেবের বেনিয়া, চাষা-ভূষা, নাপিত। চৈতন্যদেবেরও তদ্রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণেরও প্রধানতম শিষ্যগণ স্কুল-কলেজের কতিপয় নগণ্য বালক। যীশুর ভক্তগণের মধ্যে পিটার, এ্যান্ড্রু, জেমস, জন, ফিলিপ, বার্থালোমিউ, টমাস, ম্যাথু, দ্বিতীয় জেমস, থেডাস, সামন দি ক্যানানিয়ান ও জুডাসই সর্বপ্রধান এবং স্ত্রীভক্তগণের মধ্যে মার্থা, মেরি ও পতিতা রমণী মেরি মেগডেলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যীশু কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও রাজযোগের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন। গুরুভাবের সময় অনেক যৌগিক বিভূতি তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। জনৈক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্পর্শের দ্বারা রোগমুক্তি, জনৈকা বিধবার মৃত পুত্রের জীবনদান ও পাঁচ সহস্র নরনারীকে মাত্র পাঁচটি রুটি ও দুইটি মৎস্য দ্বারা উদর পূর্তি করিয়া আহার করানো, প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এরূপ আরো অসংখ্য অলৌকিক কার্য তাঁহার দ্বারা সংশাধিত হইয়াছিল—তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তিনি জীবদ্দশাতেই তাঁহার প্রধানতম শিষ্যগণকে লইয়া সঙ্ঘ গঠন করিতে আরম্ভ করেন। উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে প্রচারকার্যে প্রেরণ করিবার পূর্বে যীশু বলিয়াছেন ঃ "Provide neither gold, nor silver nor brass in your purses. "Nor scrip for your journey, neither two coats neither shoes nor yet staves."

যে ত্যাগিশ্রেষ্ঠ যীশু আকুমার ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করিয়া জগৎসমক্ষে ত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিলেন, যিনি একদিন ঘোষণা করিলেন ঃ "Behold the fowls of the air : for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly father feedeth them. Are ye not much better than they ? Therefore take no thought, saying what shall we eat ? or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed ?" আশ্চর্যের বিষয় সেই ত্যাগী শিরোমণি-প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায়ে আজ ত্যাগের বিন্দুমাত্র চিহ্নও পরিদৃষ্ট হয় না। হায়, কালের কি বিচিত্র গতি!

হিন্দুশাস্ত্র বলেন, 'সাধক দ্বৈতভূমি হইতে অদ্বৈতভূমিতে আরোহণ করিয়া পরব্রহ্মের সহিত একত্বানুভব করেন।' যীশুও জ্ঞানের মণিকোঠায় আরোহণ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ 'I and my father are one'—'আমি ও আমার পিতা এক' 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি' আমাদের এই শাস্ত্রবাক্যের সহিত যীশুর অনুভবসিদ্ধ বাক্য সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। এই অদ্বৈতবাণীই পরিশেষে তাঁহার জীবননাশের প্রধান কারণ রূপে শত্রু কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছিল। যীশু জানিতে পারিয়াছিলেন, বিপদের ঘন মেঘরাশি তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে করিতেছে। স্বার্থপর যাজককুল যীশু কর্তৃক তাহাদের সমস্ত পসার প্রতিপ বিনষ্ট ও ধর্মবিশ্বাস আক্রান্ত দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে নানারূপ অপমানিত ও নির্যাতিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু যীশু তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে অনুমাত্র বিচলিত হইলেন না। শেষে যাজককুল স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, এই পাপিষ্ঠকে একেবারে ধ্বংস করা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। যীশুও মৃত্যু অতি সন্নিকটে বুঝিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত প্রচারকার্যে ব্যাপৃত হইলেন, তাঁহার একজন প্রিয়তম সন্তানকে বিশ্বাসঘাতক ও শত্রুগণের সহিত ঘোর ষড়যন্ত্রে

সংশ্লিষ্ট জানিয়াও তাহাকে ক্ষমা করিলেন, তাঁহার জনৈক শিষ্য একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times."

ঈশ্বরতনয় উত্তর করিলেন—

"I say not unto thee, until seven times, but until seventy times seven."

এই বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করিয়া, যীশু জগৎকে দেখাইলেন—তিনি যাহা উপদেশ করেন, তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতে পশ্চাৎপদ নহেন।

অতঃপর যীশু ইহুদি যাজকগণের, অনুচরবর্গ ও রোমীয় সৈন্যগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া বিচারক সমক্ষে নীত হইলেন। উহার পূর্বদিবস সান্ধ্যভোজনে তিনি তাঁহার পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন : "বৎসগণ! ইহাই তোমাদের সহিত আমার শেষ ভোজন।" তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, "তিনি পাপকে ক্ষমা, পাপীদের সহিত সুব্যবহার ও নিজকে ঈশ্বরপুত্র বলিয়া প্রচার করেন।" বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন : "আপনি কি বলেন—আপনি 'Messiah' অর্থাৎ ঈশ্বরপুত্র?" কঠোর প্রাণদণ্ড ধ্রুব জানিয়াও যীশু নির্ভীকভাবে উত্তর করিলেন 'I am'—'হাঁ, আমি ঈশ্বরতনয়'। এই ঘটনা আমাদিগকে সমজাতীয় অন্য একটি ঘটনার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন কাশীপুর উদ্যানে রোগশয্যায় শায়িত। দেহাবসানের আর অল্পক্ষণ মাত্র বিলম্ব আছে। নিকটে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথ শোকার্ত ও সন্দিগ্ধ চিত্তে ভাবিতেছেন—"এখন যদি তিনি বলিতে পারেন—'তিনি ঈশ্বর'—তবে বিশ্বাস করিব।" শ্রীভগবান পুত্রের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন : "হাঁ বৎস যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।" যাহা হউক তিনি বধ্যভূমিতে নীত হইয়া হত্যাকারিগণ কর্তৃক অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন। আশ্চর্যের বিষয় এইরূপ নৃশংস অত্যাচারেও তাঁহার সৌম্য মুখমণ্ডল এতটুকুও সঙ্কুচিত বা ওষ্ঠদ্বয় হইতে একটিও অভিশাপ উচ্চারিত হইল না বরং তাঁহার হত্যাকারিগণকে ক্ষমা করিয়া তিনি করুণাময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"Father, forgive them, for they know not what they do"—"হে পিত! তাহারা অজ্ঞ, তাহাদের ক্ষমা কর।"

কথিত আছে, হত্যার তিন দিবস পরে যীশু তাঁহার সমাধি হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল মৃত্যু তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই—তিনিই মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন।

ভগবান যীশুখ্রীস্টের জন্ম, কর্ম ও ধর্মমতসমূহের সম্যক আলোচনা করা এইরূপ একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। জগতের সমগ্র নরনারী অনন্তকাল ধরিয়া চেষ্টা করিলেও ভগবানের লীলারহস্য লিখিয়া বা পড়িয়া কখনো শেষ করিতে পারে না। তাই খ্রীস্টের পরম ভক্ত সেন্ট জনের বাণীর অনুকরণ করিয়া বলিতে হয়—

And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written everyone, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen.* □

* ২৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা

তপস্বিনী রাবেয়া

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে প্রত্যেকটিই ঈশ্বরলাভের একটি পথ। মূল সত্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে বিচার করলে সব ধর্মই সমান। তবুও দেশ কাল ও সমাজের তারতম্যে বিভিন্ন রূপ নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে। ধর্মের এই বাইরের আকারটাই মানুষের চোখে পড়ে, তার সেটাকেই ধর্মের সর্বস্ব মনে করে মানুষ তৈরি করে ভেদ বিবাদের প্রাচীর।

সাধকদের বেলাও ঠিক একই কথা। সাধকদের পোশাক ভাষা আচার ব্যবহারগুলোকেই সর্বস্ব মনে না করে যদি তাঁদের অন্তর রাজ্য লক্ষ্য করবার শক্তি আমাদের থাকে তাহলে আমরা অতি পরিষ্কার দেখতে পাব, পৃথিবীর সব দেশের সব কালের সব সমাজের সাধকেরাই এক। সকলেই যেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাইরের দিক থেকে শত বিভিন্নতা নিয়েও সাধনার পথে তাঁরা সকলেই এক।

মুসলমান জগতে তুর্কী সাধিকা রাবেয়ার খুব নাম। রাবেয়ার কথা পড়তে পড়তে মনে হয়, তুর্কীর নয় এদেশেরই মেয়ে তিনি। ভারতের উজ্জ্বলচরিত্রা তপস্বিনীদের মাঝে দেবতার মন্দিরতলে জ্যোতির্ময়রূপে তিনিও বসে আছেন আর ভারতসন্তান তাঁর পায়ে লুটিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। তাঁর চেহারা পোশাক ভাষা আমরা কিছুই জানি না, কিন্তু সাধনার প্রত্যেকটি ব্যাপার যেন আমাদের অতি পরিচিত অতি আপনার। বাইরের দিক থেকে তিনি তুর্কীর, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে তিনি যেন আমাদেরই।

শরহোল কলব, কশফোল আশ্রার প্রভৃতি আরবী গ্রন্থে বহু মুসলমান সাধকের কাহিনী আছে। সেগুলো থেকে বেছে বেছে অনেকগুলো কাহিনী নিয়ে মওলনা শেখ ফরিদোদ্দিন অত্তার একখানা ফারসী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার নাম 'তেজকরতোল আওলিয়া' অর্থাৎ ঋষিদের কাহিনী। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় আরবী ফারসী ভাষা শিক্ষা করে মুসলমান ধর্মশাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি কোরান শরিফের বাংলা অনুবাদ করেন। এই তেজকরতোল আওলিয়াখানাও তাপসমালা নাম দিয়ে তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তাপসমালা ছভাগে প্রকাশিত হয়েছিল এবং আর তাতে ছিয়ানব্বইজন সাধকের জীবনী আছে।

তুর্কী দেশের (বর্তমান ইরাকের) বাসোরা নগরে রাবেয়ার জন্ম হয়। গরিব পিতা মাতার চতুর্থ কন্যা ছিলেন তিনি। যৌবনে পিতা, মাতা দুজনকেই হারিয়েছিলেন। সেসময় সেদেশে আবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় ভাইবোনদের একত্রে থাকা আর সম্ভব হলো না। রাবেয়া পড়েছিলেন একটি দুষ্ট লোকের হাতে। টাকা নিয়ে সে এক ধনীর কাছে রাবেয়াকে বিক্রি করে দিল। তারপর থেকে ধনীর ঘরে দাসীবৃত্তি করে চলত তাঁর দিন।

তাঁর মনিবটি ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর। রাবেয়াকে সে এত কাজ দিত যে সারাদিন খেটেও তিনি সেগুলো শেষ করতে পারতেন না। আর সেজন্যে রোজ তাঁর ওপর চলত অকথ্য অত্যাচার। এক-একদিন অত্যাচার একেবারে চরমে উঠত। সমস্তই তিনি চুপ করে সয়ে যেতেন। কিন্তু মানুষের সইবারও একটা সীমা আছে। সহ্য করতে না পেরে তিনি একদিন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। পালাবার সময় রাস্তায় পড়ে গিয়ে তিনি একখানা হাত ভেঙে ফেললেন। দুর্বল শরীরে যে সামান্য শক্তিটুকু অবশিষ্ট ছিল, এ আকস্মিক বিপদে তাও হারিয়ে তিনি পথে পড়েই কাঁদতে লাগলেন। চারদিক তখন তাঁর নিরাশার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। উপায়ান্তর না দেখে ব্যাকুল হয়ে তিনি ভগবানকে ডাকতে লাগলেন।

রাবেয়ার জীবনের প্রথম অধ্যায় এখানেই শেষ হলো। যে উজ্জ্বল পবিত্র জীবনের অধিকার নিয়ে তিনি সংসারে এসেছিলেন তার বিশেষ কোন পরিচয় এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এ-অধ্যায়কে তার পরবর্তী অমর জীবনের পটভূমিকা মাত্র বলা যেতে পারে। শিশুকাল থেকে তাঁর মধ্যে ধর্মভাবের কিরকম প্রকাশ দেখা যেত, তার কোন বিবরণ আমরা পাই না। তবে তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে যে সাধনা বৈরাগ্য ঈশ্বরপ্রেম ও জ্ঞানের বিকাশ আমরা দেখতে পাই, তাতে নিশ্চয় করে বলা যায় যে, অসাধারণ মানসিক সম্পদ অলৌকিক ও শুভ-সংস্কার নিয়ে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন।

মানুষ যখন সমস্ত অন্তর দিয়ে ভগবানের শরণাগত হয় আর ব্যাকুলভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, অন্তর-দেবতা অন্তরে থেকে তখন সাড়া দেন। আকুল হৃদয়ে কেঁদে কেঁদে রাবেয়া পরমদেবতার কাছে তাঁর মনোবেদনা জানালেন। তাঁর কান্না বিশ্বদেবের চরণে পৌঁছুল। রাবেয়ার তাপিত হৃদয়কে মোহন স্পর্শে শীতল করে তিনি জবাব দিলেন, "দুঃখ করো না রাবেয়া, দুঃখের দিন শেষ হয়ে শিগগিরই তোমার সৌভাগ্য আসবে।"

রাবেয়া শান্ত হলেন। অল্পসময়ের মাঝেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করলেন, তাঁর সব অবসাদ যেন কোথায় চলে গেল। উঠে ধীরে ধীরে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন, আর পালাবার চেষ্টা করলেন না। এ-ঘটনা থেকেই রাবেয়ার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হলো। এটি সাধনার সংযমের ও তপস্যার অধ্যায়।

বাড়ি ফিরে তিনি সারাদিন তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে মনিবের সেবা করতে লাগলেন, আর রাত্রিবেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন বসে বসে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও উপাসনা করতেন। এভাবেই কেটে যেত তাঁর সারা রাত। এক রাত্রে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, "আমার অন্তর তো তুমি জান দেবতা। তোমার সেবাতেই তোমার আজ্ঞা পালনেই রাতদিন থাকি, এ ইচ্ছে আমার মনে কত প্রবল। কিন্তু তুমি যে আমাকে পরাধীন দাসী করে রেখেছ। কত দেরি করে তাই তোমার কাছে আসতে পাই।"

কি কারণে সেসময় গৃহস্বামীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। শুয়ে শুয়ে সে রাবেয়ার প্রার্থনা সবই শুনতে পেল। কী করুণ কী আন্তরিক সে প্রার্থনা! আশ্চর্য হয়ে সে চেয়ে দেখল এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে রাবেয়ার মুখখানা উজ্জ্বল

হয়ে উঠেছে, এক অপার্থিব সৌন্দর্যে রাবেয়ার সারা দেহ জ্বলজ্বল করছে। তাতে সারা ঘরখানাই যেন আলো হয়ে উঠেছে। পরদিন সকালে রাবেয়াকে ডেকে গৃহস্বামী বলল ঃ "রাবেয়া, তোমার মতো মেয়েকে আমি দাসী করে রেখেছি, তোমার সেবা আমি নিচ্ছি, আমার মহা অন্যায় হয়ে গেছে। আজ থেকে তোমায় আমি মুক্তি দিচ্ছি। যদি তুমি দয়া করে আমার এখানে থাক, তাহলে আমি আজীবন তোমার সেবা করব।"

রাবেয়া সেখানে আর থাকতে চাইলেন না। কৃতজ্ঞ অন্তরে মনিবের শেষ অনুমতি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। যে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা এতদিন তাঁর হৃদয়কে পূর্ণ করে রেখেছিল, তাকে পুরো সুযোগ দেওয়ার জন্যে তিনি এক নির্জন বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। লোকসমাজের কোলাহলের বাইরে একান্তভাবে তিনি নিজেকে কঠোর সাধনায় ডুবিয়ে দিলেন। ভগবানের ধ্যান, উপাসনা, প্রার্থনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও চিন্তায় রাবেয়ার দিন কাটতে লাগল।

ধর্মসাধন সম্বন্ধে ভারতে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। হয়তো পৃথিবীর সব দেশের চাইতে এবিষয়ে ভারতই অগ্রবর্তী। কিন্তু ভারতেও ধর্মসাধনায় পুরুষদের যত সুবিধে সুযোগ আছে মেয়েদের তত নেই। তুর্কি, ইরাক বা আরবের কথা আমি জানি না। তবে বোরখা প্রথা প্রভৃতির জন্যে অনুমান করা যায় সেদেশে এবিষয়ে মেয়েদের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধে ছিল না। এ-অনুমানের পক্ষে আরো দুটি কারণ দেখতে পাই।

আগেই বলেছি, তেজকরতোল আওলিয়া গ্রন্থে ছিয়ানব্বইজন সাধকের কাহিনী আছে। এর মাঝে রাবেয়াই একমাত্র নারী। যেসব গ্রন্থ থেকে সাধকদের কাহিনী সংগ্রহ করে তেজকরতোল আওলিয়া রচনা হয়েছিল, হয়তো সেগুলোতে আর নারী সাধিকার কাহিনী ছিল না। অথবা ছিল, কিন্তু সেগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। রাবেয়ার মতো কোন নারীই সাধনজগতে এত উন্নতি করতে পারেননি, একথা জোর করে বলতে না পারলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তপস্বিনী নারীর সংখ্যা বেশি ছিল না। বেশি থাকলে আরো দু-একজন নারীর কাহিনী অবশ্যই আমরা তেজকরতোল আওলিয়াতে পেতাম।

কতকগুলো লোক একদিন এসে রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করেছিল, ঈশ্বর পুরুষকেই সবরকম গুণ দিয়েছেন। অলৌকিক শক্তি পুরুষরাই পেয়েছে। কোন মেয়ে কখনো ধর্ম প্রবর্তকের আসন পায়নি। মেয়ে হয়ে তোমার এত আস্পর্ধা হলো কিসে?

নারী পুরুষের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা থাকলে কখনো এরূপ প্রশ্ন উঠতে পারে না। ঈশ্বর, পরকাল, পুনর্জন্ম, ত্যাগ, তপস্যা, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা সব দেশে সমান নয়। ভারতের দেশ ও সমাজের সাথে আরবের যেমন অনেক বিষয়ে গরমিল আছে, ভারতের স্বর্গের সাথেও তেমনি আরবের স্বর্গের অনেক প্রভেদ। শুনেছি অবিবাহিত জীবনযাপন করা মুসলমান সমাজ ও ধর্মশাস্ত্র অনুমোদন করে না। কিন্তু ভারতের ধারণা বিবাহিত জীবন অপেক্ষা অবিবাহিত জীবনই ধর্মসাধনার পক্ষে অধিক অনুকূল। ধর্মসাধনায় ত্যাগ বৈরাগ্যের ওপরও ভারতে খুব জোর দেওয়া হয়।

রাবেয়া আজীবন কুমারী ছিলেন। লোকসমাজ আত্মীয়স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করে তিনি ত্যাগীর জীবন গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মপথে যেতে হলে এগুলো ত্যাগ করতে হয়, হয়তো এ-ধারণা নিয়ে তিনি ত্যাগের পথে যাননি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে বৈরাগ্য এসেছিল। ঈশ্বরের প্রতি যে প্রবল অনুরাগ তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল, তা-ই হয়তো তাঁকে ত্যাগ ও তপস্যার পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

হোসন বাসোরী ছিলেন তখনকার দিনে খুব নামকরা সাধক। মাঝে মাঝে রাবেয়া তাঁর সাথে ধর্মকথা ও শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করতেন। একদিন হোসন রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : "রাবেয়া, তোমার কি বিয়ে করবার ইচ্ছে হয় না?"

উত্তরে রাবেয়া বলেছিলেন : "না, শরীরের সম্বন্ধেই তো বিয়ে। আমার শরীর কই? এ-শরীর যে আমি ঈশ্বরকে দান করেছি। এটি তাঁর আজ্ঞাধীন।"

প্রবল ঈশ্বরানুরাগ ও তীব্র বৈরাগ্য না থাকলে রাবেয়া কখনো এত প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি করতে পারতেন না। হোসন জিজ্ঞেস করেছিলেন : "রাবেয়া, কি করে তুমি তোমার এ-উন্নত অবস্থাটি পেয়েছ?"

রাবেয়া উত্তর করেছিলেন : "সংসারে যা-কিছু পাবার সবই আমি ত্যাগ করেছি তাই।"

বহুকাল নির্জনে তপস্যা করার পর রাবেয়া এক ধর্মমন্দিরে গিয়ে বাস করেন। অত্যন্ত কঠোরতার মধ্যদিয়েই তাঁর দিন কাটত। একটি ভাঙা বাসনে তিনি জল খেতেন, একখানা ইঁটে চলত তাঁর বালিশের কাজ, আর একখানা ছেঁড়া মাদুরই ছিল তাঁর বিছানা। অন্যের কাছে তিনি কোনরকম সাহায্য চাইতেন না। তাঁর গায়ে ছেঁড়া কাপড় দেখে এক ধনী একদিন বলেছিলেন : "এখানে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন। একটুখানি ইঙ্গিত করলেই তাঁদের কাছ থেকে আপনি অনায়াসে সাহায্য পেতে পারেন।"

রাবেয়া উত্তর করলেন : "সংসারের অভাবের জন্যে কারো কাছে কিছু চাইতে আমার বড় লজ্জা করে। এ-সংসার যে তাঁরই রাজ্য। যদি চাইতে হয় তাঁর কাছেই চাইব, অন্য কারো কাছে চাইব না।"

আরেকজন বলেছিলেন : "মা, আমার অনেক ধনী বন্ধু আছেন। আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি তাঁদের কাছে আপনার জন্যে কিছু সাহায্য চাই।"

রাবেয়া বললেন : "না বাবা, তুমি ভুল করছ। তাঁদের কেউ আমার ভরণপোষণকারী নন। যিনি আমার খাওয়া-পরা দেন, তিনি ধনীকে যেমন ভোলেন না, গরিবকেও তেমনি ভোলেন না।"

আরেক দিনের ঘটনা। একজন ধনী লোক এক থলে মোহর নিয়ে রাবেয়ার কুটিরের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। রাবেয়ার প্রতাপ তিনি জানতেন আর জানতেন কারো দান রাবেয়া নেন না। তাঁর ইচ্ছে মোহরগুলো তিনি রাবেয়াকে দেন অথচ ভিতরে যেতে সাহস হচ্ছিল না। এমন সময় হোসন

সেখানে উপস্থিত হলেন। হোসন অনুরোধ করলে হয়তো রাবেয়া তা প্রত্যাখান করতে পারবেন না, এই ভেবে হোসনকে তিনি তাঁর মনের কথা বললেন। ভিতরে গিয়ে হোসন রাবেয়াকে সমস্ত কথা জানালেন। রাবেয়া বললেন ঃ "না, এ-দান আমি নিতে পারব না। আমার নেবার কি প্রয়োজন? যে ঈশ্বরের নিন্দে করে তাঁকেও তিনি খাবার দেন। আর যে তাঁকে রাতদিন ডাকছে তার প্রতি কি তিনি বিমুখ হবেন?"

রাবেয়া রাতদিন আর্তনাদ করতেন। লোকে জিজ্ঞেস করত ঃ "আপনার কি দুঃখ? কি যন্ত্রণায় আপনি এরকম চিৎকার করেন? আমরা তো আপনার কোন অসুখ দেখতে পাই না।"

তিনি উত্তর করলেন ঃ "সত্যি আমার রোগ হয়েছে। রোগ আমার বুকের ভিতর। তার যন্ত্রণা আমি সইতে পারছি না। সংসারের কোন চিকিৎসকই এ-অসুখের ওষুধ জানে না। এ-রোগের একমাত্র ওষুধ তাঁর দর্শন।"

ঈশ্বরদর্শনের আগে সাধকদের মনে এরকম ব্যাকুলতাই হয়। এরকম তীব্র ব্যাকুলতা যখন সাধকের দেখা দেয়, তখনই বোঝা যায়, ঈশ্বরদর্শনের আর বেশি দেরি নেই। সাধকের সাধনার যত বিস্তারিত ইতিহাস এদেশে পাওয়া যায় তেজকরতোল আওলিয়ার সাধকদের সাধনার কাহিনী সেরকম আমরা পাই না। রাবেয়া তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তিনি তাঁর ইষ্টদেবতার দর্শন পেয়েছিলেন।

তাঁকে জিজ্ঞেসা করা হয়েছিল ঃ "তুমি ঈশ্বরের পূজা কর। তুমি কি তাঁকে দেখতে পাও?"

রাবেয়া তাতে বলেছিলেন ঃ "দেখতে না পেলে আমি এভাবে পূজা করতাম না।"

হোসন একদিন প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "ঈশ্বরের রূপ সম্বন্ধে তুমি কি বল?"

রাবেয়া উত্তর করেছিলেন ঃ "ঈশ্বরের রূপ সম্বন্ধে আপনারা এরূপ-ওরূপ বলেন। আমি জানি তিনি অরূপ।"

ইষ্টলাভের সঙ্গে সঙ্গে রাবেয়ার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হলো। তাঁর বাকি জীবনটুকু তিনি কাটিয়েছিলেন পবিত্র মক্কা তীর্থে। সেখানে তিনি কখনো কখনো ধর্ম-উপদেশও দিতেন। তাঁর অদ্ভুত জীবন দেখে আর তাঁর মুখে মর্মস্পর্শী ধর্মকথা শুনে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত। হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর দুটি কথা শুনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ছুটে আসত।

হোসন বাসোরীকে রাবেয়া যেমন শ্রদ্ধা করতেন, হোসনও তাঁকে তেমনি শ্রদ্ধা করতেন। সপ্তাহে একদিন করে প্রকাশ্য সভায় হোসন ধর্ম-উপদেশ দিতেন। রাবেয়া ছিলেন তাঁর নিয়মিত শ্রোতা। রাবেয়াকে সামনে না দেখলে হোসনের উদ্দীপনা আসত না। একদিন কোন কারণে সে-সভায় রাবেয়া উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁকে না দেখে হোসনও চুপ করে বসে রইলেন। শ্রোতাদের একজন বললেন ঃ "কত জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত লোক আপনার উপদেশ শোনবার জন্যে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। একজন বুড়ো মেয়ে আসেননি বলেই কি আজ আপনি উপদেশ দেবেন না?"

হোসন উত্তর করলেনঃ "যে শরবত হাতির জন্যে তৈরি করেছি, তা কি আমি পিঁপড়ের মুখে দিতে পারি?"

ঈশ্বরের প্রতি রাবেয়ার ছিল অহেতুকি ভক্তি। এ-ভক্তি সবার চাইতে বড় আর দুর্লভ। অহেতুকী ভক্তি যার হয়, সে ভগবানের কাছে কিছুই কামনা করে না। ভালবাসার জন্যই তাঁকে ভালবাসে। রাবেয়াকে একজন বলেছিলঃ "নরকের বড় যন্ত্রণা। সে-যন্ত্রণার ভয়েই আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি।"

আরেকজন বলেছিলঃ "না, আমি স্বর্গের জন্যই ভগবানের উপাসনা করি। পরম সুখের জায়গা স্বর্গ, সেখানরকার সুখের শেষ নেই।"

রাবেয়া বলেছিলেনঃ "অধম দাসরাই ভয়ে ও লোভে প্রভুর সেবা করে। আচ্ছা, নরক বা স্বর্গ যদি না থাকত তাহলে কি তাঁর পূজা হতো না? সত্যি কথা বললে বলতে হয় তাঁর পূজা অহেতুক।"

অন্য একজন রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলঃ "পাপদৈত্যকে তো শত্রু বলেই জান?"

উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ "আমি ঈশ্বরপ্রেমের বশ। পাপদৈত্যের সাথে আমার শত্রুতাও নেই সংগ্রামও নেই।"

রাবেয়া যখন অসুস্থ হয়ে তাঁর অন্তিম শয্যায় শুয়ে আছেন তখন আবদুল ওয়াহেদ ও সুফিয়ান নামে দুজন সাধু তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর রোগযন্ত্রণা দেখে সুফিয়ান অনুরোধ করেছিলেনঃ "মা, সুস্থ হবার জন্যে আপনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন, তাহলেই আপনি সেরে উঠবেন।"

রাবেয়া বলেছিলেনঃ "আপনারা কি জানেন না তাঁর ইচ্ছায়ই আমার এ-অসুখ করেছে? সেরে উঠবার জন্য আমি কি করে তাঁকে বলি বলুন। আমি কি কখনো আমার প্রিয়তমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারি?"

ভক্তির সাথে রাবেয়ার অন্তরে যথেষ্ট জ্ঞান-বিচারও যে ছিল, তারও পরিচয় পাওয়া যায়। একজন সাধু একদিন রাবেয়ার কাছে বসে সারাক্ষণ শুধু সংসারের নিন্দে করছিলেন। তাতে বিরক্ত হয়ে রাবেয়া তাঁকে বলেছিলেনঃ "আপনি বড় সংসার-প্রেমিক। তা নাহলে ঈশ্বরের কথা ছেড়ে এত করে সংসারের কথা বলতেন না। যে সত্যিকার সংসারবিরাগী—সংসারের ভালমন্দ নিয়ে সে এত আলোচনা করে না। যে যাকে ভালবাসে তার আলোচনাই সে বেশি করে।"

কী চমৎকার কথা রাবেয়া বললেন! সংসারের যে প্রশংসা করে সেও সংসারের প্রতি যেমন আসক্ত, সংসারের যে নিন্দে করে সেও সংসারের প্রতি তেমন আসক্ত। সত্যিকার অনাসক্ত লোক নিন্দেও করে না, প্রশংসাও করে না।

একদিন পরলোক সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। হোসন বললেন ঃ "পরলোকে এক মুহূর্তও যদি ঈশ্বরের কথা ছেড়ে থাকি, তাহলে এমন কান্না আমি কাঁদব যে, তাই দেখে আমার প্রতি স্বর্গের ঋষিদের দয়া হবে।"

রাবেয়া তার প্রতিবাদ করে বললেন ঃ "এক মুহূর্ত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছেড়ে থাকলে এ-জীবনে যদি সেরকম দুঃখ হয়, সেরকম কাঁদতে পারি, তাহলেই

বিশ্বাস হয় যে পরলোকে গিয়েও কাঁদতে পারব। এ-জীবনে যা করতে পারছি না পরজীবনে যে তা করতে পারব তার প্রমাণ কি?''

রাবেয়ার জীবনের কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার বিবরণও পাওয়া যায়। একটির কথা বলছি। কী জ্বলন্ত বিশ্বাস তাঁর অন্তরে ছিল তার বিশেষ পরিচয় আমরা এ-ঘটনায় পাই। একদিন দুজন সাধক রাবেয়ার কুটিরে অতিথি হন। তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন। রাবেয়ার ঘরে তখন মাত্র দুখানা রুটি ছিল। এ-দুখানা রুটিতে অতিথিদের কিছুই হবার নয়। ঠিক সেসময় একটি ভিখিরি এসে ভিক্ষা চাইলে। দুখানা রুটিই রাবেয়া ভিখিরিকে দিয়ে দিলেন।

অল্পসময় পরে একটি দাসী কতকগুলো রুটি এনে রাবেয়ার হাতে দিয়ে বলল: ''গিন্নিমা আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন।''

সেগুলো গুনে দেখে দাসীকে তিনি বললেন: ''না বাছা, ভুল হয়েছে। তুমি এগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও।''

দাসী বললে: ''না মা, ভুল হবে কেন? গিন্নিমা যে আপনাকেই দিয়ে যেতে বললেন।''

রাবেয়া উত্তর করলেন: ''না বাছা, ফিরিয়ে নিয়ে যাও। ভুল হয়েছে।''

এই বলে তিনি দাসীর হাতে রুটিগুলো দিয়ে দিলেন। কিছুসময় পরে আবার দাসী রুটি নিয়ে এল। রাবেয়া আবার সেগুলো গুনে দেখে বললেন: ''হ্যাঁ মা, এবার ঠিক হয়েছে। আমি এবার এগুলো রাখছি। তুমি এস।''

সাধুরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: ''ব্যাপার কি?''

হেসে রাবেয়া উত্তর করলেন: ''ব্যাপার আর কি? আপনারা দুজন ক্ষুধার্ত অতিথি। ঘরে সম্বল আমার মাত্র দুখানা রুটি। এ-দুখানাতে আপনাদের যে কিছুই হবার নয়। এসময় ভাগ্যক্রমে ভিখিরিটি এল। তাকে রুটি দুখানা দান করে ভগবানের কাছে বললাম, 'দেবতা, তুমিই বলেছ একগুণ করলে দশগুণ পাওয়া যায়। আমায় এবার দশগুণ দাও। নইলে যে অতিথি আমার অভুক্ত থাকবেন।' তারপর দাসী নিয়ে এল রুটি। গুনে দেখি আঠার খানা। আমার পাবার কথা কুড়িখানা। দুখানা কম আমি নেব কেন? ফেরত দিলুম। পরের বারে যখন নিয়ে এল তখন গুনে দেখলুম ঠিক কুড়িখানাই এসেছে।''

রাবেয়ার জীবনচিত্রের মাত্র কটি অস্পষ্ট রেখাই আমরা পাই আর তাই থেকেই সে চিত্রখানির মহনীয়তা ও উজ্জ্বলতার অনুমান আমরা করতে পারি। নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে বলেছেন: ''ভক্তদের মধ্যে জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ও ক্রিয়াগত কোন ভেদ নেই। কারণ তাঁরা যে ভগবানেরই।''

হিন্দুর চোখে পৃথিবীর সকল সাধক-সাধিকাই এক। দেশ, কাল বা সমাজের দ্বারা তাঁদের বিচার হয় না। তাঁদের বিচার হয় সাধনার তারতম্যে। মুসলমান সাধিকা রাবেয়াকে প্রত্যেক হিন্দুসন্তান অতি আপনার বলেই মনে করবে, শ্রদ্ধা করবে, প্রণতি জানাবে।* □



* ৪২ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

কবীরের জীবনী ও বাণী

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ মনীষী ইভেলিন আন্ডারহিল[১] সত্যই বলিয়াছেন যে, মধ্যযুগে জলালউদ্দীন রুমী ও হাফিজ প্রমুখ পারস্যের সাধক কবিগণ যখন হিন্দুধর্মের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন তখন কবীর আবির্ভূত হইয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সমন্বয়-সাধনে প্রবৃত্ত হন। কবীরের প্রতিভাই সর্বপ্রথম হিন্দু ও মুসলমানের মিলন-মন্দির রচনায় কৃতকার্য হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে যে ভক্তি-গঙ্গা রামানুজাচার্য দক্ষিণ-ভারতে প্রবাহিত করেন, পঞ্চদশ শতকে সেই প্রেম-প্রবাহ কবীরের গুরু রামানন্দ উত্তর-ভারতে আনয়ন করেন।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মতে মধ্যযুগে উত্তর ভারতে এমন ধর্মান্দোলন হয় নাই, যাহার উপর কবীরের প্রভাব নাই। কবীর ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কবীর-পন্থ উত্তর ভারতের একটি বিরাট ধর্মসম্প্রদায়। কবীরপন্থী সন্ন্যাসিগণ বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও গুজরাটে অসংখ্য কবীর-চৌরা স্থাপন করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের ভক্তসংখ্যা দশ লক্ষের অধিক। কবীরপন্থী সাধুগণ উদাসী সাধুগণের মতো শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উত্তর ভারতের হিন্দুগণের উপর তাঁহাদের প্রচুর প্রভাব। কবীর-বিরচিত 'বীজক' নামক গ্রন্থখানি কবীর-পন্থিগণের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। 'বীজক' গ্রন্থে কবীরের স্বরচিত কয়েক সহস্র দোঁহাবলী আছে। মূল গ্রন্থখানি হিন্দিতে লিখিত হইলেও উহার সংস্কৃত অনুবাদ হইয়াছে। 'শাখী' গ্রন্থেও কবীরের শত শত দোঁহা আছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন কবীর সম্ভবত ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারো কাহারো মতে ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তিনি ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত বস্তি জেলায় (গোরক্ষপুরের নিকটবর্তী) মাঘার নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন। মুসলমান দম্পতি নিরু ও নীমা ছিলেন তাঁহার পিতামাতা। প্রবাদ আছে যে, এই দম্পতি শিশু কবীরকে কাশীর সমীপস্থ লহর সরোবরে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর কুড়াইয়া পান।

কবীরের মাতাপিতা জোলা ছিলেন এবং কবীর নিজে মহাপুরুষ হইয়াও বস্ত্র-বয়ন ব্যবসায়েই জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

তিনি যে-জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে তাহা অতি নীচ। তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁহার সহধর্মিণীর নাম ছিল লই। কবীরের পুত্র কমালও গভীর চিন্তাশীল সাধু ছিলেন। কমালের শিষ্য দাদু বিশেষ পরিচিত। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত ও

অনূদিত 'দাদু-বাণী' বিশ্বভারতী প্রকাশ করিয়াছেন। কবীরের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ কমালকে একটি সম্প্রদায় স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "আমার পিতা সমস্ত জীবন সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার পুত্র হইয়া কিরূপে তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবকে ধ্বংস করিতে পারি?"

কবীরের মুসলমান-শিষ্যগণ উপরি উক্ত মাঘার নামক স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হন এবং তাঁহার হিন্দু-শিষ্যগণ কাশীধামে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাপূর্বক সুরথ গোপাল নামক জনৈক শিষ্যের নেতৃত্বে একত্রিত হন। অনেকের মতে ধর্মদাসই কবীরের প্রথম ও প্রধান শিষ্য। ধর্মদাস মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় নামক স্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মদাস ধনী ও সাহিত্যিক ছিলেন। রেভারেন্ড কী সাহেব তাঁহার গ্রন্থে[২] ধর্মদাসের উন্নত চরিত্রের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। কবীরের বাণী অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কয়েকখণ্ড পুস্তিকায় অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও কবীরের একশত দোঁহার ইংরেজী তর্জমা করিয়াছেন। তাহা ইভেলিন আন্ডারহিলের পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপক্রমণিকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। দাদুর শিষ্য গরীবদাস একজন মহাপুরুষ ছিলেন। গরীবদাসের আধ্যাত্মিক প্রতিভা এক বিশাল ধর্মসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। দাদুর শিষ্যগণ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গরীবদাসের বাণী সংগ্রহ করিয়া 'গ্রন্থসাহেব' প্রকাশ করেন। শিখদিগের নিকট তাহাদের 'আদিগ্রন্থ' যেমন শ্রদ্ধার বস্তু, কবীরপন্থীদের নিকট 'গ্রন্থসাহেব'ও তেমন সমাদরের গ্রন্থ। গ্রন্থসাহেবে গরীবদাস ব্যতীত অন্যান্য সাধকের বাণীও স্থানলাভ করিয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে কবীরের ন্যায় দাদু ও গরীবদাস মুসলমান ছিলেন।

মুসলমান-প্রবাদে আছে যে, কবীর শেষ জীবনে ঝাঁসির বিখ্যাত সুফি পীর তাক্বিকে গুরুরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু এই প্রবাদ ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রতীত হয়; কবীর তাঁহার দোঁহাবলীতে রামানন্দকে একমাত্র মানবগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কবীরের বাল্যকালে কাশীধামে রামানন্দ উন্মত্ত সাধকরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামানন্দকে গুরুরূপে পাইবার জন্য বালক কবীর এক কৌশল অবলম্বন করেন। রামানন্দ যে-ঘাটে নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন, সেই ঘাটের সিঁড়ির একটি ধাপে তিনি শায়িতভাবে লুক্কায়িত থাকেন। রামানন্দ সিঁড়ির ধাপে ধাপে অবতরণপূর্বক গঙ্গায় যাইতেছেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে কবীরের শায়িত দেহে পা লাগিয়া যাওয়ায় "রাম! রাম!" উচ্চারণ করেন। তখন হইতে কবীর নিজেকে রামানন্দের দীক্ষিত শিষ্যরূপে ভাবিতেন ও তদ্রূপ আচরণ করিতেন। গুরুমুখে 'রাম মন্ত্র' শুনিয়াই কবীরের দীক্ষালাভ হইল। রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন কবীর। একটি দোঁহাতে কবীর স্পষ্টই প্রমাণ করিয়াছেন যে, রামানন্দের দ্বারাই তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইয়াছিল। কবীরের এক শিষ্য রবি দাস ছিলেন চিতোরের বিখ্যাত সাধিকা মীরাবাঈ-এর গুরু।

কাশীধামেই কবীরের জন্ম হয় এবং এইস্থানেই তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী ঘটে। হিন্দুদের এই পরমতীর্থেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালও

অতিবাহিত হয়। তাঁহার সময় সমগ্র উত্তর ভারতে এবং বিশেষত কাশীধামে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে ভীষণ বিরোধ চলিতেছিল। তিনি উভয় ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া উভয়ের সমন্বয়-সাধনে জীবনদানপূর্বক নবযুগের আগমনী-সঙ্গীত গাহিলেন। ইভেলিন আন্ডারহিল সত্যই বলিয়াছেন যে, কবীর উভয় ধর্মকুসুমের সৌরভ বৃদ্ধি করিয়াছেন। বর্তমান যুগে পরস্পরবিবদমান এই ধর্মদ্বয়ের সমন্বয়ের প্রথম পুরোহিত ছিলেন কবীর। এইজন্য উভয় ধর্মাবলম্বিগণ তাঁহাকে গুরুরূপে মানিতেন। কবীর বলেন যে, আল্লা ও রাম এক এবং তিনি উভয়েরই সন্তান। কবীরের নিকট রাম ও রহিম অভেদ ছিল, কোরান ও পুরাণ একই সত্যের প্রকাশক ছিল এবং কাবা ও কৈলাস সমান পবিত্র ছিল। তাঁহার জীবন ছিল হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সঙ্গমস্থল, সমন্বয় তীর্থ, প্রয়াগ। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণের মধ্যে মৃতদেহের সৎকার লইয়া মতান্তর উপস্থিত হয়। হিন্দু-শিষ্যগণ গুরুর মৃতদেহ সৎকার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং মুসলমান-শিষ্যগণ তাঁহার কবর দিতে চাহেন। বিবাদ যখন চরমে উঠিল, তখন অশরীরী আকাশবাণী হইল—'শবদেহের আবৃত বস্ত্র তুলিয়া দেখ'। বস্ত্র অপসৃত হইলে দেখা গেল শবদেহের পরিবর্তে একরাশি ফুল পড়িয়া আছে। হিন্দু শিষ্যগণ এই ফুলের অর্ধেক লইয়া কাশীধামে দাহ করেন এবং মুসলমান শিষ্যগণ বাকি অর্ধাংশ মাঘারে কবরস্থ করেন। কাহারো মতে, এইসময় আকাশবাণী হয় নাই, কবীর স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যৌগিক শক্তি ও সিদ্ধি প্রদর্শনের জন্য কবীর সম্রাট সিকন্দর লোদীর নিকট অভিযুক্ত ও বিচারার্থ আনীত হন। বিচারে দোষী প্রমাণিত হইয়া তিনি কাশী হইতে নির্বাসিত হন এবং ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে কাশী হইতে মাঘারে গমন করেন। মাঘারে তিনি জীবনের তেইশ বৎসর যাপনপূর্বক দেহরক্ষা করেন।

অভিনব ধর্মমত প্রচারের জন্য হিন্দু ও মুসলমানগণ মিলিত হইয়া একবার কবীরের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করেন। কবীর বলিতেন ঃ "প্রেমই একমাত্র প্রকৃত ধর্ম, অন্য ধর্ম মিথ্যা এবং মন্দির ও মসজিদের অপেক্ষা হৃদয়ই ভগবানের শ্রেষ্ঠ বেদি।" কবীরের এই মতবাদে গোঁড়া ধর্মমতের মূলে কুঠারাঘাত হয়। একদল তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতে উল্লিখিত অভিযোগ করেন। বিচারক ছিলেন একজন মুসলমান সুফি। তিনি কবীরকে স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জনপূর্বক বলিলেন ঃ "মহাশয়, হিন্দু ও মুসলমানগণের মিলন-সাধনই আমার জীবনধর্ম। আপনার সম্মুখে তাহা আজ সফল হইয়াছে। আমার আর কিছু বক্তব্য নাই। আমার এই প্রার্থনা যে, উভয় দল সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিয়া সামাজিক জীবনে মিলিত হউক।" কবীরের এই কথা বিচারকের হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি কবীরকে মুক্তি দিলেন এবং নিজে তখন হইতে উভয় ধর্মের সমন্বয়সাধনে সচেষ্ট হইলেন।

কবীর ছিলেন সুনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞ ও উচ্চস্তরের সাধক-কবি। তাঁহার দোঁহাবলী চলিত হিন্দি ভাষায় লিখিত। ইহা হিন্দি ভাষার ও সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। দোঁহাবলী গভীর ভাবপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী।

কোন কোন দোঁহাতে কবীরের আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ণনাও আছে। তাঁহার মতে প্রণব বা ওঁকারই সনাতন সৎ ও সর্বশেষ শব্দ। ইহা বিজ্ঞাত হইলেই অজ্ঞানী জ্ঞানী হয় এবং জ্ঞানী নীরব হন। রহস্যময় ভাষায় কবীর তাঁহার পারমার্থিক জ্ঞানের বর্ণনা দিয়াছেন। কবীর বলেন যে, তিনি প্রেমময় ঈশ্বরের নিকট বিনা পদে চলিতে, বিনা চক্ষুতে দেখিতে, বিনা কানে শুনিতে, বিনা মুখে খাইতে এবং বিনা পাখায় উড়িতে শিখিয়াছেন।

গোরক্ষনাথ একবার কবীরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ "আপনি কবে যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন?" তদুত্তরে কবীর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মা যখন মস্তকে মুকুটধারণ করেন নাই, বিষ্ণু যখন রাজপদে অধিষ্ঠিত হন নাই ও মহাদেব যখন জন্মলাভ করেন নাই, তখন তিনি যোগ সাধনে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কবীর নিরক্ষর ছিলেন বটে কিন্তু তিনি ভাবরাজ্যের সর্বোচ্চ অবস্থা—সমাধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধির বর্ণনা যথা ঃ "আমি যাহাই করি তাহাই ঈশ্বরের উপাসনা, যেখানেই যাতায়াত করি তাহা ঈশ্বরের প্রদক্ষিণ মাত্র, যাহা আচরণ করি তাহা প্রভুর সেবামাত্র, যখন শয়ন করি তখন ঈশ্বরের চরণে প্রণিপাত করি এবং সর্বোপরি আমি জগতের ভ্রান্তিসমূহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি।" বাংলার সাধক-কবি রামপ্রসাদও তাঁহার তত্ত্বানুভূতির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কবীর মূর্তিপূজা বা সন্ন্যাস মানিতেন না। তাঁহার মতে খাঁটি সাধনার দ্বারাই সমাজ স্বর্গে রূপান্তরিত হয়। তিনি দাড়ি ও মস্তকে লম্বা কেশ ধারণ করাকে পরিহাস করিতেন এবং জটাজূটধারী যোগীকে ছাগলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। ধর্মকে জটিলতা ও কৃত্রিমতা হইতে বিমুক্ত করিয়া জনসাধারণের গ্রহণোপযোগী করাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার মতে যিনি সাধুতা অভ্যাস করেন, জগতের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন এবং পৃথিবীর প্রাণিসমূহকে নিজের বিভিন্ন রূপ বলিয়া জানেন, তিনিই জ্ঞানী ও মুক্ত। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কবীরের মত এই যে, উহা নামহীন, গুণহীন। তিনি নিরাকারও নহেন সাকারও নহেন। জ্যোতিই তাঁহার বসন, ভূষণ, আসন ও দেহ এবং তিনি আমাদের শরীরের মস্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। কবীর বলিয়াছেন যে, তিনি বিশ্বাত্মাকে স্বীয় আত্মার মধ্যে দর্শন করিয়াছেন। এই দর্শনের দ্বারা তিনি এমন এক ভাবরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন যাহা শাশ্বত সুখের আকর, যেখানে চন্দ্র, সূর্য, তারকা বা পৃথিবীর প্রবেশ নাই। গ্রীক যোগী পাইথাগোরাসের ন্যায় কবীর বিনা কর্ণে আকাশে যন্ত্রহীন বাদ্য ও অনাহত সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন এবং বিনা চক্ষে ব্রহ্ম ও আল্লার জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করিয়াছিলেন।

পৃথিবী ও স্বর্গের ব্যবধান দূর করা, সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের ভেদ নাশ করা, সাধারণ ও অসাধারণের সীমারেখা ভগ্ন করা, গৃহ ও মন্দিরের পার্থক্য তুলিয়া দেওয়া এবং মানবসৃষ্ট পাপ-পুণ্যের গণ্ডি অতিক্রম করাই ছিল কবীরের জীবনব্যাপী সাধনা। কবীর জীবহিংসা বিরোধী ছিলেন এবং ধর্মার্থে পশুহত্যার নিন্দা করিতেন। একটি দোঁহাতে তিনি বলেন ঃ "হে হিন্দু ভাইগণ, তোমরা মাটির দেবদেবী তৈয়ার করিয়া তাহার সম্মুখে ছাগল ও মহিষ বলি দিতেছ। যদি তোমাদের দেবতা জীবন্ত ও ক্ষুধিত হইতেন, তাহা

হইলে তিনি ক্ষেত্রে বিচরণশীল পশুগুলি ধরিয়াই ক্ষুধানিবৃত্তি করিতেন। ভগবান প্রত্যেক প্রাণীর অন্তরে আসীন। তোমরা যে জীবহত্যা করিতেছ তাহা ঈশ্বরের সন্তোষ বিধানের জন্য নহে পরন্তু উহা তোমাদের জিবের লালসা মিটাইবার জন্য। হে মুসলমান ভাইগণ, তোমরা খোদার সেবার জন্য রমজানের সময় সারাদিন রোজা করিতেছ, অথচ তাঁহার প্রিয় পশু গোরু বধ করিতে ইতস্তত করিতেছ না। তোমার পুণ্যের তুলনায় পাপ যে অত্যন্ত অধিক। সুতরাং আল্লা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন কিরূপে?'' কবীর মাছ-মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। তিনি মাদক-পদার্থ গ্রহণও অপরাধজনক মনে করিতেন। তাঁহার মতে যে হিন্দু বা মুসলমান জীবহত্যা হইতে বিরত না হয়, সে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবে।

কোন ব্যক্তি কবীরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আপনার নাম ও জাতি কী?' উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—

''হিন্দু কহোঁ তো মৈঁ নহিঁ, মুসলমান ভী নঁহি।
পাঁচ তত্ত্ব কা পুতলা, গৈবী খেলৈ মাঁহি॥
শব্দস্বরূপী নাম সাহেব কা, সো নিজ নাম হামারা।
নহিঁ মেরে হাড় চাম নহিঁ লোহূঁ, হম সতনাম উপাসী॥''

অনুবাদ ঃ ''আমাকে হিন্দু বল তো আমি হিন্দু নহি, কিন্তু আমি মুসলমানও নহি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চতত্ত্বের পুতলি আমি। এই পুতলির মধ্যে অসীমের অবিরাম খেলা চলিতেছে। আমার সাহেব বা প্রিয়তমের নাম শব্দস্বরূপ অর্থাৎ প্রণব এবং তাহাই আমার নিজের নাম। আমার হাড়, চামড়া ও রক্ত নাই, আমি প্রণবস্বরূপ এবং সত্যনামের উপাসক।''

পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কবীরের মত নিম্নলিখিত দোঁহাদ্বয়ে পরিস্ফুট ঃ

''এক কহুঁতো হ্যায় নঁহি, দোয় কহুঁ তো গার।
হৈ জৈসা তৈসা রহৈ, কঁহহি কবীর বিচার॥
বেদ থকে, ব্রহ্মা থকে, থকে শঙ্কর শেষ।
গীতা কো তো গম নঁহি, উহ সাহেবকা দেশ॥''

অনুবাদ ঃ ''যদি পরমতত্ত্ব এক বল তো তাহা সত্য নহে; যদি তাঁহাকে দুই বল তো, তাহাও মিথ্যা। কবীরের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি যেমন তিনি তেমনি। তিনি মনবুদ্ধির অগোচর এবং তিনিই তাঁহার অদ্বিতীয় উপমা। বেদ, ব্রহ্মা, শঙ্কর, বিষ্ণু তাঁহাকে বর্ণনা করিতে অসমর্থ। তিনি গীতারও অধিগম্য নহেন। আমার সাহেব (প্রভু) এমনি অতুলনীয় ও অগম্য।''

কবীর অবতারবাদে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলেন—দশ অবতার মায়াকৃত। মায়াতেই গমনাগমন আছে। অবতারগণের জন্মমৃত্যু আছে সুতরাং তাঁহারা সত্যস্বরূপ হইতে পারেন না। কবীরের মতে 'রজোগুণ ব্রহ্মা, তমোগুণ শঙ্কর, সত্ত্বগুণ হরি সোই'। এই ত্রিদেবতা মায়া-রচিত। এই গুণের ফাঁদ হাতে লইয়া মায়া সংসারে ফিরিতেছেন এবং নানা প্রলোভন দ্বারা সকলকে এই ফাঁদে আবদ্ধ করিতেছেন। কবীরের মতবাদ ব্রহ্মতত্ত্ব ও

ভক্তিতত্ত্বের সংমিশ্রণ বলিয়া মনে হয়। আবার তিনি মায়াবাদও মানিতেন। মহামায়া সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন ঃ

"মায়া মহা ঠগিনী হম্ জানি।
ত্রিরগুণ ফাঁস লিয়ে কর ডোলৈ, বোলৈ মধুরী বাণী।।
কেশব কে কমলা হোয় বৈঠী, শিবকে ভবন ভবানী।
ভগতা কে ভগতিন হোয় বৈঠী, ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণী।।"

অনুবাদ ঃ "আমি জানি, মায়া মহাঠগিনী (মহাচক্রিণী)। তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ফাঁদ হাতে লইয়া জগতে বিচরণপূর্বক মধুর কথা বলিতেছেন। তিনি বিষ্ণুর প্রিয়তমা কমলারূপে অধিষ্ঠিতা, মহাদেবের নিকট শিবানীরূপে প্রকাশিতা এবং ব্রহ্মার সমীপে ব্রহ্মাণীরূপে বিরাজিতা। আবার ভক্তদের নিকট রমণীরূপে আবির্ভূতা।"

কবীর সত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি বলেন—

"সাঁচ বরাবর তপ নহিঁ, ঝুট বরাবর পাপ।
জাকে হৃদয়া সাঁচ হৈ, তাকে হৃদয়া আপ।।"

অনুবাদ ঃ "সত্য কথনের সমান তপস্যা নাই, মিথ্যা কথনের ন্যায় পাপ নাই। যাঁহার হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার হৃদয়েই সত্যস্বরূপ পরমতত্ত্বের বিকাশ হয়।"* □

পাদটীকা

১ দ্রঃ One Hundred Poems of Kavir by Rabindra Nath Tagore with an introduction by Evelyn Underhill.

২ দ্রঃ 'Kavir and His Followers'—Rev. F. E. Keay, D Litt. (London)

* ৪৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা

গৌতম বুদ্ধের সাধনা

[যজ্ঞ-তপস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মত]

রাধাগোবিন্দ বসাক

"চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে।
বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্ব্বব্যাধিপ্রমোচকঃ।।"

—হে বুদ্ধদেব! ক্লেশরূপ ব্যাধি-দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া বহুকালযাবৎ জীবলোক আতুর অবস্থায় পতিত ছিল, তুমিই সর্বপ্রকার ব্যাধির প্রমোচনকারী বৈদ্যরাজ বা চিকিৎসক-প্রধান হইয়া সমুৎপন্ন হইয়াছ।

গৌতম বুদ্ধ এক বিরাট ব্যক্তিত্ব লইয়া ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বয়ং-আচরিত ও জগতে উপদিষ্ট ও প্রচারিত ধর্ম ছিল বহুলাংশে ইতিমূলক। ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণে তাঁহার যুক্তিমত্তা ও মানবের মনস্তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার প্রজ্ঞা-বৈশারদ্য কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র জগতে সুবিদিত। সর্ববিশ্বহিতকর তদীয় ধর্মোপদেশের যতই প্রচার ও আলোচনা হইবে, ততই পৃথিবীতে সুখ ও শান্তিধারার প্রবাহ লক্ষিত হইবে। জগৎ হইতে দুর্নীতির বিলয় ঘটাইতে হইলে বুদ্ধের উপদিষ্ট সুনীতিসমূহের গ্রহণ বিধেয়। এমনকি, রাজনীতি ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ ধর্মের শীলাদির প্রভাব বিস্তারিত হইবার যোগ্য। শ্রীবুদ্ধের ব্রহ্মবিহারের কল্পনায় মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা—এই চারিটির যে আচরণ-নির্দেশ আছে, তাহা চিরকালই স্মরণীয়। এইসব কথা ভাবিয়াই এই মহাপুরুষ বা অবতারের জীবনচরিতের একটি বিষয় লইয়া এই প্রবন্ধ রচিত হইল।

প্রাগবুদ্ধ যুগের ভারতীয় ধর্মে পৌরোহিত্য ও কর্মকাণ্ডের অত্যধিক প্রভাব দৃষ্ট হয়। উপনিষদ্‌গুলি সেই প্রভাবের অনেকটা বিরোধিতা সম্পাদন করিয়াছে। তৎপরে বুদ্ধদেবও যজ্ঞ তপস্যাদি ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধের কথাবস্তু সংগৃহীত হইয়াছে তিনখানি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে, যথা—পালি ভাষায় রচিত 'নিদান-কথা', সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত তিন ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত গাথা-নামক ভাষায় রচিত 'মহাবস্তু-অবদান' এবং মহাকবি ও মহাদার্শনিক অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ-চরিত'।

পাঠকমাত্রই জানেন কেমন করিয়া বোধিসত্ত্ব গৌতম স্নেহবান পিতা রাজা শুদ্ধোদন, স্নেহময়ী মাতৃসদৃশা মাতৃস্বসা গৌতমী, রূপলাবণ্যবতী ভার্যা যশোধরা ও নবজাত শিশুপুত্র রাহুলকে এবং আত্মীয়স্বজনসহ সমগ্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া উনত্রিশ বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন। সংসারে ত্রিতাপের অভিঘাতে খিন্ন হইয়াই জগতের লোকেরা মুক্তিকামী হয়।

ছন্দককে বিদায় দিয়া গৌতম সর্বপ্রথম এক তপোবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাই বশিষ্ঠ গোত্রনামা এক ঋষির আশ্রম। আশ্রমবাসী বিপ্রেরা

বোধিসত্ত্বের অলৌকিক শরীরলক্ষণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সেখানে একটি তপস্বীকে তিনি তপস্যার তত্ত্ব ও সেই আশ্রমে প্রচলিত ধর্মবিধির আচরণ ও তৎফলবিষয়ক প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, কোন কোন তপস্বী অগ্রাম্য, সলিল-প্ররূঢ় অন্ন, বৃক্ষপর্ণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করেন; কেহ উঞ্ছবৃত্তিক হইয়া, কেহবা বল্মীক মধ্যে ভুজঙ্গসহ বাস করিয়া, কেহ জটাকলাপধারী হইয়া, কেহ দুই সন্ধ্যায় অগ্নির উপাসক হইয়া, কেহবা আবার মৎস্যসহ জলে বাস করিয়া কাল অতিবাহিত করেন। এইরূপ নানাভাবে তপস্যা করিয়া কেহ তৎফলে স্বর্গে যাইয়া বা মর্তলোকেই সুখ অনুভব করেন। তখন রাজকুমার সন্ন্যাসী গৌতম নিজের কথা বলিতে যাইয়া এইপ্রকার তপস্যাদির এইরূপ একটি সমালোচনা করিলেন ঃ

"দুঃখাত্মকং নৈকবিধং তপশ্চ স্বর্গপ্রধানং তপসঃ ফলং চ।
লোকাশ্চ সর্বে পরিণামবস্তুঃ স্বল্পে শ্রমঃ খল্বয়মাশ্রমাণাম্।।" (বুদ্ধচরিত)

—এই অনেকবিধ তপস্যা দুঃখময়, তপস্যার ফলের মধ্যে স্বর্গই প্রধান; স্বর্গাদি-লোক-সকল পরিণামযুক্ত (অর্থাৎ পরিবর্তন ও ক্ষয়শীল), তাই দেখা যাইতেছে যে, আশ্রমবাসীদের এই শ্রম যেন অল্পবস্তুলাভের জন্য (গুরুতর তত্ত্বলাভের জন্য নহে)। তাঁহার মতে স্বর্গফলের জন্য নিয়মাদির আচরণ মহত্তর বন্ধনের হেতু হইতে পারে। ইহা তো দুঃখদ্বারা অন্য দুঃখ অন্বেষণমাত্র।

"ইহার্থমেকে প্রবিশন্তি খেদং স্বর্গার্থমন্যে শ্রমমাপ্লুবন্তি।
সুখার্থমাশাকৃপণোঽকৃতার্থঃ পতত্যনর্থে খলু জীবলোকঃ।।" (বুদ্ধচরিত)

—কেহ কেহ ঐহিক সুখাদি লাভের জন্য দুঃখপূর্ণ বিষয়ে প্রবেশ করে, অপর কেহ কেহ স্বর্গার্থে শ্রম অবলম্বন করে। কিন্তু, জীবলোক সুখের আশা করিয়া, নিজকে দীন বোধ করিয়া, অকৃতার্থ হইয়া অনর্থে পতিত হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এমন বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করা উচিত "যত্র পুনর্নকার্যম্"—যাহাতে আর কোন করণীয় করিতে হইবে না। কৃচ্ছ্রসাধনে বা শরীরপীড়া-দ্বারাই ধর্ম হয় না। চিত্তের বশেই মানুষের শরীর—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পথে চলে, তাই চিত্তের দমনই তাহার উপযুক্ত কার্য, কারণ, চিত্ত-ব্যতিরেকে শরীর তো কাষ্ঠপ্রায়।

এইভাবে অনেক যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়া সেদিন বোধিসত্ত্ব সন্ধ্যাসময়ে তপঃপ্রশান্ত সেই তপোবনে প্রবেশ করিলেন। কয়েক রাত্রি সেখানে বাস করার পরে তিনি তপস্যার পরীক্ষা করিয়া সে-স্থান ত্যাগ করিলেন। আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ তপস্বী সম্মান-সহকারে গৌতমকে বলিতে লাগিলেন ঃ "হে বৎস! তুমি আমাদের আশ্রমে থাকাতে ইহা পূর্ণ প্রতিভাত হইতেছে; তুমি চলিয়া গেলে ইহা শূন্য বোধ হইবে। সুতরাং তোমার এখানেই থাকা উচিত। সম্মুখে তুমি যে হিমালয় পর্বত দেখিতেছ সেখানে কত ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিরা তপস্যা করিয়া থাকেন এবং সেখানে অনেক পুণ্যতীর্থ রহিয়াছে।" তপস্বিমুখ্য এইরূপ অনুরোধ করিলেও ভবপ্রণাশের জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ গৌতম তাঁহাকে বলিলেন ঃ "তপোবনের মুনিদিগের আমার প্রতি স্বজনভাবদর্শনে আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে আমার দুঃখ হইবে। কিন্তু,

"স্বর্গায় যুষ্মাকমযং তু ধর্মো মমাভিলাষস্ত্বপুনর্ভবায়।
অস্মিন্ বনে যেন ন মে বিবিৎসা ভিন্নঃ প্রবৃত্ত্যা হি নিবৃত্তিধর্মঃ।।"
(বুদ্ধচরিত)

—আপনাদের ধর্মাচরণ স্বর্গলাভের আশায়; আমার অভিলাষ অপুনর্ভবের (অর্থাৎ জন্মান্তরচ্ছেদের) জন্য। এই কারণে, এই বনে বাস করিবার ইচ্ছা আমার নাই। যেহেতু প্রবৃত্তিপর ধর্ম হইতে নিবৃত্তিপর ধর্ম ভিন্ন রকমের। পরিব্রাজক গৌতমের অর্থবৎ, ওজস্বী ও গর্বিত বচন শুনিয়া তপস্বীরা তাঁহার প্রতি অত্যধিক সমাদর প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্য হইতে একটি ভস্মশায়ী দ্বিজ গৌতমকে বলিলেন ঃ "হে ধীমন্! তোমার সঙ্কল্প উদার, যেহেতু তুমি জন্মপরিগ্রহে দোষদর্শী হইয়া স্বর্গ ও অপবর্গের (মোক্ষের) বিচার করিয়া নিজে অপবর্গেই মতি রাখিয়াছ।"

"যজ্ঞৈ স্তপোভির্নিয়মৈশ্চ তৈস্তৈঃ স্বর্গং যিযাসন্তি হি রাগবন্তঃ।
রাগেণ সার্ধং রিপুণেব যুদ্ধা মোক্ষং পরীপ্সন্তি তু সত্ত্ববন্তঃ।।" (বুদ্ধচরিত)

—যাঁহারা (বিষয়-সুখে) রাগযুক্ত তাঁহারাই সর্বপ্রকার যজ্ঞ, তপস্যা ও নিয়ম আচরণ করিয়া স্বর্গে যাইতে ইচ্ছুক; কিন্তু, যাঁহারা সত্ত্বগুণী লোক তাঁহারা রাগ বা বিষয়াসক্তিকে শত্রু মনে করিয়া, ইহার সহিত সংগ্রাম করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন।

মহাবস্তু-অবদানে উক্ত হইয়াছে যে, যখন বোধিসত্ত্ব বশিষ্ঠের সেই ধর্মারণ্যে প্রথম প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সেই নির্বাত সাগরের ন্যায় অব্যগ্র মুনিকে দর্শন করিয়া ধর্মাত্মা শাক্যরাজকুমার তৎসমীপে ভূমিতে উপবেশন করিলেন। কাঞ্চনস্তম্ভ-সদৃশ, জন্মশত-সঞ্চিত গুণসঞ্চয়ে লব্ধ শুভ শারীরলক্ষণযুক্ত সন্ন্যাসী রাজকুমারকে সবিশেষ লক্ষ্য করিয়া ঋষি বলিয়াছিলেন ঃ

"স্নিগ্ধগম্ভীরশব্দেন স্বরেণ অনুনাদিনা।
ত্রিলোকমর্হতে কৃৎস্নমাজ্ঞাপয়িতুমোজসা।।
ব্যঞ্জনানি হি যা যস্য লক্ষণানি চ লক্ষয়ে।
যুক্তোহয়ং সর্বভূতানাং ত্রিলোকপতিরীশ্বরঃ।।" (মহাবস্তু)

—(এই ব্যক্তি) তাঁহার স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও অনুনাদকারী স্বরের শব্দদ্বারা নিজ তপোবলে সমগ্র ত্রৈলোক্যকে আজ্ঞা করিবার যোগ্য। তাঁহার (শরীরে) আমি যে-সব লক্ষণ ও ব্যঞ্জন (চিহ্ন) সমূহ লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে (মনে হয় যে) তিনি ত্রিলোকে সর্বজীবের অধিপতি হইবার উপযুক্ত। কি কারণে তাঁহার তপোবনে আগমন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে গৌতম বশিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন ঃ

"ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবঃ শুদ্ধোদন-নৃপাত্মজঃ।
বিহায় পৃথিবীং রাজ্যং উজ্ঝিত্বা মোক্ষমাস্থিত।।
লোকস্তু বহুভির্দুঃখৈর্দৃষ্টেবং সমভিদ্রুতম্।
মোক্ষার্থমভিনিষ্ক্রান্তো জাতিব্যাধিজরাদিভিঃ।।
যত্র সর্বং ন ভবতে যত্র সর্বং নিরুধ্যতে।
যত্রোপশম্যতে সর্বং তৎপদং প্রার্থয়াম্যহম্।।"

—আমি ইক্ষ্বাকুবংশজাত ও শুদ্ধোদন রাজার পুত্র, পৃথিবী ছাড়িয়া ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া মোক্ষকে আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু, জন্ম ব্যাধি ও জরা প্রভৃতি

বহুবিধ দুঃখদ্বারা এইভাবে লোককে সংপীড়িত দেখিয়া আমি মোক্ষের অন্বেষণে (গৃহ হইতে) অভিনিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। আমি সেই পদ বা স্থানই প্রার্থনা করি, যাহাতে কোন কিছুই ভব বা সত্তা লাভ করে না, যাহাতে সব কিছুই নিরোধ বা বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সবকিছুই উপশম বা নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। বশিষ্ঠ সর্বশেষে বোধিসত্ত্ব গৌতমকে এই কথা বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন ঃ

"ঈদৃশেন হি বৃত্তেন বৃত্ত্যা লক্ষণসম্পদা।
প্রজ্ঞয়া চ মহাভাগ ন কিঞ্চিদ্ যং ন প্রাপয়ে।।"

—হে মহাভাগ! তোমার ঈদৃশ আচরণ, তোমার শরীরলক্ষণের উপযোগী ব্যবহার ও প্রজ্ঞাদ্বারা—তুমি না পাইতে পার, এমন কিছু নাই।

সেই আশ্রমের পূর্বোক্ত ভস্মশায়ী ব্রাহ্মণ তপস্বীর নির্দেশে, গৌতম বিন্ধ্যকোষ্ঠে (মহাবস্তুর মতে, বৈশালীতে) শ্রেয়োবিষয়ে লব্ধচক্ষুঃ নৈষ্ঠিক মুনি অরাড়কালামের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের আশায় তাঁহার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। এই ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মবাদী মুনিকে সাক্ষাৎকার করার পথে (মহাবস্তুর মতে, মুনির সহিত সাক্ষাৎকার লাভের পরে) গৌতম মগধদেশের রাজধানী রাজগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। এই রাজগৃহ নগর তখন 'পঞ্চাচলাঙ্ক' অর্থাৎ পাঁচটি গিরিদ্বারা পরিবৃত বলিয়া পরিচিত ছিল। গৌতম সেখানে শ্রেণ্য রাজা বিম্বিসারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন রাজগৃহ-প্রদেশের পাণ্ডবপর্বতের এক গুহায় বাস করিতেন এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য নগর মধ্যে যাইতেন। রাজা ভিক্ষুবেশী শাক্যকুমারকে বাহিরের প্রাসাদ হইতে লক্ষ্য করিয়া রাজদূত পাঠাইয়া জানিলেন যে, ভিক্ষুটি শুদ্ধোদন রাজার পুত্র গৌতম, যাঁহার সম্বন্ধে পূর্বে বিপ্রগণ বলিয়াছিলেন যে, হয় তিনি শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান অথবা রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন—"জ্ঞানং পরং বা পৃথিবীশ্রিয়ং বা বিপ্রৈর্য উক্তোহধিগমষ্যতীতি।"

রাজা অমাত্য ও পরিজন সঙ্গে করিয়া পাণ্ডবপর্বতে যাইয়া দেখিলেন যে, সেই কাষায়ধারী কুমার-সন্ন্যাসী এক বৃক্ষমূলে পর্যঙ্কবন্ধে একাগ্রচিত্তে সমাধিনিমগ্ন হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাজা বিম্বিসার গৌতমের সহিত কথোপকথন সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেন তিনি কুলধারা রক্ষা না করিয়া, এই বয়সে ভিক্ষাচরণে মতি দিয়া, রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রকারদিকের মতে ধর্মাচরণ কেবল স্থবিরদিগেরই আচরণীয়। রাজা গৌতমকে আরো স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে—যদি একান্তই ধর্মাচরণ করিতে হয়, তবে তাঁহার যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত; কারণ, অনেক রাজর্ষি ও মহর্ষি যজ্ঞ সম্পাদন-দ্বারাই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। গৌতম উত্তরে রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, অকল্যাণের হেতুভূত সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু ত্যাগ করিয়া, আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া, তিনি জরা ও মৃত্যুর ভয় বিশেষভাবে বুঝিয়া মুমুক্ষাবশতঃ ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাজা তাঁহাকে নিজ রাজ্যের অর্ধভাগ দান করিতেও চাহিয়াছিলেন—কিন্তু, গৌতমের নিকট রাজ্য ও দাস্য সমান প্রতিভাত হইত, কারণ—

"নিত্যং হসত্যেব হি নৈব রাজা, ন চাপি সন্তপ্যত এব দাসঃ।"

—রাজাও নিত্যই হাসেন না, আর দাসও নিত্যই সন্তাপ ভোগ করে না। গৌতম রাজাকে আরো বলিয়াছিলেন যে, রাজ্যব্যতিরেকেও তাঁহার মনস্তুষ্টি আছে। শান্তির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ ধ্যান অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগী হইয়াছেন; মানুষ-লোকের কথা দূরে থাকুক, তপস্যাদির আচরণের ফলে তিনি স্বর্গলোকেও রাজত্ব করিতে চাহেন না। ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের সেবা তিনি অনর্থ মনে করেন এবং যাহাতে জন্ম, জরা, রোগ, মৃত্যু, ভয় ও মানসিক ব্যথা বিদ্যমান নাই এবং যাহার লাভে পুনঃ পুনঃ কোন কর্মই আর করিতে হয় না—সেই বস্তুকেই তিনি পরমার্থ বলিয়া মনে করেন। যজ্ঞসম্পাদনে দোষদর্শী হইয়া গৌতম বিম্বিসারকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ঃ

"নমো মখেভ্যো ন হি কাময়ে সুখং পরস্য দুঃখক্রিয়য়া যদিষ্যতে।"

—যজ্ঞসমূহকে আমি নমস্কার করি—তদ্দ্বারা আমি কোন সুখ আকাঙ্ক্ষা করি না—কারণ, এই-সবে অপর প্রাণীর দুঃখ-সম্ভাবনা আছে। তিনি ভাবিতেন যে, পরহিংসা ইহলোকে বা পরলোকে সুখবিধান করিতে পারে না।

মগধরাজ গৌতমকে আশীর্বাদ করিলেন ঃ

"তং খো তথা ভোতু স্পৃশাহি নির্বৃতিং
বোধিং চ প্রাপ্তো পুনরাগমেসি।
মহ্যংঝি ধর্মং কথয়েসি গৌতম
যমহং শ্রুত্বা ন ব্রজেয় স্বর্গতিম্।।" (মহাবস্তু)

—(তুমি যেরূপ চাহ) তাহা যেন সেইরূপই হয়। তুমি যেন নির্বাণ স্পর্শ বা লাভ করিতে পার। বোধি বা সম্যকসম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় (এখানে) আসিও। হে গৌতম! (তখন) তুমি আমাকে ধর্মকথা বলিও—যাহা শুনিয়া আমি স্বর্গে যাইতে পারি। বোধিসত্ত্বও বিদায়কালে বলিলেন ঃ

"তং খো মহারাজ তথা ভবিষ্যতি
বোধিং স্পৃশিষ্যামি ন মেহত্র সংশয়ঃ।
প্রাপ্তো চ বোধিং পুনরাগমিষ্যং
ধর্মং চ তে দেশয়িষ্যং প্রতিশৃণোমীতি।।" (মহাবস্তু)

—হে মহারাজ! সেইরূপই হইবে। আমি যে বোধিপ্রাপ্ত হইব সে-বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। বোধিপ্রাপ্ত হইয়া আমি পুনরায় (এখানে) আসিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তখন আমি আপনাকে ধর্মের দেশনা বা উপদেশ প্রদান করিব। পাঠক জানেন—গৌতম 'বুদ্ধ' হইয়া মগধরাজকে ধর্মদানরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

বিন্ধ্যকোষ্ঠেই হউক আর বৈশালীতেই হউক, গৌতম বিমোক্ষবাদী ও আত্মাতে বিশ্বাসী অরাড়কালামের আশ্রমে যাইয়া মুনির সহিত পরমার্থবিষয়ক আলাপ করিয়াও সম্যক সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। গৌতমের আশ্রমে আগমনের পরেই মুনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার রাজ্যভোগ ছাড়ার ও গৃহত্যাগের বিষয় অবগত আছেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি জ্ঞানপ্লবে চড়িয়া শীঘ্রই সর্বদুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিবেন। বোধিসত্ত্ব অরাড়মুনিকে জরা মরণ ব্যাধি প্রভৃতির হাত হইতে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি তাঁহার নিজ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গৌতমকে

উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, অজ্ঞান, কর্ম ও তৃষ্ণা—এই তিনটিই সংসারের হেতু এবং মানুষ অবিদ্যার বশে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে। তিনি তাঁহাকে আরো বলিলেন যে, পরমব্রহ্মবাদীদিগের মতে মুমুক্ষুরা প্রথমে গৃহত্যাগ করিবেন এবং ভিক্ষার আশ্রয় লইবেন, শীলাচরণ করিবেন, নির্দ্বন্দ্ব হইয়া বিবিক্তসেবী হইবেন এবং তারপর প্রথম হইতে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মনির্বাণ—সুখ ও শান্তি অনুভব করিবেন। মুনি আকাশরূপী আত্মার উপলব্ধি ও আকিঞ্চন্যের কথাও বলিলেন এবং সর্বশেষে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গৌতমকে ইহাও বলিলেন ঃ

"এতৎ তৎ পরমং ব্রহ্ম নির্লিঙ্গং ধ্রুবমক্ষরম্।
যন্ মোক্ষ ইতি তত্ত্বজ্ঞাঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ।।" (বুদ্ধচরিত)

—ইহাই সেই পরম ব্রহ্ম—যাহা নির্লিঙ্গ, ধ্রুব ও অক্ষয় এবং যাহাকে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা মোক্ষ-নামে অভিহিত করেন। মুনি গৌতমকে বলিলেন, যদি তিনি ইহা বুঝিয়া থাকেন এবং যদি ইহাতে তাঁহার রুচি হইয়া থাকে, তবে এই মোক্ষবাদ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু, গৌতম মনে করিলেন বিকারপ্রকৃতি হইতে মুক্ত হইলেও ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মায় প্রসবধর্ম ও বীজধর্ম রহিয়া যায়। তিনি আরো মনে করিলেন যে, অরাড়-প্রোক্ত অজ্ঞান, কর্ম ও তৃষ্ণার ত্যাগ হইতেই মোক্ষ উৎপন্ন বা উপলব্ধ হইতে পারে না, কারণ, "আত্মনস্তু স্থিতির্যত্র তত্র সূক্ষ্মমিদং ত্রয়ম্"—যে ক্ষেত্রে আত্মার স্থিতি স্বীকৃত হয়, সেখানে এই তিনটি সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যাদি ধর্মমতের মোক্ষে গৌতম দোষদর্শী হইয়া ভাবিলেন—"সত্যাত্মনি পরিত্যাগো নাহংকারস্য বিদ্যতে"—আত্মা থাকিলে অহঙ্কার বা আমি-জ্ঞানের আত্যন্তিক পরিত্যাগ ঘটিতে পারে না। সত্ত্বের (জীবের) আত্মা 'জ্ঞ' বা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' হইলে, তাঁহার কোন না কোন জ্ঞেয় থাকিয়া যায়। আবার "জ্ঞেয়ে সতি ন মুচ্যতে"—জ্ঞেয় থাকিলে তাঁহার মুক্তি হয় না। কাজেই তিনি অরাড়মুনিকে বলিয়াছিলেন ঃ "তস্মাৎ সর্বপরিত্যাগান্ মন্যে কৃৎস্নাং কৃতার্থতাম্"—এইপ্রকার যুক্তি দ্বারা বলা যায় যে সর্ববিষয়ের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ বা বিলয় ঘটিলেই সমগ্র কৃতার্থতা লাভ সম্ভবপর হইতে পারে। তাই এই মুনি-প্রোক্ত ধর্মকে তিনি অসমগ্র মনে করিলেন এবং দুঃখিত হইয়া অরাড়প্রোক্ত মার্গ বা ধর্মপথকে নির্বাণগামী মনে করিলেন না এবং সেই মুনির আশ্রম ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে চলিয়া গেলেন। গৌতম সেখানে রামপুত্র উদ্রক-নামক মুনির আশ্রমে যাইয়া "আত্মগ্রহাচ্চ তস্যাপি জগৃহে ন স দর্শনম্"—সেই মুনিও আত্মা স্বীকার করেন বলিয়া তিনি তাঁহার দর্শনও মানিয়া নিলেন না এবং সেই আশ্রম ছাড়িয়া গয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পূর্বে বর্ণিত অবস্থাভেদে যজ্ঞ ও তপস্যাদিতে দোষদর্শী হইয়াও গতানুগতিক রীতি অবলম্বন করিয়া বোধিসত্ত্ব গৌতম অতি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হইতে অভিলাষী হইলেন। নিজ সঙ্কল্প স্থির রাখিয়া তিনি গয়া নগরীর আশ্রমের নিকটে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে কৌণ্ডীন্যপ্রমুখ পাঁচ প্রব্রজিত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগদ্বারা সংপূজ্যমান হইয়া জন্ম ও মৃত্যুর অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে—'কোটিপ্পত্তং দুক্করকারিকং করিস্সামীতি' (নিদানকথা)—শেষসীমায় উপগত দুষ্কর (তপস্যাদি) ক্রিয়া সম্পাদন করিব—বলিয়া ধার্য করিলেন।

তৎপর তিনি এমনভাবে আহারচ্ছেদ আরম্ভ করিলেন যে, একটি তিল বা একটি তণ্ডুলমাত্র গ্রহণ করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। অনশনাদি দ্বারা তাঁহার ছয় বৎসর চলিয়া গেল। একদিন এমনও হইল যে, তিনি প্রাণবায়ুরোধকারক তপস্যাকালে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় কাষ্ঠবৎ আসীন হইলে লোকেরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়াছিল। শমপ্রত্যাশী বোধিসত্ত্ব উপবাসাদি আচরণ করিয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়িলেন—তাঁহার সুবর্ণবর্ণ দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার শরীরস্থ দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ-লক্ষণ অদৃশ্য হইতে লাগিল। অপার-পার সংসারের পারপ্রাপ্তি তাঁহার ঘটিল না। তাঁহার শরীরের মেদ, মাংস ও রক্ত শুকাইয়া গেল। ত্বগস্থিশেষ হইয়া তিনি ভাবিলেন ঃ

"নায়ং ধর্মো বিরাগায় ন বোধায় ন মুক্তয়ে।
জম্বুমূলে ময়া প্রাপ্তো যস্তদা স বিধির্ধ্রুবঃ।।" (বুদ্ধচরিত)

—(কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা আচরিত) এই ধর্ম বৈরাগ্য, সম্যগজ্ঞান বা মুক্তি—কোনটাই আনিতে পারিবে না। (পূর্বে পিতার রম্যোদ্যানে) জম্বুবৃক্ষমূলে আমি যে (ধ্যান) বিধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাই ধ্রুব বা ঠিক বিধি। এই কঠোর তপস্যাসাধনকে অমার্গ মনে করিয়া তিনি উত্তম উত্তম আহার্য বস্তু গ্রহণে মতি স্থির করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীর হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া আসিয়া অল্পমাত্র খাদ্যের জন্য উরুবিল্বা গ্রামে যাইয়া (মহাবস্তুর মতে) গ্রামিকের কন্যা সুজাতার (বুদ্ধচরিতের মতে গোপকন্যা নন্দবালার) প্রদত্ত মধু-পায়স গ্রহণ করিয়া সন্তর্পিত ষড়িন্দ্রিয় হইয়া ক্রমশ বোধিপ্রাপ্তির সামর্থ্য লাভ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বকে দুষ্করচর্যা দ্বারা সর্বজ্ঞতালাভের চেষ্টায় বিরত দেখিয়া এবং পুনরায় সুখাদ্য গ্রহণে প্রবৃত্ত লক্ষ্য করিয়া সেই ভিক্ষুপঞ্চক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বিরক্তিসহকারে দূরবর্তী কাশীরাজ্যের ঋষিপত্তনে (মৃগদাবে) চলিয়া গেলেন। তৎপর যিনি অরাড় ও উদ্রক ঋষির ধর্মমতবাদে অপরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি আজ পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের নিষেবিত এই গয়াপ্রদেশে যাইয়া বোধিলাভের উদ্দেশ্যে কৃতনিশ্চয় হইয়া অশ্বত্থমূলে সমাসীন হইয়া এই এক দুর্জয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই আসনে বসিয়া তাঁহার শরীর শুষ্ক হইয়া যায় যাউক, তাঁহার ত্বক, অস্থি ও মাংস লুপ্ত হয় হউক, কিন্তু, বহুকল্পেও দুর্লভ বোধি বা প্রজ্ঞাপারমিতা লাভ না করিয়া তিনি নিজ শরীর এই আসন হইতে চালিত করিবেন না। পাঠক জানেন যে, তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা ফলমণ্ডিত হইয়াছিল এবং এই বোধিবৃক্ষমূলে সেই আসনে বসিয়াই সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি 'সম্যকসম্বুদ্ধ' হইয়াছিলেন।

অতঃপর অতিসংক্ষেপে মধুপায়সদাত্রী সুজাতার আখ্যানবস্তু 'নিদানকথা' ও 'মহাবস্তু' হইতে চয়ন করিয়া নিম্নে প্রদান করিতেছি। নিদানকথাতে বর্ণিত আছে যে, শ্রীবুদ্ধের উরুবিল্বায় ছয় বৎসর ব্যাপী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে ব্যাপৃত থাকাসময়ে সেই সেনানী-নিগমে সেনানী কুটুম্বীর গৃহে সুজাতা-নাম্নী বয়ঃপ্রাপ্তা এক দুহিতা বাস করিত। সে এক ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে বৃক্ষদেবতার নিকট এই প্রার্থনা করিতে গেল যে, যদি সমজাতিক কুলঘরে বিবাহিত হইবার পর প্রথম গর্ভে সে পুত্র লাভ করে, তবে প্রতি বৎসর শতসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া বৃক্ষদেবতার জন্য বলিকর্ম সম্পাদন করিবে। যখন বোধিসত্ত্ব গৌতম তদীয়

দুষ্কর তপস্যার ষষ্ঠ বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন, তখন বৈশাখী পূর্ণিমা আগত হইয়াছে। সুজাতা বৃক্ষদেবতার উদ্দেশ্যে সেইদিনই বলিকর্ম সম্পাদন করিতে অভিলাষ করিল এবং প্রাতঃকালে নবভাজনে (পাত্রে) ধেনুদিগের স্তনমূল হইতে স্বতঃপ্রস্রুত অপর্যাপ্ত দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিল। আশ্চর্যের বিষয় যে, সেই দুগ্ধ সুজাতা স্বয়ং জ্বাল দিবার সময় দেখিল যে একবিন্দু দুগ্ধও পাকের সময় উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়া গেল না। এরূপ আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করিয়া সে তাহার পূর্ণা নামক দাসীকে ডাকিয়া বলিল যে, নিশ্চিতই তাহাদের দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন এবং তাহাকে ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে দ্রুত যাইয়া দেবতাস্থান পরিষ্কৃত রাখিতে বলিল। বোধিসত্ত্ব গৌতমও পূর্বরাত্রিকালে পঞ্চস্বপ্নদর্শনে জানিয়াছিলেন যে, আগামী রাত্রিতেই তিনি নিঃসংশয়ে 'বুদ্ধ' হইবেন। তাই তিনি সেই রাত্রি প্রভাত হইলে পর সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া আসীন হইয়া চারিদিক নিজ শরীরপ্রভায় উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। সুজাতার দাসী পূর্ণা বোধিসত্ত্ব গৌতমের প্রভায় সেই বৃক্ষকে সুবর্ণবর্ণ দেখিয়া মনে করিল যে, তাহাদের বৃক্ষদেবতা প্রসন্ন হইয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া স্বহস্তেই সুজাতার বলিকর্ম স্বীকার করিবেন। পূর্ণা বেগে যাইয়া সুজাতাকে এই সংবাদ জানাইল। তখন সুজাতা তাহার নিজহস্তে প্রস্তুত মধুপায়স সুবর্ণপাত্রে ঢালিয়া লইয়া সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে দেখিয়াই তাঁহাকে বৃক্ষদেবতা বলিয়া জ্ঞান করিল। সুজাতা পাত্রসহ পায়স সেই মহাপুরুষ গৌতমের হস্তে প্রদান করিল এবং বলিল ঃ "আপনি ইহা লইয়া যথারুচি চলিয়া যাউন—যেমন আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, তেমন আপনার অভীষ্টও সিদ্ধ হউক।" সেই পায়স লইয়া বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনা নদীর তীরে গেলেন এবং তাহা ঘাটের সোপানে রাখিয়া নদীতে স্নান করিয়া প্রথমত সেই মধুপায়স উনপঞ্চাশ ভাগে ভাগ করিয়া একভাগ আহার করিলেন। বোধিলাভের পর এই পায়স তিনি সাত সপ্তাহকাল পরিভোগ করিয়াছিলেন, অন্য কোন আহার গ্রহণ করেন নাই।

উপরি-বর্ণিত 'নিদানকথা'য় উল্লিখিত এই আখ্যান হইতে খানিকটা পৃথকভাবে বর্ণিত 'মহাবস্তু-অবদানে' উল্লিখিত আখ্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ ঃ

অরাড়কালাম ও উদ্রক ঋষির উপদিষ্ট তত্ত্বকথায় পরিতুষ্ট না হইয়া বোধিসত্ত্ব গৌতম উরুবিল্বায় চলিয়া আসিলেন। সেখানে গ্রামিকের (গ্রামপতির) সুজাতা-নাম্নী বিদুষী কন্যা রাজপুত্রকে দেখিয়া প্রীতিবেগে কাঁপিতে লাগিল; অশ্রুপাত করিয়া তাঁহাকে বলিল ঃ "হে নরবর! তুমি আজ এই নিগম (ক্রয়বিক্রয়ের নগর) হইতে ফিরিয়া যাইও না। তোমাকে দেখিয়া আমার নয়নদ্বয় অতৃপ্ত রহিয়াছে; তুমি চলিয়া গেলে আমার হৃদয় সর্বতোভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে।" সেইসময়ে সুজাতা দেববাণী শুনিল—"এই ব্যক্তি কিন্তু কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের শ্রেষ্ঠ পুত্র।" সে ভাবিল—কেমন করিয়া এই বরপুরুষ বান্ধবদিগকে ছাড়িয়া বনবাস করিতেছেন। তৎপর কুমারকে পুনরায় বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সুজাতা রোদন-সহকারে বোধিসত্ত্বের অনুগমন করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিল ঃ "তোমার কমলদলসদৃশ কোমল চরণদ্বারা তৃণকুশাদিময় দুর্গম ভূমির উপর দিয়া তুমি কিরূপে চলিবে? মিষ্টান্ন ও অন্যান্য রসময় দ্রব্যদ্বারা বর্ধিতদেহ তুমি কেমন করিয়া বনের ফলমূলাদি

ভক্ষণ করিবে? পুষ্পাকীর্ণ শয্যায় শুইতে অভ্যস্ত তুমি কি প্রকারে তৃণকুশাদি-সংস্কৃত তলভূমিতে শয়ন করিবে? রাজভবনে পটহাদির সঙ্গীত শুনিয়া এখানে তুমি কিপ্রকারে রুষ্ট শ্বাপদ জন্তুদিগের গর্জন শুনিবে? হে বনেচর সন্ন্যাসী! তুমি যেন তৃষ্ণায় ও ক্ষুধায় কাতর না হও। দেবশিশুর ন্যায় তোমার শরীরটিকে যেন দেবযোনিরা রক্ষা করেন।'' বোধিসত্ত্ব গৌতম এইরূপে সেই ভয়ঙ্কর বনমধ্যে তপস্যায় নিরত রহিলেন। ইহাও বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে সত্ত্বসার তপস্বী গৌতম যেরূপ নিজের জন্য, তদপেক্ষা অধিকভাবে জগতের সর্ব সত্ত্বের জন্য, হিত কামনা করিতেছেন। তাঁহার মনে এইপ্রকার উদার ভাব উদিত হইল—(এইরূপ ভাব পরবর্তী কালে মহাযানী বৌদ্ধদিগের মতসম্মত) ঃ

''একেকসত্ত্বমোক্ষণে যদি কল্পসংখ্যং সর্বসত্ত্বানাং।
দুঃখমনুভোমি তারেষ্যং সর্বসত্ত্বানাং ব্যবসিতমিদম্।।'' (মহাবস্তু)

—এক একটি সত্ত্ব বা জীবের মোক্ষের জন্য যদি আমি অসংখ্য কল্পে সর্ব সত্ত্বের দুঃখ অনুভব করি, তথাপি আমি সর্ব সত্ত্বের উদ্ধার সাধন করিব—ইহাই আমার ক্রিয়াসঙ্কল্প। কর্মক্ষয়ের জন্য ছয় বৎসর ব্যাপিয়া বনমধ্যে দুষ্কর তপস্যাদির আচরণ করিবার পর বোধিসত্ত্বের এই জ্ঞান লব্ধ হইল—''যত্র পথাস্মি গতো নায়ং মার্গো মোক্ষায়''—আমি যে পথে গমন করিয়াছি তাহা মোক্ষের মার্গ নহে। বরং শাক্যরাজের উদ্যানে বহুপূর্বে জম্বুবৃক্ষমূলে বসিয়া আমি যে প্রথম ধ্যান সম্পাদন করিয়াছিলাম—''স ভবিষ্যতি বোধয়ে মার্গো''—সেই ধ্যানমার্গই বোধি বা সম্যকপ্রজ্ঞার মার্গ হইবে। যে ব্যক্তি দুর্বল ও কৃশ এবং যাহার রুধির ও মাংস পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে বোধিলাভ সম্ভবপর নহে; তাই আমি পুনরায় আহার্য বস্তু ভক্ষণ করিব। এইসময়ে এক দেবতা তাঁহাকে আহার্য গ্রহণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—''তুমি পুনরায় আহার করিও না, তোমার যশঃ পরিহীন হইবে—আমরাই তোমার গাত্রে বল সঞ্চার করিব।'' গৌতমের বিশ্বাস, এই বচন সত্য হইতে পারে না, তাই তিনি ভীতভাবে দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিন্দা করিলেন—''তোমাদের সেই চেষ্টায় আমার কোন প্রয়োজন নাই।'' ইহার পরেই তিনি মুদ্গ (মুগ) ও অন্যান্য কলায় ও গুড়মিশ্রিত যূষ ভোজন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমশ শরীরে শক্তি ও বল অনুভব করিতে লাগিলেন এবং আহার অন্বেষণে উরুবিল্বাগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে পূর্বে কোন জন্মে তাঁহার জনয়িত্রী (জননী) সেই সুজাতা-নাম্নী উচ্চকুলসম্ভূতা ও পণ্ডিতা নারী ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে মধুপায়স গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গৌতমকে সেই পায়স দান করিয়া সে তাঁহার গুণকীর্তন করিতে লাগিল। তিনি সুজাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—''কিমর্থমেতং দদাসি দানম্''—তুমি কি কারণে আমাকে এই (পায়স) দান দিতেছ? গৌতমের শত-শত জন্মের জননী সুজাতা উত্তরে বলিলেন ঃ ''তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহা গ্রহণ কর। শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের পুত্র ভয়ঙ্কর বনে ছয় বৎসর ঘুরিয়া তপস্যা-দ্বারা যাহা অন্বেষণ করিতেছেন সেই উদ্দেশ্য যেন পূর্ণতা লাভ করে। আমিও তাঁহার পথেই যাইতে চাই।'' অন্তরীক্ষ হইতে তখন এক অমানুষী বাণী প্রাদুর্ভূত হইল—''সুজাতে এষো সো ধীরো শাক্যরাজকুলোদিতো''—হে সুজাতে! এই ব্যক্তিই

সেই শাক্যরাজকুলে উদিত ধীর বা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। এই ব্যক্তি নিজের শোণিত ও মাংস শুষ্ক করিয়াও তপোবনে দুষ্কর ও রোমহর্ষণ তপস্যা করিয়াছেন। তাহা নিরর্থক বলিয়া ত্যাগ করিয়া তিনি এখন ন্যগ্রোধমূলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—যেখানে অতীত সংবুদ্ধগণও উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপর সুজাতা আনন্দে অশ্রুপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই নরশ্রেষ্ঠকে বলিতে লাগিলেন—হে কমললোচন মহাপুরুষ! আমি তোমাকে উগ্র তপস্যা হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়াছি; এখন আমার শোকমথিত হৃদয় প্রীতি অনুভব করিতেছে। বিগত ছয় বৎসর আমি নিজে যে সুখশয্যাসমূহে ঘুমাইয়াছি, সেসব আমার কোন সুখই উৎপাদন করিতে পারে নাই—কারণ, আমি তোমার কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের কথায় শোকশরের আঘাত-তাপে ক্লিষ্ট হইয়া সর্বদা চিন্তা করিয়াছি। এখন তোমাকে চিনিতে পারিয়া এই বলিতেছি যে, তোমার সেই রাজ্য ও প্রজারা, তোমার পিতা ও স্নেহকাতরা মাতৃষ্বসা (গৌতমী) তোমার সেইরূপ কঠিন তপস্যার অবসানের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন। কপিলবস্তুর নরনারীরা এখন হাস্যপূর্ণবদনে আনন্দে প্রমুদিত হইয়া উঠিবে। আমার প্রদত্ত মধুপায়স উপভোগ করিয়া পূর্বজন্মের আকাঙ্ক্ষাসমূহের নির্ঘাতক বা নাশকারী হও এবং এই দ্রুমরাজমূলস্থ ভূমিখণ্ডে বসিয়া—'অমৃতমধিগতো পদমশোকম্'—শোকাতীত অমৃতপদ (নির্বাণ) প্রাপ্ত হও। তখন বোধিসত্ত্ব গৌতম ব্যক্ত করিলেন—পাঁচ শত জন্মে তুমি আমার জননী ছিলে। ভবিষ্যৎকালে তুমি জৈনব্রত ধারণপূর্বক প্রত্যেক-বুদ্ধপদ লাভ করিতে পারিবে (অর্থাৎ স্বয়ংই বুদ্ধত্বলাভের অধিকারিণী হইতে পারিবে)।

ইহাই সুজাতা-সম্বন্ধীয় আখ্যান-বস্তু। জননী-সদৃশা সুজাতার প্রদত্ত পায়স আহার করিয়া নিরর্থক কঠোর তপস্যার অন্তে বোধিসত্ত্ব গৌতম সম্যক সংবোধিলাভের চেষ্টায় কৃতকৃত্য হইতে পারিয়াছিলেন। পাঠক জানেন যে, সংবুদ্ধ হইয়া গৌতম ঋষিপত্তনে ধর্মচক্র প্রবর্তন সময়ে ভিক্ষুগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, প্রব্রজিতের পক্ষে দুইটি 'কোটি' বা অন্ত পরিত্যক্তব্য—(১) সংসারের কামসুখভোগে আত্মসমর্পণ ও (২) কঠোর তপস্যায় নিরত হইয়া আত্মক্লেশভোগ। তাই তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গ-নামক মধ্যম প্রতিপদা বা মধ্যমপথের আবিষ্কার করিয়া জনগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই পথই সম্বোধি ও নির্বাণের পথ। জ্ঞান, শান্তি, অভিজ্ঞা প্রভৃতি এই পথেই পাওয়া যায়।* □

* ৫৯ বর্ষ, ৯ ও ১১ সংখ্যা

আচার্য শঙ্কর

প্রভাসচন্দ্র সেন

শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশে কালাডি নামক গ্রামে ৬০৮ শকে (৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে) বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন (মতান্তরে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী) নম্বুরী ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা শিবগুরু স্বধর্মনিষ্ঠ যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও পুত্র না হওয়ায় তিনি গ্রামের নিকটস্থ বৃষপর্বতে কেরলরাজ-প্রতিষ্ঠিত শিবালয়ে সস্ত্রীক মহাদেবের আরাধনা করিতে থাকেন। এক বৎসর পরে ভগবান শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে অভীষ্ট বর প্রদান করিলে শিবগুরু পুত্রলাভ করেন। ইনিই জগদ্বিখ্যাত আচার্য শঙ্কর।

শিশুকাল হইতেই শঙ্কর অসাধারণ মেধাবী ও শ্রুতিধর ছিলেন। তিন বৎসর বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। স্বামীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য শঙ্করের মাতা পঞ্চম বৎসরে উপনয়ন দিয়া পুত্রকে শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন শঙ্কর দুই বৎসরেই সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং মাতৃসেবায় রত হন।

গুরুগৃহে অবস্থানকালে শঙ্কর একদিন এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। ব্রাহ্মণী গৃহে কিছু না থাকায় তাঁহাকে একটি আমলকি ফল প্রদান করেন এবং নিজেদের দারিদ্র্যের কথা নিবেদন করেন। ব্রাহ্মণীর দুঃখে বিগলিত হইয়া শঙ্কর কাতরপ্রাণে লক্ষ্মীদেবীর স্তব করেন এবং ব্রাহ্মণীকে আশ্বস্ত করিয়া গুরুগৃহে ফিরিয়া আসেন। সেই রাত্রেই দেবীর কৃপায় ব্রাহ্মণীর প্রচুর ধনলাভ হইয়াছিল। আচার্য শঙ্করের জীবনীলেখক মাধবাচার্য 'শঙ্কর-দিগ্বিজয়' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ঐ রাত্রে ব্রাহ্মণীর গৃহে সুবর্ণ আমলকির সৃষ্টি হইয়াছিল।

গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুদিন পরে আরেকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে, যাহাতে শঙ্করের খ্যাতি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়। শঙ্করের মাতা গৃহ হইতে কিছু দূরে আলোয়াই নদীতে প্রত্যহ স্নান করিতে যাইতেন। একদিন গ্রীষ্মকালে স্নান করিয়া বাটী ফিরিবার পথে প্রচণ্ড রৌদ্রে অবসন্ন হইয়া তিনি মূর্ছিতা হইয়া পড়েন। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া শঙ্কর তাঁহার অনুসন্ধানে গিয়া দেখেন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন। সেবাশুশ্রূষার দ্বারা সংজ্ঞালাভ করাইয়া মাতাকে গৃহে লইয়া আসিয়া শঙ্কর কাতরভাবে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যেন নদী তাঁহাদের বাটীর নিকট দিয়া প্রবাহিত হয়। অতি আশ্চর্যের বিষয়, কিছুদিনের মধ্যেই আলোয়াই নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়া শঙ্করের বাটীর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

একদিন কয়েকজন জ্যোতিষী শঙ্করের গৃহে আসিয়া কোষ্ঠী বিচার করিয়া বলিয়া যান যে, শঙ্কর অতি অল্পায়ু হইবে। অষ্টম বর্ষে তাহার মৃত্যুযোগ আছে। ঐসময় হইতে শঙ্করের মনে সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য তীব্র বাসনা জন্মে। তিনি মাতাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন, কিন্তু বিধবা মাতা একমাত্র সন্তানকে কিছুতেই অনুমতি প্রদান করিলেন না। কয়েকদিন পরে কোন কার্যোপলক্ষে আলোয়াই নদী পার হইয়া আসিবার কালে শঙ্করকে এক কুম্ভীর আক্রমণ করে। শঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকিলে বৃদ্ধা মাতা বা কেহই জলে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে যাইতে পারিলেন না। তখন শঙ্কর সেই অবস্থায় দূর হইতে মাতাকে বলিলেন ঃ "মা, সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া মৃত্যু হইলে সদ্গতি হয়, আপনি আমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিন।" পুত্রের কল্যাণের জন্য মাতা অনুমতি প্রদান করিলে বিধাতার ইচ্ছায় কুম্ভীর শঙ্করকে পরিত্যাগ করে। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে মাতাকে অনেক বুঝাইয়া এবং তাঁহার মৃত্যুকালে আসিয়া সৎকার করিবেন ও ভগবদ্দর্শন করাইবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া শঙ্কর গৃহত্যাগ করিলেন।

গুরুগৃহে শাস্ত্রপাঠকালে শঙ্কর গুরুর নিকট শুনিয়াছিলেন মহর্ষি পতঞ্জলি দেহধারণ করিয়া গোবিন্দপাদ নাম লইয়া নর্মদাতীরে এক গুহায় বহুকাল সমাধিস্থ আছেন। অষ্টমবর্ষীয় বালক সদগুরুলাভের আশায় মাসাধিককাল পদব্রজে দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নর্মদাতীরে সেই গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং গুহা প্রদক্ষিণ করিয়া যোগীকে ভক্তিভরে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি শঙ্করের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে দীক্ষাদানপূর্বক নিজের নিকট রাখিলেন এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও যোগ-সাধনের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দপাদ তখন শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্বক বলিলেন ঃ "বৎস, তুমি কাশীধামে গমন কর এবং বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার কর।" শঙ্কর কাশীতে বিশ্বেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিবার জন্য প্রত্যক্ষ আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর শঙ্করাচার্য কাশী হইতে বদরিকাশ্রম গমন করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনা সমাপ্ত করিয়া শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে দশোপনিষদের ও গীতার ভাষ্য এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিলেন।

আচার্য শঙ্করের প্রথম শিষ্য সনন্দন। তিনি পরম গুরুভক্ত ছিলেন বলিয়া আচার্য তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। এজন্য অপর শিষ্যগণ কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত ছিলেন। একদিন শঙ্করাচার্য শিষ্যদিগকে সনন্দনের গুরুভক্তির পরিচয় ও শিক্ষা দিবার জন্য নদীর অপর পারে অবস্থিত সনন্দনকে এপার হইতে আহ্বান করিলেন। গুরুভক্ত শিষ্য গুরুদেবের আহ্বানে নদীর ব্যবধান লক্ষ্য না করিয়াই দ্রুতবেগে আসিতে লাগিলেন। গুরুভক্তির কী অপার মহিমা! সনন্দনের প্রতি পদক্ষেপে নদীবক্ষে এক একটি করিয়া পদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে

লাগিল। তিনি পদ্মগুলির উপর দিয়া অনায়াসে নদী পার হইয়া আচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেইসময় হইতে তাঁহার নাম 'পদ্মপাদ' হইল।

বদরিকাশ্রমে চারি বৎসর অবস্থান করিবার পর পুনরায় কাশীধামে আগমন করিয়া শঙ্করাচার্য শিষ্যগণকে শিক্ষাদান এবং শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এইসময়ে ব্রহ্মসূত্র-প্রণেতা ব্যাসদেব শঙ্করের সহিত শাস্ত্রবিচার করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আগমন করেন। অষ্টাহকাল শাস্ত্রালোচনা ও তর্ক করিবার পর ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হইয়া নিজমূর্তিতে দর্শন দিয়া শঙ্করাচার্যকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন ঃ "তোমার ভাষ্য উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তুমি শঙ্করের অবতার। তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হও। দূষিতধর্মমতাবলম্বী আচার্যগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ধর্মের গ্লানি হইতে সনাতন ধর্ম রক্ষা এবং বেদান্তমত প্রচার কর। ধর্মসংস্থাপনের জন্য তোমার আয়ু বত্রিশ বর্ষ পর্যন্ত বর্ধিত হইল।"

অনন্তর শঙ্করাচার্য শিষ্যগণের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভারত পরিভ্রমণপূর্বক বিভিন্নমতাবলম্বী প্রতিপক্ষগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধবাদ, জৈনমত, পাশুপত, ভৈরব, কাপালিক প্রভৃতি মতবাদকে হীনপ্রভ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষাপূর্বক অদ্বৈত বেদান্তের মত প্রচার করেন। তিনি প্রথমে মগধে মাহিষ্মতীনগরে গমন করিয়া মীমাংসকাচার্য কুমারিলভট্টের শিষ্য মণ্ডনমিশ্রকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। এই মণ্ডনমিশ্র সুরেশ্বরাচার্য নামে শঙ্করের প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মহারাষ্ট্রে ও শ্রীশৈলে শৈব ও কাপালিক প্রভৃতি মতবাদিগণকে পরাস্ত করেন। শ্রীশৈলে 'উগ্রভৈরব' নামে এক কাপালিক ভৈরবের নিকট বলি দিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার মানসে গোপনে আচার্যের নিকট প্রার্থনা করে যেন তিনি বলির জন্য তাঁহার দেহ দান করেন। দেহজ্ঞানশূন্য উদারহৃদয় শঙ্করাচার্য কাপালিকের বলিস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন ঃ "আমি সমাধিস্থ হইলে আমার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিও।" এদিকে আচার্যকে দেখিতে না পাইয়া নৃসিংহদেবের ভক্ত পদ্মপাদ গুরুদেবের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভগবান নৃসিংহদেব পদ্মপাদের শরীরে আবিষ্ট হইয়া নক্ষত্রবেগে বলিস্থানে গমনপূর্বক কাপালিকের খড়্গ শঙ্করাচার্যের উপর পাতিত হইবার পূর্বেই কাপালিকের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন।

আচার্য শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যে-যে স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন সেখানকার লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও স্থানে স্থানে মন্দির নির্মাণ করিয়া তত্রত্য দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বদরীনাথে নারদকুণ্ড হইতে বদরীনারায়ণের মূর্তি এবং হৃষীকেশে গঙ্গাগর্ভ হইতে বিষ্ণুবিগ্রহ উদ্ধার করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। দাক্ষিণাত্যের কামাক্ষী দেবীর মন্দির তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। পুরীধামে কালযবনের অত্যাচারে পাণ্ডারা জগন্নাথ-বিগ্রহের উদরস্থিত রত্নপেটিকা চিল্কা হ্রদের তীরে প্রোথিত করিয়া লুকাইয়া রাখে। কালক্রমে ঐ স্থান বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া যাইলে শঙ্কর যোগবলে ঐ স্থান নির্ণয় করিয়া রত্নপেটিকা উদ্ধার করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

শঙ্করাচার্য ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ নির্মাণ করিয়া প্রত্যেক মঠে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থাপন করিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে মহীশূর প্রদেশে তুঙ্গভদ্রার তীরে শৃঙ্গেরি মঠ এবং ঐ মঠে সরস্বতীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি পুরীধামে গোবর্ধন মঠ স্থাপন করেন। তৎপর উজ্জয়িনীতে ভৈরবদিগের অত্যাচার দমন করিয়া দ্বারকায় সারদা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কামরূপে অভিনবগুপ্তকে বিচারে পরাস্ত করিয়া শাক্তদের দুর্নীতি দমন করেন। কামরূপে অভিনবগুপ্ত অভিচারের দ্বারা আচার্যের শরীরে ভগন্দর রোগের সৃষ্টি করে। পদ্মপাদ নৃসিংহ-মন্ত্র জপ করিয়া ঐ রোগ আচার্যের শরীর হইতে অভিনবগুপ্তের দেহে সঞ্চারিত করিয়া গুরুদেবকে রোগমুক্ত করেন। অনন্তর শঙ্করাচার্য মিথিলা ও কাশ্মীর হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া সেখানে বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকট জ্যোতির্মঠ স্থাপন করেন। তিনি শৃঙ্গেরি মঠে সুরেশ্বরাচার্য, গোবর্ধন মঠে পদ্মপাদাচার্য, সারদা মঠে হস্তামলকাচার্য এবং জ্যোতির্মঠে তোটকাচার্য—এই চারিজন শিষ্যকে মঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। সুরেশ্বর ও পদ্মপাদের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। অপর দুইজন সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি এইরূপ ঃ

হস্তামলকাচার্য—ইনি ত্রয়োদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মূকের ন্যায় ছিলেন। পিতা তাঁহাকে শঙ্করের নিকট আনয়ন করিলে ইনি আচার্যকে প্রণাম করিয়া 'হস্তামলক' নামে একটি সুন্দর স্তোত্রপাঠ করিয়া আত্মপরিচয় দেন এবং তাঁহার শিষ্য হন। এজন্য ইঁহার নাম হস্তামলকাচার্য হইয়াছিল। শঙ্কর ঐ স্তোত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

তোটকাচার্য—আচার্যের শৃঙ্গেরি মঠে অবস্থানকালে ইনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহার নাম ছিল গিরি। গিরির বিদ্যাবুদ্ধি অল্প ছিল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত গুরুসেবাপরায়ণ ছিলেন। একদিন শাস্ত্রব্যাখ্যাকালে ইনি গুরুর বস্ত্র ধৌত করিতে যাওয়ার জন্য অনুপস্থিত থাকায় শঙ্কর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ গিরিকে মূর্খ বলিয়া আচার্যকে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করেন। তখন শঙ্করাচার্যের কৃপায় গিরির ব্রহ্মবিদ্যার স্ফুরণ হয়। গিরি তোটক ছন্দে গুরুদেবের স্তব করিতে করিতে আগমন করেন। আচার্য এইরূপে পদ্মপাদ প্রভৃতিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তদবধি গিরি তোটকাচার্য নামে প্রসিদ্ধ হন।

আচার্য শঙ্কর তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—এই দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'মঠান্নায়' নামে মঠ ও সন্ন্যাসীদের বিধিনিষেধসূচক গ্রন্থ রচনা করিয়া ইঁহাদিগকে পূর্বোক্ত মঠচতুষ্টয়ের অধীন করেন। পরিশেষে তিনি কেদারনাথে প্রত্যাবর্তন করিয়া বত্রিশ বৎসর বয়সে অতিমানবলীলা সংবরণ করেন।

শঙ্কর-বিরচিত কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ ও রচনাবলীর নামোল্লেখ করা হইল ঃ (১) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা শারীরক মীমাংসা, (২) ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বেতর ও নৃসিংহপূর্বতাপনী উপনিষদ্‌সমূহের ভাষ্য, (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্য, (৪) সনৎসুজাতীয় ভাষ্য, (৫) বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য, (৬) হস্তামলকভাষ্য, (৭) বিবেকচূড়ামণি,

(৮) আনন্দলহরী, (৯) উপদেশ-সাহস্রী, (১০) অপরোক্ষানুভূতি, (১১) প্রবোধসুধাকর, (১২) যোগতারাবলী, (১৩) মণিরত্নমালা, (১৪), গঙ্গা, যমুনা, ভবানী, দক্ষিণামূর্তি, শিব, বিষ্ণু ও গণেশাদি দেবদেবীর স্তোত্র, (১৫) মোহমুদ্গর, (১৬) বোধসার, বাক্যসুধা, দশশ্লোকী, আত্মানাত্ম-বিবেক ইত্যাদি।

এক্ষণে শঙ্করাচার্যমতানুগ অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে ঃ

অদ্বৈতবাদ—আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। মায়ার সাহায্যে তিনি আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। জগৎপ্রপঞ্চ মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব নিত্যমুক্ত—অবিদ্যার বলে আপনাকে বদ্ধ মনে করে। ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম নাই, যাহার দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করা যাইতে পারে। মায়ার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই অথচ ইহা আকাশকুসুমের মতো অভাবাত্মকও নহে, সুতরাং অনির্বচনীয়। আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের সারকথা অর্ধ শ্লোকে বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"

অদ্বৈতবাদের ধারণা করিতে হইলে মায়া কি তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। যাহা পরিবর্তনশীল, অচিরস্থায়ী ও বিনাশী তাহা মায়াময়। এই দৃশ্যমান জগৎ প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইতেছে। ইহাকে অসৎ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। অথচ ইহা যে একেবারে সৎ তাহা বিচার ও যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না, কারণ ইহার পরিবর্তন ও বিনাশ আছে, ইহা চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং ইহা অনির্বাচ্য, মায়াময়।

সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসারে বলিয়াছেন ঃ "অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।" অর্থ—অজ্ঞান অর্থাৎ মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে অর্থাৎ অনির্বচনীয়। ইহা সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মক। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে ইহা বিলীন হইয়া যায়। ইহা ভাবরূপ তুচ্ছ পদার্থ।

জ্ঞানবাদীরা জগৎকে আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় একেবারে মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহারা জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যে (১।১১।১) বলিয়াছেন ঃ "প্রাগব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্তব্যানি শ্রৌতস্মার্তানি কর্মাণি।" অর্থাৎ যতদিন আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি না হয় ততদিন বেদ ও স্মৃতি-বিহিত কর্মসকল নিয়ম করিয়া সম্পাদন করা উচিত। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-উপলব্ধির পর দেখা যায় জগৎ মিথ্যা, তাহার পূর্বে ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না।

শঙ্করাচার্য সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন উত্তম অধিকারীর জন্য নির্গুণ উপাসনা অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি এবং মন্দাধিকারীর জন্য সগুণ উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। তিনি সাধারণ গৃহস্থের জন্য পঞ্চদেবতার (গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা) উপাসনার নির্দেশ করিয়াছেন। অদ্বৈতমতের সিদ্ধান্ত এই যে, সগুণ উপাসনায় নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়।

এক্ষণে নির্গুণ কথা বলা হইতেছে ঃ 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ 'তুমি হও সেই' প্রভৃতি বেদবাক্য যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করে তাহা সিদ্ধান্ত

করার নাম মনন। যখন শ্রবণ ও মনন দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্য বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না তখন সেই বিষয়ে চিত্ত স্থাপন করিয়া যে ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন অনুভব তাহার নাম নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসনের পরিপাক অবস্থার নাম সমাধি। নিদিধ্যাসনে ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় বিষয়ের জ্ঞান থাকে। চিত্ত ক্রমে ধ্যাতা ও ধ্যান এই দুইটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ে স্থির হইয়া যায়। চিত্তের এই অবস্থাকে নির্বিকল্প সমাধি বলে। এই সমাধি জন্মজন্মার্জিত পাপ ও পুণ্য বিনাশ করিয়া ফেলে। প্রথমে তত্ত্ববস্তুর পরোক্ষ জ্ঞান হয়। পরে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে হস্তামলকবৎ তত্ত্ববস্তুর উপলব্ধি হয়। মধ্যাহ্ন-সূর্য যেমন অন্ধকার নাশ করে, সেইরূপ উক্ত অপরোক্ষ জ্ঞান সংসারের কারণ অবিদ্যা-অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া ফেলে। তখন জীব সংসারমুক্ত হইয়া নিরতিশয় সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়।

আচার্য শঙ্কর সম্বন্ধে কেহ কেহ অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। তাঁহারা শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিক বলিতেও কুণ্ঠিত হন না।

তিনি কিরূপে ধর্মের গ্লানি হইতে দেশকে রক্ষাপূর্বক আসমুদ্রহিমাচল সনাতন বৈদিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। অদ্বৈতমত সার্বভৌম ও উদার। এজন্য অদ্বৈতবাদীদের কাহারো সহিত বিবাদ নাই। তাঁহারা দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি যত মত আছে কোনটিকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেন না। তাঁহারা সকল মতবাদই স্বীকার করেন, কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষ—ইহা চরম তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, এই মাত্র প্রভেদ। আচার্য শঙ্কর তাঁহার বেদান্তদর্শনের অধ্যাসভাষ্যে এই নির্বিশেষ মতবাদ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য একাধারে মহাজ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত ছিলেন। তিনি জ্ঞানরাজ্যের সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন, ইহা অবিসংবাদিত।

শঙ্কর-রচিত 'যোগতারাবলী' গ্রন্থপাঠে বুঝা যায়, তিনি যোগমার্গের কিরূপ প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ি, জালন্ধরাদি মুদ্রা, সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্র ও নাদানুসন্ধান সমাধি প্রভৃতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর যে মহাযোগী ছিলেন, সে-সম্বন্ধে দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে।

গুরু গোবিন্দপাদের নিকট অবস্থিতিকালে একদা নর্মদার জলপ্লাবন হয়। নদীর জল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া তীরবর্তী গৃহাদি ভাসাইয়া গোবিন্দপাদের গুহামধ্যে প্রবেশের উপক্রম করে। যোগী তখন সমাধিস্থ। শঙ্কর গুরুদেবের সমাধির বিঘ্ন হইবে আশঙ্কা করিয়া গুহার মুখে একটি কলস স্থাপন করিলেন। জলস্রোত কলসমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, কিন্তু উহার এক বিন্দুও গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল না। এই জলস্তম্ভন শঙ্করের যোগসিদ্ধির পরিচায়ক।

এইবার শঙ্করসাহিত্য হইতে উদ্ধৃতি দিয়া শঙ্করাচার্যের ভক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। আচার্য শঙ্কর ভক্তিকে জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াছেন। যথা, তাঁহারা 'বোধসার' গ্রন্থে ঃ

"ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যপায়শতৈরপি।
ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণক্রমঃ।।"

অর্থ—ভক্তি ব্যতীত শত-শত উপায় দ্বারাও জ্ঞানলাভ করা যায় না। প্রথমে ভগবদ্ভক্তি, তাহা হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়, ইহাই সাধারণ ক্রমানুসারে হইয়া থাকে।

তিনি 'বিবেকচূড়ামণি'তে বলিয়াছেন ঃ "মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।"

অর্থ—মোক্ষের কারণস্বরূপ উপায়গুলির মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

ভক্তেরা যে ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা শ্রীহরির দর্শনলাভ করেন, সে-সম্বন্ধে শঙ্কর তাঁহার 'প্রবোধসুধাকর' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ

"যদ্যপি গগনং শূন্যং তথাপি জলদামৃতাংশুরূপেণ।
চাতকচকোরনাম্নোর্দৃঢ়ভাবাৎ পূরয়ত্যাশাম্।।
তদ্বৎ ভজতাং পুংসাং দৃগ্‌বাঙ্মনসামগোচরোঽপি হরিঃ।
কৃপয়া ফলত্যকস্মাৎ সত্যানন্দামৃতেন বিপুলেন।।"[১]

অর্থ—যদিও গগন শূন্যাকার তথাপি মেঘরূপে চাতকের এবং সুধাংশুরূপে চকোরের দৃঢ়ভাববশত আশা পূরণ করিয়া থাকে। সেইরূপ দৃষ্টি, বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও শ্রীহরি অহৈতুক কৃপাপূর্বক ভক্তপুরুষগণের প্রতি বিপুল সত্য-আনন্দ-সুধায় ফলবান হইয়া থাকেন।

আচার্য শঙ্কর মহাভারতের অনুশাসন-পর্বের অন্তর্গত 'বিষ্ণুসহস্রনামে'র উপর ভাষ্য রচনা করিয়া নামমাহাত্ম্য ও হরিভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

শঙ্কর-রচিত দেবদেবীর সুললিত স্তোত্রগুলি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তিভাবের পরিচায়ক।

শঙ্করাচার্য যে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুরাগী ছিলেন তাহা শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার 'তত্ত্বসন্দর্ভ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করের কুলদেবতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কিরূপ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহার 'প্রবোধসুধাকর' গ্রন্থ। ইহাতে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার অধিকাংশই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই যে নির্গুণ ব্রহ্ম তাহা তিনি এই গ্রন্থের 'সগুণনির্গুণয়োরৈক্যপ্রকরণম্'-এ দেখাইয়াছেন। যথা—

"সাক্ষাৎ যথৈকদেশে বর্তুলমুপলভ্যতে রবের্বিম্বম্।
বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্বৈঃ সর্বত্র দৃশ্যতে যুগপৎ।।
যদ্যপি সাকারোঽয়ং তথৈকদেশী বিভাতি যদুনাথঃ।
সর্বগতঃ সর্বাত্মা তথাপ্যয়ং সচ্চিদানন্দঃ।।"

অর্থ—সূর্যমণ্ডল আকাশের একাংশে গোলাকার দৃষ্ট হন, কিন্তু সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশিত করেন এবং সকলে তাঁহাকে সর্বত্র এককালে দর্শন করিয়া থাকে। সেইরূপে যদুনাথ যদ্যপি সাকার এবং গৃহাদির একদেশে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হন, তথাপি তিনি সর্বব্যাপক, সকলের আত্মা এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

আচার্য শঙ্করের জীবন জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সমন্বয়ের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। অদ্বৈতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার আসমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণ ও বিভিন্নমতবাদী আচার্যদের বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন, প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য, নানা গ্রন্থাদির প্রণয়ন এবং ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপনপূর্বক দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা তাঁহার অতুলনীয় কীর্তি। জীবনকালেই

তাঁহার কীর্তিকলাপ সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের প্রসন্নগম্ভীর অধ্যাসভাষ্যে শ্রুতিবাক্যের যুক্তিপূর্ণ অপূর্ব সমন্বয় অদ্বিতীয়। এই ভাষ্যের মধ্যে তিনি অন্যান্য দার্শনিক মত যেভাবে প্রপঞ্চিত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার নিদর্শন। শঙ্করাবতার আচার্য শঙ্করের মনীষা ভারতের জাতীয় জীবনের মহাতপস্যার ফল। শঙ্করের জীবন-সুষমায় স্নাত হইলে আশার তৃপ্তি, জীবনের পূর্ণতা, প্রাণের বল, হৃদয়ের তেজ, বুদ্ধির স্ফূর্তি এবং সর্বোপরি মানবের পরিপূর্ণ আত্মদর্শন লাভ হয়। আচার্য শঙ্করের মতো মহাপুরুষ পৃথিবীতে বিরল।

ভগিনী নিবেদিতা শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শঙ্করাচার্যের মহিমা ধারণা করিতে অক্ষম। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বল্পকাল মধ্যে এরূপ গভীর সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সাহিত্য রচনা করিয়া ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। দীর্ঘ বারশত বৎসরকাল তাঁহার এই মহিমাকে কেহই বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি এরূপ স্তোত্রসকল রচনা করিয়াছেন যে, তাহাদের গম্ভীর মাধুর্য বিদেশীয়গণের অনভ্যস্ত কর্ণেও নিঃসন্দেহে অনুভূত হইয়া থাকে। আমরা এই মহত্ত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে পারি, কিন্তু ইহা আমাদের বোধগম্য নহে। আমরা Francis of Assissi-র ভক্তিভাব, Abelard-এর বুদ্ধিমত্তা, Martin Luther-এর পুরুষোচিত তেজস্বিতা ও স্বাধীনচিত্ততা এবং Ignatius Lyola-র রাজনৈতিক কর্মকুশলতা চিন্তা করিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইতে পারি, কিন্তু কে একাধারে এইসকলের সমষ্টির চিন্তা করিতে পারে?[২] * □

পাদটীকা

১ এই শ্লোকটি মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তাঁহার 'ফেলোশিপ লেকচারে' উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২ এই প্রবন্ধ-রচনায় বেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তের প্রকরণগ্রন্থ ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লইয়াছি ঃ ১। পঞ্চদশীর বেদান্তরহস্য—কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়। ২। বেদান্তদর্শনের ইতিহাস—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী। ৩। আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৪। শঙ্করগ্রন্থমালা—মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন। ৫। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

* ৭০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

গুরু নানক

রেজাউল করিম

পাঞ্জাবের পথ দিয়ে একদিন ভারতবর্ষে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঞ্জাব প্রদেশ মুসলিম শাসনাধীনে ছিল। পাঞ্জাবের নগরে গঞ্জে গ্রামে বহু মুসলিম সাধুসন্ত, ফকির ও দরবেশ বসবাস করতেন ঐকালে। পানিপথ, মুলতান, সিরহিন্দ, পাক পাটান—এইসমস্ত অঞ্চলে বহু শেখ ও সুফি তাঁদের সরল ও অনাড়ম্বর জীবন কাটিয়েছিলেন। এই সুফিদের কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যথা—বাবা পীর ফরীদ, আলাউল হক, জয়নুদ্দিন বোখারী, মখদুম জাহালিয়ান, ইসমাইল বোখারী। এইসব সাধক ও ফকিরগণ তাঁদের ধর্ম ও নিষ্ঠার জন্য সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন। তাঁরা সাধারণ মানুষের মনে এমন একটি উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেন, যার প্রভাবে বিভিন্ন আদর্শ ও কর্মের মধ্যে একটি মৈত্রী এবং বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়-সাধন সম্ভব হয়েছিল। এইপ্রকার উদারতা ও সমন্বয়ের পরিবেশে মহাত্মা গুরু নানকের আবির্ভাব হয়েছিল।

পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলার শারাকপুর তহসিলের অন্তর্গত তালওয়ান্দ গ্রামে গুরু নানকের জন্ম হয়। এই গ্রামটি ইরাবতী (Ravi) নদীর তীরে অবস্থিত। নানক ছিলেন ভাটি রাজপুত বংশসম্ভূত। রায় বুলার ছিলেন এই গ্রামের জমিদার। এই জমিদারের একজন হিসাবপরীক্ষক ছিলেন, তিনি ছিলেন বেদীক্ষত্রি-বংশের লোক। তাঁর নাম ছিল মেহতা কালুচাঁদ। গ্রামের সকল শ্রেণীর লোক এই হিসাব-পরীক্ষককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। জমিদার রায় বুলারের তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন কর্মচারী। খ্রীস্টীয় ১৪৬৯ সালে এই মেহতা কালুচাঁদের ঘর উজ্জ্বল করে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর বংশের পুরোহিতগণ এই নবজাত শিশুটির নাম রাখলেন 'নানক'। তখনকার যুগে অনেক হিন্দু ও মুসলমানের সাধারণ নাম 'নানক'। বাল্যকালেই ছেলেটি তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগল। সাতবছর বয়সের সময় তাঁকে হিন্দি শিক্ষার জন্য একটি হিন্দি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। এবং আরো তিনবছর পরে তাঁর সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিছুদিন পরে ফারসী ভাষা শিক্ষার জন্যও একটি ফারসী স্কুলে তাঁকে প্রেরণ করা হলো। হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলিম মৌলবীর নিকট শিক্ষালাভের ফলে তাঁর কতটা লাভ হয়েছিল, তা বলা কঠিন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর পিতা চেয়েছিলেন যে, ছেলেকে এমন শিক্ষা দেবেন যেন সে সরকারী চাকরি বা কাজকর্ম করতে পারে। যাহোক নানক হিন্দি ও ফারসী ভাষায় কাজ চলার মতো শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি ভাল লেখাপড়া শিখতে পারবেন না মনে করে, তাঁর পিতা

চেষ্টা করতে থাকলেন, বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের বাইরে অন্যান্য নানা বিভাগে তাঁকে শিক্ষিত করে তুলতে। প্রথমে কৃষিকাজ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হলো। তারপর গোপালন, তারপর দোকানদারির কাজ। এই ধরনের আরো নানা কাজে তাঁকে নিযুক্ত করা হতে থাকল। কিন্তু কোন ফল হলো না। যে মহান ব্যক্তিকে একটি বিরাট জাতি গঠনের কাজ করতে হবে, তিনি কি ঐসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন? নানক অন্য কাজের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি কি দোকানদারি আর মাল বিক্রয়ের কাজে আপন প্রতিভাকে নিয়োগ করতে পারেন?

জগতের অনেক মহাপুরুষের মতো তিনিও বাল্যকাল থেকেই গভীর চিন্তাশীল ছিলেন। এই চিন্তার মধ্যে সব যেন ভুলে যেতেন। কখনো কখনো একপ্রকার দিব্যস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন। সাংসারিক কোনপ্রকার কর্মের দিকে তাঁর আকর্ষণ ছিল না। এমনকি নিজের প্রয়োজনের দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল না। আপনার ধ্যানে তিনি এমনই বিভোর হয়ে থাকতেন যে, সংসারের নির্ধারিত কাজকর্ম সম্বন্ধে তিনি ক্রমেই অত্যন্ত অমনোযোগী হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর এইপ্রকার ভাব-ভঙ্গি দেখে কেউ কেউ মনে করত যে, তিনি বাস্তব বিষয়ে যেন বোধশক্তি রহিত হয়ে পড়েছেন। সুতরাং তাঁর আত্মীয়স্বজন তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তখনকার দিনে গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। দেশ-প্রচলিত হাতুড়ে চিকিৎসক অথবা ওঝা শ্রেণীর দৈবজ্ঞ চিকিৎসকগণের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু এই শ্রেণীর চিকিৎসকগণ তাঁর রোগ সারাতে পারলেন না। এই ধরনের চিকিৎসার ফলে কেউ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারলেন না, অথবা কোন উপকারও করতে পারলেন না। তাঁর পিতৃদেব তাঁকে মোটেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁর ভগ্নী ছিলেন একজন তীব্র সহানুভূতিশীলা মহিলা। তিনি তাঁর নারীসুলভ স্বাভাবিক বুদ্ধির সাহায্যে তাঁর ভ্রাতার ব্যাধির স্বরূপটা উপলব্ধি করতে পারলেন। নানকের এই ভগ্নীর বিবাহ হয়েছিল জয়রাম নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে। ইনি নবাব দৌলত খাঁ লোদীর দেওয়ান ছিলেন। দৌলত খাঁ লোদী ছিলেন তৎকালীন দিল্লীর সম্রাট বহলুল লোদীর আত্মীয়। কাপুরতলার নিকট সুলতানপুরে নবাব দৌলত খাঁ লোদীর একটি বিস্তীর্ণ জায়গির ছিল। নানকের ভগ্নী তাঁর ভ্রাতাকে নিজের নিকট ডেকে পাঠালেন। এবং তাঁর জন্য নবাবের অধীনে একটি চাকরি যোগাড় করে দিলেন নবাবের সাহায্য-ভাণ্ডারের হিসাব-রক্ষকের পদে। নানক এই চাকরিতে ১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করেছিলেন।

মাত্র আঠার বছর বয়সে নানকের বিবাহ হয়। তাঁর স্ত্রীর নাম সুলাখিন। সুলাখিনের গর্ভে নানকের দুটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। তাঁদের নাম শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস। এই শ্রীচাঁদ পরে উদাসী সন্ন্যাসী দল স্থাপন করেন। যখন নানকের বয়স ত্রিশ বছর তখন তিনি সেই ভাণ্ডার-রক্ষকের চাকরিটা ছেড়ে দেন। শুধু চাকরি নয়, সেইসঙ্গে গৃহত্যাগ করে বিরাট জগতে নেমে পড়লেন। নানক এখন নিঃস্ব ফকির। তারপর তিনি মারদানা নামক একজন মুসলিম ফকিরের সাহচর্য লাভ করেন। এই শ্রেণীর আরেকজন উদাসী ফকির তাঁর সঙ্গে যোগ

দিলেন—তাঁর নাম ভাইবালা। সে-যুগের গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতো তাঁরা বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করলেন এবং বহু সাধুসন্তদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো। তাঁদের সঙ্গে বহু আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময় হতে থাকে। এইভাবে বিভিন্ন সাধক ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে নানক বহুপ্রকার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকেন। মহাপুরুষগণ চিরকাল এইভাবেই জগতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন।

ক্রমে ক্রমে মহাত্মা নানকের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এইসময় থেকে নানকের জীবনের ঘটনাবলীকে নিয়ে নানাপ্রকার কথা, উপকথা, কাহিনী ও জনশ্রুতি রচিত হয়েছিল। সেগুলি যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে বলব যে, তিনি দেশের প্রায় সমস্ত পবিত্র তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন—ভারতের, সিংহলের, পারস্য, আরব দেশের নানা তীর্থস্থান দর্শন করেন। পরিব্রাজকের বেশে তিনি বহু সন্তসাধুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁর জীবনের অবশিষ্ট চল্লিশ বছর ধরে তিনি বহু উল্লেখযোগ্য সাধুসন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পানিপথের শেখ শরাফতের সঙ্গে অনেকদিন ধরে তিনি ধর্মালোচনা করেছিলেন। মুলতানের পীর দরবেশের সঙ্গে তিনি ধর্মচর্চা করেছিলেন। পাকপত্তনের ধর্মগুরু বাবা ফরিদের উত্তরাধিকারী শেখ ইব্রাহিমের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে ধর্ম নিয়ে গভীর আলোচনা করেছিলেন। বস্তুত তিনি যেখানেই যেতেন সেইখানেই নিজের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের কথা প্রচার করতেন। আর যা তিনি মুখে বলতেন ও প্রচার করতেন, সে আদর্শকে বাস্তব কাজে পরিণত করতে কখনোই ইতস্তত বোধ করতেন না। এইভাবে তাঁর পরিব্রাজকের কাজ শেষ হলো। তিনি বহু উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে তাঁর বাণী ও আদর্শগুলি ব্যাখ্যা করতেন। তারপর সেই মহাদিন আগত হলো যখন তিনি পৃথিবীর বক্ষ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। বিদায় নেবার পূর্বে তিনি নিজের দেহকে একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। এবং 'ওয়াহ গুরু' এইকথাটি উচ্চারণ করলেন। এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে শেষ প্রণিপাত করলেন এবং নিজের বাতির সঙ্গে গুরু অঙ্গদের বাতি একীভূত করে দিলেন। এক গুরু চলে গেলেন এবং সেই একই গুরু অন্য মূর্তিতে থেকে গেলেন। অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে কেবলমাত্র দেহেরই পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটল।

পাঠান ও মোগল আমলে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বহু অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করতে আরম্ভ করেছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব মহান সাধক সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবীর ও নানক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তাঁদের দুজনেই ছিলেন সমন্বয়-সাধনের অগ্রদূত। সমন্বয়মিলন ও ঐক্যসাধনে তাঁদের দান অবিস্মরণীয়। এইসব মহাপুরুষগণের চেষ্টার ফলে সেযুগে সাম্প্রদায়িক কলহ ভীষণাকার ধারণ করেনি। বরং উভয় সম্প্রদায় সৌহার্দের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করতে থাকে। নানকের জীবন থেকে জানা যায় যে, তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে গ্রথিত করা। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, সমাজের ব্যাধি ও ক্ষয়ক্ষতিকে দূর করতে হলে বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়ের

বিরোধগুলিকে বিনাশ করতে হবে। এসম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে। The History and Philosophy of Sikhism গ্রন্থে নানকের আদর্শ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান উক্তির উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় তাঁর উক্তিটি উল্লিখিত আছে। নানক বলেছেন, "যখন একজনই থাকে এবং অপরজন অপসারিত হয়, কেবলমাত্র তখনই আরামের সঙ্গে বসবাস করা সম্ভব হয়। কিন্তু যতদিন দুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে ততদিনই সংগ্রাম, কলহ ও বিবাদ লেগেই থাকবে। যখন দুটি ব্যর্থ হয়ে গেছে, তখন ঈশ্বর আদেশ দিলেন। কারণ অনেকেই চলে গেল। ফোরকান (অর্থাৎ কোরান আছে)—যেন তারা তাই নিয়েই একত্র হতে পারে। কিন্তু তারা তাই নিয়েই একত্র থাকতে পারেনি। তুমি, আমার পুত্র যাও জগতের মাঝে। দেখবে প্রায় সকলেই সত্যপথ থেকে সরে গেছে। তাদের সকলকে একই নাম বার বার উচ্চারণ করাও। 'হে নানক, তুমি যাও তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে,. তুমি যাও হিন্দু-মুসলমানের নিকট, তাদের দুদলের নেতা হিসাবে। সত্য ধর্ম হলো প্রেম ও প্রীতির ধর্ম—এই প্রীতির ধর্ম প্রতিষ্ঠিত কর। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-কেউ তোমার নিকট আসবে তাকেই গ্রহণ কর, অপ্রয়োজনে কারুর জীবন নষ্ট করো না। দরিদ্রকে রক্ষা কর। মনে রেখো, ঈশ্বর সকলের উপর বিরাজিত আছেন।'" নানক নিজেকে একজন ঈশ্বর-প্রেরিত মানুষ বলে মনে করতেন। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের দরবার থেকে মর্ত্যভূমিতে এসেছেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট বাণী লাভ করেছেন। তাঁর শিক্ষার প্রধান বিষয় হলো যে, পৃথিবীতে একজন ঈশ্বর আছেন। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। আর নানক সেই ঈশ্বরের খলিফা বা প্রতিনিধি। তিনি ঈশ্বরের নিকট যে-সত্যলাভ করেছেন মানুষের মধ্যে তিনি সেসব কথা প্রচার করেছেন। একথা বেশ বোঝা যায় যে, নানক বাইবেল-বর্ণিত প্রফেটগণকে তাঁর 'মডেল' (Model) বা আদর্শ মনে করতেন। সেইসব প্রফেটগণের শিক্ষাকে প্রচার করে তাদের মাধ্যমে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার ব্যাখ্যা করেছেন। একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, তিনি ছিলেন মিস্টিক (Mystic)। তিনি এই অর্থে মিস্টিক মরমী ছিলেন যে, ঈশ্বরের সদা উপস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর একটা জাগ্রত চেতনা ছিল। তবে কবীরের মতো Visionary ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি আত্মসমাহিত স্বপ্নদর্শী ছিলেন না। তাঁর আত্মা মাঝে মাঝে সীমাতীত লোকে চলে গেলেও, বাস্তবকে তিনি ভোলেননি। যেখানে ঈশ্বরের প্রাসাদ হাজার আলোকে আলোকিত আছে, সেখানেও তিনি যেতেন এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ করতেন। নানক ইন্দ্রিয়াতীত লোকের কথা ভাবতেন। সেইসঙ্গে তিনি বিরাট মানব সমাজের কথাও চিন্তা করতেন। নানক ছিলেন বাস্তববাদী ধর্মনেতা। তাই তিনি অতীন্দ্রিয় লোকে বেশিক্ষণ থাকতেন না।

এবার ধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে নানকের জীবনদর্শন কি ছিল, সেই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। নানক ছিলেন একজন ধর্মসংস্থাপক। সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে নৈতিক আদর্শের ওপর গুরুত্ব দান করতেন। তাঁর প্রচারিত নীতির মর্মমূলে আছে মহান ঈশ্বরের আসন। ঈশ্বর অগম্য, ও সীমাহীন। সমস্ত সৃষ্ট বস্তু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর

পাদপীঠে লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষ উপবেশন করে তাঁরই স্তুতিগান গাইছেন। তাঁরা লক্ষ লক্ষ পন্থা ও পদ্ধতিতে তাঁরই ভজন-গান গাইছেন। তিনি ধারণার অতীত, স্পর্শের অতীত, তিনি সীমাহীন, গণনার অতীত। তিনি স্বতন্ত্র, অমর, অক্ষয়, অব্যয়। তিনি সর্বব্যাপী, তাঁর কোন জাতি নেই। তিনি কারও দ্বারা জ্ঞাত নন। তিনি স্বয়ম্ভূ। তিনি নিজের শক্তিতে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান। তাঁর কোন ভয় নেই। কোন সন্দেহ নেই। তাঁর কোন পরিবার নেই। কোন ভ্রান্তি নেই। তিনি সকল সীমার অতীত—দূরে আরো দূরে। "সমস্ত আলো তোমারই হে প্রভু।" নানক স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর Immanent অর্থাৎ তিনি সর্ব বস্তুতে ব্যাপ্ত। প্রত্যেক দেহের মধ্যে পরম ব্রহ্মরূপে লুক্কায়িত আছেন। যেখানে যত আলো আছে তা সবই তাঁর আলো। তিনি মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হয়ে আছেন। সবসময় মনে করতেন যে, ঈশ্বর সকলের প্রভু। তিনি চালক, হাকিম। তাঁর পূর্ব নির্ধারিত ইচ্ছা অনুসারে প্রত্যেক মানুষের চলা উচিত। কারণ তাঁকেই মেনে চললে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নিরাপত্তা আসবে, মুক্তি ও পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

তিনি ঈশ্বরের মধ্যে মানবীয় অথবা ব্যক্তির গুণাদি আরোপ করতেন না। তিনিই আসল সদ্‌গুরু ও অপ্রতিরোধ্য। নানক ইচ্ছাশক্তির ওপর বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এসব কথা অত্যন্ত দুরূহ। সেজন্যই তিনি ঈশ্বরের তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা করতেন না।

সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বর অন্ধকার থেকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে বাস্তব অস্তিত্বদান করেছেন। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে প্রভু ঈশ্বরের মহান সাম্রাজ্য, সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্যহীন কর্ম—তাঁর অপার লীলা। তিনি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মহান প্রভু।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিত্রতা ও সদ্ভাব স্থাপন করতে হবে—এই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। "হিন্দু মুসলমান ও অপর ধর্ম সম্প্রদায়কে ঈশ্বরের দরবারে সভাসদ্ ও সভ্যগণকে তাঁর হুকুম ও আদেশের অপেক্ষায় উপস্থিত হয়ে থাকতে হবে।" পৃথিবীর বড় বড় পীর ও গুরু হচ্ছেন তাঁর নিয়োজিত কর্মচারীর মতো। এনজেল বা দেবদূতগণও হচ্ছেন তাঁর কর্মচারীর মতো। কেউ কেউ তাঁর কোষাধ্যক্ষ মাত্র। তাঁর মতে, 'আজরাইল' বা যমদূত মূর্খ ও পশুস্বভাব বিশিষ্ট মানুষকে গ্রেপ্তার করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এইসব ধারণা মানুষের পশুশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি ও অনুভূতির ওপর ততটা প্রভাব বিস্তার করে না। নানকের শিষ্যগণ দাবি করেন যে, তাঁর শিক্ষার প্রভাবে তাঁরা ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন। নিজের সম্বন্ধে নানক বলেনঃ "এই নানক একটি আবেদন করেন যে, আমার আত্মা ও দেহ সমস্তই তোমার শক্তির দান। প্রভু! তুমি নিকটে আছ। তুমি দূরেও আছ। তুমি মধ্য পথে আছ, তুমি দেখতে পাও, তুমি শুনতে পাও। তুমি তোমার শক্তি দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছ।" নানক বলেনঃ "হে প্রভু! যখন কোন আদেশ করতে তোমার ইচ্ছা হয়, তখন তাই তুমি গ্রহণযোগ্যরূপে কর।" নানক অন্যত্র বলেছেন, প্রভু যা করবেন তা মঙ্গলের জন্য। তিনি রাজা, তিনি যা আদেশ করেন, সমস্ত দেহ মন দিয়ে তাই পালন কর। তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তি এইপ্রকার। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি এরূপ হবে যে,

তাঁর মধ্যে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে লোপ করে দিতে হবে। তারপর তুমি তাঁকে প্রাপ্ত হবে। অন্য কোন জ্ঞান কোন কাজেই আসবে না। মানুষের দীনতার কোন অন্ত নেই। তাই নানক বলেন যে, সমুদ্রের জলের মতো মানুষের পাপরাজিও অনেক। ''হে ঈশ্বর, তুমি আমার ওপর দয়া বিতরণ কর। একটু দয়ার হস্ত প্রসারিত কর। আমি একটি নিমজ্জমান প্রস্তরের মতো আমাকে রক্ষা কর।'' মুক্তিলাভের জন্য মানুষ কী করতে পারে? আপন আত্মার আলোর সঙ্গে ঈশ্বরের আলো কিভাবে যুক্ত হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে নানক বলেন যে, এজন্য চারটি বস্তুর দরকার ঃ (১) ঈশ্বরকে ভয় কর (২) তাঁর দয়ার ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর (৩) যে-পথ তোমাকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে সেই পথের সন্ধান কর (৪) একজন চালকের দরকার, তার পথ-নির্দেশ গ্রহণ কর। পৃথিবীর সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আছে একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়। নানক বলেন ঃ ''যেদিন ঈশ্বর তোমার বিচার করবেন সেদিনের কথা ভুলে যেয়ো না। সেদিনকে ভয় কর। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর-ভীতি রেখ। মৃত্যুর ভয়ে নিজের কর্তব্যকর্ম থেকে পলায়ন কোরো না। সবসময় ঠিক কাজ করে যেতে হবে।'' Right Action বা কাজ সম্বন্ধে নানকের উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—তিনি দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন, পুণ্যের প্রশংসা ও পাপের নিন্দা। নানক বলেন যে, কেবলমাত্র আদেশাত্মক ও নিষেধাত্মক বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করাই যথেষ্ট নয়। অন্তরের বা আত্মার আচরণই হলো খাঁটি নৈতিকতা। তিনি জানতেন যে, কোটি কোটি নরনারীকে এই জগতে বাস করতে হবে। তাদেরকে তাদের বৃত্তি অনুসারে কাজ করে যেতে হবে। যে-ধর্মাচরণ কেবলমাত্র ফকির ও সাধুর জন্য নির্ধারিত সে-ধর্ম একটা সক্রিয় ও কর্মচঞ্চল সমাজের জন্য নয়। সমাজের যে বিরাট অংশ নানাবিধ সামাজিক ও জাগতিক কাজে নিযুক্ত আছে সে-ধর্ম তাদের জন্য নয়। সেজন্য মধ্যপন্থা অবলম্বনের ওপর তিনি জোর দিলেন। চরম বৈরাগ্যের পন্থাকে একমাত্র পথ বললেন না। নানক এই দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে উপদেশ দিলেন। নানক আরো বলেন ঃ ''জগতের প্রয়োজনে যেমন দেহ-মনকে দেখতে হবে, তেমনি হৃদয়ের বৈরাগ্য ও তপস্যারও প্রয়োজন আছে।'' কয়েকটি গুণের কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেন ঃ ''সদ্ব্যবহার, সৎ আচরণ, বিনয়-অভ্যাস দ্বারা অহঙ্কার ত্যাগ কর, মনকে সংযত করে রাখ, ঈর্ষাকে সংযত কর, সকল সময় সৎ হয়ে চল, প্রতি পদক্ষেপে সতর্ক হয়ে চল। পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংযত কর, সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে থাক।'' হিন্দুসমাজের মতো নানক জন্মান্তর মতবাদ বিশ্বাস করতেন। যারা অসৎ ও কুকার্য করে তারা বার বার বিভিন্নভাবে জন্মগ্রহণ করে অশেষবিধ দুঃখকষ্ট ভোগ করবে এবং এইভাবে তাদের পাপ ক্ষালন হলে তবেই তারা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। নানক আরো বলেন ঃ ''যারা পাপকার্য করবে তাদের জন্য কঠোর দণ্ড নির্ধারিত আছে। কেবল ঈশ্বরের অপার দয়া মানুষকে এই দণ্ড থেকে রক্ষা করতে পারে।'' পাপীর জন্য এত কঠোর দণ্ডের কথা বলেও, নানক মানুষের সামনে ঈশ্বরের নম্র কোমল রূপটাও তুলে ধরেছেন। তাই তিনি বলেন ঃ ''মানুষ, তুমি যদি

মুহূর্তের জন্য তোমার মনকে সংযত কর তবে ঈশ্বর তোমার সম্মুখে উপস্থিত হবেন। যার ওপর তিনি দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টিপাত করেন তাকেই তিনি পুনরুদ্ধার করেন ও অনুগ্রহ দান করেন। কেবল তাঁর নাম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করলে তাতেও মুক্তি আছে। তাঁর দয়ার দান সীমাহীন। তাঁর দয়া অপার। তাঁর আদেশ শিরোধার্য। সৎ কর্ম, দান, অনুশোচনা, যোগ, শাস্ত্রপাঠ এসবেরও প্রয়োজন আছে। তবে এসব কাজ কোন কাজেই লাগবে না, যদি তাঁর দয়া না পাওয়া যায়।'' শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর প্রমুখ মহান সাধকগণ নিজেদের জীবনের আদর্শ দ্বারা এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, এই জীবনেই ঈশ্বরলাভ করা যায়। সেজন্য চাই অকৃত্রিম সাধনা, ধ্যান ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। নানককে অনেক সাধনা করতে হয়েছিল। তারই ফলে তাঁর ঈশ্বর-উপলব্ধি হয়েছিল। অতীতের মহান সাধুসন্ত ও সুফিদের মতো নানক শিক্ষা দিলেন যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে সত্যের পথে চলতে হবে। সেজন্য একজন উপযুক্ত গুরুর দ্বারা পরিচালিত হওয়া দরকার। কবীরের পদ্ধতির মতো তিনিও মনে করতেন যে, একজন গুরু গ্রহণ করা দরকার। নানক সুফিদের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। নানক নানাভাবে যে ধর্মালোচনা আরম্ভ করলেন তা তাঁর উত্তরাধিকারীদের দ্বারা আরো গতিশীল ও বেগবান হয়ে উঠল। এবং চতুর্দিকে তীব্রভাবে প্রবাহিত হতে লাগল।* □

* ৮৫ বর্ষ, ১০ সংখ্যা



শ্রীরামকৃষ্ণ



শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী



স্বামী বিবেকানন্দ

১ম বর্ষ—১০০তম বর্ষ
'উদ্বোধন'-সম্পাদনার দায়িত্বে যাঁরা



স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ



স্বামী সারদানন্দ



স্বামী শুদ্ধানন্দ

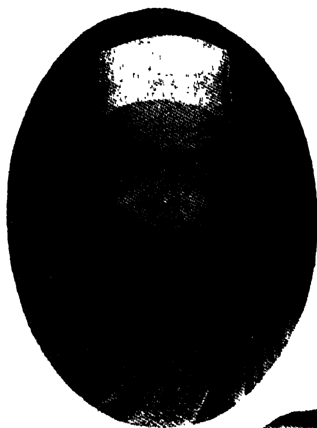

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ


স্বামী মাধবানন্দ


স্বামী গঙ্গেশানন্দ


স্বামী দয়ানন্দ


স্বামী বাসুদেবানন্দ



স্বামী সুন্দরানন্দ



স্বামী শ্রদ্ধানন্দ



স্বামী নিরাময়ানন্দ



স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ



স্বামী ধ্যানানন্দ



স্বামী অব্জজানন্দ



স্বামী প্রমেয়ানন্দ



স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

১ম বর্ষ—১০০তম বর্ষ

'উদ্বোধন'-সম্পাদনার দায়িত্বে যাঁরা

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ
(১ম বর্ষ—৪র্থ বর্ষ ❑ মাঘ ১৩০৫—পৌষ ১৩০৯)

স্বামী শুদ্ধানন্দ
(৫ম বর্ষ—৯ম বর্ষ ❑ মাঘ ১৩০৯—পৌষ ১৩১৪)

স্বামী সারদানন্দ
(১০ম বর্ষ—১৩শ বর্ষ ❑ মাঘ ১৩১৪—পৌষ ১৩১৮)

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ
(১৪শ বর্ষ—১৫শ বর্ষ ❑ মাঘ ১৩১৮—পৌষ ১৩২০)

স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী মাধবানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী নির্মল)
(১৬শ বর্ষ—১৭শ বর্ষ ❑ মাঘ ১৩২০—পৌষ ১৩২২)

স্বামী সারদানন্দ
স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী গঙ্গেশানন্দ
(তখন ব্রহ্মচারী বিমল ও ব্রহ্মচারী শান্তিচৈতন্য)
(১৮শ বর্ষ—২১তম বর্ষ ❑ মাঘ ১৩২২—পৌষ ১৩২৬)

স্বামী বাসুদেবানন্দ
(২২তম বর্ষ—২৪তম বর্ষ ❑ মাঘ ১৩২৬—শ্রাবণ ১৩২৯)

স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী বাসুদেবানন্দ
(২৪তম বর্ষ—২৯তম বর্ষ ❑ ভাদ্র ১৩২৯—শ্রাবণ ১৩৩৪)

স্বামী শুদ্ধানন্দ এবং স্বামী বাসুদেবানন্দ
(২৯তম বর্ষ—৩৭তম বর্ষ ❑ ভাদ্র ১৩৩৪—আশ্বিন ১৩৪২)

স্বামী শুদ্ধানন্দ এবং স্বামী সুন্দরানন্দ
(৩৭তম বর্ষ—৩৮তম বর্ষ ❑ কার্তিক ১৩৪২—আশ্বিন ১৩৪৩)

স্বামী সুন্দরানন্দ
(৩৮তম বর্ষ—৫৪তম বর্ষ ❑ কার্তিক ১৩৪৩—চৈত্র ১৩৫৮)

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
(৫৪তম বর্ষ—৫৮তম বর্ষ ❑ বৈশাখ ১৩৫৯—পৌষ ১৩৬৩)

স্বামী নিরাময়ানন্দ
(৫৯তম বর্ষ—৬৬তম বর্ষ ❑ মাঘ ১৩৬৩—পৌষ ১৩৭১)

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
(৬৭তম বর্ষ—৭৪তম বর্ষ ❑ মাঘ ১৩৭১—পৌষ ১৩৮০)

স্বামী ধ্যানানন্দ
(৭৫তম বর্ষ—৮৪তম বর্ষ ❑ মাঘ ১৩৮০—ভাদ্র ১৩৮৯)

স্বামী অব্জজানন্দ
(৮৪তম বর্ষ—৮৭তম বর্ষ ❑ আশ্বিন ১৩৮৯—কার্তিক ১৩৯২)

স্বামী প্রমেয়ানন্দ
(৮৭তম বর্ষ—৮৯তম বর্ষ ❑ অগ্রহায়ণ ১৩৯২—আশ্বিন ১৩৯৪)

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
(৮৯তম বর্ষ— ❑ কার্তিক ১৩৯৪—)

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ক বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র ও সমালোচন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, ডাক মাশুল সমেত। কলিকাতা, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলেটোলা, নং ১৪ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, উদ্বোধন-প্রেস হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "উদ্বোধনের" প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। ●●। এই প্রেসে পুস্তক, চেক, বিল প্রভৃতি নানাপ্রকার ছাপা কার্য্য সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সু-সম্পন্ন করা হয়। ●●।

১ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা। ১লা মাঘ। ১৩০৫ সাল।

বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র।

"তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো!"

উদ্বোধন

"তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো!"

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

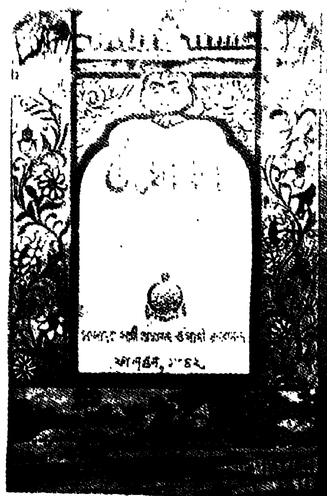
স্বামী ত্রিগুণাতীত—সম্পাদক।

সূচী

—০—

'উদ্বোধন'-এর ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যার প্রচ্ছদ। (মূল প্রচ্ছদ গেরুয়া রঙের কাগজে, কালো কালিতে ছাপা।)

'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ



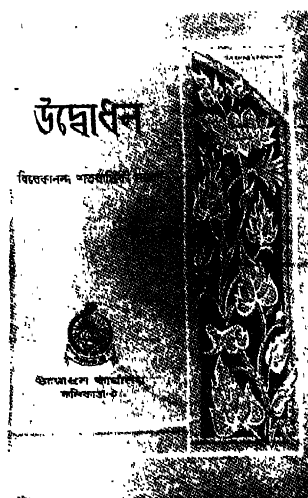
'উদ্বোধন'-এর শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সংখ্যা-র প্রচ্ছদ



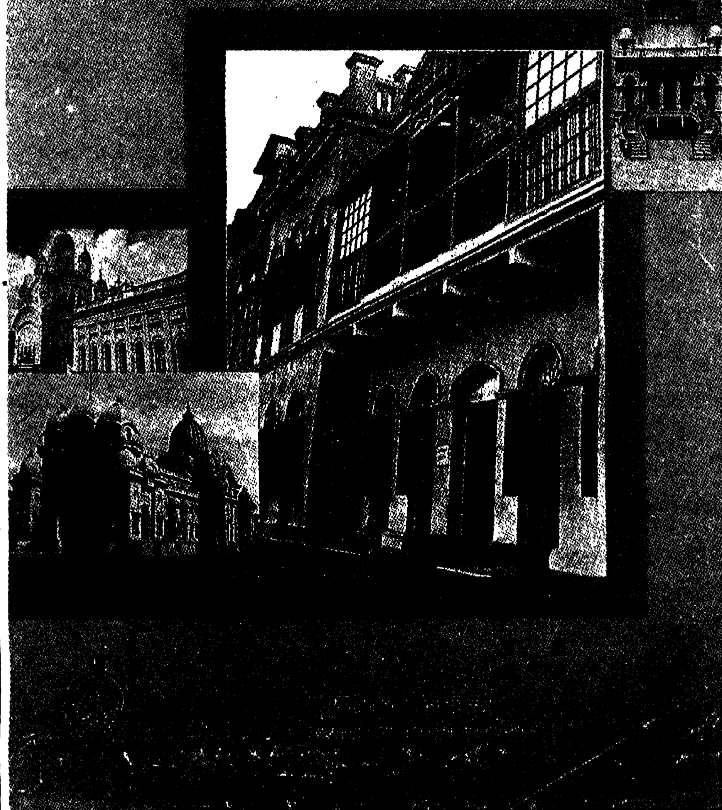
'উদ্বোধন'-এর শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা-র প্রচ্ছদ



'উদ্বোধন'-এর সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা-র প্রচ্ছদ



'উদ্বোধন'-এর বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সংখ্যা-র প্রচ্ছদ

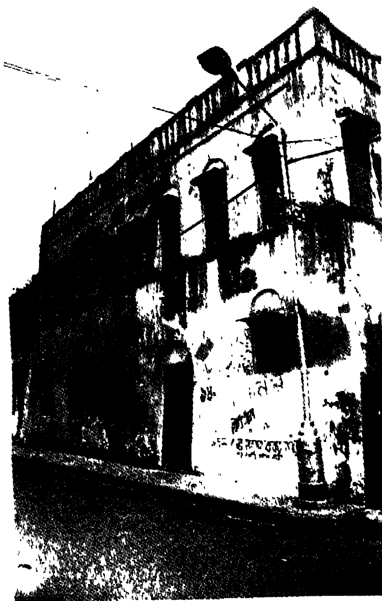


'উদ্বোধন'-এর শতাব্দীজয়ন্তী বর্ষের (১ম—১২শ সংখ্যা) প্রচ্ছদ



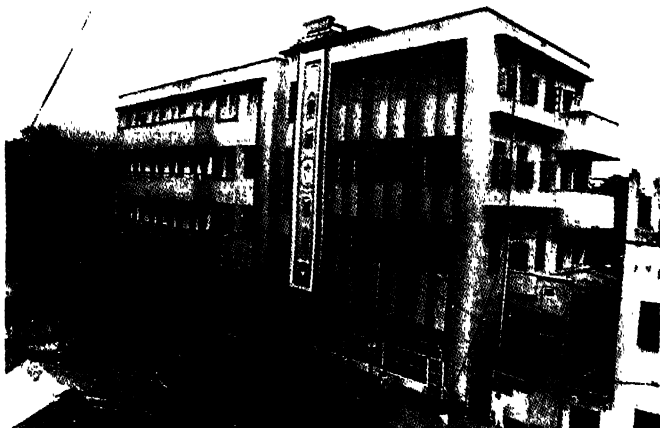
'উদ্বোধন'-এর প্রথম প্রকাশস্থল ঃ ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কম্বুলেটোলা, কলকাতা-৭০০ ০০৪। ১ম বর্ষ থেকে ৮ম বর্ষের শেষ ভাগ (মাঘ ১৩০৫—কার্ত্তিক ১৩১৩) পর্যন্ত এখান থেকে 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়।

'উদ্বোধন'-এর দ্বিতীয় প্রকাশস্থল—৩০ নং বোসপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩। ৮ম বর্ষের শেষ ভাগ থেকে ১০ম বর্ষের শেষ ভাগ (অগ্রহায়ণ ১৩১৩ —অগ্রহায়ণ ১৩১৫) পর্যন্ত এখান থেকে 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়।





'উদ্বোধন'-এর তৃতীয় ও বর্তমান কার্যালয়—'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'—১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। ১০ম বর্ষের শেষ থেকে (পৌষ ১৩১৫) এটিই 'উদ্বোধন'-এর মূল কার্যালয়।



'উদ্বোধন' কার্যালয়ের নতুন ভবন
২৪নং নয়নকৃষ্ণ সাহা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩।

জরথুস্ত্র ও তাঁর ধর্মদর্শনের একটি দিক

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে প্রায় তিনহাজার বছর আগে প্রাচীন ইরানীয় বিদ্বৎ-সমাজে অধ্যাত্মবিশ্বাসের প্রতি একটি গভীর সংশয় জাগ্রত হয়েছিল। এরূপ সংশয়ের পিছনে ছিল গ্রীক ও তুরস্কের সংস্কৃতির প্রভাব। ঈশ্বর আছেন কি নেই, থাকলে তাঁকে দেখা যায় কিনা এসব প্রশ্নে মানুষের মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলেন ধর্মাচার্য স্পিতম জরথুস্ত্র। বিশ্বের দরবারে তাঁর প্রকৃত পরিচয় ধর্ম-প্রবর্তক হিসাবে নয়, ধর্ম-সংস্কারক হিসাবে। প্রাচীন ইরানের ধর্মতত্ত্ববিদ, অহিংসা ও সাম্যের মূর্ত প্রতীক, বিশ্বমানবের অখণ্ড শান্তির মঙ্গলঘট স্থাপয়িতা, জাতি-বর্ণ-গোত্র-আদি সকল বৈষম্য ও কুসংস্কার বর্জিত এক শোষণহীন সমাজের মন্ত্রদাতা ঋষি ছিলেন স্পিতম জরথুস্ত্র। এই তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের জন্মসময়কাল নিয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে বহু মতদ্বৈততা আছে। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে তিনি খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পশ্চিম ইরানের মিডিয়া নামক প্রদেশে গ্রীষ্মকালের (জ্যৈষ্ঠ মাসের?) এক পূর্ণিমার রাত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'গাথা' (পবিত্র সঙ্গীত)। গাথার ভাষার সঙ্গে বৈদিক ও উপনিষদিক ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে অনেকেই আবার তাঁর সময়কাল ১০০০ খ্রীস্টপূর্ব বলে নির্ণয় করেছেন।

তাঁর পিতা পৌরুষাসপ রাজবংশজাত ছিলেন। পরে তিনি পুরোহিত বৃত্তি গ্রহণ করেন। পৌরুষাসপ কথার অর্থ যাঁর বহু অশ্ব আছে। (তুলনীয় সং পুরু + অশ্ব)। জরথুস্ত্রের মাতার নাম দুঘ্দ্য-হেবা (দুগ্ধবতী গাভী)। আটত্রিশ বছর বয়সে জরথুস্ত্র বিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম হেবা-স্বো (গাভী)। অবেস্তা এবং পহলবী গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, তাঁর তিনপুত্র ও তিনকন্যা ছিল। পুত্রগণের নাম ইসৎবাস্ত্র (যিনি কৃষিকার্যে ইচ্ছুক), হ্বর-চিথ্র (সূর্যের ন্যায় মুখমণ্ডল যাঁর) এবং উরবতৎ-নর (মানুষের বন্ধু)। কন্যাগণের নাম ফ্রনি (পূর্ণতা), থ্রিতি (জ্ঞান) এবং পৌরুচিস্তি (পরিপূর্ণ জ্ঞান)। ইয়শ্ত ১৩।৯৮ এবং ১২।১৩৯ সংখ্যক শ্লোক দুটিতে এই ছয়টি নাম পাওয়া যায়। তবে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে জরথুস্ত্রের সন্তান-সন্ততি নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। পৌরুচিস্তির সঙ্গে সম্রাট জামাস্পের বিবাহ হয়েছিল একথা গাথায় বলা আছে। বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, জরথুস্ত্র প্রচারিত 'মজদায়শ্ন' ধর্মে তাঁর এই পুত্রকন্যাগণের কোন ভূমিকা নেই। পহলবী গ্রন্থগুলিতে জরথুস্ত্রের এই তিনপুত্রকে 'সওষ্যন্ত' (ত্রাণকর্তা) রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তাঁরা মানুষের পরিত্রাণের জন্য ভবিষ্যতে জন্ম নেবেন। বিলিমোরিয়া তাঁর বিখ্যাত গুজরাটি 'অশো-জরথোষৎ অনে তেমনো পেগাম' গ্রন্থে (পরিচ্ছেদ ৫, পৃঃ ৪৪) দৃঢ়তার

সঙ্গে বলেছেন ঃ "ঐ তিনজনই তাঁর প্রকৃত পুত্র। গাথায় উল্লিখিত ফরশষ্ত্র হলেন জরথুস্ট্রের প্রধান শিষ্য।" তবে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে অনেকেরই ধারণা ফরশষত্রই হলেন জরথুস্ট্রের একমাত্র পুত্র। মজ্দায়শ্ন্ ধর্মে ফরশষত্রের ভূমিকাই এরূপ ধারণার কারণ। জরথুস্ট্রের জন্ম ও মৃত্যু নিয়েও বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কিছু বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি বসন্তকালের কোন এক প্রভাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং গ্রীষ্মকালের কোন এক প্রভাতে যোগবলে দেহত্যাগ করেছিলেন। তবে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি গ্রীষ্মকালের কোন এক পূর্ণিমা রাত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং গ্রীষ্মকালেরই এক পূর্ণিমার রাত্রে সাতাত্তর বছর বয়সে বাহ্লিকের অগ্নিমন্দিরে তুরব্রাতুর নামে এক তুরানী (তুরস্কের অধিবাসী) ধর্মান্ধ ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন সেই পূর্ণিমা দুটি ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা।

জরথুস্ট্রের গোত্রনাম 'স্পিতম' (তুলঃ সং শ্বিতম > শ্বেত)। জরথুস্ট্র এবং তাঁর পরিবারবর্গ যে কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিলেন তা তাঁর নাম থেকেই বোঝা যায়। 'জ়রথুস্ট্র' নামের আক্ষরিক অবেস্তীয় অর্থ 'যার বুড়ো উট আছে' (জরথ + উষ্ত্র। জরথ = বৃদ্ধ, উষ্ত্র = উট। উট [উষ্ট্র] কথাটি অবেস্তা উষ্ত্র থেকেই এসেছে। সংস্কৃত ভাষাতে 'জরদ্' শব্দের অর্থ 'বৃদ্ধ' আর 'উষ্ট্র' শব্দের অর্থ 'উট'।) অবশ্য অন্য ব্যাখ্যাও হতে পারে। অবেস্তীয় 'জরথ' শব্দের অর্থ 'স্বর্ণময় বা প্রদীপ্ত' এবং 'উষ' ধাতুজাত 'উষ্ত্র' শব্দের অর্থ 'উষার কিরণ'। অর্থাৎ তাঁর নামটির অর্থ 'যিনি উষার কিরণের ন্যায় প্রদীপ্ত জ্ঞান লাভ করেছেন' এমনও হতে পারে। আধুনিক ফারসী ভাষায় 'জরথুস্ট্র' নামের অর্থ 'প্রজ্ঞাবান, স্বর্গীয় জ্যোতিঃ, বুদ্ধিদীপ্ত আত্মা, প্রথম সৃষ্ট ব্যক্তি এবং সত্যবক্তা'। সত্যানুসন্ধানের জন্য মাত্র ষোল-বছর বয়সে জরথুষ্ট্র গৃহত্যাগ করে পশ্চিম ইরানের উশিদারায়ন পর্বতে তপস্যায় রত হন। দীর্ঘকাল তপস্যার পর (আনুমানিক কুড়ি বছর) পরমেশ্বর 'অহুর-মজ্দা' তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং তিনি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ লাভ করেন। পরমেশ্বর অহুর-মজ্দার আদেশে তিনি পর্বত থেকে অবতরণ করেন এবং প্রাচীন ইরানের বিভিন্ন স্থানে এই ঈশ্বরলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু এই প্রচারকার্যে তাঁকে প্রচণ্ড বাধা পেতে হয়েছিল, বহু নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছিল। ঐসময়ে প্রাচীন ইরানের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা ছিল অশান্ত। সেখানে ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি ছিল না। ছিল শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন ও ভোগের লিপ্সা। তুরানীয় ধর্মের কুসংস্কার, অশিক্ষা ও অসমতা এবং উৎপীড়নে ব্যক্তিজীবন জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। ধনী-নির্ধনভেদ এবং বিদ্বেষের পঙ্কিলতায় দেশ আচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীন ইরানীয় সমাজকে সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য জরথুস্ট্র অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। তাঁর সংগ্রাম অবশ্য রক্তাক্ত ছিল না। তাঁর সংগ্রাম ছিল অন্যায়, অধর্ম, কুসংস্কার, অশিক্ষা ও অসমতার বিরুদ্ধে। সমগ্র প্রাচীন ইরানের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি পূর্ব ইরানের অন্তর্গত বাকট্রিয়া প্রদেশের রাজা বিশতাসপের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। রাজা বিশতাসপের (তুলঃ সং বিষ্টাশ্ব) সাহায্যে

তিনি মজদায়শন ধর্ম প্রচারের পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেছেন যে, তিনি প্রাণভয়ে বাকট্রিয়ায় পলায়ন করেছিলেন। কিন্তু এ-অনুমান কোনমতেই সত্য নয় যেহেতু তার কোন প্রমাণ নেই। বরং পহল্বী সাহিত্যকর্ম 'জনদ্-ই-আগাহি বা বুন্দাহিশনে' (দ্বিতীয় অংশ) স্পষ্টতই উল্লেখ আছে যে, জরথুস্ত্র নির্ভীক ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল জীবনকে রক্ষা করতে হলে চাষবাস করতে হবে, বিবাহ করতে হবে। আবার নৈতিক জীবনে যা অসৎ তাকে পরাস্ত করতে হবে। দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধও করতে হতে পারে। অবশ্য সশস্ত্র বিপ্লব বা যুদ্ধ তিনি করেননি। প্রেম, মৈত্রী ও করুণার মাধ্যমেই তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। তাঁর বাকট্রিয়া গমনের উদ্দেশ্য ছিল রাজা বিশতাসপকে দেশ ও জাতির জন্য আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করা। সম্রাট বিশতাসপের মাধ্যমে তিনি ইসফাহান্ সিরাজ, সেমনান, হিরাত, বুখারা, তুস, নিশাপুর, রেই, হামাদান, মাহ্, নাহাবন্দ্, মিডিয়া ও বাকট্রিয়ার মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ইরানকে এমন অবস্থায় উন্নীত করা যেখানে বৈরিতা, কলহ, উৎপীড়ন এবং অপ্রীতিকর অবস্থার কোন অবকাশ থাকবে না। সেখানে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিকেই চরম স্বর্গসুখের বিকাশ ঘটবে। মহামানব জরথুস্ত্রের এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রেম, মৈত্রী ও করুণা মানবসমাজের তিনটি স্তম্ভ।

একথা সত্য যে, মানুষ দুটি প্রবৃত্তির স্রোতে ভেসে চলে। একটি ঈশ্বরলাভের প্রবৃত্তি। অন্যটি ঈশ্বর-বিমুখতার। জরথুস্ত্র প্রথম শ্রেণীর মানবের একজন অগ্রণী পুরোহিত। তিনি প্রাচীন ইরানে ঈশ্বর-বিশ্বাসীর সমষ্টি সৃষ্টি করে এক উদারনৈতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্ন-দর্শনের ইতিহাস তাঁরই লেখনীমুখে গাথায় প্রকাশিত হয়েছে। জরথুস্ত্রের মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী প্রাচীন ইরানের মানুষকে অভিসিঞ্চিত ও প্রবুদ্ধ করে সত্যিকারের পথের সন্ধান দিয়েছিল। জৈবিক সত্তার অন্তরালে অধ্যাত্মলোকে মানুষের যে একটি শাশ্বত জীবন ও মহামূল্য প্রাণসম্পদ রয়েছে এ-সত্যটি তাঁর বাণীর মাধ্যমে সবার প্রাণে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি একান্তভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, জীবন এবং সংস্কৃতির যেসব দিকের সঙ্গে বহুজনের মঙ্গলের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই সেগুলির কোন মূল্য নেই। তাঁর কাছে পরমধর্ম ছিল অন্তরের ধর্ম। ভিতরের শৃঙ্খলাবোধ তৈরি না হলে বাইরের নিয়মনিষ্ঠা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ধর্মকে অপধর্মের অশুভ পরিণামের কবলমুক্ত করতে হলে ধর্মের সারতত্ত্ব কি, তার সম্যক্ অনুধাবন এবং জনমানসে তার প্রতিফলন অপরিহার্য বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাই ধর্মশাস্ত্রাদির অনুশীলন সর্বতোভাবে প্রাসঙ্গিক বলে তিনি বিবেচনা করতেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল অন্তরানুভূতি ছাড়া শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। ঈশ্বরলাভই ধর্মের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। ঈশ্বর মূলত উপলব্ধির বস্তু। মন্ত্র-তন্ত্র, পূজা-উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি পরমপ্রাপ্তির সহায়কমাত্র। ঈশ্বর-চিন্তাই সর্বধর্মের উপজীব্য। ঈশ্বরের সংজ্ঞায় কোন সীমাবদ্ধতা নেই। যেকোন নামেই

তিনি স্মরণীয়, মননীয়। ঈশ্বরীয় ভাবের উপলব্ধি ঘটলে আর ধর্মদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। জরথুস্ট্রীয় ধর্মে শ্রেণীবর্ণমতভেদের কোন অবকাশ নেই। তাঁর ধর্ম ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা গোষ্ঠীগত ধর্ম নয়। তা হলো মানবধর্ম—যা চিরন্তন ও শাশ্বত বিশ্বধর্ম—যা বিশ্ববাসীকে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। এই আদর্শকে নিজের জীবনে সত্য করে তুলেছিলেন বলেই তিনি প্রাচীন ইরানের ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তিনি বলতেন, জীবন ও জগতের মধ্যে দুটি তত্ত্ব আছে। একটি নিত্য পরিবর্তনশীল, আরেকটি এই পরিবর্তনের পিছনে অপরিবর্তনীয়রূপে বিরাজমান যাকে নিয়ে সমস্ত দৃশ্যবস্তু, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের অস্তিত্ব। জগতের পশ্চাতে যে মহতী শক্তি আছে তার উদ্ঘাটন করলে, তাকে অনুভব করলে, ধারণ করলে বাহ্যত অসহায়, দুর্বল, অক্ষম মানুষ অসীম কল্যাণকারী শক্তিতে পূর্ণ হতে পারে। মানবজীবনের আদর্শের পূর্তি তাতেই। মানুষের আত্মা এবং ঈশ্বর—এই দুইয়ের সংযোগের মধ্য দিয়েই জ্ঞান এবং শান্তিলাভ করা যেতে পারে। কাজেই ধর্মাচার্য জরথুস্ট্রের অভিমত—যেসব জাগতিক দুঃখকষ্ট এই জগতে মানুষকে পীড়িত করে, অভয়জ্যোতির উপলব্ধিই তার হাত থেকে মুক্তিলাভের উপায়। মানুষের বাহ্যিক শক্তি কিংবা জাদুকরী ক্ষমতার দ্বারা কখনো জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে না। মানুষকে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির জন্য আত্মিক বলের অধিকারী কোন মহামানবের নিকট সাধনকর্মের শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া মানুষকে অবশ্যই শুভমত, শুভবাক্য ও শুভকর্ম—এই তিনটি নীতি অনুসরণ করতে হবে।

এইসমস্ত বিচার করলে বোঝা যায় যে, জরথুস্ট্র ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। শুধু তিনিই নন, গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, প্লটিনাস প্রত্যেকেই ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু গ্রীক সংস্কৃতি সমাজের ওপর জোর দিয়েছিল। যাদের নিয়ে সমাজ তাদের ব্যক্তিগত শোধনের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় সেখানে সামাজিক শোধন বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি, বিকৃত হয়ে গেছে। আধ্যাত্মিকতাই হলো সেই দৃঢ় ভিত্তি যার ওপরে দৃঢ় চরিত্র এবং সমাজ নির্মিত হতে পারে। হিন্দু এবং জরথুস্ট্রীয় বা মজ্‌দায়শন ধর্মই একমাত্র প্রাচীন ধর্ম—যে-ধর্মে মানুষের বাস্তবিক স্বরূপকে জানতে চেষ্টা করার কথা বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞান দ্বারা দুঃখকে জয় করার কথা বলা হয়েছে, সামাজিক সংস্কারের চেয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই শুদ্ধশক্তির অধিকারী জরথুস্ট্র মানুষের যথার্থ রক্ষক, শাসকবর্গের আচার্য এবং যথার্থ অর্থে সংস্কারক হতে পেরেছিলেন।

জরথুস্ট্রের সমাজভাবনা গড়ে উঠেছিল মানবতার আদর্শকে কেন্দ্র করে। সেই আদর্শের প্রতীক হলো 'অশবহিস্ত'। এই 'অশ'-এর সঙ্গে বৈদিক 'ঋতের' তুলনা করা যেতে পারে। 'ঋত' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো বিশ্বের বিষয়বস্তুর গতি। ('ঋত' আবার ন্যায় ও সত্যকেও বোঝায়)। ঋত হলো বিশ্বের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। জগতের বিভিন্ন ঘটনা হলো ঋতের অভিব্যক্তি। ঋত হলো শাশ্বত সত্তা যা সব পরিবর্তনেও অপরিবর্তনীয় থাকে। কাজেই বৈদিক ঋষিগণ

মনে করতেন যা-কিছু প্রতীয়মান, ঋত তার পূর্ববর্তী। জগতের পরিণামী ঘটনাগুলি শাশ্বত ঋতের বিচিত্র প্রকাশ। কাজেই ঋতকে সবকিছুর পিতা নামে অভিহিত করা হয়। অপরিণামী ঋতই হলো প্রকৃত সত্তা। মানুষের কাছে ঋতের পথই হলো একমাত্র সঠিক পথ, বাকি অন্য সব পথই অলীক বা ভ্রান্ত। কারণ ঋত বা নিয়ম জীবজগৎকে চালিত করে এবং ধর্ম ও নীতির সংরক্ষণে সহায়তা করে। বৈদিক দেবতা বরুণ বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলার রক্ষক এবং তিনি ঋত নামে অভিহিত। বৈদিক বরুণই প্রাচীন ইরানীয় ধর্মগ্রন্থ অবেস্তায় 'অহুর-মজ্‌দা'রূপে পরিচিত। তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা, সত্য-ন্যায়-নীতির পালনকর্তা। বরুণ হলেন খাঋহস্য/খার্হস্য (= ঋতের রক্ষক, ঋগ্বেদ-২।২৮)। অহুর-মজ্‌দা হলেন অশয়ে খাও (= অশ বা ঋতের রক্ষক, ইয়শ্‌ন-১০।৪)। জরথুস্ট্র এই অভিজ্ঞতার জগৎকে অশ বা অরত্য (তুল ঃ সং ঋত) এর ছায়াস্বরূপ বলেছেন।

জরথুস্ট্রীয় ধর্মে 'অশ' হলো জ্বলন্ত, দীপ্তিমান, উজ্জ্বল অগ্নিশিখার প্রতীক—যার অস্তিত্ব সর্বত্রই বিরাজমান। 'অশ' অভিধাটির প্রথমাংশের অর্থ 'সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও বাস্তবিকতা'। 'অশ'র বিশেষণাত্মক আখ্যা 'বহিস্ত'-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'অতিশয় দীপ্তিমান বা সুন্দর'—যা পরবর্তী কালে সাধারণত 'অত্যুত্তম' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং 'অশবহিস্ত' নামটির অর্থ 'সর্বোৎকৃষ্ট ন্যায়-নীতি বা অতিশয় বাস্তবিকতা অথবা অত্যুত্তম আলোক'। যেহেতু অহুর-মজ্‌দার প্রকৃতিগত গুণ হলো আলোক—যা সমগ্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ওতপ্রোতভাবে সঞ্চারিত, 'অশবহিস্ত' সেই সত্তার সর্বব্যাপিত্ব দ্যোতিত করে। যে-আলোক সমগ্র প্রাণী ও বস্তুজগতের সৃষ্টির জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি ধারণ ও পোষণ করে, যা সমস্ত বিকাশের মূল কারণ, সেই 'অশবহিস্ত' যাবতীয় সৎ জীবন এবং সৎ বস্তুর সংরক্ষক। এ-হিসাবে 'অশ' ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানকে সূচিত করে। মানুষের অন্তর্জগতের যে নৈতিক শৃঙ্খলাবোধ 'অশ' তারই তত্ত্ববধায়ক। পৃথিবীতে জীবনের ধারায় প্রকাশ পায় একটি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল এবং সৎ সর্বাঙ্গীণ শৃঙ্খলাবদ্ধ গতিশীলতার আভাস। প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্যের ছন্দ বসন্তে, গ্রীষ্মে, বর্ষা, হেমন্তে এবং হিমে নিত্য-নিত্য পরম্পরাগত পরিবর্তনের ধারায় তাদের অনড় গতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। জোয়ার-ভাঁটা নিয়মমাফিক ক্রিয়াশীল থাকে। ঊষা ও প্রভাত, দ্বিপ্রহর, অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা ও রাত্রি তাদের দৈনন্দিন পরিক্রমা অব্যাহত রাখে। কাজেই মানুষ যতই ক্ষমতাশীল হোক এবং অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার, প্রকৃতির রহস্যজালভেদ করবার যত কৌশলই করুক না কেন তাকে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতেই হয়। আর তা না রাখলে সমাজজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। সেই অতি প্রাচীনকালে ধর্মাচার্য জরথুস্ট্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষের পারিপার্শ্বিক প্রাণিজগৎ এবং উদ্ভিদজগতের সঙ্গে আপস করে চলার নীতি কেবল দার্শনিকের তত্ত্বকথা বা সাহিত্যের কল্পলোকের বিষয়বস্তু নয়। এ মানুষের অস্তিত্বের অপরিহার্য শর্ত। তাই প্রাচীন ভারতীয় ও প্রাচীন ইরানীয় আর্যঋষিগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার অন্তরালে এক সর্বব্যাপী নিয়ম-শৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। এই নিয়ম জীবজগৎকে চালিত করে এবং ধর্ম ও নীতির সংরক্ষণে সহায়তা করে।

সুতরাং, 'অশ'-এর গতিপথই সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিয়মানুবর্তিতার পথ। এই 'অশবহিস্ত' কোন দেবতা নন। অহুর-মজ্‌দারই অন্যতম গুণ বা আদর্শ। কারণ জরথুস্ট্রীয় ধর্ম একেশ্বরবাদী। এখানে বহু দেবতার স্থান নেই। অহুর-মজ্‌দাই একমাত্র আরাধ্য দেবতা। অহুর-মজ্‌দা ও তাঁর ছয়টি গুণ বা আদর্শকে একত্রে সপ্ত অনুশাসনাবলী[১] (হপ্ত অমেষস্পেন্ত) বলা হয়ে থাকে। জরথুস্ট্রের নীতিকথা ও সমাজ সম্পর্কিত আলোচনা বিবর্তিত হয়েছে ন্যায়পরায়ণতা ও সততাকে (অশ) কেন্দ্র করে।

'অশ' হলো 'ত্রয়াত্মক অনুশাসন'—যা দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক স্তরে জীবনের অভিব্যক্তিকে পরিচালিত করে। 'অশ' সেই স্বর্গীয় অনুশাসন যা ঈশ্বর তাঁর আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য পরিচালনার নিমিত্ত নির্দিষ্ট করেছেন। 'অশ' তাঁর স্বর্গীয় ইচ্ছারই প্রকাশ। প্রত্যেক নরনারীকে এই মহাজাগতিক অনুশাসনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে চূড়ান্তভাবে সম্পূর্ণতা প্রদানের জন্য। সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিয়মশৃঙ্খলাই একমাত্র মানুষকে সুখী করতে পারে। জীবনের সমস্ত কর্ম স্বর্গীয়শক্তির দ্বারা চালিত হতে পারে যদি 'অশ'-র নীতিকে (সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিয়মশৃঙ্খলা) অনুসরণ করা যায়। 'দ্রুজ' হলো 'অশ'-র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী প্রক্রিয়া, যার অর্থ হলো 'বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, অনগ্রগতি ও প্রতারণা।' এই দ্রুজকে যে অনুসরণ করে তাকে 'দ্রেগভন্ত' (বিশ্বাসঘাতক) বলা হয়। সমাজ তাকে ঘৃণা করে। জরথুস্ট্র বিরচিত গাথায় তাঁকে 'অশয়ুখ্‌ত্য' বলা হয়েছে যিনি অত্যুত্তমবিবেক বা জ্ঞানলাভ করেছেন। শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় নৈতিক সত্যগুলি সার্বভৌম এবং স্বতঃসিদ্ধ। নৈতিক বৃত্তি হলো সেই বিচারবুদ্ধি যা নৈতিক সত্যগুলিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানতে এবং সেগুলিকে জীবনে প্রয়োগ করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। 'অশ' হলো বিবর্তনের অনুশাসন। 'অশ' তাই আত্মার উন্নতি ঘটায়, পৃথিবীর ক্রমবিকাশকে ('ফ্রদত্‌ গয়েথেম্‌') দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়। যে-ব্যক্তি নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে তাঁর বাক্যে, চিন্তায় ও কর্মে মেনে চলেন তাঁকে পবিত্র ব্যক্তি ('অশবন্‌') বলা হয়। সুতরাং নৈতিক অগ্রগতির অর্থ হলো জীবনের নৈতিক আদর্শের দিকে অবিরাম যাত্রা। নৈতিক নিয়ম মেনে চলার প্রধান উদ্দেশ্য হলো জীবনের পরম কল্যাণ বা পরমার্থ লাভ করা। নীতি ছাড়া ধর্ম এবং ধর্ম ছাড়া নীতি কখনই সম্ভব নয়। নৈতিক আদর্শ হলো জীবনের অন্যতম পরম আদর্শ যাকে একটিমাত্র ক্ষুদ্র সীমিত জীবনে লাভ করা সম্ভব নয়। জন্ম-জন্মান্তরের প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ ধীরে ধীরে এই নৈতিক আদর্শের নিকট যায়। এই আদর্শের বাস্তব এবং পূর্ণ রূপ হলো ঈশ্বর বা জগৎসত্তা। অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যেই নৈতিক আদর্শ পূর্ণতালাভ করে বাস্তবরূপ গ্রহণ করেছে। ঈশ্বর নৈতিক আদর্শের পূর্ণ প্রকাশ। যা ভাল তাই ঈশ্বরের স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর যা মন্দ তা তাঁর স্বভাবের বিরোধী। তাই ধার্মিক ব্যক্তি স্বভাবতই বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন—যিনি নীতিসম্মতভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন এবং নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করে জীবনযাপনের সঙ্কল্প করেন। পক্ষপাতশূন্যতা, সাম্য, সাধুতা, সততা, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা প্রভৃতি সদ্‌গুণের মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশিত হয়।

জরথুস্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বিশ্বাসকে ক্রমবর্ধমান বিবাদগ্রস্ত ধর্মশাস্ত্রগুলি থেকে সরিয়ে একটি নির্বিবাদ বিজ্ঞানের ওপর স্থাপিত করা। কারণ ন্যায়-নীতির বোধে গঠিত মানুষের অপার শক্তি ছাড়া সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের মৌলিক কাঠামোর জন্যই 'অশ'-এর নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। সুতরাং যথেচ্ছ আচরণ করা সমাজের নিয়মবিরুদ্ধ। কারণ যথেচ্ছ আচরণ স্বীকৃত হলে সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। সমাজবদ্ধ মানুষ বলতে সমাজের নানারকম অনুশাসনের অধীন মানুষকে বোঝায়। যেকোন নিয়ম বা আইন মানুষের ওপর চাপিয়ে দিলেই সমাজের নিবিড়বন্ধন সুদৃঢ় হয় না। যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ ঐগুলি মেনে চলে তবেই সমাজের গতি স্বচ্ছন্দ হয়। জরথুস্ট্রের মতে তিনিই একমাত্র 'দাতোরাজ' (সত্য-ন্যায়-নীতির পথপ্রদর্শক) যিনি 'অশ'-এর শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ অনুশাসনকে (সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিয়মানুবর্তিতা) কখনই সমাজ থেকে বিলুপ্ত হতে দেন না। গাথায় আমরা লক্ষ্য করি যে, সেই ব্যক্তিকেই 'অশখ্বাথ্র' (পবিত্রতায় সূর্যের মতো উজ্জ্বল) বলা হয়েছে যিনি সমাজবদ্ধ মানুষের সকল সমৃদ্ধির পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়তই ব্যস্ত থাকেন। যারা অহুর-মজ্‌দা সৃষ্ট 'দাত'-র (আইন) বিরুদ্ধবাদী তাদেরকে গাথায় 'দুষমনংহ' (অমঙ্গলকারী), 'অরথ্বইরেবচংহ' (কুভাষী), 'অকো-দা' (কুকর্মের প্রযোজক), 'দুষ্‌সিয়োথন' (কুকর্মের মন্ত্রণাদাতা বা পরিচালক), 'দৈবিতর' (প্রতারক) এবং 'দুঝনিদাত' (কুপ্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তি) বলা হয়েছে। জরথুস্ট্রের মতে এরূপ অসৎ ব্যক্তিগণকেও সমাজে স্থিতি দেওয়া যেতে পারে যদি তারা তাদের অসৎ কর্মের জন্য পরিতাপ করে পুনরায় সমাজকল্যাণের জন্য 'অশ'-র পথকে অনুসরণ করে। এই ধরনের প্রত্যাবর্তনকে গাথায় 'পতেৎপশেমনি' ('পইতি-ই' অর্থ প্রত্যাবর্তন এবং 'পশেমনি' অর্থ, পরিতাপ বা অনুশোচনা) বলা হয়েছে। জরথুস্ট্রের ধর্মসংস্কারে 'অশ' হলো অহিংসার প্রতীক। কারণ অহিংসাই মানবজাতির ধর্ম। সত্যপরায়ণ হতে হলে অহিংস হতেই হবে। আবার অহিংস হতে হলে সত্যপরায়ণ হতে হবে। দুই-ই অবিচ্ছেদ্য। তাই যেকোন উদারনৈতিক রাষ্ট্রে 'অশ'-র পথই নির্ধারণ করে দেবে নতুন করে সমাজ গড়ার পথ। 'অশ'কে স্বীকার করে নিলে কোন সামাজিক সমস্যাই উপস্থিত হতে পারে না। এই ছিল মহামানব জরথুস্ট্রের বিশ্বাস।* □

পাদটীকা

১ (১) অহুর-মজ্‌দা—জীবনদেবতা বা বিশ্বদেবতা, (২) বহুমনো—স্বর্গীয়মন, (৩) অশবহিস্ত—শাশ্বত সত্য, (৪) বহুশত্র—স্বর্গীয় শক্তি, (৫) স্পেন্ত আরমইতি—স্বর্গীয় জ্ঞান, বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা, (৬) হউরবতৎ—পূর্ণতা, (৭) অমেরতৎ—অমৃতত্ব।

* ৯০ বর্ষ, ৫ সংখ্যা

পল্লীর পৌষপার্বণের একটি চিত্র*

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

পৌষপার্বণ তথা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হিন্দুদের—বিশেষ করিয়া পল্লীবাসীদের নিকট একটি বিশেষ পবিত্র দিবস। মহাভারতে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপিতামহ দক্ষিণায়নে শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যু ভীষ্মের ইচ্ছাধীন ছিল; সেজন্য তিনি উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। "সূর্য যখন উত্তরদিকে গিয়ে সর্বলোক প্রতপ্ত করবেন, তখন আমার প্রিয় সুহৃদতুল্য প্রাণত্যাগ করব।"[১] এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি যুদ্ধে পতিত হইয়াও শরশয্যায় বহুদিন বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি শরশয্যায় অবস্থান করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলাভের উপায় ও রাজ্যশাসন নীতি সম্পর্কে সারগর্ভ উপদেশ দান করিয়াছিলেন। উত্তরায়ণ সমাগত হওয়ার পর ভীষ্ম দেহরক্ষা করেন। পল্লীর হিন্দুরা আজও অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই পুণ্যদিবসটি উদ্‌যাপন করে।

ভীষ্মের দেহত্যাগে মাতা ভাগীরথী শোকে অধীর হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সরোদনা ভাগীরথীকে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনাদান করিয়াছিলেন। আজও সেই পুণ্যদিবসে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব উপলক্ষে সাগরসঙ্গমে শত-শত ধর্মপ্রাণ যাত্রীর বিপুল সমাগম হয়। সেখানে যাত্রীরা কপিলমুনিও দর্শন করিয়া থাকেন। ভারতের সকল প্রান্ত হইতে বহু সাধু সন্ন্যাসী ও পুণ্যকামী স্নানার্থী সেখানে সমবেত হইয়া থাকেন।

'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা অমর বৈষ্ণবকবি জয়দেব গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে পৌষসংক্রান্তি দিবসে অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব নামক স্থানে বিরাট মেলা বসে। সেদিন শত সহস্র হিন্দু অজয় নদে প্রত্যূষে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ বোধ করে। প্রবাদ আছে, সেদিন অজয় নদেও গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। বাউল, কীর্তন ও অন্নসত্রের জন্য এই মেলা বিখ্যাত। আটশত বৎসর পূর্বে জয়দেব মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে দেশের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্তু জয়দেবের মেলা প্রতিবৎসরই মহাসমারোহে আজও সঙ্ঘটিত হয়।

কেন্দুবিল্বের একাধিক মন্দিরে মর্মর শিলার উপর জয়দেব রচিত বিখ্যাত কবিতা—"স্মর-গরল-খণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্, দেহি পদপল্লবমুদারম্" ভক্তপ্রাণে আজও স্পন্দন জাগায়। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই পদটি পূরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্ট জেলার একটি পল্লীতে আমার পিতৃগৃহ ছিল। ছেলেবেলায় আপন পল্লীতে পৌষপার্বণের যে-রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এ-জীবনে সেরূপটি দেখিবার

---

* এই প্রবন্ধে রেখাচিত্রগুলি আঁকিয়াছেন সুখময় মিত্র

আশা নাই বলিলেও চলে। মাত্র কয়েক দশক পূর্বেও সেখানকার পল্লীর আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনস্রোত কতখানি বেগবান ছিল, হিন্দুর বার-মাসের তের-পার্বণ কত না জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইত, আর উৎসবসমূহকে কেন্দ্র করিয়া সেখানকার পল্লীর সামাজিক জীবন কতখানি স্পন্দিত হইত, তাহা অনভিজ্ঞের পক্ষে আজ অনুভব করা সহজ নয়। আজকাল শহরে নগরে সার্বজনীন পূজাপার্বণের রেওয়াজ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু পল্লী-উৎসবের সার্বজনীনত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন মোটেই হইত না। উৎসব সমাগমে সকলের প্রাণমন স্বতই আনন্দে নাচিয়া উঠিত। পল্লীজীবন এখন পারতপক্ষে কাহাকেও আকর্ষণ করে না, আর শ্রীহট্ট জেলার হিন্দুর প্রাচীন সাংস্কৃতিক জীবনও দ্রুত ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এমন একসময় ছিল যে, নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরে যাঁহারা শহরে দেশান্তরে বাস করিতেন, তাঁহারাও উৎসব পর্বাদি উপলক্ষে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিতেন। পল্লীজীবন আনন্দমুখরিত হইয়া উঠিত।

শ্রীহট্ট জেলার যে অঞ্চলের কথা বলিতেছি, সেখানে বর্ষার জল নামিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান ফসল ধান কাটার কাজে পল্লীবাসী ব্যস্ত হইয়া উঠিত। বাড়ির উঠান ও ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া উৎকৃষ্ট মাটিতে লেপন করিয়া ধান রাখার উপযুক্ত করিয়া তুলিত। গোলা-ঘর মেরামত করিত। ধান কাটা শুরু হইলে, দিনেরবেলা ধান কাটা, রাত্রিবেলা মাড়া দেওয়া, পরদিন রৌদ্রে ধান শুকানো, রাত্রিবেলা আবার মাড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজে গৃহস্থগণ বিশেষ ব্যস্ত থাকিত। এসকল রীতি ঐ অঞ্চলে এখনো বলবৎ আছে, কিন্তু নাই কেবল পল্লীজীবনের পূর্বেকার আনন্দের হিল্লোল।

অগ্রহায়ণে ধান উঠিয়া গেলে আর পৌষমাস সমাগত হইলেই পল্লীর ছেলেরা 'গুলি' বাহির করিত। বন্দুকের গুলি নহে, খেলার গুলি। সর্বজনপ্রিয় গুলিখেলা শুরু হইলেই পৌষ-সংক্রান্তির উৎসবের বাণী সকলের মনে পৌঁছিত। সংক্রান্তি দিবসের কর্মসূচী এইরূপ ছিল—প্রাতঃস্নান, ভ্যাড়াঘর পোড়ান, গুলিখেলা ও নগর সঙ্কীর্তন। স্বতঃস্ফূর্ত সেই উৎসবের স্মৃতি আজও মনকে আলোড়িত করে।

শীতারম্ভে স্থানীয় কুমোরেরা হাঁড়ি পাতিলের সঙ্গে তিন হইতে চার ইঞ্চি পরিধির উৎকৃষ্ট মাটির গুলি তৈরি করিয়া রাখিয়া দিত। পল্লীর খেলোয়াড়ের দল ছিল এই গুলির গ্রাহক। আধুনিক খেলার ন্যায় গুলিখেলার নিয়মকানুন ছিল। যতজন খেলোয়াড়, ততগুলি গুলির প্রয়োজন হইত। গুলিখেলার একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, সংখ্যায় যত খুশি লোক খেলায় যোগ দিতে পারিত। খেলোয়াড়ের দল সমান দুইভাগে বিভক্ত হইয়া প্রতিযোগিতা করিত। বিজোড় অর্থাৎ অতিরিক্ত খেলোয়াড় মাঠে উপস্থিত থাকিলে তাহাকেও বাদ দেওয়া হইত না। তাহাকে উভয় পক্ষেই খেলিতে দেওয়া হইত। মুদ্রা-নিক্ষেপ—মুদ্রার অভাবে হাঁড়ি পাতিলের ভাঙা টুকরা নিক্ষেপ করিয়া কোন দল প্রথম খেলিবে, তাহা স্থিরীকৃত হইত।

সমকোণী লম্বাকৃতি চতুর্ভুজ ক্ষেত্র খেলায় স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। লম্বা ও চওড়া নির্ভর করিত উপযুক্ত ভূমির উপর। নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে একদিকে

মাটির উপর একটি চৌকোণ চার-পাঁচ ইঞ্চি বাহু বিশিষ্ট ঘর আঁকা হইত। ইহাতে দ্বিতীয় দলের গুলি বিশেষ আকারে স্থাপন করা হইত। সীমানার বিপরীত রেখার উপর দাঁড়াইয়া প্রথম দলের খেলোয়াড়েরা পর্যায়ক্রমে নিজেদের গুলি ছুড়িত। এই গুলি ছোড়াকে 'গুলি গাওয়া' বলা হইত। গুলি গাওয়ার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকিত দ্বিতীয় দলের গুলি ঘরের যথাসম্ভব নিকটে যাওয়া। গাওয়াগুলি স্থির হইলে একই পর্যায়ে বসিয়া দ্বিতীয় দলের গুলিকে মারিতে হইত। এইভাবে গুলি মারিয়া নির্দিষ্ট সীমানা পার করিতে পারিলে 'গোল্লা' হইত। গোল্লাকে আজকালকার ভাষায় পয়েন্ট বলা যাইতে পারে। গুলিখেলার বহু বিধি ও অনুশাসন ছিল; যেমন এক পক্ষের একজনের গুলি অন্য পক্ষের কোন গুলির অতি নিকটে চারি আঙুল মধ্যে অবস্থান করিলে 'ব' বলা হইত। একবার 'ব' হইলে ইহা ভাঙিবার বিধি ছিল। 'ব' না ভাঙিয়া খেলা চলিত না। বিপক্ষদলের মারা গুলির সীমানার নিকটে আসিয়া থামিলে 'যাদ্দু' অথবা 'চুমকা' হইত। গুলির স্থান হইতে জোড়পায়ে লম্ফ দিয়া সীমানায় পৌঁছিলে যাদ্দু হইত। যাদ্দুর গুলি মারিতে হইলে দুই পায়ের গোড়ালির মধ্যে গুলি রাখিয়া 'গুলি গাহিতে' হইত। চুমকা স্থিরীকৃত হইত অন্যভাবে। চুমকার গুলি মারিতে হইত খেলার মাঠের বিপরীত দিক হইতে এবং তাহা প্রায় কঠিন হইত। গুলি গাহিবার সময় বিশেষ কবিতা ব্যবহার করা হইত। যেমন—"গুলিরে ভাই, ঘরের কাছে যাইতে চাই।" গুলি মারিয়া ভাঙিতে পারিলে অমনিই একটা 'পয়েন্ট' হইত। কোন কোন খেলোয়াড় বিপক্ষের গুলি ভাঙিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিতেন। পল্লীর বয়োবৃদ্ধেরা খেলার মাঠে উপস্থিত থাকিয়া খেলোয়াড়দিগকে উৎসাহ দান করিতেন। খেলার নিয়মে কোন সঙ্কট দেখা দিলে বয়োবৃদ্ধেরা তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। পৌষসংক্রান্তি দিবসে গুলিখেলা চরম পর্যায়ে পৌঁছিত। সেদিনকার খেলার জন্য প্রচুর নূতন গুলি আমদানি করা হইত। বয়োবৃদ্ধেরাও সেদিন খেলার উৎসবে যোগ দিতেন।

সংক্রান্তির পর গুলির মরসুম শেষ হইয়া যাইত। গুলির মালিকেরা মৃত্তিকামধ্যে গুলি পুঁতিয়া রাখিতেন। ইহাতে নাকি গুলি শক্ত থাকিত। আবার পরবৎসর পৌষমাস সমাগত হইলেই পুরানো গুলি মাটির নিচ হইতে বাহির করিয়া খেলা আরম্ভ হইত। গুলিখেলা এখনো হয়তো কোন কোন পল্লীতে বাঁচিয়া আছে কিন্তু, সংক্রান্তির গুলিখেলার উৎসবে ভাঁটা পড়িয়াছে।

ভ্যাড়াঘর পোড়ানোর প্রথাও সেই অঞ্চলে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুত কখন ভ্যাড়াঘর-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা জানা সহজ নয়। উত্তরায়ণ-সমাগমে অগ্নিদ্বারা আলোকের আহ্বান বা শীতাবসান ঘোষণা করাই হয়তো ভ্যাড়াঘর পোড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল। ঋতু-উৎসব বহুদেশেই বিদ্যমান দেখা যায়। স্কানডিনেভীয় দেশসমূহে 'লুৎসিয়া' উৎসব অনেকটা এইধরনের বলিয়া মনে হইয়াছে। বাঁশের খুঁটি ও ঠাট এবং ন্যাড়ার ছাউনি ও বেড়া দ্বারা ভ্যাড়াঘর নির্মিত হইত। আমাদের জলাদেশের ধানগাছ স্বভাবতই বড় হইয়া থাকে। বর্ষার জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানগাছও যেন সাঁতার কাটে। ধান কাটার পর গাছের যে-অংশ (বৃহত্তম নিম্নাংশ) ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে, তাহাই ন্যাড়া

নামে অভিহিত হয়। ধানসিদ্ধ করিবার জন্য কৃষকেরা জ্বালানিরূপে ন্যাড়া ব্যবহার করিয়া থাকে। খড়ের অভাবে অসমর্থেরা ঘরের চালেও ন্যাড়া ব্যবহার করে। ভ্যাড়াঘরের জন্য পল্লীর যুবকদল প্রচুর ন্যাড়া সংগ্রহ করিত।

সংক্রান্তির পূর্বদিবস প্রতিঘরেই অসাধারণ কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিত। নারীরা বাসনপত্র বিশেষভাবে পরিষ্কার করিতেন, ঘরদোর ঝাড়িয়া মুছিয়া নিকাইয়া তকতকে করা হইত। উঠান ও তুলসীতলা নিকাইয়া উৎসবের জন্য প্রস্তুত করা হইত। পুরাতন রান্নার মাটির বাসন ফেলিয়া নূতন বাসন সেদিন ব্যবহার করা হইত।

ভ্যাড়াঘর নির্মাণে ও গুলিখেলার মাঠ পরিষ্করণে তরুণ ও যুবকদের দল সংক্রান্তির পূর্বদিবসে মাতিয়া উঠিত। পল্লীবাসীর বাঁশঝাড় হইতে ঘনগাঁটবিশিষ্ট কাঁচা বাঁশ কাটিয়া আনা হইত। কেহ কেহ 'মুক্তা' সংগ্রহ করিত। মুক্তা একজাতীয় বেতগাছ—আমাদের অঞ্চলে জলাভূমির নিকটে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। বাঁশ-মুক্তা-সংগ্রহ ও গুলিখেলার মাঠের পরিষ্করণ স্নানের পূর্বেই সারিয়া ফেলা হইত। স্নানাহারের পর আবার সকলে কাজে মত্ত হইয়া উঠিত। কেহ দা লইয়া বাঁশ কাটিত, কেহবা বাঁশ 'কান্তাইত'—(খুঁটির মাথা V আকারে কাটাকে বাঁশ কান্তান বলা হয়)—যাহাতে মারুলের বাঁশ বসিতে পারে। কেহ খন্তা দ্বারা খুঁটির উপযোগী গর্ত করিত। বাঁশের কাঠামো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যাড়ার ছাউনি ও বেড়ার কাজ হাতে-হাতে সমাধা করা হইত। প্রবল উৎসাহে কাজ চলিত। পল্লীর বালকের দলও সেদিন ভ্যাড়াঘর নির্মাণের কাজে সহায়তা করিয়া আত্মগৌরব বোধ করিত। ভ্যাড়াঘর নির্মাণ সম্পূর্ণ হইলে ঘরের মেঝের উপর ন্যাড়া বিছাইয়া চাটাই দেওয়া হইত। এই ভ্যাড়াঘরে সারারাত্রি 'বাউল' গানের আসর বসিত।

বাউলের গানকেই আমাদের অঞ্চলে 'বাউলা' বলা হয়। এই আসরের জন্য চাঁদা তুলিয়া প্রচুর আহার্যবস্তু সংগ্রহ করা হইত। ফলের মধ্যে শ্রীহট্টের কমলা, উকরা (খইয়ের মুড়কি), কদমা, বাতাসা ইত্যাদি সকলে উপভোগ করিত। তাছাড়া পল্লী প্রথানুযায়ী তামাকু সেবনও সারারাত্রি চলিত। বাউলা গায়কদের কেহ কেহ গঞ্জিকা সেবন করিতেন। বোধ করি সেজন্য বয়োবৃদ্ধেরা বালকদিগকে বাউলাগানের আসরে যাইতে দিতেন না। পৌষ-সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে সমগ্র পল্লীতে তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় একটা আনন্দের হিল্লোল বহিত। গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঘরে ঘরে আলো জ্বলিত। নারীরা পাকালের (চুল্লি) নিকটে বসিয়া পিষ্টক, নাড়ু ইত্যাদি উৎসবের আহার্য তৈরি করিতেন।

বাউলাগানের আসরে লাউয়ের একতারা, খঞ্জনি, ঢোল ও করতাল সহযোগে গান চলিত। প্রথমে 'তিননাথের' গুণ গাওয়া হইত। তিননাথ—ত্রিনাথ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। ত্রিনাথ শব্দের অর্থ—যিনি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই তিনকালের অধিপতি। রাত্রি অবসানের কিয়ৎকাল পূর্বে গানের আসর ভাঙিয়া যাইত। চাটাই সরাইয়া ভ্যাড়াঘর প্রচুর অতিরিক্ত ন্যাড়ায় পূর্ণ করিয়া সকলে ঘরে ফিরিত।

আমরা অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়াই স্নান করিতাম। স্নানান্তে পরিষ্কার কাপড় ও শীতবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সকলে ভ্যাড়াঘরের নিকটে জড়


পৌষপার্বণের পূর্বরাত্রে 'ভ্যাড়াঘরে' বাউল ও কীর্তনগানের আসর

হইতাম। তারপর ভ্যাড়াঘরে অগ্নিসংযোগ করা হইত। দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখা আকাশে বিস্তারলাভ করিত এবং বাঁশের ঘন গাঁটগুলি একটি একটি করিয়া সশব্দে ফুটিত আর ছেলে মহলে আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইত। অরুণোদয়ের পূর্বে অথবা সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাড়াঘর পুড়াইবার পর্ব শেষ করিয়া পুরুষের দল গুলিখেলার মাঠে সমবেত হইতেন। আমাদের পল্লীর চন্দ্রমোহন নামক একজন উৎকৃষ্ট গুলি-খেলোয়াড়কে সত্তর বৎসর বয়সেও ঐদিনের গুলিখেলায় যোগ দিতে দেখিয়াছি। সেদিন খেলোয়াড়ের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হইত। খেলার উৎসাহ যেন কোন বাধাই মানিত না। অবশ্য এরূপ ভিড়ে খেলা বড় সহজ হইত না। এত লোকের গুলি চিনিয়া রাখাই কঠিন হইয়া পড়িত। তাছাড়া খেলোয়াড়ের সংখ্যাধিক্য হেতু ঘন ঘন 'ব' হইত। 'ব' লাগিলেই খেলোয়াড়ের দলকে নূতন করিয়া গুলি গাহিয়া আনিতে হইত। ঘণ্টাকাল উত্তেজনাপূর্ণ খেলার পর সকলেই দ্রুতপদে যার যার ঘরে ফিরিত এবং পর্বদিনের প্রাতরাশ, যথা ঘরের দই, ঘরের চিড়া, পিঠা ইত্যাদি খাইয়া সঙ্কীর্তনের আসরে একে একে জড় হইত।


"দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখা আকাশে বিস্তারলাভ করিত..."

চারিশত বৎসর পূর্বে বাঙলাদেশে শ্রীচৈতন্যরূপী মহামানব প্রেমগীতির যে বন্যা আনিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ এদেশে এখনো স্তিমিত হইয়া যায় নাই। শ্রীহট্ট বৈষ্ণবপ্রধান জেলা। আমাদের পল্লীর একাধিক গৃহে বিগ্রহ ছিলেন। একসময়ে গৃহদেবতার নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদি আড়ম্বর সহকারে সম্পন্ন হইত। পৌষসংক্রান্তি দিনে পালা ক্রমে কোন বাড়ির বিগ্রহের মন্দিরপ্রাঙ্গণে গায়কগণ সমবেত হইতেন। আমাদের পল্লীতে একটি 'নট' পরিবার ছিল। কৃষিই ছিল নট পরিবাবের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। বস্তুত পরিবারটি একসময়ে স্বচ্ছল গৃহস্থ ছিল। কিন্তু নট পরিবারের প্রধান পেশা ছিল গানবাজনার চর্চা পল্লীর

উৎসবে নাচগানে বাদ্যে নটেরাই অগ্রণী হইতেন। নট পরিবারের ছেলেদিগকে অল্পবয়সে ওস্তাদের নিকট গানবাজনার শিক্ষা লইতে হইত। হিন্দুর সকল পর্বের সময়োচিত গানের চর্চা নটেরা করিতেন।


পৌষপার্বণে পল্লীপরিক্রমা

সংক্রান্তি দিবসে কোন বাড়ির মন্দিরপ্রাঙ্গণে গায়কগণ খোলকরতালসহ সমবেত হইতেন। প্রথমেই ধামালী। খোলীর দল বাদ্যদ্বারা সকলের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিতেন। এই খোলের বাজনা পল্লীবাসীর কর্ণকুহরে পৌঁছিলে সকলেই দ্রুতপদে কীর্তনের আসরে আসিয়া জড় হইতেন।

প্রথম গান—গৌরচন্দ্রিকা, যেমন—

নগরবাসী ওরূপ দেখবি যদি শীঘ্র আয়,
শচীর দুলাল গৌর নেচে যায়।
ওরূপ যে দেখেছে, সে ভুলেছে
তারে কি পাশরা যায়।
(নগরবাসী, ওরূপ দেখে যা রে)


"আক্রোধপরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়
যারে দেখে আপন করে হরির নাম

তখনকার দিনে পল্লীতে দুচারজন লোক দেখা যাইত, যাঁহারা অবসর সময়ে সাধন ভজন ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে আনন্দ পাইতেন এবং অন্য সকলকে আনন্দদান করিতেন। ভক্তশ্রেণীর সেইসকল গায়ক সেদিন কীর্তনের আসরে যেন শচীর দুলালকে প্রত্যক্ষ করিতেন। তাঁহাদের অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিতে এই প্রেমলীলাগীতির আনন্দ-হাট অপূর্ব শ্রীলাভ করিত। নৃত্যকালে তাঁহাদের কাহারো কাহারো শিখা খাড়া হইয়া উঠিত। চৈতন্যের প্রেমগীতির আবেশে কাহারো কাহারো শরীরে অশ্রুকণা পুলকাদি প্রকাশ পাইত। বাদকের দল বিভিন্ন তাললয়ের কলা-কৌশল প্রদর্শন করিতেন। পল্লীরমণীগণ হাতের কাজ ফেলিয়া কীর্তনের আসরে কোন একদিকে সমবেত হইয়া উলুধ্বনিতে পর্বদিনের মঙ্গলগীতিকে অভ্যর্থনা করিতেন। এই চিরাচরিত কীর্তন এখনো হয়; কিন্তু তাহা নিছক সংস্কার ও নিয়মরক্ষার জন্য।

মন্দির-প্রাঙ্গণে দু-একটি গান গীত হইবার পর কীর্তনীয়ার দল পল্লী-পরিক্রমায় বাহির হইতেন। এই দলকে পল্লীর প্রতিটি বাড়িতেই যাইতে হইত। সেদিন সকলের বাড়িতেই লুটের ব্যবস্থা থাকিত। পল্লীর সকল

বয়সের নরনারীর হৃদয়-মন আনন্দে উদ্বেলিত হইত। পৌষপার্বণ বস্তুত গণ-উৎসব ছিল।

চৈতন্যের সহযোগী নিত্যানন্দের প্রেমগাথা গাহিয়া কীর্তনীয়ার দল যখন উন্মুক্ত মাঠের উপর দিয়া এক হাটি হইতে অন্য হাটিতে যাইত, তখন কী যেন অপূর্ব প্রেমভাবপ্রবাহ চলিত। ইহার বর্ণনা দেওয়া কঠিন।

আয় সবে ভাই
নিতাই গুণ গাই
অভিমানশূন্য গৌর নিতাই।
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় (রে)
(নিতাই) যারে দেখে, আপন করে
হরির নাম বিলায় (রে)।

'অভিমানশূন্য' 'অক্রোধপরমানন্দ' মহাজন যে-বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, চারিশত বৎসরকাল বাংলার পল্লীর হিন্দুসাধারণ তাহা হইতে প্রেমের ও অহিংসার প্রেরণা লাভ করিয়াছে। পৌষসংক্রান্তিতে সেই বাণীর জয়গীতি সমগ্র পল্লীর হৃদয়মনকে আলোড়িত করিত।

বহুরকমের কীর্তন সেইদিন গাওয়া হইত। পল্লীপরিক্রমার আরেকটি গানের নমুনা এখানে দিতেছি—

ওরে কে রে, হরিবল বলে যায়
গৌর যায় কি নিতাই যায়,
যা রে মাধাই দেখে আয়,
সোনার নূপুর রাঙা পায়।

দীনভাবে উদ্বুদ্ধ গায়কগণ গৌর নিতাইয়ের পদধ্বনি যেন সেদিন প্রত্যাশা করিতেন।

আমাদের পল্লীর এক কোণে চৈতন্য মহাপ্রভুর আখড়া আছে। ইহার সুপ্রাচীন অট্টালিকাসমূহ, পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাধকদের সমাধি মন্দিরের শ্রেণী ও সুবিশাল নাটমন্দির আখড়ার প্রাচীন ঐশ্বর্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। বহু সিদ্ধসাধক এই আখড়ায় প্রেমধর্মের আচরণ করিয়া সমাধিলাভ করিয়াছেন। শ্রীহট্টের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আখড়াটি প্রাচীনতমের একটি। বৈষ্ণবধর্মপ্রবাহ একসময়ে শ্রীহট্টবাসীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। আখড়া-সমূহ ইহার সাক্ষী। বিথলঙ্গের আখড়ার কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। বিথলঙ্গে অতিথিদের জন্য বিশাল অট্টালিকার শ্রেণী ও সহস্রাধিক লোকের বাসস্থান দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না, চৈতন্যবাণী একসময়ে শ্রীহট্টে কী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সংক্রান্তিদিবসে কীর্তনীয়ার দল আখড়ায় পৌঁছিলেই আবার নূতন উৎসাহে নব-নব কীর্তন গাওয়া হইত। এই কীর্তনের একটা বিশিষ্ট ধারা ছিল। যেমন—

নিতাই রে,
ঐ নাকি রে ব্রজধাম
শ্রবণে না শুনি কৃষ্ণ নাম।

বৃন্দাবন হতো যদি
শুকসারী করতো গান।

কী বেদনা! বৃন্দাবনে আসিয়াও কৃষ্ণনাম শোনা যায় না। শুকসারীর গানও কর্ণকুহরে পৌঁছে না। আখড়ার বৈষ্ণবীয় পরিবেশে এই গান যেন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিত। গায়কদের কাহারো কাহারো অশ্রুপ্রবাহ যেন আর বাধা মানিত না। এই প্রেমগীতি পার্থিব সুখের তো কোন সন্ধান দিত না! আমার মনে প্রশ্ন জাগিত। প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইতাম না। ইহা বিকার বলিয়াও মনে করিতে পারিতাম না।

আমাদের জীবদ্দশায় দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রকোপে আমাদের পল্লীসংস্কৃতির মর্মবাণীও মরুভূমিতে নদীস্রোত বিলীন হইবার মতো অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। হিংসাদ্বেষে ও কালোবাজারী মনোবৃত্তিতে কলুষিত যুদ্ধোত্তর পল্লীসমাজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ পল্লীর পূর্বেকার পৌষপার্বণের প্রেমগীতির ধারা ও অনুরূপ উৎসব—যেমন বিজয়াদশমীর প্রীতির আলিঙ্গনের রীতির তুলনা করিলে স্বতই মনে হয় অহিংসার সাধনা এদেশের সমাজের সকল স্তরে কিভাবে অনুষ্ঠিত হইত।

যে মন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্তন আরম্ভ হইত কীর্তনীয়ার দল পরিক্রমা শেষ করিয়া আবার সেখানেই পৌঁছিতেন। তখন একাধিক কীর্তন গাওয়া হইত। যেমন চৌতালের গান—

আমি ব্রজপুরে যাব রে,
গুণের ভাইরে নিতাই মায় যে জানে না।
জানিলে সন্ন্যাসের কথা রে,
(মায়) পাষাণে ভাঙিবে মাথা রে—
(মায় যে জানে না)

চৈতন্যের সন্ন্যাসের গান জমিয়া উঠিলে দেখিতাম, রমণীগণ গৃহের কাজ ফেলিয়া কীর্তনের আসরের কোণে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইতেন। গৃহকর্ম বিস্মৃত হইতেন। অনেকের চোখে অবিরাম জলের ধারা বহিত। মাতৃহৃদয়ের বেদনা অনুভব করিয়া চৈতন্য নিতাইকে সতর্ক করিতেছেন। পল্লীর মাতৃহৃদয়ও সেই বেদনায় ভারাক্রান্ত হইত। চারিশত বৎসর পরও চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণচিত্র পল্লীরমণীদের হৃদয়ে ব্যথা জাগাইত। এই চৌতালের গান কতদিনের জানি না। অশীতিপর বৃদ্ধের কাছে শুনিয়াছি যে, তাঁহারাও বাল্যকাল হইতে এই গান শুনিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পিতা, প্রপিতামহেরাও এই গান গাহিয়াছেন। ধীর লয়ে নৃত্যসংযোগে এইধরনের চৌতালের গান দ্রুতলয়ে শেষ হইত। আরেকটি গানের নমুনা দিতেছি ঃ

জয় রাধে শ্রীরাধে বলে মুদিলা নয়ন,
হরিদাস ত্যজিলা জীবন।
হরিদাসের গলে ধরে, প্রভু তুলি নিলেন কোলে
প্রেমভরে দিলেন আলিঙ্গন।
চৌদিকে খোল করতাল বাজে
(সবে) করে নাম সঙ্কীর্তন।

হরিদাসের মহাপ্রয়াণের চিত্রটি গানে ফুটিয়া উঠিত। এরূপ কত প্রাচীন গান সেদিন শোনা যাইত। লুটের গান গাহিয়া কীর্তনের পালা শেষ করা হইত। তারপর লুট; লুটের পর সকলে খিচুড়ি, পরমান্ন, ফলাদি আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া প্রসাদ পাইতেন। কাহার প্রসাদ। চৈতন্যরূপী বিশ্বাত্মার নামে উৎসর্গীকৃত প্রসাদ—যাঁর গুণে সকলের আত্মা তৃপ্তিলাভ করে। প্রসাদ গ্রহণের পূর্বে পঙক্তিতে বসিয়া সকলে প্রেমধ্বনি দিতেন। সেই ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস স্পন্দিত হইত। ইহাই ছিল পৌষসংক্রান্তির বাণী—ধর্মরূপী কুরুপিতামহ ভীষ্মের অহিংসার বাণী। মহাভারত আজও মানবীয় প্রেরণার আধার।

পল্লীজীবনের বাল্যস্মৃতি আমাকে আকর্ষণ করিত, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বেদনা জাগাইত। ফলে প্রৌঢ় বয়সে আবার পল্লীতে ফিরিয়াছিলাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বপর্যন্ত একটানা পাঁচ বৎসর পল্লীতে অতিবাহিত করিয়াছি। দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় বহু লোককেই আমার মতো উদ্বাস্তু হইতে হইয়াছে। হয়তো ইহা স্বাধীনতার মূল্য। কিন্তু জন্মপল্লীর শেষ অভিজ্ঞতা হইতে আমার এইটুকু ধারণা হইয়াছে যে, যে-শাশ্বত প্রেমধর্ম এদেশের পল্লীজীবনের ঐতিহ্যকে নানা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও সঞ্জীবিত করিয়াছে, ফল্গুর ধারার ন্যায় সেই ঐতিহ্যের প্রবাহ এখনো এদেশের পল্লীধমনীতে প্রবহমান।

চৈতন্য নিত্যানন্দের উত্তরাধিকারী স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-গঠনের আহ্বান, রবীন্দ্রনাথের মৈত্রীর বাণী এবং গান্ধীজীর প্রেম ও অহিংসার অমৃতসম বাণী বর্তমান যুগকে নূতন করিয়া ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়াছে। সেই ঐতিহ্যকে সর্বলোকের সম্পদে পরিণত করার পথ নিরঙ্কুশ করিবার মতো মহামানবতার জাগরণের প্রতীক্ষা স্বাধীন ভারতের নাগরিকরূপে আমরা অবশ্যই করতে পারি।* □

পাদটীকা

১ মহাভারত ঃ রাজশেখর বসু

* ৫৬ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

বাংলার ব্রত-উৎসব

উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

'বারো মাসে তের পার্বণ' বলে একটি কথা প্রচলিত, কিন্তু দোল-দুর্গোৎসব, রথ-রাসযাত্রা, মহালয়া-দীপান্বিতা ইত্যাদি প্রধান প্রধান পূজা-পার্বণের কথা বাদ দিলেও প্রত্যেক মাসেই ব্রত-পূজাদি ধর্মকৃত্যের বহু অনুষ্ঠান হিন্দু নরনারীর সামাজিক জীবনে প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। হিন্দুজীবন চতুরাশ্রমে বিভক্ত, সকল আশ্রমেরই মূল গার্হস্থ্যাশ্রম। গৃহী নরনারীদের দুর্লভ জীবন সর্বদা পরমার্থ-নির্ভরশীল রাখিয়া সুপথে চালিত করার জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে বেদের কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি। তদবলম্বনে মানবহিতৈষী ঋষিগণ জিজ্ঞাসু ও উপদেষ্টার প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সরল সরস উপাখ্যানাদি দ্বারা বৎসরের বিশেষ বিশেষ পুণ্যাহে অগণিত ধর্মকৃত্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ধর্মপ্রাণ নরনারীদের সাধনালব্ধ প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতিজাত নানা পুণ্যানুষ্ঠানও স্থানীয় প্রভাবপুষ্ট হইয়া ধর্মকৃত্যে সংযুক্ত এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমাজবদ্ধ সুসভ্য মানুষ চায় অত্যাচার-উৎপীড়নহীন সুখময় জীবন, জ্ঞানে অর্থে অভাব-অনটন বর্জিত ক্রমোন্নতিশীল সমৃদ্ধি এবং অনুতাপহীন আত্মিক শান্তি, যাহার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অর্গলাস্তবে পাওয়া যায়—"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি"—এই সরল প্রার্থনায়। যিনি সর্বনিয়ন্তা তাঁহাকে বিশ্বপিতা, বিশ্বমাতা যেভাবে ধারণা করিয়াই হউক, বিশ্ববাসীরা সর্বদা সর্বাবস্থায় সবকিছু তাঁহার কাছে অকপটে চাহিয়া চাহিয়া লাভ করিবে। এই চাওয়া-পাওয়ার শেষ নাই! শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নির্দেশ দেন, "দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।" যাগযজ্ঞ, ব্রতপূজা, ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা দেবতার তর্পণ করিলে তাঁহারাও বিনিময়ে তর্পণকারীদের মঙ্গল চিন্তা করিয়া সর্বপ্রকারে পুষ্টিসাধন করেন। এইরূপে পরস্পর-নির্ভরতা দ্বারাই শ্রেয়োলাভ হয়। সংসারের জীব তার সতত কর্মব্যস্ততাপূর্ণ সুখদুঃখ ও উত্থানপতনান্দোলিত জীবনকে স্বধর্মনিষ্ঠ ভগবন্মুখী রাখার উদ্দেশ্যে বিবিধ পূজাব্রতোৎসব পুণ্যানুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ নিয়োজিত রাখিয়া দুর্লভ জীবন সার্থক করে।

এই সার্থকতা-সাধনের যাত্রাপথে বিশাখার বিপরীতে মেষরাশিতে সূর্যের অবস্থানে বাঙলা প্রথম মাস বৈশাখ আদ্যঋতু গ্রীষ্মকে সঙ্গে লইয়া বর্ষচক্রে প্রকটিত হওয়ার কালে বহু ধর্মকৃত্যের ভিতর পাওয়া যায়—অক্ষয়তৃতীয়াব্রত, গৌরীব্রত, পুণ্যিপুকুরব্রত, পৃথিবীব্রত ইত্যাদি। মহাপুণ্যময় অক্ষয়তৃতীয়া দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রতি বৎসর এইদিনে হিমতুষারাচ্ছন্ন বদ্রীনারায়ণ-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। যেসব ব্যবসায়ীরা নববর্ষ দিনে হালখাতা করেন না, তাঁহাদের অনেকে এই পুণ্যদিনে তাহা অনুষ্ঠান করেন। এই দিনে অনুষ্ঠিত সব সৎকার্য অক্ষয় পুণ্যফল প্রদান করে বলিয়া পূর্ণকুম্ভে জলদান,

ব্যজন (তালপাতার পাখা)-দান, সভোজ্য ফল-মিষ্ট-দ্রব্যাদি দান শ্রদ্ধার সহিত করা হয়। ভবিষ্য-পুরাণে এই দানের মহিমা এরূপ বর্ণিত আছে যে, কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ঐ তিথিতে তাহার সহধর্মিণীকৃত জলদানের ফলে নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

গৌরীব্রত ঃ কুমারী মেয়েরা শিবতুল্য বরলাভের কামনায় সারা মাস প্রত্যূষে ভক্তিভরে শিবপূজা করে এবং শিবের মাথায় জল দিয়া ছড়া গায়—

শিল শিলাটন, শিলে বাটন
শিল অঝঝর ঝরে।
কৈলাস থেকে শুধান শিব
গৌরি! কি ব্রত করে?
নড়ে আশ, নড়ে পাশ,
নড়ে সিংহাসন,
হর-গৌরী কোলে করে
গৌরী-আরাধন।

পুণ্যিপুকুর ঃ ভাইদের এবং স্বামী-পুত্রাদির মঙ্গলার্থে মেয়েরা এই ব্রত করেন—উঠানে একটি পুকুর তৈরি করিয়া। পুকুরের মাঝে তুলসীচারা রোপণ করা হয়। পুকুরের জল ছিটাইয়া পূজা করার ছড়া—

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী,
সাত ভাইয়ের বোন
ভাগ্যবতী।...
...এ পূজিলে কি হয়?
নির্ধনের ধন হয়,
সাবিত্রী-সমান হয়,
স্বামী-আদরিণী হয়।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে,
মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে।[১]

তুলসীগাছে জল ঢালার ছড়া—

তুলসী তুলসী নারায়ণ!
তুলসী তুমি বৃন্দাবন।
তোমার মাথায় ঢালি জল,
অন্তিমে চরণে দিও স্থল।[২]

পৃথিবীব্রত ঃ পরম সৌভাগ্যলাভের কামনায় পিটুলি দিয়া পৃথিবী আঁকিয়া প্রত্যহ ফুল, দূর্বা, জলসহ পূজা করিয়া ছড়া গাওয়া হয়—

আইস পৃথিবী গো, বস পদ্মপাতে,
শঙ্খ চক্র পদ্মাক্ষ ধরি চারি হাতে।
খাওয়াইব ক্ষীর, মাখাইব ননী,
আমি যেন হই গো, রাজার পাটরানী।[৩]

জ্যেষ্ঠার সম্মুখীন বৃষরাশিতে সূর্যের অবস্থিতিতে বাংলা দ্বিতীয় মাস জ্যৈষ্ঠ দারুণ নিদাঘতাপিত ধরায় প্রকটিত হইলে সাবিত্রীব্রত, অরণ্যষষ্ঠীব্রত, মঙ্গলচণ্ডীব্রত, কর্মাদি বা সইপাতার ব্রতাদি অনুষ্ঠিত হয়।

সাবিত্রীব্রত ঃ প্রগাঢ় পতিপ্রেমবলে সাবিত্রী মৃতস্বামী সত্যবানকে পুনর্জীবিত করিয়া সতী-শিরোমণির গৌরবতিলক ধারণে যেরূপ ধন্যা হইয়াছিলেন, নারীমাত্রেই সেরূপ সতীত্বলাভের আকাঙ্ক্ষায় এই পুণ্যব্রত অনুষ্ঠান করেন।

অরণ্যষষ্ঠী ঃ নিজ সন্তানদের ও সন্তান-স্থানীয় সকলের নির্বিঘ্ন দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া মেয়েরা এই ব্রত অনুষ্ঠান করেন। পুত্রবৎ জামাতারাও এই ব্রতদিনে বিশেষভাবে শুভাশিষলাভ করে বলিয়া এই ব্রত 'জামাইষষ্ঠী' নামেও প্রসিদ্ধ।

মঙ্গলচণ্ডী ঃ সর্ববিধ মঙ্গলের আশায় সর্বমঙ্গলময়ী চণ্ডীর ব্রত ও পূজা এই মাসের প্রতি মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত হয়, যদিও বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী, হরিমঙ্গলচণ্ডী, জয়মঙ্গলচণ্ডী, কলুই-সঙ্কট, নাটাই মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বহুভাবে আরাধনা প্রচলিত আছে।

কর্মাদি ঃ সংক্রান্তি-দিনে দৈ, খৈ, চিড়া, গুড়, আম-কাঁঠালাদি ফল ও বিবিধ মিষ্টদ্রব্য নিবেদন করিয়া কর্মপুরুষে নারায়ণের পূজা হয়। ঐদিন সবস্ত্রফলভোজ্যাদি বদল করিয়া পুরুষেরা পুরুষদের সহিত 'বন্ধু' পাতে এবং মেয়েরা মেয়েদের সহিত 'সই' পাতে। এক ভক্তিমতী কালীঘাটের মা-কালীর সহিত এইরূপ 'সই' পাতিয়া ভাবের ঘোর গাহিয়াছিলেন—

'মনের কথা শোন মা শ্যামা!
দিয়ে তোমায় খৈ, দৈ,
মায়ে ঝিয়ে পাতানু সই।
এখন বল্ দেখি মা, ওমা সই!
আমার ঘুচবে কিসে আনাগোনা?'

পূর্বাষাঢ়া-নক্ষত্রদৃষ্ট মিথুন-রাশিতে সূর্য-সংক্রমণে বাংলা তৃতীয় মাস আষাঢ় বর্ষাকে সঙ্গে লইয়া বর্ষচক্রে প্রকটিত হইলে মনোরথদ্বিতীয়া, বিপত্তারিণী, বিবস্বৎসপ্তমী-ব্রতাদির অনুষ্ঠান হয়।

মনোরথ-দ্বিতীয়া ব্রত ঃ

জীবদেহ নিত্যরথ, আত্মা শ্রেষ্ঠ রথী,
লাগাম উহার মন, বুদ্ধি যে সারথি,
জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয় ঘোটক-নিচয়,
বিবেক-বেত্র-তাড়নে সুপথে চলয়।[৪]

এই অনুধ্যান করিয়া মনোরথ-দ্বিতীয়া উদযাপিত হয়।

বিপত্তারিণী ব্রত ঃ সতত বিঘ্নবিপদসঙ্কুল সংসারের পরিত্রাণের আশায় এই ব্রত নরনারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

বিবস্বৎসপ্তমী ব্রত ঃ অটুট স্বাস্থ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় আরোগ্যদ সূর্যদেবের ব্রতোৎসব হয়।

শ্রবণা-নক্ষত্রদৃষ্ট কর্কটরাশিতে সূর্য সংক্রমণে বাংলা চতুর্থ মাস শ্রাবণ প্রবল বারিধারাপাতের সঙ্গে বর্ষচক্রে উপনীত হইলে অশূন্যশয়নাব্রত, নাগপঞ্চমী, কৃষ্ণজয়ন্তী ব্রতাদি অনুষ্ঠিত হয়।

অশূন্যশয়নাব্রত ঃ পতি-পত্নীর বিরহ-মুক্তি কামনায় মৎস্যপুরাণোক্ত এই ব্রতের প্রচলন।

নাগপঞ্চমী ঃ সর্পভয় হইতে পরিত্রাণ-মানসে এই ব্রতের অনুষ্ঠান। নাগপূজা দেশ-বিদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন আচারে প্রচলিত। নাগমাতা, পদ্মা, বিষহরি, জরৎকারী বা মনসাকে অবলম্বন করিয়া একাধিক প্রাচীন কবি 'পদ্মাপুরাণ', 'পদ্মার ভাসান', 'মনসামঙ্গল' প্রভৃতি গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন, যাহা হইতে চাঁদসদাগরের ইষ্টনিষ্ঠা, সনকার ভক্তিবিশ্বাস এবং সতীমুকুটমণি বেহুলার উজ্জ্বল চরিত্র অদ্যাপি পল্লীতে পল্লীতে শ্রাবণ মাস জুড়িয়া সগৌরবে গীত হইয়া থাকে। সংক্রান্তি-দিনে, শেষ-পূজা, সাপখেলা, নৌকাবাইচাদি ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষ্ণজয়ন্তী ঃ দ্বাপরযুগপাবন শ্রীকৃষ্ণ রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতিথিতে জয়ন্তীযোগে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া এই পুণ্যদিনটি কৃষ্ণজয়ন্তী নামে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সারা ভারত জুড়িয়া এই কৃষ্ণজয়ন্তী ব্রতোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া স্বধর্মরক্ষণ, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনরূপ মনুষ্যত্বের মহান আদর্শ নরনারীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করে। মহান আদর্শই মানবজীবনের ভিত্তি, কারণ 'স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে'—আদর্শ মহাপুরুষের আচরণই সর্বসাধারণের অনুকরণীয়! তাই আমাদের জাতীয় আদর্শ ছিল এই পুরুষোত্তমের জীবন! জানি না, সর্বদুঃখহারী কবে দেশবাসীর চৈতন্য জাগাইয়া জাতিকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিবেন!

পূর্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রদৃষ্ট সিংহরাশিতে সূর্যের অবস্থানে বাংলা পঞ্চম মাস ভাদ্র বর্ষাঋতু অন্তে শরৎ সূচনা করিয়া কালচক্রে প্রকটিত হয়। এই মাসে অঘোর-চতুর্দশী, দূর্বাষ্টমী, তালনবমী, অনন্তচতুর্দশী, বিশ্বকর্মা-পূজা, অরন্ধনব্রতাদি অনুষ্ঠিত হয়।

অঘোর-চতুর্দশী ঃ ঘোর নরকবাস হইতে পরিত্রাণের কামনায় এই দিনে শিবের আরাধনা করা হয়।

দূর্বাষ্টমী ঃ বলিষ্ঠ দীর্ঘজীবী সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষায় সাধ্বী রমণীরা অষ্টগ্রন্থিযুক্ত দূর্বা বাম-বাহুতে ধারণকরত অক্ষয়া দূর্বারূপা বিশ্বমাতৃকার আরাধনা শুক্লাষ্টমীতে করেন।

তালনবমী ঃ শুক্লানবমীতে সুখ সৌভাগ্য ও আরোগ্য প্রার্থনা করিয়া তালের পিষ্টকাদি নিবেদনে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করা হয়।

অনন্তচতুর্দশী ঃ এই দিনে নরনারী সর্বপাপ ও ক্লেশনাশক এবং সকল-বাসনাপূরক মহাবিষ্ণু অনন্তদেবকে আরাধনা করিয়া প্রার্থনা করেন ঃ

অনন্তভবসাগরে মোরা নিমজ্জিত,
অনন্ত! করুণাদানে কর সমুত্থিত।

বিশ্বকর্মাপূজা ঃ

ভাদ্র-সংক্রান্তিতে সূর্য কন্যা-রাশিসনে,
সম্মিলিত হন সুখে যেই শুভদিনে—
সর্বকর্মে ধর্মঘট রন্ধন-বর্জন,
কর্মব্যস্ত ধরা মাঝে শান্তির আসন,
সেদিন করম হতে বিশ্রাম তোমার,
ভক্ত কাছে পেতে চাও পূজা-উপহার!

প্রার্থনা শুধু তাই এই শুভদিনে,
খাটিয়া শ্রমের অন্ন পায় যেন দীনে।

এই বিশ্বকর্মাকে কর্মপুরুষও বলা হয় শিল্প-রচনার বিবিধ নৈপুণ্যপূর্ণ বহু দেবদেবীর সবাহন মূর্তি গড়িয়া ব্রতধারিণী মায়েরা কর্মপুরুষ বা চলিত কথায় বুড়াই-বুড়ি পূজা সন্ধ্যাকালে সমাপন করেন।

অশ্বিনী-নক্ষত্রদৃষ্ট কন্যারাশিতে সূর্যের অবস্থিতিকালে বাংলা ষষ্ঠ মাস আশ্বিন শারদোৎসবের পসরা লইয়া বর্ষচক্রে উপস্থিত হইলে দুর্গাষষ্ঠী, বীরাষ্টমী, কোজাগরী, জিতাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠান হইয়া থাকে।

দুর্গাষষ্ঠী ঃ সন্তানের মঙ্গলার্থে ষষ্ঠ্যধিষ্ঠাত্রী দুর্গার আরাধনা অতীব ভক্তিসহকারে করা হয়।

বীরাষ্টমী ঃ দীর্ঘজীবী বলিষ্ঠ বীর পুত্রলাভের কামনায় ধর্মপ্রাণা মায়েরা মহাশক্তিময়ী সমরাধিষ্ঠাত্রীর আরাধনা করেন শুক্লা মহাষ্টমীতে।

কোজাগরী ঃ শারদীয়া পূর্ণিমায় কোন কোন ভক্ত ও ভক্তিমতী মহাসৌভাগ্যলাভের জন্য মোহনিদ্রামুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ জাগ্রদবস্থায় দেবীর আরাধনায় নিরত আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া বরদানেচ্ছু স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহার পেচক-বাহিত রথে সারা বিশ্বে ঘুরিতে থাকেন ; তাই ঐ নিশায় তাঁহার বিশেষ পূজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

জিতাষ্টমী ঃ মরণজয়ী সুসন্তানলাভের আশায় সাধ্বী রমণীরা এই ব্রত অনুষ্ঠান করেন।

কৃত্তিকা-নক্ষত্রদৃষ্ট তুলারাশিতে সূর্যের অবস্থানকালে বাংলা সপ্তম মাস কার্ত্তিক হৈমন্তিক আবহাওয়া লইয়া বর্ষচক্রে উপনীত হয়। এই মাসে যমপুকুর-ব্রত, ভাইফোঁটা-ব্রত, কার্ত্তিকেয়-ব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

যমপুকুর-ব্রত ঃ মা-বাপ, ভাইবোন, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, পাড়াপড়শির মঙ্গলার্থে অনুষ্ঠিত হয়।

ভাইফোঁটা ঃ দীপান্বিতার পর শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভাইয়ের মঙ্গলার্থে যম-যমুনার পূজা করিয়া ভাইদের কপালে ফোঁটা দিবার কালে ছড়া বলা হয়—

ভাইয়ের কপালে দিয়ে ফোঁটা,
যম-দুয়ারে দিলাম কাঁটা।
ভাই না যেও যমের ঘর,
চিরকাল থাক সুখে ধরার উপর।

কার্ত্তিকেয়-ব্রত ঃ মাসের শেষদিনে সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ও বীরপুত্রলাভের আশায় পুত্রদানে অধিকারী স্কন্দদেবের ব্রতোৎসব সায়ংকালে আরম্ভ করিয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

মৃগশিরা-নক্ষত্রদৃষ্ট বৃশ্চিক-রাশিতে সূর্যসংক্রমণকালে বাংলা অষ্টম মাস অগ্রহায়ণ হিম বহন করিয়া কালচক্রে প্রকটিত হয়। এই মাসে ক্ষেত্রব্রত, নবান্ন-ব্রত, মিত্রসপ্তমী, ইতুপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষেত্রব্রত ঃ শস্য-সঞ্চয়, দারিদ্র্য-মোচন ও অক্ষয় সৌভাগ্যলাভের কামনায় ক্ষেত্রব্রত অনুষ্ঠিত হয়।

নবান্নব্রত ঃ লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা করিয়া এবং নবান্ন শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া বন্ধু-বান্ধবাদি সহ নবান্নের পায়স-পিষ্টকাদি ভোজন খুব ধুমধামের সঙ্গে হইয়া থাকে।

ইতুপূজা ঃ সারা মাস জুড়িয়া ইতু বা মিত্র অর্থাৎ সূর্যের উপাসনা করা হয়। এবং বিশেষ করিয়া শুক্লা সপ্তমী দিনে স্বাস্থ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত হয়। ইতু-পূজারিণীরা ইতুর পাত্রে জল ঢালিয়া বরলাভের ছড়া গাহিয়া থাকেন—

তৃণ লতা শস্যাঙ্কুরে অর্ঘ্য জল দিয়ে,
ইতুর চরণ পূজি ভকতি করিয়ে।
তুষ্ট ইতু দেখা দিয়ে দেন বর সবে,
ধন-ধান্যে সুখ-স্বাস্থ্যে নিত্য পূর্ণ রবে।

পুষ্যা-নক্ষত্রদৃষ্ট ধনুরাশিতে সূর্য সংক্রমিত হইলে বাংলা নবম মাস পৌষ শীত-ঋতু সঙ্গে করিয়া কালচক্রে প্রকটিত হয়। এই মাসে তুষলী-ব্রত, পৌষপার্বণ, দধি-সংক্রান্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

তুষলীব্রত ঃ মেয়েরা সারা মাস এই ব্রত করিয়া সংক্রান্তি-দিনে ডালি ভাসায় বা বিসর্জন দেয়। ব্রতের প্রার্থনা ছড়া অনেক রকমের, মূল হইতেছে এইটি—

গৌরী গো মা তুষলী! তোমার কাছে মাগি বর,
স্বামী-পুত্র নিয়ে যেন সুখ-শান্তিতে করি ঘর।

পৌষপার্বণ ঃ বিবিধ পিষ্টক-পায়সাদি নিবেদনে লক্ষ্মীনারায়ণের অর্চনান্তে ভক্ত ও ভক্তিমতীদের তৃপ্তিসহকারে ভোজন করানো হইয়া থাকে। ছেলেমেয়েদের লইয়া খুব আনন্দ ও ঘটা করিয়া এই পর্ব উদযাপিত হয়।

দধি-সংক্রান্তি ঃ উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি দিনে বিষ্ণুকে দধিস্নান করাইয়া পায়স, পিষ্টক, দৈ, মিষ্টি প্রচুর নিবেদনকরত বৈধব্য ও সন্তাপ মোচন-কামনায় প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠান করার সঙ্কল্প লইয়া সাধ্বী রমণীরা ব্রত গ্রহণ করেন। এই সংক্রান্তি-দিনে গঙ্গাসাগরে স্নান, ত্রিবেণীস্নান বা শুধু গঙ্গাতেই অবগাহন এক মহাপুণ্য কৃত্য; ইহা ছাড়া গঙ্গা সাক্ষী রাখিয়া পুরুষেরা মিতালি এবং মেয়েরা গঙ্গাসই বা মকর পাতেন।

মঘা-নক্ষত্রদৃষ্ট মকররাশিতে সূর্যাবস্থানে বাংলা দশম মাস মাঘ দারুণ শীত বহন করিয়া বর্ষচক্রে প্রকটিত হইলে মাঘব্রত, সূর্যব্রত, শ্রীপঞ্চমীব্রত, বাঘের ব্রত, সঙ্কটাচতুর্থী ব্রতাদি অনুষ্ঠান হয়।

মাঘব্রত ঃ কুমারী মেয়েরা প্রত্যুষে স্নানান্তে চন্দ্রসূর্যের পূজা করিয়া নিত্য প্রার্থনা করেন ঃ

মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল
বাপ রাজা ভাই প্রজা।
মা পাটেশ্বরী আপনি বিদ্যাধরী,
থালে ভাত, ভৃঙ্গারে পানি
জন্মে জন্মে এয়োরানী।

সূর্যব্রত ঃ রবিবার উদয়াস্ত মুক্ত আকাশতলে মণ্ডলে দণ্ডায়মান থাকিয়া নির্জলা উপবাসে আরোগ্যদ সূর্যের আরাধনা নিজের বা প্রিয়জনদের রোগমুক্তি-কামনায় করা হয়। সূর্যাস্তকালে সারাদিন প্রজ্বালিত ঘৃত প্রদীপে অস্তগামী সূর্যকে আরতি করিয়া ব্রতধারিণীরা প্রার্থনা করেন—

কোথা যাও লালঠাকুর! কি না বর দিয়া?
ব্রতীরা সব চেয়ে আছি চরণে ধরিয়া।।

শ্রীপঞ্চমীব্রত ঃ সৌভাগ্য ও বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর আরাধনা শুক্লাপঞ্চমীতে ভক্তিভরে অনুষ্ঠিত হয়।

বাঘের ব্রত ঃ বাঘের ভয় হইতে গৃহপালিত পশু এবং নিজেদের রক্ষার দৃঢ় উৎসাহ লইয়া বাঘ মারিবার জন্য সাহস ও শক্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে ছেলের দল গোচারণ-মাঠে পায়স-পিষ্টকাদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া মহাশক্তিধরের উদ্দেশ্যে নিবেদন এবং বাঘমারার অভিনয় প্রদর্শন সঙ্গে সঙ্গে সকলে আনন্দে বনভোজন সমাপন করে। এই উৎসবের জন্য ছেলের দল রাত্রে বহু ছড়াগান গাহিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করে। একটি ছড়া যথা—

পিটুর পিটুর মেঘ পড়ে, কৈ যাও রে ভাই!
রাজার পুতে কৈয়া দিছে, বাঘ মারিতে যাই।

সঙ্কটাচতুর্থী ঃ কৃষ্ণাচতুর্থীতে সর্বসঙ্কট বিমুক্তি কামনায় সঙ্কটনাশিনী দুর্গার পূজা হয়।

পূর্বফল্গুনীর সম্মুখীন কুম্ভরাশিতে সূর্যাবস্থানে বাংলা একাদশ মাস ফাল্গুন বসন্তের আনন্দসম্ভার লইয়া কালচক্রে প্রকটিত হয়। এই মাসে শিবরাত্রিব্রত ও হোলি-উৎসব সারা ভারত জুড়িয়া অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্রানক্ষত্রদৃষ্ট মীনরাশিতে সূর্যবস্থানে বাংলা দ্বাদশ মাস চৈত্র বসন্তের পূর্ণানন্দ দান করিয়া বর্ষকে সম্পূর্ণ করিতে প্রকটিত হয়। এই মাসে অশোকষষ্ঠী, অশোকাষ্টমী, রামনবমী, সন্ন্যাসগ্রহণে শিবব্রত, হাড়বিষু, মহাবিষু ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

অশোক-ষষ্ঠী ও অষ্টমী ঃ শুক্লাষষ্ঠী ও অষ্টমী দিনে অশোকাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে পূজার্চনা করিয়া শোকদুঃখ-মোচনার্থ অশোকফুলসহ জলপান করা হয়।

রামনবমী ঃ ত্রেতাযুগপাবন রামচন্দ্রের মহৎ-চরিত্রকে মানবজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গ্রহণের অনুধ্যানে তাঁহার পুণ্য জন্মদিনে পূজা-উৎসবের ধুম ভারতময় হইয়া থাকে।

শিবব্রত ঃ সাময়িক সন্ন্যাসগ্রহণে ত্যাগ ধর্মের বৈশিষ্ট্য অনুভবকরত মহাত্যাগী দেবের দেব মহাদেবের আরাধনা, শিবের গাজন, চড়কপূজা ও বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা উদযাপিত হয়।

হাড়বিষু ও মহাবিষু ঃ চৈত্রসংক্রান্তির আগের দিনকে হাড়বিষু বলা হয়। ঐদিন নীলকণ্ঠ শিবের কৃচ্ছ্রসাধ্য উপাসনা অতীব ভক্তির সহিত করা হয়। মহাবিষুর সংক্রান্তি দিনে ভোজ্য, ছাতু, ফল, মিষ্টদ্রব্যাদিসহ জলপূর্ণ ঘট ও ব্যজন (তালপাতার পাখা) দান এবং হরি-হরের পূজা সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়া দেবাশিষ-গ্রাহী ধর্মিষ্ঠ পুণ্যময় জীবনের বর্ষশেষ দিনটি সম্পূর্ণ হয়।* □

পাদটীকা

১, ২, ৩ অপ্রচলিত অন্যরূপ ছড়াও আছে, বাহুল্য-ভয়ে দেওয়া হইল না।

৪ রথ-দ্বিতীয়ার কোন ছড়া নাই। ব্রতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রকাশার্থ তন্ত্রোক্ত সংস্কৃত মূল শ্লোকের পদ্যানুবাদ উল্লিখিত হইল।

* ৬৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা

কিংবদন্তীর কলকাতা

সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার কথা লিখতে গেলে সপ্তগ্রামের কথা এসে পড়ে। সপ্তগ্রাম ছিল সেকালের একটি বিশিষ্ট বন্দর। দেশ-বিদেশের অর্ণবপোত সরস্বতী নদীর তীরে এই সপ্তগ্রাম বন্দরে এসে ভিড়ত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে সরস্বতী নদীতে এমন চড়া পড়তে শুরু করল যে, সপ্তগ্রাম ক্রমে হারিয়ে ফেলল তার নাব্যতা। সেখানকার সম্পন্ন বস্ত্র-ব্যবসায়ী শেঠ ও বসাকরা তাই সপ্তগ্রাম ছেড়ে চলে এলেন আরো দক্ষিণে গঙ্গাতীরের একটি গ্রাম সুতানুটিতে। এ-ঘটনা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে। 'সুতা নুটি' অর্থাৎ সুতার গোছা—ইংরেজদের ভাষায় 'ইন্ডিয়ান কটন'—সেকালে তার খুব চাহিদা। সম্ভবত এ-থেকেই সুতানুটি নামটি হয়েছে। গঙ্গাতীরবর্তী কাছাকাছি আরেকটি গ্রাম গোবিন্দপুর।[১] সপ্তগ্রামের বস্ত্র-ব্যবসায়ী মুকুন্দরাম শেঠ তার চারজন সঙ্গিসহ এই গ্রামে এসেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমেই। কথিত আছে, তাঁর গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নামানুসারেই নাকি মুকুন্দরাম গোবিন্দপুরের নামকরণ করেছিলেন। তারপর ইংরেজরা সুতানুটি ও গোবিন্দপুর থেকেই কিনতে লাগল ইন্ডিয়ান কটন। তার বহুদিন পর জব চার্নক এলেন সুতানুটিতে—১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট। ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নবাবের কাছ থেকে কিনে নিলেন সন্নিহিত তিনখানি গ্রাম—সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা। আরো পরে এই তিনখানি গ্রাম মিলে গড়ে উঠল নগর কলকাতা।

তাহলে কলকাতা কতদিনের পুরনো শহর? প্রধানত ইংরেজ ঐতিহাসিকরা আমাদের জানিয়েছেন, ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট কলকাতার জন্ম। অর্থাৎ কলকাতার বয়স তিনশো বছর। সময়ের বিচারে তিনশো বছর খুব কম নয়। এর মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বহু পরিবর্তন ঘটেছে; ভল্গা-গঙ্গা-শ্যেনের জল একত্রে মিশেছে। একদা সমগ্র ভারতবর্ষের, এখন ভারতবর্ষের এক অঙ্গরাজ্যের রাজধানী এই শহরের বহিরঙ্গে এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নানা বদল ঘটেছে সময়ের সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই। বহু কর্মকাণ্ডের সাক্ষী, নানা ভাষা-ধর্ম-বর্ণের আশ্রয় কলকাতাকে কেন্দ্র করে তাই বিচিত্র কিংবদন্তীর প্রচলন থাকা খুবই স্বাভাবিক।

বাংলার প্রাচীন সাহিত্য পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্য প্রধানত কিংবদন্তী-আশ্রয়ী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসা বিজয়' এবং ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে যথাক্রমে চাঁদসদাগর এবং ধনপতি সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় কলকাতা এবং কালীঘাটের উল্লেখ আছে। দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যে কলকাতার এই উল্লেখ নিঃসন্দেহে কলকাতা সম্পর্কে একটি কিংবদন্তীর বাতাবরণ এনে দিয়েছে।

কলকাতার নামকরণ নিয়েই কত কিংবদন্তী। কোন এক ওলন্দাজ ভ্রমণকারী নাকি এখানে বহু মড়ার মাথার খুলি দেখতে পান। তাই জায়গাটিকে তিনি 'গলগাটা' Galgata (অর্থাৎ Galgatha বা শ্মশানভূমি) বলে উল্লেখ করেন। সেই 'গলগাটা'-ই নাকি বিবর্তিত হয়ে পরে 'কলকাতা'য় রূপান্তরিত হয়েছে। আরেকটি কিংবদন্তী কলকাতার ইংরেজী নাম 'ক্যালকাটা'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এক ঘেসুড়ে গঙ্গাতীরে ঘাস কেটে আঁটি বেঁধে রেখেছিল। একজন ইংরেজ নাবিক জাহাজ থেকে নেমেই তার ছড়িটি ঐ ঘাসের আঁটির ওপর ঠেকিয়ে ঘেসুড়েকে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ "এই স্থানের নাম কি?" ঘেসুড়ে ইংরেজ নাবিকের কথা বুঝতে না পেরে উত্তর দিয়েছিল 'কাল কাটা'। ঘেসুড়ে ভেবেছিল সাহেব ঘাস কবে কাটা হয়েছে তা-ই জানতে চেয়েছে; তাই সে বলেছিল (গত) কাল কাটা হয়েছে। সাহেব বুঝলে, ঘেসুড়ে তাকে জায়গাটির নাম 'কাল কাটা' বলেছে। সেই 'কাল কাটা' থেকে 'ক্যালকাটা' বা 'কলকাতা' কথাটি এসেছে বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন। আবার কলিচুন ও কাতাদড়ির আড়ত থাকার জন্য 'কলি' ও 'কাতা' যুক্ত হয়ে 'কলিকাতা' নামটি এসেছে—এও শোনা যায়।

কলকাতার কাহিনী বলতে গেলে প্রথমে কালীঘাটের কথাই বলতে হয়। কারণ, অনেক পণ্ডিতের মতে 'কালীঘাট' থেকেই 'কালীঘাটা' এবং তার অপভ্রংশ হিসাবে 'কলিকাতা' নামের প্রচলন হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, কালীর মন্দিরের জন্য লোকে স্থানটিকে বলত, 'কালীকোটা' যার অপভ্রংশ হলো 'কলিকাতা' বা কলকাতা। আবার এই কালীঘাটকে নিয়েও নানা কিংবদন্তী ও গল্প-কাহিনী প্রচলিত। তারমধ্যে দু-একটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভবানীদাস চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণ বৃত্তিতে শাঁখারি ছিলেন। একদিন তিনি গঙ্গাতীর দিয়ে শাঁখা বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন। এক সধবা ব্রাহ্মণী শাঁখা পরতে চাইলে ভবানীদাস তাঁকে কালীঘাটের বর্তমান কালীকুণ্ডের তীরে শাঁখা পরিয়ে শাঁখার মূল্য চাইলেন। ব্রাহ্মণী 'স্নান করে আসি' বলে ঐ কুণ্ডে নামলেন। বহুক্ষণ পরেও ব্রাহ্মণী না আসায় ভবানীদাস ভাবলেন যে, ব্রাহ্মণী বোধহয় জলমগ্ন হয়েছেন। তিনি ব্রাহ্মণীকে উদ্ধার করার জন্য কুণ্ডে নামতে যাচ্ছেন, এমন সময় জলের ভিতর থেকে ব্রাহ্মণী শুধু তাঁর হাতটি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তুলে ধরলেন। সেইসময় দৈববাণী হলো—"আমি কালী, এই হ্রদতীরে তুমি আমার পূজার প্রচার কর। তুমি গৃহে ফিরে যাও, সেখানে অমুক স্থানে একটি কৌটার মধ্যে আমি আছি।" ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরে কথিত স্থানে একটি কৌটা দেখতে পেলেন। সেটি খোলামাত্র সূর্যের মতো জ্যোতি ঝলসে উঠল। অতঃপর তিনি দেখলেন, কৌটার মধ্যে একটি পদাঙ্গুলি রয়েছে। এটি আসলে সতীর দক্ষিণ চরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলি। পদাঙ্গুলিটি মস্তকে ধারণ করে ভবানীদাস বর্তমান কুণ্ডতীরে এসে দেবীর মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হন। সেই থেকে কালীঘাটে দেবীর পূজার সূচনা। কেউ কেউ মনে করেন ভবানীদাস চক্রবর্তীর নামানুসারেই ভবানীপুরের নাম হয়ে থাকবে। ভবানীদাসকে কেন্দ্র করে কালীঘাটের কালীর পূজা-প্রচার সংক্রান্ত কিংবদন্তীটি 'কালীক্ষেত্রদীপিকা'য়

পাওয়া যায়। কালীর সেবাইতদের উপাধি হালদার। তাঁদের আদিপুরুষ ভবানীদাস। কথিত আছে, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নবাব আলিবর্দী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রসহ কালীঘাটে আসেন এবং মন্দিরের সেবাইতদের দেবোত্তর দান ও হালদার উপাধিতে ভূষিত করেন। অবশ্য এসম্পর্কে ভিন্নমতও আছে। একমতে বড়িশার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের আদিপুরুষ কেশব রায়চৌধুরীর পুত্র সন্তোষ রায়চৌধুরী, অন্যমতে যশোরের রাজা বসন্ত রায় কালীঘাটের কালীর পূজা ও প্রচারের সঙ্গে সংযুক্ত এবং দেবোত্তর দান ও হালদারদের নিয়োগ করেছেন। মনে হয়, বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী-পরিবার সম্পর্কিত মতটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

জনশ্রুতিতে আরো আছে যে, পোস্তার দক্ষিণে যে জায়গাকে 'পুরাতন পোস্তা' বলে সেখানে একটি কালীর মন্দির ছিল এবং সেইটিই নাকি কালীঘাটের আসল কালী। পরবর্তী কালে কোন এক সময়ে সেই মন্দির ভেঙে সবকিছু চাপা পড়ে যায়। ওখানেই হাট বসত বলে কালীঘাটের নাম লুপ্ত হয়ে স্থানটি 'পোস্তার হাট' বলে পরিচিত হয়। বহুকাল পরে একদল কাপালিক-সন্ন্যাসী গঙ্গাসাগরে যাবার পথে ঐ মন্দিরের ভগ্নস্তূপের ভিতর থেকে চারটি ছিদ্র সংযুক্ত ত্রিকোণাকৃতি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরখণ্ডে দেবীর মুখমণ্ডল পান। ঐটি কালীঘাটের কালী বলে তাঁরা চিনতে পারেন। তখন চৌরঙ্গী ছিল গভীর জঙ্গল। চৌরঙ্গী থেকে আদিগঙ্গার ধার পর্যন্ত বিস্তৃত জঙ্গলে কাপালিকেরা কুটির নির্মাণ করে তন্ত্রমতে কালীর উপাসনা করতে থাকেন। পরে সেইটি সর্বজন সমক্ষে কালীঘাটের কালী বলে পরিচিত হয়। এছাড়াও এই প্রসঙ্গে আরো একটি কিংবদন্তী আছে। সেটি হচ্ছে এই ঃ নরবলির উপকরণ না পাওয়ার জন্য কাপালিকেরা পাথরে খোদিত দেবীর মুখমণ্ডল চৌরঙ্গীর জঙ্গলের মধ্যে পুঁতে দিয়ে চলে যান। এদিকে জঙ্গলের ভিতর থাকতেন এক সন্ন্যাসী। তাঁর নাম ছিল চৌরঙ্গী গিরি। কেউ বলেন, তিনি শৈব, কেউ বলেন তান্ত্রিক। হঠাৎ একদিন তিনি অভূতপূর্ব একটি দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন জঙ্গলের ভিতর একটি গরু দাঁড়িয়ে। সেই দুগ্ধবতী গরু একটি জায়গায় বারবার দুধ দিচ্ছে। এই অভাবিত দৃশ্য দেখে সন্ন্যাসী বড় কৌতূহলী হলেন। দুধসিক্ত সেই জায়গাটি খুঁড়ে ফেললেন তিনি। তারপর মাটির তলা থেকে আবিষ্কার করলেন কাপালিকদের লুকিয়ে রাখা মায়ের সেই মুখমণ্ডল। মাকে পেয়ে সন্ন্যাসী চৌরঙ্গী নতুন করে পূজা আরম্ভ করে দিলেন। পরে তিনি যখন গঙ্গাসাগরে চলে যান, তখন তাঁর শিষ্য জঙ্গল গিরির ওপর মায়ের পূজার ভার দিয়ে যান। চৌরঙ্গী গিরির নামানুসারেই বর্তমান চৌরঙ্গী অঞ্চলের নাম হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। জঙ্গল গিরির কাছ থেকেই কেশব রায়চৌধুরী বা সন্তোষ রায়চৌধুরী মাকে জনসমাজে নিয়ে এসে পরিচিত করে দেন। বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার শ্যামরায়ের পুজো যেমন জাঁকজমক করে সম্পন্ন করতেন, সেইরকম জাঁকজমকেই শ্যামামায়ের আরাধনাও তাঁরা শুরু করলেন। (শ্যামরায়ের দোল উৎসবে দীঘির জল লাল হয়ে উঠত বলে, তার নাম হয়েছিল 'লালদীঘি'।) পাঁঠার মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে রসিক কবি ঈশ্বরগুপ্তের মনে পড়ে গিয়েছিল কালীঘাটের হালদারদের কথা ঃ

প্রতি কোপে যত পাঁঠা বলিদান করে।
দেবী বরে জন্মে তারা হালদারের ঘরে।।
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়।
কলির দেবল হয়ে কালীগুণ গায়।।

এছাড়াও আছে পুরনো কলকাতার চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী সম্পর্কে কিংবদন্তী। বাগবাজারের গঙ্গার ধারে কে বা কারা কোন্ সময়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সঠিক বিবরণ নেই। শোনা যায়, চিতে ডাকাতের দল সাড়ম্বরে মায়ের পুজো করত। চারিদিক ছিল গভীর জঙ্গল, খাল-খোঁদালে ভরা। নদীতে জোয়ার এলে এক প্রহর বেলা থাকতে অন্ধকারের ছায়া নামত মায়ের মন্দির ঘিরে। চিতে ডাকাতের দল মশাল জ্বালিয়ে মায়ের সামনে নরবলি দিত। তারপর নররক্তে কপাল রাঙিয়ে তারা বের হতো ডাকাতি করতে। নিশুতি রাতে তাদের উল্লাসে অঞ্চলটি উঠত কেঁপে কেঁপে।

কলকাতার উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয় দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের বৃহৎ ব-দ্বীপ অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আজকের কলকাতার। সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত বহু ঝড়, বন্যায় বিধ্বস্ত, জঙ্গলাবৃত একদা পরিত্যক্ত যে-ভূখণ্ড পরবর্তী কালে 'কল্লোলিনী কলকাতা'তে রূপান্তরিত, তার সম্পর্কে লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানস্বরূপ নানা গল্প-কাহিনী-জনশ্রুতি কিংবদন্তী যে প্রচলিত থাকবে এবিষয়ে আর আশ্চর্য কি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কলিকাতা-পরিচয়' কবিতায় যে-কলকাতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় তিনি করিয়েছেন সে-কলকাতা নিতান্তভাবে কিংবদন্তীরই কলকাতা।

এই কলিকাতা-কালিকা-ক্ষেত্র,
কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
বিষ্ণুচক্র ঘুরেছে হেথায়,
মহেশের পদধূলে এ পূত।
ধাত্রী ইহার ভাগীরথী-ধারা,
সতী-পঞ্জর বুকে এ বহে,
পুরাণ-স্মৃতির জড়োয়া জড়িত,
এ ঠাঁই কখনো হেলার নহে।* □

পাদটীকা

১ এই মতটি গৌরদাস বসাকের। ষোড়শ শতাব্দীর ভূগোলবেত্তা কবিরাম তাঁর 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে লিখেছেন : "গোবিন্দ দত্ত (গোবিন্দশরণ দত্ত) নামক এক রাজা গঙ্গাসাগর তীর্থ থেকে যাবার পথে রাত্রে কালীর একটি স্বপ্নাদেশ পান। স্বপ্নে কালী তাঁহাকে বলেন, গঙ্গার পূর্বতীরে 'বাদররসা' নামক চরের তৃণগুল্মাদি পরিষ্কার করে একটি গ্রাম স্থাপন করে সেখানে বসবাস করতে। দেবীর সেই স্বপ্নাদেশ অনুসারে গোবিন্দ দত্ত গৃহাদি নির্মাণ করেন এবং ব্রাহ্মণাদি জাতিকে সেই গ্রামে বাসের জন্য আমন্ত্রণ জানান। নিজের নাম অনুসারে তিনি গ্রামের নাম দেন গোবিন্দপুর। গোবিন্দ দত্তের আদি নিবাস সপ্তগ্রাম, গোবিন্দপুরে আসার আগে চান্দোলে বা পারীন্দ্র গ্রামে, বর্তমান আন্দুলে তিনি বাস করছিলেন। অপর একটি মতে, গোবিন্দরাম মিত্র নামে একজন বঙ্গসন্তান পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করে জব চার্নকের সঙ্গে এখানে বাস করেন। তিনি নিজের নাম অনুসারে গ্রামের নাম রাখেন গোবিন্দপুর।

* ৯১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা

বিজ্ঞান, ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির পটভূমিতে শুশুনিয়া পাহাড়

শান্তি সিংহ

শুশুনিয়া পাহাড়ের চারপাশে দূর অতীতে যে মানবগোষ্ঠী বাস করত তাদের প্রাচীনত্ব আমাদের জানা পৃথিবীর প্রাচীনতম জনগোষ্ঠীর সমসাময়িক অথবা তাদের চেয়েও দূরবর্তী। এই শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে লোকসংস্কৃতির অমূল্য সব নিদর্শন। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার সূত্রে খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক ডঃ শান্তি সিংহ তাঁর বর্তমান নিবন্ধে শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন।—সম্পাদক

বাঁকুড়া শহর থেকে পুরুলিয়া আসার সময় এক্সপ্রেস বাস আঁচুড়ি-শালবনি, গৌরীপুর কুষ্ঠাশ্রম ছাড়িয়ে প্রথম থামে ছাতনায়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ছোট্ট স্টেশনও আছে ছাতনার গ্রামপ্রান্তে। ছাতনায় জন্মগ্রহণ করেন মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। এখনো সংস্কৃতিপ্রিয় নরনারীর হৃদয়ে বাশুলিদেবীর মন্দির, বড়ু চণ্ডীদাসের ভিটে, রামী ধোবানীর ঘাট, শাঁখাপুকুর স্মৃতির প্রদীপ জ্বালে। প্রতি বছর মহাসমারোহে এখানে হয় চণ্ডীদাস-মেলা।

ছাতনাবাজার ছাড়িয়ে ডানদিকে বেঁকে গেছে শুশুনিয়ার পথ। কয়েক মাইল গেলেই শুশুনিয়া। গোয়ালডাঙা, শিউলিবনা, হাপানিয়া, বনশোল, পাহাড়বেদ্যা প্রভৃতি গ্রাম আছে পাশাপাশি। ১৪৪২ ফুট উঁচু শুশুনিয়া পাহাড়। প্রাগৈতিহাসিক রহস্য-রোমাঞ্চের সাক্ষী। শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে পাওয়া গেছে 'পালাইয়োলোক্সোডন নমাডিকাস' (Palaioloxodon namadicus) গোষ্ঠীর হাতির জীবাশ্ম। গবেষকদের মতে ভারতবর্ষে মধ্যাশ্মর অস্ত্রাদিকে মোটামুটি খ্রীস্টপূর্ব ৫০,০০০ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ২৫,০০০ বছরের মধ্যে গণনা করা হয়। শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে আবিষ্কৃত জীবাশ্মগুলি তা থেকে প্রাচীনতর।

১৯৬৫ সালের নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ শুশুনিয়া অঞ্চলে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শুরু করে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকর্মের পরিচালনায় পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ক্ষেত্র-সমীক্ষা (Field work) শেষে তিনি মন্তব্য করেন : "এক সুদূর অতীতে শুশুনিয়া পাহাড়ের চারপাশের বলয়ভূমিতে এবং গন্ধেশ্বরী, ধনকোড়া, বাঁকাজোড়, হাড়োকা, আমাগোড়া ইত্যাদি স্রোতস্বতীর তীরে একদা বিরাজিত এই মানব-সংস্কৃতি প্রকৃতই এশিয়া ইউরোপ এবং আফ্রিকায় বিরাজিত প্লিস্টোসীন অথবা কোয়াটেরনারী যুগের বিভিন্ন সুপরিচিত প্রত্নাশ্মীয় জীবনধারার সঙ্গে তুলনীয়।"[১]

শুশুনিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নাশ্মর হাতিয়ারসমূহের আকৃতি ও নির্মাণশৈলী গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

(১) স্তর-পর্যায়ক্রমে অতি ধারালো হাত-কুঠার। এ ধরনের শল্কচ্ছেদ (Step flaking) অ্যাশিউলীয় কুঠারের বৈশিষ্ট্য।

(২) হরতনের আকারযুক্ত হাত-কুঠার (Cordate)।

(৩) ছেদক (Cleaver)।

(৪) বর্শা-ফলক ধরনের (Lanceolate) হাতিয়ার।

(৫) ডিমালো ধরনের হাতিয়ার (Ovate)।

(৬) খাঁজযুক্ত হাতকুঠার (Rostro-carinate)।

(৭) ডিমালো তীক্ষ্ণ আয়ুধ (Pointed ovate)।

(৮) কর্তরী (Half ovate)।

(৯) পাতার মতন (Leaf shaped) হাতিয়ার।

(১০) গোলাকার ক্ষেপনাস্ত্র ইত্যাদি।

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বলেন ঃ "প্রস্তরযুগের আদি পর্যায়ে এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকায় একদা-প্রচলিত হাত-কুঠারের এক প্রধান কেন্দ্রস্থল যে ছিল শুশুনিয়া শৈলাঞ্চল ও গন্ধেশ্বরী নদী—আজ তা সপ্রমাণিত। অপরাপর দৃষ্টান্তের মধ্যে এখানকার সুচারু আকৃতিবিশিষ্ট আয়ুধগুলি আজ তুলনীয় সুদূর উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত সিদি জীন (Sidi Zin) এবং গ্রীস দেশে প্রসারিত পিনঢোস পাহাড়ের নিম্ন উপত্যকায় অবস্থিত পালাইয়োকাস্ট্রোনের (Palaiokastron) শৈলসমাবেশে আবিষ্কৃত একটি সুসামঞ্জস্য আকৃতির অ্যাশিউলীয় হাতকুঠারের সঙ্গে।"[২]

শুশুনিয়া পাহাড়ের মারাং ঢেরী গুহা সমুদ্রতল থেকে প্রায় হাজার ফুট ওপরে। এই গুহাটি একটি কক্ষের মতন। ভালুক গুহা সমুদ্রতল থেকে প্রায় পাঁচশ ফুট ওপরে। এই গুহাটির প্রবেশপথ সঙ্কীর্ণ হলেও এর অভ্যন্তর কক্ষের মতন। ভরতপুর গুহা সমুদ্রতল থেকে প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে। এই গুহা শুশুনিয়া পাহাড়ের পশ্চিমদিকে ভয়ঙ্কর খাড়াইয়ের গায়ে। গুহার প্রবেশমুখ খুবই সঙ্কীর্ণ। এই গুহার অভ্যন্তরেও আছে কক্ষ। তার মাঝে আলো কিছুটা ঢোকে।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গবেষক ডঃ অতুল সুর বলেন ঃ "বঙ্কগিরি ও শুশুনিয়া পাহাড় অভিন্ন। পূর্বকালে শুশুনিয়া পাহাড়ই বঙ্কগিরি নামে অভিহিত হতো।... এই বঙ্কগিরিতে শিবিরাজ বেস্‌সান্তর একটি আশ্রম স্থাপন করেন ও শিবিধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। এই আশ্রমের নাম হয় 'বেস্‌সান্তর আশ্রম'। পরবর্তী কালে এই আশ্রমে অরাধ মুনি বাস করতেন। গৌতম সিদ্ধার্থ মহানিষ্ক্রমণের পর বেস্‌সান্তর আশ্রমে এসে অরাধ মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও পাঁচ বছর সেখানে থেকে শিবিধর্ম আয়ত্ত করেন। পরবর্তী কালে তাঁর প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম এই শিবিধর্মের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। একথা গৌতম বুদ্ধ নিজ মুখেই বলে গেছেন। কপিলাবস্তুর শাক্যদের কাছে তিনি ঘোষণা করেন যে, পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্বরূপে তিনি শিবিরাজপুত্র বেস্‌সান্তর নামে জন্মগ্রহণ করে তাঁর অতিদানের দ্বারা দানপারমিতা পূর্ণ করেছিলেন।"[৩]

অন্যদিকে পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বলেন ঃ "ধোনশাখ জাতকের (ফাউসবল অনূদিত, জাতক নং ৩৫৩) কাহিনীর ওপর নির্ভর করে ডঃ হেমচন্দ্র

রায়চৌধুরী অনুমান করেছেন যে, খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে শুংশুমারগিরি একদা কৌশাম্বীর (বর্তমান এলাহাবাদের অদূরে অবস্থিত) বৎসগণের অধীনস্থ ছিল। এই জাতকে বর্ণিত আছে যে, উদয়নের পুত্র বোধি শুংশুমারগিরিতে নির্মিত কোকনদ প্রাসাদে বাস করতেন।"[৪] বলা বাহুল্য, সংস্কৃত 'শুংশুমার' (পালি-লিপিতে 'সুংসুমার') থেকে 'শুশুনিয়া' নাম আসা অসম্ভব নয়। লক্ষণীয়, দূর থেকে শুশুনিয়া পাহাড়কে 'শুংশুমার' অর্থাৎ শুশুকের মতনই অনেকের মনে হতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শুশুনিয়া পাহাড়ের তীর্থমাহাত্ম্য আজও আছে। প্রতি বছর চৈত্রমাসে বারুণী মেলা এখানে হয়। অসংখ্য পুণ্যার্থী বারুণী মেলায় আসেন ও পুণ্যস্নান করেন পাহাড়ের ধারাজলে (ঝরনা)। সেই ধারাজল পানও পুণ্যকর্মের অঙ্গ।

শুশুনিয়া পাহাড়ের দুর্গম প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে একটি সুপ্রাচীন শিলালিপি। লিপির হরফ খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের ব্রাহ্মী, অথচ তার ভাষা সংস্কৃত। রাঢ়-বঙ্গে সংস্কৃতচর্চার প্রাচীন শিলালিপি। প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিটি নিম্নরূপ ঃ

"পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিঙ্ঘবর্মণঃ পুত্রস্য
মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ চক্রস্বামিনঃ দোসগ্রেণাতিসৃষ্টঃ।"

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন ঃ "পণ্ডিতেরা 'দোসগ্রেণ' ভুল পাঠ মনে করিয়া সংশোধন করিয়াছেন 'দাসাগ্রেণ'। সেই অনুসারে অর্থ করা হয়, পুষ্করণার রাজা মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার কৃতি, চক্রস্বামীর অর্থাৎ বিষ্ণুর দাসমুখ্যের দ্বারা উৎসর্গীকৃত।"[৫]

শুশুনিয়া পাহাড় থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে পখন্না গ্রাম [পুষ্কর্ণা > পোখর্ণা > পোখন্না > পখন্না]। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন ঃ "বাঁকুড়ার নিকটবর্তী শুশুনিয়া নামক পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত একখানি লিপিতে পুষ্করণের অধিপতি সিংহবর্মার ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবর্মার উল্লেখ আছে। শুশুনিয়ার পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে দামোদর নদের দক্ষিণতটে পোখর্ণা নামে একটি গ্রাম আছে।... ইহাই সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মার প্রাচীন রাজধানী পুষ্করণের ধ্বংসাবশেষ।... ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় চন্দ্রবর্মকোট নামক একটি দুর্গ ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উল্লিখিত চন্দ্রবর্মার নাম অনুসারে এই দুর্গের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। এই মত অনুসারে চন্দ্রবর্মার রাজ্য বাঁকুড়া হইতে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে-সমুদয় রাজাকে পরাজিত করিয়া আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন, তাঁহাদের একজনের নাম চন্দ্রবর্মা। খুব সম্ভবত ইনিই পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মা এবং ইঁহাকে পরাজিত করিয়াই সমুদ্রগুপ্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা অধিকার করেন।"[৬]

পুষ্কর্ণাধিপতি চন্দ্রবর্মা চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন—"The Susunia inscription also furnishes the earliest record of Vishnu worship in Bengal. Chakraswamin (the wielder of the discus) is a well-known name of Vishnu and it is more than apparent that king Chandravarma, who

has been mentioned as a chief of the servants of Chakraswami, who is a worshipper of Vishnu."[৭] তাঁর সময় থেকেই বাঁকুড়া অঞ্চলে বিষ্ণুপূজার প্রচলন ছিল। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত দ্বারিকা গ্রামে ও দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী জয়পুর থানার বেশ কয়েকটি গ্রামে বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে গোকুলনগরের গোকুলচাঁদ-মন্দিরের সুঠাম, অনন্ত-বিষ্ণুমূর্তি উল্লেখযোগ্য। মহুলাড়া ডিহর, জয়কৃষ্ণপুর শলদা কিংবা ছান্দার পরিমণ্ডলের পাঁচাল, ময়নামুনি প্রভৃতি গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি প্রাচীনত্বের পরিচয় দেয়। 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থের লেখক মন্তব্য করেছেন ঃ "চন্দ্রবর্মার সময় থেকেই বিষ্ণুপূজার ক্ষেত্র বাঁকুড়া অঞ্চলে তৈরি হয়েই ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মী সেন-রাজাদের কালেও বিষ্ণুবন্দনা কিছুমাত্র ব্যাহত হয়নি। সেজন্য সেন রাজত্বকালে বা কাছাকাছি সময়ে ধরাপাট যে বিষ্ণু (বাসুদেব) উপাসনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল—এরকম অনুমান করাই সঙ্গত।"[৮]

সবিশেষ লক্ষণীয়, প্রাচীন ভারতে আর্যভাবনা-নির্ভর কৃষিভিত্তিক জীবনে পালনকর্তা বিষ্ণুর শক্তি হলেন লক্ষ্মী—তিনি শ্রীরূপা কৃষি-লক্ষ্মী। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের গবেষণাঋদ্ধ অভিমত ঃ "শ্রী বা লক্ষ্মীর উল্লেখ বা তাঁহার পূজার উল্লেখ প্রাচীনতম গ্রন্থাদিতে কিছু কিছু পাওয়া গেলেও মনে হয়, দেবী হিসাবে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার পূজার প্রচলন গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় হইয়াছিল। আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে। শ্রী বা লক্ষ্মী এবং তাঁহার পূজার প্রচলন প্রাচীন যেসকল উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, যদিও শক্তিরূপে বা পত্নীরূপে তিনি বিষ্ণুর সহিত যুক্ত, তবু এই বিষ্ণু-শক্তিরূপ বা বিষ্ণু-পত্নীরূপই তাঁহার মুখ্য পরিচয় নহে; তিনি শস্য, সৌন্দর্য, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আপন স্বতন্ত্র মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিতা।"[৯]

ইতিহাসের আলোয় জানা যায়, পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মা সমুদ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি ও দিল্লীর কুতুবমিনারের কাছে মেহরৌলি লৌহস্তম্ভে তাঁর নাম পাওয়া যায়। চন্দ্রবর্মার সময় বা তাঁর রাজত্বকালের পূর্বেও কৃষিজীবী মানুষ কমলা বর্ণের পাকা ধান মাঠ থেকে তোলার সময় লক্ষ্মীদেবীরই প্রতীক টুসুগান গাইত। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে কৃষিলক্ষ্মী টুসু-পূজার প্রাচীনত্বের ইঙ্গিত বহন করে শুশুনিয়া পাহাড়ে চন্দ্রবর্মা-শিলালিপির ঊর্ধ্বে উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্রটি। বিষ্ণুচক্রের কেন্দ্রে একটি দীপশিখার ব্যঞ্জনা, সেখান থেকে চক্রের পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত আটচল্লিশটি রেখা (spoke); বিষ্ণুচক্রের গায়ে শোভনভাবে অলঙ্কৃত ফুলের চোদ্দটি পাপড়ি এবং চোদ্দটি দীপশিখা। এ-প্রসঙ্গে রাঢ়-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ মানিকলাল সিংহ একদা বলেন ঃ "চন্দ্রবর্মা বিষ্ণুর উপাসক। চক্র বিষ্ণুর প্রতীক... এই বিষ্ণু পুষ্য—পৌষের রবি। এই পুষ্য বা বিষ্ণু চক্রাকার—চক্রাকারে তিনি পরিভ্রমণ করেন। তিনিই পৃথিবীপালক অগ্নি-তাপ-শিখার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই দেবতার কল্যাণময়ী বরদাত্রী শক্তি হইলেন লক্ষ্মী বা রাই। কৃষিজাত রবিশস্য ধান্য, সরিষা, গুঞ্জা, তিল, রমা কলাই। পৌষ মাসে খেতে সরিষা জন্মে—সরিষার নাম রাই। লক্ষ্মীর অপর নাম রাই। রমা কলাই এই মাসের উৎকৃষ্ট ফসল। পিঠে-পার্বণে রমার পুর অপরিহার্য। কলাইয়ের নাম রমা—লক্ষ্মীর একটি নাম রমা। সমস্ত

ঘিরিয়া পুষ্য বা বিষ্ণুর পূজা। তাঁহারই শক্তিরূপিণী লক্ষ্মীকে লইয়াই দক্ষিণরাঢ়ের তুষু পার্বণ। তুষুর আলোখেলা চন্দ্রবর্মার বিষ্ণুচক্র অনুযায়ী গঠিত। বৃত্তাকারে চৌদ্দটি দীপশিখা চতুর্দশ তিথির প্রতীক এবং কেন্দ্রের বৃহৎ দীপশিখাটি পূর্ণিমার দ্যোতক। যেদিন পুষ্যার আদিতে মকর-সংক্রান্তি হইয়াছিল সেদিন পূর্ণিমা। চক্রে তাহাই উৎকীর্ণ হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের নিকট আর্যাবর্তের অন্যান্য রাজগণের মতনই চন্দ্রবর্মাও পরাজিত হইয়াছিলেন। শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত লিপি এবং দক্ষিণ রাঢ়ের তুষু আজিও চন্দ্রবর্মার স্মৃতি বহন করিতেছে।''[১০]

এখনো শুশুনিয়া অঞ্চলে 'পাথুরিয়া' বা 'পাথর-কাটা' নামে পরিচিত খয়রা, বাগদি বা বাউরি সম্প্রদায়ের মানুষ ঐ অঞ্চল থেকে সহজে আহৃত পাথর কুঁদে বৃত্তাকার টুসুর আলোখেলা তৈরি করে। সেই আলোখেলার চতুর্দিকে চোদ্দটি দীপশিখা উৎকীর্ণ থাকে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদার জীবনমুখী সহজ সরল ভাবধারা সভ্যতার আলো না-পৌঁছানো এখানকার লোকায়ত জীবনেও ভালবাসার তরঙ্গ জাগিয়েছে। তাই তথাকথিত অন্ত্যজ বর্ণের লোকশিল্পীরা সহজ আন্তর প্রেরণায় অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদার ভাবরূপ পাথরের মাঝে শিল্পায়িত করেন। অথচ প্রত্যন্ত বাংলার দুর্গম পাহাড়িয়া অঞ্চলে নেই কোন রামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারের কেন্দ্র। নিরন্ন গ্রামীণ মানুষ দুমুঠো ভাতের জন্য যুগের তথাকথিত হাওয়ায় নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে সুযোগসন্ধানী হওয়ার চেষ্টা করেনি। অবহেলিত-নিরন্ন দুর্গম লোকজীবনে লোকশিল্পী, লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ গভীর প্রভাব প্রসঙ্গে মনে বারবার জাগে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের 'দীনের সঙ্গী' গানটি—

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নিচে, সব-হারাদের মাঝে।
*
অহঙ্কার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নিচে, সব-হারাদের মাঝে।"

লোকশিল্পীদের কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে যায়। তাই টুসুর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনায় আবার তত্ত্বে ফিরে আসি। টুসুপূজা ও পিঠেপরব সম্পর্কে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির অভিমত—"পৌষসংক্রান্তিতে পৌষালী পার্বণ বা পিঠাপরব। কত কষ্টের, কত যত্নের ধান্য গৃহাগত হইয়াছে। যে-ধান্য গৃহস্থকে সপরিবারে জীবিত রাখিবে, সে-ধান্য আসিলে তাহার আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হয়। লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহার পূজা চাই, তাঁহাকে গৃহে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। গৃহিণী ধানের মরাই-গোলা প্রভৃতি খড় দিয়া বাঁধেন, পেঁটরাও বাঁধেন। আর ছেলেরা বলিতে থাকে—'আওনি, বাওনি, চাওনি। তিনদিন পিঠা খাওনি।' লক্ষ্মীর আগমন ও বন্ধন হইয়াছে; তিনি গৃহে চিরদিন থাকুন, এখন এই প্রার্থনা (চাহনি)। যে-সে পিঠা নয়, পুলি-পিঠা।..."[১১]

শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্র সূর্যের প্রতীক হিসাবেও গণ্য হয়। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন ঃ "বিষ্ণু যে সূর্য, সেবিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। সূর্যই কালবিভাগ করেন, বর্ষ পূর্ণ করেন। ঋগ্বেদে সেকথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে—

'চতুর্ভি সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্বভির্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্।।'

—বিষ্ণু গতিবিশেষ দ্বারা বিবিধ স্বভাববিশিষ্ট চতুর্নবতি (কালাবয়বকে) চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট ও স্তুতির দ্বারা পরিমেয়, তিনি নিত্যতরুণ ও অকুমার, তিনি আহবে গমন করেন।"[১২]

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' গ্রন্থেও 'চতুর্নবতি' কালচক্রের কথা আছে ঃ "কালচক্র ৯০ + ৯০ + ৯০ + ৯০ দিবসে বিভক্ত। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এই অয়ন ও দুই বিষুব দ্বারা কালচক্র বিভক্ত।"[১৩]

এদেশীয় মতে, সূর্যের উত্তরদিকে গতি উত্তরায়ণের শুরু ৭ পৌষ (ইংরেজী ২২ বা ২৩ ডিসেম্বর)। কিন্তু রাজা চন্দ্রবর্মার আমলে একটি বিশেষ বছরে পৌষসংক্রান্তির দিন সূর্যের সংক্রমণ ঘটেছিল। এপ্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ-অভিমত— "পৌষ-সংক্রান্তি পৌষমাসের শেষ দিন। মকর বা মকরসংক্রান্তি, মকরক্রান্তিতে সূর্যের সংক্রমণ দিন। দুইটি পৃথক দিন একই দিনকে অবলম্বন করিয়াছে। মকরক্রান্তিতে সূর্যের সংক্রমণ হয় ২৩ ডিসেম্বর—তাহার পরদিন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ—বড়দিন আরম্ভ। পৌষসংক্রান্তি জানুয়ারি মাসের ১৪ হইয়াছে। দুই ক্রান্তির ব্যবধান ২৩ দিন। তুষুর ভেলা যেদিন দক্ষিণ রাঢ়ে প্রথম ভাসিয়াছিল সেদিন পৌষসংক্রান্তিতে মকরসংক্রান্তি হইয়াছিল।... সেই বৎসর ২৪১ শক ৩১৯ খ্রীস্টাব্দ। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম পাদ। দক্ষিণ রাঢ়ে তখন সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মার রাজত্বকাল।"[১৪]

এরূপ সৌর-ভাবনার উৎসে আছেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ "ষোল শত বৎসর পূর্বে পৌষসংক্রান্তির দিন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত।... সূর্যের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। সূর্যের প্রকাশকালে নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।... নক্ষত্র স্থির। যেটা যেখানে আছে, সেটা সেখানেই আছে। এই কারণে মাস ও বর্ষচক্রের এক-এক নির্দিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু অয়নাদি বিন্দু স্থির নাই, অল্পে অল্পে পশ্চাদ্‌দিকে সরিয়া যাইতেছে। ফলে মনে হয়, মাস অগ্রগত হইতেছে। অয়নের সহিত ঋতু পিছাইতেছে, কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসরে একমাস পিছাইতেছে। ইউরোপের মাস অয়নের সহিত বাঁধা, ঋতুও বাঁধা। ২২ ডিসেম্বর উত্তরায়ণ আরম্ভ চিরদিন হইতেছে। কিন্তু আমাদের পাঁজিতে ৩১৯ খ্রীস্টাব্দে পৌষসংক্রান্তি হইত, এখন ৭ পৌষ হইতেছে।"[১৫]

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষ কৃষিকর্ম করছে। তাই শস্যোৎপাদনের সঙ্গে ব্রতভাবনা জড়িত—"ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা-বিপর্যয় ঘটত—সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষ বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে—এই হলো ব্রত; পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরনো, বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।"[১৬] কৃষিকর্মের সঙ্গে তাই উৎসবও জড়িত

থাকে। রাজর্ষি অশোকের আমলেও (খ্রীস্টপূর্ব ২৭৩-২৩৬) পৌষালি উৎসব হতো। এপ্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন ঃ "তোসলা বা পোষলা পরব এদেশের খুব প্রাচীন প্রথা; অশোকের কলিঙ্গ-অনুশাসনে ইহার ইঙ্গিত আছে। অশোক বলিয়াছেন; 'আমার এই নীতি-অনুশাসন যেন প্রজারা তিষ্য নক্ষত্রে (অর্থাৎ পৌষালি উৎসবের সময়)' শোনে এবং অন্য সময়েও ইচ্ছামতন শুনিতে পারে'।"[১৭]

অথচ সেই শস্যোৎসব কোথায়, কিভাবে পালিত হতো তার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অন্যদিকে শুশুনিয়া শিলালিপি ও বিষ্ণুচক্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় টুসুগানের দেশ হিসাবে বাঁকুড়া চিহ্নিত। প্রচলিত বিশিষ্ট টুসুগানেও দামোদর নদ-তীরবর্তী বাঁকুড়ার পোখন্নার উল্লেখ আছে। তা থেকে বাঁকুড়ার শ্রীরূপ ["পোখন্নাতে দেখে আল্যম্ দুয়ারে মরাই।"] জানা যায়। এই টুসুগানটি লোকসঙ্গীতের প্রচারধারায় লোকপরম্পরায় ক্রমবলয়িত তরঙ্গে বাঁকুড়া থেকে পার্শ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়ার বহু এলাকা ছাড়াও পাশাপাশি অন্যান্য জেলাতেও গেছে এবং পশ্চিম বর্ধমানের সীমানা পেরিয়ে বীরভূমের নানা গ্রাম ছুঁয়ে সাঁওতাল পরগনা অবধি প্রসারিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "বাংলাদেশের ছড়ায় এই 'পোখন্না' নামটির উল্লেখ দেখা যায়, যেমন—

"পুষালু গো রাই—
আমরা ছোপড়ি পিঠা খাই।।
ছোপড়ি-লোপড়ি গাঙসিনানে যাই—
গাঙের জল রাঁধি বাড়ি, ঝারির জল খাই।
চার মাস বর্ষা আমরা পোখন্না যাই।।"

ছড়াটি সাঁওতাল পরগনা জেলা থেকে সংগৃহীত। সুতরাং শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদিত লিপিতে চন্দ্রবর্মাকে যে পুষ্কর্ণার রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই পোখন্না ব্যতীত আর কিছুই নয়। রাজপুতানার অন্তর্গত পশ্চিম যোধপুরের 'পোখরণ' নামক স্থানটির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। যদি তাই হয়, অর্থাৎ চন্দ্রবর্মা যদি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বর্তমান পোখন্নারই রাজা হয়ে থাকেন, তবে তাঁর সংস্কৃত ভাষায় এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে ক্ষোদিত শুশুনিয়া পর্বতগাত্রের এই লিপি দেখে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতেই বাঁকুড়ার পোখন্না অঞ্চলে এক সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল এবং সেই রাজ্যে সংস্কৃত চর্চা হতো; সাধারণ লোকেও সংস্কৃত জানত, তা না হলে সংস্কৃতে এই অঞ্চলে লিপি ক্ষোদিত করবার কোন সার্থকতা ছিল না।"[১৮]

কেউ কেউ 'পোখন্না' বা 'পখন্না' কথাটিকে 'পইখর না' (অর্থাৎ 'পুকুর না') অর্থ ভাবতে পারেন। তাঁদের ধারণায় "চার মাস বর্ষা আমরা পখন্না (পইখর, না) যাই" পঙক্তিটির অর্থ—"চার মাস বর্ষার সময় আমরা পুকুরে যাই না।" কিন্তু প্রচলিত ঐ গান বা ছড়ায় আরেকটি পঙ্ক্তি আছে। তা হলো ঃ "পোখন্নাতে দেখে আল্যম্ দুয়ারে মরাই।" তার অর্থ—গৃহস্থের সদর দরজা-সংলগ্ন উঠানে ধানের মরাই (গোলা) দেখে আসা। আবহমান কাল ধরে

গ্রামবাংলার কৃষিভিত্তিক গৃহস্থের সমৃদ্ধি তথা সচ্ছলতার ইঙ্গিত দেয় ধানের পরিপূর্ণ গোলা অর্থাৎ 'মরাই'। অন্য অর্থে—পুকুরে 'মরাই' অর্থাৎ ধানের গোলা দেখার মতন ভোজবাজির ভাবনা বাস্তবে সম্ভবপর নয়। ফলত, এই গানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রাচীন বাঁকুড়ার ধনৈশ্বর্যময়ী রূপের কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

উল্লিখিত টুসুগানটি বাল্যজীবনে একাধিক টুসু-পরবের সময় বাঁকুড়া জেলার ভূতেশ্বর, সানবাঁধা, ভাদুল, বিকনা, কাটনাড়, তিলাবেদ্যা প্রভৃতি জয়বেলিয়া পরগনার গ্রামগুলিতে অথবা রণবহাল, গঙ্গাজলঘাটি, কাপিষ্টা প্রভৃতি বাইশগ্রাম এলাকাতেও শুনেছি। উক্ত টুসুগানে টুসুকে 'রাই' অর্থাৎ 'লক্ষ্মী' বলা হয়েছে। রাধিকা > রাহী > রাই। গানের মর্মার্থ—কৃষিলক্ষ্মীর কৃপায় 'ছব্‌ড়ি' (ছয় বুড়ি = ২০ x ৬ = ১২০টি) এবং 'লব্‌ড়ি' (নয় বুড়ি = ২০ x ৯ = ১৮০টি) পিঠে-খাওয়ার সুযোগ হয়। [এই 'ছব্‌ড়ি' এবং 'লব্‌ড়ি' কথা-দুটি অঞ্চলভেদে 'ছোব্‌ড়ি' বা 'ছোপ্‌ড়ি' এবং 'লোব্‌ড়ি' বা 'লোপ্‌ড়ি' হয়েছে।] লোকায়ত জীবনে বুড়ি, পণ, কাহন ইত্যাদি ছিল পরিমাপের অঙ্ক। লোকায়ত জীবনের কৃষিকর্মে এখনো তার প্রচলন বহু জায়গায় দেখা যায়। তাছাড়া তিন, পাঁচ, সাত কিংবা ছয়, নয় ইত্যাদি সংখ্যাগুলি হিসাব করার সময় মানুষ প্রায়ই সাবলীলভাবে ব্যবহার করে। তার মধ্যে লোকায়ত ভাবনা ক্রিয়াশীল। বস্তুতপক্ষে, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার মানুষ একদা রীতিমত ভোজনরসিক ছিল। বহু বৃদ্ধ 'পণদরুনে' অর্থাৎ 'পণ' হিসাবে (৮০টি এক পণ) পৌষপিঠে খাওয়ার যৌবন-সুখস্মৃতি কথাপ্রসঙ্গে এখনো জানিয়ে থাকেন।

পরবর্তী কালে মানভূম-পুরুলিয়ার তথা সিংভূম, ধানবাদ, হাজারিবাগের বাঙলাভাষী বিভিন্ন গ্রামে লোকসংস্কৃতি-গবেষণার কাজে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে প্রাগুক্ত টুসুগানেরই প্রচলন দেখেছি। পুঞ্চার পাকবিড়র্‌য়া, বুধপুর, বাঁদরহাল, বড়গাঁ, নপাড়া প্রভৃতি গ্রামে কিংবা মানবাজারের ঝাড়বাগদা, জবালা, বারী প্রভৃতি গ্রামে, কিংবা বাগমুণ্ডির তুনতুড়ি, সারেংডি, সুইসা প্রভৃতি গ্রামে এবং আড়শা থানার অনেক গ্রামে অথবা পুরুলিয়ার কাঁসাই ব্রিজের তলায় টুসুমেলায় উক্ত গানটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে শুনেছি। অঞ্চলভেদে লোকসঙ্গীতের পরিবর্তন ঘটেই থাকে। কারণ, লোকসঙ্গীত সম্প্রচারের প্রধান মাধ্যম হলো মৌখিক পরম্পরা (Oral tradition)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মানভূম-পুরুলিয়ার বিশিষ্ট সাংবাদিক অশোক চৌধুরী ১৮।১।১৯৫৪ 'মুক্তি' পত্রিকায় [তখন 'মুক্তি'র সম্পাদক ছিলেন বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত।] 'মানভূমের টুসুপরব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে আলোচ্য টুসুগানটির ভিন্নতর দুটি রূপও পাওয়া যায়। যথা—

১) "তোষলা গো রাই তোমার দৌলতে
আমরা ছ-বুড়ি পিঠে খাই—
ছ-বুড়ি, ন-বুড়ি গাঙ সিনাতে যাই
গাঙের বালিগুড় দু-হাতে মোড়াই।
গাঙের ভিতর লাড়ুকলা ডব্‌ড়বাতে খাই।।"

২) "টুসালু গো রাই মোরা গাঙ সিনানে যাই
গাঙের জল রাঁধিবাড়ি
মকরের জল খাই।
হাতে পো, কাঁখে পো পৃথিবী জুড়িয়ে টুসু
না পড়িল রো, গো
না পড়িল রো।"

অশোক চৌধুরী সংগৃহীত দ্বিতীয় গানটির সঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সংগৃহীত একটি টুসুগানের অনেকখানি মিল আছে। ডঃ ভট্টাচার্য লিখেছেন ঃ "গানের পরিবর্তে মধ্যে মধ্যে দুই-একটি টুসুর ছড়াও শুনিতে পাওয়া যায়—

"টুসালু গো রাই, টুসালু গো ভাই
তোমার দৌলতে আমরা ছবড়ি পিঠা খাই লো।
ছবড়ি লো লবড়ি গাঙ সিনানে যাই
গাঙের জলে রাঁধিবাড়ি মকরের জল খাই।
চার মাস বর্ষা পোখার না যাই
হাতে পো কাঁখে পো
পৃথিবী জুড়ালো চোখে পড়ল রো রো
চোখে পড়ল রো।।[১৯]

পুরুলিয়া শহর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে রঘুনাথপুর যাওয়ার পথে পোদলাড়া গ্রাম। ঐ গ্রামের ত্রিলোচন বাউরির স্ত্রী ও মেয়েদের কাছ থেকে সংগৃহীত টুসুগান নিম্নরূপ—

"টুসালি গো টুসালি
গাঙ সিনানে যাই।
গাঙের জল রাঁধিবাড়ি
মকরের জল খাই।
মায়ে দিল তেলহল্দ্যা বাপে দিল শাড়ি
সেই শাড়িটা নিয়ে যাব বঁধুয়ার বাড়ি
বঁধুয়ার বাড়িতে পাকা পাকা আম
মা-বাপকে বল্যে দিব বলুক রাম-রাম।।"

পৌষালি শস্যোৎসব (Harvest festival) টুসুর সুরলহরী বাঙলা গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ঊর্মিল লালমাটি আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নীল অরণ্যের প্রলেপ-জাগানো, ঢেউতোলা পাহাড়ের দেশ বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার লোকায়ত জীবন থেকে মেদিনীপুর পেরিয়ে সুদূর সুন্দরবনের নদীনালা-বেষ্টিত গ্রামীণ জীবনে, কিংবা হুগলী-বর্ধমানের কৃষিভাবনার পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল-সমৃদ্ধ লোকজীবনে নব জীবনানন্দ আনে টুসুগান। আবার বীরভূমের কৃষিজীবী জনজীবন ছুঁয়ে সাঁওতাল পরগনা কিংবা ধানবাদ-রাঁচী-হাজারিবাগ-সিংভূমের বাঙলাভাষী বিস্তীর্ণ লোকজীবনে পৌষালি শীতের হাওয়ায়, ধানশিষের আনম্র শোভায় নবজীবনের মদির ছন্দ জাগায় টুসুগান।

পৌষমাসের সূর্য পুষ্য বা বিষ্ণু। পুষ্যা বা তিষ্যা নক্ষত্রযুক্ত পৌষমাসে অনুষ্ঠিত টুসু-উৎসবের প্রধান উপকরণ কমলা-সোনালি রঙের ধানের তুষ।

সেইসঙ্গে থাকে আতপচাল, সর্ষে-গাঁদা-মূলো ইত্যাদি ফুল, দূর্বা-কড়ি-সিঁদুর প্রভৃতি মাঙ্গলিক উপকরণ। আর থাকে 'কাড়ুলি-বাছুর'-এর (যে-গরুর বাছুর মরেনি) পাঁচটি, সাতটি বা নয়টি গোবরগুলি। এসবই উর্বরতাবাদের (Fertility Cult) প্রতীক। এগুলি রাখা হয় পোড়ামাটির শূন্যগর্ভ পাত্রে—যার নাম 'টুসুখলা'। 'টুসুখলা'-র কানার চারদিকে তৈরি করার সময় থেকেই বসানো থাকে ছোট ছোট মাটির প্রদীপ। এসব মাঙ্গলিক উপকরণ দেখে ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক মনে করেন, "টুসু ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজ থেকেই সীমান্ত বাংলায় প্রবেশ করেছে।"[২০]

ধানের খোসা 'তুষ'-এর সঙ্গে আদরার্থক উ-প্রত্যয় যুক্ত করে 'তুষু' নাম এসেছে। 'তুষ'-এর সঙ্গে 'লা'-প্রত্যয় যোগ করলে হয় 'তুষলা'। 'তুষলা' শব্দের উ-ধ্বনি ধ্বনিবিজ্ঞানের নিয়মে 'গুণ' হয়ে 'তোষলা' কথাটির সৃষ্টি। আবার ভাষাতত্ত্বের নিয়মে দন্ত্যবর্ণের মাঝে মাঝে মূর্ধণ্য বর্ণে পরিণত হওয়ার উচ্চারণপ্রবণতা আছে। তাই 'তুষু' অনেকেরই মুখে হয় 'টুসু'। 'ভারতকোষ'-এ 'টুসু' কথাটি আছে। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, তিনি ক্ষেত্রসমীক্ষায় অবগত হয়েছেন—চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় পৌষমাসে যে 'তুষ-তুষুলি' পূজা হয়, তার সঙ্গে টুসুর অভিন্নতা নেই।

লোকবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করলে বাংলার উপাস্য দেবদেবী যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণার অনুবর্তী তা নয়, পরন্তু তার সঙ্গে অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) ও দ্রাবিড়ভাষী প্রাগার্য-জনসংস্কৃতির মিলন ঘটেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্য গতিতে নিঃশব্দ চরণে চলিয়াছে; আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে—নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই; সে-পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না।"[২১]

দেশের এই যে 'প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায়'—যারা 'প্রাকৃত' বা লোকায়ত জীবনে নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কার, পূজাপার্বণ, সঙ্গীত ইত্যাদি নিয়ে 'অলক্ষ্য গতিতে' অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের মেলবন্ধনপ্রয়াসী, তারাই লোক-উৎসবের 'লোক' (Folk)। তাই "Folk is ethnology the common people who share a basic store of old tradition."[২২] আমরা জানি, প্রতিদিনের নানাবিধ সমস্যা মানুষকে সঙ্কুচিত, নিরানন্দ ও উদ্বাস্ত করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।"[২৩]

আদিবাসী জীবনে মুণ্ডারি শব্দজাত 'টুসু' শব্দের এক বিশেষ অর্থ—'পুতুল'। ধলভূম, রাঁচী প্রভৃতি জায়গায় টুসু কোথাও লক্ষ্মীরূপা, কোথাও মকরবাহনা গঙ্গাদেবী এবং মূর্তির চালচিত্রে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও আছেন। জামশেদপুরের ঘাটশিলা অঞ্চলে টুসু হলুদ রঙের। পদতলে পদ্মফুল বা ময়ূর কিংবা মকর। বাঁকুড়ার কাঁসাইতীরে পোরকুলের মেলায় বা হুগলীর কানা নদীর তীরে মূর্তিমতী টুসু দেখা

যায়। বাঁকুড়ার বহু জায়গায় টুসুর আলোখলায় পূজা হয়। আবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে টুসুভাসানে 'নবরত্ন চৌদল' যোগে পোকাবাঁধ, লালবাঁধে টুসু-বিসর্জনের রীতি আছে। মানভূম-পুরুলিয়ার টুসুভাসানে ছোট্ট রথাকৃতি রঙিন কাগজের অলঙ্করণ-যুক্ত 'চৌডল' (কথাটি 'চতুর্দোলা'-জাত) গ্রামীণ জনজীবনে আনন্দের জোয়ার আনে। পুরুলিয়া শহরপ্রান্তে কাঁসাই নদীর টুসুমেলা, জয়দা (চাণ্ডিল), সতীঘাট (তোড়াং), দীগড়ি (গালুডি) প্রভৃতির টুসুমেলা খুবই জনপ্রিয়। ঝাড়খণ্ড-ভাবনায় বিশ্বাসী নরনারীর কাছে টুসুগানের জনপ্রিয়তা দুর্গাপূজার চেয়েও বেশি।

'টুসু' নামকরণের পিছনে কোল (Austro-Asiatic) গোষ্ঠীর 'টুসা' (টুসাউ) শব্দটির প্রভাব থাকতে পারে। কোল ভাষায় তার অর্থ—'ফুলের গুচ্ছ'। এপ্রসঙ্গে ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক বলেছেন ঃ "Perhaps 'tusu' is a non-Aryan word coming from Austro-Asiatic Kol origin, to mean flower, bunch of flowers, bud etc. In Santali 'bãhã-tusu' means a bunch of flowers, 'tusã' means simply bud a leaf of bud—a symbol of youth and beauty."[২৪]

অঞ্চলভেদে একই টুসুগান নানাভাবে পরিবর্তিত বা সংযোজিত হয়। এই রূপভেদের পিছনে কাজ করে মৌখিক পরম্পরা (Oral tradition)। সেইসঙ্গে সমাজজীবনের নানা পরিবর্তনশীলতা, রাজনৈতিক ভাবনার নানা তরঙ্গ লোককবিরা টুসুগানে রূপ দেন। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি-আন্দোলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তারই ফলে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর বিহারের মানভূম থেকে পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি। উত্তাল ভাষা-আন্দোলনের সময় ভজহরি মাহাত, অরুণচন্দ্র ঘোষ (বর্তমানে পুরুলিয়ার 'মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক) প্রমুখ ব্যক্তি টুসুগান রচনা করেন। 'মানভূমকেশরী' অতুলচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র অরুণচন্দ্র ঘোষের জনপ্রিয় টুসুগানের কয়েক পঙ্‌ক্তি—

"আমার বাঙলাভাষা প্রাণের ভাষা রে
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তারে।।..."

পরিবর্তমান যুগের নানা সামাজিক চেতনার অনিবার্য অভিঘাতে কিংবা ব্যক্তিজীবনের কামনা-বাসনা, দুঃখ-অভিমানের বহুমাত্রিক প্রকাশে টুসুগানে আসে রূপবৈচিত্র্য। এই সজীব প্রাণচাঞ্চল্য লোকসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য—"Indeed, a folk-song is neither new nor old; it is like a forest tree with roots deeply buried in the past but which continuously puts forth new branches, new leaves, new fruits."[২৫]

লোক-উৎসবের একটি প্রধান লক্ষ্মণ—তা ঋতুভিত্তিক। মাঠে মাঠে যখন আনম্র আমন ধানের সোনালি রঙ, তখন ধান কাটা ও ফসল তোলার কাল। কৃষিজীবী গ্রামীণ পরিবারের বালিকা, কিশোরী থেকে নববধূ—সকলেই তাই অঘ্রাণ মাসের সংক্রান্তিতে শস্যদেবী টুসুকে আলোখলায় প্রতিষ্ঠা করে। তার নাম—'টুসু-পাতা'। সারা পৌষ মাস তার সান্ধ্য বন্দনাগীতি—বিশেষ সুরে, বিচিত্র ভাষায় জীবনরাগসংযুক্ত। তাই টুসু ফসল কাটা তথা ফসল তোলার উৎসব (Harvest festival)। তখন মাঠে-ঘাটে-প্রান্তরে কিংবা যূথবদ্ধ কর্মজীবনে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তিক বাংলা তথা সন্নিহিত বিহার অঞ্চলের বাঙলাভাষী

খেটে-খাওয়া নরনারীরা প্রলম্বিত সুরে টুসুগানের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগ প্রকাশ করে। তাতে প্রাত্যহিক কর্মজীবনের শ্বাসরোধী বিবর্ণতা তাদের মনের সহজ আনন্দকে গ্রাস করতে পারে না। প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ আনন্দের বহুমাত্রিক রূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জীবনমুখী ভাবনা—"উৎসবের দিনে আমরা যে-সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোন প্রয়োজন নাই—সকল প্রয়োজনের অধিক যাহা, উৎসব তাহা লইয়া। এইজন্য উৎসবের একটা প্রধান লক্ষণ প্রাচুর্য।... এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিস্বরূপ করিয়া তুলি।"[২৬] * □

পাদটীকা

১ প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া—পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, ১৯৬৮, পৃঃ ১০

২ প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া—পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, ১৯৬৮, পৃঃ ২৭

৩ বাংলার সামাজিক ইতিহাস—অতুল সুর, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৩১-৩২

৪ প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া, পৃঃ ৩৫

৫ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা ৪র্থ সং, ১৯৬৩, পৃঃ ২৩

৬ বাংলাদেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১ম খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৭৪, পৃঃ ২২-২৩

৭ West Bengal District Gazetteers–Amiya Kumar Banerjee (Ed.) Bankura, 1968, p. 63

৮ বাঁকুড়ার মন্দির—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃঃ ৭৭

৯ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ৩য় সং, ১৩৭০, পৃঃ ২১-২২

১০ 'দক্ষিণ রাঢ়ের তুষু পর্বের ঐতিহাসিক পটভূমিকা'—মানিকলাল সিংহ, 'দেশ', ২৬ জুন, ১৯৬৫

১১ পূজাপার্বণ—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮, পৃঃ ৫২-৫৩

১২ হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ—হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ২য় পর্ব, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ২০৮

১৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬১, পৃঃ ৯৪-৯৫

১৪ মানিকলাল সিংহের পূর্ব-উল্লিখিত প্রবন্ধ

১৫ পূজাপার্বণ, পৃঃ ৩

১৬ বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৩৫১, পৃঃ ৯

১৭ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১৭

১৮ বাঁকুড়া-পরিক্রমা—অনুকূলচন্দ্র সেন, বুক সিন্ডিকেট প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৭৬, ভূমিকা দ্রঃ

১৯ বাংলার লোকসাহিত্য—আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, ১৯৬৫, পৃঃ ১২০

২০ টুসুঃ ইতিহাসে ও সঙ্গীতে—দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ৩৫

২১ রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৫৭, পৃঃ ৫৮৬

২২ Copenhegen International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore, 1960, Vol. I, p. 126

২৩ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, জন্মবার্ষিক সং, ১৩৬৮, পৃঃ ৫৩

২৪ 'Tusu Songs'—Suhrid Kumar Bhowmik, Bulletin of the Cultural Research Institute, Vol. XVI, p. 137

২৫ Encyclopaedia Britanica, 'Folksong', 14th Edn. 1932, p. 448

২৬ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃঃ ৫৭৭

* ৯৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

আড্ডা

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

এমন পাড়াই নাই, যে-পাড়ায় কোনরকমের আড্ডা নাই। একপ্রকার ধরিতে গেলে, আড্ডাই আমাদিগের দেশের জাতীয়ত্বের এবং নিজের নিজের মনুষ্যত্বের হ্রাস বৃদ্ধির, মঙ্গল অমঙ্গলের, উন্নতি ও অবনতির মূল কারণ। হেলায় বৃথা সময় কাটাইয়া মনুষ্যত্বের হানি করিতে আড্ডা যেমন মজবুত এমন আর কিছুই নহে। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, ধনী-নির্ধনী পণ্ডিত-মূর্খ প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরই একটা না একটা আড্ডা আছে। আড্ডা মানে কোনও নিয়মিত প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, বা মাসিক সভা, ক্লাব, বা কোনপ্রকার মিটিং বলিতেছি না। আড্ডা মানে—গল্পের স্থান; আড্ডা মানে অযথা বিরামের স্থান, অযথা খেলার স্থান, অযথা স্ফূর্তির বা রগড়ের স্থান, যে-স্থানে যাইবার জন্য অনেক সময়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়; যে-স্থানে যাইবার, বসিবার, কথা কহিবার, বা কোনপ্রকারের, কোন নিয়মাদি বিশেষ কিছু নাই; যে-স্থানে প্রত্যহই বা সর্বদাই যাইয়া থাকি; যে-স্থানে কয়েকটি অতি ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া, প্রায় আর কেহ আসেন না, যদি বা আসেন, তো অতি অল্পক্ষণের জন্যই। এইসকল স্থানে নানাপ্রকার চর্চা হইয়া থাকে। আড্ডায় যদি একটা কথা উঠিল, তাহা অযথা বা মিথ্যাই হউক, আর যাহাই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ সেকথা পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া যাইল। আড্ডায় যদি কেহ একটা 'মতলব' করিলেন, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ সকলে তাহাতে 'হাঁ' দিলেন। আড্ডার কথা বেদবাক্য; আড্ডা হইতে যেকথা শুনিয়া আসিব, সেকথা যদি প্রকৃতই মিথ্যা হয় এবং তাহার বিপক্ষে যদি দশহাজার সৎলোক সাক্ষ্য প্রদান করেন, তবুও আড্ডার কথা কোনমতে অবিশ্বাস করিতেছি না—আড্ডার হাওয়া সাধারণত প্রায় এই রূপই হইয়া থাকে, তবে দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে এই হাওয়া কিছু কম বা বেশি বহে মাত্র।

আড্ডা নানা প্রকারের আছে। প্রধানত আড্ডাগুলিকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(১) মজলিশি, আজগুবি, বা খোশ গল্পের আড্ডা। আফিম আশি বৃদ্ধ বা মোসাহেব মহাশয়গণই সচরাচর এইসকল আড্ডার প্রধান সভ্য।

(২) খেলার আড্ডা। সতরঞ্চ, পাশা, তাস প্রভৃতি এইসকল আড্ডার আদরের দ্রব্য। যুবা ও বৃদ্ধ উভয় দলই এই আড্ডায় সমান আকৃষ্ট হন।

(৩) গান বাজনার আড্ডা। এখানে যুবা বা বৃদ্ধ সকলই প্রায় আনন্দ পাইয়া থাকেন। আজকাল কিন্তু যুবকদলের ভিতরেই এইসকল আড্ডা বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ভাল ভাল কন্সার্ট-পার্টি, থিয়েটার-পার্টি, যাত্রার

দল, প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিতেছি না; কেননা, তথায় অনেক বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। সেসকল—রেগুলার মিটিং ক্লাব বা এ্যাসোসিয়েশন (অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত বা নিয়মিত সভা) নামে পরিগণিত হইতে পারে।

(৪) ফূর্তির আড্ডা। অল্প স্বল্প পাঁচরকম ইয়ার্কি, পরচর্চা, ঠাট্টা, তামাসা, গুড়ুক সেবন, গল্প প্রভৃতি, হরেক রকমে, এইসকল আড্ডায় সময় অতিবাহিত হয়। ইহাতে যুবার ভাগই বেশি।

(৫) নেশার আড্ডা। কোন কোন ভদ্র এবং শিক্ষিত লোককেও দেখিতে পাওয়া যায়—গুলি, গাঁজা বা চরস প্রভৃতি নীচ নেশায় রত। তাঁহারা গোপনে গোপনে ঐসকল আড্ডায় যাইয়া নিজ নিজ কার্যসম্পন্ন করিয়া আসেন; মনে করেন, যেন কেহই টের পাইল না।

(৬) মিশ্রিত আড্ডা। অর্থাৎ, এসকল আড্ডায় পূর্বোক্ত সকল রকমেরই রস অল্পবিস্তর আছে।

এসকল ছাড়া আরো অনেক রকমের ভাল মন্দ আড্ডা আছে; তাহাদিগের উল্লেখ অনাবশ্যক, অথবা অযোগ্য।

এই তো গেল পুরুষদিগের আড্ডা। মেয়েদেরও আড্ডা আছে। গঙ্গার ঘাট তো এক প্রধান আড্ডা; গঙ্গা বা নদী যদি দূর হয়, তো নিদেন দিঘি বা পুষ্করিণী। শহর হইলে আড্ডা দিবার সময় একবার—প্রাতঃকাল; পল্লীগ্রাম হইলে দুইবেলা—দুপুরবেলা স্নানের সময়, আর সন্ধ্যাকালে জল আনিতে যাইবার সময়। শহরে পুরুষগণ অফিসে বাহির হইয়া যাইলে পর, আরেকটি মস্ত আড্ডা দিবার সময়; মফঃস্বলে তো, পুরুষগণ নিদ্রা যাইলেও, একবার পাড়ায় বাহির হইয়া দুইটা কথা কহিয়া আসা যায়। যাহা হউক অনেক কারণে, স্ত্রীলোকদিগের আড্ডা তত ধর্তব্য নয়। এমন অনেক সম্ভ্রান্তা স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা আজও সূর্যদেবের দর্শন পর্যন্ত কদাচিৎ পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

পুরুষদিগের আড্ডা সকল হইতে আমরা যথেষ্ট আশা করিতে পারি। এইসকল আড্ডাও দেশের অনেক উপকারে আসিতে পারে। কোন নূতন বিষয় প্রবর্তন করিতে হইলে, আড্ডায় যত শীঘ্র ও সহজে প্রবর্তিত হয়, এত আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। কৌশলক্রমে বা প্রকারান্তরে তথায় যেকোন ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তাহাই তথাকার সকলের ভিতর অনতিবিলম্বে চলিয়া যায়। অন্যান্য চর্চার সহিত অতি ধীরে ধীরে, অতি অল্প অল্প করিয়া, খেলাধূলার ছলে, দেশের যথাসম্ভব হিত চর্চা, পাঁচজনের মঙ্গল কামনা, সকলকার প্রতি শুভেচ্ছা অনায়াসেই আড্ডায় প্রবর্তন করা যাইতে পারে। ইহা বৃদ্ধি পাইলেই ক্রমশ অনেকের ভিতর সদ্বৃত্তি এবং সদুদ্যমের বিকাশ হইবে। বিকাশ হইলে নিজের মঙ্গল, পাড়ার মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, সমগ্র জগতের মঙ্গল হইবে, ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল হইবে, এবং নিজের মনুষ্যজীবন ধন্য হইবে।

আড্ডাগুলিতে একটি সামান্য উপায় অনায়াসে অবলম্বন করিতে পারেন। সকলেই জানেন, ভিক্ষাদানে হৃদয় পবিত্র হয় ও সদবৃত্তির উদয় হয়। আমাদের দেশে আজও ভিক্ষাদান প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই; হাজার গরিব হউন,

ভারতে এমন গৃহস্থ খুব কমই আছেন, যিনি, শতকরা নিদেন একজন ভিখারিকেও একমুষ্টি তণ্ডুল প্রদান না করেন। ভারতে এমন খুব কমই পরিবার আছেন, যে-পরিবারের মধ্য হইতে কেহ-না-কেহ, রমণীই হউন বা পুরুষ হউন, বারো মাসে তের পার্বণের মধ্যে কোন-না-কোন পার্বণে নিদেন এক কপর্দকও ব্যয় না করেন। তদ্রূপ, যদি আমরা সকলেই কোনপ্রকারে, কষ্টে-শিষ্টে, নিদেন এক-আধ পয়সা করিয়াও ভিক্ষাস্বরূপ আড্ডাতে জমাইতে পারি, তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। ভিক্ষা প্রদান করিলে হৃদয় অতি পবিত্র হয়; এবং সেই হৃদয়ে সদিচ্ছা স্বতই ক্রমশ বিকশিত হইতে থাকে; মন প্রফুল্ল হইতে থাকে, মুখশ্রী বর্ধিত হইতে থাকে, এবং তাঁহাকে দেখিলে সকলে শান্তিলাভ করেন। সাধুগণ ভিক্ষালব্ধ অন্নকে এত পবিত্র মনে করেন কেন? তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, সদিচ্ছাবান পুরুষ ব্যতীত ভিক্ষা প্রদান করিতে কেহ সক্ষম হন না। আমরা সাধারণত অন্ন আহার করিতে করিতে শরীরের কোন স্থানে অন্ন একটি হঠাৎ পড়িয়া গেলে, সেই স্থানটি অপবিত্র জ্ঞানে ধৌত করি; সাধুগণ কিন্তু, গাত্রস্থিত বহির্বাসের একাংশে পাঁচ-সাত বাটী হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনেন—গাত্রও ধৌত করেন না সমগ্র বহির্বাসও ধৌত করেন না, কেবলমাত্র বহির্বাসের সেই অংশটুকু জলে পরিষ্কার করিয়া লয়েন। হয়তো কোন সাধু সেই ভিক্ষালব্ধ অন্ন আহার করিয়া সেই হস্ত মস্তকে মুছিয়া ফেলিলেন। কেন? অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাও এক কারণ যে, সেই অন্নের ভিতর 'শুভ ইচ্ছা' যেন নারায়ণ স্বরূপে বিরাজমান, সেইজন্য অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে সেই অন্নস্পৃষ্ট হস্ত মস্তকে স্পর্শ করান। শুধু যে, ভিক্ষা নিজে পবিত্র, এবং যিনি ভিক্ষা দেন, তিনিই যে কেবল পবিত্র তাহাই নহে; যাঁহাকে ভিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁহাকে তো নারায়ণস্বরূপে জ্ঞান করিতেই হয়, তাহা ছাড়া যেখানে ভিক্ষা দেওয়া হয় সে-স্থান পর্যন্তও পবিত্র হয়। সেইজন্যই, অন্নসত্র, সদাব্রত, প্রভৃতি স্থান এত দেবালয়তুল্য পবিত্র। আমরাও কেন না আমাদিগের আড্ডাগুলিতে অতি যৎসামান্যও কিছু ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিয়া সেগুলিকে পবিত্র করি, এবং নিজেরাও ধন্য হই?

অবশ্য, সেই সঞ্চিত ভিক্ষার সৎ ও সংযত ব্যবহার আবশ্যক। প্রধানত দুইটি উপায়ে ইহা সদ্ব্যয়িত হইতে পারে। প্রথমত, নিজের পাড়ার আপদ-বিপদে বা কোনপ্রকার আবশ্যকে সাহায্য করিতে পারি। দ্বিতীয়ত, তাহার মধ্য হইতে যৎকিঞ্চিৎ, দেশের কোন সাধারণ বড়জাতীয় সভাতে দিতে পারি। এই দুইটি আমাদিগের একান্ত কর্তব্য। প্রথমটির পরিণাম একতা; দ্বিতীয়টির—জাতীয়তা। উভয় বৃত্তেরই একই কেন্দ্র; প্রভেদ কেবল একটি ক্ষুদ্রতর, অপরটি বৃহত্তর। উভয়েরই সমান উদ্দেশ্য—শ্রীবৃদ্ধি; প্রথমটির—পাড়ার, দ্বিতীয়টির—সমগ্র দেশের। প্রথমটি যেমন—সোপান; দ্বিতীয়টি—ছাদ। সোপান দ্বারা ছাদে উঠুন; আপনার রূপ দেখিয়া, গৌরব দেখিয়া, ঐশ্বর্য দেখিয়া, আপনার শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, আপনার শোভা দেখিয়া, জগৎ মুগ্ধ হউন, চন্দ্র তারকা আপনার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করুন। 'আমাদিগের মাতৃভূমি রত্নগর্ভা' নাম সার্থক হউক।

আড্ডার নাম শুনিলেই যেন সাধারণত লোকের মনে একটা ঘৃণাসূচক ভাব আসে। সে-ভাব যেন সকলকার মন হইতে দূরীকৃত হয়। আড্ডাসকল যেন আমাদিগের দেশের নেতৃমণ্ডলি-স্বরূপে পরিণত হয়, যেন পাড়ার আদর্শ-স্থান বলিয়া গণ্য হয়—এই একান্ত প্রার্থনা। যাবতীয় আড্ডাগুলি যদি সদ্ভাবে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে আর দেশের কোন স্থানে আপদ-বিপদের ভয় থাকে না। যদি কোন পাড়ায় কাহারও কোন আপদ-বিপদের সম্ভব হয়, তো তৎক্ষণাৎ স্থানীয় আড্ডায় খবর দিলেই যেন তিনি নির্ভরপ্রাপ্ত হন। আড্ডা যেন, দীন-দরিদ্র, অনাথ-অনাথাগণের আশ্রয় হয়; আড্ডা যেন বিপন্নগণের একমাত্র শরণ-স্থল হয়; যেন দুষ্টের পরিবর্তন ও শিষ্টের আদর-স্থান হয়; ধনী-নির্ধনী, গুণী ও নির্গুণ, মহৎ ও ক্ষুদ্র, বালক বা বৃদ্ধ, সকলকারই যেন প্রিয় কুটির হয়। আড্ডা যেন পল্লীর শান্তিনিকেতন হয়। আড্ডা যেন যাবতীয় লোককে একতাবন্ধনে বদ্ধ করিতে পারেন। দেশের জাতীয়ত্ব বজায় রাখিতে পারেন এবং ভারতের নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করিয়া স্বজাতির জীবনরক্ষা করিতে পারেন। নিজ মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন।* □



* ২ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা

চন্দ্রলোকে জনসভা

[দার্শনিকের স্বপ্নদর্শন]

গোবিন্দচন্দ্র দেব

'লাইকা'কে নিয়ে 'রাশ্যান স্পুটনিক'-এর চন্দ্রলোক অভিযানের রোমাঞ্চকর সংবাদ প্রচারিত হবার কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি—যার ভাল ব্যাখ্যা এখনো খুঁজে পাইনি। সর্বদাই তরুণ-পোষণ ও তোষণে ব্যস্ত থাকায় কালিকলমের আঁচড়ে সেই স্বপ্নের একটা চলনসই ছবি আঁকবার সুযোগও তখন জোটেনি। অনলস, দীর্ঘসূত্রী ও অনর্থক অতিব্যস্ততার ফাঁকে যে-কাহিনীর স্মৃতি মনের কোণে আবছায়ার মতো মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে, তাকে আজ সত্যি সত্যি কালিকলমের বন্ধন স্বীকার করতে হলো।

এই স্বপ্নদর্শনের দিনকয়েক আগে এক বিদ্বজ্জন-সমাবেশে 'দর্শনের প্রয়োজনীয়তা' নিয়ে এক বিতর্ক হয়—যার সঙ্গে আমার স্বপ্নের কিছু অব্যক্ত যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয়। সে বিতর্কে আমি আদা-নুন খেয়ে দর্শনের পক্ষ সমর্থন করি, কারণ আমার ক্ষুদ্র জীবনের অজস্র অকৃতকার্যতার ভিতর সাফল্যের যে কণিকা লুকিয়ে আছে তার আসল হলো 'দর্শন', বাকিটুকু হলো তারই সুদ।

তবে আসলের চেয়ে সুদের ওপর বেশি আসক্তি রেখে দুটাকেই না হারাতে হয়, এই ভয়েই এই দর্শন-বিতৃষ্ণার যুগেও দর্শনকে ধরে আছি আঁকড়ে। এই অতি-আসক্তির ফলে যে-বাক্‌চাতুরী দেখিয়েছিলাম, তার চাপেই বোধহয় সেদিনের বিতর্ক-সভায় আমাদের পক্ষই হয়েছিল জয়ী। সে-সভায় এক প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন বিরোধী দলের নেতা। বাক্যের তুবড়ি রচনা করে আমাকে নাজেহাল করার চেষ্টা তিনি কম করেননি। হঠাৎ দর্শনের নিরর্থকতা প্রমাণ করবার আগ্রহাতিশয্যে তিনি শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বাঁকা হাসি হেসে বললেন ঃ "এই যে দেখছেন ডক্টর দেব, একজন বড় ('বড়' কথাটি বক্তার উক্তি থেকে উদ্ধৃত। পাঠকের মনে রাখা উচিত বিতর্কসভায় বিরোধী দলের কাউকে বড় বলা হয় ছোট অর্থে) দার্শনিক, তাঁকে যদি লাইকার সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় স্পুটনিকে করে চন্দ্রলোকে, তবে তাঁর দশা কি হবে?" তার এই চটকদার, চমকপ্রদ উক্তি শুনে মনে হলো দর্শনের সাফল্যের সঙ্গে এই অঘটন-ঘটনের নিকট যোগ যদি সত্যি থাকে, তবে তার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন তা বলা বাহুল্য। নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার। তবে খুবই আশার কথা এই যে জাগ্রত চেতনায় যে অসম্ভব সম্ভব হয়নি, স্বপ্ন-মানসে তার আংশিক সত্যের হয়েছে অনুভূতি। এতেই ইউক্লিডের উপপাদ্যগুলোর মতো প্রমাণিত হয়ে

গেছে যে, বাস্তব জীবনে দর্শনের যতই পরাভব ও পরাজয় হোক না কেন, স্বপ্ন-জীবনে তার একাধিপত্য অনস্বীকার্য।

হঠাৎ গভীর রাত্রে হল-ক্যান্টিনের জমাট আসর ও তার নিত্য সহচর অনবরত শব্দের গোলাবর্ষী রেডিও-র স্মৃতি গেল মুছে। সুষুপ্তির ভিতর স্বপ্নের স্বাতন্ত্র্য-লোকে হঠাৎ হলো প্রবেশ। যা দেখলাম তার সঙ্গে আজকের দিনের চাঞ্চল্যকর শ্লোগান-সাইরেনের কোন যোগ নেই। তথাপি তা অতি বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। হঠাৎ সাদা চোখে দেখতে পেলাম স্পুটনিকে করে মুহূর্তে অবলীলাক্রমে হাজির হয়ে গেছি চন্দ্রলোকে; বন্ধুবর লাইকা সঙ্গে নেই। ডারউইনের নীতির ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ অনুসারে লাইকার সঙ্গে আমার প্রাচীন পুরুষানুক্রমিক অনাবিল প্রেমের সম্পর্ক স্মরণ করেই হয়তো প্রবীণ অধ্যাপক বিতর্কসভায় তার সঙ্গে আমার সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। ডারউইনের নীতি সম্ভবত চন্দ্রলোকে অচল। কাজেই অতি যুক্তিসঙ্গতভাবেই সেখানে আমার একাকী আবির্ভাব।

ছোটবেলা থেকেই ধর্ম ও দর্শনের পুঁথিতে চন্দ্রলোকের কথা পড়ে আসছি। হিন্দুদের পরলোকের কাহিনীতে মৃত্যুর পর পুণ্যবলে চন্দ্রলোকে যাওয়ার কথা আছে। কিন্তু এমন সশরীরে চন্দ্রলোকে যাওয়া বিজ্ঞানের আশীর্বাদেই সম্ভব হলো—তবে যা দেখলাম সেটা বৈজ্ঞানিক চন্দ্রলোক না আধ্যাত্মিক চন্দ্রলোক, তা আজও ঠিক করতে পারিনি। আমার চন্দ্রলোক অভিযানের প্রেরণা সম্ভবত বৈজ্ঞানিক, তবে আমার স্বপ্নমানসে চন্দ্রলোকের যে রূপায়ণ হয়েছিল তার উপাদান সম্ভবত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক; বিজ্ঞানের চন্দ্রলোক মোটেই সুদৃশ্য বা রমণীয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সেজন্যই বলেছেন—চাঁদের সঙ্গে সুন্দর মুখের তুলনা যাঁরা করেন, তাঁরা জানেন না সে উপমা যদি আক্ষরিক অর্থে সত্য হয় তবে তার ফল কি ভয়ানক ও ভয়াবহ। আমার স্বপ্নের চন্দ্রলোক সত্যি খুব মনোরম, মনোহারী, শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুন্দর। একবার দেখলে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।

হঠাৎ দেখি—নেমে পড়েছি চন্দ্রলোকের সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর ও স্বস্তিকর আবহাওয়ায়। সামনে দেখি এক বিরাট জনসভা। সভা সামনে দেখা আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক—তার সঙ্গে আমার একটা নিকট যোগ নিশ্চয়ই আছে; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি আবাল্যজড়িত। মহাভারত আলোচনা করে আমি জানতে পেরেছি যে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো সভা-পর্ব ও গদাপর্বের অপূর্ব সমন্বয়, এই দুই পর্বে যাঁরা বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তাঁদের চরম পরিণতি বনপর্বে ও স্বর্গারোহণ-পর্বে। পৃথিবীর প্রাত্যহিক জীবনের কাদামাটির সঙ্গে ভাল করে যোগ রাখা তাদের পক্ষে অসম্ভব। যাই হোক, এখন সে আলোচনা মুলতুবি রেখে চন্দ্রলোকের সভার কথাই বলি। সেই সভায় পৌরোহিত্য করছেন দেখতে পেলাম মহাভাগবত এক ভিক্ষু; তাঁর জ্যোতির্ময় কান্তি, গৈরিক বসন, শান্ত গাম্ভীর্য ও অচঞ্চল প্রসন্ন হাস্য সেই বিরাট জনসমুদ্র থেকে তাঁকে অতি স্বাভাবিকভাবেই করে রেখেছে পৃথক ও স্বতন্ত্র। ভূতলে গিরিশৃঙ্গের মতো তাঁর চিন্তা জনমানসের বহু ঊর্ধ্বে।

সে-সভার আলোচ্য বিষয় : পৃথিবীতে স্পুটনিক আবিষ্কার ও চন্দ্রলোকে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া। নানা বক্তার বক্তৃতা শুনে মনে হলো পৃথিবীতে স্পুটনিক আবিষ্কারে চন্দ্রলোকের নেতারা ভীত, সন্ত্রস্ত ও বিচলিত। তাদের বক্তব্যের সারমর্ম : চন্দ্রলোকে খাদ্যসঙ্কট নেই। পৃথিবীর জনসংখ্যা অনবরত বেড়েই চলেছে। কাজেই সেখানে খাদ্যসঙ্কট ক্রমবর্ধমান, এ-দুরবস্থা অপরিহার্য। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে স্পুটনিক আবিষ্কারের ফলে চন্দ্রলোকে পড়বে পৃথিবীর মানুষের লোলুপ দৃষ্টি ও তাতে হবে সেখানকার শান্তিভঙ্গ। যে বাস্তুহারা সমস্যায় পৃথিবী জর্জরিত—পৃথিবীর মানুষের সংস্পর্শে চন্দ্রলোকেও সে-সমস্যা দেখা দেবে। এইভাবে সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা তাঁদের দিশারি ভিক্ষুর পৌরোহিত্যে করেছেন এই বিরাট সভার আয়োজন।

ভয়, নৈরাশ্য ও মানসিক চাঞ্চল্যের যে আবহাওয়া বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় সৃষ্টি হয়েছিল, সভার পুরোহিত শান্তচিত্ত ভিক্ষু যে-মুহূর্তে সবার সামনে তাঁর বহুবাঞ্ছিত ভাষণ দেবার জন্য দাঁড়ালেন, অমনি যেন তা চলে গেল। চন্দ্রলোকের গণমানসের এমন আকস্মিক পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম ও মনে পড়ল মহাকবি কালিদাসের উক্তি—"চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে"; সমস্ত সভা যেন রঙের তুলিতে আঁকা ছবির মতো নিস্পন্দ ও নিশ্চল।

সমাহিতচিত্ত ভিক্ষু শান্তকণ্ঠে বললেন : "পৃথিবীর মানুষের ওপর তোমাদের ঈর্ষা অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছনীয়। তোমরা চন্দ্রলোকবাসী পৃথিবীর মানুষের মতো নানা সঙ্ঘর্ষের দ্বারা জর্জরিত নও সত্য, কিন্তু পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকেই বিশ্বের এক মহাসত্য তোমাদের শিখতে হবে। সে সত্য হচ্ছে বিশ্বের সর্বজীবের একত্ব। বেদ, বাইবেল, কোরান ও জেন্দাবেস্তায় যুগ-যুগ ধরে এই তত্ত্ব পৃথিবীর মহামানবেরা করছেন প্রচার। তোমরা চন্দ্রলোকবাসী সে সত্যের খবর রাখ না। স্পুটনিক আবিষ্কারের ফলে সে সত্য হৃদয়ঙ্গম করবার, জীবনে রূপায়িত করবার নতুন প্রেরণা পাবে পৃথিবীর মানুষ ও তাদের সংস্পর্শে এসে সমস্ত বিশ্বের অধিবাসী।

"মনুষ্যলোকে অতি প্রাচীনযুগে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য খুব জোরের সঙ্গে গার্গীকে বলেছিলেন, 'এই অবিনাশী ও অক্ষর তত্ত্বকে না জেনে যে যজ্ঞ-তপস্যাদি করে, তার সমস্তই নিষ্ফল, সে তত্ত্বসুখসম্ভোগ-বঞ্চিত কৃপণ।' মনুষ্যলোকে বিজ্ঞানের বিরাট জনকল্যাণ-যজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে আজ হতে চলেছে নিষ্ফল। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে সেই মহাযজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করাই আজকের দিনে মনুষ্য-লোকবাসী ও চন্দ্রলোকবাসী উভয়েরই অপরিহার্য কর্তব্য। তাতেই দূরীভূত হবে সবার জীবনের দৈন্য, নৈরাশ্য ও কার্পণ্য।

"চন্দ্রলোকবাসী বন্ধুগণ, পৃথিবীর মানুষ চন্দ্রলোকের ওপর হামলা করবে—এই আশঙ্কা অমূলক। বিজ্ঞানের দৌলতে পৃথিবীর মানুষ আজ বেশ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে যুদ্ধের ফল অতি ভয়াবহ। বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত মারণাস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত হলে সমস্ত মানবজাতির সত্তা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যেতে পারে, একথা পৃথিবীর অনেক মনীষী আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করছেন।

সেজন্যই পৃথিবীতে আজ শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রভূত চেষ্টা। সঙ্কীর্ণতা—তা প্রাদেশিকই হোক, অর্থনৈতিক হোক, রাজনৈতিকই হোক, আর তথাকথিত ধর্মীয়ই হোক—মানুষের মনে বিদ্বেষ জাগিয়ে তাকে করে যুদ্ধোন্মুখ। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম ভেবে মানুষ আজ তার উলটো পথে চলতে আরম্ভ করেছে। আজ তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সারা জগতের মানুষের কল্যাণমূলক জীবন-দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি আবিষ্কারের ও জীবনে তার প্রয়োগের চেষ্টায় তৎপর। চন্দ্রলোক ও মনুষ্যলোকের ভিতর স্পুটনিক মারফত যে-যোগসূত্র আজ স্থাপিত হলো, তাতে এই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা চন্দ্রলোক থেকেও হবে বিলুপ্ত এবং পৃথিবীতে যেমন বহু শতকের ভ্রান্ত চেষ্টার পর জনগণের ব্যাপক ও সামগ্রিক কল্যাণকেই করা হচ্ছে সমস্ত সংস্থার প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য, চন্দ্রলোকেও হবে তার পুনরাবৃত্তি।

"পৃথিবীর মানুষেরও এতে হবে বিশেষ মঙ্গল। কারণ তারা এতকাল শুধু পৃথিবীর কথাই ভেবেছে। চন্দ্রলোকের সংস্পর্শে এসে সারা জগতের সকল জীবের কল্যাণ সম্বন্ধে তারা হবে সজাগ ও সচেতন।

"আড়াই হাজার বছর আগে পৃথিবীরই এক মহামানব তথাগত বুদ্ধ প্রচার করেছেন, 'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু'—সব প্রাণী সুখী হোক।"

এমন সময় ঘরের ছিটকিনি না-লাগানো জানালা বাতাসে দেওয়ালে লেগে হলো খট্-খট্ শব্দ, আর ঘুম গেল ভেঙে। স্বপ্নমঙ্গলের এমন অপ্রত্যাশিত অবসানে স্পুটনিকে করে পৃথিবীতে ফিরে আসার লোভনীয় অভিজ্ঞতা থেকে হলাম বঞ্চিত। দেখি সেই পুরানো ঘরে ভাঙা খাটে আছি শুয়ে; আর গভীর রাতের অন্ধকার বিজলীবাতির ক্রমবর্ধমান আলোতে চোখের সামনে 'জগন্নাথ হলে'র ত্রিতল প্রাসাদ তার সুপ্তিমগ্ন যুবশক্তি নিয়ে করছে জ্বলজ্বল।

মনোবিশ্লেষণের নিয়মে প্রগতিপন্থীরা আমার এই স্বপ্নের পেছনে অবচেতন মনের কোন অবদমিত ইচ্ছার অভিব্যক্তি আবিষ্কার করবেন, তা জানি না; তবে আন্তরিক ও অকপট প্রার্থনা—আমার স্বপ্নলোকের আদর্শ জীবলোকে মূর্ত ও বাস্তব হয়ে উঠুক।* □

* ৬১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা

কাশ্মীরে অমরনাথ

স্বামী প্রকাশানন্দ

মানুষ নিত্য নূতন চায়—প্রকৃতির নব-নব লীলাভূমি সন্দর্শন করিয়া প্রাণ-মন চরিতার্থ করিতে বাসনা করে, অন্তর্জগতের নব-নব ভাব উপলব্ধি করিতে সতত যত্নবান হয়। আজ যেস্থান অতীব নয়নপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়, কাল তাহা পুরাতন হইয়া যায়। আজ যে-ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া লোকে অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করে, কাল তাহার তত আকর্ষণ থাকে না। ইহাই মানব প্রকৃতির অনিবার্য নিয়ম। এই মানব প্রকৃতির বশীভূত হইয়া যথায় প্রাকৃতিক যাবতীয় সৌন্দর্যের একত্র সমাবেশ, ভূস্বর্গ সেই কাশ্মীর এবং বিশেষত কাশ্মীরস্থ নিখিল সৌন্দর্যের খনি স্বরূপ অমরনাথ তীর্থ দর্শনাভিলাষে ১৩০৮ সালের ১৮ চৈত্র রাওয়ালপিণ্ডি উপস্থিত হইলাম। রাওয়ালপিণ্ডি নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের একটি বড় স্টেশন। বহু পূর্বে ইহাই সীমান্ত-প্রদেশ বলিয়া গণ্য ছিল, পরে পেশোয়ার এবং কোহাট পর্যন্ত রেল যাওয়াতে সীমান্ত-প্রদেশ অনেক পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে।

যদিও নানাদেশ ভ্রমণ ও তীর্থাদি গমন বাসনা দ্বারা সাধকজীবনের উচ্চস্তরে বহু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, যাহা লক্ষ্য করিয়া সাধক গাহিয়াছেন, "তীর্থভ্রমণ দুঃখগমন, মন উচাটন কর না রে", যদিও উদ্দেশ্যবিহীন ভবঘুরে হইয়া জীব ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া যায়, তথাপি ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে, এক অবস্থায় ইহা অতীব আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন দেশাদি ভ্রমণচ্ছলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া অনেক বহুদর্শিতা জন্মে এবং আজন্ম বদ্ধমূল ভ্রমসংস্কার সকল হৃদয় হইতে অপসারিত হয়। তীর্থাদি স্থানে সাধুসঙ্গলাভে অনেকসময় চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া মন উন্নত হয়। পদব্রজে তীর্থাদি ভ্রমণে স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে। তীর্থাদি গমনকে কায়িক তপস্যা বলে। এইসমস্ত কারণে সাধুদিগের চারিধাম করিবার বিধি আছে। গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বেষ্টিত থাকিয়া আলস্যবশত অনেকেই ঘরের বাহির হইতে চান না। মৃত্যুতুল্য সঙ্কীর্ণতাকে হৃদয়ে লইয়া জড়ভরত হইয়া ঘরের কোণে বসিয়া বসিয়া আমাদের দেশ তো অবনতির আবর্তে দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। কিন্তু ভিন্ন দেশে গিয়া ভিন্ন দেশের শিল্পাদি, কার্যকারিতা, একতা প্রভৃতি সদগুণ শিক্ষা করিতে পারিলে আজ বোধহয় আমাদের এ-অবস্থা হইত না।

কাশ্মীরে যাইবার অনেকগুলি পথ আছে। (১) নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের গুজরাট স্টেশন হইতে রাজাওরি হইয়া সমুদ্র সমতল হইতে ৮২০০ ফিট উচ্চ রতনপীর নামক পাশ এবং ১১৩০০ ফিট উচ্চ পীরপঞ্চাল পাশ পার হইয়া ইসলামাবাদ (Islamabad) হইয়া শ্রীনগরে যাইতে হয়। (২) নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের ঝিলাম স্টেশন হইতে কাশ্মীরের করদ পুঞ্চ রাজ্যের মধ্য দিয়া সমুদ্র

সমতল হইতে ৮৫০০ ফিট উচ্চ হাজ্জিপীর পাশ পার হইয়া বরাহমুলা দিয়া শ্রীনগর যাইতে হয়। (৩) উক্ত রেলওয়ের ওয়াজিরাবাদ হইতে যে শাখা-লাইন শিয়ালকোট হইয়া জম্মু পর্যন্ত গিয়াছে তাহা দিয়া জম্মু যাইতে হয়। এই জম্মু রাজ্যও কাশ্মীর মহারাজের অধীন এবং জম্মু শহর মহারাজের শীতাবাস ও কাশ্মীর গ্রীষ্মাবাস। এই জম্মু হইতে পার্বতীয় পথ দিয়া সমুদ্র সমতল হইতে ৯৩০০ ফিট উচ্চ বানিহাল পাশ দিয়া ইসলামাবাদ হইয়া এক্কা করিয়া কিংবা উহার অর্ধমাইল দক্ষিণ খান্নাবল হইতে নৌকাযোগে শ্রীনগর যাওয়া যায়। (৪) জম্মু হইতে আকনুর ও রাজাওরি হইয়া প্রথমোক্ত রতনপীর এবং পীরপঞ্চাল পাশ পার হইয়া কাশ্মীরে যাওয়া যায়। (৫) এই পথ নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের হাসন আবদাল স্টেশন হইতে এবোটাবাদ ও মুজফ্ফরাবাদ হইয়া ঝিলাম ভ্যালি রোডে আসিয়া মিশিয়াছে। (৬) রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ব্রিটিশ স্টেশন মরি পাহাড়ের নিচে দিয়া ঝিলাম[১] নদীর ধার দিয়া বরাবর গিয়াছে। ইহাকে ঝিলাম ভ্যালি রোড বলে।

উপরোক্ত প্রথম চারিটি পথ বর্ষার পর ৩/৪ মাস খোলা থাকে মাত্র। অন্যসময় বরফের জন্য দুর্গম হয়। কুলি, ঘোড়া, ঝাঁপান, পালকি পাওয়া যায়। এবোটাবাদে ব্রিটিশ স্টেশন বলিয়া উক্ত পথে টাঙ্গা, এক্কা প্রভৃতি পাওয়া যায়। রাওয়ালপিণ্ডির পথ দূর হইলেও অন্যান্য পথ অপেক্ষা অনেক সহজ। এই পথ দিয়াই মহারাজ ও তাঁহার রাজ্যের কর্মচারীসকল যাতায়াত করেন। সাহেব-মেম প্রভৃতি যাঁহারা কাশ্মীর দেখিতে যান, তাঁহারাও সাধারণত এই পথ দিয়াই গমনাগমন করেন। এপথে টাঙ্গা, এক্কা প্রভৃতি সমস্ত পাওয়া যায়। ধাঞ্জীভাই এবং তাঁহার পুত্রেরা টাঙ্গার কন্ট্রাক্ট লইয়া বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন। পুরো টাঙ্গার ভাড়া ১০০ টাকা, কখনো কখনো ১৩০/৪০ টাকা পর্যন্ত বাড়ে। একটি লোকের স্থানের জন্য ভাড়া ৩৩ টাকা। এক্কার স্টেট হইতে ধার্য ভাড়া সাড়ে বাইশ টাকা। ইহারও ভাড়া কখনো কখনো ৩০/৩২ টাকা পর্যন্ত বাড়ে। একটি লোকের শেয়ারে ভাড়া ৬/৭ টাকা।

অমরনাথ যাত্রার বিলম্ব আছে বলিয়া রাওয়ালপিণ্ডি কালীবাড়িতে আমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কালীবাড়ি স্টেশনের খুব নিকট। একটি সদাশয় বাঙালী ব্রাহ্মণের উৎসাহে আম্বালা, রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানে কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙালীগণ বিদেশে যাইয়া স্থানাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পান। তাঁহাদের পক্ষে কালীবাড়ি ২/১ দিন থাকিবার বেশ সুবিধাজনক স্থান। যেসমস্ত বাঙালীকে চাকরি উপলক্ষে বিদেশে থাকিতে হয়, তাঁহাদের পূজাদি ও বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম কালীবাড়ির বাঙালী পূজারী দ্বারা সংসাধিত হয়। যখন অফিস পাহাড় হইতে দেশে এবং দেশ হইতে পাহাড়ে যায়, তখন অফিসের কোন কোন কর্মচারী কালীবাড়িতে ২/১ দিন বিশ্রাম করিয়া যাইবার সময় কালীমাতাকে কিছু প্রণামী দিয়া যান। কালীবাড়ির ব্যয়াদি স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের চাঁদা দ্বারা নির্বাহ হয়। কালীবাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে তের পার্বণ প্রায় কিছুই বাদ যায় না। রাওয়ালপিণ্ডির কালীবাড়িতে একটি রিডিং রুমও আছে। সাধু-সন্ন্যাসিগণ মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন। আমাকে ইঁহারা খুব যত্ন করিয়াছিলেন।

স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোক কাশ্মীর যাইবার জন্য আমাকে এক্কা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রাওয়ালপিণ্ডি হইতে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ১৮৯ মাইল। টাঙ্গায় আড়াই দিনে শ্রীনগর পৌঁছান যায়। টাঙ্গার জন্য ৪/৫ মাইল অন্তর ঘোড়ার ডাকের বন্দোবস্ত আছে। এক্কা এক ঘোড়াতেই বরাবর যায়। তজ্জন্য এক্কা ৬ দিনে শ্রীনগর পৌঁছায়। এক্কায় যিনি কিছুক্ষণ চড়িয়াছেন, তিনিই ইহার কষ্ট বিশেষরূপে অবগত আছেন। অন্তত দুইখানি গাড়ি একত্র না হইলে এক্কার ঘোড়া প্রায় চলিতে চায় না; যখন জোরে চলিতে থাকে, নাড়ি-ভুঁড়ি একেবারে ওলট-পালট হইবার যোগাড়। ২ জ্যৈষ্ঠ বৈকাল ৫টার সময় আমাদের এক্কা ছাড়িল। প্রায় ১৭/১৮ মাইল পরে, আমরা রীতিমতো পাহাড়ের ভিতর পড়িলাম। রাত্রি ১০টার সময় সত্র নামক স্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লইয়াছিলাম। এক্কা সমস্ত রাত্রি চড়াই করিয়া পরদিন প্রাতে মরি পাহাড়ের দুই মাইল নিচে রাওয়ালপিণ্ডি হইতে প্রায় ৩৯ মাইল দূরবর্তী ঘোড়াগলি নামক স্থানে উপস্থিত হইল। এপথে টাঙ্গা, এক্কা প্রভৃতির সুবিধা হইলেও রাত্রে থাকিবার অত্যন্ত স্থানাভাব। বেশি ভাড়া দিলে দুই-একটি ঘর পাওয়া যায়। কোন পাহাড়ে তাহা পাওয়াও দুষ্কর। ডুমেল, কোহালা, রামপুর, উড়ী, চকোটি, বরাহমূলা প্রভৃতি স্থানে সরকারি ডাকবাঙলা আছে। দোকানদারদের নিকট রাত্রে শুইবার জন্য খাটিয়া লইলে দুই-পয়সা খাটিয়ার ভাড়া দিতে হয়। ঝিমর নামে এক ছোট জাত আছে, তাহারা রুটি, ভাত, ডাল, তরকারি বিক্রয় করে। ছোট জাত বলিয়া সকলে তাহাদের হাতে খায় না। পুরি, ফুলুরি, দুগ্ধ, মিছরি, বাতাসা, জিলিপি, গজা প্রভৃতি সামান্য মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। ডাল, চাল প্রায় পাওয়া যায় না। আস্ত মসুর ও কলাই ডাল, আটা, আলু, মসলা প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানে আধঘণ্টা বিশ্রামের পর পুনরায় এক্কা চলিতে লাগিল।

বেলা ১২টার সময় ডুমেল পৌঁছিলাম। ইহার অপর পারে মজঃফরাবাদ। এখানে কৃষ্ণগঙ্গা ঝিলামের সহিত মিশিয়াছে। সঙ্গমে স্নান করিয়া দোকান হইতে কিঞ্চিৎ পুরি ও হালুয়া কিনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় এক পাহাড়ি বর বিবাহ করিয়া গৃহে যাইতেছে, দেখিলাম। সঙ্গিগণ বাজনার তালে তালে তরবারি খেলিতেছে। বরের কোমরে কোষবদ্ধ অসি রহিয়াছে। প্রায় ৩টার সময় এক্কা ছাড়িয়া সন্ধ্যার সময় কোহালার নিকট পুল পার হইয়া দুই মাইল দূরে বর্ষালা নামক স্থানে রাত্রিযাপন করিলাম। পুলের ওপার হইতে কাশ্মীর মহারাজের এলাকা। টাঙ্গা ও এক্কা পিছু যথাক্রমে একটাকা ও আট আনা পোল ট্যাক্স দিতে হয়। পুল পার হইয়া মহারাজের রাজ্যে প্রবেশ করিলে ব্যবহার্য বস্ত্র ও শয্যাদি ব্যতীত নূতন জিনিসপত্রের কিংবা ব্যবসাদির জন্য মালপত্রের উপর কিছু কিছু কর দিতে হয়। কাশ্মীর রাজ্যে যাহাতে প্লেগ প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য কোহালা, উড়ী ও বরাহমূলাতে প্লেগ পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে। বর্ষালায় একটি মাত্র দোকান আছে। তথায় বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। প্রাতে এক্কা ছাড়িয়া মধ্যে এক স্থানে একটু বিশ্রাম করিয়া বেলা ৫টার সময় ঘেড়ী পৌঁছিলাম। এখানে ভাল ডাল চাল পাওয়া গেল। রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়িয়া আর অন্নাহার হয় নাই। এক্কাতে গাড়োয়ান ছাড়া আর তিনজন বসিতে পারে। আমার সঙ্গে একটি বাঙালী যুবক কাশ্মীরে চাকরি অন্বেষণে যাইতেছিলেন।

আরেকটি পাঞ্জাবী ছিলেন। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি গুলমার্গ পাহাড়ে টেলিগ্রাফ-মাস্টার নিযুক্ত হইয়া যাইতেছিলেন। শ্রীনগর হইতে দক্ষিণ দিকে তুষারাচ্ছন্ন গুলমার্গ পাহাড় অতি সুন্দর দেখায়। এখানে বসন্তে গোলাপ ফুল ফোটে বলিয়া ইহার নাম গুলমার্গ হইয়াছে। শ্রীনগরে গরম পড়িলে অনেক সাহেব-মেম এইখানে যান। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির নিকট অনেক বড়ি ছিল। আজ ভাত ও আলুবড়ির ঝোল প্রস্তুত করিয়া তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। এস্থানে একটি সরাই ছিল। তথায় রাত্রি যাপনকরত প্রাতে ৪টার সময় গাড়ি ছাড়িয়া মধ্যে একস্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বৈকালে প্রায় সন্ধ্যার সময় উড়ী পৌঁছিলাম। পথে আসিতে আসিতে মরী পাহাড়ের নিকট বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইয়াছিল। মধ্যে বেশি ঠাণ্ডা পাওয়া যায় নাই। এখানে আজ বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল। চারি পার্শ্বের পাহাড়ে বরফ পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। আমাদের আসিতে কিঞ্চিৎ দেরি হওয়াতে দোকানে আমরা স্থান পাইলাম না। সন্ধ্যার পূর্বেই অনেক লোক স্থান অধিকার করিয়াছিল। এখানে একে অত্যন্ত শীত, তার উপর স্থানাভাব, এক্কাদিগের ঘোড়া রাখিবার স্থানে কিঞ্চিৎ জায়গা পাওয়া গেল। দোকান হইতে খাটিয়া লইয়া কোনরূপে রাত্রিযাপন করা হইল। এখানে দুগ্ধ ও গরম জিলিপি পাওয়ায় জলযোগের কষ্ট হয় নাই। এখানে প্লেগ পরীক্ষার জন্য এক্কা ছাড়িতে প্রায় বেলা ৭টা হইল। ১২টার সময় বরাহমূলা পৌঁছিলাম। এখান হইতে রাস্তা সমতল ও ঝিলামের স্রোতও কম। অনেকে এস্থান হইতে নৌকা করিয়া শ্রীনগর যায়। বরাহমূলা হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত রাস্তার দুধারে লম্বা-লম্বা সবেদা (Poplars) গাছের সার অতি সুন্দর দেখায়। বরাহমূলা হইতে শ্রীনগর ৩২ মাইল। বরাহমূলা ছাড়িয়া চারিদিকে পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। চারিদিকে তুষারধবলিত অভ্রভেদী পাহাড়সকল বহুদূর বিস্তৃত কাশ্মীর উপত্যকাকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। রাত্রে পওন নামক স্থানে থাকিয়া পরদিন প্রাতে ৭টার সময় শ্রীনগর পৌঁছিলাম।

কাশ্মীর উপত্যকা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ৭৫ মাইল। উত্তরে সমুদ্র সমতল হইতে ১৩৫০০ ফিট উচ্চ ব্রাজিল ও ১৩২০০ ফিট উচ্চ কাত্রী পাশ পার হইয়া গিলগিট দিয়া রাশিয়া সীমানায় যাওয়া যায়। উত্তরপূর্ব কোণস্থিত সমুদ্র সমতল হইতে ১১৩০০ ফিট উচ্চ জোজিলা পাশ হইয়া তিব্বত রাজ্যের অধীন লাডাক যাইবার পথ। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীনগরে ঝিলমের উপর ৭টি পুল আছে। শ্রীনগর সমুদ্র সমতল হইতে প্রায় ৫৪০০ ফিট উচ্চ। মহারাজের প্রাসাদ ঝিলামের উপর অবস্থিত। বর্তমান মহারাজা প্রতাপ সিংহের এক্ষণে বিশেষ ক্ষমতা নাই। রেসিডেন্টই হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ইঁহার পিতা মহাতেজস্বী বীরেন্দ্রকেশরী মহারাজ রণবীর সিংহের সময় কাশ্মীর স্বাধীন ছিল।

এখানে দেখিবার অনেক জিনিস আছে। ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক কাশ্মীরের সৌন্দর্য ভূরি-ভূরি লিখিত হইয়াছে। সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা হইতে সাহেবগণ ইহার মনোহর দৃশ্য দর্শন করিতে আইসে। শহরের দেড় মাইল পূর্বে শঙ্করাচা বা তখ্ত সুলেমান নামে এক অতি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। ইহার উপর এক প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এই পাহাড়ের উপর উঠিলে শ্রীনগর একখানি ছবি

মতন দেখায়। শহরখানি যেন জলের উপর ভাসিতেছে বোধ হয়। কারণ, উত্তরে ডাল নামক ক্ষুদ্র হ্রদ এবং অন্য কয়েক ধারে নদী ও খাল। নদী, হ্রদ, খাল ইত্যাদির একত্র সমাবেশে ইহার সৌন্দর্য অতুলনীয় হইয়াছে। নানাবর্ণের ক্ষেত্রগুলি ও ময়দান সকল দেখিয়া বোধ হয়, যেন বিভিন্ন বর্ণের গালিচা বিস্তৃত রহিয়াছে। জমি অত্যন্ত উর্বর। প্রচুর পরিমাণে ধান্য এবং পটল ছাড়া প্রায় সর্বপ্রকার তরকারি উৎপন্ন হয়। সর্বোৎকৃষ্ট ধান্য টাকায় ১৬ সের। মটর, সরিষা প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

বেগুন পয়সায় ১৬টা, ওলকপি ১০/১১টা পাওয়া যায়। ঘৃত টাকায় দেড় সের। গ্রামে দুই সের, আড়াই সের করিয়া পাওয়া যায়। সাহেব মেমদিগের অত্যধিক আগমনে এবং অন্যান্য দেশের সহিত সংযোগবৃদ্ধিবশত জিনিসপত্র সমস্ত মহার্ঘ হইতেছে। মাংসের সের ১৪ পয়সা হইয়াছে, দুগ্ধ টাকায় ১৬ সের হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে মাংস আরো সস্তা ছিল ও দুগ্ধ টাকায় ৩২ সের করিয়া পাওয়া যাইত। আবার যাহা কখনো আশা করি নাই, কাশ্মীরে সেই ধান্যদুর্ভিক্ষ আজকাল শুনা যাইতেছে। জানি না, ভবিষ্যৎ গর্ভে আরো কত কি লুক্কায়িত আছে। এখানে নানাপ্রকারের আঙুর, আপেল, ন্যাসপাতি, পীচ, ববুগোষা, তুঁত, চেরি প্রভৃতি সুমিষ্ট নানাবিধ ফল এত প্রচুর পরিমাণে হয় যে, গরিব লোকেরা পর্যন্ত ফলসকল ফেলিয়া ছড়াইয়া খাইয়া থাকে। শ্রীনগরের উত্তরপূর্বে ৮ মাইল দূরস্থ পাম্পুর নামক স্থানে জাফরাণ বা কেশর উৎপন্ন হয়। যখন উহার ফুল ফোটে, তখন দেখিতে অতি সুন্দর হয়। অনেকে ইহা দেখিবার জন্য গিয়া থাকে। কাশ্মীরের উত্তরপূর্বস্থ কাষ্টওয়ার নামক পাহাড়েও জাফরাণ উৎপন্ন হয়।

শ্রীনগর শহরের ভিতর অতি অপরিষ্কার। কাশ্মীরীরা অনেকসময় পথের ধারেই মলত্যাগ করে। শুনা যায়, ইহাদের মধ্যে ধারণা, বাহিরে মলত্যাগ ধনীলোকের চিহ্নস্বরূপ। ইংরাজেরা যে-অংশে বাস করে, সেই অংশ বেশ পরিষ্কার ও তথাকার রাস্তাও বেশ বড় এবং রাস্তার দুধারে সবেদা গাছের সার থাকায় রাস্তার সৌন্দর্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

ডাল হ্রদ অত্যন্ত গভীর। ইহার জল অতি স্বচ্ছ, জলের নিচে গাছসকল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্বে কাশ্মীর উপত্যকা একটি হ্রদ ছিল; শ্রীনগর দেখিলে তাহার সার্থকতা কতক বুঝা যায়। ডালের উপর খুব পানফল হয়। ডালে যখন পদ্ম ফোটে তখন দেখিতে অতি মনোরম হয়। একদিন চাঁদনী রাত্রে কয়েকটি বন্ধুর সহিত ডালে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেসময় খুব পদ্ম ফুটিয়াছিল। একদিকে শহর ও তিনদিকে পাহাড়। মৃদু মৃদু পবনে জল, প্রস্ফুটিত পদ্ম ও পদ্মপত্রসকল ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার সহিত চন্দ্রপ্রতিবিম্ব শতধা বিভক্ত হইয়া খেলা করিতেছিল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বন্ধুগণ ভজন গাহিতেছিলেন। সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। ডালের পশ্চিমদিকে হরিপর্বত। ইহা একটি ক্ষুদ্র পাহাড়, ইহার উপর পুরাতন কেল্লা। কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের পাশ ব্যতীত ইহার ভিতর প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। ইহার ভিতর কালীদেবীর একটি সুন্দর মন্দির আছে। ইহাতে বড় বড় কামান সযত্নে রক্ষিত আছে। বেলা ১২টা ও রাত্রি ১০টার সময় এখান হইতে দুইবার তোপ দাগা হয়।

ডালের ধারে ধারে নিষাদবাগ, পরীভবন, শালিমারবাগ প্রভৃতি কতকগুলি মোঘলদিগের বিলাসকানন দেখিতে পাওয়া যায়। ডালের উত্তরে হারবন নাম স্থানে জলের কারখানা। খুব বড় পুকুরের ন্যায় একটি গভীর স্থানে পাহাড় হইতে জল আসিয়া জমিতেছে এবং তথা হইতে শ্রীনগরে কলের জল আসিতেছে। ডালে ভাসমান বাগান একটি দেখিবার জিনিস। পদ্মের মৃণালের ন্যায় একপ্রকার ঘাসের উপর মাটি জমাইয়া ভাসমান বাগান প্রস্তুত হয়। ইহার উপর প্রচুর পরিমাণে শশা, ফুটি, কাঁকুড় প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়। এই বাগানে কখনো কখনো চুরি হইয়া থাকে। ইহার কিয়দংশ ভাসাইয়া অপরস্থানে লইয়া যাওয়া যায়। ডালের পূর্বতীরে রাস্তার উপর হইতে পাহাড়ে একটু চড়াই করিয়া চিসাম সাই নামক সুন্দর একটি ঝরণা দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীনগর হইতে ২৫ মাইল নিচে উলর নামক একটি সুন্দর হ্রদ আছে। ইহার চারিদিকে পাহাড়। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ৬/৭ মাইল হইবে। নৌকা হইতে ইহার দৃশ্য অতি সুন্দর। ইহার জল অতি গভীর। বেলা ৩টার সময় প্রায় ঝড় উঠে, অনেক সময় ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া গিয়াছে। এইজন্য মাঝিরা সকালে হ্রদ পার হয় কারণ, প্রাতে ঝড় হয় না ও জল স্থির থাকে।

শ্রীনগর হইতে ৭/৮ মাইল নিচে ক্ষীরভবানী নামে একটি কুণ্ড আছে। নদী ও খাল দিয়া যাইতে হয়। মাটির নিচে হইতে জল উঠিতেছে! উহার বর্ণ সময়ে সময়ে পরিবর্তন হয়। আমরা যাইয়া জলের গোলাপী বর্ণ দেখিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে কালো রঙও দেখা গিয়াছিল। এই কুণ্ডে প্রত্যহ প্রায় এক মণের অধিক ক্ষীর (পরমান্ন) ঢালা হয়। এখানে একটি রেশম কুঠি আছে। বাষ্পীয় যন্ত্রে জল গরম হইয়া নলযোগে আসিতেছে। তাহাতে একজন গুটিসকল সিদ্ধ করিয়া দিতেছে। একটি ছেলে ৩/৪টি সিদ্ধ গুটি লইয়া উহার ছাল হইতে রেশম বাহির করিয়া ৩/৪ গাছি রেশম একত্র করিয়া দিতেছে। আরেকটি ছেলে লাটাইয়ের মতো একটি কল ঘুরাইয়া তাহাতে জড়াইয়া লইতেছে। আরেক স্থানে যন্ত্রদ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ রেশম গাঁট বাঁধিয়া রাখা হইতেছে। এইস্থানে রেশম প্রস্তুত করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তথা হইতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৮৭৫ সালে এখানে একটি কৌতুকাগার স্থাপিত হয়। কৌতুকাগারে ভাল ভাল কাশ্মীরী শাল, কার্পেট, গব্বা; পুরাতন মূল্যবান তরবারি, বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রাদি, কস্তুরীমৃগ, তিব্বতীয় হরিণ, কৃষ্ণভল্লুক, ব্যাঘ্র, নানাজাতীয় পক্ষীসমূহ; কাশ্মীরী রৌপ্য ও সুবর্ণলঙ্কারাদি; চিলকী নামক কাশ্মীরী মুদ্রা ও বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রাসকল; প্রস্তরের হাঁড়ি, নানাজাতীয় প্রস্তর, ফসিল, কাষ্ঠনির্মিত নানাপ্রকার জিনিস ইত্যাদি দেখিবার আছে। একখানি শালের উপর সমুদয় শ্রীনগর শহরটি অঙ্কিত আছে। পশমের কাপড়ের উপর সূচীর কার্য অতি সুন্দর। ইসলামাবাদ এবং অন্যান্য স্থানে অনেকে শাল, কম্বল, পট্টু, লুই প্রভৃতি প্রস্তুত করে। ইহাই অনেকের জীবিকা। এস্থানে কাগজের সুন্দর বাক্স ও ছবির ফ্রেম প্রস্তুত করে, ইহাকে পেপিরস মেসি কহে। তাম্রের সুন্দর পাত্রাদিও প্রস্তুত হয়।

ডালের দক্ষিণপূর্ব কোণে গুপকার নামক স্থানে চেরি, আপেল প্রভৃতি হইতে মদ প্রস্তুত হইবার কল আছে। একজন ফরাসী দেশীয় সাহেবের তত্ত্বাবধানে ইহা আছে। কার্পেট, গব্বা প্রভৃতিরও একটি কুঠি আছে।

এখানে দুইটি হাসপাতাল আছে। একটি রাজসংক্রান্ত ও আরেকটি ক্রিশ্চান মিশন দ্বারা চালিত। এইরূপ একটি হিন্দু স্কুল ও আরেকটি মিশন স্কুল আছে। এখানে মধ্য ইংরেজী পর্যন্ত পড়ান হয়। কাশ্মীরে প্রবেশিকা পরীক্ষার বিদ্যালয় নাই। শুনা যায়, পূর্বে এখানে খুব বিদ্যার চর্চা ছিল। এখানে সারদা দেবীর মন্দির আছে। যত বড় বড় পণ্ডিতকে একবার এখানে আসিতে হইত। শুনা যায়, শঙ্করাচার্য এখানে আসিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে সমস্ত বিদ্যা লোপ পাইয়াছিল। এখন ধীরে ধীরে কাশ্মীরে বিদ্যার চর্চা বাড়িতেছে। রাজ্য সরকার হইতে খরচ পাইয়া ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা অন্য কোন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়া পুনরায় রাজ্য সরকারে কর্ম করিতে হইবে, এক্ষণে এইরূপ নিয়ম হইয়াছে। একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত সহকারী অস্ত্রচিকিৎসক হইয়াছেন। ৩/৪ জন পণ্ডিত সহকারী জজ ও উকিল হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এখানে উকিল হইতে ওকালতি পরীক্ষায় পাশ হইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

এস্থানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। মুসলমান রাজত্বের সময়ে বোধহয় অধিকাংশই মুসলমান হইয়াছিল। অনেক মুসলমানের নাম হিন্দু ও মুসলমান নামের একত্র মিলনে উৎপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের আচার-ব্যবহারে এত মিল যে, এক কাশ্মীরী হিন্দু অন্নাদি রন্ধন করিয়া কম্বলের ভিতরে বাঁধিয়া কাশ্মীরী মুসলমানের মাথায় দিয়া অপর হিন্দুকে প্রেরণ করিলে উহা গ্রহণে তাহার আপত্তি হইবে না। স্পর্শ না করিলেই হইল। কপালে কেশর ও চন্দনের চিহ্ন ব্যতীত মুসলমান হইতে হিন্দু বাছিয়া লওয়া দুষ্কর। ইহাদিগের ভাষা পাঞ্জাবী, হিন্দি ও সিন্ধি ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।

হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ছত্রী (শূদ্র) দুই জাতি সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদিগের দুইটি মসজিদ আছে। হিন্দুদের শিবমন্দিরই অধিক। ইহাদিগের অধিকাংশই শৈব। শক্তিপূজাও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদিগের পদবী কোল দেখিয়া তান্ত্রিক কৌলের কথা মনে পড়ে। কাশ্মীরী স্ত্রী ও পুরুষের ঝলঝলে আলখাল্লার ন্যায় প্রায় এক সাধারণ পোশাক দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষেরা চাদর ও পাগড়ি পরে। স্ত্রীলোকেরা মাথায় ও পিঠে একটি ছোট চাদর দেয়। স্ত্রী-পুরুষের রঙ খুব সুন্দর হইলেও সেরূপ গঠন বা মুখশ্রী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমি এখানে উচ্চপদস্থ একটি বাঙালী ভদ্রলোকের বাটীতে ছিলাম। এখানে ১৬/১৭ জন বাঙালী আছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরে থাকেন এবং শীতকালে জম্মু নামিয়া যান। প্রধান জজ, প্রধান চিকিৎসক, রিসেপ্‌সন ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদ বাঙালী অধিকার করিয়া আছেন।

আমি যখন শ্রীনগরে উপস্থিত হইলাম, তখন অমরনাথ যাত্রার বিলম্ব থাকিলেও সাধু-সন্ন্যাসিগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীনগরের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বর্তমান মহারাজের পিতামহ গোলাপ সিংহের

সমাধি মন্দির রামবাগ নামক স্থানে সাধু-সন্ন্যাসীদিগের থাকিবার বিশেষ সুবিধা। স্থানটিও নির্জন ও দুধগঙ্গা নামক একটি নদী উহার পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। আরো ২/৪টি বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের মঠ আছে। সাধু-সন্ন্যাসী ও অসহায় যাত্রীদিগের জন্য ধর্মার্থ ডিপার্টমেন্টের অনেক টাকা ব্যয়ের বন্দোবস্ত আছে। যেহেতু, বিশেষ তত্ত্বাবধানের অভাবে সাধুদিগের অত্যন্ত কষ্ট হয়। নাম লিখাইলে প্রত্যেকে এককালীন একটাকা ও প্রত্যহ কিছু বোকডা চাল ও একপয়সা করিয়া পাইয়া থাকে। অমৃতশহর হইতে দর্শনার্থী সন্ন্যাসীরা আসিয়া থাকেন। ইঁহারাই অমরনাথের পূজারী। অমরনাথের প্রতিভূস্বরূপ ছড়ী (আসাসোঁটা) মহারাজ পূজা করিয়া দক্ষিণাদি দিলে প্রায় পঞ্চমীর দিন ছড়ী শ্রীনগর হইতে যাত্রা করে। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন দর্শন হয়। ২৩ শ্রাবণ শুক্রবার পঞ্চমীর দিন শ্রীনগর পরিত্যাগ করিয়া ছড়ী পাসপুর, বিজবেয়ারা ও ইসলামাবাদ হইয়া শনিবার সন্ধ্যার সময় মটন উপস্থিত হইল। শ্রীনগর হইতে দুইটি পথ আছে। একটি স্থলপথে পাশপুর ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে, অপরটিতে গেলে ঝিলাম নদীতে উজান বাহিয়া খান্নাবল পর্যন্ত নৌকাযোগে যাওয়া যায়। খান্নাবল হইতে ইসলামাবাদ প্রায় অর্ধ মাইল।

এদেশে স্ত্রীলোকেরাও মাঝিগিরি করিয়া থাকে। নৌকায় প্রায় মাঝি ও তাহার স্ত্রী থাকে। মাঝিদিগের ঘরবাড়ি ইত্যাদি প্রায় নৌকার উপর। উহারা জন্মাবধি নৌকাতেই বসবাস করে। সাহেব কিংবা বিদেশীয় ভদ্রলোকগণ কাশ্মীর দেখিতে আসিয়া প্রায় হাউসবোটে কিংবা বড় বড় ডোঙ্গায় বাস করে। শ্রীনগরে অধিকাংশই কাঠের বাড়ি। ভাল বাড়িভাড়া প্রায় পাওয়া যায় না। বিদেশীর পক্ষে নৌকাতে থাকাই বিশেষ সুবিধা। বড় বড় হাউসবোটে পাশাপাশি ৪/৫টি ঘর থাকে। উহার ঘরসকল বৈঠকখানা, শয়নাগার, আহারের ঘর ইত্যাদি হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। আগুন জ্বালাইবার জন্য চিমনি পর্যন্ত বন্দোবস্ত আছে। বড় বড় বোটের সঙ্গে রাঁধিবার জন্য একটি ডোঙা এবং বেড়াইবার জন্য ছোট একখানি শিকারা থাকে। বড় বোটের মাসিক ভাড়া ৩০/৪০ টাকা। ১৫/১৬ টাকাতে ছোট ডোঙা বোট পাওয়া যায়। এদেশে নৌকায় হাল থাকে না। গঙ্গাতে জেলে ডিঙির দাঁড়ের ন্যায় উহাই হালের কার্য করে।

আমি তৃতীয়ার দিন শুক্রবার ১২টার সময় নৌকাযোগে ইসলামাবাদ পৌঁছিলাম। এস্থানে অনেকে অনন্তনাগ ও এস্থান হইতে কিছুদূরবর্তী অচ্ছেদ সরোবর ও বৈরীনাগ (মাটির ভিতর হইতে জল উঠিতেছে) দেখিতে যায়। একটি কুলি করিয়া বেলা ৩টার সময় এস্থান হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত মটন পৌঁছিলাম। মার্তণ্ড হইতে ইহার নাম মটন হইয়াছে। ইহার অপর একটি নাম ববন। এখানে মার্তণ্ডের একটি মন্দির আছে। এখানে সুন্দর দুইটি কুণ্ড আছে। ইহাদের জল অতি স্বচ্ছ। ল্যাটা মাছের ন্যায় ছোট ছোট অসংখ্য মৎস্য ইহাতে খেলা করিতেছে। যাত্রিগণ পাহাড়ীদিগের নিকট ভুট্টার খই কিনিয়া মৎস্যদিগকে দিলে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া খাইতে ও লাফালাফি করিতে থাকে। এখানে খুব বড় গুহা আছে। আলো জ্বালিয়া একদিন আমরা ভিতরে গিয়াছিলাম। কিছু দূর যাইয়া বাম পার্শ্বে আরেকটি গর্ত দেখিলাম। তাহাতে একটি আসনের মতো বড় পাথর ও চারি পার্শ্বে হাড় পড়িয়া রহিয়াছে। শুনা যায়, কোন

মহাপুরুষ উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া আর বাহির হন নাই; তিনি সমাধিস্থ হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। শুনিলাম, ইহা ৬০/৭০ হাত লম্বা। এখানে বিনোদবিহারী দে নামক একটি বাঙালী ভদ্রলোক আছেন। ইনি লিডার নদী হইতে যে মার্তণ্ড খাল কাটা হইতেছে, তাহারই জন্য সাব-ডিভিশন অফিসার হইয়া এখানে আসিয়াছেন। বাঙালী যাত্রিগণকে ইনি অতি সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এখানে দুই দিন থাকিয়া পরদিন প্রত্যূষে যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে আর দুইটি বাঙালী যুবক ছিলেন। প্রায় ১১টার সময় মটন হইতে ১০ মাইল দূরবর্তী আয়াস-মোকাম নামক পড়ওয়ায় পৌঁছিলাম।

ইহার আরেকটি নাম জনক-মহল। এইখানে পাহাড়ের উপর একটি সমাধি মন্দির আছে। ইহাকে হিন্দুরা জনক রাজার সমাধিস্থান বলে এবং মুসলমানেরা ইহাকে জনক সাহ নামক কোন মুসলমান সিদ্ধপুরুষের কবর বলিয়া থাকে। এক্ষণে ইহা মুসলমানদিগের অধীন। এস্থানের অদূরে গণেশপুরা নামক স্থানে বিনোদবাবুদিগের হেড কোয়ার্টার। তজ্জন্য বিনোদবাবুকে কার্যোপলক্ষে প্রায় এখানে আসিতে হয়। এখানে বিনোদবাবুর তাঁবু ছিল। সেইদিন বিনোদবাবুর তাঁবুতেই রাত্রিযাপন করিলাম। তাঁহার লোকেরাই আমাদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিল। পরদিন আর দুইটি বাঙালী আসিয়া জুটিলেন। একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, অপরটি যুবক, তাঁহার শিষ্য। তাঁহারা ঘোড়ায় আসিতেছিলেন। একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মটনেই অমরনাথের পাণ্ডাগণের বাস। উহারা শ্রীনগরে যাইয়া যাত্রী অন্বেষণ করে। মটনে অমরনাথের জন্য কুলি, পালকি, ঝাঁপান, ডাণ্ডি, ঘোড়া প্রভৃতি পাওয়া যায়। যাতায়াতের কুলি ও মালের জন্য ঘোড়ার ভাড়া আড়াই টাকা লাগে। চড়িবার জন্য ঘোড়ার যাতায়াতের ভাড়া প্রায় ৫/৬ টাকা। ঝাঁপান, ডাণ্ডি প্রভৃতির যাতায়াতের খরচ প্রায় ৫০/৬০ টাকা লাগে।

কেদারবদ্রীর পথে যেরূপ চটি বা ধর্মশালা আছে, এপথে সেরূপ কিছুই বন্দোবস্ত নাই। যাত্রীদিগকে তাঁবু লইয়া যাইতে হয়। দোকানসকল সঙ্গে সঙ্গে যায়। আমরা মটন হইতে কিছু চাউল, ঘৃত, আটা, ডাল ইত্যাদি কিনিয়া লইয়াছিলাম। বৈকালে আয়াসমোকাম হইতে সাত মাইল দূরবর্তী বটুকোট নামক স্থানে পৌঁছিলাম। আমার সঙ্গী কয়েকজন একটি তাঁবু লইয়া গিয়াছিল। এখানে এক পয়সায় ১২টা ন্যাসপাতি পাওয়া গেল। কিছু দুগ্ধ কিনিয়া ও ফল খাইয়া রাত্রি কাটান হইল। রাত্রে অত্যন্ত বৃষ্টি ও ঝড় হওয়াতে অর্ধ রাত্রে তাঁবু পড়িয়া গেল। কুলিদিগকে সেই রাত্রে উঠাইয়া পুনরায় ভাল করিয়া তাঁবু খাটান হইল। প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলাম, অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। আকাশের একধার পরিষ্কার হইতেছে দেখিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে যাইতে যাইতে বৃষ্টি খুব বৃদ্ধি হইল। অত্যন্ত ভিজিয়া প্রায় ১১টার সময় ৮ মাইল দূরে পাহলগাম নামক স্থানে পৌঁছিলাম। ইহার আশপাশে দুই-একখানি গ্রাম থাকিলেও তাহার পরে আর গ্রাম নাই বলিয়া ইহাকে পাহলগ্রাম অর্থাৎ প্রথম গ্রাম কহে। পাহলগামের এক মাইল নিচে সাহেবদিগের অনেক তাঁবু দেখিলাম। শুনিলাম, প্রাকৃতিক সুন্দর দৃশ্য এবং জলবায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এখানে প্রায় ১৫০ সাহেব-মেম তাঁবু খাটাইয়া রহিয়াছে। এই স্থান পর্যন্ত যাত্রিগণ ছড়ি আসিবার পূর্বে আসিতে পারে। ইহার উপর যাইবার আর হুকুম নাই। এবার অনেকগুলি বাঙালী অমরনাথ দর্শনে

গিয়াছিলেন। একটি উচ্চ ভূমির উপর বাঙালীদিগের ৫টি তাঁবু পড়িয়াছিল। এখানে যাত্রিগণ একাদশী পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এবারে দুইদিন একাদশী ছিল। ২৯ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার প্রথম একাদশীর দিন ৯/১০টার সময় ছড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ধীরে ধীরে দশনামী, বৈরাগী, উদাসী, নাগা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণ ও নানাদেশীয় গৃহস্থ যাত্রিগণ আসিয়া জুটিতে লাগিল। ক্রমশ দোকানদারগণ, ডাক্তার, নায়েব, তহশীলদার এবং শ্রীনগরের সহকারী জজ, যাঁহাদের উপরে যাত্রীদিগের তত্ত্বাবধানের ভার, সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। এক ঘণ্টা মধ্যে সেস্থান অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করিল। কেহবা কাপড়ে, কেহবা কম্বলে, কেহবা ছত্র দ্বারা তাঁবুর কার্য করিয়া লইল। কেহবা ছাই মাখিয়া ধুনির আশ্রয়ে, কেহবা অল্পমাত্র গায়ের কাপড়ে সেই অসহ্য শীত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিল। এ সাধু-সন্ন্যাসীর মেলা এক দেখিবার জিনিস। তার উপর এস্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। চতুর্দিকে তুষারধবলিত অত্যুচ্চ পাহাড়সকল, নিচে লিডার নদী কলকল নাদে প্রস্তর খণ্ডসমূহের বাধা তুচ্ছ করিয়া অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। সে শব্দ এত মধুর অথচ গভীর যে, শুনিতে শুনিতে চিত্ত আপনি স্থির হইয়া যায়। প্রাণকে যেন সবেগে প্রাণারামের দিকে ছুটাইয়া লইয়া যায়। সন্ধ্যার পর সাধুদিগের ধুনি জ্বলিয়া উঠিল, ভক্তগণ কেহ স্তোত্রপাঠ, কেহ ভজন গাহিতে লাগিল, তাহার উপর চন্দ্রমা আপনার শুভ্রকিরণ ছড়াইয়া যাত্রিগণকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতে লাগিল। দ্বাদশীর দিন প্রত্যূষে ছাড়িয়া পথিমধ্যে যাত্রিগণ নীলধারা নামক স্থানে স্নানাদি করিয়া বেলা ১০টার সময় ১০ মাইল দূরে চন্দনবাড়ি নামক স্থানে উপস্থিত হইল। আজ পথ তত ভাল ছিল না। অমরনাথ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় একটি স্ত্রীলোক ঘোড়ায় করিয়া এই পথে আসিতেছিল। পাথরে ঘোড়ার পা লাগিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। এস্থানেও নদী ও চীরবৃক্ষের সৌন্দর্য অপূর্ব। এস্থানে অনেক ভূর্জপত্রের গাছ আছে। এখানে বরফের একটি সুন্দর পুল হইয়াছে দেখিলাম। চন্দনবাড়ি হইতে পঞ্চতরণী যাইবার দুইটি পথ আছে। একটি পথ দুই দিনে যাওয়া যায় ও অপেক্ষাকৃত সহজ। অপরটি একদিনে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু শ্বাসঘাটি নামে ভীষণ খাড়া এক চড়াই আছে। তজ্জন্য যাত্রিগণ যাইবার সময় প্রথম পথে যায় ও শেষ পথটি দিয়া ফিরিয়া আসে। আসিবার সময় ঐ উৎরাই করিতে আমাদের প্রায় চার ঘণ্টা লাগিয়াছিল। ঐ শ্বাসঘাটির পথে হত্যারা তলাও নামে এক জায়গা আছে। কোনসময়ে একদল বৈরাগী শঙ্খধ্বনি ও উচ্চৈঃস্বরে ভজন গাহিতে গাহিতে ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ বরফের পাহাড় ভাঙিয়া উহাদের উপর পড়িয়া উহারা মারা যায়। এইজন্য উহার নাম হত্যারা তলাও হইয়াছে।

আমরা প্রথমোক্ত পথটি ধরিয়া চলিলাম। ইহাতেও দুইটি ভয়ানক চড়াই আছে। একটি নাম পিসুঘাটি। লাঠি ভিন্ন চড়িতে কষ্ট হয়। স্থানে স্থানে এত খাড়া যে, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দম লওয়া দুষ্কর। পথের দুই পার্শ্বে নানা রঙের সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; একপ্রকার ফুলের এত তীব্র গন্ধ যে, পাণ্ডারা বলিতে লাগিল, কোন কোন সময়ে তীব্র গন্ধে যাত্রীদিগের মাথা ঘুরিয়া মূর্ছা হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য মুখে আমসি কি লেবুর আচার রাখিতে হয়। আমরা কাহাকেও মূর্ছা যাইতে দেখি নাই। বোধহয়, অত্যন্ত চড়াই করিয়া মুখ শুকাইয়া যাইলে কোনপ্রকার অম্লদ্রব্য মুখে রাখিলে কতকটা পিপাসা শান্তি হয়। এই দুইটি

চড়াই-এর পর ছোট কাঁটা গাছ ব্যতীত বড় বৃক্ষ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে কাষ্ঠের ভারী কষ্ট। কাঁটা গাছ জ্বালাইয়া কার্য সারিতে হয়। তহশীলদারের কুলিরা যাত্রীদিগের জন্য কাষ্ঠ লইয়া যায়, কিন্তু হাজার যাত্রীর জন্য কাষ্ঠ যোগাড় করা সহজ ব্যাপার নয়। এবার শ্রীনগরে বরফ পড়ে নাই, তজ্জন্য ঠাণ্ডা কম ছিল এবং পাহলগামের পর হইতে বৃষ্টিও হয় নাই, তজ্জন্য রাস্তায় কাদা হয় নাই। একে এই চড়াই, তার উপর কাদা হইয়া রাস্তা খারাপ হইলে যাত্রীদিগের কষ্টের অবধি থাকিত না। শুনা যায়, সাধারণত চন্দনবাড়ি পর্যন্ত বরফ থাকে। চন্দনবাড়ি হইতে ১০/১১ মাইল চলিবার পর পথ হইতে প্রায় ৫০০ ফিট নিচে শেষনাগ নামে সুন্দর স্বচ্ছ সরোবর দেখিতে পাইলাম। এই স্থান হইতে লিডার নদী উৎপন্ন হইয়াছে। একটি পথ দিয়া যাত্রিগণ স্নান করিতে যাইতেছে ও অপরদিকে আরেকটি পথ দিয়া স্নান করিয়া উঠিয়া আসিতেছে। এই স্থানের তিন দিকে যেসব পাহাড় দেখা যাইতেছিল, সে সমুদয়ই বরফে আচ্ছন্ন। এই স্থান হইতে দুই মাইল দূরে বায়ুবর্জন নামে পড়াও (বিশ্রাম স্থান)। সেই স্থানে আজ যাত্রীদিগকে থাকিতে হইবে। একটি ক্ষুদ্র নদী পাইয়া প্রায় ১২টার সময় আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলাম। আজ চড়াই করিয়া যাত্রিগণ একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উপস্থিত হইয়াই দোকান হইতে গরম গরম পুরি কিনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিল।

এখানে বৃক্ষাদির নামগন্ধও নাই। আজ ত্রয়োদশীর চন্দ্রকিরণ তুষারশুভ্র পর্বতের উপর পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। আজ নদীর আর সে শব্দ নাই। আমাদের অনেক নিচে নদী ছাড়াইয়া আসিয়াছি।

পরদিন প্রত্যুষে যাত্রীদিগকে কতকগুলি বেগবতী নদী পার হইতে হইয়াছিল। কেহবা কুলিপৃষ্ঠে, কেহবা জলের যেখানে অল্প স্রোত, সেখানে পার হইতেছিল। যাইতে যাইতে রাস্তার আশেপাশে বরফ পড়িয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। প্রকৃতিদেবীর মনোহারিণী মূর্তি দেখিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া পড়িতেছিল। আমরা কখনো বরফের উপর গিয়া দাঁড়াইতেছিলাম, কখনো-বা পথ হইতে খুব নিচে নদীর ধার দিয়া যাইতেছিলাম। স্থানে স্থানে জলের উপর কাঁচের ন্যায় বরফ জমিয়া গিয়াছে দেখিতেছিলাম। তাহার উপর আবার কত কার্য করা। স্বভাব শিল্পে প্রভেদ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। দূর হইতে অমরনাথ পাহাড়ের তুষারধবলিত চূড়া দেখিয়া প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল। আমরা দূর হইতে উচ্চভূমির উপর তাঁবু পড়িয়াছে, দেখিতে পাইলাম। সম্মুখে সমতল উপত্যকায় ৪টি ছোট, একটি বড় নদী। যাত্রিগণ এই ৫টী নদীতে স্নান করিতেছে। এই ৫টি নদী হইতে ইহার নাম পঞ্চতরঙ্গিণী বা পঞ্চতরণী হইয়াছে।

এই আমাদের শেষ পড়াও। প্রায় ১২টার সময় আমরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম ও স্নানাদি করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এস্থানটির দৃশ্য অতি মনোহর। সম্মুখে বহুদূর বিস্তৃত সমতলভূমি, মাঝে মাঝে নদী, তিনদিকে বরফের পাহাড়। একয়েকদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। আজ বৈকালে হঠাৎ মেঘ করিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং পাহাড়ের উপর বরফ পড়িতে লাগিল। পাণ্ডাগণ ও যাত্রিগণ সকলে বাবা অমরনাথকে স্মরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর আকাশ পরিষ্কার হওয়ায় আমরা তাঁবুর

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পূর্বদিক হইতে পাহাড়ের অন্তরালে চন্দ্র উঠিতেছে। একটি পাহাড়ের শৃঙ্গদেশ হইতে যখন চন্দ্র বাহির হইল, সে শোভা, সে সৌন্দর্য না দেখিলে লিখিয়া বোঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা। আমার ঠিক মনে হইতে লাগিল, 'শশধর তিলক ভালে গঙ্গা জটা মাঝে' তুষার ধবলিত পাহাড় যেন মহাদেব, আর তাঁহার ভালে শশীশিশু খেলা করিতেছে। যেন সাক্ষাৎ অমরনাথ দর্শন করিলাম। অন্যান্য বন্ধুগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া ভজন গাহিতে লাগিলেন।

এখান হইতে অমরনাথ গুহায় যাইবার তিনটি পথ আছে। একটি পথ ভাঙিয়া গিয়াছিল বলিয়া তহশীলদার হুকুম দিয়াছিল, সে পথে যেন কেহ না যায়। দ্বিতীয়টিতে নদীর ধার দিয়া কিছুদূর গিয়া একটি চড়াই ও উৎরাই করিয়া নদীর ধারে পৌঁছান যায়। নিচে নদী চলিতেছে, কিন্তু উপরে বরফ অত্যন্ত কঠিন হইয়া জমিয়া গিয়াছে। উহার উপর দিয়া প্রায় এক মাইল যাইয়া অমরনাথ গুহায় পৌঁছান যায়। অনেকে এই পথ দিয়া যাতায়াত করেন। এ পথটি অপেক্ষাকৃত সহজ। আমরা তৃতীয় পথ দিয়া যাইয়া এই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। দ্বিতীয় পথটি প্রায় ৭/৮ মাইল হইবে। আজ ৩ ভাদ্র, পূর্ণিমা—দর্শনের দিন। ছড়ী প্রায় রাত্রি ৩টার সময় তৃতীয় পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরাও প্রত্যূষে ঐ পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। প্রথম চার মাইল একেবারে খাড়া চড়াই, একবার পা পিছলাইলে নিঃসন্দেহে মৃত্যু। ইহাকে ভৈরবঘাটির চড়াই কহে। মাঝে মাঝে বরফের উপর দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইতেছিল। একটি ২৫/৩০ ফিট উচ্চ পাহাড়কে ভৈরব কহে। সেখান হইতে অমরনাথ গুহা দেখা যায়। এস্থান হইতে উত্তরদিকে সাদা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। এখান হইতে চার মাইল উৎরাই করিয়া আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিব। যাহারা পূর্বে পৌঁছিয়াছিল, এত উচ্চ হইতে তাহাদিগকে পিপীলিকার ন্যায় দেখাইতেছিল। এই উৎরাই অতি ভীষণ, স্থানে স্থানে বসিয়া নামিতে হয়। এক-একজন বৃদ্ধাকে ৩/৪ জন কুলি বুকে বাঁধিয়া পশ্চাৎ হইতে টানিয়া আছে, বৃদ্ধা সম্মুখে ভর দিয়া যাইতেছে। মধ্যে পাহাড়ের একটি গর্তের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, উহাকে গর্ভযোনি কহে। আমরা যত নিচে নামিতে লাগিলাম, পথ তত ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। এক-এক স্থানে কেবল পা রাখিবার জায়গা আছে মাত্র। একজনের ঘটি পড়িয়া যাওয়াতে গড়াইয়া একেবারে বরফের নদীর উপর পড়িল। গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যাত্রিগণ অমরগঙ্গায় স্নান করিয়া সর্বাঙ্গে বিভূতি[২] লেপনকরত বম্-বম্ শব্দে গুহার ভিতর দেবদর্শনে যাইতেছে। সে-ব্যাকুলতা, সে-আগ্রহ, সে-আনন্দে বিহ্বলভাব, শত শত লোকের মুখে বম্-বম্ রব এবং গুহার ভিতর হইতে প্রতিধ্বনি না শুনিলে বা না দেখিলে বুঝা যায় না। সেই অমরগঙ্গাজলে স্নানপূত হইয়া শুভ্র বিভূতি গাত্রে লেপন করাতে যেন বোধ হইতে লাগিল, অমরধামে অমরনাথ আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া বহুরূপে প্রকাশিত করিয়া বম্-বম্ রবে ক্রীড়া করিতেছেন। সেইসময় একটু বৃষ্টি হওয়াতে মনে হইতে লাগিল যেন দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্প বরিষণ করিতেছেন।

আমরা গঙ্গাজলে স্নান করিয়া অমরনাথ দর্শনাভিলাষে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ গুহার মুখ প্রায় ৪০/৫০ ফিট উচ্চ এবং ২০/২৫ ফিট বিস্তৃত হইবে। গুহাটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৫/৩৬ ফিট হইবে। উপরদিকে চাহিয়া দেখিলাম,

ঘুঘুর ন্যায় একপ্রকার পক্ষী উড়িয়া গেল। যাত্রিগণ দেখিয়া আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। ইহাই অমরনাথ দর্শন ও তাঁহার কৃপাদৃষ্টির বাহ্যনিদর্শন বলিয়া পাণ্ডাগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। গুহার ভিতর পূর্বে উলঙ্গ যাইবার নিয়ম ছিল। এখনো ভূর্জপত্রের কৌপীন পরিয়া অনেকে যায়। উপরে খিলানের ন্যায় এবং তিনপাশে সোজা পাহাড় তিনদিকে দেয়ালের কার্য করিতেছে। গুহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্বয়ম্ভু অমরনাথ বিরাজিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম দেয়াল কতকটা জুড়িয়া রহিয়াছেন এবং মধ্যস্থলে কোণে উপরে ঠিক বরফের শিবলিঙ্গের ন্যায়। তাঁহার পার্শ্বে উত্তরদিকে একটি বরফের বেদির ন্যায় রহিয়াছে। উহাকে পাণ্ডারা গণেশ বলেন, এবং তাহার পর উত্তর পশ্চিম কোণে বরফের স্তম্ভের ন্যায় রহিয়াছে। উহাকে পাণ্ডাগণ ভগবতী বলেন।

ভক্তগণ ভক্তিভরে পূজা, প্রণাম ও আলিঙ্গন করিতেছেন। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাকে Stalagmite[৩] বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও ভক্তের চক্ষু স্বতন্ত্র, ভক্তের ভাব ও হৃদয় স্বতন্ত্র। শুনা যায়, কোন ব্যক্তি পুঁইশাক ভাবিয়া জগন্নাথে যাইয়া পুঁইশাক দেখিয়াছিল। সত্য বটে, সর্বস্থানে বায়ু আছে, কিন্তু পাখা নাড়িলে যেরূপ বায়ুর বিশেষ প্রকাশ হয়, সেইরূপ বহুকাল হইতে হাজার হাজার সাধু-সন্ন্যাসী-ভক্তগণ ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য এস্থানেও ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। বাস্তবিক গুহার ভিতর যাইলে এবং সেই হাজার হাজার যাত্রীর আগ্রহ ও ভক্তিভাবে পূজা সন্দর্শন করিলে হৃদয়ে

"এ কি এ সুন্দর শোভা— বল ওহে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী
কি ধন তোমারে দিব উপহার হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি কি বলিব
যাহা কিছু আছে মম সকলই লও হে নাথ।"* □

পাদটীকা

১ বিতস্তা—পাঞ্জাবের পাঁচটি নদীর অন্যতম।

২ এই পাহাড়টি খড়ির পাহাড়। যাত্রিগণ একটু পাহাড় ভাঙিয়া লইয়া গাত্রে মাখিতেছে।

৩ খড়িমাটির পাহাড়ে জলের সহিত খড়িমাটি মিশ্রিত থাকে। গুহার মেঝেতে জলের সহিত খড়িমাটি জমিয়া জ্যামিতির কোণের (Cone)-এর ন্যায় হয়। উহাকে Stalagmite কহে।

* ৫ বর্ষ, ৭ সংখ্যা

মণিমহেশ

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের সুদুর্গম শৈবতীর্থ মণিমহেশ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় গত ১৯৪১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে পাঞ্জাবের পাঠানকোট শহর হইতে বাসে ডালহৌসি অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে আরেকজন পূজ্য সন্ন্যাসী-ভ্রাতা—স্বামী অপূর্বানন্দজী। পাঠানকোট হইতে ডালহৌসি পঞ্চাশ মাইল। উচ্চতায় ছয় হাজার পাঁচশত ফুট। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর গ্রীষ্মনিবাস, সৈনিক বিভাগের একটি অন্যতম কেন্দ্রস্থলও বটে। সাড়ে আটটায় ডালহৌসি পৌঁছিলাম। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য চাম্বা। ডালহৌসি হইতে চাম্বা যাইবার তিনটি রাস্তা আছে। একটি চির (Chir) বাংলা হইয়া বিশ মাইল। দ্বিতীয়টি খজুয়ার হইয়া আঠার মাইল এবং অপরটি একুশ মাইল। মালবাহী ঘোড়া ভাড়া করিয়া আমরা প্রথমোক্ত পথে চলিলাম। নয় মাইল হাঁটিবার পর চির বাংলা। দোকান হইতে কিছু দুধ কিনিয়া আহারপর্ব শেষ করিলাম। রান্নাবান্নার কোনই ব্যবস্থা ছিল না, আর ঘোড়াওয়ালারাও অপেক্ষা করিবে না। চির বাংলা হইতে কাশ্মীর যাওয়ার একটি পায়ে- হাঁটা রাস্তা আছে।

ঘোড়াওয়ালা মদ খাইয়া অনেক গোলমাল করিয়াছিল, তাই চাম্বা পৌঁছিতে আমাদের বেশ দেরি হইয়া গেল, প্রায় সন্ধ্যা। বিভা নদীর পুল অতিক্রম করিয়া চাম্বা শহরে প্রবেশ করিলাম। নদীর পশ্চিম কূলে টোল অফিস ও পূর্ব কূলে প্রকাণ্ড একটি দ্বিতল ধর্মশালা। সামান্য চড়াইয়ের পর তোরণদ্বার। তাহার পরেই সুবিস্তীর্ণ মাঠ, নাম চৌগাঁও। হিমালয়ের মধ্যে এত বড় মাঠ অতীব বিরল। মাঠের চারিপাশে বাড়িঘর, দোকানপাট, ডাকবাংলা, ডাকঘর, স্কুল, জনসাধারণের জন্য হাসপাতাল ও লাইব্রেরি, মিউজিয়াম ও হোটেল ইত্যাদি। ইহার সামান্য উপরিভাগে রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের পাশেই ছয়টি মন্দির। লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, চন্দ্রগুপ্ত (শিব), পঞ্চমুল-শিবলিঙ্গ, গৌরীশঙ্কর ও লক্ষ্মীদামোদরের নিত্যপূজা ও ভোগারতি হয়। ইহা ছাড়াও শহরে আরো কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির আছে। প্রধান তোরণদ্বারের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। আমরা পোস্ট অফিসের নিকট স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তিনি বাজারের ধর্মশালায় আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং যে-কয়দিন থাকিব সে-কয়দিন তাঁহার বাড়িতেই 'ভিক্ষা' গ্রহণ করিতে বলিলেন। শিক্ষকমহাশয় রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত।

ব্রিটিশযুগে চাম্বা ছিল হিমালয়স্থিত একটি ছোট করদ রাজ্য। চাম্বা শহর এই রাজ্যের রাজধানী। পূর্বে চল্লিশ মাইল দূরে ভরমুরে এই দেশের রাজধানী ছিল। ইহার পূর্ব নাম ব্রহ্মপুর। ৯২০ খ্রীস্টাব্দে রাজা সহিল বর্মা চাম্বাতে রাজধানী স্থাপন করেন। চাম্বা অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার উচ্চতা প্রায় তিনহাজার ফুটের উপর। চারিদিকেই উচ্চ পর্বতমালা। সেজন্য কোন কোন

বৎসর বরফও পড়িয়া থাকে। রাজার রাজকন্যা চম্পাবতী এই স্থান মনোনীত করিয়াছিলেন বলিয়াই জায়গাটির নাম হয় 'চাম্বা'। ইহা হইতে এ-রাজ্যেরও ঐ নাম হয়। প্রবাদ এই যে, চম্পাবতী অতিশয় রূপসী, বিদুষী, সতীসাধ্বী ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি শাস্ত্রাদি আলোচনার নিমিত্ত নিত্য একজন মহাত্মার নিকট যাতায়াত করিতেন। একদিন পিতা সন্দিগ্ধমনে কন্যার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মহাত্মার আস্তানায় প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন রাজা এই দৈববাণী শুনিতে পাইলেন—"কন্যার উপর সন্দেহ করায় আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না।" রাজা ঐস্থানে প্রিয়তমা কন্যার একটি মন্দির নির্মাণ করেন। অদ্যাবধি ঐ মন্দিরে চম্পাবতী দেবী-রূপে পূজাদি গ্রহণ করিতেছেন। বৈশাখ মাসে এই মন্দিরে একটি মেলা হয়। আরো একটি প্রবাদ আছে যে, রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার পর এই নগরে জলের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। দূরে একটি প্রস্রবণ হইতে পাহাড়ের উপর দিয়া নালা কাটিয়া জল আনিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কোন কারণবশত ঐ নালায় জল আসিল না। সকলেই বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণগণ বিধি দিয়াছিলেন যে, রানী অথবা তাঁহার কোন পুত্র এই নালাতে জীবনোৎসর্গ করিলে জল আসিবে। রানী নেনা দেবী সহাস্যবদনে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করায় স্রোতের ধারা নালাতে বহিতে লাগিল। রাজা তথায় একটি মন্দির নির্মাণ করিলেন। চৈত্রমাসের শেষ ভাগে ঐখানে একটি মেলা হয়। সাধারণত রমণী ও শিশুগণ ঐ মেলায় যাইয়া থাকে। পর্বতশিখরে দেবী চামুণ্ডার মন্দির আছে। চাম্বার রাজপরিবার শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর বলিয়া পরিচিত। রাজা সহিল বর্মা প্রথমে নিঃসন্তান ছিলেন। পূর্ব রাজধানী ভরমুরে থাকাকালীন একদিন চুরাশি জন সন্ন্যাসী তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসিগণ রাজার সেবা ও যত্নে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সন্তানলাভের বর প্রদান করিলেন। ইহার পর রাজার দশ পুত্র ও এক কন্যা হয়। এই শুভাশীর্বাদের জন্য তিনি চুরাশিটি মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাই চম্পাবতী। নয়টি পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহের মর্মর প্রস্তর আনিতে যাইয়া বিন্ধ্যগিরিতে দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করে। দশম পুত্র কৃতকার্য হইয়া বর্তমান লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শেষজীবনে রাজা সহিল বর্মা প্রিয়পুত্র যুগাকরকে রাজকার্যে অভিষিক্ত করিয়া সন্ন্যাসধর্মাবলম্বনে গুরু চর্পটনাথের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন সকালবেলা শিক্ষকমহাশয়ের সাহায্যে কুলি-এজেন্সি হইতে একটি কুলির ব্যবস্থা করা হইল। পরে শিক্ষকমহাশয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করিয়া বেলা এগারটায় আমরা মণিমহেশ দর্শনে যাত্রা করিলাম। বিভা নদীর ধারে ধারে চলিয়াছি। চড়াই উৎরাই নাই বলিলেই চলে। পনের মাইল পথ চলিয়া সন্ধ্যার সময় চুড়ি নামক স্থানে আসিলাম। নদীর ধারে একটি শিবমন্দির ও একটি ধর্মশালা আছে। আমরা দোতলার একটি ঘরে আশ্রয় লইলাম। স্থানীয় একজন মাড়োয়ারি দোকানদার পরিতোষপূর্বক 'ভিক্ষা' দিলেন।

পরদিবস (১৪ সেপ্টেম্বর) নদীর ধারে ধারেই চলিয়াছি। বিশেষ কোন চড়াই উৎরাই নাই। নয় মাইল পথ চলিয়া একটি চটিতে দুপুরের আহারাদি করি। বিশ্রামান্তে আরো ছয় মাইল চলিয়া দুরুংগাটিতে আসা গেল। এখানে একটি দোতলা পাকা বাড়ি আছে। ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন চৌকিদার নিযুক্ত

ছিল। তাহাকে কিছু বখশিস্ দিয়া দোতলায় 'আসন' করিলাম। দোকান হইতে জিনিসপত্র আনিয়া রান্না করিতেছি, এমন সময় একটি লোক আসিয়া আমাদের খুবই গালাগালি করিতে লাগিল এবং আমাদের জিনিসপত্র সব বাহিরে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল। তখন চৌকিদার ও একজন ভদ্রলোক আসিয়া বলিল ঃ "মহাত্মাজী, আপলোগ্ কুছ্ না বলিয়ে, চুপচাপ রহিয়ে।" তাহারা নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ যাবৎ খুবই বচসা করিয়া ঠাণ্ডা হইল। ঐ লোকটির ব্যবহার দেখিয়া মনে হইল, সে নেশা করিয়াছে। যাহা হউক রাত্রিটা বেশ ভালভাবেই কাটিয়াছিল।

তাহার পরদিন (১৫ সেপ্টেম্বর) ভোরবেলায় যাত্রা করিয়া প্রায় আড়াই মাইল যাওয়ার পর বিভা নদীর পুল অতিক্রম করিলাম। সেতু হইতে খালি নামক গ্রাম পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাইল খাড়া চড়াই। চলিতে বেশ কষ্ট হইয়াছিল। পূর্বে এই রাস্তা নদীর অপর তীরের পাহাড়ের গা দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাহাতে প্রায় দশ মাইল বেশি হাঁটিতে হইত। যদিও বর্তমান রাস্তায় চলিতে খুবই কষ্ট হয় কিন্তু ইহাতে একদিনের পথ বাঁচে। খালি গ্রামটির উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট। চড়াই শেষ করিয়া গ্রামে আসিতেই দূরে চিরতুষারের দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। একজন গ্রামবাসীকে ঐ বরফের পাহাড়টা কতদূরে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল ঃ "উহাই মণিমহেশের পাহাড়—আরো দুইদিনের পথ।" আমরা মণিমহেশের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।

খালিগ্রাম হইতে আমরা ভরমুরের অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। চড়াইয়ের পর চড়াই, কেবলই চড়াই। আর সমস্ত পথটাই জনমানবশূন্য। ঘন চির (Pine) গাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে পথ চলিয়াছে। ঐসব গাছের ফাঁক দিয়া সূর্য উঁকি দিতেছেন। বহু নিচে একটি নদী দেখা যাইতেছিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর আট-নয় বৎসরের একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে ভরমুরে যাইবে, তথাকার স্কুলে পড়িবে। তাহার সহিত নানারকমের আলাপ করিয়া চলিয়াছি। হঠাৎ সে বলিল ঃ "মহাত্মাজী, পানি পিউঙ্গা।" তাহাকে কমণ্ডলুর জল দিতে গেলে সে বলিল ঃ "য়হতো গন্‌দা পানি।" জল না খাইয়াই সে চলিতে লাগিল। আমরাও চলিয়াছি। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার ছেলেটি বলিল ঃ "বহুতহী প্যাস্ লগী হ্যায়।" তখন তাহাকে থলে হইতে মিষ্টি দিয়া জলপান করিতে দিলাম। মিষ্টি খাইয়া কমণ্ডলুর জল মুখে দিয়াই মুখ বিকৃত করিয়া বলিল ঃ "অওর নেহীঁ, ব্যস্।" তাহার সন্তুষ্টির জন্য আমিও কিছুটা জলপান করিলাম। কিন্তু সে অতি কষ্টে সামান্য একটু মুখে দিয়াছিল। আরো প্রায় এক মাইল চলিয়া একটি গ্রামে আসিলাম। এই গ্রামে মাত্র চার-পাঁচটি পরিবার বাস করে। এক একটি চালাতেই একটি করিয়া পরিবার। এখানেও জল কোথাও দেখিতে পাইলাম না। গ্রামের বাহিরে একটি ডালপালার তৈয়ারি চালা দেখিলাম। তাহাতে একটি মাটির কলসি, কলসির মুখটি ঢাকা। তার উপর একটি এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস আছে। ছেলেটি দূর হইতে উহা দেখিয়া দৌড়াইয়া গিয়া ঐ কলসি হইতে খানিকটা জলপান করিল। আমরা তো ইহা দেখিয়াই অবাক। এখানে কোথা হইতে জল আসিল! ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আঙুল দিয়া দেখাইল, ঐ নিচে নদী। ওখান হইতে গ্রামবাসীরা রোজ জল আনিয়া দৈনন্দিন কাজকর্ম

করিয়া থাকে। আরেক কলসি জল পথিকদের জন্য রাখিয়া দেয়। নদীটি গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল নিচে। নিত্য অতটা খাড়া চড়াই উৎরাই করিয়া রোজকার প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করিতে হয়। তাহা হইতে আবার পথিকদের তৃষ্ণা-নিবারণের নিমিত্ত এক কলসি জল রাখা আছে! আরো কিছুক্ষণ চড়াই উৎরাই করিয়া বেলা প্রায় একটায় ভরমুরে আসিলাম। ভরমুরের উচ্চতা প্রায় সাতহাজার ফুট। এখানে তিরাশিটি দেবদেবীর মন্দির আছে। প্রধান মন্দিরে হরিহর শিব, দ্বিতীয় মন্দিরে নৃসিংহদেবের পূজা হয়। এই দুইটি মন্দির প্রায় হাজার বৎসর পূর্বের নির্মিত। পাশেই পার্বতী, মহালক্ষ্মী ও গণেশের মন্দির। বাকি সব শিবের মন্দির। অধিকাংশ শিবের কোনই মন্দির বা আচ্ছাদন ছিল না। প্রায় বারো বৎসর হইল মহাত্মা স্বামী জয়কৃষ্ণ গিরিজী নামক জনৈক নাগা সন্ন্যাসীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ঐসব শিবের আচ্ছাদন হইয়াছে। ইহার বিশেষ কারণ আছে। এখানে ডাক্তারখানা, পোস্ট অফিস, বনবিভাগের ডাকবাংলো, রাজার তরফ হইতে একটি পাকা ধর্মশালা এবং কয়েকটি দোকানপাট আছে। মণিমহেশে যাত্রার সময় যাত্রীদের বিশেষত সাধু মহাত্মাদের থাকিবার কোনই ব্যবস্থা ছিল না। এই কারণে নাগা মহাত্মাজী জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ঐসব মন্দির করিয়াছেন। জলের কোনই ব্যবস্থা ছিল না দেখিয়া তিনি প্রায় দুই মাইল দূরে একটি প্রস্রবণ হইতে নল সহযোগে জল আনিয়া জনসাধারণের ও যাত্রীদের খুবই উপকার করিয়াছেন। তিনি জুনা আখড়ার একজন মহাত্মা। তাঁহার বিছানাপত্রের ও পোষাক-পরিচ্ছদের কোনই আড়ম্বর নাই। খুবই তিতিক্ষাপরায়ণ সাধু। বিছানার মধ্যে একটি ছোট চাটাই আর পোষাকের মধ্যে কৌপীন ও একটি বহির্বাস। নিকটেই কয়েকটি পাহাড়ী পরিবার বাস করিতেছে। এখানে বেশ ঠাণ্ডা, দূরে পর্বত-শিখরে বরফের শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। নাগাজীকে দর্শন করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। তিনিও আমাদের সহিত অতি সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

নাগাজী বলিলেন ঃ "পনের দিন পূর্বে যাত্রা শেষ হইয়া গিয়াছে। তবে দর্শনের কোনই অসুবিধা হইবে না। একটু ঠাণ্ডা বেশি হইবে।" কথিত আছে যে, যখন কাশ্মীর মুসলমানদের অধিকৃত হয় তখন অমরনাথ তাহাদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া এই পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং মণিমহেশ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই পাহাড়ের নাম হয় মণিমহেশ। এসব অঞ্চলের লোকেরা কৈলাস বলিয়া থাকে। এখানে জন্মাষ্টমীতে যাত্রা আরম্ভ হয় আর রাধাষ্টমীতে শেষ হয়। জন্মাষ্টমীতে যাত্রীরা হ্রদে স্নান করিয়া থাকে। আর রাধাষ্টমীতে চাম্বা হইতে ছড়ি যায়। সেইসময় বহু যাত্রী ও গদ্দিদের সমাবেশ হয়। সকলেই হ্রদের চারিপারে তাঁবু খাটাইয়া সারারাত্রি ভজনাদি করিয়া কাটায়। প্রত্যেক তাঁবুর সম্মুখে ধুনি জ্বালাইয়া থাকে। পরদিন স্নান ও পূজাদি করে। আর গদ্দিরা হাজার হাজার ভেড়া বলিদান দিয়া থাকে। এ-অঞ্চলের যাহারা ভেড়া চরায় তাহারা কেবল কৌপীন ও একটি লম্বা গরম জামা ব্যবহার করে। আর কোমরে একটি একশত বিশ হাত লম্বা ভেড়ার কালো লোমের আধ ইঞ্চি মোটা রশি জড়ানো আছে। ইহাকেই গদ্দি বলে। ইহা হইতে তাহাদের নাম হয় 'গদ্দি'।

ভরমুর হইতে মণিমহেশ কুড়ি মাইল। দশ মাইল পরে একটি গ্রাম আছে, তাহার নাম হর্ষির। ওখানে মণিমহেশের পাণ্ডাদের বাস। এই দশ মাইলের মধ্যে আর কোন লোকালয় নাই। তার পরের দশ মাইল একেবারে জনপ্রাণীশূন্য। পাঁচ মাইল পরে ধনশৌড়ে, ওখানে কেবল একটি ধর্মশালা আছে। যাত্রীরা ঐখানেই রাত্রিবাস করিয়া থাকে। এই বিশ মাইলের মধ্যে কোথাও চাউল, আটা, ডাল কিছুই পাওয়া যায় না, সবই এখান হইতে লইতে হয়।

পরদিন (১৬ই) ভোরবেলা হর্ষিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। নাগাজী একজন অতিরিক্ত কুলি দিয়াছিলেন। চাম্বা হইতে ভরমুর পর্যন্ত ঘোড়া যাতায়াত করিতে পারে। ভরমুরের পর সাধারণত ঘোড়া যাতায়াত করে না, কারণ রাস্তা ক্রমেই দুর্গম হইতে দুর্গমতর। বেলা প্রায় বারটায় আমরা হর্ষির গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামের মোড়লের সহিত দেখা হইবার পর সে গ্রামের বাহিরের একটি ছোট কুঠিয়াতে আমাদের থাকিতে বলিল। আরো দুই-তিনটি কুঠিয়া আছে। কুঠিয়াগুলি লম্বা চওড়ায় প্রায় সমান। একটি লোকের হাত-পা ছড়াইয়া শুইতে কুলায় না। কুঠিয়াটির মাঝখানে ধুনি জ্বালিবার একটি গর্ত আছে। গর্তের দুইপাশে আমরা দুইজনে বসিলাম। কিছুক্ষণ পর কুলি আসিল। তখন দিনমণির আর দেখা নাই। বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল। এই স্থানের উচ্চতা প্রায় দশহাজার ফুট। নিকটবর্তী পাহাড়গুলির চূড়া বরফে ঢাকা।

মোড়ল বলিল ঃ "এই গ্রামে তাহারা চল্লিশ ঘর ব্রাহ্মণ আছে। সকলেই মণিমহেশের পূজারী। রাজা জায়গীর দিয়াছেন। এইরূপ আদেশ আছে যে, প্রত্যেক যাত্রীদলের সঙ্গে একজন পূজারী যাইবে। সে পথ-প্রদর্শকের ও পূজারীর—দুই কাজই করিবে। কিন্তু তাহাদের নিকট কিছু চাহিতে পারিবে না।" অবশ্য যাত্রীরা সকলেই কিছু কিছু দিয়া থাকে। অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় এখানে পাণ্ডাদের অত্যাচার নাই। তাহারা হাট, বাজার, শহর ও বর্তমানকালের সভ্যতা হইতে দূরে থাকিয়া যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতেছে। কোন্ ঘর হইতে পূজারী যাত্রীদলের সঙ্গে যাইবে তাহা মোড়ল ঠিক করিয়া দিবে। ইচ্ছামতো কেহ যাইতে পারিবে না। সেইজন্য মোড়লকে সকলেই মান দিয়া থাকে। আমাদের সঙ্গেও একজন পূজারীকে দিতে হইবে। যাহাদের পালা ছিল তাহাদের ডাকা হইল। একটি লোক আসিল, বয়স সাতাশ কি আঠাশ হইবে, কানে খাটো এবং কথা বলিতে পারে না। তাহার আরো দুই ভাই আছে, তাহারা অন্যত্র কোথায় গিয়াছে। অতএব ইহাকেই আমাদের লইতে হইবে কারণ এই পরিবারেই পালা পড়িয়াছে। এমন নয় যে, ইহাকে বাদ দিয়া অন্য পরিবারের লোক যাইবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার কোন উপায় নাই। আমরাও কোন আপত্তি করিলাম না। মোড়ল হাতের ইশারায় তাহাকে সব বুঝাইয়া দিল। সেও মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল।

পরদিন (১৭ই) সকালে আমরা দুইজন, কুলি দুইটি ও পূজারী—এই পাঁচজন যাত্রা করিলাম। মণিমহেশের পাহাড় হইতে অমরগঙ্গা নামে একটি পাহাড়ী ছোট নদী বাহির হইয়া বিভা নদীতে পড়িয়াছে। আমরা অমরগঙ্গার ধারে ধারে চড়াই করিতে করিতে চলিয়াছি। এই রাস্তা পূর্বদিনের চেয়েও অনেকগুণে খারাপ। পাহাড়ীদের পক্ষে ইহাই রাস্তা। আমাদের পক্ষে ইহাকে রাস্তা বলিয়া নাম দেওয়া যায় না। পনের দিন পূর্বে যাত্রা উপলক্ষে যাত্রীদের

যাতায়াতের দরুন একটি পথের চিহ্ন আছে বলিয়া মনে হয়। নচেৎ পথই খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল। এমনকি পথ হারাইবার খুবই সম্ভাবনা। সারা পথটিতে আমরা এই কয়জন ব্যতীত আর কোন প্রাণীর সঙ্গে দেখা হয় নাই। পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতায়—আছে মাত্র অমরগঙ্গার হরহর ধ্বনি। ধীরে ধীরে চলিয়াছি, দুই দিকেই উঁচু উঁচু পাহাড় ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত। এইভাবে চলিয়া বেলা এগারটায় পাঁচ মাইল দূরে ধনশৌড়ে আসিলাম। এখানে সরকার যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি দোতলা ধর্মশালা নির্মাণ করিয়াছেন, কারণ হর্ষির হইতে মণিমহেশ পর্যন্ত এই দশ মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নাই। একদিনে এই দশ মাইল যাইয়া পূজা ও দর্শনান্তে ফিরিয়া আসা খুবই কষ্টকর। ধর্মশালা হওয়াতে যাত্রীরা প্রথম দিন এখানে বিশ্রাম করিয়া দ্বিতীয় দিন দর্শনাদির পর হর্ষিরে ফিরিয়া আসে। এই স্থানটি খোলা ময়দানের মতো। আকাশ পরিষ্কার, বেশ রোদ। আমরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া রৌদ্রে বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। চারিদিকের পর্বতশিখরে ধবধবে তুষার রাশির উপর সূর্যকিরণ পতিত হইয়া চকমক্ করিতেছে। অধিকাংশ পাহাড়ের শিরোভাগ গাছপালাশূন্য। এই স্থানটির উচ্চতা এগার হাজার পাঁচশত ফুট। আহারান্তে বিশ্রামের পর দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সূর্যদেব মেঘের আড়ালে লুকাইয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে বেশ জোর এক পশলা বৃষ্টি হইল। ঠাণ্ডার মাত্রা আরো বাড়িয়া গেল। জামা কম্বল যাহা ছিল সবই জড়াইলাম। তাহাতেও নিস্তার নাই। এদিকে প্রকৃতি শান্ত হইল। চারিদিকে আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমরাও কিছু খাইয়া রাত্রির মতো নিদ্রাদেবীর শরণ লইলাম।

পরদিন (১৮ই) ভোরবেলায় দেখিলাম, যেসকল পাহাড়ের মাথায় বরফ ছিল না, সেইসকল পাহাড়েও বরফ পড়িয়া আছে। বেলা সাতটায় আমরা দুইজন, একটি কুলি ও পূজারী—এই চারজনে মণিমহেশ দর্শনে যাত্রা করি। চাম্বার কুলিটি আমাদের সঙ্গে কিছু খাবার ও কাপড়-গামছা লইয়া চলিল। অপর কুলিটিকে আমাদের জিনিসপত্র পাহারা দিতে ও রান্না করিয়া রাখিতে বলিলাম। এই কুলিটি পূর্বে দর্শন করিয়াছে। কিন্তু চাম্বার কুলিটি কখনো আসে নাই। আজও আমরা ছাড়া অন্য কেহ নাই। পূজারী পথপ্রদর্শক হইলেও কোন জবাব পাইবার উপায় নাই। কাজেই মণিমহেশই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। রাস্তা পূর্বদিন হইতে অধিকতর খারাপ। কোন কোন স্থানে অতি সন্তর্পণে পা ফেলিতে হইতেছিল। প্রতি মুহূর্তেই বিপদের আশঙ্কা। এক জায়গায় আলগা পাথরের সিঁড়ি। কোন পাথর এক ফুট উঁচু, কোন পাথর নয় ইঞ্চি। আবার কোন পাথর পনের ইঞ্চি চওড়া, কোথাও বা এক ফুট। সিঁড়িগুলি লম্বাতে দুই ফুট, এক একটি আড়াই ফুটও আছে। সামঞ্জস্য নাই বলিলেই হয়। আবার কোন কোন পাথর নড়ে। ডানদিকে অমরগঙ্গা দ্রুতগতিতে বহিয়া যাইতেছে। কোন প্রকারে সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিলাম। প্রায় পঞ্চাশের উপর সিঁড়ি হইবে। আবার কিছুক্ষণ চড়াইয়ের পর পাহাড়ের উপর আসিয়া পথের বামদিকে একটি ছোট কুণ্ড দেখিতে পাইলাম। ইহার নাম গৌরীকুণ্ড। নীল রঙের পরিষ্কার জল। এক মাইল দূরে তাল বা হ্রদ। সম্মুখেই মণিমহেশ পর্বত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ধর্মশালা হইতে দুই মাইল পর্যন্ত কিছু কিছু গাছপালা দেখিয়াছিলাম। তারপর সবই গাছপালাশূন্য নগ্ন পাহাড়। যাত্রীদের কেহ কেহ এই গৌরীকুণ্ডেও স্নান

করিয়া থাকে। পাহাড়িয়া সাধারণত হর্ষির হইতে খালি পায়ে দর্শনে আসিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের রীতি। যদিও কেহ জুতাসহ আসে তাহা হইলে এই স্থানে উহা ছাড়িয়া যাইতে হয়। আমাদের কুলিটিও এই স্থানেই জুতা রাখিল। পূজারী খালি পায়েই আসিয়াছিল। আমরা মণিমহেশকে প্রণাম করিলাম। বাকি একমাইল পথ পূর্বেকার তুলনায় সমতল বলিলেই হয়। তালের দক্ষিণদিকে আসিয়া পাথরের উপর বসিলাম। তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা।

আজ ১৯ সেপ্টেম্বর, ভাদ্র, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি, শনিবার। এই হ্রদেই স্নান করিতে হয়। ইহাকেই 'তাল' বলিয়া থাকে। ইহার চারিধারের জলের উপর স্বচ্ছ কাঁচের মতো বরফ ভাসিতেছে। নির্মল আকাশ, বেশ রোদ। একটু বিশ্রামান্তে বরফ ভাঙিয়া স্নান করিলাম। নিকটেই একটি মর্মর পাথরের চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ। জনৈক শেঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাত্রিগণ এই শিবকে মণিমহেশের উদ্দেশে পূজা করিয়া থাকে। উন্মুক্ত আকাশই শিবের আচ্ছাদন। আমরাও শিবের পূজা করিলাম। আনীত গোমুখীর জল, চন্দন মাখানো বেলপাতা, সুগন্ধি ধূপ ও আতর উৎসর্গ করিয়া কিছু পাহাড়ি ফুল তুলিয়া অঞ্জলি দিলাম। রুটি ও গুড়ও নিবেদন করিলাম। পরে আমরা চা তৈয়ার করিয়া শিবের প্রসাদ পাইলাম। পাত্রের অভাবে ছিপি বা কমণ্ডলুতেই চা তৈয়ার করা হইল। এই ছিপি সামুদ্রিক নারিকেলের মালা হইতে তৈয়ার হয়। সাধু মহাত্মাগণ ধাতুনির্মিত কমণ্ডলু ব্যবহার না করিয়া ইহাও ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই হ্রদটি দৈর্ঘ্যে প্রায় তিনশত ফুট ও প্রস্থে আড়াইশত ফুট হইবে। চারিধারেই কাঠ-কয়লা ও ভেড়ার শিং দেখিতে পাইলাম। রাধাষ্টমীর পূর্বদিন রাত্রে যাত্রিগণ ধুনি জ্বালিয়া তাঁবুতে বাস করিয়াছিল। ঐসব ধুনির কাঠকয়লা পড়িয়া আছে। আর গদ্দিরা মণিমহেশের উদ্দেশে হাজার হাজার ভেড়া বলিদান করিয়াছিল। সেইসব ভেড়ার শিং দেখিতে পাওয়া গেল। ধুনির কাঠ পাঁচ মাইল নিচে ধর্মশালার নিকট হইতে আনিয়াছিল। এই তালের উচ্চতা প্রায় চৌদ্দ হাজার ফুট।

সম্মুখে অভ্রভেদী চিরতুষারমণ্ডিত মণিমহেশ পর্বত দণ্ডায়মান। চতুর্দিকের পর্বতশ্রেণীও বরফে আচ্ছাদিত। সূর্যরশ্মি ঐ চিরতুষারের উপর পতিত হওয়ায় উহার ছটাতে চোখ যেন ঝলসাইয়া গেল। আর ঐ প্রতিফলিত প্রভায় চারিদিক এক দিব্য জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। প্রকৃতি শান্ত ও ধীর স্থির। সাড়া-শব্দ নাই, গাছপালা নাই, জনপ্রাণী নাই, আছে কেবল শীত আর শীত। তপনদেব ইহার নিকট হার মানিয়াছিলেন। আবার তালের স্বচ্ছ সলিলের তরঙ্গমালার সহিত মণিমহেশের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিতেছে। হ্রদে মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্ফুটিত পুষ্পসকল আনন্দে বিভোর হইয়া যেন মণিমহেশের মহিমা কীর্তন করিতেছে। মনে হইল ইহাই সেই অমরাপুরী। এই আবহাওয়ায় মানবের মনকে ইহজগতের কথা একেবারে বিস্মরণ করাইয়া কোন্ এক অজানা দেশে লইয়া যায়। কিছুকালের নিমিত্ত এই প্রাকৃতিক অপূর্ব শোভা উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মণিমহেশ পর্বতশিখরের উচ্চতা আঠার হাজার ফুট।

প্রায় রোজই এইস্থানে বৈকালবেলায় বৃষ্টি বা বরফ পড়িয়া থাকে। মণিমহেশকে শেষ প্রণামান্তে আমরা বেলা বারটায় যাত্রা করিয়া দেড়টায় ধর্মশালায় ফিরিয়া আসি। দেখিলাম তিনজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক মণিমহেশ দর্শনে ডালহৌসি হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা ধর্মশালার পাশেই তাঁবু খাটাইয়া আছেন। আমরা একটু

বিশ্রাম করিয়া আহার করিলাম। কিছুক্ষণ পরে রওনা হইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই হর্ষিরে আসি ও রাত্রিযাপন করি। পরদিন ভরমুরে আসিয়া নাগাজীর আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে একদিন থাকিতে হইল। পরদিন ২১ সেপ্টেম্বর মহালয়া ও সূর্যগ্রহণ। গ্রহণ-উপলক্ষে একটি কুণ্ডতে স্নান করি। পরদিন দুরুংগাটিতে মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সমাপন করিয়া চুড়িতে রাত কাটাই। দোকানদারের ভিক্ষা গ্রহণ করিলাম। পরদিন বেলা এগারটায় একটি জায়গায় আহারের ব্যবস্থা হইল। এখান হইতে চাম্বা আরো ছয় মাইল। এই চটিতে একটিমাত্র দোকান ও পাশের ছোট ঘরটিতে যাত্রীরা বিশ্রাম করিয়া থাকে। দোকান হইতে ধান্যমিশ্রিত মোটা চাউল কিনিলাম। আর কিছুই পাওয়া গেল না। ভাল চাউলের কথা জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার বলিল ঃ "এই চাউল আমাদের রাজা খাইয়া থাকেন।" সঙ্গে একমুঠা ভাজা মুগডাল ও একটি আলু ছিল। অগত্যা উহাতেই আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা বিশ্রাম করিলাম। সন্ধ্যার পূর্বেই চাম্বাতে আসিয়া বাজারের ধর্মশালায় উঠিলাম এবং শিক্ষকমহাশয়ের আতিথ্যগ্রহণ করিলাম। পরদিন মন্দিরাদি দর্শন করি এবং শহরটি বেড়াইয়া দেখি। এ-দেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই আমিষভোজী। এমনকি নিরামিষভোজীদের জন্য একটিও হোটেল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই শহরে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। দুপুরে আহারান্তে দুইটি কুলিসহ ডালহৌসি অভিমুখে যাত্রা করিয়া নয় মাইল চড়াইয়ের পর সন্ধ্যায় খজুয়ারে আসি। এইখানে একটি ডাকবাংলো, একটি শিবমন্দির, দুইটি দোকান ও একটি পুরাতন দোতলা ধর্মশালা আছে। মন্দিরে ও নাটমন্দিরে কাঠের নানারকম কারুকার্য আছে। আমরা সন্ধ্যারতি দর্শন করিয়া ধর্মশালার দোতলায় রাত্রিযাপন করিলাম। ধর্মশালার সম্মুখেই একটি হ্রদ। ইহার দুই-তৃতীয়াংশ ভর্তি হইয়া গিয়াছে। উহাতেই 'গলফ্ কোর্ট' করিয়াছে। আর বাকি অংশে সামান্য জল আছে। পরদিন নয় মাইল পথ চলিয়া বেলা দশটায় ডালহৌসিতে আসি। এই নয় মাইলের মধ্যে প্রথম ছয় মাইল চড়াই, বাকি তিন মাইল সমতল ও সামান্য উতরাই। বারটার সময় বাস ছাড়িবে। নিকটবর্তী একটি হিন্দুস্থানী পানের দোকানদার হোটেলের মতো সাত-আটজন লোককে খাওয়াইতেছে। আমরাও খাবারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দোকানদার বলিল ঃ "হাঁ দুইজনের হইয়া যাইবে, তবে চার আনা হিসাবে পয়সা দিতে হইবে।" আমরা তাহাতেই রাজি হইলাম। দুইটি থালায় বাসমতী চাউলের ভাত, অড়হরের ডাল ও দুইরকম তরকারি সাজাইয়া দিয়াছিল। আমরাও বেশ তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম। ইতিমধ্যে তাহার সঙ্গে মণিমহেশের যাত্রার কথা হইয়াছিল। পরে দোকানদার পয়সা গ্রহণ না করিয়া বলিল ঃ "আপলোগ্ মহাত্মা হ্যাঁয়, অওর মণিমহেশ দর্শন করকে আয়ে। আপলোগোঁকো খিলাকে ম্যাঁয় তো ধন্য হো গয়া।" বারটায় বাস ছাড়িয়া চারটায় পাঠানকোট পৌঁছিলাম।* □

* ৫৭ বর্ষ, ৬ সংখ্যা

অ্যান্টার্কটিকা অভিযান

সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

প্রখ্যাত ভূতাত্ত্বিক, প্রথম বাঙালী তথা ভারতীয় মহিলা যিনি সম্প্রতি পৃথিবীর তলদেশে হিমময়ী দুর্জয় কুমেরুতে ভারতীয় অভিযানে অংশ নিয়েছেন। পর্বতাভিযানেও খ্যাতকীর্তি—হিমালয়ের 'রটি' প্রভৃতি অভিযানে সফল যাত্রী। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে 'ললনা' অভিযানের সহনেত্রী—হিমালয়ের এক অজেয়, অনামী শৃঙ্গ (২০,১৩০ ফিট) জয়ের গৌরব অর্জনকারিণী। লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে রয়েল কমিশনের প্রাক্তন ফেলো। সুইডেনের উপাসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা। স্কটিশ হাইল্যান্ড, স্পেন, সুইডেন ও নরওয়ের আর্কটিক অঞ্চলে ভূতত্ত্বের গবেষিকা। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বিজ্ঞানী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব-বিভাগে অধ্যাপিকা। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুশিল্পে সুকুশলা—বিশিষ্ট লেখিকা।—সম্পাদক

পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণ কোণায় যে এক বিশাল মহাদেশ লুকিয়ে আছে সেকথা গ্রীকেরা কল্পনা করেছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির যুগেই। এই মহাদেশের নাম দিয়েছিলেন তাঁরা অ্যান্টার্কটিকোস—যার অর্থ হলো সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিপরীতে। দক্ষিণের এই মহাদেশ থেকে উত্তর আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যাবে না বলেই এই নামকরণ। তারপর বহু শতাব্দী কেটে গেছে এই মহাদেশকে জানতে। দুঃসাহসী নাবিক ক্যাপটেন জেমস কুক ১৭৭২ থেকে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দ এই মহাদেশ আবিষ্কারের আশায় বরফ-জমা দক্ষিণ সমুদ্রে অভিযান চালিয়েছেন। কিন্তু প্যাক আইসের দুস্তর বাধা ভেদ করে অ্যান্টার্কটিকাতে পৌঁছতে পারেননি। তবে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ পরিক্রমা করে তিনি প্রমাণ করলেন যে, যদি কোন মহাদেশ থেকেও থাকে দক্ষিণ মেরুতে তার সঙ্গে উত্তরের ভূখণ্ডের কোন যোগ নেই। তিনিই প্রথম কুমেরু বৃত্ত অতিক্রম করেছিলেন।

জেমস কুক দক্ষিণ সমুদ্রে তিমি আর সীলের প্রাচুর্যের কথাও উল্লেখ করেছিলেন; ফলে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে দলে দলে তিমি-শিকারীর দল পাড়ি জমাল দক্ষিণ সমুদ্রে। এমনই এক তিমি-শিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাথানিয়েল পামার ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে দাবি জানান যে, তিনি মূল মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন। একই খ্রীস্টাব্দে রুশ অভিযাত্রী ভন বেলিংসহাওসেন ও ব্রিটিশ অভিযাত্রী জন ব্র্যান্সফিল্ড একই দাবি জানান। আজ সঠিক জানা মুশকিল তাঁরা সত্যিই মূল ভূখণ্ড দেখেছিলেন, অথবা বরফে ঢাকা কোন দ্বীপের অংশকেই মূল মহাদেশ ভেবে ভুল করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই শুরু হলো একের পর এক অভিযান। এইসময় বেশ কয়েকটি অভিযান হয় অ্যান্টার্কটিকাতে। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানগুলি পরিচালিত হয় এই দুর্গম মহাদেশে। ধীরে

ধীরে এই মহাদেশের নানান অংশ আবিষ্কৃত হলো—বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সঙ্কলিত হলো। পালতোলা জাহাজে চেপে এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা যে-মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছেন, নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেও, তার মূল্য আজও অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের ইতিহাসে অনন্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার এই অংশকে তাই বলা হয় অ্যান্টর্কটিকা অভিযানের 'হিরোয়িক পিরিয়ড'। স্কটের ডিসকভারি ও টেরানোভা অভিযান, আমুণ্ডসেনের ফ্রামহাইম অভিযান, শ্যাকলটনের নিমরোড ও অরোরা অভিযান এইসময়েই হয়েছে। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর আমুণ্ডসেন দক্ষিণ মেরুতে ওড়ালেন নরওয়ের জয়পতাকা। স্কট একমাস পরে পৌঁছলেন সেখানে তাঁর চারজন সঙ্গী নিয়ে। আমুণ্ডসেন সুস্থদেহে সদলবলে ফিরে এসেছেন কিন্তু স্কট ও তাঁর সঙ্গীদের প্রাণ দিতে হয়েছিল প্রতিকূল প্রকৃতির কাছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের রূপও পালটাতে লাগল। এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার, আইসব্রেকার জাহাজ, স্নোট্রাক্টর আর নানান রকম আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হতে লাগল প্রতিকূল প্রকৃতিকে জয় করার জন্য। একটি দুটি উৎসাহী ব্যক্তির পরিবর্তে সরকারী ব্যবস্থাপনায় অভিযান পরিচালনা হতে শুরু হলো। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীস্টাব্দে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বছরে অ্যান্টার্কটিকাতে বিশদ সমীক্ষা করার কর্মসূচী নিয়ে বারোটি দেশ সেখানে স্থায়ী গবেষণাগার স্থাপন করল। এই সম্মিলিত গবেষণার ফল এত ভাল পাওয়া গেল যে, অ্যান্টার্কটিকাকে বিজ্ঞানের মহাদেশ বলে চিহ্নিত করে ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে ওয়াশিংটনে অ্যান্টার্কটিকা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এই চুক্তির বলে অ্যান্টার্কটিকাতে কোন দেশের মালিকানা গ্রাহ্য করা হবে না, এই মহাদেশে কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণাই চলবে, কোনরকম মিলিটারি কার্যকলাপ চলবে না, অ্যান্টার্কটিকার প্রাণী ও পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় এমন কিছু করা সেখানে বারণ। আর্জেন্টিনা, চিলি, ব্রিটেন, নরওয়ে, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান, সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল মূল স্বাক্ষরকারী। ক্রমে ক্রমে এই চুক্তিতে যোগ দিয়েছে পোল্যান্ড, স্পেন, পূর্ব জার্মানি, ব্রেজিল, ভারত ও চীন।

ভারতবর্ষ অ্যান্টার্কটিকা গবেষণায় যোগ দেয় ১৯৮১-৮২ খ্রীস্টাব্দে। ডক্টর সৈয়দ জহুর কাশিমের পরিচালনায় প্রথম অভিযান হয়। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের ৯ জানুয়ারি অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে প্রোথিত হলো ভারতীয় পতাকা। ১৯৮২-৮৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরায়নার নেতৃত্বে হলো দ্বিতীয় অভিযান। এই অভিযানে ভারতীয় স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র বানাবার প্রাথমিক সমীক্ষা চালানো হয়। ১৯৮৩-৮৪ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় অভিযান হয় ডক্টর হর্ষ গুপ্তার নেতৃত্বে। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ছাড়াও এই অভিযানের প্রধান দায়িত্ব ছিল একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের। আর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সক্রিয় উৎসাহে দুজন মহিলা বিজ্ঞানীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হলো তৃতীয় অভিযাত্রী দলে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশেনোগ্রাফির মেরিন বায়োলজিস্ট ডক্টর অদিতি পন্থ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি ভূতত্ত্ববিদ হিসাবে নির্বাচিত হলাম।

তৃতীয় অভিযান শুরু হলো ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর গোয়ার মার্মাগাও বন্দর থেকে। দলে ছিল একাশিজন সদস্য। আর্মির কোর অফ ইঞ্জিনিয়ার্স-এর আটত্রিশজন; তাঁদের দায়িত্ব স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্রটি বানানোর। নেভি ও এয়ারফোর্স থেকে এসেছে তেরজন করে সদস্য। তাদের দায়িত্ব কুমেরু অঞ্চলে হেলিকপ্টারের সাহায্যে অভিযাত্রী ও অভিযানের মালপত্র পৌঁছে দেওয়া। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য ছিলেন ষোলজন বিজ্ঞানী ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম তোলার জন্য একজন ক্যামেরাম্যান। ফিনল্যান্ড থেকে আইসব্রেকার জাহাজ ফিনপোলারিস ভাড়া করা হলো। ভারতীয় সদস্য ছাড়া জাহাজের অফিসার ও কর্মী ছিলেন আঠাশজন। ১০ ডিসেম্বর মরিশাস পৌঁছই। সেখানে চারদিন থাকা হয় কিছু খাদ্যসামগ্রী, খাবার জল ও কিছু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার জন্য। ১৪ ডিসেম্বর শুরু হয় আবার সমুদ্রযাত্রা। এবারে অ্যান্টার্কটিকাতেই পৌঁছে হলো যাত্রা শেষ।

গর্জনশীল চল্লিশাতে খুব একটা ঝড়-জলের সম্মুখীন হতে হয়নি, কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হলো প্রবল ঝড়। পঞ্চাশ ও ষাট ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর বিশেষ কোন ভূখণ্ডের বাধা না থাকাতে এই অংশের সমুদ্র সদাই উত্তাল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। আমাদের জাহাজখানা পাঁচদিন ধরে সেই উত্তাল সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে প্রবেশ করল প্যাক আইসের সীমানায়। তখন সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য। যেদিকে দু-চোখ যায় কেবল ভাঙা বরফের রাশি। অ্যান্টার্কটিকাকে ঘিরে রয়েছে এই দক্ষিণ সমুদ্র—ভারত, প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ অংশ। বছরের বেশিরভাগ সময়ই এই দক্ষিণ সমুদ্রের উপরিভাগ জমে বরফ হয়ে থাকে। এই সামুদ্রিক বরফ সাধারণত তিন-চার মিটার পুরু হয়। গ্রীষ্মকালে এর কিছুটা অংশ ভেঙে সমুদ্রের স্রোতের টানে উত্তরে চলে আসে। পরের শীতে আবার এই ভাঙা টুকরোগুলি নতুন করে জমে যায়। অ্যান্টার্কটিকাকে ঘিরে এই জমে যাওয়া ভাঙা সামুদ্রিক বরফের এক বলয় তৈরি হয়। এই অঞ্চলকেই বলা হয় প্যাক আইস। কুমেরু অঞ্চলে প্রবেশের প্রধান বাধাই হলো এই প্যাক আইসের বেড়াজাল।

২৬ ডিসেম্বর আমরা এই বেড়াজাল ভেদ করে পরিষ্কার নীল জলে এসে পড়লাম। অদূরে অক্ষত সামুদ্রিক বরফ—ফাস্ট আইস। ২৭ ডিসেম্বর আমাদের জাহাজ সেই ফাস্ট আইসে গিয়েই নোঙর করল। সেখানকার তিন মিটার পুরু বরফ কাটার ক্ষমতা আমাদের ফিনপোলারিসের ছিল না। সেখান থেকে মূল হিমসোপান তিন কিলোমিটার দূরে। পৌঁছনোমাত্র ছুটে এল পেঙ্গুইনের দল। অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া অন্য কোথাও এই পেঙ্গুইনদের দেখা যায় না। কুমেরু অঞ্চলের পাঁচটি প্রজাতির মধ্যে প্রধান হলো অ্যাডেলি ও এম্পেরর পেঙ্গুইন। এম্পেরর পেঙ্গুইন আকারে বড়, লম্বায় প্রায় সাড়ে চার ফুট। অ্যাডেলিরা লম্বায় আড়াই ফুট মতন হয়। এদের প্রধান খাদ্য হলো দক্ষিণ সমুদ্রের চিংড়ি মাছ—ক্রিল। অ্যান্টার্কটিকার অন্যান্য প্রাণী—যেমন সীল এবং তিমিদেরও প্রধান খাদ্য এই ক্রিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ক্রিলই হয়তো ভবিষ্যতে পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা সমাধান করবে। পেঙ্গুইন ছাড়া অ্যান্টার্কটিকাতে আরো দু-তিন ধরনের পাখি দেখা যায়। শিকারী পাখি স্কুয়া, যাকে বলা হয় অ্যান্টার্কটিকার বাজ, এদের মধ্যে প্রধান। পেঙ্গুইনের ডিম বা শিশু এবং ছোট

পাখি পেট্রেলই এই শিকারী স্কুয়ার প্রধান খাদ্য। তবে আজকাল রিসার্চ স্টেশনের ধারেও এরা উড়ে বেড়ায় খাবারের লোভে।

অ্যান্টার্কটিকায় পৌঁছনোর দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল কর্মব্যস্ততা। মূল শিবির ও স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করে ফেলা হলো প্রথম দিনেই। ২৮ ডিসেম্বর আঠাশজন ইঞ্জিনিয়ার ও জওয়ানদের একটি দল চলে গেল মূল শিবির স্থাপন করতে। স্নো ট্র্যাক্টরগুলিকে সামুদ্রিক বরফের ওপর দিয়েই চালিয়ে নিয়ে মূল বরফভূমিতে রেখে আসা হলো। জওয়ানদের একটি দল ও বিজ্ঞানীদের ওপর ভার দেওয়া হলো অভিযানের মালপত্র ও বাড়ি তৈরি করার সরঞ্জাম হেলিকপ্টারে বোঝাই করার। আশা ছিল সাতদিনের মধ্যেই এই মাল খালাসের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর বিজ্ঞানীরা নিজের নিজের সমীক্ষা শুরু করতে পারবেন। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা।

সমস্ত মালপত্র পাঠানো হচ্ছিল হেলিকপ্টারের তলায় নেটে ঝুলিয়ে। বড় হেলিকপ্টার প্রতাপ এভাবে আড়াই টন মাল বহন করতে পারে। এভাবে মাল পাঠানোর ফলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হতে লাগল। আমরা একবারের মাল পাঠিয়ে হেলিকপ্টার ফিরে আসার আগেই দ্বিতীয় দফার মাল তৈরি করে রাখতাম। মূল শিবিরে গিয়ে হেলিকপ্টার নেট নামিয়েই ফিরে আসত। পরেরবার আবার মাল নামিয়ে আগের বারের নেট ফেরত নিয়ে আসত। ততক্ষণে মূল শিবিরে ওরাও মাল নামিয়ে নেটে খালি করে রেখেছে। উনত্রিশ তারিখও এভাবেই মাল নিয়েছিল প্রতাপ হেলিকপ্টার। প্রথম দফায় মাল পৌঁছনোর পর আবার দ্বিতীয় দফায় মাল নিয়ে উড়বার সময় জাহাজের ক্রেনের দড়িতে হেলিকপ্টারের রোটর ব্লেড গিয়ে ধাক্কা খেল। মুহূর্তের মধ্যে হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ল হিমশীতল জলে। আমরা নিরুপায় দর্শকের মতো জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছি জানালা ভেঙে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন পাঁচজন আরোহী। নেভির চেতক হেলিকপ্টার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে দড়িতে ঝুলিয়ে উদ্ধার করল একজনকে। বাকিদের রেসকিউ বোট নিয়ে উদ্ধার করা হলো। হেলিকপ্টার ততক্ষণে তলিয়ে গেছে গভীর সমুদ্রে। এত ঠাণ্ডাজলে মানুষের পক্ষে আধঘণ্টার বেশিসময় বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের সৌভাগ্য পাঁচজনকেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। একজনের চোট কিছুটা গুরুতর ছিল, তার সুস্থ হতে সপ্তাহ তিনেক লেগেছিল। বাকিরা কয়েকদিন বাদেই আবার কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

চোদ্দ মিলিয়ন পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের শতকরা আটানব্বই ভাগই দু-তিন কিলোমিটার পুরু হিমবাহে ঢাকা। হিমবাহের গভীরতা কোন কোন জায়গায় সাড়ে চার কিলোমিটারেরও বেশি। এই মহাদেশীয় হিমবাহে সঞ্চিত আছে পৃথিবীর আটাত্তর শতাংশ মিষ্টি জলের ভাণ্ডার। বর্তমানে অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া কেবলমাত্র গ্রীনল্যান্ডেই মহাদেশীয় হিমবাহ আছে। তবে তা আয়তনে অ্যান্টার্কটিকার তুষারক্ষেত্রের দশভাগের একভাগ। এই ২৯,০০,০০০ ঘন কিলোমিটার বরফের চাপে অ্যান্টার্কটিকার ভূপৃষ্ঠ ৬০০ মিটার নিচে নেমে গেছে। যদি কোনদিন এই বরফ গলে যায়

তবে সারা পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ ৬০ মিটার বেড়ে যাবে, অর্থাৎ সমস্ত বন্দর প্লাবিত হয়ে যাবে।

১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি আমরা পাঁচজন বিজ্ঞানী শির্মাকার পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মূল শিবির স্থাপিত হয়েছে তীর থেকে ১৩ কিলোমিটার অভ্যন্তরে। আরো ৭০ কিলোমিটার ভিতরে এই শির্মাকার ওয়েসিস মাউন্টেন রেঞ্জ অবস্থিত। ভারতীয়রা নাম দিয়েছেন দক্ষিণ গঙ্গোত্রী পর্বতমালা। চারিপাশের বরফের মধ্যে যখন ছোট একটি পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে বলা হয় ওয়েসিস মাউন্টেন রেঞ্জ। এখানে যদি পাহাড়ের উচ্চতা হিমবাহের গভীরতা থেকে বেশি হয় তবেই তা বরফ ভেদ করে দৃশ্যমান হয়, ঠিক যেমন জলের মধ্যে মাথা তুলে থাকে দ্বীপ। শির্মাকার পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করাই আমাদের প্রধান কাজ। তিনজন ভূতত্ত্ববিদ—ডক্টর মদনলাল, রবীন্দ্র সিং ও আমি, জীববিজ্ঞানী প্রভু মাতোন্দকর ও ডক্টর অলক ব্যানার্জি, সেখানে তাঁবু করে একমাস থাকব। বাকিরা হয়তো দু-একদিন কাটিয়ে যাবেন, তবে তাঁদের প্রধান কাজ হয় মূল শিবিরে নয়, জাহাজে থেকেই।

ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রায় দু-কোটি বছর আগে অ্যান্টার্কটিকা গণ্ডোয়ানাল্যান্ড নামে এক বিশাল মহাদেশের অংশ ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই বিশাল মহাদেশ ভেঙে তৈরি হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, অ্যান্টার্কটিকা ও ভারতবর্ষ। অ্যান্টার্কটিকার প্রাচীন যুগের পাথরের সঙ্গে গণ্ডোয়ানাল্যান্ডের অন্যান্য মহাদেশগুলির পাথরের খুবই সাদৃশ্য। অ্যান্টার্কটিকাতে পাওয়া গিয়েছে কয়লার স্তর এবং গ্লসপটেরিস পাতার ফসিল যার ফলে প্রমাণিত হয় সেখানে এককালে ছিল উষ্ণ নিরক্ষীয় আবহাওয়া।

আমরা শির্মাকার পাহাড়ের পঁয়ত্রিশ বর্গকিলোমিটার এলাকার ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। একটি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করা ছাড়াও নানান নমুনা সংগ্রহ করে এনেছি ভারতবর্ষে ফিরে গবেষণাগারে পরীক্ষা করার জন্য। আমরা সাধারণত সকাল নটায় কাজে বেরোতাম, ফিরতে রোজই রাত নটা হয়ে যেত। জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে সেখানে চব্বিশ ঘণ্টাই দিনের আলো। ২৩ জানুয়ারি প্রথম রাত হলো আধঘণ্টার জন্য। তারপর থেকে ধীরে ধীরে রাতের পরিধি বাড়তে লাগল। আমরা যখন মার্চ মাসে অ্যান্টার্কটিকা থেকে রওনা দিলাম তখন সেখানে ঘণ্টাতিনেকের মতো রাত হতো।

প্রায় মাসখানেক বাদে শির্মাকার রেঞ্জের ফিল্ডওয়ার্ক সমাপ্ত করে আমরা ফিরে এলাম বেস ক্যাম্পে। সেখানে হিমবাহ গবেষণার কিছু কাজ করা হবে। তখন ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। তাপমাত্রা অনেক নিচে নেমে গেছে। জানুয়ারি মাসের গড় তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায়ই মাইনাস ২০ ডিগ্রি পর্যন্ত নামত। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেইসময় তুষার-ঝড়ও অনেক বেশি হতে লাগল। জানুয়ারি মাসে ব্লিজার্ডের সংখ্যা ছিল মাত্র দুই। ফেব্রুয়ারি মাসে তিন-চারদিন পর পরই প্রবল ব্লিজার্ড শুরু হয়ে যেত, আর সেই ঝড় চলত

পাঁচ-ছয়দিন ধরে। তবে সৌভাগ্যের কথা, তখন আমাদের গবেষণাকেন্দ্রের বাইরের কাঠামো সম্পূর্ণ। ভিতরের কাজ ব্লিজার্ড হলেও চলতে থাকে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী'র উদ্বোধন হলো। ভারতীয় পতাকার নিচে সব ধর্মের উপাসনা করার পর দলনেতা ডক্টর হর্ষ গুপ্তা শীতের অধিনায়ক কর্নেল সত্যস্বরূপ শর্মার হাতে বাড়ির ভার অর্পণ করলেন। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও জওয়ানদের অসীম অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতায়ই এই দুঃসাধ্য কাজ সম্পূর্ণ হলো মাত্র দু-মাসে। গর্বের কথা এই যে, এখন পর্যন্ত আর কোন দেশ মাত্র দু-মাসে অ্যাণ্টার্কটিকাতে একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র সম্পূর্ণ করতে পারেনি। দোতলা এই বাড়িটি দু-ভাগে ভাগ করা। একদিকে আছে গবেষণাগার, সার্জারি ও মেডিক্যাল রুম, লাউঞ্জ, লন্ড্রি, রান্নাঘর, স্নো মেল্টিং প্ল্যান্ট ও বয়লার রুম। এইদিকের দোতলাতে আছে কমিউনিকেশন রুম, অফিস ঘর, ডার্করুম, শোবার ঘর, শাওয়ার এবং টয়লেট। অন্য ব্লকে আছে জেনারেটর রুম, নানাধরনের ওয়ার্কশপ, জ্বালানী রাখার এক বিশাল ট্যাঙ্ক এবং গ্যারাজ। তার দোতলায় আছে স্টোর। সারা বছরের রসদ সেখানে জমা করা আছে। সারা বছরের জ্বালানী তেল রাখা হয়েছে বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরের ফুয়েল ডাম্পে। সপ্তাহে একদিন সেখান থেকে ড্রাম এনে বাড়ির ট্যাঙ্কে ভর্তি করে রাখতে হবে। বাড়িটি সম্পূর্ণ তাপনিয়ন্ত্রিত। ভিতরের তাপমাত্রা আরামদায়ক পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া বাড়ির ঠিক মধ্যিখানে বসানো হয়েছে একটি গম্বুজ। এটির সাহায্যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব। এখান থেকে পৃথিবীর যেকোন জায়গায় টেলিফোন করা যায়, টেলেক্স পাঠানো যায়।

উদ্বোধনের পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল প্রবল তুষার-ঝড়। এবারের ঝড়ের দাপট সবচেয়ে বেশি; ঘণ্টায় দুশো কিলোমিটার বেগে হাওয়া চলছে, তাপমাত্রা মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দৃশ্যমানতা শূন্য; তবে এবারে আমরা আর তাঁবুর মধ্যে বন্দী নেই, আমরা সবাই উঠে এসেছি নতুন গবেষণাকেন্দ্রের নিরাপদ আশ্রয়ে। ইঞ্জিনিয়ারদের সুবিধেই হলো যে, ফেরবার আগে ঝড়ের মুখে বাড়ির খুঁটিনাটি ব্যবস্থা কেমনভাবে কাজ করে সে-সম্বন্ধে আন্দাজ পাওয়া গেল, যাতে দরকার মতো ডিজাইনের অদলবদল করা যায়। আর কিছুদিন বাদেই বারোজন বাদে আমরা সবাই ফিরে আসব ভারতবর্ষে। শীতের দলের এই বারোজনকে এই বাড়িতে থেকেই কুমেরুর দীর্ঘ শীতের রাত্রির মোকাবিলা করতে হবে।

আসল ২৮ ফেব্রুয়ারি। ততদিনে বাড়ির সামনে ঝড়ে উড়ে আসা বরফ জমে দোতলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। একতলার মূল দরজা দিয়ে বেরোনো অসম্ভব। আমরা দোতলার ইমার্জেন্সি দরজা দিয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে তখন ঝকঝকে সূর্যের আলো। আমাদের বরফে চলার গাড়ির প্রায় সবটাই ডুবে গেছে বরফে, বাড়ির চারপাশেও তখন একতলা সমান উঁচু বরফের রাশি। কুমেরুর বরফ একেবারে শক্ত জমাট বাঁধা। সেই বরফ পরিষ্কার করা বিশেষ সহজ কাজ নয়। দুটো গাড়িকে উদ্ধার করতে লেগে

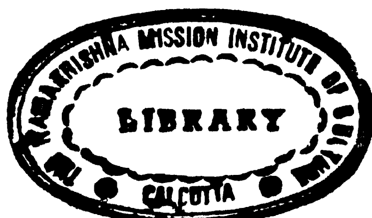
গেল প্রায় চারঘণ্টা। প্রায় বিকেল চারটার সময় শীতের দলকে বিদায় দিয়ে আমরা বাকিরা ফিরে এলাম জাহাজে।

জাহাজ তখন মূল হিমসোপানে নোঙর করা। সামুদ্রিক বরফ সবই ভেঙে চলে গেছে। তবে আরো একটি শীত আসছে; তাই সমুদ্র আবার নতুন করে জমতে শুরু করেছে। সমুদ্র জমে যাওয়ার আগেই আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে কুমেরু অঞ্চলের বাইরে।

১ মার্চ দুপুর তিনটেতে আমাদের যাত্রা হলো ঘরের দিকে। তার আগে শীতের দল এসেছিল আমাদের বিদায় জানাতে, তাদের আরেকটি বছর কাটাতে হবে এই হিমশীতল মহাদেশে। দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রিযাপনের পর আবার সূর্য উদয় হলে পরের গ্রীষ্মে চতুর্থ অভিযান তাঁদের ফিরিয়ে আনতে আসবে, তখন আবার নতুন দল থেকে যাবে তাঁদের জায়গায়। দক্ষিণের এই হিমভূমিতে স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে এইভাবেই চলবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণা। বরফের পাড়ে দাঁড়ানো কয়েকটি মানুষকে শুভকামনা জানিয়ে তাঁদের ও অ্যান্টার্কটিকাকে বিদায় জানালো বাকি সদস্যরা। ধীরে ধীরে ফিনপোলারিস এগিয়ে চলল উত্তরে। যাত্রা শেষ হলো গোয়ার মার্মাগাও বন্দরে ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের ২৯ মার্চ দুপুর বারোটায়।

তিনদিন পরে ফিরে এলাম কলকাতায়। আবার শুরু হয়ে গেল গতানুগতিক জীবন; তবে সঞ্চিত রইল অমূল্য কয়েকটি দিনের অপূর্ব অভিজ্ঞতা।* □

*৮৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা



ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীম

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জিলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে এক সদ্‌ব্রাহ্মণের ঘরে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৬ শক, ১০ ফাল্গুন, বুধবার, ১২৪১ সাল, ইংরেজী ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ। কামারপুকুর গ্রাম জাহানাবাদ (আরামবাগ) হইতে চার ক্রোশ পশ্চিমে, আর বর্ধমান হইতে ১২।১৩ ক্রোশ দক্ষিণে।

ঠাকুর মানব শরীরে ৫২ বৎসরকাল ছিলেন।

ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান ও পরম ভক্ত ছিলেন। ঠাকুরের মা চন্দ্রমণি দেবী সরলতা ও দয়ার প্রতিমূর্তি ছিলেন। পূর্বে তাঁহাদের দেরে নামক গ্রামে বাস ছিল। ঐ গ্রাম কামারপুকুর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। সেই গ্রামস্থ জমিদারের হইয়া মোকদ্দমায় ক্ষুদিরাম সাক্ষ্য দেন নাই। পরে স্বজন লইয়া কামারপুকুরে আসিয়া বাস করেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছেলেবেলার নাম গদাধর। পাঠশালে সামান্য লেখাপড়া শিখিবার পর, বাড়িতে থাকিয়া রঘুবীরের বিগ্রহ-সেবা করিতেন, নিজে ফুল তুলিয়া আনিয়া নিত্য-পূজা করিতেন। পাঠশালে 'শুভঙ্করী ধাঁধা লাগত'।

নিজে গান গাহিতে পারিতেন—অতিশয় সুকণ্ঠ। যাত্রা শুনিয়া প্রায় অধিকাংশ গান গাইয়া দিতে পারিতেন। ঠাকুর বাল্যকালেই সদানন্দ ছিলেন ও পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

বাড়ির পাশে লাহাদের বাড়ি, সেখানে অতিথিশালা—সর্বদা সাধুদের যাতায়াত ছিল। গদাধর সেখানে সাধুদের সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিতেন। কথকেরা যখন পুরাণ পাঠ করিতেন, তখন নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিতেন—এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত কথা সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

বাড়ির নিকটবর্তী গ্রাম আনুড়ে একদিন মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার তখন ১১ বৎসর বয়স। ঠাকুর নিজ মুখে বলিয়াছেন, সেইসময়ে হঠাৎ তিনি অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন করিয়া বাহ্যশূন্য হয়েন। লোকেরা বলিল মূর্ছা—ঠাকুরের ভাবসমাধি হইয়াছিল।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর, ঠাকুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ হইবে। কলিকাতায় কিছুদিন নাথের বাগানে, কিছুদিন ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চাটুজ্জ্যের বাড়িতে থাকিয়া পূজা করিয়া বেড়াইতেন। এই সূত্রে ঝামাপুকুরের মিত্রদের বাড়িতে কিছুদিন পূজা করিয়াছিলেন।

রানী রাসমণি কলিকাতা হইতে দুই ক্রোশ দূরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি স্থাপন করিলেন। ১২৫৯ সাল স্নান-যাত্রার দিন (ইংরেজী ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দ)। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার কালীবাড়ির প্রথম পূজারী নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে আসিতেন ও কিছুদিন পরে নিজে পূজা কার্যে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরও মাঝে মাঝে

কালীবাড়িতে পূজা করিতেন। তাঁহারই দুই পুত্র রামলাল ও শিবরাম ও এক কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী।

কয়েকদিন পূজা করিতে করিতেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনের অবস্থা আরেক রকম হইল। সর্বদাই বিমনা ও ঠাকুর-প্রতিমার কাছে বসিয়া থাকেন।

আত্মীয়েরা এইসময় তাঁহার বিবাহ দিলেন—ভাবিলেন, বিবাহ হইলে হয়তো অবস্থান্তর হইতে পারে। কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে জয়রামবাটীগ্রামস্থ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর সঙ্গে বিবাহ হইল। তখন ঠাকুরের বয়স ২১।২২, শ্রীশ্রীমার বয়স ছয় বৎসর।

বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পর তাঁহার একেবারে অবস্থান্তর হইল। কালী-বিগ্রহ পূজা করিতে করিতে কী অদ্ভুত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। আরতি করেন, আরতি আর শেষ হয় না! পূজা করিতে বসেন, পূজা শেষ হয় না; হয়তো আপনার মাথায় ফুল দিতে থাকেন।

পূজা আর করিতে পারিলেন না—উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। রানী রাসমণির জামাতা মথুর তাঁহাকে মহাপুরুষ বোধে সেবা করিতে লাগিলেন ও অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা মাকালীর পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

ঠাকুর আর পূজাও করিলেন না, সংসারও করিলেন না—বিবাহ নামমাত্র হইল। নিশিদিন মা-মা করেন। কখনো জড়বৎ, কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় থাকেন। কখনো উন্মাদবৎ বিচরণ করেন। কখনো বালকের ন্যায়। কামিনীকাঞ্চনাসক্ত বিষয়ীদের দেখিয়া লুকাইতেন। ঈশ্বরীয় লোক ও ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু ভালবাসিতেন না। সর্বদাই মা-মা!

কখনো পঞ্চবটীতে একাকী বসিয়া গাভী যেরূপ বৎসের জন্য ডাকে, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া মা-মা করিতেন। কখনো বা 'রাম! রাম! রাম রাম' বলিয়া কাতর স্বরে নাম করিতেন। কালীবাড়িতে সদাব্রত ছিল (এখনো আছে)— সাধু সন্ন্যাসীরা সর্বদা আসিতেন। তোতাপুরী এগার মাস থাকিয়া ঠাকুরকে বেদান্ত শুনাইলেন—একটু শুনাইতে শুনাইতে তোতা দেখিলেন, ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী কিয়ৎপূর্বে আসিয়াছেন; তিনি ঠাকুরকে তন্ত্রোক্ত অনেক সাধন করাইলেন ও তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ জ্ঞানে শ্রীচরিতামৃত ও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থ শুনাইলেন। বৈষ্ণবপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও সর্বদা আসিতেন। তিনিই ঠাকুরকে কলুটোলায় চৈতন্যসভায় লইয়া যান। এই সভাতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবচরণ চৈতন্যসভার সভাপতি ছিলেন।

বৈষ্ণবচরণ মথুরকে বলিয়াছিলেন, এ উন্মাদ সামান্য নহে—প্রেমোন্মাদ; ইনি ঈশ্বরের জন্য পাগল! ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবচরণ দেখিলেন, ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা! চৈতন্যদেবের ন্যায় তাঁহারও কখনো অন্তর্দশা, (তখন জড়বৎ, সমাধিস্থ) কখনো অর্ধবাহ্য, কখনো বা বাহ্যদশা!

কিন্তু ঠাকুর মা মা করিয়া কাঁদিতেন—সর্বদা মার সঙ্গে কথা কহিতেন, মার কাছে উপদেশ লইতেন। বলিতেন ঃ "মা, তোর কথা কেবল শুনব, আমি শাস্ত্রও জানিনা, পণ্ডিতও জানিনা। তুই বুঝাবি তবে বিশ্বাস করব।" ঠাকুর জানিতেন ও বলিতেন ঃ "যিনিই পরব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা।"

ঠাকুরকে জগন্মাতা বলিয়াছিলেন : "তুই আর আমি এক। তুই ভক্তি নিয়ে থাক—জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখতে হবে না; অনেক শুদ্ধ কামনাশূন্য ভক্ত আছে, তারা আসবে।" ঠাকুরবাড়িতে আরতির সময় যখন কাঁসর ঘণ্টা বাজিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠিতে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন : "ওরে ভক্তেরা, তোরা কোথায় কে আছিস শীঘ্র আয়।"

শ্রীযুক্ত কেশব সেন যখন বেলঘরিয়ার বাগানে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তা করেন, তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে যান ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১ জ্যৈষ্ঠ।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, নেপালের 'ক্যাপ্টেন' কিছু পূর্বে আসিতে থাকেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ১৮৭৯।১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন। তাঁহারা যখন ঠাকুরকে দেখেন, তখন উন্মাদ অবস্থা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। তখন শান্ত সদানন্দ বালকের অবস্থা। কিন্তু সর্বদা সমাধিস্থ—কখনো জড়-সমাধি—কখনো ভাব-সমাধি। সমাধি ভঙ্গের পর ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। যেন পাঁচ বছরের ছেলে। সর্বদাই মা মা।

রাম ও মনমোহন ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন; কেদার, সুরেন্দ্র তারপর আসিলেন; চুনি, লাটু, নিত্যগোপাল, তারকও পরে আসিলেন। ১৮৮১-এর শেষভাগ ও ১৮৮২-এর প্রারম্ভ এইসময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাস্টার, যোগিন আসিয়া পড়িলেন। ১৮৮৩।৮৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কিশোরী, অধর, নিতাই, সিঁথির গোপাল, মহেন্দ্র কবিরাজ, ছোট গোপাল, বেলঘরিয়ার তারক, শরৎ, শশী, সুবোধ, সান্যাল; ১৮৮৪-এর মধ্যে গঙ্গাধর, কালী, গিরিশ, দেবেন্দ্র, সারদা, কালীপদ, উপেন্দ্র, দ্বিজ, হরি; দেখিতে দেখিতে ছোট নরেন্দ্র, পল্টু, পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, হরিপদ আসিলেন। এইরূপে হরমোহন, হাজরা, ক্ষীরোদ, যজ্ঞেশ্বর, কৃষ্ণনগরের যোগিন ও কিশোরী, মণীন্দ্র, ভূপতি, অক্ষয়, নবগোপাল (ঘোষ) ও নবগোপাল (কবিরাজ), বেলঘরিয়ার গোবিন্দ, আশু, গিরীন্দ্র, অতুল, দুর্গাচরণ, সুরেশ, প্রাণকৃষ্ণ, মহিমাচরণ, নবাই চৈতন্য, হরিপ্রসন্ন, মহেন্দ্র (মুখো), প্রিয় (মুখুজ্জে), সাধু প্রিয়নাথ, বিনোদ, তুলসী, হরিশ মুস্তাফি, বসাক, কথকঠাকুর, বালীর শশী (ব্রহ্মচারী), নিত্যগোপাল (গোস্বামী), কোন্নগরের বিপিন, বিহারী, ধীরেন, রাখাল (ঘোষ) ক্রমে আসিয়া পড়িলেন।

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, শশধর পণ্ডিত, ডাক্তার রাজেন্দ্র সরকার, বঙ্কিম (চাটুয্যে), আমেরিকার কুক সাহেব, ভক্ত Williams, মিসির সাহেব, মাইকেল মধুসূদন, কৃষ্ণদাস (পাল), পণ্ডিত দীনবন্ধু, পণ্ডিত শ্যামাপদ, নবীন (মুন্সি), নীলকণ্ঠ ইঁহারাও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাশীধামে ও গঙ্গামাতার শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গামাতা ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধা জ্ঞানে ছাড়িতে চান নাই।

অন্তরঙ্গ ভক্তেরা যাইবার আগে কৃষ্ণকিশোর, মথুর, শম্ভু মল্লিক, নারায়ণ শাস্ত্রী, ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত, চন্দ্র, অচলানন্দ সর্বদা ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। বর্ধমানের সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন, আর্যসমাজের দয়ানন্দ, ইঁহারাও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর এবং সিহড়, শ্যামবাজার ইত্যাদি স্থানের অনেক ভক্তেরা তাঁহাকে দেখিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকে ঠাকুরের কাছে সর্বদা যাইতেন। কেশব, বিজয়, দীন (বসু), প্রতাপ, শিবনাথ, অমৃত, ত্রৈলোক্য, কৃষ্ণবিহারী, মণিলাল, উমেশ, বেণী (পাল); হীরানন্দ, ভবানী (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়) নন্দলাল ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা সর্বদা যাইতেন; ঠাকুরও ব্রাহ্মদের দেখিতে আসিতেন। ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে থাকিয়া দীননাথ ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। আজ তিনি সন্ন্যাসী। মথুরের জীবদ্দশায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁহার বাটীতে ও উপাসনাকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। পরে কেশবের ব্রাহ্মমন্দির ও সাধারণসমাজ উপাসনাকালে দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশবের বাড়িতে সর্বদা যাইতেন ও ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে কত আনন্দ করিতেন। কেশবও সর্বদা কখনো ভক্তসঙ্গে, কখনো একাকী আসিতেন।

কালনাতে ভগবানদাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ঠাকুরের সমাধি অবস্থা দেখিয়া বাবাজী বলিয়াছিলেন—আপনি মহাপুরুষ, চৈতন্যদেবের আসনে বসিবার আপনিই উপযুক্ত।

ঠাকুর সর্বধর্ম সমন্বয়ার্থ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি ভাব সাধন করিয়া অপরদিকে আল্লা মন্ত্র জপ ও যীশুখ্রীস্টের চিন্তা করিয়াছিলেন। যে-ঘরে ঠাকুর থাকিতেন, সেখানে ঠাকুরদের ছবি ও বুদ্ধদেবের মূর্তি ছিল। যীশু জলমগ্ন পিতরকে উদ্ধার করিতেছেন, এ ছবিও ছিল। এখনো সে ঘরে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়। আজ ঐ ঘরে ইংরেজ ও আমেরিকান ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুরের ধ্যান চিন্তা করেন, দেখা যায়।

একদিন মাকে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন ঃ "মা, তোর খ্রীস্টান ভক্তেরা তোকে কিরূপে ডাকে দেখব, আমায় নিয়ে চ।" কিছুদিন পরে কলিকাতায় গিয়া এক গির্জার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উপাসনা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া ভক্তদের বলিলেন ঃ "আমি খাজাঞ্চীর ভয়ে ভিতরে গিয়া বসি নাই—ভাবিলাম, কি জানি যদি কালীঘরে যেতে না দেয়।"

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত আছেন। গোপালের মাকে ঠাকুর 'মা' বলিয়াছিলেন। সকল স্ত্রীলোককেই তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী দেখিতেন ও মা-জ্ঞানে পূজা করিতেন। কেবল যতদিন না স্ত্রীলোককে সাক্ষাৎ মা বোধ হয়, যতদিন না ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি হয়, ততদিন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুরুষদের সাবধান থাকিতে বলিতেন। এমনকি, পরম ভক্তিমতী হইলেও তাঁহাদের সম্পর্কে যাইতে বারণ করিতেন। মাকে নিজে বলিয়াছিলেন ঃ "মা, আমার ভিতরে যদি কাম হয়, তাহলে কিন্তু মা, গলায় ছুরি দিব।"

ঠাকুরের ভক্তেরা অসংখ্য—তাঁহারা কেহ প্রকাশিত আছেন, কেহবা গুপ্ত আছেন—সকলের নাম করা অসম্ভব। বাল্যকালে অনেকে যথা—নগেন্দ্র (মিত্র), তুলসী, রামকৃষ্ণ, হীরালাল (সেন), শান্তি, শশী, বিপিন, উপেন্দ্র (ইটালি), সুরেন্দ্র (গুপ্ত), সুরেন (বসু), নিবারণ ইত্যাদি; ও ছোট ছোট মেয়েরা ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারাও ঠাকুরের সেবক।

লীলা সংবরণের পর আজ তাঁহার কত ভক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। মাদ্রাজ, লঙ্কাদ্বীপ, উত্তর-পশ্চিম, রাজপুতনা, কুমায়ুন, নেপাল, বোম্বাই, পাঞ্জাব, জাপান, আবার আমেরিকা, ইংল্যান্ড সর্বস্থানে ভক্ত পরিবার ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে।*□

* ৫ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বাভাস

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

সর্বলোকললামভূত, বিজ্ঞানময়বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট স্বীয় বিভূতির কিয়দংশ বর্ণন করিয়া কহিলেন ঃ "এ জগতে যেকোন জীবে বিশেষ শক্তি, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও মহত্ত্ব দেখিতে পাইবে, তাহাকে মদীয় অনন্ত তেজোরাশির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিও।" সনাতন ধর্মের আশ্রয়ভূতা এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সনাতনধর্মাবলম্বী পুরুষমাত্রেই দেবকীনন্দনকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কেহ কেহ আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি পাঠ করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন, এমনকি, কেহ কেহ আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝা যাইবে যে, নাস্তিকতা বা সন্দেহবাদ অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধিদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। হে মানব, যদি তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে তাহাই পাইতে, তাহা হইলে আমি তোমায় ঈশ্বর আখ্যা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। যদি তোমায় বাধা দিবার শক্তি কাহারও না থাকিত, যদি তুমি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া মৃত্যুভয় অতিক্রমপূর্বক পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিতে, যদি তোমার জ্ঞানপিপাসা নির্বাণ করিবার শক্তিকে আশ্রয় করিয়া তুমি অজ্ঞান অন্ধকারের সমূলে উন্মূলনক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিতে, যদি তুমি সর্বকাল, অনায়াসে, স্বেচ্ছানুসারে তোমার অসংখ্য প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করিতে পারিতে, তাহা হইলে ঈশ্বর তুমিই হইতে। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি ঠিক ইহার বিপরীতাবস্থাপন্ন কি না? তুমি কি আপনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর দেখিতে চাও না? কিন্তু হায়। তোমার রূপ তোমার অভিমত নয়। তুমি কি কোটিপতির সন্তান হইয়া স্বয়ং কোটিপতি হইতে চাও না? কিন্তু হায়, তোমার অনিচ্ছাক্রমে তুমি দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি তোমার স্বেচ্ছাক্রমে এই সংসার নগরে অবতীর্ণ হইবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তুমি দরিদ্রের কুটির দ্বার দিয়া কখনো ইহাতে প্রবেশ করিতে না, ধনাঢ্যের অশেষ কারুকার্যসমন্বিত, সুবিপুল সিংহদ্বার দিয়াই এখানে আসিতে। তুমি কখনো অশেষ রোগের নিলয়ভূত, ভগ্ন, কদাকার, দুর্গন্ধময় দেহকে আশ্রয় করিতে না, বিপুলবীর্যসম্পন্ন, সর্বসৌন্দর্যের আশ্রয়ভূত, সুস্থ, সৌরভময় দেহকেই অধিকার করিতে। কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলেও তোমায় কখনো কখনো রুগ্ন, অন্ধ, বধির হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, দুর্ভাগ্যের দ্বিতীয় বিগ্রহ বলিয়া আপনাকে স্বীকার করিতে হয়। তুমি সকলের উপর আধিপত্য করিতে চাও, কিন্তু প্রাণসম পুত্রগণ ও প্রিয়তমা সহধর্মিণীও কখনো কখনো তোমার আজ্ঞাপালন করিতে চাহেন না, অন্যে তো তোমার কথায় কর্ণপাত করিতেও

ইচ্ছুক নহে। এ অবস্থায় নিরীশ্বর হইয়া আপনাকে ঈশ্বরজ্ঞান করা কেবলমাত্র বাতুলতার কর্ম। যে শক্তি তুমি বাধা দিতে পার না, কিন্তু যাহা অবাধে তোমায় বাধা দিতেছে, সেই মহাকালশক্তি কালীর অধীনে শুদ্ধ তুমি নও, চরাচর সমস্ত জগৎ চালিত হইতেছে। কালক্রমে মহাবীর্যশালী, মহাযশস্বী, মহাবদান্য, মহাধার্মিক, সৌন্দর্য মাধুর্যের প্রিয়তম নিলয়ভূত রাজচক্রবর্তীকেও ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া শ্মশানের পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাঁহার জীবিতাবস্থার যাবতীয় আশা, উদ্যম, লোকহিতচিকীর্ষা, রিপুকুলবিমর্দনেচ্ছা, তৎসমস্তই চিতাগ্নি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে, কারণ কালশক্তি কালীকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেন না, "কালো হি দুরতিক্রমঃ"। কালে ধনী নির্ধনী এবং নির্ধনী ধনী হইতেছে; সর্বলোকঘৃণ্য সর্বলোকপূজ্য এবং সর্বলোকপূজ্য সর্বলোকঘৃণ্য হইতেছে। মহাকাল ভিন্ন কে এই কালশক্তির বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হয়? অতএব হে মানব, তুমি এই মহাশক্তির প্রভাব যখনই বিস্মৃত হইয়া আপনাকে স্বাধীন জ্ঞান কর, তখনই তুমি মহাভ্রমে পতিত হও, তখনই উক্ত ভ্রমবশত মনে কর, "কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া" আমার মতো আর কে আছে? তখনই তোমার জ্ঞানচক্ষু অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই কালশক্তিই ঈশ্বর নামে অভিহিত। কালশক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জননী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনিই ব্রহ্ম নামে অভিহিত 'জন্মাদাস্য যতঃ'।

যেখানে এই কালশক্তির বিকাশ সমধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়, সেইখানেই ঈশ্বরত্বের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ভিতর এই মহাকালীর বিকাশ যে প্রভূত পরিমাণে ছিল, ইহা যে-কেহ তাঁহার জীবনী শ্রীমদ্ভাগবতাদি পরম পবিত্র পুরাণ সমূহে পাঠ করিয়াছেন, তিনিই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন! কোন মহাশক্তিই তাঁহাকে বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি তাৎকালিক যাবতীয় রাজশক্তিকে পদানত করিয়া, নিজ অভিমত ধর্মপ্রাণা-রাজশক্তিরই অভ্যুদয় সাধনপূর্বক গীতোক্ত স্ববাক্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।" "অর্জুন, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি অবতীর্ণ হই। সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ এবং ধর্মের জয় সাধনের জন্যই আমি প্রতি যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।" বিশ্বরূপ দর্শনপূর্বক পরম ভীত হইয়া অর্জুন যখন জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ। বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।।" "দেববর, প্রসন্ন হউন, আমি আপনাকে নমস্কার করি, উগ্ররূপধারী আপনি কে? আপনি চরাচর বিশ্বের আদিভূত। আপনার অভিলাষ কি তাহা জানি না বলিয়া আমি আপনার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।" এইরূপে পৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবান কহিলেন ঃ "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" "আমি সর্বলোক সংহারকারী অনাদি কাল।" আবার কহিলেন ঃ "ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে", "তোমার ন্যায় কতিপয় ধর্মপ্রাণ লোক ভিন্ন আর কাহাকেও রক্ষা করিব না।" এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে,

অনাদিমধ্যান্ত কাল ধর্মেরই পক্ষপাতী, কারণ ধর্মসংস্থাপনই ইঁহার উদ্দেশ্য। বাস্তবিকই কালশক্তি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইনি অনাদিকাল হইতে ধর্মেরই অভ্যুদয় সাধন করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ধর্মের জয় লক্ষিত হয় বটে কিন্তু কলিতে ধর্মের চারিটি পাদের মধ্যে কেবল একটি বর্তমান আছে বলিয়া অধুনা অধর্মেরই জয় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এ সিদ্ধান্তটি সত্য নহে, কারণ যদিও মিথ্যাবাদ, চৌর্য, নৃশংসতা ও অধার্মিকতাকে আশ্রয় করিয়া কখনো কখনো কোন কোন মনুষ্যকে সুখলাভ করিতে দেখা যায়, তথাপি যদি তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে ব্যক্তি ধর্ম বা অধর্মদ্বারা অর্থ সঞ্চয়পূর্বক পার্থিব সুখ-ভোগলাভে সমর্থ হইয়াছে, সে কখনো আপনাকে অধার্মিক বলিয়া পরিচয় দিবে না পরন্তু তুমি তাহার ধার্মিকতায় সন্দিহান হইয়াছ বলিয়া তোমার প্রতি বিশেষ রুষ্ট হইবে। অধর্ম এখনো নিশাচর পেচকের ন্যায় রজনীযোগেই বাহির হয়, দিবাভাগে লোক সমক্ষে বাহির হইবার শক্তি তাহার কখনো ছিল না এবং হইবেও না। এখনো জগতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুল, ধর্মরক্ষক শ্রীবিষ্ণুর অবতারসমূহ, শঙ্করাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য, শেষাবতার শ্রীমৎ রামানুজাচার্য, আঞ্জনেয়াবতার শ্রীমৎ মধ্বাচার্য, পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ধর্মময় বিগ্রহ জরথুস্ট্র ঈশা ও মহম্মদ এবং জ্ঞানময়বিগ্রহ পূজ্যপাদ শাক্যসিংহ শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব সমগ্র জগৎকে শাসন করিতেছেন। ইঁহারা বর্তমান সম্রাট ও রাজগণের উপর এখনো আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। অতএব কালশক্তি যে ধর্মেরই পক্ষপাতিনী; ইহা নিঃসন্দেহ এবং ইহার বিকাশ যাঁহাতে প্রভূত পরিমাণে লক্ষিত হয়, তাঁহাকে লোকে ঈশ্বরাবতার না বলিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ঈশ্বর শব্দটি যদি প্রভুবাচী হয়, তাহা হইলে যিনি সকলের পরিচালক কিন্তু স্বয়ং পরিচালিত নহেন, তাঁহাকে প্রভু বা ঈশ্বর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এইজন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে শিক্ষা দিলেন যে, "এজগতে যেকোন জীবে বিশেষ শক্তি, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও মহত্ত্ব দেখিতে পাইবে, তাহাকে মদীয় অনন্ত তেজোরাশির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিও।" কারণ, বিশেষ সৌন্দর্যসম্পন্ন, ঐশ্বর্যবান, বিশালহৃদয় মহাত্মাগণই এখানে প্রভুর স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। মানবগণ স্বেচ্ছানুসারে তাঁহাদের পদানত হইয়া আপনাদের কৃতার্থ মনে করেন। যে কেহ এতাদৃশ মহাপুরুষের বিরুদ্ধাচারণ করিতে সাহসী হইয়াছে বা হইবে, তাহাকে সর্বতোভাবে অপদস্থ ও সকলের ঘৃণাভাজন হইয়া জীবনযাপন করিতে হইয়াছে বা হইবে। ইহজীবনেই যে তাহাকে এরূপ নরকভোগ করিতে হয় তাহা নহে, পরজীবনেও তাহার সুখের আশা কোথায়? যাহার মন বিস্তীর্ণমনা মহাপুরুষগণের অনুগামী হইতে পারিল না, তাহা যে নিরতিশয় জঘন্যপ্রবৃত্তিপরায়ণ এবং সুতরাং তাহাতে যে কখনো কোন সুখশান্তি আসিতে পারে না, ইহা কি প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে? মলিনহৃদয় দুঃখেরই নিবাসভূমি ও নির্মলহৃদয় সুখের আবাস স্থান, ইহা সর্বলোকপ্রত্যক্ষ। তিনটি বস্তু জগতে বড় দুর্লভ—মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। সুতরাং মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহারা ইহজীবনে আপনাদিগকে

দুঃখজননী মলিনতার হস্ত হইতে উদ্ধারপূর্বক কৃতার্থ করিতে পারিল না, তাহারা নিতান্ত শোচনীয়। মহাপুরুষগণ কালশক্তির মূলস্থান অধিকার করিয়া আছেন, কারণ সমগ্র জগৎ আবহমানকাল হইতে তাঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কালশক্তি কালী যেমন সর্বলোকশাসনকর্ত্রী, মহাপুরুষগণও তেমনি সর্বলোক শাসন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বাক্যই শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, বাইবেল, কোরান, ত্রিপিটক, জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি আকার ধারণ করিয়া নিত্যকাল জগতের যাবতীয় নরনারীর কল্যাণ বিধান করিতেছে। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ও দুঃখময় সংসারে তাঁহারাই মানবমনে বল ও আশার সঞ্চার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের পথ জনসাধারণের গোচর করিয়া এবং নিজেরা সেই পথের পথিক হইয়া কত শত নরনারীকে যে চিরশান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহারাই যথার্থ পিতৃনামের যোগ্য। পার্থিব পিতা জন্মদাতা মাত্র, কিন্তু তাঁহারা নিত্যসুখশান্তিপ্রসবিনী ; অপবর্গকারণভূতা পরমাবিদ্যা দান করিয়া থাকেন। এইজন্যই তাঁহারা গুরুপদবাচ্য। এইজন্যই গুরুকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী কালশক্তির স্বরূপ ও তদতীত বলিয়া পূজা করা হয়, যথা "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।" কালশক্তি বিরূপা বা রুষ্টা হইলে গুরু মানবকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন, কিন্তু "গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।" অর্থাৎ গুরু রুষ্ট হইলে আর কাহারো উদ্ধার করিবার শক্তি নাই।

বর্তমানকালে এই কালশক্তি মহাকালীর মূল স্থান কোন্ মহাপুরুষ অধিকার করিয়া আছেন, কাঁহার শ্রীচরণতরণী আশ্রয় করিলে সংসারসাগরে মগ্নপ্রায় শত শত নরনারী নিষ্কৃতি লাভ করিবে? নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদরূপ রাক্ষসদ্বয়ের করালকবলে পতিত অন্ধ, বিপন্ন মানবগণকে কোন্ মহাবীর রক্ষা করিতে সমর্থ? বর্তমান মহান ধর্মবিপ্লবের সময় অজ্ঞানান্ধকারতিতীর্ষু সত্যপিপাসুগণ উদগ্রীব হইয়া কাঁহার প্রত্যাশায় রহিয়াছেন? মাতৃকণ্ঠনিঃসৃত অমৃতময় বাক্যতুল্য কোন্ স্নেহময়ী গুরুমূর্তির সুললিত, সরল বাক্যামৃতবিন্দু ত্রিতাপতপ্তের নৈরাশ্যময় হৃদয়ে স্বর্গের জ্যোতি বিস্তার করিতে সমর্থ? বিজ্ঞানময়বিগ্রহ, ভক্তিরস-পরিপ্লুত অলৌকিক ভাবরাশির অদ্বিতীয় আধার, কোন লোকোত্তর পুরুষের নিরক্ষরতার সম্মুখে, অদ্য পৃথিবীর যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ভীত-ভীতের ন্যায়, শিষ্য-প্রশিষ্যের ন্যায় যুক্তকরে অবস্থিত? কোন্ ছদ্মবেশী মায়াধিনায়ক আপনাকে অন্তরালে রাখিয়া শ্রীমদ্বিবেকানন্দরূপ স্বকীয় বিজ্ঞান দীপ্তি দ্বারা অদ্য সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন?

বস্তুত, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সকলই অলৌকিক। তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি, 'সে ঘরের উলটো চাবি' অর্থাৎ জ্ঞানের ঘরে প্রবেশপূর্বক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পার্থিব উপায় অবলম্বন করিলে চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণও এরূপ উপদেশ দিয়াছেন যথা—"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী" ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্র উক্ত উপদেশের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ইহা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। কারণ, লোকে যাহাকে ভাল বলে, তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে মন্দ, লোকে যাহাকে সুখশান্তির কারণ বলিয়া জানে, তাঁহার দৃষ্টিতে তাহা দুঃখ ও

অশান্তির হেতু। তাঁহার শক্তি দুর্নির্বার্যা ও অতুলনীয়া। এসকল বিষয় উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইলে তাঁহার পরমপাবন জীবনের দুই-চারিটি ঘটনার আভাস দেওয়া আবশ্যক। পূর্বে বলিয়াছি যেখানে শক্তির বিকাশ, সেখানেই ঈশ্বরত্ব পরিদৃষ্ট হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, নিরক্ষর সপ্তমুদ্রামাত্র বেতনভোগী জনৈক পুরোহিতের এমন কি শক্তি থাকা সম্ভব, যদ্দ্বারা লোকে তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে পারে? মনুষ্যদৃষ্টিতে অসম্ভব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যদিও কিছুকাল পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণশক্তি লোকবুদ্ধির অগোচর ছিল, অধুনা সভ্যজগতে এমন কেহই নাই, যিনি উক্ত মহাশক্তির পূজা না করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? এতদুত্তরে আমরা বলি যে, নিরক্ষরতা ও নির্ধনতাই তাঁহার অতুলশক্তির পরিচায়ক। উপায় দ্বারাই উপেয় বস্তু লাভ করা যায়, সাধন দ্বারাই সাধ্যবস্তু আয়ত্তাধীন হয়। কিন্তু যে-ব্যক্তি বিনা উপায়ে বিনা সাধনে সাধ্যবস্তুকে আপন আয়ত্তে অনায়াসে আনিতে পারেন, তিনি যে বিপুলশক্তিসম্পন্ন, ইহা বুঝিতে কি আর প্রমাণ প্রমেয়ের আবশ্যক হয়? অস্ত্রশস্ত্র ও বিপুল বাহিনী সহায় যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়, কিন্তু যিনি অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া একাকী বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন অসংখ্য সৈন্য সহায় বাহিনী-পতিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হন, তিনি যে ঈশ্বরীয় শক্তির আধার ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। বর্তমানকালে পণ্ডিত হইতে হইলে লোকে গ্রন্থরাশির আশ্রয় লন। যিনি যত পরিমাণে গ্রন্থাভ্যাস করিতে শিখিয়াছেন, তিনি তত পরিমাণে পণ্ডিত বলিয়া গণনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রন্থপাঠ একবারে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কখনো কখনো গ্রন্থকে গ্রন্থিস্বরূপ বলিতেন। কারণ অনেকস্থলে গ্রন্থপাঠ পাণ্ডিত্যাভিমানের কারণ হয় ও তজ্জন্য নানাবিধ গ্রন্থিল বন্ধন মানবমনকে সংসারে আবদ্ধ রাখে। যুবাকালে জনৈক বুদ্ধিমান বেদান্তশাস্ত্রাধ্যায়ীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এ ব্যক্তির নিকট তিনি সর্বদাই জগতের মিথ্যাত্ব, অবস্তুত্ব এবং ব্রহ্মের সত্যত্ব ও বস্তুত্ব সম্বন্ধে শুনিতেন এবং উক্ত বেদান্তাধ্যায়ী যে সর্বতোভাবে সাংসারিক বাসনা শূন্য, ইহা তাহার তর্ক ও যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা একপ্রকার স্থিরই করিয়াছিলেন। কিন্তু যৎসামান্য তণ্ডুলের লোভে একদা তাহাকে হীন পৌরোহিত্য কর্মে ব্রতী হইতে দেখিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, গ্রন্থপাঠে জ্ঞানলাভ হয় না, তাহার অন্য উপায় নিশ্চয়ই আছে। এইরূপে তিনি গ্রন্থপাঠে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। সামাজিক পণ্ডিতগণ সভামধ্যে বেদান্ত শাস্ত্রের অপার্থিব সত্যসমূহের আলোচনা করিতেছে দেখিলে তিনি তাহাদিগকে সুদূর গগনগামী গৃধ্রাদি খেচরসমূহের সহিত তুলনা করিতেন। কারণ, তাহারা গগন প্রদেশের মহোচ্চস্থান অধিকার করিলেও সর্বদা পূতিগন্ধময় মৃত জীবদেহের অন্বেষণে পৃথিবীর অতি কদাকার স্থানসমূহে ন্যস্তদৃষ্টি হইয়া থাকে। তদ্রূপ পণ্ডিতগণের বদন হইতে তত্ত্ববাক্যের স্রোত প্রবাহিত হইলেও তাহাদের মন সর্বদা অর্থের উপর পতিত থাকে। একদা জনৈক মূর্খ শিষ্য তাঁহার সংসারতারিণী অভয়দায়িনী সেবা পরিত্যাগ করিয়া ফার্সি গ্রন্থপাঠে অভিনিবিষ্ট হইলে তিনি মধুরবাক্যে তাহাকে কহিয়াছিলেন : "বৎস্য, ঈদৃশ গ্রন্থপাঠে মন বিক্ষিপ্ত হয়। এমনকি ইহাতে ভগবদ্ভক্তির হানি হয়।" তাঁহার এই শাসনবাক্যে উক্ত শিষ্যের চৈতন্যলাভ হইয়াছিল।

বহু গ্রন্থ অভ্যাস করিলে মানব-মন অন্যের চিন্তার দ্বারা পরিপূর্ণ হয় ও স্বকীয় চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে। গ্রন্থপাঠ যদি কাহারও চিন্তার সহায় হয়, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই উপাদেয় কিন্তু যদি তাহা কাহারও চিন্তাশক্তির নাশক হয়, তাহা হইলে সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার পরম পবিত্র মনোমধ্যে সুগুপ্ত অতুল জ্ঞানরাশির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বল্পকাল মধ্যে এত জ্ঞানধনের অধিকারী হইলেন যে, স্বীয় অক্ষয় কোষ হইতে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে তাহা অহরহ অবাধে বিতরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধনী তাঁহার অক্ষয়জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানধন লাভ করিয়া আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতেন।

আমরা উপনিষদে পাঠ করিয়াছিলাম যে, দুই প্রকারের বিদ্যা আছে, পরা ও অপরা। তথায় বেদ বেদান্তাদি পাঠ অপরাবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু পরা বা শ্রেষ্ঠা বিদ্যা ঈশ্বরপ্রাপিকা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা তখন আমরা ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বুঝিলাম, পরাবিদ্যা কাহাকে বলে। এই পরাবিদ্যা বলেই তিনি মহাপণ্ডিত হইতে মহামূর্খেরও মোহ আবরণ অপসারিত করিতে পারিতেন। এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্বের বিশেষ পরিচায়ক।

ইদানীং ধন না থাকিলে জগতে কাহারও সম্মানলাভের সম্ভাবনা নাই। ধনে মূর্খকেও পণ্ডিত করায়। ধনে অসম্ভব সম্ভবপর হয়। সুতরাং অধুনা সর্বত্র অর্থশক্তিরই পূজা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থকে সর্বানর্থের মূল জানিয়া তাহার ধাতুময়ী মূর্তির প্রতি এতাদৃশ ঘৃণাপরায়ণ হইয়াছিলেন যে, কোন ধাতুময় দ্রব্য তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেন না, তাহা করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যাইত। তিনি এইরূপ ধনস্পর্শলেশশূন্য ছিলেন বলিয়াই মহাধনিগণ তাঁহার দাসত্ব করিয়া, তাঁহার জন্য বিপুল অর্থব্যয় করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। যিনি অর্থ চাহেন না, অর্থ যে আপনা আপনি তাঁহার নিকট আইসে, অলৌকিক শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন পর্যালোচন দ্বারা ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

ভবিষ্যতের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করা অত্যাবশ্যক, কারণ, অভাবময় মনুষ্যজীবনে কখন কি অভাব হইবে তাহা কাহারো জানা নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমুহূর্তের জন্যও কিছু সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। একদা তিনি শম্ভুচরণ মল্লিকের উদ্যানবাটিকায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত মল্লিক মহাশয় তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন। এইজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার উদ্যানে গমন করিয়া ক্ষণকাল সংলাপাদিকরত স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতেন। মল্লিক মহাশয় একদিবস তাঁহার অজ্ঞাতসারে তদীয় ব্যবহারার্থ কিঞ্চিৎ অহিফেন বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন; প্রত্যাগমনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ সুস্পষ্ট দিবালোকে গৃহদ্বার অন্বেষণ করিতে সমর্থ না হইয়া বিপথে গমন করিতেছেন দেখিয়া মল্লিক মহাশয় কহিলেন ঃ "বাবা, দ্বার তো ওদিকে নয়।" তাহাতে তিনি কহিলেন ঃ "আমার সমুদয় অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। তুমি কি আমার কাপড়ে কিছু

বাঁধিয়া দিয়াছ?" মল্লিক মহাশয় কহিলেনঃ "আপনার ব্যবহারার্থ কিঞ্চিৎ অহিফেন দিয়াছি।" পরে তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া লইতে তিনি প্রকৃত দ্বার দেখিতে পাইলেন। সঞ্চয় সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ এরূপ উদাসীন ছিলেন। এইজন্যই তাঁহার জন্য অন্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিত। আমরা গীতায় পাঠ করিয়াছিলাম—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।"

"যাঁহারা অন্য সর্ব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্তগণের জন্য আমি দ্রব্য আহরণ ও সঞ্চয় করিয়া থাকি।" তখন ইহা বোধগম্য হয় নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবন ইহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছে।

এজগতে বন্ধনই একমাত্র সহায় ও সুখের কারণ। প্রেমবন্ধন আছে বলিয়া সাংসারিক জীবন এত সুখকর হইয়াছে। গৃহ নির্মাণে, বস্ত্র বয়নে, পেটিকাদি করণে বন্ধন অপরিহার্য। গৃহদ্বারে বন্ধন না দিলে চোরের ভয়। বেশবিন্যাসে বন্ধন আবশ্যক। যাহার কোন বিষয়ে বন্ধন নাই, তাহাকে অচিরাৎ পথের ভিক্ষুক হইতে হইবে। এমনকি, ভিক্ষুকও আপনার চীরখণ্ডগুলিকে একত্র বন্ধন করিয়া রাখে, পাছে হারাইয়া ফেলে। অতএব বন্ধন সাংসারিক লোকের পরম সহায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বন্ধনের কথায় ভয় পাইতেন। বন্ধন মনুষ্যকে পৃথিবীতে বাঁধিয়া রাখে, ভগবৎপাদপদ্মে যাইতে দেয় না। বন্ধনে মানব স্বাধীনতা ধন হইতে বঞ্চিত হয়। বন্ধন হৃদয়কমলকে প্রস্ফুটিত হইতে দেয় না। সুতরাং যে-কেহ ভগবৎপাদপদ্মের মধু পান করিতে সমুৎসুক, যে-কেহ স্বাধীনতা লাভ করিয়া অকুতোভয়ে মহামায়ার রাজ্যে আনন্দে বিহার করিতে অভিলাষী, তিনি কখনো বন্ধনকে হৃদয়ে স্থান দিবেন না। এইরূপে তিনি বন্ধনকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন যে, কোনো দ্রব্যে তিনি বন্ধন দিতে পারিতেন না। বস্ত্র পরিধানে বন্ধন আবশ্যক, সুতরাং স্বয়ং পারিতেন না বলিয়া অন্যে তাঁহাকে বস্ত্র পরাইয়া দিত। পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় তাঁহার স্বভাব ছিল, সুতরাং জগজ্জননীর কালশক্তি কালী তদীয় সেবার্থ অনেক দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহারা সেই মহাপুরুষের সেবা করিয়া আপনাদের পরম ভাগ্যবান মনে করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎপ্রসূতি কালীকেই আপনার জন্মদাত্রী বলিয়া জানিতেন। শিশু যেরূপ কখনো মাতৃ অঙ্ক ত্যাগ করিতে চাহে না, তিনিও সেইরূপ কখনো মাতৃ অঙ্ক হইতে উত্থিত হইতে চাহিতেন না। অহরহ মাতৃ সমক্ষে থাকিয়া নির্ভয়ে আনন্দসাগরে ভাসমান হইতেন এবং জানিতেন, এ-সংসারে মাতৃপাদমূল ভিন্ন আর কুত্রাপি নির্মল আনন্দভোগের সম্ভাবনা নাই। এইজন্যই তিনি আনন্দপ্রিয় মানবগণকে নিজ জননীর নিকট লইয়া যাইতে চাহিতেন। বাস্তবিকই যতদিন স্ত্রীজাতির প্রতি তোমার মাতৃভাব থাকে, ততদিন তাঁহারা তোমায় সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিয়া থাকেন, কিন্তু যখনই তাঁহাদের প্রতি তুমি কামভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ কর, তখনই বিবাহেচ্ছা তোমার হৃদয়ে বলবতী হয়। বিবাহের পর নারীকে পত্নীরূপে লাভ করিলে লালন পালনের ভার আর নারীতে থাকে না, তাহা তোমার উপর আসিয়া পড়ে। পত্নী ভার্যা বা ভরণীয়া হন। এতদিন বালকের ন্যায় লালিত

পালিত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলে, এক্ষণে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চিন্তারূপ জ্বরে শরীর মনকে মলিন করিয়া দুঃখময় সংসারে দুঃখের ভার মস্তকে ধারণকরত অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছ। নির্মল ললাটে চিন্তার রেখা দেখা দিল, হৃদয় হইতে শান্তি চিরকালের জন্য তিরোহিত হইয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ এইজন্য বলিতেন যেঃ "দেখ, নবজাত গোবৎস্য কেমন সুন্দর, কত আনন্দময়, ইতস্তত কেমন লম্ফঝম্প দিয়া বেড়াইতেছে। যেন জগতে কেবল আনন্দভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যেদিন হইতে উহার গলায় রজ্জু সংলগ্ন হইবে, সেইদিন হইতেই উহার রূপ ও আনন্দ উভয়ই ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইবে। বিবাহবন্ধনের পূর্বে মানব সন্তানও ঐরূপ আনন্দে জীবনযাপন করে, কিন্তু সংসারের রজ্জু গলদেশে একবার সংলগ্ন হইলে, সে-সুখ কোথায় পলাইয়া যায়।"

স্বাধীনতাই সুখের মূল। স্বাধীনতাই মানবকে অমিততেজঃসম্পন্ন করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্বাধীনতাধন কখনো নষ্ট করেন নাই। কোনোরূপ বন্ধন তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ করিতে পারে নাই। তাঁহার হৃদয় অনন্ত আকাশের ন্যায় বিশাল ছিল। এই হেতুই তিনি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিতেন। তিনি কহিতেনঃ "ভগবানের কখনো ইতি করিও না। কেহ কখনো তাঁহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয় নাই, হইবেও না। তিনি চিৎসমুদ্রস্বরূপ, শিব শুক সনক নারদাদি সেই সমুদ্রের এক এক ফোঁটা জল পান করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সাকার, নিরাকার ও এতদুভয়ের অতীত, ইহা জানিয়াছি। আর যে তিনি কি তাহা জানি না। পৃথিবীতে যত ধর্মমত আছে, তৎসমস্তই তাঁহার শ্রীপাদমূলে যাইবার এক একটি পথ। তুমি যে-পথে আজন্ম স্থাপিত হইয়াছ, সেই পথ দিয়াই অগ্রসর হও, কালক্রমে চিরশান্তি-নিকেতন বিভুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর আমিত্ব ছিল না। তিনি "আমি, আমার" এই দুই কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। যেস্থলে সচরাচর লোকে 'আমার' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, তিনি সেইস্থলে নিজ হৃদয়ে হস্ত স্থাপনপূর্বক 'এখানকার' শব্দ প্রয়োগ করিতেন। যথা 'আমার ভাব এরূপ নয়' বলিতে হইলে তিনি "এখানকার ভাব এরূপ নয়" ইহা বলিতেন। তাঁহার নিজের আমিত্ব তাঁহার ভিতর ছিল না বলিয়া জগৎপ্রসূতি কালীর আমিত্বই তাঁহার ভিতর দিয়া সর্বতোভাবে প্রকাশ পাইত। অর্থাৎ বিশ্বজননী লীলাময়ী কালীই শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহ ধারণ করিয়া তাঁহার অসংখ্য পুত্রকন্যাগণকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে মানব, শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস আমি তোমায় দিলাম। আমার ন্যায় নগণ্য ক্ষুদ্র জীব তাঁহার অনন্ত শক্তির এক কণাও বিবৃত করিয়া বলিতে সমর্থ নয়। তুমি যদি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হও, তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বলোকপাবন নিখিল সন্তাপহর চরিত্র সাগরে অবগাহন কর। ক্রমে তত্ত্বস্ফূর্তি দ্বারা তোমার হৃদয় সমুদ্ভাসিত হইবে। প্রাণে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হইবে। মন আনন্দময় হইয়া যাইবে ও তুমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে।* □

* ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

বিবেকানন্দ স্মরণে*

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

বিচিত্র কর্মক্ষেত্র হইতে যখন মহৎ ব্যক্তিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তখন নানা দিক হইতে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের বিচিত্র মহিমা আমাদের মানসপটে আজ মুদ্রিত হইয়া যাইবে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিশাল ও বিরাট, সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও অতলস্পর্শ। কখনো সেখানে হাস্যকৌতুকের চঞ্চল লহরী খেলিয়া বেড়াইতেছে, কখনো তাহা নির্মল উষার বালার্ক-কিরণদীপ্ত সমুদ্রের মতো ক্রীড়ামত্ত বালকের স্বচ্ছ ও সরল হর্ষে পরিপূর্ণ, কখনো তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের শান্তি ও গভীরতা অতল সমুদ্র অপেক্ষাও নির্বিকল্প ও গভীর, আবার কখনো বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রের মতো তাঁহার আত্মা অসীম উদ্বেগপূর্ণ অসীম ব্যথায় প্রপীড়িত, অনাদি ক্রন্দনে বিমূঢ়—আর ইহাও ঠিক সমুদ্রের মতো তাঁহার বিরাট আত্মা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে জুড়িয়া দিয়া—অর্থ ও পণ্যের বিনিময় নহে, শক্তি ও ত্যাগের, বিচার ও ভক্তির, কর্ম ও জ্ঞানের বিশ্বের যুগধর্মোপযোগী এক অদ্ভুত বিনিময়ের সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন করিয়াছে; আর সর্বাপেক্ষা এইটাই ঠিক দিবসের বা রজনীর, জাগরণের বা স্বপ্নের প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ইচ্ছা ও উদ্বেগ ভারত-সমুদ্র-তরঙ্গের মতো একটির পর একটি আপনি উঠিয়া দেশের মলিনতা ও কলঙ্ক ধুইয়া দিতে চাহিয়াছে—পারে নাই, আবার উঠিয়া শুষ্ক বেলাভূমি বা মরু কান্তারে আছড়াইয়া পড়িয়াছে—এই ক্লান্তিহীন নিরুদ্যমহীন হইতে যাওয়া এরূপ কাতর হইয়া নিজের অন্তরের শক্তি ও লীলার মধ্যে ফিরিয়া আসা ইহার আদিও নাই অবসানও নাই—"সাগর-লহরী সমানা"। এইটাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের বর্তমান ভারতের আসল ভাবিবার ও সাধন করিবার দিক। আমি তাঁহার অতলস্পর্শ ব্যক্তিত্বের যেটা একবারে বাহিরের দিক—তাঁহার ধর্ম, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার অধ্যাত্মজীবন নহে—তাঁহার বাহিরের কর্মের যতটুকু অংশ দেশের কর্মজীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, শুধু এইটুকুর কথা কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

এই সংস্পর্শের কথা আলোচনা করিতে গেলেই আমরা তাঁহাকে যুগপ্রবর্তকরূপে পাই। "পরানুবাদ, পরানুকরণ, দাসসুলভ দুর্বলতার" যুগে যখনি তিনি শিকাগোর ধর্মমহাসভায় হিন্দুর বেদান্তবাদ ব্যাখ্যা করিয়া বর্তমান যুগধর্মোপযোগী পরিণামবাদের সহিত তাহার সৌসামঞ্জস্য দেখাইয়াছিলেন তখন সেটা শুধু ভারতীয় দর্শনের মহিমা-প্রচার হয় নাই—সেটা বিশ্বসভ্যতায় ভারতীয় সভ্যতার বাণীপ্রচার হইল। কারণ—বেদান্তবাদ ভারতের শুধু দর্শন নহে, বেদান্তবাদ যে ভারতের কর্ম। ভারতের সমাজগঠন, ভারতের সামাজিক রীতি-নীতি, ভারতের আচার-অনুষ্ঠান,

* ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের বাৎসরিক স্মৃতিসভায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পঠিত।

পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় যে এই বেদান্তবাদকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে ও বিকাশ লাভ করিয়াছে। ভারতের এই বেদান্তবাদকে না বুঝিলে ভারতীয় সভ্যতার অধিকারভেদ ও ব্যক্তির স্বাধীনতা, প্রতিযোগিতা ও সমবায়, ত্যাগ ও শক্তির, ভোগ ও বৈরাগ্যের, কর্ম ও মুক্তির যে অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তাহা কিছুতেই বুঝা যাইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দের নূতন ভারত গঠনের যন্ত্র, আশ্রয় ও আধার হইল—এই বেদান্তবাদ। হিন্দুর মায়াবাদ যেখানে অত্যধিক সংসারবিমুখীনতার প্রশ্রয় দিয়া দুর্বলতার নামান্তর মাত্র হইয়াছে তাহা তিনি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বৈরাগ্য যে-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যে শক্তের ভূষণ, অক্ষমের নহে। হিন্দুর বেদান্তবাদ যেখানে অধ্যাত্ম-জীবনের রসসঞ্চারে অভিভূত ও আবদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ সেই বেদান্তবাদকে কর্মজীবনে প্রয়োগ করিয়া সফল করিয়া তুলিতে আমন্ত্রণ দিলেন। সে আমন্ত্রণ, সে আহ্বান গীতার সেই অমর আহ্বানের মতো—"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং, ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"— দেশের প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, ও স্বীয় স্বরূপজ্ঞানের ও প্রত্যক্ষানুভূতির জ্বলন্ত বিশ্বাসে তাহা পাঞ্চজন্যের আহ্বানের মতো শুনাইয়াছিল।

যুগশক্তি বাস্তবিকই মহাপুরুষের এই আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছিল। শাসন নাই, শিক্ষা নাই, সমাজব্যবস্থা নাই, আমাদের সভ্যতা পরমুখাপেক্ষী হইয়া একবারে আত্মবিক্রয় করিয়া বসিতেছিল। বাহির হইতে বণিকের তুলাদণ্ড ও রাজার শাসনদণ্ড হইতে জড়বাদ আপনার গুরুভারে ও প্রভুর খেতাবে গর্বিত ও স্ফীত হইয়া দেশের হৃদয়-সিংহাসন জুড়িয়া বসিতেছিল। ভিতর হইতে অসংযম ও বিলাসিতা দেশের চিরন্তন সংযম ও বৈরাগ্যের ভিত্তিকে নষ্ট করিতে উদ্যত। ভারতীয় সমাজের একান্নবর্তী পরিবার, গ্রাম্য-সমাজ, নানা সামাজিক সম্বন্ধসমূহ ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। সমাজ যখন খণ্ডবিখণ্ডতা প্রাপ্তির দিকে দ্রুত অগ্রসর তখন সত্য সত্যই একটি বন্ধনীশক্তির নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা এই বন্ধনীশক্তি।

পূর্বে দুইজন তাঁহার অগ্রে সমাজবন্ধনের রজ্জু লইয়া আসিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন ও ভূদেব। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে আমরা দুইজনকে তেমন নিবিড়ভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। একজন রহিয়া গেলেন, শুধু ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক, আরেকজন শুধু সনাতনধর্মের প্রচারক।

স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি, যুগধর্মনির্দেষ্টারূপে, যুগপ্রবর্তকরূপে।

কেমন করিয়া তাঁহার বেদান্তবাদ সমাজকে স্বৈরাচার ও খণ্ডবিখণ্ডতা প্রাপ্তি হইতে রক্ষা করিল তাহা বলিতে হইবে না। তিনি বলিলেন, তুমি তোমাকে ভাল করিয়া জান, অনুভব কর, সমাজের সকলেই যে তুমি, তোমার মুখ দিয়া তাহারা আহার ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করিতেছে, তুমিই রাজারূপে ঐশ্বর্য বিভব ভোগ করিতেছ, আবার তুমিই দীনহীন ভিখারির বেশে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে দয়া ও প্রেম যাচিতেছ। সমাজ যে তোমারই শরীর। তোমার সুখ-দুঃখ অনুভব যে অন্যের, নিখিল প্রাণীর, জগতের সুখ-দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া। সমাজের মঙ্গল না হইলে যে তোমার মঙ্গল নাই। সভ্যতার মুক্তি না হইলে যে তোমার মুক্তি নাই। তিনি আরো বলিলেন, তুমিই নারায়ণ, আর এই সমাজ নারায়ণের বিরাট

শরীর। তুমি দরিদ্রনারায়ণ, দুঃখীনারায়ণ, আতুরনারায়ণের সেবা কর, সেই সেবাতেই তোমার ভিতর যে পূর্ণ অথচ ক্রমবিকাশমান, বিশ্বব্যাপক অথচ জিগীষু আত্মাটি আছে তাহার তৃপ্তি হইবে। সভ্যতার চঞ্চল জীবনে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে অপরিসীম শক্তি অথবা ভোগ প্রদান করিতে পারে তাহাতে চরম তৃপ্তি নাই। বৈরাগ্যেই পরম আনন্দ ও বল, সম্ভোগে অতৃপ্তি, অবসাদ ও ব্যর্থতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তাঁহার এই বজ্রগম্ভীর সতর্কবাণী।

বিবেকানন্দ প্রচারিত দর্শন আজ হিন্দু সভ্যতার স্বধর্ম রক্ষার সহায় হইয়াছে। তাঁহার সেবামন্ত্র আজ নূতন ভারতকে বিচিত্রভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন ত্যাগ ও কর্মের ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছে। নূতন সেবাধর্ম যে শুধু সমাজকে খণ্ডবিখণ্ডতা প্রাপ্তি হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহা নহে, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র, লোকহিত প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহা এক অভিনব ভাবুকতার সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন করিয়া চলিয়াছে। নূতন ভারতের কর্মের যজ্ঞশালায় তিনিই প্রধান ঋত্বিক। আমাদের এই যজ্ঞের প্রিয়তম ঋত্বিকের পূজা আমার ভারতের নবীন কর্মোপাসনার দ্বারা।

স্বামীজী সমাজের পুনর্গঠনের জন্য সমাজসংস্কার চাহিয়াছিলেন। সমাজকে তিনি কম বিদ্রূপ করেন নাই, কম তীব্র কষাঘাত করেন নাই। সকলের মূলে তাঁহার হিন্দুসভ্যতার অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বদেশবাসীর প্রতি অসীম প্রীতি। তাই তিনি যখন তিরস্কার করিয়াছিলেন তাহা সন্ন্যাসীর স্নেহাশীর্বাদরূপে লোকে গ্রহণ করিয়াছিল। বিভিন্ন বর্ণ যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে তাহার তিনি প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও যে বিবাহ-কর্মকে অবশ্যকর্তব্য মনে করিয়া সমাজে পরমুখাপেক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে তাহার বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত শিক্ষার তিনি সংস্কার চাহিয়াছিলেন, লোকশিক্ষার বিস্তারকল্পে তিনি ম্যাজিকলণ্ঠন সাহায্যে নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবহারিক বিদ্যার প্রচার তিনি চাহিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম ও দর্শন সর্বজনীন; হিন্দুধর্ম, হিন্দুর আচার ও অধিকারভেদ হইতে তিনি যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, দ্বন্দ্ব ও ভেদজ্ঞাপক, কাহারো আত্মার পূর্ণ বিকাশ ও বিস্তৃতির বিরোধী তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তরুণ সন্ন্যাসীর আশা দুর্নিবার, বাসনা অসীম ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐশ্বর্য ও ভোগের আড়ম্বরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া গৈরিকবসনধারী যষ্টিমাত্র সম্বল শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য-সন্ন্যাসী সিদ্ধগুরুর গুরুদায়িত্ব বরণ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য জগতের নিষ্ঠা, প্রেম, সহানুভূতি ও বৈরাগ্যের মূর্তিমান বিগ্রহ হইয়া তিনি পাশ্চাত্য জগৎকে এক অভিনব মন্ত্রে দীক্ষা দিবার ভার লইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহার দায়িত্ব আরো গুরুতর, কর্তব্য আরো কঠিন হইয়াছিল। তিনি লোকসমূহের যুগপরম্পরাসঞ্চিত হলাহল পান করিয়া, বিশ্বসংসারের আর্তি-দুঃখ-ভাবনাদায়ের জটাভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া, ললাটে গুরুর আশীর্বাদের চিরনবীন শশীতিলক ধারণ করিয়া আপনাকে সেই জীবনমরণজয়ী বৈরাগীর মতো উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নসূর্যের প্রখর দীপ্তিতে যেখানে কৃষক গলদঘর্ম হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে নিযুক্ত, তাহার উদ্বেগ ও বেদনা, ভীতি ও নৈরাশ্য তিনি বরণ করিয়াছিলেন, যেখানে মাঝিমাল্লা উজান গঙ্গায় নৌকার দাঁড় টানিতে টানিতে গান ধরিয়াছে—

'মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারি না'—তাহার বিশ্বাস ও বল আপনার করিয়া তিনি তাহাদের বৈঠা লইয়াছিলেন। কলিকাতার রাস্তায় কুলি যেখানে গুরুভার মোট বহিতে না পারিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া আপনার দুরদৃষ্ট স্মরণ করিয়াছে, তাহার অদৃষ্টকে তিনি খণ্ডন করিতে চাহিয়াছিলেন। অসংখ্য জনপূর্ণ কোলাহলমুখরিত রাজনগরীর উন্মত্তপ্রায় জনস্রোতের দ্রুতপদসঞ্চার তাঁহার শিরায় শিরায় কল-কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী সঞ্চার করিত। জনসমূহ মনের শক্তি ও উদ্বেগ পূতগঙ্গাবারির মতো বিন্দু বিন্দু এমনি পান করিয়া, সকল লোকের উদ্বেগ আপনার বিরাট বক্ষে এমনি ধারণ করিয়া, তিনি আপনার হৃদয় শান্ত ও শীতল করিতেন। তাহার পর সেই আনন্দ ও শান্তিধারায় জগৎকে প্লাবিত করিতে চাহিতেন। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম, কুপ্রথাদুষ্ট সমাজ, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনসমাজ, পরমুখাপেক্ষী দেশবাসী, বিরোধী যুগশক্তির মধ্যে বাংলার পিঞ্জরাবদ্ধ রাজব্যাঘ্রের বেদনা ও নৈরাশ্য তাঁহার ভাগ্যে বিধাতাপুরুষ লিখিয়াছিলেন। বাস্তব ও তাঁহার আদর্শের বিরোধ যে তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, তাই যখন তাঁহার শক্তি ও সাধনার চরম অবস্থা, যখন তাঁহার অবসন্ন দেহ তাঁহার আত্মার অসীম উদ্বেগের উত্তাপ সহ্য করিতে একবারে অপারগ না হইয়া উঠিতেছিল, তখন বিধাতাপুরুষ তাঁহাকে সেই দেহ হইতে আপনার বিরাট শান্তির ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। তবুও তিনি আশা ছাড়েন নাই, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, আমি যদি না পারি, আমার কাজ করিবার জন্য অন্য কেহ নিশ্চিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন—

"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা,
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

আমার সমানধর্মা অন্য কোন ব্যক্তি আছেন বা উৎপন্ন হইবেন—কারণ কালের অন্ত নাই এবং পৃথিবীও বিপুলা।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের tragedy-টুকু, তাঁহার চিত্তের রুদ্ধ আবেগ, তাঁহার হৃদয়ের অনাহত সঙ্গীত, তাঁহার মর্মের অকথিত বাণীই আমাকে সর্বাপেক্ষা নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে ও আঘাত দেয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আমাদের সভ্যতা আজ বিষম অগ্নিপরীক্ষা ও বিপদের মধ্যে পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎ বিবেকানন্দের বৈরাগ্যবাণী আজও শুনে নাই। আমাদের সভ্যতারও সংস্কার হয় নাই। "সেই পরানুবাদ, পরানুকরণ, দাসসুলভ দুর্বলতা", যাহার বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত জীবন ধরিয়া অসীম অধ্যবসায়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আজও যায় নাই। আমরা মনশ্চক্ষে দেখিতেছি একটা নূতন ভারত—যেখানে লোকে একমন, সমান্তঃকরণবিশিষ্ট হইয়া কাজ করিতেছে, সকলেই আশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, মেধাবী, জ্ঞানে, কর্মে, ধর্মানুশীলনে ও বিদ্যাচর্চায়, শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক সরল, সহজ, সতেজ স্বাধীন জীবন গড়িয়া উঠিতেছে—সে-জীবনে দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি কেমন এক সুরে বাঁধা, ইন্দ্রিয়ভোগ কেমন বৈরাগ্যের সংস্পর্শে রূপান্তরিত। সেখানে সমাজের প্রত্যেক বিভাগ পরস্পরের কল্যাণে নিয়োজিত, পুরোহিত শিক্ষিত ও যুগধর্মনির্দেষ্টা, যজমান শিক্ষিত ও অধ্যবসায়শীল, বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক বিদ্যায় নিপুণ, বণিক সাহসিক ও উৎসাহী, কৃষকশিল্পী শ্রমজীবী শিক্ষিত ও শ্রমকুশল, শ্রমজীবিগণ

আপনারাই আপনাদের কারখানার পরিচালনের ভার লইয়াছে, সেখানে হাট হইতে, বাজার হইতে, মুদির দোকান হইতে, ভুনাওয়ালার উনানের পাশ হইতে, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হইতে নূতন ব্যক্তিত্বের অভিনব পরিচয় পাওয়া যায়—তাহাদের আশা আছে, ভরসা আছে, শিক্ষা আছে, সুবিধা আছে। নারী সেখানে বিদুষী ও শক্তিমতী হইয়া সমগ্র সমাজকে আপনার স্বজনগৃহরূপে পালন করিতেছেন—এই জীবন যখন ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে তখনই বিবেকানন্দের হৃদয়ের অনাগত গীত ও রুদ্ধ আবেগ মুক্ত হইয়া অসংখ্য নরনারীর হৃদয় আলোড়িত করিয়া তাহাদের জ্ঞানে ও কর্মে উদ্দাম ভাবে জাগিয়া উঠিবে।

সেই জাগরণের দিনে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত, সহজ, অবাধ ও স্বাধীন জীবন দেখিব। কারণ তিনি যে-জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন তাহার সফলতা অপেক্ষা ব্যর্থতাই আমাদের নিকট অধিক শিক্ষাপ্রদ, তাঁহার সেই অধীরতা—"আমি ভাঙিব পাষাণ কারা, ঢালিব করুণাধারা, জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল পারা"—ইহা তাঁহার তৃপ্তি ও আনন্দ অপেক্ষা আমাদের সাধনার শ্রেষ্ঠতর ধন।

যেদিন সে জাগরণ আসিবে, সেদিন নূতন যুগের নূতন যুগশক্তির উপযোগী কর্তব্য আমরা সম্পাদন করিব—সমাজে, শিক্ষায়, বিদ্যানুশীলনে, রাষ্ট্রশিল্পে, সাহিত্যে আমরা জাতীয় প্রাণধারাটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া আবার নূতন ভাবে সকলই গঠন করিয়া তুলিব। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট আরো নূতন নূতন জটিল ও দুরূহ সমস্যা উঠিয়াছে। বৈষয়িক সমস্যা, শ্রমজীবিসমস্যা, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন সমস্যা, অন্তর্জাতীয় সমস্যা, শান্তি সমস্যা নূতনভাবে হিন্দুসভ্যতাকে বুঝিতে হইবে ও সেইসকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। যুদ্ধের মধ্যেই হউক, যুদ্ধাবসানে হউক—হিন্দুসভ্যতা যদি এখন বাঁচিয়া থাকে তবে ইহা সে করিবেই—কারণ প্রতিক্রিয়াই যে জীবনের চিহ্ন।

সেদিন হিন্দুসভ্যতার অন্তঃস্তল হইতে পরিব্রাজক আবার বাহির হইবেন একটা আত্মঘাতী সভ্যতার হস্ত হইতে শাণিত তরবার কাড়িয়া লইবার জন্য। তিনি হিংসাপ্রপীড়িত পাশ্চাত্য জগৎকে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিবেন, 'মা হিংস'। কাহাকে হিংসা করিতেছ, মারিতেছ, কাটিতেছ—তোমাকেই তো। আপনাকে কেহ কখনো হিংসা করে না। বিজ্ঞান সভ্যতার শত্রু হইয়াছে। বিজ্ঞান-কালসর্পের বিষদন্ত তিনি উৎপাটন করিয়া তাহাকে দিয়া শিব ও সুন্দরের লজ্জা নিবারণ করাইবেন, সত্যের অলঙ্কাররূপে সাজাইবেন। বিজ্ঞান বলিতেছে, হিংসার ভিতর দিয়া জীবের উন্নতি। পরিব্রাজক বলিবেন, জীবের পক্ষে যাহা সত্য, মানুষের পক্ষে তাহা মিথ্যা। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পরের শত্রুতাচরণ করিতেছে; পরিব্রাজক বলিবেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে সমাজদেহের অকল্যাণ। জাতিগণ ভূমি ও অর্থলোভে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। পরিব্রাজক বলিবেন, জাতির নিকট সাহিত্য, আর্ট, অধ্যাত্ম-সাধনাই আসল সম্পদ; তাহাই সর্বকালের ও সর্বজাতির। তাহাদের পুষ্টিবিধানে একের স্বার্থসাধন নহে, সকলের কল্যাণবিধান। বিভিন্ন জাতিসমুদয় নারায়ণের বিরাট আত্মা। প্রত্যেক জাতির বিশিষ্ট সাধনার ঐ বিরাট ক্রমবিকাশমান আত্মার এক-একটি স্বতন্ত্র ভাব ও ক্রিয়া অভিব্যক্ত, এবং তাহার নিরোধে সেই বিরাট আত্মার হিংসা

ও অবমাননা। সেদিন পরিব্রাজক পাশ্চাত্যের সর্বজাতিসভায় অহিংসা, মৈত্রী ও সখ্যের মন্ত্র প্রচার করিয়া বলিবেন, জাতিতে জাতিতে সখ্যবন্ধনে ও পরস্পরের কল্যাণসাধনে সেই অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাসের প্রীতিসাধন।

রোমীয় সভ্যতার বিজয়ের মোহ, যাহা অতীতের কত শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে বিপথে প্রেরণ করিয়াছে, বর্তমান সভ্যতার হিংস্র ও পরশ্রীকাতর জাতীয়তা, যাহা ভগবানের শান্তিরাজ্যে অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের আয়োজন করিয়াছে, তাহার এতকাল পরে একান্ত বিনাশসাধন হইবে। হিন্দুর এই জগদ্বিজয়ের নেতা হইবে সীজার, নেপোলিয়ন নহে, তাহার উপকরণ হইবে সেনাবল নহে, তাহার নেতা ও উপকরণ হইবে পরিব্রাজক ও বৈরাগী এবং তাঁহাদের অলক্ষ্যে বুদ্ধ, অশোক, ভিক্ষু ও শ্রমণগণের অশরীরী আত্মা চঞ্চল হইয়া আপনাদের শান্তিনিবাস ত্যাগ করিয়া, বিশ্বজগতের অসংখ্য লৌহবর্ম্ম ও বাণিজ্য পথে পরিব্রাজকের অগ্রে অগ্রে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের বিপুল বিশ্বযজ্ঞের স্বস্তিবাচন করিবেন।

সেদিন বেলুড় মঠের নিভৃত কোঠায় তীর্থযাত্রীর বিপুল সমারোহ, দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতটে কুললক্ষ্মীগণ স্তবগান করিতে করিতে নির্নিমেষনেত্রে প্রাতঃসূর্যকে বরণ করিবে, হরিনামগানমত্ত বৈরাগী সেদিন গৃহে গৃহে অধিকতর সময় যাপন করিবে, আগতশ্রী পল্লীগ্রামের কৃষি-শিল্পবিদ্যালয়ে, শ্রমজীবিগণের স্বচালিত কর্মশালায়, আমাদের নৈশবিদ্যালয়সমূহে সেদিন অফুরন্ত উৎসব। সেদিন মায়াবতী ও নৈনিতালের গিরিনিতম্ব নূতন সৌন্দর্যে বিভূষিত হইয়া অভ্যস্ত পথিকের দৃষ্টি হরণ করিবে, হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গে নক্ষত্রখচিত রাত্রি মনকে আরো উদাস ও ব্যাকুল করিবে, কাশীতলবাহিনী গঙ্গা আরো দ্রুতগতিতে সমুদ্রের দিকে ধাবমান হইবে, মাদ্রাজ বন্দরে সমুদ্রতরঙ্গ নাচিতে নাচিতে তাহাদের হর্ষ জ্ঞাপন করিবে—আর অনন্ত শস্যশ্যামলা, সহস্রস্রোত-স্বতীমাল্যধারিণী বাংলাদেশের সে রূপের কথা কী বলিব। আপনারা কি সে রূপ দেখিতেছেন? সে জাগরণ কি আসিয়াছে? বিবেকানন্দ কি আসিয়াছেন? আপনারা কি অনুভব করিতেছেন—আপনারা বলুন।

সেই জীবনই ধন্য—যাহা বর্তমানে আবদ্ধ নহে, যাহা অতীত হয় না এবং যাহা বর্তমান ও অতীতের সমস্ত সঞ্চিত-শক্তি পুঞ্জীভূত করিয়া নূতন ভাব ও রূপ গ্রহণ করিতে করিতে চির অগ্রসর।* □

* ২০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা

পরমহংসদেবের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

রামবাবু (রামচন্দ্র দত্ত) স্বামীজীকে সঙ্গে করে ঠাকুরের কাছে লয়ে গেছলেন। ঠাকুরের কাছে যাবামাত্র—ঠাকুর দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং ভাব হলো। রামবাবু বললেন ঃ "তোমায় দেখে ভাব হয়েছে।" এরপর ঠাকুর স্বামীজীর বাড়ি দৌড়ে দৌড়ে যেতেন। বলতেন যে, ওকে আমার কাজের জন্য পৃথিবীতে টেনে এনেছি; ও-ই একমাত্র ঠিক ঠিক জ্ঞানের অধিকারী। একদিন বুকে হাত দিবামাত্র স্বামীজী বেহুঁস হলেন। স্বামীজী চিৎকার করে বললেন ঃ "কর কি, কর কি, আমার বাপ-মা আছে।" ঠাকুর বললেন ঃ "থাক থাক, ও-ই পাওয়ার ঠিক ঠিক অধিকারী। এর নিজের সংস্কার নয়; বাপ-মার সংস্কার।"

একসভা লোক ঘরে বসে থাকতো, বড় বড় লোক—কেশব সেন প্রভৃতি; তাদের সামনে বলতেন ঃ "তোকে পেলে আমি কাউকে চাইনা।"

ঠাকুর বলতেন ঃ "ও সর্বাঙ্গসুন্দর, কোনো খুঁত নাই। যেমন দেখতে, তেমনি গাহিতে, বাজাইতে, বলতে-কইতে, বুঝতে, বুঝাতে। মহা পবিত্র, ছোটকাল থেকে কখনো মিছা কথা বলে নাই।"

ঠাকুর কারুর জন্য মা কালীর কাছে—ভক্তি ছাড়া আর কিছু চাইতেন না। স্বামীজী বললেন[১] ঃ "আমি জানি তুমি টাকাকড়ির জন্য মা কালীর কাছে কিছু বলবে না। কিন্তু ভীষ্মের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বাণ ধরতে হয়েছিল তেমনি আমার জন্য মা কালীর কাছে বলতে হবে। তোমাকে বলতুম না, কিন্তু কি করি, ভাইবোনের কষ্ট দেখতে পারি না।" ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন ঃ "তুই কালীর ঘরে যা—যা ইচ্ছে তাই চাগে যা।" স্বামীজী কালীঘরে গেলেন, কিন্তু কেমন মন হয়ে গেল—স্বামীজী কাঁদতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন ঃ "বিবেক বৈরাগ্য দাও।" কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন। ঠাকুর বললেন ঃ "কি চেয়ে এলি?" স্বামীজী ঃ "বিবেক বৈরাগ্য চাইলাম।" ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন ঃ "আমি জানি তোর দ্বারা টাকাকড়ি চাওয়া হবে না।"

তারপর সকলের সামনে আনন্দ করে বলতেন ঃ "দেখ, নরেনের ভাইবোন খেতে পায় না—তাও কালীর কাছে বিবেক বৈরাগ্য চেয়েছে।" ওকালতি পড়ছিলেন—ঠাকুর একদিন বললেন ঃ "দেখ, এতে তোর টাকাকড়ি, গাড়িঘোড়া হবে কিন্তু ভগবান তো পাবি না।" এই কথায় স্বামীজী ওকালতি ছেড়ে দিলেন।

স্বামীজীর প্রাণটা দিনরাত ভগবানের জন্যে কাঁদত। কেউ বুঝতে পারত না—ঠাকুর বুঝতে পারতেন। একদিন স্বামীজী খুব জোরে চিৎকার করে কাঁদছিলেন। ঠাকুর বুঝতে পারলেন—স্বামীজী কি জন্যে কাঁদছেন। স্বামীজীকে ডাকিয়ে বললেন ঃ "তুই এইজন্য কাঁদছিস।" স্বামীজী ঃ "হ্যাঁ।" তখন ঠাকুর বললেন ঃ "তোকেই দিব। তুই আগে আমার জন্য খাট। তোর জন্যে আমি এতদিন দুঃখ

করলেম—তুই আমার জন্য দুঃখ কর। আমি যা খেটেছি তার তুই এক আনা খাট—তোকে গদি করে দিব।"

স্বামীজী একবার বুদ্ধগয়ায় পালিয়ে গেলেন। গুরুভাইরা ঠাকুরের কাছে ব্যস্ত হয়ে বলায় ঠাকুর বললেন ঃ "কোথাও কিছু নেই ; সব এইখানে।" স্বামীজী দু-একদিন পরে ফিরে এলেন।

ঠাকুরের অভাবের পর সকলে স্বামীজীকে বলতেন ঃ "ঠাকুর আপনাকে এতবড় বলেছেন, আপনি কি বুঝলেন।" স্বামীজী বললেন ঃ "তিনি বড় বলেছেন আমি সেকথা খুব মানি, কিন্তু আমি এখনো তো বুঝিনি। আমি আগে বুঝি, তারপর তোমাদের নিয়ে বুঝিয়ে দিব।"

গুরুভাইরা সব বাড়ি ফিরে গিছলেন, স্বামীজী ধরে ধরে তাদের ফিরিয়ে এনে বললেন ঃ "তিনি তোদের ভালবাসতেন কি সংসার করবার জন্য!"

ব্রাহ্মসমাজে নাটক হয়েছিল, স্বামীজী শিব সেজেছিলেন। ঠাকুর ঐখানে ছিলেন। স্বামীজীকে ঐ বেশে নেমে আসতে বললেন। স্বামীজী ইতস্তত করছেন দেখে কেশববাবু বললেন ঃ "উনি যখন বলছেন, নেমে এস না।" ঠাকুর বললেন ঃ "দেখ কেশব, তোমার একটা বক্তৃতা দিবার শক্তি আছে। এর আঠারোটি শক্তি আছে।" কেশববাবু খুব আনন্দ করে বললেন ঃ "এতো ভাল কথা, আমিও তাই চাই ; নরেন আমার চেয়ে ছোট কেন হবে।" স্বামীজীকে খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে ঠাকুর কোন মানা করেন নাই। তাঁকে ভাল ভাল জিনিস খাওয়াতেন ; আর বলতেন ঃ "ওকে খাটতে হবে।" ঠাকুর স্বামীজীকে তামাক সাজতে, শৌচের জলাদি দিতে দিতেন না ; বলতেন ঃ "ওসব কাজ করবার অন্য লোক আছে।" তিনি জানতেন ওঁর দ্বারা বড় বড় কাজ হবে।

স্বামীজী রাতভোর ধ্যান জপ করতেন। গান, বাজনায় গুরুভাইদের স্ফূর্তি দিতেন। শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সকলে স্বামীজীর কাছে গানবাজনা শিখেছিলেন।

অমরনাথ যাত্রাকালে—চড়াই উঠার সময় আমি স্বামীজীকে বললাম ঃ "আর যাব না।" স্বামীজী মন বুঝবার জন্য বললেন যে, "একে টাকা দিয়ে দে।" আমি বললাম ঃ "বেশ, দিয়ে দাও।" তখন স্বামীজী বললেন ঃ "আমি তোর কি অনিষ্ট করেছি, তুই যখন যা বলছিস তাইতো করছি।"

ঠাকুরের দেহ যাবার পর সকলে বলতে লাগল—ঠাকুর কি পাগলাপনা করে গেলেন! স্বামীজীর কর্মটা শিকাগোয় প্রকাশ পেলে, তখন লোকে বললে—ঠাকুরের কথাই ঠিক।

যখন স্বামীজী ভারতে ফিরে এলেন, তখন মিস সেভিয়র, গুডউইন সাহেব, আমি ও আরো কয়েকজন দেখা করতে গেলাম ; মনে মনে ভাবছি, স্বামীজীর গোটাকতক সাহেব শিষ্য হয়ে অহঙ্কার হয়েছে। স্বামীজী আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে, হাত ধরে বললেন ঃ "তুই আমার সেই লাটুভাই, আমি সেই নরেন।" তখন বুঝতে পারলাম স্বামীজীর মানুষ চেনবার শক্তি হয়েছে।

স্বামীজী বললেন ঃ "আয় আমরা বসে খাই, তুই একপাশে বসে যা ; বাঙালীদের সঙ্গে কথা কচ্ছি, দেখ এরা কেমন হুজুগে।" খাওয়াদাওয়ার পর বললেন ঃ "দেখলি ঐ দেশের যত বাজে খবর নিলে, এত কাজ হলো, কার

দোহাই দিয়ে হলো—তার খবর নিল না। ভাই, আশ্চর্য হচ্ছি, আমার দ্বারা এতবড় কার্য হবে আমি জানতাম না।"

বিলেত হতে আসার দুই-চারদিন পরেই বিলেতের পোশাক ছেড়ে সেই দুটাকা দামের চাদর, আড়াই টাকা দামের জুতা ব্যবহার করতে লাগলেন। এতো যে মান সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

স্বামীজীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা

কেউ দুঃখ পেয়ে স্বামীজীর কাছে আসলে আর কিছু না পারলে, দুটা গান শুনিয়ে স্ফূর্তি দিতেন।

গুরুভাইদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ঠাকুরের নিচেই। যা কিছু গুরুভাইদের ধর্মকর্ম সব ওঁর দ্বারাই হয়েছে।

সকলেই বাড়ি ফিরে গিছলো, স্বামীজী ধরে ধরে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

স্বামীজী আপনার ভাইদের চেয়ে গুরুভাইদের ভালবাসতেন ও বিশ্বাস করতেন।

অভেদানন্দকে যখন বললেন : "তুই আমেরিকায় চল।" অভেদানন্দ কাঁদতে লাগল আর বললে : "একা কি করে যাব ?" স্বামীজী বললেন : "আমি একা কি করে গিছলাম—যাঁর মুখ দেখে আমি গিছলাম তুইও তাঁর মুখ দেখে যা।"

আলমোড়া পাহাড়ে স্বামীজীকে এক মুসলমান ফকির অসময়ে ফল খাইয়েছিল। হঠাৎ তার সঙ্গে একদিন দেখা। স্বামীজী দৌড়ে গিয়ে তার হাতে দুটাকা দিলেন। আমি বললাম : "ঐ লোককে কেন টাকা দিচ্ছ ?" স্বামীজী বললেন : "ও আমায় অসময়ে ফল খাইয়েছিল ; দুটাকা কি বলছিস ওরে লেটো, অসময়ে উপকারের মূল্য নেই।"[২]

কাঁকুরগাছিতে স্বামীজী রামবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিছলেন। রামবাবু তখন পীড়িত। স্বামীজী অনেকের সাক্ষাতে জুতা এগিয়ে দিলেন। রামবাবু কেঁদে বললেন : "বিলে, কর কি, কর কি ?" স্বামীজী উত্তরে বললেন : "রামদাদা ! আমি তোমার সেই বিলে। তুমি যা উপকার করেছ, তা কি আমি ভুলে গেছি ?" উভয়েই কাঁদতে লাগলেন।* □

পাদটীকা

১ যখন তাঁহাদের সাংসারিক কষ্ট হইয়াছিল
২ স্বামীজী পরিব্রাজক অবস্থায় আলমোড়া ভ্রমণকালে আহার

* ২৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

ভগিনী নিবেদিতা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসে 'মডার্ন রিভিউ' মাসিকপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাহার কয়েক মাস আগে হইতে উহার জন্য প্রবন্ধ, চিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি। তখন আসরে নটেশনের 'ইন্ডিয়ান রিভিউ' সচ্চিদানন্দ সিংহের 'হিন্দুস্থান রিভিউ' এবং মালাবারীর 'ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট'—এই তিনখানি প্রধান ইংরেজী মাসিকপত্র ছিল। সেইজন্য এইরূপ একটা কথা উঠে যে, আমার কাগজ অল্পদিনের মধ্যেই লেখার অভাবে উঠিয়া যাইবে—কে উহাতে লিখিবে? যথেষ্ট ও ভাল লেখা পাইব কিনা সে-বিষয়ে আমারও সন্দেহ যে ছিল না, এমন নয়। কিন্তু আমি যখন নিঃসম্বল অবস্থায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়া ইংরেজী মাসিকপত্র চালাইবার সঙ্কল্প করি, তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম আর কেহ না লিখিলেও আমার নিজের সংগৃহীত নানা তথ্য দিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া কাগজ চালাইয়া দেখিব চলে কিনা। আমার প্রবন্ধে সাহিত্যিক উৎকর্ষ থাকিবে না, তাহা জানিতাম; কিন্তু জ্ঞাতব্য অনেক কথা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিব এবং যাহা প্রমাণ করিতে চাই তাহার সমর্থক যুক্তি দিতে পারিব, এই ভরসা ছিল। কিন্তু শুধু আমার এইরূপ লেখায় তো পত্রিকাটি উৎকৃষ্ট হইবে না। এইজন্য লেখক ও লেখা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করি।

তখন ভগিনী নিবেদিতার সহিত পরিচয় ছিল না। আমার ইংরেজী মাসিকটিতে লিখিবার জন্য যাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। আমি তাঁহার ছাত্র বলিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই। তাঁহাকে একথাও জানাইয়াছিলাম যে, অনেকে বলিতেছেন আমি ভাল লেখা যথেষ্ট পাইব না ও তজ্জন্য কি করিব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বেশি লিখিতে না পারিলেও কখনো কখনো লিখিবেন বলেন এবং ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিতে অনুরোধ করেন। নিবেদিতা দৃঢ়তার সহিত বলেন ঃ "লেখার অভাব যাহাতে না হয় সে চেষ্টা হইবে।" তাহার পর হইতে নিজের নাম দিয়া এবং নাম না দিয়া তিনি যতদিন বাঁচিয়াছিলেন 'মডার্ন রিভিউ'তে বিস্তর প্রবন্ধ, নিবন্ধিকা, টিপ্পনী ও চিত্রপরিচয় লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার রাজনৈতিক মত জানিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। কিন্তু সে-বিষয়ে বিশেষ কিছু লিখিব না। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, তিনি ভারতবর্ষের পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রয়াসী ছিলেন; স্বাধীনতার পতাকা নামাইতে বা ঢাকা দিতে তাঁহার প্রাণে লাগিত। তবে আপাতত ঔপনিবেশিক স্বরাজ বা আভ্যন্তরীণ জাতীয় আত্মকর্তৃত্বে তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহাকে উচ্চতম বা চরম লক্ষ্য বলিতে তিনি রাজি ছিলেন না। তাঁহার রাজনৈতিক

মত সম্বন্ধে আরেকটি কথা এই বলিব যে, তিনি সকল অবস্থাতেই অহিংসার পক্ষপাতী ছিলেন না; প্রয়োজন-বিশেষে স্থান-বিশেষে বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধ তিনি আবশ্যক মনে করিতেন। তিনি যোদ্ধৃপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। অনেক সময় তাঁহার কথাবার্তায় ও লেখায় তাহা প্রকাশ পাইত। ধর্ম বিষয়েও তিনি সত্ত্বগুণের সহিত রাজসিকতার মিশ্রণ ভালবাসিতেন। তাঁহার 'Aggressive Hinduism' নামক পুস্তিকা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু তিনি যেমন তেজস্বিনী ছিলেন, তেমনি দয়াবতীও ছিলেন।

প্রবন্ধের মধ্য দিয়া পরিচয়, চিঠিপত্রের পরিচয় হইবার অনেকদিন পরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। এলাহাবাদ ছাড়িয়া কলিকাতা আসিবার পর আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তখন আচার্য বসু ও তাঁহার সহধর্মিণীর সহিত তিনি দমদমার 'ফেয়ারী হল' নামক ভবনে বাস করিতেছিলেন। আমি প্রাতঃকালে দশটার সময় আহার করিয়া দমদমা যাই। কি কারণে এখন ঠিক মনে পড়িতেছে না, আমি একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া দমদমা গিয়াছিলাম, রেলে যাই নাই। আমি 'ফেয়ারী হল'-এ পৌঁছিয়া খবর দিবামাত্র নিবেদিতা বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহারা তখন আহার করিতেছিলেন, আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তিনি বাহির হইয়া আসিলে আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তিনি প্রতিনমস্কার করিলেন। তাহার পর প্রথমেই ভাড়াটিয়া গাড়ির গাড়োয়ানকে ঘোড়াদুটিকে খাইতে ও বিশ্রাম করিতে দিতে বলিলেন এবং গাড়োয়ানকেও বিশ্রাম করিতে বলিলেন। ঠিক মনে পড়িতেছে না—বোধহয় গাড়োয়ানকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার খাওয়া হইয়াছে কি না।

আমি ভিতরে তাঁহাদের ভোজন-কক্ষে যাইবার পর আমাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার খাওয়া হইয়াছে কি না। হইয়াছে জানিয়া চা খাইতে বলিলেন এবং তাঁহারা যে উৎকৃষ্ট খেজুরগুড় খাইতেছিলেন তাহাও খাইতে বলিলেন। তাহার পর দু-তলার বারান্দায় বসিয়া নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইয়াছিল। সেখানে যে আরামচেয়ারটি ছিল তাহাতেই আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকেই তাহাতে বসিতে অনুরোধ করায় বলিলেন : "না, উহা নারীদের বসিবার নয়, পুরুষদের।"

ভাড়াটিয়া গাড়ির ঘোড়া দুটির প্রতি তাঁহার দয়ার কথায় আরেকটি দৃশ্য মনে পড়িল। একদিন সুকিয়া স্ট্রীট দিয়া কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে যাইতে যাইতে দেখিলাম, বিপরীত দিক হইতে নিবেদিতা ও অন্য একজন পাশ্চাত্য মহিলা আসিতেছেন। মদন মিত্রের গলির মোড়ের নিকট একটি কুকুরছানা অর্ধমৃত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া ধুঁকিতেছিল। কত লোক যাইতেছে, আসিতেছে, কাহারও তাহার প্রতি দয়া হয় নাই। নিবেদিতা তাহাকে দেখিবামাত্র থামিলেন এবং নিকটস্থ খাবারের দোকান হইতে দুধ কিনিয়া কুকুরছানাটিকে খাওয়াইয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই খাবারের দোকানটি এখন নাই; তাহার জায়গায় বড় পাকা বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে।

নিবেদিতার ধর্মবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব এবং চিত্র,স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল। এইসকল বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন।

তদ্ভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে তো তিনি খুব ভাল প্রবন্ধই লিখিতে পারিতেন। তাঁহার প্রবন্ধ তিনি যেরূপ লিখিতেন, প্রায় সেইরূপই ছাপিতাম; দু-একটির কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন করিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে; টিপ্পনী, মন্তব্য বা নিবন্ধিকা (Notes) তিনি যাহা লিখিতেন, তাহার কোন কোনটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিতাম। তাহা করিবার একটা কারণ, আমাদের দেশের 'রাজদ্রোহ' বিষয়ক আইন। কেননা, তিনি অনেক সময় খুব স্পষ্ট ভাষায় কঠোর সত্য লিখিতেন। "আপনার বিবেচনার উপর আমার বিশ্বাস আছে" পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার অধিকার আমাকেই এই বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা কোন কোন নোট আমার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া স্বাক্ষরবিহীনভাবে প্রকাশিত হওয়ায় এখন আর তাঁহার বলিয়া সহজে ধরিবার জো নাই, যাঁহারা তাঁহার লিখনভঙ্গি ও চিন্তার ধারার সহিত বিশেষ পরিচিত, তাঁহারাই ধরিতে পারেন।

তিনি আমার কাগজে লেখায় কয়েকটি বিষয়ে আমার চোখ ফুটিয়াছিল। আমি প্রথম প্রথম রবি বর্মার ছবির প্রতিলিপি এবং সেইজাতীয় অন্যান্য ছবির প্রতিলিপি ছাপিতাম। তিনি ক্রমাগত আমার সহিত তর্কযুদ্ধ করিয়া আমার এই বোধ জন্মান যে, রবি বর্মার ও তদ্বিধ অন্য ছবির রীতি ভারতীয় নহে এবং পাশ্চাত্য রীতির চিত্র হিসাবেও সেগুলির উৎকর্ষ নাই। চিঠিতে ছাড়া এসব ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সহিত মৌখিক কথা যখন হইত, তখন কথা বলার কাজ তিনিই বেশি করিতেন, আমি বেশিরভাগ শ্রোতার কাজ করিতাম। আচার্য বসু হাসিতে হাসিতে বলিতেন ঃ "উনি চান যে, তুমিও খুব তর্ক কর এবং তর্কে তাঁহার নিকট তুমি পরাস্ত হও; তাহা হইলে তিনি খুব খুশি হন।" নিবেদিতা শুনিয়া হাসিতেন। গ্রীক-গান্ধার মূর্তি-শিল্প যে ভারতীয় মূর্তিশিল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে এবং গান্ধার মূর্তি-শিল্পের বাহ্য কারিগরী গ্রীক হইলেও তাহাতে প্রাণ যতটুকু আছে তাহা যে ভারতীয় তাহা তিনি প্রদর্শন করেন। অজন্তা গুহাবিহারের প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত চিত্রাবলী ছাড়া গুহাগুলির স্থাপত্যাদিও যে প্রশংসনীয়, নিবেদিতা কয়েকটি সচিত্র প্রবন্ধে তাহা প্রদর্শন করেন। ভারতবর্ষে লোকে বসতি বড় ঘন এবং ইহার লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিও খুব বেশি হয় বলিয়া ইহা দরিদ্র দেশ, ইংরেজরা এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। নিবেদিতা দেখান যে, মোটের উপর ইহা সত্য নহে যে, নিখিল-ভারত ঘনবসতি। 'কিন্ডারগার্টেন' প্রণালীতে ভারতীয় জিনিসপত্র লইয়া কেমন করিয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা তিনি প্রদর্শন করেন।

ভারতীয় অনেক রীতিনীতি আমরা জন্মাবধি দেখিয়া আসিতেছি বলিয়া অভ্যাসবশত উহার ভিতরকার গূঢ়তত্ত্ব ধরিতে পারি না, উহার প্রাণ ও অর্থ খুঁজিয়া পাই না। এসব বিষয়ে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে ভুল করিতেন না, এমন নয়; কিন্তু অনেকসময় অনেক রীতিনীতি, ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠানের মজ্জাগত প্রাণের সন্ধান পাইতেন, যাহা আমরা পাই না।

ভারতীয় দেশী জিনিসের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। একবার তিনি আমাকে তাঁহার সহিত প্রত্যূষেই দেখা করিতে বলেন। বোসপাড়া লেনে তাঁহার সেই জীর্ণ বাড়িতে গিয়া খবর দিতেই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। দেখিয়াই বুঝিলাম, তিনি পূজাপাঠ ও জপ করিতেছিলেন। পরে নিচে আসিয়া

উভয়ে জলযোগ করিলাম। তিনি আমাকে পনীর (Cheese) খাইতে দেওয়ায় বলিলাম, তাহা খাওয়া আমার অভ্যাস নাই। তিনি বলিলেন ঃ "খান; ইহা ঢাকার তৈরি, বিদেশী নয়।" এইরূপে দেশী বলিয়া আমাকে কিছু নূতন খেজুরগুড়ও খাইতে হইল। তিনি কোথায় একটি আধ-পয়সা দামের কালো মাটির প্রদীপ পাইয়াছিলেন। তাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহা যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার বন্ধুপ্রীতি ও হিতৈষণা অসাধারণ ছিল। চিত্রের সৌন্দর্য বুঝিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা আমার নাই, নিবেদিতার তাহা বিশেষরকম ছিল। এইজন্য আমি তাঁহাকে অনেকসময় চিত্র-পরিচয় লিখিতে অনুরোধ করিতাম। সময় না থাকায় কখনো কখনো তাঁহাকে ছবির প্রুফ পাঠাইয়া বাহকের মারফত লেখাটি পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিতে হইত। তাহাতে তিনি কখনো কখনো আহার স্থগিত রাখিয়া বা অন্য কাজ ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ চিত্র-ব্যাখ্যা লিখিয়া পাঠাইতেন। কিন্তু চিঠিতে লিখিতেন ঃ "এরকম করা বড় খারাপ; আপনি আমাকে একটুও সময় দেন না।" একবার তিনি চর-মুখে জানিতে পারেন যে, আমার নামে রাজদ্রোহের মকদ্দমা হইবে। খবরটা সত্য ছিল, কিন্তু কি কারণে জানি না মকদ্দমা হয় নাই। খবর পাইয়া তিনি অনেক দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিয়া তাহা আমাকে জানান।

তাঁহার বিষয়ে আচার্য বসু মহাশয়ের নিকট অনেক কথা শুনিয়াছি। তাহা অধিকতর শিক্ষাপ্রদ ও মনোহর। আমি নিজে যাহা জানি, তাহাই কিছু লিখিলাম।* □

*৩১ বর্ষ, ১ সংখ্যা

'জীব শিব' ও 'কাঁচা আমি'

স্বামী নির্বেদানন্দ

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের একটি প্রধান সিদ্ধান্ত জীবের ক্রমবিবর্তন (evolution), বৈজ্ঞানিক যথেষ্ট অভ্রান্ত প্রমাণের সহায়ে প্রকৃতির এই গূঢ় রহস্যটি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এই সত্যটি মানিয়া লইবার বিরুদ্ধে এ-যাবৎ কোন বলবান সঙ্গত যুক্তি কোন তরফ হইতে আসে নাই। এই ক্রমবিবর্তন কোন্ শক্তির প্রভাবে এবং কিভাবে সঙ্ঘটিত হয় এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা বৈজ্ঞানিকের আসরে হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই বিষয়ে সকল সমস্যার মীমাংসা আজও তাঁহারা করিতে পারেন নাই। কিভাবে ইহা সঙ্ঘটিত হয়, এই সম্বন্ধে অবশ্য কয়েকটি অতি সন্নিকট কারণের (immediate cause) সন্ধান তাঁহারা দিয়াছেন, কিন্তু কি মূলশক্তির প্রভাবে এইরূপ ঘটনা সম্ভব হইল তাহা তাঁহারা পরিষ্কার করিয়া বলিতে আজও অক্ষম। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এই বিষয়ে একটা সুমীমাংসার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যেমন বটবীজের মধ্যে পূর্ণাবয়ব বটবৃক্ষে পরিণত হইবার একটি অদৃশ্য এবং অমোঘ শক্তি আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়, ঠিক সেইরকম ভাবেই স্বীকার করিতেই হইবে যে ক্ষুদ্রতম জীবাণুর মধ্যেই বুদ্ধত্বে পরিণত হইবার বিপুল শক্তি বিদ্যমান, ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া একদিন 'বুদ্ধের' আবির্ভাব জীবের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের ক্রমাভিব্যক্তির একটা রহস্যময় ইতিহাস। ক্রমশ নৈসর্গিক উপায়ে উপরিস্থিত কঠিন আবরণ যতই অপসৃত হয়, ততই হয় জীবের পূর্ণতার দিকে ঊর্ধ্বগতি। ইহা অপেক্ষা যৌক্তিক এবং সহজ ব্যাখ্যা বিবর্তনবাদের আর কি হইতে পারে?

এখন প্রশ্ন, কোন্ আবরণের আড়ালে এই পূর্ণতারূপী শিব প্রচ্ছন্ন থাকেন? হিন্দুশাস্ত্র বলেন ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ শক্তির দ্বারাই এই আবরণ গঠিত। উদ্ভিদ ও নিম্নস্তরের প্রাণীর কথা বাদ দিয়া, প্রাণিজগতের উচ্চস্তরে পৌঁছাইলে শিবের আবরণ এককথায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলা যায় 'কাঁচা আমি'। স্বার্থসর্বস্ব হইয়া নিজের ইন্দ্রিয়-ভোগ ও জীবনধারণের জন্য যথেচ্ছ প্রচেষ্টা করাই এই 'কাঁচা আমি'র স্বভাব। নিজের সুখের জন্য অপরের দুঃখ উৎপাদন করিতে ইহার তিলমাত্রও লজ্জা বা সঙ্কোচ নাই। স্বভাব-চালিত হইয়া প্রবৃত্তির পথে ভয় ছাড়া অপর কোন বাধাকেই ইহা গ্রাহ্য করে না। ভোগলোলুপ, স্বার্থান্বেষী, হিংস্রস্বভাব এই 'কাঁচা আমি'টির পরিপূর্ণ মূর্তি দেখা যায় পশুজগতে।

আদিমযুগে প্রকৃতির ক্রোড়ে যখন মানুষের প্রথম জন্ম হয় তখনো তাহার উপর পশুর মতোই ছিল এই ভোগলোলুপ, স্বার্থান্ধ, জিঘাংসাপরায়ণ 'কাঁচা আমি'র অপ্রতিহত অধিকার। ঠিক পশুরই মতো নিজের জীবনকে নিরাপদ রাখা এবং যথেচ্ছ ভোগ আহরণ করার জন্য কঠিন বিপদসঙ্কুল আবেষ্টনীর সঙ্গে নিয়ত লড়াই করাই ছিল আদিম মানুষের কাজ। কিন্তু একটা নৈসর্গিক কারণেই আদিম মানুষ ক্রমে 'কাঁচা আমি'কে সংযত, গণ্ডিবদ্ধ, শৃঙ্খলিত করার প্রয়োজন

অনুভব করিল। কোন এক শুভলগ্নে অপরকে ভালবাসার এক অভিনব বৃত্তি, বহুকে লইয়া সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করার এক অদম্য স্পৃহা এবং প্রয়োজনবোধ আদিম মানুষের নির্মম হৃদয়কে রসসিক্ত করিয়া তুলিল। এই বিশেষ রসভোগের আয়োজন করিতে গিয়া সে দেখিল যে, ইহার বিনিময়ে তাহার 'কাঁচা আমি'র অবাধ স্বাধীনতার একটা সীমা নির্দেশ করা প্রয়োজন। তাহাতেও সে পশ্চাৎপদ হইল না। কারণ, রিপুর তাড়না তাহার কাছে যতটা স্বাভাবিক সমাজপ্রেমের আকর্ষণও তাহার কাছে ততটাই স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। 'কাঁচা আমি'কে যতটুকু বাঁধিয়া সমাজের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় এই অভিনিবেশের মধ্য দিয়াই সামাজিক বিধি, নিষেধ, রাজার আইন-কানুন প্রভৃতির উদ্ভব। ইহাই মানবসমাজের ক্রমবিবর্তনের সাধারণ এবং নৈসর্গিক ধারা। সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যষ্টির 'কাঁচা আমি'টিকে শৃঙ্খলিত করার প্রয়াসের মধ্য দিয়াই হইয়াছে মানবসভ্যতার বিরাট অভিযান।

কিন্তু নিছক সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনেই এই দুর্দমনীয় 'কাঁচা আমি'টিকে সংযত করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। অবাধ-স্বাধীনতাকামী যথেচ্ছাচারপ্রিয় এই 'কাঁচা আমি' কোনপ্রকার বিধি-নিষেধের বশ্যতা স্বীকার করিতে নারাজ। পশুরই মতো ইহা ভয় করে শুধু প্রবলের কঠিন শাসন। অন্তরের অসন্তোষ ও তীব্র প্রতিবাদ লইয়া সে একটুখানি মাথাহেঁট করে শুধু ভয়েরই কাছে। কিন্তু পশু অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধি থাকায় মানুষ সুযোগ বুঝিয়া শাসনের কড়া পাহারাকে ফাঁকি দিয়া বিধি-নিষেধের গণ্ডি লঙ্ঘন করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। আর যাহারা অত্যন্ত দুর্দান্ত-প্রকৃতির তাহারা সমাজ বা রাজার শাসনকে উপেক্ষা করিয়াই সংযমের নির্দিষ্ট কোঠার বাহিরে চলিয়া যাইতে দ্বিধা বোধ করে না। তাই অধুনাতম সমাজেও দেখা যায় যে, কঠোর ফৌজদারি-দণ্ডের ব্যবস্থা বহাল থাকা সত্ত্বেও নরহত্যা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ করার লোকের অভাব নাই। যাহারা দুর্বল তাহারা শাসন মানিয়া লয় শুধু ভয়ে; ঐ শাসনের কঠোরতা শিথিল হইলে তাহাদের মধ্যে অনেকেই যে 'কাঁচা আমি'র প্রবল প্রেরণায় উচ্ছৃঙ্খলতাকেই বরণ করিয়া লইতে পারে ইহা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুতই মানুষের এই দাম্ভিক, স্বার্থপর, ভোগলুব্ধ, হিংস্রস্বভাব 'কাঁচা আমি'টিকে শুধু বাহিরের শাসন দিয়াই সংযত রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, অসম্ভব বলিলেও ক্ষতি নাই।

কিন্তু বিপদ শুধু এইটুকুই নয়। এই 'কাঁচা আমি'র দানবীয় প্রভাব শুধুই ব্যক্তির জীবনে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের জীবনেই নিবদ্ধ থাকে না। যদিও বা কোন সমাজের কড়াশাসনের প্রভাবে ঐ সমাজের ব্যক্তিদের জীবন কতকটা সংযত হইয়া উঠে, তথাপি কৌশলী 'কাঁচা আমি' অপর একদিক দিয়া সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া বসে। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজেই (জাতি বা সম্প্রদায়) একটা সমষ্টিগত 'কাঁচা আমি' সৃষ্টি হয়। নরহত্যা, ব্যভিচার, পরস্ব অপহরণ প্রভৃতি গুরু অপরাধ নিজ নিজ সমাজের গণ্ডির মধ্যে দণ্ডনীয় হইলেও, যখন একটি ক্ষুদ্র সমাজের সঙ্গে অপর সমাজের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন এই অপরাধগুলি স্বদেশ বা স্বজাতির নামে মহিমান্বিত হইয়া উঠে, জগতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এই চিত্র উজ্জ্বলভাবেই অঙ্কিত রহিয়াছে।

বর্তমান জগতের ইতিহাস বোধহয় অতীতকে লজ্জা দিবার জন্যেই এই উৎকট লীলার রেকর্ড ভঙ্গ করিতে উদ্যত। ইউরোপখণ্ডে মহাপরাক্রমশালী 'কাঁচা আমি' 'নেশন' নাম লইয়া খাড়া হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জগতের এক বিশেষ দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। দুর্বলের উপর প্রবলের অবৈধ এবং নির্লজ্জ অত্যাচার আধুনিক মানবসমাজের দৈনন্দিন ব্যাপার। জড়প্রকৃতি মন্থন করিয়া বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জ্ঞানরূপী অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে বিষও তুলিয়াছে যথেষ্ট। বিজ্ঞানের সহায়ে 'নেশন'গুলি লোক ও জনপদ বিধ্বস্ত করার নূতন নূতন লোমহর্ষণ উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, ইহাদের ভয়ে পৃথিবীর দুর্বল জাতিগুলির শঙ্কা ও ব্যথার সীমাই নাই। ইহাদের কাহারো লুব্ধ এবং সকোপ দৃষ্টি পড়িবামাত্রই দুর্বলজাতির মৃত্যুর পথে যাত্রা করিতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু ভয় শুধু দুর্বল জাতিরই নয়। দুর্বল ও সবল শুধু আপেক্ষিক শব্দমাত্র। সবল হইতেও সবলতর আছে। তাই ভয় আপেক্ষিক সবলতাকেই। এইজন্যই বর্তমান ইউরোপখণ্ডে নেশনগুলির অনেকের মধ্যেই দেখা যায় সবলতম হইবার দুর্নিবার উদ্যম। তাই সমগ্র জগতের শান্তিরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সভাসমিতির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই বড় নেশনগুলির মধ্যে চলিয়াছে রণসজ্জার প্রতিযোগিতায় এক অভূতপূর্ব সাধনা। একটি বীভৎস মহাসংগ্রামের নিদারুণ স্মৃতি লোপ পাইবার পূর্বেই আরেকটি মহাসমরের ঘনঘটায় জগতের রাজনৈতিক আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সকলেই অবশ্য বুঝিতেছেন যে এইপথে অগ্রসর হইলে, বিগত মহাসমরের আর দুই একবার পুনরাবৃত্তি হইলে সমগ্র মানবসমাজকেই বোধহয় পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তথাপি দুর্দমনীয় সঙ্ঘবদ্ধ 'কাঁচা আমি'কে অবশ্য প্রয়োজনীয় সংযমের কোটায় বাঁধিয়া রাখিবার সাধ্য যেন কাহারই নাই।

বস্তুতই 'কাঁচা আমি'টাই সকল অনর্থের মূল। ইহার অবাধ সেবা অর্থাৎ ব্যক্তিগত এবং সঙ্ঘবদ্ধ স্বার্থপরতা ও ভোগসর্বস্বতার কাছে আত্মসমর্পণ করাই ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন বিষময় করিয়া তোলে। ইহারই অপ্রতিহত প্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের গণ্ডির মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আসে এবং আন্তর্জাতিক সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়া ইহাই সমগ্র মানবসমাজকে মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। 'কাঁচা আমি'র প্রভাবে শুধু পশুবৃত্তি লইয়াই যদি মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে অধুনালুপ্ত অতিকায় পশুগুলির মতো মানুষের একদিন পৃথিবীর বুকে নিজ অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ তাহার কঙ্কালটি রাখিয়া অদৃশ্য হইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

দেখা গেল, মানুষের 'কাঁচা আমি'র প্রবল প্রতাপ, ইহাকে সংযত করা কত কঠিন এবং করিতে না পারার ফল কত বিষময়; গণ্ডিবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের বাহ্যিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই 'কাঁচা আমি'টিকে সংযত করার পথে ব্যর্থতার কি করুণ কাহিনী, এবং এই ব্যর্থতার পশ্চাতে ধ্বংসের চিত্র কত বীভৎস!

কিন্তু মানবসমাজের প্রগতির সাধনায় এইটুকু সব কথা নয়। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে প্রবল 'নেশন'গুলি যে-আত্মঘাতী প্রচেষ্টায় প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছে ঐ পথেই, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, সকল মানুষকে অগ্রসর হইয়া অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইত।

মানবসভ্যতার ইতিহাসের আরেকটি দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, এই 'কাঁচা আমি'টিকে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়। মেগাস্থিনিসের বর্ণনার মধ্য দিয়া তদানীন্তন ভারতীয় সমাজের যে-চিত্র পাওয়া যায়, অথবা কনফুসিয়াসের আমলে চীনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমষ্টি জীবনেও 'কাঁচা আমি'টিকে সংযমের গণ্ডির মধ্যে রাখা খুবই সম্ভব। কিন্তু এই সংযমের প্রেরণা শুধু সমাজের বাহ্যিক শৃঙ্খলা রাখার প্রয়োজনের দিক হইতে আসে নাই—ইহা আসিয়াছে আরেকটি বিশেষ দিক হইতে—সেটি ধর্মের দিক।

যেমন একটি শুভলগ্নে আদিম মানুষের মনে সমাজ গঠন করার এক অদম্য ক্ষুধা জাগিয়াছিল, সেইরূপ আরেকটি বিশেষ শুভলগ্নে মানুষ আবিষ্কার করিয়া বসিল তাহার অন্তরের মধ্যে 'কাঁচা আমি'র আড়ালে এই 'কাঁচা আমি'টিকে জয় করার উপযুক্ত এক অফুরন্ত শক্তির উৎস। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর এবং আশাপ্রদ প্রত্যক্ষ হইল এই যে, যখন একনিষ্ঠ সাধনার ফলে এই 'কাঁচা আমি'টি মরীচিকার মতো শূন্যে মিলাইয়া যায় তখনই মানুষের অন্তরে প্রকট হয় মানুষের যথার্থ স্বরূপ, যেখানে হিংসা নাই, লোভ নাই, ক্রোধ নাই—আছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন শান্তির এক মহান গাম্ভীর্য আর সমগ্র বিশ্বের কল্যাণকামনার এক অফুরন্ত প্রবাহ। তখন তাহার 'আমি'টি 'কাঁচা আমি'র মতো একটা ক্ষুদ্র দেহ-মনের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকে না। তার 'আমি'র মধ্যে দেখিতে পায় সে বিশ্ব-সংসার। "সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি, ঈক্ষতে যোগ-যুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শিনঃ।।" সকলের প্রতিই তার সমদৃষ্টি, সকলের কল্যাণের মধ্যে পায় সে অনাবিল আনন্দ। 'কাঁচা আমি'র ক্ষুদ্র স্বার্থপর সত্তার স্থান অধিকার করিয়া সেখানে বিদ্যমান এক ভূমা বিশ্বকল্যাণমূর্তি। নিজের জন্য তাহার ভাবনা নাই, সংশয় নাই, ভয় নাই, কোন কিছু পাবার উদ্বেগ নাই, দুঃখও নাই। "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।" তাহার অনাবিল স্বার্থগন্ধশূন্য বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায় নিরন্তর লোককল্যাণই হয় একমাত্র কাম্যবস্তু। "বসন্তবল্লোকহিতে চরন্তঃ", বসন্তকালের মতো সকলের কল্যাণ কামনাই হয় তাঁহার স্বভাব। পরিস্ফুট দেবস্বভাবের প্রেরণায় অপরের কল্যাণের জন্য বিষপান করিতেও তাঁহার দ্বিধা নাই। ছাগশিশুর জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবনকে অর্পণ করিতে অথবা মানব-কল্যাণের জন্য ক্রুশ-বিদ্ধ হইতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত। ইহাই 'কাঁচা আমি'-মুক্ত জীবের স্বরূপগত শিবের পরম কল্যাণময় মূর্তি।

জীবের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের প্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল বহু সহস্র বৎসর পূর্বে বৈদিক ভারতে, "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" প্রভৃতি উপনিষদ্-বাক্যের মধ্য দিয়া এই তত্ত্ব প্রথম ঘোষিত হয়। সেই সুদূর অতীত হইতে বর্তমান পর্যন্ত যুগে যুগে ভারতের তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষি ও আচার্যগণ এই তত্ত্বের যাথার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন এবং নানা ভাষায় নানা ছন্দে এই সত্যই প্রচার করিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ঃ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি", ইত্যাদি। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলিলেন ঃ "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সংক্ষেপে-সূত্রাকারে বলিলেন ঃ "জীব শিব"।

জীবের ইন্দ্রিয়চালিত বহির্মুখী স্বার্থান্বেষী একটা বাহিরের মূর্তির অন্তরালে যে তার স্বরূপগত পরম কল্যাণময় শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ইহা নিছক কবির কল্পনা নয়, ঔপন্যাসিকের উচ্ছ্বাস নয়, যুক্তিসর্বস্ব দার্শনিকের অসার অনুমান নয়। ইহা শুদ্ধ ও একাগ্র মানববুদ্ধিমাত্রেরই গোচর প্রকৃতির একটি চিরন্তন মূল সত্য। ভারতের বাহিরেও বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন যুগে এই সত্যের সন্ধান ও যথোপযুক্ত প্রচার হইয়াছে। যীশুর "I and my Heavenly Father are one"—ইহা এই সত্যেরই ঘোষণা।

যাহা হউক, জগতের তত্ত্বদ্রষ্টা আচার্যগণ যুগে যুগে এবং দেশে দেশে এই সত্য উপলব্ধি করাকেই মানবজীবনের আদর্শ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। অন্তর্নিহিত শিবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির মধ্যেই মানবজীবনের চরম উৎকর্ষ; ইহাতেই তাহার সকল অভাব আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ তৃপ্তি, ইহাতেই সকল দুঃখ, ভয় ও সংশয়ের চির অবসান। ইহাতেই হৃদয় পূর্ণ হয় ভূমা আনন্দে, নিঃস্বার্থ প্রেমে; জীবন মধুময় হয়, কৃতকৃত্য হয়। ইহাই ব্যক্তিগত মানবজীবনের চরম পরিণতি। সুতরাং ইহাই মানবের জীবনব্যাপী সংগ্রামের চরম লক্ষ্য।

মানবসমাজের পরম কল্যাণকামী আচার্যগণ এই আদর্শ নির্দেশ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এই আদর্শলাভের উপায়ও তাঁহারা নির্দেশ করিলেন। কেমন করিয়া 'কাঁচা আমি'র আবরণটি মুক্ত করিয়া শিবত্বের ক্রমবিকাশ ঘটাইতে হইবে তাহাও তাঁহারা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মানুষকে শিখাইলেন, এই আদর্শলাভের প্রচেষ্টাই মানুষের অধ্যাত্মসাধনা। ইহারই নাম ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, "Religion is the manifestation of the Divinity already in man." মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের (শিবত্বের) পূর্ণ অভিব্যক্তি যখন হয় তখন হয় তাহার যথার্থ ধর্মলাভ।

জগতের সকল ধর্মমতগুলির মূলেই আছে 'কাঁচা আমি'জয়ের ন্যূনাধিক ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ ত্যাগ ও সেবা, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিয়া অপরের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করার নাম সেবা। এই ত্যাগ ও সেবার মধ্য দিয়া যে 'কাঁচা আমি'র আবরণ ভেদ করিয়া মানুষ শিবত্বের ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে কোন অস্বাভাবিক যুক্তির আশ্রয় লইতে হয় না।

শাস্ত্র ও আচার্যবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অন্তর্নিহিত শিবত্বে আস্থাবান হইতে পারিলেই এই পথে অগ্রসর হইবার প্রবল প্রেরণা আসে। আদর্শলাভের মহান প্রেরণায় মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নীচ, স্বার্থপর, ভোগলুব্ধ 'কাঁচা আমি'র বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ত্যাগ ও সেবার পথে অগ্রসর হয়। নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য নিজে বরণ করিয়া লয় বলিয়াই ত্যাগ ও সেবার আপাতবন্ধুর পথে অগ্রসর হইবার উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় ক্রমে বাড়িয়াই চলে। এইজন্যই, শুধু সমাজের বিধিনিষেধ এবং রাজার কঠোর শাসন যে 'কাঁচা আমি'কে ঈষৎমাত্র সংযত রাখিতেও অক্ষম, সেই 'কাঁচা আমি'কে নিজ অভীষ্টলাভের প্রেরণায় সম্পূর্ণ লয় করাও অসম্ভব হয় না। ধর্মপ্রাণ মানুষের আত্মসংযম সমাজ ও রাজার শাসনজনিত সংযম অপেক্ষাও হয় অধিকতর কার্যকরী। তাই যখনই কোন সমাজের জীবনে ধর্মলাভের ব্যাপক জাগরণ লক্ষিত হয় তখনই সহজ ও দ্রুতপদক্ষেপে সেই সমাজ কল্যাণের পথে

অগ্রসর হয়। কনফুসিয়াসের আমলের চীনে এবং মেগাস্থিনিসের আমলের ভারতে ব্যাপক শান্তি ও শৃঙ্খলার মূলে ছিল এই স্বতঃপ্রবৃত্ত অধ্যাত্মসাধনার প্রভাব—ধর্মের প্রেরণা।

কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ধর্মের দিক দিয়াও মানবসমাজ 'কাঁচা আমি'কে ব্যাপকভাবে এবং স্থায়িভাবে জয় করিবার পথে বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবন এবং কিছুদিনের জন্য কোন কোন সমাজের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে সত্য—কিন্তু সভ্যতাগর্বিত বর্তমান জগতের সমষ্টিগত জীবনও 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' আছে বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

ইহার কারণ, ব্যক্তিগত 'কাঁচা আমি' বড়ই প্রবল, বড়ই কৌশলী, এবং সমষ্টিগত 'কাঁচা আমি' আরো প্রবল আরো কৌশলী। আচার্যনির্দিষ্ট ধর্মমত গ্রহণ করিয়াও মানুষ কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ভুলিয়া যায় যে 'কাঁচা আমি'কে জয় করাই ধর্মের মূল কথা। তখন ধর্মের আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর সে সবটুকু রাখিয়া দেয় বটে, বরং উহার মাত্রা বোধহয় দিন দিন সে বাড়াইয়াই চলে, কিন্তু অন্তর্নিহিত শিবের আবাহনের পরিবর্তে সে ছদ্মবেশী 'কাঁচা আমি'র নূতন রকমের পূজায় ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। ত্যাগ ও সেবার, প্রেম ও পবিত্রতার স্থান অধিকার করিয়া বসে অভিমান, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের প্রবল স্পৃহা। ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষ তখন অন্তরের পশুত্বকে বহাল রাখিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে, মূলকথা বিস্মৃত হইয়া এই পথেও সঙ্ঘবদ্ধ 'কাঁচা আমি' ধর্মের পতাকা উড়াইয়া উৎকট হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষের সমাজকে কতভাবেই বিপর্যস্ত করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সাম্প্রদায়িক কোলাহল ও অশান্তির মূলে এই সঙ্ঘবদ্ধ 'কাঁচা আমি'রই প্রতারণা। ধর্মের পোশাক পরিয়া 'কাঁচা আমি' মানুষকে মিথ্যাচার করিয়া তোলে, এবং সকল কল্যাণের মূল উৎস যে ধর্ম, তাহাকেই বীভৎস করিয়া বসে।

এইজন্য বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, ধর্মের নাম থাকিলেই ধর্ম হয় না। ধর্মেরও একটা স্বরূপ আছে এবং একটি বিকৃতি আছে, 'কাঁচা আমি'কে ক্রমশ লয় করিয়া শিবত্বের প্রকাশ করাই যথার্থ ধর্মের লক্ষ্য। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে 'কাঁচা আমি'র কোনপ্রকার আপোষ হওয়া অসম্ভব, যদি কোথাও কোনপ্রকার আপোষ দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেখানে ধর্ম কক্ষচ্যুত হইয়াছে। মূল লক্ষ্য হারাইয়া উহা বিকৃত হইয়াছে এবং সমাজকে কল্যাণের নামে অকল্যাণের বিপরীত পথে লইয়া যাইতেছে। এইরূপ বিকৃত ধর্মই গীতার "ধর্মস্য গ্লানিঃ", (ধর্মের গ্লানি)।

বর্তমান জগতে আস্তিক সমাজগুলির প্রায় সর্বত্রই এই গ্লানিগ্রস্ত ধর্মের চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রায় সর্বত্রই বাহ্যিক আচার ও আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের অন্তরালে 'কাঁচা আমি'র অবাধ পূজার ব্যবস্থাই দৃষ্টিগোচর হয়। স্বার্থপর, দাম্ভিক, নৃশংস, ক্রূর, অত্যাচারী, ব্যভিচারী ধর্মযাজকের সংখ্যা সকল দেশেই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। ধর্মজগতে যাঁহারা নেতার পদ দখল করিয়া আছেন, তাঁহাদের অবস্থাই যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের অবস্থা কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ধর্মগুরুর জীবনেই যদি প্রেম, পবিত্রতা, শান্তি ও মাধুর্যের আদর্শ তাহারা দেখিতে না পায়, তাহারা সংযমের

পথে আকৃষ্ট হইবে কোন্ প্রেরণায়? মানুষকে চিরকাল অজ্ঞ রাখিয়া, শুধু পরকালের ভয় দেখাইয়াই কল্যাণের পথে চালিত করা যায় না। অন্তঃসারশূন্য হইয়া ধর্মযাজকগণ জনসমাজে ধর্মের অস্তিত্ব বহাল রাখিবার জন্য যখন এই পথ অনুসরণ করেন, তখন বস্তুতঃই তাঁহারা ধর্মের সমাধি রচনা করেন।

বর্তমান যুগে গণশিক্ষা বিস্তারের ফলে পাশ্চাত্যখণ্ডে প্রায় প্রত্যেক দেশেই ধর্মযাজকদের ভণ্ডামি ধরা পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। ফলে কোথাও প্রতারক ধর্মযাজকদের অপরাধে আচার্য-প্রচারিত মূল ধর্মই অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে এবং নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। কোথাও ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদের ক্ষমতা ও আভিজাত্যকে খর্ব করার আয়োজন চলিতেছে। এই গ্লানিগ্রস্ত ধর্মের বিকট চিত্র দেখিয়া বহু মনীষী ধর্মকে মানবসমাজের প্রগতির পথের বন্ধন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এই মনীষীদের দোষ দেওয়া যায় না। ধর্মের স্বরূপ ও বিকৃতির মধ্যে ভেদটা স্বর্গ ও নরকের ভেদের মতোই একেবারে বিপরীত। বিকৃত ধর্মই যদি ধর্ম হয় তাহা হইলে ইহার চিরনির্বাসনই মানুষের কল্যাণের পথ, একথা নিঃসংশয়। আরেক কথা, ধর্মের স্বরূপগত যে একটি পরম কল্যাণময় রূপ আছে তাহার সন্ধান না পাওয়ার জন্য এই মনীষিবৃন্দকে দায়ী করা যায় না। কারণ চতুর্দিকে যখন ধর্ম গ্লানিগ্রস্ত তখন কাহারো পক্ষে যথার্থ ধর্মের সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, অসম্ভবও বলা যাইতে পারে। এই জন্যেই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন : "যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন (ধর্মের নবজাগরণের জন্য) স্বয়ং আমি অবতীর্ণ হই।" "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।" যাহা হউক, গ্লানিগ্রস্ত ধর্মও যেমন সমাজকে বিপরীতদিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, উহার প্রতিকারকল্পে মূলধর্মের লোপ-সাধনের প্রচেষ্টাও ঐপথে সমাজকে লইয়া যাইতে বাধ্য। কারণ উভয় পক্ষেই আছে সেইসকল অনর্থের মূল পশুভাবাপন্ন 'কাঁচা আমি'র ছলনাময় আত্মপ্রসারের প্রচেষ্টা। একপক্ষে 'কাঁচা আমি'র ছদ্মবেশী অভিযান, অপর পক্ষে উহারই উলঙ্গ আস্ফালন। ইহারই ফলে ইউরোপে আজ ব্যাপক অশান্তি এবং সমগ্র মানবসমাজের আসন্ন বিপদ।

ভারতের ধর্মও গ্লানিগ্রস্ত এবং ইহার প্রতিকারের জন্য এখানেও মূল ধর্মকেই নির্বাসন দিবার চিন্তা অনেক মনীষীর মনই অধিকার করিয়াছে ও করিতেছে। জগতের সর্বত্রই বোধহয় এইরূপ একটি বিপরীত গতি শুরু হইয়াছে।

তথাপি একটু নজর করিলেই দেখা যায় যে, বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যদেশের মনীষীদের মধ্যেও কেহ কেহ গ্লানিগ্রস্ত ধর্মের বীভৎসতা দেখিয়াও মানবসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হন নাই, বরং আশার বাণী শুনাইয়াছেন ও শুনাইতেছেন। তাঁহারা মূলধর্মের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া নিশ্চিত থাকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন নাই। বরং ধর্মের যুক্তি-বিরোধী আবর্জনা দূর করিয়া উহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা সেই বিষয়েই গবেষণা করিতেছেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই, কিন্তু ইঁহাদের উপায়টি উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট কিনা তাহা প্রণিধানযোগ্য। ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অধ্যাত্মতত্ত্বের উপলব্ধির মধ্য দিয়াই সম্ভব, কল্পনা বা বিচারের সাহায্যে বেশিদূর অগ্রসর

হওয়া যায় না। কিন্তু ইঁহারা শুধু বিচারকে অবলম্বন করিয়া ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে এক একটি কল্পনা খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছেন, অবশ্য উদ্দেশ্য মহান বলিয়া তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা একবারের উপেক্ষার বস্তু নয়।

কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক ক্রমবিবর্তনবাদটিকে যুক্তিদ্বারা অনুসরণ করিয়া মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি উজ্জ্বল চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, মানুষের মধ্যে একটি অতিমানবতার (Superman) বীজ রহিয়াছে, এই বীজ হইতেই একদিন অতিমানবের সৃষ্টি হইবে এবং মানুষের সমাজ ক্ষুদ্র এবং সঙ্কীর্ণ গণ্ডি লঙ্ঘন করিয়া অতিমানব সমাজে পরিণত হইবে। এই মতের প্রবর্তকদের মধ্যে জার্মান দার্শনিক নীটসে এবং বর্তমান ইংলন্ডের ভাবনায়ক বার্নাড-শ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তবে ইঁহাদের কল্পিত অতিমানবের চিত্রটি বুদ্ধ বা যীশুর অনুরূপ হইবে, কিংবা হিটলার ও মুসোলিনীর অনুরূপ হইবে তাহা বলা যায় না। মানুষ তাহার গণ্ডিবদ্ধ শক্তির সীমা ছাড়াইয়া অসুরেও পরিণত হইতে পারে, দেবতাও হইতে পারে। 'কাঁচা আমি'টিকে যদি বাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে সে হয় অসুর আর উহাকে সম্পূর্ণ জয় যদি করিতে পারে, তাহা হইলে হয় দেবতা।

মানুষের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে আশার বাণী আরেক দিক হইতেও উঠিয়াছে। উপনিষদের ঋষিদের মতেই নিজের শুদ্ধ ও পবিত্র হৃদয়ে অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগে নূতন করিয়া 'জীব শিব' মন্ত্রের পুনরায় উদ্বোধন করিয়াছেন। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার প্রিয়শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও সঙ্কল্প ও সাধনাবলে এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া জগতে ইহার বহুল প্রচার করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই সকলকে বলিয়াছেন যে, এই 'জীব শিব' মন্ত্রের সাধনের মধ্য দিয়াই মানবসমাজ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে, অন্যথা নয়। এইজন্যই ত্যাগ ও সেবার মহিমা প্রচার করিয়া তিনি জগতের নরনারীকে কল্যাণের পথে আহ্বান করিয়াছেন। 'কাঁচা' আমিকে জয় করিয়া অন্তর্নিহিত শিবকে প্রকট করাই ধর্ম এবং এই ধর্মই মানবসমাজের যাবতীয় কল্যাণের মূল উৎস, এইকথা প্রচার করিয়া তিনি উদভ্রান্ত জগৎবাসীকে যথার্থ প্রগতির পথের সন্ধান দিয়াছেন।

ইউরোপকে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, উহার সমগ্র বর্তমান সভ্যতার নিচেই আছে এক ভীষণ আগ্নেয়গিরি। যদি এখনও ঐ সভ্যতা আমূল শোধিত হইয়া অধ্যাত্ম পথে চালিত না হয়, তাহা হইলে ঐ সভ্যতার ধ্বংস হইতে আর বিলম্ব নাই। ভারতবাসীকেও দুইটি আসন্ন বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তিনি সতর্ক করিয়াছেন। ভারতের একদিকে গ্লানিগ্রস্ত ধর্মের উৎকট ব্যভিচার, অপরদিকে যুক্তিবাদী নাস্তিকতার নির্লজ্জ পরানুকরণস্পৃহা। ধর্মের গ্লানি দূর করিয়া ঔপনিষদিক ধর্মের কল্যাণময় রূপটি প্রকট করিয়া জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিবার ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন তিনি ভারতবাসীর উপর। ভারতই জগতের আদি ধর্মগুরু। আজ নিয়তির চক্রে ভারত নিজে পথভ্রষ্ট হইলেও তাহার দায়িত্ব লোপ পায় নাই। তাই বুঝি এখানে বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব এবং 'জীব শিব' মন্ত্রের পুনঃপ্রচার।* □

রানী রাসমণি

অপরাজিতা দেবী

রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা যখন নিপুণভাবে অভিনয় করে, প্রেক্ষাগৃহে ওঠে প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি। যে-শিল্পী দৃশ্যপট তৈরি করে, যে-রূপকার অভিনেতাকে সাজিয়ে দেয়, যে-সহকারী অভিনেতাকে কথা বলে দেয়, তারা থাকে যবনিকার অন্তরালে। অভিনেতার সু-অভিনয়ের মাঝে তাদের দান অনেকখানি, কিন্তু সাধারণ লোক তাদের দেখতে পায় না, তাদের দানের প্রকৃত মূল্য দিতে পারে না।

বড় বড় মহাপুরুষরা যখন আসেন তখন দেখা যায় তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মহাপ্রাণ নরনারীও তাঁদের সহকারী রূপে তাঁদের লীলা অভিনয়ের রূপকার রূপে এ-জগতে এসে থাকেন। মহাপুরুষদের অলৌকিক জীবনের উজ্জ্বল দীপ্তি এঁদের ছোট ছোট জীবনকে ম্লান করে দেয়। তাই এইসব জীবনগুলোর মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য লোকসাধারণের চোখে ধরা পড়ে না, যদিও এগুলোকে বাদ দিয়ে মহামানবের জীবনটি আমরা আলোচনা করতে পারি না, ধারণা করতে পারি না।

মানব-দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় জীবন দেখে আজ সারা বিশ্ব স্তম্ভিত। সংখ্যাতীত নরনারীর অশান্ত চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আজ শান্তিবারি সেচন করছে। রামকৃষ্ণদেবের ধর্মজীবনে রানী রাসমণির দান অনেকখানি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেই তিনি মানবজীবনের চরম কাম্য পরমসত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যত মত তত পথ—রূপ মহাসত্য আবিষ্কারের জন্য আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত পৃথিবীতে বিশেষরূপে পুজো পাচ্ছেন। যতদিন জগতে ধর্ম থাকবে ততদিনই তিনি এভাবে পূজিত হবেন। এই মহাবস্তু তিনি রাসমণির স্থাপিত মন্দিরেই লাভ করেছিলেন।

হালিশহরের কাছে কোনা নামক গ্রামে ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে রানী রাসমণির জন্ম হয়। তখন কেউ জানতে পারেনি যে ঐ ছোট শিশুটি বাংলার কি অপরিমিত গৌরব বহন করে আনবে। জীবনকে মহৎ করে গড়ে তোলবার জন্য যে শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের অবশ্য প্রয়োজন আমরা অনুভব করি, রাসমণি তখন তার কিছুই পাননি। দারিদ্র্যের কঠোরতার মাঝে অশিক্ষার গভীর অন্ধকারের মধ্যে তাঁর বাল্য-জীবন গতানুগতিক ভাবেই অতিবাহিত হয়েছিল।

সুদূর পল্লী-কুটিরে রাসমণির শৈশবের দিনগুলো খেলাধূলায় একান্ত সাধারণভাবেই কেটে যাচ্ছিল। শেষে একদিন বিধাতাপুরুষ স্বয়ং তাঁর সৌভাগ্য-মন্দিরের বদ্ধ দুয়ারটি খুলে দিলেন। বহু সুকৃতির ফলে কলকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়ে গেল। অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান ও কঠোর দারিদ্র্যের মাঝে লালিত পালিত হয়েও তিনি এই অতুল বৈভবের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন, আত্মহারা হননি। এ-অবস্থায় সাধারণ মানুষের মাঝে আসে অহঙ্কার, আসে গরিবের প্রতি ঘৃণা, আসে আত্ম-

বিস্মৃতি, কিন্তু রানী রাসমণির হয়েছিল ঠিক তার বিপরীত। তিনি তাঁর জন্ম ও কুমারী-জীবনের কথা ভুলতে পারেননি। শৈশবের দুঃখ কষ্টই হয়তো তাঁকে এতদূর মহানুভব ও বিশাল করে গড়ে তুলেছিল।

অভিমানহীনতায় অন্তরের মাধুর্যে ও স্বামীর অকৃত্রিম ভালবাসায় রাসমণির দিনগুলো পরম সুখে কেটে যাচ্ছিল। তিনি চারটি কন্যা সন্তান পেয়েছিলেন— পদ্মমণি, কুমারী, করুণাময়ী ও জগদম্বা। রানীর সুখের দিনে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিল, ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে রাজচন্দ্র দাস পরলোক গমন করলেন। রাসমণির বয়স তখন চুয়াল্লিশ বৎসর।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই দুঃখ বিপদ আসে। এগুলোর হাত থেকে বাঁচবার কারুর উপায় নেই আর যখন দুঃখ আসে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়ই হোক মানুষকে তা ভোগ করতেই হয়। দুঃখকে মঙ্গলময়ের শুভ আশীর্বাদরূপে যে বরণ করে নিতে পারে, দুঃখ তাকে দিয়ে যায় পরমকল্যাণ, দুর্যোগ-নিশার শেষে সে দেখতে পায়, তার সারা আকাশ ভরে উঠেছে অমৃত উষার অরুণ-আলোয়। আবার এই দুঃখ বিপদগুলো মানুষের জীবনে কষ্টিপাথরের কাজ করে। এগুলোর কঠোর স্পর্শেই আমরা জানতে পারি কোন্‌টি খাঁটি সোনা আবার কোন্‌টিই বা পিতল। এগুলোর কঠিন অগ্নিপরীক্ষায়ই আমরা জানতে পারি—কে যথার্থ মানুষ, কার অন্তর কত মহৎ।

বাংলাদেশে জমিদারগৃহিণীর অভাব নেই। কিন্তু তপস্যায়, ত্যাগে, তেজস্বিতায়, দানে যে-কজন বঙ্গনারী বাংলার ইতিহাসে উজ্জ্বল তারকার মতো অমর হয়ে আছেন, রানী রাসমণি তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মণি। যে বৈধব্যযন্ত্রণা কোন হিন্দুনারীই কামনা করেন না, সেই অনাকাঙ্ক্ষিত অশুভ বস্তুটিই রাসমণিকে রানীর আসন দিয়েছিল, বাংলার ইতিহাসে একটি গৌরবময় স্থান প্রদান করেছিল। রাজচন্দ্র দাসের দেহত্যাগের পর রাসমণি তাঁর বিশাল জমিদারির পরিচালনভার নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ে যে দুর্লভ মানবতা সুপ্তভাবে বাস করছিল, হয়তো যার অস্তিত্ব রাসমণি নিজেই বুঝতে পারেননি, এখন উপযুক্ত সুযোগ ও ক্ষেত্র পেয়ে সেই সুপ্ত সিংহ জেগে উঠল।

রাসমণি একে একে তাঁর তিনটি কন্যার বিবাহ দিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ী একটি পুত্রসন্তান রেখে অকালে মারা গেলেন। রানী তখন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বাকে তৃতীয় জামাতা মথুরানাথের হাতে সমর্পণ করলেন। বিষয়কর্মে মথুরানাথ ছিলেন রানীর দক্ষিণ-হস্ত। রাসমণি গরিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আবার শিক্ষা বলতে সাধারণত যা বোঝায় তাও তাঁর বিশেষ ছিল না এবং নিজে স্ত্রীলোক হয়েও যে-নিপুণতার সহিত তিনি এত বড় একটা বিষয় পরিচালনা করেছিলেন, তাতে শতমুখে তাঁকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। অবশ্য একথা ঠিক, মথুরানাথের মতো উপযুক্ত বিশ্বাসী সহায়ক না পেলে রানীর পক্ষে এ-কাজটা অত সহজ হতো না।

বাংলার গৌরব রানী রাসমণির একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনী যদি প্রকাশিত হতো, তাহলে বাংলার বিশেষ করে বাংলার মেয়েদের বড়ই উপকার হতো। রানীর বংশধরেরা যদি এবিষয় অগ্রবর্তী হন, তাহলে আমার মনে হয়, এ-কাজটি এখনো সম্ভব হতে পারে। রামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এবং সাময়িক পত্রাদিতে

রানীর সম্বন্ধে যা-যা প্রকাশিত হয়েছে, সেসব অবলম্বন করেই আমি এ-প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস পেয়েছি।

সর্বতোমুখী প্রতিভা নিয়ে রাসমণি এসেছিলেন সংসারে। তাঁর অপূর্ব জীবনের মূল্যবান ঘটনাগুলোর প্রায় সবই কালের অতল তলে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে। যে-কটি ঘটনা জানতে পারা যায়, তার প্রত্যেকটিই স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল, প্রত্যেকটিই সুন্দর, প্রত্যেকটিই অনুকরণীয়। শোনা যায়, রানীর জানবাজারের বাড়ির কাছে তখন গোরা সেপাইদের একটি ব্যারাক ছিল। মদ খেয়ে উচ্ছৃঙ্খল সেপাইরা একদিন রানীর দারোয়ানদের পরাস্ত করে একেবারে বাড়ির ভিতর চলে গিয়ে লুটপাঠ করতে আরম্ভ করে। মথুরানাথ সেসময় বাড়ি ছিলেন না এবং পুরুষদের মধ্যে প্রায় সকলেই সেদিন কোন না কোন কাজে বাইরে ছিলেন। কোনরকম বাধা না পেয়ে গোরা সেপাইরা একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে প্রবেশ করল। অবস্থা দেখে রাসমণি স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গোরাদের বাধা দেবার জন্য তৈরি হয়েছিলেন।

বাংলার নারীদের ওপর অত্যাচার নারী-হরণ প্রভৃতি সংবাদ আজকাল খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে। অবলা না হয়ে বাংলার মেয়েরা যদি একটু শক্তিশালী হন আর রাসমণির মতো তেজের ও সাহসিকতার সহিত দাঁড়াতে পারেন তাহলে এসব অত্যাচার একদিনেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

রাসমণির বুদ্ধিকৌশল ও তেজস্বিতা সম্বন্ধে আরো একটি চমৎকার ঘটনার কথা শোনা যায়। একসময় ব্রিটিশ সরকার জেলেদের ওপর কর বসিয়েছিলেন। গঙ্গায় মাছ ধরলেই সরকারকে কর দিতে হতো। এইসব জেলেদের প্রায় অধিকাংশই রানীর প্রজা ছিল। করের দায়ে উৎপীড়িত হয়ে তারা রানীর কাছে নিজেদের দুঃখের কথা নিবেদন করল। রানী তাদের অভয় দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। তারপর সরকারকে অনেক টাকা দিয়ে তিনি নিজেই গঙ্গায় মাছ ধরবার ইজারা নিলেন। সরকার মনে করলেন রানী বুঝি নিজেই মাছের ব্যবসা করবেন। রানী তখন বড় বড় লোহার শিকল দিয়ে বহু জায়গায় গঙ্গার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। ইংরেজদের জাহাজগুলোর হলো তখন মহা বিপদ, নদীর পথে যাওয়া আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। তারা তখন একযোগে রানীর নামে নালিশ করল। রানী উত্তর দিলেন, অনেক টাকা খরচ করে নদীতে মাছ ধরবার অধিকার আমি পেয়েছি আর সেই অধিকারেই বাধ্য হয়ে আমাকে এরকম করতে হয়েছে। জাহাজগুলো যদি অনবরত যাওয়া আসা করে তাতে আমার মাছ সব পালিয়ে যাবে, আমার ভয়ানক ক্ষতি হবে। সুতরাং আমি কিছুতেই তা করতে পারি না।

মহা মুশকিল দেখে শেষকালে ব্রিটিশ সরকার রানীর সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হন। জেলেদের ওপর যে-কর বসান হয়েছিল বাধ্য হয়ে সরকার তা তুলে নিলেন, তখন রানীও নিজের অধিকার ত্যাগ করলেন। এই একটি ঘটনাতেই রানীর মহৎ অন্তঃকরণ, বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকহিতকর কাজে সর্বদাই রানীর বিশেষ উৎসাহ ছিল। সোনাই, বেলেঘাটা ও ভবানীপুরের বাজার, কালীঘাটে ঘাট ও মুমূর্ষুনিবাস, হালিশহরে গঙ্গাতীরে ঘাট, সুবর্ণরেখা থেকে অনেকদূর পর্যন্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতি তিনি করে দিয়েছিলেন। গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ ও পুরীতে

তীর্থযাত্রা করে রানী দেবতার উদ্দেশে বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তিনি তাঁর মকিমপুর জমিদারীর প্রজাদের নীলকরের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ করে টোনায় খাল কেটে মধুমতীর সাথে নবগঙ্গার যোগ করে দিয়েছিলেন।

ভক্তিমতী রানী রাসমণির অপরিসীম দেবীভক্তি ছিল। জমিদারী সেরেস্তার সমস্ত কাগজপত্রের জন্য যে শিলমোহর তিনি করিয়েছিলেন; তাতে লেখা ছিল—কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, রানীর মধ্যে যে অপরিসীম দেবীভক্তি ছিল, তা তাঁর প্রতি কাজেই প্রকাশ পেত।

কাশীধামে গিয়ে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণাকে দর্শন ও বিশেষভাবে পূজা দেবার ইচ্ছা রানীর অন্তরে বহুকাল থেকে জাগছিল। কিন্তু সাংসারিক নানা অসুবিধায় এতকাল তিনি তা কাজে পরিণত করতে পারেননি। এজন্য তিনি বহু টাকা সঞ্চয় করেও রেখেছিলেন। পরে ১২৫৫ সালে রানী কাশী যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাত্রা করবার আগের রাতে রানী স্বপ্ন দেখলেন—দেবী তাঁকে দর্শন দিয়ে বলছেন, তোর কাশী যাবার আবশ্যক নেই। ভাগীরথী তীরে একটি সুন্দর জায়গায় আমার মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর। ঐ মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে নিত্য আমি তোর পূজা গ্রহণ করব।[১]

ঐ স্বপ্ন দেখার পর রানীর আর কাশী যাওয়া হলো না। তিনি দেবীর মন্দির করবার সঙ্কল্প করলেন। যে প্রচুর অর্থ তিনি তীর্থগমনের জন্য সঞ্চয় করেছিলেন এখন সেসবের দ্বারাই মন্দিরের কাজ আরম্ভ করবার ইচ্ছা করলেন। জগন্মাতার প্রতি রানীর আশৈশব যে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এখন তা মূর্তিতে রূপায়িত হবার সুযোগ পেল।

১২৫৪ সালের মাঝামাঝি (৬ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭) কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের এটর্নী হেস্টি নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে গঙ্গার তীরে রানী প্রায় ৬০ বিঘা জমি কিনলেন। সেখানে অজস্র টাকা খরচ করে তিনি মন্দির, বাগান প্রভৃতি তৈরি করতে লাগলেন। ঐসময় থেকে আরম্ভ করে আট বৎসরেও মন্দিরের কাজ শেষ হচ্ছে না দেখে রানী বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর বিলম্ব করা উচিত নয় ভেবে তিনি ১২৬২ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার দিনে মন্দিরে মাকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। শোনা যায়, দেবালয় নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উৎসবে রানী প্রায় নয় লাখ টাকা ব্যয় করেন।

কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে একটি গোলযোগ উপস্থিত হয়েছিল। রানীর বিশেষ ইচ্ছা—দেবীকে নিত্য অন্নভোগ দেন, কিন্তু তাঁর জাতি ও সামাজিক প্রথা হলো এতে প্রবল অন্তরায়। তাঁর মন কোন বাধাই মানতে চাইল না। তিনি ভাবলেন, মায়ের কাছে কি সন্তান কখনো অস্পৃশ্য হতে পারে, জগজ্জননীর কাছে জাতিভেদের স্থান কোথায়?

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে ব্যবস্থা চাওয়া হলো। কিন্তু কেউই রানীর এ ইচ্ছা সমর্থন করলেন না। রানীও বার বার বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে ব্যবস্থা চেয়ে পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তিনি সম্মতি পেলেন না। শেষকালে যখন এবিষয়ে প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছেন তখন দৈববাণীর মতো ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত রামকুমারের কাছ থেকে সংবাদ এল—রানী যদি সমস্ত

মন্দিরটি তাঁর গুরুদেবের নামে দান করে দেন, তাহলে অন্নভোগে আর কোন বাধা থাকবে না।

পণ্ডিত রামকুমারের ব্যবস্থা পেয়ে রানীর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি সেইভাবেই কাজে অগ্রসর হলেন। ব্রাহ্মণেরা এ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে আরম্ভ করলেন কিন্তু রানী তা গ্রাহ্য করলেন না। দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি রানীর বিশেষ ভক্তি ছিল, কিন্তু সর্বত্রই তিনি তাঁর বিবেকের নির্দেশ মেনে চলতেন। ব্রাহ্মণদের আন্দোলনের ফলে কোন ব্রাহ্মণই মন্দিরে পূজকের ভার নিতে সাহস করেননি। রানীও কিছুতেই নিরাশ হলেন না। পূজকের পদ গ্রহণ করবার জন্য তিনি রামকুমারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে পাঠালেন। রানীর ঐকান্তিকতায় বাধ্য হয়ে রামকুমার পূজকের পদ গ্রহণ করলেন।

প্রতিষ্ঠা-উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হলো। সুদূর কান্যকুব্জ, কাশী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান থেকে বহু অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ-উৎসবে সমাগত হয়ে প্রত্যেকে রেশমী কাপড়, চাদর আর বিদায়স্বরূপ এক-একটি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিলেন। অজস্র অর্থ ব্যয় করে রানী উৎসবটিকে শ্রীমণ্ডিত করেছিলেন, অতিথিদের যথোচিত সেবা করেছিলেন এবং দরিদ্র নরনারীকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করেছিলেন।

দাদা রামকুমার যখন কালীমন্দিরের কাজ গ্রহণ করেছিলেন রামকৃষ্ণদেব তখন বালক। তাঁর সৌম্যদর্শন কোমল প্রকৃতি ধর্মনিষ্ঠা ও অল্পবয়স রানী রাসমণি ও মথুরানাথকে আকৃষ্ট করল। তাঁরা বালককে মায়ের বেশকারীর পদে নিযুক্ত করবার জন্য বার বার চেষ্টা করে পরে কৃতকার্য হয়েছিলেন। এসময় একদিন মূর্তি গড়ে শিবপূজা করতে রামকৃষ্ণের বড় ইচ্ছে হয়। তিনি গঙ্গার মাটি দিয়ে একটি শিবমূর্তি গড়ে পূজা আরম্ভ করলেন। ঐসময় হঠাৎ মথুরবাবু সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন একটি মূর্তির সামনে বসে রামকৃষ্ণ তন্ময় হয়ে পুজো করছেন। মূর্তিটি ছোট হলেও অতি সুন্দর হয়েছিল আর ষাঁড়, ত্রিশূল, ডমরু কিছুরই ত্রুটি ছিল না। মথুরবাবু দেখে বিস্মিত হলেন, এরূপ দেবভাবাঙ্কিত মূর্তি বাজারে পাওয়া যায় না। তারপর যখন তিনি জানতে পারলেন যে বালক রামকৃষ্ণই এ-মূর্তিটি গড়েছেন তখন তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। পূজার পর তিনি মূর্তিটি চেয়ে নিয়েছিলেন এবং রানীকে দেখিয়েছিলেন। রানীও ঐ মূর্তি দেখে বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন।[২]

মন্দির প্রতিষ্ঠার তিনমাসের মধ্যেই আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল যাতে রানীর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক আমরা দেখতে পাই। জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসব, মধ্যাহ্নে রাধাগোবিন্দের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদির শেষে পূজক গোবিন্দের মূর্তিকে অন্য ঘরে শয়ন দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। মন্দিরের মেঝে জল পড়ে পিছল হয়েছিল। যাবার সময় পূজারি হঠাৎ পড়ে যান, তাতে মূর্তিটির একখানি পা ভেঙে যায়। একেবারে হুলুস্থুল পড়ে গেল। ভাঙা বিগ্রহে পুজো হবে কি করে? শহরের সব খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সাদরে আহ্বান করে রানী সভা করলেন। অনিবার্য কারণে যাঁরা আসতে পারলেন না, তাঁদের মতামতও সংগ্রহ করা হলো। পণ্ডিতেরা একবাক্যে বিধান দিলেন ভাঙা মূর্তিটি গঙ্গার জলে বিসর্জন দেওয়া হোক এবং তার পরিবর্তে একটি নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হোক।

সভার শেষে মথুরবাবু ও রানী রামকৃষ্ণদেবকে তাঁর মতামত জিজ্ঞেস করলেন। তিনি নির্ভীকভাবে উত্তর করলেন, রানীর জামাইদের মাঝে কেউ যদি পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলত তবে কি তাঁকে ত্যাগ করে আরেকজনকে এনে তাঁর জায়গায় বসানো হতো, না তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো? এখানে সেরকম কি করা যায় না? পা-টি জুড়ে নিয়ে যেমন পুজো হচ্ছে তেমনি পুজো করা হোক, ত্যাগ করতে হবে কিসের জন্য?

হিন্দুসমাজের নেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিধান অগ্রাহ্য করে রানী অখ্যাত বালক রামকৃষ্ণের কথা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেন। কী অপরিসীম বিবেকবুদ্ধি ও মানসিক বল নিয়ে রানী সংসারে এসেছিলেন এ-ঘটনায় আমরা তার পরিচয় পাই। অনেককাল পরের আরেকটি ঘটনায়ও আমরা রানীর চরিত্রের অন্য একটি উজ্জ্বল দিকের পরিচয় পাই। রামকৃষ্ণদেব তখন মাকালীর পূজক। রানী তখন মাঝে মাঝে মন্দিরে এসে রামকৃষ্ণদেবের মুখে গান শুনতেন। একদিন রানী ঠাকুরবাড়িতে এসে গঙ্গাস্নান করে কালীঘরে গেলেন। তখন মায়ের পুজোও শেষ হয়ে গেছে। দেবীকে প্রণাম করে তিনি ভিতরে দেবীমূর্তির কাছে আসনে বসে পুজো আহ্নিক করতে বসলেন। তার আগে রামকৃষ্ণদেবকে তিনি মা-র নাম গাইবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবও কাছে বসে ভাবে বিভোর হয়ে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদের পদাবলী গাইতে লাগলেন। পুজো জপ করতে করতে রানী ভজন শুনতে লাগলেন। এভাবে কিছুসময় কেটে যাবার পর হঠাৎ গায়কের গান থেমে গেল। তিনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, কেবল ঐ ভাবনা, এখানেও ঐ চিন্তা? বলেই রানীর গালে এক চড়। রানীর পরিচারিকারা সকলে মিলে হৈ-চৈ করে উঠল, দারোয়ান ব্যস্ত হয়ে পূজারিকে ধরতে ছুটল, মন্দিরের ভিতর গোলমাল শুনে বাহিরের কর্মচারিরাও ছুটে এল। কিন্তু ঐ গোলমালের কারণ যাঁরা, তাঁরা উভয়েই এখন স্থির গম্ভীর!

একটি মোকদ্দমার ফলাফলের জন্য রানী বিশেষ চিন্তিত ছিলেন তাই অন্যমনস্ক হয়ে মোকদ্দমার কথাই ভাবছিলেন। নিজের অপরাধ রানী বুঝতে পারলেন। রামকৃষ্ণদেবের কাছে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন। নিজের পদগৌরব ক্ষণেকের জন্যও তাঁর মনে উদয় হলো না, আশ্রিত পরিচারিকা ও কর্মচারিদের সামনে এ অপমানকে তিনি দেবতার আশিস-রূপেই মাথা পেতে নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা দেবার অলৌকিক ক্ষমতা দেখে যেমন অবাক হতে হয়, শিক্ষা-গ্রহণ করবার শক্তির বিষয় বিচার করলে রানীকেও শতমুখে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

এ-ঘটনার বর্ণনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-এ একটু অন্যরকম দেখতে পাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়িতে এসেছে। কালীঘরে এল। পূজার সময় আসত আর দুই একটা গান গাইতে বলত। গান গাচ্ছি, দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি দুই চাপড়। তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাত জোড় করে রইল।[৩]

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগে একদিন অসাবধানতাবশত হঠাৎ পড়ে গিয়ে রাসমণি বড় আঘাত পান। তাইতেই গায়ে ব্যথা জ্বর প্রভৃতি হয়ে শেষকালে গ্রহণী-রোগ দেখা দেয়। অল্পসময়ের মধ্যে অসুখটি সাঙ্ঘাতিক ভাব ধারণ

করে। তাঁর জীবননাট্যে যবনিকাপাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে একথা বুঝতে রানীর বাকি রইল না।

মন্দিরের কাজ যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তারজন্য একটা স্থায়ী আয়ের নিতান্তই দরকার, একথা রানী প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। এজন্য মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় তিনমাস পর তিনি ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট থেকে দিনাজপুরের শালবাড়ি পরগণার তিন লাট জমিদারি দু-লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকায় কিনেছিলেন। কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প থাকলেও এতদিন তিনি ঐ সম্পত্তি দানপত্র করে দেবোত্তর পরিণত করতে পারেননি। আসন্নকাল উপস্থিত দেখে তিনি তা সমাধা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দানপত্র সম্পাদিত হলো। রানীর অন্যান্য মেয়েরা সকলেই দানপত্রে স্বাক্ষর করলেন, কিন্তু মুমূর্ষু জননীর কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে প্রথম কন্যা পদ্মমণি কিছুতেই তাতে সই করলেন না। এজন্য শেষযাত্রার প্রাক্কালে রানী মর্মান্তিক যাতনা ভোগ করেছিলেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি রানী দেবোত্তর দানপত্রে সই করেন এবং তার পরদিনই রাত্রিবেলা নশ্বরদেহ ত্যাগ করে অমরালয়ে যাত্রা করেন।

রানীর প্রকৃতির সঙ্গে আকৃতিরও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁর উজ্জ্বল বিশাল দুটি চোখে ও মুখে এমনই একটি দৃঢ়তার ছাপ ছিল, যা দেখলেই মানুষের মনে একটি শ্রদ্ধানত ভাব স্বতই জেগে উঠত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব *বলতেন রানী ছিলেন মা-র আটজন নায়িকার একজন। রানী রাসমণির জীবন* কত মহৎ, কত উজ্জ্বল, কত গৌরবময় ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের এই একটি কথাতেই তা আমরা বুঝতে পারি।

যেসময় রাসমণি জন্মগ্রহণ করেন তখন বাংলার সামাজিক বা রাষ্ট্রিক অবস্থা তত ভাল ছিল না, বরং সবদিক থেকেই সেসময় দেশে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছিল। তবুও রাসমণির মতো নারীকে বাংলা প্রসব করেছে, একথা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য বোধ হয়। রানী রাসমণির জন্মে সারা বাংলার নারীজাতি ধন্য। তিনি সমাজের সাধারণ স্তরে দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও স্বীয় কৃতিত্বে গৌরবের শীর্ষস্থানে উঠেছিলেন। যে মহীয়সী নারীর ওপর মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলানাট্যের দৃশ্যপট নির্মাণের ভার পড়েছিল, মানবজাতির গৌরবের ইতিহাসে চিরকাল তিনি অমরত্ব লাভ করবেন।* □

পাদটীকা

১ এ ঘটনাটি সম্বন্ধে অন্যরকম কথাও শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, কাশী যাত্রা করে রানী কলকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে গিয়ে নৌকায় রাত্রিবাস করেন এবং সেখানেই ঐরকম স্বপ্ন দেখেন ও আদেশ পান।

২ কেউ কেউ বলেন, রামকৃষ্ণদেব যখন মাকালীর পুজো করতেন তখন এই ঘটনাটি হয়েছিল। মথুরবাবু রানীকে মূর্তিটি দেখিয়ে বলেছিলেন, যেমন উপযুক্ত পূজক পেয়েছি মা, দেবী শিগগিরই জাগ্রতা হয়ে উঠবেন।

৩ কথামৃত ২, স ৭, পৃঃ ৩-৪। লীলাপ্রসঙ্গ-এর ও কথামৃত-এর বর্ণনায় মোকদ্দমা ও ফুলবাছার ব্যাপারের তফাত হলেও রানীর অন্যমনস্ক হওয়াতে কোন মতবিরোধ নেই এবং সেটিই বক্তব্য বিষয়ের মূল লক্ষ্য।

* ৪১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

নিবেদিতা

মোহিতলাল মজুমদার

"মৎপ্রাণাঃ শ্রীগুরুপ্রাণাঃ মদ্দেবো গুরুমন্দিরম্।
পূর্ণমন্তর্বহির্যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নাম দিয়া যে একটি অপূর্ব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার ঐ নামটাও যেমন, তেমনই তাহার অন্তর্গত ভাবটি আমাদের মধ্যে একটা সাহিত্যিক প্রবাদের মতো হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের ক্ষেত্রেও যেমন, জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি, জাতির ইতিহাসে এমন অনেক 'উপেক্ষিতা' আছেন, যাঁহাদের নাম বিখ্যাতগণের আড়ালে পড়িয়া আমাদের স্মৃতিতে তেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। গত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার, তথা হিন্দু ভারতের ইতিহাস যখন চিন্তা করি, তখন এমনই একজনের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ হয়, আবার ভুলিয়া যাই; আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সকলই স্মরণ করি, কীর্তন করি—তাঁহাদের স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ ও স্মৃতি-কথা রচনা করিয়া এই নিত্যবিস্মৃতিপরায়ণ জাতির স্মৃতিভ্রংশ নিবারণ করি; কিন্তু তাঁহাদেরই সঙ্গে, বিশেষ করিয়া স্বামীজীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হইয়া আছে যে একটি অনন্যসাধারণ নারীচরিত্রের মহিমা তাহাকে তেমন করিয়া আর স্মরণ করি না; এমনকি, যে-মন্দিরের নবনির্মিত চত্বরের একপ্রান্তে তিনি তাঁহার অন্তরের পূজা-প্রদীপ জ্বালাইয়া, নিজের সমগ্র দেহমন লুটাইয়া দুই করপুটে সেবার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিলেন, মনে হয়, সেখানেও তাঁহার নামটি তেমন করিয়া কেহ স্মরণ করে না; এযুগের বাঙালী-সন্তানকে সেই নিবেদিতার অপূর্ব আত্মনিবেদনের কথা ভাল করিয়া স্মরণ করাইবার জন্য কোনরূপ স্মৃতিপূজার আয়োজন হয় না, হইলেও বাহিরে তাহার তেমন প্রচার নাই।

জানি, তাহাতে সেই কল্যাণময়ী তপস্বিনীর—সেই সত্য-শিব-সুন্দর-নন্দিনীর জন্য কিছুমাত্র আক্ষেপের কারণ নাই, যে নিজেই 'নিবেদিতা' তাহাকে নিবেদন করিবার তো কিছুই নাই। আমাদের মতো যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিল, তাঁহার সেই পুণ্যজীবনের, সেই অতুল আত্মোৎসর্গের চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়াছিল—এই জাতির দুর্গতিমোচনের জন্য তাঁহার সেই সরব আকুলতা ও নীরব কর্মযোগের কথা জানিত, তাহাদের হৃদয়—দুর্বল বলিয়াই ক্ষুব্ধ হয়, মনে হয়, এত স্মৃতি-উৎসব—বারো মাসে চুরাশি পার্বণের মতো ছোট-বড়-মাঝারি কতজনের উদ্দেশে কত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে—কই, ভগিনী নিবেদিতাকে তাহার কোনটাতেই তেমন করিয়া আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি না! এ্যানি বেসান্তকে আমরা স্মরণ করি, নিবেদিতাকে করি না। সেকালের এক কবি লিখিয়াছিলেন—

"হৈমবতী উমার অর্ঘ্য কাড়বে ওলাই-চণ্ডী কি হায়?
বেসাত্ত নেবে সে নৈবেদ্য অর্পিত যা নিবেদিতায়!"

—ইহার কারণ কি? কারণ কি এই নয় যে, আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়াছে, আমরা যে-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, সে-মন্ত্রই অন্যরূপ; তাহাতে সেই হৃদয়ের সাড়ার প্রয়োজন আর নাই, যাহাতে খাঁটি মনুষ্যধর্মের প্রেরণা আছে, যাহাতে প্রাণের সত্যই আর সকল সত্যের উপরে।

নিবেদিতার পরিচয় আশা করি দিতে হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও তাঁহার অলৌকিক কীর্তিকথা যাঁহারাই অবগত আছেন, তাঁহারা তাঁহার এই আত্মসৃষ্ট কন্যাটির কথাও না জানিয়া পারিবেন না। বিবেকানন্দের চরিতকার মহামনীষী মঁসিয়ে রোঁলা বলিয়াছেন—

"The future will always unite her name of initiation, Sister Nivedita, to that of her beloved Master... as St. Clara to that of St. Francis."

গুরুর সহিত এই শিষ্যার যে সম্পর্ক—অধ্যাত্মজীবনের সেই এক অভিনব আত্মীয়তার তত্ত্ব পরে কিছু আলোচনা করিব, তেমন আত্মনিবেদন-কাহিনী আমাদের কোন ভক্তমাল-গ্রন্থে কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি কেমন করিয়া এই গুরুলাভ করিয়াছিলেন, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিজেই তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে (The Master as I saw him) লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় গুরুবাদের একটা নূতন ভাষ্যও তাঁহার ঐ গুরু-পরিচয়-গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। সে যেন একটি শাণিত খড়্গ—যেমন দিব্যপ্রভাসমুজ্জ্বল, তেমনই নির্মম; সেই খড়্গের নিচে নিবেদিতা তাঁহার আত্মাভিমানী দেহটাকে—তাঁহার যতকিছু পূর্বসংস্কার এবং প্রাণ ও মনের যতকিছু কামনাকে—বলি-স্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন। গুরু তাঁহাকে ভারতের হিতার্থে উৎসর্গ করিবার কালে বলিয়াছিলেন: "যদি আমার নিজের কোন অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক; আর যদি ইহার মূলে সেই পরমা-শক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক।"

ইহার পর নিবেদিতার যে-জীবন আরম্ভ হইল, তাহা এমনিই সেবা ও আত্মদানমূলক তপস্যার জীবন যে, বাহিরের শোভাযাত্রায়, ধ্বজ-পতাকায় তাহার জয়-ঘোষণা হয় নাই। গুরুর নিকট হইতে যে-অগ্নি তিনি আপন হৃদয়পাত্রে চয়ন করিয়াছিলেন, তাহার তেজ তিনি সযত্নে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন—সেই অপরিমেয় শক্তিকে সংবরণ করিয়া, তাহার পাবক শিখায় আপনাকেই নিরন্তর দগ্ধোজ্জ্বল করিয়া, তিনি কেবল তাহার আলোকটুকুই বিকিরণ করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার কর্মযোগ, গুরুনির্ধারিত তাঁহার সেই ব্রত ও তাহার উদ্‌যাপন-পদ্ধতির কথা এখানে বলিব না, আমি তাহার উদ্দেশ্য ও ফলাফল বিচারের অধিকারী নই। বাংলার মাটিতে হলকর্ষণের পর, যখন নবজীবনের বীজবপন ও বারিসেচন আরম্ভ হইয়াছে, তখন দিকে দিকে দ্রুত অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল; তাহারই মধ্যে এই আরেকটি বীজ যেন সকলের দূরে, এক কোণে—নিজেকেই ফলে-পুষ্পে বিকশিত করিবার জন্য নয়—অপরগুলির সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য, এমন ফসলের আকাঙ্ক্ষা

করিয়াছিল, যাহা বাজার পর্যন্ত পৌঁছায় না; সে কেবল সার হইবার ফসল। বাংলার মাটিতে তাঁহা মিলাইয়া গিয়াছে; সেই কালের অব্যবহিত পরে আমরা বাংলার উদ্যানে ফলফুলের যে আকস্মিক বাসন্তীশোভা দেখিয়াছিলাম, ভগিনী নিবেদিতার এই নীরব আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকাতলে কোন্ রসধারা গোপনে সঞ্চারিত করিয়াছিল—তাহা নির্ণয় করিবে কে?

এমন কত মহাজীবনের মহান আত্মোৎসর্গ যুগে যুগে সকল জাতির সাধনাকে সংবর্ধিত ও সঞ্জীবিত করিয়াছে। ইতিহাস তাহার সন্ধান রাখে না, সন্ধান চায়ও না; তার কারণ, ইতিহাসের লক্ষ্যই অন্যরূপ। যাহারা ইতিহাসকে গড়িয়া তোলে তাহাদের পরিচয় করা সহজ; যাহারা সেই গড়ার উপাদান হইয়া বা সেই গঠন-শিল্পীর যন্ত্র হইয়া, শিল্পীর কীর্তিকে সম্ভব করিয়া তোলে, তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। যে গড়ে তাহার একরূপ আত্মাভিমান যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই যাহাকে সেই গঠনের উপাদান, উপকরণ, বা যন্ত্র হইতে হয়, তাহার কিছুমাত্র অভিমান না থাকাই আবশ্যক। স্বামী বিবেকানন্দ সেই গঠন-শিল্পী; ভগিনী নিবেদিতা আপনাকে তাঁহার হাতে যন্ত্রস্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন—একজনকে যেমন দুর্ধর্ষ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনিষ্ঠা রক্ষা করিতে হইয়াছিল, অপরকে তেমনি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলোপ করিতে হইয়াছিল।

সেই আত্মবিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। গুরুর নিকটে শিষ্যের আত্মনিবেদন একটা অসামান্য কিছু তো নয়ই, বরং অতিশয় সাধারণ। ভক্তির অর্থ তাহাই। কিন্তু সাধারণভাবে, যে-সকল কারণে, এইরূপ আত্মবিলোপ দুঃসাধ্য নয়—নিবেদিতার পক্ষে তাহার বিপরীতগুলিই প্রবলরূপে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার জাতি ও দেশ, ধর্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন এবং বয়োধর্মে এমনই দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য হইয়াছিল যে, শুধু মনে বা ভাব-জীবনে নয়—একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়া প্রায় অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হইবে। ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য যে আচার-অনুষ্ঠানগত পরিবর্তন মানুষের জীবনে হইয়া থাকে, তাহার শতসহস্র দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু একই দেহে জন্মান্তর-গ্রহণ যে সম্ভব তাহা ভগিনী নিবেদিতাকে না দেখিলে কেহ কখনো বিশ্বাস করিত না। এই একটা দিক দিয়াও তাঁহার জীবন অনন্যসাধারণ—এমন বোধহয়, আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন জাতিটাই বদলাইয়া গিয়াছে, তাঁহার রক্তেও যেন বাঙালী-হিন্দুর জন্মজন্মান্তরগত সংস্কৃতির অবচেতন ভাবধারা পূর্ণ প্রবাহিত হইয়াছে! ভারতের সেবায় এই শিষ্যাকে উৎসর্গীকৃত করিবার সময়ে গুরু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ঃ "তোমাকে তোমার পূর্বজীবন, পূর্বসংস্কার, পূর্ব অভ্যাসের স্মৃতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে হইবে, দেহের ও প্রাণের প্রতি তন্তুতে অনুভব করিতে হইবে যে, তুমি এই দেশের সন্তান, এই জাতিই তোমার জাতি।" গুরুর ঐ বাক্য এমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সম্ভব হইয়াছিল কেমন করিয়া? এ কোন্ যাদুশক্তির খেলা! নিবেদিতার বয়স তখন আঠাশ বৎসর—তিনি ইউরোপীয় ভাব-চিন্তা, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব উত্তমরূপে অধিগত করিয়াছেন—আশ্চর্য ধীশক্তি ছিল তাঁহার; সেই ধীশক্তি, চরিত্রবল ও স্বাধীন-চিন্তা এবং অধ্যয়নশীলতার বলে তিনি তৎপূর্বেই একটা তত্ত্ব ও তাহার সাধনপন্থা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব জন্মান্তর-গ্রহণের

রহস্যভেদ করিতে হইলে প্রথমেই তাঁহার গুরুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। সে কথাও পরে।

এই দেশ, এই জাতি ও এই সমাজে নিজেকে এমন করিয়া বিলাইয়া দেওয়া তো কেবল ইচ্ছা ও সঙ্কল্পমাত্রেই—সে যত দৃঢ় হউক—একতরফা সম্পন্ন হইতে পারে না। বাঙালী হিন্দুসমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, তিনি তাহার উঠানে একপাশে একটা স্থান করিয়া লইয়াছিলেন; তজ্জন্য নিজেকে কিছুমাত্র পর বা পৃথক মনে করিতেন না; সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ না করিলেও তিনি তাহাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে অধিক কিছু না বলিয়া আমি এখানে কেবল একটি ঘটনা—সহস্রের একটি উল্লেখ করিব। বাগবাজারে তাঁহার যে স্কুলটি ছিল, তাহাতে বালিকা, কিশোরী, কুমারী ও বিধবা—নানাবর্ণের কন্যারা শিক্ষালাভ করিত। ভগিনী তাহাদিগকে সেকালের প্রথানুযায়ী একখানি ঢাকা-গাড়িতে করিয়া নানা দর্শনীয় স্থানে শিক্ষার্থে লইয়া যাইতেন। একবার তিনি কয়েকজনকে কলিকাতার যাদুঘর দেখাইতে লইয়া যান। প্রকাণ্ড বাড়ির সর্বত্র ঘুরিয়া দেখিবার পর কন্যাগুলি একটু শ্রান্ত ও পরে পিপাসার্ত হওয়ায়, তিনি তাহাদিগকে জলের কলটির নিকটে লইয়া গিয়া নিজের বসন-মধ্য হইতে একটি গেলাস বাহির করিলেন—গেলাসটি তিনি যাত্রাকালেই সকলের অগোচরে সঙ্গে লইয়াছিলেন। এক্ষণে গেলাসটি ধুইয়া স্বহস্তে জলপূর্ণ করিয়া মেয়েদের ডাকিয়া পান করিতে বলিলেন। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কয়েকটি বয়স্থা কন্যাও ছিল—তাহারা ঐ জল গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিতেছিল; তখন একজন—বোধহয়, ততখানি জাত্যাভিমানের কারণ তাহার ছিল না—অগ্রসর হইয়া সেই গেলাস তাঁহার হাত হইতে লইয়া, অসঙ্কোচে সেই জলপান করিল। ভগিনী নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত হইতে গেলাসটি লইয়া নিজে ধৌত করিয়া, শূন্য গেলাসটি মাটিতে রাখিয়া দিলেন এবং প্রত্যেককে পরপর আপন হাতে তাহা ভরিয়া পান করিতে বলিলেন। মুখে এতটুকু ব্যথার বা অসন্তোষের চিহ্নমাত্র নাই; সে তেমনই স্নেহোদ্ভাসিত, তেমনই প্রসন্ন ও প্রীতিপূর্ণ। এই জাতি ও এ সমাজের সেবা ও কল্যাণ-কামনায় ভগিনী নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ যে কিরূপ ছিল, তাহা উপরের ঐ একটি কাহিনী হইতে যিনি বুঝিয়া লইতে না পারিবেন, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য এপ্রসঙ্গ আরো দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই।

এইবার আমি ভগিনী নিবেদিতার কিছু পরিচয় সেকালের সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করিব। তাঁহার উদ্দেশে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"প্রসূতি না হয়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী,
তেমনি তোমারে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি—
বিদেশিনী নিবেদিতা!..."

ঐ একটি উপমা ব্যতীত আর কোন যথার্থ উপমা কবির মনেও উদয় হয় নাই। নিবেদিতার মৃত্যুসংবাদে সত্যেন্দ্রনাথ এই কবিতাটি সদ্য সদ্য রচনা করিয়াছিলেন। দার্জিলিঙে হিমালয়ের কোলে অতিশয় অকালে তিনি দেহত্যাগ করেন, তাই কবিতার এই শেষ চারিটি পংক্তিও সত্যভাষণে যথার্থ হইয়াছে—

"এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়,
চলে গেলে অল্প আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়
দেহ রাখি শৈলমূলে—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী।
ওগো দেবতার-দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী।"

এইবার নিবেদিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে একটি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিব। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে কোন কোন সভায় যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি। পরে এই প্রবন্ধে, নিবেদিতার সহিত তাঁহার সেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তাঁহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধার কারণ বিশেষরূপেই অবগত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনপ্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব ইউরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব—কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।"

"বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন 'our people', তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমনকি, জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।"

"কত লোকের কাছ হইতে তিনি কত নীচতা, বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্য লোকের অসঙ্গত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন; কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল, পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এইসকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার 'পীপল্'দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা কিছু ভাল তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন, তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধাদৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন।"

"শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে-

তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন, অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে-বাড়িতে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে-বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিনযাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এইসমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?''

এইবার আমরা এই অপূর্ব আত্মোৎসর্গের—এই পরিপূর্ণ আত্মবিলোপের রহস্য সন্ধান করিব। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে ভগিনী নিবেদিতার সেই আত্মবিলোপ-কাহিনী যেমন বর্ণিত হইয়াছে, তেমন করিয়া বর্ণনা আর কেহ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাতে তিনি ভগিনীর প্রতি যে-শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধা একান্ত তাঁহারই প্রতি; রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করিয়া ভগিনী নিবেদিতার অর্চনা করিয়াছেন। এই অর্চনায় একটা ফাঁক আছে, রবীন্দ্রনাথ ইহাতে নিবেদিতার গুরুকে একবারও স্মরণ করেন নাই। তাহার কারণ বোধহয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ গুরুবাদকেই চিরজীবন অস্বীকার করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, নিবেদিতার জীবনে ঐ গুরুবাদ কোন্ অর্থে সত্য—গুরুবাদের তত্ত্বটাই ভ্রান্ত কিনা, সে-বিচার নিষ্প্রয়োজন; কারণ, নিবেদিতার ঐ-নামটাও যেমন গুরুদত্ত, তেমনই তাঁহার সেই সমগ্র নিবেদিতা-জীবনই নিরবচ্ছিন্ন গুরু-মন্ত্রের সাধনা; তাঁহার সেই আত্মবিলোপও—গুরুতেই আত্মবিলোপ। ইহার প্রমাণ নিতান্তই অনাবশ্যক। তাঁহার ভিতরে যে-সত্য ছিল, যে অসামান্য ত্যাগ ও প্রেমের শক্তি ছিল—যাহা রবীন্দ্রনাথকেও বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছে, সেই শক্তি এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে তাঁহার গুরুই পারিয়াছিলেন, গুরুবাদের যদি কোন অর্থ থাকে তবে তাহা ইহাই। ভিতরে সেই বস্তু থাকা চাই; কিন্তু এক-একটি ক্ষণে, মানুষের জীবনের এক-একটি দর্শনলাভ হয়; বাহিরে ব্যক্তির রূপেও হয়, আবার অন্তরের একটা দিব্য উপলব্ধির (revelation) মতোও হয়, যাহাতে মানুষ যেন দ্বিজত্বলাভ করে। যাহার প্রকৃতি এবং প্রয়োজন যেমন, তাহার সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু বাহিরের কোন অসাধারণ ব্যক্তি-পুরুষের সংস্পর্শেই অধিকাংশ ভাগ্যবান নর বা নারীর জীবনে আশ্চর্য রূপান্তর হইয়াছে তাহা আমরা জানি। আমাদের শাস্ত্রেও তাই শুধুই 'মনুষ্যত্ব' অর্থাৎ মনুষ্য-জন্ম এবং 'মুমুক্ষুত্ব' অর্থাৎ পরমের পিপাসাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, তাহার সঙ্গে 'মহাপুরুষ-সংশ্রয়' অত্যাবশ্যক বলা হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতার জীবনকাহিনী যিনি সম্পূর্ণ জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনি স্বামীজীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের পূর্ব ও পরবর্তী জীবন তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন—তাঁহার কেবল ঐ মহাপুরুষের সংশ্রয়টাই যেন বাকি ছিল,

যেমন তাহা ঘটিল, অমনি তাহার পূর্ববর্তী জীবনের খোলসটি বিদীর্ণ করিয়া আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পাইল। সেই লগ্নের সেই অনির্বচনীয় আনন্দের প্লাবন-বেগ তাঁহাকে কিরূপ বিহ্বল করিয়াছিল—তাহাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। যে-মুহূর্তে সর্বত্যাগ—সেই মুহূর্তেই সর্বপ্রাপ্তি! সে প্রাপ্তি যে কেমন, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি—সেই প্রাপ্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতেই ভগিনীর সেই অফুরন্ত দান। তেমন করিয়া না পাইলে, এমন করিয়া দান করিতে কেহ পারে না। কিন্তু তিনি পাইয়াছিলেন কোথায়, কাহার নিকটে?

সেকথা তিনিও বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। স্বামীজীর নিকটে তিনি কি পাইয়াছিলেন এবং স্বামীজী তাঁহার কি ছিলেন, তাহাই বলিবার জন্য তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; সেই গ্রন্থ (The Master as I saw him) জগৎ-সাহিত্যে মানবাত্মার এক অপূর্ব আত্মকাহিনী হিসাবে অমর হইয়া থাকিবে। এই কাহিনীতে, এবং অন্যত্র, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে একটি আত্মিক সম্পর্ক ফুটিয়া উঠিতে দেখি—আমাদের জ্ঞানে তাহার কোন নাম-নির্দেশ করিতে পারি না। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক আমাদের দেশে নূতন নয়; সেই সম্পর্কের যত প্রকারভেদ আছে—সাধন-মার্গ, অধিকার এবং শিষ্যের ব্যক্তিগত বিশিষ্ট চরিত্র অনুসারে, তাহাতে যে বৈচিত্র্য ঘটে তাহাও কিছু কিছু বুঝিতে পারি; কিন্তু স্বামীজীর সহিত ভগিনী নিবেদিতার ঐ সম্পর্ক এমনই অপূর্ব যে, তাহা চিন্তা করিলে দেহধারী আত্মার অনন্তলীলা একটা নূতন রসরূপে আমাদের হৃদয়-গোচর হয়। একদিকে স্বামীজীর সেই দৃপ্ত পৌরুষ—যে-পৌরুষ সকল মমতা, সকল দুর্বলতাকে নিমেষে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, আরেক দিকে তেমনই তেজস্বিনী নারী—সে তেজও যজ্ঞবেদির হোমানলশিখার মতো। স্বামী বিবেকানন্দের সেই প্রজ্বলন্ত পৌরুষই যে তেজস্বিনী নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই—ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রে এই তেজ যে কি পরিমাণ ছিল, তাহা অন্তরঙ্গগণ সকলেই জানিতেন। রবীন্দ্রনাথও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এমনও বলিয়াছেন যে, এই তেজ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি লিখিয়াছেন—

"...নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল এবং সে জোর যে কাহারো প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত।"

এই যে তেজ, চিত্তের এই দুর্দমনীয়তা—ইহাই ছিল তাঁহার জন্মগত, প্রকৃতিগত সম্পদ; ইহাই ছিল তাঁহার নিজ আত্মার মূলধন। গুরু বিবেকানন্দ তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির বলে, এই বস্তুটিকে তাঁহার মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং ইহা যে হোমাগ্নির মতই পবিত্র, তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই ইহা তো কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিবে না। যুবক নরেন্দ্রের মধ্যেও ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঠিক এই বস্তুই দেখিয়াছিলেন, এবং নরেন্দ্রও ঠিক সেই কারণে বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে নাই। অতএব গুরু ও শিষ্যের

প্রথম দর্শনে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল—উভয় ক্ষেত্রে তাহা প্রায় এক। শেষে নরেন্দ্র যেমন বলিয়াছিল—"আমাকে জয় করিয়াছিল তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) সেই অদ্ভুত প্রেম", ভগিনী নিবেদিতাও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সেই দুর্ধর্ষ বীর বৈদান্তিকের প্রেম যে কিরূপ ছিল তাহা আমি অন্যত্র সবিস্তারে বলিয়াছি ('বাংলার নবযুগ')—পর্বতের মতো অটল এবং পাষাণের মতো কঠিন সেই পুরুষের অন্তরে যে প্রেমের সুধানিস্যন্দিনী নিত্য প্রবাহিত ছিল তাহা সকলের বোধগম্য হইত না। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রেমের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন—তেমন করিয়া বোধহয় আর কেহ করে নাই; কারণ সে প্রেম এমনই যে, তাহাকে অনুভব করিতে হইলে, অগ্নিশিখায় দেহ সমর্পণ করিয়া তাহার জ্বালা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে হয়।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার মূলে যদি নারীপ্রকৃতিসুলভ কোন আকুতি মর্মান্তিকরূপে বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, গুরু বিবেকানন্দ তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন; নিবেদিতা নিজেরই পুণ্যবলে তাঁহার গুরুর সেই ব্যক্তিসম্পর্কহীন মহাপ্রেমের (যে প্রেমের আমরা ধারণাই করিতে পারি না) অপূর্ব রস আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন। আমরা জানি, স্বামীজীর পুরুষ-আত্মাপ্রকৃতির বশ্যতা আদৌ স্বীকার করে নাই; মায়াকে একেবারে উড়াইয়া না দিলেও তাহাকে জয় করিয়া, বশ করিয়া, তিনি সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাকেই কল্যাণী-মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে যে নারীপ্রকৃতি ছিল, তাহাকেও তিনি কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরম স্নেহে তাহাকে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন। সেই যে স্নেহ—ভগিনী নিবেদিতা তাহাতেই তাঁহার নারী-হৃদয়ের গভীরতম পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন।

মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন : "But her love was so deep that Nivedita does not seem to have kept any memory of the harshness from which she suffered to the point of the greatest dejection. She only kept the memory of his sweetness. Miss Macleod tells us, 'I said to Nivedita : "He was all energy." She replied : "He was all tenderness." But I replied : "I never felt it." "That was because it was not shown to you. For he was to each person according to the nature of that person and his way to the Divine." ' "

সর্বত্যাগিনী তপস্বিনী নারী গুরুর চরণমূলে কেবলমাত্র সেইটুকুর আশ্বাসে নিজের জীবনটাকে পুষ্পাঞ্জলির মতো নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি গুরুর সাক্ষাৎ সাহচর্য বা সঙ্গ খুব অল্পই পাইয়াছিলেন—তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের পর মাত্র চারি বৎসর স্বামীজী বাঁচিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একবার কয়মাসের জন্য অপর কয়েকজন গুরুভগিনীর সঙ্গে, কাশ্মীরভ্রমণ উপলক্ষে তিনি স্বামীজীর কিঞ্চিৎ নিকটে অবস্থান করিতে পাইয়াছিলেন। গুরুর নিকটে থাকিবার কোন সুযোগই ছিল না। প্রথম কিছুদিন স্বামীজী তাঁহার এই শিষ্যার প্রতি এমন অতিরিক্ত কঠোর ছিলেন যে, নিবেদিতার সে ছিল একরূপ অগ্নিপরীক্ষা; শুনা যায়, সেই কঠোরতায় তিনি প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন।

তারপর তিনি প্রাণে যে কি বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মতো মানুষের পক্ষে ধারণা করিতে যাওয়া স্পর্ধামাত্র, আমি চেষ্টা করিয়াছি, পারি নাই। আমার মনে হইয়াছে, সেই প্রেম মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, প্রকাশ করিতে গেলেই তাহাকে অশুচি করা হইবে। বোধহয়, তাহা জগতে একটিমাত্র কবির কাব্যকল্পনায় কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে; সেখানে দেহ ও মনের সমস্ত মলিনতামুক্ত হইয়া, অথচ মানব-হৃদয়ের আকুল রোদন-রবে বন্দিত হইয়া, সেই প্রেম অতি ঊর্ধ্বলোক হইতেও আমাদের চক্ষে দীপ্তি দান করে। বিয়াত্রিচের প্রতি মহাকবি দান্তের সেই যে প্রেম, তাহার নাম কি? তাহা ভগবদ্ভক্তির নিচে না উপরে, না একই পদবীর? সেখানে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় অন্যরূপ বটে, কিন্তু ঐরূপ প্রেমে কি নারী-পুরুষ ভেদ আছে? বৈষ্ণব বলিবেন, আছে, কারণ, প্রেমের আশ্রয়মাত্রেই নারীজাতীয়; তাহা হইলে দান্তেও সেখানে পুরুষ নহেন—নারী। আমি ভগিনী নিবেদিতার এই গুরুভক্তির মধ্যেই নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক মমতা কোন্ রূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহার একটা অক্ষম অসম্পূর্ণ পরিচয়ের চেষ্টা করিয়াছি; মানুষের ভাষায় তাহার অধিক অসম্ভব! আবার, আমার মতো মানুষের সাধ্য কি যে, তাঁহার মতো মহীয়সী নারীর তপোবীর্য-মহৎ সেই অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশলাভ করি। তথাপি সেই প্রেমের যে-দিকটি একান্ত ব্যক্তিগত, সে-দিকটি—অপর কেহ দূরে থাক—গুরুকেও তিনি দেখিতে দেন নাই, সে অধিকার গুরুরও ছিল না। তাঁহার সম্পর্কে তিনি শেষ পর্যন্ত কি কঠিন মৌন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার গ্রন্থে (The Master as I saw him) তিনি গুরুর শেষজীবনের শেষ দিনকয়টির কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সর্বশেষে স্বামীজীর তিরোধান-কথাও লিখিয়াছেন। কিন্তু সেইদিনের সেই ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ বিবৃতি ছাড়া এমন একটি কথাও তাহাতে নাই, যাহাতে তাঁহার নিজপ্রাণের এতটুকু হাহাকারও শুনিতে পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করার পর পাঠকমাত্রেই ঐখানে পৌঁছিয়া যতটুকু উদ্বেল না হইয়া পারে না এবং সেইজন্য যে সহানুভূতি আকাঙ্ক্ষা করে, লেখিকা তাহাতেও বিমুখ। আমারও রীতিমতো আশাভঙ্গ হইয়াছিল। তারপর যখন স্বামীজীর পৃথক জীবনকাহিনীতে তাঁহার সেই তিরোধানের বিস্তৃত বিবরণ-প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি আচরণের কথা অবগত হইলাম, তখন নিজের বিমূঢ়তাকেই ধিক্কার দিলাম। মৃত্যুর পরদিন বেলা ১টা-২টা পর্যন্ত স্বামীজীর শবদেহ একটি কক্ষে শয্যার উপরে সযত্নে শায়িত করিয়া রাখা হইয়াছিল; নিকটে ও দূরে তাঁহার সেই আকস্মিক দেহত্যাগের সংবাদ প্রেরিত হওয়ার এবং অন্ত্যেষ্টিকালে সকলের উপস্থিতির যথাসম্ভব সুযোগ দিবার জন্যই এইরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতাও সংবাদ পাইলেন, তাঁহার পক্ষে সে কেমন সংবাদ? কে তাহা বুঝিবে? বুঝাইবার প্রয়োজনই বা কি? পরে কেবল ইহাই দেখি যে, স্বামীজীর সেই শবদেহের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একখানি পাখা হাতে লইয়া তিনি তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। সে মূর্তি ধীর-স্থির, একেবারে নিস্তরঙ্গ; চক্ষে অশ্রু নাই, অধরোষ্ঠও একটু কাঁপিতেছে না। তিনি কেবল একমনে গুরুর দেহে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছেন। তখনো সেই সেবার অধিকারটি

ত্যাগ করিবেন না। বুদ্ধের পরম স্নেহাস্পদ ও নিত্যসহচর আনন্দের কথা মনে পড়িল। তিনিও তাঁহার গুরুর মহাপরিনির্বাণ সময়ে শোকাভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। বুঝিলাম, সেই পুরুষ অপেক্ষা এই নারীর প্রকৃতি আরো কঠিন, এ ধাতু অগ্নিতেও গলে না। তাঁহার অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা কল্পনা করিতে পারে কোন্ কবি, কোন্ সাধক, তাহা আমি জানি না।

উপরে আমি যে-প্রসঙ্গ একটু সবিস্তারে করিয়াছি, তাহার প্রয়োজন ছিল। ভগিনী নিবেদিতার এই যে আত্মোৎসর্গ—এই জাতিকে তিনি যে এমন চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাকে এমন করিয়া বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহার কারণ সন্ধান করিতে হইলে, কেবল ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র বা প্রকৃতির মধ্যেই তাহা পাওয়া যাইবে না। পদ্মফুল খুব বড় ফুলই বটে, তথাপি সূর্যের আলোক ব্যতিরেকে তাহা প্রস্ফুটিত হয় না। ভগিনী নিবেদিতা এই দেশকে যে এত ভালবাসিয়াছিলেন, এমন করিয়া তাঁহার জীবনটাকে তাহার সেবায় বিলাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আদৌ সেই গুরুরই প্রীত্যর্থে। তাঁহার গুরু যাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, তিনিও তাহাকে ভাল না বাসিবেন কেমন করিয়া? স্বামীজী যে-দৃষ্টিতে তাঁহার দেশকে দেখিয়াছিলেন, শিষ্যা নিবেদিতার চক্ষে সেই দৃষ্টি তিনি পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের হৃদয়খানিকেই এই শিষ্যার বক্ষগহ্বরে যেন বসাইয়া দিয়াছিলেন। নতুবা, এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিত না। গুরুর সহিত একাত্ম হইয়া, সেই গুরুর হৃদয়ে আপনার হৃদয় নিঃশেষে গলাইয়া মিলাইয়া দিয়া, তিনি যে-সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, তাহা একাধারে এই দেশের এবং তাঁহার গুরুর সেবা। এমনই হয়; জগতের ইতিহাসে নর-নারীর যত মহাবত্ত্ববদান-কাহিনী আছে—প্রেমই তাহার একমাত্র প্রেরণা। ঐ প্রেমের তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব—আর সকলই জগতের পক্ষে মিথ্যা। সেই প্রেমকে আমরা একটা সাধারণ বস্তুরূপেই জানি, কখনো বা সেই সাধারণ বস্তুর একটা বিশেষরূপ দেখিয়া চমৎকৃত হই; কিন্তু তাহার পরমরূপ—সেই অপর রূপ—আমাদের বুদ্ধি ও সংস্কারের অতীত; ভগবদ্‌প্রেমই বল, আর গুরুভক্তিই বল, কোন নামেই তাহাকে বিশেষিত করা যায় না। নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য—এসকল সম্পর্ক আমাদের সংস্কারের পোষকমাত্র; প্রেম একরূপ, তাহার দুইরূপ নাই। যাহার অন্তরে এই প্রেম নাই, সেই ব্যক্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমা-কীর্তন করে, তাই গুরুবাদ তাহার নিকটে আর কিছুই নয়—সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবমাননা। আসলে গুরু যে আর কিছু নয়—বৃহতের বেদিমূলে মানুষের ক্ষুদ্র অহংকে বলি দিবার যজ্ঞযূপ, প্রেমের অমৃতপানে আত্মাকে আনন্দ-স্বরূপে অধিষ্ঠিত করিবার পানপাত্র এবং তাহারই প্রয়োজনে অদ্বৈতের একরূপ দ্বৈতবিলাস ইহা যাঁহারা মানেন না, তাঁহারা মানবতার ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যতদিন মানুষ মানুষমাত্র, ততদিন ঐ হীনযান অপেক্ষা এই মহাযানই তাহার প্রশস্ততর পন্থা হইয়া থাকিবে এবং "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" নয়—ভগিনী নিবেদিতার ঐ জীবন এবং তাঁহার ঐ অপূর্ব সাধনাই মানুষকে সেই আশ্বাসে চিরদিন আশ্বস্ত করিবে।* □

---

* সুবর্ণজয়ন্তী, মাঘ ১৩৫৪

বিবেকানন্দ ও আমেরিকা

কালিদাস নাগ

অনেককাল পরে কলকাতার মার্কিন বন্ধুরা নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের স্বাধীনতা উৎসবে ৪ জুলাই। মনে পড়ে গেল ১৯০২ সালে ঐদিনই স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান বেলুড় গঙ্গাতীরে। কিন্তু স্বল্পায়ু জীবন ৩৯ বছরে শেষ হবার আগেই স্বামীজী যে সারা আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করে এসেছেন তাই নয়, মার্কিন শিষ্যশিষ্যাদেরও এই গঙ্গাতীরে টেনে এনেছেন—হয়তো মার্কিন ভক্ত নির্মিত বেলুড় মন্দিরই তার নীরব সাক্ষী। আমি শুধু সেই তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসের দু-একটা পাতা উলটে ৪ জুলাই—স্বামীজীকে অর্ঘ্য নিবেদন করছি।

১৮৮৫-৮৬ সাল সকলেরই মনে আছে জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের ১ম ও ২য় অধিবেশন বোম্বাই ও কলকাতায় হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বর্গ আরোহণের পর তাঁরই নির্দেশমত শিষ্য নরেন্দ্র অন্য গুরুভাইদের নিয়ে এলেন বরানগরে; সেখানে মঠ ছিল ১৮৮৬–৯২ (পরে সরে এল দক্ষিণেশ্বর উপকণ্ঠে আলমবাজারে ১৮৯৭ পর্যন্ত।) বাংলার কোলে গরিব সর্বহারা সন্ন্যাসীদের মঠ থেকে বিশ্বব্যাপী 'মিশন' কি করে হলো? সেকথা বাঙালীও ভুলতে বসেছে।

বরানগরে তপস্যার ফলে আমরা পেলাম 'ভারতপথিক' নরেনকে; হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করে তিনিও রবীন্দ্রনাথের মতো অনুভব করেন, "শক-হূনদল পাঠান মুঘল এক দেহে হলো লীন।" তাঁর বিশাল বক্ষে ঝাপটা দিল ভারতের জনসাধারণের বিরাট দুঃখবেদনা। তার জ্বালায় অস্থির হয়ে যেন পরিব্রাজক নরেন খুঁজেছিলেন বিত্তশীল বস্তুবাদী পাশ্চাত্য জগতের সাহচর্য। শুধু ইংরেজী ভাষাটা নয় ফরাসী ভাষাও আয়ত্ত করেছেন যখন গান্ধীর জন্মস্থান পোরবন্দরে নরেনের পরিচয় হলো দেওয়ান শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিতের সঙ্গে (তখন তিনি বেদের অনুবাদ করছেন)। সেই বেদজ্ঞ দেওয়ানই নরেনকে উপদেশ দেন পশ্চিমে যেতে। হয়তো তাঁর কাছেই নরেন খবর পান আমেরিকা ভারতকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে—Parliament of Religions... শিকাগো সভা থেকে। ১৮৯২ সালে ৪০০ বর্ষ পূর্তি কলম্বাস (Columbus) কর্তৃক আমেরিকা (তথা পশ্চিম ইন্ডিয়া) আবিষ্কারের।

কাথিয়াওয়াড় থেকে মধ্যভারতে এসে খাণ্ডোয়া শহরের ভক্তদের কাছে স্বামীজী প্রথম জানালেন তিনি প্রচারার্থে আমেরিকা যেতে ইচ্ছুক। তখনই বোম্বাইয়ে গুরুভাই কালীপ্রসাদ—অভেদানন্দের সঙ্গে দেখা—তিনিও সাক্ষী। কত রাজা মহারাজ পাথেয় অর্থাদি দিতে চেয়েছেন কিন্তু নেন নি। শেষে নিলেন রাজস্থানের খেতড়িরাজের দান ও তাঁর দেওয়া মর্যাদা 'বিবেকানন্দ' নাম।

সারদাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে ৩১ মে ১৮৯৩ সালে স্বামীজী ভাসলেন—বোম্বাই থেকে কলম্বো, সিঙ্গাপুর, হংকং, ক্যান্টন (Sun Yat Sen-ও স্বামীজীর যুগ-ভ্রাতা), ইওকোহামা, ওসাকা, কিয়োটো, টোকিও, ভ্যানকুভার পার হয়ে পরিশেষে শিকাগো। এইসব জায়গায় নিজেও যখন ঘুরেছি স্বামীজীকে মনে পড়েছে; আর অবাক হয়েছিলাম দেখে যে, ঠিক ৬০ বছর পরে (১৯৫১) সেই শিকাগো শহরেই আতিথ্যলাভ হলো—স্বামী বিশ্বানন্দের (শিকাগো বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ) তিনি তাঁর বেদান্ত-কেন্দ্র থেকে সপরিবারে আমাকে একটি বাড়িতে তুললেন; যে বাড়ি থেকে দেখা যায় বিবেকানন্দের ঘরের বারান্দা! তাঁর অনেক মূল্যবান চিঠিপত্র এই অঞ্চল থেকে লেখা (Dearborn Avenue); ১৯৫৩ বিবেকানন্দ প্রচারের হীরক-জয়ন্তী।

১৮৯৩ জুলাইয়ের মাঝামাঝি তিনি শিকাগো পৌঁছান অথচ প্রায় দুমাস পরে সেপ্টেম্বরে বসল ধর্মমহাসভা; কাল-সঙ্কটের চেয়ে ভয়াবহ হলো অর্থসঙ্কট, সেটা কিভাবে মিটল ও নারী-হৃদয়ের দাক্ষিণ্যের কথা তিনি বহু স্থানে লিখেছেন আমরাও জেনেছি। কিন্তু মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রায় ভুলতে বসেছে বাংলার এক সন্ন্যাসী এসে কেমন সহজে তাদের সম্পদ-বিপদের সাথী ও কল্যাণ-মিত্র বিবেকানন্দ হয়েছিলেন। আমেরিকার কাছে তিনি পেয়েছেন যতটুকু তার চেয়ে দিয়ে গেছেন অনেক—একথা হয়তো বিশ্বসঙ্কটে ধ্বংসোন্মুখী আমেরিকা একদিন বুঝতে চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যে স্বামী নিখিলানন্দ তাঁর নব প্রকাশিত গ্রন্থে গবেষণার প্রভূত সাহায্য করেছেন বলে তাঁর সাধুবাদ করি।

মার্কিন-আবর্তে পড়ে প্রথমটা বিবেকানন্দকেও হাবুডুবু খেতে হয়েছিল; কিন্তু কত শীঘ্র ও সহজে তিনি টাল সামলে নিয়েছিলেন, ভাবলে অবাক লাগে। তারাও প্রথমটা হয়তো ভুল বুঝে ক্রমশ তাঁকে হিতৈষী বন্ধু বলেই বরণ করেছিল; ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত একটানা আমেরিকায় সাধনার ইতিহাস উদ্ঘাটিত হলে সেটি পরিস্ফুট হবে। আমেরিকাও বিবেকানন্দ-বেদান্ত গ্রহণের জন্য অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত হচ্ছিল, সে ইতিহাস প্রায় বিস্মৃতপ্রায় বলে কিছু ইশারা রেখে যাব। ভারতের তরুণ দল আজ অতি সহজে Fullbright বৃত্তি পেয়ে উড়োজাহাজে আমেরিকা যাচ্ছে কিন্তু কাউকেই এ-সমস্যা নিয়ে গবেষণা করতে দেখছি না; বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা এগিয়ে আসুক। অধ্যক্ষ তেজসানন্দজীকে এই অনুরোধ জানিয়ে রাখি।

রামমোহন রায়ের বেদান্তসার বঙ্গানুবাদ বাংলাদেশে আলোচিত হয়েছে কিন্তু তার ইংরেজী অনুবাদ (১৮১৮) লন্ডন থেকে বোস্টন পৌঁছেছিল তাঁর প্রমাণ দিয়েছেন মনীষী এমার্সনের (Emerson) অভিভাবিকা; তিনি হার্ভার্ডের ছাত্র এমার্সনকে রামমোহনের বেদান্ত পড়তে আদেশ করেন। Brahma কবিতা ও Oversoul প্রবন্ধে এমার্সন তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। এমার্সনের কাছ থেকে বেদান্তের ছোঁয়াচ লাগল থোরিও (Thoreau) (সাত্ত্বিক নন-কোঅপারেশনের গান্ধী-গুরু) ও শেষে বিশ্বকবি হুইটম্যান (Whitman)কে (১৮১৯-১৮৯২)। ১৮৪০-এ প্রতিষ্ঠিত হলো অতীন্দ্রিয়বাদী ট্রানসেনডেন্টাল ক্লাব (Transcendental Club) ও ১৮৪২-এ আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি (American Oriental

Society) যাদের সাহায্যে মার্কিন-চিন্তাধারা ও পাণ্ডিত্য ভারতমুখী হয়েছিল। ১৮৮২-তেই দেখছি বাঙালী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম ও একেশ্বরবাদ প্রচার করে এলেন (তিনিও বিবেকানন্দের সঙ্গে শিকাগো সভায় ছিলেন), কর্নেল অলকট (Col. Olcott) ব্লাভাৎস্কি (Blavatsky) ও অ্যানি বেসান্ত (Anne Besant) প্রমুখ থিয়োসফিস্টগণও তাঁদের মতন করে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন। শেষে খাঁটি সিংহলী বৌদ্ধ ধর্মপালও শিকাগোতে এলেন এবং বিবেকানন্দকে দিয়ে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আমি অবাক হলাম বিবেকানন্দের নতুন চোখে আমেরিকা দেখায়; পরিশ্রমী গবেষক এবিষয়ে "Discovery of America" (1893-1902) লিখে যশস্বী হতে পারেন।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আমেরিকায় পদার্পণ করেন হুইটম্যানের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই; হুইটম্যানের বিশ্ববিশ্রুত কাব্য 'ঘাসের পাতা' (Leaves of Grass) ছাপা হয় ১৮৫৫-তে; তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে এবছর ক্যালিফোর্নিয়ায় মার্কিন ছাত্রদের সেদিন বলেছি যে কবির দেশে বাংলার বিবেকানন্দ হুইটম্যানের কবিতা ভাল করেই পড়েছিলেন; তাঁর "ভারতে চল!" (Passage to India) (১৮৬৯ গান্ধী জন্ম-বৎসরে রচিত) ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ইঙ্গিতে ভরা। পূর্ব ও পশ্চিমের উদ্বাহব্রত—উৎযাপিত হবে যদি আমেরিকার নিছক বস্তুতান্ত্রিক মন ছোটে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পানে, আর ভারতের বস্তুজ্ঞানশূন্যতা আমেরিকার লোকহিতবাদী পদার্থবিজ্ঞানে পরিণতি লাভ করে। অজ্ঞাতসারে শুধু কবি-প্রেরণার বলে—হুইটম্যান এই বাণীই প্রচার করেন; এবং বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাভরে তাঁকে "Sannayasi of America" (আমেরিকার সন্ন্যাসী) আখ্যা দেন—তখন হয়তো সারা ভারতে হুইটম্যান পাঠ করেছে কম লোকই। আমি পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত হুইটম্যানের জীবনদীপ যে-ঘরে নির্বাপিত হয় সেই ঘরে গেছি ও Camdon-এর বাড়ির গ্রন্থাগারটি দেখেছি—হঠাৎ চোখে পড়েছিল দার্শনিক এমার্সনের উপহার কবি হুইটম্যানকে দেওয়া ভগবদ্গীতা, তার পাতায় পাতায় হুইটম্যান নিজের হাতে নোট লিখেছেন! দেখে শরীর পুলকিত হয়েছিল—সে কথা হাওয়াই (Hawai) ও আমেরিকার বহু বক্তৃতায় বলেছি। বিবেকানন্দ ১৯ শতকের শেষ দশকে আমেরিকায় এসেছিলেন শুধু ভারতের মিশনেই নয়—এক বিশ্বসমন্বয়ের মিশন নিয়ে—সেকথা আজ আমেরিকা ভুলতে বসলেও ভারতবাসী যেন না ভোলে। দলিলসংযোগে একথা প্রমাণ করে যাওয়ার সামর্থ্য আমার নেই—শরীর ভেঙেছে, কিন্তু আরেকটু ইঙ্গিত এখানে দিয়ে যাই। মনীষী রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে যখন 'মহাত্মা গান্ধী' 'রামকৃষ্ণ' ও 'বিবেকানন্দ' শীর্ষক গ্রন্থত্রয়ীতে সহযোগিতা করি তখন তাঁর কাছেই শুনেছি ও দেখেছি যে, ঋষি টলস্টয়ও শেষ জীবনে ভারতীয় প্রেরণা খানিকটা বিবেকানন্দের ছোঁয়ায় পান (তার বহু প্রমাণ সোভিয়েত গবেষকরা প্রকাশ করবেন) একথা আমার Tolstoy and Gandhi গ্রন্থে দেখিয়েছি। ভূতুড়ে 'যোগী'দের কবল থেকে মার্কিনদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ দুই বছর আমেরিকায় কাজ করার পর পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' ইংরেজীতে প্রকাশ করেন (১৮৯৫); সেই ৩২ বছর বয়সের হিন্দু

যোগীর 'রাজযোগ' গ্রন্থখানি অশীতিপর ঋষি টলস্টয় পাঠ করে মুগ্ধ হন। পতঞ্জলির বিবেকানন্দভাষ্য রুশ ভাষায় কি আকার নেবে সেটি ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্র।

হাজার দ্বীপের (Thousand Island Park) বাগানে যে সাধন কুটির স্বামীজী গড়ে তোলেন ও সেখানে যেসব গভীর আলোচনা হতো তার বিবরণ স্বামী নিখিলানন্দ প্রকাশ করেছেন, তেমনি আটলান্টিক থেকে প্যাসিফিক—বিস্তৃত বিশাল আমেরিকার কত ছোট-বড় বৈঠকে বিবেকানন্দ ভারতীয় সাধন বিষয় আলোচনা করেছেন তার কিছু রক্ষা পেলেও অনেক হারিয়ে গেছে। পুনরুদ্ধার করতে সন্ধানীদের নামতে হবে। সারদানন্দ ও অভেদানন্দকে স্বামীজী যেদিন থেকে পশ্চিমে টেনেছেন তখন থেকে তাঁদের ও অন্যান্য কর্মীদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সব দলিল ভাল করে পড়লে তবেই এ-বিরাট প্রচার কাহিনী বোঝা যাবে। ১৮৯৬ সালে আমেরিকা ছেড়ে ইউরোপ হয়ে ভারতে ফেরবার আগে কেন দুটো বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড ও কলম্বিয়া—প্রাচ্যদর্শনের অধ্যাপকরূপে বিবেকানন্দকে বরণ করতে চেয়েছিল? যোশিয়া রয়েস (Josiah Royce) ও উইলিয়াম জেমসের (William James) মতো শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরা কেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন? মাদাম কালভের (Madame Calve) মতো উচ্চ কোটীর সুরশিল্পী বাঙালী ওস্তাদ বিবেকানন্দের মধ্যে কোন্ সুরের সন্ধান পান? নিরীশ্বরবাদী বাগ্মী রবার্ট ইঙ্গারসোল (Robert Ingersoll) কেন বিবেকানন্দমুখী হন? সর্বোপরি বিস্ময়কর এই যে, ব্রজেন্দ্র শীল-সতীর্থ নরেন্দ্র-বিবেকানন্দ কেন নিউইয়র্কে লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) ও অধ্যাপক হেলম্‌হোজ (Prof. Helmholtz)-এর মতো দুর্জয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে যান? আবার বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানে ওস্তাদ নিকোলা টেসলাকে (Nekola Tesla) সাংখ্যদর্শনের বস্তু ও শক্তি-তত্ত্ব কেন বুঝিয়ে ছিলেন? আবার সেই বিবেকানন্দই ১৯০০ সালে প্যারিস আন্তর্জাতিক সভায় আচার্য জগদীশচন্দ্রকে প্রথম জয়ধ্বনি করেন। এসব কথা অনেকে ভাবেননি যখন আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল তাঁর Hindu Positive Science পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। জগদীশ-জীবনীতেও উল্লেখ আছে কিনা জানিনা।

১৮৯৭ সালে দেশে ফিরে দুবছর কঠিন পরিশ্রম করে বেলুড়ে মঠ ও মিশন, মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'উদ্বোধন' পত্রিকা স্থাপন করে কোন্ সাধনার সঙ্কেত দিয়ে গেছেন ভারতপথিক বিবেকানন্দ? আবার আমেরিকা ছেড়ে ইউরোপে এসে জার্মান পণ্ডিত বৈদান্তিক ডয়সন (Deussen) ও বেদজ্ঞ ম্যাক্সমূলর (Max Muller)এর সংযোগ কেন করেন? নারদের ভক্তিসূত্র অনুবাদ করে ইংল্যান্ডে বিবেকানন্দ কি কাজ করে গেছেন? কেমন করে ভগিনী নিবেদিতাকে ভারতমাতার কোলে এনে দেন? এসবই নতুন ভাবে বুঝতে হবে। দ্বিতীয়বার আমেরিকা পরিক্রমার কাহিনী অলিখিত থাকায় নষ্টপ্রায়, উদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত। ক্যালিফোর্নিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে আজ বহু বেদান্ত-কেন্দ্র সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে! স্বামী প্রভবানন্দ টেনে এনেছেন ঈশারউড (Isherwood) জেরাল্ড হার্ড (Gerald Heard) ও অলডাস হাক্সলি (Aldous Huxley)-কে! তারও সূচনা করেন ক্যালিফোর্নিয়া

'বেদান্ত আশ্রম' প্রতিষ্ঠাতা বিবেকানন্দ। ক্যালিফোর্নিয়ার সন্নিকটে পৃথিবীর বৃহত্তম টেলিস্কোপ কাজ করছে বিরাট বিশ্বের মানচিত্র গড়তে; আবার তারই কাছে নেভাডার (Nevada) মরু প্রান্তরে চলছে গোপনে এই ছোট্ট পৃথিবী তথা মানবজাতির চরম মারণাস্ত্র নির্মাণ ঃ অ্যাটম্ ও হাইড্রোজেন বোমা! বড় বৈজ্ঞানিকরা আজকার আমেরিকায় সাহস করে প্রতিবাদ করছেন না তবু মৃত্যুশয্যা থেকে জার্মান মার্কিন মনীষী আইনস্টাইন তাঁর শেষ প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী ইংরেজ বৈজ্ঞানিক বারট্র্যান্ড রাসেলের (Bertrand Russel) হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের শেষ-স্বাক্ষর শুধু কাগজেই লেখা থাকবে, আর শক্তির তামসিকতায় উন্মত্ত জগৎ চরম যুদ্ধে আত্মঘাতী হবে? এর জবাব দিয়েছে—বিবেকানন্দ রবীন্দ্র-গান্ধী-নেহরুর ভারত। আবার ডাক পড়েছে ভারতের জীবরক্ষার ব্রতে অগ্রসর হবার। তাই যুগাচার্য বিবেকানন্দকে আজ বারবার মনে পড়েছে—'উদ্বোধন'-এর মারফতে সেটি জানিয়ে গেলাম। ১৮৯৮ সালে ভারতে বসে বিবেকানন্দ ৪ জুলাই-এর মার্কিন তথা বিশ্ব-স্বাধীনতা দিবস পালন ও কবিতা রচনা করেন। তার চার বছর পরেই ৪ জুলাই বেলুড়ে দীপ-নির্বাণ!

মাটির প্রদীপ নেভে আবার জ্বলে—যুগের গুরু সাধক রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর গানে এই আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন। মানব ইতিহাসের রক্ত-সন্ধ্যায় নেভা-দীপ আবার জ্বলবে না কি?* □

* ৫৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনায় বেদান্তরহস্য

স্বামী বুধানন্দ

মা-ই ধরে নিয়ে এলেন ন্যাংটাকে, ছেলেকে অদ্বৈত শেখাতে। এতে রয়েছে নব্য বেদান্তের এক রস-রহস্য কথা।

লীলারূপিণীর লীলা ও রূপই শেষ কথা নয়। আরো কথা আছে।

সংহারিণী রুধিরপ্রিয়া, নিজেকে বাঁচাবার জন্য নয়, দেবার জন্যে। তাই তাঁর সংহরণেই হয় সত্যের শেষ প্রাপ্তি।

আদিকাণ্ডে কত কাঁদলেন ঠাকুর। দিনরাত সে কী ডাকছেড়ে কান্না। মাটিতে আর্তিতে মুখ-ঘষা। মাতৃহীন দিনের যাওয়া আসার সে কী অসহ বেদনা। ক্রিয়াকাণ্ড ভুললেন। আচার-বিচার উঠে গেল, দেহ-জ্ঞান উড়ে গেল। হলেন পাগল, নিরেট পাগল। মা পাগল শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিশ্বজননী কি শ্রুতিহীনা? শুনতে কি পান না অধীর সন্তানের হৃদয়ের রক্তক্রন্দন? এত করা হলো; আর কি করা যায়? এ দুর্বহ অসহ জীবন ধিকি-ধিকি জ্বলা ব্যর্থতার ইন্ধনে বাঁচিয়ে রেখে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ পড়ল মন্দিরের কোণে ঝুলিয়ে রাখা খড়্গটির ওপর। কি হবে এই ব্যর্থ-জীবন রেখে? উন্মাদ উদ্যত হলেন নিজের গলা কেটে নিজেকে নিঃশেষে বলি দিতে বলিপ্রিয়াকে।

ঐ শেষ দেওয়ার চূর্ণ মুহূর্তে হলো পূর্ণ প্রকাশ। প্রপঞ্চের আসন ভেঙে লীলানাটক-সূত্রভেদনকারী হলেন আবির্ভূতা। জ্যোতিষ্মান অতল নিঃসীম চৈতন্যসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলল শ্রীরামকৃষ্ণকে। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন অনুভূতির সাগরে নিমজ্জিত।

সব না দিলে দেওয়াই হয় না। সব না দিলে সব কি করে পাওয়া যাবে?

নিজেকে নিঃশেষে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মা-কে পেলেন। আর সে কী পাওয়া! আর হারানোর উপায় রইল না। মা-ই যে সব হয়ে আছেন। কোথায় তাঁকে আর হারানো চলে?

আশ্চর্যের বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনে মা আবির্ভূতা হলেন—বিশ্বজোড়া উচ্ছলিত ভাস্বর চৈতন্যসমুদ্র। মা-মা ডাকটি তবু রাখা হয়েছিল।

এখন সব-হওয়া মায়ের ইঙ্গিতে ওঠেন, বসেন, চলেন, ফেরেন সব-পাওয়া শ্রীরামকৃষ্ণ। কি করবেন না করবেন নিজে কিছুই জানেন না, মা-ই সব জানেন।

চাঁদনিতে বসে আছেন বিস্ফারিত নয়ন আত্মারাম, জ্যোতিরুজ্জ্বল বয়ান। দেখে তোতা বললেনঃ "তোমায় উত্তম অধিকারী মনে হচ্ছে; বেদান্ত সাধন করবে?"

"কি করব না করব আমি কিছু জানিনে। আমার মা সব জানেন। তিনি যদি বলেন, করব।"—বললেন বালক শ্রীরামকৃষ্ণ।

"তবে যাও, জিজ্ঞেস করে এস তোমার মায়ের কাছে। বেশিদিন আমার থাকা হবে না এখানে।"

গেলেন মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করতে। জবাব নিয়ে ফিরে এলেন জগদম্বার কাছ থেকে ঃ "যাও শিখে নাও, তোমাকে শেখাবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আসা হয়েছে।"

মন্দিরের শিলারূপিণী 'মায়ের' কাছ থেকে এই যে আদেশ নিয়ে আসা হলো, এই সারল্যটুকু ব্রহ্মবিলাসী জ্ঞানী তোতা শুনলেন কৌতুকভরে। ভেবেছিলেন হয়তো, অজ্ঞানের সহজ বিশ্বাসে কী যেন এক মাধুর্য আছে!

জগদম্বাও নেপথ্যে একটু চটুল হাসলেন। ব্রহ্মের ঘরে উঠলেও মায়ার ঘরে, মায়ের ঘরে সেলামিটি দিতে হয়। না-দিলে হয় জ্ঞানাপরাধ। তোতা ভুলে গিয়েছিলেন এই কথাটি। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গমহিমায় জানতে পেরেছিলেন এ সত্য—মায়ের চরণে তখন প্রণত হয়ে সাশ্রুনয়নে করেছিলেন কৃপাভিক্ষা। তবে শেষ ছুটি মিলেছিল মহাপ্রস্থানের চলা-না-চলার চিহ্নবিহীন পথে। সে অন্য কথা।

মায়ের আদেশে অদ্বৈত-সাধনে লেগেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়েরই ধরে নিয়ে আসা গুরু, ন্যাংটা।

প্রাথমিক ক্রিয়াদি সমাপ্ত। ধ্যানে বসেছেন সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ। সব করা চলে। মনকে প্রপঞ্চ থেকে উঠিয়ে আনা কিছু নয়। কিন্তু শেষের বাধা হয়ে দাঁড়ালেন মা নিজেই।

বিভুঁই বিদেশে চলে যাবে ছেলে, নৈর্ব্যক্তিক অচিন দেশে। আর হয়তো আসবে না ফিরে কোনকালে মায়ের ঘরে, ডাকবে না মা-মা বলে। কোন্ মা পারে থাকতে দুয়ারে এসে না দাঁড়িয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের এত করে ডাকা-মা এত করে পাওয়া-মা, মা-ছাড়া-আর-কিছু-না-জানা এই ছেলের সাধন-সন্ধিক্ষণে বারবার এসে দাঁড়ান চৈতন্যের দোরগোড়ায়। মায়ের মন তো!

ন্যাংটা গেলেন ক্ষেপে। কাঁচের টুকরো শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রূ-মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়ে আদেশ করলেন ঃ "এই বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আনো।"

আবার চেষ্টা। আবার এসে লীলাময়ীর চৈতন্যের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো।

আর যেই দাঁড়ানো, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানাসিতে বলিপ্রিয়াকে দিলেন বলি। মাকে কেটে দুখানা করে ফেললেন। মায়ের হলো শেষ। হলো শেষ বাঁধন কাটা, শেষ না-জানার বাঁধন। সাধনায় হলো সিদ্ধি।

হু-হু করে মন উঠে গেল সীমাদুষ্ট ইন্দ্রিয়-ব্যাপার অবস্তু থেকে। লীন হলো অন্তবিহীন ব্রহ্মে—একেবারে নির্বিকল্প সমাধি।

নিজে নিঃশেষিত হয়ে মা-ই কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে উত্তীর্ণ করলেন ব্রহ্মের ঘরে।

আশ্চর্যের বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণের এই মায়ার পরপারে আচম্বিতে অবস্থিতিকেই স্তম্ভিত বিস্ময়ে তোতা স্বাগত করলেন চারটি অসামঞ্জস্য শব্দে—"য়হ্ ক্যা দেবী মায়া!"

ব্রহ্মের ঘর থেকে তোমাকে মা তাই ধরে এনেছিলেন; শেখাতেই নয় শুধু, শিখতেও। তার পালা হলো শুরু। যার যা দরকার। যার যা পেটে সয়। ন্যাংটার আমাশয়ের অর্থটি হচ্ছে সেলামি আদায়।

একদিন নিজেকে বলি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পেয়েছিলেন মা-কে। আর আজ মাকে বলি দিয়ে পেলেন ব্রহ্মকে।

শেষ হতে পারত শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে। কিন্তু হলো না। নতুন এক কিশলয় ফুটল জ্ঞানের মহাকাশে।

ছয়মাস ব্রহ্মলীন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রপঞ্চের ঘরে ফিরে এলেন জ্ঞানের আলো হয়ে। এসে দেখেন মা তেমনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে স্বাগত করতে। কিন্তু এ যেন আরেক মা—ক্ষণে তরঙ্গ, ক্ষণে সমুদ্র; পলে লীলা-চঞ্চল, পলে এক-রস। এই আছেন সব হয়ে, এই নেই কোন বিষয়রূপে।

যাঁকে ব্রহ্মরূপে পেয়েছেন—তাঁকেই দেখলেন প্রতিভাত কালীরূপে। যাঁকে জেনেছেন মা বলে, তাঁকেই পেলেন ব্রহ্মজ্ঞানচৈতন্যে।

এখন "কাকো নিন্দি কাকো বন্দি, দোনো পাল্লা ভারি।" "কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধর্মাধর্ম সব ছাড়ার ব্যাপারটি ধর্মজগতে মানুষ পেল এক অভিনব 'বস্তু'—বৈতরণী রূপে—ভাবমুখে থাকা।

'কাক-বিষ্ঠা' জগৎকেই ঠাকুর আমাদের পাইয়ে দিলেন মায়ের সব-হওয়া রূপে। মায়া হলেন মা। মা-ই মহামায়া। মহামায়া ব্রহ্মপ্রকাশ। মায়াকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। মহামায়াকে কেঁদেকেটে বিরক্ত করা চলে। তখন ঝনাৎ করে বাক্স খুলে প্রাপ্যটুকু দিয়ে পান নিষ্কৃতি। এই স্বীকৃতিটুকু ঠাকুর কত সহজ করে দিয়েছেন। মা শুনতে পান, কথা কন, খেতে পরতে দেন, লালন পালন করেন, চতুর্বর্গের সব দেন। কত নিবে নাওনা। পরে নিজে বলি হয়ে ব্রহ্মলীন করে দেন।

ঠাকুরের 'ভাবমুখে' থাকা বেদান্তে এনেছে এক মহা ভাব-বিপ্লব; ধুলির ধরায় এক নব্য রস-প্লাবন। ব্রহ্ম-শক্তি যুগ্ম বস্তু নয়, মিতালির পাড়াপড়শি নয়—এক বস্তু। যিনি রস বই আর কিছু নন, তাঁতে ডুবে গিয়ে ডাঙায় উঠে দেখা যায় ডাঙাই জল হয়েছে—আবার জল হয়েছে ডাঙা।

এ দেখতে পাওয়ার পর শুধু আনন্দ, অভীঃ সঙ্গীত আর প্রেম।

অদ্বৈতকে ঠাকুর বলেছেন ঃ "শেষ কথা।" আবার বলেছেন ঃ "ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ।" যাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তাঁকেই ডাকা হয়েছে, "আমার মা।"

অন্যদিকে জীবই শিব। আর মা-ই সব হয়েছেন।

ঘৃণ্য-পূজ্য, তুচ্ছ-বরণীয়, সুন্দর-বীভৎস্য, ভয়ানক-সৌম্য, বিদ্যা-ভ্রান্তি, ভীতি-বীরত্ব, পীড়া-শান্তি—সবকিছুই মা-র হওয়া।

পুণ্যবানের ঘরে শ্রী, দুর্ভাগার ঘরের অলক্ষ্মী, সতীর পবিত্রতা, কুলটার লজ্জাহীনতা—সবই মায়ের হওয়া।

তুমি যাঁকে পূজা করলে, যাকে লাঞ্ছনা করলে—সব মা।

কালীর ভোগ বেড়ালকে দিয়েছিলেন। না দিয়ে করেন কি? দেখতে পেলেন যে মা-ই ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঐরূপে।

অদ্বৈত সাধন করে জীবকে পেলেন শিব-রূপে। আবার সব-হওয়া মাকেই স্পষ্ট দেখলেন 'ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা'।

তাই মহাবাক্য উচ্চারণ করলেন : "খালি পেটে ধর্ম হয় না।"

পূজার, সাধনের নূতন পথ খুলে দিলেন।

'ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা'কে দেখলেন পতিতা-রূপে। পাপীকে দেখলেন মায়ের অধিষ্ঠান-রূপে।

তাই সবার পায়ে করলেন প্রণতি।

মায়ার জগতে ঈশ্বরের শক্তি কতটুকু? আছেন যেন অজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। মায়ের জগতে মায়ের জোর ব্রহ্ম-বিস্তীর্ণ। শক্তি-ব্রহ্ম অভেদ।

এটি ঠাকুরের উত্তম রসিকতা। রসস্বরূপকে বিজ্ঞানে পাওয়া।

'নেতি-নেতি'র বেদান্তকে 'ইতি-ইতি'র ঘরে ফিরিয়ে আনলেন মায়ের সব-হওয়ার জোরে। 'ইতি-ইতি'র বেদান্তকে ধাতে-ধাতুতে আনতে হলে মায়ের ছেলে হওয়া চাই।

মায়ার কীট যদি ভ্রমবেশে 'ইতি-ইতি' করে, অজ্ঞানের পাঁকে রুদ্ধশ্বাস হয়ে সে মরে।

মায়ের ছেলে কিন্তু মায়ের জোরে সব পারে।

এই সব-হওয়া মায়ের সন্তান হয়ে যে ঠাকুরের জীব-শিব মন্ত্র সাধন করবে তার অসাধ্য থাকবে না কিছু জগতে কোনকালে। সে হবে অভীঃ, আনন্দ-সুন্দর, শক্তিধর, প্রেমী।

মানুষের জটিল কুটিল মহাসমস্যার আর কোন সমাধান আছে কি?

ভয় পেও না। তোমার মা-ই সর্বশক্তিময়ী। যা মায়ের সব তোমার। আর তোমার আত্মাই অবিনাশী, বিশ্বব্যাপী।

অত আর ভেব না! "মা সব জানেন।"

এস এই সব-হওয়া মা-কে আমরা হৃদয়-ভরে জীবন-ভরে বোধন করি এই শিউলি-শরতে।* □

* ৬৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

উনিশ শতকের মানসমণ্ডল ও স্বামী বিবেকানন্দের গণমুক্তির পরিকল্পনাঃ সমীক্ষা

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

একদিন যখন আমাদের দেশে জনগণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন সচেতনতা ছিল না, তখন একটি নিঃসঙ্গ একক কণ্ঠ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিল : "মনে রাখিও দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত।" সে-কণ্ঠ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের। তখন কিন্তু আমাদের দেশে সমাজসংস্কারকের অভাব ছিল না। বস্তুত তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রচণ্ড অনুপ্রবেশ ঘটেছে আমাদের মানসমণ্ডলে এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণে সমাজসংস্কারের প্রবল বন্যা সারা দেশের বুকে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সে আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল সমাজের উপরতলার মানুষ। কারণ, বিধবাবিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, পর্দাপ্রথা-বিসর্জন—যা ছিল এইসকল আন্দোলনের মূল বিষয়, তা সমাজের উপরতলার মানুষদের সমস্যা, এগুলি কোনদিনই নিচুতলার মানুষদের সমস্যা ছিল না। সমাজের অগণিত দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষদের মূল সমস্যা দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, যার মূলে রয়েছে পুরোহিত ও অভিজাত শ্রেণীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত দীর্ঘকাল ধরে শোষণ, সেইসময় একমাত্র সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দৃষ্টিই আকর্ষণ করতে পেরেছিল। সেজন্য সমাজের মূল সমস্যা হতে চ্যুত উনিশ শতকের সংস্কার-আন্দোলনকে বিবেকানন্দ আদৌ গুরুত্ব আরোপ করেননি। এ-সম্পর্কে একটি সমীক্ষায় তিনি বলেন : "তোমাদের সমাজ-সংস্কার মানে তো বিধবার বিয়ে আর স্ত্রী-স্বাধীনতা বা ঐরকম কিছু। তোমরা দুই-এক বর্ণের সংস্কারের কথা বলছো তো? দুই-চারজনের সংস্কার হলো, তাতে সমস্ত জাতটার কি এসে যায়? এটা সংস্কার না স্বার্থপরতা? নিজেদের ঘরটা পরিষ্কার হলো, আর যারা মরে মরুক।... আজ অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতের নানাস্থানে ঘুরে দেখলাম, সমাজ-সংস্কার সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাদের রক্তশোষণের দ্বারা ভদ্রলোকেরা ভদ্রলোক হয়েছেন বা হচ্ছেন, তাদের জন্য একটি সভাও দেখলাম না।... জনগণকে অবহেলা করাই ভারতের জাতীয় পাপ এবং অবনতির প্রধানতম কারণ। নিম্নজাতিরা উচ্চবর্ণের শিক্ষার জন্য পয়সা দিয়েছে, ধর্মলাভের জন্য মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছে, কিন্তু তার বিনিময়ে তারা চিরদিন লাথিই খেয়েছে।... সমাজ-সংস্কারকেরা খুঁজে পান না ক্ষতটি কোথায়? তাঁরা জানেন না জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপরে।" জনগণকে অবহেলা করাই যে আমাদের সমাজের মূল ত্রুটি, সেদিন তা একমাত্র বিবেকানন্দের অসাধারণ প্রজ্ঞাদৃষ্টির সম্মুখে ধরা দিয়েছিল। সমস্যার মূল সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবার প্রয়াসে তিনি আরো বলেন : "সমস্ত ত্রুটির মূল এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান প্রত্যেকের পদতলে পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে পিষ্ট

হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদের শিক্ষিত করিতে হইবে।"

যখন অন্যান্য সকল সমাজ-সংস্কারকদের দৃষ্টি সমাজের উপরতলায় আবদ্ধ, যখন তাদের একমাত্র প্রয়াস উঁচুতলার সমাজকে পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢেলে সাজানো, তখন বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত আসমুদ্রহিমাচল ভারতব্যাপী এক সবিপুল গণ-জাগরণের স্বপ্ন। তাঁর এই নূতন দৃষ্টি তাঁকে তখনকার মানস-মণ্ডলে অনন্য স্থান দিয়েছে। এটা সত্যই আশ্চর্যের বিষয় যে, যখন জনগণ সম্বন্ধে সারাদেশে কোথাও বিশেষ কোন চেতনাই ছিল না, তখনই এই ক্রান্তদর্শী ঋষি মনশ্চক্ষে দেখছেন ভবিষ্যৎ ভারতে এক অভিনব গণ-অভ্যুদয়ের দৃশ্য, শোষকশ্রেণী উচ্চবর্ণদের সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ার স্বপ্ন। ভবিষ্যতের সেই মহান অভ্যুদয়-দৃশ্য সুস্পষ্ট দেখে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তাকে আবাহন করেছেন। বলেছেন ঃ "তোমরা উচ্চবর্ণেরা... তোমরা হচ্ছ দশহাজার বছরের মমি!!... তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।... তোমার যাই শূন্যে বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি 'ওয়াহ গুরুহ কি ফতে।'" এই আবাহনের কথাগুলি পরবর্তী ভারতে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে ক্রমাগত মন্ত্রবাণীর মতো উদ্গীত হয়েছে। বারংবার উচ্চারিত হয়েছে, বহুমুখে উচ্চারিত হয়েছে। এভাবে উচ্চারিত হয়ে হয়ে সেই মন্ত্রার্থ আজ সবার অলক্ষ্যে সকলের হৃদয়ে অনুস্যূত হয়েছে, সকলের চোখে সেই মহান অভ্যুদয়ের স্বপ্ন এঁকে দিয়েছে, সকলের হৃদয়ে এজন্য প্রতীক্ষা জাগ্রত করেছে। বহুদিন আগে অধ্যাপক বিনয় সরকার আমাদের এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়ে বলেছিলেন ঃ "আজ যে তোমরা সমাজবাদকে গ্রহণ করতে পারছ, তা কার জন্য জানো? বিবেকানন্দের জন্য। তিনি এদেশে সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি করে দেন।"

বস্তুত সেদিনের ভারতে বিবেকানন্দের মতো 'আমূল রূপান্তরের' সাধক, এমন বিপ্লবী চিন্তাধারার ধারক ও বাহক আর কেউ ছিলেন না, যিনি আগামী গণ-অভ্যুদয়ের প্রস্তুতির কাজে সকলকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সেজন্য একটি বাস্তব কার্যসূচীও প্রণয়ন করেছিলেন।

উনিশ শতকের মানস-মণ্ডলকে সমীক্ষা করে রুশ সমীক্ষক চেলিশেভ[১] বলেছেন ঃ "The great merit of Vivekananda, in my opinion, is that he was one of the first in India to pay attention to the masses, to the suffering and misfortune of his compatriots." এখানে লক্ষণীয় চেলিশেভ বিবেকানন্দকে প্রথম ভারতীয় গণ-সচেতন ব্যক্তিদের অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন। উনিশ শতকে মনীষি-মননে জনগণ অস্ফুট চেতনায় জাগ্রত হয়েছে রামমোহনের মধ্যে। তাঁর একটি-দুটি বিচ্ছিন্ন উক্তিতে তা ধরা পড়ে। রামমোহনের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশীয় কৃষক' শীর্ষক একটি রচনা চোখে পড়ে। এ-রচনাটি অবশ্য অনন্য, এতে কৃষক তথা জনগণের উপর যে-

শোষণব্যবস্থা জমিদারীপ্রথার মধ্যে কায়েম তারই স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু বিবেকানন্দের মধ্যে জনগণ সম্পর্কে চেতনা পূর্ণ পরিণত। এজন্য বিবেকানন্দের চিন্তার যে-বৈশিষ্ট্য তা অন্য কারো মধ্যে নেই।

বিবেকানন্দের মধ্যে শুধু যে জনগণ সম্বন্ধে চেতনা পূর্ণ পরিণত, তা শুধু নয়। এ-বিষয়ে ইতিহাস পর্যালোচনা করে, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-সহায়ে গণমুক্তির একটি পূর্ণায়ত দর্শন তিনি গড়ে তুলেছেন। এজন্য আশ্চর্য ভবিষ্যৎবাণী তিনি উচ্চারিত করেছেন যা পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণিত করেছে, যেমন তাঁর এই ঘোষণাটি—আসন্ন শূদ্রবিপ্লব ঘটবে চীন কিংবা রুশ দেশে। এই দুই দেশেই জনগণ সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত। আমরা দেখেছি ভারতেও এই গণ-অভ্যুদয় যে অবশ্যম্ভাবী একথাও তিনি সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন। ইতিহাস-বিশ্লেষণ করে সমাজ-বিকাশের স্তর ও পর্যায় নির্ণয় করে অকাট্য যুক্তি-সহায়ে সেই সম্ভাবনা সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে প্রত্যয় এনে দিতে চেয়েছেন। এবং সেজন্য পাশ্চাত্য ধাঁচে সমাজকে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস না করে গণ-অভ্যুদয়ের কাজে হাত লাগাতে বলেছেন। তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে, তার সমাপ্তিসূচক স্বদেশমন্ত্রের মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে। উচ্চশ্রেণীকে এ-বিষয়ে সাবধান করে তাদের ইতিকর্তব্যও বিবেকানন্দ নির্দেশ করেছেন। বলেছেন ঃ "জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকায় নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একইভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐরকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সেকাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐকথা বুঝতে পারছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা ছোটজাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতরজাতদের দ্বারা অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতের কল্যাণ।... তা নাহলে কিন্তু তোদের কল্যাণ নেই।... এই জনগণ যখন জেগে উঠবে, আর তাদের উপর তোদের অত্যাচার বুঝতে পারবে তখন ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি। তারাই তোদের ভেতর civilisation (সভ্যতা) এনে দিয়েছে, তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে।" এদের এই অভ্যুদয়ের পূর্বে যে বিপুল সংক্ষোভ দেখা দিতে পারে সে সম্ভাবনার কথাও তিনি সুস্পষ্ট বলেছেন। এ-সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন—"শূদ্রগণের সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু কী ভয়ানক সংক্ষোভের অন্তে।" উক্তিটি পড়লে মনে হয় তিনি তাঁর অনন্য প্রজ্ঞাদৃষ্টির দ্বারা সমগ্র ভবিষ্যৎকে সুস্পষ্ট দেখে কথা বলছেন। এবং কত সুস্পষ্টভাবে ভবিষ্যৎকে তিনি দেখেছিলেন তা আজ আমরা এতদিন পরে বুঝতে পারছি।

এ-প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে, তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি পাশ্চাত্য সমাজবাদী ভাবধারার আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি একথাও বলেছিলেন—"আমি একজন সমাজবাদী।" কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, যখন এই সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখনই তার মূলত্রুটি সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছিলেন। বলেছিলেন—"I am a socialist, not because it is a perfect system but

because half-a-loaf is better than no bread." (একেবারে রুটি না থাকার চেয়ে আধাটুকরো থাকাও ভাল।) শূদ্রশাসনের কালে সাংস্কৃতিক অবনতি ঘটবে বলে তাঁর ধারণা—দৃঢ় ধারণা ছিল। আর তাছাড়া পাশ্চাত্য ধাঁচের সমাজতন্ত্রে যেভাবে সমাজের যূপকাষ্ঠে ব্যষ্টির বলিদান-ব্যবস্থা নিহিত তাকে তিনি কখনোই কল্যাণকর বলে মনে করেননি। ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যতীত যেকোন উন্নতি, কোন কল্যাণ, সত্যিকারের মুক্তি সম্ভব নয়, এ-বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। এ-বিষয়ে দৃঢ়মত প্রকাশ করে তিনি বলেছেন : "যে সমাজ প্রাণহীন যন্ত্রের মতো, মৃত্তিকাপিণ্ডের মতো একদল লোকের সমষ্টি, একটি ঢেলাস্তূপের সমষ্টি সেই সমাজ কি সমাজ? সে সমাজ কি কখনো কল্যাণকর হতে পারে?"

একটি কথা এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, বিবেকানন্দ একদিন আসমুদ্রহিমাচল ভারতভূমি পদব্রজে ভ্রমণ করে দীর্ঘদিন ধরে জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমে গণমানসের গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। সেজন্য ভারতের জনগণ সম্বন্ধে যা কিছু তিনি বলেছেন, তা অবাস্তব আদর্শবাদ নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত সত্য তত্ত্ব। বস্তুত গণ-জীবনের মর্মমূলটি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। ভারতের গণ-জীবনের মধ্যেই তিনি ভারতের আবহমান কালের ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই গণজীবনে যে ইতিহাস জীবন্ত তারই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর গণ-মুক্তির পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছেন।

আজ আমরা যারা সমাজের রূপান্তর আনতে চাইছি, আমাদের গণ-জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কতটুকু? আমরা উচ্চশ্রেণীতে উদ্ভূত হয়ে, ইংরেজী শিক্ষার বিশেষ সুবিধা ভোগ করছি, আমরা আজ আমাদের পাশ্চাত্য দীক্ষানুসারে প্রাপ্ত মতবাদ, আদর্শ, রোমান্টিক স্বপ্ন সব জনগণের স্কন্ধে আরোপ করছি। ফলে নিদারুণ বিভ্রান্তি ঘটছে। বস্তুত আজ একথা বিশেষভাবে চিন্তা করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে, যারা অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য ও শোষণের মধ্যেও শত-শত শতাব্দী ধরে অবিচলিত ধৈর্য ও বিশ্বাসের সঙ্গে এক উচ্চ শ্রেয়োবোধকে আঁকড়ে ধরে আছে, মনুষ্যত্বের মানদণ্ডকে যারা সর্বদা বিচারের মাপকাঠি বলে ধরে রেখেছে তাদের কি আমরা সত্যই চিনেছি? তাদের মুক্তি কোন্ পথে তা কি আমরা বুঝেছি?

বিবেকানন্দ তাঁর সুদীর্ঘ ভারতভ্রমণকালে গণ-জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন। সেজন্য তিনি তাঁর জনগণের জন্য কার্যসূচী-প্রণয়নকালে জোর দিলেন ভারতের জনজীবনে যে শ্রেয়োবোধ, যে উচ্চ নৈতিকতা ও ধর্মচেতনা দেখা যায়, তা অক্ষুণ্ণ রাখবার উপর। তাঁর কার্যসূচীর প্রথম নির্দেশই হলো—"আমাদের কার্যের মূল কথাটি মনে রাখিবে—ধর্মে একবিন্দু আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতিবিধান।" ধর্মকে আশ্রয় করে আমাদের জনজীবন অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে স্মরণাতীতকাল হতে, এবং সেজন্য অতি দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যেও আমাদের দেশে মহৎ মানবিক মূল্যবোধগুলি বিকশিত। পাশ্চাত্য দেশের জনজীবনকে দেখে তিনি এবিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছিলেন—"পাশ্চাত্যে গরিবগণ পিশাচপ্রকৃতি, আর আমাদের দেশের গরিবেরা তুলনায় দেবপ্রকৃতির। সেজন্য আমাদের দেশের গরিবদের উন্নয়ন অনেক সহজ।"

ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর একটি অনন্য সমাজ-সমীক্ষায়[২] উদ্ঘাটিত করেছেন এই তত্ত্ব যে, ভারত জাতিসমূহের মধ্যে অনন্য জীবনশিল্পী। "মিশর যখন পিরামিড নির্মাণ করে অনন্য স্থাপত্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছিল, ভারত রাখছিল অনন্য জীবন-গঠন প্রতিভার।" তাঁর মতে ভারত যে অনন্য জীবনশিল্পী তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখেছেন তিনি জনজীবনের সর্বস্তরে অনুস্যূত অনন্য শ্রেয়োবোধের মধ্যে। নিবেদিতা তাঁর সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার শেষে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন—"যদি সভ্যতার মূল্যবিচারের কোন চূড়ান্ত মানদণ্ড থেকে থাকে, তা হলো এই নৈতিকতা বা জাতীয় বিবেক; ধনসম্পদ, শিল্পায়ন, এমনকি সুখও এ-বিষয়ে আমাদের মানদণ্ড হতে পারে না।" পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্ হলডেনও (Haldane) এ-বিষয়ে নিবেদিতার সঙ্গে একমত। এ-সম্পর্কে একটি সমীক্ষায়[৩] তিনি বলেছেন যে, "সমাজজীবনের ভিত্তিই হলো এই নৈতিকতা যা ব্যক্তির আচরণে প্রতিফলিত না হলে সমাজ ভেঙে পড়ে।" তাঁর মতে "ব্যক্তির জীবন ও আচরণে এইসকল শীল পালিত না হলে সমাজজীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে, এবং অব্যাহতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব হয় না। দৈনন্দিন জীবনে ও আচরণে উচিত ও অনুচিত বোধের সহজাত প্রকাশ স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস। এই যে সহজাত ঔচিত্যবোধ তাই সমাজজীবনের প্রকৃত ভিত্তি। এই সহজাত বোধ জীবন্ত হয়ে ওঠে আমাদের পারিবারিক জীবন এবং আমাদের পৌর ও সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠান বিধি নিয়মের মধ্যে। এর এইসকল আধারকে যে সবসময় একই ধরনের হতে হবে তা নয়। নূতন ধরনের আধারও আসতে পারে, আবার পুরাতন আধারেরও নূতনতর বিকাশ ও রূপান্তর ঘটতে পারে।" সুতরাং সমাজব্যবস্থা নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু যে সমাজব্যবস্থাই আসুক তার দৃঢ়ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে ধর্ম ও নৈতিকতার উপর। ভারতের জনজীবনে এই ধর্ম ও নৈতিকতাবোধ পূর্ব হতেই দৃঢ়মূলবদ্ধ; তাকে সেজন্য সযত্নে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। এ-বিষয়ে ভারতের দৃষ্টান্ত জগতের সকল জাতির অনুসরণের যোগ্য। এজন্যই বিবেকানন্দ এর উপর এত জোর দিয়েছেন। এবং জোর দিয়ে এ-বিষয়ে তাঁর অসাধারণ আরেকটি প্রমাণ রেখেছেন।

বিবেকানন্দ জনসাধারণের জন্য মোক্ষবাদের বুলি কখনোই আওড়াননি। এবিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত—"ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও ভারতে একলক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তি নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশকোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং না খাইয়া মরিতে হইবে? একজন লোকও কেন না খাইয়া মরিবে? ঐহিক সভ্যতা আবশ্যক; শুধু তাহাই নহে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিব লোকের জন্য নূতন নূতন কর্মের সৃষ্টি হয়।

"যে ভগবান আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখ দিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে; আর পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে। আরো খাদ্য, আরো সুযোগ প্রয়োজন।" এই উক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট তিনি জনসাধারণের জন্য চেয়েছেন ধনোৎপাদন, কর্মসৃষ্টি, স্বাচ্ছন্দ্য, খাদ্য, উন্নত জীবনধারণের

মান। সঙ্গে সঙ্গে চেয়েছেন তাদের শ্রেয়োবোধ অক্ষুণ্ণ থাকুক। ধর্ম বলতে তিনি বুঝেছেন এই শ্রেয়োবোধ ও মনুষ্যত্বের উদ্ঘাটন। তাঁর মতে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবেই। তার বিনিময়ে কোন কিছুই তিনি চাননি।

বিবেকানন্দ তাঁর কর্মসূচী-রূপায়নে একটি বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি জানতেন যে, অন্ধ অজ্ঞ জনসাধারণকে একটি কোন মহৎ লক্ষ্যের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেই মুক্তি আসবে না। ওভাবে মুক্তি আসতে পারে না। মুক্তিকে সবসময় স্বোপার্জিত হতে হয়, তবে তা সত্যকারের মুক্তি হয়। পরের হাত দিয়ে পাওয়া যে মুক্তি তা একসময় দাসত্বের শৃঙ্খল হয়ে ওঠে। এ-বিষয়ে তাঁর মত—"তাহাদের জনগণের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ ফিরাইয়া দিতে হইবে। প্রত্যেককেই তাহার নিজের মুক্তির পথ নিজেকেই করিয়া লইতে হইবে। রাসায়নিক দ্রব্যগুলির একত্র সমাবেশ করিলে, যৌগিক ফল আপনিই প্রসূত হয়। আসুন আমরা তাহাদের মধ্যে ভাব প্রবেশ করাইয়া দিই—বাকিটুকু তাহারা নিজেরাই করিবে। ইহার অর্থ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে।"

এই উক্তি থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্ত পাই। প্রথমত উচ্চশ্রেণীর হাত দিয়ে গণমুক্তি আসবে, তা বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন না। তিনি চেয়েছেন নেতৃত্ব জনসাধারণের মধ্য হতে গড়ে উঠুক। সেজন্য একটি চিঠিতে স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখেছিলেন ঃ "একটি চাষীর ছেলেকে শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে গ্রামের ভার তার উপর ছেড়ে দিতে হবে, তারপর যা করবার তা তারা নিজেরাই করবে।" উচ্চশ্রেণীর উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল না, কারণ তারা যে তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইবে তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যকে মূলধন করে, এও তিনি বোধহয় স্পষ্ট দেখেছিলেন। সেজন্য তিনি তাদের বলেছেন ঃ "তোমরা শূন্যে বিলীন হও।" শুধু তাদের হাতে যে অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার, সংস্কৃতিসম্পদ আছে তা দিয়ে যেতে বলেছেন জনগণের হাতে তুলে ধরে। বলেছেন ঃ "অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত! ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আঙটি—ফেলে দাও এদের হাতে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও।" গণনেতৃত্ব-গঠনের উপর জোর দিয়ে বলেছেন ঃ "ভারতের ভরসাস্থল জনসাধারণ। মধ্যবিত্ত ও অভিজাতরা শরীরে মনে একেবারে মরে গেছে। অনুশীলনের দ্বারা যে সহজ বুদ্ধি প্রতিভায় পরিণত হয়, তার উদ্ভব ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের মতোই ছোট দোকানদার বা লাঙলধারী কৃষকের মধ্যেও সম্ভব। সাহস যদি ক্ষত্রিয়ের একচেটে সম্পত্তি হতো, তাহলে তাঁতিয়া ভীল কোথায় থাকত?" এইভাবে গণনেতৃত্বের উপর আস্থা আজও কজনের আছে? এখনো অনেক বিপ্লবপন্থী ব্যক্তিও বিশ্বাস করেন যে, নেতৃত্ব-প্রতিভা একমাত্র উচ্চশ্রেণী হতে আসতে পারে। এদিক দিয়ে বিবেকানন্দের মতো খাঁটি সমাজবাদী সারা পৃথিবীতেই খুব কম আছে।

দ্বিতীয়ত বিবেকানন্দের পথ বিকাশের পথ, অভ্যুদয়ের পথ। জোর করে মুক্তি আনা যাবে না। মুক্তি-সচেতন জনগণের নেতৃত্ব গড়ে উঠলে গণ-নেতৃত্বে সমাজ নবকলেবর ধারণ করবে, এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এজন্য চাই গঠনমূলক কাজ। তাঁর পন্থা রাজনীতির পন্থা নয়। গঠনমূলক পন্থায় কিভাবে একাজ অগ্রসর হতে পারে তার বাস্তব দৃষ্টান্ত তাঁরই ভাবধারার বাস্তব রূপায়ন

করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন রেখেছেন। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে ছোটনাগপুর আদিবাসি-অধ্যুষিত অঞ্চলে যে কর্মকাণ্ড 'দিব্যায়ন' নামক প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে এঁরা পরিচালনা করছেন তা এদিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আদিবাসী কৃষকসমাজকে শিক্ষা দিয়ে, প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে, সমবায় যৌথ খামার ও আধুনিক কৃষিপদ্ধতি সহায়ে এঁরা স্বাবলম্বনের যে পথ দেখাচ্ছেন গঠনমূলক কর্মধারায় তা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

পরিশেষে আরেকটি কথা স্মরণীয়। সমাজব্যবস্থার স্বাভাবিক বিকাশের পথেই একদিন সমাজবাদ আসবে—একথা পাশ্চাত্য সমাজবাদী তাত্ত্বিকদের। তা যদি হয়, তাহলে সমাজবাদী চিন্তার অভ্যুদয় স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় মানসিকতার বিকাশের পথেই হওয়া উচিত। বিবেকানন্দের মধ্যে সেই অভ্যুদয় ঘটেছিল, যদিও দেশ আজ তা উপেক্ষা করছে পাশ্চাত্য ভাবধারার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বিবেকানন্দ সুপ্রাচীন বেদান্তের নিহিতার্থ উদ্ঘাটিত করে জীবব্রহ্মবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন এই তত্ত্ব—"সকলেরই মধ্যে একই শক্তি নিহিত, সকলেরই এর বিকাশের সুযোগলাভের অধিকার আছে।" বিবেকানন্দ এই তত্ত্বকে সমাজবাদ বলেননি, বলেছেন 'ব্যবহারিক বেদান্ত'—তাই-ই এর যথাযোগ্য নাম। কারণ পাশ্চাত্য সমাজবাদের থেকে এ গোত্রে ভিন্নতর। এর মধ্যে সমাজের যূপকাষ্ঠে ব্যষ্টির বলিদান-ব্যবস্থা নেই, ধর্ম বা শ্রেয়োবোধের উপর এর প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য সমাজবাদী চিন্তা থেকে এজন্য এ-চিন্তা আরো সম্পদশালী। কিন্তু আজকের ভারতীয় মানসে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবের দরুন একে আমরা সমাজবাদ বলে অভিহিত করেছি। পাশ্চাত্য সমাজবাদের সঙ্গে এর পার্থক্য এইখানেই যে, এ-ধারণা আরো পূর্ণায়ত। কিন্তু এরও ফলশ্রুতিতে ঘটবে শোষণ হতে গণমুক্তি ও গণসমাজের প্রকৃত অভ্যুদয়। এবং এ-মুক্তি হবে সত্যকারের মুক্তি, কারণ এ হবে স্বোপার্জিত।

সুতরাং পাশ্চাত্য অনুকরণে সমাজকে ঢেলে সাজানো নয়, ভারতে বহু প্রাচীনকাল হতে যে-সাম্যতত্ত্ব বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদের মধ্যে নিহিত আছে তাকে বাস্তব করে তুললেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারব। ভারতীয় সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের পথেই তা আসবে। এই স্বাভাবিক বিকাশের পথটিই বিবেকানন্দ আমাদের দেখিয়েছেন।

উপরে উক্ত সুদীর্ঘ সমীক্ষান্তে তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তই রাখতে চাই যে, উনবিংশ. শতাব্দীর মানস-মণ্ডলে বিবেকানন্দের মধ্যে সমাজবিকাশের স্বাভাবিক পথে ভারতীয় চিন্তায় খাঁটি সমাজবাদ বা গণমুক্তি-সম্পর্কিত পূর্ণায়ত ভাবধারার অভ্যুদয় ঘটেছিল। তা নিয়ে আজ বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা-রূপায়ন চলছে। এই ভাবধারা, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রূপায়নপ্রয়াস আমাদের বিশেষ অনুশীলন ও অনুসরণের বস্তু হওয়া উচিত।* □

পাদটীকা

১ Swami Vivekananda Center Commemoration Volume
২ Civil and Political Ideals
৩ The Principle of Higher Nationality

* ৭৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা



রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি*

জলধিকুমার সরকার

বিষয়বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করলে সহজ কথায় বলতে পারা যায় যে, আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী বা লেখার মাধ্যমে তাঁদের বৈজ্ঞানিক মনকে আবিষ্কার করা। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি হাস্যকর না হলেও কৌতূহলোদ্দীপক বলা যেতে পারে। কারণ, যে রামকৃষ্ণের পাঠশালায় শুভঙ্করী বুঝতে ধাঁধা লাগত; শ্রীম বা মাস্টারমশাই মাটিতে আঁক কেটে মাধ্যাকর্ষণ, জোয়ার, পূর্ণিমা প্রভৃতি বুঝাবার সময় যাঁর মাথা ঘুরে টনটন করাতে শিশুর মতো জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ "আচ্ছা, এত দূরের কথা কেমন করে জানলে?" নৃত্য করতে করতে ক্ষণে ক্ষণে সমাধিস্থ হয়ে যাঁর মন কোন্ এক অতীন্দ্রিয় জগতে চলে যেত; 'ইলেকট্রিসিটি' (electricity) কথাটি শুনে বালকের ন্যায় ঔৎসুক্যে যিনি বলেছিলেন ঃ "হ্যাঁরে, ...ইলেকটিক্‌টিক্ মানে কি?"[১] তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্তার কথা ভাবা সত্যই কঠিন। আবার স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি সারা ভারতবাসীকে বলতে বলছেন ঃ "বল, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী"; গভীর সমাধিতে যিনি দেখেছেন—"নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর"; আবার কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ "রামকৃষ্ণাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্যযুগোৎপত্তি হইয়াছে"[২]—তাঁকেই বা কি করে বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে ভাবা যায়? সমস্যাটি সত্যই চিন্তার বিষয়। কিন্তু এ-সমস্যাটি সমাধানের আগেই আমাদের ভাবতে হবে, বিজ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝি, এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কি কি বিশেষত্ব থাকা আবশ্যক।

ইংরেজী অভিধান-মতে সায়েন্স (Science) বলতে বুঝায় systematised knowledge বা প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান। আরো সবিস্তারে, knowledge of facts, phenomena, laws and proximate cause gained and verified by observation experiment and correct thinking.[৩] বাংলা অভিধান-মতে বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান বা নিয়মিত গবেষণার ফলে ক্রম-অনুসারে লব্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞানের এইসব সংজ্ঞা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের অর্থ যে ল্যাবরেটরি, টেস্ট টিউব, মাইক্রসকোপ ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ থাকবে, তা তো নয়ই, বরং ব্যাকরণ, সঙ্গীত প্রভৃতি অনেক কিছুই বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। 'বিজ্ঞান' শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা থাকার জন্য এবং খানিকটা বোধহয় শব্দটির আভিজাত্যের জন্য আমরা পাই হোম সায়েন্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স,

* ৫ ও ৬ এপ্রিল ১৯৮০, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের সারদানন্দ হলে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ।

লাইব্রেরি সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স ইত্যাদি। শ্রীম-লিখিত 'কথামৃত'-এ আমরা 'বিজ্ঞান' শব্দটি অনেকস্থলে পাই, যেটির অর্থ বাংলা অভিধানগত বিজ্ঞানের সূত্র হতে খুব একটা তফাত নয়, তবে ভাব আরো গভীর। সেখানে পাই, "তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান; জ্ঞান অজ্ঞানের পারে গেলে থাকে বিজ্ঞান"; "দুধের কথা শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দুধ খেয়েছে, তার জ্ঞান হয়েছে, আর যে দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তার বিজ্ঞান হয়েছে"; "ঈশ্বর আছেন এইটে জেনেছে এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে, সে জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জ্বেলে রাঁধা খাওয়া, হেউ-ঢেউ হয়ে যাওয়া, যার হয়, তার নাম বিজ্ঞানী।" অর্থাৎ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণে আমরা আপাতদৃষ্টিতে দুটি পৃথকরূপ পাচ্ছি। একটি সাধারণ অর্থে, যেটিকে বলতে পারা যায় 'জড়বিজ্ঞান'; অপরটি শ্রীরামকৃষ্ণ যে-অর্থে ব্যবহার করেছেন, যাকে 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' বলতে পারা যায়। 'জড়' কথাটি অবশ্য ব্যবহৃত হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে, নিকৃষ্টার্থে নয়।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণে এইসব জটিলতা এসে গেলেও আমরা যখন 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি' কথাটিতে আসি, অথবা বৈজ্ঞানিকের আবশ্যকীয় গুণাবলী বিবেচনা করি, তখন সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিকের থাকবে খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, দৃষ্টবস্তু বা ঘটনার পূর্ণ ও নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) মূল্যায়ন করার যোগ্যতা, গভীর চিন্তাশীলতা বা তন্ময়তা, এবং যাচাই না করে কিছু মেনে না নেওয়ার প্রবণতা। আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সামিল হবে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার-ক্ষমতা, ভাবপ্রকাশের স্পষ্টতা, 'মতুয়ার বুদ্ধি' না করা বা dogmatic না হওয়া, এবং এমন কিছু না বলা যা verifiable নয় অর্থাৎ পূর্ব প্রদর্শিত পথে চলেও যার সত্যতা প্রতিপাদন করা যাবে না। এইসব গুণাবলীকে মানদণ্ড করলে সহজেই বুঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিকের কাজে নিযুক্ত না থেকেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সম্ভব, যদিও বৈজ্ঞানিকের কাছেই পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বেশি আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ "যন্ত্রপাতি ব্যবহাররত বৈজ্ঞানিক নামে অভিহিত সকলকে আমি বৈজ্ঞানিক বলে ধরি না; আমার কাছে বৈজ্ঞানিক মনটাই আসল।"[৪]

এটা ঠিক যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিছু বললে তা শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করে, কারণ, তা যুক্তিভিত্তিক ও প্রমাণভিত্তিক। শ্রোতা যেন এক্ষেত্রে জাতসাপের এক কামড়ে চুপ হয়ে যায়। তাই আমরা দেখতে পাই প্রায়-নিরক্ষর ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্থির হয়ে শুনছেন বিদ্যাসাগর, বৈজ্ঞানিক মহেন্দ্রলাল সরকার, জ্ঞানসূর্য নরেন্দ্রনাথ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীম বা মাস্টারমশাই। বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনার শেষে স্তম্ভিত হয়ে চাদর নিতে ভুলে গেলেন, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মাত্র কিছুক্ষণ আলোচনার পরে উদভ্রান্ত বোধ করেছিলেন।[৫] এমনকি বালক-অবস্থাতেও রামকৃষ্ণকে দেখি, মহতী পণ্ডিতসভা যেখানে জটিল প্রশ্নের সমাধানে অপারগ, সেখানে সুমীমাংসা করে দিচ্ছেন। 'কথামৃত'-এ তাঁকে বারেবারে বলতে শুনা যায় ঃ "একটি মতকে বিশ্বাস কর, তবে অন্যরকম কিছু হতে পারে না এরূপ ভেব

না'' অর্থাৎ dogmatic হয়ো না, মনের কপাট খোলা রেখ। তিনি কারও 'আমি সব জানি' বলা পছন্দ করতেন না। সবকিছু যাচাই করে নিতে বলতেন, অন্ধবিশ্বাস করাকে প্রশ্রয় দিতেন না। প্রিয় শিষ্য যোগেন রাত্রে যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর শয্যায় না দেখে সন্দেহ করেছিলেন যে, তিনি পত্নীর নিকট নহবতে গেছেন এবং পরে পঞ্চবটীর দিক হতে তাঁকে ফিরতে দেখে এরূপ সন্দেহ করার জন্য লজ্জিত হলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত না হয়ে বরং খুশি হয়ে বললেন ঃ ''বেশ, বেশ, সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।''[৬] একজন ব্রাহ্মভক্ত যখন সদরওয়ালাকে যুক্তি দিয়ে না বুঝে মেনে নিতে বলেছিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন ঃ ''তুমি কি রকম লোক। কথায় বিশ্বাস না করে মেনে নেওয়া! কপটতা। তুমি ঢং কাচ দেখছি।'' তিনি বারেবারে ভক্তদের বলতেন তাঁরা যেন বিশ্বাসে দৃঢ় হন, কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি না করেন অর্থাৎ 'অন্যরা ভুল, তাঁরাই ঠিক' এরকম মনোভাব না আনেন। কিন্তু তিনি নিজের উপর আত্মবিশ্বাস রাখতে বলেছেন। একজনের চোখের সামনে দেওয়াল ভেঙে পড়ায় সে খবর দিলেও খবরের কাগজে সেই খবরটা না থাকার জন্য অবিশ্বাস করাকে তিনি বিদ্রূপকশাঘাত করেছেন। এদিকে 'কথামৃত'-এর পাতায় পাতায় প্রমাণ পাই তাঁর power of observation বা খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, খই ভাজার সময় যেগুলি লাফিয়ে পড়ে, সেগুলি মল্লিকা ফুলের মতো সাদা, খোলার উপরে যেগুলি থাকে সেগুলি ততটা সাদা হয় না। কুস্তিগিরের মলের চেহারা দেখে তিনি তার হজমের অতিরিক্ত আহার করা বুঝতে পেরেছেন; লক্ষ্য করেছেন, কীর্তনিয়া সেজেগুজে কিরকম ঢঙ করে কাশে, মাঝে মাঝে হাতের কাপড় সরিয়ে তাবিজ, অনন্ত প্রভৃতি অলঙ্কার দেখায়, আবার বিশিষ্ট ব্যক্তি এলে তারি মাঝে 'আসুন' বলে অভ্যর্থনা করে। বাইরের দৃষ্টি শুধু তীক্ষ্ণ নয়, অন্তর্দৃষ্টিও ছিল অমেয়—চেহারায়, চলনে-বলনে লোকের চরিত্র বুঝতে পারতেন; একজনের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভিতর-বার বুঝতে পারতেন। আর জাগতিক ঘটনাই হোক, অথবা আধ্যাত্মিক দর্শনাদিই হোক, শ্রীরামকৃষ্ণের মূল্যায়ন যে নৈর্ব্যক্তিক হতো, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেইজন্যই সেগুলি গ্রহণ করতে সকল শ্রেণীর শ্রোতাদেরই কারো কোন দ্বিধা হতো না। বৈজ্ঞানিকের যে মনঃসংযোগ বা চিন্তার তন্ময়তার প্রয়োজন, তা যে তাঁর ছিল, এ-বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। চিন্তার গভীরতায় সমাধিলাভের চেয়ে তন্ময়তা আর কি হতে পারে? এদিকে, তিনি যে নিজেই ঈশ্বরদর্শন করেছেন তা নয়, অন্যকেও দর্শন করাতে পেরেছেন, যাঁরা তাঁর প্রদর্শিত পথে চলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করতে গেলে এ-বিষয়ে বিরুদ্ধ মতগুলিরও আলোচনা দরকার। তাঁর শুভঙ্করীতে ধাঁধা লাগা বা সূর্যগ্রহণ বুঝতে না পারার অর্থ তাঁর বুদ্ধির অভাব নয়। বরং ঠিক উলটো। লীলাপ্রসঙ্গকার বলেছেন, বালক গদাধরের অদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার বিকাশে পিতা ক্ষুদিরাম বিস্মিত হয়েছিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও দেখেছিলেন যে, বালকের মন কতকগুলি বিষয়কে যেমন আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ ও ধারণা করে অপর

কতকগুলি বিষয়ের সম্বন্ধে তেমনি উদাসীন থাকে। পাঠশালায় গিয়ে তার গণিতেও বেশ উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু 'চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিবার পর হইতে বালকের ভক্তি ও ভাবুকতা এত অধিক প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাঠশালার অর্থকরী শিক্ষা তাহার পক্ষে এককালে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহার নিকট উপলব্ধি হইতেছিল। সে যেন এখন হইতেই অনুভব করিতেছিল, তাহার জীবন অন্য কার্যের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে এবং ধর্মসাক্ষাৎকার করিতে তাহাকে তাহার সর্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে।'[৭] যিনি সারাজীবন মনকে একাভিমুখী করে রেখে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পর কেবলমাত্র জগতের মঙ্গলের জন্য মনকে অন্য জগৎ হতে একধাপ নিচে নামিয়ে রাখতেন, তাঁর পক্ষে এখন মনকে বহির্মুখী বা বহুমুখী করা সম্ভব নয়। মাথা টনটন করা তাঁর এই মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ওপর জোর দিয়েছেন। বিশ্বাস বলতে তিনি ব্রহ্ম-দর্শনকারীদের কথায় বিশ্বাস করতে বলেছেন, যেমন আমরা ডারউইন, হাক্সলির কথায় বিশ্বাস করি। আর নতুন কোন বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে কি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস নিয়ে আরম্ভ করা চলে? মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি অতি-প্রচলিত বিশ্বাস এখনো প্রমাণোত্তীর্ণ হয়নি। অঙ্কশাস্ত্রের বেলাতেও তাই। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গিডেল (Goedel) বলেছেন: "Even in Mathematics we must admit truths that are not provable."[৮] (অঙ্কশাস্ত্রেও কতকগুলি সত্য মেনে নিতে হয়, যেগুলি প্রমাণ করা যায় না।) সেইরকম, ধর্মজগতে প্রবেশ করার শুরুতেও কতকগুলি সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হয়।

এবার স্বামী বিবেকানন্দের কথায় আসা যাক। শৈশব হতেই তাঁর যুক্তিবাদী মনের সত্যকে যাচাই করে নেওয়ার প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন দেখি বীরেশ্বর বা বিলে গাছে চড়ে বসে আছেন সত্যি সত্যি ব্রহ্মদত্যি ঘাড় মটকে দেয় কিনা দেখবার জন্য, অথবা কলাগাছের ঝোপে বসে আছেন মহাবীরের দর্শন-আকাঙ্ক্ষায়। আবার পিতার বৈঠকখানায় যখন কেউ নেই, বিভিন্ন জাতির জন্য নির্দিষ্ট হুঁকাগুলিতে মুখ দিয়ে ফুড়ুক করে টেনে দেখছেন সত্যি সত্যি জাত যায় কিনা। আর এই মনোবৃত্তিরই অভিব্যক্তি পাই তাঁর উত্তরজীবনে যখন দেখি তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বা শ্রীরামকৃষ্ণকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করছেন: "আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন: "রূপটুপ যা দেখেন তা আপনার মাথার খেয়াল"; অথবা তাঁকে বলছেন: "অন্যেরা যা বলুক, আমার নিজের যখন বিশ্বাস হবে, তখন আপনাকে অবতার বলব।" স্বামীজী বলেছেন: "অন্ধবিশ্বাস করার অর্থ হইল মানবাত্মার অধঃপতন। নাস্তিক হতে চাও তো তাই হও; কিন্তু বিনা প্রশ্নে কোন কিছু গ্রহণ করিবে না।"[৯] এদিকে, যে স্বামীজী বেদের এত প্রশংসা করেছেন, তিনিই বলছেন: "...আমি... বেদের ততখানিই গ্রহণ করি; যতখানি যুক্তির সঙ্গে মেলে।"[১০] অন্যত্র স্বামীজী বলছেন: "Why was reason given us if we have to believe?... What right have we not to use the greatest gift that God has given to us?"[১১] (যদি আমাদের বিশ্বাসই করিতে হয়, তা হইলে আমাদের বিচারক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে কেন?

ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ দানকে ব্যবহার না করিবার আমাদের কি অধিকার আছে?) আর বৈজ্ঞানিকের তন্ময়তা আমরা স্বামীজীর মধ্যে পাই তাঁর জীবনের প্রতি স্তরে। শৈশবে সীতারামের মূর্তির সামনে ধ্যানমগ্ন যে-বিলেকে দরজা ভেঙে বার করতে হয়েছিল, যৌবনে কাশীপুরের বৃক্ষতলে কৃষ্ণ কম্বলের মতো মশকাবৃত ধ্যানমগ্ন তাঁকেই গিরিশবাবু ডেকে জাগাতে পারেন নাই; আবার জার্মানির কিয়েল নগরে অধ্যাপক পল ডয়সন কাব্যগ্রন্থরত তাঁকেই ডেকে সাড়া না পেয়ে বিরক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য প্রফেসর যখন দেখলেন যে, স্বামীজী তন্ময়ভাবে পড়ার সময়ের কবিতাগুলি হুবহু উদ্ধৃত করলেন তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন।[১২] ধ্যান সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য : "যদি তুমি প্রকৃতির উপর আধিপত্য চাও (ইহা ধ্যানের অনুশীলনেই সম্ভব হইবে)। আজকাল বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়াও ধ্যানের দ্বারাই হইতেছে। তাঁহারা (বৈজ্ঞানিকগণ) বিষয়বস্তুটি তন্ময়ভাবে অনুধ্যান করিতে থাকেন এবং সবকিছু ভুলিয়া যান—এমনকি নিজেদের সত্তা পর্যন্ত, এবং তখন মহান সত্যটি বিদ্যুৎপ্রভার মতো আবির্ভূত হয়। কেহ কেহ ইহাকে 'অনুপ্রেরণা' বলিয়া ভাবেন। কিন্তু নিঃশ্বাস ত্যাগ যেমন আগন্তুক নয়, (নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলেই উহার ত্যাগ সম্ভব), সেইরূপ 'অনুপ্রেরণা'ও অকারণ নয়। কোন কিছুই বৃথা পাওয়া যায় নাই।"[১৩]

স্বামীজী পাঠ্যাবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইতিহাস, ন্যায়, দর্শন সম্বন্ধে বহু পুস্তক পড়েছিলেন; তার সঙ্গে পড়েছিলেন ফলিত গণিত ও গ্রহবিজ্ঞান। কেউ কেউ হয়তো জানেন না যে, তিনি শারীরিক গঠন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজে মাঝে মাঝে গিয়ে এ্যানাটমির বক্তৃতা শুনতেন।[১৪] যদিও তিনি কলেজে আনুষ্ঠানিকভাবে আর্টসেরই ছাত্র ছিলেন, তাঁর জীবনীতে পাই, উত্তরজীবনে যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, "... পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই-চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন।"[১৫] আর এটা আমরা জানি যে, দুচার কথায় বুঝিয়ে দিতে তাঁরাই পারেন যাঁদের সেই বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আছে।

বিজ্ঞানমনস্কতা স্বামীজীর মধ্যে এমন ঘনীভূত হয়েছিল যে, যখন তিনি বেলুড় মঠে অসুস্থ হয়ে গুরুভাইদের কথায় কবিরাজী ওষুধ খাচ্ছেন, তখনো তাঁর মনের কথা—"আমার মত কিন্তু একজন সায়েন্টিফিক চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল; layman (হাতুড়ে) যারা বর্তমান সায়েন্সের কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে পাঁজিপুঁথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে, তারা যদি দু-চারটে রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্যলাভ আশা করা কিছু নয়।"[১৬] অন্যত্র বলেছেন : "যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি এক অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে যে, তোমার উহা দেখিবার কোন অধিকার নাই, আমি তাহার কথা বিশ্বাস করি না।... বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হইলে তৎক্ষণাৎ উহা পরিত্যাগ কর।"[১৭] তাঁর আরেক উক্তি : "পুরাতন ঋষিগণের হয়েছিল, আর আমাদের হবে না?...

একবার একজনের জীবনে যা হয়েছে, চেষ্টা করলে তা অবশ্যই আবার অন্যের জীবনেও সিদ্ধ হবে।"[১৮] তবে সেই সঙ্গে স্বামীজীর একটি বক্তব্য স্মরণীয় : "প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব অনুসন্ধান-প্রণালী আছে।... মনে কর, একজন রাসায়নিক—বড় বৈজ্ঞানিক তোমার নিকট আসিয়া রসায়নশাস্ত্রের কথা বলিলেন। যদি তুমি তাঁহাকে বল, 'আমি রসায়নবিদ্যার কিছুই বিশ্বাস করি না, কারণ আজীবন রাসায়নিক হইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু উহার মধ্যে কিছুই পাই নাই।' তখন বৈজ্ঞানিক তোমাকে প্রশ্ন করিবেন, 'কখন তুমি ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলে?' তুমি বলিবে, 'যখন ঘুমাইতে যাইতাম, তখন পুনঃ পুনঃ এই কথা উচ্চারণ করিতাম—হে রসায়নশাস্ত্র, আমার নিকট এস। কিন্তু সে কখনো আসে নাই।' উত্তরে বৈজ্ঞানিক হাসিবেন ও বলিবেন, 'না, উহা যথার্থ প্রণালী নয়। কেন তুমি পরীক্ষাগারে গিয়া ক্ষাররস, অম্লরস প্রভৃতি মিশাইয়া দিনের পর দিন গবেষণায় তোমার হাত পোড়াও নাই? ঐ প্রণালীতেই তুমি ধীরে ধীরে রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে পারিতে।' "[১৯] ধর্মানুশীলনেরও সেইরূপ বিশিষ্ট প্রণালী আছে।

বিজ্ঞানের দ্বারা তিনি এত প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে, তাঁর বক্তব্যের অনেক অংশ, এমনকি ধর্মীয় ব্যাখ্যাও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বুঝিয়ে দিতেন। এগুলির মাধ্যমে তাঁর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠ করছি। (ক) "বেদ বলেন—সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা সমপরিমাণ।"[২০] (খ) " 'ডিসকভার' শব্দটির অর্থ—অনন্ত জ্ঞানের খনিস্বরূপ নিজ আত্মা হইতে আবরণ সরাইয়া লওয়া। আমরা বলি, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা কি এক কোণে বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল? না, উহা তাঁহার নিজ মনে অবস্থিত ছিল। সময় আসিল, অমনি তিনি উহা দেখিতে পাইলেন।"[২১] (গ) "মস্তিষ্কের দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রটিই দর্শনেন্দ্রিয়, চক্ষুটি নয়। এইরূপ প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের কাজ আভ্যন্তরীণ। একমাত্র মনের প্রতিক্রিয়া ঘটিলেই বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য সংজ্ঞাবহ এবং ক্রিয়াবাহী উভয় প্রকার নার্ভই (sensory and motor nerves) প্রয়োজন।"[২২] (ঘ) "ধ্বংস বলিতে কারণে লয়, কারণে প্রত্যাবর্তন—যে-সকল উপাদান হইতে কোন বস্তু নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলি তাহাদের আদিম অবস্থায় চলিয়া যায়। ধ্বংস শব্দের এই 'অর্থ' ব্যতীত সম্পূর্ণ অভাব বা বিনাশ-অর্থ যে অসম্ভব, তা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কপিল অনেক যুগ পূর্বে ধ্বংসের অর্থ যে 'কারণে লয়' করিয়াছিলেন, বাস্তবিক উহা দ্বারা যে তাহাই বুঝায়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।... বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে... প্রমাণ করা যাইতে পারে—জড়বস্তুও অবিনশ্বর।"[২৩] ডারউইনের ক্রমবিকাশ (Evolution theory) সম্বন্ধে স্বামীজী যে-অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা থেকে তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারা যায়। তিনি এই মতবাদকে চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করেন নাই। পতঞ্জলির এই বিষয়ে মত উল্লেখ করে তিনি বলেন : "আমার বিবেচনায় struggle (লড়াই) এবং competition (প্রতিদ্বন্দ্বিতা)

জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেকসময় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়।... জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও বিকাশ।... প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিম্নস্তরে যাই হোক, উচ্চস্তরে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করেই যে ওদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়; দেখা যায় সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা ও প্রধানত ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং obstacle (প্রতিবন্ধক)-গুলিকে আত্মপ্রকাশের কার্য না বলে কারণরূপে নির্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত নয়।"[২৪] স্বামী বিবেকানন্দ 'রাজযোগ' বুঝাতে গিয়ে ঘনঘন এ্যানাটমির (anatomy) সাহায্য নিয়েছেন। আবার সৃষ্টি ও লয় বুঝাতে গিয়ে 'ইথার' (ether) সম্বন্ধে যে-আলোচনা করেছেন তাতে তাঁর তৎকালীন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির কথাই প্রকাশ পায়। তিনি বলেছেন : "বিশ্বের যত শক্তি আছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে তাহার সমষ্টিকে 'প্রাণ' বলে।... কঠিন, তরল প্রভৃতি যে-সব বস্তুকে আমরা জড়পদার্থ বলিয়া থাকি, সে-সবই একটি মূল জড়পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে;... এই মূল পদার্থের নাম 'আকাশ' (ইথার)...। আকাশের উপর এই প্রাণের কার্যের ফলেই বিশ্ব সৃষ্ট হয়, এবং একটি সুনির্দিষ্ট কালের অন্তে—অর্থাৎ কল্পান্তে—একটি সৃষ্টির, বিরতি-সময় আসে।... যখন প্রলয়কাল আসে, তখন... সবকিছুই খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া 'আকাশে' লীন হয়।"[২৫] মনে রাখবেন, স্বামীজী যেসময় ether-এর কথা বলেছেন, তখন সূর্যের কিরণ কিভাবে পৃথিবীতে আসে, এই সম্বন্ধে নিউটনের কর্পাসকুলার মতবাদ (Corpuscular theory) চলে গিয়ে হাইগেনের (Huyghen) ওয়েভ মতবাদ (Wave theory) বা ইথার মতবাদই বলবৎ ছিল। পরে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের ডিউয়াল মতবাদ (Dual theory) এসে ইথার মতবাদকে ধূলিসাৎ করে দেয়। এরূপ আরেকটি অধুনা-মতে বৈজ্ঞানিক ভুল স্বামীজী বলেছিলেন, যখন তিনি তাঁর গুরুভাই (স্বামী শিবানন্দ)-কে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হতে উদ্ধার পাবার জন্য জল ফিলটার করে খেতে বলছেন।[২৬] ওই কালে, মশা দূষিত জলের মাধ্যমেই ম্যালেরিয়া বিস্তার করত, এই ধারণা বলবৎ ছিল।[২৭] অবশ্য এটা তো আপনারা জানেন যে, বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যই পরে পরিবর্তিত বা পরিত্যক্ত হয় এবং ভুল মেনে নিয়ে সত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই বিজ্ঞানের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠ গৌরব।

স্বামীজীর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, ভারতের আশু প্রয়োজন বিজ্ঞানশিক্ষার বিস্তার। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ১৮৯৭ সালে মঠে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে লিখছেন : "এক সেট Physics (পদার্থবিদ্যা) আর Chemistry-র (রসায়নের) সাধারণ যন্ত্র ও একটা telescope (দূরবীক্ষণ) ও microscope (অণুবীক্ষণ) ১৫০।২০০ টাকার মধ্যে সব হবে।... আর বাঙালা ভাষায় যেসকল উত্তম Scientific (বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়) পুস্তক আছে তা সব কিনবে ও পাঠ করবে।"[২৮] অন্যত্র বলছেন : "আমাদের চাই কি জানিস?—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর Science (বিজ্ঞান) পড়ানো; চাই technical education (কারিগরী শিক্ষা);... High education (উচ্চশিক্ষা) থাকলেই কি, আর গেলেই বা

কি?"[২৯] মহীশূরের রাজাকে বলছেন : "যদিও ভারতের বিশেষত্ব বলিতে দর্শন ও ধর্মকেই বুঝায়, তথাপি যুগপ্রয়োজনে তাহাকে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-অর্জনে ও সামূহিক সমাজসংস্কারে আশু তৎপর হইতে হইবে।"[৩০] এই মানসিকতা থাকার জন্যই তিনি প্যারিসে জগদীশ বোসের বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। আর জনগণের বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রয়োজনীয়তা বুঝেই 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য স্বামীজী যেসব বিষয় নির্দিষ্ট করেছিলেন, তার মধ্যে বিজ্ঞানের বিশিষ্ট স্থান আছে।[৩১]

বহুদিন যাবৎ আলাদা হয়ে থাকা ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্র এনে স্বামীজী কিভাবে সমন্বয় করেছেন, সেই বিষয়ে আসা যাক। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষায় "আমরা বিবেকানন্দের জীবনের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং আধ্যাত্মিকতার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাই।"[৩২] স্বামীজীর কাছে বিজ্ঞান ও ধর্মের উদ্দেশ্য একই—সত্যানুসন্ধান। তিনি বলেছেন : "রসায়নশাস্ত্র ও অপরাপর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ যেমন জড়জগতের সত্য অন্বেষণ করে, ধর্মের লক্ষ্য সেরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের সত্য।... ঋষিগণ প্রায়শ জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ,... বৈজ্ঞানিকগণও সেরূপ ধর্মবিজ্ঞানে প্রায়শ অনভিজ্ঞ।"[৩৩] 'যুক্তি ও ধর্ম' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : "অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির প্রত্যেকটিই যুক্তির যেসকল আবিষ্কারের সহায়তায় নিজেদের সমর্থন করিতেছে, ধর্মকেও কি আত্মসমর্থনের জন্য সেগুলির সাহায্য লইতে হইবে?... আমার মতে তাহাই হওয়া উচিত। আমি ইহাও মনে করি,... এরূপ অনুসন্ধানের ফলে কোন ধর্ম যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সেই ধর্ম বরাবরই অনাবশ্যক কুসংস্কার-মাত্র ছিল; যতশীঘ্র উহা লোপ পায়, ততই মঙ্গল।"[৩৪] স্বামী বিবেকানন্দের মতে : "জ্ঞান-অর্থে... একত্ব আবিষ্কার। রাসায়নিকেরা সর্বপ্রকার জ্ঞাত বস্তুকে ঐগুলির মূল উপাদনে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; আর যদি সম্ভব হয়, তবে যে-এক উপাদান হইতে ঐগুলি সব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় আসিতে পারে, যখন তাঁহারা সকল ধাতুর মূল এক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিবেন,... তখন আর তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিবেন না; তখন রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ণ হইবে।"[৩৫] "প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ (Heat, light and electricity) বিভিন্ন শক্তি বলিয়া সকলে জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, ঐগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র।"[৩৬] 'একত্বে' উপনীত হইলেই সব বিচার সমাপ্ত হয়, সুতরাং আমরা প্রথমত বিশ্লেষণ (analysis), তারপর সমন্বয় (synthesis) অবলম্বন করিয়া থাকি। বিজ্ঞানের রাজ্যে দেখা যায়, একটি অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক শক্তির অনুসন্ধানের ফলে শক্তিগুলির সংখ্যা কমিতে থাকে। চরম একত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জড়বিজ্ঞান লক্ষ্যে উপনীত হয়। একত্বে পৌঁছিলেই আমাদের বিশ্রাম। জ্ঞানই চরম অবস্থা। সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞান বহু পূর্বেই সেই একত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, সেই একত্বে অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হওয়াই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য। বিশ্বময় এক পরমাত্মাই বিরাজ করিতেছেন, ক্ষুদ্র জীবাত্মাগুলি তাঁহারই অভিব্যক্তি মাত্র।[৩৭] অন্যত্র বলেছেন : "যখন আবিষ্কৃত হইল, 'আমি ও আমার পিতা

অভিন্ন' তখনই ধর্ম সম্বন্ধে শেষকথা বলা হইয়া গিয়াছে, তারপর বাকি রহিল শুধু খুঁটিনাটি।"[৩৮] আরো বলেছেন ঃ "অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়দিকেই যে শুধু মেলে তাহা নয় বরং ঐসকল সিদ্ধান্ত অপেক্ষাও উচ্চতর সিদ্ধান্ত স্থাপন করে, আর এইজন্যই ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অন্তর এতখানি স্পর্শ করিয়াছে।"[৩৯] আরো বলেছেন ঃ "কেবল জড়-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যেকোন একটির, যথা—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত-জ্যোতিষ বা প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্যার কথা ধরুন; উহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করুন, ঐ তত্ত্বানুসন্ধান ক্রমশ অগ্রসর হউক, দেখিবেন স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থে লয় পাইতেছে; শেষে ঐগুলি এমন স্থানে আসিবে, যেখানে এই সমুদয় জড়বস্তু ছাড়িয়া একেবারে অজড়ে বা চৈতন্যে যাইতেই হইবে। জ্ঞানের সকল বিভাগেই স্থূল ক্রমশ সূক্ষ্মে মিলাইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা দর্শনে পর্যবসিত হয়।"[৪০]

স্বামীজী জড়বিজ্ঞানের সীমিত পরিধি দেখেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "আপেল ভূমিতে কিরূপে পড়ে, অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিরূপে স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, যদি কেবল এইটুকুই জানাই জীবনের একমাত্র কাজ হয়, তবে তো আমি এখনই আত্মহত্যা করি। আমার সঙ্কল্প—সবকিছুর মর্মস্থল অনুসন্ধান করিব।... আমার 'দর্শন' বলে—জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্যই জানিতে হইবে।... অবশ্য বিজ্ঞানবিৎ হওয়া খুব ভাল এবং গৌরবের বিষয় বটে,... কিন্তু যখন কেহ বলে, এই বিজ্ঞানচর্চাই সব, ইহা ছাড়া জীবনে আর কোন উদ্দেশ্য নাই তখন সে নির্বোধের মতো কথা বলিতেছে।"[৪১]

স্বামীজীর এইসব উক্তি হতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্মবিজ্ঞান শুধু যে বিজ্ঞান তাই নয়, আরো উন্নততর বিজ্ঞান (স্বামীজীর ভাষায় 'greatest of all sciences'), যা সমস্ত বস্তু, প্রাণী বা সৃষ্টিরহস্যের মূল তত্ত্ব অনুসন্ধান করে। আগেই দেখান হয়েছে যে, জড়বিজ্ঞান ও ধর্মবিজ্ঞান উভয়ের পক্ষেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। ধর্মবিজ্ঞানের শেষ লক্ষ্য অদ্বৈতজ্ঞান এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর যিনি এক ধাপ নেমে এসে লোকশিক্ষা দেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকেই বলেছেন 'বিজ্ঞানী'। এই লক্ষ্যে যেতে হয় প্রত্যক্ষানুভূতির মাধ্যমে, এবং এখান হতেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন "এক চৈতন্যে জগৎ জরে রয়েছে", "এক চৈতন্য অভেদ, লোকের মধ্যে, মলমূত্রের মধ্যে।". এই যে অনুভূতির রাজ্য এটা unscientific বা অবৈজ্ঞানিক নয়; বলা যেতে পারে beyond science বা জড়বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের "মা, আমার বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক" কথাটির তাৎপর্য খানিকটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

অতীতে ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয়ে গেছে। আমার মনে হয় স্বামীজীর বাণী ও রচনার মাধ্যমে সারা জগৎ ধর্ম ও বিজ্ঞানকে তাদের যথাস্থানে দেখতে সমর্থ হবে। এরূপ দেখা এখন বিশেষ প্রয়োজন।* □

পাদটীকা

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৬৬, পৃঃ ১৭৪
২ পত্রাবলী, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ২৯
৩ Britannia World Language Dictionary
৪ Science Information Notes, Albert Einstein, Indian National Science Academy, Oct. 1979, p. 2
৫ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৭৩
৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ১ম ভাগ, ৩য় সং, পৃঃ ১৬৬
৭ লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, ১৩৬৩, পৃঃ ৮৮, ১১৯, ১৩৮
৮ Meghnad Saha Medal Lecture, 1978. Atom & Self by D.S. Kothari, Indian National Science Academy, p. 14.
৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৫৬
১০ ঐ, পৃঃ ২৩৪
১১ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VI, 8th Ed., p. 12
১২ যুগনায়ক, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৩০৯
১৩ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮-৪৯
১৪ লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ১৩৬৬, পৃঃ ২১৯
১৫ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৩৭৩-৭৪
১৬ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৩য় সং, পৃঃ ২০৮
১৭ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩০৩
১৮ ঐ ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮
১৯ ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৩
২০ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪
২১ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪
২২ ঐ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৯৭-৯৮
২৩ ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬
২৪ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১২০
২৫ ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯
২৬ পত্রাবলী, ১ম ভাগ, ৩য় সং, পৃঃ ৩৩৩
২৭ A Text Book of Practice of Medicine by F. W. Price, 8th Ed., p. 274
২৮ পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৫-৩৬
২৯ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪০২-৩
৩০ যুগনায়ক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭
৩১ উদ্বোধন, মাঘ ১৩৮৫, পৃঃ ৪
৩২ বিশ্ববিবেক, প্রথম প্রকাশ ১৩৭০, পৃঃ ১৯৭
৩৩ বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৪১
৩৪ ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩২
৩৫ ঐ, ৩য় পৃঃ ১১
৩৬ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪
৩৭ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১১
৩৮ ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৫
৩৯ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০১
৪০ ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯
৪১ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩

* ৮২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য*

নিমাইসাধন বসু

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন তার জন্মলগ্ন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে লক্ষ লক্ষ দুর্গত জনগণের সেবা করছেন এবং সঙ্ঘটিত সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানরূপে সর্বজনস্বীকৃত। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই এর বীজবপন করেছিলেন, এ-ঘটনা সকলের জানা। মানবসেবার আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে নিজেই অনুপ্রবেশ করিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই দুঃখী মানুষের দুর্দশায় চিন্তিত ছিলেন। তিনি বলতেন, জীবই শিব। কে বলে যে তাদের দয়া দেখাও? দয়া নয়, সেবা—মানবসেবাই ঈশ্বর সেবার সম্মান পাবে। বিবেকানন্দকে তাঁর গুরুর এইকথা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং স্বামীজী স্থির করেছিলেন যে, যখনই সুযোগ পাবেন তখনই এই নির্দেশকে কর্মে পরিণত করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিন-রাত্রি অসংখ্য পুরুষ ও নারীর দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনেছেন। সকলে তাঁর কাছে আসছেন একটু সান্ত্বনা ও আরামের জন্য, একটু করুণা, ভালবাসা, তাদের দুঃখ-দুর্দশায় একটু আশার আলোর জন্য। একবার বিবেকানন্দ যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন, তাঁকে নির্বিকল্প সমাধি দেবার জন্য, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করলেন, কারণ তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরপ্রাপ্তিকেই জীবনের সর্বোত্তম প্রাপ্তি বলে মনে করতেন না। তিনি স্বামীজীকে বললেন একচোখো দৃষ্টিভঙ্গি বা স্বার্থপর না হতে। তিনি আশা করেন, সর্বোচ্চ জ্ঞান যেন সর্বোচ্চ মানবসেবায় পরিণত হয়।

এই বীজ, এর থেকে বেশি উর্বর জমিতে বপন করা সম্ভব হয়নি। বিবেকানন্দের মনে এইভাব সর্বদা জাগরূক ছিল। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ মে এই সম্বন্ধে তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে এক পত্র লেখেন। ভারত ভ্রমণকালে তাঁর সর্বদা এই বিষয় মনে ছিল, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র সফরকালেও। এইভাব ক্রমশ তাঁর মনে দানা বাঁধছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ২৭ এপ্রিল ১৮৯৬ তারিখের চিঠিতে এটা স্পষ্ট আকারে দেখা গেল। এই চিঠিতে তিনি সবিস্তারে এই ভাবী প্রতিষ্ঠানের কি আচরণবিধি হবে তাও জানিয়েছেন। এই চিঠিটি একটি স্মরণীয় দলিল। এটি স্বামীজীর সাংগঠনিক ক্ষমতা, কার্যকরী জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তারপর এল সেই ঐতিহাসিক 'মে দিবস'। এ এক নতুন ধরনের 'মে দিবস'। ভারতবর্ষে একটি স্থায়ী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পক্ষে এটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে ঐতিহাসিক 'মে দিবসে'র সঙ্গে আমরা অধিক পরিচিত সেটা ছিল ১৮৯৭

* ২৪ জুলাই ১৯৮৪—রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণটি বিমলকুমার ঘোষ কর্তৃক অনূদিত

খ্রীস্টাব্দের ১ মে। স্থানটি উত্তর কলকাতার বাগবাজার; বলরাম বসুর বাড়ি। মূল বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ। অন্যান্য ত্যাগী সন্ন্যাসীরাও উপস্থিত। রামকৃষ্ণের বহু অনুরাগীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ঐ ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় বক্তব্যের মধ্যে স্বামীজী বিশেষভাবে জোর দেন যে, যে সঙ্ঘ স্থাপন করার প্রস্তাব তিনি রাখছেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কার্যসূচী অবশ্যই থাকবে।

(১) মানব কল্যাণের জন্য রামকৃষ্ণ যে সত্যপ্রচার করেছেন, সেই সত্য প্রচার ও নিজ জীবনে তার প্রয়োগ করতে হবে।... এই সত্যকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করে জনজীবনে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।

(২) এই সঙ্ঘকে বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে একমাত্র অনাদি ও শাশ্বত ধর্মই যে বর্তমান তার প্রচার করতে হবে।

(৩) কার্যের পদ্ধতি হবে এইরকম ঃ

(ক) এমন জ্ঞান ও বিজ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে যা জনগণের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে।

(খ) কলা ও শিল্পে উৎসাহিত করতে হবে।

(গ) শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মমত গ্রহণ—জনগণের মধ্যে প্রচার ও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে।

(৪) বিদেশে এই সঙ্ঘের কাজ হবে ভারতবর্ষের সঙ্গে সেই দেশের সম্পর্ক আরো ভাল করা।

শুধু ভারতে নয় পৃথিবীর ইতিহাসে স্বামীজীর এই সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা একটি নজিরবিহীন আন্দোলন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে বিবেকানন্দ দায়মুক্ত হলেন। স্বামীজী দেখেছিলেন, ঠাকুরের মনে কি তীব্র প্রতিক্রিয়া হতো যখন চরম দারিদ্র্য ও দুর্দশাতে সাহায্য করবার জন্য কেউ দয়া দেখাত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—জীবে দয়া? দয়া দেখাবার তুমি কে? তুমি তো একজন হতভাগ্য! তুমি দয়া করবে? না—না, দয়া নয়। শিবজ্ঞানে জীবসেবা। স্বামীজীর এই কথাগুলি শোনার সুযোগ হয়েছিল। তার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করে স্বামীজী স্থির করেছিলেন, যদি ঈশ্বর সুযোগ দেন, তাহলে এই সত্য আমি পৃথিবীতে জ্ঞানী-অজ্ঞানী, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলের মধ্যে প্রচার করব।

রামকৃষ্ণ মিশনের উৎপত্তি, ভিত্তি ও উদ্দেশ্য আলোচনা এখানে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক। 'সঙ্ঘটিত সেবাকার্য' ভারতে ও পশ্চিমী পৃথিবীতে খ্রীস্টীয় আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত এই ধারণাই বদ্ধমূল। স্বামীজী এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হন। বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্য থেকে দুজনের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যায় এই প্রসঙ্গে। সি. এইচ. হেমস্যাথ তাঁর 'ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম্ ও হিন্দু সোস্যাল রিফর্ম' গ্রন্থে লিখেছেন, রামকৃষ্ণ মিশন গভীর মনন ও সমাজসেবার দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রথমত, প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। দ্বিতীয়ত, হেমস্যাথের মতে, পাশ্চাত্যের আদর্শে সমাজসেবা ও লোকহিতৈষণার দ্বারা। রিচার্ড ল্যানয় তাঁর 'দি স্পীকিং ট্রি' গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশন খ্রীস্টীয়

চিন্তায় প্রভাবিত এবং হিন্দুধর্ম যে একেশ্বরবাদ ধর্মের মধ্যে নিহিত সেই ঐতিহাসিক সার্বজনীন ভাব প্রচারে উদ্যমী, তাও পাশ্চাত্য মতের অনুগামী এই ইঙ্গিতও করেছেন।

ঠিকভাবে বলতে গেলে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি ভ্রান্ত। আগেই সংক্ষেপে জানানো হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। সেখানে খ্রীস্টীয় মতের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের মতবাদের মূলগত পার্থক্য পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে। সঙ্ঘগঠনের জন্য স্বামীজীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যদিও পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলে তা সম্ভব হয়েছিল। তিনি নিজেই তা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন তাঁর 'মে দিবসে'র বক্তৃতায়। যখন তিনি বললেন ঃ "বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের পর আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, কোন প্রতিষ্ঠান গঠন ছাড়া কোন বড় অভিপ্রায় কৃতকার্য করা সম্ভব নয়।" এটাও অবশ্য স্বীকার্য যে, স্বামীজীর কয়েকজন গুরুভাই, স্বামীজী যে আদর্শ বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করছেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। স্বামী যোগানন্দ সন্দিগ্ধভাবেই স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "তুমি বিদেশী নিয়মে এইসকল রীতি এখানে প্রয়োগ করতে চাইছ। তুমি কি বলতে পার, ঠাকুর এইরকম কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন?" সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী যে উত্তর দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন ঃ "তুমি কেমন করে জানলে যে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ নয়? তাঁর ছিল এক অফুরন্ত উদার সহানুভূতি। জীবনের সীমাবদ্ধ চিন্তাকে তিনি সাহসের সঙ্গে অসীমের দিকে চালিত করতে পারতেন। আমি সকল গণ্ডিকে ভেঙে দেব এবং পৃথিবীতে তাঁর সেই অসীম ভাবের কথা প্রচার করব। দিকে দিকে ছড়িয়ে দেব... আমি পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে জন্মগ্রহণ করিনি।" স্বামীজী এখানেই থামেননি। তিনি আরো এগিয়ে যান। উত্তরের শেষ অংশে যোগানন্দ স্বামীকে আরো জানান যে, তিনি ভারতের ভূমি ও মানুষকে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখেছেন এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর অনন্ত পরিধিকে জীবনের অঙ্গীভূত করে উপলব্ধি করেছেন। কিছুক্ষণের জন্য যেন স্বামীজীর মধ্যে ঢাকা আগ্নেয়গিরির আবরণ উন্মোচিত হয়েছিল। তিনি আবেগের সঙ্গে জানালেন ঃ

"প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ-জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে এসব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন আঁটবার বস্ত্রও ছিল না, যখন কপর্দকশূন্য হয়ে পৃথিবীভ্রমণে কৃতসঙ্কল্প, তখনো ঠাকুরের দয়ায় সর্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করতে শিকাগোর রাস্তায় লাঠালাঠি হয়েছে, যে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, ঠাকুরের কৃপায় তখন সে সম্মানও অক্লেশে হজম করেছি—প্রভুর ইচ্ছায় সর্বত্র বিজয়! এবার এদেশে কিছু কাজ করে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য কর, দেখবি—তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।"[১]

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে খ্রীস্টান মিশনের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পার্থক্য দেয়া যায় তুলনামূলক বিচার, অভীষ্ট ও লক্ষ্য অনুধাবন করলে।

এতৎ সত্ত্বেও বলা যায় যে, খ্রীস্টান মিশনারিদের বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে সমবেদনার কঠিন চাপ, কর্তব্যনিষ্ঠা, পরোপকার, পাপীর মুক্তি এবং ধর্মান্তকরণ ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়েছে যা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় প্রত্যয়ের মধ্যে নেই। আমরা তা দেখতে পাই কতকগুলি খ্রীস্টান মিশনারির নামের মধ্যেই; যেমন, খ্রীস্টান জ্ঞানোন্নয়ন সমিতি, খ্রীস্টীয় প্রত্যাদেশ প্রচার সমিতি, ব্যাপটিস্ট মিশনারি সমিতি, লন্ডন মিশনারি সমিতি, চার্চ মিশনারি সমিতি, ব্রিটিশ ও বিদেশী বাইবেল সমিতি ইত্যাদি। নামকরণের মধ্য দিয়েই তাদের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কারভাবে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, খ্রীস্টানসম্প্রদায়ের মত হচ্ছে, যখন কারো ব্যক্তিগত মুক্তির পূর্ণ বিশ্বাস আসে, নতুন জন্মান্তর হয়, তখনই ধর্মান্তরকরণ সম্ভব এবং পাপের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্প্রদায় প্রচার করে, 'মানুষ দোষী, ভগবান যীশু মৃত, আবার মুক্তিও সম্ভব।' উইলিয়ম কেরির উদ্যমে খ্রীস্টীয় সমিতি গঠন করা হয়, যিনি 'অ্যান ইনকোয়ারি ইনটু দি অবলিগেশনস্ অব খ্রীস্টানস্ টু ইউস মীনস্ ফর দি কনভারসন অব দি হীদেনস্' ইত্যাদি পুস্তিকায় উল্লেখ করেন, খ্রীস্টান মিশনারি সমিতির মূল উদ্দেশ্য 'দরিদ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রতিমাপূজক, ধর্মহীন ব্যক্তিদের খ্রীস্টধর্মপ্রচারক দ্বারা খ্রীস্টান করা।' চার্চ মিশনারি সোসাইটির প্রচারক রিচার্ড বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন: "কবে এমন দিন আসবে যখন ভারত আমাদের মহান ত্রাণকর্তা যীশুর কাছে মাথা নত করবে?" ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে লন্ডন মিশনারি সোসাইটির একজন প্রচারক লিখেছিলেন, "আমরা শত্রুর দুর্গে আমাদের ক্রুশ তুলে দিয়েছি... আমরা আমাদের তরবারি নামিয়ে রেখেছি এবং স্থির করেছি এই ভারতে ভগবান যীশুকে তাঁর সিংহাসনে স্থাপনের জন্যই ব্যবহৃত হবে।"

খ্রীস্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর মূল্যায়ন করতে হবে। খ্রীস্টীয় সংগঠন এবং প্রচারকগণ সুস্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ভারতীয় জীবনে ও চিন্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ভারতে ও বিদেশে সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলির বিভিন্ন স্তরভেদে সংশোধন বা ধর্মাভিযানের কোন স্থান নেই, লক্ষ্য করা যায়। অন্য কেউ নয় স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই খুব জোরের সঙ্গে সমালোচনা করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে কোন ব্যক্তিবিশেষ, দল বা ধর্মসম্প্রদায়ের সমালোচনা স্বামীজী নিজেই কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ উভয়েরই যীশু ও তাঁর উপদেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। যীশুখ্রীস্টকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও অনুরাগিগণ মূল সত্যের এক আধ্যাত্মিক নেতা রূপে মনে করেন। তবুও ঐতিহাসিকদের ভুল ধারণার, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত আপত্তির সংশোধন করা প্রয়োজন।

ভারতে ও বিদেশে সহস্র-সহস্র হতভাগ্য আর্তজনের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন মাদার টেরিজা ও তাঁর 'মিশনারিস অব চ্যারিটি' নামক প্রতিষ্ঠান। তাঁর মতে তাদের সেবাই ভগবান যীশুর সেবা। আমরা স্মরণ করতে পারি, কয়েক দশক আগে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের যুবকদের ডাক দিয়ে বলেছেন

যে, ঈশ্বর সর্বত্র এমনকি সকলের মধ্যে বিদ্যমান। তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে পীড়িতের মধ্যে, কুষ্ঠরোগীর মধ্যে, পাপীর মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে, যদি মানবদেহের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে তাঁকে ভাই, বোন, পিতা, মাতা বা শিশুর মতো স্নেহ ভালবাসা দেখাতে পারে। এই শ্রীরামকৃষ্ণই আবার বলেছেন যে, যদি একজনকে সাহায্য করার জন্য আমাকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, এমনকি কুকুরের রূপেও, তার জন্যও আমি প্রস্তুত। এজন্যই রোমাঁ রোলাঁ তাঁর রামকৃষ্ণ-জীবনীতে পাঠকদের জানিয়েছেন, "সময় ও দেশের পার্থক্য বাদ দিলে আমরা রামকৃষ্ণদেবকে যীশুর ছোট ভাইরূপে দেখতে পাই।"

ঐতিহাসিকগণসহ অধিকাংশ লোকই ঠিকভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার শক্তি, গতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত নন। ক্রিস্টোফার ইশারউডের মতে "আমাদের সময়ে এই ধর্মীয়-ভাবধারাই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।" ইশারউড আরো ব্যাখ্যা করেছেন, কারণ এর উৎসে এক অতুলনীয় ব্যক্তি—'এক অসাধারণ দৃশ্য'। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐশ্বরিক সত্যের এক জীবন্ত রূপ। এই ভাব, পূর্বে ও পশ্চিমে এক নতুন সমত্ববোধ, শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার সৃষ্টি করেছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা বিনা কারণে ধর্মের ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যবাদকে লক্ষ্য রেখে ধর্মান্তর বা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেনি বা আজও করছে না।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর পর্বতপ্রমাণ গ্রন্থ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে'র কয়েক খণ্ডে প্রচুর প্রমাণসহ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন। মার্গারেট ই. নোবল (পরবর্তী কালে সিস্টার নিবেদিতা) ১ অক্টোবর ১৮৯৭ তারিখের এক চিঠিতে নতুন প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "ব্যবহারিক কর্ম ও মানব সেবার আদর্শ আমাদের বিস্মিত করে এবং কেউ কিছু বলতে চাইলে অবশ্যই এই ভাষায় বলবেন। এই ভ্রাতৃভাব মঠে বর্তমান এবং এর প্রসার এতেই সম্ভব—যা আমাদের চোখে সহযোগ-সংগঠনের মাধ্যমে ইংলন্ড ও আমেরিকায় বিভিন্ন শাখায় প্রসারিত।" রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর সংগঠন ও সন্ন্যাসিগণের নিঃশব্দ কর্মপদ্ধতি এবং নিজেদের সর্বতোভাবে প্রচারবিমুখতা আশ্চর্যজনক সফলতা এনে দিয়েছে। প্রচারবিমুখতা একটি নতুন দৃষ্টান্ত এবং উচ্চপর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। দেওঘরের সাবডিভিশনাল অফিসার এইচ. এইচ. হার্ড তাঁর রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মপদ্ধতি প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "এত নিঃশব্দে, উদারভাবে ও নিঃস্বার্থরূপে এই মিশনের কার্য সাধিত হয় যা তিনি নিজে উপস্থিত থেকেও অনুভব করতে পারেননি।" তাঁকে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছে এই সংগঠনের কর্মপদ্ধতি। ১৫ ডিসেম্বর ১৯০১ তারিখের 'দি রিফর্মার' মিশনের সর্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের কথা লিখেছে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১২ জুলাই-এর 'নেটিভ অপিনিয়ন' রামকৃষ্ণ মিশনের যথোচিত গুণাবলী উল্লেখ করে লিখেছে যে, মানবের দুঃখভার লাঘবের জন্য কার্যকরী পদ্ধতি রামকৃষ্ণ মিশনই গ্রহণ করেছে। ঐ কাগজের মতে, রামকৃষ্ণ মিশন পূর্ব ও পশ্চিমের আদর্শকে একীভূত করেছেন।

বিবেকানন্দের অতুলনীয় কীর্তি হচ্ছে মানবকে এক ধর্মীয় রূপ দান যা উপযুক্তভাবে নির্ণয় করেছেন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী জি. এস. ঘোরে। তিনি লিখেছেন ঃ "(রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মতো) দুজন অত্যন্ত উন্নত ও অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এক ঐশ্বরিক শক্তি উদ্ভব হয়েছে যা বিবেকানন্দকে আধুনিক কালের সবচেয়ে মৌলিক ও বিশিষ্ট যোগীর আদর্শে পরিণত করেছে।... তিনি রুচিবিজ্ঞানের আদর্শ সংগঠন ও সংশোধন করেছেন।"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতবাদ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারা যুবকদের মনে গভীর এবং স্থায়ী রাজনৈতিক শক্তির সঞ্চার করেছিল। তাও সর্বজনবিদিত যে, বিবেকানন্দ নিজে কোনরূপ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হোক এটা কখনো চাননি। স্বামীজীর মহাসমাধির পর মিশনের কর্তৃপক্ষ সেই একই ভাবধারা অনুসরণ করছেন এবং কখনো রামকৃষ্ণ মিশন ও তার কোন শাখাকেন্দ্রে ভারতীয় বিপ্লবীদের থাকার বা কার্যক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করার অনুমতি দেননি। তবুও মিশনের কর্মপদ্ধতি পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২ মার্চ চিফ সেক্রেটারি স্টিফেনসন তাঁর নিজস্ব গোপন রিপোর্টে লিখেছেন ঃ "এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয় না যে এরা বিপ্লবী, কারণ এদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগ আছে। আবার আমি মনে করি যে, অনেক ক্ষেত্রে বিপ্লবীরাই মিশনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এটাও ঠিক।" স্টিফেনসন ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ "বিবেকানন্দের শিক্ষা শাসকবিরোধী বা ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু তা বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রথম পদক্ষেপ রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।" এই হচ্ছে 'রামকৃষ্ণ ভাবধারা' যেখানে বিবেকানন্দের শিক্ষা ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যধারা প্রসারিত, যা বিশেষ পুলিশ প্রধান টেগার্ট ও বিচক্ষণ পুলিশ কর্মচারী স্টিফেনসনকে চিন্তান্বিত করেছিল। বিবেকানন্দের শিক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজসেবা ও মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত ছিলেন। এটি রামকৃষ্ণ ভাবধারার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আত্মোন্নতি ও বিশেষ সেবার দ্বারাই সম্ভব, যা যুবক বিপ্লবীদের আহ্বান করেছিল। সমকালে কথিত 'রেডবুক'-এর টেগার্ট-বিবরণী ও স্টিফেনসনের টীকায় উল্লেখ আছে ঃ "বিপ্লবিগোষ্ঠীতে যুক্ত বিপ্লবীরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শে গঠিত। এই আদর্শ যেখানে বর্তমান সেখানে এঁদের কাজ সহজ হয়েছে।" নির্ভীক জাতীয়তাবাদকে শুধু ত্বরান্বিত করা নয়, রামকৃষ্ণ মিশন এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল যার প্রমাণ হচ্ছে চতুর্দিকে জাতীয় অভ্যুত্থান ও উন্নতিতে উৎসাহদান।

স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের অসংখ্য কর্মী, অনুরাগী ও সন্ন্যাসীদের জন্য একটি মহৎ, উচ্চ ব্যবহারিক কর্ম ও আদর্শ রেখে গেছেন। স্বামীজীর সকল কর্মের পিছনেই রামকৃষ্ণ বর্তমান, স্বামীজীর অনুপ্রেরণার মূল উৎস রামকৃষ্ণ, যিনি তাঁর জীবন-দেবতা। তিনি তাঁর গুরুর নামেই এই সঙ্ঘ করেছেন। তবুও স্বামীজী তাঁর গুরুভাই, শিষ্য ও অনুরাগীদের সতর্ক করে বলেন ঃ "আদর্শকে ধরে কাজ করবে, ব্যক্তি মানুষকে নয়।" তিনি সতর্ক করে মনে করিয়ে দেন যে, পূর্ববর্তী আচার্যের শিষ্যগণ তাঁর নির্দেশিত পথ ও সেই ব্যক্তি মানুষকে

এমনভাবে মিশিয়ে ফেলেছেন যে, আর আলাদা করা অসম্ভব এবং শেষে দেখা গেছে, সেই আচার্যের জন্যই সেই ভাব নষ্ট হয়ে গেছে। স্বামীজী চাননি যে, রামকৃষ্ণ মিশন সেই ভুলই করুক। তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলেন : "আমাদের দেখা প্রয়োজন এবং অনুভব করা দরকার যে, ঈশ্বর সকলের মধ্যে এবং সর্বত্র আছেন।" তিনি জনসাধারণকে নির্দেশ দেন : "শতবর্ষ বাঁচার ইচ্ছা ভাল, পার্থিব ইচ্ছাও পূরণ হতে পারে, তাকে দেবত্বে আরোপ কর, ঈশ্বরসুখের দিকে পরিবর্তিত কর। সুখী ও উপকারী দীর্ঘ জীবনযাপনের ইচ্ছা কর এবং পৃথিবীতে তার উদ্যোগ দেখাও... সকল জিনিসের মধ্যে ভগবান আছেন; এখান ছেড়ে কোথায় তাঁকে খুঁজতে যাবে? তিনি সকল কাজের মধ্যে, সকল চিন্তার মধ্যে এবং সকল অনুভবের মধ্যে বর্তমান।"

স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের এই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও অপরসকল সঙ্ঘ যে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মত ও কর্মের গুরুত্ব সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দেন। যেকোন ক্ষেত্রে ও পেশায় উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের কাছে এটাই মূল শক্তি। স্বামীজী বলেছেন : "যেকোনরূপ কাজকে কখনো ছোট করে দেখো না।... মানুষকে তার কাজ দিয়ে বিচার কর কাজের পদ্ধতি দিয়ে নয়।... একজন মুচি তার পেশা ও কাজের দ্বারা খুব কম সময়ে একজোড়া সুন্দর জুতা তৈরি করছে অথচ একজন অধ্যাপক জীবনের প্রতিদিন বাজে বকে সময় নষ্ট করছে।" পরিশ্রমের এমন সুন্দর শক্তিশালী ব্যাখ্যা খুব কমই দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হওয়ার পর জন্ এফ. কেনেডি তাঁর দেশবাসীকে বলেছিলেন যে, কেউ যেন জিজ্ঞাসা না করেন, দেশ তার জন্য কি করল? সে যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে, সে নিজে দেশের জন্য কি করতে পারে। কেনেডির এই বক্তব্য দেশবাসীর উপর বিশেষ বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। এটা এখন বেশ চালু হয়েছে। কিন্তু আমরা বেশ কষ্ট করে মনে করি যে, স্বামীজী তাঁর দেশবাসীকে বেশ জোরের সঙ্গে উৎসাহিত করে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন এবং অনুসরণ করতে বলেছিলেন :

"প্রথমত আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা সকলেই জগতের নিকট ঋণী; জগৎ আমাদের নিকট এতটুকু ঋণী নয়। আমাদের সকলেরই মহা সৌভাগ্য যে, আমরা জগতের জন্য কিছু করিবার সুযোগ পাইয়াছি। জগৎকে সাহায্য করিতে গিয়া আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই কল্যাণ করিয়া থাকি। দ্বিতীয়ত এই জগতে একজন ঈশ্বর আছেন। ইহা সত্য নয় যে, এই জগৎ স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে এবং তোমার বা আমার সাহায্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ঈশ্বর জগতে সর্বদাই বর্তমান। তিনি অবিনাশী, নিয়ত ক্রিয়াশীল, তাঁহার সতর্কদৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যখন বিশ্বজগৎ নিদ্রা যায়, তখনো তিনি জাগিয়া থাকেন। তিনি অবিরত কাজ করিতেছেন। জগতে যাহা কিছুর পরিবর্তন ও বিকাশ দেখা যায়, সবই তাঁহার কাজ। তৃতীয়ত আমাদের কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। এই জগৎ চিরকাল শুভাশুভের মিশ্রণ হইয়াই থাকিবে। আমাদের কর্তব্য—দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং অনিষ্টকারীকেও ভালবাসা। এ-জগৎ একটি বিরাট নৈতিক ব্যায়ামশালা— এখানে আমাদের সকলকেই অনুশীলন করিতে হইবে, যাহাতে দিন দিন

আমরা আরো বেশি আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে পারি। চতুর্থত আমাদের কোনপ্রকারের গোঁড়া হওয়া উচিত নয়, কারণ গোঁড়ামি প্রেমের বিপরীত।”[২]

আমি আবার আরেকটি উপমা দিতে প্রলুব্ধ হচ্ছি। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সভাপতি ফ্রাঙ্কলিন ডিলেনো রুজভেল্ট যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি নিয়ে চারটি মুক্তির বাণী উচ্চারণ করেছিলেন—বাক্-স্বাধীনতা, পূজা করার স্বাধীনতা, না চাওয়া থেকে বিরত থাকার স্বাধীনতা এবং ভয়শূন্য হবার স্বাধীনতা। এইগুলি সাধারণ মানুষের মনে ধরেছিল। যুদ্ধকালীন জরুরীর মতো আজকের পৃথিবীকে স্বামীজীর ঐ চারটি আদর্শ মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ্যে স্বীকার করতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশনও তাই বিবেচনা করে এবং স্বামীজী প্রবর্তিত মানবজীবনের মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের বীজরোপণ এবং তাকে পুষ্টিসাধনের কার্যকরীরূপ দেবার বিষয় বিবেচনা করে। রামকৃষ্ণ মিশন অত্যাবশ্যকভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে ভারতীয়—মূলে ও চরিত্রে।* □

পাদটীকা

১ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩
২ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৬-০৭

* ৮৮ বর্ষ, ১ সংখ্যা

রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে বরাহনগর মঠের ভূমিকা

স্বামী প্রভানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ পর্যালোচনার জন্য বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছে দশ হাজার প্রাণচঞ্চল তরুণ-তরুণী, কলকাতা গোলপার্কের ঝলমলে পরিবেশে ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করছে দেশ-বিদেশের সুধীজন, উত্তরকাশীতে গঙ্গার তীরে কুঠিয়াতে তন্ময় হয়ে সাধনভজন করছে সাধু-ব্রহ্মচারী, ইটানগরের হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করছে চির-অবহেলিত গিরিজন, নিউইয়র্কের চোখ-ধাঁধানো হাই-টেক সমাজে বেদান্ত প্রচার করছেন ভারতীয় সন্ন্যাসী—ভাবলে অবাক হতে হয় ক্রমপরিব্যাপ্ত এসকল কর্মসূচীর উৎসমুখে রয়েছে অজ্ঞাতপ্রায় কিন্তু চিরপ্রেরণাপ্রদ বরাহনগর মঠ। বরাহনগর মঠই শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব। এখানেই রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ আশ্রয় করে আদর্শোদ্দীপ্ত একদল ত্যাগী তরুণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা সেই মহৎ ভাবাদর্শকে ব্যক্তিগত জীবনে ধারণ করেছিলেন, গোষ্ঠীজীবনে তাকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তপস্যা-কর্ষিত বরাহনগর মঠে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল, এক উজ্জ্বল মহিমায় ভবিষ্যৎ সূচিত হয়েছিল।

ইতিহাসের বিচারে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বরাহনগর মঠ। লৌকিক-অলৌকিক ঘটনার সমবায়ে উদ্ভূত বরাহনগর মঠের শুভারম্ভ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর। ভারতের রাজধানী কলকাতার উপকণ্ঠে আবির্ভূত হয়ে শাশ্বত ভারতীয় তপস্যাধারার একটি নতুন আবর্ত। খরস্রোত এই আবর্ত সৃষ্টি করে প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তি; ততোধিক অফুরন্ত অনুপ্রেরণা। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে আবর্তটি সরে যায় আলমবাজারে। এই সাড়ে পাঁচ বছর কাল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে অনন্য। এইসময়েই রচিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-সৌধের পীঠিকার প্রথম বিন্যাসটি। একালের তপস্যাই গড়ে তুলেছিল সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ।

ঘটনার পশ্চাতে থাকে ভাব। বাহ্য ইতিহাসের আড়ালে থাকে ভাবের ধারা। সে-ধারার দিকে মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে কাশীপুর বাগানবাড়িতেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পূর্ণ উদ্যোগ হয়েছিল, মঠ-জীবনের ভাবটি দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছিল। বোধ করি এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ কাশীপুর বাগানবাড়ি সম্বন্ধে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "বাস্তবিক এটাই আমাদের প্রথম মঠ।" অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘ বারো বছরের কঠোর সাধনা সাঙ্গ করে 'যোগদৃষ্টিসহায়ে' উপলব্ধি করেছিলেন কয়েকটি ভবিতব্য সত্য। তাদের একটি হচ্ছে তাঁর জীবনে প্রকাশিত উদার মতের বিশেষ অধিকারী একটি নতুন সম্প্রদায়

তাঁকেই প্রবর্তন করতে হবে। শ্রীজগদম্বার উপর সদা-নির্ভরশীল শ্রীরামকৃষ্ণ এবিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি আহ্বান করেছিলেন, আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জগদম্বা-চিহ্নিত ব্যক্তিদের তিনি চিনতে পেরেছিলেন, শ্যামপুকুরে থাকাকালীন সর্বত্যাগে উপযুক্ত যুবকদের বাছাই করে নিয়েছিলেন, কাশীপুরে তিনি মনোনীত যুবকদের বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁদের এগারোজনকে গেরুয়া কাপড় দিয়েছিলেন, এঁদের নেতা হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন সকলের সেরা নরেন্দ্রনাথকে; তাঁকে সর্বোচ্চ জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়ে দিয়ে লোকশিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন; তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ত্যাগী তরুণগোষ্ঠীর দায়িত্ব এবং গোষ্ঠীর সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব অনুসরণের। এভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং গড়ে তুলেছিলেন ভবিষ্য-সঙ্ঘের বীজ। এবং সেটি সমর্পণ করেছিলেন তাঁরই নির্বাচিত নেতা নরেন্দ্রনাথের হাতে। নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানগণ জমি প্রস্তুত করেছিলেন, বীজ রোপণ করেছিলেন ও তার পরিচর্যা করেছিলেন। পরিণতিতে নবোদগত সবুজ অঙ্কুর এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচিত করেছিল। মহৎ ভাবের এই বীজ রোপণ ও অঙ্কুর উদ্গমনের কাহিনী নিয়েই বরাহনগর মঠের ইতিকথা।

স্বামী শিবানন্দের অভিমত, শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসাধনায় ব্রহ্ম-কুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটেছিল। এই জাগরণের ফলে, মহাশক্তিশালী স্প্রিং-এর মতো সম্প্রসারণোন্মুখ রামকৃষ্ণ-আন্দোলন বিকাশের তাগাদায় বরাহনগর মঠ, আলমবাজার মঠ, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানস্থিত মঠের খোলস একটির পর একটি ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তার মূলকেন্দ্রটিকে বেলুড়ের বর্তমান প্রাঙ্গণে সংস্থাপন করেছে। বিশ্ব জুড়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে আন্দোলনের বিকাশের ধারা রয়েছে অব্যাহত। আর ওয়েবার (Weber) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ charisma—শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমায় অসাধারণত্ব, স্বতঃস্ফূর্ততা, শক্তি ও সৃজনীপ্রতিভা তাঁর তরুণ অনুগামীদের তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের ভক্তি, ভালবাসা ও আনুগত্য উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন। পরিণতিতে তরুণদের মধ্যে ভাবনা, অনুভূতি, কর্মশক্তি এবং পরস্পরের মধ্যে নিকট-সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। চোখের সামনে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলে স্বাভাবিক কারণেই এঁদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। সমাজবিজ্ঞানী বলবেন শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে উত্তরণ বা শ্রীরামকৃষ্ণ-উপলব্ধ সত্যের প্রতিষ্ঠানীকরণ (institutionalization) ঘটেছে সমবেতভাবে বৌদ্ধিক স্তরে, ধর্মবিশ্বাসের স্তরে এবং সাংগঠনিক স্তরে। এই তিনটি স্তরেই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনাদি ঘটেছিল এবং পরিণতিতে সঙ্ঘজীবন কতকটা দানা বেঁধেছিল বরাহনগর মঠেই। দানা বাঁধতে বিশেষ সাহায্য করেছিল আঁটপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সার্বিক ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ এবং বরাহনগরে তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে বৈদিকমতে সন্ন্যাসগ্রহণ। এঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ। অব্রাহ্মণের সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল। যাহোক Routinization of charisma বা রামকৃষ্ণ মহিমার প্রথাবদ্ধকরণ প্রাথমিক পর্যায়ে ঘটেছিল

বরাহনগর মঠেই। এই প্রক্রিয়ায় কাশীপুর পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা মুখ্য, অপরপক্ষে বরাহনগর পর্যায়ে নরেন্দ্রনাথই প্রধান। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা সম্যক্‌ভাবে ধারণা করতে হলে বরাহনগর মঠের ইতিহাস অবশ্য বিচার্য।

বরাহনগর মঠের নাম 'রামকৃষ্ণ মঠ' কখনো হয়নি। একটি প্রমাণ তুলে ধরা যাক। ১৫ এপ্রিল ১৮৮৯ তারিখে শ্রীশ্রীমায়ের লেখা একটি চিঠির ঠিকানা ঃ

'পরমকল্যাণীয়/শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী/বাবাজীবন নিরাপদেষু।/বরাহনগর পরামাণিক ঘাট রোড/মুনসীর পুরাতন বাটী/আত্ম-উন্নতি সভা।' অবশ্য ইতোপূর্বে বলরাম বসুর জীবিতকালে মঠবাসিগণের চিঠিপত্র তাঁর ঠিকানাতেই যেত। আলমবাজারে মঠ স্থানান্তরের পাঁচ বছর পরেও নাম-নির্বাচন হয়ে ওঠেনি। ১৩ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন ঃ "মঠের নাম কি হইবে, একটা স্থির তোমরাই কর।" অর্থাৎ মঠের না ছিল কোন সুস্পষ্ট নাম ও ঠিকানা, না ছিল স্থানীয় সমাজের স্বীকৃতি। এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের অনেকেরই মঠের প্রতি ছিল দ্বিধা, অনীহা, এমনকি মৃদু প্রতিবাদও। মুরুব্বি ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ত্যাগী ভক্তদের সাধন-ভজন সম্বন্ধে খোঁটা দিয়ে বলতেন ঃ "তাঁকে দর্শন করেছি। আবার সাধন কি?" কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অনুগামীদের কাউকে "সন্ন্যাসীর বাহ্য চিহ্ন ধারণ করিতে অনুরোধ করেননি।" এসকল বাধা অগ্রাহ্য করে মঠবাসিগণ ত্যাগ ও তপস্যার হোমাগ্নিতে নিজেদের আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

দীর্ঘকালের সোপান বেয়ে নেমে এসে প্রাচীন ভারতীয় সাধনার ধারা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল উনিশ শতকের ভারতবর্ষে, বিশেষত ইংরেজ-শাসিত ভারতের রাজধানী কলকাতাতে। সে-সাধনার ধারা শ্রীরামকৃষ্ণের কঠোর ও গভীর তপস্যায় পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাঁর সাধনার ফসল সমসাময়িক জটিল সমাজে প্রাসঙ্গিক বলে গৃহীত হয়েছিল এবং তদানীন্তন বিপুল বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধ সত্যসমূহ প্রত্যক্ষীকরণ ও স্বাঙ্গীকরণের জন্য মঠের ত্যাগী তাপসগণ সাধন-সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ত্যাগ ও তপস্যায় সমুদ্ভাসিত তাঁদের দিনচর্যা।

তপস্যার জয়গানে মুখরিত ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র। তপ্‌ ধাতু থেকে তপস্যা। তপ্‌ ধাতুর মুখ্যার্থ সন্তাপ, দাহ, অনুতাপ, শারীরিক ক্লেশ, পুণ্য অর্জন ইত্যাদি। তপস্যার অপর একটি শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ অর্থ আলোচনা বা জ্ঞান-বিচার। আচার্য শঙ্কর মুণ্ডক ও তৈত্তিরীয় ভাষ্যে তপঃ শব্দের অর্থনির্ণয়ে জ্ঞান-বিচার, ইন্দ্রিয়মনের একাগ্রতা, প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে তপস্যা খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "খুব তপস্যা চাই"; "তাঁকে লাভ করতে গেলে তপস্যা চাই"; "শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে, কিছু তপস্যার দরকার"; "তপস্যা না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না"; ইত্যাদি। তপস্যার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে কৃচ্ছ্রতার ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে ঊর্ধ্বপদ করে কত তপস্যা

করেছিলেন''; ''ভগবতী নিজে পঞ্চমুণ্ডির উপর বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন''। তপস্যার শক্তি প্রচুর। তপস্যার শক্তিতে অসাধ্য সাধিত হয়। তপস্যার বলেই যেন তাপস ভগবানের কৃপা আদায় করে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ ''তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্ম নেন।'' আমাদের আলোচ্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি উক্তিঃ ''সকলেরই যে বেশি তপস্যা করতে হয়, তা নয়। আমায় কিন্তু বড় কষ্ট করতে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতাম। কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল 'মা' 'মা' বলে ডাকতাম, কাঁদতাম।'' শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সন্তানদের বলতেন, তিনি নিজে ষোল টাং করেছিলেন, তাঁদের এক টাং করলেই হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশেই মঠের তাপসগণের সাধনভজন। তাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ছিল তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বা ঈশ্বরদর্শন। যীশুখ্রীস্ট বলেছেন সাধকের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের কথা। বলেছেনঃ ''Except a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven.''। এই আধ্যাত্মিক উত্তরণের জন্যই সাধন-ভজন। মঠের তাপসগণের অনুসৃত উপায় ছিল প্রবল পুরুষকার ও ঈশ্বরকৃপার উপর নির্ভরতার সার্থক সমন্বয়। যতক্ষণ না ঈশ্বরের কৃপা-বাতাস বইছে ততক্ষণ সাধকের আয়াস-প্রয়াস করতেই হবে। আবার কৃপা-বাতাসের সুযোগ গ্রহণ করতে হলেও প্রয়োজন পাল তোলার, প্রয়োজন পুরুষকারের। তাপসগণের লক্ষ্যে কৃচ্ছ্রতা ছিল না। অবশ্য কৃচ্ছ্রতা, দারিদ্র্য ইত্যাদির ভয়ে তাঁরা কখনো পেছপা হননি। ভোগবিলাসের প্রতি প্রত্যেকের ছিল অনীহা, উপস্থিত ভোগ্যবস্তুর প্রতি ছিল উপেক্ষা। তাঁদের তপস্যার ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁরা সকলেই ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের তপস্যা ছিল সাত্ত্বিক তপস্যা।

স্বামী শুদ্ধানন্দের মতে ত্যাগের বহিঃপ্রকাশই তপস্যা।[১] ত্যাগই প্রধান সাধন। ''ত্যাগ এব হি সর্বেষাং মোক্ষসাধনমুত্তমম্।'' আরো বিস্তারিত করে বলেছেন শাস্ত্রকারঃ ''সুখত্যাগে তপোযোগং সর্বত্যাগে সমাপনম্।'' অর্থাৎ বিষয়-সুখ ত্যাগই তপস্যা এবং সার্বিক ত্যাগরূপ নিঃশেষত্যাগে যোগ সমাপ্ত হয়। এই ত্যাগ আশ্রয় করেই দীর্ঘকাল নিরন্তর ও অত্যন্ত আদরের সহিত সাধন-ভজনে লিপ্ত হয়েছিলেন মঠের তাপসগণ। পুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ সম্মুখে রেখেই তাপসগণ ভিক্ষাটন, জপ-ধ্যান, পূজা-ভজন, পাঠ-বিচার ইত্যাদিতে মেতে উঠেছিলেন। সে-সময়কার মঠজীবন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায় নেতা নরেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ থেকেঃ

''ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরানগরের মঠে কত জপ-ধ্যান করতুম। তিনটার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেউ চান করে, কেউ না করে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসে জপ-ধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের ভিতর কি বৈরাগ্য ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই, তার হুঁশই ছিল না।... এমন দিনও গেছে যখন সকাল থেকে বেলা ৪।৫টা পর্যন্ত জপ-ধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোনরূপে টেনে-হিঁচড়ে আমাদের জপ-ধ্যান থেকে তুলে দিত।... এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে, কিছুই নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হলো তো নুন নেই। এক

একদিন শুধু নুন-ভাত চলেছে, তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই; জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাসছি। তেলাকুচোপাতা সেদ্ধ, নুন-ভাত—এই মাসাবধি চলেছে! আহা, সেসব কী দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত—মানুষের কথা কি!"

খাওয়া-পরা-থাকার অভাব-অনটন-অস্বাচ্ছন্দ্য অগ্রাহ্য করে মঠের তপস্বিগণ লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে চলেছিলেন। কয়েকদিন এঁদের মধ্যে বাস করে কথামৃতকার লিখেছেন তাঁর নিজস্ব স্মৃতি ঃ "আহা, এঁরা কেমন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। স্থানটি যেন সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। মঠের ভাইগুলি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ।"

বরাহনগরে সাড়ে পাঁচ বছরের মঠজীবনে যে ভাবপুঞ্জ বিকশিত হয়েছিল এবং যা মঠজীবনকে ধরে রেখেছিল, সে-সম্বন্ধে ধারণা করা যায় পরবর্তী কালের মঠজীবন লক্ষ্য করলে। যেমন বলা হয়ে থাকে—"ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব" অর্থাৎ ফল দেখেই কাজের বিচার সম্ভব হয়, যেমন ফল দেখে পূর্ব সংস্কারের অনুমান করা হয়। পরবর্তী কালের মঠজীবনের পরম্পরায় বরাহনগর মঠের যে ভাবমূর্তি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে সেটি কঠোর তপস্বীর রূপ। সেখানে দেখা যায় কৃচ্ছ্রতায় ঘেরা পরিবেশে তাপসগণের আত্মমোক্ষের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। দিন-রাত্রির হিসাব নেই সেখানে। তাপসগণের অন্তরে ব্যাকুলতার ঝড়, তাঁদের অনুরাগ ও আবেগের পরাক্রমে সুখ-দুঃখ সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের সকলের মুখে এক কথা—ঠাকুর যা করেছেন, যা আমাদের বলেছেন তা করতে পারলাম কই? ভগবানের দর্শন হলো কই? নানান দিব্যদর্শনের আস্বাদ পেয়েও তাঁরা তৃপ্ত হতে পারছিলেন না। সুদূর লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রেখে তাঁরা সাধনসাগরে পাড়ি জমিয়েছিলেন।

তাপস শশীর সাধন ছিল ঠাকুরঘরকে কেন্দ্র করে। শ্রীরামকৃষ্ণকে মায়িক দেহে তিনি যেভাবে প্রাণমন ঢেলে সেবা করতেন পটস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবন্ত জ্ঞানে তেমনি সেবা করতেন। ঠাকুরের সেবাপূজা শশীর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়গুণে হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। স্বাভাবিক কারণেই ঠাকুরঘরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল মঠজীবন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সেবাপূজাই ছিল মঠবাসিগণের একমাত্র বাধ্যতামূলক কর্ম। মঠবাসিগণের শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের প্রতি আনুগত্য ছিল অপরের দৃষ্টান্তস্থল, সেইসঙ্গে ঠাকুরঘরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অভিপ্রকাশে তাঁদের উপলব্ধি ছিল সকলের প্রেরণাপ্রদ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দীপ্তিমান সন্ন্যাসীদের মঠজীবনের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখতে মঠের ঠাকুরঘর ও শশীর ঠাকুরের সেবাপূজা যে সাহায্য করেছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সত্যোপলব্ধির তীব্র আকাঙ্ক্ষা মঠবাসিগণের তপস্যার হোমাগ্নি উজ্জ্বলতর করে তুলেছিল। সে অগ্নিতে তাপসগণের ব্যক্তিচিত্তের মালিন্য দগ্ধ হয়, চিত্তলোহা ইস্পাতে পরিণত হয়, গড়ে ওঠে তেজসম্পন্ন চরিত্র। এসকল চরিত্র সম্বন্ধে পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ "এরা প্রত্যেকে ধর্মশক্তির এক একটি কেন্দ্রের মতো।"[২] আবার সে অগ্নি যৌথ মানসে অঙ্কুরিত করেছিল যে অনুপম প্রীতি, তা মঠবাসীদের এক অচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রত্যাশাবিহীন ভালবাসার বাঁধনে তরুণ

তাপসদের বশীভূত করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁর সহমর্মী তাপসদের ভালবাসার স্বর্ণসূত্রে বেঁধেছিলেন। এঁদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার স্বরূপটি ব্যাখ্যা করে প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন: "এইরূপ জমাট ভালবাসা কখনো দেখি নাই। একজনের গায়ে চিমটি কাটিলে অপরজনে উঁহু করিয়া উঠে।"[৩] এঁরা একে অপরের গুণগ্রাহী ছিলেন। নেতা নরেন্দ্রনাথের গুণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন অপর সকলেই। কথামৃত-সূত্রে পাই রাখাল সারদাপ্রসন্নকে বলছেন: "কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস? এখানে সাধুসঙ্গ। এ-ছেড়ে যেতে আছে? আর নরেনের মতো লোকের সঙ্গ। এ-ছেড়ে কোথায় যাবি?"

সন্ন্যাস জীবনের ছন্নছাড়া ভাবটি অতিক্রম করে সংহতির যে-সূত্রটি তাপসদের সঙ্ঘজীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল সেটি নির্দেশ করে কেউ বলেছেন আশ্চর্যপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গে তাপসগণের সহবাসের প্রেরণাপ্রদ স্মৃতি, কেউ বলেছেন তাপসগণের পরস্পরের মধ্যে অসাধারণ ভালবাসা, কেউ বলেছেন নরেন্দ্রনাথের অনুপম নেতৃত্ব, কেউ বা বলেছেন তাপসগণের আদর্শের প্রতি আনুগত্য ও আত্মবলি। আমাদের মনে হয় এসকল উপাদানের প্রত্যেকটি অল্পবিস্তর কাজ করেছে।

বরাহনগর পর্যায়ে যাঁরা মঠবাসী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নরেন্দ্র, রাখাল, শরৎ, শশী, তারক, কালীপ্রসাদ, নিরঞ্জন, সারদাপ্রসন্ন, লাটু, বুড়োগোপাল, যোগীন, হরি, সুবোধ, গঙ্গাধর, বাবুরাম, তুলসী ও হরিশ। একমাত্র শশী ভিন্ন তাপসগণের সকলেই আলোচ্যকালের বেশ কিছু অংশ চিরাচরিত পরিব্রজ্যার আকর্ষণে বা অধিকতর নির্জনস্থানে সাধন-ভজনের আকাঙ্ক্ষায় বা তীর্থদর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন। এদের অধিকাংশই ঘুরে ফিরে মঠে এসে জুটতেন। মঠের বাইরে বসবাসের সময় তাপসগণের ধারণা স্পষ্টতর হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিক্ষা অতুলনীয়। বাইরের অভিজ্ঞতার আলোকে ঘরের মর্যাদা বেড়ে গেছিল। হৃষীকেশ থেকে শরৎ লিখেছিলেন বলরামবাবুকে: "বাহিরের ভাব দেখিলে তিনি যে কি ছিলেন তাহা কতকটা বুঝা যায়।" নরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছিলেন: "এ দুনিয়া ঘুরে দেখেছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই ভাবের ঘরে চুরি।" বিভিন্ন স্থান থেকে ভাল ভাল রীতি-নীতি সংগ্রহ করে তাঁরা বরাহনগর মঠে প্রবর্তন করেছিলেন।

আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ ছিলেন আনন্দের সন্তান। এঁদের কেউই গোমড়ামুখো তপস্বী ছিলেন না। এঁরা একসময়ে যেমন জপ-ধ্যানের অতলে তলিয়ে যেতেন, আবার অপর সময়ে একক সঙ্গীতে ও বাদ্যে, সমবেত ভজন-কীর্তনে, যৌথ নৃত্যে মেতে উঠতেন। দিনচর্যার ফাঁকে ফাঁকে হাস্য-পরিহাস, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, মঠের অঙ্গদের পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। শিবরাত্রির পরবর্তী সকালে কথামৃতকার দেখছেন যেন সেখানে আনন্দের হাট বসেছে। সাধন-ভজনের দুস্তর দীর্ঘ পথে এ-ধরনের আমোদ-প্রমোদ পথশ্রমকে সহনীয় করে তুলতে, প্রত্যাশিত অগ্রগতিতে ব্যর্থতার বেদনাকে লঘু করতে এবং নতুন উদ্যমে তাপসদের লক্ষ্যাভিমুখে চলতে সাহায্য করেছিল।

তপস্যার অঙ্গ হিসাবে শাস্ত্রপাঠ হতো, বিচারের আসর বসত। শাস্ত্রপাঠে কালীপ্রসাদের ছিল গভীর প্রীতি। বিচারের আসরে নরেন্দ্রনাথের শাণিত বুদ্ধির ঝলক সকলকে বিস্মিত করত। পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য নরেন্দ্রনাথের ১৯ নভেম্বর ১৮৮৬ তারিখে লেখা চিঠির একটি অংশ : "প্রত্যুতঃ এ-মঠে সংস্কৃতশাস্ত্রের বহুল চর্চা হইয়া থাকে।... এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিবার অভিলাষ।" শাস্ত্রচর্চাদি ছাড়াও তাপসগণের সৃজনীমূলক প্রতিভা বিভিন্নভাবে স্ফুরিত হয়েছিল। কালীপ্রসাদ অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচনা করেছিলেন 'লোকনাথশ্চিদাকারো' স্তোত্র যার শেষাংশ 'নিরঞ্জন নিত্যমনন্তরূপং' ইত্যাদি ভক্তমহলে অতি পরিচিত। এ-কালেই নরেন্দ্রনাথ 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্কসুন্দর' গানটির রচনা ও সুরদান করেছিলেন।

তাপসগণের নিজেদের অসুখ-বিসুখে কথাই নেই, গৃহী ভক্তগণেরও রোগমুক্ত করবার জন্য তাপসগণের সেবাশুশ্রূষা তাঁদের সেবার ভাবটি স্ফুরিত করেছিল। এবিষয়ে শরৎচন্দ্রের ভূমিকা ছিল অগ্রণীর।

পরবর্তী কালে সঙ্ঘজননী রূপে সমাদৃত শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা কিছু ছিল কি? তিনি বরাহনগর মঠে কখনো পদার্পণ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী গোলাপ-মা, গৌরী-মা, গোপালের-মা প্রভৃতি স্ত্রী-ভক্তদের মুখে শুনে তাপস-সন্তানগণের কঠোর জীবন সম্বন্ধে তিনি পরিচিত ছিলেন। সন্তানদের খাওয়া-পরা গৃহাচ্ছাদনের জন্য তিনি কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছিলেন। বোধগয়াতে সেখানকার মঠের ঐশ্বর্য দেখে তিনি আকুল হয়ে ঠাকুরের কাছে তাঁর সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। ইতোমধ্যেই তাপসদের কেউ কেউ একটি বিশ্বাস আশ্রয় করেছিলেন, আর যাই হোক তাঁদের একজন 'মা' আছেন। বিপদে-আপদে অনুভব করতেন 'শিয়রে জাগে কার আঁখি রে!'

নতুনকে গ্রহণ করতে ভারতীয় সমাজ চিরকালই দ্বিধাগ্রস্ত। বরাহনগরের সন্ন্যাসীদের মঠকে সমাজ ভাল চোখে দেখেনি; অবজ্ঞা পরিহাস এমনকি অত্যাচার[৪] পর্যন্ত করেছিল। বাংলাদেশে বৈদিক সন্ন্যাস প্রায় অপ্রচলিত ছিল। উপরন্তু প্রচলিত শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য করে অব্রাহ্মণ তাপসগণের বিদ্বৎসন্ন্যাসগ্রহণকে গোঁড়া সমাজপতিগণ মেনে নিতে পারেননি। 'রামক্রীশ্চান', 'পরমহংসের ফৌজ' ইত্যাদি অভিধায় সম্বোধন, পাড়ার ছোকরাদের 'প্যাক দেওয়া' ইত্যাদি তাপসগণকে বিব্রত করতে পারেনি। রামচন্দ্র দত্তের গোষ্ঠী, নিত্যগোপালের অনুরাগীর দল বা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভাংচি[৫] তাঁদের দমিত করতে পারেনি। এমনকি 'বহুসংখ্যক শক্তিশালী সঙ্ঘের' আক্রমণও তাঁদের বিচলিত করতে পারেনি।[৬] বরং এসকল বাধা-বিপত্তি তরুণ তাপসগণের প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়তর করেছিল, তাঁদের মহৎ সঙ্কল্পকে বাস্তব-রূপায়ণে প্রকারান্তরে উৎসাহ জুগিয়েছিল। এর ফলে কয়েকবছরের মধ্যেই মঠবাসিগণের মহৎ ভাবের অনিবার্যতা সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, ক্রমে বিপরীত দিকে স্রোত বইতে শুরু করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার অমোঘ শক্তি অনেক শিক্ষিত তরুণের হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। মনে রাখতে হবে তখনো বিবেকানন্দ কলকাতাতে প্রায় অপরিচিত। তখনো স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববরেণ্য হয়ে উঠতে দেরি

রয়েছে। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই দেখা গেল বেশ কিছু যুবক বরাহনগর মঠে নিয়মিত যাতায়াত করছে। 'কলেজ-পার্টি' ও 'স্কুল-পার্টি' বলে পরিচিত দুটি দলের ডজনখানেক তাজা তরুণ এই নতুন ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হয়েছে। তাদের অনেকেই ক্রমে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন।

তাপসগণ নিজেদের বলতেন দানা-দৈত্য। কোন কিছুতেই তাঁদের ভয়ডর ছিল না। কোন সঙ্কল্প রূপায়ণই যেন তাঁদের অসাধ্য ছিল না। নেতা নরেন্দ্রনাথ কয়েকবছর পরে একটি চিঠিতে তাঁদের মনের ভাবটি প্রকাশ করেছিলেন। লিখেছিলেন ঃ "কূর্মস্তারকচর্বনং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।" কাম-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠার বাসনা কাকবিষ্ঠার মতো ত্যাগ করে রামকৃষ্ণদাস তাপসগণ দুর্জয় দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সমবেত চর্যায় সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায় রামকৃষ্ণ মহিমার 'প্রথাবদ্ধীকরণ' (Routinization) অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল; অধ্যাত্মবিজ্ঞানীর ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জাগরিত ব্রহ্মকুণ্ডলিনী শক্তি ত্যাগী তাপসগণকে আশ্রয় করে একটি প্রবল শক্তিসম্পন্ন শক্ত্যাধার সৃষ্টি করেছিল, গড়ে তুলেছিল রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের নিউক্লিয়াস (nucleus)।

সামগ্রিক বিচারে তপস্যাদীপ্ত বরাহনগর মঠকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়েছিল একটি অনন্তধারার কুণ্ড তুলনায় কতকটা কাবেরী-উৎস থল্-কাবেরীর মতো। তপস্যা-সমুদ্ভূত ভাবামৃত সঞ্চিত হয়েছিল এই কুণ্ডে; এখান থেকে উৎসারিত হয়েছিল প্রাণদ, বলদ একটি ভাবধারা, যা একশ বছরের মধ্যেই আবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে সর্বজনসমাদৃত শক্তিশালী রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন।* □

পাদটীকা

১ উদ্বোধন, ১৮ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৃঃ ২৩
২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ২৪৮
৩ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১৩৫৫, পৃঃ ৩০
৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১৬৪
৫ Swami Vivekananda : Patriot-Propet–B. N. Dutta, 1954, p. 186
৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১৪৪

* ৯১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

শ্রীশ্রীমা ঃ মর্যাদার মহত্তমা প্রতিমা

প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

ভারতের নারী আজ পশ্চিমের নারীদের সঙ্গে সমতালে প্রগতির পথে অগ্রসর। মধ্যযুগীয় নারী অথবা উনিশ শতকের নারীর মতো আজ সে অন্তঃপুরে বন্দী নয়। পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রেই আজ নারী নিজের শক্তির পরিচয় দিয়ে চলেছে। বর্তমানে আমেরিকান নারীদের সমকক্ষতা লাভের জন্যও তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই ধাবমান। বেশবাস, প্রসাধনেও আজ লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা জীবিকার্জনের জন্য যে-কোন বৃত্তি অবলম্বনে আগ্রহী। স্বাধীন বৃত্তি অনেক ক্ষেত্রেই আনছে স্বনির্ভরতা ও মর্যাদাবোধ। আবার কোন কোন পরিস্থিতিতে বিপরীত প্রতিক্রিয়াও দেখা যাচ্ছে। শিক্ষাদীক্ষা পেয়েও বহু নারী হীনম্মন্যতায় ভুগছে, অন্যদিকে বহু নারী আজও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও একটা সংগ্রামের ভাব অবশ্যই দেখা দিয়েছে। অস্বীকার করা যাবে না, নানাদিক থেকেই আজ মেয়েদের জীবনে অভূতপূর্ব আলোড়ন এসেছে। একশো বছর আগে মেয়েদের ঘনঘন বিদেশযাত্রার কথা কি স্বপ্নেও ভাবা যেত? অথচ আজ বহু উচ্চশিক্ষিতাই নিজের কৃতিত্বে বিদেশে যাচ্ছেন এবং সেখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেদের মানিয়েও নিচ্ছেন। স্বামীজী একসময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ "মা-ঠাকুরানী ভারতে... সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন।" আধ্যাত্মিক জাগরণের কথা বাদ দিলেও বলা যায়, জাগতিক জীবনে যে-রূপান্তর এসেছে তা কোন অংশেই কম নয়। মেয়েরা আজ শিক্ষার জগতে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, চিকিৎসাবিদ্যায়, প্রশাসনিক দক্ষতায়, এমনকি খেলাধূলার আসরেও প্রতিভা ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। আমাদের মনে হয়, এক নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন ঘটছে—যা রোধ করা অসাধ্য। বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও আজ অস্বীকার করা যায় না। তবে সে-সভ্যতার জলুস থেকে মুক্ত হয়ে একদিন নিশ্চয়ই ভারতীয় নারী আত্মস্থ হবে—ফিরে আসবে অধ্যাত্মচেতনায়, তার স্বকীয় মহিমার জগতে। ফিরে পাবে আপন মর্যাদা—নিজের জীবনাচরণে ও আত্মবিশ্বাসে। সেইজন্যই এবার মর্যাদাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের আগমন—যিনি যথার্থই স্বামী অভেদানন্দের ভাষায় 'যুগধর্মপাত্রী'।

মেয়েদের শিক্ষা তো মায়ের কাছেই হয়। এ আর নতুন কথা কী? নারীর জীবনে, কি এদেশে কি বিদেশে, সর্বত্রই আজ মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্ন উঠেছে—আলোড়ন ও সংগ্রাম সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপ নিচ্ছে। বহু মেয়ে সমাধান বা আলোক চাইছে অন্তর থেকে। নারী-স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান শর্ত নারীর মর্যাদারক্ষা। আমাদের সামনে ধ্রুবজ্যোতি শ্রীশ্রীমা। তিনি

সর্বদাই স্বমহিমা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা। তিনি কথায়, কাজে, আচরণে, জীবনচর্যায় এমনকি সেবা-পরিচর্যার ক্ষেত্রেও কোনদিন মাত্রা অতিক্রম করেননি। শুধু নিজের মর্যাদাই নয়, প্রতিপদে অপরের মর্যাদা রক্ষা করেছেন—অন্যকে মর্যাদা দান করেছেন অকুণ্ঠিতচিত্তে। মায়ের জীবন উদার আকাশের মতো। পাখির গতি মুক্ত আকাশে, আকাশ ছুঁতে সে কোনদিনই পারে না। আকাশ যেমন দূরে তেমন দূরেই থেকে যায়। আমরাও যত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করছি, ততই ধীরে ধীরে ক্লান্তচরণে মায়ের কাছেই ফিরে আসছি। মা আকাশের মতোই নিঃসীম, কিন্তু দেশ ও কাল অতিক্রম করে ভাবী যুগের নারীজীবনে অনুপ্রেরণা বহন করার মতো আদর্শ মায়ের জীবনে উজ্জ্বল। আজকের অস্থির জীবনের আবর্তে করুণা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ এমন একটি আত্ম-সমাহিত ও মর্যাদাময় জীবন আমাদের বড় প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার মাস্টারমশাইকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "আমার সঙ্গে কি আর কারু মেলে? কোন পণ্ডিত কি কোন সাধুর সঙ্গে?" মাস্টারমশাই উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকেদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন। যেমন আইন অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে।" অবতার প্রতিবারেই 'অচিনে গাছ'—সাধারণ মানুষের সঙ্গে তো নয়ই, এমনকি রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্য—এদের সঙ্গেও সর্বাংশে মেলে না। এবারে তিনি যেন মানুষের বড় বেশি কাছে এসেছেন, পাঁচজনের একজন হয়ে, ঐশ্বর্যবিহীনরূপে লীলা করেছেন। মায়ের ক্ষেত্রেও আমরা একই ধ্যানধারণা করে চলেছি। কখনো কালী, কখনো দুর্গা, কখনো জগদ্ধাত্রী অথবা অন্যান্য যুগের অবতারসঙ্গিনী—সীতা-রাধা-বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাইছি। মায়ের সত্তা কিছুটা চেনা, অনেকটাই অচেনা। তাঁর আবির্ভাব ভারত-ইতিহাসের এক মহালগ্নে। তাঁর একটি বিশেষ অবদান আছে, যা সাধারণত অবতারদেরই থাকে। সেই সক্রিয় ভাবী ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "এ আর কি করেছে, তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।" মায়ের ঐশী মাতৃত্ব সব সাধকের ভাবনা-কল্পনা ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাকে অতিক্রম করে এক অভিনব আদর্শ স্থাপন করেছে—নারী এবং পুরুষ উভয়ের সামনে। মায়ের মহিমার ইতি করতে না পেরে স্বামী প্রেমানন্দ লিখেছিলেন ঃ "শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধারানী—এঁদের কথা শুনেছ। মা এঁদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবভক্তি, বিবেক-বৈরাগ্য ও প্রেমসমাধি তাঁকে স্বতন্ত্র করেছিল সাধারণের থেকে। এটি সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য। শ্রীমা ঠাকুরের শক্তি। আমাদের একটা সহজ ধারণা—শক্তি হলে ঐশ্বর্যও থাকবে। কই মায়ের তো কোন ঐশ্বর্যের প্রকাশ ছিল না! স্বামী প্রেমানন্দ আমাদের সন্দেহভঞ্জন করে বললেন ঃ "ঠাকুরের বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু মার বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত—এ কি মহাশক্তি!" মায়ের চরিত্রের অনুধ্যান তাই কঠিন। আধুনিক শিক্ষা তাঁর ছিল না, বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গেও তাঁর কোন পরিচয় ছিল না। আজকে বিজ্ঞানের অবদানে সমস্ত বিশ্বের মানুষ ভাববিনিময় করতে পারছে অনায়াসে।

মায়ের সে-সুযোগ ছিল না। তিনি অন্তরালে থাকতেন। অথচ স্বামীজী এই মাকেই কেন্দ্রে রেখে মেয়েদের জাগরণ ঘটবে—এমন একটি ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন। গুরুভাই স্বামী শিবানন্দকে লিখলেন : "মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনো কেহই পার না, ক্রমে পারবে।" লিখলেন : "দাদা, রাগ করো না, তোমরা এখনো কেউ মাকে বোঝনি।" শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাচরণ দেখে তিনি ঐ পরম মর্যাদাময়ীকে বুঝেছিলেন। তাই মায়ের কলকাতায় আসার ব্যাপারে বলরাম বসুকে লিখেছিলেন : "মাতাঠাকুরানীর যে-প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোন্ নরাধম—তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কথা কহি!" এই মাকে দর্শন করেই তিনি নারীর পরিপূর্ণ মহিমা বুঝেছিলেন। মুক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী মার্কিন মহিলারাও স্বামী বিবেকানন্দের কাছে পেয়েছিলেন মর্যাদা ও সমানাধিকারের সম্মান, তবে শ্রীশ্রীমাকে না দেখা পর্যন্ত "পূর্ণ নারীত্ব মানে পূর্ণ স্বাধীনতা"—একথাটি তাঁরা তখনো বুঝতে পারেননি। বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যের নারীদের বলেছেন : "সেই সর্বমহিমময়ী—যিনি আমায় এই শরীর দিয়েছেন তিনি কোথায়?... কোথায় তিনি, যিনি আমার প্রয়োজন হলে বারবার জীবন দিতে প্রস্তুত? কোথায় তিনি, আমার প্রতি যাঁর অফুরন্ত স্নেহ—তা আমি যতই দুষ্ট বা হীনপ্রকৃতির হই না কেন?" বাস্তবিক, এ তো ভারতীয় জননীর মহিমময়ী মূর্তি—শ্রীশ্রীমার মধ্যে যে-ভাবের অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীগুরু গ্রহণ, নারীভাবে সাধন এবং মাতৃভাব প্রচারের মূলে ছিল নারীর মর্যাদা পুনরুদ্ধারেরই ইতিহাস।

সেই একশো বছর আগেই আমেরিকায় মেয়েরা মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে সংগ্রাম শুরু করে দেন। উচ্চশিক্ষিতা স্বাধীনচেতা বহু মহিলা সমাজের নিচুতলার খেটে খাওয়া নারীদের মর্যাদার দাবি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। শিকাগোর ধর্মমহাসভা উপলক্ষে গঠিত কার্যকরী সমিতির মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নারী ছিলেন। 'বোর্ড অব লেডি ম্যানেজার'দের প্রেসিডেন্ট মিসেস পটার পামার নারীদের দ্বারা নির্মিত গৃহ ও সজ্জিত প্রদর্শনীটির উদ্বোধনী ভাষণে বলেন : "নারীর অধিকারের প্রতি বহুযুগের নীরব উপেক্ষা, নারীর স্বনির্ভরতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিকূলতাই হলো সমাজের সবচেয়ে অবিচার।... সুখের সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রীর ভূমিকা যাঁদের, তাঁরা ভাগ্যবতী। কিন্তু সবাই তো সংসার-সাম্রাজ্যের ইন্দ্রাণী নন। বহু নারী অবমাননার মধ্যে, আত্মমর্যাদাহীন হয়ে বাস করছেন—তাদের জন্য নেমে আসুন, এসে অভাগিনী ভগিনীদের পাশে দাঁড়ান। মুষ্টিমেয় মহিলার জন্য পূজাবেদি প্রতিষ্ঠার চেয়ে সহস্রগুণ কাম্য সমগ্র নারীজাতির স্বাধীনতা ও তাদের প্রতি সুবিচার।"[১] ভাষণের এই অংশটুকু বলে দেয়, তখন সর্বস্তরে সমানভাবে শিক্ষা ও সুযোগ পৌঁছায়নি। নারীর পাশে নারীকেই দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন মহিলারা। আশ্চর্য, মায়ের মধ্যে তখনই আমরা ঐ ভাব দেখি। তিনি সকলের পাশে রয়েছেন, সমাজকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে একটা পরিমণ্ডল রচনা করেছেন।

এই আমেরিকান নারীদের মধ্যে জায়াভাবের প্রাধান্য। মাতৃভাব, গুরুভাব বা দেবীভাব সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা নেই। ১৮৯৮ সালে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও

সংস্কৃতির, বলা যায় শ্রেষ্ঠতম নারী-প্রতিনিধি—ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস সারা বুল ও মিস ম্যাকলাউড এলেন ভারতে। দেখলেন মাকে। বহু অভিজাত গৃহিনীর মধ্যে সরলা এক পল্লীবালা অসামান্য মর্যাদায় বসে আছেন। চারপাশের অশিক্ষা, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে একটি মুক্তমনের উদার আকাশ। মা তাঁদের সঙ্গে আহার গ্রহণ করলেন। কথাবার্তাও হলো। এঁদের মন ভারতীয় নয় এবং পূর্ব ধারণার দ্বারা আচ্ছন্নও নয়। কিন্তু এক লহমায় তিনজনের অভিজ্ঞ চোখ ও পরিশীলিত মনই মাকে চিনে নিল অসামান্যা বলে, যেমন করে আমেরিকায় তাঁরা চিনেছিলেন নবযুগের প্রফেট স্বামীজীকে। মিসেস এরিক হ্যামন্ডকে নিবেদিতা অল্পদিন পরেই লিখছেন ঃ "তিনি (শ্রীশ্রীমা) অনাড়ম্বর সহজ সাজে পরম শক্তিময়ী এক নারী।" কয়েক বছর পরে বলেছেন ঃ "আমার ধারণায় তিনি বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।" মায়ের সম্পর্কে প্রযুক্ত বিশেষণগুলি এবং তাঁদের বলার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় তাঁরা কোন দেবী বা জননীর নয়—মর্যাদাময়ী এক নারীর মূল্যায়নে রত। মিসেস ওলি বুল মাকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ গুরুর প্রতি আনুগত্য বলতে কী বোঝায়? সেই 'গুরুবাদ'-এর দিনে মায়ের আশ্চর্য উক্তিটি মিসেস বুল ম্যাক্সমূলারকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন ঃ "কারুকে গুরু নির্বাচন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর সব কথা শুনতে বা মানতে হবে। কিন্তু ঐহিক বা বাস্তবজীবনে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে কাজ করলে কোন দোষ হবে না।" মায়ের এই উত্তর তাঁর স্বকীয়তারই পরিচয়। যোগীন-মা একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শ্রীমা ঠাকুরের একান্ত অনুগত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর কথা মানেন না কেন! মা হেসে বলেন ঃ "তা যোগেন, মানুষ কি সব কথাই মেনে চলতে পারে?" মাতৃত্বের গৌরবে তাই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশও মানতে পারেননি বহুক্ষেত্রে।

পবিত্রতাস্বরূপিণীকে গভীরভাবে চিনেছিলেন মিস ম্যাকলাউড। মায়ের লীলাবসানের পরে ম্যাকলাউডের উক্তি যুগান্তকারী, যা মায়ের মানবীয় মহিমা বা মর্যাদারই কথা আমাদের স্মরণ করায়। তিনি লিখেছিলেন ঃ "সেই নির্ভীক, শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি তাহলে নির্বাপিত হলো—আধুনিক হিন্দুনারীর কাছে যা রেখে গেল আগামী তিন হাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে তারই আদর্শ।" এঁরা যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক। তুলনায় মায়ের শরীরত্যাগের পর সুধীরা দেবীর লেখা গানটি তুলে ধরছি, যে-গানে মায়ের দেবীত্বেরই স্তুতি ঃ

"কোথা গো মা জননী আমার
সাধনার ধন রামকৃষ্ণপ্রাণ
সত্য কি মা করিলে লীলা অবসান।
কত যোগী ঋষিগণ যে চরণ ধ্যানে নাহি পায়
আমি কৃপায় পাইনু হেলায় হারানু
বুঝিতে নারিনু মহিমা তোমার।"

এ অবশ্যই আমাদের প্রাণের কথা—ভারতীয় সুরে কথা। পাশ্চাত্যের মেয়েদের মূল্যায়নটি আগে তুলে ধরলাম, কারণ এঁরা মায়ের মধ্যে দেখেছিলেন পরিপূর্ণ মানবিক মর্যাদা—যা তখন পাশ্চাত্য নারীদের মধ্যেও তাঁরা দেখেননি।

অবশ্যই তার অন্তরালে ছিল এক গভীর অধ্যাত্মজীবন যা একান্তই ভারতীয় ঐতিহ্য, যার সন্ধানে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন।

মায়ের শৈশবের পল্লীজীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। গ্রামের লোকসংস্কৃতির একটা ছাপ তাঁর চরিত্রে ছিল। গ্রামে দরিদ্র ঘরের শতসহস্র মেয়ে যেমন কঠিন জীবনসংগ্রামে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, মা-ও ঠিক সেইরকম দুঃখময় জীবনকেই বরণ করে নিয়েছিলেন শুধু শৈশবেই নয়, সমস্ত জীবনে। আজকের জীবনযাত্রার কোন স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর ছিল না—অতি সাধারণভাবে তিনি বড় হয়েছেন। মায়ের জীবন অভিজাত ঘরে ঐশ্বর্যের মধ্যে কাটেনি। একান্তই আটপৌরে দরিদ্র পল্লীবধূ তিনি।

প্রবাসী স্বামী বিদেশ থেকে বারবার ঘরের টানে ফেরেন। শ্রীশ্রীমার ক্ষেত্রে সবটাই বিপরীত। তাঁর অনিকেত স্বামী শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সারাতে কামারপুকুরে যান, আর তাঁর তরুণী বধূ পায়ে হেঁটে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে দক্ষিণেশ্বরে স্বামীর কাছে যেতেন। সারাদিনমান নহবতের ঘর—যাকে আজকের ভাষায় 'ওয়ান রুম ফ্ল্যাট'-ও বলা যায় না, তার চেয়েও ছোট, দুটো দেওয়ালের মধ্যে ৭ ফুট ৫ ইঞ্চির তফাত—এমন ক্ষুদ্র ঘরে বাস এবং দিবারাত্র পরিশ্রম। ভক্তদের অবিরাম যাতায়াত। মা সারাদিন রান্না ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত। কখনো সাহায্যের জন্য কোন ভক্তমহিলা থাকেন—কখনো রুটি বেলার লোক খুঁজে পান না। শ্রীরামকৃষ্ণকেও কোনদিন তিনি নিজের কায়িক ক্লেশের কথা জানাননি, অসুবিধার কথা মুখ ফুটে বলেননি। যখন শরীর অসুস্থ হয়েছে, সেবা নিতে হবে ভেবে জয়রামবাটীতে দরিদ্র মায়ের ঘরে ফিরে এসেছেন। চিকিৎসা হয়নি, মা সিংহবাহিনীর কাছে 'হত্যা' দিয়ে সুস্থ হয়েছেন। ঠাকুরের কাছে টাকাকড়ি কিছুই চাননি। এমনও হয়েছে—দক্ষিণেশ্বরে পা দেওয়ামাত্র হৃদয়ের অপমানজনক ব্যবহারে নীরবে ফিরে গেছেন—তাঁর স্থান হয়নি থাকার। এই জীবনসংগ্রাম ও সমস্যার মধ্য দিয়েই তিনি পথ চলেছেন। এর ফলে তাঁর মধ্যে দেবীত্ব ও মাতৃত্বের সঙ্গে মানবীয় মহিমা ও শক্তির স্ফুরণ ঘটেছে। পরবর্তী কালে সংসারের মধ্যে তাঁর একক সংগ্রামের পটভূমি যেন কোন অদৃশ্য হাতে রচনা করা হয়েছে। আমরা দেখছি, এইসব পরিবেশেও কখনো তিনি মুখ ফুটে কিছুই দাবি করছেন না, বরং মানিয়ে চলছেন। নিজে আনন্দে থেকে সকলকে আনন্দ বিতরণ করছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'আনন্দময়ীর মূর্তি'। আজ হাজার হাজার টাকা স্বামী রোজগার করলেও মেয়েদের মন ভরছে না। চাহিদা ও দাবি যেন ক্রমাগত বেড়ে গিয়ে নারীকে মহিমাচ্যুত, অশান্ত করে তুলছে। অথচ মায়ের না ছিল ঐশ্বর্য, না গৃহসুখ, না স্বাচ্ছন্দ্য। এইসবের মধ্যেও তিনি নীরবে সাধনা করেছেন—সে-সাধনায় অন্য সিদ্ধির কথা আমরা না বুঝলেও বুঝি আত্মসংযম, আত্মত্যাগ ও আত্মমর্যাদার সাধনায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনেও তার দিব্য প্রকাশ ঘটেছে। মর্যাদার পরীক্ষা তাঁকে প্রথম থেকেই দিতে হয়েছে।

শ্রদ্ধা-ভালবাসা এবং অনেক উদ্বেগ নিয়ে তিনি যেবার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে ও সেবা করতে উপস্থিত হলেন, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" নারীর

এই একটা ভূমিকা যেন নির্দিষ্ট করা ছিল—যা তার মর্যাদার পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। নারী সম্পর্কে এই ছিল যেন সমাজের সনাতন ধারণা—"নারী নরকের দ্বার", "প্রলুব্ধ করাই তার স্বভাব", "নারী ধর্মপথের অন্তরায়"। এটি মর্মান্তিক প্রশ্ন তাঁর কাছে, যিনি চার বছর প্রতীক্ষায় থেকে নিজের সুখের জন্য নয়, তাঁকে সেবা করার আগ্রহে ছুটে এসেছেন। মা এই প্রথম দৃঢ়স্বরে যেন সমস্ত নারীদের হয়ে ঘোষণা করলেন : "না।" উলটে আরেকটি প্রশ্ন করলেন : "তোমায় সংসারপথে কেন টানতে যাব?" (অর্থাৎ তোমার ত্যাগের পথকে আমিও বরণ করেছি।) তারপর আশ্চর্য আশ্বাস—"আমি তোমার ইষ্টপথে সাহায্য করতে এসেছি।" যেন ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্তের ঘোষণা শুনতে পেলাম—"অমন্তবো মাং উপক্ষিয়ন্তি"—আমাকে যারা অবজ্ঞা ও অসম্মান করে তারা ক্ষয় পায়, বিনষ্ট হয়। তখনকার দিনে বহু-পূজিত ও সম্মানিত পুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই মানুষকে সাহায্য করবেন একটি নারী? মায়ের এই ভূমিকার কথা পরে শ্রীরামকৃষ্ণই গোলাপ-মায়ের কাছে বলেন : "ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে", "ওকি যে সে, ও আমার শক্তি।" তিনি স্বয়ং শ্রীশ্রীমাকে পূজা নিবেদন করেন। মা নিজের স্বকীয় সত্তাকে উন্মোচিত করেছিলেন এবং তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যুগাবতার স্বয়ং। মানবীতে দেবীর মহাপ্রকাশ ঘটল—অবিদ্যাশক্তি পরাস্ত হলো শ্রীবিদ্যার কাছে।

এতদিন স্ত্রী স্বামীকে পূজা করেছেন, এবার স্বামী স্ত্রীর চরণ পূজা করলেন—দেখালেন, যে-মহামায়ার রূপরসাত্মক বিকার মানুষকে বদ্ধ ও উন্মাদ করে তারই সাত্ত্বিক বিকাশ মানুষকে মুক্তি দেয়, পরম প্রাপ্তির পথে পৌঁছে দেয়। আরেকটি ঘটনা মনে পড়ছে—সেও মায়ের চরিত্রের নীরব মর্যাদার দিক। শ্রীরামকৃষ্ণের দেখাশোনা আত্মীয়স্বজনরা নয়, ভক্তরাই করেছিলেন—অসুস্থ হলে চিকিৎসা পথ্য সবই। মা দূর থেকে নীরবে সেবা করতেন। ঠাকুরকে হঠাৎ ভক্তেরা শ্যামপুকুরে নিয়ে গেলেন চিকিৎসার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর তিনি কখনো কোন দাবি করেননি, ভক্তদের দাবিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দক্ষিণেশ্বরে তখন মা একাটি, কাজকর্ম তেমন নেই, একটি মেয়ের কাছে পড়াশুনার পাঠ নেন। ঠাকুরের এই আকস্মিক স্থানান্তরের কারণ নির্ণয় করতে না পেরে গোলাপ-মা যোগীন-মাকে বলেই বসলেন : "ঠাকুর বোধহয় মার ওপর রাগ করে চলে গেছেন।" কথাটি শুনে লজ্জাশীলা মা কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে গাড়ি ডাকিয়ে শ্যামপুকুরে ঠাকুরের কাছে গেলেন। ঘটনাটি আমরা সবাই জানি। ঠাকুর বললেন : "গোলাপ তোমায় এই কথা বলে কাঁদিয়েছে! গোলাপ জানে না তুমি কে?" কিন্তু আশ্চর্য, মা মুখ ফুটে বললেন না—আমাকে সেখানে একা ফেলে এলে কেন? অথবা আমাকে সেবার জন্য নিয়ে এস। কী আশ্চর্য মর্যাদাবোধ! তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন—একা থাকার জন্য। পরে অবশ্য ভক্তেরা নিজেরাই অসুবিধা বোধ করে তাঁকে আনার প্রস্তাব করে।

এই মাকেই আবার বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখি—যখন এক পাগলীকে শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রাম্যভাষায় তিরস্কার করছেন। সে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অন্য ভাব নিয়ে উপস্থিত হওয়ায় বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ উত্যক্ত শিশুর মতো তাকে

গালাগালি করছেন। মা মেয়ের এই অপমানে লজ্জায় মরে গেলেন। গোলাপ-মাকে বললেন ঃ "ও যদি কোন অবিবেচনার কথা বলেই থাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়।" পরে ঐ মহিলাকে নিজের কাছে আনিয়ে শান্ত করলেন। নারীর প্রতি নারীর এই ব্যবহারই তো বাঞ্ছনীয়। নারীর বিপদে, নারীর অসম্মানে রুখে দাঁড়ানোর আরো বহু দৃষ্টান্ত মায়ের জীবনে আছে। মর্যাদালাভের অন্তরালে এই মর্যাদাদানের একটা বড় ভূমিকা থাকে।

মাকে পরম মর্যাদাদান করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু পূজা করে নয়, তাঁর ওপর—একজন নারীর ওপর—তাঁর ভাবী সঙ্ঘের ও বৃহত্তর লোককল্যাণের দায় অর্পণ করে। নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির এ এক বিরাট স্বীকৃতি। জগতের ইতিহাসে একটি অধ্যাত্মসঙ্ঘের নেতৃত্বে নারীকে সসম্মান মর্যাদাদান এযুগেই সম্ভব হয়েছে। দীক্ষাদান প্রভৃতি মেয়েরা করেছেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার অধ্যাত্মশক্তি অতুলন। নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবী দেবীও খুব উচ্চ অধ্যাত্মভাবসম্পন্না ছিলেন। কিন্তু তিনি এবং দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সমস্ত বৈষ্ণবসমাজকে পরিচালিত করেননি। এবিষয়ে শ্রীশ্রীমা এক ব্যতিক্রমী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মাকে আবার দুটি আশ্রমের মর্যাদা রেখেই চলতে হতো। ব্যক্তিগতজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণই মর্যাদারক্ষার মন্ত্রটি তাঁকে শিখিয়েছিলেন ঃ "দেখ, কারো কাছে একটি পয়সার জন্যও চিতহাত করো না।... একটি পয়সার জন্য যদি কারো কাছে হাত পাতো, তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে।" আশ্চর্য এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মা সম্পূর্ণ 'নির্বাসনা' হয়ে সংসারে কাটিয়ে গেলেন। ঠাকুরের শরীর যাবার পর রামলাল-দাদা প্রভৃতি আত্মীয়পরিজন মা যে সাত টাকা করে কালীবাড়ি থেকে পেতেন, সেটি বন্ধ করলেন। মা ঐ নিয়ে বিবাদ করেননি, নিজের জন্য ভাবেননি। পরম বৈরাগ্যভরে বলেছিলেন ঃ "এমন ঠাকুরই চলে গেলেন—টাকা নিয়ে আমি আর কি করব!" তাঁর এই নিস্পৃহতার কাছে বারবার সাংসারিকতা পরাজিত হয়েছে। ঠাকুরের লীলার জন্য যোগমায়ার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু এই পরম বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিতা মাকে ধরে রাখার জন্য ঠাকুরকে যোগমায়া রাধুকে আনতে হয়েছে। সরলা দেবী (পরবর্তী কালে শ্রীসারদা মঠের ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা) তখন কাশীতে আছেন। মায়ের কাজের জন্য তাঁকে জয়রামবাটীতে ডেকে পাঠানো হয়। সেসময় স্বামী তুরীয়ানন্দও ছিলেন কাশীতে। প্রণাম করার সময় তুরীয়ানন্দ মহারাজ তাঁকে বললেন ঃ "যাও যাও মহামায়ী ডেকেছেন। আমরা যে-মনকে বহুকষ্টে কণ্ঠে তুলি, মা রাধু রাধু করে সেই মনকে কণ্ঠে নামিয়ে রেখেছেন।"

এবার মহামায়া মুক্তি দিতে এসেছেন—মুক্তিদাত্রী তিনি। বন্ধ করতে আসেননি। তাই সংসারে তাঁকে টেনে রাখার জন্য এবার শ্রীরামকৃষ্ণকেই যোগমায়ার ব্যবস্থা করতে হলো। বাস্তবিক, মা যেন পদেপদে আমাদের চোখ খুলে দিলেন। বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে বলে দিলেন ঃ "চিরকাল একজনের মন যুগিয়ে চলা কি সহজ কথা!" তিনি সারদা, সার-দাত্রী। তাঁকে আত্মীয়পরিজন উপেক্ষার ভাব দেখাল। তাঁর ব্যক্তিত্ব, স্বকীয়তাকে মেনে নিতে পারল না শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি বিরোধের

সাহস কারো হয়নি। মা একা ঠাকুরের কথাকে সম্মান দিয়ে কামারপুকুরে অতি দারিদ্র্যে দিন কাটিয়েছেন। অন্ন-বস্ত্র দুয়েরই অভাব। ছেঁড়া কাপড়ে গিঁট দিয়ে, কোনক্রমে সেলাই করে লজ্জা নিবারণ করেছেন। দেখিয়েছেন—অসহায় হয়েও একটি নারী প্রতিবেশীদের কাছে কিছু না চেয়েও কী করে ঈশ্বরের মুখ চেয়ে দিন কাটাতে পারে। এ যেন অবিশ্বাসীকে শিক্ষা দেওয়া। ভক্তরা তাঁকে সমাদরে রাখলেও তিনি কিছুদিন অন্তরই জয়রামবাটী গ্রামে অশেষ কষ্টে কাটিয়ে আসতেন। তাঁর এই বিবেচনা কোন বিরূপ সমালোচনা তুলতে দেয়নি। সর্বত্রই তিনি সঙ্ঘজননী ও ভক্তজননী, জ্ঞানদাত্রী, গৃহিণী ও মুক্তিদাত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন বিচিত্র ভূমিকা পালন করেছেন। সন্ন্যাসাশ্রমের আদর্শে কোনরকম শিথিলতা বা অমর্যাদা তিনি সহ্য করতেন না। সেরকম ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ 'হাইকোর্টের রায়' হিসাবেই প্রতিটি সাধু মেনে চলতেন। অন্যদিকে গৃহস্থ যাতে চতুর্থাশ্রমের মর্যাদা রক্ষা করে চলে, সেদিকেও তাঁর নজর থাকত। একবার উদ্বোধন-এ রাধু মল পরে ঝমঝম করে ওপর থেকে নামছিল। মা তাকে তিরস্কার করে বলেন ঃ "রাধী, তোর লজ্জা নেই? নিচে সব সন্ন্যাসী ছেলেরা রয়েছে, আর তুই মল পরে দৌড়ে নামছিস, ছেলেরা কি ভাববে বল তো?... এখানে ছেলেমেয়েরা যারাই আছে তারা তামাসা করার জন্য আসেনি, সকলেই সাধন-ভজন করছে।"

বাস্তবিক, এবার স্বামীজী অরণ্যের সাধুসমাজকে মানুষের কল্যাণে লোকালয়েই প্রতিষ্ঠা করেছেন। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীকে আজ পাশাপাশি থেকেই উভয় আশ্রমের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হবে। সাধু ত্যাগে, গৃহস্থ পরিমিত ভোগ এবং সংযম রেখে পাশাপাশি চলবে। মা ঐ নতুন আদর্শকেই স্থাপন করে গেলেন। উদ্বোধনে মেয়েদের চালচলনের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত, জীবনযাত্রায় থাকত পরিমিতি ও সংযম। একটা ছোট ঘটনা মনে পড়ছে—ভারতীপ্রাণাজীর মুখে শোনা—"উদ্বোধনে একখানা ভাঙা চিরুনি দিয়ে মা থেকে শুরু করে রাধু, মাকু, আমরা সবাই চুল আঁচড়াতাম। নলিনীদিদি যদি বলতেন, 'পিসিমা, তোমাকে তো কত ভক্ত জিজ্ঞেস করে কি চাই—তখন একটা চিরুনির কথা বলতে পার না?' মা হেসে বলতেন, 'কাজ তো চলে যাচ্ছে।'" তাঁর মুখে যখন শুনি—"সন্তোষের সমান ধন নেই", তখন মনে হয় একথা কত সত্য। ত্যাগী সাধুরা ফলের ঝুড়ি ফেলে দিচ্ছেন। মা গৃহস্থাশ্রমে—ঝুড়িটি তুলে যত্ন করে রাখছেন। কোন বস্তুর অপচয় করছেন না। মায়ের ঘরে ঝাঁটাটিরও সমান মর্যাদা—মানুষের তো কথাই নেই। অন্যদিকে জয়রামবাটী গ্রামেও তিনি সকলের মা। সমাজপতি ও গোঁড়া সমালোচকেরা মাঝে মাঝে মায়ের উদারতায় অর্থদণ্ড দিলেও মা গ্রাহ্য করতেন না। সন্তানদের জন্য অনন্ত স্নেহ নিয়ে অপেক্ষা করতেন, অনুযোগ করতেন ঠাকুরকে ঃ "ঠাকুর, তুমি তো বলেছিলে, রোজই কেউ-না-কেউ আসবে। বলতেন 'ওরে ভক্তেরা আয়'।" মায়ের দরজা সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাকত। আমাদের কাছে আজ আমজাদের ঘটনাটাই খুব পরিচিত। শুধু আমজাদ কেন, পিয়ন, পালকিবাহক, খেটে-খাওয়া মজুরনী, নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা—সকলেই কি তাঁর কাছে সমাদর পেত না? একটি মজার ঘটনা

শুনেছিলাম ভারতীপ্রাণাজীর মুখে। সেবার শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী থেকে ফিরছেন। বেহারারা 'হুম্ হুম্ না' শব্দ তুলে তাঁকে নিয়ে চলেছে পল্লীর আঁকাবাঁকা পথে। হঠাৎ মহারাজের কানে এল বেহারাদের বোল—"বাবু বড় ভারী", "বাবু বড় ভারী"। পালকির ভিতরে মহারাজ চমকে উঠে বললেন ঃ "ওরে নামিয়ে দে, ওরে নামিয়ে দে।" এদিকে বেহারারা সঙ্গে সঙ্গে বোল পালটিয়ে বলছে ঃ "মা বকবে, মা বকবে।" রামায়ণে সীতার দুঃখে আমরা চোখের জল ফেলি। মর্যাদাবোধ প্রসঙ্গে শেষ ঘটনাটি উল্লেখ করছি। সে যে কী নিদারুণ কষ্টের! মায়ের সারাজীবন নিঃশব্দ দহন ও মানিয়ে চলা যে কোন্ পর্যায়ে উঠেছিল তারই একটি চিত্র। মা নিজেই বলেছিলেন ঃ "সংসারবৃক্ষের তলায় বাস করলে সুখ-দুঃখ ফলভোগ করতে হয়"; "আদর্শ হিসাবে যা করতে হয়, তার ঢের বাড়া করে গেলাম।"

তিনি তখন কোয়ালপাড়ায়—রাধু ও তার তিনমাসের ছেলেকে নিয়ে ঐ বনে বাস করছেন। সরলা-দি ও যুগল-দি (দুর্গা-মা) দুজনেই মায়ের কাছে। সরলা-দি বা ভারতীপ্রাণাজীর নার্সিং ট্রেনিং ছিল। মা খুব নির্ভর করতেন তাঁর ওপর। হঠাৎ নিবেদিতা স্কুল থেকে সুধীরা-দি সরলা-দিকে চিঠি লিখলেন, কলকাতায় চলে এস। মাকে চিঠির কথা জানাতে মা কোন দ্বিধা না করে বললেন ঃ "সুধীরা যখন লিখেছে, তখন তোমরা এস মা।" কিন্তু ভারতীপ্রাণাজী স্মৃতিচারণ করেন ঃ "আসবার সময় মা এত কেঁদেছিলেন, মনে হলে মনটা এখনো কিরকম করে। মায়ের এত কান্না দেখে আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বারবার বলছিলেন, 'মা, দেখে গেলে তো? শরৎকে বলো আমি কি অবস্থায় আছি।'" মা মুখ ফুটে তাদের থাকতে বললেন না, অথবা সুধীরা-দির অবিবেচনায় কোন ক্ষোভপ্রকাশ করলেন না।

চিত্রগুলি বড়ই মর্মস্পর্শী!

"পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" সর্বদাই আত্মস্থা মা—সাংসারিক ঝড় সহ্য করেছেন; মৃত্যু, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে ব্যাকুল হলেও অসাধারণ মনোবলে নিজেকে সংযত করেছেন। সাধুদের সম্মান, গৃহস্থদের পূজা-গ্রহণ করেও কর্তব্য করেছেন, দোষ দেখেননি, সকলকে পরম প্রেমে গ্রহণ করেছেন। "যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না" এবং "কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার"—মায়ের এই বাণী এখন পাশ্চাত্যের বহুঘরে ভাষান্তরে লিখিত হয়ে মানুষকে এক নতুন আলো দেখাচ্ছে—যে-আলোর উৎস তিনি স্বয়ং।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী—এঁরা তিনজনেই এসেছিলেন মানুষের কল্যাণে। তাঁদের কাছে স্ত্রী-পুরুষ বিভেদের প্রশ্ন বড় হয়নি, কিন্তু তাঁরা অনুভব করেছিলেন, সামাজিক ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার মেয়েদের প্রকৃত স্বরূপকেই আবৃত করেছে—যার ফলে একটা জাতির উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়েছে। মেয়েদের মর্যাদা না দিয়ে কোন জাতিরই উন্নতি হয় না। ঐ শক্তিস্বরূপিণীদের অবলা, অসহায় এবং অন্যের অধীনে রেখে তাদের অবমাননাই করা হয়েছে এতদিন। নারীর মধ্যে কী পরিমাণ শক্তি রয়েছে এবং শিক্ষা ও অধ্যাত্মজাগরণে তার কী রূপ হতে পারে, সেটি প্রমাণ করতেই যেন মা এবার এলেন

অধ্যাত্মভিত্তিক বা ধর্মভিত্তিক না হলে মানুষের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়—তারও একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তিনি দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মেয়েদের তৎকালীন অবস্থা খুব ভাল করেই জানতেন, বলেও ছিলেন—

"হয়ে বিদেশিনী নারী লাজে মুখ দেখাতে নারি
বলতে নারি, কইতে নারি নারী হওয়া একি দায়!"

মায়ের দেহাবসানের এই চুয়াত্তর বছরের মধ্যে মেয়েদের মধ্যে তো অভাবনীয় জাগরণ এসেছে। নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়েছে। মর্যাদা ও পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের দাবিতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের নারীসমাজে আলোড়ন চলছে। মা কিন্তু আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন—স্বাধীনভাব আগে মনের মধ্যে জাগাতে হবে। সে-স্বাধীনতা ঈশ্বরনির্ভরতা বিসর্জন দিয়ে নিজের মহিমায় মশগুল হওয়া নয়। নিজের আত্মস্বরূপ, নিজের ঐশীস্বরূপ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সচেতনতাই প্রয়োজন—যা লক্ষ্য করে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "আত্মায় আবার লিঙ্গভেদ আছে নাকি", "স্ত্রীপুরুষের ভেদটার জড় মেরে ছাড়ব।" বিদেশে তিনি এই আত্মভাবই প্রচার করেছিলেন। মা সংসারের মধ্যে আত্মস্থা থেকে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন—তাঁকে মর্যাদা চাইতে হয়নি। নিজের মহিমায় আসীন থেকে তিনি সারাজীবন অপরকে মর্যাদা দিয়ে দেখিয়েছেন—"কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।"* □

পাদটীকা

১ দ্রঃ History of the World's Fair—Benjamin C. Truman, New York, 1916

* ১৬ বর্ষ, ১২ সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান*

স্বামী ভূতেশানন্দ

মায়ের কথা বলতেও আনন্দ, শুনতেও আনন্দ। মায়ের কথা যখন শুনি, বিশেষ করে যখন কেউ তাঁর অন্তরের ভাবকে শব্দ দিয়ে অভিব্যক্ত করে আমাদের কাছে বলেন, তখন তাতে মন এমন নিবিষ্ট হয়ে যায় যে, মনে হয় যেন কথাগুলি আমারই কথা। কথাগুলি যখন শুনি তখন মনে হয়, আমার অন্তরের কথাই তিনি বলছেন। আমার মতো এরকম বোধ—বোধহয় সকলেরই হয়। কে কি ভাষায় বলছেন, কে কোন্ ঘটনা বলছেন—সেসব মুখ্য নয়। মায়ের কথা নতুনভাবে বলতে পারেন এমন কেউ আমাদের মধ্যে এখন আর আছেন বলে মনে হয় না। যে দুই-এক জন আছেন, যাঁদের স্থূলশরীরে মায়ের দর্শনলাভ হয়েছে তাঁদের কথাও যথাসম্ভব বইতে বা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। নতুন কথা যে বের করতে হবে, তা নয়। পুরনো কথাগুলিই যখন শুনি তখন সেগুলি নতুন করে আস্বাদন করতে আমাদের ইচ্ছা হয়। গীতায় বলা হচ্ছে, ভক্তরা ভগবানের কথা বলতে ভালবাসে, শুনতে ভালবাসে। কারণ, শোনা আর বলা—এই দুয়ের মধ্যে একটি মিল আছে। যখন অপরে আমার মনের কথা বলছে তখন প্রতিটি কথায় যেমন আমার অন্তরে প্রতিধ্বনি জাগছে। পূর্বপ্রকাশিত হলেও, বহুবার শোনা হলেও মায়ের কথা কখনো পুরনো হয় না। যেমন সন্তানের কাছে মা কখনো পুরনো হয়ে যান না, তেমনি আমাদের মায়ের কথাও কখনো পুরনো হয়ে যায় না। যখনই তাঁর কথা শোনা যায় তখনই আনন্দ। এই আনন্দকে আস্বাদন করতে হবে, জীবনের সম্বল করে নিয়ে রাখতে হবে। তিনি আমাদের অন্তরে থেকে তাঁর স্বরূপকে প্রকাশ করছেন। আমরা যাতে সেই রসানুভূতির আস্বাদন করতে পারি, সেজন্যই তো তিনি স্থূলশরীর ধারণ করে লীলা করে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের কি অবদান? তার উত্তরে বলব, শ্রীরামকৃষ্ণের যদি কোন অবদান থাকে তবে সেসবই শ্রীশ্রীমায়ের অবদান। আমরা বলি, মা আর ঠাকুর আলাদা নন। এই কথাগুলি শুধু কেবল ভাবের দৃষ্টিতে বিচার করে বলার কথা নয়। এটা সবসময় মনে রাখবার এবং এইভাবে তাঁদের অভেদত্বকে আস্বাদন করবার। ঠাকুর এত গভীর যে, আমাদের সাধ্য নেই তাঁকে আমাদের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসি। ঠাকুরের মুহুর্মুহু সমাধি হচ্ছে। যখন কথা বলছেন তখন যে-ভূমি থেকে বলছেন, তা আমাদের কল্পনার অতীত। আমরা হয়তো তাঁর কথায় মোহিত হতে পারি,

* শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫ শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠে পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভাষণ।—সম্পাদক

কিন্তু তাঁর কাছে আসতে পারি না। কারণ, আমাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান এত বিরাট! যেমন গীতায় বলা হয়েছে—"দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা" (১১।১২)—আকাশে সহস্র সূর্যের যুগপৎ উত্থানের প্রভা। হাজার সূর্যের কথা ছেড়ে দিলাম, একটা সূর্যের যা প্রভা এবং তেজ তার সঙ্গে আর কোন কিছুর তুলনা করা যায় কি? যায় না। ঠিক সেইরকম ঠাকুর এত ঐশ্বর্যবিশিষ্ট যে, আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। সূর্য কিরণ দেয়, তাতে আমাদের কাছে জগতের প্রকাশ হয়। কিন্তু আমাদের চোখ সূর্যের তেজ সহ্য করতে পারে না।

তাই আমাদের প্রয়োজন সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদকে, চন্দ্রমাকে। তার কিরণ আমাদের অন্তরকে শীতল করে, চোখকে স্নিগ্ধ করে। আমরা প্রাণভরে চন্দ্রের শোভা দর্শন করতে পারি, উপভোগ করতে পারি। সৌন্দর্যের তুলনা যখন কবিরা দেন, সবসময় চন্দ্রেরই তুলনা দেন। আর আমরা জানি, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হিসাবেই জানি যে, চন্দ্রের যে-কিরণ তা আসলে সূর্যেরই কিরণ। চন্দ্রের আলাদা কিরণ নেই। কিন্তু চন্দ্র এমনই একটি মাধ্যম, একমাত্র তার ভিতর দিয়ে সেই কিরণ এসে আমাদের স্নিগ্ধ করে, প্রফুল্ল করে, শান্ত করে, অনুপ্রাণিত করে। সূর্যকে পারি না, চাঁদকেই আমরা তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে ধারণা করতে পারি। একথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না যে, মা আমাদের কাছে চাঁদের মতো হয়ে এসেছেন আমাদের অন্তরকে প্রফুল্ল, স্নিগ্ধ, শান্ত করার জন্য এবং জীবনকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। তার মানে এই নয় যে, ঠাকুরের স্নেহ মায়ের স্নেহের থেকে কম। কিন্তু বিরল সেই অধিকারী, যিনি ঠাকুরের স্নেহ অনুভব করতে পারেন। ঠাকুরের সময়েও যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা কজনই বা ঠাকুরকে একেবারে আপন করে নিতে পেরেছেন? মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র। সাধারণের সাধ্য কি যে তাঁকে সাধারণ চোখ দিয়ে গ্রহণ করতে পারে। ঠাকুর নিজেই বলেছেন, অবতার যখন আসেন তখন কজন তাঁকে ধারণা করতে পারে? রামচন্দ্র যখন এসেছিলেন তখন বারোজন ঋষি তাঁকে অবতার বলে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। আর বাকি সবাই তাঁকে জানতেন 'দশরথের বেটা' বলে। তাঁর যে ঐশ্বর্য, তাঁর যে দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব তা মানুষের বুদ্ধির অগোচর। গীতাতে তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।" (৯।১১)

—মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা আমাকে নরদেহধারী ভেবে, মানুষ ভেবে অবজ্ঞা করে। আমার যে পরম তত্ত্ব তা তারা জানে না।

অবতার যখন আসেন তখন তাঁর স্বরূপকে জানতে পারে—এমন লোক কজন? জানবার চেষ্টা করে এমন দুঃসাহসই বা কজনের আছে? তাই ঠাকুর যখন স্থূলশরীরে লীলা করেছেন তখন তাঁকে কজন লোকই বা চিনেছে! কালীবাড়ির লোকেরা, পাড়াপড়শীরা নিত্য ঠাকুরকে দেখেছে, কিন্তু কে বা কজন তাঁকে চিনেছে? অনেকেই তো অবজ্ঞা করেছে, কেউবা চলে গেছে পাশ কাটিয়ে। আবার অনেকে তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারেনি। এখন আমরা মায়ের দিকে চেয়ে দেখি। মায়ের দিকে তাকালে আমরা কি দেখি? সকল

স্তরের সকল প্রকারের মানুষ—কি সংসারী, কি সন্ন্যাসী—মাকে আপনার মা বলে গ্রহণ করতে লালায়িত। মাকে 'মা' বলে ডাকতে কত আনন্দ! তা সে সাধু হোক, দুশ্চরিত্র হোক, মাতাল হোক, বিষয়ী হোক বা যাই হোক। মাকে কিন্তু সকলের দরকার। কারণ, মা ছাড়া মানুষ বাঁচে না। মাতৃহারা শিশুর বাঁচা দুষ্কর। মায়ের কাছে আমাদের সব আবদার চলে। সবরকম অত্যাচার মা সহ্য করেন। ঠাকুর কি পারতেন? মায়ের মতো সহনশক্তি কি ঠাকুরের ছিল? তাঁর জন্য ছিলেন নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম প্রমুখ। তাঁর জন্য ছিলেন রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, বলরাম, নাগমশাই। কিন্তু সাকুল্যে সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন। কজনকেই বা ঠাকুর নিজের বলে হিসেব করতেন? বলতেন ঃ খতিয়ে দেখলুম কজন আমার অন্তরঙ্গ। খতিয়ে দেখে নিলেন নরেন্দ্র, রাখালদের। আর মা! মা তাঁর স্নেহের পরিধির বাইরে কাউকে দেখেননি। বিশ্বজগতের তিনি জননী। সেই স্বদেশী যুগে যখন আমরা ইংরেজের পদানত হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি, যখন বিদেশীদের ম্লেচ্ছজ্ঞানে পরিহার করে চলছি, মা তখন বলছেন—"তারাও তো আমার সন্তান।" দুষ্ট হোক, ভাল হোক, আমজাদ হোক, শরৎ হোক, বেশ্যা হোক অথবা সৎ ব্রাহ্মণ হোক—তাঁর স্নেহের পরিধির বাইরে কেউ নয়, কেউ তাঁর করুণা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত নয়। কারো দোষ-গুণ বিচার তিনি করছেন না। কিন্তু ঠাকুরের তা ছিল না। তিনি বেছে বেছে নিতেন আর যাদের পছন্দ হতো না তাদের এড়িয়ে চলতেন। এমনভাবে মায়ের মতন সকলকে আপন করে বুকে টেনে নেওয়া—এ ঠাকুরকে করতে দেখা যায়নি। তিনি করেননি বলেই তো জগতের মাকে প্রয়োজন ছিল।

তাই আমরা মায়ের অবদানকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে সর্বশ্রেষ্ঠ বলব। বস্তুত, ভাবান্দোলনের এই বিশাল বিস্তৃতি হতো না যদি মা না থাকতেন। তাঁর স্নেহ সর্বগ্রাহী। এইরকম অহেতুক স্নেহ কোথাও দেখা যায় না। আমরা এই জগতে মাতৃস্নেহের উপমা দিই এই বোঝাতে যে, এমন স্নেহ যার কোন তুলনা হয় না। কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিতে যখন দেখি, তখন দেখি সেই মায়ের সমস্ত স্নেহ একেবারে তার নিজের সন্তানের ওপর এমন কেন্দ্রিত যে, সে একজনের কাছে মা এবং আরেকজনের কাছে সে রাক্ষসী। অন্যের সন্তানকে সমভাবে আপন সন্তানরূপে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কোথাও? তত্ত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঋষিরা ব্রহ্মদর্শন করেছেন, কিন্তু ব্রহ্ম যখন ধুলোকাদা, মলমূত্র গায়ে মেখে এসেছেন তখন তাঁদের কোলে করতে পেরেছেন কজন? এটা ভাববার কথা। 'ব্রহ্মদৃষ্টি' যখন বলি তখন তত্ত্বের কথা বলি। ঠাকুর বলছেন, চোখ চেয়েও যা দেখছি চোখ বন্ধ করেও তা-ই দেখছি। সত্যি কথা। কিন্তু এইরকমভাবে ব্যবহারিক জগতে সকলকে আপনার করে নেওয়া, সকলের ওপর অকাতরে বিনা পক্ষপাতে স্নেহবারি সিঞ্চন—একমাত্র শ্রীশ্রীমা ছাড়া আর কোথাও এর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। ঐহিক জগতে মা নিজের সুখ না চেয়ে যে সন্তানের সুখ দেখেন, সে তো সেই সন্তান তাঁর নিজের বলে। নিজের সন্তানের ওপর মায়ের যে-ভালবাসা অপরের সন্তানের ওপর সেই ভালবাসা হয় কি? সেই তো একই মা, কিন্তু নিজের সন্তানের ওপরে যেমন

স্নেহ বর্ষিত হয় অপরের সন্তানের ওপর যে সেরকম হয় না, সে তো আমরা জানি। এমন যদি মা থাকেন, যিনি জগতের সকল মানুষকে তাঁর সন্তান বলে ভাবেন এবং দেখেন তবে তাঁর সেই স্নেহের পরিমাণ কি আমরা ধারণা করতে পারি? এইরকম মা যদি না আসতেন তাহলে আমাদের মতো অনেক অপদার্থ সন্তান আছে, যাদের এই সঙ্ঘে স্থান হতো না। আমরা যারা সঙ্ঘে এসেছি, তারা যে রয়েছি তা তাঁর কৃপায়। আমরা হয়তো ভাল করে বিচার করে দেখি না, কিন্তু এইটুকু বেশ বুঝতে পারি—একটা বিশেষ টানে আমরা এখানে রয়েছি। সেই টান ঠাকুরের টান অবশ্যই, কিন্তু পিছনে আছে মায়ের টান। এটা আস্বাদন করা যায়, অনুভবও করা যায় কিন্তু সহজে বোঝা যায় না। আস্বাদনের কথা বলতে তত্ত্বের কথা বলছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্ব আর সারদা-তত্ত্ব অভিন্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা যখন আমাদের অন্তরের চাহিদার দিক দিয়ে, আমাদের অন্তঃকরণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ভগবানকে চাই তখন সহজেই কি মা-রূপী ঈশ্বরকেই চাই না? যেমন ঠাকুর বলতেন, আমার মা চাই। মা না হলে চলবে না। ঠাকুরের 'মা' যিনি, আমাদের মা-ও তো তিনিই। তা না হলে এরকম সর্বগ্রাহী প্রেম আর কোথায় হতে পারে? আমরা যাদের শত্রুবুদ্ধি করি, আমরা যাদের ভ্রষ্টাচারী বলে মনে করি, আমরা যাদের ঘৃণিত ব্যক্তি বলি—তারাও মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। এই সর্বগ্রাহী মাতৃস্নেহের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে আর অন্য কিছুর সঙ্গে মায়ের তুলনা করা যায় না। মায়ের স্থান এই ভাবান্দোলনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। মা যদি না আসতেন শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্ব হয়তো বেদান্তের একটি সম্প্রসারিত তত্ত্ব বলে গৃহীত হতো; কিন্তু এমন করে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবকে আস্বাদন করতে পারতাম না। কজনের সেই অধিকার বা সেই আধ্যাত্মিক সম্পদ রয়েছে যা-দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে আস্বাদন করবে? মা কিন্তু সকলের কাছে সহজলভ্য। শুধু সহজলভ্য নন, অত্যন্ত সহজ। এত সহজ যে, মনে হয় আমরা যেন আজন্ম তাঁর সঙ্গে পরিচিত। কারোরই মনে হয় না, মা তার অচেনা। মায়ের কাছে যখন কেউ যেতেন, তিনি তখন ঠিক তাঁর আপন মায়ের কাছে এসেছেন বলেই ভাবতেন। মায়ের স্বরূপ হয়তো তাঁরা জানতেন না—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই জানতেন না। স্বরূপ জানতে হলে যে-মনের, যে-শুদ্ধির দরকার তা আর কজনেরই ছিল বা আছে? সুতরাং তাঁকে জানা যায় না। কিন্তু জানতে না পারলেও আস্বাদন কম হয় না। পণ্ডিত যেমন করে জানেন, জ্ঞানী পুরুষ যেমন করে জানেন সেরকম করে হয়তো আমরা জানতে পারব না, কিন্তু কোন্ সন্তান মায়ের ভালবাসা বোঝে না? মায়ের স্নেহ বোঝে না এমন সন্তান কে আছে? এই অপূর্ব মাতৃভাব শ্রীরামকৃষ্ণকে যেন দূর সূর্যলোক থেকে আমাদের হাতের কাছে নিয়ে এসেছে। স্নিগ্ধ, শান্ত, দরদী মা আমাদের সমস্ত দোষকে উপেক্ষা করছেন, অপার্থিব স্নেহের দ্বারা আমাদের আকর্ষণ করছেন—আমাদের শত অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও।

শ্রীরামকৃষ্ণকেও কেউ কেউ এইভাবে আস্বাদন করেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে মাতৃভাবে কজন ভাবতে পারেন? অথচ মাকে!—মাকে সবাই পারে। মায়ের

ছবিখানি দেখলে সাধারণত আমাদের প্রথম আকর্ষণ করে তাঁর দৃষ্টি। সেই দৃষ্টির ভিতরে কত করুণা, কত স্নেহ! যেন ঝরে ঝরে পড়ছে! আমরা যখন নিজের গর্ভধারিণী মাকে ভালবাসি তখন কি তাঁকে বিশ্লেষণ করে ভালবাসি? গর্ভধারিণী মায়ের একটা সামগ্রিক রূপ আছে, সেই সামগ্রিক রূপটিই সন্তানকে আকর্ষণ করে। মায়েরও তেমনি সামগ্রিক রূপ আমাদের আকর্ষণ করে। মায়ের ঐ দৃষ্টিতে তাঁর সেই সামগ্রিক রূপটি ধরা আছে।

আমরা যখন প্রথম সঙ্ঘে এসেছি তখন এবং তার পরেও বহুদিন মায়ের ছবির বেশি প্রচার ছিল না। তা আমাদের মনের ভিতরেই ছিল। আমাদের প্রাচীন সন্ন্যাসীদেরও ভাব ছিল—মায়ের ছবি বাজারে বেরবে না, মায়ের কথা ব্যাপকভাবে বলে বেড়াবে না। কেননা মা আমাদের অত্যন্ত আপনার। ঘরের কোণে যেমন মা থাকতেন, নিজেকে যেমন অবগুণ্ঠনবতী, লজ্জাপটাবৃতা করে রাখতে ভালবাসতেন সেইরকম করে তাঁকে রাখতে হবে। কিন্তু ঐ অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকেই তাঁর এমন আকর্ষণ যে, আমরা তাতে মুগ্ধ হয়ে যাই। এটি হচ্ছে মায়ের আকর্ষণী শক্তি। একেই বৈষ্ণবগ্রন্থে 'হ্লাদিনী শক্তি' বলা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল এই মাকে। মা না থাকলে তিনি পারতেন না আমাদের সকলকে এক করতে। আর এই কারণেই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছে। এই সঙ্ঘ মা-ই করেছেন।

ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা, যাঁরা ধর্মজগতে এক-একজন দিকপাল, এই কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন। স্বয়ং স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের বলছেন : "রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলেই সর্বনাশ!... তোমরা এখনো কেউ মাকে বোঝনি।" স্বামীজী যেমন ঠাকুরকে সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন, মাকেও তেমনি তিনিই সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন। স্বামীজীর মতো তাঁর গুরুভাইরাও বুঝতে পারেননি। তাঁরা স্বীকার করেছেন, এমন করে তাঁরা আগে ভাবতে পারেননি। মায়ের স্নেহ পেয়েছেন, কিন্তু মায়ের তত্ত্বের আস্বাদন করতে তাঁরা প্রথমে পারেননি। ধীরে ধীরে তাঁরা মায়ের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। মায়ের স্থূলদেহ অবসানের পর যখন তাঁর স্নেহের শক্তির অবিদ্যমানতা ধরা পড়েছে তখন তাঁরা বেশি করে বুঝতে পেরেছেন, মা কী ছিলেন! মাকে আমরা আড়াল করে রাখতে চেয়েছিলাম। হয়তো আমাদের আপনবোধই আমাদের স্বার্থপর করেছিল, কিন্তু মাকে আমরা আটকে রাখতে পারিনি। মা আজ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে সমস্ত জগতের দিকে তাঁর স্নেহবিস্তার করছেন। তাঁর স্নেহদৃষ্টি চারিদিকে। আগে ঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তানেরাও তাঁর মুখ দেখতে পেতেন না, আর এখন সমস্ত জগৎ 'মা মা' করছে। ঠাকুর বলতেন, মায়ের এত সন্তান হবে যে 'মা মা' শব্দে তিনি অস্থির হয়ে যাবেন। ঠাকুরের কথা আংশিকভাবে সত্য। জগৎ জুড়ে সবাই আজ 'মা মা' ডাকছে, কিন্তু মা তাতে 'অস্থির' হচ্ছেন না। আমাদের সব দৌরাত্ম্য তিনি হাসিমুখে সহ্য করছেন।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ মায়ের প্রার্থনার ফল। মা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন : ঠাকুর, তুমি এলে, এত কষ্ট সহ্য করলে আর তারপরে তোমার অন্তর্ধানের পর তোমার ছেলেরা চারদিকে বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাহলে এত

কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল তোমার? তাহলে তো তোমার আসা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মা আসলে চিন্তা করছেন, ঠাকুরের মহান ভাব কিভাবে প্রচার হবে। এই যে ঠাকুর এসে এত ভাব বিস্তার করলেন, দু-চার জনের কল্যাণ করেই কি তা নিঃশেষিত হয়ে যাবে? মা তা চাননি। ঠাকুরও তা চাইতেন না। এইজন্যই ঠাকুরের মাকে রেখে যাওয়া। ঠাকুর বললেনঃ আমি যাচ্ছি, তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে। ঢের কাজ বাকি রয়েছে। ঠাকুরের যে-কাজ অপূর্ণ ছিল তা মাকে দিয়ে পূর্ণ হলো। কোন অবতারের লীলাসঙ্গিনী তাঁর সহকারিণীরূপে এত কাজ করেননি। একজনও না। জগতের ইতিহাসে এ এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের বুঝতে হবে মায়ের শক্তি—এই সঙ্ঘে, এই ভাবান্দোলনে মায়ের অবদান কতখানি। মনে রাখতে হবে, মাকে আমরা বুঝি বা না বুঝি—তাঁকে আমরা আস্বাদন করতে পারি। কারণ, তিনি আমাদের কাছে প্রহেলিকা হয়ে আসেননি। তিনি আমাদের কাছে যে কোন দূরের বার্তা বহন করে এনেছেন, তাও নয়। এজন্য আমাদের কাছে এত সহজ তিনি। অবশ্য সহজ হলে যা হয়—আমরা অনেক সময় তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করি না। মা ঠাকুরকে বলেছিলেনঃ এই করো যাতে তোমার ছেলেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে। এদের যেন মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব না থাকে। মা কিনা! ঘরকন্না দেখবার দায়িত্ব তাঁর। সংসারের কাজের দায়িত্ব তাঁর। কাজেই আমাদের ভার তিনিই নিয়েছেন। ঠাকুর অন্তর্দৃষ্টিতে এসবই দেখেছিলেন, কিন্তু অত ঝামেলা সইবার ক্ষমতা যেন তাঁর ছিল না। মাকে সেই জন্য তাঁর দরকার ছিল।

ঠাকুর আদর্শ দিয়েছেন, কিন্তু তাতে রসসৃষ্টি করেছেন মা। সেই রসবারি সিঞ্চন না করলে সঙ্ঘের চারাগাছটিই নষ্ট হয়ে যেত। কালে পুষ্ট হয়ে ক্রমে সে মহীরূহে পরিণত হয়েছে, ফল-ফুলে সুসজ্জিত হয়েছে। সারা জগতে সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের সমাদর হয়েছে। এর মূলে রয়েছেন মা। সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার মূলে তাই মায়ের সবচেয়ে বড় অবদান—একথা আমরা যেন কখনো না ভুলি। মাকে ভুললে আমাদের দাঁড়াবার স্থান নেই। এজন্য মায়ের কথা ভাবতে হয় সবচেয়ে বেশি। স্থূলদেহে সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণ তিনি করেছেন। বলতেনঃ "আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করব!" অথচ সেই 'মেয়েমানুষটি' সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করেছেন! স্বামীজী আমেরিকায় যাবেন কিনা তা ঠিক করতে পারছেন না। স্বামীজী দেখেছেন, ঠাকুর যেন তাঁকে ইশারা করছেন সমুদ্রপারে যাবার জন্য। কিন্তু তাতে হবে না। মা না বললে তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না। মাতৃভক্ত সন্তান স্বামীজী। মা আদেশ ও আশীর্বাদ করলেন। তখন তিনি বললেনঃ আর কোন চিন্তা নেই। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমি হনুমানের মতো বিশ্বজয় করব, সাগর পাড়ি দেব। সেই আশীর্বাদের শক্তি তাঁকে সর্বদা সঞ্জীবিত করে রাখত।

মা বলছেনঃ তোমরা কিছু করতে পার আর না পার জেনো আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কেউ বলছেঃ মা, সাধনপথে এগোচ্ছি কিনা বুঝতে পারি না। মা বলছেনঃ বাছা, চিন্তা করো না। তুমি যদি ঘুমিয়ে থাক আর

কেউ যদি তোমাকে খাটসুদ্ধ তুলে নিয়ে যায়, তুমি কি বুঝতে পার? আমি তোমাদের পিছনে আছি—এই কথা সর্বদা মনে রেখো। ভাববে 'আমার মা' আছেন। কত জোর, কত সাহস! সর্বশক্তির আধার মা আমাদের। মা থাকলে ভয় কি? আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান। এই বিশ্বাস মনে রাখতে হবে। মা কোন ব্যাপারে নিষেধ করেছেন স্বামীজীকে। স্বামীজী এককথায় নিরস্ত। তিনি ঠাকুরের কথা এককথায় মেনে নিতে পারতেন না, কিন্তু মা যেই বলেছেন অমনি মাথা নত করে মেনে নিয়েছেন।

এক ব্রহ্মচারীকে কোন অপরাধে মহাপুরুষ মহারাজ মঠ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ব্রহ্মচারী সোজা চলে গেছেন জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে। মাকে বললেন: মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মা তাঁকে খাইয়ে-দাইয়ে, দু-চারদিন কাছে রেখে তাঁর হাতে একটি চিঠি লিখে দিলেন মহাপুরুষ মহারাজকে—"বাবাজীবন তারক, এই ছেলেটি অপরাধ করেছে। এখন অনুতপ্ত। একে মঠে স্থান দিও।" মহাপুরুষ মহারাজ সেই চিঠি পড়ে বললেন: "ব্যাটা, তুই একেবারে হাইকোর্টে আপিল করেছিস!" মা হলেন সঙ্ঘের 'হাইকোর্ট'—হাইয়েস্ট কোর্ট। তারপরে আর কোন কথা চলে না। এই হলেন মা। সঙ্ঘনিয়ন্ত্রী-রূপে তাঁকে আমরা পাই। তিনি বাইরে কিছু দেখাচ্ছেন না, সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু তাঁর অঙ্গুলিহেলনেই হচ্ছে।

সাধু আর গৃহস্থ—দুই-ই তাঁর সন্তান। সন্তানের ভিতরে একজন যদি ফরসা হয়, আরেকজন যদি কালো হয় তাহলে মা কি তাদের পৃথক করেন? কেউ গৃহস্থ, কেউ সন্ন্যাসী—মা কি তাদের পৃথক করেন? কেউ ভাল, কেউ মন্দ—তাদেরও কি মা পৃথক করেন? আমরা ভাল হই, খারাপ হই, সাধু হই, গৃহী হই—মা আমাদের ভালবাসেন। কারণ আমরা তাঁর সন্তান। আমরা ভাল বলে নয়। তবে 'তাঁর সন্তান'—এই চিন্তা মনে এলে যত মন্দই আমরা হই না কেন, আমরা ভাল হব। মা সবসময় তাঁর কোল পেতে রয়েছেন। ছোট্ট একটি শিশু তার ছোট্ট হাত দিয়ে মাকে ধরতে যায়। সে কি তার শক্তিতে মাকে ধরতে পারে? কিন্তু ঐ হাত-দুটি বাড়ালে মা তাকে নিজে কোলে করেন। মা জানেন যে, সে তাঁকেই চাইছে। সেরকম মা আমাদের কোলে করে নেবেন। আমরা তাঁকে ধরতে পারব না। নাই পারি, 'মা' বলে ডাকতে পারব তো! তাঁর কাছে অবনত হয়ে তাঁর স্নেহ আকাঙ্ক্ষা করতে পারব তো! আমাদের দুটো হাত বাড়াতে পারব তো! তাহলেই হবে। তিনি আমাদের ধরে তুলবেন। আমরা যেখানেই যাই, যতই বিপথে যাই—ভয় নেই, তিনি আছেন। এই অভয়দায়িনী মা আমাদের সবসময় রয়েছেন। আমরা মায়ের সন্তান। আমাদের ভয় কি?* □

* ৯৭ বর্ষ, ১২ সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণের মথুর

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেছে, কলকাতার অদূরে দক্ষিণেশ্বর নামক গ্রামে এক রানী একটি কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছেন, একেবারে গঙ্গার ধারে। সুরম্য উদ্যান। দুটি বাঁধানো ঘাট, চাঁদনি, পোস্তা। নহবতে সানাই বাজে। সেখানে একটি দিশাজঙ্গল আছে। গঙ্গার পবিত্র পানীয় জল সদাসর্বদাই পাবে। কয়েক রাত নির্জনে কাটাবার মতো কুঠিয়া আছে। সেই রানীর জামাতা, বিত্তশালী জমিদার মথুরামোহন পর্যাপ্ত সেবার ব্যবস্থাও রেখেছেন। শুধু তাই নয়, সেখানে এক মহাসাধকের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করেছেন। তিনি কখনো নিরাকারে, আবার কয়েক মুহূর্ত পরেই সাকারে। এই এখানে, তো সেই সেখানে। দেহ বিসর্জন না দিয়েও মুহূর্তে পৃথিবীর বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার একটি গোপন পথের সন্ধান তিনি পেয়ে গেছেন। সমাধি তাঁর হাতধরা—করামলকবৎ। গেরুয়া নেই, পাগড়ি নেই, চিমটে নেই, লোটা-কম্বল কিছুই নেই। বাইরে কোন প্রকাশ নেই, লম্বা লম্বা উপদেশ নেই। একটি ধুতি—হাঁটু ছাড়িয়ে নামতে চায় না, আর সেই ধুতির খুঁটটি গায়ে ফেলা। গাছপালা, লতাপাতার আড়াল থেকে তাঁর মুখটি যখন বেরিয়ে থাকে, সেই মুখটি দেখলে মনে হবে নিষ্পাপ এক বালকের মুখ। চোখে একটি বালকের অপার বিস্ময়। জগৎসংসারের দিকে তাকিয়ে আছেন। মহামায়ার লীলা দেখছেন। সেই চোখ-দুটি অপার প্রেমাশ্রুতে সদাই টলটলে। তিনি ফুল তুলতে পারেন না, বেলপাতা ছিঁড়তে পারেন না, দূর্বা ওপড়াতে পারেন না। স্পর্শ করেন, অনুভব করেন—পৃথিবীর বস্তুনিচয় একই চৈতন্যের অধিকারী। এই বোধের উদ্ভাসে তাঁর মুখটি সদাই উদ্ভাসিত। কোমল দূর্বার ওপর দিয়ে কেউ দুর্বিনীতভাবে হেঁটে গেলে তাঁর বুকে লাগে।

তাঁর অনেক শত্রু, কারণ তিনি ঐ জমিদারটিকে যা বলেন তিনি তাই করেন। মধুলোভী বিষয়ীরা এই বশীকরণটি সহ্য করতে পারে না। সাধকের সাধনাকে বলে পাগলামি। তাঁর ভাবকে বলে ঢঙ। তিনি কিন্তু সকলের মিত্র। তিনি জানেন, এক দৈবীশক্তি তাঁকে বেছে নিয়েছে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে। তিনি অসহায়। 'আমি'টা খসে গেছে, সবটাই 'তুমি'। এত প্রেম, কিন্তু বিষয়ী, অবিশ্বাসীদের সহ্য করতে পারেন না। ধর্মের গোঁড়ামিকে বলেন—"শালার মতুয়ার বুদ্ধি"। দক্ষিণেশ্বর শুধু মা ভবতারিণীর মন্দির নয়, অমন ঢাকঢোল বাজানো মন্দির অনেক আছে। ঐ মন্দির এই সাধকের সাধনায় একটি মহা পীঠস্থান। চৈতন্যে জরে আছে। মৃত্তিকার প্রতিটি কণায় বীজমন্ত্র বিড়বিড় করছে। এই মন্দিরের দেবী মধ্যরাতে মূর্তি ফেলে জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন। মন্দিরের ধাপে ধাপে তাঁর পায়ের পাঁয়জোরের শব্দ ঝুমুর ঝুমুর করে। মন্দিরের দ্বিতলে কালো কেশ এলিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গঙ্গা

দেখেন, কলকাতা দেখেন। কালীঘাট তাঁর সেরেস্তা, দক্ষিণেশ্বর তাঁর আবাসস্থল। রোজ সকালে তিনি মাখনমিছুরি খেয়ে চলে যান কালীঘাটের সেরেস্তায়—দীন, দুঃখী, সংসার-জ্বালায় জর্জরিত ভক্তদের দরবারে। সন্ধ্যার সময় ফিরে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। এ হলো সাধকের দর্শন। বিষয়ের ছানি পড়া চোখে দেখা যায় না, আসক্ত মনে বিশ্বাস আসে না। ঝমঝম শুনতে না পেলেও বেশি রাতে মন্দিরের দিকে যেতে তাদের গা ছমছম করে।

মথুরামোহন দেখছেন অবাক হয়ে, কি ভেলকি লেগেছে! তন্ত্রসাধনার পর এই সাধকের শক্তি শতগুণ বেড়েছে। দেবালয় হয়েছে ইন্দ্রালয়। মথুরামোহনের ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি বেড়েছে। যে-কাজে হাত দিচ্ছেন, সেই কাজই সফল হচ্ছে। আর লক্ষ্য করছেন, গুরুরা সব শিষ্য হয়ে যাচ্ছেন, বাঘা বাঘা পণ্ডিতরা সব শিশু। কেউ না চিনুক মথুর চিনেছেন, কেউ না জানুক মথুর জেনেছেন। রানীর দেবালয়ে সাধনের ভিয়েন বসেছে। নবদ্বীপ কলকাতার দিকে সরে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দী আগামীকালের ওপর ফেটে পড়বে। ইতিহাসের মোড় ঘুরবে। একটা জাগরণ। শাস্ত্র, সাধনা একটা নতুন ব্যাখ্যা পাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ হবেন একটি আন্দোলনের নাম। "তোমার যা খুশি, তুমি তাই কর, মথুর তোমার পিছনে আছে।"

নিজের ভাবে বিভোর হয়ে বসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আঙুল নিয়ে খেলা করছিলেন। বড় বিস্ময় তাঁর এই আঙুলে। যখন সমাধি হয়, এই জগতের খোলস খুলে পড়ে যায়। হঠাৎ দেখতে পান সর্বত্র গনগনে বহ্নিশিখা, অথবা প্রায় তরল একটি অগ্নিমণ্ড, শত স্ফুলিঙ্গে উৎসারিত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, চরাচরে মহাব্যাপ্ত নাভিমণ্ডল থেকে উত্থিত প্রণবধ্বনিতে তাঁর জগৎ-চেতনা যখন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন বাঁহাতের এই আঙুলগুলো পদ্মমুদ্রা রচনা করে, আর ঊর্ধ্বোত্থিত ডানহাতের আঙুলে আসে আরেকটি মুদ্রা, বলিষ্ঠ একটি ইঙ্গিত—মহাকাশে, মহাবিশ্বে প্রভু তোমার অন্বেষণ!

আঙুল নাড়তে নাড়তে, দেখতে দেখতে একসময় বললেন : ও মথুর, এইবার যে অনেকে আসবে।

কে আসবে?

এই যারা ভক্ত, সাধুসন্ত, বিভিন্ন মত ও পথের ভক্ত আর সাধকরা।

তা আসুন না তাঁরা। আমি তো তাই চাই। জমে যাক তোমার লীলাখেলা প্রমাণ তো হয়েই গেছে, তুমি সাক্ষাৎ অবতার।

দেখ মথুর, যে যা বলে বলুক, তুমি আমাকে অবতার বলবে না। আমি যেদিন নিজে হাটে হাঁড়ি ভাঙব একমাত্র সেইদিনই জানা যাবে আমি কে। তার আগে নয়। আমি এখন নিজেকে আরো দেখব। মেলাব, মিলব।

এখন যেখানে আছ, সেখানে তুমি কে?

আমি এক রসিক পাগল।

বুঝেছি, বাধাবে গোল—সেবার নদীয়ায়, এবার দক্ষিণেশ্বরে। যাক, এখন বল, তোমার ভক্তদের জন্য কি করতে হবে।

শোন সেজবাবু, সাধু আর ভক্তরা সব ঈশ্বরের প্রতিরূপ। তাদের সেবা আর ঈশ্বরের সেবায় কোন তফাত নেই।

জানি, আমার এ-বিশ্বাস তুমি আগেই তৈরি করে দিয়েছ।

তাহলে বুঝতে পারছ, সাধু-সন্তদের শুধু অন্নসেবা করলেই হবে না, তাঁদের দেহরক্ষার উপযোগী অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বল, কি কি জিনিস?

বস্ত্র, কম্বল, কমণ্ডলু, এমনকি গাঁজা-কলকে।

ঠিক আছে, আমি তোমার জন্য আলাদা ঘরে আলাদা একটা ভাণ্ডার তৈরি করে দিচ্ছি, তোমার খুশিমত যাকে যা ইচ্ছে তাই দিও। ভাণ্ডারটা সম্পূর্ণ তোমার। তোমার হুকুম ছাড়া কেউ খুলতে পারবে না। কি, খুশি তো।

খুব খুশি।

—এইসব খবর মুখে মুখে ছড়াল সাধুসমাজে। দো-চার দিনকে লিয়ে, ঠারনেকা তো ওহি আচ্ছা হায়। গঙ্গাসাগর থেকে দক্ষিণেশ্বর, পুরী যাওয়ার পথে দক্ষিণেশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণের কী আনন্দ!

মথুর, এতে কিন্তু তোমার বিষয় নেই!

তুমি তো আমাকে অবিষয়ের মহাবিষয় চিনিয়েছ। আচ্ছা ঠাকুর! আমার কি কিছু হতে পারে না।

তোমার তো হয়েই আছে, আর কি হবে!

বিষয় সম্পত্তি, সোনাদানা, জুড়ি গাড়ি, চোগা চাপকান, চেন-লকেট— এসব নয়, এর বাইরে। সুরাপানে তো রেমো, শ্যেমোও মাতাল হয়, তোমার মতো সুধাপানে মাতাল।

ধুৎ, এ আবার তোমার কি ইচ্ছে! তাহলে আমার সানাইয়ের পোঁ ধরবে কে? সানাই আর পোঁ, দুটোই যে দরকার গো। একটাকে ছেড়ে আরেকটা তো হয় না মথুর!

কিন্তু আমার যে খুব ইচ্ছা করে, একবার অন্ততঃ পাঁচিল টপকাই।

সে কি আমার হাতে। যাঁর হাতে, তাঁকে গিয়ে ধর। মন্দিরে যাও, গিয়ে মাকে বল—মা, আমাকে ভাবসমাধি দাও। আমাকে তো তিনিই দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে হলে ছুঁচের ফুটো দিয়ে হাতি গলে যায়।

আমি কি রামকৃষ্ণ যে, বললেই হবে! পাথরে প্রাণ একমাত্র তুমিই পার প্রত্যক্ষ করতে। আমার না আছে সাধন, না আছে বিশ্বাস। আমি দেখব পাথরের মূর্তি। পুজো হচ্ছে, আরতি হচ্ছে, ঘণ্টা নড়ছে।

তাহলে কি করে হবে? এ কি ছেলের হাতের মোয়া!

তুমি হওয়ালেই হবে।

আমি কে?

তুমি শিব, কালী, কৃষ্ণ, রাম, ভগবান—তুমি আমার সব, আর আমি তোমার সেবক। তোমার সেবাই আমার সাধনা। তুমি একটা কথা বল, মথুরের সেবায় কোন ত্রুটি আছে?

না, একথা আমি মানছি।

তাহলে সেবক কি তোমার কৃপা একটু পেতে পারে না! তোমাকে পেয়েছি, তোমাকে দেখেছি। কিন্তু তুমি যেখানে থাক, সেই জায়গাটা একবার দেখাবে না!—থেকে থেকে তুমি যেখানে চলে যাও।

আরে, সে-জায়গার কি কোন ঠিকানা আছে, না পথ আছে, না গাড়ি আছে? উড়িয়ে নিয়ে যায়।

তুমি পাশ কাটাতে চাইলেও আমি ছাড়ছি না। বাবা, তোমায় করে দিতেই হবে। অন্ততঃ একবার আমি ভাবসমাধিতে যেতে চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরামোহনের আরো অন্তরঙ্গ হয়ে বললেন : ওরে কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পোঁতামাত্রই কি গাছ হয়ে তার ফল পাওয়া যায় বাবা! কেন, তুই তো বেশ আছিস—এদিক-ওদিক দুদিক চলছে। ওসব হলে এদিক থেকে মন উঠে যাবে, তখন তোর বিষয়-আশয় সব রক্ষা করবে কে? বার ভূতে সব যে লুটে খাবে। তখন কি করবি?

সে যা হয় করব, আমার ভাবসমাধি চাই।

আচ্ছা শোন, আমি তোকে আরেক ভাবে বলি। ভাল করে শোন, যারা ভক্ত, ওরে, তারা কি কিছু দেখতে চায়! তারা সাক্ষাৎ সেবার অধিকার চায়। তাদের সেবাতেই আনন্দ। ঈশ্বরকে দেখলে শুনলে তাঁর ঐশ্বর্যজ্ঞানে ভয় আসে, ভালবাসা চাপা পড়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলেন। গোপীরা সব বিরহে আকুল! শ্রীকৃষ্ণ তাদের অবস্থা জেনে উদ্ধবকে পাঠালেন বোঝাতে। উদ্ধব জ্ঞানী কিনা! বৃন্দাবনের কান্নাকাটি ভাব, খাওয়ানো-পরানো—এসব উদ্ধব বুঝতে পারত না। গোপীদের শুদ্ধ ভালবাসাকে ভাবত মায়িক, ছোট করে দেখত। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পাঠালেন আরো এই কারণে, যাতে গোপীদের দেখে তারও শিক্ষা হয়—ভালবাসা কাকে বলে! উদ্ধব গিয়ে গোপীদের বোঝাতে লাগল—'তোমরা সব কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কেন অমন করছ? জানই তো, তিনি ভগবান, সর্বত্র আছেন; তিনি মথুরায় আছেন আর বৃন্দাবনে নেই—এটা তো হতে পারে না। অমন করে হা-হুতাশ না করে একবার চোখ বুজে দেখ দেখি, দেখবে তোমাদের হৃদয়মাঝে সেই নবঘনশ্যাম মুরলীবদন বনমালী সর্বদা রয়েছেন।' উদ্ধবের জ্ঞানের কথা শুনে গোপীরা বলেছিল—'উদ্ধব! তুমি কৃষ্ণসখা, জ্ঞানী। তুমি এসব কি কথা বলছ! আমরা কি ধ্যানী, না জ্ঞানী, না ঋষি-মুনির মতো জপ-তপ করে তাঁকে পেয়েছি। আমরা যাঁকে সাক্ষাৎ সাজিয়েছি-গুজিয়েছি, খাইয়েছি-পরিয়েছি, ধ্যান করে তাঁকে আবার ঐসব করতে যাব! আমরা তা কি করতে পারি? যে-মন দিয়ে ধ্যান-জপ করব, সে-মন আমাদের থাকলে তো তা দিয়ে ঐসব করব! সে-মন যে অনেক দিন হলো কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করেছি! আমাদের বলতে আমাদের কি আর কিছু আছে যে, তাইতে অহং-বুদ্ধি করে জপ করব?' উদ্ধব তো শুনে অবাক! তখন কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ভালবাসা যে কত গভীর আর সে-ভালবাসা যে কি বস্তু, তা বুঝতে পেরে তাদের গুরু বলে প্রণাম করে চলে এল। তাহলে মথুর, এইবার তুমি বল, ঠিক ঠিক ভক্ত কি তাঁকে হৃদয়ে ধ্যানমন্দিরে দেখতে চায়? তাঁর সেবাতেই তার পরমানন্দ। তার অধিক দেখাশুনা সে চায় না; তাতে তার ভাবের হানি হয়।

মথুরামোহন সব শুনলেন, কিন্তু তাঁর সেই এক গোঁ—বাবা, তোমার সব কথা আমি মানছি, কিন্তু একবার আমার ভাবসমাধি চাই। তোমার কৃপায়। আমার কোন সাধন-ভজন নেই। আমার শুধু তুমি আছ।

নাছোড়বান্দা মথুরামোহনকে শ্রীরামকৃষ্ণ শেষে বললেন : তা কি জানি বাপু! মাকে বলব, তিনি যা হয় করবেন।

মথুরামোহন মহা খুশি। তুমি আমার রাজা, রাজরাজেশ্বর। আজকে যাত্রা হবে। আমরা দুজনে আসরে বসে শুনব।

কি পালা দিলে?

বিদ্যাসুন্দর।

বাঃ, বেশ দিয়েছ। অনেক গান আছে গো। দেশে মানিকরাজার আমবাগানে পাঠশাল থেকে পালিয়ে এসে কত যাত্রা করেছি! কার ভাল লাগে বল তো ঐ মানসাঙ্ক, শুভঙ্করী, লিয্যে, লিয্যে, কুড়োবা লিয্যে, দুই দু-গুণে চার, তিন দু-গুণে ছয়। ওসব তোমাদের! আমি এক গণ্ডমূর্খ।

ভাগ্যিস মূর্খ হতে পেরেছিলে! পণ্ডিত হয়ে গেলে কী সর্বনাশটাই না হতো! কোথায় ঘটির জল আর কোথায় গঙ্গার জল! কোথায় মাথায় ছেটানো, আর কোথায় অবগাহন!

না গো! কত ইচ্ছে ছিল, বিয়ে করে বাবার মতো সংসারী হয়ে আমার কামারপুকুরে ঘুরে বেড়াব। চণ্ডীমণ্ডপে বসে পাঠ শুনব। চিনু শাঁখারী, গয়াবিষ্ণু, আরো যত সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে হাসিঠাট্টা, মস্করা করব। বহুরূপী সাজব। যাত্রাপালায় শিব হব।

সে তো হয়েছিলে, তারপর তো দেখলে কি হলো? আসল শিব কেমন করে নকল শিব হবে।

তাই তো বলছি গো মথুর, মা আমায় কি করে দিলেন!

যাক, আর দুঃখ করে কি হবে, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। কূপ না হয়ে সমুদ্র হয়ে গেছ। এখন লহরীর আনন্দ!

শ্রীরামকৃষ্ণ কেমন একটা দুঃখ দুঃখ ভাব করে বসে রইলেন আরো কিছুক্ষণ। 'মা, আমার ভেতরটা ভেঙেচুরে তছনছ করে দিলি মা!' হঠাৎ ভাব এসে গেল, বিভোর হয়ে গাইতে লাগলেন—

আর ভুলালে ভুলব না গো!
আমি অভয় পদ সার করেছি,
ভয়ে হেলব দুলব না গো।।
বিষয়ে আসক্ত হয়ে,
বিষের কূপে উলব না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান
মনের আগুন তুলব না গো।
ধনলোভে মত্ত হয়ে
দ্বারে দ্বারে বলব না গো।
আশাবায়ুগ্রস্ত হয়ে
মনের কথা খুলব না গো।
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে
প্রেমের গাছে ঝুলব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি,
ঘোলে মিশে ঘুলব না গো।।

খুব ধুম লেগেছে আজ দক্ষিণেশ্বরে। ফলহারিণী কালিকা-পূজা। আলোতে, মালাতে, ভক্তসমাগমে, ঘণ্টাধ্বনিতে, সানাইয়ের সুরে জমজমাট দেবালয়।

সাজপোশাকের বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে যাত্রার দল এসেছে। আলাদা ঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। মেঝেতে শতরঞ্জি বিছিয়ে কেউ শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, কেউ দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে হুঁকো টানছে, কেউ ঘুরে ঘুরে হাত নেড়ে নেড়ে পাঠ মুখস্থ করছে। এঁদের জন্য আলাদা রান্নাঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। মন্দিরের রান্না চলবে না। দলের নানাজনের নানান বায়না। দলের সঙ্গেই পাচক আর সহযোগীদের আগমন। কাটা, ধোয়া, মাজা, ঘষা, ওদিকে এক মহা কর্মযজ্ঞ। ওদেরই মধ্যে দু-একজন ভাবুক প্রকৃতির পঞ্চবটীতে, গঙ্গার ধারের পোস্তায় আপন মনে ঘুরছে।

শ্রীরামকৃষ্ণেরও খুব আনন্দ। যেখানে ভগবান সেখানে ভক্ত, যেখানে ভক্ত সেখানেই ভগবান। মথুরামোহনের হাত খুলেছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঠাকুরকে চিনেছেন। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।" দক্ষিণেশ্বরে তাই ইদানীং আনন্দের হাটবাজার। আনন্দময় ঠাকুরকে ঘিরে যত আনন্দ। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণও জানেন, যতদিন মথুর ততদিন একরকম, তারপরেই সব অন্যরকম হয়ে যাবে। তা চিরকাল কি একরকম থাকে নাকি! যখন যেমন তখন তেমন!

সন্ধ্যার আরতির পরই শুরু হয়ে গেল কনসার্ট। ভ্যাঁপপোরো, ভ্যাঁপপোরো, ঝ্যাহ। কর্নেট, ফ্লুট, ঝাঁঝ সব মিলিয়ে সেই চিত্তনর্তনকারী সুর। বাল্যে যেমন হতো, এখনো তেমন হচ্ছে—চল মথুর চল, কনসার্ট শুরু হয়ে গেছে। পরে গেলে আমরা আর জায়গা পাব না।

মথুরামোহন অভিভূত। কী অদ্ভুত বালকস্বভাব। এ যেন সেই ষোড়শবর্ষীয় শুকদেব। জ্ঞানের প্রতিমূর্তি কিন্তু বালক। সব সমস্যা, সব দর্শন মথুরকে বলা চাই, পরামর্শ চাই, অথচ নিজে সব জানেন। মথুর ভাবেন—এমন বন্ধু, এমন অভিভাবক, এমন কল্যাণকামী মঙ্গলময় তিনি আর কোথায় পাবেন!

মথুরামোহন হাসতে হাসতে বললেন : আমরা যাওয়ার আগে একবার আরম্ভ করে দেখুক না, আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করাব। আসরে যাবে, তোমাকে একটু সাজাব না! ভাল করে ধুতিটাও পরতে শিখলে না! কোঁচা-কাছার ছিরি দেখ! এস দেখি।

এত বড় একটা চোদ্দ হাতি ফরাসডাঙার ধুতি দিয়েছ, এ কি সহজে বাগে আনা যায়! আট দাও, দশ দাও, দেখিয়ে দিচ্ছি বাহার!

থাক, সেও আমি দেখেছি। এখন একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও, কাছার পুঁটলিটা ঠিক করে দিই।

দেব অঙ্গের স্পর্শে মথুরামোহনের শিহরণ হচ্ছে। মনের তামস-পরত খুলে যাচ্ছে। কলকাত্তাইয়া কায়দার কাছা-কোঁচা রপ্ত হলো।

মথুরামোহন বললেন : নাও, ঠিক যেন শ্রীগৌরাঙ্গ। পালাচ্ছ কোথায়! এখনো বাকি আছে। আসগর আলির উমদা বেলি আতর কানের দুপাশে একটু লাগাও। যাত্রা দেখতে যাচ্ছি, 'বিদ্যাসুন্দর পালা', আতর ছাড়া হয়!

দুজনে এসে আসরে বসলেন। মখমল-মোড়া তাকিয়া। পাশে ফরসি। গোলাপজলের ঝারি। তলায় বিছানো দামী কার্পেট। অধিকারী এসে সসম্ভ্রমে নমস্কার করলেন। দুজনকে দুটো গোড়ের মালা দিলেন। দুই জমিদার যেন পাশাপাশি! ঠাকুরের সে-ভাব দেখে কে। কনসার্টের জমজমা জোরে শুরু হলো। দুই রাজা পাশাপাশি, একজন জানবাজারের জান, আরেকজন!

কানু পরশমণি আমার।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দরশন।।
বদনের ভূষণ আমার তার গুণ গান।
হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন।।
ভূষণ কি আর বাকি আছে।
আমি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রহার পরিয়াছি গলে।।

মথুরামোহন তাঁর বাবার সামনে দশ দশ টাকার নোটের থাক পর পর সাজালেন। একটু পরেই পালা শুরু হলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে আত্মহারা হয়ে গায়ক আর অভিনেতাদের দিকে পুরস্কার ছুঁড়তে থাকবেন। প্রথমে উত্তরীয়, তারপর জামাটা খুলে ছুঁড়ে দেবেন, অবশেষে পরিধানের বস্ত্রও খসে পড়বে, এবং সমাধিস্থ। মথুরামোহনের এই অভিজ্ঞতা পূর্বে একাধিকবার হয়েছে। এত দামী শালটা এইভাবেই গেছে। সেই কারণে মথুরামোহন আজকাল প্রচুর টাকা নিয়ে বসেন বাবার পাশে। কিছু সাজিয়ে রাখেন হাতের কাছে—দশ দশের ভাগা, আর বেশ কিছু নিজের ঝুলিতে মজুত। যাঁর কাছে 'টাকা মাটি, মাটি টাকা', তিনি অল্পে সন্তুষ্ট হবেন কি করে! মুঠো মুঠো চাই। সামান্য হলে বলবেন: মথুর, ছি ছি, তোমার নজর এত ছোট! বদনাম আছে, মথুরবাবুর একটু হাতভারি স্বভাব। সেই মথুরবাবু বাবার বেলায় আকাশ-উদার। ঠাকুর বিভোর হয়ে শ্রেষ্ঠ নট-নটীর দিকে টাকা ঠেলে দিয়ে তৃপ্ত হচ্ছেন। মুখে আনন্দের ভাব। মথুরের প্রাণ ভরে যায়। আমি আর কি চাই—"ভূষণ কি আর বাকি আছে।/আমি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রহার পরিয়াছি গলে।"

পালা খুব জমে উঠেছে, বিদ্যা গান গাইছে ঘুরে ঘুরে। শ্রীরামকৃষ্ণ এতটাই তন্ময় যে, মনে হচ্ছে মানুষ নয় পাথরের মূর্তি। মথুরামোহন পাশে বসে পাখার বাতাস করছেন। গান শেষ হতেই ঠাকুর দশ টাকার একটি থাক তার দিকে ঠেলে দিলেন। দর্শকরা হর্ষ প্রকাশ করলেন।

শেষ রাতে শেষ হলো পালা। মন্দির-চূড়ায় ডাকছে শেষ প্রহরের প্যাঁচা। মথুরামোহন দক্ষিণেশ্বরেই আছেন, ঠাকুর কোন্ লোকে চলে গেছেন, তিনিই জানেন। এক পাশে হৃদয় আরেক পাশে মথুরামোহন, মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ—চলেছেন কুঠিবাড়ির দিকে। শূন্য আসরে বহুমূল্য কার্পেটের ওপর রুপো-বাঁধানো ফরসির নলটা সাপের মতো শুয়ে আছে।

ভোরের বিছানায় পাশ ফিরতে ফিরতে মথুরামোহন প্রার্থনা করছেন: বারেকের জন্য ভাবসমাধি দাও ঠাকুর। তুমি সব পার। আবার আমিও তোমার জন্য সব পারি। মনে আছে, কাশীতে গিয়ে তুমি আমাকে বললে, মথুর! 'কল্পতরু' হয়ে দান কর। যে যা চায় তাকে তাই দান কর।

শেষ দৃশ্যটা মনে পড়তেই মথুরামোহনের চোখে জল এল। সারাদিন ধরে দানধ্যান হলো। সবশেষে মথুরামোহন অনুরোধ করলেন: বাবা! এইবার তুমি কিছু চাও।

অনেকক্ষণ ভাবলেন, শেষে বললেন: তাহলে তুমি আমাকে একটা কমণ্ডলু দাও।

যেমন মা, তাঁর তেমন ছেলে! তাঁকে বললাম : সেবা করতে চাই, বলুন কি লাগবে আপনার। বললেন : সবই তো আছে বাবা, কোনকিছুর অভাব তো তুমি রাখনি!

তাহলেও একটা কিছু!

বেশ, তাহলে তুমি বাবা আমাকে এক পয়সার দোক্তাপাতা আনিয়ে দাও।

দেবতার ঘরেই দেবতা জন্মায়!

মথুরামোহন জানবাজারে ফিরে গেলেন। যথারীতি বিষয়ের ভূত এসে ঘাড়ে চাপল আবার। দিন কয়েক গেল। হঠাৎ এক সকালে মনে হলো—কার বিষয়? কিসের বিষয়? অনেক হয়েছে! মাথা ফাটাফাটি, মামলা-মকদ্দমা, স্তাবক-চাটুকার, খয়ের খাঁ! উঠে পড়লেন সেরেস্তা ছেড়ে। সোজা অন্দরমহলে। সবাই ভাবলে, বাবুর শরীর খারাপ হয়েছে।

মথুরামোহন চুপ করে বসে আছেন নির্জনে। কারো সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মূর্তি চোখের সামনে ভাসছে। ভাবে কথা বলছেন মায়ের সঙ্গে, আর অনবরত জল ঝরছে দুচোখ বেয়ে। চোখ-দুটো জবা ফুলের মতো লাল। বুক সবসময় থরথর করে কাঁপছে। নায়েব জানাতে এসেছিলেন—মামলার দিন পড়েছে, নবদ্বীপে যেতে হবে। কাকে বলছেন, কে শুনছেন! থেকে থেকে বলছেন—মন-পাখি তুই কৃষ্ণকথা বল। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। তিনদিন চলে গেল, অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। কেউ কেউ বললে, 'হাওয়া' লেগেছে।

স্ত্রী জগদম্বা দক্ষিণেশ্বরে খবর পাঠালেন—ঠাকুর, একবার আসুন।

মজার ঠাকুর রসিক ঠাকুর মথুরামোহনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'কি গো সেজকত্তা!' ঠাকুর হাসছেন মুচকি মুচকি। মথুরামোহন সোজা ঠাকুরের পায়ের ওপর। পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বলছেন : বাবা ঘাট হয়েছে! আজ তিনদিন ধরে এই অবস্থা চলেছে, বিষয়কর্মের দিকে চেষ্টা করলেও মন যাচ্ছে না কিছুতেই। সবদিকেই সব গোলমাল হয়ে গেল, ক্ষতিও হলো অনেক। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও। আমার চাই না।

ঠাকুর বললেন : সেকি রে। তুই যে ভাবসমাধি চেয়েছিলিস!

বলেছিলাম, আনন্দও আছে; কিন্তু হলে কি হয়, এদিকে যে সব যায়! বাবা, ও তোমার ভাব তোমাকেই সাজে। আমাদের ওসবে কাজ নেই! ফিরিয়ে নাও।

ঠাকুর হাহা করে হাসতে হাসতে বললেন : তোকে তো একথা আগেই বলেছি!

হ্যাঁ বাবা বলেছিলে, কিন্তু তখন কি অত-শত জানি যে, ভূতের মতো ঘাড়ে এসে চাপবে আর তার গোঁয়ে আমার চব্বিশ ঘণ্টা ফিরতে হবে? ইচ্ছে করলেও কিছু করতে পারব না!

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরামোহনের বুকে ধীরে ধীরে হাত বোলাচ্ছেন আর বলছেন : ফিরে আয়, ফিরে আয়, ওরে ও বড় সর্বনাশা পথ। যে করে আমার আশ, আমি করি তার সর্বনাশ। সংসার এক নকশ খেলা, তোরা একটু একটু কাটা থাকবি বেশ, আমার মতো সবটা কাটলে জ্বলে যাবি। একটু, একটু!* □

* ১০০ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

'উদ্বোধন'-এর আদর্শ

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

সার্ধ শতাব্দীর পর 'উদ্বোধন'-এর জন্মদিনে তাহার ঘোষিত আদর্শের কথাটাই আজ সর্বাগ্রে মনে আসিল। এই আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং 'উদ্বোধন'-এর মধ্য দিয়া উহা প্রচারের ভার দিয়াছিলেন তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের উপর। 'উদ্বোধন'-এর মধ্য দিয়া জাতির সেবায় যাঁহারা শক্তি সামর্থ্য মনীষা নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই জীবনের পুণ্যব্রত উদ্‌যাপন করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের পতাকাবাহী সেইসকল সাহসী যোদ্ধার কথা আজ বেশি করিয়া মনে পড়িতেছে। সেদিন সামাজিক তীব্র বিরুদ্ধতা ছিল, বহুর তামসিক জড়ত্ব ছিল, না ছিল সহানুভূতি, না ছিল আনুকূল্য। গুরু-পুরোহিত-গণৎকারি-শাসিত সমাজে লোকাচার ও দেশাচারের অন্ধ অনুগামী প্রস্তরীভূত কুসংস্কারের উপর স্বাধীনচিন্তার আঘাত হানিবার জন্য সেদিন 'উদ্বোধন'-এর দুঃসাহসিক অভিযান আজ কল্পনা করা কঠিন।

বলা বাহুল্য কেবল পারলৌকিক মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করিবার জন্য বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন' প্রতিষ্ঠা করেন নাই; শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মসমাজ বা আর্যসমাজের মতো কোন ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। আর্যজাতির উদার সার্বভৌমিক অধ্যাত্মসাধনাকে তিনি বহু শতাব্দীর বিকৃতি হইতে উদ্ধারের জন্য অদ্বৈতবেদান্তের দৃঢ়ভূমির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্যের এই ভয়াবহ বৈষম্য হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য বেদান্তের তত্ত্বগুলি কর্মজীবনে প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক বোধ ছিল তীব্র ও তীক্ষ্ণ। কি ধর্মচিন্তা ও সাধনা, কি সামাজিক ব্যবস্থা, কোনটাকেই তিনি সনাতন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সামাজিক অধঃপতন ও ধর্মসাধনার বিকৃতি—এই দুইকে তিনি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া দেখিয়াছেন। সামাজিক অধঃপতনের জন্য ধর্মকে দায়ী করিয়া যাঁহারা ধর্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ব্যর্থ প্রয়াসের সমালোচনা করিয়া স্বামীজী বলিলেন : "হিন্দুরা নিশ্চয়ই তাহাদের ধর্মত্যাগ করিবে না, তবে ধর্মকে যথাযথ সীমার মধ্যে রাখিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্বাধীনতা দিতে হইবে। ভারতের সমস্ত সংস্কারকগণ এই এক মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন যে পুরোহিতকুলের বীভৎস বিধান ও অধঃপতনের জন্য ধর্মই দায়ী, অতএব তাঁহারা সেই অবিনাশী সৌধ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিলেন। ফল কি হইল? ব্যর্থতা!! বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় পর্যন্ত এই ভুল করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ-প্রথার ভিত্তি ধর্মের উপর এবং তাঁহারা ধর্ম ও জাতিভেদকে একসঙ্গে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন এবং ব্যর্থকাম হইয়াছেন। কিন্তু পুরোহিতদের সমস্ত প্রকার প্রলাপোক্তি সত্ত্বেও জাতিভেদ-প্রথা একটা অচলায়তন সামাজিক ব্যবস্থা মাত্র। উহা তাহার প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে, এই মৃতভার অপসারণ করিবার জন্য জনসাধারণকে

তাহাদের সামাজিক ব্যক্তিস্বাধীনতা ফিরাইয়া দিতে হইবে।" (২ নভেম্বর, ১৮৯৩)

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত বিবেকানন্দ কেবল কবির উদ্দাম ভাবাবেগ লইয়া তাঁহার জাতিকে ভালবাসেন নাই, সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া তিনি বর্তমান ভারতের সমস্ত স্তরের প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কত উত্থান-পতন অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়া এই জাতি বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার যেমন ঐতিহাসিক সম্বিদ ছিল, তেমনি ভাবী পুনরুত্থান সম্বন্ধেও তাঁহার মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না। ভারতের অধ্যাত্মজগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সহিত এইখানেই বিবেকানন্দের পার্থক্য। একের সাধনায় একের যোগবলে বহুর উন্নতি সম্ভব, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না, অপরকেও বিশ্বাস করিতে বলিতেন না। সমষ্টির দ্বারা সমষ্টিমুক্তি ইহাই ছিল তাঁহার সাধনা। সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া তাঁহার চিত্ত বিষাদে ভরিয়া উঠিয়াছিল, দীন দরিদ্র অজ্ঞ পদদলিতদের প্রতি শতাব্দীর পর শতাব্দী যাহারা অত্যাচার করিয়া ভারতভূমিকে নরকে পরিণত করিয়াছে সেইসকল ধনী শিক্ষিত উচ্চবর্ণীয়কে কশাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন : "আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই দেশকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছি। কারণ ভিন্ন কি কার্য হয়? পাপ না করিলে কি শাস্তি আসে? যাহা দেখিলাম, বিশেষভাবে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দেখিয়া আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। কন্যাকুমারীর মন্দিরের পাদদেশে, ভারতবর্ষের সর্বশেষ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া আমার মনে এক নূতন পরিকল্পনার উদয় হইল। আমরা লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসী লোককে ধর্মশিক্ষা দিয়া বেড়াই—নিছক পাগলামি। আমাদের গুরুদেব বলিতেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' একমাত্র অজ্ঞতার জন্যই দরিদ্র ব্যক্তিরা পশুবৎ জীবনযাপন করিতেছে। আমরা যুগ যুগ ধরিয়া উহাদের রক্তশোষণ করিতেছি এবং পায়ের তলায় চাপিয়া রাখিয়াছি।" (১৯ মার্চ, ১৮৯৪)

হিন্দুসমাজ ও সভ্যতার এই দুর্গতি একদিনে হয় নাই। জনসাধারণকে হতবীর্য ও পশুপ্রায় রাখিয়া প্রভুত্ব বিস্তারের ইতিহাসের কলঙ্কমলিন কাহিনী উদ্ঘাটন করিয়া স্বামীজী বলিয়াছেন : "কোথায়, ইতিহাসের কোন্ স্তরে তোমাদের দেশে ধনী ও অভিজাতবর্গ, তোমাদের পুরোহিত ও সামন্ত নৃপতিরা দরিদ্রের জন্য কিছু চিন্তা করিয়াছেন? অথচ ইহাদের শ্রম অপহরণ করিয়াই উহাদের শক্তি!... ক্রমে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, প্রকৃতির অভিশাপ নামিয়া আসিল। যাহারা দরিদ্রদের রক্ত শোষণ করিয়াছে, তাহাদের অর্থে জ্ঞানবিদ্যা করায়ত্ত করিয়াছে এবং তাহাদের দারিদ্র্যের উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্যের সৌধ গড়িয়াছে—তাহাদেরই শত সহস্র দাসের মতো বিক্রীত হইতে লাগিল, তাহাদের স্ত্রী-কন্যা অপমানিতা হইল, তাহাদের ঐশ্বর্য ও সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতে লাগিল—তোমরা কি মনে কর গত এক সহস্র বৎসরের এইসব ঘটনার কোন কারণ নাই?

"ভারতের দরিদ্রদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যায় মুসলমান কেন? তরবারি-বলে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, একথা বলা মূর্খতা। জমিদার ও পুরোহিতের দাসত্ব হইতে মুক্তির জন্যই তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ তোমরা দেখ, বাংলাদেশে কৃষকদের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক; কেন না বাংলায় জমিদারের সংখ্যা অধিক।

পদদলিত অধঃপতিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর উদ্ধারের কথা কে চিন্তা করে? কয়েক হাজার গ্র্যাজুয়েট লইয়া একটা নেশন তৈয়ারি হয় না। সত্য কথা, আমাদের সুযোগ সঙ্কীর্ণ—তথাপি অন্নবস্ত্রের দিক হইতে ত্রিশ কোটি লোকের উন্নতি করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের শতকরা ৯০ জন লোক অশিক্ষিত—কে ইহা চিন্তা করে? তথাকথিত দেশপ্রেমিক বাবুর দল?'' (নভেম্বর, ১৮৯৪)

অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর অদ্বৈত বেদান্তী শঙ্করাচার্য যে প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছেন, ঋগ্বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বৈদিক সভ্যতার ছয় হাজার বৎসর পরেই তাঁহার সমসাময়িক সামাজিক ভেদনীতিকে যেভাবে কৌশলপূর্বক ঋষিদের দোহাই দিয়া সমর্থন করিয়াছেন; সেই বেদ-বেদান্তের যুক্তি ও সত্য লইয়াই বিবেকানন্দ পারমার্থিক ও লৌকিক সত্যের ব্যবধান বিলুপ্ত করিবার জন্য তাঁহার জাতিকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহা যে কতবড় বৈপ্লবিক পরিকল্পনা, আজিও আমরা তাহা ধারণা করিতে পারি নাই। কেননা সামাজিক সমুন্নতির জন্য বিবেকানন্দ যে আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম-পরিগ্রহে অসমর্থ হইয়া আজ পর্যন্ত আমরা কেবল জলচল, মন্দির-প্রবেশ, এক পংক্তিতে ভোজন প্রভৃতিই নিম্নবর্ণীয়ের উন্নতির কার্যক্রম বলিয়া ভাবিতেছি। ''ধর্মকে অবিকৃত রাখিয়া তোমাদের সমাজকে ইউরোপীয় সমাজে পরিণত করিতে পার?'' বিবেকানন্দের এই মর্মঘাতী প্রশ্নের আজ পর্যন্ত আমরা কোন সদুত্তর দিতে পারি নাই, অনুসরণ করা তো দূরের কথা।

ভারতে নবযুগ-প্রবর্তক বলিয়া আমরা যাঁহাকে বন্দনা করি তাঁহার সামাজিক সমস্যা সমাধানের মূলসূত্রটি কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই 'উদ্বোধন'-এর আদর্শের আমরা নিকটবর্তী হইব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সভ্যতার তুলনামূলক বিচার সমসাময়িক কালে বিবেকানন্দের মতো কেহই করেন নাই; উভয় সভ্যতার দোষ-ত্রুটি তিনি তুলনা করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের শোষণধর্মী সাম্রাজ্যবাদী বণিকের নির্মম নিষ্ঠুর রাষ্ট্রনীতির অন্তরালে তিনি দেখিয়াছিলেন অপূর্ব ব্যক্তিস্বাধীনতা। জ্ঞানের সাধনায় স্বাধীন চিন্তার ধারক ও বাহক ইউরোপ বিচিত্র—বুদ্ধির আলস্য নাই, চিন্তার জড়ত্ব নাই, অতীতের অন্ধ অনুকরণ নাই, তন্ত্রমন্ত্র ও কল্পনার মোহিনী মায়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন করিবার কুহকজাল নাই, সত্যের সাধনায় তার বুদ্ধি নির্মল। ধর্মের নামে পাদ্রী-পুরোহিতের অনুশাসন সে ভাঙিয়াছে, নবসমাজের নির্মাণশালায় সে নিমন্ত্রণ করিয়াছে সকল মানুষকে। তাহার বাণী—সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা।

এই জ্ঞানের সাধক, বিজ্ঞানের সাধক, শক্তির সাধক পাশ্চাত্যের সহিত, জড়ধর্মী ইহবিমুখ প্রাচ্যের ভাব ও আদর্শের আদান-প্রদান ব্যতীত এই 'শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের' অভ্যুত্থান অসম্ভব। আমরা পাশ্চাত্যকে আমাদের দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলার সমুন্নত সম্পদ দিব, তাহার নিকট শিখিব বিজ্ঞান, সঙ্ঘগঠন, ক্ষিপ্র কার্যকুশলতা। ভারতের স্থবিরত্বের অচলায়তন ভাঙিবার জন্য চাই ইউরোপের চিন্তা ও বুদ্ধির জঙ্গম-শক্তি। পরানুকরণপ্রিয় আত্মবিস্মৃত একটি মহান জাতির বংশধরগণ 'রাজচক্রবর্তী ইংরাজের' 'ভারবাহী পশু'তে পরিণত হইয়াছে। অথচ বাহ্যজগতের আঘাত-সঙ্ঘাতে কিঞ্চিৎ স্বাধীন চিন্তারও উদয় হইয়াছে। এইসময় শ্রেয়ের পথ কি, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই লৌকিক উন্নতিকে মুখ্য লক্ষ্য রাখিয়া বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রাচ্য

ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে (অনুকরণ নহে) নূতন সমাজ, নূতন জাতিগঠনের কথা আলোচনার জন্য সুধীজনকে আহ্বান করেন। ভারতবর্ষ তাহার গৌরবময় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া, স্বকীয় বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিশ্বকে বরণ করিবে, বিশ্বমানবের মুক্তিসাধনার সহিত একাত্ম হইবে, ইহাই ছিল বিবেকানন্দের মিশন এবং 'উদ্বোধন' তাহার উত্তর সাধক।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত নবযুগের নূতন সন্ন্যাসী, যাঁহারা ব্যক্তিগত মুক্তি বা মোক্ষলাভের জন্য লোকালয় ত্যাগ না করিয়া 'বহুজনসুখায়, বহুজনহিতায়' লোকসমাজের মধ্যে থাকিয়া সর্বমানবের কল্যাণকেই যুগধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সার্ধশতাব্দী ব্যবধানে 'উদ্বোধন'-এর সেবক সেইসকল শুক্লকর্মা কর্মবীরের সাধনা ও ঐকান্তিক সেবা সমাজজীবনে কতটুকু সার্থকতা লাভ করিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত প্রত্যেকেরই আজ তাহা গভীরভাবে চিন্তা করিবার দিন। "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্যা ইষ্টদেবী হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের ভুলিলেও ক্ষতি নাই"—এই উদাত্ত আহ্বান দ্বারা যিনি ভারতবর্ষের যৌবনকে বিঘ্নবহুল দুর্গমপথের যাত্রী করিয়াছিলেন, তাহাদের রাজনৈতিক সাধনা আজ সিদ্ধির বন্দরে উত্তীর্ণ। আজ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মকর্তৃত্বের অধিকার আমাদের হাতে আসিয়াছে। তথাপি ভারতের স্বাধীনতা যেপথে যেভাবে আসিল, তাহা কেহই প্রত্যাশা করেন নাই। সমাজজীবনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে যে ক্লেদপঙ্ক স্তরে স্তরে সঞ্চিত ছিল, ইংরাজ শাসনের ধারা শুখাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অতি কুৎসিতভাবে প্রকট হইয়া উঠিল। আমরা দেখিতেছি, ভারতবর্ষের বৃহৎ মানবসমাজের এক স্তরের সহিত অপর স্তরের চিত্ত ও বুদ্ধির শ্রেয় ও কল্যাণ ভাবনার কি গভীর অসহযোগ। এক বর্বরতা নির্দয় হইয়া আজ চারিদিকে নির্লজ্জভাবে উদ্ঘাটিত হইতেছে। স্বাধীন ভারতের এই ভয়ঙ্কর দুর্গতির মধ্যে দাঁড়াইয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সন্তানদিগকে অকুতোভয়ে বলিতে হইবে, এই দুর্যোগময়ী রজনীরও পরপার আছে—যেখানে নির্মল প্রভাত মানবমুক্তির সাধকগণের শিরে সমুজ্জ্বল রশ্মিমালার আশিস বর্ষণ করিবে।

যুগান্তপট বিদীর্ণ করিয়া আজ যে অভাবনীয়ের আবির্ভাব ঘটিল—তাহাকে আমরা বিবেকানন্দের সাধনার সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করিব। মহান যুগপ্রবর্তকের নির্দেশ ও নিয়োগ আমরা শক্তির স্বল্পতা সত্ত্বেও অঙ্গীকার করিতে পারিয়াছি, আমরা ধন্য ও কৃতার্থ। একটি অতিক্রান্ত যুগের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া, নবযুগের উদ্বোধনের মঙ্গল-মুহূর্তে 'উদ্বোধন'-এ বিবেকানন্দের বীরবাণী বজ্রস্বরে মন্দ্রিত হউক। নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু ঔদ্ধত্যের পীড়ন হইতে ভারতের অগণিত দুর্গত নরনারীকে মানবীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার যে সাধনা দায়স্বরূপ বিবেকানন্দ আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্মকথা আজ আমরা নূতন করিয়া অনুভব করিব। পর্বে পর্বে যে নূতন মহাভারত রচিত হইতেছে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সন্তান আমরা 'উদ্বোধন'-এর মধ্য দিয়া তাহার উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করিব। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং পূর্বাচার্যগণের আশীর্বাদ এবং বর্তমান সঙ্ঘনায়কগণের শুভেচ্ছা 'উদ্বোধন'-এর এই বীরের ব্রতকে প্রত্যক্ষ সার্থকতায় ভরিয়া তুলুক।* □

---

* সুবর্ণজয়ন্তী, মাঘ ১৩৫৪

'উদ্বোধন'-এর জয়যাত্রা

কুমুদবন্ধু সেন

দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। এই অর্ধশতাব্দী যাবৎ 'উদ্বোধন' দেশের জন-জাগরণে, সাহিত্যের নূতন শৈলীর ভাবধারায়, ব্যষ্টির স্বাধীন চিন্তার উন্মেষে, সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উদার সম্প্রসারিত দৃষ্টি আনিয়াছে। কোন সঙ্কীর্ণ আদর্শ, ক্ষুদ্রগণ্ডি বা সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যুগোপযোগী মহাসমন্বয়ের দৃষ্টিতে—পূর্ব ও পশ্চিমের ব্রহ্মবিদ্যা ও বিজ্ঞানের মিলনে এক নূতনতর মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির গঠনে জাতির সুপ্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য 'উদ্বোধন'-এর আবির্ভাব বা বোধন হইয়াছে। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ জলদগম্ভীর ও ওজস্বিনী ভাষায় 'উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। 'উদ্বোধন'-এর ৫ম বর্ষে ১৩০৯ সালে ১লা মাঘের ১ম সংখ্যায় পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ সুস্পষ্ট প্রাঞ্জলভাবে উহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "হে পাঠক! 'উদ্বোধন' ৫ম বর্ষে উপনীত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্য বা ব্রহ্মশক্তি বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়-নিহিত রজঃ বা ক্ষত্র-শক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরম কল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিয়াছে। সেইজন্য আপাত শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবয়স্ক হইলেও অমিতবলশালী এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর। আশ্চর্য নহে—সর্ষপতুল্য বীজেই বিশাল বৃক্ষ, নগণ্য মনুষ্য-শরীরেই জড়শক্তি-নিয়ামিকা চৈতন্যময়ী অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি এবং আকাশাপেক্ষাও তরল ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্ব-সংসার নিহিত রহিয়াছে। নববর্ষে নবোদ্যমে পুরাতন শক্তি আবার জাগরিতা।"

'উদ্বোধন' প্রকাশের দিন এখনো স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কী অদম্য উৎসাহ, কী মহোচ্চ আদর্শ, কী বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং কী অনাবিল আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। স্বামীজীর লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া তাঁহাদের নয়নসম্মুখে বাংলা তথা ভারতের এক ভাবী সমুজ্জ্বল ছবি উদিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্রিকা—সামান্য পুঁজি, পরগৃহে অফিস ও ছোট ছাপাখানা, তবুও ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কারণ ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল আধ্যাত্মিক মহাশক্তি, স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব প্রেরণা ও প্রদীপ্ত উৎসাহব্যঞ্জক বাণী এবং সর্বত্যাগী পরহিতব্রতী রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সুদৃঢ় সঙ্কল্প, নিষ্কাম কর্ম-প্রচেষ্টা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়। আজ মনে পড়ে 'উদ্বোধন'-এর সর্বপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে 'উদ্বোধন প্রেস' এবং 'উদ্বোধন

পত্রিকা'র সম্পাদনার গুরু দায়িত্বভার একাকী বহন করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যাপূত জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর পত্রিকাপ্রকাশের ইচ্ছাকে তিনি কার্যক্ষেত্রে আকার দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেখিয়াছি—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় কতদিন তিনি কখনো অনাহারে, অর্ধাহারে প্রেস ও পত্রিকার কার্য দেখিতেছেন। শুধু পরিদর্শকভাবে দেখাশুনা নহে, আজ কম্পোজিটার অনুপস্থিত, তাঁহাকে নিজে সন্ধান করিয়া নূতন লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে, কাল প্রেসম্যান অসুস্থ, কোথায় প্রেসম্যান পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানে নানাস্থানে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় সস্তায় প্রেসের কোন্ উপকরণ পাওয়া যায় সেই তথ্য লইবার জন্য কখনো ছুটাছুটি করিতেছেন, আবার কখনো কখনো প্রেসের লোকজনের কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে প্রবন্ধ সংগ্রহ এবং প্রবন্ধ রচনা করিতেও হইত। ঠিক সময়ে পত্রিকা-প্রকাশ না হইলে স্বামীজীর নিকট তিরস্কৃত হইতেন। ইহা ছাড়া ছাপাখানার কাহারও ব্যারাম হইলে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থার আয়োজন তাঁহাকেই করিতে হইত। নানাদিকে এইসব কঠোর পরিশ্রমেও তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত—ক্লান্তির কোন কালিমা দেখা যাইত না। বেশিরভাগ কম্পোজিটার ও প্রেসম্যান বস্তিতে বাস করিত। তিনি বিনাসঙ্কোচে বস্তির মধ্যে যাইয়া তাহাদের খোঁজ লইতেন। কতদিন দেখিয়াছি—শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্ত স্বর্গীয় মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে অপরাহ্নকালে তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি জলপান করিতেছেন এবং তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি তাঁহার তখনো স্নানাহার হয় নাই। মণীন্দ্রকৃষ্ণ মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র এবং তাঁহার দৈনিক সংবাদ 'প্রভাকর'-এর সম্পাদনা তিনি নিজেই করিতেন। তাঁহাদের 'প্রভাকর প্রেস' নামক একটি প্রেস ছিল, সুতরাং সন্ধান লইতে সেখানে অনেক সময়ে তিনি যাইতেন। এদিকে পত্রিকায় কোনপ্রকার ভ্রম-প্রমাদ বা প্রুফ দেখিতে ভুল-ত্রুটি থাকিলে কিংবা অশুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করিলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বিশেষভাবে তিরস্কার সহ্য করিতে হইত। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদিন এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীস্বামীজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ 'উদ্বোধন'-এ তখন সদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়াই 'উদ্বোধন'-এ তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন ঃ "কি রকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তাতো বুঝতে চাও না!" স্বামীজী বলিলেন ঃ "ওসব কথা রেখে দে—তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে। ওদেশে কম্পোজিটাররাও বিদ্বান নয়—যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। এদেশে দেখি ছাপা হলেই হলো—তাতে ভুল-ত্রুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের এদিক ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ

একেবারে উলটে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়। তোরা কাগজে যদি ভুল-ভ্রান্তি ছাপবি—তবে উন্নতিটা কি হলো বল?'' স্বামী ত্রিগুণাতীত নিরুত্তর রহিলেন। প্রেস ও পত্রিকা দুটির জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে—বিশেষ কম্পোজিটার প্রভৃতির সন্ধানে তাঁহাকে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরিতে হইতেছে শুনিয়া স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেসটি বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও জিদ করিলেন। অবশেষে প্রেস বিক্রয় করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করিলেন। কখনো কখনো তিনি 'উদ্বোধন'-এর জন্য বাগবাজার পল্লীর যুবকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

আজ যে চলিত ভাষায় সাহিত্যের প্রসার হইয়াছে—তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছে স্বামীজীর বাংলা রচনা। 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা' ও 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া হাজার হাজার শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন ঃ ''কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়িবার জন্য সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গসাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন—তাহা পড়িয়া দেখুন—বলিয়া বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল?'' দীনেশচন্দ্র বলিলেন ঃ ''আমি এইমাত্র রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি উহা পড়ি নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন ঃ ''আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।'' এছাড়া তিনি আরো শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন। বইখানি লইয়া দীনেশবাবু চলিয়া গেলেন। এই চলিত ভাষার ধারা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা-গোমুখী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। বহুপূর্বে 'হুতোম প্যাচার নক্সা'য় চলিত ভাষা ছিল—তাহা ব্যঙ্গ রঙ্গ তামাসা। গভীর চিন্তা ও সাহিত্যিক মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া স্বামীজীর প্রাণস্পর্শী চলিত ভাষা 'উদ্বোধন'-এ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।

ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যকে 'উদ্বোধন' কিরূপ পরিপুষ্ট করিয়াছে 'উদ্বোধন'-এর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিবে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', 'ভারতে শক্তিপূজা' প্রভৃতি বাংলার অগণিত নরনারীর প্রাণে শুধু শান্তিদান করে নাই—অনেকের সাধনায়, চিন্তায় ও জীবনে প্রেরণা দান করিয়াছে। অনুবাদ-সাহিত্যের আদর্শ রচনা দেখিতে পাই বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও পত্রাবলীতে। বঙ্গভাষায় এখন পর্যন্ত ইহা অতুলনীয়। 'রাজযোগ', 'কর্মযোগ' প্রভৃতি গ্রন্থও সুন্দর অনূদিত হইয়াছে। অনেকে ইহা

মৌলিক রচনা বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। 'উদ্বোধন' সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দের ইহা বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব দান। কুরুচিপূর্ণ নাটক, উপন্যাস ও গল্পব্যতীত চিন্তাশীল প্রবন্ধ সহায়েও যে মাসিকপত্র চলিতে পারে—ইহার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন—'উদ্বোধন'।

বিগত অর্ধশতাব্দীকাল 'উদ্বোধন' বাঙালী হিন্দু-নরনারীকে, আভিজাত্য-অভিমানী হিন্দুগণকে শিখাইয়াছে—যদি এখনো বাঁচিতে চাও তোমরা তোমাদের মাতৃভূমি—তোমাদের সমাজ ও ধর্ম বাঁচাইতে চাও—তবে অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হরণ করা অপেক্ষা আর মহাপাপ কি হইতে পারে? যাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া এতদিন অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়া আসিয়াছ—তাহাদের অধিকার দাও, বিদ্যা দাও, তাহাদের তোমাদের মতো মানুষ করিয়া তোল, সব ভেদ দূর কর। স্বামীজীর ভাষায় বলি—ভারতকে উঠাইতে হইবে, আর পুরোহিতদলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন, পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দু যাহাতে না থাকে তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরো ভাল করিয়া খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরো সুবিধা পায়—তাহা করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতে আজ ইহাই প্রধান সমস্যা।

'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী এখনো ঝঙ্কৃত হইতেছে। স্বামীজী বলিয়াছেন : "উন্নতির মুখ্য সহায় স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।

"ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্মিক লোক নাই ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে, না মরিতে হইবে? কেন একজন লোকও না খাইয়া মরিবে? মুসলমান হিন্দুগণকে জয় করিল—এ ঘটনা সম্ভব হইল কেন? এই বাহ্য সভ্যতার অভাব।"

সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'উদ্বোধন'কে অভিবাদন করিয়া বলিতেছি—হে 'উদ্বোধন', তোমার দিব্য কণ্ঠে ফুটিয়া উঠুক শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দের স্বাধীনতার বাণী—এই স্বাধীন ভারতে তোমার আদর্শ সমুজ্জ্বল হইয়া কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়ে প্রকৃত স্বাধীনতার প্রেরণা আনুক—কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি রাষ্ট্রক্ষেত্রে, কি আধ্যাত্মিক সাধনায়, কি ধর্মক্ষেত্রে ধ্বনিত হোক—শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিবেকানন্দের প্রেমপরিপূর্ণ উদার বাণী ও মহোজ্জ্বল আদর্শ। সভ্যতার নব রূপ গঠনে কোটি কোটি নরনারী উদ্বুদ্ধ হোক—ভারত আবার সকল বিষয়ে জগতের মহাবরেণ্য আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত হোক।* □

---

* সুবর্ণজয়ন্তী, মাঘ ১৩৫৪

'উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ১ ॥

স্বামীজীর বাণীবহ প্রথম বাঙলা পত্রিকা 'উদ্বোধন'—তার প্রথম সম্পাদককে কি বজ্রবহনের উপযোগী আধার হতে হবে না?

প্রথম সম্পাদকের নাম স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ—ঈষৎ হ্রস্ব আকারে ত্রিগুণাতীত। তাঁর জীবনের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করা যাক :

সময় ১৮৯৯-এর আগস্ট মাস। শ্রীমা সারদাদেবী কলকাতা থেকে বর্ধমানের পথে জয়রামবাটী যাচ্ছেন। সঙ্গে আছেন ত্রিগুণাতীত। দামোদর পার হওয়ার পরে শ্রীমায়ের জন্য পালকি পাওয়া গেল না। গরুর গাড়িতে তাঁর যাত্রা শুরু হলো। রাত্রি ঘনালো—মধ্যরাত্রি পেরিয়েছে। সামনে যাচ্ছেন লাঠিকাঁধে ত্রিগুণাতীত। তিনি সভয়ে দেখলেন, পথের খানিকটা বানের জলে ভেঙে গেছে। সেখানে গাড়ি পড়লে মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে—আহতও হতে পারেন। মায়ের কষ্টের ঘুম তো ভাঙানো যায় না! সুতরাং উন্মেষশালিনী বুদ্ধিযোগে বলীয়ান শ্রীমৎ ত্রিগুণাতীত ঐ ভাঙা অংশটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন—তাঁর ওপর দিয়ে গাড়ি দিব্যি চলে যাবে, মাতাঠাকুরানীর কোনই অসুবিধা হবে না। আর তাঁর অবস্থা—যায় যদি যাক জীবন চলে 'বন্দে মাতরম্' বলে।

অবশ্য মায়ের প্রাণে ছেলের জন্য সাড়া জাগেই। ঘটনাটি ঘটবার আগে মায়ের ঘুম ভেঙেছিল। ওহেন বীরকর্মের জন্য পুত্র যথোচিত তিরস্কার লাভ করেছিলেন এবং অবশ্যই মায়ের সজল চোখের আশীর্বাদ।

স্বামীজীর 'উদ্বোধন'-এর চাকা নিজের শরীরে ওপর দিয়ে চলে যাক—এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই ত্রিগুণাতীত কাজে নেমেছিলেন।

কিন্তু সত্যই কি ত্রিগুণাতীতের সাধ্য ছিল 'উদ্বোধন'-এর রথারোহী হয়ে একক যাত্রার?

আরেকটি দৃশ্য এই—সরাসরি স্বামী গম্ভীরানন্দের লেখা থেকে উদ্ধৃত করি :

"(ত্রিগুণাতীত মহারাজ)... ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতের লাদাখ, কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শনে যাত্রা করিলেন।... একদিন পথ চলিতে চলিতে ঠিক সন্ধ্যা-সমাগমে এক বিস্তীর্ণ খরস্রোতা পার্বত্য নদীর তীরে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন, পার হইবার জন্য একটি পুরাতন বাঁধমাত্র আছে; তাহাও মধ্যে মধ্যে ভগ্ন। জ্যোৎস্নার আলোকে কোনপ্রকারে উহারই উপর দিয়া চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া অগ্রসর হইলেন এবং ভগ্নস্থানগুলি উল্লম্ফনপূর্বক অতিক্রম করিতে থাকিলেন। এইভাবে চলিয়া সবেমাত্র মধ্যস্থলে পৌঁছিয়াছেন, এমন সময়ে একখানি কালো মেঘ উজ্জ্বল চন্দ্রমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করায়

অমানিশার মতো চারিদিক সম্পূর্ণ তিমিরাবৃত হইল। অন্ধকারে এই বাঁধের উপর দিয়া এক পা অগ্রসর হওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; মনে মনে শুধু ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, 'আমায় অনুসরণ কর।' হঠাৎ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—কলের পুতুলের মতো চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে নদীর অপর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণে কালো মেঘখানি সরিয়া যাওয়াতে চাঁদের আলো পরিষ্কারভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; তথাপি নদীর তীরে তিনি কোন লোকের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।"[১]

অলৌকিক কাণ্ডকারখানা! বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের দায় পাঠকের। কিন্তু ত্রিগুণাতীতের বিশ্বাস একেবারে বাস্তব।

সেই বিশ্বাসের চেহারা কিরকম?

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে জানুয়ারি ১৮৯৬-এ ত্রিগুণাতীতকে লিখলেন ঃ

"তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। বাহবা, সাবাস। গুঁজগুঁজেগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ করে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি।... মোচ্ছব (মহোৎসব) এমনি মাচাবি যে, দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়।... তোলপাড় কর—তোলপাড় কর দুনিয়া।"[২]

কাছাকাছি সময়ে ১৭ জানুয়ারি স্বামীজী ওঁকেই লিখলেন ঃ "লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। বজ্রবাঁটুলের মতো হতে হবে, পাহাড় পর্বত ভেদ হয়ে যাতে যায়।... তুই, শশী আর গঙ্গাধর—এই তিনজন দেখছি faithful.... তোদের মুখে হাতে বাগ্‌দেবী বসবেন—ছাতিতে অনন্তবীর্য ভগবান বসবেন—তোরা এমন কাজ করবি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখবে।..."[৩]

বিবেকানন্দ দেখিয়েছিলেন বিশ্বাসের চেহারা কিরকম হওয়া দরকার। ত্রিগুণাতীত জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন—সত্যই স্বামীজীর ইচ্ছা পূরণ করা যায়।

সুতরাং ত্রিগুণাতীত ভাবতেই পারেন—দুর্গম পার্বত্যপথে খরস্রোতা নদীর ওপর ভগ্ন সেতুর ওপরে তাঁর হাত ধরে পার করে দিয়েছিলেন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং গুরুতুল্য গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ।

।।২।।

ত্রিগুণাতীত মানুষটি কেবল অদ্ভুতকর্মা নন—নিজেও স্বভাবে অদ্ভুত। ৩০ জানুয়ারি ১৮৬৫ তারিখে জন্ম, পিতা শিবকৃষ্ণ মিত্র। তাঁদের সম্পন্ন পরিবার। তাঁর সংসারাশ্রমের নাম সারদাপ্রসন্ন। পড়াশোনায় ভাল। শ্যামপুকুরের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন তখন স্বয়ং তিনি এবং অন্য সকলে স্থির করে রেখেছিলেন, পরীক্ষায় উচ্চস্থানলাভ অবধারিত। কিন্তু একটি সোনার ঘড়ি প্রাপ্য ও প্রাপ্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল। ঘড়িটি তাঁর বড় প্রিয়—পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে সেটি চুরি হয়ে গেল, ফলে পরীক্ষাগত স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কালিমাচ্ছন্ন। ভেঙে পড়লেন। পাস করলেন দ্বিতীয় বিভাগে। তাঁর নৈরাশ্য কাটাতে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 'ছেলেধরা' নামে খ্যাত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) তাঁকে হাজির করালেন নৈরাশ্যসূদন

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। ফলে পড়াশোনা মাথায় উঠল, এফ.এ-ও পাস করলেন সাধারণভাবে, কেননা ইতিমধ্যে অসাধারণের সংস্পর্শে অসাধারণের সন্ধানী হয়ে পড়েছেন।

সারদাপ্রসন্ন স্বতই খেয়ালী, তার সঙ্গে যুক্ত হলো ধর্ম-নেশা, ফলে আচার-আচরণ লাগামছাড়া। এধার ওধার ছুটতে লাগলেন বিপদকে সঙ্গী করে। কাণ্ড দেখে তাঁর সংসারে প্রবল আলোড়ন—সোনার টুকরো ছেলে দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনের পাল্লায় পড়ে বুঝিবা কৌপীনবন্ত হয়ে পড়ে! পিতা শিবকৃষ্ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন—যখন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্ত হলো এবং হাসলেন—হাসতে হাসতে বললেন ঃ "আমি কালীঘাটে গিয়ে জপ করলুম, তবে তো হলো!"

কিন্তু মা কালী নিশ্চয় উলটো সমঝেছিলেন। সারদাপ্রসন্ন এবার সংসারের শেষ বন্ধন ছিঁড়ে ভিড়ে পড়লেন বরানগরের উন্মাদ দলটির সঙ্গে। সন্ন্যাস নেওয়ার পরে নাম হলো ত্রিগুণাতীতানন্দ। নামটি বড় মাপের—তাঁর কোনকিছুই কি মাপসই ছিল?[৪] বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে তাঁকে ঘুরতেই হবে—কোনকিছুর ভ্রূক্ষেপ না করে, খেতে পেলে খাবেন, আর দু-চারদিন না খেতে পেলেই বা কি? যখন খাবেন—মানে খেতে পাবেন, তখন সে এক বিপর্যয় কাণ্ড!

'সৃষ্টিছাড়া' খাওয়ার দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পেটের অসুখে ভুগছিলেন দেখে চিকিৎসার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে ডাক্তার বিপিন ঘোষের কাছে পাঠালেন। ডাক্তার তাঁকে চিনতেন। সুতরাং সাধুকে খাওয়াবার জন্য দু-টাকার রসগোল্লা আনালেন (তখনকার দু-টাকায় এখনকার প্রমাণ মাপের ৬৪টি রসগোল্লা পাওয়া যেত)। ত্রিগুণাতীত সেগুলি নির্বিবাদে খেলেন। তারপর ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তা এসেছ কেন?" শুনলেন—পেটের অসুখের চিকিৎসা করাবার জন্য এসেছেন। চমকে উঠে ডাক্তার বললেন ঃ "তাহলে অতগুলো রসগোল্লা খেলে কেন?" উত্তর—"আপনি দিলেন, আমি কি করব?"

স্বামী প্রেমানন্দ একবার চমৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি সাড়ে সাত সের ঘন দুধ ধীরে ধীরে ত্রিগুণাতীতকে খেতে দিয়েছিলেন এবং একেবারে না থেমে সেই দুধ উনি খেয়েছিলেন। প্রেমানন্দ বলেছিলেন ঃ "আমিও থামলুম না, ও-ও থামল না।"

ছেলের সঙ্গে মায়ের অভিজ্ঞতা এক তারে বাঁধা ছিল। প্রেমানন্দ-জননী ত্রিগুণাতীত ও আরো দুজনকে একবার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন। ত্রিগুণাতীতের আহারাদির অতিকায় রূপ সম্বন্ধে ধারণা থাকায় আয়োজন বড় মাপের হয়েছিল। নিমন্ত্রিত বাকি দুজন আসেননি। আহা, এত সব জিনিস নষ্ট হবে!—সম্ভবত গৃহস্বামিনীর প্রতি এই ধরনের সহানুভূতি বোধ করে ত্রিগুণাতীত কেবল নিজের নয়, বাকি দুজনেরও খাবার খেয়ে নিলেন। গৃহের কল্যাণ হলো, কিন্তু গৃহস্বামিনীর রাত্রির নিদ্রা গেল। বৃদ্ধা ভয়ে অস্থির, না জানি কি অসুখ হয়! পরদিন ত্রিগুণাতীতকে সুস্থ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন ঃ "সারদা কি খায় রে! ও অনেক পাহাড়-পর্বত ঘুরে বেড়িয়েছে, ও অনেক

'মোন্তর' শিখেছে, তাই উড়ো মন্তরে উড়িয়ে দেয়। তা না হলে মানুষ কি অত খেতে পারে!" ওঁর পুত্র প্রেমানন্দও ত্রিগুণাতীতকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন— "ওর সিদ্ধাই ছিল।"

গভীর ভক্তি এবং কিঞ্চিৎ ছেলেমানুষি মেশানো খাদ্যগ্রহণের একটি মনোহর দৃষ্টান্ত আছে।

শ্রীমা সারদাদেবী সন্তান সারদাকে বলেছিলেন, বাজার থেকে ঝাল লঙ্কা কিনে আনতে। মায়ের ইচ্ছা যখন, তখন সেরা জিনিসটি চাই। সুতরাং ত্রিগুণাতীত কোন্‌টি সেরা ঝাল লঙ্কা তা জানবার জন্য বাগবাজার থেকে বড়বাজার পর্যন্ত দোকানগুলিতে লঙ্কা চাখতে চাখতে চললেন। তার ফলে তিনি সেরা ঝাল লঙ্কা পেয়েছিলেন কিনা সে-সংবাদ আমরা পাইনি (কে আর অমনভাবে চেখে চেখে পরীক্ষা করতে রাজি হবে?)—কিন্তু জেনেছি যে, তাঁর জিভ-মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল।

খাদ্য ব্যাপারে সমদর্শিতার মনোমুগ্ধকর দৃষ্টান্তও আছে।

বরানগর মঠে থাকাকালে স্বামীজীর নির্দেশে শরৎ মহারাজ পায়ে হেঁটে নবদ্বীপযাত্রা শুরু করেছিলেন, মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে খবর পেয়ে "আমি চঞ্চল হে" সারদা মহারাজ (ত্রিগুণাতীত) কি দলে না ভিড়ে পারেন? কিন্তু পথ চলতে চলতে তাঁর দেখা বাকি দুজন পেলেন না। সূর্য চড়তে চড়তে মাথার ওপর উঠে পড়ল, বিশ্রামের জন্য তাঁরা একটা বাগানের সামনে বসে পড়লেন ক্লান্ত হয়ে। হঠাৎ দেখা গেল, ত্রিগুণাতীত বাগানের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন। মনে হয়, তাঁকে অভ্যর্থনার ভাষাটা কিছু কড়া হয়েছিল। তাঁদের রাগ-তাপ কিন্তু গলে জল হয়ে গেল যখন অপূর্ব উত্তর শুনলেন—স্নেহের সারদা মহারাজ বাগানে সুন্দর পুকুর দেখে স্নানাদি করবার ইচ্ছা বোধ করেছিলেন এবং স্নান শেষে নিয়মমাফিক পিত্তরক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। "কিভাবে?"

—"কেন, দেখলুম চমৎকার কচি দূর্বা রয়েছে, তাই দিয়ে পিত্তরক্ষার কাজটা সেরে ফেললুম।"

তবে মাঝে মাঝে এই ঘুরণচণ্ডী মানুষটি বনে-বাদাড়ে পিত্তরক্ষাও করতে পারেননি। কিংবা যখন স্বেচ্ছাব্রতে মাত্র পিত্তরক্ষাটুকুই করেছিলেন, তখন পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দের সবিস্ময় শ্রদ্ধাও লাভ করেছিলেন।

"স্বামী প্রেমানন্দই আবার বেলুড় মঠে বসিয়া শিবরাত্রির পরদিন বলিয়াছিলেন ঃ 'রোজ একটা করে কলা খেয়ে (সারদা) ঐ বেলতলায় সাতদিন পড়ে রইল।'"[৫]

।।৩।।

'উদ্বোধন'-এর প্রকাশকর্মে সরাসরি জড়িত হওয়ার আগে ত্রিগুণাতীতের নিজ জীবনের বোধনপর্ব শেষ হয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ পেয়েছেন, তাঁর শিষ্য তিনি, সুতরাং সাধ্য ও সাধন একত্রে লাভ। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় গুরুও ছিলেন—বিবেকানন্দ। তাঁর টানে পাহাড়-পর্বত ওলটাবার কাজও জুটে গেল। বরাত আরো ভাল, স্বয়ং মহাশক্তি মহাশান্তি—তাঁর আশ্রয়লাভও জীবনে ঘটল। তা অবশ্য কিছু পরে, যখন স্বামী যোগানন্দের দেহান্ত ঘটল এবং তিনি কিছুদিনের জন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দ্বারপাল এবং গৃহের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

স্বামীজী বলতেন, তাঁর পায়ের তলায় 'চক্কর' (চক্র) আছে। চক্রের সংখ্যা অনেক। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রিয় মানুষগুলির পায়ের তলায় সেই সদাঘূর্ণিত চক্র থাকবে না, তা হতে পারে না। আর ঘূর্ণিপাকে যদি ঘুরতেই হয়, তাহলে ভারতের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত সাঙ্গ করার পরে তিব্বতের কৈলাস ও মানস সরোবরের দিকে না এগিয়ে পারা যায়? কৈলাস শিবের স্বভূমি এবং মানস সরোবর—'মানসে মা যথা ফলে।' সুতরাং বিবেকানন্দের দুই গুরুভাই—অখণ্ডানন্দ ও ত্রিগুণাতীত উক্ত স্থানে না গিয়ে পারেন কখনো? বিবেকানন্দের শিষ্যরাও ঐ পরম রহস্যভূমিতে গিয়েছেন—শুদ্ধানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দ।

বিবেকানন্দের খুশির সীমা ছিল না। আতুপুতু প্রাণওয়ালা ভারতীয় বাবুর দল যখন প্ল্যাটফর্মে উঠে গলা ছোটাচ্ছেন এবং কাগজে-কলমে স্বদেশের নোংরা ঘর ঝাড়ছেন, তখন 'স্বদেশ' ব্যাপারটি কী তা জানবার জন্য নিজের প্রাণটাকে নিয়ে খেলা করতে করতে বিবেকানন্দের গুরুভাইরা স্বদেশের সর্বদিকে ঘুরছেন।

স্বামীজী সহর্ষে বললেন : "শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য চরণস্পর্শে যে মুষ্টিমেয় যুবকদলের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখ। আসাম হইতে সিন্ধু, হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা তাহারা প্রচার করিয়াছে। তাহারা পদব্রজে বিশ হাজার ফুট উর্ধ্বে হিমালয়ের তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া তিব্বতের রহস্য ভেদ করিয়াছে। তাহারা চীরধারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছে। কত অত্যাচার তাহাদের উপর দিয়া গিয়াছে—পুলিশ তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে—কারাগারে তাহারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।"[৬]

॥৪॥

অভিজ্ঞতা অন্যদিকেও ছিল। প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পঠন ও মননের অভিজ্ঞতা। ফলে ত্রিগুণাতীত লেখক হয়ে উঠেছিলেন—বাস্তব অভিজ্ঞতা, চিন্তার শক্তি এবং স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ সেইসব লেখায় ছিল। 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশের বেশ কয়েক বছর আগে তখনকার দিনের নামী ইংরেজী দৈনিক 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এ ১৮৯৫ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে নয় সংখ্যায় তাঁর তিব্বত ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়। (শেষ কিস্তি বের হয় ২৯ ডিসেম্বর ১৮৯৬—স্বামীজী তখন ভারতভূখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেননি।)

আরেকটি দীর্ঘ লেখা বেরিয়েছিল 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এর ২৮-৩০ জানুয়ারি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ৫ মার্চ ১৮৯৮—দুর্ভিক্ষের ইতিহাস ও তত্ত্ব সম্বন্ধে (Swami Trigunatitas' Lecture on the History and Philosophy of Famine)।[৭]

শেষোক্ত লেখাটির পটভূমিকায় ছিল উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষের সমগোত্রীয় খাদ্যাভাব। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে ত্রিগুণাতীত সেখানে ১৮৯৭-এর আগস্ট মাসে সেবাকাজে যান, বিরোল গ্রামকে কেন্দ্র করে কাজ শুরু করেন। চার মাসের মতো কাজ করেন তিনি, সর্বমোট ৮৪টি গ্রামে সেবাকাজ চালান। নিখুঁতভাবে কাজ করেছিলেন, অধিকাংশ কাজ নিজেই করতেন; গ্রামগুলির ঘরে ঘরে গিয়ে সন্ধান নিয়ে তবে প্রয়োজনমতো খাদ্যবস্তু সরবরাহ করেছেন। রাত্রে বিরোল গ্রামের সেবাঘরটিতে চালের বস্তার ওপর শুয়ে ঘুমিয়েছেন, পাছে কেউ চুরি করে নিয়ে যায়। নভেম্বরের শেষে কাজ সমাপ্ত

করেন এবং তাঁর সেবাকাজে মুগ্ধ স্থানীয় অধিবাসীরা ৩ ডিসেম্বর এক বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন করেন দিনাজপুর শহরের ময়দানে। সেই সভায় শহরের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন জেলার কালেক্টর মিঃ এন. বনহ্যাম কার্টার।

সভায় ত্রিগুণাতীতকে মানপত্র দেওয়া হয়—স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ইয়াকুইনুদ্দিন আমেদ। মানপত্রে প্রভূত প্রশস্তি ছিল, সেইসঙ্গে গভীর কৃতজ্ঞতা—কঠিন দুঃখের দিনে ত্রিগুণাতীতের ত্রাণকর্তা ভূমিকার জন্য। তাতে উল্লিখিত হয়েছিল—কেন্দ্রপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণের অভূতপূর্ব লোকসেবার বিষয়টি : "পরম আনন্দের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রয়াত পরমহংস রামকৃষ্ণ আপনার মতো উপযুক্ত শিষ্য এবং সহযোগী কর্মিবৃন্দকে রেখে যেতে পেরেছেন, যাঁরা তাঁদের শুভকর্মের দ্বারা উক্ত খ্যাতনামা ঋষির এবং যে-দেশে তিনি জন্মেছেন সেই দেশের নামকে উচ্চে স্থাপন করতে পেরেছেন। আপনার সেবাকর্মের বিনিময়ে আমাদের দেওয়ার মতো কিছু নেই, শুধু আছে ধন্যবাদটুকু। সে-ধন্যবাদ, বিশ্বাস করুন, আমাদের প্রাণের গভীর থেকে এসেছে—তা আপনি ও আপনার মিশন সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ। সেবা এক মহান গুণ, আর আপনি যে-সেবাব্রত নিয়েছেন তা পৃথিবীর পরমতম পবিত্রতম এক ব্রত।"

দেশীয় মানুষদের কার্যাবলী সম্বন্ধে ঢালাও সার্টিফিকেট দেওয়া ইংরেজ প্রশাসকদের কার্যবিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যেখানে প্রশংসা করতেন, সেখানে মুরুব্বিয়ানার সুর গোপন থাকত না। সভাপতি মিঃ এন. বনহ্যাম কার্টার-এর সাধুবাদে যদি কিছু মুরুব্বিয়ানা থাকেও (ছিল কি ?), তাকে ছাপিয়ে উঠেছিল যথার্থ শ্রদ্ধার উচ্চারণ। বাস্তব তথ্য ও সুষ্ঠু বিশ্লেষণ—দুইই ছিল তাঁর ভাষণে :

"স্বামী ত্রিগুণাতীত ও তাঁর ভ্রাতৃসঙ্ঘকে ধন্যবাদদানের আনন্দদায়ক কর্তব্যপালনের জন্য আমরা সমবেত হয়েছি—যাঁরা নিজ হস্ত ও মস্তিষ্ক সহায়ে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে সেবাকাজ করেছেন। একাধিক কারণে আমি এই সভায় সভাপতিত্ব করতে সানন্দে রাজি হয়েছি। প্রথমত, আমি পুরোপুরি উপলব্ধি করেছি—স্বামী মহোদয়ের এই মঙ্গলকর্ম সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। এই জেলার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কবন্ধন নেই। মানবমঙ্গলই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। আমি অবশ্য জমিদারগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ভাল কাজের কথা ভুলছি না। কিন্তু স্বার্থহীন মঙ্গলকর্ম অধিকতর প্রশংসার যোগ্য। স্বামী ত্রিগুণাতীত সরকারের সাহায্যের ওপর নির্ভর করেননি—আবার সরকারী কর্মচারীদের বিরোধিতা করার কাজও করেননি।...

"আরেকটি কারণে আমি এসেছি। স্বামী মহোদয় নিজে কাজ করেছেন—একেবারে নিজের হাতে। স্বায়ত্তশাসনের সাফল্যের রহস্য এখানেই আছে। স্বায়ত্তশাসন মানে কেবল সভা করা নয়—স্বায়ত্তশাসন মানে কাজ করা। যখন বড়মাপের কাজ তখন সভা-সমিতির দরকার আছে, কিন্তু আসল ব্যাপার দাঁড়ায় খাঁটি কাজে। যদি এঁর মতো আরো মানুষ থাকেন তাহলে আরো স্বায়ত্তশাসন ঘটবে। সরকারের সাহায্য ছাড়াই এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে জনসাধারণ স্ব-শাসন চালাচ্ছে। যেমন ইউরোপে বিরাট বিরাট ট্রেড

ইউনিয়ন এবং ইংল্যান্ডে খেলাধূলার ও ঘোড়দৌড়ের ক্লাবগুলি। তারা মস্ত মস্ত কাজ করে যায়। সরকারের মুখাপেক্ষী তারা নয়—জনসাধারণের সঙ্গে সহজ ধরনের চুক্তির ওপর তারা নির্ভরশীল। যদি এখানকার মানুষ সত্যকার কাজ করে যায়, কাজের বাহ্য আড়ম্বর না করে, তাহলে দেখব যে, এদেশে স্বায়ত্তশাসন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

"তৃতীয় কারণ হলো—স্বামী মহোদয় রীতিবদ্ধভাবে কাজ করে গেছেন। টাকা থাকলে দান বিতরণ করা সোজা ব্যাপার। কিন্তু অপাত্রে দান ভালর চেয়ে মন্দ করে বেশি। মানুষকে তা ভিখারি করে তোলে। অযোগ্যের দান-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। স্বামী মহোদয় শ্রমস্বীকার করে ব্যক্তিগতভাবে সন্ধান নিয়েছেন—কার সাহায্য প্রয়োজন।

"এই সভায় সভাপতিত্ব করতে পেরে আমি আনন্দিত, কারণ, যদিও ক্ষুদ্রাকারে সূচনা হয়েছে তা সঠিক পথে স্ব-নির্ভরতার সূচনা। বীজ থাকলে তা যথাকালে ফুটে উঠবেই।"

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের চরিত্র সম্বন্ধে চকিত কিন্তু উজ্জ্বল আলোকপাত ঘটেছে ওপরের বক্তৃতায়। দারিদ্র্য সেবার সুযোগ দেয়, সুতরাং দারিদ্র্য সেবাকর্মীর পক্ষে ঈশ্বরের আশীর্বাদ—এই একান্ত ভ্রান্ত, সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর দর্শনের বিরুদ্ধে ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাদর্শন ও তার প্রয়োগ, যা দুঃস্থ ভ্রাতৃগণের দুঃখের দিনে সেবার হাত বাড়ায়; আবার সেবাপ্রাপ্তদের মনে গেঁথে দিতে চেষ্টা করে যে, আত্মনির্ভরতাই দুঃখমোচনের একমাত্র উপায়। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্ম যিনি প্রথম বৃহত্তর আকারে বাস্তবায়িত করেন সেই স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বামী বিবেকানন্দ চিঠির পর চিঠিতে আগুন-ধরানো ভাষায় উদ্দীপিত করেছেন, সেইসঙ্গে বারবার বলেছেন ঃ কেবল সাহায্য বিতরণ করে থেমে যেও না, সংগঠন কর, শক্তিসঞ্চার কর গ্রামবাসীদের মধ্যে, তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাও। অখণ্ডানন্দের কাজ সম্বন্ধে প্রশংসার সঙ্গে স্বামীজীর সতর্কবাণীও ছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দকে ১১ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে তিনি লিখেছিলেন ঃ "জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।" অখণ্ডানন্দ সেবাকার্যের সঙ্গে শিক্ষাদানের কাজও শুরু করে দিয়েছিলেন। কয়েক বছর পর স্বামীজী ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ তারিখের চিঠিতে তাঁকে 'সাবাস' জানাবার পরে কর্তব্যনির্ণয় করে দিয়েছিলেন ঃ

"কতকগুলো চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখতে-পড়তে শেখাও ও অনেকগুলো ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও—তারপর গ্রামে চাষারা চাঁদা করে তাদের এক-একটাকে নিজেদের গ্রামে রাখবে। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' (নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে)—সকল বিষয়েই এই সত্য। We help them to help themselves (তারা যাতে নিজেরাই নিজেদের কাজ করতে পারে, এইজন্য আমরা তাদের সাহায্য করছি)। ঐ যে চাষারা ডাল দিচ্ছে—ঐটুকু হচ্ছে আসল কাজ। ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার এবং উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে। তাছাড়া পয়সাওয়ালারা

দয়া করে গরিবের কিছু উপকার করবে—তা চিরন্তন হয় না এবং তা আখেরে উভয় পক্ষের অপকার মাত্র। চাষাভূষো মৃতপ্রায়, এজন্য পয়সাওয়ালারা সাহায্য করে তাদের চেতিয়ে দিক—এই মাত্র। তারপর চাষারা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝুক, দেখুক এবং করুক।''

পূর্বোক্ত সংবর্ধনাসভার প্রতিভাষণে স্বামী ত্রিগুণাতীত রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের সূচনা বিষয়ে কিছু তথ্য জানান এবং শ্রদ্ধানিবেদন করেন এব্যাপারে পূর্বসূরী স্বামী অখণ্ডানন্দকে। নিজেদের অন্নসমস্যা নিজেদেরই মিটিয়ে ফেলতে হবে—এই বিষয়ে আহ্বান জানাবার পরে তিনি বলেন :

''আমার ব্যাপারটাই ধরুন। আমি সন্ন্যাসী, পথের গরিব ভিখারির চেয়েও গরিব—কিন্তু দেখুন কী পরিমাণে অর্থ আমার এবং আমার প্রতিষ্ঠানের কাছে এসে গেল, যাতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে সেবাকাজ আমরা চালাতে পারি। কিভাবে ঐ ব্যাপারটা ঘটল?

''আমার সন্ন্যাসী ভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ, তিরিশেরও অনেক নিচে তাঁর বয়স, 'নদীয়ার অবতারের' লীলাধন্য পবিত্র নানা স্থানের তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আরেকটু এগিয়ে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক ভূমিখণ্ডে ঘটনাচক্রে হাজির হন। এখানে একদল দুঃস্থ মানুষকে দেখে এই তরুণ সন্ন্যাসীর হৃদয় বিচলিত হয়। তরুণ ঋষির পক্ষে সেই স্থান ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। সেখানেই তিনি চিন্তান্বিত হৃদয়ে বসে পড়েন। তাঁর কাছে একটা কড়িও পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু শুনুন! তিনি সেই অভাবীদের দুঃখ দূর করতে পেরেছিলেন। তার রহস্য কি? কপর্দকশূন্য হয়েও তিনি তাদের দুঃখমোচন করতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁর ছিল 'ইচ্ছাশক্তি'। 'ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।' ঈশ্বর সেখানে ঐ ঐকান্তিক হৃদয়সম্পন্ন কর্মীকে সাহায্য করেছিলেন। সেখানকার মানুষ তাঁকে সাময়িকভাবে কিছু অর্থদান করেছিলেন। তারপর তাঁর শুভকাজের বার্তা বাতাসে ভেসে গিয়ে বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের কানে যেন চুপি চুপি কথা বলে গেল। স্বামীজী তখন কলকাতায় ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগীরা অর্থসাহায্য করতে শুরু করলেন। অখণ্ডানন্দ ঐ জেলায় ধারাবাহিক সেবাকাজ আরম্ভ করে দিলেন। কিছু সময়ের জন্য সহৃদয় বৌদ্ধ (মহাবোধি) সোসাইটি বেশকিছু সাহায্য করেছিলেন। সেখানেই শেষ নয়। সরকার যথেষ্টভাবে সাহায্য করলেন। অখণ্ডানন্দের কাজের বৃদ্ধি ঘটল। আমাদের সঙ্ঘ কলকাতায় আরেকটি সেবাকেন্দ্র খুলল। যখন আমাদের তহবিলে আরো কিছু জমল তখন আমাদের কলকাতা কেন্দ্রের কর্মকুশলী সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে আপনাদের এখানে সেবা করতে পাঠালেন। আমি আপনাদের সুজনস্বভাব কালেক্টরের কাছে হাজির হলাম। তিনি আমাকে প্রভূত উৎসাহ দিয়ে বললেন—যথাসাধ্য সাহায্য তিনি করবেন।

''বিরোল গ্রামে যখন সেবাকেন্দ্র খুলেছিলাম তখন আমার তহবিলে বিশেষ কিছু ছিল না। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, এখানে আমাদের কাজ সফল হবে। কিন্তু সমস্ত কার্যকালে আমার ছিল শুভ ইচ্ছাশক্তি, তাই ঈশ্বর সাহায্য করেছেন। আমাদের তহবিল বেড়েছে, আমাদের সঙ্ঘ বৈদ্যনাথধামে অন্নছত্র খুলেছে এবং আমার কাছেও কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ পাঠাতে পেরেছে। কাজের বিস্তৃতি ঘটিয়ে আমি এই শহরে একটি সেবাকেন্দ্র খুলতে পেরেছি।''

ত্রিগুণাতীত নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রসঙ্গে কয়েকবার ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তের কথা বলেছেন। সন্ন্যাসী তিনি—তা বলতেই পারেন। কিন্তু তিনি আবার সাধারণ সন্ন্যাসী নন—শ্রীরামকৃষ্ণের ছোঁয়া-লাগা সন্ন্যাসী শিষ্য। তাই তাঁর ঈশ্বর সর্বগ্রাসী। এই বক্তৃতাতেই বিশ্বের অণু-পরমাণুতে ব্যাপ্ত ঈশ্বর, বিশ্বাত্মবোধে সেই ঈশ্বরের উপলব্ধি—সেবিষয়ে রহস্যগভীর বর্ণনা আছে (যা তাঁর তিব্বত ভ্রমণকাহিনীর মধ্যেও মেলে)। আব্রহ্মস্তম্বব্যাপ্ত সেই একাত্মবোধ কিভাবে বিশ্বমানব-ভ্রাতৃত্ববোধে পৌঁছেছিল তার ভাবঘন বর্ণনা এই ঃ

"যখন কৈলাস দর্শনের জন্য তিব্বত যাচ্ছিলাম, তখন আমার সহযাত্রিদল কোন বিশেষ কারণে আমাকে তুষারাবৃত হিমালয়ের গিরিবর্ত্মে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে এগিয়ে যেতে বাধ্য হন। একলা সেখানে পড়ে রইলাম, সঙ্গিদল ক্রমে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। হতাশ হয়ে সেখানে বসে পড়লাম। চারিদিক গভীরভাবে শান্ত ও সমাহিত। কিন্তু অনিবার্য বিপদও সর্বত্র। চারিদিকে তুষারাবৃত পর্বতশিখর ভিন্ন আর কিছু নেই। সেই স্বর্গীয় পর্বতশিখরগুলিকে আমি নিজের ভাই বলেই মনে করলাম। শিখরগুলি ঝলমল করছিল, যেন জীবন্ত চরিত্র তারা—আমার তো তাই মনে হতে লাগল। তাদের সঙ্গে আত্মগত অন্তরঙ্গ অধ্যাত্মকথালাপ শুরু করে দিলাম। আমার সেই প্রাচীন শুভ্রশির ভ্রাতৃগণ আমার আত্মগত উক্তির প্রত্যুত্তর দিলেন—সান্ত্বনা দিলেন তাঁদের অলৌকিক মৌন বাণীতে। তাঁদের এবং আমার চোখে আর যাকিছু পড়েছিল সকল কিছুকে আমার ভাই বলে গ্রহণ করলাম।

"কিন্তু সকল পার্থিব ও নশ্বর বস্তুর মধ্যে মানুষই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সিংহাসনের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠরূপে নির্মাণ করা হয়েছে। বলা হয়, ঈশ্বরের আদলেই মানুষ নির্মিত। আমাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রিয়তম সন্তান এই মানুষ। তাই আপনাদের আমি সবচেয়ে প্রিয় ভ্রাতা-রূপে সম্বোধন করছি—হতে পারে তা প্রজ্ঞা থেকে, হতে পারে অজ্ঞতা থেকে।

"ঘটনা যখন এই, তখন আপনাদের যদি কোন সাহায্য করে থাকি, তা সামান্যই। যদি আমি আমার অভাবী ভাই-বোনদের সাহায্য করে থাকি—সে তিনি হিন্দু, খ্রীস্টান বা মুসলমান যেই হোন—সে-কাজ করেছি কর্তব্যরূপেই; তার জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি আমি মণ্ডা-মেঠাই ও অন্য সুখাদ্যে ভরা থালা নিয়ে খেতে বসি, অথচ যখন আমার ভাইবোনেরা ঘাসপাতা খাচ্ছে—যদি আমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি, অথচ আমার ভাইবোনেরা অনাহারে আছে—তাহলে তো আমি মানুষই নই, একেবারে পশু।... সেক্ষেত্রে নিজেকে মনুষ্যগুণসম্পন্ন বলবার অধিকার হারিয়ে যাবে, আমি পাপী হয়ে দাঁড়াব, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের কঠিন দণ্ডাঘাত সইতে হবে আমাকে।

"এই জেলার ভাইবোন আপনারা, এরপরেও যদি ভালবেসে বা কৃতজ্ঞতাবশে আমাকে এবং আমাদের সঙ্ঘকে ধন্যবাদ দিতে চান, তাহলে আমি বলব—হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ! কদাপি ওকথা মুখে উচ্চারণ করবেন না।"

॥৫॥

ত্রিগুণাতীতের ভাষণে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, যেখানে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে। তিনি বিস্তৃতভাবে দুর্ভিক্ষের রূপ, হেতু ও নিরাকরণের উপায় বর্ণনা করেছিলেন। অনেক তথ্য তিনি ঐতিহাসিক ও সমকালীন নথিপত্র থেকে সঙ্কলন করেছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—সর্বোপরি তাতে প্রাণসঞ্চার করেছিল স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত আত্মনির্ভরতার বাণীশক্তি। বহু তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক লেখাটি, এমনকি তার সারাংশও এখানে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। কেবল দু-একটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

ত্রিগুণাতীত অর্থাগমের দ্বিতীয় উপায় শিল্পায়নের প্রসঙ্গ এখানে একেবারেই আনেননি। গ্রামবাংলায় তিনি কৃষির বিষয়েই মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছিলেন, কারণ প্রধানত কৃষির দ্বারাই তখনকার ভারতবর্ষে অন্নাগম হতো।

গোড়ায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একাধিক ভ্রান্ত ধারণার দূরীকরণের চেষ্টা তিনি করেছিলেন। ঈশ্বরবিশ্বাসী তিনি, কিন্তু কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে গররাজি। সেজন্য শাস্ত্রবচন বলে কথিত কিছু কুসংস্কারাত্মক ধারণার খণ্ডন করেছেন শাস্ত্রবচন উদ্ধার করেই। তেমন একটি ধারণা—দৈবনিগ্রহে দুর্ভিক্ষ হয়। আরেকটি ধারণা—ঠিকমত যাগযজ্ঞ না করলে দুর্ভিক্ষ হয়। এইসব নির্বোধ ধারণাকে খণ্ডন করে, যথোচিত অবজ্ঞার সঙ্গে সেসব আবর্জনায় নিক্ষেপ করেছেন। তারপরে দুর্ভিক্ষের যথার্থ কারণ নির্ণয় করেছেন—যা রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, কৃষিগত এবং বৈজ্ঞানিক। রাজনৈতিক কারণের মধ্যে আছে—(১) বিধ্বংসী যুদ্ধ, (২) খাদ্যশস্যের রপ্তানী ও আমদানী সম্পর্কে ক্ষতিকর আইন, (৩) ক্ষুদ্রতর স্থানে অতিরিক্ত লোকসমাগম, (৪) অপরিণামদর্শী প্রশাসন। ব্যবসায়িক কারণ—(১) ব্যবসায়ীদের সাংগঠনিক ত্রুটি এবং সংরক্ষণ ও বণ্টন ব্যাপারে দূরদর্শিতার অভাব, (২) খাদ্যশস্য চলাচলের ক্ষেত্রে সামর্থ্যের অভাব, (৩) গৌণ কারণে মুখ্য পণ্যের অপব্যবহার। কৃষিজ কারণ—(১) খরা কিংবা জলসেচের বন্দোবস্ত না থাকা, (২) জলপ্লাবন কিংবা নদী বা সমুদ্রতটে উপযুক্ত বাঁধ না থাকা, (৩) অতিবৃষ্টি এবং জলনিকাশী ব্যবস্থা না থাকা, (৪) জমিকে উর্বর করার উপযুক্ত পদ্ধতি বিষয়ে অজ্ঞতা, (৫) একই জমিতে হিসাব না করে অন্য শষ্যের চাষ, (৬) আহার্য হিসাবে কেবল এক ধরনের খাদ্যশস্যের ওপর অত্যধিক নির্ভরতা। বৈজ্ঞানিক কারণ—(১) বনাঞ্চলের সম্পূর্ণ বিনাশ যা অনাবৃষ্টি ডেকে আনে, (২) ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের উপদ্রব, (৩) অত্যধিক তুষারপাত ইত্যাদি।

ত্রিগুণাতীত উল্লিখিত কারণগুলির সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। অনেকখানি অংশ নিয়ে তিনি বাংলার ১৭৭০, ১৭৭৫, ১৭৯৩, ১৮৬১, ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের বিবরণ দিয়েছেন। বৃহত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষের বর্ণনাও তিনি করেছেন, যেমন মাদ্রাজে ১৭৩৩, ১৭৮৩, ১৮০৫, ১৮১৪, ১৮২৪, ১৮৫৪, ১৮৭৭; বোম্বাইয়ে ১৮৭৭; উড়িষ্যায় ১৮৬৬; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৮৬১ এবং ১৮৩৮ সালে। এইসব দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ মরেছে, যথাসর্বস্ব হারিয়ে তারা ক্ষুধার জ্বালায় পশুবৎ আচরণ করেছে, সম্পন্ন জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ত্রিগুণাতীতের ইতিহাসবোধ সুপ্রাচীনকালের দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করতে তাঁকে প্রণোদিত করেছে এবং তিনি বহির্ভারতের দুর্ভিক্ষের কথাও বলেছেন।

দুর্ভিক্ষ কেন হয়, তার সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ধারণাতে তাঁর সায় ছিল না। খাদ্যশস্য রপ্তানী করলেই দুর্ভিক্ষ হয়, তা তিনি মানতে পারেননি। রপ্তানীর ওপর দেশের ধনবৃদ্ধি নির্ভর করে এবং বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়। খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হলে, রপ্তানী না থাকলে শস্যাদির দাম পড়ে গিয়ে কৃষকের আর্থিক ক্ষতি হয়, সে পরিশ্রমের মূল্য পায় না। ত্রিগুণাতীত চেয়েছেন, ভারতবর্ষ অযথা আত্মতৃপ্তির সুখনিদ্রা ছেড়ে বিশ্বব্যাপক প্রতিযোগিতার মধ্যে নেমে পড়ুক, জেনে নিক অপর জাতির সমৃদ্ধির রহস্য, তার প্রয়োগ করে লাভবান হোক ঐহিক দিক থেকে, যাতে ভারতের পূর্বতন ঐশ্বর্যশালী সভ্যতার প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে।

ত্রিগুণাতীত অনেকখানি অংশ নিয়ে ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতিতে কিভাবে কৃষির উন্নতি ঘটানো যায় তার পর্যালোচনায় নিয়োজিত ছিলেন। সেচের প্রশ্নে তিনি অপ্রচুর খালের ওপর নির্ভরতার পরিবর্তে ব্যাপকভাবে কূপখননের পরামর্শ দিয়েছেন—তার কারণও জানিয়েছেন। তার সঙ্গে এনেছেন কৃষির সঙ্গে জড়িত জমি, কৃষক ও জমিদারদের প্রসঙ্গ। জমির উন্নতি না ঘটিয়ে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়। যারা অন্নদাতা, জমির উন্নতিতে মনোযোগী নয়—তাদের সমূহ ধিক্কার দিয়েছেন। "কি উদ্ভট এবং হাস্যকর আমাদের প্রয়াস! আমরা এখনো শিখিনি কিভাবে আমাদের খাদ্যবস্তু উপযুক্ত উপায়ে উৎপাদন, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে হয়—অথচ আমরা রাজনীতি এবং জ্ঞানের অন্য ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে বড় বড় বচন আওড়াচ্ছি। জমির উন্নতিই আমাদের প্রথম মনোযোগের লক্ষ্য হওয়া উচিত—জমিই আমাদের প্রধান অন্নদাতা, আমাদের ধন-সম্পদের উৎস।" জীবনের নানা দিক আছে—শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক। ত্রিগুণাতীতের বিবেচনায়, জীবনের অন্য দিকগুলির উন্নতি নির্ভর করে কৃষির উন্নতির ওপরে। কৃষিই ভিত্তি। তা নষ্ট হয়ে গেলে অন্য সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। "অনুপযুক্ত ভিত্তির ওপরে কিছু নির্মাণ করা মানে শূন্যে সৌধনির্মাণ। তেমন করা হলে বাতাসের এক ঝাপটে শত শত বৎসর ধরে তৈরি করা সৃষ্টি ডাল-পালা-সুদ্ধ উপড়ে পড়বে। ১৭৭০ সালে বাংলায় তেমন এক দুর্ভিক্ষ, কিংবা ১৮৭৮ সালে চীনের দুর্ভিক্ষ সারা দেশের উন্নত সভ্যতা ধ্বংস করে আবর্জনায় পর্যবসিত করতে পারে।"

এই কারণে ত্রিগুণাতীত কৃষির স্থায়ী উন্নতির নানা পন্থা নির্দেশ করেছেন। তার মধ্যে প্রতি জেলায় সরকারের তরফে 'কৃষি-সমিতি' স্থাপন, কৃষিবিষয়ে দেখাশোনার জন্য 'ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারারিস্ট' নিয়োগ, জমির উন্নতির জন্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পৃথক ট্যাক্স বলবৎ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কলেজে কলেজে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা। "প্রথম শিক্ষা দিতে হবে কৃষিবিজ্ঞান, ভূমিবিজ্ঞান, শ্রম ও মূলধন-বিজ্ঞান,... সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে গণিত যেমন প্রাথমিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হলো কৃষি, ভূমি, শ্রম এবং মূলধন-বিজ্ঞান। ভারতের রাজধানীর (অর্থাৎ

কলকাতার) অনেক গ্র্যাজুয়েট ও আন্ডার-গ্র্যাজুয়েটের মুখে শুনেছি—ধানগাছ থেকে বড় বড় কাঠের তক্তা হয়। আহা, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কী-সব পণ্ডিতই প্রসব করেছেন।"

কৃষির ক্ষেত্রে শ্রম ও শ্রমজীবীর গুরুত্বের কথা বারেবারে ত্রিগুণাতীত বলেছেন : "সম্পদের সৃষ্টির মূলে আসল শক্তি হলো শ্রম। সে-শ্রম পবিত্র। হায়, আমাদের দেশে শ্রমের গুণগৌরবের বোধই নেই। আমেরিকা আজ এত ধনী দেশ কেন? কারণ, সেখানে শ্রমকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। আমেরিকা যে সভ্যতার এত উন্নতি ঘটিয়েছে তার মূলেও ঐ কারণ রয়েছে। শ্রম যে-প্রকারের হোক না কেন, আমেরিকায় তাকে ঘৃণা করা হয় না; তেমনি কোন স্তরের শ্রমিকই সেখানে অবজ্ঞা বা ঘৃণার পাত্র নয়। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক তার উলটো, আমরা শ্রমের দাম দিই না, শ্রমিকদের নিচু চোখে দেখি, তাদের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করি না। অপরদিকে অলস গদীয়ান লোকগুলোকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আকাশে তুলে দিই—যাদের ধনসম্পদ কিন্তু ঐ অসহায় দরিদ্র শ্রমিকদের অবিরাম ঘাম-ঝরানো শ্রমের ফলেই সম্ভব হয়েছে।"

কৃষি, জমি ও কৃষকের দুর্দশার জন্য দায়ী কে? সে-প্রসঙ্গে যাদের মূল দায়িত্ব, তাদের বিষয়ে তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে যথেষ্ট কঠিন কথা ত্রিগুণাতীত বলতে পারেননি সেজন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের সরাসরি নিন্দা তাঁর ভাষণে ছিল না—বরং সহৃদয় কিছু প্রশাসকের মঙ্গলকর্মের প্রশংসা ছিল। কিন্তু পুরো সমালোচনা বাদ দিতে পেরেছিলেন কি? পারেননি :

"আপনারা দেখলেন, কেবল ভারতবর্ষ কতবার দুর্ভিক্ষ-কবলিত হয়েছে! আপনাদের তো বলেছি—ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষের বড় প্রিয় বাসভূমি—আর স্থায়িভাবে তা দূরীকরণের কোন চেষ্টা করা আমরা প্রয়োজন বোধ করিনি। যে-ভারতবর্ষ একদা ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, জগতের সামনে কল্পলোক—সেই ভারতবর্ষ কেন আজ প্রত্যেকের দরজায় ঘুরছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে—একমুঠো চাল কি এক ঘটি জলের জন্য? আমরা হলুম গৌরবান্বিত ব্রিটিশ প্রজা!—কেন আমাদের বাঁচতে হবে অপরের দয়ার দানে? সুসভ্য ব্রিটিশ সরকারের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে থেকেও ভারতবর্ষকে দুঃখ-দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের জন্য বিখ্যাত হয়ে পড়তে হচ্ছে—এটা কি অগৌরবের বিষয় নয়? কেউই ক্ষণেকের জন্য একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, ব্রিটিশ শাসনে রেল, রাস্তা, খাল, বেতার ইত্যাদি হয়েছে। তাতে উন্নতি ঘটেছে। খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষের সময়ে সরকার চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করে এবং খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য বড় আকারের জোরালো সংগঠন গড়ে তোলে। তাও বিতর্কের বিষয় নয়। সে-কাজ সরকার করে দুর্ভিক্ষ এসে গেলে। কিন্তু প্রশ্ন—সুসভ্য ব্রিটিশ জাতি, বিরাট সাম্রাজ্যের গর্বিত মালিক, যে-সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না—কেন সেই সুসভ্য ও শক্তিশালী জাতি দুর্ভিক্ষের স্থায়ী নিরাকরণব্যবস্থা করতে পারে না?... কেন সরকারকে দ্বারে দ্বারে আমাদের জন্য দান সংগ্রহে যেতে হয়? কেন সরকার কেবল ভিক্ষা নেওয়া শেখায়, তার দ্বারা আমাদের অলস করে তোলে এবং আমাদের জমি সম্বন্ধে যত্নের ব্যাপারে কোন চেষ্টাই

করে না? পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সভ্যতার স্বাদ পাওয়ার পরেও কি আমাদের পরের দয়ার দানে বাঁচতে হবে?"

প্রশ্নগুলির মধ্যে ত্রিগুণাতীত কিছু বলতে বাকি রাখেননি।

ত্রিগুণাতীতের খাঁড়ার ঘা গিয়ে পড়েছিল কৃষি ও কৃষকের সাক্ষাৎ শত্রু জমিদারের ওপরে।—

"গর্বান্ধ জমিদার, রাজা, মহারাজা ও জমির অন্যান্য বড় বড় মালিকদের জন্যই আমাদের দেশের মানুষের এত কষ্ট। 'রাজা', 'মহারাজা'—এইসব বড় বড় খেতাবের কী দাম আছে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে বা কৃষির ক্ষেত্রে তাদের কী গুরুত্ব—যদি না তারা নিজেদের প্রজাদের উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে? জমিদার বা রাজাদের কী প্রয়োজন যদি না তারা রায়তদের অবস্থার উন্নতি বা কৃষিজমির উন্নতি করতে না পারে? রপ্তানি আমাদের দেশকে নিঃশেষিত করছে না—ঐসব অহঙ্কারী রাজা মহারাজারা দেশের সম্পদ শুষে দেশকে ছিবড়ে করে দিচ্ছে অথচ প্রজাদের সম্বন্ধে ওদের ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল প্রেমপূর্ণ দায়িত্বশীল পিতার মতো। সেই প্রাথমিক দায়-দায়িত্ব ভুলে গিয়ে তারা রায়তদের নিংড়ে পয়সা আদায় করছে, সেই টাকা বিলাসব্যসনে নয়-ছয় করছে, কিংবা সিন্দুকে ভরছে। অথচ প্রত্যেকেরই মনে রাখা দরকার, ব্যক্তির ধনসম্পদ জাতীয় সম্পদ ভিন্ন কিছু নয়—সেইজন্য তা পবিত্র বস্তু। বস্তুতপক্ষে আমাদের দেশে সম্পদকে দেবী লক্ষ্মীরূপে পূজা করা হয়।"

ত্রিগুণাতীত আরো নানাভাবে শোষিত রায়ত এবং শোষক জমিদারদের বিষয়ে বলেছিলেন। সংশ্লিষ্ট সকলেরই কর্তব্যকর্মের রূপ নির্ধারণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে সন্ন্যাসীদের কর্তব্যের কথা বলতেও তিনি ভোলেননি। ঋষি বা সাধুদের তপস্যার এক-চতুর্থাংশ গৃহীদের প্রাপ্য। তার উল্লেখের পরে, তাঁর সকল শ্রম ও সাধনার উৎসের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন :

"যদি আপনারা মনে করেন যে, আপনাদের জেলায় আমি কিছু ভাল কাজ করেছি, তাহলে বলব, বস্তুতপক্ষে তা আমার কাজ নয়—আমার মহিমান্বিত আচার্যদেবের কাছ থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যে শক্তি-স্ফুলিঙ্গ লাভ করেছি, ঐ কাজ তারই ফল-পরিণতি।"

একশ বছর আগেকার এই রচনা এক সন্ন্যাসীর—বাস্তব মানুষের প্রতি গভীর প্রীতি এবং চিন্তাশীলতার স্বাক্ষর যা বহন করেছে, যার কিছু কিছু বিধান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও পালনীয়।

॥ ৬ ॥

স্বামী ত্রিগুণাতীত বাঙলায় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে চাইলেন। এবিষয়ে তাঁর নেতা বিবেকানন্দের প্রবল ইচ্ছার কথা জানতেন। স্বামীজী ত্রিগুণাতীতকে এই কাজে যোগ্য মনে করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের তখন আর্থিক অবস্থা যেরকম তাতে ঐ প্রয়াস কার্যত দুঃসাহসিক। সুতরাং যদি এমন কেউ থাকে, যে সামান্য ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে, স্বভাবে জেদী এবং কর্তব্যপরায়ণ, যার চিন্তা করার ও লেখার ক্ষমতা আছে—



তাকেই ভারার্পণ করা যায়। ত্রিগুণাতীত তেমন একজন পুরুষ—যা প্রমাণিত হয়ে গেছে। অবশ্যই মানুষটি খেয়ালি, কিন্তু যখন নির্দিষ্টভাবে কাজের দায়িত্ব পড়ে তখন কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা বলবৎ করেন।

ত্রিগুণাতীতের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধেও স্বামীজী অবহিত ছিলেন। সন্ন্যাসজীবনের সূচনাপর্বে নরেন্দ্রনাথের কাছে সারদা মহারাজের পড়াশোনা করার কিছু স্মৃতিকথা মহেন্দ্রনাথ দত্ত নিবেদন করেছেন :

"নরেন্দ্রনাথের যখন পাথুরীর অসুখ হয়, তখন ৭ নং রামতনু বসু গলির বাড়িতে সারদা মহারাজ শুশ্রূষার জন্য আসিয়া থাকিতেন। তিনি 'ক্যাসেলের' মুদ্রিত ছবিওয়ালা শেক্সপীয়ারের গ্রন্থগুলি পড়িয়া নরেন্দ্রনাথকে শুনাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থবোধ করিলে সারদা মহারাজকে শেক্সপীয়ারের নানা গ্রন্থ ও কাব্যের বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। বালক সারদা মহারাজ সম্মুখে বইখানি খুলিয়া রাখিয়া একমনে নরেন্দ্রনাথের নিকট শেক্সপীয়ারের কাব্যের সহিত সংস্কৃত কাব্যের কোথায় মিল ও কোথায় বৈষম্য আছে—সেই সমস্ত স্থির হইয়া বসিয়া শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে সারদা মহারাজের মুখে ধ্যানের ভাব ফুটিয়া উঠিত। তখন তিনি আর পড়িতে পারিতেন না, বইখানি বন্ধ করিয়া স্থিরমনে জপ করিতেন। তিনি যখন বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তখনও ঠিক এইরকম এক-মন-প্রাণ হইয়া পড়িতেন। বিকাল হইল, সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু সারদা মহারাজের কোন হুঁশ থাকিত না। অন্ধকার হইয়া আসিলে আলো জ্বালিয়া আবার পড়িতে বসিতেন এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত পাঠ করিতেন। এইরূপে তিনি সংস্কৃত ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিশেষরূপে শিখিয়াছিলেন।"[৮]

ত্রিগুণাতীতের অপরিসীম পাঠনিষ্ঠার অন্য প্রমাণও আছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের এবং রামকৃষ্ণ ভাবধারার পত্র-পত্রিকা স্বামীজী একান্তভাবে চেয়েছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহের ভূমিকা ছিল তাঁর। বিপক্ষ দল থেকে অবিরাম নিন্দা, কুৎসা ও ভ্রান্ত প্রচার এবং স্বদলের মধ্যে গতানুগতিক ধর্মাচরণের মধ্যে আবর্তিত থাকার প্রবণতা—এর ভিতর থেকে পথ কেটে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসত্য অর্থাৎ নিত্যসত্য এবং ভারতীয় ধর্ম এবং সভ্যতার মর্মবাণীর পতাকা তুলে—এই তাঁর জীবনব্রত। পত্র-পত্রিকা এই ব্রতসাধনে অন্যতম সহায়ক।

সন্ন্যাসজীবন গ্রহণের আগেই নরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' পত্রিকার (এবং পরবর্তী কালে সাপ্তাহিক 'বসুমতী' পত্রিকা) ব্যাপারে সাহায্য করেছেন যথোচিত উৎসাহ দিয়ে।[৯] আমেরিকা যাওয়ার পর থেকে স্বামীজী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইংরেজী, সেইসঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা—যেমন হিন্দি, তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মালয়ালম প্রভৃতিতে পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহ দেখিয়েছেন, বাঙলা ভাষায় তো নিশ্চয়ই। দ্বিভাষী পত্রিকার কথাও তাঁর মনে এসেছিল। বাঙলা পত্রিকা প্রসঙ্গে তাঁর চিঠিপত্র থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

১৮৯৪-এর ২৫ সেপ্টেম্বর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা :

"তোমাদের একটা কিনা কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার কি খবর?... একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit করতে হবে, আদ্দেক বাঙলা, আদ্দেক হিন্দি—পার তো আরেকটি ইংরেজীতে।" (স্মর্তব্য, তখনো মাদ্রাজ থেকে 'ব্রহ্মবাদিন' বেরোয়নি।)

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ১৮৯৫ সালের এক চিঠিতে ঃ

"সারদা (ত্রিগুণাতীত) কি বাঙলা কাগজ বার করতে বলছে? সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে-মতলবটা মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism (বিরুদ্ধ সমালোচনা) একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয়, সকলকে সাহায্য করবে।"

রামকৃষ্ণানন্দকে ১১ এপ্রিল ১৮৯৫ তারিখে লেখা ঃ

"মাস্টারমহাশয় প্রভৃতি ও তোমরা এককাট্টা হয়ে একটা কাগজ যাতে বার করতে পার, তার চেষ্টা কর দিকি।"

১৮৯৬-এর জানুয়ারিতে ত্রিগুণাতীতকে লেখা ঃ

"তোর কাগজের idea অতি উত্তম বটে এবং উঠে-পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেব, ভাবনা নেই টাকার জন্য। আপাতত এই চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার নে।... কোন আরবীজানা মুসলমানভায়া ধরে যদি পুরনো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করাতে পার ভাল হয়। ফারসী ভাষায় অনেক Indian History আছে। যদি সেগুলো ক্রমে ক্রমে তর্জমা করাতে পার, একটা বেশ regular item হবে। লেখক অনেক চাই। তারপর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল, উপায়—তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, বাঙলা ভাষা যেখানে যেখানে আছে, লোক ধরে কাগজ গতিয়ে দিবি।... চালাও কাগজ, কুছ্ পরোয়া নেই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে (অর্থাৎ সকলে মিলে) লিখতে আরম্ভ কর।... তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। বাহবা সাবাস!"

স্বামীজী ত্রিগুণাতীতের ভিতরে অগ্নিশর ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যার আনন্দ ও যন্ত্রণা দুই-ই ছিল—"গুঁজগুঁজেগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ করে, আর দুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি।" সারদার 'লম্ফ' যাতে বন্ধ না হয়, তার জন্য স্বামীজী তাঁকে আরো "লেগে যাও" বাণী পাঠিয়েছেন (১৭ জানুয়ারি ১৮৯৬), অপরকেও প্রণোদিত করেছেন সারদাকে মাতিয়ে রাখবার জন্য—যেমন স্বামী তুরীয়ানন্দকে (২৪ জানুয়ারি ১৮৯৬ তারিখের চিঠি)।

স্বামীজীর উৎসাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিন্তু তাঁর হাতে টাকা জুটছিল না। ১৪ এপ্রিল ১৮৯৬ ডাঃ নাঞ্জুন্ডা রাওকে জানালেন, তাঁর ভাণ্ড কার্যত শূন্য, সেজন্য কলকাতায় কাগজের জন্য টাকা পাঠাবেন বললেও তা করতে পারছেন না। ঐ বছর ২৭ এপ্রিল রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে বাঙলা কাগজের দায়দায়িত্ব যেন সকলে ভাগ করে নেয়—এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন স্বামীজী ঃ "সারদা যে কাগজ বার করতে চেয়েছে, সে উত্তম কথা বটে, কিন্তু সকলে মিলেমিশে করতে পার তো আমার সম্মতি আছে।" বস্তুতপক্ষে

স্বামীজীর টাকার অনেকখানি অংশ চলে গিয়েছিল মাদ্রাজের ইংরেজী পত্রিকার প্রকাশনায়।

কিন্তু স্বামীজী ছাড়বার পাত্র নন, বিশেষত সারদার মতো নাছোড় গুরুভাইকে যখন পেয়ে গিয়েছিলেন। ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে বাঙলা পত্রিকার পরিকল্পনা এগতে লাগল। ভারতে ফেরার পরে স্বামীজী শুদ্ধানন্দকে ১১ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে লিখলেন : "...ব্রহ্মানন্দকে বলবে, সে যেন অভেদানন্দ ও সারদানন্দকে... লেখে—যে-বাঙলা কাগজটা বার করবার কথা হচ্ছে, তার জন্য যেন তারা প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় উপাদান মঠে পাঠায়। গিরিশবাবু কি কাগজটার জন্য যোগাড়যন্ত্র করছেন?"

এরপরেও যখন কয়েকমাস পত্রিকা বেরল না, তখন স্বামীজী নৈরাশ্য ও অভিমানের সঙ্গে ১১ অক্টোবর ১৮৯৭ তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন : "সারদা বেচারিকে অনেক গাল দিয়েছি। কি করব?... আমি গাল দিই, কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে।... আমি হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর প্রবন্ধ লিখেছি।" (প্রবন্ধটি সম্ভবত 'উদ্বোধন'-এর বিখ্যাত 'প্রস্তাবনা'।)

অর্থকষ্ট 'উদ্বোধন'-এর প্রকাশকালকে আরো দেড় বছর টেনে নিয়ে গেল। স্বামীজীর কিন্তু বাঙলা মুখপত্র খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল আক্রমণ সবেগে চলেছে, তাঁর ব্যাখ্যাত বেদান্তধর্মকে বাঙালীদের সামনে বাঙলা ভাষায় উপস্থিত করার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বাংলাদেশেই—সুতরাং বাঙলা ভাষায় পত্রিকা চাই-ই। ২৯ এপ্রিল ১৮৯৮, মিস ম্যাকলাউডকে সাহায্য করতে অনুরোধ জানিয়ে স্বামীজী চিঠি লিখলেন : "আমি কলকাতায় একখানা কাগজ চালাব। তুমি যদি ঐ কাগজ চালু করতে আমাকে সাহায্য কর, তবে খুবই কৃতজ্ঞ হব।" ম্যাকলাউড অবশ্যই যথাসাধ্য সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন।[১০] স্বামীজী ব্রহ্মানন্দকে কিছুদিন পর (২০ মে) লিখলেন : "কাগজের জন্য টাকার চেষ্টা হইতেছে। যে ১২০০ টাকা তোমায় কাগজের জন্য দিয়াছি, তাহা ঐ হিসাবেই যেন থাকে।" তবু বাধা। প্রায় একমাস পরে ব্রহ্মানন্দকে তিনি লিখলেন : "সারদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এইমাত্র যে, বাঙলা ভাষায় ম্যাগাজিন paying করা মুশকিল, তবে সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া subscriber যদি যোগাড় করা যায় তো সম্ভব। এবিষয়ে তোমাদের যেপ্রকার মত হয় করিবে। সারদা বেচারা একেবারে ভগ্নমনোরথ হইয়াছে। যে-লোকটা এত কাজের এবং নিঃস্বার্থ, তার জন্য ১০০০ টাকা যদি জলেও যায় ক্ষতি কি?"

অবশেষে 'উদ্বোধন' আত্মপ্রকাশ করল ১ মাঘ ১৩০৫ সন (১৪ জানুয়ারি ১৮৯৯)। পাক্ষিক পত্ররূপে তার আত্মপ্রকাশ। কিছুদিনের মধ্যে তা মাসিক পত্রের রূপ ধরে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, 'উদ্বোধন' দৈনিক পত্র হয়। স্বামীজীর ইচ্ছার অশ্বমেধের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দৌড়ানো সম্ভব নয়, কিন্তু অশ্বখুররেখা ধরে ধ্রুবগতিতে অগ্রসর হওয়ার মতো মানুষ জন্মেছেন—একশ বছর ধরে সেই 'পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি' 'উদ্বোধন' চলেছে এবং চলবেও।

॥৭॥

'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ

বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র।

১ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা। ১লা মাঘ। ১৩০৫ সাল।

"তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো!" **উদ্বোধন** "তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো!"

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত—সম্পাদক।

সূচী

প্রচ্ছদের ওপরে আরো লেখা ছিল :

ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ক বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র ও সমালোচনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, ডাক মাশুল সমেত। কলিকাতা, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কম্বুলেটোলা, নং ১৪ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, উদ্বোধন-প্রেস হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 'উদ্বোধনের' প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দুই আনা মাত্র।। এই প্রেসে পুস্তক, চেক, বিল প্রভৃতি নানাপ্রকার ছাপা কার্য সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন করা হয়।**।**

প্রথম বর্ষের অন্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্বামী শুদ্ধানন্দ (ধারাবাহিক তিব্বত ভ্রমণকথা লিখেছেন), প্রবোধচন্দ্র দে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র বসু, স্বামী বিরজানন্দ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন, স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীম (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৯ম সংখ্যা থেকে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে)। এছাড়া সম্পাদকের লেখা, রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ বেরিয়েছে। ধারাবাহিক লেখাগুলি প্রথম বর্ষ ছাপিয়ে পরের বছরেও গেছে। স্বামীজী নিঃস্বার্থ অক্লান্ত কাজের 'বাহবা' যেমন দিয়েছেন, তেমনি রাগের চোটে গালাগালিও দিয়েছেন : "সারদাকে অনেক

গাল দিয়েছি।" সেই গালাগালির তোড়ে পড়লে পাহাড় উলটে যাবে। আবার ভালবাসার টানে ওলটানো পাহাড় সোজা হয়ে গিয়েই দণ্ডদাতা ও দণ্ডগ্রহীতায় গলাগলিও ঘটবে।

তারই একটি ছবি, প্রত্যক্ষদর্শী শচীন্দ্রনাথ বসুর পত্র থেকে : "গত সোমবার [৬ নভেম্বর ১৮৯৮]... স্বামীজী ও আমি বাগবাজারে আসিলাম।... [বলরামবাবুর বাড়ির] হলঘরে [স্বামীজী] বসিলেন, আমরাও বসিলাম—কেবল আমি ও রাখাল মহারাজ। কিছু পরে শরৎ চক্রবর্তী আসিল। নানাবিধ কথা হইতেছে, এমন সময় সারদা মহারাজ টলিতে টলিতে আসিয়া হাজির—জ্বর হইয়াছে।

"স্বামীজী যখন আলমোড়াতে তখন হইতে ত্রিগুণাতীত মহারাজ তাঁহাকে বারবার চিঠি লেখেন—ভাই, আমি work করিব। তুমি আমাকে ২০০০ টাকা দাও, আমি প্রেস করিব, কাজ চালাইব। স্বামীজী তাঁহাকে ১০০০ টাকা দিয়াছেন, বাকি ১০০০ টাকা ধার করিয়াছেন। মাসে ১০ টাকা সুদ লাগে। ১৫০০ টাকায় দুটি ভাল প্রেস কিনিয়াছেন, কিন্তু কিনিলে কি হইবে, কোন কাজ নাই; ঠায় বসিয়া আছেন। বড়বাজারের এক গুদামে ৮ টাকা ভাড়া দিয়া রাখা হইয়াছে। সুধীরের [শুদ্ধানন্দ] রাজযোগ বইখানি [স্বামীজীর বইয়ের অনুবাদ] ছাপাইবার সঙ্কল্প হইয়াছে, কিন্তু পয়সা নাই, কাগজ আসিবে কোথা হইতে?... আমি একবার ত্রিগুণাতীত মহারাজকে বলিয়াছিলাম, 'মহারাজ, ও কাজ [প্রেসের কাজ] বড় nefarious [হীন], আপনার কর্ম নয়। অপর লোকের করা উচিত।' তখন ভারী spirit। বলিলেন, 'না any work is sacred। আমি কাজ পেলে খুশি, কাজ করতে আমি নারাজ নই।' আমি চুপ করিয়া গেলাম। এখন রোজ ৬টার সময়ে প্রেসে যান, সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া হয়। আর আসেন রাত ৮টার পর। রোজ সন্ধ্যার পর জ্বর হয়।

"স্বামীজী ও রাখাল মহারাজ একসঙ্গে ত্রিগুণাতীতজীকে অভ্যর্থনা করিলেন—'কি বাবাজী, এস, আজকের খবর কি? প্রেসের কতদূর? বল বল, বস বস।'

"ত্রিগুণাতীত (নাকি সুরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে)—আঁর ভাই, আর পাঁরিনি। ওসব কাঁজ কি আঁমাদের পোষায় ভাই?... সারাদিন তীর্থির কাকের মতন বসে থাকতে হয়; না আছে একটা কাজ, না আছে কিছু। একটা job work পাওয়া গেছে, তাতে কি হবে? আট আনা বড় জোর পাওয়া যাবে। আমি প্রেস বিক্রি করে ফেলার চেষ্টা করছি।

"স্বামীজী—বলিস কিরে? এরই মধ্যে তোর সব শখ মিটে গেল? আর দিন-কতক দেখ, তবে ছাড়বি। এইদিকে প্রেসটা নিয়ে আয় না, কুমারটুলির কাছে। আমরা সকলে দেখতে পেতুম।

"ত্রিগুণাতীত—না ভাই, সেইখানেই থাক। দিনেক দুদিন দেখা যাক। ১৫-২০ টাকা লোকসান করে বেচে দেব।

"স্বামীজী—ও রাখাল, বলে কি? ওর যে খুব ট্রায়াল হলো দেখছি। তোর এরই মধ্যে সব গুঁড়িয়ে গেল! Patience রইল না।

"এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর চক্ষু ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন ও গর্জিয়া বলিলেন, 'বলিস কিরে। দে, প্রেস বিক্রি করে দে। আমার টাকার ঢের দরকার আছে। এই বেলা বিক্রি কর—১০০-১৫০ টাকা লোকসান করেও বেচে ফেল।... কাজের নামটি হলেই এদের সব বৈরাগ্যি উপস্থিত হয়—আঁর ভাঁই পাঁরিনি, ওঁসব কাঁজ কি আঁমাদের? কেবল খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি উপুড় করে শুয়ে থাকতে পারে। যাদের কোন কাজে patience নেই তারা কি মানুষ?... তুই তিনদিন এখনো প্রেস করিসনি। যাঃ যাঃ তোর ঢের experiment হয়েছে—তোর বড় আম্বা হয়েছিল। কে তোকে প্রেস করতে সেধেছিল? তুই-ই তো আমাকে লিখে লিখে টাকা আনালি। নিয়ে আয় না তুই তোর প্রেস এখানে, সেখানে রাখবার তোর মানে কি? এই তোর জ্বর-জ্বর হচ্ছে, তুই শরীরটা দেখছিস না?

"ত্রিগুণাতীত—আট টাকা ভাড়া দিতে হবে, এক মাসের এগ্রিমেন্ট হয়েছে।

"স্বামীজী—দূর-দূর, ছি-ছি। এ বলে কি? এসব লোক কি কোন কাজ করতে পারে? আট টাকার জন্য পড়ে আছিস? তোদের এ ছোটলোকপনা কিছুতেই যাবে না। তুই আর হরমোহনটা সমান। তোদের কখনো কোন business হবে না। সেও এক পয়সার আলু কিনতে পঞ্চাশ দোকানে ঘুরবে আর ঠকে মরবে।... দে প্রেস আমাদের মঠে পৌঁছে—আমাদেরও তো একটা প্রেস চাই। দেখ, কত লেকচার দিয়েছি, কত লিখেছি, তার অর্ধেকও ছাপা হলো না। তুই আমাকে work দেখাস? রাখাল, মনে কর, সে আজ কত দিনের কথা—আজ সে বার-তের বছরের কথা—সেই গঙ্গার ধারে বসে আমরা কয়জনে তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁদছি। আমি বললাম, তাঁর অস্থি গঙ্গার ধারে রাখা উচিত, গঙ্গার ধারেই মন্দির হওয়া উচিত। কারণ, তিনি গঙ্গার ধার ভালবাসতেন।... আমার কথা শুনল না। তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁকুড়গাছির বাগানেতে রাখল। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বেজেছিল। রাখাল, মনে কর, আমি কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আজ বার বছর bull dog-এর মতন সেই idea নিয়ে তামাম দুনিয়া ঘুরেছি, একদিনও ঘুমাইনি। আজ দেখ, তা সফল করলাম। সেই idea আমাকে একদিনও ছাড়েনি।...

"ত্রিগুণাতীত—ভাই, তোমার brain-টি কেমন! তোমার brain-টি আমায় দিতে পার?

"এই কথায় খুব হাসি পড়িয়া গেল, কারণ বলিবার তারিফ ছিল। পরে ত্রিগুণাতীত বলিলেন, এ জ্বরের উপর সকালে একটু সাবু খাইয়াছিলেন; এ বেলা এক সের রাবড়ি, আধ সের কচুরি ও তদুপযুক্ত তরকারি আহার করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্বামীজী হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'শালা! তোর stomach-টা দে দেখি—দুনিয়াটার চেহারা একেবারে বদলে দিই। লাহোরে সুরজলাল বলেছিল, স্বামীজী, তোমার নানকের brain আর গুরুগোবিন্দের heart এসে গিয়েছে—কেবল জগমোহনের [খেতড়ির দেওয়ান] মতো পেটটি চাই।' "[১১]

স্বামীজীর গালাগালি শিবের আশীর্বাদ—গুরুভাইরা ও শিষ্যরা তাই মনে করতেন। এবং জানতেন যে, স্বামীজীর ইচ্ছার শেষপ্রান্ত ছোঁয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু বাস্তব জীবনে তাঁরা অসম্ভবের প্রান্তরে যথাসম্ভবের ধ্বজা পুঁতেছেন। ত্রিগুণাতীতের 'উদ্বোধন'-সংক্রান্ত কার্যাবলী থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। প্রত্যক্ষদর্শী কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথা এইরকম :

"'উদ্বোধন' প্রকাশের দিন এখনো স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কি অদম্য উৎসাহ, কি মহোচ্চ আদর্শ, কি বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং কি অনাবিল আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। স্বামীজী লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া তাঁহাদের নয়ন-সম্মুখে বাংলা তথা ভারতের এক সমুজ্জ্বল ছবি উদিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্রিকা, সামান্য পুঁজি, পরগৃহে অফিস ও ছোট কারখানা—তবুও ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল।... আজ মনে পড়ে 'উদ্বোধন'-এর সর্বপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে 'উদ্বোধন প্রেস' এবং 'উদ্বোধন পত্রিকা'র সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব একাকী বহন করিয়াছিলেন।... দেখিয়াছি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় কতদিন তিনি অনাহারে, অর্ধাহারে প্রেস ও পত্রিকার কার্য দেখিতেছেন। শুধু পরিদর্শকভাবে দেখাশুনা নহে, আজ কম্পোজিটর অনুপস্থিত, তাঁহাকে নিজে সন্ধান করিয়া নূতন লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে; কাল প্রেসম্যান অসুস্থ, কোথায় প্রেসম্যান পাওয়া যায় তাহার সন্ধানে নানা স্থানে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; কোথায় সস্তায় প্রেসের কোন্ উপকরণ পাওয়া যায়, সেই তথ্য লইবার জন্য কখনো ছুটাছুটি করিতেছেন, আবার কখনো কখনো প্রেসের লোকজনের কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে প্রবন্ধ সংগ্রহ এবং প্রবন্ধ রচনা করিতেও হইত। ঠিক সময় পত্রিকা প্রকাশ না হইলে স্বামীজীর নিকট তিরস্কৃত হইতেন। ইহা ছাড়া ছাপাখানার কাহারও ব্যায়রাম হইলে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের আয়োজন তাঁহাকেই করিতে হইত। নানাদিকে এইসব কঠোর পরিশ্রমেও তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত—ক্লান্তির কোন কালিমা দেখা যাইত না। বেশির ভাগ কম্পোজিটর ও প্রেসম্যান বস্তিতে বাস করিত। তিনি বিনা সঙ্কোচে বস্তির মধ্যে যাইয়া তাঁহাদের খোঁজ করিতেন। কতদিন দেখিয়াছি—শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্ত স্বর্গীয় মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে অপরাহ্নকালে তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি জল পান করিতেছেন এবং তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার তখনও স্নানাহার হয় নাই। মণীন্দ্রকৃষ্ণ মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র এবং তাঁহার দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদনা তিনি নিজেই করিতেন। তাঁহার 'প্রভাকর প্রেস' নামক একটি প্রেস ছিল, সুতরাং সন্ধান লইতে সেখানে তিনি অনেক সময়ে যাইতেন। এদিকে পত্রিকায় কোনপ্রকার ভ্রমপ্রমাদ বা প্রুফ দেখিতে ভুলত্রুটি থাকিলে কিংবা অশুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করিলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বিশেষভাবে তিরস্কার সহ্য করিতে হইত। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদিন এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামীজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ তখন 'উদ্বোধন'-এ সদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীত

বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়াই 'উদ্বোধন'-এ তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের ভ্রমপ্রমাদের উল্লেখ করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, 'কিরকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তা তো বুঝতে চাও না।' স্বামীজী বলিলেন, 'ওসব কথা রেখে দে। তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে। ওদেশে কম্পোজিটররাও বিদ্বান নয়। যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। এদেশে দেখি—ছাপা হলেই হলো, তাতে ভুল-ত্রুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের এদিক-ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারেই উলটে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়। তোরা কাগজে যদি ভুল-ভ্রান্তি ছাপবি, তবে উন্নতিটা কি হলো বল?' স্বামী ত্রিগুণাতীত নিরুত্তর রহিলেন। প্রেস ও পত্রিকা—দুটির জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে, বিশেষ—কম্পোজিটর প্রভৃতির সন্ধানে তাঁহাকে বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরিতে হইতেছে শুনিয়া স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেসটি বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও জিদ করিলেন। অবশেষে প্রেস বিক্রয় করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করিলেন। কখনো কখনো তিনি 'উদ্বোধন'-এর জন্য বাগবাজার পল্লীর যুবকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন।"[১২]

প্রকাশনার উচিত রূপ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তার কিছু অংশকে প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে আদর্শ-নীতি রূপে গ্রহণ করা যায়। তবু এই কথাটা মনে না উঠে পারে না, স্বামী ত্রিগুণাতীতের 'লাঞ্ছনা' তিনি একটু বেশি রকম করেছিলেন, বিশেষত যখন জানতেন যে, কোন্ পরিস্থিতিতে ওঁকে কাজ করতে হচ্ছিল। আরো মনে রাখব, যাঁর লাঞ্ছনা করছেন, তিনি স্বামীজীর গুরুভাই। এবং কী আশ্চর্য, উক্ত গুরুভাই স্বামীজীর বাক্যের চড়চাপড় প্রায় নীরবে সহ্য করে গেলেন। কী অপরিসীম শ্রদ্ধা ও আনুগত্য নেতার প্রতি। এখানে আরেকটি আদর্শের চেহারা আমরা দেখতে পেলাম। যিনি স্বচ্ছন্দে বেপরোয়া হয়ে 'ধুত্তোরি' বলে বেরিয়ে পড়তে পারতেন—বেপরোয়া জীবনে তো তিনি অভ্যস্ত, মোটামুটি সুখের জীবন তাঁর জন্য সাজানো ছিল—সেই তিনি সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়ার জীবন বেছে নিয়েছিলেন। একমাত্র সান্ত্বনা, তৎসহ গৌরব এইখানে—তিনি ভূতের কিল খাচ্ছিলেন না, তা স্বয়ং ভূতনাথের কিল!!

অধিকন্তু, স্বামীজী এদেশে ইদানীং প্রচলিত একটি জীবননীতির বিপরীত কাজটি করছিলেন। প্রচলিত রীতি হলো—কোন ব্যক্তির সামনে যৎপরোনাস্তি তার প্রশংসা কর, আর আড়ালে তাকে নরকে পাঠাও। অপরপক্ষে স্বামীজী সামনে যার সমালোচনা করতেন, অন্তরালে অনুরাগে শ্রদ্ধায় অর্চনা করতেন তারই—যদি সে যোগ্যপাত্র হয়।

'উদ্বোধন' প্রকাশিত হওয়ার পর 'শিষ্য' শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মঠে গেছেন এবং প্রকাশিত প্রথম সংখ্যাটির প্রশংসা করেছেন। বলেছেন ঃ "স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।" সেকথা শুনে স্বামীজী সানন্দে ও সগৌরবে বলেছিলেন ঃ

"তুই বুঝি মনে করছিস, ঠাকুরের এইসব সন্ন্যাসী-সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে কাজ কি করে করতে হয় শেখ। এই দেখ, আমার আদেশ পালন করতে ত্রিগুণাতীত সাধনভজন ধ্যানধারণা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কাজে নেমেছে। একি কম sacrifice-এর কথা! আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল দেখি! Success করে তবে ছাড়বে!!"[১৩]

॥ ৮ ॥

অন্যান্য শক্তিতে 'উদ্বোধন' যতই বলীয়ান হোক, প্রথম পর্বে একটি কঠিন ব্যাধি ছিল—অর্থকৃচ্ছ্রতা। অর্থাভাবে পত্রিকা চালানো দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে রসদদার স্বামীজীর কাছে আবেদনপত্র প্রায়ই উপস্থিত হতো। চটে গিয়ে স্বামীজী ১০ আগস্ট ১৮৯৯ লন্ডন থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন ঃ

"সারদা বলে, কাগজ চলে না।... আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত খুব advertise করে (বিজ্ঞাপন দিয়ে) ছাপাক দিকি—গড়গড় করে subscriber (গ্রাহক) হবে। খালি ভটচায্যিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে?"

"যাহোক, কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে, মনে জেনো যে, আমি গেছি।... 'টাকাকড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্যন্ত টাকা আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব—তোমরা কি করবে?... একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার কেউ নেই,... এক লাইন লিখবার... ক্ষমতা কারুর নেই—সব খামকা মহাপুরুষ।"

উদ্ধৃত চিঠিতে স্বামীজী কিন্তু 'উদ্বোধন'-এর সঙ্কট অবস্থার জন্য কেবল ত্রিগুণাতীতকে দায়ী করেননি—পত্রিকাটিকে সঙ্ঘের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে সমষ্টিগত দায়িত্বের কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

এখন দেখে নেওয়া যেতে পারে, প্রচারের ব্যাপারে ত্রিগুণাতীত কী করেছিলেন। একেবারে প্রথম সংখ্যায় আখ্যাপত্রে পত্রিকাটিতে প্রকাশযোগ্য বিষয়ের যে-তালিকা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে এমনকি 'রাজনীতি' পর্যন্ত ছিল। সেখানে লেখকদের মধ্যে একমাত্র স্বামীজীর নাম ছাপা হয়েছিল—এবং রীতিমত বড় অক্ষরে। (চতুর্থ বর্ষের দশম সংখ্যা থেকে করা হয়—"প্রধান লেখক—শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ"।)

এইবার কয়েকটি বিজ্ঞাপন সরাসরি উদ্ধৃত করব—ইতিহাসমনস্ক পাঠকদের কাছে আকর্ষক মনে হবে, এই বিবেচনায়।

'উদ্বোধন'-এর দ্বিতীয় বর্ষের সূচনায় এই বিজ্ঞপ্তি ছিল ঃ

উদ্বোধন

যাহার মাহাত্ম্যে আজ ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি জড়বাদিদেশ-সমুদয় পর্যন্তও মুগ্ধ, সেই মহত্তোমহীয়ান সনাতন হিন্দু ধর্মের বহুল প্রচার করাই উদ্বোধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্বোধনের দ্বারা বঙ্গীয় ধর্ম-সাহিত্য ও সমাজে যে কতদূর উপকার সাধিত হইতেছে তাহা দুই এক কথায় বলিয়া শেষ করিবার নহে, কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র পৃথক হ্যান্ডবিলে দেখিতে আজ্ঞা হয়। আশা করি, হৃদয়বান গ্রাহক-মহোদয়গণ এবং অপরাপর বন্ধুবর্গ, এই মহৎকার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কোন মতে ত্রুটি করিবেন না। নিজ নিজ আত্মীয় বন্ধুবর্গকে উদ্বোধনের গ্রাহক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে, এই মহাপুণ্য-কর্মে যার-পর-নাই সাহায্য করা হইবে, এবং তাহাতে আমাদিগের দেশ যথেষ্ট উপকৃত হইবে, ও আমরাও পরম বাধিত হইব। আমাদিগকে উৎসাহ-প্রদানার্থ যদ্যপি কোন মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক নূতন ৫টি গ্রাহক করিয়া দেন তাঁহার সম্মানার্থ উপহার স্বরূপে—বর্তমান বর্ষের সমগ্র উদ্বোধন কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার হস্তে অর্পণ করিব; এবং তিনি ইচ্ছা করিলে, উদ্বোধনের অবৈতনিক 'এজেন্ট' এরও পদ গ্রহণ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় বর্ষের নূতন ও পুরাতন গ্রাহকগণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আগামী জন্মোৎসবের মধ্যে, রাজযোগ লইতে ইচ্ছা করিলে, এক টাকা দশ আনা স্থলে আট আনায় পাইবেন; ডাকমাশুলাদি দুই আনা ও ভিপি খরচ দুই আনা পৃথক্।

প্রথম বর্ষের উদ্বোধন দুই টাকা; কাপড়ে হাফ বাঁধাই দুই টাকা চার আনা; ডাকমাশুলাদি চার আনা, ভিপি দুই আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের 'বিলাতযাত্রীর পত্র' (পরে 'পরিব্রাজক') সম্বন্ধে দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ঃ

স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রতি সংখ্যায় তাঁহার নিজের 'বিলাত যাত্রা' অতি সরল চলিত বাঙলায় লিখিতেছেন। ভাষার মাধুর্য ও সারল্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইবেন এবং ইহাতে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

একই বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল ঃ

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ, নানাবিধ ভাল ভাল প্রবন্ধ, গীতাশাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ সমূল সটীক, বেদান্তরামানুজ-ভাষ্যানুবাদ সমূল, পাণিনীয় মহাভাষ্যানুবাদ সমূল বাহির হইতেছে। এই সকল অমূল্য গ্রন্থ উদ্বোধন হইতে খুলিয়া পৃথক বাঁধাইবার সুবিধা আছে।

স্বামী ত্রিগুণাতীত 'উদ্বোধন'-এর প্রচারে ত্রুটি করেননি। নানা জায়গায় হ্যান্ডবিল পাঠিয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে অনুরাগিবৃন্দের কাছে অনুরোধ-পত্রও। ঢাকা-নিবাসী যতীন্দ্রচন্দ্র দাসকে ১৯ পৌষ ১৩০৫ তারিখের পত্রে লিখেছিলেন ঃ

"যতীন্দ্রবাবু... আগামী ১লা মাঘ হইতে কাগজ বাহির হইবে। ছাপা হইয়া গিয়াছে। আগামী সংখ্যাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে ঃ

১। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা';

২। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 'রাজযোগের' ইংরেজী হইতে শুদ্ধানন্দ কর্তৃক অনুবাদ;

৩। মুকুন্দমালাস্তোত্র—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক অনুবাদিত;

৪। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের উপদেশ;

৫। স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক বক্তৃতা;

৬। বিবিধ

আপনি যথার্থই নিঃস্বার্থ কার্য—হিন্দুধর্মের জন্য করিতেছেন; নচেৎ 'উদ্বোধনের' জন্য এত পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। ঢাকার যাবতীয় কলেজ, স্কুল ও আফিসে এবং স্টেশনে হ্যান্ডবিল বিতরণ করাইবেন। তাহার দরুন পৃথক হ্যান্ডবিল অদ্য পাঠাইলাম।

ইতি—ত্রিগুণাতীত।"

ত্রিগুণাতীত ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ তারিখে একই ব্যক্তিকে লেখেন :

"My dear Jatin Babu,

অদ্য ডাকে এক হাজার হ্যান্ডবিল আপনাকে পাঠাইয়াছি। প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন। আপনাকে পদে পদে কষ্ট দিতেছি, মনে করিবেন না। আপনাদিগের দ্বারাই পূর্ববঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ প্রচারকার্য হওয়া সম্ভব এবং হইতেছেও। আপনার ন্যায় উদ্যোগী ও পরিশ্রমী লোক যদি আমরা সব জেলায় পাইতাম তো আমাদের আজ ভাবনা কি ছিল। যাহা হউক, ঢাকায় প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে এক-একখানি হ্যান্ডবিল দিয়া 'উদ্বোধনে'র গ্রাহক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিবেন। হ্যান্ডবিলে কি আছে তাহা সকলকেই খুব ভালরূপ বুঝাইয়া দিবেন, নচেৎ কেহ হ্যান্ডবিল বুঝিতে পারিবে না। রীতিমতো লেকচার দেওয়ার মতো হ্যান্ডবিলে কি কি বিষয় আছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন। আমাদের ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিবেন।

ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী ত্রিগুণাতীত"[১৪]

দুঃখের বিষয়, 'উদ্বোধন'-এর জন্য প্রথম প্রচারিত ঐ হ্যান্ডবিল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

'উদ্বোধন' কিছুটা পায়ে দাঁড়াবার পরে বিস্তৃতভাবে নিয়মাবলী প্রকাশ করা হয়েছিল। তৃতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় (১৫ বৈশাখ ১৩০৮) দেখতে পাচ্ছি, দুই পৃষ্ঠাব্যাপী তেরটি নিয়ম মুদ্রিত। নিয়মাবলী থেকে পত্রিকার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তথ্য মেলে। যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে নিয়মগুলি জানালেও ভিতরে ছিল নিজ নীতি সম্বন্ধে শান্ত দৃঢ়তা। ঐসকল নিয়মের কয়েকটি উপস্থিত করছি :

২। উদ্বোধনের নববর্ষ প্রতিবৎসরের বাঙলা ১লা মাঘে আরম্ভ হয়। বৎসরের অন্যসময়ে গ্রাহক হইলেও এই ১লা মাঘ হইতেই কাগজ লইতে হইবে।

৬। 'উদ্বোধন পাক্ষিক-পত্র'। ইহার অর্থ সর্ব সাধারণে অনুগ্রহপূর্বক যেন এইরূপ বুঝেন যে, ইহা প্রতি বাঙলামাসে দুইখান বাহির হয় মাত্র; যদিচ ইহাতে মাসের ১লা বা ১৫ই তারিখ লেখা থাকে, তত্রাচ বাহির হইবার কোন নির্দিষ্ট তারিখের প্রত্যাশা যেন কেহ না করেন। ঠিক ঠিক সময়ে যাহাতে পত্রিকা বাহির হয় তাহার চেষ্টা আমরা যৎপরোনাস্তি করিয়া থাকি; যদি কোন অভাবনীয় বা অনিবার্য কারণবশত কৃতকার্য না হই, আমাদের অপরাধ যেন কেহ গ্রহণ না করেন।

৭। বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়েই হউক এক মাস উদ্বোধন বন্ধ থাকিবে। এইরূপ ছুটি লইবার পূর্বে বা পরে গ্রাহক মহাশয়দিগের জ্ঞাপনার্থে উদ্বোধনের একস্থানে ছুটির সংবাদ ছাপাইয়া দিব।

৮। পোস্ট আফিসের দোষে মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণ কাগজ না পাইলে আমরা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি-পূরণ করিতে বাধ্য হইব না। কেননা আমরা 'ইন্সিওরান্স ফি' লই না, কেবলমাত্র ডাক-খরচা লই। কাগজ আমাদের সম্মুখে প্যাক করান হয়; আমরা স্বয়ং গ্রাহক বহি ধরিয়া প্রত্যেকের নামের সহিত চেক করিয়া দিই; এবং আমাদের অতি বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা অতি সাবধানতার সহিত পোস্ট করান হয়; ইহাতেও কাগজ না পৌঁছিলে আমরা কোন মতে সম্পূর্ণ দায়ী হইব না। এরূপ স্থলে উদ্বোধন না পাইলে গ্রাহক মহাশয়গণকে আমাদের নিকট হইতে উহা পৃথক ক্রয় করিয়া লইতে হইবে; তবে, অর্ধ মূল্যে (অর্থাৎ প্রতিসংখ্যা এক আনা মূল্যে) দিব স্বীকৃত রহিলাম। এই মূল্য কিন্তু অগ্রিম না পাইলে, ঐরূপ নষ্ট বা অপ্রাপ্ত কাগজ পাঠাইতে বাধ্য হইব না।

১২। উদ্বোধন পাক্ষিক-পত্র হইলেও ইহার কাপীরাইট রিসার্ভ করা। ইহাতে যে-সকল প্রবন্ধ বাহির হইবে, সে-সকল আর কেহ উদ্বোধন স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের বিনা অনুমতিতে

অনুবাদ করিতে, উদ্ধৃত করিতে, ছাপাইতে, বা প্রকাশ করিতে পারিবেন না। যদি কেহ করেন তো আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৩। আমাদের বিশেষ নির্দিষ্ট লেখকগণের প্রবন্ধ ব্যতীত অপর কাহারও প্রবন্ধ উদ্বোধনে প্রকাশ করা হয় না।

'উদ্বোধন-কার্য্যাধ্যক্ষ' কর্তৃক ১৫. ১. ১৩০৮ তারিখে প্রচারিত এই নিয়মাবলীর একটিতে পোস্ট অফিসের গাফিলতিতে 'উদ্বোধন' না পাওয়ার বিষয়টি পর্যালোচিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, পোস্ট অফিসের গাফিলতির রোগটি পুরনো এবং দুশ্চিকিৎস্য।

বিশেষ লক্ষণীয় ১২ সংখ্যক নিয়মটি। সাময়িক পত্রিকার লেখা এদেশে সাধারণত কপিরাইটের অধীন করা হতো না (এখনো তা করা হয় না), বিশেষত যখন লেখকদের দক্ষিণা দেওয়ার রীতি প্রায় ছিল না। এক্ষেত্রে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত রচনাদি বিষয়ে কপিরাইটের অত কড়াকড়ি করার কারণ কি? সঠিক উত্তর জানি না, তবে অনুমান করতে পারি। 'উদ্বোধন'-এর প্রধান সম্পদ স্বামী বিবেকানন্দের রচনা। সেই রচনা যদি বড় অংশে অন্য পত্রিকায় সঙ্কলিত হতে থাকে তাহলে 'উদ্বোধন'-এর বিক্রয় মার খেতে বাধ্য। স্বামীজীর রচনা, তাহলে তো পাঠকরা কিছু সময় অপেক্ষা করে, অন্য পত্রিকা থেকে পড়ে নিতেই পারেন। ইংরেজী পত্রিকাদিতে স্বামীজীর রচনার প্রকাশিত হচ্ছিল—যাতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রকাশনার ক্ষতি। তাছাড়া রচনা প্রসঙ্গ-বিচ্যুত করে উদ্ধৃত করা হচ্ছিল, কটু সমালোচনা করার প্রয়োজনে। সেজন্যও সাবধানতার প্রয়োজন ছিল। এই বিষয়টি 'উদ্বোধন'-কর্তৃপক্ষের কাছে এমনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, ১২ নং নিয়মটি 'উদ্বোধন'-এর তৃতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় (১ আষাঢ় ১৩০৮) বড় অক্ষরে আলাদা করে ছাপা হয়।

উদ্বোধনের
বিশেষ বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উদ্বোধনের কোন প্রবন্ধ বা তদংশ, উদ্বোধনের স্বত্বাধিকারীর বিনা অনুমতিতে কোন সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র বা অন্য কেহ যদ্যপি উদ্ধৃত, অনুবাদিত বা প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে তিনি আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন। উদ্বোধনের কাপীরাইট সর্বতোভাবে রিসার্ভ করা। ইতি

উদ্বোধন-স্বত্বাধিকারী।

'উদ্বোধন'-এর যথাকালে প্রকাশিত না হওয়ার একটি কারণ—মহামারী। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ তারিখে 'উদ্বোধন'-এর এই মর্মে একটি 'বিশেষ বিজ্ঞাপন' বেরিয়েছিল ঃ

কলিকাতায় প্লেগের দরুন ছাপাখানার কম্পোজিটর প্রেসম্যান প্রভৃতি পাওয়া বড়ই দুষ্কর হইয়াছে; প্রায় সকলেই দেশে পলায়ন করিয়াছে, আজও প্রত্যাগমন করে নাই। আমরা সেই জন্য বর্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ মাহার দুই সংখ্যা উদ্বোধন বাহির না করিয়া, যাহাতে একেবারে আগামী আষাঢ় মাস হইতে, পূর্বেকার মতো অতি নিয়মিতরূপে ইহা প্রকাশিত হয় এমত বন্দোবস্ত করিতেছি। একমাস উদ্বোধন বন্ধ থাকিলে, গ্রাহক মহাশয়গণ এই বৎসরে সর্বশমেত ২২ খান উদ্বোধন পাইবেন। ইহাতে যেন তাঁহারা অসন্তুষ্ট না হন; কেননা—আবশ্যক বোধ

হইলে, উদ্বোধনের নিয়মাবলীর ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে, বৎসরের মধ্যে আমরা ঊর্দ্ধ সংখ্যা এক মাস পর্যন্ত ছুটি লইতে পারি। ১ম বর্ষ উদ্বোধনের ২১শ, ২২শ, ২৩শ ও ২৪শ সংখ্যায়, এবং বর্তমান বর্ষ উদ্বোধনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'উদ্বোধনের নিয়মাবলী' দেখুন। ইতি

ম্যানেজার
উদ্বোধন-কার্য্যালয়।

।। ৯ ।।

১৯৬৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকীর সময়ে উদ্বোধন কার্যালয় স্বামীজীর রচনাবলী মূল ও অনুবাদসহ দশ খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' নামে প্রকাশিত ঐ রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন'-এ (পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী, ১৩৬৯; জানুয়ারি ১৯৬৩) প্রকাশক জানান ঃ

"স্বামীজীর নির্দেশে গুরুসেবার অঙ্গরূপে স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা ও পত্রাবলীর বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজী কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া এগুলি ধারাবাহিকভাবে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়; পরে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী সারদানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় সেগুলি বিভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং এখনও হইতেছে।"

'বাণী ও রচনা'য় প্রভূত পরিমাণে অনূদিত রচনা গৃহীত হয়েছে। তার বড় অংশ স্বামী শুদ্ধানন্দ-কৃত। তিনিই বাঙলায় স্বামীজীর রচনার প্রথম অনুবাদক। বহুল প্রচারের ফলে অনেকের ধারণা সেগুলি স্বামী বিবেকানন্দের মূল রচনা।

'উদ্বোধন'-সূত্রে আমাদের পক্ষে লক্ষ্য করবার বিষয়—স্বামীজীর রচনাবলীর এই বিখ্যাত অনুবাদক ঠিক কোন্ কোন্ রচনা অনুবাদ করে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করেছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত সম্পাদিত 'উদ্বোধন' আমাদের আলোচনার বিষয় বলে সেই পর্বের মধ্যে প্রাপ্ত এই বিষয়ক কিছু তথ্য নিবেদন করব।

স্বামী শুদ্ধানন্দের 'স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি'র মধ্যে পাই—১৮৯৭ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে, ই. টি. স্টার্ডি-প্রকাশিত স্বামীজীর জ্ঞানযোগ সম্বন্ধীয় বক্তৃতাবলী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে মঠে আসছিল: সকলে সেসব পড়ে মোহিত, কিন্তু বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরেজী জানতেন না বলে তাঁকে পুস্তিকাগুলির বিষয়বস্তু বাঙলায় অনুবাদ করে স্বামী শুদ্ধানন্দ শোনাতেন। এই অনুবাদ শুদ্ধানন্দ লিখিতভাবে করেছিলেন, নাকি মুখে মুখে করেছিলেন তা তাঁর লেখা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। পরে কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দের অনুরোধে আরো কয়েকজনের সঙ্গে স্বামী শুদ্ধানন্দ কোন একটি বা একাধিক পুস্তিকার অনুবাদ শুরু করেন। স্বামী প্রেমানন্দ ঐসব অনুবাদের কথা স্বামীজীকে জানান। স্বামীজী কিছু কিছু অনুবাদ শোনেন ও প্রয়োজনমত সংশোধনী মন্তব্য করেন। "একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই [স্বামী শুদ্ধানন্দ] রহিয়াছি। তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন ঃ 'রাজযোগটা তর্জমা কর না।' আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামীজী কেন করিলেন?... যাহা হউক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতি কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"

স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রণীত 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থে সঙ্কলিত স্বামী বিরজানন্দের উক্তির মধ্যে পাই—স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকা যাওয়ার পরেও স্বামী শুদ্ধানন্দ "স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা ও রচনাবলীর চমৎকার বঙ্গানুবাদ" করে গেছেন এবং সেসব বেরিয়েছে 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় ও স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে।

এই ধরনের কথা অন্যান্য স্মৃতিকথাতেও থাকতে পারে, কিন্তু 'রাজযোগ' ভিন্ন স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর আর কোন্ কোন্ রচনা অনুবাদ করেছিলেন, তাদের বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য পরবর্তী রচনাদিতে নেই, বা আমি তাদের সন্ধান এযাবৎ পাইনি। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ—কে অনুবাদ করেছিলেন?

সুখের বিষয়, ত্রিগুণাতীতের সম্পাদনাকালে 'উদ্বোধন' পত্রিকার অন্তর্গত বিজ্ঞপ্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনে কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ মিলেছে।

'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় রাজযোগের অনুবাদ কিয়দংশে প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকারূপে নিম্নের অংশ বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে সম্পাদক-কর্তৃক লিখিত হয়েছিল ঃ

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ, রাজযোগ সম্বন্ধে কতিপয় ইংরেজী বক্তৃতা দেন; এবং পাতঞ্জল যোগসূত্রের ইংরেজী ভাষ্য করেন। সেই বক্তৃতাগুলি ও ইংরেজী ভাষ্য, একত্রে সঙ্কলন করিয়া পুস্তকাকারে, ইংলন্ডস্থ লংম্যান কোম্পানীরা বাহির করেন। পুস্তকের নাম দেওয়া হয়—রাজযোগ। ইংলন্ডে ও আমেরিকায় রাজযোগের অনেক সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ইউরোপের যাবতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্বামী বিবেকানন্দকৃত রাজযোগের বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। কলিকাতাতে নিউম্যান ও থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানীরা যতবারই বিলাত হইতে উক্ত রাজযোগ আনয়ন করিয়াছেন, ততবারই দিনকতকের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ মহোদয়ের আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ, অতি সুন্দর বাঙলা ভাষায় রাজযোগ অনুবাদ করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়গণের তৃপ্তিসাধনের জন্য, সেই অনুবাদিত রাজযোগের ১ম অধ্যায় হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে উদ্বোধনের প্রবন্ধ স্বরূপে দিলাম। রাজযোগের বিজ্ঞাপন উদ্বোধনের কভারে (মলাটের উপর) দেওয়া গেল, তাহা পাঠ করিলে এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় জ্ঞাত হইবেন।

'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে

প্রাণায়াম

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত রাজযোগের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত ইংরাজী 'রাজযোগ'-এর শুদ্ধানন্দ-কৃত বঙ্গানুবাদ বঙ্গীয় পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য ১ম সংখ্যায় কিয়দংশ দিয়াছিলাম। এই রাজযোগ স্বামীজীর গভীর সাধনা এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তির ফল-স্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রীয় তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান-সাহায্যে কেমন সহজে বুঝান যায়, ইহা স্বামীজীর রাজযোগ পাঠে অবগত হওয়া যায়। আমরা এ সংখ্যায়ও উহার কিয়দংশ দিলাম। ইহাতে অনেকে সাধন-বিষয়ে নূতন আলোক পাইবেন, ও রাজযোগ যে কি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে, তাহার আভাস পাইবেন।

রাজযোগ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরে বইটির বিজ্ঞাপন উদ্বোধনের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ঃ

রাজযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; শুদ্ধানন্দ কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া মুক্তিতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, অলৌকিক চিকিৎসাপ্রণালী, অলৌকিক শক্তি, দেহতত্ত্ব, ষট্চক্রভেদ, কুণ্ডলিনীর জাগরণ, বিশ্বাস, পূজা-পাঠাদি নানাবিধ বিষয় প্রাঞ্জল ও

বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে সাধকের গভীর সাধনা, পণ্ডিতের অগাধ পাণ্ডিত্য, যুক্তিবাদীর প্রবল যুক্তির একত্র সমাবেশ। মূল্য এক টাকা দশ আনা; কাপড়ে বাঁধাই দুই টাকা।

ঠিকানা—১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কম্বুলেটোলা, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যার গোড়ায় বিজ্ঞাপনের মধ্যে ভক্তিযোগের বিজ্ঞাপন ছিল। অনুবাদক স্বামী শুদ্ধানন্দ।

ভক্তিযোগের বিজ্ঞাপন এই ঃ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত।

ভক্তিযোগ

(মূল ইংরেজী হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক অতিসুন্দর বঙ্গানুবাদিত।) এক্ষণে যন্ত্রস্থ। মূ এক টাকা; ডাঃ মাঃ দুই আনা। আগামী মাহার মধ্যেই অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে অর্দ্ধ পাইবেন (ডাকটিকিট পাঠাইলে হইতে পারে)।

এই গ্রন্থে কি কি বিষয় আছে দেখুন ঃ—

ভক্তির লক্ষণ।	বৈরাগ্য।
ঈশ্বরের স্বরূপ।	প্রেমই বৈরাগ্যের প্রসূতি।
প্রত্যক্ষ ঈশ্বর সাক্ষাৎ।	ভক্তিযোগ স্বাভাবিক।
গুরুর আবশ্যকতা।	ভক্তির অভ্যন্তর রহস্য।
গুরু শিষ্যের লক্ষণ।	ভক্তির বিভিন্নরূপ।
অবতার তত্ত্ব।	সর্ব্বভূতে প্রেম।
মন্ত্রতত্ত্ব।	জ্ঞান ও ভক্তি এক।
প্রতিমা রহস্য।	প্রেমভক্তির বিবিধরূপ।
ইষ্ট দেবতা।	পঞ্চবিধ ভাব।
ভক্তির সাধন।	শান্ত, দাস্য, সখ্য ও মধুর।

—প্রভৃতি বিবিধ বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দ এই গ্রন্থে, প্রবল পাশ্চাত্য যুক্তি এবং অতি বিচক্ষণতার সহিত বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে জ্ঞানীর ভক্তকে এবং ভক্তের জ্ঞানীকে আপনার বলিয়া বোধ হইবে। নিরাকার-বাদী সাকারবাদীকে এবং সাকার-বাদী নিরাকারবাদীকে ভাল বাসিবেন।। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের বিবাদ ভঞ্জন হইবে। অনেকে সাময়িক উত্তেজনাকেই চরম ভক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন; পক্ষান্তরে, অনেক জ্ঞানাভিমানী, ভক্তিকে দুর্বলতা অজ্ঞতা প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক নামে অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইঁহাদিগের পক্ষেও এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী।

ঠিকানা—উদ্বোধন প্রেস, পোঃ বাগবাজার কলিকাতা।

কোন গ্রন্থের বিষয়পরিচয় আর বেশি কি হতে পারে ওপরের বিজ্ঞাপনের তুলনায়?—সেইসঙ্গে গ্রন্থটির মূল চিন্তাপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুষ্ঠু উন্মেষ!

'উদ্বোধন'-এর দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যে ১ কার্তিক সংখ্যা থেকে জ্ঞানযোগের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথমে বেরিয়েছিল স্বামী শুদ্ধানন্দ কৃত স্বামীজীর 'The Song of the Sannyasin' কবিতার বঙ্গানুবাদ 'সন্ন্যাসীর গীতি' দিয়ে। তা সমাপ্ত হয়েছিল চতুর্থ বর্ষে। ১৫ আশ্বিন সংখ্যায় তার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত সেই লেখাটির মধ্যে উৎকৃষ্ট বিষয়পরিচয়, পাশ্চাত্যের বুধমণ্ডলীতে জ্ঞানযোগের সমাদর, অদ্বৈতবাদের গুরুত্ব, জ্ঞানযোগে অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও বস্তুবিজ্ঞানতত্ত্বের সমন্বয় এবং জ্ঞানযোগের মধ্যে কর্ম, ভক্তি এবং যোগ—এই যোগত্রয়ের সমাবেশ চমৎকারভাবে লিখিত হয়েছিল। সেই রচনা এই ঃ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত

জ্ঞানযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ নামক ইংরাজী পুস্তকত্রয়ের বঙ্গানুবাদ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগের বঙ্গানুবাদ ১লা কার্ত্তিক হইতে উদ্বোধনের প্রতি সংখ্যায় এক ফর্মা করিয়া দিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। উদ্বোধনের গ্রাহক মহাশয়গণ উহা খুলিয়া যাহাতে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাঁধাইতে পারেন, এইরূপ ভাবে উদ্বোধনে উহা সন্নিবিষ্ট থাকিবে। জ্ঞানের চর্চা বঙ্গদেশে অতি বিরল। অনেকের আবার জ্ঞানের উপর বিজাতীয় বিদ্বেষ দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ—জ্ঞান কি, সাধারণে সেই বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। এই জ্ঞানের ভিতর যে অতি সুন্দর কবিতা আছে, তাহা স্বামীজী তাঁহার অপূর্ব ব্যাখ্যার দ্বারা ইউরোপীয় ও আমেরিকান বুধমণ্ডলীর নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এইসকল বক্তৃতার সময়ে বক্তা অনেক সময় এতদূর উত্তেজিত হইতেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী আপনাদের সভ্যতাসুলভ অভিমান ভুলিয়া প্রবল অশ্রু বিসর্জন করিতেন, কখনো বা আপনারদের হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে করামলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইতেন। হে বঙ্গভাষাভিজ্ঞগণ, আপনারাও যাহাতে সেই সকল তত্ত্বামৃত সম্ভোগ করিতে পারেন, যাহাতে আপনারাও সেই মায়াবাদের যুক্তিপূর্ণ গভীর রহস্য, মুক্তির প্রকৃত তত্ত্ব, সংসার ও সন্ন্যাসের সম্বন্ধ, অদ্বৈতবাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা, উহার যুক্তি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অদ্বৈতজ্ঞান [-এ] কিরূপে কার্য করা যাইতে পারে, অর্থাৎ অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া কিরূপে কার্য করা যাইতে পারে তাহার তত্ত্ব—মোট কথা, জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় সমুদয় প্রাচীন শাস্ত্রীয় তত্ত্ব বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে অতি সহজভাবে বুঝিতে পারেন, যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা অতি সামান্য মনঃসংযোগেই শাস্ত্রীয় জটিল ও কূট তত্ত্ব সকলও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তজ্জন্য আমাদের এই উদ্যম। এই জ্ঞানযোগ কর্ম, যোগ ও ভক্তির চূড়াস্বরূপ। অথচ ইহা এত সরল যে, কেবল পাঠমাত্র করিলেই হৃদয়ে অপূর্ব উদ্দীপনা উপস্থিত হইবে—বৈরাগ্যের ভাবে হৃদয় উদ্বেল হইবে এবং অদম্য কার্যকারিতা উপস্থিত হইবে।

জ্ঞানযোগ যে স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক অনূদিত—একথা স্বামী ত্রিগুণাতীতের কার্যকালে বিজ্ঞাপিত হয়েছে বলে আমাদের চোখে পড়েনি। স্বীকার্য যে, 'উদ্বোধন'-এর যেসব সংখ্যা দেখেছি, সেগুলির শরীর এমনই জীর্ণ যে, বোঝা মুশকিল কোথাও বিজ্ঞাপনের জীর্ণপত্র স্খলিত হয়ে পড়েছে কিনা। তবে অল্পবিস্তর প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় বর্ষের বর্ষসূচীতে দেখতে পাই, 'জ্ঞানযোগ' রচনাটি শুদ্ধানন্দ-কৃত। তৃতীয় বর্ষের বর্ষসূচীতে পাই, 'অপরোক্ষনুভূতি', 'অমৃতত্ত্ব', 'আত্মার মুক্তস্বভাব', 'কর্মজীবনে বেদান্ত', 'জগৎ', 'বহুত্বে একত্ব', 'ব্রহ্ম ও জগৎ', 'মানুষের যথার্থ স্বরূপ', 'মায়া ও ঈশ্বর-ধারণার ক্রমবিকাশ', 'মায়া ও মুক্তি', 'সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মাদর্শন'—শুদ্ধানন্দ-কৃত। এইসকল নিয়েই স্বামীজীর জ্ঞানযোগের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

তার আগে দ্বিতীয় বর্ষের ১৩ সংখ্যার (১ ভাদ্র ১৩০৭) গোড়ায় 'কর্মযোগ'-এর এই বিজ্ঞাপন ছিল ঃ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত

কর্মযোগ

(মূল ইংরেজী হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক অতিসুন্দর বঙ্গানুবাদিত।)

ছাপা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এক মাসের মধ্যেই বাহির হইবে। উদ্বোধনের গ্রাহক হইলে অথবা বাহির হইবার পূর্বে অর্ডার দিলে, অর্ধমূল্যে অর্থাৎ পূর্ণমূল্য এক টাকা চার আনা স্থলে দশ আনা মূল্যে পাইবেন।...

।।১০।।

'উদ্বোধন'-এর জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়োজন ছিল এবং স্বামী বিবেকানন্দেরও প্রয়োজন ছিল 'উদ্বোধন'কে। স্বামী ত্রিগুণাতীত দুই প্রয়োজনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন দেহ-মন-সত্তাকে নিবেদন করে।

'উদ্বোধন'কে কেন স্বামীজীর প্রয়োজন, তার কিছু কারণ আগে বলেছি, যার মূল কথা—শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বেদান্তকে জনগোচর করা, রামকৃষ্ণ মিশনের অভূতপূর্ব জীবনাদর্শের উপস্থাপনা ইত্যাদি। 'আচারের মরুবালুরাশির' মধ্যে ক্রমনিমজ্জিত সমাজজীবনকে সবলে আবর্জনামুক্ত করে এক বীর্যময় জীবনের ভাবরূপ ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কী প্রচণ্ড তাঁর সেই 'প্রস্তাবনা' রচনাটি, যেখানে রুদ্রনায়ক জ্বলন্ত ভাষার তরবারিকে উন্মোচন করে আহ্বান করেছেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত! চরৈবতি চরৈবতি !—

''যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিতদৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।...

''যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়—ভয় হয় পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া যাই—

''এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাঁহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে?''

অসাধারণ এই 'প্রস্তাবনা' রচনাটি। ঘনীভূত জ্ঞানরাশি সূর্যকরপাতে বিগলিত হয়ে অনুভূতি-প্রপাতের রূপ ধরে আছড়ে পড়েছে। কোন পত্রিকা তার সূচনায় এহেন সুমহৎ উচ্চারণ লাভ করেনি—অন্তত করেছে বলে জানি না।

স্বামীজীর আরো প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন মানে নতুন জীবন এবং তার নতুন ভাষা—যেকথা তিনি শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন। স্বামীজী কিভাবে সাধু ক্রিয়াকে অবলম্বন করে বাঙলা ভাষায় দার্ঢ্য এবং গতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, সেবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করেছি।[১৫] উল্লিখিত প্রস্তাবনা রচনাটি সাধু ক্রিয়ায় রচিত। প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় 'জ্ঞানার্জন', ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'বর্তমান ভারত' (যা বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় শেষ হয়, মধ্যে মধ্যে ছাড় দিয়ে) সাধু ক্রিয়ায়

রচিত। স্বামীজীর সাধু ক্রিয়ার রচনা সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত ও সমালোচিত হয়। নিজ গোষ্ঠীতেও সাধু ক্রিয়ার রচনা অতিকাঠিন্যের জন্য অনেকে পছন্দ করেননি। স্বামীজী কিছুটা আশাহত হয়েছিলেন। কিন্তু অবশ্যই বুঝেছিলেন—সেইখানেই তাঁর চলমান ইতিহাসের নাড়িজ্ঞান—সাধু ক্রিয়ার দিন শেষ, প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্যে জাতীয় সাহিত্যকে প্রবেশ করতে হলে জীবনগত ভাষাকেই গ্রহণ করতে হবে। প্রথম বর্ষের দশম সংখ্যাতে তাঁর চলিত ভাষায় লেখা 'ভাববার কথা'-র কিছু অংশ বেরল, যাতে লেখকের নাম ছিল না। এই লেখা পরবর্তী চতুর্দশ সংখ্যাতেও বেরিয়েছিল। তারপরেই পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে বেরতে লাগল চলিত ভাষায় তাঁর নামসহ 'বিলাতযাত্রীর পত্র' (তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে নাম বদলে করা হয় 'পরিব্রাজক')। এই ধারাবাহিক লেখাটির সঙ্গে সংখ্যান্তরে বেরতে শুরু করে আরেকটি ধারাবাহিক চলিত ভাষার রচনা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'। এই রচনা-দুটি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ক্রান্তিকারী—কেন, তার আলোচনাও এখানে আনার প্রয়োজন নেই।[১৬] তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নতুনের আবির্ভাব অর্চিত হয় অর্ঘ্য ও লোষ্ট্র—দুইয়ের দ্বারাই। পত্র-পত্রিকায় লোষ্ট্রবর্ষণই বেশি হয়েছিল। সে-সংবাদ অবশ্যই পৌঁছে যায় পাশ্চাত্যে স্বামীজীর কাছে। তখনই এসেছিল একটি পত্র, বা পত্র-প্রবন্ধ—স্বামীজী ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০০, লস এঞ্জেলস থেকে সেটি লিখেছিলেন—চলিত ভাষার পক্ষে মহাসনদ। সে-লেখার মধ্যে উত্থাপিত যুক্তিগুলির উল্লেখ না করে কেবল উদ্ধৃত করব কয়েকটি লাইন, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগের প্রাণচেতনা শিখায়িত ঃ

"যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।... যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ি ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।"

চলিত ভাষায় লেখা তো সম্পাদক ত্রিগুণাতীত ছাপলেন (অবশ্য এর আগে প্রথম বর্ষের নবম সংখ্যাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের একটি অধ্যায়—রামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, যার সংলাপ অংশ চলিত ভাষায় রচিত। এইসঙ্গে উল্লেখ্য, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত 'পরমহংসদেবের উপদেশ' যা পুরো চলিতে রচিত এবং 'উদ্বোধন'-এর প্রথম সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল), কিন্তু সেই কীর্তির জন্য নিন্দার ঝড় তাঁর ওপরই এসে পড়েছিল। চলিত ভাষার পক্ষে কলম ধরে যখন কেউ এগিয়ে এলেন না, তখন সে-কাজ ত্রিগুণাতীতকে করতে হয়েছিল। তিনি ১ পৌষ ১৩০৬ থেকে কয়েক সংখ্যায় 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সমালোচনা' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, যার মধ্যে চলিত ভাষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিষদের বার্ষিক সভায় যে-দীর্ঘ ভাষণ দেন, ত্রিগুণাতীতের

রচনাটি সেই সূত্রেই। বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ইতিহাসে এটির যোগ্যস্থান হওয়া উচিত। এর মধ্যে ভাষার নানা শ্রেণীভেদ করা হয়েছিল, তারপর জোরালো সমর্থন জানানো হয়েছিল সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যবহার বিষয়ে। স্বামীজীর চলিত গদ্যের চমৎকার কিছু প্রয়োগ-নমুনা তিনি ঐ রচনায় সঙ্কলন করে দেন এবং মারাত্মকরকম প্রগতিশীলতা দেখিয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে স্বতন্ত্র বাঙলা ব্যাকরণ গড়ে তোলার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন ঃ "যেরূপ লাটীন ও ইংরাজি, তদ্রূপ সংস্কৃত ও বাংলা সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেলে এমন কি ক্ষতি হইবে? বরং স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দরুন বাঙলা ভাষার কি বিশেষ উন্নতি হইবে না?" অতীব আধুনিক মনের ঐ সন্ন্যাসী বাঙলায় তিন 'শ' বর্জন করে একটি 'শ' রাখার প্রস্তাব করেন। 'বর্ণমালার সংশুদ্ধির' এবং যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জনের সুপারিশ করেছেন। 'উদ্বোধন'—'উদ্‌বোধন' হোক, তাঁর আপত্তি নেই, তাতে অন্তত 'উদ্দোধন' উচ্চারণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষার ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গের আলোচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসব ভারী ভারী পরিভাষা তৈরি করেছিলেন, সেগুলির পরিবর্তে সহজ ভাষায় সহজে উচ্চার্য কিছু পরিভাষা তিনি নিজে রচনা করে দেন নমুনা হিসাবে।[১৭] চিন্তার আধুনিকতায় স্বামী বিবেকানন্দের অনুবর্তী হওয়ার শক্তি ছিল স্বামী ত্রিগুণাতীতের।

ত্রিগুণাতীত সাধারণভাবে সাধু ক্রিয়াতে লিখতেন, যদিও ঢঙটা ছিল চলিতের। কিন্তু স্বামীজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চলিত ভাষাতেও তিনি দুটি লেখা লিখেছেন—প্রথম বর্ষের আঠার এবং উনিশ সংখ্যায়—'আনন্দময়ীর আগমন' এবং 'বিজয়া'। লেখা-দুটির মধ্যে মাতৃতত্ত্বের আলোচনা অবশ্যই ছিল, কিন্তু মূল ব্যাপার মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক-কথা। প্রাণের রঙে রাঙানো লেখা-দুটি থেকে বেশ খানিক অংশ উদ্ধৃত করব। প্রথমে 'আনন্দময়ীর আগমন' থেকে ঃ

"মা আবার আমাদের দেখতে আসছেন। প্রিয়তম সন্তানদিগের নিকট স্নেহভরে ধেয়ে ধেয়ে আসছেন।—স্মরণ করলে আনন্দে হৃদয় ভরে যায়। মা আমাদের কত দয়াময়ী! কতই স্নেহময়ী!... বেশি দিন ছেলেকে না দেখে কি থাকতে পারেন? তাই মায়ের অত সজল নয়ন। স্নেহময়ী স্নেহে এত ভরা না হলে কি এসকল অস্ফুট শুষ্ক সন্তানদিগের ভিতরে স্নেহের উদ্রেক করে দিতে পারেন?...

"মা আসবেন; দরিদ্র ও ধনী সমভাবে আনন্দে মত্ত হতেছেন। ধনীর প্রতিও যেমন স্নেহ, দরিদ্রের প্রতিও মার তেমনি স্নেহ।... গরিব, মায়ের কানে কানে বলে দিলেন, 'মা, আবার আমার ঘরে এসো'। 'আমার গরিব ছেলের আমি ছাড়া আর কেহই নাই'—ঠিক বৎসর যেতে না যেতে মা আবার স্নেহভরে এসে উপস্থিত। গরিব খেতে পায় না; তত্রাচ—মায়ের এমনি কৃপা—গরীব, মায়ের সাধের পূজা কেমন সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হন।...

"আমাদের মা, অপরের চোখে, মাটির মা হতে পারে; ভক্তের চোখে 'সচ্চিদানন্দময়ী'—চিদ্‌ঘন মূর্তি। মা সর্বব্যাপী—শূন্যে থাকতে পারেন, মানুষের ভিতরে থাকতে পারেন; গাছের ভিতরে, ইট কাঠের ভিতরে, এমন কি সেই

ক্ষুদ্র বালুকণার ভিতরেও থাকতে পারেন; আর আমার মা, আমার হাতের গড়া এত সাধের আনন্দময়ী প্রতিমায় থাকবেন না—এ কখনই হতে পারে না। আমার যদি ভক্তি থাকে, বিশ্বাস থাকে; আমি যদি অন্তরের সহিত মাকে ডাকি; প্রাণের সহিত মার কাছে কেঁদে বলি; মার জন্য যদি সত্যই আমার প্রাণ ছটফট করে; মাকে না দেখতে পেলে মহা অশান্তি বোধ করি—প্রাণ বেরিয়ে যায় এমন যদি হয়, নিশ্চয়ই বলছি, মা আসবেনই আসবেন; এই মাটির প্রতিমার ভিতরেই আসবেন। যেখানে বলব সেইখানেই আসবেন। যেমন করে হলে আমার এই ক্ষুদ্র মন তাঁকে বুঝতে পারবে, তেমনি করেই তিনি আমার কাছে আসবেন। মা সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন; মা সত্যই অন্তর্যামী, সত্যই ভক্ত-বৎসল, সত্যই স্নেহময়ী জননী।''

'বিজয়া' রচনার কিছু অংশ ঃ

''মা বাড়ি আলো করে ছিলেন। কত গমগমে ছিল, কত জাঁক জমক ছিল, কতই আনন্দোৎসব হতেছিল। আজ ঘর আঁধার করে, মন আঁধার করে চলে গেলেন! মাকে পাঠাইয়া, মাকে পৌঁছিয়া দিয়া আসিয়া, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি—চারিদিক ফাঁকা; সকলেই বিমর্ষ; কেহ কেহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন; কেহ কেহ বসে কাঁদিতেছেন। শোকে সকলেই কাতর; কেবল বাটীর লোক নয়—আত্মীয়-বন্ধুগণ, পাড়া-পড়শীগণ, অতিথি-অভ্যাগতগণ, অপরাপর লোকগণ—সকলেই শোকতপ্ত। মা! আবার কবে আসবে?''

অক্লান্ত পরিব্রাজক ত্রিগুণাতীত খুব নিকট থেকে মানুষ ও মানুষের সমাজ দেখেছেন। তাঁর গ্রহিষ্ণু মনে অভিজ্ঞতার স্থায়ী ছাপ পড়ে গিয়েছিল। নিরীক্ষার সঙ্গে পরীক্ষাও তিনি করেছেন। সেই শক্তিতে হয়ে উঠেছিলেন সমাজবিজ্ঞানী। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তাঁর রচনা থেকে তাঁর সে-পরিচয় কিছুটা পেয়েছি। দূরপ্রসারী দৃষ্টি তাঁর—কিন্তু নিকট দৃষ্টিরও অভাব ছিল না। তাঁর কলম থেকে—সন্ন্যাসীর কলম থেকে—সেই কাছের চোখে দেখা বস্তুর ওপরে লিখিত একটি উপাদেয় লেখা পেয়েছি। তাঁর পক্ষে অভাবিত বিষয়—'আড্ডা'। নিবিড় পর্যবেক্ষক এই মানুষটি বাঙালী সমাজের একটি বিশেষ জীবনাচারের ছবি আপাত হালকা চালে তুলে ধরেছেন, ভিতরে ছিল অন্তর্দৃষ্টি এবং মননশীলতা।

প্রথমত বাঙালীর সর্বজনীন আড্ডাশক্তি ও আড্ডার চরিত্র (দ্বিতীয় বর্ষের উনিশ সংখ্যায়) ঃ

''এমন পাড়াই নাই, যে পাড়ায় কোন না কোন রকমের আড্ডা নাই। এক প্রকার ধরিতে গেলে, আড্ডাই আমাদিগের দেশের জাতীয়ত্বের এবং নিজের নিজের মনুষ্যত্বের হ্রাস বৃদ্ধির মঙ্গল অমঙ্গলের, উন্নতি ও অবনতির মূল কারণ। হেলায় বৃথা সময় কাটাইয়া মনুষ্যত্বের হানি করিতে আড্ডা যেমন মজবুত, এমন আর কিছুই নহে।... আড্ডা মানে—গল্পের স্থান; আড্ডা মানে অযথা বিরামের স্থান, অথবা খেলার স্থান, অযথা ফূর্তির বা রগড়ের স্থান, যে-স্থানে যাইবার জন্য অনেক সময়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়, যে-স্থানে যাইবার, বসিবার, কথা কহিবার, বা কোনও প্রকারের কোন নিয়মাদি বিশেষ কিছু নাই; যে-স্থানে প্রত্যহই বা সর্বদাই যাইয়া থাকি; যে-স্থানে কয়েকটি অতি ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া, প্রায় আর কেহ আসেন না, যদি বা আসেন তো অতি অল্পক্ষণের জন্যই।''

সংবাদ উৎপাদনে ও বণ্টনে আড্ডার ক্ষমতা ঃ

"এই সকল স্থানে নানাপ্রকার চর্চা হইয়া থাকে। আড্ডায় যদি একটা কথা উঠিল, তাহা অযথা বা মিথ্যাই হউক, আর যাহাই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ সে কথা পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া যাইল। আড্ডায় যদি কেহ একটা 'মতলব' করিলেন, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ সকলে তাহাতে হাঁ করিয়া দিলেন। আড্ডার কথা বেদবাক্য; আড্ডা হইতে যে কথা শুনিয়া আসিব, সে কথা যদি প্রকৃতই মিথ্যা হয় এবং তাহার বিপক্ষে যদি দশ হাজার সৎলোক সাক্ষ্য প্রদান করেন তবুও আড্ডার কথা কোন মতে অবিশ্বাস করিতেছি না।"

আড্ডার মুখ্য শ্রেণীবিভাগ ঃ

"(১) মজলিশী, আজগুবী বা খোষ গল্পের আড্ডা। আফিম আশী বৃদ্ধ বা মোসাহেব মহাশয়গণই সচরাচর এই সকল আড্ডার প্রধান সভ্য।

"(২) খেলার আড্ডা। সতরঞ্চ, পাশা, তাশ প্রভৃতি এই সকল আড্ডায় আদরের দ্রব্য। যুবা বা বৃদ্ধ উভয় দলই এই আড্ডায় সমান আকৃষ্ট হন।

"(৩) গান বাজনার আড্ডা। এখানে যুবা বা বৃদ্ধ সকলই প্রায় আনন্দ পাইয়া থাকেন। আজকাল কিন্তু যুবক দলের ভিতরেই এই সকল আড্ডা বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, ভাল ভাল কন্সর্ট-পার্টি, থিয়েটার-পার্টি যাত্রার দল প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিতেছি না; কেন না, তথায় অনেক বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। সে সকল—রেগুলার মীটিং, ক্লাব বা এসোসিয়েশন (অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত বা নিয়মিত সভা) নামে পরিগণিত হইতে পারে।

"(৪) ফূর্তির আড্ডা। অল্প স্বল্প পাঁচ রকম ইয়ারকী, পরচর্চা, ঠাট্টা তামাসা, গুড়ুক সেবন, গল্প প্রভৃতি হরেক রকমে, এই সকল আড্ডায় সময় অতিবাহিত হয়। ইহাতে যুবার ভাগই বেশি।

"(৫) নেশার আড্ডা। কোন কোন ভদ্র এবং শিক্ষিত লোককেও দেখিতে পাওয়া যায়—গুলি গাঁজা বা চরশ প্রভৃতি নীচ নেশায় রত। তাঁহারা গোপনে গোপনে ঐসকল আড্ডায় যাইয়া নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করিয়া আসেন; মনে করেন, যেন কেহই টের পাইল না।

"(৬) মিশ্রিত আড্ডা। অর্থাৎ, এ-সকল আড্ডায় পূর্বোক্ত সকল রকমেরই রস অল্পবিস্তর আছে।"

ত্রিগুণাতীত মেয়েদের আড্ডার উল্লেখও করেছেন। তাছাড়া আরো অনেক রকমের ভাল আড্ডা আছে এবং মন্দ আড্ডা—যাদের উল্লেখ 'অনাবশ্যক' অথবা 'অযোগ্য'।

আড্ডার কাহিনী লিখেছিলেন অন্য কেউ নন, স্বামী ত্রিগুণাতীত। সুতরাং আদর্শের কথাটা এসে যায়ই। বাঙালীরা আড্ডা দেবেই, সেখান থেকে তাদের সরানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে উপায়—ত্রিগুণাতীত ভাবলেন—যদি ঐসব আড্ডার মধ্যে কিছু ভাব ও আদর্শ ঢুকিয়ে দিয়ে তার প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটানো যায়! বৈষ্ণব মতে যেমন কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করা। তেমন ঘটাতে পারলে আড্ডাগুলি লোকসেবা-কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। ত্রিগুণাতীতের প্রসারিত শুভকল্পনার রূপ এই ঃ

"আড্ডা যেন দীন দরিদ্র, অনাথ-অনাথাগণের আশ্রয় হয়; আড্ডা যেন বিপন্নগণের একমাত্র শরণ-স্থল হয়; যেন দুষ্টের পরিবর্তন ও শিষ্টের আদর-স্থান হয়; ধনী নির্ধন, গুণী ও নির্গুণ, মহৎ এবং ক্ষুদ্র, বালক বা বৃদ্ধ, সকলকারই যেন প্রিয় কুটীর হয়। আড্ডা যেন পল্লীর শান্তিনিকেতন হয়। আড্ডা যেন যাবতীয় লোককে একতাবন্ধনে বদ্ধ করিতে পারেন। দেশের জাতীয়ত্ব বজায় রাখিতে পারেন এবং ভারতের নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করিয়া স্বজাতির জীবন রক্ষা করিতে পারেন। নিজ মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন।"

বাস্তবে, আদর্শে, স্বপ্নে এবং সাধনায় মেশানো ছিল ত্রিগুণাতীতের জীবন।

এই আড্ডার প্রসঙ্গ ত্রিগুণাতীতের আরেকটি রচনায় আছে। সেখানে নিছক পরচর্চামুখী আড্ডাধারীদের বিষয়ে ধিক্কার দেখা যায়। নাতিহ্রস্ব সেই লেখাটি—"অনাথ-আশ্রম ও জাতীয় উপকারিতা" (১ কার্তিক ১৩০৭)—এক মহান প্রেমিক হৃদয়ের যন্ত্রণাদীর্ণ ভাবাবেগে পূর্ণ। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের ইতিহাসে এটি প্রথম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য রচনা। প্রথম অনুচ্ছেদে খ্রীস্টান মিশনারিদের ত্রাণকার্যের মূল্য (যদিও উদ্দেশ্যমূলক), অপরদিকে এদেশীয় মানুষদের অসারচিত্ততার উল্লেখ ঃ

"হিন্দু-সমাজ কর্তৃক পরিচালিত অনাথাশ্রম বাঙলাদেশে তো কুত্রাপি নাই, সমগ্র ভারতবর্ষেও আছে কি না সন্দেহ। যদিও দুই একটি মাত্র থাকে, তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং স্থানীয় কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত; তাহাতে ভারতের যাবতীয় প্রদেশের অনাথ বালক-বালিকাগণ (হিন্দু হইলেও) স্থান পায় না। সুতরাং খ্রীস্টানগণ আমাদের দেশের অনাথ বালক-বালিকাগণকে কিছুদিন লালনপালন করিয়া অনায়াসে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লয়েন। ইহাতে খ্রীস্টান মিশনারিগণেরও দোষ নাই; অনাথ বালক-বালিকাগণেরও দোষ নাই। দোষ আমাদিগের আধুনিক স্বদেশের। নীচ জাতীয় দরিদ্র দেখিলেই তো আমরা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিই। তাহারা হিন্দু হইলেও, তাহাদিগকে শূদ্র, অস্পৃশ্য ও অগণ্য জ্ঞানে আমরা অবহেলা করিয়া থাকি। তাহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেও আমরা কিছু ক্ষতি মনে করি না। যদি একান্তই দয়ার্দ্রচিত্ত হইলাম, মনে যদি একান্তই দেশহিতৈষিতারূপ প্রগাঢ় সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল, তাহাদিগকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিলাম, বা একখানি ছিন্ন বস্ত্র দিলাম, বা বড় জোর, বাটীতে ভৃত্য করিয়া রাখিলাম। তাহাদিগকে যত্নসহকারে লালনপালন করা, লেখাপড়া ও ভদ্রোচিত আচার ব্যবহার শিখানো, অন্তরে প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কর্তব্য জ্ঞান কখনো আমাদিগের মনে উদয় হয় না। সুতরাং নীচবংশোদ্ভব নিরাশ্রয় অনাথগণ পেটের জ্বালায় স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা যত্ন করে তাহাদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে, তাহাদিগের কথা শুনিতে এবং তাহাদেরই ধর্ম পালন করিতে বাধ্য হয়।"

তারপর ঃ "কি আশ্চর্য! কাহাদের ধন কাহারা ভোগ করে দেখুন; কাহাদের লোক কাহারা লইয়া যায়। কেনই বা না লইয়া যাইবে। আমরা নিজেরাই যে ঘরের লক্ষ্মী বাহির করিয়া দিতেছি।... আমরা জাত্যভিমান ও ধনগর্বাদিতে মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিতেছি না যে, যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করিতেছি, তাহারাই আমাদিগের দেশের লক্ষ্মী; তাহাদিগের হইতেই আমাদিগের

ধন, মান, সুখ, ঐশ্বর্য প্রভৃতি সমস্তই। তাহারা যদি না থাকিত, আজ আমরা অমরাবতী তুল্য শহরে রাজপ্রাসাদোপরি দুগ্ধফেননিভ শুভ্র ও পুষ্পরেণুসম কোমল শয্যাদির সুখ ভোগ করিতে পারিতাম না। যাহাদিগকে ঘৃণা করি, আজ তাহারা যদি না থাকিত, আমাদিগকেই তাহাদিগের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইত; আমাদিগকেই আজ তাহাদিগের ন্যায় লাঙল স্কন্ধে বহন করিয়া ধান্য-ক্ষেত্রে দৌড়াইতে হইত, রৌদ্রে বা বারিপাতে অনাহারে অনবরত শস্য রোপণাদি কার্য করিতে হইত, গৃহ নির্মাণ জন্য ঘর্মাক্ত কলেবরে কোদাল দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে হইত; স্বাস্থ্যরক্ষা নিমিত্ত মস্তকে করিয়া ময়লা লইয়া 'ধাবার' মাঠে ফেলিয়া আসিতে হইত। মনে করুন, যাহাদিগকে ঘৃণা করি, তাহাদিগের অবর্তমানে আমাদিগের কতদূর দুর্দশা হওয়া সম্ভব।''

এই দেশে তথাকথিত নীচ বংশোদ্ভবদের দুর্দশার মর্মন্তুদ চিত্র ত্রিগুণাতীত উপস্থিত করেছেন। সেইসঙ্গে জমিদারদের নিষ্ঠুর শোষণচিত্রও। এদেশীয় কাব্য-পুরাণে পরহিতের যে-সকল অসামান্য দৃষ্টান্ত আছে, সেগুলির দু-একটির উল্লেখও করেছেন। সেইসঙ্গে নিকট কালের পরোপকারী মানুষের কাহিনী শুনিয়েছেন। একবার প্রবল বন্যার সময়ে এক ব্যক্তি ভাসমান একটি বৃক্ষ অবলম্বন করে প্রাণরক্ষা করছিলেন, সেইসময়ে আরেকটি ডুবন্ত মানুষকে দেখতে পান। তাঁকে তাঁর অবলম্বনের বৃক্ষটিতে তুলে দিয়ে নিজে বন্যায় ভেসে যেতে থাকেন। শেষে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। ২০ ক্রোশ দূরে, তাঁর মৃতকল্প দেহকে তটে পড়ে থাকতে দেখে লোকে তাঁকে উদ্ধার করে অনেক চেষ্টায় তাঁর প্রাণ বাঁচায়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও ত্রিগুণাতীত বলেছেন :

''বৎসর সাতেকের কথা হইল; পদব্রজে অযোধ্যা যাইতেছিলাম। সঙ্গে কেহ বা কিছুই ছিল না; একা মাত্র, ও একবস্ত্র—তাহাও অর্ধাংশ একদিবস পথে গ্রাম বা বসতি কোন প্রকার পাওয়া গেল না; দিবা প্রায় অবসান সমস্ত দিবসই অনাহার। পূর্বদিবস মধ্যাহ্নে যৎসামান্য ভিক্ষা পাওয়া গিয়াছিল মাত্র। পূর্ব অপরাহ্নে পাঁচ ক্রোশ ও সে-দিবস প্রায় সাত ক্রোশের পথশ্রম। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে দূরে গুটিকতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝুপড়ি দেখিতে পাওয়া গেল। নিকটে যাইয়া বুঝিলাম, লোকগুলি সাঁওতাল অথবা ধাঙড় জাতীয়, অতি গরিব; আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'ক্যা মাংতা'; বলিলাম, 'খানেকো ভিক্‌ষা মাংতা।' 'হামারা ভাত খায়েগা?' 'হাঁ জি খায়েগা।' 'বয়ঠো।' হাত দেড়েক লম্বা ও আধহাতটাক মোটা একখণ্ড বৃক্ষের শাখা উপবেশনার্থ দিলেন। তাঁহাদিগের একখানি ঝুপড়ি; হাত চারেক চওড়া ও প্রায় ৮ হাত লম্বা; কোথাও পাতা, কোথাও চারিটি খড়, কোথাও বেনা বা উলু, কোথাও বা কাটিমুটি, কোথাও বা একটু চট দিয়া মাত্র আবৃত। যেমন চাল, তেমনি দেওয়াল। সম্মুখে হাত আষ্টেক জমি একটু পরিষ্কার করা উঠানের মতো। উপরে বিমল চন্দ্রালোক। চতুর্দিকে ময়দান; মধ্যে মধ্যে এক একটি খর্বাকৃত বৃক্ষ। দাতার পরিবারের মধ্যে—তাঁহারা দুইজন উজ্জ্বল কৃষ্ণকায় স্ত্রী পুরুষ, এবং তদনুরূপা একটি কুমারী কন্যা। সন্ধ্যার পূর্বেই রন্ধন হইয়া গিয়াছিল। হাঁড়ির ভিতর হইতে তিনটি গোল গোল পাকানো ডেলা বাহির করিলেন—

দুইটি বড় ও একটি ছোট; তিনটি ভাঙ্গিয়া চারিটি করা হইল; রাখিবার স্থান নাই, বোধহয় তাঁহাদের আবশ্যকও করে না, মাটিতেই রাখিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে, আমাকে হাত পাতিতে বলিলেন। সেই চারিটি লাড্ডু হইতে একটি আমার হাতে দিলেন; তাঁহারাও তিন জনে একেকটি লইয়া বসিলেন। লাড্ডুগুলি অতি নিকৃষ্ট আউস-চাউলের খুদ সিদ্ধ; একেকটিতে ৫।৭ গ্রাস হইবে মাত্র; তাহাই তাঁহাদিগের খাদ্য; দুইবেলা এইরূপ এক এক লাড্ডু জুটিলেই পরম ভাগ্য মনে করেন।''

সেই লাড্ডুলাভ করে প্রাণরক্ষা করেছিলেন ত্রিগুণাতীত। তেমনই করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভাই ও শিষ্যেরা। তাই বিবেকানন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পেরেছিলেন—মুচি মেথর আমার রক্ত, আমার ভাই।

ত্রিগুণাতীতের লেখা আরো এগিয়েছে। বাঙালীর আড্ডায় একদিন তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সমালোচনা শুনেছিলেন ঃ

''একটী আড্ডার কথা আমাদিগের স্মরণ পড়িতেছে; সেদিন রাস্তা দিয়া আসিতেছিলাম, একটি আড্ডায় শুনিতে পাইলাম, 'উদ্বোধন' এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অনাথাশ্রম সম্বন্ধে কথা হইতেছে—'উদ্বোধনের এই কয় সংখ্যায় আমাদিগের পড়বার বেশি কিছু নাই, কেবল অনাথ-আশ্রম, দুর্ভিক্ষ-মোচন এবং প্লেগনিবারণ প্রভৃতি নিজেদের কার্যাদি দিয়াই কাগজখানি পূর্ণ করিয়াছেন'; 'এসকল তো নিজেদেরই বিজ্ঞাপন'।''

বড় দুঃখে ত্রিগুণাতীত লিখেছেন ঃ

''দেখুন একবার; অপরাধ কি না, রামকৃষ্ণ মিশন কিরূপ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ভারতের অনাথগণকে কুড়াইয়া আনিয়া লালন-পালন করিতেছেন, এবং অনাথগণ তাঁহাদিগের আশ্রমে থাকিয়া কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাহাই দুই একবার কিছু উদ্বোধনে বলা হইয়াছিল। অপরাধ কি না, রামকৃষ্ণ মিশন কিরূপ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রাণপণে ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন; অপরাধ কি না, রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রতধারিগণ কিরূপ জীবন সমর্পণ করিয়া প্লেগাক্রমণ হইতে স্বদেশবাসিগণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; তাহাই এক আধবার কিছু উক্ত কাগজে লেখা হইয়াছিল।

''এসকল দেশহিতকর কার্যের কথা যদি না লিখিব, তো কাগজ-পত্রের আবশ্যক কি? কেবল গল্প দিয়াই যদি কাগজ ভরিয়া দিলাম, তো মাসিক পত্রের পরিবর্তে, উপন্যাস-ভাণ্ডার বা দারগার-দপ্তর লিখিলেই তো ছিল ভাল? যে পত্রে, হৃদয়বান দেশহিতৈষিগণের কার্য যদি জনসাধারণের নয়নপটে চিত্রিত করিয়া তাঁহাদিগের অন্তরস্থ প্রসুপ্ত সদুদ্যম বা সদ্বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিলাম, তো সে পত্রের 'উদ্বোধন' নাম রাখিবার প্রয়োজন কি?''

এর পরে ত্রিগুণাতীত মুর্শিদাবাদে স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং রাজপুতানায় স্বামী কল্যাণানন্দের সেবাকাজের বিষয়ে কিছু সংবাদ দিয়েছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ কিভাবে কেবল দান বিতরণ না করে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশমতো (নিজ প্রেরণাতেও) অনাথদের যথার্থ আত্মনির্ভর ও 'মনুষ্যত্বশালী' করতে সচেষ্ট ছিলেন, ত্রিগুণাতীত তা দেখিয়েছেন স্বামী অখণ্ডানন্দের একটি পত্র উদ্ধৃত করে ঃ

"গত জুলাই মাস হইতে অনাথ-আশ্রমের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। আশ্রমে প্রাতে ৩ ঘণ্টাকাল যে স্কুল, তাহাতে আশ্রমের ছাত্র ১১টি, আর বাহিরের ৯।১০টি। আশ্রমের স্কুলে আপাতত লোয়ার প্রাইমারি ক্লাস খুলিয়া তদুপযুক্ত পুস্তকাদি ধরানো গিয়াছে। অন্যান্য টেকনিক্যাল শিক্ষার (শিল্পবিদ্যার) সহিত ইহাদিগকে ইউনিভার্সিটি-এডুকেশনও আমরা দিব। এবং বালকগণকে রীতিমতো পরীক্ষা দিতে পাঠাইব।

"উক্ত স্কুল ছাড়া আবার একটি নৈশবিদ্যালয় (নাইট-স্কুল) খুলিয়াছি। ইহাতে আশ্রমের বড় ছেলে কয়টিকে ইংরেজী পড়াইয়া, বাকি কয়টিকে, যে যা পড়ে, পড়াইয়া, বাহিরের ৬।৭টি যুবা চাষী ছাত্রকে একটু একটু লেখাপড়া শিখাইয়া থাকি। গত মাস হইতে কয়েকটি চাষী বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নিয়মপূর্বক পড়িতে আসিতেছে দেখিয়া আমি বড়ই উৎসাহিত হইয়াছি। রাত্রে ১০।।৹টা [সাড়ে দশটা] পর্যন্ত পড়াইয়া থাকি।

"টেকনিক্যাল-এডুকেশনের মধ্যে আপাতত, তাঁতের, ছুতারের ও দরজির কাজ শিখাইতেছি। আশ্রমের ছেলেরা 'স্টীলপেনের হ্যান্ডল' অতি সুন্দর তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে। বহরমপুর শহরে ইহার বড় আদর হইয়াছে। সেদিন শহরে কতকগুলি লইয়া যাওয়াতে, তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকটি দুই পয়সা করিয়া সবগুলি বিক্রয় হইয়া গেল। কাশীমবাজারের মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া ২০০ কলমের অর্ডার দিয়াছেন। বার্নিশ করিয়া দিলে, তিনি প্রত্যেক কলম তিন পয়সা করিয়া লইবেন, বলিয়াছেন। আমরা যোগাইতে পারিলে, তাঁহার সদর ও মফঃস্বল কাছারিতে এই কলমই চালাইবেন বলিয়াছেন। আরও ২।১টি জমিদারের নিকট হইতে কলমের অর্ডার পাইয়াছি। বালকেরা একটি ছোট টেবিলের নমুনা দেখিয়া অতি সুন্দর একখানি টেবিল প্রস্তুত করিয়াছে। সেইরকম আরেকখানি টেবিলেরও অর্ডার পাইয়াছি।

"রেশম-কীট প্রতিপালন করিবার জন্য আমরা সমস্ত আয়োজন করিতেছি। বোধহয় শীঘ্রই সফল হইব।"

কোন্ পথ ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সূচনার সেই পথ-সংবাদ এখানে কিছু মিলেছে।

॥ ১১ ॥

রক্ত জল-করা পরিশ্রমে ত্রিগুণাতীত 'উদ্বোধন' পত্রিকা গড়ে তুলেছিলেন—সেই 'উদ্বোধন' তাঁকে ছেড়ে যেতে হলো—যেমন ছেড়ে যেতে হয়েছিল তাঁর জ্যেষ্ঠ এক গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে—নিজের বুক দিয়ে আগলে রাখা রামকৃষ্ণ মঠকে, যেখানে রয়েছে 'আত্মারামের কৌটা'। রামকৃষ্ণানন্দ গিয়েছিলেন মাদ্রাজে—স্বামীজীর ইচ্ছায়—শ্রীরামকৃষ্ণের বীজ নতুন এক ক্ষেত্রে বপন করার জন্য। আর ত্রিগুণাতীত গেলেন মার্কিন মুলুকে—সান ফ্রান্সিসকোয়, ঠাকুরকে বহন করে। রামকৃষ্ণ মঠ তৈরি হওয়ার পরে তার সাধুরা সাধারণ পরিব্রাজক জীবন ছেড়ে মঠ-মিশনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে পরিব্রাজক।

১৯০২ সালেই স্বামীজী ত্রিগুণাতীতকে সান ফ্রান্সিসকোয় প্রচারকার্যের জন্য পাঠাবার মনস্থ করেন; কারণ, স্বামী তুরীয়ানন্দ সেখানকার কাজ থেকে অব্যাহতি চাইছিলেন। ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিগুণাতীত সান ফ্রান্সিসকোয় পৌঁছান। সেখানে ১২ বছর কাজ করেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

তাঁর এই ১২ বছরের অদ্ভুতকর্মা জীবনের তথ্যনিষ্ঠ অথচ গভীর ভাবাত্মক কাহিনী রচনা করেছেন মেরী লুইস বার্ক (সিস্টার গার্গী) তাঁর Swami Trigunatita : His Life and Work গ্রন্থে। প্রচণ্ড কর্মশীলতা, কঠোর নিয়মনিষ্ঠা, অপরিসীম ধৈর্য, সঙ্কটে ভয়হীনতা এবং নিরন্তর সাধনা—আশ্চর্য তাঁর জীবন। সেখানে তিনি অব্যাহতভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে গেছেন, বেদান্ত আশ্রমকে দৃঢ় ভিত্তি দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, 'Voice of Freedom' নামে পত্রিকা শুরু করেছেন, নির্মাণ করেছেন 'পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দুমন্দির'। সর্বোপরি যাঁরা গ্রহিষ্ণু তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন চরিত্র ও ধর্মকে। তাঁর ধর্ম বেদান্ত। সেই বেদান্তের প্রতীক হিসাবেই নির্মাণ করেছিলেন হিন্দুমন্দির, যা কোনমতেই নিছক হিন্দুমন্দির নয়—সর্বধর্মের মহামিলনস্থান সেটি। ৭ জানুয়ারি ১৯০৬ মন্দিরটি উৎসর্গ করা হয়, সেই উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে স্বামী ত্রিগুণাতীত বলেছিলেন ঃ "এই ক্ষুদ্র স্থানটি ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গীকৃত। কোন বিশেষ মানুষ, কোন বিশেষ সমিতি, কোন বিশেষ ধর্ম, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এই মন্দির উৎসর্গ করা হয়নি—সকল ধর্মের মানুষের জীবনচর্যার স্থান এটি। এখানে পাপবাদ নেই, বিশেষ গুণের ধারণাও প্রচার করা হয় না। সকলেই এক। সকলেই ভ্রাতা ও ভগিনী—সকলের বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিকাশ-সাধনার এই ভূমি। সেই হলো এর চরম লক্ষ্য।... আপনারা সকলে সেই পরম পিতার সন্তান। আপনারা প্রত্যেকে যে সম্প্রদায়েরই হোন, আপনারা—তরুণ অথবা বৃদ্ধ, ধনী অথবা দরিদ্র, জ্ঞানী অথবা অজ্ঞান, ধার্মিক অথবা অধার্মিক, পুণ্যবান অথবা পাপী—সকলেই এখানে স্বাগত। আপনারা সকলেই ফিরে যাবেন আমাদের একমাত্র সেই পিতার কাছে, যিনি আপনাদের এখানে এনেছেন।"

সকলেই স্বাগত। ঠিক। অনেকেই আসত, থাকত, আবার ছেড়ে চলেও যেত। কারণ—ত্রিগুণাতীত একটি জায়গায় অনড় ছিলেন—সত্যে। সত্যরক্ষায় তিনি সুকঠিন। এবং নিয়মরক্ষাতেও। তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় (৩০ জানুয়ারি ১৯১৬) কার্ল পিটারসন বলেছিলেন ঃ "বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তাঁর মতো প্রচণ্ড শক্তিধর মানুষের শত্রু থাকবে। কেন? কারণ আমরা কেউ চাই না আমার বিষয়ে সত্যকথাটা বলা হোক। তা বললে আমাদের অহং ধাক্কা খায়। আর সেইখানেই পাচ্ছি স্বামী ত্রিগুণাতীতের মহান শিক্ষা—খাড়া থেকে সত্য বলবার শক্তি অর্জন কর।"

এমন মানুষকে মার খেতেই হবে। যাঁরা তাঁর সত্যকার অনুগামী তাঁদেরও বরাতে একই জিনিস জুটবে। ২৪ ডিসেম্বর ১৯১৪, ত্রিগুণাতীত তাঁর শেষ শিক্ষাদানের ক্লাসে বিশ্বস্ত ছাত্র ধীরানন্দকে বলেছিলেন ঃ "সেই সময় একেবারে কাছে এসে গেছে যখন তোমাদের ভয়ানক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে—তোমাদের সমালোচনা করা হবে, ধিক্কার দেওয়া হবে, ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, কারণ আমি দেখেছি—নানা লোকে নানাভাবে নানারকম বজ্জাতি শুরু করেছে, তোমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ঈর্ষা জেগেছে। তারা যে যা বলে বলুক, তাতে মন দিও না। কোনমতেই নিজের ঘাঁটি ছেড়ে নড়বে না। তখন অপ্রত্যাশিত মহল থেকে সাহায্য আসবে—সর্বোপরি ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন।"

জীবনের শেষ পর্বে ত্রিগুণাতীত কয়েক বছর বিশেষ অসুস্থ ছিলেন। অসহ্য যন্ত্রণা শরীরে। ঘনিষ্ঠ মানুষরা অবাক হয়ে দেখতেন, কিভাবে তিনি শরীররক্ষা করছেন। ত্রিগুণাতীত বলেছিলেন ঃ "অসহ্য যন্ত্রণার ক্ষণে কতবার ভেবেছি, শরীরটা যায় যাক। ঐ চিন্তা যখনই মনে এসেছে তখন আরেকটি চিন্তাও এসেছে—মায়ের কাজ তো থামবে না। তা এই শরীরকে টেনে টেনে যতদিন পারি মায়ের কাজ করে যাব।"

প্রভু—প্রভু—প্রভু—! মা—মা—মা—! শেষের দিকে বক্তৃতার সময় গলা কাঁপত। তার জন্য সমালোচনাও হয়েছে। অশক্ত শরীরে বক্তৃতা করতে গেলে যখন গলা কাঁপে তখন আর কেন! না, গলা সেজন্য কাঁপেনি। কেঁপেছিল অনিবার্য আবেগে। তিনি বলেছিলেন ঃ "গলার কাঁপন নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, যাতে তা শ্রোতাদের কানে না পৌঁছায়। কিন্তু ইদানীং যখন বক্তৃতামঞ্চে উঠি মহামায়া আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, এমনই স্নেহ-ভালবাসায় ভরিয়ে দেন যে, নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। দারুণ চেষ্টা করে নিজেকে সামলালেও গলার স্বরে কাঁপনটুকু থেকে যায়। একদিকে স্বর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, অন্যদিকে যে মহামাতার উপস্থিতির জন্য ভাববন্যা, তাকে সামলানো অসম্ভব।"

সুতরাং আসন্ন হয়েছিল বিদায়ক্ষণ। এবং তাঁর শেষ আশাও পূরণ হয়েছিল। 'Martyr' (শহীদ) শব্দটির অর্থ তিনি জানতেন না। সে তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে। অর্থটি বুঝিয়ে বলা হলে ত্রিগুণাতীত বলেছিলেন—তাঁর বড় ইচ্ছা 'শহীদ' হবেন।

শারীরিকভাবে শহীদ হওয়া বোধহয় 'দরকার' ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরা তাঁর কাজ করতে করতে বুকের রক্ত তুলে মরেছেন—কিন্তু আক্ষরিকভাবে শহীদ না হলে অবতারলীলার ছন্দটা পূরণ হয় না। সে-দায়টা গিয়ে পড়েছিল ত্রিগুণাতীতের ওপরে।

১৯১৪ সালের ক্রিসমাস। ঐদিন ত্রিগুণাতীত ১৫ ঘণ্টার উপাসনার ব্যবস্থা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতেও তাই করে থাকেন। ক্রিসমাসের দিন সকালে এক তরুণ শিষ্যকে বললেন ঃ "যদি আমার কিছু হয় তাহলে দেখো, মৃত্যুর পরে যেন আমার মস্তিষ্কটা নষ্ট না করে বৈজ্ঞানিকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।" ত্রিগুণাতীতের বিশ্বাস ছিল—যোগীদের মস্তিষ্কের সঙ্গে সংসারী মানুষের মস্তিষ্কের পার্থক্য থাকে, তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়বে। তাঁর এই ইচ্ছা অবশ্য পালিত হয়নি।

ক্রিসমাসে ১৫ ঘণ্টার উপাসনার অন্তে স্বামী ত্রিগুণাতীত উদ্দীপ্ত হয়ে বলেছিলেন ঃ "আমি হিন্দু—আমি নত হচ্ছি তাঁর চরণতলে যিনি মানুষের প্রতি প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।"

তিনদিন পরে, রবিবারের অপরাহ্নে তিনি যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন ভাব্‌রা নামে একটি ছোকরা প্ল্যাটফর্মের কাছে গিয়ে মাথার টুপির ভিতর থেকে কিছু একটা বার করে তিনবার সেটি আছড়ালো। তৃতীয় বারে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল—সেই জায়গাটি প্রায় চুরমার, ভাব্‌রার মৃত্যু হলো সঙ্গে সঙ্গে। স্বামী ত্রিগুণাতীত ছিটকে গিয়েছিলেন, গুরুতরভাবে আহত হন, কিন্তু মাথাটি অক্ষত থাকে। "মাথায় যে আঘাত লাগেনি, তার কারণ, মা আমার হাত ধরে ফেলেছিলেন"—ত্রিগুণাতীত বলেছিলেন।

ভাব্‌রা ছোকরাটি আশ্রমে একেবারে অপরিচিত ছিল না। কিছুদিন আগে সে অস্থিরচিত্তে ত্রিগুণাতীতের কাছে এসেছিল, কিন্তু বেশি সময় থাকেনি, শারীরিকভাবে তখনই সে ভারসাম্যহীন। কেন তার ঐ কীর্তি কিছুই জানা যায়নি।

ত্রিগুণাতীতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু বলেছিলেন : "বেচারা ভাব্‌রা, এইভাবে মরল! না, তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।"

আঘাত ও মৃত্যুর মধ্যে কয়েকদিনের ব্যবধান। যে গুরুভাই তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বড়ই বাসনা তাঁর হয়েছিল। সে-বছর (১৯১৫) স্বামীজীর জন্মতিথি পড়েছিল ১০ জানুয়ারি। ঐদিনই তাঁর শরীর যাবে—একথা বলেছিলেন সেবারত এক শিষ্যকে।

মৃত্যুর চেহারা স্বামী ত্রিগুণাতীতের অপরিচিত নয়। পথে প্রান্তরে পর্বতে অরণ্যে অনেক মৃত্যুর ঢেউ ঠেলে তিনি এগিয়েছেন। বহুদিন আগে তিব্বতে মানস সরোবরের পথে একটি মৃত্যুর সভাগৃহ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কিন্তু বড় আনন্দে সেই সময়টি কাটিয়েছিলেন। আলমোড়া থেকে যাত্রাকালে সেখানকার এক সহৃদয় মানুষ লালা বদ্রী শা তাঁকে গরম জামা, কম্বল, জুতো ও প্রয়োজনীয় নানা জিনিসপত্র দেন। একটা কুলিও সঙ্গে দেন। কঠিন পথে চলবার সময়ে বোঝার ভার দুর্বহ মনে হচ্ছিল। এধারে কুলিরও কম্বল দরকার ছিল। সে কম্বলাদি নিয়ে উধাও হয়ে গেল। ত্রিগুণাতীত স্বস্তিবোধ করলেন, বোঝার দায় থেকে মুক্তি! ভাবলেন, কুলি কেন বাকি জিনিসগুলোও নিয়ে গেল না! দুর্গম দুরারোহ পথ। সেই পথে নিজের বোঝা বয়ে তিনি ১৬ মাইল এগলেন। তারপর আর পারলেন না, বসে পড়লেন।

"রাত্রি ঘনাল—গভীর অন্ধকার কিন্তু নয়, তবে তীব্র ঠাণ্ডা।... মনোহারী তুষারশৃঙ্গ বেশি দূরে নয়। পাহাড়গুলির ওপরে অনেক উঁচুতে মাথা তুলে আছে ধব্‌ধবে শিখরগুলি। আমার চতুর্দিকে উপত্যকা ও তুষারশৃঙ্গ ছাড়া আর কিছু নেই। সুমহান দৃশ্য! নিম্নে সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে কত শুভ্র রেখা—সেগুলি পার্বত্য নির্ঝরিণীর ধারা—মনে হলো শুভ্র উপবীতধারী ব্রাহ্মণরা বসে আছেন। ওপরে অপূর্ব স্বচ্ছ নীল আকাশ—ঝক্‌ঝকে তারায় ভরা। জলপ্রপাতের মধুর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কী গম্ভীর! ধ্যানে বসলাম। প্রভু রামকৃষ্ণ ও মহামাতার ধ্যান। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ধ্যান। মুক্ত আকাশের নিচে কেটে গেল সারারাত্রি। জীবনের সবচেয়ে আনন্দের রাত্রি সেটি।"

পনের দিনের অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যেও ঐ অপার রাত্রিতে রামকৃষ্ণ ও মহামাতার ধ্যান স্বামী ত্রিগুণাতীতকে ঘিরে রেখেছিল। দেহ থেকে মুক্তি তিনি বেশ কিছুদিন চাইছিলেন। আটকে রেখেছিল 'মায়ের কাজে'র চিন্তা। মায়ের হাতের বজ্র সেই চিন্তাকে চূর্ণ করে দিল। এবার বিদায়। নেতা ও ভ্রাতা বিবেকানন্দের নির্দেশে 'উদ্বোধন' শুরু করেছিলেন ভারতবর্ষে। বিবেকানন্দেরই ভাবধারার অনুসরণে আমেরিকায় গিয়েছেন মানবের মুক্তির জন্য অনন্ত মুক্তির বাণী প্রচার করতে। সেখানে আরম্ভ করেছিলেন—'Voice of Freedom'। এবার নিজের জন্য মুক্তির বাণী শুনলেন। বিবেকানন্দের জন্মদিনটিকে

বেছেছিলেন নিজের মুক্তিদিন হিসাবে—বিবেকানন্দের কণ্ঠের সঙ্গীতটি তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল তাঁর ভিতরে—"মন চল নিজ নিকেতনে"।

১৯১৫ সালের ১০ জানুয়ারি স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহান্ত হলো।* □

[তথ্যসংগ্রহে সাহায্য করেছেন স্বামী প্রভানন্দ, শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ, শ্রীবিমলকুমার ঘোষ, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বড়াল। 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের আনুকূল্যে সম্পাদকীয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি।]

পাদটীকা

১ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ১৯৮৯, পৃঃ ১৫-১৬

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৯৬৩, পৃঃ ২১০

৩ ঐ, পৃঃ ২১৫

৪ স্বামীজী সারদাপ্রসন্নকে নিজেই 'ত্রিগুণাতীতানন্দ' নাম দিয়েছিলেন, আবার নামের বহর দেখে, অর্থাৎ নিজ কীর্তির চেহারা দেখে আঁতকে উঠে ত্রিগুণাতীতকে নিউ ইয়র্ক থেকে ১৭ জানুয়ারি ১৮৯৬ তারিখে লিখেছিলেনঃ

"তোর নামটা একটু ছোটখাট কর দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ! একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়। ঐ যে বলে হরিনামের ভয়ে যম পালায়, তা 'হরি'—এই নামে নয়। ঐ যে গম্ভীর গম্ভীর নাম, 'অঘভগনরকবিনাশন, ত্রিপুরমদভঞ্জন, অশেষনিঃশেষকল্যাণকর' প্রভৃতি নামের গুঁতোয় যমের চৌদ্দপুরুষ পালায়।—নামটা একটু সরল করলে ভাল হয় না কি? এখন বোধহয় আর হবে না, ঢাক বেজে গেছে, কিন্তু কি জাঁহাদারি যমতাড়ানে নামই করেছ!" (বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২১৫)

'ত্রিগুণাতীতানন্দ' নাম থেকে 'আনন্দ' ছেঁটে দিয়ে কেবল 'ত্রিগুণাতীত' হয়েছিলেন।

৫ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১০

৬ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১৯৬৩, পৃঃ ৪৬৫-৪৬৬

৭ এই লেখা-দুটি সঙ্কলিত হয়েছে মেরী লুইস বার্ক প্রণীত "Swami Trigunatita : His Life and Work" গ্রন্থে। (দ্রঃ ১৯৯৭ সং, পৃঃ ৪৬, ৩৩৫-৩৬২)

৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, পৃঃ ৫১

৯ ঐ, পৃঃ ৫৬-৬৩

১০ ঐ, পৃঃ ৯৭

স্বামীজীর আবেদনে সাড়া দিয়ে মিস ম্যাকলাউড আটশ ডলার দিয়েছিলেন এবং তাতে 'উদ্বোধন'-এর প্রেস কেনা হয়েছিল—একথা মিস ম্যাকলাউড তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন। (দ্রঃ Reminiscences of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, 1961, p. 245)

মেরী লুইস বার্ক তাঁর ত্রিগুণাতীত-জীবনীতে 'উদ্বোধন'-এর জন্য মিস ম্যাকলাউডের আটশ ডলার দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করলেও যেন ঈষৎ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—ঐ টাকায় প্রেস কেনা হয়েছিল কিনা! (তাঁর রচনা বুঝতে আমাদের ভুল হতে পারে।) সন্দেহের কারণ হিসাবে তিনি শচীন্দ্রনাথ বসুর রচনার উল্লেখ করেছেন (সে-রচনাটি কিছু পরেই উদ্ধৃত করব), যাতে স্বামীজী ত্রিগুণাতীতকে এক হাজার টাকা দিয়ে বাকি প্রয়োজনীয় এক হাজার টাকা ধার করতে বলেন। এক্ষেত্রে স্বামীজীর দেওয়া ঐ হাজার টাকা মিস ম্যাকলাউডের দেওয়া টাকা হতে বাধা কোথায়? স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা স্বামীজীর চিঠিতে পাই (পরে উদ্ধৃত হবে) তিনি 'উদ্বোধন'-এর জন্য বারশ টাকা দিয়েছিলেন। জানি না, তখনকার মুদ্রামানে আটশ ডলার কত টাকা হতো? তা কি বারশ টাকা হওয়া সম্ভব? মনে হয় তা আরো বেশি।

১১ ঐ, পৃঃ ৫৩

১২ ঐ, পৃঃ ৫৩-৫৪

১৩ 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪

১৪ 'উদ্বোধন', ৫০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৫, পৃঃ ৩৯৪

১৫ 'সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৪-২০৫

১৬ বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'সমকালীন ভারতবর্ষ'-এর ৫ম খণ্ডের ২০৫-২৩৪ পৃষ্ঠা পঠিতব্য।

১৭ 'সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের ২১২-২১৬ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

* ১০০ বর্ষ, ১ সংখ্যা

‘উদ্বন্ধন’ থেকে ‘উদ্বোধন’

স্বামী চেতনানন্দ

।। “উদ্বন্ধন দেখেছিস?” ।।

‘উদ্বন্ধন’ মানে ‘গলায় দড়ি’ বা ‘ফাঁসি’। উদ্বন্ধনে মৃত্যু মানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করা বা অপরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা। ‘উদ্বোধন’ মানে উদ্দীপন, স্মৃতিজনন, বোধ বা চেতনা-সঞ্চারণ। ‘উৎ’ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বিষয়ে বোধন—জাগরণ। এই অর্থে ‘উদ্বোধন’। ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের ব্যঙ্গোক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে স্বামীজী শরৎ চক্রবর্তীকে বলেন ঃ “উদ্বন্ধন দেখেছিস?”

নিত্যমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ স্বামীজীর কাছে জগৎ অলীক স্বপ্নসদৃশ, মানুষের বন্ধনও মায়িক, অসত্য। সাধারণ মানুষের কাছে জগৎ সত্য, সংসারের সুখদুঃখ সত্য; অথচ ব্রহ্মজ্ঞের কাছে তা তুচ্ছ কাল্পনিক। শিশুর কাছে পুতুলের বিয়ে সত্য, কিন্তু বাপমায়ের কাছে তা শিশুর খেলামাত্র। ব্রহ্মজ্ঞ স্বামীজীর নিকট এই জীবজগৎ মায়ার খেলা, তাই তাঁর পক্ষে ব্যঙ্গ করা শোভা পায়। একবার মন্মথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বামীজীকে বলেন ঃ “আপনি তো মায়ার মধ্যে রয়েছেন। আপনার মঠ, স্কুল, দরিদ্রসেবা—এসবও তো মায়া।” স্বামীজী হেসে বললেন ঃ “হ্যাঁ। তুই ঠিক বলেছিস। আমি মায়ার মধ্যেই রয়েছি। তবে আমি মায়ার সঙ্গে খেলা করছি। যে-মুহূর্তে ইচ্ছা হবে—এই খেলা ছেড়ে দেব।”[১]

এই জগতের মায়াজালে পড়ে মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে। মহাভারতের স্ত্রীপর্বে ভবাটবীর বর্ণনা আছে ঃ এক ব্রাহ্মণ গভীর অরণ্যে হিংস্র পশুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণভয়ে পলায়ন করতে গিয়ে তৃণলতাদিতে পূর্ণ এক কূপে পতিত হন। তিনি ঐ লতা ধরে কূপের মাঝে মাথা নিচে ও পা ওপরে রেখে ঝুলতে থাকেন এবং দেখেন, নিচে মহাসর্প ও ওপরে হিংস্র জন্তু। কূপের ওপর এক বৃক্ষশাখার মৌচাক থেকে ঐ ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ব্রাহ্মণের মুখে মধু ঝরতে লাগল। সেই মধু খেয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ঐ ব্রাহ্মণ দিনযাপন করতে লাগলেন। একেই বলে সংসার! মানুষ আশালতা ধরে কামরস পান করতে করতে মৃত্যুর মধ্যে দিন কাটায়।

স্বামীজী মানুষকে ‘উদ্বন্ধন’ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ‘উদ্বোধন’ সৃষ্টি করেন। তাঁর বক্তৃতা, পত্রাবলী, কবিতা, প্রবন্ধ ও কথোপকথনের একটি প্রধান সুর—“কাটো মায়ার বন্ধন”; “ভেঙে ফেল শীঘ্র চরণ-শৃঙ্খল”। কী করে মায়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, সে-বিষয়ে স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডকে একটি গল্প বলেন এবং তা তাঁর মনে খুব রেখাপাত করে। পরবর্তী কালে মিস ম্যাকলাউড গল্পটি বিখ্যাত লেখক নিকোস ক্যাজান্টজাকিসকে বলেন এবং তিনি তাঁর ‘ইংল্যান্ড’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন ঃ “কোন এক সময়ে এক ব্যাধ বহু ঘুঘু ধরে এক বিরাট জালে আবদ্ধ করে রেখেছিল। তখন ঘুঘুগুলি নিজেদের দেহ সঙ্কুচিত করে জালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তাদের দেহের আয়তন বড় থাকায় পারল না। তারা নিয়তির হাতে নিজেদের

ছেড়ে দিল। প্রতিদিন ব্যাধ এসে পাখিদের প্রচুর খাবার দিত, যাতে তারা শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট হয়। তাহলে সে তাদের বধ করে মাংস বিক্রি করতে পারবে। ঘুঘুগুলি গোগ্রাসে খাবার খেত। তারা জানত না যে, তারা যত বেশি খাবে তত মোটা হবে। এদের মধ্যে একটি ঘুঘু আহার থেকে বিরত হয়েছিল এবং সে দিন দিন ক্ষীণ হতে লাগল। অবশেষে একদিন সে জালের ফাঁক দিয়ে গলে উড়ে পালিয়ে গেল।"[২]

।। 'উদ্বোধন'-এর উদ্দেশ্য ।।

গত একশ বছর ধরে বহু সম্পাদক ও লেখক 'উদ্বোধন' পত্রিকার জীবনোদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত লিখেছেন। স্বামীজী 'উদ্বোধন'-এর 'প্রস্তাবনা'তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনা করে লিখেছেন ঃ "এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধন'-এর জীবনোদ্দেশ্য।" স্বামীজী ঐ প্রস্তাবনাতে আরেকটি প্রফেটিক উক্তি করেছেন ঃ "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" ভা = জ্যোতি, রত = মগ্ন। যে-দেশ আত্মজ্যোতিতে মগ্ন সেই দেশের পরাধীনতা ও দুরবস্থা দেখে স্বামীজী লিখলেন ঃ "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈত্রিক শক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।" 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন জাতীয় সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে দিতে। পত্রিকার প্রচ্ছদপটে যে-বাণীটি মুদ্রিত হয়ে আসছে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—সেটিও তিনি নির্বাচিত করে দেন।

দুনিয়া ঘুরে স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন যে, বক্তৃতা স্থায়ী নয়; লোকে শোনে আবার ভুলে যায়। কিন্তু পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ করলে তা বহুকাল ধরে চলে। তাই তিনি জীবদ্দশায় তিনটি পত্রিকা প্রবর্তন করেন—'Brahmavadin', 'Prabuddha Bharata' এবং 'উদ্বোধন'। 'ব্রহ্মবাদিন' মাদ্রাজে কয়েক বছর চলে বন্ধ হয়ে গেল। 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রথম মাদ্রাজ থেকে বের হয়; শেষে ১৮৯৮ সালের আগস্ট থেকে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে বের হয়। এইসব পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির বাণী প্রচারিত হয়।

'উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনা ও motto লিখেই স্বামীজী ক্ষান্ত হননি, এই পত্রিকার জীবনোদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছেন ঃ " 'উদ্বোধন'-এ সাধারণকে কেবল positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। Negative thought (নেতিবাচক ভাব) মানুষকে weak (দুর্বল) করে দেয়। দেখছিস না, যেসকল মা-বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, বলে—'এটার কিছু হবে না, বোকা, গাধা'; তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে, উৎসাহ দিলে সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাবরাজ্যের উচ্চস্তরে যারা শিশু, তাদের) সম্বন্ধেও তাই। Positive ideas (গঠনমূলক ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প—সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐসব বিষয়ে কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরো ভাল রকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের feeling wounded (মনে আঘাত দেওয়া)

হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অদ্ভুত!

"ধর্মপ্রচারটা কেবল যাতে-তাতে, যার-তার ওপর নাক-সিঁটকানো ব্যাপার বলে যেন বুঝিসনি। Physical, mental, spiritual (শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক)—সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে, কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না করে করেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive thought (গঠনমূলক চিন্তা) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে ঐরূপে সমস্ত জাতটাকে তুলতে হবে, তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই এই। তিনি জগতে কারো ভাব নষ্ট করেননি। মহা অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণ করে সকলকে তুলতে হবে, জাগাতে হবে। বুঝলি?

"তোদের history, literature, mythology (ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণ) প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে! মানুষকে কেবল বলছে—'তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নেই।' তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেইজন্য বেদ-বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। 'উদ্বোধন' কাগজে এইসব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে তোল দেখি। তবে জানব, তোর বেদ-বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। কি বলিস—পারবি?"[৩]

সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'উদ্বোধন'-এর জীবনোদ্দেশ্য লিখলেন : "আজ 'উদ্বোধন' নববর্ষে প্রবেশ করিলেন। গত মাঘের প্রথম দিবসে শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। 'দেবগুরু-প্রসাদে' এই এক বৎসরের মধ্যে বঙ্গের প্রায় সকল স্থলেই এবং ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশেই বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন, অনেক সহৃদয় মহাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন।...

" 'উদ্বোধন'-এর উদ্দেশ্য কিছু নিম্নশ্রেণীর নহে; আবশ্যকীয় প্রসুপ্ত গুণাবলীকে জাগ্রত করিয়া দেবার চেষ্টা করাই 'উদ্বোধন'-এর কার্য। প্রয়োজনীয় যেসকল গুণাবলী স্বদেশে নাই তাহার আনয়ন করিতেই 'উদ্বোধন'-এর আয়াস। নিঃস্বার্থভাবে পরহিতসাধনাই ইহার জীবনোদ্দেশ্য।...

"অতি মহৎ উদ্দেশ্য সহকারে 'উদ্বোধন' জনসমাজে শুভযাত্রা করিয়াছেন। কামনা—পরহিত;—না, 'পর' নহে, স্বজাতির, স্বদেশের—নিজের অভিন্ন বন্ধুবর্গের হিতকামনা। সমভিব্যাহারে সম্বল—একমাত্র নিঃস্বার্থতা। বিশ্বাস—সেই সম্বলেই কৃতকার্য হইবে, স্বদেশের প্রভূত উপকার করিবে। সৎকার্যে নানা বিঘ্ন, বিপদ প্রতিপদে, কেবল সহায়—পরমবন্ধু ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। ভরসা—উদ্যম। প্রসাদ—জগদীশ্বরের শ্রীচরণাশীর্বাদ। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"[৪]

নবজাত শিশু যেমন বহু চেষ্টা ও বহু পতনের পর হাঁটতে শেখে, 'উদ্বোধন' তেমনি নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে ত্রস্ত পদে চলতে শুরু করল। স্বামী সারদানন্দ 'উদ্বোধন'-এর পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় লিখলেন : "হে পাঠক! 'উদ্বোধন' পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্ত্ব বা

ব্রহ্মশক্তি বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়নিহিত রজঃ বা ক্ষত্রশক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরকল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিতেছে। সেইজন্য আপাতত শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবয়স্ক হইলেও অমিত বলশালী এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর।"

।। "তোরা সব লেখ" ।।

'উদ্বোধন'কে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার জন্য স্বামীজী উঠেপড়ে লাগলেন। নিজের শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও প্রবন্ধ লিখলেন। মরী থেকে ১১।১০।১৮৯৭ তারিখে স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন ঃ "সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) বেচারীকে অনেক গাল দিয়েছি। কি করব?... আমি গাল দেই; কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে।... আমি হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর article (প্রবন্ধ) লিখেছি।" খুব সম্ভব এই প্রবন্ধ 'উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনা। প্রথম সংখ্যাতে স্বামী শুদ্ধানন্দ-কৃত স্বামীজীর রাজযোগের অনুবাদ শুরু হলো; স্বামী ব্রহ্মানন্দ 'পরমহংসের উপদেশ' সংগ্রহ করলেন; স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মুকুন্দমালাস্তোত্রের অনুবাদ ও স্বামী সারদানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক সভার বক্তৃতার সারাংশ ছাপা হলো। স্বামীজী গুরুভাই, শিষ্য ও ভক্তদের উৎসাহ দিয়ে ঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধাদি লিখতে অনুরোধ করেন।

তিনি শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বললেন ঃ "এই পত্রের ('উদ্বোধন'-এর) ভাব, ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই, অধিকন্তু বাঙলা ভ . তন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করলে ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb-এর (ক্রিয়াপদের) ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই ঐরূপ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর। আমায় আগে দেখিয়ে তবে 'উদ্বোধন'-এ ছাপতে দিবি।"[৫]

বাঙালীদের ভাবপ্রবণতা ও দৃঢ়তার অভাব দেখে স্বামীজী শরৎবাবুকে বলেছিলেন ঃ "তোরা একটু বাধা পেলে, একটু criticism (নিন্দা) শুনলেই দুনিয়া আঁধার দেখিস।"[৬] একথা রূঢ় সত্য। 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায় কিরণচন্দ্র দত্ত 'কারিষ্টু' নামে এক ফরাসী গল্প ইংরেজী থেকে বাঙলাতে অনুবাদ করেন। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কঠোর সমালোচনা করে বলেন ঃ "ভাষার দারিদ্র্যে গল্পটি মাটি হইয়া গিয়াছে।" ঐ সমালোচনা পড়ে কিরণচন্দ্র দত্ত 'উদ্বোধন'-এ লেখা বন্ধ করেন। ব্রহ্মগোপাল দত্ত তাঁর বাবার স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন ঃ "ইহার কিছুদিনের মধ্যে তিনি [কিরণচন্দ্র] বেলুড় মঠে গিয়াছেন—তখন কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ভক্তগণকে লইয়া স্বামীজী পাদচারণা করিতেছিলেন—সঙ্গে ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজও আছেন। কিরণচন্দ্র প্রণাম করা মাত্র ত্রিগুণাতীত স্বামীকে স্বামীজী বলিলেন, 'হ্যাঁরে, কিরণের লেখা কয়েক মাস দেখছি না কেন?' তিনি উত্তরে বলিলেন, 'এই দেখ না—ওর একটি লেখা কমাস আগে বেরিয়েছিল, সুরেশ সমাজপতি তার তীব্র সমালোচনা করেছে। তাই ও লেখা বন্ধ করেছে আর লিখছে না।' পথ চলিতে চলিতে কথা কহিতেছিলেন। ত্রিগুণাতীত স্বামীর কথা শোনামাত্র স্বামীজী পিছনের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন ও সিংহবিক্রমে কিরণচন্দ্রকে বলিলেন, 'দ্যাখ, আমরা ভাবরাজ্যের ঐরাবত। ভাবের সমুদ্র তোলপাড় করে দিয়ে চলে

যাব। ভাষা ব্যাটারা গড়ে নিক। আমরা ভাষা দিতে আসিনি; বাঙলা ভাষার এখনো গঠনের যুগ। ঐরকম গল্প, ত্যাগ, বৈরাগ্য, আত্মোৎসর্গের আদর্শ যেকোন ভাষায় পাবি তর্জমা করে দিবি।' সারদা মহারাজকে বলিলেন, 'কিরণের লেখা যেন ছাপা হয়।'"[৭]

।। প্রথম সম্পাদক ।।

কোন বস্তু গড়া কঠিন, ভাঙা সহজ। গড়া জিনিস চালানো সহজ। স্বামীজী বলতেন ঃ "তোরা সব দাগা বুলো।" স্বামীজীর ভাবাদর্শকে রূপ দিলেন প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। 'উদ্বোধন'-এর জন্য এই ধনীর সন্তান কী অমানুষিকভাবে দেহের রক্ত জল করেছেন, তার কাহিনী শুনলে বিস্ময় জাগে। তিনি বিনা অভিজ্ঞতায় প্রেস কেনেন এবং চালান; বস্তিতে ঘুরে কর্মী যোগাড় এবং তারা অসুস্থ হলে নিজে তাদের সেবা ও টাইপ সেট করতেন; নিজের প্রবন্ধ লেখা ও লেখকদের বাড়িতে গিয়ে প্রবন্ধ যোগাড় করতেন; অফিসের কাজ করে ঘুরে ঘুরে পত্রিকার গ্রাহক যোগাড় করতেন; রাতে এক ঘণ্টা ঘুমাতেন এবং ক্লান্ত দেহে যাতে ঘুমিয়ে না পড়েন তার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রুফ দেখতেন; সকাল-সন্ধ্যায় দুটি মুড়ি চিবিয়ে এবং দুপুরে এক ভক্তবাড়িতে একবেলা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন; কম্বুলেটোলায় প্রেসে কাজ করে রাতে বলরাম-মন্দিরে শুতেন (তখন 'উদ্বোধন'-এর বাড়ি হয়নি); পয়সা বাঁচাবার জন্য ট্রামে না উঠে দিনে দশ-বার মাইল হেঁটে কাজ চালাতেন। কারণ, স্বামীজীর নির্দেশ ছিল পত্রিকার জন্য গচ্ছিত টাকার একটা পয়সাও পত্রে ব্যয় ভিন্ন অন্য কোন ক্ষেত্রে খরচ করা যাবে না। নেতার আদেশ ত্রিগুণাতীত বর্ণে বর্ণে পালন করেছিলেন। ত্রিগুণাতীতের অর্থ ও লোকবল ছিল না; তাঁর মূলধন ছিল—আন্তরিকতা, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সর্বোপরি ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শে সীমাহীন ভালবাসা। গুরুর কৃপায় তিনি একাই ছিলেন একশ; অবশ্য পরে স্বামী শুদ্ধানন্দকে তাঁর সহকারী করা হয়।

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ত্রিগুণাতীতের কষ্ট দেখে স্বামীজীকে বলতে বাধ্য হয়েছেন ঃ "মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন—তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।... গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীর গৃহীদের দ্বারে দ্বারে ঐরূপে ঘোরা আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে।"[৮]

'উদ্বোধন'-এর প্রথম সংখ্যা বের হলো ১ মাঘ ১৩০৫ সাল (১৪ জানুয়ারি ১৮৯৯)। রামকৃষ্ণ মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে। ত্রস্ত ত্রিগুণাতীত নিজে না গিয়ে স্বামী শুদ্ধানন্দকে দিয়ে 'উদ্বোধন'-এর প্রথম কপি স্বামীজীকে পাঠান। পরবর্তী কালে স্বামী শুদ্ধানন্দের কাছে শুনে স্বামী অশোকানন্দ বলেছিলেন ঃ "স্বামীজী কর্ম ব্যাপারে একটা উচ্চ মান (high standard) ঠিক করে দিতেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের ভীষণ সমস্যা ছিল—ঐ মানের সমপর্যায়ে না উঠলে স্বামীজীর কাছ থেকে কোন রেহাই পেতেন না। কাজটি ঠিকমত হলে—বেশ; কিন্তু ভুল করলে স্বামীজী তীব্র ভাষায় নির্দয়ভাবে তিরস্কার করতেন। অবশ্য সকলের প্রতি তাঁর হৃদয় প্রেম ও সহানুভূতিতে উপচে পড়ত। তিনি চাইতেন যে, প্রত্যেকে একটা কিছু সাফল্য বা অভীষ্ট বস্তু লাভ করুক; এবং তিনি কখনো আদর্শের মান নিচু করতে দিতেন না।"[৯]

কিছুদিন বাদে স্বামীজীর 'উদ্বোধন' পড়া হলে তাঁর অভিমত জানবার জন্য ত্রিগুণাতীত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে পাঠান। তিনি স্বামীজীকে জানান ঃ স্বামী

ত্রিগুণাতীত ঠাকুরের ছবি প্রেসে পূজা করে তবে কাজ আরম্ভ করলেন এবং কার্যের সফলতার জন্য আপনার কৃপা প্রার্থনা করলেন। স্বামীজী শুনে বললেন : "আমাদের centre (কেন্দ্র) তো ঠাকুরই।... কৈ, আমায় তো পুজোর কথা কিছু বললে না।... তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব খুশি হয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি তাকে সাহায্য করিস। ওতেই ঠাকুরের কাজই করা হবে।"[১০] তারপর তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে 'উদ্বোধন'-এর জন্য আরো টাকা দিতে আদেশ করলেন।

কথায় বলে—শাসন করা তারই শোভা পায় যে ভালবাসে। স্বামীজীর বকুনি গুরুভাইরা অল্পবিস্তর সবাই খেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন যে, স্বামীজীর মধ্যে বিন্দুমাত্র স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ বা ঘৃণা নেই। তিনি তাঁদের গুরুনির্বাচিত নেতা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও হিতৈষী। তাঁর বকুনি আশীর্বাদ, অপার্থিব ভালবাসায় সম্পৃক্ত ও সকলের পক্ষে মঙ্গলকর। তাঁর রাগ জলের দাগের মতো। তিনি চাইতেন perfection—"আমার কাজ বিদ্যুতের মতো শীঘ্র, আর বজ্রের মতো অটল চাই।"[১১] কর্মে ত্রুটি হলে কঠোর তিরস্কার। মানুষ গড়তে হলে দোষ শোধরাবার জন্য কঠোর শাসন, উৎসাহ দেওয়ার জন্য কোমল প্রেমপূর্ণ ব্যবহার—এই উভয় প্রক্রিয়াই প্রয়োজন। বর্তমানে এ দুটিরই বড় অভাব।

'উদ্বোধন' ঠিক সময়ে প্রকাশ না হলে বা প্রুফ দেখতে ভুলত্রুটি হলে স্বামীজী ত্রিগুণাতীতকে গালাগালি করতেন। প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় স্বামীজী-লিখিত ম্যাক্সমুলার-কৃত "রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি" ছাপা হলো। স্বামীজী দেখলেন কয়েকটা বানান ভুল, ভাঙা টাইপ ইত্যাদি। ব্যস! তারপর কি হলো?

প্রত্যক্ষদর্শী কুমুদবন্ধু সেন লিখেছেন : "শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়াই 'উদ্বোধন'-এ তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, 'কিরকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয়, তাতো বুঝতে চাও না।' স্বামীজী বলিলেন, 'ওসব কথা রেখে দে—তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে। ওদেশে কম্পোজিটাররাও বিদ্বান নয়—যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। এদেশে দেখি ছাপা হলেই হলো—তাতে ভুলত্রুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের এদিক-ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারে উলটে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়। তোরা কাগজে যদি ভুল-ভ্রান্তি ছাপবি—তবে উন্নতিটা কি হলো বল?' স্বামী ত্রিগুণাতীত নিরুত্তর রহিলেন।"[১২]

সময় সময় স্বামীজী গুরুভাইদের সঙ্গে রঙ্গ করতেন। ঠাট্টার ভিতর দিয়ে তিনি সকলের সুপ্ত চেতনা জাগাতেন—"তোদের কি আবার মন, ও তো ছটাক! তোদের কি আবার হৃদয়, ও তো ধুকধুকি!"[১৩] তিনি জানতেন যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন, তাই গুরুভাইদের ওপর মঠ-মিশনের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। একবার ত্রিগুণাতীত স্বামীজীর কাছে এসে বলেন যে, প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও শরৎ চক্রবর্তী উভয়েই 'উদ্বোধন'-এর জন্য গীতার

বঙ্গানুবাদ করেছেন, তার কোনটি প্রকাশিত হবে? স্বামীজী বললেন : "এটা এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয় যে, তার মীমাংসার জন্য তোদের এখানে ছুটে আসার দরকার ছিল। এইটুকু বুদ্ধিবিবেচনা খরচ যদি না করতে পারিস, তবে তোরা কি করে কাজ চালাবি? এই দেখ দেখি, নিবেদিতা কেমন নিজের মাথা খাটিয়ে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যাচ্ছে—আমাকে একবারও বিরক্ত করে না।" অবশ্য শেষে তিনি প্রমথনাথের অনুবাদই প্রকাশ করতে বলে দেন।[১৪]

জীবনীকার প্রমথনাথ বসু লিখেছেন : "স্বামীজী মিশন হইতে প্রকাশিত পত্রিকাদির মতামত ও প্রবন্ধসমূহের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। সর্বদা দেখিতেন, যেন তাহাতে তাঁহার প্রচারিত মতের কোন বিরুদ্ধ কথা না লিখিত হয়। একবার কোন প্রসিদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তি কর্তৃক উহাতে এক সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, স্বামীজী তাহাতে বিশেষ রুষ্ট হইয়াছিলেন। আরেকবার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির মৃত্যু উপলক্ষে একটি সুবৃহৎ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল ও শোকপ্রকাশের অন্যান্য উপকরণের কিছু আধিক্য ছিল। স্বামীজী তাহা পাঠ করিয়া মহা বিরক্ত হন এবং তৎক্ষণাৎ সম্পাদককে ডাকাইয়া আনিয়া ওরূপ অসার আক্ষেপোক্তি দ্বারা কাগজ বোঝাই করার জন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। আরেক সময়ে উক্ত সম্পাদক সমাজসংস্কার বিষয়ে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। সেবারও সংস্কারবাদীদের যন্ত্রস্বরূপে আপনাকে নিয়োগ করাতে তিনি স্বামীজীর তিরস্কারের পাত্র হইয়াছিলেন।"[১৫]

এই শেষোক্ত ঘটনাটি প্রসঙ্গে স্বামী শুদ্ধানন্দ ক্যারাফ্রেঞ্চকে বলেছিলেন যে, স্বামীজীর বকুনি খেয়ে "স্বামী ত্রিগুণাতীত কেঁদে ফেললেন। তারপর স্বামীজী তাঁকে প্রসাদ খেতে দিলেন। তখন দেখা গেল ত্রিগুণাতীতের এক চোখে জল, আরেক চোখে হাসি।"[১৬]

আরেকবার ত্রিগুণাতীত জ্বর-গায়ে বলরাম-মন্দিরে এসে সকলের সামনে স্বামীজীর কাছে প্রেস বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। স্বামীজী তো রেগে আগুন! দীর্ঘক্ষণ ধরে গাল দেওয়ার পর স্বামীজী বললেন তাঁর কঠোর সংগ্রাম ও সিদ্ধির কথা। তখন ত্রিগুণাতীত বিনীতভাবে বললেন : "ভাই, তোমার brain-টা আমায় দিতে পার?" সবাই হেসে ফেলল। তারপর স্বামীজী যখন শুনলেন যে, ত্রিগুণাতীত জ্বরে ভুগছেন এবং একসের রাবড়ি, আধসের কচুরি ও তদুপযুক্ত তরকারি খেয়েছেন, তখন তিনি হোহো করে হেসে বললেন : "শালা! তোর stomach-টা দে দেখি—দুনিয়াটার চেহারা একেবারে বদলে দি।"[১৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের এসব প্রেমপূর্ণ মধুর কাহিনী পড়লে বা শুনলে মনে হয় তাদের কর্মে কোন আসক্তি ছিল না। তাঁরা দেখিয়ে গেছেন কিভাবে নিরাসক্ত হয়ে, অহং বিসর্জন দিয়ে ও ফলাকাঙ্ক্ষা না করে কর্ম করতে হয়। বেদান্তে মুক্তপুরুষদের কর্মকে কর্মাভাস বলে। এ-কর্মে আসক্তি নেই, দুঃখ-দুশ্চিন্তা নেই বা কোন উদ্বেগ নেই। তাঁরা ভগবদ্বুদ্ধিতে কর্ম করে প্রকৃত আনন্দ পান। স্বামীজী ত্রিগুণাতীতকে খুবই স্নেহ করতেন এবং অপরের কাছে তাঁর প্রশংসা করে বলতেন : "খুব অদ্ভুত লোক, মোটে তাতে না।"[১৮]

।। 'উদ্বোধন'-এ স্বামীজীর আত্মজীবনী ও শেষ লেখা ।।

মহাপুরুষদের জীবনচরিত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা ভক্তশিষ্যদের কাছে অথবা স্বলিখিত আত্মজীবনী বা উপদেশ-প্রবন্ধাদির মাধ্যমে নিজেদের জীবনরহস্য অর্থাৎ তাঁরা নিজ জীবনে কি শিখেছেন, কিভাবেই বা শিখেছেন—তার একটা ইঙ্গিত দিয়ে যান। অবশ্য আজকাল একটা ঢং শুরু হয়েছে। বড় হতে গেলে নিজেকে প্রচার করতে হয়, পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না দিলে লোকে জানবে কি করে? অনেক ধর্মপ্রচারক এখন যোগী, যোগিরাজ, সদ্‌গুরু, মা, মাতাজী, মহারাজজী প্রভৃতি নিজেদের 'title' নিজেরাই বেছে নেন। কেউ কেউ আত্মজীবনী লেখেন বা শিষ্যদের দ্বারা লেখান। আমাদের এক বন্ধু মজা করে বলেন ঃ "আমেরিকায় অবতার হতে গেলে মাত্র তিনজন fanatic disciple চাই। তারাই ঘোষণা করে দেবে তাদের গুরু অবতার।"

স্বামীজীর জীবনী ও বাণীর পাঠকরা জানেন, তিনি কোনদিন আত্মপ্রচার বা গুরুপ্রচার করেননি এবং আত্মজীবনীও লেখেননি। তাঁর মুখ থেকে প্রায়ই শোনা যেত—"অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোররৌরবম্। প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ ।।" এই শাস্ত্রোক্তি তিনি শিষ্যদের স্মরণ করিয়ে দিতেন। নাম-যশ অধ্যাত্মজীবনে মহাশত্রু।

১৯০৪ সালের ১০ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে একটি সভা হয়। সেই সভায় ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর শিক্ষা কি ছিল সে-বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন ঃ "তিনি (স্বামীজী) কি চাহিতেন, তাঁহার নাম লোকে গান করুক? না, আমরা জানি, তিনি নাম-যশ প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি কি চাহিতেন, তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম চতুর্দিকে প্রচারিত হউক? না, তিনি তাহাও চাহিতেন না। তিনি কি চাহিতেন, তাঁহার বিশেষ উপদেশ বা কার্যপ্রণালী সকলে অনুসরণ করুক? না, তিনি তাহাও চাহিতেন না। তবে তিনি চাহিতেন কি? তিনি চাহিতেন, সকলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াক, মানুষ হউক।"[১৯]

যাহোক, 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় স্বামীজীর "সখার প্রতি" কবিতা প্রকাশিত হয়। ঐ কবিতাই স্বামী শুদ্ধানন্দের মতে স্বামীজীর আত্মজীবনী। 'উদ্বোধন'-এর পঁয়ত্রিশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় তিনি "সখার প্রতি" কবিতা অবলম্বনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভাষ্য রচনা করে 'কি শিখিলাম?' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি বর্তমানে "স্বামী শুদ্ধানন্দ ঃ জীবনী ও রচনা" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ঐ কবিতায় স্বামীজী মায়াময় সংসারের একটি নগ্ন চিত্র তুলে ধরেছেন এবং ী, স্বার্থপর মানুষকে কর্মপাশ গলায় বাঁধা ক্রীতদাসরূপে দেখেছেন। সম্বন্ধে বলেছেন—বিদ্যাহেতু অর্ধেক আয়ুঃক্ষয় করেছেন। প্রেমহেতু উন্মাদের মতো প্রাণহীন ছায়াকে ধরতে গিয়েছেন; ধর্মের জন্য কখনো গঙ্গাতীরে, কখনো শ্মশানে, কখনো পর্বতগহ্বরে কাটিয়েছেন; অসহায়, ছিন্নবাস, ভিক্ষাবৃত্তি ও তপস্যার দ্বারা শরীর নষ্ট করে তিনি কি লাভ করলেন? তিনি সকলকে তাঁর 'মরমের কথা' শোনালেন যে, তিনি 'প্রেম তরী' আবিষ্কার করেছেন—যা মানুষকে ভবসাগর পারাপার করে। তিনি দেখেছেন, সেই সর্বব্যাপী প্রেম, জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূতপ্রেত, পশুপক্ষী, কীটের মধ্যে। চার যোগেই প্রেমের বিস্তার। যে-প্রেম মাকে পুত্রের জন্য প্রাণবিসর্জন করায়,

আবার সেই একই প্রেম দস্যুকে পরস্বাপহরণে প্রবৃত্তি যোগায়। এই প্রেমের যথার্থ স্বরূপ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর। শাস্ত্রে রয়েছে তার ইঙ্গিত—"স ঈশ্বরঃ অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপঃ"। প্রেমের প্রেরণায় পতঙ্গের অগ্নিশিখা আলিঙ্গনের ন্যায় তিনি মানুষকে স্বার্থহীন প্রেম অবলম্বন করতে বলেছেনঃ "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়/মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।/বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর/জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখেছেনঃ "এই বিশ্বগ্রাসী প্রেমই তাঁহাকে পাশ্চাত্যদেশে লইয়া গিয়া বেদান্ত প্রচার করাইয়াছিল, ইহাই তাঁহাকে ভারতের সর্বত্র ঘুরাইয়া নানা মঠ আশ্রম সেবাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিল। এই প্রেমই মূর্ত হইয়া তাঁহার কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগাদি গ্রন্থে শব্দরূপ ধারণ করিয়া এখনও জীবের হৃদয়ে সান্ত্বনা দিতেছে।"[২০]

'উদ্বোধন'-এ স্বামীজীর জীবদ্দশায় শেষ লেখা 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ'। 'উদ্বোধন'-এর চতুর্থ বর্ষের নবম সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় (১ আষাঢ় ১৩০৯); স্বামীজীর শরীর যায় ২০ আষাঢ়। অবশ্য 'ভাববার কথা' পুস্তকের পাদটীকায় রয়েছেঃ "এই প্রবন্ধটি 'হিন্দুধর্ম কি?' নামে ১৩০৭ (ভুলক্রমে ১৩০৪ রয়েছে) সালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চষষ্ঠিতম জন্মোৎসবের সময় পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।"

যাই হোক, ১৯০২ সালের মার্চ মাসে কাশী থেকে ফিরে স্বামীজীর শরীর ভালমন্দে চলছিল। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় ইঙ্গিত করেছিলেনঃ "একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমার মধ্যে জেগেছে এবং আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।"[২১]

এই শেষ প্রবন্ধটি একটি মূল্যবান দলিল। ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীরা যাতে কোন নতুন নতুন সম্প্রদায় (sect) না গড়তে পারে, তার ইঙ্গিত এই প্রবন্ধে আছে। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা আঠার দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, খ্রীস্টের অনুগামীরাও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। 'Yearbook of American and Canadian Churches' অনুযায়ী বর্তমানে এই দুই দেশে খ্রীস্টধর্মের ২৯৬টি শাখাপ্রশাখা রয়েছে।

প্রকৃত হিন্দুধর্ম কি সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন হিন্দুর বিভিন্ন ধারণা। গোটা ভারতবর্ষেও হিন্দুধর্মের অগণিত শাখাপ্রশাখা রয়েছে। ১৮৯৭ সালে লাহোরে স্বামীজী 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ' বক্তৃতায় বলেন যে, সব হিন্দুই এগুলি মানে—বেদ, ঈশ্বর, সৃষ্টিবাদ, আত্মতত্ত্ব ও পুনর্জন্মবাদ। 'উদ্বোধন'-এ শেষ লেখায় তিনি প্রকৃত সনাতন হিন্দুধর্মের উদ্বোধন করলেন সমন্বয়াচার্য, 'বেদমূর্তি' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী দিয়ে। স্বামীজী লিখলেনঃ "এই নবযুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষত ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই নবযুগধর্ম-প্রবর্তক শ্রীভগবান পূর্বগ শ্রীযুগধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।"[২২]

রূপকথায় বর্ণিত রাজহংসের মৃত্যুকালীন শেষ সঙ্গীতের ন্যায় স্বামীজী 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের আবাহনী সঙ্গীত গাইলেন তাঁর অমর কাব্যেঃ "হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান

লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।

"যে-শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-পরিবর্তনের সহায়তা কর।"[২৩]

বুদ্ধও সারনাথে প্রথম 'ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্র' দিয়ে সকলকে আহ্বান করেছিলেন। স্বামীজীও তেমনি গতিহীন, মৃতপ্রায় হিন্দুধর্মকে গতিশীল করবার জন্য যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের নামে সবাইকে আহ্বান জানিয়ে জগৎরঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন।

।। 'উদ্বোধন'-এর উদ্বন্ধন ।।

স্বামীজী দেহ রাখলেন ৪ জুলাই ১৯০২। প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০২ কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে সান ফ্রান্সিসকো চলে যান বেদান্তের বাণী প্রচারের জন্য। অবশ্য স্বামীজী ঐরূপ ঠিক করে গিয়েছিলেন। উদ্বোধন প্রেস বিক্রি হয়ে গেল। তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ সম্পাদক হলেন। ১৯০৬ সালে ভক্ত গিরিন্দ্রলাল বসাকের মৃত্যু হওয়ায় 'উদ্বোধন' পত্রিকা হলো বাস্তুহারা। অর্থাভাবে পত্রিকা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র 'উদ্বোধন' তখন উদ্বন্ধনে ঝুলছে। মরমর অবস্থা! বাংলাদেশে শিশুমৃত্যু ও পত্রিকার মৃত্যু সমপর্যায়ে হয়ে থাকে—এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। ভাবপ্রবণ, ভাষাপ্রেমিক বাঙালীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা গরম দুধের ফেনার ন্যায় ওঠে আর নামে।

'উদ্বোধন'-এর সেই দুর্দিনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ পত্রিকাটিকে বাঁচাবার জন্য তৎপর হলেন। তাঁরা ভক্তদের কাছে আবেদন জানালেন। ডঃ শশিভূষণ ঘোষ, ডঃ বিপিনবিহারী ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র শেঠ, কিরণচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তেরা এগিয়ে এলেন। সারদানন্দ উঠেপড়ে লাগলেন 'উদ্বোধন'-এর নিজস্ব বাড়ি তৈরি করার জন্য। 'উদ্বোধন'-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদামণিও তখন বাস্তুহারা। ব্রহ্মচারী প্রকাশ লিখেছেন : "শ্রীশ্রীমা বর্তমানে অধিকাংশ সময়ই কলিকাতায় যাপন করেন। সকল সময় সুবিধামত ভাড়াবাড়ি পাওয়া যায় না। তখন ভক্ত-ভবনেই তাঁহাকে থাকিতে হয়। তাঁহার নিরতিশয় নম্রস্বভাব, লজ্জাশীলা নববধূর ন্যায় ব্যবহার, পাছে কাহারও কোনরূপ অসুবিধা হয়—এজন্য সর্বদাই সঙ্কোচ। স্থির, ধীর, সর্বংসহা মেদিনী হইতেও ধৈর্যশালিনী। অভিযোগ অনুযোগে চির-পরাঙ্মুখ।

"আরেকটি বিবেচনা করিবার বিষয় ছিল, যে-ভক্তের বাটীতে তাঁহার অধিষ্ঠান হইত, তাহার কখনই স্বাচ্ছন্দ্যে ও অসঙ্কোচে বাস করা সম্ভব নয়। সংসারে নানাবিধ উৎপাত উপদ্রব আছে, আর কলহ হাস্য-পরিহাসের উচ্ছ্বাস আছে। বিশেষত মায়ের শরীর এসময় ম্যালেরিয়ারোগগ্রস্ত। ভক্তভবনে রোগশয্যা পাতায় তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। আবার তাঁহার না হউক, ভক্ত-পরিবারে রোগ-শোকের আবির্ভাব হইতে কতক্ষণ? এইজন্য মায়ের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, একখানি তাঁহার স্বতন্ত্র বাসভবন হয়।"[২৪]

শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে ভাইদের বাড়িতে থাকতেন। সেখানেও তাঁর কোন স্বাধীনতা ছিল না। তিনি সভয়ে সঙ্কোচে থাকতেন, কারণ তাঁর অনেক শিষ্য-শিষ্যা ব্রাহ্মণেতর জাতিভুক্ত ছিলেন। জয়রামবাটীর পল্লীসমাজ এটা খুব ভালভাবে

নেয়নি। যাহোক, স্বামী সারদানন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯০৮ সালের শেষে ১নং উদ্বোধন লেনে বাস্তুহারা 'উদ্বোধন'-এর এবং বাস্তুহারা শ্রীশ্রীমায়ের বাসস্থান তৈরি হলো। পরে জয়রামবাটীতেও মায়ের জন্য বাড়ি হলো। এখন 'উদ্বোধন' জনপ্রিয়। বহু মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। বড় বাড়িতে স্বচ্ছন্দে বাস করছে। উদ্বন্ধন থেকে মুক্ত। কত ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে 'উদ্বোধন' বড় হয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষী।

অমঙ্গলের মধ্যেও ভগবান আছেন। কপর্দকহীন স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধন-ভবনের জন্য ভক্তদের কাছে অর্থ ধার করলেন। সন্ন্যাসী মানুষ। অর্থ উপার্জন করতে পারেন না। কী করবেন? একদিন অসহায় হয়ে গিরিশ ঘোষের বাড়িতে উপস্থিত। সেখানে লাটু মহারাজও ছিলেন। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) লাটু মহারাজকে ঠাট্টা করে বললেন : "সাধু, তোমার সেই মন্তরটা আওড়াও না—'টাকা ধর্ম, টাকা কর্ম, টাকা হি পরমন্তপঃ। যস্য গৃহে টাকা নাস্তি, তস্য গৃহে কুছু নেই, শুধু ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্'।"

শরৎ মহারাজ কথায় কথায় গিরিশবাবুকে বলেই ফেললেন, মায়ের মন্দির (উদ্বোধন) করতে অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেছে। সুদের টাকা না দিতে পারলে আর লোকের কাছে সত্যরক্ষা করা যাবে না। একথা শুনে হাসতে হাসতে লাটু মহারাজ তাঁকে বললেন : "দেখেছ তো শরোট! হামার মন্তরের কেমন শক্তি। তোমার মতো সাধুকেও ভাবাচ্ছে। এখনো বল, হামার মন্তর মান কিনা।" শরৎ মহারাজ রহস্য করে বললেন : "তোমার মন্তর মানলে টাকা আসবে বলতে পার?" লাটু মহারাজ বললেন : "মন্তরকে মেনে নাও, নিশ্চয়ই আসবে।" শরৎ মহারাজ—"দেখ সাধু! তোমার কথার খেলাপ হবে না তো?" লাটু মহারাজ উত্তর দিলেন : "নারে শরোট হবে না, দেখে নিস।" এর পর গিরিশবাবুকে শরৎ মহারাজ বললেন : "সাধু কি বলছে শুনলেন তো, আপনি সাক্ষী রইলেন।" গিরিশবাবু হাসতে হাসতে বললেন : "আবার সাক্ষীসাবুদ কেন? সাধুর কথাটা সফল করে দিই।" এই বলে কয়েকটি টাকা বার করে দিলেন।[২৫]

তারপর দেনা শোধ করবার জন্য স্বামী সারদানন্দ ১৯০৯ সাল থেকে 'উদ্বোধন'-এ ধারাবাহিকভাবে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর আত্মকথা : "যখন লীলাপ্রসঙ্গ লেখা হয় তখন কতদিকে গণ্ডগোল ছিল! মা উপরে রহিয়াছেন, ভক্তের ভিড়, হিসাবপত্র রাখা; রাধু রহিয়াছে, বাড়ি তৈয়ারি করায় অনেক টাকা ধার হইয়াছে। নিচে ছোট ঘরটিতে বসিয়া লীলাপ্রসঙ্গ লিখিতেছি। তখন কেহ আমার সহিত কথা কহিতে সাহস পাইত না, সকলেই ভয় করিত। আমার অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা বলিবার সময়ই ছিল না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে 'চটপট সেরে নাও' বলিয়া সংক্ষেপে শেষ করিতাম। লোকে মনে করিত, ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী।... যখন 'উদ্বোধন'-এর বাড়ি হয় তখন ১১০০০ টাকা দেনা। ঐ দেনা ঘাড়ে লইয়া বাড়ি করা হইল। বই বিক্রি প্রভৃতির দ্বারা উহা শোধ হইয়াছিল।"[২৬]

'উদ্বোধন' শতবর্ষে পদার্পণ করল। আজ বড়ই আনন্দের দিন। হে 'উদ্বোধন', তোমার প্রতিষ্ঠাতার প্রেমপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি স্মরণ রেখো। মানুষকে

উদ্বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তোমার জন্ম।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার স্মৃতি মনে পড়ছে। ১৯৫০ সাল থেকে 'উদ্বোধন'-এ আমার যাতায়াত এবং সেই থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক। স্বামী সুন্দরানন্দ তখন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক। দেখতাম, উদ্বোধন-বাড়ির (১নং উদ্বোধন লেন—শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী) তিনতলার ডানদিকের ঘরের মেঝেতে মাদুরের ওপর বসে ছোট কোল-টেবিলের ওপর 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদনা করছেন বা সহকারীর সঙ্গে প্রুফ দেখছেন। ছোট ঘর, মেঝেতে দুটি বিছানা গোটানো। চেয়ার-টেবিলের জায়গা নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের বহু সন্ন্যাসীর আত্মত্যাগে 'উদ্বোধন' এখন স্বমহিমায় দেদীপ্যমান।

হে 'উদ্বোধন'-এর পাঠকবর্গ, আসুন আজ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে 'উদ্বোধন'-এর শুভ জন্মলগ্নে আমরা সবাই স্বস্তিবাচন পাঠ করি ঃ

"হে 'উদ্বোধন'। শ্রীরসি, রুচিরসি, রোচোঽসি, শুক্রোঽসি, ভ্রাজোঽসি। সর্বা দিশঃ প্রকাশয়ন্ দীপ্তো দীপয়ন্ দীপ্যমানঃ। শতং শতং শরদ আয়ুষো জীব 'উদ্বোধন'।"—হে 'উদ্বোধন', তুমি কল্যাণরূপ, আনন্দরূপ, দীপরূপ, নির্মলরূপ, প্রকাশরূপ। দীপ্ত দীপ্যমান তুমি সকলকে দীপ্ত করতে থাক। হে 'উদ্বোধন', শত শত বছর বেঁচে থাক।* □

পাদটীকা

১ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ১০৬-১০৭
২ দ্রঃ বিশ্ববাণী, ৪০ বর্ষ, পৃঃ ৩৫৬-৩৫৭
৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১৭৬-১৭৭
৪ 'উদ্বোধন', ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩০৪, পৃঃ ৬
৫ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩ ৬ ঐ, পৃঃ ১৭৫
৭ জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র—ব্রহ্মগোপাল দত্ত, ১৯৭৬, পৃঃ ৪০
৮ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪
৯ সিস্টার গার্গীকৃত Swami Trigunatita : His Life and Work গ্রন্থ থেকে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ, পৃঃ ৫৫
১০ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৫ ১১ ঐ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯
১২ 'উদ্বোধন', সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ, ১৩৫৪, পৃঃ ২১৭
১৩ ঐ, ৩১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৬, পৃঃ ৪০৭
১৪ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৯৫-৩৯৬ ১৫ ঐ, পৃঃ ৩৯৬
১৬ দ্রঃ Swami Trigunatita : His Life and Work, p. 58
১৭ 'উদ্বোধন', ৫৫ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৯, পৃঃ ১২০
১৮ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, পৃঃ ২৫২
১৯ 'উদ্বোধন', ৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা, মাঘ ১৩১০, পৃঃ ৩২
২০ ঐ, ৩৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৯, পৃঃ ৮
২১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ৩৭২
২২ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৬ ২৩ ঐ
২৪ স্বামী সারদানন্দ—ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র, ১৩৪২, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃঃ ১৬১-১৬২
২৫ দ্রঃ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, উদ্বোধন কার্যালয়, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৯০-৩৯১
২৬ 'উদ্বোধন', ৩২ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, পৃঃ ৬৭৯-৬৮১

* ১০০ বর্ষ, ১ সংখ্যা

দ্বিতীয় পর্ব

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহু সাধকের
বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার
মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে
অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ
রূপ নিল এ জগতে;
দেশ বিদেশের
প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার
প্রণতি দিলাম আনি।*

* ৩৮ বর্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা

সখার প্রতি

স্বামী বিবেকানন্দ

আঁধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান,
প্রাণ সাক্ষী—শিশুর ক্রন্দন হেথা সুখ ইচ্ছ, মতিমান?
দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান;
"স্বার্থ, স্বার্থ" সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার
সাক্ষাৎ—নরক-স্বর্গময়—কেবা পারে ছাড়িতে সংসার?
কর্মপাশ গলে বাঁধা যার—ক্রীতদাস বল কোথা যায়?
যোগ-ভোগ, গৃহস্থ-সন্ন্যাস, জপতপ, ধন-উপার্জন,
ব্রত, ত্যাগ, তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার।
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীর ধারণ বিড়ম্বন;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত মর্মর মূরতি তা কি সয়?

হও জড়প্রায় অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থ-পরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।
বিদ্যা হেতু করি প্রাণপণ অর্ধেক করেছি আয়ুঃক্ষয়—
প্রেম হেতু উন্মাদের মতো প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়;
ধর্ম তরে করি কত মত, গঙ্গাতীর, শ্মশান-আলয়—
নদীতীর, পর্বত-গহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়;
অসহায়—ছিন্নবাস ধরে, দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন?
শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম', 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।
জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূত, প্রেত আদি দেবগণ,
পশুপক্ষী, কীট, অনুকীট এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব', 'দেব' বল আর কেবা? কেবা বল সবারে চালায়?
পুত্র তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে! প্রেমের প্রেরণ!!
হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, সুখে-দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ, শোক, দারিদ্র্য-যাতনা, ধর্মাধর্ম, শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে?
ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ—
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ-সুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার—
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম?
ছাড় বিদ্যা, জপ, যজ্ঞ, বল—স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল,
দেখ শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয়,
হে প্রেমিক, স্বার্থমলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও, দাও", যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজি ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।*

* ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা

হৃদয়

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কেহ কি বিশ্বাস কভু করেছ হৃদয়ে,
সত্য কহে হৃদয় তোমায়?
হৃদে অবিশ্বাস জেনো বাসনায় ভয়ে,
হৃদয় তোমার সত্যময়।
সতত বিলাস চাহে বাসনা অসার,
প্রতিবাদী হৃদয় কেবল।
ভাব সত্য—যাহা তব বিলাস আধার,
দম হৃদি করি যুক্তি বল।
শয়তান, অবিদ্যা, ভ্রম, অদৃষ্ট (যে নাম)
দুঃখমূল করিয়াছ স্থির,
জানিহ কেবল তব বিলাসের কাম
মন সদা করেছে অধীর।
বশ নয় বাসনা উপায় কিবা তার?
কেন না করিব সুখ আশ?
কি হেতু এ দেহ মম বাসনা আগার?
মম স্রষ্টা দেখে কি নিরাশ?
বাসনার তৃপ্তি—সুখ—বুদ্ধির ধারণা।
কখন কি পুরেনি বাসনা?
তৃপ্ত বাসনার হেতু অতৃপ্ত বাসনা।
মন কি বুঝ না প্রতারণা?
কল্পনায় তৃপ্তি দান কর বাসনার,
রক্তবীজ উঠে কোটি কোটি,
তৃপ্ত কর বাসনা তথাপি বার বার
বাসনার হেরিবে ভ্রূকুটি।
বাসনার মতো ধন হলে উপার্জন
মিটে কভু ধনের কামনা।
যত ধন উপার্জন তত উত্তেজন,
শতগুণে ধন উপাসনা।
নরনারী পৃথিবীর সবে বশীভূত
কল্পনায় হের মুগ্ধচিত,
কাম-তৃপ্তি মান-তৃপ্তি বাসনা সম্ভূত
পিয়াসায় কি হেতু পীড়িত?
বারেক সুধাও মন, হৃদয় তোমার—
জান কিহে হৃদয় কি তব?
স্বার্থহীন বৃত্তি (নহে কিঙ্কর আশার)
যে বৃত্তি আশ্রিত এই ভব।
যে বৃত্তি মিলিত ক্ষুদ্র কীটাণুর সনে
স্রষ্টার প্রধান বিশেষণ
যে বৃত্তি আশ্রয়ে এই পাশব জীবনে
দেবাধিক তোমার গণন।
সেই বৃত্তিময় সদা হও কায়মনে
স্বার্থহীন বাসনা বর্জনে,
নির্ভীক নিরহঙ্কার মিলি বিশ্ব সনে
মৃত্যুঞ্জয় ভঙ্গুর জীবনে।*

*১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা

কহিলে 'আবার আসিবে'

শ্রীম

হেরিলাম অপূর্ব মূরতি, যবে
প্রথম রাজীবপদ করি দরশন।
যেন কার প্রেমে মাতোয়ারা দুটি আঁখি,
অনুক্ষণ হাসিতেছে বদন-কমল
করি চারিদিকে অমিয়া বর্ষণ;

পঞ্চম বর্ষীয় বালক যেমতি
থাকে সদা আনন্দেতে ভোর।
ধন্য রানী ধন্য দেবালয় তব। এ কি
চঞ্চলপ্রতিমা হেথা করে বিচরণ!
কোথা হতে আসিলা এ মানুষ রতন
দেব কি মানুষ বুঝা ভার;
যেন এ মর্তের নাহি হবে;
কিন্তু আপনার কেহ হবে,
নহে প্রথম দর্শনে কেন প্রাণ টানে!
মিটিল প্রাণের তৃষা বহুদিন পরে—
জীবনের সমস্যা পূরিল এতদিনে—
গেল দূরে কি আশ্চর্য মন অন্ধকার
সার্থক হইল বুঝি মানবজীবন
পরশে পরশমণি।
ভাবিলাম কে হে তুমি হৃদয়রঞ্জন।
প্রেমনয়নের তারা, কেমনে যাইব
ফিরি ঘরে। তুমি ছাড়া ঘর কোথা আছে।
ফিরে যেতে হবে, বুক ফাটে।
হে অন্তর্যামী মম ভাব সকল জানিলে;
হাসিলে অপূর্ব হাসি,
মনপ্রাণ করিলে শীতল,
নীরবে থাকিলে কতক্ষণ,
পূরবের কথা বুঝি করিলে স্মরণ;
ভাবিলে কিঙ্কর তরে, স্নেহমাখা স্বরে,
কহিলে জননীসম 'আবার আসিবে'।*

*১১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

শান্তি

কিরণচন্দ্র দত্ত

কোথা শান্তি এ সংসারে—বৃথা অন্বেষণ!
বিষাদ কালিমা মাখা এই বসুন্ধরা;
শান্তি আশে কেন জীব করিছ ভ্রমণ?
কোথা পাবে শান্তি-বারি, এ যে শুষ্ক ধরা।
ওই দেখ কত শত মানব-হৃদয়,
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ শান্তির আশায়,

মগ্নপ্রায় জীব-মতো করিছে আশ্রয়
অতীব সামান্য তৃণ, সকলি বৃথায়।
ভ্রান্ত জীব! পাবে শান্তি বিলাস-বৈভবে?
শান্তি তরে ভালবাস রমণীর রূপ?
কাল-অলি মধু পানে সব লীন হবে,
জান নাকি এ জগতে সকলি বিরূপ?
দয়াময় নাম শুধু শান্তির আধার,
হরি সত্য সনাতন কর জীব সার।*

* ১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা

অবতার পুরুষ পরম

কাজী নজরুল ইসলাম

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ নমো নম
সর্বধর্মসমন্বয়-কারী নররূপে
অবতার পুরুষ পরম।
ঈশ্বরে বিশ্বাস জানকীর প্রায়
বন্দিনী ছিল কামনার লঙ্কায়
উদ্ধারিলে তারে তোমার তপস্যায়
শক্তিরে জাগাইয়া শ্রীরাম-সম।
তোমার কথামৃত কলির নববেদ
একাধারে রামায়ণ ও গীতা
বিবেকানন্দ-মাঝে লক্ষ্মণ অর্জুন
শক্তি করিলে পুনর্জীবিতা।
ভূভারতের কলহের কুরুক্ষেত্রে
দাঁড়াইলে তুমি আসি সকরুণ নেত্রে
বাজালে অভয় পাঞ্চজন্য শঙ্খ,
বিনাশিলে অধর্ম, হিংসা, আতঙ্ক—
প্রেম-নদীয়ায় তুমি নব-গৌরাঙ্গ
সকল জাতির সখা, প্রিয়তম।*

* ১০০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা

শোনাও সে অগ্নিমন্ত্র

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পতিত ভারতবর্ষে, নারায়ণ, তুমি এসো আজ
পাঞ্চজন্য-গরজনে দিকে দিকে তুলিয়া আওয়াজ।
মুক্ত করো, মুক্ত করো ক্লৈব্য হতে দুর্ভাগা জাতিরে;
মৃত্যু হতে, হে দেবতা, লও তারে অমৃতের তীরে;
ঢেকেছে আত্মারে তার অজ্ঞানের মেঘ-আবরণ!
জ্ঞানের আলোকতীর্থে হোক তার মহাজাগরণ।

তোমার এ ধরিত্রীরে করোনি তো কুসুম-পেলব
সুন্দরের লীলাভূমি! হেথা আছে রক্তাক্ত বিপ্লব
উৎসবের পাশাপাশি। হেথা স্নিগ্ধ কাকলি শিশুর
ঝড়ের গর্জন সাথে মিলাইছে আপনার সুর!
সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প আর মহামারী
তারা আর পুষ্প নিয়ে এ বিচিত্র সংসার তোমারই!
জীবন নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর আহব।
হেথা শুধু বিনাশের পথে আসে সৃষ্টির গৌরব।

সংগ্রামের পথে আসে সফলতা সত্যোপলব্ধির
বোধিদ্রুমমূলে। হেথা ভূমানন্দ ভাবসমাধির
জয় করে নিতে হয় বীর্য দিয়ে তীব্র তপস্যায়।
হেথা দুঃখজয়ী যারা যুগে যুগে তরণী ভাসায়
অজানা সিন্ধুর বক্ষে, অকম্পিত কণ্ঠে যারা বলেঃ
সমুদ্রে ডুবুক তরী, সব কিছু যাক রসাতলে,
তবু ফিরিব না তীরে, হয় জয়, নয় সর্বনাশ—
তারাই মরিয়া গড়ে মানব-সভ্যতার ইতিহাস
রক্ত আর ঘর্ম দিয়ে। জ্যোতির্ময় নবজীবনের
তারাই পতাকাবাহী। তাহাদের বলিষ্ঠ মনের
শক্তির প্রাচুর্য আনে অন্ধকারে প্লাবন জ্যোতির।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা; দুর্বলেরা বোঝা ধরিত্রীর।
হীনবীর্য যে অভাগা—তার ধ্বংস কে ঠেকাতে পারে?
চরম দুর্গতি তার জীবনের এপারে ওপারে
সুনিশ্চিত। সংসারের চিরন্তন নিয়ম সংগ্রাম;
সমরে শৈথিল্য যার—অনিবার্য তার পরিণাম

অধোগতি আর মৃত্যু। নাহি পাপ দুর্বলতাসম;
বীর্যের আগুন নাই যে সাধুত্বে তার নাম তমঃ—
ভীরুর ভীরুত্ব-মাখা। নাই, নাই কোন মূল্য তার।
তার চেয়ে ঢের ভাল উগ্রমূর্তি রাজসিকতার
শক্তিতে গরিমাময়ী। নারায়ণ, পতিত ভারতে
শোনাও সে অগ্নিমন্ত্র যাহা তুমি কপিধ্বজ-রথে
শুনাইলে অর্জুনেরে। পাঞ্চজন্যে আবার বাজাওঃ
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে, ধনঞ্জয়, যুদ্ধ করে যাও
সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়াজয় করি সমজ্ঞান;
যুদ্ধ কর, সব্যসাচি, বর্জিয়া সমস্ত অভিমান
আপনারে যন্ত্র মানি সর্বব্যাপী ঈশ্বরের করে।
মাভৈঃ গাণ্ডীবধন্বা; এ বিশ্বের কল্যাণ যে করে
দুর্গতি হয় না তার; আমি তার সহায় শাশ্বত।
অর্জুন, গাণ্ডীব ধর—যুদ্ধ করে যাও অবিরত।*

* ৫৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু

নরেন্দ্র দেব

সবার আগে ত্যাগ করা চাই
তোমার মনের অহমিকা,
কর্তা তুমি ভুলতে হবেই
নইলে দেখবে মরীচিকা।
মালিক তুমি নও তো কিছুর
জাগবে এ বোধ যবে মনে,
হয়তো তুমি খুঁজছ যে ধন
ঘুরছ সুদূর গিরি বনে;
দেখবে সে তো বক্ষে তোমার
সততই যে করে বাস,
খুঁজতে তাঁরে হয় না অধিক
যখন আসে সে বিশ্বাস।

আছেন তিনি তোমার মাঝেই
করান নিতি সব কাজ,
আদেশ যদি না মানো তাঁর
শাস্তি দেবেন মহারাজ।
চরণে তাঁর সরল প্রাণে
করিলে সব নিবেদন,
রবে না আর আত্মশ্লাঘা,
শুদ্ধ হবে দেহ মন।
হয়তো পাবে সেদিন তোমার
ধ্যানের ধনের দরশন,
মুক্ত হবে সকল বাঁধন
লভি দুর্লভ পরশন।*

* ৭২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা



কবীর

কালিদাস রায়

কবে তব আবির্ভাব, কবে তব হলো তিরোধান—
কিছু তার নাহি জানি। গণিতের অঙ্কপরিমাণ
তোমারে বাঁধিতে নারে কোন ইতিহাসের পাতায়।
তব জাত-পত্রখানি নাহি মিলে কালের খাতায়।
তুমি চিরদিনকার, নহ তুমি কোন শতাব্দীর;
গোষ্ঠীহারা, কোষ্ঠীহারা, গোত্রহীন হে সাধু কবীর!
কালসিন্ধু মাঝে তব জীবনের নাহি পাই সীমা—
মহাসিন্ধুময় হয়ে আছে তার বিশাল মহিমা।
কেবা তব পিতামাতা—তার মোরা পাইনি সন্ধান।
তুমি নারদের মতো বিধাতার মানস-সন্তান।
সংসার-সন্ন্যাস ভেদ যাঁর মাঝে পাইল বিলয়
গৃহী, কি বৈরাগী তিনি কেমনে তা হইবে নির্ণয়?
জানি না, কি ছিলে তুমি ধর্মরাজ্যে সহজী মরমী,
রামাত বৈষ্ণব সুফি বৌদ্ধ জৈন কিংবা বর্ণাশ্রমী,
কতটা মোস্‌লেম ছিলে, কতটা বা হিন্দু নাহি বুঝি;
কুড়ানো ছেলের আর পিতৃধর্ম কোথা পাব খুঁজি?
কোন সম্প্রদায় তোমা জাতিহারা, ভাবেনি আপন,
মহামানবের ছিলে, তারি ধর্ম করেছ পালন।
জানি না জীবন-কথা। কি কি ভাবে করিলে সাধনা
জানি না করিলে কারে কি প্রথায় পূজা আরাধনা।
গড়েছিলে সম্প্রদায় জানি নাকো কি বিধি-বিধানে,
তাহার প্রতীক বেশ জীবযাত্রা কি ছিল, কে জানে?
কোন্ গ্রন্থ পড়েছিলে, কোন্ মন্ত্র জপিতে ধীমান
কতবার? কি আসনে কতক্ষণ করিতে ধেয়ান?
তব দীর্ঘ জীবনের বহিরঙ্গ কোন পরিচয়
করিয়া রাখেনি হায়, ইতিহাস অমর অক্ষয়।
সমস্ত জীবনখানি নিঙাড়িয়া দিয়াছ যে বাণী
তার এক বর্ণ মোরা হারাইনি—এই শুধু জানি।
ব্যাপ্ত হলো দিগ্বিদিকে স্নেহবিন্দুসম খরস্রোতে,
বঞ্চিত হইনি তব জীবনের সার ধন হতে।
ভারতের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হয়ে অনুস্যূত
তব ব্রত, তব মন্ত্র চিরদিন তার অঙ্গীভূত।
কলামূর্ত করি তারে ইতিহাস গম্বুজ মিনারে
নমস্য করিয়া রাখি আপনার দায়িত্ব না সারে।*

---

* ৫১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

সেদিন

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

দুঃখের দিন বলে ভেবেছিনু যারে,
আজি প্রাণ ফিরে চায় তারে বারে বারে।
সে দুখ—সুখের রাজা
কাঁটায় গোলাপ তাজা,
ভোরাই-আঁধার ভাল আলো চাহি না রে।

মৃগনাভি বাস ছিল সে ঝড়ের পাছে,
ছিল বড় মৌচাক নিম্বের গাছে।
মেঘের আড়ালে ঘোর
রাকা শশী ছিল মোর
অভয়ার হাসি ছিল সে ভয়ের পাছে।

কে বুঝিবে কত বল এই মন পায়
অসম্ভবের নিতি সম্ভাবনায়।
কার আগমন সুখ
সুরভিত করে বুক
সোনার নূপুর বাজে দখিনার বায়।

কোথা সেই ব্যাকুলতা সেই আঁখিজল,
প্রণামেতে ক্ষয়ে যাওয়া তুলসীর তল।
কত আশা কত ভীতি
দেব হাসি দেখা নিতি
হরিনাম সুধারসে ভেজা অবিরল।

মিলাইয়া গেছে দেবী, হয়েছে প্রভাত,
মনে পড়ে সেই শব-সাধনার রাত।
বিভীষিকা সেও ভাল
চন্দ্রভালীর আলো
সিদ্ধির অরুণিমা ছিল তার সাথ।*

---

* ৪২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

বিবেকানন্দ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে কানে যেন অনেক দূরের কথা শুনি কার
সে-দূরত্ব মাটিমাপা নয়; কাল থেকে কালান্তর পার
হয়ে আসে, হয়তো বা অনেক হাজার বছর অতীত
হতে ধ্বনি আসে—হিংসা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, জীবন অমৃত।

আকাশে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? ধ্বনি বলে, আমি বুদ্ধ;
সে-বাণীতে ওই নাম—এজগতে অন্ধকারে অবরুদ্ধ
মানুষের মৃত্যুভীত আর্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায়;
আলো জ্বলে ওঠে—মানুষ মিছিলে খোঁজে অমৃত কোথায়।
পথ চলে পথশ্রান্ত মানুষেরা আবার আঁধার খোঁজে।
অরণ্যে গুহায় ঢুকে হতাশে এলায়ে দেহ চোখ বোজে।

অন্ধকারে মৃত্যুভয় জাগে, ভয়ার্ত মানুষ মৃত্যু স্থির
জেনে, আকণ্ঠ আসব পানে হয়ে ওঠে প্রমত্ত অধীর।
আবার নতুন কণ্ঠ শুনি, ভয় নাই—ওরে ভয় নাই—
অমৃতের পথযাত্রী মোরা, অমৃতসন্তান আমরাই—।
শত শত বৎসরের গাঢ় অন্ধকারে উঠেছিল বাণী—
মানুষেরা পেয়েছিল—অপরূপ একজন অমৃতসন্ধানী
মানুষকে। দীপ্তকান্তি দৃপ্তদৃষ্টি নির্ভয় ভাস্কর—
ক্লিষ্ট মানুষের বক্ষোমাঝে সম্মুখে সে দেখাল ঈশ্বর।

আজি তার বাণী ভেসে আসে শতবর্ষ অতীতের পার
হতে অন্ধকারে নিদ্রাঘোরে। প্রশ্ন করি, কণ্ঠস্বর কার?
দিগন্ত উত্তর দেয়, ভারতের তপস্যায় জাগরণী ছন্দ
সঞ্জীবনী হোম, ঋষি রামকৃষ্ণ—হোতা সে বিবেকানন্দ।*

* ১০০ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার

সজনীকান্ত দাস

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।
ছিন্ন কাঁথা জীর্ণ চীর, স্পর্শে তব ভস্ম হোক,
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার।
হে সূর্য, প্রণাম লহ মোর—
তিমিরবিদারী তব দীপ্ত খর করাঘাতে
ছিন্নভিন্ন হোক মায়া-ডোর।

সন্ন্যাসী ভ্রমেন একা হিমাচল পাদমূলে
হাতে দণ্ড, মুণ্ডিত মস্তক,
বিজন পার্বত্য-পথে নামিয়া এল কি ভুলে
দেহধারী জ্বলন্ত পাবক!
দেখিয়া সভয়ে সবে ছাড়িয়া দাঁড়ায় পথ,
মনে ভাবে স্বয়ং শঙ্কর—
ললাটেতে রাজটিকা, নাহিক সারথি—রথ,
নাহি সহস্রেক অনুচর।

স্বপ্ন কিংবা কর্ম দুই ভাবনার মাঝখানে,
সংশয়-আকুল তাঁর মন,
এ তীরের মহারাজা যেন ও তীরের টানে
পরিয়াছে গৈরিক বসন।
হেথা তাঁর কোন্ কাজ—ধরার ধূসর ধূলি,
তমোময় পঙ্কিল সংসার—
শ্মশানে শঙ্কর চলে বিষাণে নিনাদ তুলি—
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

সন্ন্যাসী পড়িল জলে মেলি শ্রান্ত ক্লান্ত আঁখি,
ভারতভূমির পানে চায়।
কে ডাকিল, 'ওরে বৎস, কত কাজ আছে বাকি
বাছা মোর কোলে ফিরে আয়।
কাঁদিছে তেত্রিশ কোটি রোগে শোকে নিপীড়নে,
রক্তমেঘে ঢেকেছে আকাশ—
ভালবাস বুকে নাও, আলো দাও অন্ধজনে—
সন্ন্যাসী উঠিল সিক্তবাস।

ভারতের মৃত্তিকায় সিক্ত পদচিহ্ন রাখি
ললাটে জুড়িয়া দুই কর
উত্তরে প্রণাম করি, পশ্চিমে ফিরাল আঁখি,
শিব শিব, শঙ্কর শঙ্কর।
ভারতের বাণীমূর্তি দাঁড়াইল রূপ ধরি
মূর্তি ভারতের সাধনার—
পূর্বাচল বহ্নিশিখা পশ্চিমে ভাসাল তরী—
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

পশ্চিমে বিজয়লক্ষ্মী কণ্ঠে দিল জয়মালা,
বিজয়ী ফিরিয়া এল ঘরে,
কে বসিবে সিংহাসনে বক্ষে যার বহ্নিজ্বালা,
নীলাকাশ শিরে ছত্র ধরে!
পীড়িত আর্তের সেবা পতিত অন্ত্যজে প্রীতি,
দীনতা ভুলাতে দীনজনে
সংশয়-তিমির ছেদি ওঠে সন্ন্যাসীর গীতি,
ধায় মন পঞ্চবটীবনে;

মন্দির করিয়া আলো মহাকালী যেথা জাগে,
নাচে শ্যামা হৃদয়-শ্মশানে—
ক্ষুধিত জঞ্জালপুঞ্জে বহ্নির পরশ লাগে,
গুরু জানে আর শিষ্য জানে,
আঁধার গগনবক্ষে ধোঁয়াইয়া ধোঁয়া ওঠে,
বহ্নি জাগে তিমির-বিদার—
একটি কমল হতে সহস্র কমল ফোটে—
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।*

---

* ৯২ বর্ষ, ১ সংখ্যা

হে সন্ন্যাসি

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

আত্মভোলা হে সন্ন্যাসি, কটিবাস পরিয়া একাকী
উদাত্ত আহ্বানে
ডাকিলে এ কোন্ সুরে? উদাস, উতল হলো প্রাণ
কেন যে কে জানে?
কি স্বপ্নে মদির তব স্থির শান্ত স্বচ্ছ আঁখি দুটি,
উড়িছে গৈরিক,
নির্ভয় ন্যায়ের দণ্ড দৃঢ়হাতে তুলেছ ধরিয়া
সন্ন্যাসী সৈনিক!

তূণ কোথা, বাণ কই? কোথায় কৃপাণ ক্ষুরধার?
কই ধনুঃশর,
এ দুর্বার মহারণে বর্ম কই, কোথা শিরস্ত্রাণ
কবচ অমর?
কিছুই রাখনি সাথে নিঃসহায়, প্রশান্ত উদার
সুস্নিগ্ধ নয়ন,
রণ তো বিলাস নয়— অস্ত্রে অস্ত্রে ঘাত প্রতিঘাত,
রক্তের গর্জন।
আহতের আর্তনাদ শৌর্যের উদ্ধত জয়োল্লাস
মৃত্যুর প্রান্তরে
অস্ত্রহীন চল তবু কী নির্ভয়ে সেই রণভূমে
ধীর পদভরে
তুমি কি পেয়েছ কোন স্বর্গের বরাভয়ে অভয়ের
চোখের ইশারা?
ক্ষমা-নম্র শান্ত চোখে ঝরে তাই মমতাকাতর
প্রেম-অশ্রুধারা?
আত্ম-ত্যাগ মহামন্ত্রে, ধর্মযুদ্ধে আত্মবিসর্জনে
এস, এস সবে
ভয় নাশ হলে জয়, প্রাণ হননের আগে তাই
প্রাণ দিতে হবে।
যতই ঢালিবে প্রাণ নির্ভীক, নিঃশঙ্ক হবে তত
মৃত্যুর সম্মুখে
দাঁড়ায়ে উন্নত শিরে অগ্রাহ্য করিবে তারে যত
দেখিবে কৌতুকে।
মরণ পরাস্ত হবে তোমার সে উদ্দীপ্ত চক্ষুর
স্থির দৃষ্টিপাতে
মৃত্যুভস্মে জন্ম নেবে সৃষ্টির দেবতা
মৃত্যুঞ্জয় বর দিবে হাতে।
এই মন্ত্রে কম্বুকণ্ঠে আসমুদ্রহিমাচলে ডাক দিলে
তুমি হে সন্ন্যাসি!
দুর্বলের দুঃখভার শিরে তুলে নিলে আপনার
স্নিগ্ধ চোখে হাসি।
এই মন্ত্রে যূপকাষ্ঠে নিজ কণ্ঠ বাড়ালে আগ্রহে
সকলের আগে
মাভৈঃ দীনের বন্ধু তব সাথে এ দুর্গম পথে
ভগবান জাগে।*

* ৯৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা

শ্রীবুদ্ধ

দিলীপকুমার রায়

বুদ্ধ তুমি মুক্ত মহান্—চিন্তাপারের অবন্ধনে,
অবিশ্বাসের লক্ষ ফণী নম্রফণা যার চরণে।
যুগে যুগে শৈল কত
লুপ্ত হলো কাল-আহত,
তোমার মরমূর্তিখানি রয় জেগে অবিস্মরণে,
পুণ্য নামে শঙ্খ বাজে শঙ্কাবেসুর কাঁটাবনে।
ভক্তিহারা দুঃখভরা মিথ্যামলিন এই জগতে
কান্তি তোমার ভ্রান্তি নাশে, শান্তি আনে শুভ্রব্রতে।
তনুর কারায় হে অতনু
রাঙলে আকাশ-ইন্দ্রধনু
বিয়োগ কালোয় অশোক আলো, পলের বুকে চিরন্তনে।
সীমার নিশায় অসীম উষা—অমর রবি হৃদ্‌গগনে।*

---

* ৪৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যা

জয়—তরুণের জয়

জীবনানন্দ দাশ

জয়—তরুণের জয়!
জয় পুরোহিত আহিতাগ্নিক—জয়—জয় চিন্ময়!
স্পর্শে তোমার নিশা টুটেছিল, উষা উঠেছিল জেগে,
পূর্বতোরণে, বাংলা-আকাশে, অরুণ-রঙিন মেঘে;
আলোকে তোমার ভারত, এশিয়া—জগৎ গেছিল রেঙে!

আসিলে সব্যসাচী,
কোদণ্ড তব নব উল্লাসে নাচিয়া উঠিল প্রাচী!
টঙ্কারে তব দিকে দিকে শুধু রণিয়া উঠিল জয়,
ডঙ্কা তোমার উঠিল বাজিয়া মাভৈঃ মন্ত্রময়;
শঙ্কাহরণ ওহে সৈনিক—নাহিক তোমার ক্ষয়।

তৃতীয় নয়ন তব
ম্লান বাসনার মনসিজ নাশি জ্বালাইত উৎসব!
কলুষ-পাতকে, ধূর্জটি, তব পিনাক উঠিত রুখে,
হানিতে আঘাত দিবানিশি তুমি ক্লেদ কামনার বুকে,
অসুর-আলয়ে শিব-সন্ন্যাসী বেড়াতে শঙ্খ ফুঁকে!

চক্র গদার সাথে
এনেছিলে তুমি শঙ্খ পদ্ম—হে ঋষি, তোমার হাতে;
এনেছিলে তুমি ঝড় বিদ্যুৎ—পেয়েছিলে তুমি সাম,
এনেছিলে তুমি রণ-বিপ্লব—শান্তি-কুসুমদাম;
মাভৈঃ শঙ্খে জাগিছে তোমার নর-নারায়ণ—নাম!

জয়—তরুণের জয়!
আত্মাহুতির রক্ত কখনো আঁধারে হয় না লয়!
তাপসের হাড় যন্ত্রের মতো বেজে উঠে বারবার!
নাহিরে মরণে বিনাশ—শ্মশানে নাহি তার সংহার,
দেশে দেশে তার বীণা বাজে—বাজে কালে কালে ঝঙ্কার!*

*১০০ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চোখ দুটি

বনফুল

আশ্চর্য চোখ।
পদ্ম-পলাশ নয়ন নয়
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখিও নয়।
অতি সাধারণ চোখ।
কিন্তু সে চোখের দৃষ্টি কি অপরূপ!
চোখের কোণে কি সহাস্য প্রশ্ন,
তা যেন বলছে—
এখনো তোরা মেতে আছিস?
এখনো ভুল ভাঙে নি?
কি কাণ্ড!
সে প্রশ্নকে কিন্তু প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে
অসীম করুণা
অনন্ত আশ্বাস!
তা যেন বলছে
হবে, হবে
ঠিক পারবি।
চেষ্টা কর, ঠিক পারবি।
তোকে পারতেই হবে।

নিষ্পলক নয়নের
নিঃশব্দ বাণী
নিরন্তর বলে যাচ্ছে
পারবি, পারবি, ঠিক পারবি
তোকে পারতেই হবে।*

---
*৮০ বর্ষ, ২ সংখ্যা

আনন্দস্বরূপ

জ্যোতির্ময়ী দেবী

খুঁজিতেছ আনন্দকে? পথ কোথা তার।
আলো আছে বিশ্বভরা। আশা আছে চিত্তভরা।
চারিদিকে আহা! তবু দেখ অন্ধকার।
পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব উত্তর ঈশান
অগ্নি বায়ু নৈর্ঋতের সব দিশা করেছ সন্ধান।
কোথা পথ আছে? কোথা রথ আকাশের বাটে?
অথবা ভূতলে পর্বতে সাগরে?
নিরানন্দ সঙ্গীহীন সঙ্গহীন জগতের হাটে
চলেছ পথিক।
দুর্গম সুগম পথ দিশাহীন দিক।
উর্ধ্বে আদি-অন্তহীন রবি শশী তারাদল
জ্বলে অনির্বাণ—।
আকাশ অপার।
কবিঋষিমুনিগণ হেরে বিশ্বে আনন্দ-পাথার।
কে দেখেছে? কে বলেছে—কে শুনেছে তাঁহাদের অপূর্ব আহ্বান?
কোথা তিনি অরূপ-স্বরূপ-বিশ্বরূপ
চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।
ভাবে আর্ত মূঢ় নরনারী কোথা সেই আনন্দ-ভুবন।*

* ৮০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

জগজ্জননী সারদা

বেগম সুফিয়া কামাল

মধুর শৈশবকাল কেটেছে খেলায়
কিশোর বেলায়
সুকন্যা! বধূর বেশে হয়েছ গৃহিণী
তার পরে বরণীয়া হয়েছ জননী।
জঠরে ধরনি তুমি আপন সন্তান
লালন করনি, তবু মাতার সম্মান
লভিয়াছ, মহীয়সী! অনাথের একান্ত আশ্রয়
তোমার অঞ্চল তলে স্নেহের প্রচ্ছায়

আতুর, অনাথ জনে মায়াক্ষরা মমতার মধু
সিঞ্চিয়া করেছ ধন্য, হে সাধিকা, সাধকের বধূ,
শুধু বধূ নহ তুমি, অর্ধাঙ্গিনী, জীবনের সাথী
মহতের কর্মপথে অন্তর আরতি
প্রদীপের শিখা জ্বালি করি দীপ্যমান
সাধক স্বামীরে তুমি করিয়াছ মহৎ, মহান।
তব নিষ্ঠা, ত্যাগ, সেবা সর্বজন তরে
করুণার বারিধারা প্রাণপাত্র ভরে
বিলায়েছ অকাতরে, অফুরন্ত সে মাঙ্গল্য দানে
করেছ পবিত্র, পূত অনেক অজ্ঞানে।
নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ সেবা, ফলভারানত তরুসম
সাধক সাধন-পীঠ করি মনোরম
দৃঢ় অবিচল চিত্তে নীরব সাধিকা, সুগৃহিণী
তোমার কর্মের যোগে, তুমি আজ জগত-জননী।*

* ৮৭ বর্ষ. ৯ সংখ্যা

আমার পৃথিবী

অরুণ মিত্র

জলস্থল জুড়ে এক দারুণ কৌশল,
আমিও এক কৌশলেই আছি
সারাটা দিন ঘুরেটুরে বনবাগান
ঘরে ফিরি চাকের মৌমাছি।
অবশ্য আচমকা চাকা কিংবা অস্ত্র
দু-আধখানা করে দেয় আস্ত স্বপ্ন,
খুলে ফেলে হাড়মাংসের বাঁধন জবর।
এ সমস্ত দেখা আর তারই সঙ্গে
লাগাতার গুনগুন পাখনার সফর।
সুষমা সৌন্দর্য স্বাদ লক্ষ্যে আছে,
ঘরে জমানো সোনালি মধুতে
আমার পৃথিবী মাখিয়ে নিই—
তাতে বেশ শান্তি নেমে আসে
দু-চোখ ভরে ঘুম
একটা রাত কাটলে ফুল ফুল সকাল।*

* ৯৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

নবীন তপস্বী তুমি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আকৈশোর দেখে আসছি—বাহুবদ্ধ, দীর্ঘ বক্ষপট,
সঙ্কল্পে কঠিন দৃষ্টি, মুখময় সন্ন্যাসী-দ্যোতনা,
ঋজুরেখ দৃপ্ত ভঙ্গি, আর কণ্ঠে ঘোষণা স্বাধীনঃ
ভারতে মিলায়ে দেবে, ধর্মের ছুঁৎমার্গ দেবে মুছে।
নবীন তপস্বী তুমি, বিশ্বের বিভিন্ন মঞ্চ ঘুরে
তোমার তেজস্বী বাণী, পৌঁছে গেছে কানে মানুষের।
শতাব্দীর আগে জন্ম নিয়েছিলে, দুঃখ পেয়ে গেলে,
আজকের সমাজ তাই পূজা করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে।*

৯১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা

সমতা

হরপ্রসাদ মিত্র

কী চাই চূড়ান্ত তবে?—প্রভানন্দ?—উষার আকাশ?
এ কোন্ প্রার্থনা?—এর বেশি—আর কী আছে চাইবার?
নানা হাওয়া আছড়ায়, ছুঁয়ে যায় হিম ও উত্তাপ।
তাতেই মথিত মন। শান্তি তার নয় পরিণাম।

শান্তির সাদৃশ্য যেন শীতের দুপুরে নীলাকাশ—
গভীর নিথর নীল—তাতেই নিয়ত ভাসমান!
সুখ নয়, দুঃখ নয়—যেন নিত্য শুদ্ধ হরিদ্বার,
বহতা গঙ্গার ধারা স্বচ্ছতোয়া অনন্ত অবাধ।

'সময়' ছিন্নতা মাত্র; 'দেশ' শুধু খণ্ড ও বিভাগ;
'কারণ' কুটিল গ্রন্থি। দেশ-কাল-নিমিত্তে নিবাস—
সে নয় শান্তির স্বর্গ। শান্তি নয় উত্থান-পতন,
নয় দীপ্ত অভ্যুদয়—ঘটে যার নিশ্চিত বিনাশ।

যা চাই তা নয় কোন আদি-মধ্য-অন্ত চিহ্নে গতি,
সে শুধু প্রসন্ন বোধ—সাক্ষী-ভাব—সমতা পদ্ধতি।*

* ৮৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা

যখনি আশ্বিন আসে

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

যারা স্বদেশকে প্রিয়ার মতো হৃদয়ের মণিকোঠায় রেখেছিল
যারা হারিয়ে যাওয়া মিছিলের মুখকে
সন্ধ্যার পিলসুজে ঘর আলো করতে দেখেছে
ঘরে ফেরার সন্ধ্যায়—
যারা সংগ্রামের শেষে উত্তোলিত দুবাহু দিয়ে
জীবনকে জড়িয়ে ধরে মমতার ঘর বাঁধতে চেয়েছিল

তাদের সে-সব উদ্যম শুভ্র মেঘের টুকরো
আকাশের বুকে ভেসে ভেসে বেড়ায়
তাদের বুকফাটা ব্যাকুলতা কাশের বনে মর্মর তোলে।

যখনি আশ্বিন আসে দিগ্বিজয়ী সেই ইচ্ছেটাই
ধমনীতে রক্তের বান ডাকায়
দাঁড়িয়ে যাওয়া পেশীগুলো টানটান করে
অদৃশ্য আততায়ীকে হেঁকে বলিঃ
'কৈ হে, হিম্মৎ থাকে তো ধর এই পাঞ্জা।'

যখনি আশ্বিন আসে দুরন্ত সেই মুখগুলো
একে একে মনের মধ্যে ভিড় জমায়
চোখে তাদের দিগন্তের নীলাঞ্জন
বুকের রক্তে লাগাম-ছেঁড়া দিগ্বিজয়ী হ্রেষা।
পেশল বাহুর বিক্রমে মাটির এই পিণ্ডটাকে দুমড়ে-মুচড়ে
যারা স্বপ্নের দুর্জয় মূর্তি গড়তে চেয়েছিল
আশ্বিনের ভোরের খেয়ায় যদি তারা আর সকলের
সঙ্গে উষ্ণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাখামাখি হয়ে ফেরে!*

* ৯৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

মানুষের জন্য

অমিতাভ দাশগুপ্ত

মানুষের মুখোমুখি মানুষেরই বানানো ঈশ্বর।
ফোলা ফোলা গাল নিয়ে সে-দারুগোপাল
সিঁড়িপথে বসে আছে
মেধা ও চৈতন্য খাবে বলে।
দোসাদের পায়ে পায়ে চণ্ডালের হাড়ের বাতাসে
বড় দীর্ঘদিন ঘুরে ঘুরে
দক্ষিণের বাদামি ছায়ায়
তুমি তাকে রেখে এলে কন্যাকুমারীর নীল জলে।
নির্বাণ তোমার নয়। মোক্ষ নয়।
হাভাতের বেদনার রঙে
ও-বসন রাঙিয়েছ যোগী,
ধ্যানমগ্ন মহাবেলা—
তোমাতে সমানভাবে সুর তোলে
পূরবী ভৈরবী।*

* ৯১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা

যাত্রা

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

তখনো যে ঘণ্টা বাজে দূরে নদীতীরে,
অন্ধকারে যুক্ত কর ঊর্ধ্বে তুলে রাখে
ছায়ার মন্দির, স্তব্ধ অস্তাচল ঘিরে
শেষ রশ্মি আপনার আশীর্বাদ রাখে,
দিনান্তের খেয়াপারে ছলচ্ছল ধ্বনি
তখনো ঘাটের বুকে বাজে ঘুরে ফিরে,
জোনাকির দীপ জ্বেলে নিঃশব্দে ধরণী
জপ করে ঝিল্লিমন্ত্র সায়াহ্ন-সমীরে।

খুলে গেল রুদ্ধদ্বার, হয়েছে সময়,
আলোর আড়াল থেকে শুনেছে সে ডাক,
যে মহামৌনের বাণী চরাচরময়
ধ্বনিত স্পন্দিত করে থেমে গেল শাঁখ,
এসেছে আহ্বান তাঁর রাত্রির তিমিরে,
চেনার জগৎ থেকে অচেনার তীরে।*

* ৬৬ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

ব্রহ্মনগর

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

ব্রহ্মনগরের মধ্যে ক্ষুদ্র এক হৃদিপদ্মকলি,
অভ্যন্তরে আছে সে আকাশ। এখানেই স্বর্গমর্ত
অগ্নিবায়ু সূর্যচন্দ্র বিদ্যুৎতারকা—যাকিছুই
আছে আর নাই। দেহমন্দিরের এই হৃদিপদ্মে
ব্রহ্মাবাস। এখানে বার্ধক্য নাই, নাই মৃত্যুভয়
নাই রোগদুঃখশোক ক্ষুধাতৃষ্ণাক্ষয়—এ আকাশে
মর্তের কৃতিত্ব মুছে যায়, খসে যায় কর্মফল।
গূঢ় এ আকাশে নিজেকে পেয়েছে যে-ই স্বয়ম্ভূ সম্রাট
সার্বভৌম; সকলি এখানে তার, এখানই সকল।
পিতামাতা ভাইভগ্নী পুত্রকন্যা পত্নী বন্ধুজন
সকলি এখানে; আছে গন্ধবায়ু কুসুমমালিকা
বিহগকূজন আহার্য-রোচন; এখানে সঙ্গীত
ইচ্ছামাত্র বেজে ওঠে, প্রাণের সঙ্গিনী কাছে কাছে—
সবকাম্যধন-কেন্দ্রে মূর্ত সদা আনন্দ অগাধ।
সমস্ত সুখের সমাহার এই আত্মার আবাসে,
তবু মিথ্যা আবরণে আছে সবই ঢাকা। অজ্ঞান যে
বাহিরেই ঘোরে ফেরে, জানে না যে মর্মতলে তার
মহারসের ভাণ্ডার; যে জানে সে খোলা পায় দ্বার।*

* ৮০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা

সাবিত্রীমন্ত্র

শিবশম্ভু সরকার

অসহ্য এ রিক্ততার পরম পুণ্যতা
জীবনের কী দিল বারতা
কী কহিল কথা
—শুধু দিনযাপনের গুটি-গুটি নিরীহ শান্ততা—
অর্থহীন কথাচালা ঘরভরা বিরাট শূন্যতা!
নাহি ঋতি, নাই গতি—
অচল অসাড়ে পরিণতি!
'লোক মান্যি' যায় যদি—তাই সাবধান!
প্রাণে সাধ—হবে পুণ্যবান—
তাই মাথাভাঙা স্তব্ধতার মাঝে
সূর্য উঠে—নিবে যায় সাঁঝে।
চায় ক্ষোভ—বিপুল স্ফারণ
চূর্ণ হোক মূঢ় সঙ্কোচন
চায় দাহ—প্রতপ্ত বিদার
বজ্র হানিবার—
উন্মত্ত মন্থন হতে জীবন বন্যায়
অসীম অজস্রতায়
বাহিরিবে প্রাণ আর ঘোষিবে মল্লার—
সৃজনের পাশাপাশি নাচিবে সংহার।
প্রাণের উৎভঙ্গ হতে বিষ ও সুধার
নিত্য আস্বাদন
জীবনেরে করিবে জীবন!
—ঘুমন্তের দৃপ্ত জাগরণ
ভাঙিবে স্বপন
রিমিঝিমি সঙ্গীতের মুগ্ধ আলাপন
সাবিত্রীর নব উদ্‌ভাষণ।*

* ৭৬ বর্ষ, ৭ সংখ্যা

মন্দির ও দেউল

শান্তিকুমার ঘোষ

পাহাড়-চূড়ায় মন্দির ঃ
পাথরের ধাপ ভেঙে পৌঁছনো দেবতার সমুখে।
নিচে অশ্রুমতী নদী, যার সরস সবুজ দু-পারে
গড়ে উঠেছে জনপদ—
জনসঙ্ঘ অধিকার করেছে নির্জনতাকে।
আমার ইচ্ছা ঢেউ তোলে নারকেল গাছ-ঘেরা ফসল খেতে,
ফোটায় শেষ গোলাপ বন্ধ্যা জমিতে।
দেবতা দেবেন স্থিতি, অবসর
উপচে-ওঠা ভালোবাসা হৃদয়-হৃদয়ে।

ঘুমের ভিতর থেকে জেগে বইছে নদী
এই সকালে কুয়াশায় ঢেকে ফেলছে সাঁকো
এক-একটা বজরা বয়ে নিয়ে যায় শস্যভার বন্দর অবধি
সোনার মুহূর্তটিকে তুমি পারো যদি ধরে রাখো
আমি তাকাতে পারি না জলের দিকে—কে ধরবে
স্রোতে ভেসে-যাওয়া মালা
গোলাপ-বাগের বুকের উপর শুধু বয়ে যাচ্ছে সুবাতাস
বুলবুলির স্পষ্ট স্বর পুষ্পিত ডালে; কাঠবিড়ালী দ্যাখে
গাছের ছায়ায় রামসীতার পালা
মানুষ গড়লো করজোড়ের মতো দেউল,
যা ছুঁতে চাইছে হৃদয়াকাশ।*

* ৮৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

হৃদয়তীর্থ

সেখ সদরউদ্দীন

পুণ্য-লোভে কোথায় ছোটো, মন যে উচাটন,
ঘরের কোণেই আছে তোমার কাশী-বৃন্দাবন!
অশ্রু মুছাও আজ তাহাদের নেইকো যাদের নাথ,
দেখবে আপন হৃদয়-মাঝেই আছেন বিশ্বনাথ!
কাছের মানুষ জানতে হবে দূরে ছুটে নয়,
আপন-হৃদয় গহন কোণই সর্বতীর্থময়।*

---

* ৬৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

সহজিয়া

ল দাশ

দুঃখবাদের জাল বুনিনাঃ হইনি আমি শঙ্কিত;
আমার বীণা মধুর গানে আজো যে হয় ঝঙ্কৃত।
ধ্যান করি না চক্ষু বুঁজে,
পাব নাকো যে ধন খুঁজে;
অকারণে অসন্তোষের ক্ষোভ করি না সঞ্চিত।

দুঃখ, ব্যথা, আঁধার আছে এই ধরণীর বক্ষেতে,
এই দেখে ভয় করব শুধু! দেখব না সে চক্ষেতে
বিচিত্র রঙ, রূপের খেলা,
দিকে দিকে আলোর মেলা—
তৃপ্তি আছে, শান্তি আছে বিচিত্রিতার অঙ্কেতে।

চোখের জলে বুক ভরেছে—শুনেছি যে তার মাঝে
বুকের বীণার একটি তারে কী প্রশান্ত সুর বাজে।
আঘাত পেয়ে তাই অকারণ
করি না কো মৃত্যু স্মরণ;
দুঃখ-সুখের সহজ পথে চলতে না পাই শঙ্কা যে।*

* ৫৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

আমার বুকের মধ্যে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

আমার বুকের মধ্যে এত আলো রাখিতে পারি না,
আমার বুকের মধ্যে এত গন্ধ বহিতে পারি না,
আমার বুকের মধ্যে আজ এত অমৃত-যন্ত্রণা,
এত সুখ, এত স্বপ্ন, এত রাত্রি, সম্পন্ন স্বচ্ছল দিনের
উন্মীলন, এত শব্দ, এত শান্তি,
এত দুঃখ আনন্দ অপার,
আমার বুকের মধ্যে সাত সাগর ঊর্মি-কলস্বনা।
আমার বুকের মধ্যে আজ এত অনুভূতি,
মহাজীবনের রূপোদ্ধত জয়োল্লাস,
বিদীর্ণ আলোকমালার অপরূপ অপাবৃত্তি,

এত প্রাণ-প্রৈতি আর পারি না সহিতে।
আমার সমগ্র সত্তা সীমাহীন স্বপ্নে সঙ্গীতে
শতধা বিদীর্ণ হচ্ছে, সমগ্র আশা ও ইচ্ছা-বাসনার
উন্মীলনে অন্তহীন অনিবার্য হৃদয় আমার
মুক্তি চায়!
কী যেন করিতে চাই—করিতে পারি না।
কী যেন বলিতে চাই—বলিতে পারি না।
কী যেন গাহিতে চাই—গাহিতে পারি না।
আমার সর্বস্ব আমি দিতে চাই—একটি অঞ্জলি।
কিন্তু কাকে দেব আমি?
—"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ?"
কে আমার সর্বসমর্পণ
হাত পেতে তুলে নেবে?
কে আমাকে বাজাবে যে বীণা
আমি তা জানি না।
আজ চৈতন্যের অব্যর্থ বিজলী
চমকিত হয়ে উঠছে বারবার;
বুকের অসহ্য অনিন্দ্য বিবরণ
কার শ্রুতি-লগ্ন করব?
আমার বুকের ব্যথা বৃষ্টি হতে চায়,
আমার সমুদ্র-ইচ্ছা লক্ষ লক্ষ দুরন্ত নদীর
হৃদয় বহাতে চায় অমল জলের শিল্পে,
হয়ে শুদ্ধ গানের চারণ!
যেখানে যে তীক্ষ্ণ রৌদ্রে সকলকে নিবিড় ছায়ায়
আবৃত করিতে চায়, অনন্ত আকাশ হতে
অমল শিশির হয়ে ঝরে যেতে চায়—
সহৃদয় শান্তি সান্ত্বনা।
আমার বুকের মধ্যে এত স্বপ্ন, এত আলো,
এত ইচ্ছা, সমুদ্র-শান্তির সম্মেলন,
বিশ্বের সবার জন্য সার্বিক সুখের প্রস্তাব
এইখানে অনূদিত হোক—
হোক সকলের সহজ স্বভাব
তোমার আমার জন্য—সকলের জন্য এক
অনির্বাণ আনন্দ আলোক।*

* ৯৫ বর্ষ, ৭ সংখ্যা

অগ্নিশুদ্ধি চাই

সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম।।"
(ঈশ-উপনিষদ্, ১৮)

—হে অগ্নি, মহার্ঘ বস্তুলাভের জন্য আপনি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যান; হে দেব, সর্বপ্রাণীর কর্ম ও চিত্তবৃত্তি আপনার জ্ঞাত আছে—আপনি আমাদের নিকট হইতে কুটিল পাপ বিদূরিত করুন; আপনার প্রতি বহু নমস্কারবচন উচ্চারণ করিতেছি। (অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ)

"বারবার রাত্রি দিয়ে দিন যদি মুছি,
হে পূষণ! কবে হব শুচি?" ('পূষণ'—প্রেমেন্দ্র মিত্র)

চারিদিকে মিসকালো অন্ধকার।
অন্ধকার ছাড়া আর
কোনদিকে কিছু নেই আজ।
কি করে থাকবে যদি আমাদের একমাত্র কাজ
হয় রাত্রি দিয়ে দিন মুছে ফেলা?
এ এক বীভৎস খেলা
খেলেই চলেছি অন্ধকারে—
অন্ধকার নিয়ে কাড়াকাড়ি; কেউ কারে
দেখি না
চিনি না।
দেখে চিনে কী দরকার!
দুই চোখে অন্ধকার মাখি, আর
মনের কন্দরে
আঁধার জমাই থরে থরে।
কবি প্রশ্ন করে—এই যদি চলে তবে
শুচি হব কবে?
কে যেন উত্তরে বলে—শুচি হবে
অগ্নিশুদ্ধ হতে যদি পার, তবে।
আজ তাই
অগ্নিশুদ্ধি চাই।

অগ্নিশুদ্ধ না হতে পারলে, জেনো, শুচিতা আসে না;
আজ জেনো, অগ্নিশুদ্ধি পণ্য নয়, যায় নাকো কেনা।
অতএব একমনে আগুনকে ডাক—
পাথর-গলানো স্বরে বল—যেখানেই থাক
অগ্নিদেব, প্রাণসখা, দেখা দাও,
জ্বলে উঠে প্রচণ্ড উত্তাপে, জ্বালাও—জ্বালাও
যত কালো দৃষ্টি, কালো মন, আর
এই পাপ অন্ধকার।
আগ্নেয় ফতোয়া কর জারি—
আর যেন রাত্রি দিয়ে দিনগুলো মুছতে না পারি।
হে অগ্নিদেব! ওগো বন্ধু মহৎ!
আমাদের দেখাও সুপথ।*

* ৯৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা

প্রত্যাশা

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

একদিন সাড়া দিয়েছিলে
‘সখা’—ডাকে অর্জুনের,
পাশে এসে দাঁড়িয়েছ
তার নেতা ও চালক,
নিবাস শরণ সুহৃদ।
আজকের এই শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুদ্র অর্জুনের
নেই কোন সমপ্রাণতার অহঙ্কার,
অধিকার নেই সঙ্গ পাওয়ার।
সে শুধু অন্ধকার পথে
একটু আলোর প্রত্যাশী।
জীবন-জ্বরের তাড়নায় তপ্ত ভালে
তোমার কোমল হাতের স্পর্শ পেলে
আবার শক্তি পাবে
বিগতজ্বর হয়ে যুদ্ধ করার।*

* ৯৯ বর্ষ, ২ সংখ্যা

ভোরের প্রতীক্ষায়

পলাশ মিত্র

পথের ভিতর গভীর আবর্তে
তুমি কি আতঙ্কে অস্থির পথিক?
না কি, এরকম টালমাটাল অবস্থা
তোমার নিজেরই নির্মাণ?
আকাশে যখন
অনাবিল চন্দ্রিমার আলোর জোয়ার
বন্ধ জানালা খুলে দিত—
তখনও কি তুমি
উদ্বেলিত নদীর মতোই চঞ্চল?
কাল রাতে ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার।
কালো মেঘে ছেয়ে ছিল সমস্ত ভুবন-
আজ দেখ ভোর হলোঃ
সূর্য
জবাকুসুমসঙ্কাশং....।*

* ৯০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

অনির্বাণ অগ্নি

চিত্তরঞ্জন মাইতি

তোমার দেহ ঘিরে অগ্নির বলয়,
উষ্ণীষ—অগ্নির শিখা।
হে জাতবেদাঃ—অগ্নি,
তুমি গ্রাস করছ, ধ্বংস করছ
যাকিছু অশুভ তমোময়
পুঞ্জীভূত আবর্জনার পর্বত।
একদিকে তুমি রুদ্র—তাণ্ডবে প্রমত্ত,
অন্যদিকে প্রসন্ন বরদ সমাহিত শিব।
তোমার এক হস্ত ধরে আছে—
সর্ব খর্বতা দহনের দীপ,
অন্য হস্ত—মৃতসঞ্জীবনী সুধার ভৃঙ্গার।
ঋষিলোক থেকে
তুমি অর্জন করে এনেছ অনির্বাণ তেজ,
দেবলোক থেকে জ্যোতির অনিঃশেষ ধারা।
হে অগ্নি-সম্ভব পুরুষ,
আমি নতজানু—
তুমি দগ্ধ কর দীনের অতি ক্ষুদ্র অহঙ্কার,
তোমার তিমিরবিদারী আলোর দীপ্তিতে
অপগত হোক আমার অন্তরের সঞ্চিত তমসা।*

* ১০০ বর্ষ, ১ সংখ্যা

জীবনজিজ্ঞাসা

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

জীবনের পায় হাঁটা পথে হলো অনেক সৃজন
কোন রাঙা কোন বা সবুজ বুঝে এ অবুঝ মন।
প্রলেপ লেগেছে আঁতে তারি কত রঙের বর্ণালী,
জীবনের ফুল ফল পাতারূপে এঁকেছে সোনালী
মনছোঁয়া আকাশের সূর্যমণি চোখের তারায়;
মাঝে মাঝে পথ ছেড়ে যায় যেন কোন ছলনায়।
জীবনের প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রজ্বলিত জানি দ্যুতি-দীপ
আনে পথ প্রদর্শন করে করে যেথা কুঞ্জ-নীপ।
জানি দূর বনান্তের বাণী মেঘে ও মলয়ে আসে
নিত্যকার জীবনখেলায় যারা শুধু মধু হাসে,
তাদেরই বুকের পাঁজরে আলো যদি থাকে জ্বালা
সত্য ও শ্বাশত হবে ধর্ম-ফুলে মাধবীর মালা।
কিছু দুঃখ কিছু সুখ জীবনের নিয়ে পথ চলা
দেখে দেখে পৃথিবীর প্রান্তলীন শুচির শ্যামলা।
তাই ছন্দ পদে পদে উঠি বাজে নূপুর-নিক্কণে
অন্তরের অস্থির যন্ত্রণা পুষে কর্দম-কাঞ্চনে।
দিনে রাতে কালো আলো বিচিত্রের তীরে বসে ভাসা,
চলন্ত পথের মাঝে তাই জাগে জীবন-জিজ্ঞাসা।*

৫৮ বর্ষ, ৭ সংখ্যা

কল্পতরু

বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কে তুমি দাঁড়িয়ে আছ
সতত দীপমান জ্যোতিষ্কের মতো
আমাদের এই অন্ধকারে?
কে তুমি নীলকণ্ঠ, পান কর
আমাদের যত পাপ, গ্লানি আর অবক্ষয়

তুমি কল্পতরু
এই অন্ধকারে আলো দেবে বলে
সত্য হয়ে
প্রেম হয়ে
এবং আমাদের সকলের ঈশ্বর হয়ে
আবার এসেছ
এই অন্ধকারে।*

* ৯৬ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

বিজয়ী

নূপুর গুপ্ত

মৃত্যুকে শ্রদ্ধা কর,
সে এসে দাঁড়ালে বিনীত হয়ে মাথা নামাও।
জীবন এক অখণ্ড লড়াই সন্দেহ নেই,
কিন্তু সে দিতে পারে না বিজেতার গৌরব,
মৃত্যুই জীবনকে দেয় বিজয়ীর মুকুট।
জীবনের বড় পক্ষপাতিত্ব,
অনেক ভেবে, বিচার করে সে অলঙ্কার দেয়
প্রাপকের হাতে—
কাউকে শান্তি, কাউকে চিরজ্বালা,
কেউ পায় লক্ষ্মীর ঝাঁপির উপছে পড়া ধন
কেউ হাহাকার করে দু-মুঠো চালের জন্যে;
ভরা আঁচলে আবার ঝরে নতুন উপহার
—হয়তো জীবনের খেয়াল থাকে না
কাকে কখন কি দেওয়া উচিত।
মৃত্যু কিন্তু অবিচল তার নির্বিচার আশীর্বাদ বিতরণে।
নিজের দান সে মাপে না জীবনের মাপকাঠিতে।
যুদ্ধের শেষে ক্লান্ত সৈনিকের জন্য
শান্তির প্রলেপ নিয়ে অপেক্ষা করে
চির আশ্রয়ের আশ্বাস নিয়ে।
তাই মৃত্যু নিরপেক্ষ দাতা, অবিচল দর্শনে,
সমদৃষ্টি তার মূল্যায়নে।
জীবনের চেয়ে সে মহান, নির্ভুলভাবে সার্থক।
মৃত্যু এলে তাকে শ্রদ্ধা জানাও,
শোকে বিনত হয়ে, নীরব অভিবাদনে।*

* ৮৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

কোন্ পথে তার যাত্রা

দেবী রায়

বল, শুষ্ক-বক্তৃতায়—উপদেশে কি কাজ?
সর্বাগ্রে দেওয়া চাই নিরন্নের মুখে অন্ন, আর্তের পাশে
গিয়ে সেবকের ভূমিকায় যথার্থ দাঁড়ানো
নচেৎ, সবকিছুই হয়ে উঠবে আড়ম্বর,
কি প্রয়োজন ঐসব মূঢ়-সাজ!
নচেৎ, সদুপদেশ হয়ে উঠবে খামোকা এক প্রহসন
জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষই ভাল,
যদি পার তাকে নাও—কাছে টেনে নাও... 'ও ছন্নছাড়া মন'
আঁধার মানেই পেচক নয় কিংবা শৃগালও।
বোঝাও, ব্যাকুল হয়ে যে ডাকে
তার জটিলতা, ভয়, ভুলচুক এখুনি সরে যাবে
তার আঁধার নিশা—নিশা পোহাবে।
ভুলের বিনুনি থেকে জট খোলো, মানবহৃদয়
সূর্যকে লক্ষ্য করে দেখ—
কোন্ পথে, তার সুস্পষ্ট-যাত্রা অগ্রসর হয়।*

* ৯০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা

রাধাকৃষ্ণ

মঞ্জুভাষ মিত্র

'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্'

ধীর ও ললিতভাবে ঈশ্বরের আলিঙ্গিত সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ স্বরূপ
বংশীর বাদনরত দেবতার কাছে এসে পরিপূর্ণ সমর্পণকারী
আহ্লাদিনীপ্রেমসার মহাভাব ভক্তিরানী আনন্দের স্নিগ্ধ কুটম্বিনী
বেতসনিকুঞ্জতলে ও বৃন্দাবিপিনে রটে দুজনের মিলনকাহিনী
যমুনার নীলতীরে রতিসুখসার-ভাষা জ্যোৎস্নাবতী শুক্ল অভিসার
হরির রভসে ভোর গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা-তনু থরো থরো লাবণ্য বিথার
পুরুষের কাছে এসে মধুর প্রচেষ্টা করে সে-পুরুষ উৎকর্ষে পরম
চিন্তার অতীত স্তরে ভাবঘন সু-বর্ষার গদগদ কদম্বের রূপ

অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গনে নারীর লাবণ্য যেন কৃষ্ণদেহ ঢেকে দিতে চায়
গোপীকুলতিলোত্তমা প্রেয়সীস্বরূপ হয়ে পৃথিবীতে প্রেম জিজ্ঞাসায়
ঈশ্বর আসেন নেমে, ফাল্গুনী পূর্ণিমাচাঁদ পদাবলী কীর্তন ছড়ায়
শতচন্দ্রে স্বরধ্বনি রঙে মত্ত গোপাঙ্গনা আনন্দের উৎফুল্ল জোয়ার
ছন্দোময়ী কাব্য আনে, ভাবময়ী গীতিগানে হৃদয়ের উৎস খুলে যায়
রাধাকৃষ্ণভাবমূর্তি কবিতার রজঃস্থলী নিরন্তর প্রভাবিত করে!*

---

* ৯৩ বর্ষ, ৮ সংখ্যা

কোন্ দিকে যাবে?

কৃষ্ণা বসু

কোন্ দিকে যাবে?...
দক্ষিণের দিকে যাবে নাকি তুমি?
দক্ষিণবাহিনী নদী, তার তীরে শ্মশান রয়েছে,
সেইখানে কাপালিক আছে,
মৃত হাড়, ধূসর করোটি,
মড়া পোড়ানোর কাঠ, আধপোড়া চিতাটির
নিভন্ত আগুন,
সেই আগুনের অভিশাপ আর
প্রলাপের মতো সঙ্গিহীন
বসন্ত-বাতাস ঘোরে দক্ষিণ প্রান্তরে।
শীতল উত্তর দিক টানে কি তোমায়?
পাতালের থেকে আসে উন্মাদ বাতাস;
শান্ত সাদা তুষার-মানব হিমচোখে
চেয়ে আছে, তোমার ভিতর অবধি নিচ্ছে দেখে
তার ঠাণ্ডা দু-চোখের রঞ্জনরশ্মিতে।
তুমি কি পশ্চিমে যাবে?
পশ্চিমের দিকে আছে ফাঁকা মাঠ, কেউ নেই,
সকলেই চলে গেছে ব্যক্তিগত উৎসবের দিকে,
কেউ বসে নেই। তোমাকে নেবে না ডেকে কেউ,
অতিথি আসনখানি কেউ দেবে না তো পেতে।
দরজা জানালা হাটখোলা, ধুলোয় ভরেছে ঘর,
বহুদিন ব্যবহারহীন ঠাণ্ডা শয্যা, বিছানা বালিশ;
সাদা, মৃতের হাড়ের মতো সাদা;
দূর থেকে উৎসবের বাজনা আসে ভেসে,
ওখানে তোমার কোন আমন্ত্রণ নেই,
তোমার জন্যই কেউ ভোরবেলায় কান পেতে নেই!

পূর্বদিকে যাবে ভাব ?
বহুকাল আগে তৈরি ছোট ঘর,
তোমার মাঠের চেয়ে ছোট,
তোমাকে ধরবে না, পূর্বদিকে মানুষেরা আছে,
তারা সব তোমার অচেনা, ছোট ঘর, মাথা নিচু করে
সেই ঘরে ঢোক যদি...
তেমন নুয়ে পড়া কি তোমাকে মানায় ?
কোন্ দিকে যাবে তুমি ? কোন্ দিকে ?
বলো কোন্ দিকে ?...*

* ৯৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

গম্ভা

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।'
—স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা

দৃষ্টিসুখে এস হৃদয়নিধি মোর,
জানি না কি ছলনা দারুণ বিধি ঘোর।
হৃদয় অর্পণ করেছি ভালবেসে
আমার দেহ এই আপন করেনি সে;
কোথায় ওগো প্রিয়, হে অন্তরতম,
জান না এ বিরহ কঠিন কি যে মম।
কে তুমি বসে এই চিত্তে কর পান
বিশ্বসুধা রস, না করি ব্যাখ্যান।
ললিত কান্তিতে মধুর ভ্রান্তিতে
যে-রস লীলারূপে ধরেছে নবকায়,
বাইরে রাধা, তার ভিতরে শ্যামরায়।
ধ্রুবজ্যোতি রূপে ছিলাম একাকারই,
কি রসতৃষ্ণায় হলো যে ছাড়াছাড়ি!
কোথায় প্রিয় মোর, কোথায় তুমি থাক ?
এ শচীদুলালের হৃদয় ভেঙে যায়;
বাইরে রাধা সে যে ভিতরে শ্যামরায়।*

* ৯৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

যে-সেতু মানুষের মুক্তিদাতা

শেখ আবদুল মান্নান

আমার চারপাশে একটা দাম্ভিক বৃত্ত রচনা করা
এখানে সমীহ্ নয় ভয়ের সঙ্গে ভালমন্দের ফারাক
একটা তাজা গোলাপের শেষ ঘ্রাণ...
জীবনের 'লাস্ট সাপার',
ফুটন্ত বুদ্বুদের কাছের মানুষ আমরা
সারা গায়ে সুখ মেখে দরজায় খিল দিয়ে বসে থাকি,
ঐশী প্রেরণায় দীপ্ত আচার্য উদাত্ত কণ্ঠে
শোনায় দরদী ও সুরসিক স্বর...।
শাশ্বত সনাতন বেদান্তের সুর কোকিলের
কণ্ঠ বেয়ে অনায়াসেই দিগ্বিজয় সম্পন্ন করতে পারে
একটা মসৃণ, কুসুমাস্তীর্ণ সেতু অনায়াসেই
সাত রঙের বর্ণালী... এক সূর্যকিরণ
জ্যোতির বর্ষণই সমান মুক্তিদাতা
বিষণ্ণ মুখগুলো সারবদ্ধ দাঁড়িয়েছে রাস্তায়
জ্যোতির জ্যোৎস্নায় অভিস্নাত হবার ব্যগ্রতায়...।*

---

* ১৮ বর্ষ, ৩ সংখ্যা

বাতাসে ফুলের গন্ধ

উত্থানপদ বিজলী

বাতাসে ফুলের গন্ধ, দশদিক আমোদিত।
ঘৃণা থেকে আসেনি এ-গন্ধ,
আসেনি ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, ক্রোধ
কিংবা হিংসা থেকে,
তাই মানুষ প্রতীক্ষায় বসে থাকে।
প্রতীক্ষায় বসে থাকে চিরদিন
কাঙালের মতো দীন প্রার্থনায়
এই হীরকখণ্ডের জন্যে।
ফুল আর কিছু নয়—একটি হৃদয়
আর, গন্ধের অপর নাম ভালবাসা।
ফুলের গন্ধ ছড়ায় রসিক বাতাস
দশদিক আমোদিত করে।*

---

১৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা

শান্তির সন্ধানে

মেরী দাস

শান্তির সন্ধানে ফিরেছি।
শহরে, গ্রামে, বিভিন্ন লোকালয়ে,
গেছি গির্জায়, মন্দিরে, মসজিদে, গুরুদ্বারে—
কোথায় যেন একটা সীমার বন্ধন—
একটা ধর্মান্ধতা, স্পর্শকাতরতা—
আশাহীন হয়ে ফিরে এসেছি
রিক্ত চিত্ত নিয়ে।
কোথায় শান্তি, সব কি ভ্রান্তি?
মন ভরে গেছে দীনতায়।
পথের শেষ হলো ঠাকুরের মূর্তির
সামনে এসে—
সন্ধ্যারতির সাথে সাথে চলছে স্তব—
"খণ্ডন ভববন্ধন..."
সাধু-ভক্তরা সব উপবিষ্ট
ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে;
মন্দির কাঁপছে যেন থর থর মদিরতায়
সুন্দর সন্ধ্যা, মধুর পরিবেশ;
মনের পাখি গান গেয়ে উঠল;
অজানিতে হাত জোড় হয়ে এল—
ভূমিষ্ঠ হয়ে করলাম প্রণাম।
আকণ্ঠ ভরে করলাম পান
শান্তির স্রোতোধারা।

আমি খ্রীস্টান, সকলের সাথে
এক করে আমাকে কোলে তুলে নিল
কে এই মহামানব!
হে রামকৃষ্ণ, তোমার চরণে এসে
পেলাম পরিপূর্ণ শান্তির সন্ধান।*

---

* ১৩ বর্ষ, ৬ সংখ্যা

উপলব্ধি

চিরপ্রশান্ত বাগদী

উপলব্ধি ছিল, তবে এত ঘন ছিল না
ঘন সেদিনই হলো,
যখন শববাহকের কাঁধে
শবদেহ দেখেছিলাম
সেদিন মনে হলো,
'আমি' এই শব্দটির আবিষ্কর্তা
অত্যন্ত মূর্খ-মূঢ়;
উপলব্ধি ছিল, তবে এত ঘন ছিল না
ঘন সেদিনই হলো,
যখন মুখ-নিঃসৃত শব্দ-ভাষার
উৎস খুঁজেছিলাম
সেদিন মনে হলো,
শব্দের উৎস জল-মাটি-বায়ু
কারণ এসবেই উদ্ভব।
উপলব্ধি ছিল, তবে এত ঘন ছিল না
ঘন সেদিনই হলো,
যখন গঙ্গায় জোয়ার কালে
সূর্য-প্রণামরত একজনকে দেখলাম
সেদিন মনে হলো,
ব্রহ্ম মানুষের ভিতর অবস্থিত
সূর্য ও মানুষ মূলতঃ এক ও অভিন্ন।*

* ৯২ বর্ষ, ১১ সংখ্যা

অরূপের রূপ

নিমাই মুখোপাধ্যায়

একটা একটা রূপ অরূপ হয়ে যায়।
সমুদ্রের কাছে যত এগোতে থাকি
হাত বাড়িয়ে দিয়ে সমুদ্র বলে বুকে আয়।
অনেকদিন সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখেছি
সাদা, কালো, ধনী, গরিব—একই আহ্বান শুনছে।
সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে মায়ের কোলে।
কোলে দোল খেতে খেতে সবাই শিশু হয়ে যায়।
মানুষের দেবত্বের রূপ ফুটে ওঠে।
সমুদ্র যেখানে আকাশে গিয়ে মেশে
সেখানে মনে হয় তুমি হাত বাড়িয়ে সবাইকে ডাকছ ঃ
চলে আয়, চলে আয়।
মানুষের প্রতিদিনের প্রাণধারণের জন্যে যে যুদ্ধ
সে যুদ্ধে কত রক্তক্ষরণ হচ্ছে।
কেউ কেউ পাগলের মতো ছুটে চলেছে
কেউ বা শান্ত।
দুঃখে তাপিত বা সুখে বিগলিত
সবাইয়ের জন্যেই তোমার ব্যাকুলতা।
সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে তাই তোমার আহ্বান শুনতে পাই ঃ
কে কোথায় আছিস, ছুটে আয়,
ছুটে আয় আমার বুকে।
সব জ্বালার অবসান করতে
শান্তি পেতে
আমি তোদের সকলের মা
আমি যে সারদা।*

---

* ৮৫ বর্ষ, ১২ সংখ্যা

সাহারার আকাশে ফোটাই

নিভা দে

এমন অনিকেত মানুষ কখনো হয়নি আগে।
যেন সাহারায় পথ হাঁটা দিবানিশি—
চারদিকে শুধু ধুলো, ধোঁয়া আর বালি
কী করে যে ভেঙে গেল রম্য বাসভূমি।
ভেঙে যায় এভাবেই বুঝি—এভাবেই
সব কালে কালে।
স্নায়ুতে স্নায়ুতে হাহাকার—দুরন্ত খরা—
ভিতরে ও বাইরে—অনিঃশেষ দহন।
ভীষণ দুরন্ত ইচ্ছা তাই মাথার ভিতরে
জেগে ওঠে—
সাহারার আকাশে ফোটাই অজস্র মেঘের পদ্ম
মাটিতে পুঁতে দিই গোপন প্রেমের যত অভিলাষ
চারদিগন্ত জুড়ে শান্তির শ্বেত পারাবত
উড়ুক শুধু ডানায় দীঘল শব্দ মেলে মেলে।
এইভাবে গড়ে তুলি আর এক অলকাপুরী
আর এক মানস সরোবর তীরে।*

---
* ১২ বর্ষ, ৭ সংখ্যা

তোমার জন্যে

জয়নাল আবেদিন

আমার এই হাত রেখেছি তোমার হাতে
আমার চোখের মাঝে তোমার দুই চোখ
তবু কেন ব্যবধান, মৌনতা সঙ্ঘাতে
বুকের গভীরে বাজে ব্যথাতুর শোক।
তোমার আহ্বান কি আমাকেও চায়?
আমার সর্বস্ব শুধু তোমার জন্যে আছে
হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়ে ধুলো বালি ছাই
এত কাছে আছ, তবু নেই কাছে।*

---
* ১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা

জীবনের মুখোমুখি

শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের কাছে হাত পেতে
শুধু অমৃত চেয়েছ বলে
জীবন-পলাতক তুমি
বারবার দূরে সরে গেছ জীবন থেকে
জেনে রাখো, শুধু অমৃতের স্বাদও
কখনো কখনো তেতো হয়, বিস্বাদ লাগে।
সমুদ্রমন্থনের গরল ও অমৃত দুই-ই তোমার নিয়তি।
জীবনের কম্পমান লতায় পাতায়
ছড়িয়ে আছে লুব্ধগন্ধ কত ফল।
নীল নীল মুগ্ধতার আভাস
ভয়ে নয়—নির্ভয়ে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াও
তারপর হয়ে ওঠ নীলকণ্ঠ এক।*

---

*১৭ বর্ষ, ৩ সংখ্যা

প্রাণ আছে, প্রেম আছে

মিলি হীরা

আমি কিছু বলব না?
সমস্ত পতন আর সব মৃত্যু দেখেও।
 স্থাণু হয়ে থাকব?
জল্লাদরাত্রি আমার পূর্ণদিবসকে ফাঁসিতে লটকে দিক
 আমি শুধু দেখে যাব?
 আমার জড়তা ভাঙব না?
কপালে কপোলে হতাশাচিহ্ন ক্ষতচিহ্ন হোক,
 তবুও সে-ক্ষত প্রলেপ পাবে না।
আমার চতুর্দশী চাঁদ রাহুগ্রস্ত হবে
 অশ্রুবারি বইবে না?
হে আমার সৃষ্টির দেবতা—
আমাকে অহল্যা হতে বলো না।*

---

*১৯ বর্ষ, ৮ সংখ্যা

একটি সকালের জন্য

বিজয়কুমার দাস

তেমন একটি সকাল চাই
ফুলের গন্ধে আতুর, পাখির গানে মধুর
সেই সকালের জন্য
অনন্তকাল শুধু প্রতীক্ষার প্রহর গোনা...

এমন একটি সকাল
যেখানে পাখির গানে জীবনের কল্লোল
ফুলের গন্ধে সুন্দরের তপস্যা।

সেই সকালে
আমাদের দুঃখের নদী
হয়ে উঠবে আনন্দের সমুদ্র।

সেই সকালে
আমাদের সমস্ত কান্না
হয়ে উঠবে প্রেরণার কবিতা।

সমস্ত বিভেদের সীমারেখা ভুলে
সবাই হেঁটে যাবে উদ্ভাসিত আলোর দিকে...
রাতের আঁধার পিছনে ফেলে
ভোরের কুয়াশা দু-হাতে ঠেলে
সেই সকালটা আসবেই।*

তৃতীয় পর্ব

বিশ্বরূপ দর্শন*

দুই ভাব

শ্রীঅরবিন্দ

ভীষণ বিশ্বরূপ দর্শনের প্রভাব তখনো অর্জুনের উপর রহিয়াছে, সেই অবস্থায় অর্জুন ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমেই যে-কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন সেগুলি এই মৃত্যু ও ধ্বংসমূর্তির পশ্চাতের যে মহত্তর উৎসাহ ও আশ্বাসপ্রদ সত্য রহিয়াছে তাহারই নির্দেশে পূর্ণ। তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ "হে কৃষ্ণ, তোমার নামকীর্তনে সমস্ত জগৎ হৃষ্ট ও পুলকিত হয়, রাক্ষসকুল ভয়ে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধগণ অবনত মস্তকে তোমাকে নমস্কার করেন— এসমস্তই যুক্তিযুক্ত ও যথোচিত। হে মহাত্মা! তোমাকে তাঁহারা কেনই বা নমস্কার না করিবেন? কারণ তুমিই আদি স্রষ্টা ও কর্মকর্তা, তুমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা অপেক্ষাও গরীয়ান। হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস! তুমি অক্ষর, তুমি সৎ, তুমি অসৎ এবং তুমিই পরাৎপর। তুমি পুরাণ-পুরুষ, তুমি আদিদেব এবং তুমিই এই বিশ্বের পরম নিধান; তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয় এবং তুমিই পরমধাম। হে অনন্তরূপ! তোমার দ্বারাই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে।"[১] "যম, বায়ু, অগ্নি, সোম, বরুণ—সবই তুমি! তুমি প্রজাপতি, জীব-সকলের পিতা এবং প্রপিতামহ। তোমাকে পুনঃ পুনঃ সহস্র সহস্রবার নমস্কার, সম্মুখে তোমাকে নমস্কার, পশ্চাৎ ভাগে তোমাকে নমস্কার, সকলদিক হইতে তোমাকে নমস্কার, কারণ যাহা কিছু সে-সবই তুমি। তুমি অনন্তবীর্য ও অমিত-বিক্রম, তুমি সর্বত্র ব্যাপ্ত, তুমিই সব।"[২]

এই পরম বিশ্বপুরুষ এখানে মানবমূর্তি লইয়া মরদেহে তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি দিব্য মানবদেহধারী ভগবান, অবতার, কিন্তু ইতিপূর্বে অর্জুন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি কেবল তাঁহার মানব স্বরূপটিই দেখিয়াছেন এবং ভগবানের প্রতি শুধু মানুষেরই মতো ব্যবহার করিয়াছেন। পার্থিব ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তাহার পশ্চাতে যে ভগবান বিরাজিত, মানবরূপটি যাঁহার কেবল একটি আধার, একটি প্রতীক মাত্র— তাঁহাকে তিনি দেখিতে পান নাই; তাই এখন তাঁহার অন্ধ অবহেলা ও অসতর্ক অজ্ঞানের জন্য তিনি সেই ভগবানের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ঃ "হঠকারিতার বশে তোমাকে কেবল আমার মানব-সখা মাত্র জ্ঞান করিয়া, প্রমাদেই হউক বা প্রণয়েই হউক তোমার এই মহিমা না জানিয়া 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা'—এইরূপ যত সব বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, বিহারে, শয্যায়, উপবেশনে, ভোজনে, একাকী বা তোমার সম্মুখে তোমার প্রতি যতকিছু অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছি, হে অপ্রমেয়, আমার সেসব অপরাধ ক্ষমা

---

* মূল ইংরেজী হইতে অনিলবরণ রায় কর্তৃক অনূদিত।

কর। এই চরাচর সমস্ত লোকের তুমি পিতা, তুমি পূজ্য, তুমি গুরু হইতেও গরীয়ান।"[৩]

"ত্রিজগতে তোমার সমানই কেহ নাই, তাহা হইলে হে অমিত-প্রভাব, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে-ই বা হইতে পারে? অতএব বন্দনীয় ঈশ্বর, তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ের অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমি তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যাহা কেহ কখনো দেখে নাই, আমি দেখিয়াছি ও পুলকিত হইয়াছি, কিন্তু আমার মন ভয়ে ব্যাকুল। হে দেব, তোমার সেই অন্য রূপ দেখাও। আমি পূর্বের ন্যায় তোমার কিরীট-গদা-চক্রধারী রূপটি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি। হে সহস্রবাহু, হে বিশ্বমূর্তি, তোমার চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ কর।"[৪]

প্রথমোক্ত কথাগুলি হইতেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই করাল রূপসকলের পশ্চাতে যে-সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা আশ্বাসময়, উৎসাহজনক এবং আনন্দপূর্ণ সত্য। এমন কিছু সেখানে রহিয়াছে যাহাতে ভগবানের সান্নিধ্যে, ভগবানের নামে জগতের হৃদয় হৃষ্ট ও পুলকিত হয়। ইহা সেই গভীর তত্ত্ব, যাহার কল্যাণে আমরা কালীর করাল বদনের মধ্যে মায়ের মুখ দেখিতে পাই, এমনকি ধ্বংসের মধ্যেই সর্বভূত-সুহৃদের বরাভয়প্রদ হস্ত দেখিতে পাই, অশুভের মধ্যেই শুদ্ধ অপরিবর্তনীয় কল্যাণ রূপকে দেখিতে পাই এবং মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতত্বের অধিপতিকে দেখিতে পাই। দিব্যকর্মের অধীশ্বরের করাল মূর্তির সম্মুখ হইতে অন্ধকারের দুর্দান্ত দানবীয় শক্তিসকল, রাক্ষসকুল নিহত পরাজিত অভিভূত হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু সিদ্ধগণ, যাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ের নাম জানেন ও কীর্তন করেন এবং তাঁহার সত্তার সত্যে বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার প্রত্যেক রূপের সম্মুখেই প্রণত হন এবং জানেন প্রত্যেক রূপের মধ্যে কি বস্তু আছে এবং তাহার অর্থ কি। বাস্তবিক কাহারো ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। ভয়ের কারণ আছে শুধু তাহাদেরই, যাহাদিগকে ধ্বংস হইতে হইবে—অশুভ, অজ্ঞান, নিশা-চমূ রাক্ষসী শক্তি-সঙ্ঘ। করাল রুদ্রের যত গতি, যত ক্রিয়া—সমুদয়েরই লক্ষ্য সিদ্ধি, দিব্য জ্যোতি ও পূর্ণতা।

কারণ এই যে আত্মা, এই ভগবদ্ পুরুষ—ইনি শুধু বাহ্যরূপেই সংহারক। এইসব সসীম বস্তুর ধ্বংসকর্তা মহাকাল, কিন্তু নিজের সত্তায় তিনি অনন্ত বিশ্বদেবগণের অধীশ্বর, তাঁহারই মধ্যে জগৎ এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়া নিশ্চিতভাবে বিধৃত। তিনি আদি এবং সর্বদা উদ্ভাবনশীল সৃষ্টিকর্তা, তিনি দৃষ্টিশক্তির মূর্তরূপ ব্রহ্মা অপেক্ষাও গরীয়ান। তাঁহার যে ত্রয়ীভাব স্থিতি ও ধ্বংসের সাম্যের দ্বারা বিচিত্রিত সৃষ্টি, ইহারই শুধু একটি ভাবরূপে তিনি ব্রহ্মাকে বিশ্বরূপের মধ্যে দেখাইয়াছেন। প্রকৃত যে দিব্যসৃষ্টি তাহা শাশ্বত, তাহা হইতেছে সসীম জিনিসের মধ্যে অনন্তের নিত্য প্রকাশ। পরমাত্মা তাঁহার অগণন অনন্ত জীবাত্মায়, তাহাদের কর্মের মহিমায়, তাহাদের রূপের সৌন্দর্যে নিজেকে চিরকাল লুক্কায়িত ও প্রকটিত করিতেছেন। তিনি সনাতন, অক্ষর, সৎ, অসৎ, ব্যক্ত, চির-অব্যক্ত। যেসব জিনিস ছিল কিন্তু এখন আর নাই বলিয়া মনে হয়, যেসব জিনিস আছে কিন্তু ধ্বংস হইবেই বলিয়া মনে হয়,

যেসব জিনিস ভবিষ্যতে হইবে এবং লোপ পাইবে—এসব তাঁহারই দুই ভাব। কিন্তু এইসকলের উর্ধ্বে তিনি যাহা, তাহা হইতেছে 'তৎপরং' পরম পুরুষ, তিনি সকল নশ্বর জিনিসকে কালের এক অনন্তের মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন, যেখানে সবই চির-বিরাজমান। তাঁহার অক্ষর সত্তা রহিয়াছে কালের অতীত অনন্তে; কাল এবং সৃষ্টি তাঁহারই চির-প্রকাশমান রূপ।

তাঁহার এই যে সত্য, ইহার মধ্যেই সকলের সমন্বয় হইয়াছে; যুগপৎ ও পরস্পরসাপেক্ষ সত্যসকলের সামঞ্জস্য সেই এক সত্য হইতেই উদ্ভূত এবং এইসকলকে লইয়াই সেই সত্য। এই সত্য হইতেছে পরমাত্মার। যাঁহার পরমা প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি, জগৎ সেই অনন্তেরই একটি নিচের রূপ। তিনি পুরাণ-পুরুষ, কালের অন্তর্গত সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশ ধারার উপর তিনি অধ্যক্ষ হইয়া আছেন, তিনি আদিদেব। সকল দেব, মানব ও জীব তাঁহারই সন্তান, শক্তি, আত্ম-সত্তা; তাঁহারই সত্তার সত্যে সকলের আধ্যাত্মিক সার্থকতা। তিনি জ্ঞাতা, তিনিই মানুষের মধ্যে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ করিয়া দেন। তিনি সকল জ্ঞানের একমাত্র জ্ঞেয়। যিনি মানুষের হৃদয়, মন ও আত্মার সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করেন, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রত্যেক নববিকাশ তাঁহারই আংশিক প্রকাশ; আর আমাদের যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান তাহাতে তিনিই অন্তরঙ্গভাবে, গভীরভাবে, সমগ্রভাবে দৃষ্ট ও আবিষ্কৃত হন। তিনি উচ্চ পরম সংস্থান, 'পরং নিধানং'। বিশ্বে যাহা কিছু আছে তিনিই সবকে সৃষ্টি করিতেছেন, ধরিয়া রহিয়াছেন, নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার দ্বারা তাঁহার নিজেরই সত্তার মধ্যে জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে—তাঁহার সর্বজয়ী শক্তি দ্বারা, তাঁহার অলৌকিক আত্ম-রূপায়ন, তেজ এবং অন্তহীন সৃষ্টির আনন্দের দ্বারা। তাঁহার অনন্ত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক রূপসকলকে লইয়াই সমগ্র বিশ্ব। নিম্নতম হইতে উচ্চতম সমস্ত দেবতাই তিনি, জীবগণের পিতা, সকলই তাঁহার সন্ততি, তাঁহার প্রজা। তিনি ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্তা, এইসকল বিভিন্ন জাতির জীবনের দিব্যস্রষ্টা যাঁহারা, তিনি তাঁহাদের পিতার পিতা, প্রপিতামহ। এই সত্যটির উপর পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়া হইয়াছে। পুনরায় পুনরাবৃত্তি করা হইল যে, তিনি সবই, প্রত্যেকটিই তিনি, সর্বঃ। তিনি অনন্ত বিশ্বসত্তা; আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিসত্তা, প্রত্যেক বস্তুই তিনি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে এক শক্তি ও সত্তা রহিয়াছে তাহা তিনিই। তিনি অনন্ত তেজ—যাহা অসংখ্য বস্তুসকলের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করিতেছে। তিনি অপ্রমেয় ইচ্ছা এবং গতি ও কর্মের মহতী বীর্য নিজের মধ্য হইতে কালের সকল প্রবাহ এবং প্রাকৃত জগতে আত্মার সমুদয় ঘটনাকে রূপ দিতেছেন, গঠন করিতেছেন।

এই সত্যটির উপর পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়ায় মানুষের মধ্যে এই যে মহান ভগবান বিরাজ করিতেছেন তাঁহার কথা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। বিশ্বরূপ-দ্রষ্টার হৃদয়ে ক্রমান্বয়ে তিনটি তত্ত্ব উপলক্ষিত হইল। প্রথমত তাঁহার উপলব্ধি হইল, এই যে মানব-সন্তান পৃথিবীর একটি অনিত্য জীবরূপে তাঁহার পার্শ্বে বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহার সন্নিকটে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, এক স্থানে ভোজন করিয়াছেন এবং যাঁহার সহিত

তিনি কত ব্যঙ্গ-কৌতুক করিয়াছেন, যিনি যুদ্ধে, মন্ত্রণা-পরিষদে এবং সাধারণ ব্যাপারে কর্মী হইয়াছেন, ইহার দেহে—সব মানবের এই মূর্তিটির মধ্যে বরাবরই একটি মহান ও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ কিছু লুক্কায়িত ছিল—এক দেবতা, এক অবতার, এক বিশ্বশক্তি, একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক বিশ্বাতীত পরম সত্তা। এই যে গুহ্য দেবত্ব, যাহার মধ্যে মানুষ এবং তাহার সমগ্র ইতিহাসের তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে এবং যাহা হইতে সমস্ত বিশ্বজীবন অনির্বচনীয় মহত্ত্বপূর্ণ নিগূঢ় সার্থকতা লাভ করিতেছে, অর্জুন এইদিকে অন্ধ ছিলেন। কেবল এখনই তিনি দেখিলেন ব্যষ্টি-আয়তনের মধ্যে বিশ্ব-আত্মা, মানবদেহের মধ্যে ভগবান, এই প্রতীকস্বরূপ প্রকৃতির মধ্যে অধিষ্ঠিত বিশ্বাতীত পরম পুরুষ। দৃশ্যমান বস্তুসকলের এই যে বিরাট, অনন্ত, অপ্রমেয় সত্তা, এই যে সীমাহীন বিশ্বরূপ—যিনি প্রত্যেক ব্যষ্টিরূপকে অতিক্রম করিয়া আছেন, আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিরূপই যাঁহার আবাসগৃহ—অর্জুন কেবল এখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। কারণ সেই মহান সত্তা সমান এবং অনন্ত, ব্যষ্টিতে এবং বিশ্বে তিনি একই। আর প্রথমেই তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার অন্ধতা, ভগবানের প্রতি সাধারণ মানুষের ন্যায় ব্যবহার, তাঁহার সহিত কেবল মানসিক ও শারীরিক সম্বন্ধটি ছাড়া আর কিছু না দেখা—তাঁহার পক্ষে এসব হইয়াছে সেই মহান শক্তিময়ের বিরুদ্ধে পাপ। কারণ যাঁহাকে তিনি 'কৃষ্ণ', 'যাদব', 'সখা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—তিনি এই অপ্রমেয় মহত্ত্ব, এই অতুলনীয় বীর্য, এই সর্বভূত-স্থিত আত্মা যাঁহার সৃষ্টি এই বিশ্বপ্রপঞ্চ। মানবীয় তনুটিকে অবজ্ঞা না করিয়া সেইটিকে আশ্রয় করিয়া যিনি বিরাজিত, তাঁহাকেই বিস্ময়, ভক্তি ও অনুরাগের সহিত তাঁহার দেখা ও উপাসনা করা উচিত ছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইতেছে এই যে, মানবীয় রূপ এবং মানবীয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যাহা মূর্ত হইয়াছে সেইটিও সত্য। বিশ্বরূপের করাল স্বরূপের সহিত সেইটি যুক্ত থাকিয়া আমাদের মনের কাছে উহাকে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। ভগবানের বিশ্বাতীত সত্তা এবং বিশ্বাত্মক রূপ দেখিতে হইবে, কারণ তাহা ছাড়া মানবীয়তার গণ্ডি অতিক্রম করা সম্ভব নহে। সেই ঐক্য-সাধক একত্বের মধ্যে সবকে লইতে হইবে। কিন্তু শুধু এইটির দ্বারা বিশ্বাতীত সত্তা এবং নিচের প্রকৃতিতে বদ্ধ এই সসীম জীবাত্মার মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইবে। অনন্ত স্বরূপের যে পূর্ণ তেজ, সীমাবদ্ধ ব্যষ্টিগত প্রাকৃত মানবের স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রতার পক্ষে তাহা অসহনীয়। একটি যোগসূত্র চাই যাহার সাহায্যে সে বিরাট বিশ্বপুরুষকে দেখিতে পারে নিজের ব্যষ্টিগত প্রাকৃত সত্তার মধ্যে, নিজের সন্নিকটে। তিনি শুধু তাঁহার বিশ্বব্যাপী ও অপ্রমেয় বীর্যের দ্বারা তাহার সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন না, পরন্তু মানবীয় মূর্তিতে তাহাকে সাহায্য করিতেছেন এবং অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভিতর দিয়া তাহাকে ঐক্যের মধ্যে তুলিয়া লইতেছেন। যে-ভক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ জীব অনন্তের সম্মুখে প্রণত হয়, তাহা তখনই পূর্ণ মাধুর্যে ভরিয়া উঠে এবং সখ্য ও ঐক্যের নিগূঢ়তম সত্যের সমীপবর্তী হয়—যখন তাহা গভীর হইয়া অধিকতর অন্তরঙ্গ ভক্তিতে পরিণত হয়, ভগবানকে পিতারূপে অনুভব করা যায়, সখারূপে অনুভব করা যায়, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে পরস্পরের

প্রতি আকর্ষণমূলক প্রেমের অনুভব লাভ করা যায়। কারণ ভগবান মানব-আত্মা, মানবদেহের মধ্যে বাস করেন। তিনি পরিচ্ছদের ন্যায় মানবীয় মন ও মূর্তির দ্বারা নিজেকে আবরিত করেন। মরদেহের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মা পরস্পরের মধ্যে যেসব সম্বন্ধ স্থাপন করে, ভগবানও সেইসব সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং ভগবানকে অবলম্বন করিয়াই সেসব পায় তাহাদের পূর্ণতম সার্থকতা এবং মহত্তম সিদ্ধি। ইহাই বৈষ্ণব ভক্তি। এখানে গীতার কথাগুলির মধ্যে ইহার বীজ রহিয়াছে, কিন্তু পরবর্তী কালে ইহাদের অধিকতর গভীর, আনন্দময় ও সার্থকতাপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

আর এই দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইতেই আরেকটি তত্ত্ব আপনিই উদ্ভূত হইতেছে। এই যে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বময় পুরুষের রূপ, মুক্ত আত্মার শক্তির পক্ষে ইহা মহান, উৎসাহপ্রদ, সাহসপ্রদ। ইহা বীর্যের উৎস। এই দর্শন সমতাসাধন করে, উন্নয়ন করে, সকল জিনিসের সার্থকতা দেখাইয়া দেয়, কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা অসহনীয়, ভয়ঙ্কর, দুর্বোধ্য। এই যে সর্বগ্রাসী কাল এবং ধারণাতীত ইচ্ছাশক্তির ভীষণ ও মহান রূপ, এই বিরাট অপ্রমেয় গহন কর্মধারা—ইহার পিছনে যে আশ্বাসপ্রদ সত্য রহিয়াছে সেটিকে জানিলেও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়। কিন্তু আবার দিব্য নারায়ণের প্রসন্ন মধ্যবর্তী রূপও আছে, সেখানে ভগবান মানুষের অতি সন্নিকটে এবং তাহার মধ্যেই বিরাজিত, তিনি যুদ্ধে এবং যাত্রাপথে সারথি, সাহায্য করিবার জন্য তিনি চতুর্ভুজ, তিনি ভগবানের মানবীয় ভাবাপন্ন প্রতীক, এই সহস্রবাহু বিশ্বরূপ নহেন। নির্ভর করিবার জন্য মানুষকে এই মধ্যবর্তী রূপটিই সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে। কারণ যে-সত্য আশ্বাস প্রদান করে, নারায়ণের এই রূপই তাহার প্রতীক। বিশ্বের কর্মধারাসকল তাহাদের বিরাট আবর্তন, পশ্চাদ্‌গতি অগ্রগতির ভিতর দিয়া মানুষের অন্তরাত্মা ও অন্তর্জীবনের পক্ষে যে বিশাল অধ্যাত্ম আনন্দে চরম পরিণতি লাভ করে, যেটি তাহাদের অত্যাশ্চর্য কল্যাণময় লক্ষ্য—সেইটি অন্তরঙ্গ, দৃশ্য, জীবন্ত, সহজবোধ্য হইয়া উঠে নারায়ণের এই সৌম্যমূর্তির সাহায্যে। এই মানবীয় ভাবাপন্ন দেহধারী পুরুষের সহিত মিলন ও সান্নিধ্যই হয় তাহাদের পরিণাম—মানুষের সহিত ভগবানের নিত্য সাহচর্য। মানুষ জগতে ভগবানের জন্যই জীবনযাপন করে, ভগবান মানুষের মধ্যে বাস করেন, এই রহস্যময় জগৎলীলাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষের মধ্যে নিজের দিব্য ইচ্ছা-সকলই পূর্ণ করেন। আর মানুষের এই পরিণামেরও পার হইতেছে অধিকতর আশ্চর্যময় ঐক্য, শাশ্বতের শেষ রূপান্তরসকলের মধ্যে নিবিড়ভাবে বাস করা।

অর্জুনের প্রার্থনার উত্তরে ভগবান তাঁহার স্বকীয় সাধারণ নারায়ণরূপ পুনরায় ধারণ করিলেন, 'স্বকং রূপম্', প্রসাদ ও প্রেম, মাধুরী ও সৌন্দর্যের বাঞ্ছনীয় মূর্তি।[৫] কিন্তু অন্য যে বিরাট মূর্তিটি তিনি সংবরণ করিতেছেন, সেইটির অপরিমেয় গূঢ়ার্থের কথা প্রথমেই বলিলেন। তিনি বলিলেনঃ "যাহা তুমি এখন দেখিতেছ—ইহা আমার পরম মূর্তি, আমার তেজোময় রূপ। বিশ্বাত্মক, আদ্য আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন এপর্যন্ত আর কেহ দেখিতে পায় নাই।"[৬] আমি আমার আত্মযোগের দ্বারা ইহা দেখাইয়াছি। কারণ ইহা আমার আত্মার, আমার নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্তারই রূপ, এই রূপে পরাৎপর পরম্ পুরুষ

নিজেকে বিশ্ব-লীলায় প্রকট করিয়াছেন। আমার সঙ্গে যে পূর্ণযোগে যুক্ত কেবল সে-ই এই রূপ অবিচলিতভাবে দেখিতে পারে। তাহার স্নায়ুমণ্ডলী কম্পিত হয় না, তাহার মন বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে না। কারণ ইহার বাহ্যরূপে যাহা ভয়ঙ্কর ও দুঃসহনীয় আছে সে শুধু তাহাই দেখে না, কিন্তু ইহার মহান ও আশ্বাসময় নিগূঢ় মর্মও উপলব্ধি করিতে পারে। আর তোমারও উচিত বিমূঢ় ও অবশ না হইয়া আমার এই ঘোররূপ দর্শন করা।[৭] কিন্তু তোমার নিম্নতম প্রকৃতি এখনো ইহাকে সেই মহৎ সাহস ও স্থৈর্যের দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। অতএব তোমার জন্য আমি পুনরায় আমার নারায়ণরূপ ধারণ করিতেছি। তাহার মধ্যে মানুষের মন পৃথগ্‌ভাবে, মানবীয় শক্তি অনুযায়ী প্রশমিতভাবে সুহৃদ্‌রূপী ভগবানের সৌম্যভাব, আনুকূল্য ও আনন্দকে দেখিতে পায়। মহত্তর রূপটি অদৃশ্য হইবার পর ভগবান আবার বলিলেন ঃ "কেবল অসাধারণ শ্রেষ্ঠ মহাত্মারাই ঐ রূপ দেখিতে পান। দেবতাগণই নিত্য এই রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন। বেদের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দানের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা ইহাকে লাভ করা যায় না। ইহাকে দেখা যায়, জানা যায়, ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় কেবল সেই ভক্তির দ্বারা যাহা সর্বভূতে শুধু আমাকেই শ্রদ্ধা করে, ভজনা করে, ভালবাসে।"[৮]

কিন্তু তাহা হইলে এই রূপের এমন কি বৈশিষ্ট্য যাহার জন্য ইহা এতদূর ধারণাতীত যে, মানবজ্ঞানের সকল সাধারণ প্রয়াস, এমনকি তাহার অধ্যাত্ম-সাধনারও গভীরতম তপস্যা অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে সে-রূপ দর্শনে সমর্থ হয় না? তাহা এই যে, মানুষ অন্যান্য উপায়ে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' সত্তার কোন একটি বিশেষ ভাবকে আংশিকভাবে, স্বতন্ত্রভাবে জানিতে পারে, তাঁহার ব্যষ্টিগত বা বিশ্বগত বা বিশ্বাতীত রূপসকলকে জানিতে পারে, কিন্তু ভগবানের সকল ভাবের সমন্বয়মূলক এই যে মহত্তম ঐক্য—যাহাতে একসময়ে একসঙ্গে একই রূপের মধ্যে সমস্ত প্রকটিত, সমস্ত অতিক্রমিত, সমস্ত সংসিদ্ধ—ইহাকে নহে। কারণ বিশ্বাতীত, বিশ্বগত, ব্যষ্টিগত ভগবান, আত্মা ও প্রকৃতি, অনন্ত ও সান্ত, দেশ ও কাল ও কালাতীতভাব, সৎ (Being) ও সম্ভূতি (Becoming)—ভগবান সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু ভাবিতে, জানিতে চেষ্টা করি, কৈবল্যাত্মক সত্তাই হউক বা প্রকটিত বিশ্বলীলাই হউক, সবই এখানে এক অনির্বচনীয় ঐক্যে অত্যাশ্চর্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দর্শনলাভ করা যায় কেবল সেই অনন্য ভক্তি দ্বারা, সেই প্রেমের ও নিবিড় ঐক্যের দ্বারা যাহা পূর্ণবিকশিত কর্ম ও জ্ঞানের মুকুটস্বরূপ। ইহাকে জানা, ইহাকে দর্শন করা, ইহার মধ্যে প্রবেশ করা, পরম পুরুষের এই পরম রূপের সহিত এক হওয়া তখনই সম্ভব হয় এবং এইটিকেই গীতা নিজ যোগের লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছে। এক পরম চৈতন্য আছে, তাহার ভিতর দিয়া বিশ্বাতীতের মহিমার মধ্যে প্রবেশ করা। এবং তাঁহার মধ্যে অক্ষর আত্মা এবং ক্ষর সর্বভূতকে ধারণ করা সম্ভব হয়, সকলের সহিত এক হইয়াও সকলের ঊর্ধ্বে থাকা, জগতের অতীত হওয়া অথচ বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত ভগবানের সমগ্র প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করা সম্ভব হয়। মন ও দেহের মধ্যে বন্দি সীমাবদ্ধ মানুষের পক্ষে ইহা কঠিন, সন্দেহ নাই, কিন্তু ভগবান বলিলেন ঃ "আমার কর্ম কর;

আমাকে পরম পুরুষ, পরম বস্তু বলিয়া স্বীকার কর; আমার ভক্ত হও, আসক্তি বর্জন কর, সর্বভূতের প্রতি বৈরিতাশূন্য হও; কারণ এইরূপ মানুষই আমাকে প্রাপ্ত হয়।"[৯] অন্য কথায়, নিম্নতম প্রকৃতিকে জয়, সর্বভূতের সহিত ঐক্য, বিশ্বাত্মক ভগবান এবং বিশ্বাতীত সত্তার সহিত একত্ব, কর্মে ভগবদিচ্ছার সহিত ঐক্য, অদ্বিতীয় একের প্রতি, সর্বভূতস্থিত ভগবানের প্রতি সর্বাঙ্গসম্পন্ন প্রেম—ইহাই হইতেছে পন্থা যাহার দ্বারা মানুষ সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া সেই সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম মুক্তি এবং সেই অচিন্ত্য রূপান্তর লাভ করিতে পারে।* □

পাদটীকা

১ স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।।
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ।।
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ—
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।। (১১।৩৬-৩৮)

২ বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।।
(১১।৩৯-৪০)

৩ সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।।
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্।। (১১।৪১-৪২)

৪ পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।।
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।।
অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে।। (১১।৪৩-৪৬)

৫ ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা।। (১১।৫০)

৬ ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্।। (১১।৪৭)

৭ মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য।। (১১।৪৯)

৮ সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।।
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।।
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুংচ পরন্তপ।।
(১১।৫২-৫৪)

৯ মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।
(১১।৫৫)

* ৩৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

একটি নবীন বিশ্বের কল্পনা*

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

যদি একজন ভাবী ঐতিহাসিককে বর্তমান যুগের মুখ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করিতে বলা হয়, তবে তিনি আমাদের সংবাদপত্রগুলির বড় বড় শিরোনামার রাষ্ট্রবিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও যুদ্ধের জনরবের কথা উল্লেখ করিবেন না, বলিবেন মানবজাতির ক্রমবর্ধমান ঐক্যের কথাই। মানুষের যে-একতা নবজন্ম লাভ করিতেছে উহাই হইল এই যুগের প্রধানতম চিহ্ন। এই ঐক্য-সাধনের অগ্রদূত রূপেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কাজ করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক অধ্যয়ন ও যোগাযোগ স্থাপনের কাজে ইহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আমরা এখনও অতীতের উত্তরাধিকার অত্যুগ্র জাতীয়তা এবং ভবিষ্যতের আশা—ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব—এই দুইয়ের মধ্যে দোদুল্যমান রহিয়াছি। এই সম্মিলিত বিশ্বের প্রতিষ্ঠা-কার্যে যেসকল বাধাবিঘ্ন আছে উহারা মানুষের মনেই বর্তমান। এখনও আমরা পরস্পরের প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধ উপলব্ধি করিতেছি না। অতএব, মানবজাতির ক্রমবর্ধমান ঐক্যের জন্য কাজ করা আমাদের সকলের, বিশেষত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত নরনারীগণের অবশ্য কর্তব্য।

অনেকে বলেন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধীয় পরিবর্তনসমূহ আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে প্রভাবিত এবং জগদ্বাসীকে পরস্পরের নিকটে আনিয়াছে। বিশ্বের ঐক্য সম্ভবত বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের উপরও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের এবিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁহারা দেখিবেন, প্রকৃত বিশ্বমৈত্রীর জন্য যে মনস্তাত্ত্বিক বুঝাপড়া ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রয়োজন তাহা বাহ্যিক কলাকৌশল দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। যদি তোমরা মানবসমাজের ঐক্য গড়িয়া তুলিতে চাও, তোমাদিগকে মন ও আত্মার ক্ষেত্রেই উহা গড়িতে হইবে।

সভ্যতার মূলনীতি

বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ (Scientific Naturalism) অথবা বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের (Scientific Humanism) সমর্থকগণ বলেন, পরমত-অসহিষ্ণুতাই ধর্মের প্রধান অনর্থ। যাহারা আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত তাহাদের প্রতি আমরা সহানুভূতিসম্পন্ন, আর যাহারা আমাদের দলভুক্ত নহে তাহাদিগের প্রতি আমরা বিদ্বেষভাবাপন্ন। ধর্মজগতে আমাদিগকে এই যে মূলগত বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, ইহাকে দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিশ্বের বিভিন্ন অংশ পরস্পরকে আঘাত দিয়া চলিতেছে, প্রধান প্রধান ধর্মসমূহের বিভিন্ন

* লন্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত-কেন্দ্রের মুখপত্র 'Vedanta for East and West' (July-August, 1955)-এ প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদক—রমণীকুমার দত্তগুপ্ত

মতবাদগুলি পরস্পরের অতি সান্নিধ্যে আনীত হইয়াছে, এবং যদি আত্মিক ভিত্তির উপর কোনপ্রকার ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে আমাদিগকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সহানুভূতির ভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে। ধর্মসমূহের একীকরণের কথা আমরা বলিতেছি না; সকল ধর্মেরই কতকগুলি মৌলিক অন্তর্দৃষ্টি আছে—যেগুলি এই জড়জগতের আত্মা ও প্রাণস্বরূপ—আমরা সেগুলিকেই স্বীকার করিতে বলিতেছি।

সকল ধর্মই ঘোষণা করে—মানবসভ্যতার মূল তত্ত্ব হইতেছে ব্যক্তির মর্যাদা ও সৌভ্রাত্র বোধ। আমাদের ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকালেই প্রচারিত হইয়াছে—জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ; সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহ নহে; সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম। বৌদ্ধ ও জৈনগণ বলেন—সুযোগ পাইলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন করা সম্ভবপর। মানুষের আত্মা ঈশ্বরের জ্যোতি। "স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে"—খ্রীস্টানগণ বলেন। সাধু পল বলিয়াছেন: "তুমি কি জান না যে, তুমি ভগবানের মন্দির এবং ঐশ্বরিক শক্তি তোমার ভিতরে রহিয়াছে?" মহম্মদ বলিয়াছেন: "গ্রীবার ধমনী অপেক্ষাও ঈশ্বর আমাদের নিকটতর।" সংক্ষেপত, সকল ধর্মই স্বীকার করে, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা আছে এবং জাগতিক অভ্যুদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ দ্বারা এই আধ্যাত্মিক সত্তারই পূর্ণবিকাশের সহায়তা হয়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

কেবল ইহাই নহে; সকল ধর্মের আরো একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে—প্রেম। ধর্মের ভিন্ন-ভিন্ন নাম-রূপ-ভাষা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ধর্মের একটি প্রমাণসিদ্ধ বাণী আছে—আর্ত মানবের প্রতি করুণা। আমরা ইহাকে অহিংসা বা ঈর্ষাহীনতা বলি। বুদ্ধ ইহাকে করুণা বা দয়া বলেন। খ্রীস্টানগণ ইহাকে প্রেম বলেন—যে প্রেম সার্বজনীন, সক্রিয়, সর্বগ্রাহী, আনন্দময় এবং জগতের পাপ দূর করিয়া ইহাকে পুণ্যে পরিণত করে। এই প্রেমের ভাবই আমাদের জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে। পরস্পরের প্রতি এই প্রেম জাগ্রত হইলে আমাদের বর্তমান অবস্থা আরো উন্নততর হইবে।

ভারতের পুরাবৃত্তে আছে অসুর ও দেবগণ প্রত্যেকেই সাধারণ পিতার সন্তান। তোমার শত্রুর হৃদয়ের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করিলে তথায় তোমার ভ্রাতাকেই দেখিতে পাইবে। এই নিগূঢ় জগতে মুক্তি ও যথেচ্ছাচার সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী হইতে পারে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এমন কোন দল নাই যাহাকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বলা যাইতে পারে। তোমরা দেখিবে, যদি এক পক্ষে দোষ থাকে তাহা হইলে কোন বিবাদ থাকিবে না। কোন বিবাদে উভয় পক্ষের দোষ-ত্রুটি আছে বলিয়াই বিঘ্ন ও সঙ্কট উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় বিশ্বে মৈত্রী ও শান্তির সম্পর্কস্থাপনের জন্য আমাদিগকে পরস্পরের প্রতি বন্ধুতা, সহানুভূতি ও বিবদমান মতবাদের ঊর্ধ্বে অবস্থানের মনোবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাই আমাদের কর্তব্য। কিন্তু এই মনোবৃত্তির জন্য প্রয়োজন মানুষের মন ও হৃদয়ের বিপ্লব। কেবল বৃথা বাক্যব্যয়ে ইহা সাধিত হইবে না। যেসকল বিষয় আমরা বাস্তবজীবনের

আচরণে বিশ্বাস করি, সেগুলিই আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনায় ও ধর্মে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া থাকি।

বোঝাপড়ার দৃষ্টিভঙ্গি

পরস্পরকে বুঝিবার মনোবৃত্তিই আমাদের প্রয়োজন। এই মনোবৃত্তি দ্বারা আমরা অপর পক্ষের ভাব বুঝিতে সমর্থ হই, অপরকে বুঝিতে—সে কি করিতেছে, কেন ইহা করিতেছে এবং বিবদমান মতামতগুলির বাহিরে কোন একটি ভাবালম্বনে পরস্পর মিলিত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা—ইহা বুঝিতে পারি। ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারাই ইহা অবধারণ করা যায়। প্রগতি প্রকৃতির নিয়ম নহে। ইহা মানুষের চেষ্টা ও উদ্যমের উপর নির্ভর করে। উচ্চ উচ্চ ভাবগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই প্রকৃত মানুষ—কবি, ধর্মযাজক, দার্শনিক, পুরোহিত, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, বিদ্যার্থী, গবেষক প্রভৃতি সৃজন করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যদি নিরঙ্কুশ ও স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান করিতে দেওয়া হয় তবেই তাহারা এই মহৎ কার্যে সফলকাম হইতে পারে। কতকগুলি শক্তি এমন প্রবলভাবে মস্তক উত্তোলন করিতেছে যে, তাহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় তাহারা মানুষের মনকে ব্যূহবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করিবার জন্য সচেষ্ট। রাষ্ট্রনৈতিক গোঁড়ামি এখনো অন্তর্হিত হয় নাই; একনিষ্ঠ ও অনন্যচিত্ত সত্যানুসন্ধানের কার্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যাহাতে বাহিরের কোন শক্তির হস্তক্ষেপ হইতে বিমুক্ত থাকে, তদ্বিষয়ে তাহাদের সক্রিয় হইতে হইবে। আমি বিশ্বাস করি, বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট যুবক-যুবতীরা, তাহাদের স্বাভাবিক একগুঁয়েমি ও যৌবনসুলভ চিরন্তন চাঞ্চল্য সত্ত্বেও, বাহির হইতে তাহাদের উপর জোর করিয়া যে নিপীড়ন চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে, উহাকে প্রতিরোধ ও জয় করিতে সমর্থ হইবে। আমার প্রার্থনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ঐকান্তিক আশা—যেসকল যুবক-যুবতী আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহারা ভাবী বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, সাম্য-মৈত্রী-সৌভ্রাত্র ও ন্যায়পরতার উপর প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্য এক শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য গভীর আত্মপ্রত্যয় ও সরলতার সহিত এমন এক আদর্শের কথা বলিবে, যাহার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সাম্প্রতিক কালেও অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে।* □

* ৫৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

সনাতন ধর্ম*

স্বামী অভেদানন্দ

[স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে আমন্ত্রিত হইয়া জামসেদপুরে পদার্পণ করেন। সেইসময় তাঁহাকে 'মিলনী' মণ্ডপে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় শহরের জনসাধারণ উপযুক্ত মর্যাদা ও উৎসাহে বিপুলভাবে সংবর্ধনা করেন। সভায় টাটা ইস্পাত কারখানা ও চতুষ্পার্শ্বস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গণ্যমান্য দেশীয় এবং ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এই সংবর্ধনার উত্তর প্রদানকালে তিনি যে ভাষণ দেন তাহাই ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'Sanatana Dharma' নামে মুদ্রিত হয়।]

অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ, টাটানগরবাসী বন্ধুগণ, অদ্য সন্ধ্যায় আপনারা আমার প্রতি যেসকল প্রীতিপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করেছেন এবং শহরে উপনীত হওয়ামাত্র যেরূপ সমারোহে আমাকে অভ্যর্থনা করেছেন তজ্জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। বিগত ২৫ বৎসর আমি আমেরিকায় কাজ করেছি। আমার জগৎবরেণ্য গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজ আমার পূর্বে এই কাজ আরম্ভ করেছিলেন; আপনারা তা জানেন। তিনিই প্রথম সন্ন্যাসী, যিনি সাগর পার হয়ে নতুন পৃথিবীতে পদার্পণ করেন এবং শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় (১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ) সনাতন ধর্মের (বৈদিক ধর্ম ও বেদান্ত দর্শনের) প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই বিরাট সম্মেলনে পৃথিবীর সকল অংশ থেকে ধর্মের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক, ধর্মতত্ত্বে উচ্চ উপাধিকারী ব্যক্তি এবং খ্যাতিমান প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিরাও তথায় উপস্থিত হয়ে স্বকীয় ভাবধারা ও ধর্মনীতি জগৎ সমক্ষে প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। এইসকল স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ তো ছেলেমানুষ! তিনি যদিও পূর্বে কখনো সাধারণ সভায় বক্তৃতা করেননি তথাপি সভাপতির নির্দেশে শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে সহজ সরল ভাষায় স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত সামান্য কয়েকটি কথাতে কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। তাঁর কথা লোকের প্রাণে উৎসাহ, প্রীতি ও সহানুভূতি জাগরিত করল; ইহা বৈদিক ধর্মের সেই মহান প্রতিনিধিরও হৃদয় স্পর্শ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ সনাতন ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছিলেন। আপনারা সকলেই জানেন, সনাতন ধর্মের অর্থ চিরন্তন ধর্ম। এই ধর্মের কোন প্রতিষ্ঠাতা নেই। এটিকে কেন চিরন্তন ধর্ম বলা হয়? ধর্ম দ্বারা আমরা কতকগুলি গ্রহণীয় বা বিশ্বাস্য তত্ত্ব বা মতবাদ বুঝি না, বুঝি আত্মবিজ্ঞান; যদ্দ্বারা আমাদের যথার্থ প্রকৃতির ব্যাখ্যা এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যথা—আমরা এই জগতে কেন এসেছি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? মৃত্যুর

* মূল ইংরেজী ভাষণ থেকে অনূদিত। অনুবাদক : কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরে কোথায় যাব? আমাদের মন যেসকল প্রশ্নে বিচলিত হয় তার সমাধান করা ধর্মের অবশ্যকর্তব্য। কোন গ্রন্থে কতকগুলি কথা লিখিত হবে, আর তদ্দ্বারা আমাদের মনের প্রশ্নগুলির উত্তর পাই বা না পাই সেগুলিকে ধ্রুব সত্যরূপে গ্রহণ করতে হবে, ধর্মের অর্থ ইহা নয়; কথাগুলি আপ্তবাক্য হতে পারে, নাও হতে পারে। ধর্মদ্বারা জন্ম-মৃত্যু সমস্যার সমাধান বোঝায়। বেদ ব্যতীত অন্য কোথায়ও আমরা উক্ত সমাধান খুঁজে পাই না। আমাদের ঋষি ও সত্যদ্রষ্টা পূর্বপুরুষগণ সর্বপ্রথম জগৎকে ঐ সমাধান দান করেন। উক্ত সত্যদ্রষ্টাগণ খ্রীস্টের বহু শতাব্দী পূর্বে বর্তমান ছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা সেসময় অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। বর্তমানকালের সভ্যতার নেতৃস্থানীয় জাতিদিগের পূর্বপুরুষগণ সেসময় তাদের দেহে উল্কি অঙ্কিত করত এবং গুহায় ও জঙ্গলে বাস করত। সেই সুদূর অতীতেই আমাদের পূর্বপুরুষ বৈদিক ভারতের মহান ঋষিরা সনাতন সত্য উপলব্ধি করেন এবং সর্বকালে সকল মানবের মন যেসব সমস্যা দ্বারা বিচলিত হয় তার সর্বপ্রথম সমাধান আবিষ্কার করেন। এগুলি ঈশ্বরের নিকট থেকে অনুপ্রেরণারূপে আসে, তাঁদের অন্তরে বিশ্বপ্রেম জাগ্রত করে ও আমাদের জীবাত্মা যেসকল নিয়মের অধীন তা প্রকাশ করে। যে ধর্মকে আমি আত্মবিজ্ঞান আখ্যা দিয়েছি তা কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নয়। সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই প্রতিষ্ঠাতা আছে। খ্রীস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশুখ্রীস্টের জীবন ও বাণী উক্ত ধর্মের ভিত্তি। বর্তমানে সভ্যজগতে বৌদ্ধধর্মের অনুগামীরা সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ। উক্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধের জীবন, চরিত্র ও বাণীর উপর এর ভিত্তি স্থাপিত। খ্রীস্ট ও বৌদ্ধধর্ম-বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মেরও প্রতিষ্ঠাতা আছে। মহম্মদ মুসলমান ধর্ম, জরথুস্ট্র জরথুস্ট্র-ধর্ম প্রবর্তন করেন। আপনারা দেখেছেন সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই প্রতিষ্ঠাতা আছে, কিন্তু সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নেই। সকল মানবাত্মার নিয়ন্তা শাশ্বত আধ্যাত্মিক নিয়মই এর ভিত্তি। এইসকল আধ্যাত্মিক নিয়ম মানুষের সৃষ্টি নয়। অন্য যেসব নিয়ম আমাদের বাহ্য অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে তা হয়তো মানুষের তৈরি হতে পারে, কিন্তু যেসকল আধ্যাত্মিক নিয়ম আমাদের জীবাত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে তা নিত্য। এই নিয়মগুলিই সনাতন ধর্মের মূল তত্ত্ব। সুতরাং আমাদের ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলি। আমাদের পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আমেরিকায় শিকাগোতে বিশ্বমেলায় এটি ব্যাখ্যা করেন।...

২৫ বৎসর পূর্বে খ্রীস্টধর্ম যেরূপ ছিল আজ সেরূপ নেই। বৈদিক দর্শন যে সনাতন সত্যের মৌলিক তত্ত্ব শিক্ষা দেয় তাই আজ তার ভিত্তি; বেদে যেরূপ আছে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ভগবান এক, পণ্ডিতগণ তাঁকে বহু নামে ডাকেন। অতএব এইসকল আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রের খ্রীস্টান, সায়েন্টিস্ট, 'নিউ থটিস্ট' (নব চিন্তাবিদ) ও প্রেততত্ত্ববিদগণ গ্রহণ করেছে। তাদের মন বেদান্তের নতুন আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। এগুলি আমরাই তাদের মধ্যে প্রচলন করেছি। এবং ইউরোপীয়রাও ধীরে ধীরে একই আদর্শ প্রাপ্ত হচ্ছে। অধুনা ইংল্যান্ডে বহুসংখ্যক খ্রীস্টান সায়েন্সগীর্জা ও নিউ থট মন্দির দেখা যাবে। স্যার আর্থার

কোনান ডয়েল ও স্যার ওলিভার লজ প্রভৃতির ন্যায় প্রেততত্ত্ববিদেরা আমাদের বেদান্তের উপদিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছেন।

আধুনিক অধ্যাত্মবাদ শিক্ষা দেয় যে, আত্মা অবিনশ্বর এবং মৃত্যুর পরে আমরা অনন্ত দুঃখে নিপতিত হই না। স্যার ওলিভার লজের কথাই ধরা যাক। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। তাঁর লেখা বই 'রেমন্ড' পাঠ করলে দেখতে পাবেন তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আমাদের যে-বন্ধুরা মৃত ও পরলোকগত তাদের সঙ্গে আমরা খবরাখবর করতে পারি এবং এইরূপ উক্তির জন্য তিনি গর্ববোধ করেন। ক্যালিফোর্নিয়া স্যানফ্রান্সিসকোতে গত বৎসর তিনি যে ভাষণ দেন তা আমার শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। বিশপ কর্তৃক আনীত এই মহাপ্রাণ প্রবীণ ভদ্রলোক খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন যে, বন্ধুগণ, মৃত্যুর পর আমরা নরকে যাই না পরন্তু সুখভোগ করতে থাকি এবং আমাদের শক্তি আছে যার সাহায্যে আমরা আমাদের মৃত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। বন্ধুগণ, এটি গোঁড়া খ্রীস্টধর্ম-বহির্ভূত এক পদক্ষেপ। গোঁড়া খ্রীস্টান কখনো এই চিন্তা করতে দেবে না যে আপনি মৃত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। বরং তাদের মতে তারা সবাই এখন নিদ্রিত এবং শেষ-বিচারের দিন একজন দেবদূতের ভেরীনিনাদে জাগ্রত হবে ও তাদের পাঞ্চভৌতিক দেহসহ উত্থিত হয়ে স্বর্গে যাবে। বহু শতাব্দীব্যাপী এই মতবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু পরিবর্তন এসেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায়তনে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হয় এজন্য কৃতিত্ব তাঁরই বেশি। কিন্তু ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়বাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিচ্ছে এবং জড়বাদ মানবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তা জড়ের উৎস খুঁজে পায় না অথচ জড়বহির্ভূত কোন কিছুকে অস্বীকার করে।

খ্রীস্টান সায়েন্টিস্টরা কিন্তু উলটো—জড়ের অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং বেদান্ত যেমন বলে, জড় বা জড়জগৎ হলো মায়া বা প্রপঞ্চ, খ্রীস্টান সায়েন্টিস্টরাও সেইরূপ একে অলীক বলে। তাদের মতে আপনাদের ভৌতিক দেহও অলীক ও দেহের ব্যাধিরও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। কারণ আপনারা ব্যাধি রোগ দুঃখ ও ক্লেশ থেকে মুক্তস্বভাব। এখানে বলে রাখি, বেদ এই ধারণা শিক্ষা দেয় এবং বেদান্তদর্শন দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে যে, 'আত্মা দুঃখ, ক্লেশ, ব্যাধি ও মৃত্যু থেকে মুক্ত।'

আত্মাই আমাদের সত্য পরিচয়। এটিই সনাতন সত্য; কেউ বলে ব্রহ্ম, কেউ বলে পরমাত্মা। এইটি শক্তি, শক্তিদিগের মা ভগবতী; শৈবের শিব, বৈষ্ণবের বিষ্ণু। খ্রীস্টানরা এই সত্যকেই স্বর্গস্থ পিতা বলে। নানকের শিষ্যগণ এটিকে সনাতন সত্য বলে। বৌদ্ধরা এটিকে বুদ্ধ বলে থাকে এবং মুসলমানেরা একই সত্যকে বিশ্বনিয়ন্তা আল্লা বলে। সুতরাং বন্ধুগণ, মৌলিক সত্যে কোন প্রভেদ নেই—কারণ সত্য এক। খ্রীস্টান মুসলমান বা হিন্দু সকলে একই সত্যের আরাধনা করে, যা অদ্বয়। সত্য এক, একথা যখন লোকে ভুলে যায়, তখনই ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ করে এবং পৌত্তলিকের ঈশ্বর, খ্রীস্টানের ঈশ্বর, মুসলমানের ঈশ্বর, বৈষ্ণবের ঈশ্বর ও শৈবের ঈশ্বর ইত্যাদি বলা শুরু করে। এঁরা সকলেই ঈশ্বর—কিন্তু কে এঁরা? ধর্ম কি এই শিক্ষা দেয় যে এতগুলি

ঈশ্বর আছেন? একজন গোঁড়া খ্রীস্টান বলতে পারে, কেন পৌত্তলিকের ঈশ্বর উপাসনা করবে? খ্রীস্টানের ঈশ্বরই উপাসনা করা উচিত; খ্রীস্টানের ঈশ্বর শ্বেতাঙ্গ ও পৌত্তলিকের ঈশ্বর কৃষ্ণাঙ্গ। বন্ধুগণ, খ্রীস্টানের ঈশ্বর, হিন্দুর ঈশ্বর, মুসলমানের ঈশ্বর বলে কিছু নেই। কারণ ঈশ্বর এক এবং তাঁকেই সকল জাতি পূজা করে। তিনি উপাধিশূন্য। যাঁকে মুসলমানেরা আল্লা বলে উপাসনা করে সেই একই ঈশ্বরকে পারসীরা আহুরমাজদা নামে ডাকে। সেই একই সত্য বৈষ্ণবের বিষ্ণু, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি বা আমাদের স্বর্গস্থ পিতা। সকল ধর্মমতের বিভেদের সামঞ্জস্য একমাত্র ঈশ্বরের একত্বরূপ মৌলিকত্বের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের সনাতন ধর্ম এই মূল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং সনাতন ধর্ম জগৎময় প্রচার করা কর্তব্য।

জড়বাদ কখনো প্রাণে শান্তি দিতে পারে না। ব্যবসাদারী পৃথিবীতে দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা আনবে—বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে যেমন দেখা গেছে। জড়বাদ ও ব্যবসাদারীর ফল ঐ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরে এখন নবযুগ শুরু হয়েছে, ব্যবসাদারী আর থাকবে না। আমরা জগৎকে দেখিয়েছি যে, সাংসারিক অভ্যুদয়ের জন্য আমরা জীবন ধারণ করি না, উদ্দেশ্য অন্য বস্তু লাভ। আমাদের জীবনোদ্দেশ্য সর্বব্যাপী অদ্বয় শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করা। প্রশ্ন হতে পারে কিরূপে তা লাভ করা সম্ভব? প্রথমত শিক্ষা করতে হবে যে, প্রাণ একটিই। মানুষ, প্রাণী, গাছগাছড়া যতসব দেখছি—প্রত্যেক ব্যষ্টিপ্রকাশে কি স্বতন্ত্র প্রাণ আছে? না; বহুবিধ বৈদ্যুতিক আলোর মতোই একই প্রাণশক্তির প্রবাহ সর্বত্র বিদ্যমান। একথা কি বলা চলে যে একটি আলো একপ্রকার বৈদ্যুতিক শক্তির আলো, অপরটি ভিন্ন এবং তৃতীয়টি আবার বিভিন্ন রকমের শক্তির? একই বিদ্যুৎ এতগুলি বাতিতে আলো দিচ্ছে আর একই বিদ্যুৎ শুধু আলো উৎপন্ন করে না, উত্তাপ ও গতিও উৎপন্ন করে। দেখুন, রাস্তায় গাড়ি বিদ্যুতে চলে, বৈদ্যুতিক চুল্লিতে আহার্য প্রস্তুত হয় এবং বৈদ্যুতিক আলোতে পুস্তক পাঠ করা যায়। এইসব বিভিন্ন প্রকাশ একই বিদ্যুৎশক্তির। সুতরাং বন্ধুগণ, সকল মনুষ্যদেহে এই প্রাণশক্তির প্রকাশ; এমনকি সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যেও। উক্ত প্রাণশক্তি এক, আমার বা আপনার কারও নয়; এই প্রাণ অবিনশ্বর। প্রাণহীন পদার্থ কিছুই নেই। সবই প্রাণবন্ত এবং প্রাণ বা জীবনীশক্তি সর্বব্যাপী। এটিই আণবিক কার্যকারিতার হেতু; ইলেকট্রনের গতির কারণ। এ থেকেই ইলেকট্রন, আয়ন, অণু ও পরমাণুর উৎপত্তি। একই প্রাণশক্তি তথাকথিত জড়জগতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং তারা প্রাণীজগতে মন ও ইন্দ্রিয়শক্তি রূপে, চিন্তা ও বিচারশক্তি রূপে প্রকাশিত। বেদান্তে আমরা বহুত্বে একত্বের ভাব দেখি—সবকিছু সেই এক অনন্ত উৎস থেকে উদ্ভূত। প্রাণশক্তির উৎপত্তি তা থেকেই এবং একই উৎস থেকে মন, বুদ্ধি, বাক্‌শক্তি, আস্বাদনশক্তি, স্পর্শশক্তি প্রভৃতি উদ্ভূত এবং যা-কিছু ইথার-জাতীয়, বায়বীয়, তরল ও কঠিন সেইসকলও।

পদার্থ ও মন সেই একই উৎস থেকে এসেছে যাকে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলে থাকি। সুতরাং বন্ধুগণ, কিরূপে বহু ঈশ্বর থাকা সম্ভব—মুসলমান, খ্রীস্টান ও পারসীদের ঈশ্বর থেকে কি হিন্দুর এক ভিন্ন ঈশ্বর? কেন বিবাদ, কেন একে

অপরকে ঘৃণা করা? বিবিধ নামে ও বিভিন্ন মূর্তিতে ঈশ্বর একই, এই উপলব্ধি সহায়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের একে অন্যকে ভালবাসা উচিত। মানুষ হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীস্টান হোক সে ঈশ্বরেরই সন্তান, এই সনাতন সত্য এবং আমাদের একে অন্যকে অবশ্য আলিঙ্গন করা এবং খ্রীস্টান, মুসলমান বা পারসীকে নিজের ঠিক ভাই মনে করা কর্তব্য। যীশুখ্রীস্টেরও আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে পুরুষ-পরম্পরা এই শিক্ষা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। এই বাণী সর্বপ্রথম ভারতেই ঘোষিত হয় এবং এটিই ভবিষ্যতে ইউরোপীয় জাতিগুলিকে পরিচালিত করবে। আজ তারা এই সত্য গ্রহণেচ্ছু হয়ে উৎসুকভাবে অপেক্ষা করছে। এবং আজ খ্রীস্টানধর্ম, অর্থাৎ গোঁড়া খ্রীস্টধর্মের কথা বলছি, পশ্চাতে স্থান নিতে বাধ্য। যেখানে বিজ্ঞানের জয়, সেখানে বেদান্তের, সনাতন ধর্মেরও বিজয়।

সুতরাং বন্ধুগণ, পৃথিবীময় সনাতন ধর্মের পতাকা বহন করে নিয়ে গিয়ে তার সত্য প্রচার করুন। হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন জাতি উত্তরাধিকারসূত্রে এটি প্রাপ্ত হয়নি এবং হিন্দুরাই সমগ্র পৃথিবীর ধর্মাচার্যদিগের পথপ্রদর্শক। স্বামী বিবেকানন্দ পথ প্রস্তুত করেন, আমি তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করেছি এবং আপনারা আমাদের অনুগামী হোন। এগিয়ে আসুন এবং সকল জাতিকে দেখান যে, প্রাচীনকালের ঋষি ও মহাপুরুষদের স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আপনারা এই সত্যের উত্তরাধিকারী হয়েছেন এবং এই যুগেও আপনারাও ঐরূপ জীবনে উন্নীত হতে সক্ষম। পাশ্চাত্যের লোকদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা প্রায় নেই বলা চলে। তাদের উপাসনার সময়াভাব। তারা সপ্তাহে একবার ভজনালয়ে যায়, নানা উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মসভায় যায়। কিন্তু বন্ধুগণ, মানবজাতির মধ্যে একমাত্র আমাদেরই খাওয়াদাওয়া নিদ্রা প্রভৃতির ভিতর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে ধর্ম ওতপ্রোত। আমরা ধর্মকে ভালবাসি। এই আদর্শ সমগ্র পৃথিবী জয় করবে। ইউরোপীয় জাতি জাগতিক বিষয়ে আপনাদের অধীশ্বর হতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আপনারা তাদের প্রভু। আপনারা মানবজাতির সমক্ষে প্রমাণ করুন, তরবারির শক্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তি বড়। আজ হয়তো আপনারা একথা পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারেন কিন্তু কাল যদি আত্মিক শক্তি প্রকাশ করতে পারেন, যদি এই উপলব্ধি হয় যে আপনারা অমৃতের পুত্র, ঈশ্বরের প্রেম আপনাদের মধ্যে প্রকটিত হচ্ছে তবে আপনারা জগতের কর্তৃত্বলাভে সমর্থ হবেন। এইখানেই আমাদের শক্তি এবং কেউ তা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। আত্মার শক্তি তরবারির শক্তি অপেক্ষা অধিক। অন্য জাতিকে জয় করা চলে, তাদের দেশ দখল করা যায়, তরবারির আঘাতে প্রতিবেশীকে হত্যা করে তার যথা-সর্বস্ব লুণ্ঠন করা সম্ভব, কিন্তু হে বন্ধু, তাতে সুখশান্তি আসবে না। কিন্তু যদি স্বীয় মন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা জয় করা যায় তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট অপেক্ষাও বড় হওয়া সম্ভব।

মহান আলেকজান্ডার একজন দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তিনি একটি বৃক্ষতলে এক উলঙ্গ দরিদ্র সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁর সঙ্গে তিনি পরিচিত হতে ইচ্ছা করেন। সন্ন্যাসীকে তার কাছে আনার জন্য তিনি অনুচরদের পাঠান। যোগী সন্ন্যাসী কিন্তু স্থান ত্যাগ করলেন না। অনুচরগণ যখন আলেকজান্ডারকে জানাল যে যোগী আসতে অসম্মত, আলেকজান্ডার হুকুম

করলেন: "না এলে, তাকে হত্যা কর।" এই সংবাদ যোগীটিকে জানান হলে তিনি বলেন: "আলেকজান্ডার মিথ্যাবাদী, ক্রীতদাস। সে পৃথিবী-বিজেতা নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লিপ্সার ক্রীতদাস; আর মিথ্যাবাদী; কারণ সে আমাকে হত্যা করতে পারে না। 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।' অস্ত্র আমাকে ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি দাহ করতে পারে না, জল আমাকে আর্দ্র করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না। আমি অমর, অক্ষয়, জন্মমৃত্যুরহিত। সুতরাং কেউ যদি বলে আমাকে বধ করবে, তবে সে মিথ্যাবাদী।" মহান আলেকজান্ডার অনুচর-প্রমুখাৎ এই কথাগুলি শ্রবণান্তর এই মহাপুরুষের কাছে শির অবনত করেন ও বলে ওঠেন: "এই সাধু বিশ্বের প্রকৃত কর্তা ও প্রভু।"

আপনারা প্রত্যেকেই উক্ত মহাপুরুষের ন্যায় হতে পারেন—যথার্থ প্রভু—যদি উপলব্ধি হয় যে আপনাদের অন্তরে ঈশ্বর বাস করেন আপনারা সর্বশক্তিমানের জীবন্ত বিগ্রহ। এখন আপনারা মনে করেন যে ঈশ্বর মেঘলোকের ঊর্ধ্বে কোনো দূর স্বর্গে বাস করেন, আপনাদের অন্তরে নয়। এটি কেমন ধর্ম? ঈশ্বর সর্বব্যাপী, আত্মার অস্তিত্ব সর্বত্র। তিনি আপনাদের অন্তরে বাস করেন। ঈশ্বরকে আত্মারূপে অনুভব করতে প্রয়াসী হন এবং জীবনের প্রতিটি দৈনন্দিন কার্যে দেবত্ব প্রকাশিত করুন। তিনিই চিরন্তন সত্য, তাঁহার অস্তিত্ব জগতের সর্বত্র। সৌরজগতে, নক্ষত্রলোকে ও যুগপৎ সকল প্রাণীর অন্তরে তিনিই বাস করেন। যে এই শাশ্বত সত্য অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করে, সে অসীম শান্তি ও অনন্ত সুখলাভ করে। বেদান্তের শিক্ষা এই। অবশ্য আমরা পৃথিবীর সর্বত্র এ শিক্ষা দান করব। অধিকন্তু এও আমাদিগকে উপলব্ধি করতে হবে যে, সকল মানুষই সেই দিব্য সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ। মানুষই ঈশ্বর; কোন মানুষ-ভ্রাতার সহিত যদি দুর্ব্যবহার করা হয়, সে ঝাড়ুদার, মেথর বা পারিয়া যাই হোক না কেন, তবে তা ঈশ্বরের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের সমতুল্য।

এদের কারও অপেক্ষা আমাদের নিজেদের বড় মনে করার অধিকার নেই। সকলের মধ্যে একই ঈশ্বর বাস করছেন। আমাদের শাস্ত্র, বেদ, দর্শন ও বেদান্তের শিক্ষা হলো, যে একই দেবত্ব সকলের মধ্যে দর্শন করে সেই-ই সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। ভগবদ্গীতায় আছে—যে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ, হাতি, গরু, কুকুর ও পারিয়ার মধ্যে একই ব্রহ্মদর্শন করে সেই জ্ঞানী। সুতরাং বন্ধুগণ, আপনাদের ধর্মের শিক্ষা অনুসরণ করুন। এবং স্মরণ রাখুন এইসকল পারিয়া ও নীচ জাতির মানুষ ব্রাহ্মণেরই সমতুল্য, কারণ ঈশ্বর তাদের মধ্যেও আছেন। আমরা যদি সকলের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন না করতে পারি তবে দোষ কার?

যে ব্রাহ্মণ এই সনাতন সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ সে ব্রাহ্মণই নয়, অপর পক্ষে যে ব্যক্তি এই সত্য উপলব্ধি করে সে নীচজাতিসম্ভূত হলেও, যে-ব্রাহ্মণ সনাতন ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে না তার চেয়ে বড়। সুতরাং বন্ধুগণ, আমাদের ধর্ম মহৎ ও উদার এবং সেখানে এইসব জাতিভেদ এবং মতবাদ বা বর্ণবৈষম্যের স্থান নেই। একত্বই মৌলিক নীতি। সকল জাতিই এই সত্য গ্রহণ করবে এবং এই মহান উপদেশাবলী কার্যে পরিণত দেখলে শ্রদ্ধাবনত

হবে সেখানে। এখন যুক্তরাষ্ট্রে এমন বহু লোক আছে যারা যেকোন সত্যের প্রচারককে গ্রহণ করবে এবং তাকে জগতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক নেতাদের একজন ভেবে বরণ করবে। বেদান্তদর্শন তার কাজ করেছে, কিন্তু এখনো তা শেষ হয়নি। আমরা মাত্র আরম্ভ করেছি। আমেরিকায় বর্তমানে অন্য স্বামীজীরা আছেন। তাঁরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নামে প্রতিষ্ঠিত মিশনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা অভিনন্দনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নামোল্লেখ করেছেন। তিনি আমার গুরুদেব। আমি তাঁর দর্শনলাভের গৌরব ও সৌভাগ্য অর্জন করেছি, তাঁর উপদেশ শুনেছি এবং দুই বৎসর তাঁর সেবাধিকার পেয়েছি। আমাদের সঙ্ঘের স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য স্বামীজীদেরও ন্যায় আমিও তাঁর শ্রীচরণতলে আশ্রয় পেয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্তবিগ্রহ। আপনাদের সম্মুখে যেসকল আদর্শের বর্ণনা দিচ্ছিলাম সেইসকলই আমরা তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। খ্রীস্টানরা এসে যখন তাঁর ঐরূপ ঈশ্বরানুভূতি প্রত্যক্ষ করত তারা তখন তাদের প্রভু যীশুখ্রীস্টের সম্মুখে যেরূপ প্রণত হয় তাঁকেও সেইরূপ প্রণতি জানাত এবং ঈশ্বরের কাছে যেরূপ প্রার্থনা করে তাঁর কাছেও তেমনই প্রার্থনা করত। মুসলমানেরা আসত এবং তাঁকে তাদের শ্রেষ্ঠ সাধু ও ইসলামের অনুপ্রাণিত আচার্য মনে করত। বৌদ্ধরা তাঁর মধ্যে তাদের বুদ্ধের আদর্শ দেখত এবং শাক্ত ও বৈষ্ণবেরাও তাঁর ভিতরে তাদের উচ্চতম আদর্শের পরিচয় পেত। শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মধ্যেই ঈশ্বরদর্শন করতেন এবং তাঁর শিক্ষা ছিল অতি উদার যা খ্রীস্টান, মুসলমান, হিন্দু বা বৌদ্ধ সকলেই অনুসরণে সক্ষম।

সুতরাং বন্ধুগণ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার। আমাদের যখন এমন একজন আচার্যের প্রয়োজন উপস্থিত হলো, নিজ জীবনে যিনি জ্ঞান ও ধর্মসমূহের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, তখন তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। তিনি নিজ জীবনে তা দেখিয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ধর্মসমন্বয়ের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। যখন তাঁর কাছে আসি, খ্রীস্ট বা বুদ্ধের ন্যায় কোন আচার্যকেই আমরা বিশ্বাস করতাম না। আমরা ছিলাম অজ্ঞেয়বাদী ও বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্তু যখন তাঁকে দেখলাম এবং তাঁর জীবন দিনে রাতে প্রত্যক্ষ করলাম, তখন তাঁর মধ্যে আমরা কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, খ্রীস্ট ও অন্যান্য অবতারের প্রকাশ দেখতে পেলাম। তিনি প্রায় সর্বক্ষণই ঈশ্বরানুভূতিতে তন্ময় হয়ে থাকতেন। তাঁর জীবনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্রষ্টা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সংসারী লোকের ন্যায় বস্তুতান্ত্রিক বা ব্যবসায়ী আদর্শ অনুসরণ করতেন না, বরং ঈশ্বরই একমাত্র সত্য এই ছিল তাঁর আদর্শ। আপনারা প্রচুর সম্পত্তির মালিক ও অতুল সম্পদের অধিকারী অথবা বহু সন্তানের জনক হোন না কেন, কিন্তু যদি ঈশ্বরোপলব্ধি বা বিশ্বজনীন আত্মার সহিত আপনাদের সম্বন্ধ উপলব্ধি না হয়ে থাকে তবে আপনাদের জীবন বৃথা। এই বিষয় তাঁর স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। আবার একই সঙ্গে তিনি ছিলেন অতীব প্রযুক্তিকুশলী, স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না। এইরূপ গুরুর শিষ্যগণ প্রয়োগকুশল নিশ্চয়ই হবে, স্বপ্নবিলাসী হবে না। তারা মহান কর্মী। তারা আদর্শের জন্য কর্ম করে।

তাদের আদর্শ কর্মযোগ। কর্মযোগ নিঃস্বার্থ কর্মের পথ। তাদের জীবন জগতের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত এবং নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা মুক্তির পথপ্রদর্শক। কর্মযোগ অন্তর পবিত্র করার উপায় শিক্ষা দেয়, সংস্কৃতে তাকেই চিত্তশুদ্ধি বলে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পূর্বে প্রথম সোপান চিত্তশুদ্ধি। যীশুখ্রীস্ট এই কথাই কি কম্বুকণ্ঠে বলেননি, "যাদের অন্তর পবিত্র তারাই ভাগ্যবান, কারণ তারা ঈশ্বর দর্শন করবে।" ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরদর্শন উভয়ের জন্য অন্তরের পবিত্রতা প্রয়োজন। অতএব বন্ধুগণ, সকলের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা আপনারা চিত্তশুদ্ধি করতে পারেন; উপলব্ধি করুন, জীবনে যেসব কর্ম করছেন তা পরমেশ্বরেরই উপাসনা।

ভগবদ্গীতা বলে ঃ "যে কোন কর্ম কর, যে কোন ত্যাগ কর, সব বিনাশর্তে ঈশ্বরে সমর্পণ কর।" এই প্রণালীতে অন্তর শুদ্ধ হবে এবং অন্তর শুদ্ধ হলে ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরদর্শনের অধিকার আসবে। তখন সনাতন ধর্মাদর্শে পৌঁছিবেন। অতএব সকল কর্ম, শারীরিক, মানসিক বা লোকহিতকরই হোক, নিজের জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা না করে সম্পাদন করলে চিত্ত শুদ্ধ হবে। আমাদের সনাতন ধর্ম অন্য একটি বিষয় শিক্ষা দেয়; আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, সকল মানুষই একটি যন্ত্র—যার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ করছেন।

ঋগ্বেদে আছে—ঈশ্বরের অসংখ্য চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও মস্তক আছে। যখন এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর অন্তরের ভগবানকে শ্রদ্ধা করা কর্তব্য; মরণশীল সত্তাকে আপনার অভিবাদন না দিয়ে অমৃতকে দিন, তিনিই প্রকৃত মানুষ। আমাদের প্রথা বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাদের প্রণাম করা। এর অর্থ আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যে ঈশ্বর বাস করেন তাকেই প্রণাম জানাই; অধিকন্তু আপনাদের উপলব্ধি করা কর্তব্য, যে কোন কাজ আপনার ভ্রাতা, প্রতিবেশী বা দেশের জন্য করেন তা উপাসনাই এবং এই আদর্শ মনে রেখে নিজেদের কাজ করে চলা ও পৃথিবীতে বাস করা উচিত। যদি ভগবৎপ্রেমে ও মানবপ্রীতিতে কাজ করেন তবে এই জীবনেই ঈশ্বরলাভের অধিকারী হবেন এবং মৃত্যুর পরে, সেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হবেন যা পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থেই বর্ণিত আছে। তখন জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য লাভ হবে। আর তখন উপলব্ধি হবে যে আপনি মরণশীল নন, মৃত্যুহীন প্রাণ; পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব উপলব্ধি হবে। মুক্তিতেই আপনার জন্মগত অধিকার, এতদিন আপনার শক্তির অপচয় করেছেন পার্থিব বিষয়ে আপনার মনকে আবদ্ধ রেখে এবং নিজকে অন্য মরণশীল প্রাণীর দাস মনে করে, এই বোধ তখন আসবে। আমরা সকলে মুক্তিলাভের জন্য জন্মগ্রহণ করেছি। মুক্তিই সকলের লক্ষ্য এবং মোক্ষ আমাদের ধর্মের উচ্চতম আদর্শ। মোক্ষ অর্থ মুক্তি। মুক্তি শুধু জাগতিক কার্যে স্বাধীনতা বুঝায় না, সকল বন্ধন, সকল দৈহিক ও মানসিক অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্তি ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি বুঝায়। পুরাকালে মহান ঋষিগণ এই আদর্শ রেখে গেছেন এবং একই আদর্শ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ মিশন সঙ্ঘে কর্মরত তাঁর শিষ্যগণও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন...।* □

---

* ৬৯ বর্ষ, ৮ সংখ্যা

শঙ্করের ধ্যাননেত্রে দেবী কালিকা*

ভগিনী নিবেদিতা

অনুবাদ ঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

পূর্বপুরুষেরা হয়তো তাঁকে পর্বতমালায় দেখতে পেয়েছিলেন অথবা অন্য কোথাও। কোন এক জায়গায় হিন্দুমানসে একথা উদ্ভাসিত হয়েছিল যে তুষারশিখর, চন্দ্রালোক আর স্থির জলরাশিতে এমন কোন সৌন্দর্য রয়েছে যা আর সব বর্ণ বৈচিত্র্যময় দৃশ্যসৌন্দর্যের থেকে একেবারে আলাদা।

এ যেন জননী প্রকৃতি স্বয়ং ফুল ফল আর পাখির নক্সা-আঁকা-পাড় সবুজ শাড়ীটি পরে অগণ্য মণিখচিত নীলাম্বরীতে মুখ ঢেকে রয়েছেন, তবু তাঁর অজস্র ঐশ্বর্যের অন্তরালে মাঝে মাঝে এমন কিছুর চকিত আভাস খেলে যায়, যা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এমন কিছু যা শুভ্র, পবিত্র, তপস্যাপূত, যা নৈঃশব্দ্যের অনিবার্য ইঙ্গিত, যা স্তব্ধ, নিরাবেগ, চিরনিঃসঙ্গ। সমগ্র পৃথিবীর সৌন্দর্যে তখন দ্বৈতসত্তার ব্যঞ্জনা। আলোয়-অন্ধকারে, আকর্ষণে-বিকর্ষণে, অণুতে-বিশ্বে, কার্যে-কারণে—সর্বত্র হিন্দুমানস তখন এই দ্বৈত-সত্তারই প্রকাশ দেখতে পেয়েছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র মানবসমাজের দিকে তাকিয়েও সে তাই দেখেছে—নর ও নারী, আত্মা ও দেহ—এই দ্বৈতসত্তার সম্মেলন।

এইখানেই সূত্রপাত। সাঙ্কেতিকতার স্তরে এসে সর্ববস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তা যুক্ত হলো নবরূপের সঙ্গে, আর শক্তিরূপে যা প্রকাশিত (যাকে আমরা প্রকৃতি বলি) নারী ও জননীমূর্তির সঙ্গে তা অন্বিত হলো। এই কল্পনাপ্রসঙ্গে একথা স্মরণীয় যে, নর ও নারী—এ দুয়ে মিলে যেমন মানবতা, তেমনি ঈশ্বর ও প্রকৃতি এখানে পারস্পরিকভাবে একই সত্যের পরিপূরক প্রকাশরূপে । তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রকৃতির অন্তরাত্মার মতো সমগ্র প্রকৃতিও ঈশ্বরসত্তারই প্রকাশ।

'ঈশ্বর ও প্রকৃতি কি দ্বন্দ্বরত?' এ শুধু এক মহাকবির জিজ্ঞাসা নয়, সমগ্র পাশ্চাত্যের ধর্মচেতনার এই প্রশ্ন। শত শতাব্দী বিস্মৃতির অপরপ্রান্ত থেকে ভারতীয় ঋষির অস্ফুট কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—'আরো গভীরে চেয়ে দেখ বৎস। আসলে তারা দুই নয়, এক সত্তা।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেই এক সত্তাই পুরুষ ও প্রকৃতি, আত্মা ও শক্তিরূপে প্রকাশিত।

অলোকসত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ চিরদিনই একান্ত মানবিক। অন্তহীন প্রান্তরের বুকে এক বিরাট প্রস্তরচ্ছায়া আমাদের মনে ঈশ্বরের মহিমার নানা বিচিত্র সৌন্দর্যময় অনুভব জাগিয়ে তোলে, কিন্তু একবারও এমন ভুল হয় না যে, ওই বস্তুটিই স্বয়ং ঈশ্বর। আলো আর দরজা, পাহাড় এবং ঢাল—এরাও এমনি প্রতীক। এইসব প্রতীক কখনো হৃদয়বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে তাদের জন্য আত্মবিসর্জনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে না। ঈশ্বরের অন্য ছবি—মেষপালকরূপে বা চিরকালীন পিতারূপে—তাঁর ছবির সঙ্গে এসব প্রতীকের অনেক পার্থক্য।

* Kali The Mother গ্রন্থের The Vision of Shiva রচনার অনুবাদ।

এক বিচিত্র মানসিক উদভ্রান্তি এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত। প্রতিটি প্রতীকের পটভূমিতে সত্যানুভব জড়িয়ে আছে তা নিশ্চিত বিশ্বাসে, অনিবার্য আবেদনে, পরিপূর্ণতার তৃপ্তিতে এমন অমোঘ যে, সব পার্থক্য মুছে যায়, আমরা ভুলে যাই যে, এও শেষকথা নয়, ভুলে যাই যে, এই প্রতীকের অন্তরালেই বিশাল সমগ্রতা নিহিত।

কোন বিশেষ প্রতীকে আবদ্ধ হওয়ার বিপদকে হিন্দুধর্ম বড় বিচিত্রভাবে পরিহার করতে পেরেছে। পৃথিবীর সব জাতির মানুষের মধ্যে হিন্দুরাই তাই বাইরে থেকে সবচেয়ে বেশি এবং অন্তরে সবচেয়ে কম পৌত্তলিক। মণিখণ্ডের বিচিত্র দ্যুতির মতোই তাদের প্রতীকের বহুবর্ণময় প্রকাশ।

পুরুষ ও প্রকৃতি এক মহৎ সত্যের প্রতীক। প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ এর একটি ব্যাখ্যা। আত্মা ও অভিজ্ঞতা আরেকটি ভাষ্য। বিদ্যুৎযন্ত্র ও তার পরিচালক বিদ্যুৎশক্তির রূপক হয়তো এর তৃতীয় অর্থ।

এই শেষ ব্যাখ্যাটি এক মুহূর্তের অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে। সর্বত্র আমরা দেখতে পাই শক্তি ও কর্মের প্রকাশের জন্য একে অন্যের স্পর্শের অপেক্ষা রাখে। এ-দুয়েরই ভারতবর্ষীয় পরিচয় শিব ও শক্তি নামে। নাইট (বা ক্ষত্রিয় যোদ্ধা) যেমন অপেক্ষা করে তার মানসী রমণীর জন্য, যার প্রেরণাস্পর্শ ছাড়া সে শক্তিহীন, শিষ্য যেমন অপেক্ষা করে গুরুর জন্য—যাঁর মধ্যে সে জীবনের সব অর্থ খুঁজে পায়, আত্মাও তেমনি নিশ্চল নিষ্ক্রিয়, বহিরঙ্গ স্পর্শহীন হয়ে থাকে যতক্ষণ না অধ্যাত্ম-বিপ্লবের চকিতস্পর্শে সমগ্র বহির্জগৎ—সমস্ত জীবন, প্রকৃতি এবং কাল ও অভিজ্ঞতা—আর সমস্ত অন্তর্জগৎ যে এক ঈশ্বরেরই প্রকাশ—একথা সে উপলব্ধি করতে পারে।

প্রতীচ্যের ভাষায় এ সেই অনন্তসৌন্দর্যদৃষ্টি, আর প্রাচ্যের ঘোষণা—এই সেই আত্মোপলব্ধি।

কালী এমনই এক মহামুহূর্তের প্রতিমা—আত্মার উন্মোচিতদৃষ্টিতে বিশ্বসংসারে সর্বত্র ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পাওয়া।

আমরা দেখেছি ঈশ্বরীয় সত্তার মানবীয় প্রকাশ আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেই প্রকাশপদ্ধতি অনুধাবন করতে হলে একটি সমগ্র জাতির হৃদয় ও অনুভূতিলোকের সঙ্গে পরিচিতি আবশ্যিক। আদর্শ মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে রাজা, প্রভু ও পিতার সমন্বয়ে গঠিত। সর্বোচ্চে সেই পরমপিতার স্থান। তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে তিনিই সেনাপতি ও সর্বাধিনায়ক রূপে চলেছেন। তাঁর সন্তানদের প্রতিটি কেশের সংবাদ তাঁর জানা। তাদের অন্যায়ের তিনি প্রতিবিধান করেন, রক্ষা করেন সব দুর্দৈবের হাত থেকে। জগৎরূপ দ্রাক্ষাক্ষেত্রটির তিনি একক অধিকারী, সযত্নে লালন ও গ্রহণ করছেন তাঁর প্রিয় দ্রাক্ষাগুচ্ছ। প্রেমে শাসনে শক্তিতে চিরপূর্ণ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ বিচারক, আদর্শ শাস্তা। এই হলো পাশ্চাত্য কল্পনায় ভগবদ্‌স্বরূপের মানবিক প্রকাশ।

ভারতের আদর্শ কত আলাদা। জীবনের সেখানে একটিই পরীক্ষা, একমাত্র মানদণ্ড—একজন মানুষ কি ঈশ্বরকে জেনেছে, না জানেনি; শুধুমাত্র তাই। ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই, কর্মের প্রশ্ন নেই, সুখের অন্বেষণ নেই। শুধু কেবল প্রশ্ন—আত্মা কি পূর্ণতার সন্ধানে যাত্রা করেছে?

জনপ্রিয় নাটকে-যাত্রায় কী আশ্চর্য নিষ্ঠায় এই একটিমাত্র আবেগেরই রূপায়ণ আমরা লক্ষ্য করি। সেখানে রোমান্টিক প্রেরণা কখনো বড় কথা নয়। জ্যাক (নায়ক) যে তার জোয়ানকে (নায়িকা) পাবে (অথবা পাবে না) তা একান্ত বহিরঙ্গ ব্যাপারমাত্র—যা নাটকের গোড়াতেই সংক্ষেপে সেরে নেওয়া হয়। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা পুলকিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করি—কখন এই মানুষ ভগবানের দেখা পাবে? অথবা কখন তারা একথা উপলব্ধি করবে যে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই পাওয়ার যোগ্য নয়।

উপলব্ধির এই স্তরে উন্নীত হওয়ারই সর্বস্বীকৃত বহিঃপ্রকাশ—ত্যাগ। ভগবদ্প্রেমের আরক্ত গোলাপটি সেই মুহূর্তে ভক্তহৃদয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে, সেই মুহূর্তে সে গেয়ে ওঠে, 'তৃষ্ণার্ত হরিণ যেমন ঝর্ণার উদ্দেশে ছুটে চলে, প্রভু, আমার হৃদয়ও তেমনি তোমার উদ্দেশে ধাবমান।' সমগ্র এশিয়া জানে যে, সেই মুহূর্তে জগতের আর সবকিছু তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়-জগতের সব আকর্ষণ মুহূর্তে দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। গৃহ, পরিজন, জনসংসর্গ—সবই বন্ধন বলে মনে হয়। আহার, নিদ্রা ও দৈহিক যত প্রয়োজন সবকিছু অসহ্য ও অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। হিন্দুকল্পনার দেবাদিদেব মহাদেব তাই ভিখারিমাত্র। যজ্ঞাগ্নির ভস্মবিভূষিত তাঁর তনু তখন তুষারাবৃত মনে হয়, অযত্নবিন্যস্ত তাঁর জটাভার, শীতোষ্ণনিরপেক্ষ মৌন অসঙ্গ তাঁর অবস্থান। অনন্তধ্যানে তিনি চিরসমাহিত।

অর্ধনিমীলিত দুটি নেত্র। তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কত জগতের উদয়-বিলয়, তাতে তাঁর কিছুই এসে যায় না। তাঁর সামনে সব কিছু স্বপ্নবৎ ভাসমান। এই অপূর্ব অবাস্তব মূর্তিটির এমনি অর্থ। কিন্তু একটি শক্তি তাঁর সদাকর্মচঞ্চল। তারই মধ্যে সব ইন্দ্রিয়ের সব শক্তি নিহিত। ললাটের মধ্যভাগে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির তৃতীয় নয়ন। এই তো একান্ত স্বাভাবিক যে, আদর্শ মনুষ্যত্বের প্রতীক দেবাদিদেব শিবের আরেক নাম হলো বিরূপাক্ষ। পশুপতি তিনি। কণ্ঠ তাঁর সর্পবিষজর্জর, যে-বিষ আর কেউ গ্রহণ করবে না। কাউকে তিনি কখনো ফিরিয়ে দেন না। উন্মাদ ও উৎকেন্দ্রিক, পাগল আর অদ্ভুত, অল্পবুদ্ধি যত মানুষ—তাদের সবার ঠাঁই রয়েছে তাঁর দুয়ারে। দৈত্যদানবকেও তিনি আপন করে নিতে জানেন।

যা আর সবাই প্রত্যাখান করে, তাই তিনি গ্রহণ করেন। জগৎরক্ষার জন্য তিনি যখন বিষগ্রহণ করেছিলেন, যে-বিষ তাঁকে নীলকণ্ঠে পরিণত করেছে, তখনই জগতের সব বেদনা ও গ্লানির বোঝা তিনি টেনে নিয়েছেন।

এত সামান্য তাঁর সম্পদ! বাহন একটি বৃদ্ধ বৃষভ, ধ্যানের ব্যাঘ্রচর্ম আর একটি কি দুটি জপের মালা—আর কিছু নয়, কিছুই নয়।

সবার উপরে—তিনি এত অল্পে সন্তুষ্ট। এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু কি হতে পারে? শুধু পবিত্র বারি আর দু-চারটি আতপ চাল আর একটি কি দুটি বেলপাতা দিনে একবার করে তাঁকে দিলেই চলে। জাগতিক বিষয়ে মহাদেবটি একেবারে সরলতম। যেসমস্ত বস্তুর জন্য আমাদের এত সংগ্রাম, এত মিথ্যাচার, পরস্পরের এত হানাহানি—তার কিছুই তাঁর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। বিশ্বাত্মা, অনন্তকরুণাময়, অজ্ঞাননাশন দেবাদিদেব শিবের এমনি একটি ধ্যানমূর্তি ভারতীয় হৃদয়ে ভেসে ওঠে। হিমালয়ের তুষারপুঞ্জের জ্যোতি আর

স্তব্ধ সরোবরে নবীন চন্দ্ররেখার স্থির প্রতিচ্ছায়ায় এমনই একটি মূর্তির প্রথম আভাস জেগেছিল। পরিপূর্ণ ত্যাগ, পরিপূর্ণ অন্তর্মুখীতা, পরিপূর্ণ অনন্তের অন্তর্লীন হয়ে যাওয়া—শুধু এই কথাগুলিই তাঁর সম্বন্ধে বলা যায়, 'মধুরের মধ্যে মধুরতম, ভীষণের মধ্যে ভীষণতম, যিনি বীরেশ্বর, যিনি বিরূপাক্ষ।'

প্রতিদিন ভারতের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে তাঁর উদ্দেশে যে-প্রার্থনামন্ত্র ধ্বনিত হয়, সেটি এই—

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়,
আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখম্
তেন মাং পাহি নিত্যম্।।

আদর্শ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ দেবত্বের এমন এক প্রতীক এই শিব।

পুরুষ বা আত্মারূপে তিনি প্রকৃতি বা মায়ার—ইন্দ্রিয়জগতের বিচিত্র প্রকাশলীলার সহচর, স্বামী। এই সম্বন্ধেই আমরা তাঁকে কালীর চরণতলে দেখতে পাই। তাঁর প্রশান্ত ভঙ্গিমাটি নিষ্ক্রিয়তার প্রতীক। আত্মা বহির্জগতের প্রতি উদাসীন, অসম্পৃক্ত। কালী এক ভয়ঙ্কর সংহারনৃত্যে মগ্ন। চতুর্দিকে তাঁর প্রলয়ের চিহ্ন ছড়ান। গলায় তাঁর মুণ্ডমালা। এখনো তাঁর একহাতে রুধিরচর্চিত খড়্গ, আরেক হাতে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড। সহসা অতর্কিতে তিনি তাঁর স্বামীর বুকে পা রেখেছেন। সেই স্পর্শে সচকিত শিব কালীর দিকে চোখ মেলে চাইলেন, স্থিরনেত্রে দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইলেন।

মায়ের ডান হাতদুটি আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় বিন্যস্ত, প্রসারিত জিহ্বায় লজ্জা ও বিস্ময়ের আতিশয্যচিহ্ন—একদা যা গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে সহজেই দেখতে পাওয়া যেত।

আর শিব—তিনি কি দেখছেন? তাঁর কাছে এই ভয়ঙ্করী কৃষ্ণা নগ্নিকামূর্তি—নরমুণ্ডমালায় যাঁর ঈশ্বরের নামাঙ্কিত, রক্তবন্যায় যিনি দানবদের রুধির পান করান, মহানন্দে যিনি হত্যা করে চলেছেন, কোন বেদনা যাঁর হৃদয়ে নাড়া দেয় না, যে তাঁর চরণাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, একমাত্র তাকেই যিনি আশীর্বাদ করেন—সেই কালী সমস্ত সৌন্দর্যের সার।

মায়ের পুঞ্জ কৃষ্ণকেশরাশি পিছন পানে ঝড়ের মতো উড়ে চলেছে, অথবা সমস্ত-বস্তুপ্রবাহ-বহনকারী সময়ের মতো দ্রুত ধাবমান। কিন্তু সেই পরম তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিতেও কালও এক, অখণ্ড, আর সেই একই ঈশ্বর। মায়ের নীলিমা ঘনকৃষ্ণ মেঘের কাছাকাছি—এক বিশাল ছায়ার মতো। সেই মহাভয়ঙ্করী হৃদয়গভীরে তিনি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন। আর সেই উপলব্ধির সমাহিত চেতনায় তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। আত্মা ও ঈশ্বরের এই তো চির-অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ!

কোন্ মননভূমি থেকে এমন ভাবনা উৎসারিত হয়, তা কি আমরা বুঝতে পেরেছি? কালী তো কেবল প্রতিমামাত্র নয়, আমাদের অন্তরতম অনুভবের উচ্চারণ।

উপলব্ধির দিব্যমুহূর্তে আত্মা মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করে—কী উপায়ে করে? সবুজ বাগান, সহাস আকাশ, রৌদ্রাপ্লুত পুষ্পরাশি—এরা কেউ সেই সর্বেশ্বরকে

ভোলাতে পারে না। আপাত মাধুর্যের অন্তরালে তিনি দেখতে পান জীবন জীবনকে আক্রমণে উদ্যত, নদী পাহাড়-পর্বতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ধাবমান, মধ্যাকাশে আঘাত হানতে উদ্যত ধূমকেতু। তাঁর চারপাশে ধ্বনিত হচ্ছে সর্বজীবের আর্ত ব্যথিত ক্রন্দন, লুব্ধের হাহুতাশ আর ক্ষুদ্রের নিরীহের ভয়ার্ত কলরব। মমতাহীন, দায়িত্বহীন, মানবজাতির ক্রন্দনের প্রতি উদাসীন অথবা সে-ক্রন্দনের প্রত্যুত্তরে উন্মত্ত অট্টহাস্যে মুখর কালস্রোত প্রবহমান।

সহজাত সংস্কারে হিন্দুর দৃষ্টিতে জগতের এমনি এক ছবি ভেসে ওঠে। শ্রান্তহৃদয় বলে ওঠে, 'সত্যি, জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক বড়, অনেক ভাল।'

কিন্তু আত্মার দিব্যদৃষ্টির মুহূর্তটি তো তা নয়। পরিশ্রান্তির দীর্ঘশ্বসিত বিলাপ, করুণার জন্য কাতর প্রার্থনা, অলস বৈরাগ্য—কিছুই সে-মুহূর্তে নেই। মাথা নিচু কর, অমনি চিরন্তনী মহাজননীর উদ্দেশে ভারতবর্ষের বহু যুগের যন্ত্রণা ও হতাশায় মন্থনজাত বাণী শুনতে পাবে। যদিও ধ্বংসের নিনাদই তীব্রতর, আর সেই কণ্ঠস্বর মৃদুতম, তবু কান পেতে শোন—

"আমায় তুমি সংহার করলেও একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করব।"

শেষ অবধি শিবের এই ধ্যানদৃষ্টিতে ছাড়া আর কোন উপায়ে কি কেউ ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে? আমাদের জীবনের যত মহত্তম উপলব্ধি—তারা সব কি বেদনার পাত্রটি তিক্ততম রসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার মুহূর্তেই ধরা দেয়নি? সর্ব-রিক্ততার বুক-ভাঙা কান্নার মুহূর্তেই কি আমরা প্রেমের বিজয়ী মূর্তিতে পরমতমের দর্শন লাভ করিনি?

চেয়ে দেখ, মাগো, আমরাও তোমারই সন্তান! তুমি আমাদের সংহার করলেও আমরা তোমারই শরণাগত!

মুহূর্তটি অপগত, অপসৃত সেই দিব্যদৃষ্টি—মানবকল্পনার যা হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। সেই মুহূর্তটি পার হয়ে আমরা ফিরে এলাম আদিযুগের পার্বত্যপটভূমিকায়।

বৈদিক যজ্ঞের আয়োজন—আর্যগোষ্ঠীর লোকেরা সমবেত। যজ্ঞের সমিধভার বহন করে বলিষ্ঠ এক বৃষভ ধীরস্বচ্ছন্দ গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

অগ্নিসংযোগ হলো, চারপাশের যজ্ঞকাষ্ঠকে দগ্ধ অঙ্গারে পরিণত করে হোমকুণ্ডের মধ্যভাগ থেকে নীলাভ শিখা সমুত্থিত হলো, তারই চারপাশে লেলিহান রক্তাভ অগ্নিরাশি। পুরোহিতেরা মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন, সমবেত জনসাধারণ অপেক্ষমান। আমরা চেয়ে আছি কখন কবির দৃষ্টিতে এই অগ্নির বিচিত্র মুখগুলি গড়ে তুলবে ঈশ্বর ও প্রকৃতি, আত্মা ও জীবনের এক দিব্যকল্পনা।

পণ্ডিতেরা বলেন, বৈদিক যজ্ঞাগ্নিরই রূপমূর্তি এই শিব। তিনিই বৃষভবাহিত কাষ্ঠরাশি থেকে সমুদ্যত নীলাভকণ্ঠ শুভ্র অগ্নিশিখা। আর কালী হলেন এই শিবের অন্যতম শক্তি, এই রক্তিম অগ্নিশিখার অন্যতম শিখা—যার দ্বারা অদগ্ধ সমিধরাশি কৃষ্ণ অঙ্গারে পরিণত হয়ে ভস্মসাৎ হয়। প্রসারিত জিহ্বায় সেই অগ্নিশিখার স্মৃতি।* □

---

* ৭০ বর্ষ, ১ সংখ্যা

আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

অনুবাদক : ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য

ভারতের অমর শাস্ত্রে যেসব দর্শন মূর্ত হয়ে রয়েছে, বিশেষত উপনিষদ্ এবং গীতাতে, তা বাস্তবিকই শাশ্বত ও সনাতন। ঐগুলি হচ্ছে প্রাচীন ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা, সাধু ও মনীষীদের দর্শন—আর ঐগুলি মানবজাতির এক-সপ্তমাংশ লোকের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ঋষিদের ঐ দর্শনের ধারা যুগযুগ ধরে এমনকি আমাদের এই বর্তমানকাল পর্যন্ত বয়ে চলেছে আর এটিই হচ্ছে সনাতন বস্তু। পৃথিবীর অন্যান্য বস্তু সব আসবে ও যাবে, কিন্তু উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের ঐ অনুভূতি অনন্তকাল ধরে থাকবে।

আমরা এই প্রসঙ্গ আলোচনা করবার সময় দেখব যে, ভারতের এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল নরনারীর হৃদয়ের আদরের বস্তু। ভারতেতর দেশে ভ্রমণের সময় একটা জিনিস আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে—তা হচ্ছে ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের প্রতি সকল দেশের মানবমনের একটা আবেগময় সাড়া। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে উপেক্ষা করেও ভারতের এই আধ্যাত্মিক বাণী সকল দেশের মানবহৃদয়কে স্পর্শ করেছে। এ হলো ভারতবর্ষের একটি রূপ—অন্য জাতির ন্যায় যার রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক প্রভৃতি পটভূমিকা রয়েছে, আবার অন্যদিকে রয়েছে অনন্ত পরিধি ও সীমাহীন ক্ষেত্র। এটিই মানুষ ও প্রকৃতির চরম সত্তার সাক্ষিস্বরূপ হয়ে রয়েছে এবং এই আধ্যাত্মিক দান পৃথিবীর মানবজাতির গৌরব ও মহত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই বর্তমান সঙ্কটময় পৃথিবীতে মানুষের সামগ্রিক ও স্বতন্ত্র সত্তার যোগসূত্র স্থাপন করতে এই অনুভূতিগুলিই সমর্থ।

স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ-বাণীতে পাশ্চাত্যে যে বিস্ময়কর সাড়া জেগেছে—এটি ইতিহাসের একটা স্বতন্ত্র বা খামখেয়ালী ঘটনামাত্র নয়। কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের বর্তমান পৃথিবী খুঁজছিল একটি সর্বজনীন বস্তু। আজ সমগ্র পৃথিবীতে এমনকি কম্যুনিস্ট-প্রধান দেশগুলিতে আমি দেখেছি যে, বহু লোক ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সুযোগ পেলেই তারা ঐসব বস্তু জানতে চায়। ভারতের বাণী কোন একটা ধর্মমতের, গোঁড়ামির বা সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আবদ্ধ নয়; উপরন্তু তা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে মানবের সামগ্রিক উন্নতি, অগ্রগতি এবং তাঁর চরম উৎকর্ষলাভের পন্থা। সত্যি বলতে কি, শুধু এই বস্তুটির জন্যই জগৎ অপেক্ষা

* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এ প্রদত্ত একটি ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ।

করছে। চেকোস্লোভাকিয়ার লোকেরা আমাকে বলেছিল যে, ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁদের বংশানুক্রমিক ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন বেদান্তের ঐ সর্বজনীন আদর্শ দেখে। এই আদর্শ কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়; এটি কোন নির্দিষ্ট ধর্মমতের, সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত নয়; উপরন্তু এটি মানবীয়।...

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, জগৎ ভারতের এই চিন্তাধারার বিষয় খুব কমই জানে। বস্তুত ভারতবর্ষেরও খুব কম লোকই তাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। আমরা আমাদের এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারকে আমাদের নিজেদের জাতীয় গৌরব বলে সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে ফেলে রাখি না; উপরন্তু আমরা সকল মানবকে জানাই যে, এতে তাদেরও সমান অধিকার আছে, ভারতের মানুষ কয়েকটি বিষয় সহজে লাভ করেছে—সে মানুষের শ্রেষ্ঠ অনুভূতির চরম শিখরে উঠেছে, এবং তাদের সেইসব দুর্লভ অভিজ্ঞতা দান করে গেছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। আজকাল আমরা শুনি যে, মানুষ মাউন্ট এভারেস্ট এবং অন্যান্য উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করছে, কিন্তু ভারতবর্ষ উঠেছে অনুভূতির এবং মহত্ত্বের চরম শীর্ষে। এটিই জগতের প্রতি তার শ্রেষ্ঠ অবদান। এর ভিতর কোন সীমাবদ্ধ বা সঙ্কীর্ণ ভাব নেই; আর ঘোষণা করছে মানুষের মনের, চিন্তাধারার ও সামগ্রিক ভাবে কল্যাণলাভের দিগ্‌দর্শন।

মনুষ্যানুভূতির দাবি

ক্রমবিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে। এর ভিতর দিয়ে জীবনীশক্তি স্ফুট থেকে স্ফুটতর হয়েছে; আর মানুষের কাছে প্রকাশ করেছে সৌন্দর্য, শক্তি, সামর্থ্য এবং মহত্ত্বের উৎকর্ষ। ভারত ঐগুলি বহন করে নিয়ে গেছে তাদের চরম অভিব্যক্তিতে। বহু যুগ পূর্বে ভারত জিজ্ঞাসা করেছে, 'মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?' এই জটিল প্রশ্ন ভারত সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করেছে। দেহ-ইন্দ্রিয় ও বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েও মানুষকে এগুতে হবে তার জন্মগত অনুভূতির শিখরে, আর তা লাভ করতে হলে চাই জীবনের একমুখী চেষ্টা। তাই শিক্ষা ও ধর্ম এক এবং অভিন্ন। ভারত তার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রথম ভাগে কতিপয় ঋষি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির দ্বারা এই মৌলিক সমস্যার সমাধান করেছে এবং ঐ সমস্যার অনুসন্ধিৎসার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি উপনিষদের মতো অমর গ্রন্থ। এই সাহিত্য অমর, কারণ এর প্রসঙ্গ অমরত্ব ঘোষণা করেছে। উপনিষদ্ ঘোষণা করেছে যে, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করাতেই রয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। আমরা বহু জিনিস অতিক্রম করেছি। আমরা আমাদের এই দেহমনসমন্বিত মনুষ্য শরীরে পশুবৃত্তিটা কিয়ৎ পরিমাণে অতিক্রম করেছি কিন্তু এটিই শেষ বা চরম লাভ নয়। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো উন্নত আধুনিক যন্ত্রশিল্প লাভ করেও মানুষ তার সবকিছু চাহিদা মেটাতে পারেনি। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা লাভ করেও মানুষ এখনো সেই আদিম পঙ্কে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাকে এখনো প্রভূত পরিমাণে পশুবৃত্তি ছাড়তে হবে। ক্রমবিবর্তনের পথে সে যথেষ্ট এগিয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য এখনো তার নাগাল থেকে অনেক দূরে। আরো অনেক পথ এগিয়ে গিয়ে নিজেকে অতিক্রম করে মানুষকে লাভ করতে হবে সেই মহান সত্যকে।

উপনিষদ্ মানুষের এই ক্রমবিকাশের ধারাকে এবং তার গভীরতম অনুভূতির দাবিকে স্বীকার করেছে এবং মানুষকে এগিয়ে দিয়েছে সেই অগ্রগতির পথে অর্থাৎ অনুভূতির শিখরে। উপনিষদ্ দেখিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের প্রকৃত সত্তা রয়েছে তার অমর দৈবী প্রকৃতির অনুভূতির মধ্যে। এটিই হলো উপনিষদের বিষয়বস্তু এবং তা আমাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, আর তা-ই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উপাদান। বর্তমানকালে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখতে পাই মানুষের ভিতর দেবত্ব-বিকাশের চরম পরিণতি। উপনিষদ্ থেকে ঐ ধারাটি প্রবাহিত হয়ে এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আর এই ধারাটি হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি আকর্ষণীয় বস্তু। শাশ্বত সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া কোন সংস্কৃতিই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুদীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু যখন কোন সংস্কৃতির বনিয়াদ সুদৃঢ় গভীর অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জীবনের মৌলিক উপাদানগুলিকে স্পর্শ করে, কেবল তখনই সেটি একত্ব এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং যুগ যুগ ধরে মানুষকে আলোকের পথে এগুতে প্রেরণা দেয়।

ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমিতে আমরা দেখি যে, ভারত মানুষের জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, মানুষ সম্বন্ধে ভারতের চিন্তাধারা কেবল ধর্মীয় সাধকের মধ্যে সীমিত এবং তারা কোন এক কাল্পনিক অতীন্দ্রিয় জগতের অন্বেষণ করে। কিন্তু তা সত্য নয়। আমরা দেখি যে, জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সর্বক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা লাভ করে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আনন্দময় জীবনের ক্ষেত্রে সে কোন বিষয়েই পিছিয়ে ছিল না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি চিন্তাধারা প্রাধান্য লাভ করেছে—যা মানুষ এবং জগতের আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়ে পৌঁছে দিয়েছে সেই চরম সিদ্ধান্তে—বহুত্বে একত্ব ও একত্বে বহুত্ব। সামাজিক ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ করে সেই উন্নতমনার দল এগিয়ে গেছেন এবং একটার পর একটা জিজ্ঞাসা করেছেন সেই মৌলিক প্রশ্নাবলীকে। এই সামাজিক মানুষ, এই দেহমনধারী জীব কি ক্রমবিকাশের শেষ স্তর? অথবা এটি কি অন্য কোন উচ্চ পর্যায়ে রূপান্তরিত হতে পারে? অবশ্য এই জিজ্ঞাসা কয়েকটি মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তির উন্নত চিন্তাধারার পরিচায়ক। কেবল কয়েকটি প্রতিভাশালী ব্যক্তিই এই রহস্যপূর্ণ মৌলিক সত্যজিজ্ঞাসা বেছে নেয়; আর তারা সমাজের যেকোন স্তর থেকে হতে পারে। উপনিষদের পৃষ্ঠা ওলটাবার সময় আমরা দেখব যে, এই চিন্তানায়কদের মধ্যে আছে পুরুষ, স্ত্রী, শিশু, বুদ্ধিমান, রাজা ও সাধারণ লোক। আমাদের সবচেয়ে বেশি বিস্ময় ঘটায় সেই একটিমাত্র বস্তু—সেই চিন্তানায়কদের নিরবিচ্ছিন্ন ধৈর্যপূর্ণ জিজ্ঞাসা : মুক্তি কি? মানুষের সর্বোচ্চ অস্তিত্ব কোথায়? স্বচ্ছমন ও পবিত্রজীবনসম্পন্ন ঐ চিন্তানায়কেরা আত্মসংযম ও একাগ্রতার ভিতর দিয়ে পেয়েছিলেন সেই রহস্যপূর্ণ দুরূহ প্রশ্নের উত্তর; আর তা সুন্দর বাচনবিন্যাস, আকর্ষণীয় কথোপকথন ও ছন্দোবদ্ধ অসম্পূর্ণ কবিতার ভিতর দিয়ে দান করে গেছেন পরবর্তী কালের বংশধরদের জন্য। এইভাবেই ঐ সাহিত্য হয়ে রয়েছে অমর।

মানুষের প্রকৃত স্বরূপ

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ তাঁর 'রামকৃষ্ণের জীবন' গ্রন্থে লিখেছেনঃ "যে মানুষটির মূর্তিকে আমি এখানে কল্পনায় রূপ দিতে চাই, ত্রিশকোটি নরনারীর দুইসহস্রবৎসরব্যাপী আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ তিনি।" সেই রামকৃষ্ণ আমাদের কালে আবির্ভূত হয়েছেন (১৮৩৬-৮৬ খ্রীঃ) এবং তাঁর মহান আবির্ভাবের একমাত্র কারণ ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারাকে অব্যাহত রাখা। এ হলো সেই বিরামহীন স্রোতস্বিনী—যার ফল্গুধারা যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে। সম্ভবত আমাদের ভিতর অনেকেই তা জানে না এবং অনেকে হয়তো ঐ মহান ধারার সুযোগ-গ্রহণে সমর্থ নন, আবার কারো কারো কাছে তা খুব উচ্চে। কিন্তু যে-কেউ তা শুনেছে বা দেখেছে সেই বিস্ময়ে ও প্রশংসায় ভরপুর হয়ে গেছে। এবিষয়ে ভগবদ্গীতাতে একটি সুন্দর শ্লোক আছে ঃ

"আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং, বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।।"

অর্থাৎ কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যতুল্য দেখেন, অন্য কেউ এঁকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন, অপর কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন; খুব কম লোকে মানুষের সেই শাশ্বত মহিমাকে জানতে পারে।

তাহলে মানুষের শাশ্বত গৌরব কোথায়? এ হলো তার সেই জন্মগত দৈবী প্রকৃতি, যা জন্মমৃত্যুহীন, শুদ্ধ ও পবিত্র। সে শরীর ও ইন্দ্রিয়ধারী জীব নয়—ঐগুলি হলো এই ক্ষণিক জগতের কর্মের ও প্রকাশের যন্ত্রমাত্র। সে হলো সেই অসীম অদ্বিতীয় বস্তু, যিনি আবার নিজেকে এই সসীম দেহমনবিশিষ্ট আকৃতিতে ব্যক্ত করেছেন। এটিই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। এটি কোন দার্শনিক মতবাদ নয়, কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। সকল সংবেদনশীল মনই এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে। উপনিষদ্ যখন রচিত হয় তখন তা মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে, সহস্র বৎসর পরেও এবং এমনকি আজকালও তা সমভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের এই জাগতিক উন্নতি এবং বর্তমানকালের এই ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাশালিনী পৃথিবী উপনিষদের ঐ যথাযথ সিদ্ধান্তপূর্ণ চিন্তাধারার গতিরোধ করতে পারেনি—উপরন্তু তার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। আজকের জগৎ চাইছে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি; এবং এটিই একমাত্র মানুষের মনের গতিহীনতা ভাঙতে সমর্থ, ধনাদির মোহে মানবমন তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে—'প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্' (কঠ, ১।২।৬)। ক্রমবর্ধমান গতিহীনতা মানেই মৃত্যু। সুতরাং সমগ্র মানবজাতির প্রতি উপনিষদ্ তার মহান আশার বাণী সুন্দরভাবে ঘোষণা করছে ঃ মানুষের ধন, ক্ষমতা এবং সবকিছুই থাকবে, কিন্তু তার কোনটাতেই সে নিজেকে আবদ্ধ করবে না। ঐগুলি উপায়মাত্র, লক্ষ্য নয়; চরম অভিজ্ঞতার দ্বারা সে ঐসব ভেঙে চুরমার করে সচ্চিদানন্দস্বরূপ তার যে অন্তর্নিহিত দেবত্ব অর্থাৎ আত্মাকে অনুভব করবে। এইভাবে উপনিষদ্ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে সৃজনক্ষম পূর্ণতর জীবন।

এই 'সৃজনক্ষম জীবন' কথাটি বেশ সুন্দর এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেবল একটি জিনিসকে বারবার প্রকাশ করাতেই সৃজনকারিতা প্রকাশ পায়

না। শরীর, ইন্দ্রিয়বর্গ এবং স্নায়ুব্যবস্থার প্রতিনিয়ত সঞ্চালন ও ক্ষণিকের ভোগোন্মত্ত মাদকতা ঐ সৃজনক্ষম জীবন তৈরি করতে পারে না। আজই হোক আর কালই হোক, শরীর-মনের এই দাসত্বের নিগড় আমাদের ভাঙতেই হবে। তখনই আমরা ঠিক ঠিক ঐ সৃজনকারিতায় পৌঁছাব এবং এটাই উপনিষদের অভিপ্রেত। সেজন্যই আধুনিক নরনারীর কাছে উপনিষদ্ অনুপ্রেরণা যোগায়। এইরূপ আধুনিকদের দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : প্রথমত আধুনিক সুখসুবিধা ভোগকারীরাই আধুনিক এবং তা-ই আধুনিক কথার সাধারণ অর্থ। কিন্তু ঐ কথার পিছনে রয়েছে একটি নিগূঢ় অর্থ, আর তা হচ্ছে—আধুনিক লোক সেই-ই যে বিজ্ঞানালোকে পুষ্ট, মনঃসংযমী, সত্যান্বেষী এবং মহান যীশুর মতো জিজ্ঞাসা করবার যার ক্ষমতা আছে—'খোঁজ, জিজ্ঞাসা কর এবং ধাক্কা দাও।' সেই অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই আধুনিক—যার রয়েছে সত্যের জন্য তীব্র লালসা এবং বিচারশক্তি, যে-কোন বস্তু পাওয়ামাত্রই গ্রহণ করে না কিন্তু সে চেষ্টা করে তার ঈপ্সিত বস্তুকে হৃদয়ের সঙ্গে এক করে নিতে। তার হৃদয় ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করে—'এর পর কি? এর পর কি?' এইরূপ আধুনিক মনই উপনিষদের আলোকের নিকটবর্তী। এই উপনিষদে রয়েছে একটা জাগ্রত পরিবেশ, ক্রমাগত জিজ্ঞাসা, সত্যানুসন্ধিৎসা, এগিয়ে যাবার একটা তাগিদ এবং কোন জিনিসকে ভাবালুতার সঙ্গে গ্রহণ করা নয়। একমাত্র এই উপনিষদের সঙ্গেই রয়েছে আধুনিক ভাবের একটি সুন্দর যোগসূত্র।

সুতরাং আজকাল আমরা দেখি যে, সত্যান্বেষী, জীবনের মান-উন্নয়নকারী বিজ্ঞানজগতের দিকপালরা যখন উপনিষদের সংস্পর্শে আসেন, তখন তাঁরা এতে মুগ্ধ হয়ে অনুরক্ত হন। স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদ্ সম্বন্ধে বলেছেন : "...যদি ইংরেজী ভাষায় এমন কোন শব্দ থাকে, যদ্দ্বারা মানবজাতির উপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ করা যেতে পারে, তা এই 'fascination' (আকর্ষণী শক্তি)। এই আকর্ষণী শক্তির একমাত্র কারণ—তা মানুষকে একটা অতি উঁচু পবিত্র এবং মহান স্তরে টেনে নিয়ে যায়। উপনিষদের তূর্য-নিনাদ মানুষকে টেনে নিয়ে যায় অগ্রগতির পথে। তাই আমরা কঠোপনিষদে দেখি, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' অর্থাৎ উঠ। জাগ! এবং শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের কাছে গিয়ে তত্ত্ব অবগত হও।"

আত্মশক্তির গতিশীলতা

গতিহীন বর্তমান মানবের অগ্রগতির পথে এগুতে প্রয়োজন এই শঙ্খনিনাদ। পৃথিবীর ইতিহাসে থেমে যাওয়ার কাহিনী যেন চিরাচরিত। সভ্যতা মাঝে মাঝে সসীম পঙ্কে আবদ্ধ হয় এবং থেমে যায়; ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই বদ্ধাবস্থা থেকে ছাড়া পাবার একটিমাত্র পথ আছে। কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে এই চরম দুরবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে না; এইগুলি সাময়িক উপশম হতে পারে; কিন্তু তা কোন কৃষ্টি বা সভ্যতাকে বদ্ধাবস্থা থেকে তুলতে অথবা গতিশীল রূপ দিতে পারে না। এটি আধ্যাত্মিক রোগবিশেষ, সুতরাং তার নিরাময়ত্বও রয়েছে ঐ আধ্যাত্মিকতার মধ্যে। তার নিবারণ করতে একটিমাত্র পথই আছে এবং তা হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন করা।

ভারত তা-ই বারবার করেছে। এই গতিহীন জগৎকে গতিশীল করতে গেলে চাই শক্তির অভ্যুদয়—ভারতের ইতিহাস তা বহুবার সাক্ষ্য দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" অর্থাৎ ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যখন জীবন গতিহীন হয় এবং একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে তখন ভগবান, যিনি মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরাত্মা, আবির্ভূত হন এবং সমাজকে নতুনভাবে শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করে তোলেন।

জগৎকে গতিশীল রূপ দিতে আত্মশক্তির প্রভাবের অপর একটি উদাহরণ দেখতে পাই আমরা বুদ্ধদেবের জীবনে (৫৬৩-৪৮৩ খ্রীস্টপূর্ব)। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রায় এক হাজার বছর পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নির্বাণ লাভ করার পর সারনাথে তাঁর প্রথম অনুশাসন ছিল এই ধর্মচক্রকে গতিময় করা। ঐ অনুশাসনের নামকরণও গুরুত্বপূর্ণ—'ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্র' অর্থাৎ ধর্মচক্রকে গতিশীল করা। সেখানে ধর্মকে চক্রের সঙ্গে এবং সমষ্টি ও ব্যষ্টিগত মনুষ্যজীবনকে চক্রসমন্বিত গোযানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যদি চাকা পঙ্কিল পঙ্কে আবদ্ধ হয় তবে তা ওঠাতে হারকিউলিসের মতো শক্ত কাঁধের দরকার হয়। কোন সমাজ বা ব্যক্তি দেহ-ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক সুখে মজে থাকতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রোমের সমাজ ঠিক এই কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং তা আমাদের ইতিহাসেও দেখা যায়। ইন্দ্রিয়সুখে মশগুল হয়ে এবং জীবনের উচ্চাদর্শ হারিয়ে ফেলে সমাজ অতলে তলিয়ে যায়। সারনাথে বুদ্ধদেব তাই বলেছিলেন ঃ "এস, আমরা সকলে এই চাকায় কাঁধ লাগিয়ে একে গতিময় করে তুলি।" চক্রের অর্থই গতি; তাই বুদ্ধদেব বললেন ঃ "এই ধর্মচক্রকে ঘোরাবার জন্যই আমি এসেছি।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ "এই ধর্মশক্তিকে সঞ্চালিত করতে আমি এসেছি।" সত্যি বলতে কি, ভারতের ইতিহাসে তা-ই বারবার ঘটেছে। আর আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ কি করলেন? আপাতদৃষ্টিতে তিনি কিছুই করেননি; সেইকালের তুমুল রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বাইরে থেকে তিনি একটা অনাড়ম্বর শান্তিপূর্ণ জীবন কাটালেন। কিন্তু তাঁর ভিতর থেকে যে প্রচণ্ড শক্তি বেরিয়েছিল, তা সে-সময়কার বহু মানুষকে এবং আন্দোলনগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল; অধিকন্তু কিছুকালের মধ্যেই তা এই বর্তমান পৃথিবীর ওপর একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভিতরে ও বাইরে ছিলেন তিনি আধ্যাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহ এবং মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তব রূপ তিনি দেখিয়ে গেছেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন—ধর্মের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, সকল ধর্মের একতা আর ধর্মের নামে ঝগড়া ও যুদ্ধের প্রয়োজনহীনতা। ঝগড়া-বিবাদ ধর্মকে বিকৃত করে তোলে। কিন্তু ধর্ম তো ছলচাতুরি নয়, ধর্ম মানুষকে দেখিয়ে দেয় তার জীবনের প্রকৃত পথ, প্রকৃত মুক্তির আস্বাদ।

দেহগত ও সমাজগত মানুষ কখনই মুক্ত হতে পারে না; সে বাইরের ও ভিতরের বস্তুনিচয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ। একমাত্র আধ্যাত্মিক ভূমিতেই রয়েছে প্রকৃত স্বাধীনতা ও একত্ব এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ; আর ঐ অমরত্ব ও দেবত্ব আমরা এই মনুষ্যজীবনেই লাভ করব। এই-ই হচ্ছে প্রকৃত অগ্রগতি এবং উন্নতি—আর এই-ই ধর্ম। এই আদর্শ নিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ



ছিলেন এবং তিনি এতে এমন প্রচণ্ড শক্তি দান করেছিলেন যে, পরবর্তী কালে যখন কোন লোক তাঁর কাছে থেকে ঐ আদর্শ গ্রহণ করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে সে ঐ শক্তিরও অধিকারী হয়ে যেত। ঐ আদর্শের সত্যতা সম্বন্ধে সে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করত, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজজীবনে সেই সত্যকে রূপদান করেছিলেন।

এইভাবে গতিহীন সমাজ গতিশীল হয় এবং আবার চলতে শুরু করে। সুস্থ শরীরে যেমন রক্ত সঞ্চালিত হয় সেইরূপ সমগ্র রাষ্ট্রজীবনে এই আধ্যাত্মিকতার স্রোত বওয়ানো উচিত। মহামানব আসেন তাঁর অপরিমিত শক্তি নিয়ে। আমরা আবার চলতে শুরু করেছি এবং ঐ জড়তা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। মানুষ আবার তার জীবনের প্রকৃত বস্তু খুঁজতে শুরু করেছে। মহাপুরুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আসেন তাঁর শক্তিশালী সাঙ্গপাঙ্গর দল— যাঁদের থাকে গভীর জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধানের একটা তাগিদ। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কি? মানুষ কি করে তা জানতে পারে? তার জীবনের লক্ষ্য কি এবং কিভাবে সে তা লাভ করতে পারে? আধ্যাত্মিকতা কি কয়েকটি মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান ব্যক্তির অধিকার, না তাতে প্রত্যেকের অধিকার আছে?

উপনিষদ্ তাই দর্পভরে ঘোষণা করছে যে, এই আধ্যাত্মিকতায় রয়েছে সকলের অধিকার। এই পবিত্র অমর আত্মা প্রত্যেক নরনারী-শিশুর অন্তরাত্মা। এটাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ এবং প্রত্যেক প্রাণীরও প্রকৃত স্বরূপ, কিন্তু তারা একথা অনুভব করতে পারে না। কেবল এই দেহমন-সমন্বিত মানুষ বহু বিবর্তনের পরে এই সত্যকে লাভ করবার ক্ষমতা লাভ করে। এই পথের পথিক একমাত্র মানুষই হতে পারে। মানুষের বিচারশক্তি প্রভৃতি কতকগুলি সুবিধা আছে এবং যখন সে সেগুলি অভ্যাস করতে থাকে তখন সে আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে সমর্থ হয়। উপনিষদ্ শিক্ষা দেয় যে, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব নয়। ভোগসুখের প্রতি ধাবমান মানবকে উপনিষদ্ ঘৃণা করেনি; শুধু বলেছে, 'এর চেয়েও সুন্দর ও মহত্তর বস্তু রয়েছে।' উপনিষদ্ সবসময় আমাদের জোর করে ঠেলে দিয়েছে আমাদের ভিতরের সেই বস্তুর অনুভবের পথে। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এক কাঠুরিয়া সম্বন্ধে একটি ছোট সুন্দর গল্প বলেছেন। এক কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল এবং এক সাধু তাকে বললেন, 'এগিয়ে যাও।' তাঁর উপদেশ শুনে কাঠুরিয়া চন্দনকাঠের বন পেল, তারপর রূপার খনি, তারপর সোনার খনি এবং আরো গভীর জঙ্গলে গিয়ে সে হীরের খনি পেল এবং এক মস্ত বড় ধনী হয়ে গেল। এই গল্প শেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেনঃ "তাই বলছি যে, তুমি জীবনের যেকোন স্তরেই থাক না কেন তুমি সেই সুন্দর ও পবিত্র বস্তু লাভ করতে পারবে যদি তুমি আরো এগিয়ে যাও।"

ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতের কৃষ্টি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; তার কারণ ভারত এখনো তার শিক্ষার ধারাকে ভোলেনি। এখন অগ্রগতির পথে ভারতকে এগুতে হলে দরকার তার প্রাচীন কৃষ্টির সঙ্গে বর্তমান পাশ্চাত্য-কৃষ্টির সারাংশের সম্মেলন। কিন্তু তা করতে সে তখনই সমর্থ হবে যখন সে তার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং তার দ্বারা

সে অনুপ্রাণিত ও শক্তিশালী হবে। আমাদের এই ঐতিহ্যের প্রাণবন্ত ধারা এসেছে উপনিষদ্ থেকে আর উপনিষদ্-অধ্যয়নের ভিতর রয়েছে একটা বিশেষ তাৎপর্য যা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সকল মানবকে অনুপ্রাণিত করছে।

ভারতের ক্ষেত্রে, এই উপনিষদ্ তার সন্তানদের তার মূল্য জানিয়ে দেবে আর জানিয়ে দেবে তাদের ইতিহাসকে এবং বাঁচবার পথকে। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো ঐ মূল্যবান বস্তুগুলি চাই; কিন্তু কৃষ্টি তো অনায়াসলভ্য বস্তু নয়। এতে অনুশীলনের দরকার, আর প্রয়োজন উপলব্ধির। এই কৃষ্টির মূল্যায়ন এবং উপলব্ধি এ-যুগের ভারতের নরনারীকে দেবে বর্তমান জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি এবং তা ভারত ও ভারতেতর দেশগুলিকে মানবিক কল্যাণে সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত করবে। তাই বর্তমান ভারতের শিক্ষিত নাগরিকদের জানতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে উপনিষদ্ এবং ভগবদ্গীতাকে। এটি শুধু সাহিত্য বা দর্শন হিসাবে গ্রহণ করলে চলবে না; এর গভীরে ঢুকে জীবনের সঙ্গে এক করে ফেলতে হবে এর মহান ভাবরাশিকে।

যখন আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হব তখন সেই প্রাচীন গ্রীকযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সমস্ত চিন্তানায়কদের মহান ভাবধারা গ্রহণ করতে সমর্থ হব। আজকালকার যুগে মানুষের কৃষ্টি ও সভ্যতা সঙ্কীর্ণ নয়, তাতে বিশ্বের সকল মানবের অধিকার আছে; বিশ্বের যেকোন প্রান্তের কোন কিছু গৌরবজনক আবিষ্কারে সমগ্র পৃথিবীরই অধিকার আছে। সুতরাং সমগ্র মানবের ঐতিহ্য আজকের প্রত্যেক মানুষেরই শিক্ষার বস্তু হওয়া উচিত। বর্তমান ভারতের ছেলেমেয়েরা স্কুলে কলেজে গিয়ে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের ভিতর দিয়ে পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের বিষয় পড়াশুনা করে এবং এইভাবে তারা ঐ চিন্তাধারার অধিকারী হয়। ঠিক একই ভাবে পাশ্চাত্যের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাও ভারতের এই মূল্যবান কৃষ্টির ধারাকে নিয়ে ব্যাপক হওয়া উচিত। এইরূপ ব্যাপক শিক্ষাই বর্তমান জগতের সকল সমস্যার সমাধান করবে। অতীতে এই সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা জগতের মহা অকল্যাণ করেছে; সুতরাং ঐগুলি তাড়িয়ে দিয়ে এই পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

ভারতবর্ষ বহু মহান চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্মদাতা; আর সত্যি বলতে কি আমরা বিশেষ ভাগ্যবান যে, কয়েকজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ তাঁদের বিরাট আদর্শ স্থাপন করতে এইযুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রীঃ) থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত প্রত্যেকেই ভারতের ঐতিহ্যে গর্বিত ছিলেন; তাঁরা বলে গেছেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির যা গৌরবময় দান আছে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা করতে হবে।

বর্তমান ভারতের এই মহান নেতারা আমাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভিতর থাকতে কোন উপদেশ দেননি এবং শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের ঐতিহ্যকে নিয়েও গর্ব করতে বলেননি। তাঁরা বলেছেন জগতের যেসমস্ত শ্রেষ্ঠ অবদান আছে সেগুলি প্রাণভরে গ্রহণ করতে; কিন্তু তার পূর্বে নিজেদের কৃষ্টি উপলব্ধি করে সেই অনুপাতে পাশ্চাত্যের ভাবধারাও গ্রহণ করতে। আমাদের কৃষ্টি না বুঝলে আমরা অপরেরটা বুঝতে পারব না এবং তাতে কোন লাভই

হবে না। দুর্ভাগ্যবশত এটাই বর্তমানে ঘটছে। আমাদের দোষযুক্ত শিক্ষা আমাদের গৌরবময় কৃষ্টি ও মহান চিন্তাধারাকে বুঝতে অবকাশ দেয়নি; তাই আমরা পাশ্চাত্যের কৃষ্টির সারাংশ গ্রহণ করতে পারিনি। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের মহান ঐতিহ্যের ধারা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অবশ্য স্বাধীন ভারত তার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে, তবুও আজকের ভারতের একজন শিক্ষিত নাগরিক তার কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ। বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের ক্ষেত্রে আমি তা লক্ষ্য করেছি। আমার পাশ্চাত্য বন্ধুদের কাছে শুনেছি এবং ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বহু পাশ্চাত্য মনীষীর লেখার মধ্যে দেখেছি যে, ভারতীয় ছাত্রেরা ও রাষ্ট্রদূতেরা ভারত ও ভারতের কৃষ্টি বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। আমরা যখন অপরের কৃষ্টি গ্রহণ করতে যাব, নিজেদের শক্তিহীনতার দরুন তখন তার গৌরবের দিকটার পরিবর্তে সহজলভ্য অপ্রীতিকর দিকটাই অনুকরণ করতে বাধ্য হব; আর যদি নিজেরা শক্তিশালী হই তবেই অপরের সুন্দর দিকটা আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

শিক্ষার এই ত্রুটি আমাদের শোধরাতে হবে। অবশ্য স্কুল-কলেজে তা ঠিক করতে কিছু সময় নেবে, কিন্তু সাধারণ নাগরিকেরা যদি মনপ্রাণ দিয়ে তাদের মহান ঐতিহ্যের ধারাটা দেখে নেয় তবে ঐ দোষগুলি অনায়াসে দূর হতে পারে। যদি উপনিষদ্ লেখা না হতো, যদি ঐ মহান ঋষিরা এই চিন্তারাশি উপলব্ধি করেই চলে যেতেন, তথাপি ভারতের আকাশে বাতাসে তা ধ্বনিত হতো এবং খুব কম লোকই ঐগুলি গ্রহণ করতে সমর্থ হতো। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহাপুরুষগণই তাঁদের পবিত্র মনপ্রাণ দিয়ে ঐ তরঙ্গায়িত চিন্তারাশি গ্রহণ করতে পারতেন; কিন্তু তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকত। সমগ্র মানবজাতির সৌভাগ্যের বিষয় যে, ঋষিদের ঐ চিন্তারাশি লেখা হয়েছিল এবং তার ফলেই আমাদের সঙ্গে ঐসব ঋষিদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। ঐতিহ্যের ধারা প্রবাহিত হয় আদান-প্রদান, ভাষা, শিল্পকলা প্রভৃতির ভিতর দিয়েই; মানুষ তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য ঐ অনুভূতি দান করতে পারে এবং এইভাবে সে পায় ঐতিহ্যের ধারাকে অর্থাৎ কৃষ্টিকে। এই আদান-প্রদান ও সঞ্চালনের ভিতর দিয়েই কৃষ্টি বিস্তার লাভ করে, উন্নতিলাভ করে এবং মহৎ থেকে মহত্তর হতে থাকে। আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের দানস্বরূপ সেই মহান শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাঁদের মতো জীবনযাপন করবার সেই সুযোগ আমাদের আজ এসেছে। এই উপনিষদ্ পাঠ করে আমরা সকলে 'সেই ঋষিদের সান্নিধ্য লাভ করেছি'—এই অভিজ্ঞতা লাভ করব এবং এটাই হচ্ছে উপনিষদের আক্ষরিক অর্থ।

অভীঃ-বাণী

উপনিষদ্ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদ্ ঘোষণা করেছে অমরবাণী, তাই সার্থক তার নাম। মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে উপলব্ধ হয়েছে ঐ মহান সত্য; এ সত্য সাধারণ মনের না হলেও শুদ্ধ মনের গোচর। ঐ সত্যগুলি সর্বজনীন ও শাশ্বত এবং যুগ যুগ ধরে সকল মানবকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আসছে। আজ এসেছে সেই সুবর্ণ সুযোগ—এই অফুরন্ত অমৃতের ভাণ্ড থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে অমৃতের বার্তা। স্বামী বিবেকানন্দের

আগমনের পূর্বে খুব কম লোকই জানত বেদান্তের এই মহিমা। তিনি ঐ মহান সত্যগুলি বহন করে ঘুরলেন প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে; দুয়ারে দুয়ারে আর গৃহচূড়া থেকে তারস্বরে ঘোষণা করলেন—"...আমাদের আবশ্যক শক্তি, শক্তি—কেবল শক্তি। আর উপনিষদ্‌সমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চার করতে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তিমান ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়। সকল জগতের, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল, দুঃখী, পদদলিতগণকে উহা উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।"

ইতিহাসে দেখা যায়, শঙ্করাচার্যই (৭৮৮-৮২০ খ্রীঃ) প্রথম এদেশে উপনিষদ্ জনপ্রিয় করে তোলেন। কিন্তু তাঁর আগে মাত্র কয়েকটি মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায় উপনিষদের ঐ মহিমার বিষয় অবগত ছিলেন। শঙ্করাচার্যই প্রথম তা সর্বসাধারণের জন্য প্রচার করলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এটি সকলের মঙ্গল সাধন করবে', কিন্তু তবুও উপনিষদ্ রইল সীমাবদ্ধ। এলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ভেঙে দিলেন সকল সঙ্কীর্ণ সীমা আর উপনিষদ্‌কে ছড়িয়ে দিলেন আপামর সকলের মধ্যে। ভারতের ও ভারতেতর বহু দেশের বিভিন্ন ভাষায় বিবেকানন্দের রচনাবলী অনূদিত হওয়ায় উপনিষদের আলোয় সব দেশের লোকই আলোকিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ মৃতপ্রায় ভারতকে জাগাবার জন্য উদাত্তকণ্ঠে বললেন ঃ "তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে। ঐ সত্যসকল অবলম্বন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত কর—তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভারতের উদ্ধার হইবে।"

উপনিষদ্ পাঠ করতে হলে চাই জীবনের সঙ্গে তার যোগ, আর শ্রদ্ধা। সংবাদপত্রও একধরনের সাহিত্য, কিন্তু তা অত্যন্ত নিম্নস্তরের, যেহেতু তার আয়ুষ্কাল সকাল থেকে সন্ধ্যা; উপনিষদ্ সেরূপ নয়—এটি আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার পড়তে হবে; এবং আমাদের মস্তিষ্ক যত পরিষ্কার হতে থাকবে আমরা তার গভীরে তত অধিক ঢুকতে পারব, কারণ ঐ শব্দগুলি অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে এসেছে। উপনিষদের শব্দ আসে সত্যের গভীর হতে। ঋষিরা ঐ সত্যকে অনুভব করে মানুষ ও প্রকৃতির ভিতর দেখেছিলেন এক নিগূঢ় সত্তা; তারপর ছন্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন ঐ দর্শনগুলিকে, অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বহু চিন্তাশীল মনীষীর ও কবির হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে—উপনিষদের ঐ মহান ভাবময় কবিতাগুলি। উদাহরণস্বরূপ মুণ্ডক উপনিষদ্ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি—"যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি"—অর্থাৎ যিনি সব জানেন, সব বোঝেন, জগদ্ব্যাপী যাঁর মহিমা। কিন্তু তাঁর এই মহিমা কি স্থানকালব্যাপী প্রকৃতির বাইরে অবস্থিত? তার উত্তরে উপনিষদ্ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে, না, তাঁর মহিমা মানুষে বিশেষভাবে প্রকাশিত—"দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" অর্থাৎ সেই আত্মা, মানুষেরই অন্তরাত্মা; উহা ব্রহ্মের জ্যোতির্ময় পুরে, মানুষের হৃদয়াকাশে অবস্থিত। তিনিই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত বলিয়া মনবুদ্ধিতে তাঁরই প্রকাশ, তিনিই প্রাণাদির নিয়ন্তা—"মনোময়ঃ প্রাণশরীর-নেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে

হৃদয়ং সন্নিধায়।"—হৃদয়াকাশে তিনি আছেন বলেই মনুষ্যশরীর সজীব হয়ে উঠে। তারপর ঐ শ্লোক শেষ হয়েছে একটি সুন্দর আশাপূর্ণ বাণী দিয়ে—"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—জ্ঞানীরা সেই আনন্দময় অমৃতস্বরূপ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

শ্লোকে বর্ণিত 'ধীরাঃ' শব্দটির অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ—তাতে বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা দুই-ই নিরূপিত হয়। উপনিষদ্ মানুষের মহত্ত্বকে দ্বিবিধভাবে ঘোষণা করেছে—প্রথমত বুদ্ধি, যার দ্বারা সে বাইরের ও ভিতরের জাগতিক বস্তু বুঝতে পারে; আর দ্বিতীয়ত, তেজস্বিতা ও সাহসিকতা, যাদের দ্বারা সে শুধু জেনে ক্ষান্ত হয় না, ঐ মহান সত্যের আঙিনায় পৌঁছায়। শুধু বুদ্ধি নয়, সাহসও দরকার, আর উভয়ের সহযোগে তৈরি হবে মহৎ চরিত্র।

অভিজ্ঞতা ও সত্যানুভূতি আসে বুদ্ধির ভিতর দিয়ে এবং ঐ বুদ্ধির পিছনে থাকে নির্ভীকতার জোয়ার। 'ধীর' ব্যক্তি সেই-ই, যার আত্মানুভূতি হয়েছে। কিন্তু ঐ অনুভূতির কষ্টিপাথর কোথায়? উপনিষদ্ তার প্রমাণস্বরূপ বলছে: সেই ব্যক্তি তখন ভিতরে-বাইরে, মানুষে প্রকৃতিতে, এককথায় সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করেন। তখন এই দৃশ্যমান জীবজগৎ তাঁর কাছে আনন্দময় অমর ব্রহ্মের অভিব্যক্তি বলে মনে হয়। শঙ্করাচার্য ঐ অনুভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: তখন এই জগৎ আনন্দের বন্যায় ও সৌন্দর্যের তরঙ্গে ভেসে যায়। তখন আত্মা মানুষে, প্রকৃতিতে, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রে এমনকি প্রতি ধূলিকণাতে প্রকাশিত হন! উপনিষদের অমর কবিতার এটি একটি ক্ষুদ্র নমুনা; এইরূপ অসংখ্য আছে।

উপনিষদের এই সুন্দর কবিতাগুলি বহু গভীর তত্ত্ব বহন করে নিয়ে চলেছে। ঐ তত্ত্বকে বোঝা বড় দুরূহ ব্যাপার; শুধু উপর উপর পড়া যথেষ্ট নয়। বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে অধ্যয়ন এবং গভীর তত্ত্বানুসন্ধান দরকার। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুযায়ী এই বহিঃপ্রকৃতিকে দেখি। আমাদের নিজেদের এই ব্যক্তিত্বের গভীরে এমন একটি জিনিস রয়েছে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের উন্নতি, পূর্ণতা ও অনুভূতি। উপনিষদের প্রতি বাক্যের সঙ্গে যোগ রয়েছে আমাদের হৃদয়গহ্বরের কোন তন্ত্রীর। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে বলেছেন: ব্রহ্মসূত্রের মূলতত্ত্ব এবং উপনিষদের প্রাণ যে-নির্গুণব্রহ্ম তাহা আমাদের এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে স্বতন্ত্র কোন দুরূহ সত্য নয়, উপরন্তু তা সকলের অন্তরাত্মানুভূতির স্বীকৃত সত্যের নিদর্শন।

তাই আমাদের এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বুঝতে গেলে মননশীলতার একান্ত প্রয়োজন। যদি উপনিষদ্ থেকে এই জ্ঞানের এক কণা আমাদের জীবনে আসে তবে সমস্ত দেশ নব উদ্যমে দৃঢ়সঙ্কল্প ও সুশৃঙ্খলার দ্বারা নবরূপ ধারণ করবে। আমরা গীতাতে পড়েছি "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ," অর্থাৎ এই ধর্মের (নিষ্কাম কর্মযোগের) অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও আমাদের মহাভয় হতে রক্ষা করবে। এখানে রয়েছে সেই অভীঃ-বাণী, সেই উদ্দীপনাময়ী অমৃতের বার্তা। মানুষকে ক্রমাগত এগুতে হবে এবং পৌঁছুতে হবে সেই জ্ঞান ও ভক্তির মিলনক্ষেত্রে অর্থাৎ পূর্ণত্বে। এটি উপনিষদের সেই শঙ্খনিনাদিত বাণী—যা মানুষকে গতিশীল করে ঠেলে দিয়েছে সেই চরম সত্যানুভূতির পথে

এবং এই বিবর্তনময় জীবনকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে বলেছে পূর্ণত্বে। কত বড় আশার বাণী!

বিশ্বমানব

উপনিষদ্ মানুষকে তার শাশ্বত অমর দৈবী প্রকৃতি লাভ করবার জন্য অপ্রতিহত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। অপর সব জাতি ও কৃষ্টি মানুষকে ঘোষণা করেছে বহিঃপ্রকৃতির নিয়ামক বা চালক হিসাবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা গ্রীক চিন্তাধারায় দেখি যে, মানুষ তার শক্তি দিয়ে বাইরের বাধাবিঘ্ন জয় করে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং প্রয়োজন হলে শক্তিমান মানব অপর মানুষের উপরেও ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। এই চিন্তাধারার প্রধান ক্রটি হচ্ছে সকল মানবকে একই সঙ্গে উন্নতির পথে চালিয়ে নিয়ে যায় না। বহিঃপ্রকৃতির নিয়ামক যে মানুষ, তার উপরেই এই দর্শন প্রতিষ্ঠিত। বাইরের পরিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করার ফলে আসে অহমিকা, আর তাকে শোধরাবার বা জয় করার কোন উপায় ঐ দর্শন দেখায় না। মানুষ তার পরিবেশের নিয়ামক—এটা জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ। এইপ্রকার মানবিক উৎকর্ষের চরম সীমায় পাশ্চাত্য উঠেছে; আর আমাদের এই তমসাচ্ছন্ন ভারতের পক্ষে ব্যাপকভাবে এই ধরনের শিক্ষা আজ বড় দরকার। কিন্তু মনুষ্যজীবনে এটাই শেষ স্তর নয় এবং ভারতীয় দর্শন তাকে মনুষ্যানুভূতির চরম বলে স্বীকার করে না। মানুষকে এই ক্ষুদ্র অহমিকার গণ্ডি ভেঙে সেই বিশ্বাত্মৈক্যানুভূতিকে নিজের ভিতর অনুভব করতে হবে। মানুষ যখন এই একাত্মানুভূতি লাভ করে তখন সে দেখে যে এ-জগতে কেউ কারোর নিয়ামক নয়, সে সকলের সঙ্গে মিশে রয়েছে এক হয়ে, অভিন্নভাবে।

এক কথায় সে নিজের ভিতর আবিষ্কার করে বিশ্বমানবকে; সে দেখে বাইরের ও ভিতরের সকল বস্তুকে এক এবং সে অনুভব করে জীবজগতের সঙ্গে নিজের হৃদয়তন্ত্রীর যোগসূত্র। আমাদের মতো সাধারণ নরনারীর ভিতর থেকে আসবে সেই বিশ্বমানবের মুক্তি—আর এটিই হচ্ছে উপনিষদের লক্ষ্য। সেই হেতু আজকের এই বিজ্ঞানমদে মত্ত বিংশ শতাব্দীতেও উপনিষদের প্রতি সকলের রয়েছে একটা আকর্ষণ ও প্রয়োজনবোধ। আজকের সকল প্রগতিশীল চিন্তার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্বমানবিকতা; সেই হেতু এই বর্তমান জগতের সকল প্রগতিশীল চিন্তার পুরোভাগে রয়েছে উপনিষদ্। বর্তমান পৃথিবীর স্বার্থান্ধ মানুষ ডুবে রয়েছে তাদের জাতিগত, সমাজগত, সম্প্রদায়গত প্রভৃতি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে; তাই ঐগুলি থেকে চাই দ্রুত মুক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক যুগের মানুষের সামনে বেদান্তের এই মহামহিমময়ী বাণী তুলে ধরেছেন আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই বাণী আধুনিক সমাজকে কল্যাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারে। কর্মজীবনে এই দুরূহ দর্শনের বাস্তব প্রয়োগও তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আজকের দিনে উপনিষদ্ ও গীতা প্রভৃতি অমর শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একথা সুনিশ্চিত যে, এই প্রাচীন বেদান্ত আজকের মোহগ্রস্ত নরনারীকে কল্যাণের পথে টেনে নিয়ে যাবেই যাবে।* □

* ৭০ বর্ষ, ৬ ও ৭ সংখ্যা

স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে*

ইন্দিরা গান্ধী

।।১।।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন তথা বাণী ও রচনার সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে পরিচয়ের বিশেষ সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখনই এর সূত্রপাত ঘটেছিল। আমার মা-বাবা দুজনেরই, বিশেষ করে আমার মায়ের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল মিশনের সঙ্গে। আর আমি সত্যি করেই বলতে পারি যে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমাদের সমগ্র পরিবারকেই প্রেরণা দিয়েছে, আমাদের রাজনৈতিক কাজে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও।

অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি আমার অনুরাগের কারণ শুধু ব্যক্তিগত নিশ্চয়ই নয়। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ব্যাপারে এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে মিশনের অবিরাম প্রয়াস আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমাদের দেশ চিন্তাধারায়, দর্শনে এবং সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। কিন্তু যেকোন কারণেই হোক আমরা বিদেশে এমনকি দেশের জনগণের সব অংশের সামনে এই সমৃদ্ধিকে ঠিক-ঠিক ভাবে প্রক্ষেপ করতে পারিনি। এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশন উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। মিশনের বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রগুলি যে চমৎকার কাজ করেছেন ও করছেন তাতে আমাদের ওই অভাব কতকটা পূরণ হয়েছে।

।।২।।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যান্য মহান নেতারা আমাদের শিখিয়েছেন যে, সমস্ত বড় ও ভাল গুণ আমাদের ভিতর থেকেই উদ্ভূত হওয়া চাই। অন্যরা আমাদের পথ দেখাতে পারেন কিন্তু তা অনুসরণ করবার বা না করবার দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার প্রতিটি পৃষ্ঠা, তাঁর প্রতিটি উক্তি আমাদের প্রেরণা দান করে। স্বামীজী আমাদের দেন—সাহস, শক্তি, আত্মনির্ভরতা এবং বিশ্বাস। এই তো সেই জিনিস যার প্রয়োজন ভারতের ছিল এবং যার প্রয়োজন ভারতের আজও আছে। স্বামীজী আমাদের শিখিয়েছেন যে, আমরা সত্যই এক মহান সংস্কৃতি এবং এক মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। সেই সঙ্গে তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের জাতীয় ব্যাধি। নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাদের জাতিকে কিভাবে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

---

* 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সৌজন্যে। কন্যাকুমারী প্রভৃতি স্থানে প্রদত্ত মূল হিন্দি ও ইংরেজী ভাষণ হইতে শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও অনূদিত।

স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ত্ব শুধু তাঁর বিরাট বৌদ্ধিক শক্তি ও বিচারেই আবদ্ধ নয়, তাঁর হৃদয়ের অসীম প্রেমেও প্রসারিত। মানুষের কল্যাণের জন্য কী তীব্র, জ্বলন্ত অনুরাগই না প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জীবন ও বাণীতে। স্বামীজীর এই মঙ্গলকামনা সমগ্র ভারতের জন্য তো বটেই, সমগ্র বিশ্বের জন্যও। আর বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে স্বামীজীর বিশেষ ক্ষমতা এইখানে যে, আধুনিক বিশ্বে যে-সমস্ত শক্তি সক্রিয় তিনি সেগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে সজাগ ছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, সেইসময়ে স্বামীজী কিভাবে আজকের সমস্যাগুলি তাঁর মানসনেত্রে পরিপূর্ণভাবে দেখতে পেয়েছিলেন, আজকের নানা ধারার ঘাত-প্রতিঘাত ধরতে পেরেছিলেন!

স্বামীজী প্রচার করেছিলেন মানুষের ভ্রাতৃত্ব। আজ সব-জাতির মধ্যে এইটিই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী ধ্বনি ও ভাবধারা। কিন্তু এখানেও শক্তি আসা চাই মানুষের নিজের ভিতর থেকে।

স্বামীজী একটি শব্দ বার-বার ব্যবহার করেছেন তাঁর ভাষণগুলিতে। শব্দটি হলো 'অভীঃ', নির্ভীকতা। স্বামীজীর জীবনের ছোট একটি ঘটনা, যা তিনি নিজেই বলেছিলেন—এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে। তিনি তখন পরিব্রাজক হয়ে ভারত পর্যটন করছেন। একসময় একদিন একপাল বানর তাঁর পিছু নিল। তিনি যত জোরে চলেন তারাও তত জোরে তাঁকে ধাওয়া করে। তিনি দৌড়ান, তারাও দৌড়য়। এমন সময় এক বৃদ্ধ সাধু দূর থেকে চিৎকার করে বললেন তাঁকে ঃ "থামো। জানোয়ারগুলোর সামনে রুখে দাঁড়াও।" তিনি তাই করলে বানরগুলি পালিয়ে গেল। ঘটনাটির উল্লেখ করে স্বামীজী বলতেন যে, এইভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। পালালে চলবে না। জগতের অধিকাংশ সমস্যা সম্পর্কেই তাঁর এই শিক্ষা প্রযোজ্য। যদি কেউ মনে করে যে, কোন সমস্যা তার পক্ষে বড্ড বেশি বড় এবং সে ওই সমস্যা থেকে পালিয়ে বাঁচবে তাহলে সে ভুল করবে। সেই সমস্যা তাকে ক্রমশ আরো বেশি করে চেপে ধরবে এবং শেষে পিষে ফেলবে। বরং সাহসের সঙ্গে সেই সমস্যার সামনে রুখে দাঁড়ালে তার সমাধানের একটা সুযোগ পাওয়া যায়। একজন যদি সমাধান করতে ব্যর্থ হয় তাহলেই বা কী? পরে আরেকজন তার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আরো ভালভাবে সেই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে।

।।৩।।

প্রগতি ও আধুনিকতার কথা আমরা প্রায়ই শুনি ও বলি। প্রগতি বলতে আমি বুঝি মানব-ব্যক্তিত্বের গভীরতা ও বিকাশসাধন—ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই। এরজন্য অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও সামাজিক বাধাগুলি নিশ্চয়ই অপসারিত হওয়া উচিত। এগুলি দূর করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে দেখতে হবে যে, বস্তুগত জীবনযাত্রার মান উচ্চতর করতে গিয়ে আমরা যেন কোনভাবে মানব-ব্যক্তিত্বকে আহত না করি বা মানুষ যেন তার সমাজ ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। পক্ষান্তরে মানুষ যেন একই সঙ্গে তার সামাজিক উন্নয়নের সক্রিয় শরিক হয় এবং তার আত্মিক বিকাশসাধনেও তৎপর হয়। আধুনিকতা মানে নিশ্চয়ই শুধু হালের কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ বা জিনিসপত্র ব্যবহার, কিছু ফ্যাশানে গা-ঢেলে দেওয়া বা অধিক সচ্ছল

দেশগুলির 'অনুকরণ' নয়। কাজেই শুধু অর্থনৈতিক দারিদ্র্য দূর করলেই জাতি বড় হবে না। আত্মিক দারিদ্র্যও দূর করা দরকার। এবিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক নেতাদের কাছে আমরা মূল্যবান পথনির্দেশ পাব।

জানি, উপরোক্ত দুটি কাজ (বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি) একত্রে করা সহজ নয়। পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিকতা—তা সে পুঁজিবাদী ধরনেরই হোক বা কমিউনিস্ট ধরনেরই হোক (যাকে পূর্বের বলা হলেও আসলে যা পশ্চিমেরই) তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ নিজের সঙ্গে নিজের শান্তি স্থাপন করতে না পারলে বিশ্বের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারে না। তবু আমার মনে হয় দুইয়ের সমন্বয় সম্ভব। আমার আরো মনে হয় যে, ভারত সেই পথ খুঁজে পাবে। যদিও ভারত বা কারো পক্ষে তা খুঁজে পাওয়া সহজ বলে আমি মনে করি না।

সব যাত্রাপথেই পায়ের নিচে কাঁটা ও পাথর থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের এবং আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের সব মহান সংস্কারকের পায়ের নিচেও কাঁটা ও পাথর ছিল। কিন্তু তাঁরা সেদিক দৃকপাত করেননি। তাঁদের দৃষ্টি ছিল ঊর্ধ্বে—আলোকের দিকে, স্বামীজীর এবং তাঁদের সেই দৃষ্টি থেকেই আমরা দিশা পাব। বুঝতে পারব অতীতকে এবং এগিয়ে যেতে পারব ভবিষ্যতের দিকে।* □

* ৭৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা

স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ ও আমি

সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (নিরালা)

ভাষান্তর ঃ অশোকা চট্টোপাধ্যায়

পণ্ডিত সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (ছদ্মনাম 'নিরালা') হিন্দি সাহিত্যের এক দিকপাল। মুখ্যত তিনি ছিলেন কবি। এই প্রতিভাধর মানুষটি যে আক্ষরিক অর্থে একজন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত ছিলেন তা অনেকেই জানেন না। নাগপুর কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত কথামৃতের হিন্দি অনুবাদ তাঁরই করা। কথামৃতের এই হিন্দি অনুবাদ অগণিত হিন্দিভাষী মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে। নিরালাজীর 'চতুরি চামার' নামে একটি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থটির প্রকাশক রাজকমল এ্যান্ড সন্স, দিল্লি। ঐ পুস্তিকাতে 'স্বামী সারদানন্দ' সম্পর্কে তাঁর একটি স্মৃতিকথা আছে। বর্তমান প্রবন্ধটি তার বঙ্গানুবাদ।

সাম্প্রতিককালের একজন সাহিত্য-সমালোচক নিরালাজীকে 'মাতোয়ালা নিরালা' নামে অভিহিত করেছেন। সত্যিই তিনি ছিলেন এক মাতোয়ালা কবি, এই মাতোয়ালা কবি-মানুষটি কখনই সংসারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেননি। ফলে তাঁকে অধিকাংশ সময়ই দারিদ্র্যের মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়েছে। আর সেযুগে শুধু সাহিত্যের সেবা করে একজন কবি-সাহিত্যিকের পক্ষে সংসার-নির্বাহ করাও সম্ভব ছিল না। এছাড়া একের পর এক পারিবারিক বিপর্যয় তাঁর মনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। তিনি তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন ঃ

দুঃখ হী জীবনকী কথা রহী,
ক্যা কহুঁ উসে যো নহীঁ কহী।—সম্পাদক

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের কথা। এক সাধারণ বিবাদে বাংলার মহিষাদল রাজ্যের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তখন গ্রামের বাড়ি উন্নাওতে ছিলাম। ঐসময় আমি প্রায়ই আচার্য মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীজীর সঙ্গে দেখা করতে কানপুরে তাঁর জুহির বাড়িতে যেতাম। তাঁর কাছে যাওয়ার পিছনে কোন স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ আমার ছিল না। হিন্দি সাহিত্যে তাঁর মহান অবদানের জন্য আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। তিনিও আমাকে খুবই স্নেহের চোখে দেখতেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে তিনিই আমার হিন্দি ও বাঙলা ব্যাকরণের ওপর লেখাটি সম্পাদনা করে 'সরস্বতী'-তে প্রকাশ করেছিলেন। আমার মতো একটি বাউণ্ডুলে মানুষের আর্থিক অসুবিধার কথা তিনি ভাল করেই জানতেন। তাই আমার সে অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি দুটি খবরের কাগজে আমার নাম চাকরির জন্য সুপারিশ করে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরাও আমার যোগ্যতা অনুযায়ী কিছু কাজ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে কাজ স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর যোগ্যতা বলতে তো আমার বিশেষ কিছুই ছিল না। ঐসময় সাহিত্যসেবার প্রেরণা থেকে যা কিছু লিখতাম তা এক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পাদকের দপ্তর থেকে আমার কাছে ফিরে আসত, মাত্র দুটি প্রবন্ধ ও দুটি কবিতা তখন পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। দ্বিবেদীজী আর কি করবেন।

এইসময় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী তাঁদের হিন্দি পত্রিকার জন্য এক যোগ্য সম্পাদকের খোঁজে জুহিতে দ্বিবেদীজীর কাছে

এলেন, দ্বিবেদীজী স্বামীজীকে আমার কথা বললেন। স্বামীজী যোগ্যতার প্রমাণ পাঠাবার জন্য আমাকে একটি চিঠি দিলেন। বাংলায় থাকার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। দু-চারবার বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে দরিদ্রনারায়ণ সেবার কাজে যোগ দিতেও গিয়েছিলাম, আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহান শিষ্য পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী যখন মহিষাদলে এসেছিলেন তখন তাঁকে তুলসী রামায়ণ পাঠ করে শুনিয়ে তাঁর অনুপম স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করেছিলাম। পত্রোত্তরে স্বামী মাধবানন্দজীকে এই যোগ্যতার কথাই জানিয়েছিলাম। স্বামীজীর চিঠি ইংরেজীতে ছিল। আমি বাঙলাতেই জবাব দিয়েছিলাম।

কিছুদিন পরে দ্বিবেদীজীর কাছে গিয়ে শুনলাম স্বামীজী কলকাতাতেই এক সুযোগ্য সম্পাদক পেয়ে গেছেন। বাড়িতে ফিরে আমিও এক পত্র পেলাম। তাতে তিনি লিখেছেন : "একটু অপেক্ষা করুন। শ্রীভগবানের ইচ্ছা হলে হয়তো আপনারও প্রয়োজন হবে।" এই চিঠি পাবার পরেই মহিষাদল রাজ্য থেকে আমার কাছে তার আসে—"শীঘ্র চলে এস।" তার পেয়ে ভাবলাম ইস্তফা গ্রাহ্য না হয়ে আমার রাগ করে চলে আসার দোষ যখন ক্ষমা হয়েছে, তখন আর যেতে আপত্তি কি? আমি মহিষাদলে চলে এলাম। কিন্তু রাজা, যোগী, আগুন ও জলের বিপরীত রীতির কথা তখন মনে ছিল না। এরই মধ্যে 'সমন্বয়' এই সার্থক নামে একটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সুন্দর হিন্দি পত্রিকা প্রকাশিত হলো। আমার কাছেও একটি কাগজ এল। সেইসঙ্গে এল লেখা পাঠাবার জন্য অনুরোধও। আমি 'যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে একটি লেখা পাঠালাম। যখন লেখাটি প্রকাশিত হলো তখন আমি লেখাটি সম্বন্ধে আচার্য দ্বিবেদীজীর মতামত জানতে চাইলাম। তিনি প্রবন্ধটি পড়ে আমাকে খুবই উৎসাহ দিলেন। আমি এই ধরনের মৌলিক রচনা যেন লিখি, আচার্য দ্বিবেদীজীর এই আশীর্বাদপূর্ণ উৎসাহ বাক্য সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমাকে সাহিত্যসেবায় অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। দ্বিবেদীজী ছাড়া আরো কয়েকজন অগ্রজ সাহিত্যিক এই লেখাটির শৈলী ও বিষয়বস্তু প্রকাশের মুনসিয়ানার জন্য আমাকে আশীর্বাদ জানালেন। এদিকে রাজার উলটো রীতি আমার সামনে উপস্থিত হলো। ঠিক এইসময় 'সমন্বয়' পত্রিকার পরিচালক স্বামী আত্মবোধানন্দজী আমাকে লিখলেন : "সমন্বয় পত্রিকার জন্য বাঙলা জানে এরকম একজন লোকের প্রয়োজন। আমাদের কাজে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আপনি চলে আসুন।" পত্র পেয়ে আমি চলে এলাম। গিয়ে দেখি আট মাসের মধ্যে সমন্বয়ের দুজন সম্পাদক বদল হয়েছে। সম্পাদক হিসাবে স্বামী মাধবানন্দজীর নাম ছাপা হচ্ছিল। তিনি হিন্দি খুবই ভাল জানতেন। শুধু হিন্দি ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য একজন হিন্দিভাষী সম্পাদকের প্রয়োজন ছিল। এভাবেই 'সমন্বয়' প্রকাশে সহায়তা করতে কলকাতায় বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয়ে স্বামী আত্মবোধানন্দজীর সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করলাম। এখানেই প্রথম আচার্য স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের দর্শন পাই। এটি ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের কথা।

স্বামী সারদানন্দজীর রাশভারি স্থূলকায় চেহারার জন্য ওঁকে দেখে খুবই সম্ভ্রম হতো। এমনিতেই ছোট থেকেই আমার ভয়ডর বলে কিছু ছিল না।

ভূতের দেখা পাবার জন্য রাতে শ্মশানে ঘুরে বেড়াতাম। মাঝরাত্রে রওনা হয়ে ১৬ মাইল পথ হেঁটে সকালে আচার্য দ্বিবেদীজীর সঙ্গে দেখা করতাম। তবুও সারদানন্দজীর মুখের দিকে আমি অনেকদিন চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। তবে কখনো কখনো ওঁকে প্রণাম করে নতমস্তকে ওঁর আলোচনাসভায় যোগ দিতাম। কিন্তু যেদিন কোন দার্শনিক গ্রন্থের পাঠ হতো সেদিন সভা থেকে চটপট পালিয়ে আসতাম, কেননা দার্শনিক তত্ত্বের কথা শুনলেই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত আমার। কয়েকমাস তাঁর আলোচনা-সভায় নির্বাক শ্রোতা হয়েই বসে থাকলাম। স্বামীজীও আমার "যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে" নীতি দেখে প্রসন্ন হয়ে মুচকি মুচকি হাসতেন। একদিন সাহস করে প্রশ্ন করে বসলাম: "এ-সংসার আমার মধ্যে আছে, অথবা আমি এ-সংসারের মধ্যে আছি?" আমার প্রশ্ন শুনে তিনি স্নেহমাখা স্বরে আমাকে উত্তর দিচ্ছিলেন: "এরকম নয়।"

পরিবেশ ছোট বয়স থেকেই আমাকে সাধু ও ঈশ্বরের অনুরক্ত করে তুলেছিল। এরজন্য ঘুমোলেই দেবদেবীর স্বপ্ন খুব দেখতাম। জাগ্রত অবস্থায় যাঁরা কথাই বলতেন না, ঘুমের মধ্যে তাঁরাই অফুরন্ত কথা বলতেন। কিন্তু স্বপ্নে দেবতাদের সঙ্গে সংলাপ আমার পক্ষে সুখকর হতো না। কেননা, মনে এই প্রশ্ন সবসময়ই উঠত, জাগ্রত অবস্থায় দেবতারা কেন কথা বলেন না? ক্রমে ক্রমে নানা দার্শনিক চিন্তা মনে ভিড় করতে লাগল। আস্তে আস্তে ঘোর নাস্তিক হয়ে পড়লাম। যখন 'সমন্বয়' পত্রিকা সম্পাদনের জন্য গেলাম তখন এই অবস্থাই ছিল। তবে পূর্ব সংস্কারের বলে আস্তিক ভাব কখনো কখনো মনে উঁকি দিত মাত্র। আমি একদিন স্বামী সারদানন্দজীকে বললাম: "আমি ঘুমুলে দেবতারা আমার সঙ্গে কথা বলেন।" উনি একটু হেসে মধুর স্বরে বললেন: "বাবুরাম মহারাজের সঙ্গেও দেবতারা কথা বলতেন।" স্বামী প্রেমানন্দজীর পূর্বনাম ছিল বাবুরাম, আগেই বলেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে তাঁরই আমি প্রথম দর্শন পেয়েছিলাম—মহিষাদলে।

কয়েকদিন পরে আমি একদিন দুপুরবেলা ঘুমোচ্ছি (দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস আজও আমার আছে।) স্বপ্নে দেখি, স্বামী সারদানন্দজী মহাধ্যানে মগ্ন, তাঁর সমস্ত শরীর থেকে যেন দিব্যজ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে! তিনি কমলাসনে বসে, ঊর্ধ্ববাহু মুদ্রিত নেত্র, মুখে মহা আনন্দের ছটা! ঘুম ভাঙতে মনে হলো, আমার সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেদিন মহারাজের মধ্যে মহাজ্ঞানের যে প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখেছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আমার মনে বিরোধী শক্তির প্রভাব সবসময়ই প্রবল ছিল। তীব্র ও তীক্ষ্ণ দার্শনিক বজ্রপ্রহারে আমি এইসব বিরোধী চিন্তা মন থেকে দূর করার চেষ্টা করতাম এবং যখন তা করা সম্ভব হতো তখনই সাহিত্যসেবায় মন লাগাতে পারতাম। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও আকাশ থেকে এই পৃথিবীতে এসেও যেন আকাশেই থেকে যেতাম। আর যত লড়াই করতাম ততই যেন মনের বিরোধী ভাব আরো প্রবল হয়ে উঠত। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ কি রকম তা এইসময় আরো ভাল করে বুঝতে পারলাম। যখন মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তখন স্বামী সারদানন্দজী তাঁর মধুর হাসিতে আমার সব ক্লান্তি দূর

করে দিতেন। এই মহাদার্শনিক, মহাকবি, মহামনস্বী, আকুমার ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসিপ্রবর মহাপণ্ডিত, সর্বস্বত্যাগী সাক্ষাৎ মহাবীরের সান্নিধ্যে দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব এবং মুক্তিও তুচ্ছ বলে মনে হতো। অনেক বড় বড় কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতকে দেখেছি। কিন্তু, হায়রে সংসার! কাঁচের টুকরোকে তুমি হীরে বলে চালাতে কতই না পটু!

স্বামী সারদানন্দজীর সেবক হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন : "তুমি দীক্ষা নেবে?—এস।" তাঁর কথা শুনে ভাবলাম—প্রসাদের মতো এখানে বোধহয় দীক্ষাও বিতরণ হয়ে থাকে। নিতে আপত্তি কি? বড়কে গুরু বলে মানতে আমার কখনোই আপত্তি ছিল না। আপত্তি ছিল 'গুরুভাব' মেনে নিতে। মন্ত্র নিলেই নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে, আর যেখানে পাবার কিছু ব্যাপার থাকে সেখানে যে ব্রাহ্মণ সন্তান পা না বাড়ায় তাকে বেকুব ছাড়া আর কি বলা যাবে! আমি প্রায় দৌড়ে স্বামীজীর (স্বামী সারদানন্দজীর) ঘরে গিয়ে আসনে বসে পড়লাম। তিনি প্রশ্ন করলেন : "কি চাই?" আমি বললাম : "মন্ত্র নিতে এসেছি।" আমার বলার সুরে কে জানে কি ছিল! আমার তো তন্ত্র-মন্ত্রে মোটেই বিশ্বাস ছিল না। স্বামীজী প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন : "পরে হবে।" আমি মনে মনে ভাবলাম কে জানে কপালে কি আছে! কয়েকদিন চলে গেল, আমি আর তাঁর কাছে যাইনি।

ওখানে কখনো কখনো শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে তুলসী রামায়ণ পাঠ করতাম। তখন শ্রীশ্রীমা স্থূল শরীরে ছিলেন না। প্রথম যেদিন পাঠ করলাম, সেদিন স্বামী সারদানন্দজী আমাকে দুটি প্রসাদী রসগোল্লা দেওয়ালেন। আর সকলে একটি করেই পেলেন। পরে স্বামী সারদানন্দজীর জ্যেষ্ঠ গুরুভাই, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রিয় শিষ্য শঙ্করানন্দ মহারাজকে দুটি রসগোল্লা পেতে দেখেছি। একদিন পাঠের পরে শঙ্করানন্দ মহারাজ তাঁর ভাগ থেকে একটি রসগোল্লা আমাকে দিলেন। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে সারদানন্দজী যে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেন সেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার জন্য আমি এগিয়ে গেলাম। প্রসাদ আমার হাতেই ছিল। মনটি ছিল সুপ্রসন্ন। যেন তুলসীদাসজী আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। ঠিক ঐসময় স্বামী সারদানন্দজীও ওপরে আসছিলেন। আমাকে ভাবমগ্ন দেখে তিনি রাস্তা ছেড়ে একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাবমগ্ন থাকলেও আমার মন সজাগ ছিল। তাঁকে দেখে আমিও একপাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম, উনি চলে গেলে আমি নিচে নামব। তখন সারদানন্দজী আমাকে প্রশ্ন করলেন : "এ প্রসাদ কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ?" (তাঁর সঙ্গে আমার বাঙলাতেই কথাবার্তা হতো।) আমি বললাম : "আমার নিজের জন্য।" উনি তখন বললেন : "আচ্ছা প্রসাদ খেয়ে দেখা কর।" আমি চটপট প্রসাদ খেয়ে ওপরে গেলাম। স্বামীজী তাঁর ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে খুব স্নেহভরে বললেন : "সেদিন তুমি কি বলেছিলে?" আমি বললাম আমার তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাস নেই। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : "তোমার দীক্ষা হয়েছে?" আমি বললাম : "হাঁ, কিন্তু তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ন-বছর।" তিনি তখন বললেন : "আমরা তো শ্রীরামকৃষ্ণকেই ঈশ্বর বলে মানি।" আমি বললাম :

"আমিও তো মানি।" আমি কখনো প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি করতাম না, তা ঠিকই হোক, আর ভুলই হোক। যাঁরা বক্তা, লেখক, কবি বা দার্শনিক তাঁরা আগে কি বলেছেন আর পরে কি বলেছেন, এনিয়ে মাথা ঘামান না। এব্যাপারে আমার জীবন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু স্বামী সারদানন্দের ভারতীয় কান এরকম ছিল না যে, ইংরেজী সঙ্গীতের রসবোধ করতে না পেরে তাকে সঙ্গীত বলেই স্বীকার করবেন না। তিনি ভাবস্থ এক গুরুর মূর্তিতে আমার সামনে এলেন। আমার মনে হতে লাগল আমি যেন এক পরম প্রশান্তির মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। তিনি আমার জিহ্বাতে নিজের আঙুল দিয়ে একটি বীজমন্ত্র লিখতে লাগলেন। তিনি কি লিখেছেন তা বুঝবার জন্য আমি সমস্ত মন দিয়ে চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারলাম না।

এরপর পরোক্ষভাবে তিনি কখনো কখনো আমাক ধ্যান-ধারণার কথা মনে করিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মাথায় খেয়াল চেপে গেল, দেখব জিহ্বার মন্ত্র আমাকে কোথায় নিয়ে যায়। পূজাপাঠ যেটুকু বা করতাম, তাও বন্ধ করে দিলাম। তবে কিছুদিনের মধ্যেই আমার মনে হতে লাগল যে, সবকিছু যেন উলটে-পালটে যাচ্ছে আর রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সাধুরা আমাকে আকর্ষণ করছেন। এতে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। আমি ভাবতে লাগলাম, নিশ্চয়ই এই সাধুরা আমার ওপরে বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ করেছেন। ঠিক এইসময় 'সমন্বয়' পত্রিকার কর্মকর্তা উদ্বোধন ছেড়ে 'মতওয়ালা' অফিস ভাড়া নিয়ে সেখানে একটি ঘরে থাকতে লাগলেন। 'মতওয়ালা' কাগজ তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওখানে তখন বালকৃষ্ণ প্রেস ছিল। 'মতওয়ালা' কাগজের সম্পাদক মহাদেব প্রসাদ শেঠ ঐ প্রেসের মালিক ছিলেন। তিনি ওখানেই থাকতেন। আমিও ওখানেই একটি ঘরে থাকতে লাগলাম। একদিন মহাদেববাবুকে বললাম ঃ "আমার মনে হয় এই সাধুরা যাদু জানে।" মহাদেববাবু গম্ভীরভাবে বললেন ঃ "এ আপনার ভ্রম।"

একদিন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম, জ্যোতির সমুদ্র। শ্রীকৃষ্ণের হাতের ওপরে আমার মাথা রয়েছে। আমি সেই জ্যোতির সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছি। তারপর গত দশ বছর ধরে এতসব অলৌকিক দর্শনাদি হয়েছে যে, এখন বড় বড় কবি ও দার্শনিকের চমৎকার উক্তি পড়েও হাসি পায়। আর তিন বছর হলো সেই মন্ত্র, যা স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ আমার জিহ্বায় লিখে দিয়েছিলেন, জ্যোতির্ময় রূপে আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। আমি সে মন্ত্র পড়ে নিলাম।* □

* ৯১ বর্ষ, ১২ সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস*

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ভাষান্তর ঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু

প্রাসঙ্গিক তথ্য

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু বাণী নির্বাচন করে সেগুলিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে ১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকীর সময়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তার বিস্তৃত ভূমিকা বাঙলায় অনুবাদ করে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে নগেন্দ্রনাথ একাধিকবার দর্শন করেন—ঠিকভাবে বলতে গেলে দুবার; আরো ঠিকভাবে বলতে গেলে, মর্ত্যজীবনে একবার এবং মহাপ্রয়াণের পরে কাশীপুর উদ্যানবাটীর প্রাঙ্গণে পরম শান্তিতে শায়িত অবস্থায় আরেকবার। অনূদিত অংশে বিশেষভাবে সেই দুই দর্শনের কথাই আছে। সেইসঙ্গে আছে মহাকালপটে শ্রীরামকৃষ্ণের সমুজ্জ্বল মহাকায় রূপের কথাও। লেখাটির কিছু অংশ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) স্বয়ং বাংলা ও ভারতের সংস্কৃতিজগতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর পরিচয় লাহোরের ইংরেজী 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে। ইংরেজীতে শক্তিশালী লেখক তিনি, দেশব্যাপ্ত তাঁর খ্যাতি, বিশেষত সাহিত্যগুণান্বিত রচনার জন্য—সে-সুনাম অব্যাহত ছিল যখন পরবর্তী কালে এলাহাবাদের নামী পত্রিকা 'লীডার'-এর সম্পাদক হয়েছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি উল্লেখযোগ্য পুরুষ—একাধিক বাঙলা সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে এবং ছোটগল্পকার হিসাবে। অবশ্যস্বীকার্য, বাঙলা ছোটগল্পের প্রথম পর্বে তিনি বিশিষ্ট লেখক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনার গুণগ্রাহী, রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক পর্বে তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কেশবচন্দ্র সেনের আত্মীয় তিনি, তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছেন; ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ব্যক্তিদের নিকট থেকে দেখেছেন এবং সর্বভারতীয় বিখ্যাত মানুষদের চিনতেন সাংবাদিক হিসাবে—ভারতের নানা স্থানে কাজ করার সূবাদে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এইসকল বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনেকের কথা অল্পবিস্তর লিখে গেছেন; কিন্তু এঁরা সকলেই 'চন্দ্র', তাঁর হৃদয়াকাশে 'সূর্য' বলতে একজনই—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ খণ্ড সূর্য, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণেরই নির্মাণ। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অন্তত তাই মনে করতেন।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বেশ কয়েকটি লেখায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে লেখাগুলির মধ্যে দুটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। এক, শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যোন্মাদনা ও দ্যুতিবিচ্ছুরিত সমাধি; দুই, শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর আশ্চর্য সরলতা, গভীরতা ও সর্বজনীনতা। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বারে বারে বলতে চেয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী কেবল একালের ধর্মজগতে নয়, সর্বকালের ধর্মজগতে সর্বোচ্চ ধর্মবাণীরূপে গ্রাহ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও অন্য দু-একটি বিষয় সম্বন্ধে সমকালের কিছু মানুষের—তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট মানুষরাও আছেন—সংশয়াচ্ছন্ন সমালোচনাকে তুচ্ছ স্থূল বিচার বলতে তিনি দ্বিধা করেননি।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্মৃতিকথার দু-একটি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যায়। তিনি বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের কাল জুলাই ১৮৮১। এই সাক্ষাৎদর্শন তাঁকে

---

* রচনার শিরোনাম অনুবাদকের।—সম্পাদক

অভিভূত করেছিল এবং সে-বিষয়ে তিনি তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে অবহিত করেন। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে যাওয়ার জন্যও তাগিদ দেন। তার বছরখানেকের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ঘটনাচক্রে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীম-র দেখা হয়। শ্রীম-র বিবরণ অনুযায়ী সেই সময়টি হলো—১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ ভাগ, সম্ভবত ২৬ ফেব্রুয়ারি (মতান্তরে ১৯ ফেব্রুয়ারি)। 'কথামৃত'এ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন সম্বন্ধে শ্রীম-র যে-বিবরণ আছে তাতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের উল্লেখ নেই। শ্রীম বলেছেন, তিনি তাঁর আত্মীয় সিধুর (সিদ্ধেশ্বর মজুমদার) সঙ্গে বরানগরের বিভিন্ন বাগানে বেড়াবার সময় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে এসে পড়েন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে তাঁকে ভক্ত-পরিবৃত অবস্থায় দেখেন। এই সাক্ষাতের কয়েকদিন আগে, ২৩ ফেব্রুয়ারি, শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগীদের সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসাবে 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস : সমসাময়িক দৃষ্টিতে' (সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস) গ্রন্থে সঙ্কলিত 'দ্য নিউ ডিসপেনসেশন' পত্রিকার ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ সংখ্যার বিবরণ উপস্থিত করছি :

"On Thursday last there was an interesting excursion by a steam launch up the river to Dakshinaswar. The Rev. Joseph Cook, Miss Pigot, and the apostles of the New Dispensation together with a number of our young men embarked at about 11 o'clock. The revered Paramhansa of Dakshineswar, as soon as he heard of the arrival of the party, came to the riverside, and was taken on board. He successively went through all the phases of spiritual excitement which characterizes him. Passing through a long interval of unconsciousness he prayed, sang, and discoursed on spiritual subjects. Mr. Cook watched him very closely, and seemed much interested by what he saw. Mr. Cook represented the extreme culture of Christian theology and thought. The Paramhansa represented the extreme culture of Indian Yoga and Bhakti in short the traditional piety of the East. And the apostles of the Brahmo Samaj in bringing together the two proved that they combined both in the all-inclusive harmony of the New Dispensation."

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২, 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার 'সংবাদ' : "...১২ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধর্মবিষয়ে বক্তা জোসেফ কুক সাহেবের সম্মানার্থে প্রেরিতমণ্ডলী এবং কতিপয় বন্ধু সমবেত হইয়া বাষ্পীয় শকটযোগে দক্ষিণেশ্বর গমন করেন। এইসঙ্গে মান্যার্হা মিস পিগটও ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংস মহাশয়কে বাষ্পীয় শকটে তুলিয়া লওয়া হয়। তাঁহার ভাবাবেশের ঘোর সমুদয় সময়ের মধ্যে একবারও প্রায় তিরোহিত হয় নাই। ভাবাবেশে প্রার্থনা উপদেশ সঙ্গীত সকলই মধুর এবং জ্ঞানদ। তিনি দেবীকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া যে-প্রার্থনা করেন তাহা অতি জীবন্ত। তাঁহার দেবতা তাঁহাকে কেবলই ধর্মপ্রচারার্থ পীড়াপীড়ি করেন। ইনি কিছুতেই মাথা দিতে চান না। শুদ্ধসত্ত্ব দু-চারি জন যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগের দ্বারা এই কার্য নির্বাহ করিতে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। জোসেফ কুক সাহেব এবং কুমারী পিগট তাহার আশ্চর্য ভাবে প্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন।"

'সমসাময়িক' গ্রন্থটিতে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬, 'ইন্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় যে-বিবরণ বেরোয়, তার মধ্যেও উক্ত স্টীমার-ভ্রমণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-দর্শনে রেভারেন্ড কুকের চমৎকৃত মনোভাবের কথা আছে। 'মিরারের' সম্পাদক লিখেছিলেন :

"...Ramakrishna's divine exercises became gradually so strong that when he performed it he used to lose all external sensibility. I had the good fortune of seeing him and conversing with him many a time, and I had been out of humour to see him performing the exercises when his body used to become void of animation. Anyone who touched at that time his body, found it to be as stiff as a plank. Mr. Cooke, the

American evangelist, who came to this country few years ago, once witnessed Ramakrishna's divine exercises and he expressed his great surprise at it and remarked that he was not aware before that a man could become so much immersed in divine spirit as to lose all perception of the external world."

এই স্টীমার-ভ্রমণের উল্লেখ আছে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে।

আলোচ্য বিষয়ে স্বামী প্রভানন্দের সঙ্গে কথাবার্তার পরে আমি পুনশ্চ হ্যারল্ড ডবলিউ ফ্রেঞ্চ-কৃত 'দ্য সোয়াল্স ওয়াইড ওয়াটার্স : রামকৃষ্ণ অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন কালচার' বইটি দেখি। সেখানেও এই স্টীমার-ভ্রমণের উল্লেখ পাই। তিনি এই সূত্রে 'নিউ ডিসপেনসেশন' ও 'ইন্ডিয়ান মিরার' পত্রিকাগুলির পূর্বোদ্ধৃত অংশই উৎকলন করেছেন। এইসঙ্গে এই তথ্য পেয়েছি : 'নিউ ইংল্যান্ড প্রোটেস্টান্ট রক্ষণশীলতার প্রতিনিধি' রেভারেন্ড জোসেফ কুক প্রাচ্যভ্রমণে আসেন ১৮৮২ সালে—কলকাতায় তাঁর সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। রেভারেন্ড কুক পরে 'ওরিয়েন্ট' নামক প্রাচ্যভ্রমণ বিষয়ে যে-গ্রন্থ লেখেন, তার মধ্যে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে স্টীমার-ভ্রমণের এই উল্লেখ আছে : "On invitation, I made an expedition with him (Keshab) and his pupils up the river Hooghly." কিন্তু সেখানে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের কোন উল্লেখ নেই, যদিও তিনি গ্রন্থমধ্যে বিস্তৃতভাবে কেশবচন্দ্র সেনের সানুরাগ বর্ণনা দিয়েছেন, ধর্মবিষয়ে কিছু মতপার্থক্য সত্ত্বেও। এই অত্যন্ত গোঁড়া পাদরীর পক্ষে কেশবচন্দ্র সম্পর্কে প্রীতিবোধ করা সম্ভব ছিল; কিন্তু এলোমেলো, অগোছালো, ইংরেজী শিক্ষাবিহীন এক হিন্দু ভাবোন্মাদের সমাধি ইত্যাদি দর্শনে তাঁর ক্ষণকালীন কৌতূহলী বিস্ময় ঘটলেও সেই 'দৌর্বল্য'কে পরবর্তী কালে প্রশ্রয় দেবার কথা তিনি ভাবতে পারেননি। ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন, সেখানে সাড়ম্বরে জানিয়েছিলেন—পৃথিবীতে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের সাম্রাজ্য কোন্ হিতকর্ম করে যাচ্ছে। তাঁর মুখে এবং তাঁর মতো আরো কয়েকজনের মুখে এইসব কথা শুনে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ থেকে অগ্নিস্রোত নির্গত হয়েছিল :

"We who come from the East have sat here on the platform day after day, and have been told in a patronizing way that we ought to accept Christianity because Christian nations are the most prosperous. We look about us, and we see England, the most prosperous nation in the world, with her foot on the neck of 250,000,000 of Asiatics. We look back into history, and see that the prosperity of Christian Europe began with Spain. Spain's prosperity began with the invasion of Mexico. Christianity wins its prosperity by cutting the throats of its fellowmen." (Indian Mirror, 7 Dec. 1893)

মেরী লুইস বার্ক তাঁর বিশাল প্রামাণ্য গ্রন্থ 'বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট : নিউ ডিসকভারিজ'-এর মধ্যে রেভারেন্ড কুকের দৃষ্টিভঙ্গি ও এইকালীন কার্যকলাপের প্রয়োজনীয় বিবরণ দিয়েছেন। হ্যারল্ড ফ্রেঞ্চ তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থে অনুমান করেছেন, ধর্মমহাসভায় রেভারেন্ড কুক প্রমুখের খ্রীস্টীয় পাপবাদ প্রচারে সদম্ভ ঘোষণাই বিবেকানন্দকে বিশেষভাবে ঐ পাপবাদের বিরোধিতা করতে প্রণোদিত করেছিল। এই অনুমানের আংশিক যৌক্তিকতা স্বীকার্য। তবে এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের ঐ বক্তব্যের মূল উৎস বেদান্তনির্ভর জীবনদর্শন, যা তাঁর মধ্যে প্রোথিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে ক্ষোভের সঙ্গে ব্রাহ্মভক্তদের অবিরাম 'পাপ পাপ' উচ্চারণ ও তজ্জনিত আত্মগ্লানি সম্বন্ধে ধিক্কারের ভাষায় কথা বলেছেন, সেকথা রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের পাঠকগণ জানেন। রেভারেন্ড কুক অপরপক্ষে কেশবচন্দ্রের উক্তিতে পাপবাদের সমূহ সমর্থন দেখেছেন। কেশবচন্দ্রের প্রতি রেভারেন্ড কুকের বিশেষ প্রীতির মূলে এই কারণও ছিল। হ্যারল্ড ফ্রেঞ্চ এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন :

"However much Cook may have been impressed by his meeting with Ramakrishna, he maintained the emphasis on sin which Ramakrishna and Vivekananda alike found offensive in the teachings of the Brahmo Samaj and Christianity."

সানুচর কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ২৭ অক্টোবর ১৮৮২ তারিখে স্টীমার-ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীম—'কথামৃত'এর প্রথম খণ্ডে। সুপরিচিত সেই বিবরণ। সে-ভ্রমণে নগেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। আর তিনি রেভারেন্ড কুক সহ স্টীমার-ভ্রমণেও ছিলেন বলে মনে হয় না। যদি থাকতেন তাহলে রেভারেন্ড কুক ও মিস পিগটের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতির কথা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একাধিক রচনায় স্টীমারে কেশবচন্দ্র-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন-স্মৃতির এমনই সমুজ্জ্বল চিত্র পাই যে, তার সত্যতায় সন্দেহ করা যায় না। তবে কি কেশবচন্দ্র-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকটি স্টীমার-ভ্রমণ হয়েছিল, যার হদিশ আমরা পাইনি?

আরো একটি-দুটি কথা। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন, তিনি প্রথম শ্রীম-কে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে অবহিত করেন। স্বয়ং শ্রীম-র বিবরণেও পাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ তারিখে শ্রীম যখন সিধুর সঙ্গে বরানগরে 'এ-বাগানে ও-বাগানে' বেড়াতে বেড়াতে প্রসন্ন বাঁড়ুয্যের বাগানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন সিধু বলেছিলেন : "গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে-বাগানটি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।" তারপরে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হন। এই বর্ণনা থেকেও মনে হয়, শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মোটেই সচেতন ছিলেন না। অথচ তিনি আগে থেকেই কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী, সেই সূত্রে অবশ্যই ব্রাহ্মমহলে যোগাযোগ ছিল। ব্রাহ্মদের ইংরেজী ও বাঙলা পত্রিকায় ১৮৭৫ সাল থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের বেশ কিছু বিবরণ বেরিয়ে গেছে—সেসকল বিবরণ গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগে স্পন্দিত। সেইকালে কেশবচন্দ্র ও তাঁর পত্র-পত্রিকার বিশেষ প্রভাব। তাই কেশবচন্দ্রের সবিশেষ অনুরাগী মহেন্দ্রনাথ কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেন কিছু জানেন না, এমন মনোভাব রক্ষা করলেন? এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর শ্রীম বিষয়ে চর্চাকারীরা দিতে পারবেন। আমি জানি না।

পুনশ্চ। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-উক্তির প্রধান উৎস 'কথামৃত' এবং কিছু স্বামী ব্রহ্মানন্দ-কৃত ক্ষুদ্রাকার একটি সঙ্কলন। একথা মোটেই ঠিক নয়। প্রথম সঙ্কলন হয়েছিল ব্রাহ্ম পত্র-পত্রিকায় ও কেশবচন্দ্র সেনের পুস্তিকায়। গিরিশচন্দ্র সেনের পুস্তকের কথাও স্মরণ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনকালের মধ্যে (ডিসেম্বর, ১৮৮৪) সুরেশচন্দ্র দত্ত 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র দত্তের 'তত্ত্বসার' প্রকাশিত হয় ১৮৮৫-তে। এই ধরনের আরো কিছু পুস্তিকার উল্লেখ 'সমসাময়িক' গ্রন্থে আছে। স্মর্তব্য, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 'থীস্টিক কোয়ার্টার্লি রিভিউ' পত্রিকার অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৮৭৯ সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের যে অনবদ্য জীবনচিত্র ইংরেজীতে প্রকাশ করেন, তার শেষাংশে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে 'কথামৃত'ই যে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথার প্রধান প্রামাণ্য সঙ্কলন—নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই উক্তি সর্বাংশে গ্রাহ্য। (তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের গ্রন্থাগার এবং 'বিবেকানন্দ আর্কাইভ্‌স'-এর কাছে আমি ঋণী।)

—শঙ্করীপ্রসাদ বসু

১৯৩৬ সালে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী। একশো বছর আগে তাঁর জন্ম, পঞ্চাশ বছর দেহধারণ করেছিলেন, দেহান্ত হয়েছে ১৮৮৬ সালে। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী কেবল সারা ভারতে পালিত হয়েছে তাই নয়, অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকাতেও। তাঁর প্রয়াণের পরে যে পঞ্চাশ বছর কেটেছে তারই মধ্যে তাঁর নামাঙ্কিত মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, ভারতের বাইরেও। কলকাতার নিকটে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র—সেখানে নির্মীয়মাণ মন্দিরটি সম্ভবত বাংলার সর্ববৃহৎ। প্রতিটি জাতি ও ধর্মের নরনারী সবিস্ময় শ্রদ্ধায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। তাঁর একান্ত অনুগামীরা—সন্ন্যাসী ও গৃহী সকলেই তাঁকে ঈশ্বরাবতাররূপে পূজা করেন।

নতুন নতুন মানুষ সর্বদাই রামকৃষ্ণসঙ্ঘে প্রবেশেচ্ছু হয়ে আসছেন। প্রাচীন ভারতের সাধুসমাজের রীতি অনুযায়ী রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণ জীবনাচরণে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সাময়িক পত্র-পত্রিকায় পৃথিবীর সকল স্থান থেকে বিশিষ্ট বিদ্বান ও চিন্তাবিদেরা রচনা পাঠিয়েছেন। প্রকাশিত হয়েছে শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের জীবন সম্বন্ধে কেবল সঙ্ঘভুক্ত সন্ন্যাসিগণ অথবা ভক্তগণই নন, মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁর মতো ইউরোপের অগ্রগণ্য এক সাহিত্যিকও গ্রন্থ রচনা করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ সংস্থার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সাহায্য আসছে।

কিন্তু পৃথিবী কি এখনো উপলব্ধি করতে পেরেছে—সর্বত্র যখন ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে তখন পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য কি? কালে কালে ঈশ্বরাবতারদের আবির্ভাবের যৌক্তিকতা নির্ণীত হয়েছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার একটি বিখ্যাত শ্লোকে। কিন্তু যাঁরা কেবল অবতারতত্ত্বে বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছেই ঐ উক্তি গ্রহণযোগ্য। এই ভারতবর্ষেও ঐধরনের কোন মতবাদ বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল না। উপনিষদ্‌ ও বেদান্তসমূহ বৈদিক যুগের মধ্যেই পড়ে। ঈশ্বরাবতার সম্বন্ধীয় ধারণার প্রথম প্রকাশ পৌরাণিক যুগে। বিষ্ণুরই অবতার হয়। বিষ্ণু কিন্তু উপনিষদের ঈশ্বর বা ব্রহ্ম নন। ভগবদ্গীতাতেই প্রথম দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অবতীর্ণ ঈশ্বররূপে ঘোষণা করেছেন।[১] ভারতবর্ষেও আবার শ্রীকৃষ্ণ সকল হিন্দু সম্প্রদায়ে পূজিত নন। শৈবরা শিবের উপাসক—শ্রীকৃষ্ণের নন। বারাণসীতে কোন শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির নেই, যেমন মথুরা-বৃন্দাবনে নেই শিবমন্দির।[২] ভগবদ্গীতার মতবাদ সুগভীর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সর্বজনীনভাবে তা গৃহীত হবে, এমন সুদূর সম্ভাবনাও নেই।

জরথুস্ট্রবাদীদের মধ্যে অবতারতত্ত্ব নেই। অহুর মজদা কিংবা অমশস্‌পন্দদের (Amshaspands) কাছে যদি বলা যায়, ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হতে পারেন, তাহলে সেটা তাদের কাছে একেবারে ধর্মনিন্দা। যীশুকে 'ঈশ্বরপুত্র' বলা হয়; কারণ তিনি 'হোলি ঘোস্ট'-এর দ্বারা গর্ভ-সম্ভবিত সন্তান। খ্রীস্টধর্মে এই ব্যাপার নিয়ে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। অলৌকিকতার ভূমি সর্বদাই পিচ্ছিল। ভারতীয় হলে যীশুকে সহজেই অবতার বলা চলত [যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন]। কিন্তু খ্রীস্টধর্মে কোন দ্বিতীয় খ্রীস্ট সম্ভব নয়। ইসলামের মতবাদ সুস্পষ্ট এবং আপসহীন। কোরান এবং কলমা-য় পয়গম্বর জোরের সঙ্গে বলে গেছেন, 'দেবতা' বলে কিছু নেই—একমাত্র আছেন 'ঈশ্বর'। ঈশ্বরের কোন অবতার হয়—একথা অসম্ভব ও ধর্মদূষণ। শুধু তাই নয়, এমনকি পয়গম্বরের কোন চিত্ররূপ একেবারে নিষিদ্ধ। কথাপ্রসঙ্গে বলে নেওয়া যায়, বুদ্ধের প্রদত্ত শিক্ষায় যদিও ঈশ্বর-কথা নেই, তবু বৌদ্ধ প্যাগোডায় স্বয়ং বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত। খ্রীস্টীয় গির্জায় যীশুখ্রীস্ট ও মেরীর মূর্তি আছে, কিন্তু মসজিদে কোনপ্রকার প্রতিমূর্তি রাখা যাবে না। ইহুদীদের মেসায়া

এখনো আবির্ভূত হননি, কিন্তু তাঁরা অবতারতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না এবং তাঁদের সিনাগগগুলিতে (উপাসনালয়ে) কোন প্রতিমা নেই।

ভগবদ্গীতার অবতারতত্ত্ব—যখন ধর্মের গ্লানি ঘটে তখন সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতীদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য ঈশ্বর দেহধারণ করে আবির্ভূত হন। এই তত্ত্ব অপেক্ষা মানবসাধারণের দিক দিয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য কথা হলো—যখন সমগ্র মানবজাতি নিম্নমুখ ভূমিতে অবস্থিত, পবিত্র সমুচ্চ স্তরের দিকে নয়, যখন তা ক্রমেই নেমে যাচ্ছে অন্ধগহ্বরের দিকে তখন কালে কালে আচার্যরা আবির্ভূত হন মানবজাতিকে কিংবা তার একাংশকে ঊর্ধ্বতর লোকে উন্নীত করার প্রচেষ্টায়। পৃথিবীতে যেমন জাতি অনেক, তেমনি ধর্মও অনেক। আবার যেহেতু মূলগতভাবে সকল মানুষই এক, তাই ধর্মের সারসত্যও এক। ধর্ম মানবচেতনার ক্ষেত্রে শুদ্ধতর ও সূক্ষ্মতর প্রেরণা। একথা বলা ঠিক হবে না যে, ঐহিক সভ্যতার মান-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের মান পরিবর্তিত হয়, কারণ ঐহিক সভ্যতা সাধারণত যতখানি না অধ্যাত্মবাদী ততোধিক জড়বাদী।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের কালে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের জড়বাদের মোহে আচ্ছন্ন ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য জাঁকজমকে এদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের চোখ একেবারে ঝলসে গিয়েছিল। একমাত্র ইউরোপীয় সংস্কৃতির দিকেই তাদের নজর। যারা ইংরেজী জানে না, তারা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ভারতীয় বাগ্মীরা বক্তৃতা করতেন ইংরেজীতে, ভারতীয় লেখকরা লিখতেন ইংরেজীতে। ব্রাহ্মসমাজ ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন চালাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁদের অনুগামীর সংখ্যা খুবই কম, তার ওপর ইতিমধ্যেই তাঁরা তিনটি দলে বিভক্ত। ব্রাহ্মসমাজ কোন নতুন ধর্মমত সৃষ্টি করেননি, উপনিষদ্ তাঁদের শাস্ত্র এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বর তাঁদের আরাধ্য। উপাসনারীতি ও অন্য আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি হয় তাঁরা সরাসরি উপনিষদ্ থেকে গ্রহণ করেছিলেন কিংবা উপনিষদ্‌কে ভিত্তি রেখে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। সর্বপ্রকার প্রতিমাপূজাই তাঁদের দ্বারা বর্জিত। যুক্তিতর্কের দ্বান্দ্বিকতার প্রতি ছিল তাঁদের সুস্পষ্ট পক্ষপাত, যা বহুক্ষেত্রে পারস্পরিক মানসিক তিক্ততাকে পরিহার করতে পারেনি। ব্রাহ্মসমাজের তিন ভাগের মধ্যে মাঝে মাঝে মনকষাকষি দুঃখজনকভাবে তীব্র হয়ে উঠেছিল।

ঠিক তখনি, ঐ উনিশ শতকের শেষ পাদে, কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে, গঙ্গাতীরে, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এক বিরাট সৃষ্টি-সম্ভাবনা আকারিত হয়ে উঠছিল, শোনা যাচ্ছিল নব সুসমাচার। কেইবা তার আগে ভাবতে পেরেছিল? সে এক মহাশক্তি, সর্বদাই দুর্জ্ঞেয় যার রীতি-নীতি-পন্থা; পাশ্চাত্য জড়বাদের সচঞ্চল রঙিন আলোর ঝলকানির ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করবে সার্বভৌমিক আধ্যাত্মিকতার নিত্য উদ্ভাস—এই ছিল যার নিশ্চিত নির্ধারণ, যার কাছে অগভীর বা গভীর সকল প্রকার বিদ্যার অভিমান নম্র হয়ে লুটিয়ে পড়বে ধুলায়।

কে এই নতুন আচার্য? ১৮৩৬ সালে তাঁর জন্ম। পিতামাতা নাম রেখেছিলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়। বাংলার এক অখ্যাত গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ

পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন, এমনকি মাতৃভাষা বাঙলাও ভাল করে লিখতে বা পড়তে পারতেন না। ছেলেবেলা থেকেই বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট বিতৃষ্ণা। সংস্কৃত জানতেন না, ইংরেজীও নয়। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুরোহিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন বিচিত্র সব খেয়াল জাগতে লাগল যে, তাঁকে পুরোহিতগিরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। তাঁর সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তি অবশ্য মন্দিরের মালিকদের গোচরে এসেছিল। তাঁরা তাঁকে থাকবার জন্য মন্দিরসংলগ্ন একটি কক্ষ দিয়েছিলেন, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিও করেন।

সাধারণ অবস্থায়, দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করবার মতো শিক্ষার অভাবে এই মানুষটি অজ্ঞ, সঙ্কীর্ণচিত্ত, স্থূল সংস্কারাচ্ছন্ন, মূর্তিপূজক, অখ্যাত একটি জীব হয়ে বিদায় নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যার বিষয়ে বুদ্ধদেব বলেছেন ঃ 'আবির্ভূত অদৃশ্যলোক থেকে'। পৃথিবীতে পরম আলোক অবারিত যাঁরা করেন, তাঁদেরই ধারাবর্তী তিনি।

ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে কিংবা মন্দিরসংলগ্ন ক্ষুদ্র বনটিতে তিনি যে কঠোর সাধনা করেছেন ব্যাকুল ভক্তিতে এবং সঙ্গ করেছেন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের—সেসব বিষয়ে বিস্তারিত লেখার স্থান এ নয়। তোতাপুরী নামধারী এক পাঞ্জাবী বৈদান্তিক তাঁকে 'রামকৃষ্ণ' নাম দিয়েছিলেন।[৩] সর্বপ্রকার ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের বিস্ময়কর সামর্থ্য তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু যে-জ্যোতির্ময় শক্তিতে উদ্ভাসিত ছিলেন—তা ছিল তাঁর একান্তই নিজস্ব। তিনি ধর্মোন্মত্ততার মধ্যে কাটিয়েছেন কিছুদিন। এমনই গভীর তাঁর ধ্যান এবং এমনই প্রখর প্রত্যক্ষ তাঁর উপলব্ধি যে, তিনি সাক্ষাৎ দিব্যদর্শনের আনন্দে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে অন্তরাত্মায় নিমগ্ন হয়ে যেতেন—ধর্মীয় পরিভাষায় যাকে বলে নির্বিকল্প সমাধি। এই কারণে তাঁকে 'পরমহংস' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল—যোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ হিসেবে।

ভাবোন্মাদনার কাল একসময়ে কেটে গেল। তারপর জাগল ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হবার প্রবল আকুতি, কারণ যে-সত্য তাঁর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে তা যেন সংক্রামিত করতে পারেন অপরের মধ্যে। বাহ্যতঃ তিনি কালী-উপাসক, মন্দিরে একদা কালীপূজারী তো ছিলেনই; কিন্তু তিনি স্থূল প্রতিমার পূজা করতেন না, তাঁর কাছে কালী ও ব্রহ্ম একই—প্রকৃতি এবং পুরুষ। কালীপূজক হয়েও অংশ নিতেন বৈষ্ণবদের সঙ্কীর্তনে—নাচতেন, গাইতেন। একবার কয়েক মাস মসজিদে উপাসনা করেছেন, তখন মুখে দাড়ি, জপ করছেন 'আল্লা আল্লা'। গির্জায় গেছেন, নিজের ঘরে যীশুখ্রীস্টের ছবি রেখেছেন। বুদ্ধের ছবিও ছিল। তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়েছিল। লোকজন আসতে শুরু করেছিল—তারা তেমন অজ্ঞ লোক নয়, যারা অলৌকিক কিছু দেখার বাসনায় সাধুদের পিছনে ছোটে। তাঁর কাছে আসতেন শিক্ষিত মানুষেরা, কখনো কখনো ধনীরা, ব্রাহ্মরা, স্কুল-কলেজের তরুণ ছাত্ররা, বিশিষ্ট লেখকরা, জনজীবনে খ্যাত মানুষরা, সম্পন্ন মাড়োয়ারীরা এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সাধকেরা।

কিভাবে তিনি দর্শনার্থীদের প্রভাবিত করতেন? কেবল যে তিনি প্রায় অশিক্ষিত ছিলেন তাই নয়, তিনি তো ভদ্রসমাজে প্রচলিত রীতিনীতিও জানতেন না। কথা বলতেন গ্রাম্য ভাষায়, অশালীন অমার্জিত; দিব্যি গালতেন মুহুর্মুহু। এমনই অসচেতন ও উদাসীন ছিলেন যে, কোমর থেকে কাপড় পর্যন্ত খসে পড়ত, মাঝে মধ্যে শিশুর মতো নগ্ন হয়ে বসে থাকতেন বা ঘুরে বেড়াতেন। বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু দাম্পত্যসম্পর্ক ছিল না। পত্নীকে পূজার আসনে বসিয়ে পূজা করেছেন—ঈশ্বরী কালীর মানবী প্রতিমারূপে। সেই দৃষ্টিতেই তিনি সকল নারীকে দেখতেন। কিন্তু তিনি যখন কথা বলতে শুরু করতেন, নীরব হয়ে যেত অপরের কণ্ঠস্বর। ঈষৎ তোতলামি ছিল, তবে তা বেশি কিছু নয়, আর শুনতেও মধুর লাগত। তাঁর কথা শুনতেন বিরাট বিরাট বাগ্মীরা, লেখকরা, বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা, ধর্মনেতারা। তাঁরা শুনে যেতেন বিহ্বল বিস্ময়ে, ক্রমবর্ধিত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে; কারণ তাঁর মতো কথা বলতে স্মরণকালের মধ্যে কেউ শোনেননি। তাঁরা অনুভব করতেন, ওঁর কথায় ভর করেছে শক্তি; তাতে আছে উত্তাপ, লাবণ্য এবং আশ্বাস। অবিশ্বাস্যভাবে পূর্ণ তাঁর প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিকতার ভাণ্ডার—সেখান থেকে অবিরাম নির্গত হতো উপমা, দৃষ্টান্ত, কাহিনী, প্রবাদ-প্রবচন। আপাতত খুবই সহজ সরল সেগুলি, কিন্তু সর্বদাই সুগভীর উপলব্ধিতে উৎকীর্ণ। আর্যধর্মের বিভিন্ন অংশের সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যাগুলি তাঁর কাছে অ-আ-ক-খ-র মতোই সহজ ছিল। পড়াশোনা কিছুই করেননি, অথচ বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, বিভিন্ন তন্ত্রমত, ভাগবত—এসকলই তাঁর অধিগত এবং এমন সমুজ্জ্বল স্বচ্ছতার সঙ্গে সেসব বিষয়ে বলতেন যে, শিশুদের কাছেও তা ছিল বোধগম্য। এইসকল অধ্যাত্মসম্পদের পূর্ণাধিকারী হয়েও তিনি পূজা করতেন বিচিত্র দেবদেবীর। কেবল অপূর্ব কথাই নয়, মাতোয়ারা হয়ে গাইতেন, নাচতেন। দিব্যানন্দের জীবন্ত মূর্তি তিনি।

তিনি যে কেবল টাকা-পয়সা গ্রহণ করতেন না তাই নয়, হাতের ওপর রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা পর্যন্ত রাখতে পারতেন না। কোন টাকা তাঁর হাতে দেওয়া মাত্র তাঁর হাত অসচেতনভাবে তখনি বেঁকে যেত আর মুদ্রাটি পড়ে যেত। সেইভাবেই তাঁর কোমর থেকে কাপড় খসে পড়ত, যেভাবে জ্ঞানচৈতন্যের সাক্ষাৎদর্শনমাত্রে খসে পড়ে মায়ার আবরণ। কদাপি সন্ন্যাসীর গেরুয়া ধারণ করেননি, সাধারণ বাঙালীর মতো লালপেড়ে ধুতি পরতেন। বাহ্যরূপ ব্যক্ত করত না অন্তরাগ্নির আলোক।

রামকৃষ্ণের মধ্য দিয়েই সিদ্ধ হয়েছিল ঈশ্বরের সুমহান দুর্জ্ঞেয় অভিপ্রায়। লোকে সমাধির কথা শুনেছে বা পড়েছে, কিন্তু কেউই রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে সমাধির যে-রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, তার অনুরূপ কিছু দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করেনি। জানান না দিয়েই তিনি সমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতেন। যেকোন একটি উদ্দীপক চিন্তা, শব্দ বা সঙ্গীত তাঁকে দিব্যানন্দের সমাধিলোকে প্রেরণ করত। কলকাতার চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখেছেন কি অমনই তাঁর মনে জেগেছে দেবী দুর্গার বাহন সিংহের কথা, আর তৎক্ষণাৎ সমাধি। তিনি যে নিরন্তর ঈশ্বরচেতনায় নিমজ্জিত, এসব তারই নিদর্শন। ঈশ্বর ছাড়া আর কোন

বিষয়ে কথাই তিনি বলতেন না। তিনি বলতেন, ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, পুরুষরূপে নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিরূপে ক্রিয়াত্মিকা। ঈশ্বর তাঁর কাছে কেবল নিত্য বর্তমানই নয়, তাঁকে তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করতেন। এত সহজ এবং সর্বাত্মক তাঁর বিশ্বাস যে, উপস্থিত কেউ কখনো ও-বিষয়ে প্রশ্ন করার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিরাট বাগ্মী এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা সর্বজনবিদিত। প্রায়ই তাঁরা পরস্পরের সাক্ষাতে উপস্থিত হতেন। কেশবের মৃত্যুর অল্প পূর্বে রামকৃষ্ণ কেশবের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। কেশব রামকৃষ্ণকে এতই ভক্তি করতেন যে, তিনি তাঁর পদধূলি নিতেন। তাঁর সমাজের প্রধান কয়েক ব্যক্তিও রামকৃষ্ণের কাছে যেতেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন, রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎপর্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে তিনি রামকৃষ্ণের অনুগামী হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুই নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রায়শই তাঁর কাছে যেতেন। বিজয়কৃষ্ণ পরে ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে হিন্দুসন্ন্যাসী হয়ে যান। একবার তিনি রামকৃষ্ণের শ্রীচরণ বুকে ধরে আকার-ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছিলেন—রামকৃষ্ণ ভগবানের অবতার। রামকৃষ্ণ আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখতে গিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বাৎসরিক উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। সেইসঙ্গে ঠিকঠাক পোশাক পরে আসতে অনুরোধ জানান। কিন্তু রামকৃষ্ণ বলেন ঃ "আমি বাবু সাজতে পারবুনি।" পরে দেবেন্দ্রনাথ চিঠি পাঠিয়ে বলেন, রামকৃষ্ণকে সভাস্থলে আনা উচিত হবে না। দেবেন্দ্রনাথ গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ ছিলেন ঠিকই, তবে একই সঙ্গে তিনি কলকাতার অভিজাত ভদ্রসমাজের মানুষও। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি থাকবেন—সেখানে এমনকি এক পরমহংস পর্যন্ত যদি পরিষ্কার সাদা জামাকাপড় পরে না আসেন, নিতান্ত বেমানান হয়ে দাঁড়াবেন। যীশুখ্রীস্টকে কি 'হাউস অভ লর্ডস'-এ বসতে দেওয়া সম্ভব?

স্বামী বিবেকানন্দ প্রকাশ্যে বলেছেন, তাঁর সবকিছুই তিনি পেয়েছেন গুরু রামকৃষ্ণের কাছ থেকে। তাঁর প্রধান ঋণ—নির্ভয় সত্যকথনের সামর্থ্য। রামকৃষ্ণ প্রত্যেক মানুষকে তার নাম ধরে ডাকতেন। আর যদি কারো মধ্যে হামবড়াই ভাব দেখতেন, তাঁকে প্রকাশ্যেই তিরস্কার করতেন। ধর্মবোধে, স্বতঃপ্রজ্ঞায় এবং আত্মশাসনে তিনি নিতান্ত নম্র, কিন্তু অকারণ চাপল্য কিংবা দম্ভ একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। 'রাজা' উপাধিকারী এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি বলেছিলেন ঃ "দ্যাখ বাপু, তোমাকে মিথ্যে রাজা-টাজা বলতে পারবুনি। তুমি তো সত্যি রাজা নও।" সত্যকার রাজা বলতে [দেশাধিপতি] শাসনকর্তা বোঝায়। আর যাদের রয়েছে নিছক 'রাজা' উপাধি তাঁদের সঙ্গে [সেকালের] ভারতবর্ষের শ্রমিকদের কোন পার্থক্য ছিল না। নিছক পাণ্ডিত্য কিংবা বৈদগ্ধ্য, যার বিষয়ে আমাদের মাতামাতি কিংবা ধনসম্পদ, খ্যাতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—এসকলের কোন মূল্যই তাঁর কাছে ছিল

না। একমাত্র যাদের আছে ধর্মবোধ, যারা ঈশ্বরচিন্তা করে—তাদের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ। একবার যখন বিখ্যাত এক জননেতা তাঁকে বলেন, তিনি পরোপকার করে থাকেন; রামকৃষ্ণ তাঁর মুখের ওপর সোজা বলে দেন, ঈশ্বর না চাইলে তাঁর কি ক্ষমতা যে পরোপকার করবেন? সেই কালে কলকাতায় বহু বাগ্মী ছিলেন—কেশবচন্দ্র সেন তাঁদের সেরা। রামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন: "লেকচার-ফেকচারের কি দাম, যদি না ঈশ্বরের চাপরাস সঙ্গে থাকে! লোকে বক্তৃতা শুনবে, খানিক পরে ভুলে যাবে।" হায়! সত্যিই তো, কে আর এখন কেশবচন্দ্র সেনের অতুলনীয় বক্তৃতার কথা স্মরণ করে?

আর সেই কালে সমুচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন এই মানুষটি—প্রায় নিরক্ষর, সভ্য রীতিনীতির ধার ধারেন না, গ্রাম্য অজ্ঞ মানুষের মতো কথা বলার ভঙ্গি, মুখে অনর্গল বাক্যস্রোত নয়, তোতলামির কারণে কথা মাঝে মাঝে বেধে যায়, কখনো দশ-বিশ জনের বেশি লোকের কাছে কথা বলেননি। দেখা গেল, তাঁর জন্মের পরে একশ বছরের চাকা ঘুরতে না ঘুরতে—যার মধ্যে আবার পঞ্চাশ বছর তিনি পৃথিবীর লোকচক্ষে নেই—তাঁর কথা পৃথিবীর সকল অংশে উদ্ধৃত হচ্ছে, পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হচ্ছে, আর আনন্দধ্বনি উঠছে চতুর্দিকে। পৃথিবী এখন আবার দেখল, আগেও যা দেখেছে—একজন আচার্য কোন বাগ্মীর চেয়ে কত বড়, মনীষার চেয়ে কত উচ্চে অবস্থিত আত্মিক শক্তি। রামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, যখন তিনি ভাবে থাকেন তখন পণ্ডিত-ফণ্ডিতকে একেবারে তুচ্ছ মনে হয়। আত্মার আলোকের সামনে অপর সকল আলোক ম্লান হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেমন হয় সূর্যোদয়ে তারকা বা চন্দ্রের দশা।

কোন্ হিসেব ধরতে পারব, কিভাবে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক তরুণকে—তাদের অনেকে আবার কিশোর, বালক—আকর্ষণ করে নিজের কাছে জড়ো করেছিলেন; তারপর পবিত্র জীবনযাপন করে ঈশ্বরের জন্য আত্মোৎসর্গ করার শিক্ষা দিয়েছিলেন? কিভাবে তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্তের অন্তর্নিহিত শক্তি দর্শন করতে পেরেছিলেন, যিনি পরে হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দরূপে পৃথিবীর চোখ ঝলসে দেন? কোথা থেকে এসেছিল তাঁর এই অন্তর্ভেদী অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদর্শনের ক্ষমতা, যা এই তরুণ বালকের মধ্যে (যার মধ্যে বিশেষ সম্ভাবনা তখনো দেখা যায়নি) দর্শন করতে পেরেছিল এক বিশ্বখ্যাত বিরাট বার্তাবহ আচার্যকে? বিবেকানন্দের সঙ্গে আমি একই কলেজে ছিলাম, তাঁকে কেউই উজ্জ্বল ছাত্র বলে মনে করেনি। [কথাটি বিতর্কযোগ্য।] যা শোনা গিয়েছিল তা হলো—সে খুব ভাল গায়ক। পুরো পড়াশোনা শেষ করতে না পেরে আমি ডিগ্রি ছাড়াই কলেজ ছাড়ি, আর বিবেকানন্দ ডিস্টিংশন ছাড়া সাধারণভাবে বি. এ. পাস করেন। বহু বছর পরে বিবেকানন্দ লাহোরে আমার অতিথি হিসেবে কাটিয়েছেন। আমি তখন 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক। তখন তাঁর মাথায় শিকাগো ধর্মমহাসভায় অর্জিত গৌরবমুকুট। রামকৃষ্ণ পূর্বাহ্নে কেবল বিবেকানন্দের বিরাটত্বের ভবিষ্যদ্বাণী করেননি, এও বলেছিলেন—ও যদি নিজের স্বরূপ জানতে পারে তাহলে বেশিদিন বাঁচবে না। বস্তুতপক্ষে বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি স্বয়ং আমাকে মৃত্যুর তিন বছর আগেই

নিজের ভাবী মৃত্যুর কথা বলেছিলেন। রামকৃষ্ণ আরো কিছু শিষ্য রেখে গেছেন যাঁরা অসাধারণ মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চরিত্রে ভূষিত এবং অপূর্ব আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী।

পরমহংসকে দেখার এবং তাঁর কথা শোনার পুণ্যার্জন আমি করেছি, আর কলম ধরে সেকথা লেখার জন্য আমি এখনো [১৯৩৬] বেঁচে আছি। ১৮৮১ সালের জুলাই মাসে তাঁকে দেখেছি—উনিশ বছরের তরুণ বালক তখন আমি। তাঁকে দেখেছি কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে—সেখানে কয়েকজন ব্রাহ্ম প্রচারক-সহ আরো কিছু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কেশবের জামাতা, কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের ছোট একটি স্টীমারে (বাষ্পীয় নৌকা বলাই ঠিক) আমরা ছিলাম। দক্ষিণেশ্বর থেকে পরমহংস তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়কে নিয়ে উঠলেন। তিনি এবং কেশব পরস্পরকে করজোড়ে একেবারে নত হয়ে—মাথা প্রায় জাহাজের ডেকে ঠেকে যাচ্ছিল—নমস্কার করলেন। ডেকের ওপরে গা ঘেঁষে মুখোমুখি তাঁরা বসলেন। কেশব আমাকে তাঁর পাশে বসতে বললেন। সেটা আমার সৌভাগ্য হয়ে দাঁড়াল। সামনে দেখলাম মধ্যবয়সের, মাঝারি উচ্চতার, শ্যামবর্ণ, দুর্বল চেহারার একটি মানুষকে—তাঁর চুল এলোমেলো, আঁচড়ানো হয়নি, কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখ অর্ধমুদিত এবং আত্মমগ্ন। ঠোঁট অল্প স্থূল, নিচের ঠোঁট একটু শিথিল, তার ফলে সামনের দাঁত দেখা যায়। লালপাড় ধুতি পরনে, গায়ে খাটো শার্ট, বোতাম খোলা। পায়ে জুতো নেই। তবে অন্য ক্ষেত্রে চটি বা জুতো পরতে তাঁকে দেখা গেছে। তিনি কুঞ্চিত চোখে চারদিক দেখে নিলেন—দেখলেন সকলের দৃষ্টি ভাল। তারপর নজর পড়ল জাহাজের কাছি জড়াবার লোহার খুঁটির ওপরে বসে থাকা ইউরোপীয় পোশাক-পরা যুবকটির ওপরে। রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন : "ওটি কে?" কেশব আন্দাজে বললেন : "ও বোধহয় সদ্য ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছে।" "ঠিক ঠিক"—রামকৃষ্ণ বললেন "জানোই তো, সাহেব দেখলেই ভয় ধরে যায়!" শুনে আমরা সকলে হাসতে লাগলাম। তারপরেই রামকৃষ্ণ সরাসরি গভীর বিষয়ে কথাবার্তায় নেমে পড়লেন।

কথোপকথন বলতে যা বোঝায়, এটা তা ছিল না। প্রায় আট ঘণ্টা ধরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি কণ্ঠস্বরই শোনা গিয়েছিল, সে-কণ্ঠ রামকৃষ্ণের. মাঝেমধ্যে অল্প তোতলামি, তা কিন্তু বাক্যপ্রবাহে বাধাসৃষ্টি করেনি। কথাবার্তার মধ্যে 'তুমি' ও 'আপনি' মিশে যাচ্ছিল, ভাষায় পরিমার্জনার অভাব থাকলে যেমন হয়। কিন্তু কে কবে কাউকে এমন করে কথা বলতে শুনেছে? প্রজ্ঞা ও ঈশ্বরচৈতন্যের অফুরন্ত উৎস থেকে নির্গলিত হচ্ছিল শব্দধারা। পরবর্তী কালেই কেবল আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম—কী সুমহান সৌভাগ্য ও মহাপুণ্যের সেই দিনটি আমার ছিল! আমার সামনে মিলিত দুই আত্মার আত্মীয়, যাঁরা অধ্যাত্মজগতে নির্ধারিত স্থানের অধিকারী। রামকৃষ্ণ সর্বোচ্চ আকারে প্রকাশিত তখন। ডেক একেবারে নিস্তব্ধ। আচার্যের কণ্ঠ থেকে যেসকল অমূল্য শব্দরাজি নির্গত হচ্ছে, তার কোনটি যাতে কান এড়িয়ে না যায় সেজন্য সকলে মাথা ঝুঁকিয়ে, ঘাড় বাড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে আছে। আমাদের হৃদয়তন্ত্রী একেবারে টানটান। দারুণ আবেগে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে শুনছি ঐশ্বরিক

উপলব্ধিতে সঞ্জীবিত, প্রত্যক্ষ বর্ণরঞ্জিত, ঐশ্বর্যময়, উপমা ও কথাগল্পের মালা। স্টীমারের তলা দিয়ে তরঙ্গভঙ্গে বয়ে যাচ্ছিল পবিত্র গঙ্গার ধারা।—সরে যাচ্ছিল নদীর দুপাশের সারি সারি গাছ ও বাড়ির রেখা। সেসব দিকে আমাদের মনই ছিল না। আমরা শুধু চেয়ে আছি আমাদের সামনের নিবিড় ভাবাঙ্কিত, তপঃশুদ্ধ মুখটির দিকে। কেবল শুনছি শব্দের স্রোতধ্বনি, একটি ভাব থেকে আরেকটি ভাবকে স্পর্শ করে শব্দগুলি এগিয়ে যাচ্ছে, আর ঈশ্বরবোধকে করে তুলছে সজীব স্পন্দমান জাগ্রত সত্য। কথা বলতে বলতে উপবিষ্ট রামকৃষ্ণ একটু একটু করে কেশবের দিকে সরে যাচ্ছিলেন—শেষপর্যন্ত তাঁর একটি হাঁটু কেশবের কোলের ওপরে উঠে পড়ল। কেশব একেবারে স্থির—এই ঘনিষ্ঠ স্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার কোন চেষ্টাই করলেন না। এক মুহূর্তের জন্যও রামকৃষ্ণের মুখ থেকে তাঁর দৃষ্টি সরেনি—রামকৃষ্ণের কোমর থেকে ধুতি খসে নিচে জড়ো হয়ে পড়েছে। সহসা তাঁর চৈতন্য ফিরল, সরে গিয়ে কাপড় ঠিক করলেন। কেশব তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনি কি নিরাকার [ব্রহ্ম] সম্বন্ধে কিছু শোনাবেন না?" তখনি অর্ধমুদিত নেত্র একমুহূর্তের জন্য খুলে গেল, চোখে নতুন আলোর চকিত ঝলক। পরমহংস বললেনঃ "নিরাকারের কথা জিজ্ঞাসা করছ? বোঝানো বড় শক্ত। নিরাকার—নিরাকার—।" তারপর শব্দমাত্র উচ্চারণ না করে সমাধিতে ডুবে গেলেন।

সমাধি! সে কি জিনিস!! আমি কেবল শব্দটি আগে শুনেছি। আমার বয়স অল্প, তখনো কুড়ির কোঠাতে আছি। আমি এবং আমার মতো উপস্থিত আর সকলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম রামকৃষ্ণের মুখের দিকে—সেখানে এক অনন্য অপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে। এতক্ষণ ধরে রুদ্ধশ্বাস মনোযোগের সঙ্গে যে-কণ্ঠস্বর শুনছিলাম—কোমল মধুর একাগ্র আচ্ছন্নকারী কণ্ঠস্বর—হঠাৎ তা স্তব্ধ। উপবিষ্ট শরীর স্থির, নিষ্কম্প! তাতে কিন্তু কোন আড়ষ্টতা বা কৃচ্ছ্রকাঠিন্য নেই। অর্ধপদ্মাসনে দুই পা, ভঙ্গি স্বচ্ছন্দ। কোলে ন্যস্ত দুটি হাত, আঙুলগুলি আলগাভাবে পরস্পর জড়ানো। এর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় মুখমণ্ডলটি, সেখানেই প্রকাশিত রামকৃষ্ণকে কোন্ চৈতন্য এখন অধিকার করে রূপান্তর ঘটিয়েছে, তার প্রতিচ্ছবি। অক্ষিপল্লব যদিও আবৃত করেছে চোখের অর্ধাংশকে, কিন্তু পৃথিবী পুরোপুরি হারিয়ে গেছে সেই চোখের সামনে থেকে। বহির্জগতের কোন কিছু যে তাঁর কাছে বর্তমান আছে, তার চিহ্নমাত্র নেই সেই চোখে। ঠোঁট অল্প ফাঁক—যেন হাসছেন, আর মুখটিতে এমন এক অতীন্দ্রিয় দিব্যানন্দের দ্যুতি যার বর্ণনা কেবল অসম্ভবই নয়, ক্যামেরার ছবিতেও ধরা অসম্ভব। ঐ হলো নিরাকার ব্রহ্মোপলব্ধির রসোল্লাস। পরমহংস প্রায়ই বলতেন, সমাধির অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা যায় না।

মনে পড়ে, সেইসময়ে নিজেদের ধর্মনিষ্ঠ মানুষ বলে পরিচয় দেন এমন কেউ কেউ রামকৃষ্ণের সমাধিকে একধরনের মৃগীরোগের মূর্ছা বলতেন। এইসব লোকের ধারণায় ধর্ম হলো তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিতণ্ডা, সাড়ম্বর উচ্চম্মন্যতার রূপ। ঐশ্বরিক প্রেমের গভীরতা এবং উপলব্ধির উন্মাদনা এঁদের কাছে অজ্ঞাত ব্যাপার।

বহু বাগ্মীর বক্তৃতা আমি শুনেছি, কিন্তু তাঁদের কটা কথাই বা মনে আছে? বাতাসে ভেসে সব হারিয়ে গেছে। অথচ রামকৃষ্ণের কথাগুলি মনে আছে, ঠিক যেভাবে পঞ্চান্ন বছর আগে শুনেছিলাম সেইভাবেই। চেষ্টা করলেও তাদের ভুলতে পারতাম না, কেননা ইতিমধ্যেই বলেছি যে, তাদের মধ্যে ছিল শক্তি, করুণা, শুশ্রূষা এবং সান্ত্বনা।

রামকৃষ্ণকে দেখার এবং তাঁর কথা শোনার পরে আমি মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমার আত্মীয়, বয়সে কয়েক বছরের বড়। সবকিছু বলে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য তাগিদ দিয়েছিলাম। পরের বছরে তিনি রামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হন। রামকৃষ্ণের কথা শুনে এমনই মোহিত হন যে, তিনি যাকিছু বলতেন সবই মহেন্দ্রনাথ ডায়েরিতে টুকে রাখতেন। তিনি আমাকে বলেছেন, একদিনের শোনা কথা তিন দিন ধরে লিখতে হতো। জীবনধারণের জন্য তিনি স্কুলে শিক্ষকতা এবং কলেজে অধ্যাপনা করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনে তিনি 'মাস্টার মহাশয়' নামে পরিচিত। তাঁর ডায়েরিগুলিই 'শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র উৎস। এই বই-ই রামকৃষ্ণ-কথার একমাত্র প্রামাণ্য এবং অনেকাংশে সম্পূর্ণ সংগ্রহ। মহেন্দ্রনাথ প্রতিদিন রামকৃষ্ণ-সন্নিধানে উপনীত হতে পারতেন না, কিংবা সর্বদা আচার্যের কাছে থাকতেও পারতেন না। ফলে আচার্য মূল্যবান এবং আলোকিত অন্য নানা উক্তি করেছেন, একথা খুবই সম্ভব, যেগুলি লিখে রাখা হয়নি। যেসব শিষ্য সর্বদাই রামকৃষ্ণের কাছে থাকতেন ও পরবর্তী কালে সংসারত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা গুরুর ব্যক্তিত্বের চৌম্বকশক্তি এবং চরিত্রের প্রভাবে এমনই সম্পূর্ণভাবে অভিভূত ছিলেন যে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দিনে দিনে যেসব অমূল্য কথা শুনেছেন সেগুলি লিখে রাখার কথা তাঁদের কখনো মনে হয়নি। এক গৃহী শিষ্যের ঐকান্তিক ভক্তি এবং ধৈর্যস্থিত পরিশ্রমের ফলেই সেসব রক্ষিত হতে পেরেছে। অন্য যাকিছু রামকৃষ্ণ-কথার সঙ্কলন বেরিয়েছে, সকলই প্রধানত এই উৎস থেকে সংগৃহীত—একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র সঙ্কলন।

রামকৃষ্ণকে দর্শন করার অল্প পরে আমাকে ভারতের অন্যত্র করাচীতে চলে যেতে হয়। আমি তাঁকে জীবিত অবস্থায় আর দেখিনি। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মহাসমাধির দিন, ১৬ আগস্ট ১৮৮৬, আমি কলকাতায় ছিলাম। বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি, এমন সময়ে আমার কাছে একটুকরো মুদ্রিত কাগজ পৌঁছাল—রামকৃষ্ণ পরমহংসের মহাসমাধি হয়েছে। গাড়ি করে আমি সোজা কাশীপুর বাগানবাটীতে পৌঁছালাম—সেখানেই সুমহান পুরুষটি তাঁর শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগীদের অখণ্ড ভক্তি, ভালবাসা ও সেবার মধ্যে শেষ অসুখের দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। দেখলাম, গাড়িবারান্দার সামনে মুক্ত আকাশের নিচে তাঁর মরদেহ খাটিয়ায় সুন্দর একটি বিছানার চাদরের ওপরে স্থাপিত; দেহ শুভ্র চাদরে ঢাকা, তার ওপরে ফুলের রাশি। ডানপাশে ফিরে আছেন, মাথার নিচে বালিশ, দুই পায়ের মধ্যে আরেকটি বালিশ। যে-অধরোষ্ঠ শিক্ষাদানে কখনো বিরত হয়নি—কণ্ঠে ক্যানসার হয়ে যখন অসহ্য কষ্ট পাচ্ছেন তখনো

নয়—এখন তা মৃত্যুতে চিরস্থির। যন্ত্রণার অবসানে মুখ কোমল—তাতে মহামরণের অপার মৌন শান্তি। মুখের হাস্যরেখা থেকে বোঝা যায়, সমাধির আনন্দেই আত্মার মহাপ্রয়াণ। নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও অন্য শিষ্যগণ এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈলোক্যনাথ [সান্যাল]-সহ অনেকে ভূমিতে উপবিষ্ট। যখন তাঁদের পাশে গিয়ে বসেছি এবং রামকৃষ্ণের মুখের অপরিম্লান শান্ত রূপ দেখছি তখন তাঁর এই কথাগুলি মনের মধ্যে ফিরে এল—শরীরটা বস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়, যার ভিতরে থাকে দুর্জ্ঞেয় সত্তা। সেই হলো মানুষের স্বরূপ, যাকে সহজে উপলব্ধি করা যায় না। এধারে ক্রমে ম্লান হয়ে এল অপরাহ্ণের আলো, দিনের উত্তাপ কমে যাবার পরেই মরদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাবার কথা। আমরা বসে আছি—এমন সময় ওপরে ভেসে এল একখণ্ড মেঘ, আর বৃষ্টির কয়েকটি বড় বড় ফোঁটা ঝরে পড়ল। উপস্থিত মানুষরা বললেন, এই হলো পুষ্পবৃষ্টি, স্বর্গ থেকে অমর দেবতারা তা বর্ষণ করেন মর্ত্যমানুষের ওপর—তেমন মানুষের ওপর যিনি মর্ত্যে ও স্বর্গে সুমহিম। পুষ্পবৃষ্টি তাঁকে অমরলোকে বরণের অর্ঘ্য—প্রাচীন শাস্ত্রে তাই লিখেছে।

এই বিশ্বাস আমার হয়েছে, এতগুলি বছর যে আমি বাঁচবার অধিকার পেয়েছি তার কারণ, মানুষের কাছে যাতে সশরীরে উপস্থিত থেকে এই সাক্ষ্য দিতে পারি—আমি রামকৃষ্ণকে তাঁর জীবনকালে দেখেছি, তাঁকে কথা বলতে শুনেছি এবং তাঁকে দেখেছি তাঁর মহাপ্রয়াণের পরমা শান্তির মধ্যে শয়ান অবস্থায়।

মহাকাল কিভাবে না স্থান ও পাত্রের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়! বাংলার শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অমর্যাদাকর অশালীন কথা শোনা গেছে। এহেন দাবি করা হয়েছে যে, এক বা একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে না গেলে দক্ষিণেশ্বরের সাধুর কথা কেউ জানতে পারত না। তাই যদি হয়, হায় মানবজাতি, কী দুর্ভাগ্য তার! তবে এইসব চালাকি কোন মনোযোগেরই যোগ্য নয়। পরমহংস রামকৃষ্ণের সংস্রবে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কেউই ধর্মের ইতিহাসে বা সমুচ্চ আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সমপঙ্‌ক্তির অধিকারী নন। যেসব ধনী মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন বা তিনি যাঁদের বাড়িতে গেছেন, তাঁদের কেউই মানুষের স্মরণে থাকবেন না, যদি না তাঁরা 'রামকৃষ্ণকথামৃত'-এ উল্লিখিত হয়ে থাকেন। স্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে তাঁদের অধিকাংশের নাম ইতিমধ্যেই মুছে গেছে, ধুলোয় মিশিয়ে গেছে তাঁদের ধনসম্পদ ও উপাধির সম্ভার। কেউ কেউ তাঁকে 'খ্যাপা' বলে মনে করতেন, অন্যরা নিছক কৌতূহলের বস্তু। কোথায় হারিয়ে গেছেন ঐসব লোক, আর মহাকাল মানবসমাজের মহত্তম আচার্যদের মধ্যে রামকৃষ্ণের স্থান সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেসব যুবক তাঁর সান্নিধ্যে সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিমহিমা লাভ করেছেন। আর তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও প্রশংসাপ্রাপ্ত বিবেকানন্দ অক্ষয় খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। নিজ জাতি ও তার সুপ্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে বিজয়ী মহাবীর যোদ্ধা তিনি—দেশপ্রেমিক, আচার্য এবং প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ।

রামকৃষ্ণের মতবাদের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে—সেগুলি অপর মতের সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশ করে। প্রথম ও প্রধান হলো তাঁর বিখ্যাত প্রবচন—"যত মত তত পথ"। তিনি স্বয়ং নানা ধর্মের সাধনা করেছেন। যদি তাঁকে সঠিকভাবে বুঝতে হয় তাহলে সকল ধর্মের সত্য স্বীকার করতে হবে, সকলকে শ্রদ্ধা করতে হবে, কাউকে নিন্দা করা চলবে না। প্রতিটি ধর্মমত, ধর্মবিশ্বাস ঈশ্বরের কাছে বা সত্যের কাছে পৌঁছাবার পথ। তারপর, পাপবাদ নামক দুঃখজনক মতবাদের জোরালো বিরোধিতা তিনি করেছেন। এই মতবাদ বলে—মানুষের পাপে জন্ম এবং সে পাপের উত্তরাধিকারী। রামকৃষ্ণ সেকথা মানতেনই না। তিনি সবিস্ময়ে বলতেন : ঈশ্বরের সন্তান মানুষ কিভাবে পাপসম্ভব হবে? মানুষ ভুল করার পরে যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে আর সে-কাজ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে সে ঈশ্বরের ক্ষমা পেয়ে যাবে। যে কেবল নিজেকে 'পাপী পাপী' বলে, সে পাপীই হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ আরো বলেছেন, মানুষ কেন কেবল ঈশ্বরের দয়া প্রার্থনা করে? ঈশ্বরের সন্তান সে, তাঁর ভালবাসা তো সে পাবেই। তাই 'দয়া কর, দয়া কর' বলে চেঁচাবে কেন? রামকৃষ্ণ তাঁর প্রবল ও ঐকান্তিক উপলব্ধি এবং নিরন্তর ঈশ্বরসান্নিধ্যের বিহ্বল আনন্দকে উন্মোচন করে মানুষকে ঈশ্বরের যতখানি নিকটবর্তী করতে পেরেছেন, এমনটি পূর্বে কেউ করতে পারেননি।

মানবসমাজের এই শেষ মহান আচার্যের জন্য তাঁর শিষ্য ও অনুগামীরা কোন্ স্থান নির্ধারণ করেছেন? রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণ এবং গৃহী ভক্তগণ এবিষয়ে তাঁদের চরম সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁকে 'ঈশ্বরের অবতার' মনে করেন। পৌরাণিক দশ অবতারের অতিরিক্ত এক অবতার তিনি। বাইরের মানুষের কাছে যাই হোক, ভারতবর্ষে এটা অদ্ভুত কিছু নয়। অন্য দেশের এবং অন্য ধর্মের মানুষরা, কোন একজন পৃথিবীর মানুষকে দেহধারী ঈশ্বর বলা হচ্ছে—একথা শুনলে আঁতকে উঠবে। ভারতবর্ষে তেমন হয় না।...

রামকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম, তন্ত্রধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম বলে চিহ্নিত করা যাবে।... রামকৃষ্ণ কখনো নতুন ধর্ম বা সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে চাননি।... দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণ তাঁর ঘরটি যেভাবে ছেড়ে গিয়েছিলেন, সেইভাবেই রক্ষিত আছে। দেওয়ালে টাঙানো আছে বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তকের চিত্র। এই আচার্য কিন্তু কোন নতুন ধর্মের প্রবর্তক নন। যে-সাধনা তিনি করেছিলেন, তারই শিক্ষা দিয়েছেন—সকল ধর্মমতকে শ্রদ্ধা কর।.. বহিরঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মন্দিরগুলি অন্য হিন্দুমন্দিরের মতোই। কিন্তু সেখানকার বৈশিষ্ট্য হলো—সকলেরই সেখানে প্রবেশাধিকার আছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ বোম্বাই শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে খারে রামকৃষ্ণ মিশন-আয়োজিত পরমহংস রামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। ভোর থেকেই বৈদিক স্তোত্রগীত হচ্ছিল। সন্ধ্যাকালে এক পারসী মহিলা পূজাঘরের সামনে মেঝেয় বসে সুন্দরভাবে মীরাবাঈয়ের ও অন্যান্যের ভজন গাইলেন। তার কিছু পরে বেশ বড় সংখ্যায় মানুষ

লাইব্রেরি-ঘরের মেঝেয় বসল প্রসাদগ্রহণের জন্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন গুজরাটি, দক্ষিণী, মাদ্রাজী, পারসী, বাঙালী, ইংরেজ এবং আমেরিকান—নর ও নারী। প্রসাদগ্রহণ শেষ হয়েছে কিনা হয়েছে, এক ভারতীয় নারী ভরা গলায় গভীর আবেগের সঙ্গে গেয়ে উঠলেন বন্দনাসঙ্গীত। হিন্দুধর্ম, জরথুস্টধর্ম, খ্রীস্টধর্ম, বাহাইধর্ম—এইসকল ধর্মের মানুষ সেখানে উপস্থিত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটি আমার কাছে রামকৃষ্ণের বিশেষ জীবনোদ্দেশ্যের তাৎপর্যবাহী বলে মনে হলো। এখানে ঘটেছে সর্বধর্মের সমাবেশ—প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে উপস্থিত। "যত মত তত পথ"-বাহী সেইসব মানুষেরা। নাম বহু, কিন্তু সত্য এক। এই হলো ধর্মক্ষেত্রে গণতন্ত্র, প্রত্যেকের সমমর্যাদা, প্রত্যেকের সমানাধিকার।

ভারত যেন বৃথা 'গর্বিত' নয়—গভীরভাবে 'কৃতজ্ঞ' হয় এই মনে করে যে, সে সর্বশেষ প্রফেটের জন্ম দিতে পেরেছে, যাঁর দৃষ্টির দূরপ্রসার, বিশ্বাসের সার্বভৌমিকতা, এবং ঈশ্বরোপলব্ধির প্রগাঢ় প্রত্যক্ষতা সমগ্র বিশ্বের কাছে পরমাশ্চর্য সঙ্ঘটন বলে প্রতীয়মান। পরমহংস রামকৃষ্ণের 'কথামৃত'-এর গভীরতর এক তাৎপর্য আছে। তা ভারতীয় মনন ও প্রজ্ঞার মূলদেশকে আরো গভীর ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। তা দেখিয়েছে, কিভাবে কেবল অধ্যাত্মশক্তি তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পারে ধনসম্পদ, পুঁথিগত বিদ্যা এবং সামাজিক প্রতিপত্তিকে। এই অধ্যাত্মশক্তিই নানা আকারে অভিব্যক্ত হয়ে ভারতের চরম ও পরম ত্রাণ ও মুক্তি ঘটাবে। পাশ্চাত্য যেখানে বাদ-বিসংবাদ, সন্দেহ-সংশয় এবং অবিরাম যুদ্ধ-সম্ভাবনায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, ভারত সেখানে বিশ্বাস ও ত্যাগের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎকে দৃঢ় করে তুলছে।* □

পাদটীকা

১ শ্রীকৃষ্ণকে কি পৌরাণিক যুগের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে? গীতার শ্রীকৃষ্ণকে? তিনি কি পৌরাণিক যুগের পূর্ববর্তী কালে অবতীর্ণ হননি? স্বামীজী তাঁর 'পারি প্রদর্শনী' রচনায় 'শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধ-পূর্ববর্তিত্ব' সম্বন্ধে বলেছিলেন। বেট দ্বারকা অঞ্চলে সমুদ্রমধ্যে উৎখননাদি থেকে যেসব নতুন উপাদান পাওয়া যাচ্ছে, সে-সকল স্বামীজীর মতে যৌক্তিকতার নির্দেশক।—অনুবাদক

২ বৃন্দাবনের গোপেশ্বর শিব বিখ্যাত। এছাড়া বৃন্দাবনের কাত্যায়নী-মন্দিরও সুবিখ্যাত।—অনুবাদক

৩ এক্ষেত্রে ভিন্ন মতও আছে। তবে প্রকৃত ঘটনা হলো 'রামকৃষ্ণ' তাঁর পারিবারিক সূত্রেই প্রাপ্ত নাম। কারণ তাঁদের পরিবারে 'রাম'-যুক্ত নাম রাখার যুক্তি ছিল।—অনুবাদক

* ৯৮ বর্ষ, ২ সংখ্যা

স্বদেশী সমাজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌদ্ধ পরবর্তী হিন্দুসমাজ আপনার যাহা কিছু আছে ও ছিল, তাহাই আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষকে আপনার একটি মহৎপদ হারাইতে হইয়াছে। একসময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল; ধর্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত, সকলদিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশসকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল, তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে—আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্রযাত্রা আমরা সকল দিক দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি—কি জলময় সমুদ্র, কি জ্ঞানময় সমুদ্র! আমরা ছিলাম বিশ্বের, দাঁড়াইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্য সমাজে যে ভীরু স্ত্রীশক্তি আছে, সেই শক্তিই, কৌতূলহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্যলাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ স্ত্রৈণপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলঙ্কারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা খোয়া যাইতেছে, তাহা খোয়াই যাইতেছে।

বস্তুত এই গুরুর পদই আমরা হারাইয়াছি। রাজ্যেশ্বরত্ব কোনকালে আমাদের দেশে চরমসম্পদ রূপে ছিল না—তাহা কোনদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই—তাহার অভাব আমাদের দেশের প্রাণান্তকর অভাব নহে। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার—অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণের আধার ছিল। যখন হইতে আচারপালনমাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ করিল—যখন হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্যাদা বিস্মৃত হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলেই আপনাদিগকে শূদ্র অর্থাৎ অনার্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না—সমাজকে নব নব তপস্যার ফল, নব নব ঐশ্বর্য বিতরণের ভার যে ব্রাহ্মণের ছিল, সেই ব্রাহ্মণ যখন আপন যথার্থ মাহাত্ম্য বিসর্জন দিয়া সমাজের দ্বারদেশে নামিয়া আসিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভারগ্রহণ করিল—তখন হইতে আমরা অন্যকেও কিছু দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল, তাহাকেও অকর্মণ্য ও বিকৃত করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কি উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোন জাতি হারায়, তখন হইতেই সে বিরাটমানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় কেবল ভারস্বরূপে বিরাজ করে। বস্তুত কেবল টিঁকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত-চীন-জাপান অভ্যাগত ইউরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বারবাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই—সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়।

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা যখন আপনার সমস্ত পুঁটলি-পাঁটলা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরেজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরেজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্রবেড়া অনেক স্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়মুড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য! এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে দুইটা জিনিস আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কি আশ্চর্য শক্তি ছিল, তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কি আশ্চর্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা, চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। ইংরেজ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই—যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া কেবল 'গেল গেল' বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোন ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরেজের অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা, তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরেজ হইতে পারিব না, নকল ইংরেজ হইয়াও আমরা ইংরেজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা, তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণভাবে, হইয়া উঠা।

আমাদের যে-শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশে তাপসেরা তপস্যাদ্বারা যে-শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহামূল্য,

বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না—সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোন সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সঙ্ঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীস্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না—তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।* □

* ৬ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব*

সৈয়দ মুজতবা আলী

ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোন সভ্য জাতির বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কিংবা অন্য কোন বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচর্চা না থাকে তবে সে সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পার্বণ নিয়েই মত্ত থাকে। এই তত্ত্বটি ভারতবাসীর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ, তারা স্বভাবত এবং ঐতিহ্যবশত ধর্মানুরাগী। তার কোন বোধ্য ভাষাতে সত্যধর্মের মূলস্বরূপ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ না থাকলে সে তখন সবকিছু হারাবার ভয়ে ধর্মের বহিরাচরণ অর্থাৎ তার খোলস ক্রিয়াকর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।[১]

কলকাতা অর্বাচীন শহর। যেসব হিন্দু এ শহরের গোড়াপত্তনকালে ইংরেজের সাহায্য করে বিত্তশালী হন, তাঁদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোন চর্চা ছিল না। বাঙলা গদ্য তখনো জন্মলাভ করেনি। কাজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যে তাঁরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবেন তারও কোন উপায় ছিল না। ওদিকে আবার বাঙালী ধর্মপ্রাণ। তাই সে তখন কলকাতা শহরে পাল-পার্বণে যা সমারোহ করল তা দেখে অধিকতর বিত্তশালী শাসক ইংরেজ-সম্প্রদায় পর্যন্ত স্তম্ভিত হলো। এর শেষ-রেশ 'হুতোমে' পাওয়া যায়।

জাতির উত্থান-পতনেও এ অবস্থা বারবার ঘটে থাকে। এবং সমগ্রভাবে বিচার করতে গেলে তাতে করে জাতির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। গরিব-দুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের জন্য এর একটা অর্থনৈতিক মূল্য তো আছে বটেই, তদুপরি এক যুগের অত্যধিক পাল-পার্বণের মোহকে পরবর্তী যুগের ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণা অনেকখানি ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন ঐ ক্রিয়াকর্মের যুগে হঠাৎ এক বিদেশী ধর্ম এসে উপস্থিত হয়, তার চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আন্দোলন-আলোড়ন নিয়ে। এবং এই ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক (কোঁৎ, মিল ইত্যাদি) প্রশ্নের যুক্তিতর্কমূলক আলোচনা-গবেষণা বিজড়িত থাকে তবে ক্রিয়াকর্মাসক্ত সমাজের পক্ষে তখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। বাঙালী সমাজের অগ্রণীগণ ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে অনেকখানি ইংরেজী শিখে ফেলেছেন এবং খ্রীস্টধর্মের মূলতত্ত্ব, তার মহান আদর্শবাদ, সেই ধর্মে অনুপ্রাণিত মহাজনগণের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা তাঁদের মনকে বারবার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে—তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমাদের ধর্মে আছে কি, আছে তো শুধু দেখতে পাই অন্তঃসারশূন্য পূজা-পার্বণ, আর ওদের ধর্মে দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের হৃদয়দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে পেলে এই অর্থহীন জীবন আপন

---

* দৈনিক বসুমতী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬১

চরম মূল্য লাভ করে, দুঃখ-দৈন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এক পরম পরিসমাপ্তিতে অনন্ত জীবন লাভ করে।

হিন্দুশাস্ত্রের অতি সামান্য অংশও যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, এসব কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। বস্তুত জীবনসমস্যা ও ধর্মে তার সমাধান এই অবলম্বন করেই আমাদের সর্বশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের অন্তঃহীন প্রলোভন, অন্য দিকে সত্যনিষ্ঠার প্রতি ধর্মের কঠোর কঠিন আদেশ—এ-দুয়ের মাঝখানে মানুষ কি প্রকারে সার্থক গৃহী হতে পারে, সেই পন্থাই তো আমাদের শাস্ত্রকারগণ যুগে যুগে দেখিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এসব তত্ত্ব যাঁরা জানতেন তাঁরা থাকতেন গ্রামে, তাঁরা পড়তেন পড়াতেন টোল চতুষ্পাঠীতে এবং তাঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেননি বলে ওদের ধর্ম যে নাগরিক হিন্দুকে নানা প্রশ্নে বিচলিত করে তুলেছে সে সংবাদও তাঁদের কানে এসে পৌঁছায়নি।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য, এইসব 'টোলে' 'বিটেল বামুন'রা যে শুধু পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আপন ধর্মের মর্যাদা মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারত তা নয়, তারা যে কান্ট-হেগেলের চেলাদের সঙ্গে বিশুদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল—এ তত্ত্বটিও নাগরিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। 'ঘরের কাছে নিই নে খবর, খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর'—লালন ফকিরের অর্থহীন গীত নয়।[২] এঁরা সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে শুধু স্মার্ত নন, নৈয়ায়িকও ছিলেন এবং স্মার্তরাও যে শুধু তৈলবট নিয়ে বিধান দিতেন তাই নয়, তাঁরা সে-বিধানের সামাজিক মূল্যও যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারতেন।

কলকাতায় চিন্তাশীল গুণিজন তখন এই পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এইসময় রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হয়। তাঁর ব্রাহ্ম-আন্দোলন যে বাঙালীজাতির কি পরিমাণ উপকার করেছে, এই ব্রাহ্মসমাজের কীর্তিমান পুরুষসিংহ রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যকে যে কি পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী ও বহুমুখী করে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ এখনো শেষ হয়নি। বাঙালী সাধক, বাঙালী লেখক, বাঙালী পাঠক সকলেই যে-কথা স্বীকার করেছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন :

"এদানির ব্রাহ্মধর্ম যার ছড়াছড়ি।
তারেও বারবার নমস্কার করি।।"

'ছড়াছড়ি' শব্দে তখনকার দিনে প্রচলিত একটু ক্ষুদ্র তাচ্ছিল্য লুকানো রয়েছে। পরমহংসদেব সেটিকেও 'নমস্কার' করেছেন।

রাজা রামমোহন খ্রীস্টধর্মে মহাপণ্ডিত ছিলেন, মুসলমান ধর্মের 'জবরদস্ত মৌলবী' ছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, সে-যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে যে-বস্তু সম্পূর্ণ অবান্তর এমনকি অন্তরায়, সেই হিন্দুধর্মশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

রাজা জানতেন, সে-যুগের হিন্দুকে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে। অর্থাৎ খ্রীস্টান মিশনারীর সামনে 'ক' অক্ষরে 'কৃষ্ণনাম' স্মরণে 'একঘটি'[৩] চোখের জল ফেললেই আপন ধর্মের মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে

না—খুব বেশি হলে, ভদ্র মিশনারী হয়তো তাকে ভক্ত বলে স্বীকার করবে মাত্র। তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের পিছনে রয়েছে, হিন্দুর ষড়দর্শন, বুদ্ধ এবং মহাবীরের বিশ্বপ্রেম এবং সর্বপশ্চাতে রয়েছে অহরহ জাজ্বল্যমান বেদবেদান্তের অখণ্ড দিব্যদৃষ্টি।

দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হিন্দুধর্মের নব উন্মাদনা আনতে হলে রাজা রামমোহন হিন্দুধর্মের কোন্ কোন্ সম্পদ গ্রহণ এবং প্রচার করতেন সেকথা বলা শক্ত; কিন্তু এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সে-যুগের কলকাতাবাসী সুসভ্য অথচ আপন শাস্ত্রে অজ্ঞ হিন্দুর সামনে তিনি সর্বশাস্ত্র মন্থন করে উপনিষদগুলিই তুলে ধরে প্রকৃত ঋষির গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। উপনিষদ্ থেকেই শঙ্কর-দর্শনের সূত্রপাত এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অতিশয় অক্লেশে, পরম অবহেলায় খ্রীস্টানের ট্রিনিটিকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করতে পারে। উপনিষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম রচনার উদ্দেশ্য নহে—অনুসন্ধিৎসু পাঠক তুর্কি পণ্ডিত আলবিরুনি, মোঘল সুফি দারাশিকো (ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)[৪] এবং জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের রচনাতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাবেন।

ধর্মের যেসব বাহ্যানুষ্ঠান সত্যধর্ম থেকে অতি দূরে চলে গিয়ে অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে এবং সে-সংগ্রামের জন্য তিনি অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করলেন হিন্দু স্মৃতি থেকেই! এস্থলে রাজা বিশ্বজনীন যুক্তি-তর্ক ব্যবহার না করে প্রধানত ব্যবহার করলেন হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ন্যায় এবং উদাহরণ। রাজা প্রমাণ করলেন যে তিনি দর্শনে যেরকম বিদগ্ধ, ক্রিয়াকর্মের ভূমিতেও অনুরূপ স্মার্ত মল্লবীর।

শাস্ত্রালোচনায় ঈষৎ অবান্তর হলেও এস্থলে বাঙলা সাহিত্যানুরাগীর দৃষ্টি তার অতি প্রিয় একটি বস্তুর দিকে আকর্ষণ করি। রাজাকে তাঁর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল কলকাতার বাঙালীদের ভিতর। এঁরা সংস্কৃত জানেন না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয়েছিল বাঙলা ভাষাতে। পদ্য এসব যুক্তি-তর্কের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বাহন। তাই তাঁকে বাঙলা গদ্য নির্মাণ করে তারই মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে যে বাঙলা গদ্য লেখা হয়নি, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু হিন্দুধর্মের এই তুমুল আন্দোলন আকর্ষণ মন্থনের ফলে যে-অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা গদ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এ-জাতীয় ঘটনা বহুবার ঘটেছে; তথাগতের কৃপায় পালি, মহাবীরের কৃপায় অর্ধ-মাগধী, মহম্মদের কৃপায় আরবী গদ্য, লুথারের কৃপায় জার্মান গদ্যের সৃষ্টি। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শাস্ত্রালোচনা না থাকলে ক্রিয়াকর্মের আত্যন্তিক প্রসার পায়, তার বিরুদ্ধে নবধর্ম পত্তন কিংবা সনাতন ধর্মের সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়;[৫] এবং সে-আন্দোলনকে বাধ্য হয়েই গণভাষার আশ্রয় নিতে হয়।

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করার ফলে কতকগুলি জিনিস সে অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা। দ্বিতীয়, বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ; এবং ক্রমে ক্রমে গণ-ধর্মের (Folk

religion) প্রতি ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হতে লাগল।[৬] প্রমাণ স্বরূপ বলতে পারি, তখনকার দিনে কেন আজো যদি কেউ ব্রাহ্ম-মন্দিরের বক্তৃতা দিনের পর দিন শোনে তবু সে উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্মসাধনার অল্প ইঙ্গিতই শুনতে পাবে। তার মনে হবে উপনিষদ্-আশ্রিত ধর্মদর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোনপ্রকারের উন্নতি করতে পারেননি। এমনকি গীতার উল্লেখও আমি অল্পই শুনেছি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কথা প্রায় কখনোই শুনিনি। বৃন্দাবনের রসরাজ-রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের কাহিনী থেকে কোন ব্রাহ্ম কখনো কোন দৃষ্টান্ত আহরণ করেননি।

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাহ্মদের নিকট অকৃতজ্ঞ নই। পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন তাই বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন করছি, আমি মুসলমান, আমার কাছে হিন্দু যা ব্রাহ্মও তা, আমি হিন্দু-ব্রাহ্ম উভয় পন্থার (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সন্তদের বারবার নমস্কার করি।

ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাঁদের ভিতর ছিল না। এযুগেও তার উদাহরণ পাইনি। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত আমি বহু ব্রাহ্ম পরিবারের আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে গভীর হৃদ্যতা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্রাহ্ম পরিবারে হিন্দু চাকর-বাকরকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা দেখিনি। মুসলমান-খ্রীস্টানরা সর্বদাই করে থাকেন বলেই এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র সর্বজনীন—কিন্তু একথাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মজ্ঞানীরা যেকোন কারণেই হোক সর্বজনকে আহ্বান জানাতে পারেননি। মুসলমানের নমাজে মুটে-মজুর চাকর-বাকরের সংখ্যাই বেশি, হিন্দুর সঙ্কীর্তনে ভাবোল্লাসে নৃত্য করে 'নিম্নশ্রেণী'র প্রচুর হিন্দু, আর মন্দিরে আরতির সময় শিক্ষিত হিন্দুকে তো আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসম্মেলনে ব্রাহ্ম চাকর-নফর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তার জন্য আমি ব্রহ্মবাদীদের আদৌ ত্রুটি ধরছি না। এঁরা অক্ষম ছিলেন, একথা আমি কখনো স্বীকার করব না। আমার মনে হয়, এঁরা প্রধানত সমাজের নেতৃস্থানীয় নিয়েই আপন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে যে আমাদের মতো বহু হিন্দু-মুসলমান প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন সেবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, হিন্দুধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তার জন্য ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে; দোষ হিন্দুদের। তাঁদের নেতৃস্থানীয়েরা তখন হয় দীক্ষা নিয়েছেন, কিংবা ব্রাহ্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপন গরিব জাত-ভাই কি ধর্মকর্ম করছে এবং তার কল্যাণে সত্যধর্মের সন্ধান পাচ্ছে কিনা এবিষয়ে তাঁরা তখন উদাসীন। যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিতজনেরই শাস্ত্রাধিকার।

অতিশয় মারাত্মক পরিস্থিতি। দেশের দশের তাহলে সর্বনাশ হয়। শিক্ষিতজনকেও শেষ পর্যন্ত তার তিক্ত ফল আস্বাদন করতে হয়।[৭]

ঠিক এইসময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব।

পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণভাবে ধারণা করা আমাদের মতো অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, আমরা সবকিছুই গ্রহণ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে—যুক্তি-তর্কের ছাঁচে ফেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সাধু-সন্তদের ধারণা করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই অতি অল্প অংশটুকুর খবর, যেটি জলের উপর ভাসছে। অর্থাৎ বেশির ভাগ বস্তুটি যে ষষ্ঠেন্দ্রিয় তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই। তৎসত্ত্বেও যারা তার বিচার করে তাদের নিয়ে মৃদু হাস্য করে বাউল গেয়েছেন ঃ

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরি
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি আ মরি।

যার যেমন মাপকাঠি। সেকরার ক্রাইটেরিয়ন তার নিকষ পাথর। সে তাই দিয়ে পদ্মফুলের গুণ বিচার করতে যায়। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং পরমহংসদেব—একাধিক বার। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমেছিল তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে না যেতেই সে গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল।[৮]

তাই নিয়ে কিন্তু কিছুমাত্র শোক করার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবই বলেছেন, তোমার একঘটি জলের দরকার। পুকুরে কত জল তা জেনে তোমার কি হবে?[৯]

তাই মা ভৈঃ! যারা বলে আমাদের মতো পাপীতাপীর অধিকার নেই পরমহংসের মতো মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার—তারা ভুল বলে। অধিকার আমাদেরই—এক মহাপুরুষ অন্য মহাপুরুষের জীবনী লিখতে যাবেন কেন? সে অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হলে মহাত্মাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হীনপ্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে, লোকটি কী সরল! এগিয়ে এলে বোঝা যায় এঁর বাহির-ভিতর দুই-ই সরল। এঁর শরীরটি যেমন পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমনি পরিষ্কার। মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে 'নিখিরকিচ'—চাঁচাছোলা। যেন এইমাত্র তৈরি হয়েছে কাঁসার ঘটিটি—কোন জায়গায় টোল পড়েনি।

এঁর মতো সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলেনি। এঁর ভাষার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য খ্রীস্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গির। আমাদের দেশের এক আলঙ্কারিক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন, এর অর্থ উপমামাত্রই কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে হয়, উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার ানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো ব .ব্যর অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোন বাছ-বিচার ছিল না। ইংরেজীতে একটা

প্রবাদ আছে, 'তার জাঁতায় যাই ফেল না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।' পরমহংসের বেলায়ও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হলো। সময়মতো ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমনকি, যেসব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু-কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরনের 'বেগে'র প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটির উল্লেখ এখানে না-ই বা করলুম।

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাব। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক রিলিজিয়ন), আচার-ব্যবহার, ভাষা—সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গি সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায় অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না। কিন্তু যেখানে শুধুমাত্র রুচির প্রশ্ন সেখানে তিনি 'ধোপদুরস্ত' 'ফিটফাট' হবার কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভাষাতে সেদিনকার 'ছুঁৎবাই' রোগ আমরা পেয়েছিলুম ভিক্টোরিয় পিউরিটানিজম থেকে। তখন কে জানত পঞ্চাশ বছর যেতে-না-যেতেই লরেন্স জয়েস এসে আমাদের ছুঁৎবাইয়ের 'ভণ্ডামি' লণ্ডভণ্ড করে দেবেন।[১০]

পরমহংসদেব গণধর্ম স্বীকার করে তার চরম মূল্য দিলেন। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সেই সাকারের পূজা করে প্রধানত কালীরূপে। কালীমূর্তি দেখতে অ-হিন্দু রীতিমত ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই কালীকে স্বীকার করলেন। অথচ 'দূরের কথা' বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে, পরমহংসদেব আসলে বেদান্তবাদী। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এ-তিন মার্গ তিনি অবস্থাভেদে একে-ওকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু সবকিছু বলার পর তিনি সর্বদাই বলেছেন : "কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সবকিছু মিথ্যা বলে অনুভব করতে পারনি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারবে না।" 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

"কিরকম জানো, যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকি থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকি থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি', 'তুমি', 'জগৎ' এসবের খবর থাকে না।"

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলছেন, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী'। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই ? যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে দুলছে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপে চিন্তা করবে।[১১] আরেকটা কথা—তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস কর কিন্তু মতুয়ার (dogmatism) বুদ্ধি কর না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বল না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বল আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।[১২]

জনগণপূজ্য শক্তির সাকার-সাধনা ('পৌত্তলিকতা' শব্দটা সর্বদা বর্জনীয়—এটাতে তাচ্ছিল্য এবং ব্যঙ্গের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরমহংসদেব তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন বটে, কিন্তু প্রশ্ন—জড়সাধনার অন্ধকার দিকটা কি তিনি লক্ষ্য করলেন না?

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব। এই সাকার-সাধনার পশ্চাতে যে জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় ব্রহ্মের বিরাট মূর্তি অহরহ বিরাজমান, পরমহংসদেব বারবার সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ভারসাম্যই ব্রহ্মজ্ঞানী কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ এবং তাঁদের শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তিনি যদি 'মতুয়া' কালীপূজক হতেন তবে তিনি পরমহংস হতেন না।

বস্তুত একটি চরম সত্য আমাদের বারবার স্বীকার করা উচিত। যেখানেই যে মানুষ যেকোন পন্থায় ভগবানের সন্ধান করেছে তাকেই সম্মান জানাতে হয়। এমনকি ক্ষুদ্র শিশু যখন সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করে (হায়, কলকাতার সরস্বতীপূজার বাহ্য আড়ম্বর দেখে অনেক সময় মনে হয়, এরাই বুঝি এযুগে দেবীর একমাত্র সাধক) তাকেও মানতে হয়—গাছের পাতা, জলের ফোঁটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় তারও বিলক্ষণ মূল্য আছে। গীতাতে এ সত্যটি অতি সরল ভাষায় বলা হয়েছে।

কিন্তু সাকার-নিরাকার নিয়ে আজ আর তর্ক করে লাভ কি? বাংলাদেশে আজ আর কজন লোক নিরাকার পূজা করেন তার খবর বলা শক্ত—কারণ সে-পূজা হয় গৃহকোণে, নির্জনে। আর কলকাতায় বারোয়ারি সাকার পূজার যা আড়ম্বর তা দেখে বাংলার কত গুণিজ্ঞানী যে বিক্ষুব্ধ হন তার প্রকাশ খবরের কাগজে প্রতি বৎসর দেখি। এইমাত্র নিবেদন করেছি, এরও মূল্য আছে—তাই আমার এক জ্ঞানী বন্ধু বড় দুঃখে বলেছিলেন, 'কিন্তু কি ভয়ঙ্কর স্ট্রেন করে এস্থলে সে সত্যটি স্বীকার করি।'

সাকার-নিরাকারের আধ্যাত্মিক মূল্য যা আছে তা আছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সমাধানের সামাজিক মূল্য কি?

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম সকলেই বাঙালী সমাজে সমান অংশীদার। এঁদের ধর্মাচরণ যা-ই হোক না কেন, সমাজে তাঁরা মেলামেশা করেছেন অবাধে। একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এই সহজ মেলামেশা না থাকলে খ্রীস্টান মাইকেল, মুসলমান মুশররফ হসেন, নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দিন বাংলা কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। সমঝদার ও রসিকজনের গুণগ্রাহিতা ও উৎসাহ লাভ না করে কম কবিই এ-সংসারে সার্থক কাব্যসৃষ্টি করতে পেরেছেন। এবং এঁদের সকলেরই উৎসাহী পাঠক এবং গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন প্রধানত হিন্দুরাই।[১৩]

আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যেকোন মতবৈষম্যের ফলে যদি ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায় একই সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গ ভাব বর্জন করেন তবে সেই অখণ্ড, সমগ্র সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি—'মহতী বিনষ্টি' হয়; এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সে-যুগে কয়জন গুণী সচেতন ছিলেন? মুসলমান সাকার মানে না, কিন্তু তাই বলে তো সেযুগে বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মিলনে ক্ষুণ্ণ হয়নি? তবে কেন ঐ কারণেই ব্রাহ্মে হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি বন্ধ হবে?

পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্মূল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেননি। তাই বারবার দেখি, তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বারবার দেখি, তিনি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে, বলছেন, কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের 'কালী-কাল্টে কনভার্ট' করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন, এদের বিরোধ যেন লোপ পায়।[১৪]

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্দ্ব অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের।

সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন পুরুষ যে তার অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অচেতন থাকবেন এ কখনোই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আবার অন্য সত্যও সর্বজনবিদিত—কামিনী-কাঞ্চনে পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তার থেকেই ধরে নিতে পারি, অর্থ-সমস্যা আপন সত্তায় (purse) তাঁর সামনে উপস্থিত হয়নি। যারা মুখ্যত অর্থ কামনা করে, রামকৃষ্ণদেব তো তাঁদের উপদেষ্টা নন। যাঁরা মুখ্যত ধর্মজিজ্ঞাসু অথচ অর্থসমস্যায় কাতর তিনি তাঁদের সে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন। যে যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছে ততখানি উপকার পেয়েছে।

রামকৃষ্ণদেব বহুবার বলেছেন, "কলিকালে মানবের অন্নগত প্রাণ।" এর অর্থ আর কিছুই নয়—এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোষণনীতির শোচনীয় পরিণাম বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে অন্য কোন চিন্তার স্থান আর তার মস্তকে নেই। তবু যাঁরা ধর্মে অনুরক্ত তাঁরা বারবার পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছেন, 'উপায় কি'?

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। তাহলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে পারি যে জগৎ মায়া মিথ্যা অনুমিত হলেই অর্থের প্রয়োজন আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, পাখির মতো, দাসীর মতো সংসারের কাজ করে যাবে, কিন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ের তলায়। অর্থাৎ কলিযুগে সমাজের সে স্বচ্ছলতা নেই যে তোমাকে অন্ন জোটাবে আর তুমি নিশ্চিতমনে জ্ঞানমার্গে আপন মুক্তির সন্ধান পাবে। কলির মানুষের কর্ম থেকে মুক্তি নেই।

ওদিকে যেসব ব্রাহ্ম ভক্তের অর্থাভাব ছিল না—যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের তপস্বী তাঁদের বারবার বলেছেন, ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাক। কলিযুগে ভক্তি ভিন্ন গতি নেই।

আর সকলকেই একথা বলেছেন, এই জন্মেই যারা সাধনার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছাতে চায়—রাখাল, নরেন্দ্রের মতো যারা জন্মাবধি জীবন্মুক্ত তাদের কজন বাদ দিলে আর কটি প্রাণী সে স্তরে পৌঁছাতে পারবে সেবিষয়ে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ ছিল—তাদের হতে হবে নিরঙ্কুশ জ্ঞানমার্গের সাধক। শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্যবস্তু কিছুই নেই।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। একথা স্বীকার করেও যদি দম্ভভরে কিছু বলি, তবে বলব, যে-সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনি সমগ্র পুরুষ—পরম পুরুষ। কোন মহাপুরুষকে যদি দম্ভভরে যাচাই করতে যাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়ের সন্ধান করব। তার কারণ গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোন চতুর্থ পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। এ-তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তাঁর নাম

যে-পাঠক ধৈর্য সহকারে আমার প্রগলভতা এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি কৌতূহলবশত স্বতঃই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ তো হলো মানুষের সংসর্গে আগত সমাজে সমুজ্জ্বল রামকৃষ্ণদেব। কিন্তু যেখানে তিনি একা—তাঁর সাধনার লোকে তিনি কতখানি উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাঙলায়, 'তিনি কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছিলেন?'

এর উত্তরে বলব, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার আমাদের কারোরই নেই। এ-প্রশ্নের উত্তর জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। রামকৃষ্ণের সমকক্ষজনই এর উত্তর দিতে পারেন।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঃ "সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর পরও কোন কোন মানুষ লোকহিতার্থে এ-সংসারে ফিরে আসেন। যেমন নারদ শুকদেবাদি।" একথা ভুললে চলবে না।

স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি, একথাটি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। লোকহিতার্থে তিনি যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণ করে যান, এরকম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রভু তথাগতের পর এযাবৎ কেউ নির্মাণ করেননি।

এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে ফিরে যাই।

পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গের সমন্বয় করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গির মতো পরে 'আল্লা-আল্লা'ও করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো খ্রীস্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে-কথাও তো জানি। এসবের প্রতি তাঁর অনুরাগ এল কোথা থেকে? বিশেষত যখন একাধিকবার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব কায়মনোবাক্যে সেই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন।

অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সমূলার দেখিয়েছেন ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি গাহেন তখন তিনি বলেন ঃ "হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।"

আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও তাই—"হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।" অর্থাৎ ঋষি যখন যে-দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই তাঁর কাছে পরমেশ্বররূপে দেখা দিয়েছেন। এ-সাধনা বহু-ঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সমূলার এর নতুন নাম করেছিলেন, 'হনোথেয়িজম'।

পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পন্থাই বরণ করে ছিলেন অর্থাৎ সনাতন আর্যধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্মত পন্থা বরণ করেছিলেন। তিনি যখন বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সবকিছু আবার যখন 'আল্লা আল্লা' করেছেন তখন আল্লাই পরমাত্মা।

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সর্বধর্ম সমন্বয় করতে পেরেছিলেন।

কোন বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষ, অভ্রান্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অন্য সবকিছুর অবহেলা করেননি।

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে করে না।

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এ-যুগের হিন্দু সম্বন্ধে একথা হয়তো খাটে। তাই পরমহংসদেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সনাতন আর্যধর্ম এ পন্থা কখনো গ্রাহ্য করেনি।

সত্য সর্বত্র বিরাজমান—ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে বাঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে।* □

পাদটীকা

১ বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ আছে, শাক্যমুনির আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল। বৈদিক ভাষা তখন প্রায় অবোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই ক্রিয়াকর্ম-যাগযজ্ঞ-পশুহত্যা তখন সত্যধর্মের স্থান অধিকার করে বসেছিল। বুদ্ধদেব তখন এরই বিরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রচার করেন ও সর্বজনবোধ্য লোকায়ত প্রাকৃত (পরে পালি নামে পরিচিত) ভাষায় শরণ নেন।

২ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাওয়া গান এরই কাছাকাছি ঃ

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩)

৩ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় কথার আড়

৪ দারা তাঁর অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এই বলেঃ "হে প্রভু, তুমি তোমার সুন্দর মুখ কুফ্‌র (অবিদ্যা) কিংবা ইমান (বিদ্যা) দুপাশের কোন অলকগুচ্ছ (জুল্‌ফ দিয়ে) ঢেকে রাখোনি।" এই শ্লোক ঈশোপনিষদের 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।'-রই অনুবাদ।

৫ বস্তুত, সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম পৃথিবীতে কোন মহাপুরুষ কখনোই আরম্ভ করেননি। বুদ্ধদেব বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন, মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর বা জিন। খ্রীস্ট বলেন, তিনি বিধির বিধান ভাঙতে আসেননি—তিনি এসেছেন তাকে পূর্ণরূপ দান করতে। মহম্মদ বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু সহস্র পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুত এঁদের কেউ বলেননি, আমি প্রথম। প্রায় সকলেই বরঞ্চ বলেছেন, আমিই শেষ।

৬ একটা অবিশ্বাস্য গল্প শুনেছি, কোন ব্রাহ্মভক্ত নাকি কদম্বতরুকে 'অশ্লীল বৃক্ষ' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এর থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা যায়, হিন্দুরা ব্রাহ্মদের 'গোঁড়ামি' সম্বন্ধে তখনকার দিনে কি ধারণা পোষণ করতেন।

৭ রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের ব্যবধানের জন্য আমরা যে কি কর্মফল ভোগ করেছি, সে তথ্যের উত্থাপন এস্থলে অবান্তর।

৮ আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। বাউল গেয়েছেন, 'যে জন ডুবল, সখী, তার কি আছে আর বাকি গো?' ঠাকুরও প্রায়ই গাইতেন ঃ 'ডুব, ডুব, ডুব'।

৯ এক চীনা সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, 'মাই কাপ ইজ স্মল; বাট আই ড্রিঙ্ক অফনার।'

১০ বিদ্যাসাগর মহাশয় এ-দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে দুরকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। 'সীতার বনবাসে'র ভাষা সকলেই চেনেন, কিন্তু যেখানে তিনি রামা-শ্যামাকে বিধবা বিবাহের শত্রুদের বিপক্ষে খেপাতে চেয়েছেন, সেখানে 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই বেনামীতে 'ফাজিল-চালাক', 'দিলদরিয়া তুখোড় ইয়ার', 'তার একটি বেদড়া মন্ত্রী আছে—এটি তারই ত্যাঁদড়ামি', 'লোকটা লক্ষ্মীছাড়া বক্কেশ্বর আনাড়ির চূড়ামণি বে-অকুফের শিরোমণি'। ইত্যাদি 'গ্রাম্য' বাক্য পরমানন্দে ব্যবহার করেছেন। তিনি যেসব আদিরসাত্মক গল্প ছাপায় (!) প্রকাশ করেছেন সেগুলো সমাজে বললে এখনো সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

১১ শক্তিকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানারূপ কল্পনা করেছেন। কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম।

মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়।
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

ইংরেজীতে এর প্রথম ছত্র "The Stars are blotted out!"—আশ্চর্য বোধহয় রবীন্দ্রনাথও অতি বাল্যবয়সে (১৪?) কালী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

১২ ডগম্যাটিজম না করে মনকে খোলা এবং জানা-অজানার মাঝখানেই যে সত্য পন্থা এর উৎকৃষ্ট প্রকাশ কেনোপনিষদে :

'নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥'

"আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি, অর্থাৎ 'জানি না' ইহাও মনে করি না, এবং 'জানি' ইহাও মনে করি না। 'জানি না যে তাহাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে'—আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।"—গম্ভীরানন্দ, চতুর্থ পাদটীকা পুনরায় দ্রঃ।

১৩ পূর্ববর্তী যুগে পরাগল, ছুটি খাঁর মতো মুসলমান গুণগ্রাহী ছিলেন বলেই হিন্দুরা মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন; পরবর্তী যুগে হিন্দু সমঝদার ছিলেন বলেই সৈয়দ মরতুজা প্রমুখ বহুতর মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণ সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তিকা দ্রঃ।

১৪ এবিষয়ে পরমহংসদেব কতখানি 'নাছোড়বান্দা' ছিলেন তার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাবেন, ['কথামৃত'এর] অনিল গুপ্ত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ ভাগে। পাঠক তখন 'নাছোড়বান্দা'র সত্য প্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন।

* ৫৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা

সমাজ সংস্কারে শ্রীসারদাদেবী

রওশন আরা ফিরোজ**

শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর অসীম প্রেম, প্রজ্ঞা, মাধুর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারীত্বের এক অন্যতম আদর্শ যা পতিপ্রেমের ক্ষুদ্র গণ্ডি ও সংসারের সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে এক সর্বজনীন সখ্যতা বা বিশ্বপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সিস্টার নিবেদিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ "মেয়েদের যেটা ইমোশন সেটা যদি শুধু ইমোশনই হয় তবে তা অতি সহজেই বিকৃত হয়। কিন্তু তার মধ্যে যদি একটি চরিত্র থাকে তবেই হয় তার সত্য প্রতিষ্ঠা... বিদেশী মেয়েরা তাদের ভালাবাসা প্রতিষ্ঠা করে কাজের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে। এরকম ভালবাসা আছে যা তুলে ধরে বড় করে।"[১] প্রাচ্যের রমণী সারদাদেবী সেই চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, যার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম শক্তিরূপে বিস্তৃত হয়েছিল সমাজের বিশাল পরিমণ্ডলে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি তাঁর মমতার হাত ছিল চিরপ্রসারিত। স্বার্থপরতার উর্ধ্বে থেকে পরার্থপরতার উন্মুক্ত দিগন্তে ছিল তাঁর বিচরণ, যার কাছে ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা ছিল অতি তুচ্ছ।

১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে সারদাদেবীর বিয়ে। তারপর দীর্ঘ একযুগ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক বিস্মরণ। প্রথমে কামারপুকুরে ও পরে জয়রামবাটীতে স্ত্রীকে রেখে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। উক্ত দীর্ঘ সময়টিতে নিষ্ঠুর প্রতীক্ষার যন্ত্রণা সারদাদেবীর মনোবলকে ভাঙতে পারেনি। পাড়া-পড়শি গ্রামবাসীদের উপহাস ও কটাক্ষের মাঝেও তিনি ছিলেন ধ্রুবতারার মতো ধৈর্যে স্থির। "জয়রামবাটীর মানুষজন তাঁকে নিয়ে রঙ্গতামাসা করে। পাগলা মানুষের বউ বলে সখীদের কাছেও সারদা যেন অনুকম্পার পাত্রী।"[২] কিন্তু সকলের করুণা ও উপহাসের পাত্রী হয়েও সারদাদেবী ছিলেন নির্লিপ্ত। কোনরকম হীনম্মন্যতা ও মনোবিকার তাঁকে স্পর্শ করেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ যে অন্যান্য পুরুষের চেয়ে ভিন্ন চরিত্রের ও সাধারণ মাপকাঠিতে তাঁকে বিচার করা যায় না এ স্পষ্ট প্রতীতি সারদাদেবীর হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ছিল। তাঁর অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তার বলে তিনি 'সময় হলে ডাক আসবেই' এই বিশ্বাসে বলীয়ান ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে উদাসীন স্বামীর প্রতীক্ষায় না থেকে নিজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে চলে এলেন তিনি।

---

* উদ্বোধন, ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৫-৪৮, প্রকাশ-স্থান—ঢাকা, বাংলাদেশ

** রওশন আরা ফিরোজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা

একদিকে সত্যিকারের নিষ্ঠাবতী স্ত্রী, গৃহকর্মে সুনিপুণা মহিলা, অন্যদিকে স্বামীর শিষ্যা, পরামর্শদাত্রী এককথায় 'Friend, Philosopher & Guide'-এর ভূমিকায় ও সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেন সারদাদেবী। পাশ্চাত্যের লেখক ক্রিস্টোফার ইশারউডের মন্তব্য উল্লেখ্য : "বিয়ে করে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। হিন্দুর বিবাহে তখন ভ্রষ্টাচার এসেছে। পুরুষের সমাজে স্ত্রীর মর্যাদা তখন হেয় হয়ে গেছে। বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে উঠেছে স্বামীর লালসার বস্তু। সংসারে তার পরিচয় হয়েছে দাসীরূপে। রামকৃষ্ণ তাঁর স্ত্রীকে সর্বগুণান্বিতা করে শিক্ষা দিয়েছিলেন শুধু পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেবার জন্য নয়, তাঁকে আরো মহীয়সীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে একটি দৃষ্টান্ত রাখতেই রামকৃষ্ণ যত্নবান হয়েছিলেন।"[৩] বাস্তবিকই সারদাদেবী তাঁর স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতার বলে নিজের সন্তানের মা না হয়েও লক্ষ লক্ষ সন্তানের জননীরূপে জগজ্জননীর অসাধারণ আসনে নিজেকে অলঙ্কৃত করেছিলেন।

রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের কন্যা হিসাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে লালিত হয়েও শ্রীমা সারদাদেবী সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও নীচতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সেই যুগে একজন নিষ্ঠাবতী হিন্দুকুলবধূ হয়ে পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গিনী খ্রীস্টান মহিলাদের সাদরে বরণ করা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। ইউরোপের শিক্ষিত মহিলা মিসেস ওলি বুল সারদাদেবীকে সাক্ষাতের পর তাঁর অভিজ্ঞতা অধ্যাপক Max Muller-এর কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন : "আমরাই প্রথম বিদেশী যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী সারদাদেবীকে দর্শন করার অনুমতি পেয়েছি। তিনি 'আমার মেয়েরা' বলে আমাদের গ্রহণ করলেন।"[৪] সারদাদেবীর বহু সন্তানের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৭ মার্চ নিবেদিতার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয় শ্রীমার। তাঁর পবিত্র সংস্পর্শে এসে প্রাচ্যের নারীদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাসীদের বহুদিনের বদ্ধমূল ধারণা দূরীভূত হয়। এই দিনটিকে নিবেদিতা চিহ্নিত করেছেন 'Day of Days' বলে। প্রায় ১৩ বছর সারদাদেবীর সাথে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান ঘটে। নিবেদিতার সকল রকম সমাজসংস্কারমূলক কাজে প্রেরণা যোগাতেন শ্রীমা। তাঁরই উপস্থিতি ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতার ফলে প্রাচ্যের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে একজন পাশ্চাত্য মহিলা সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে নিরলস কর্ম-সাধনার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন অতি সহজেই। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে সারদাদেবীকে লেখা সিস্টার নিবেদিতার চিঠি : "তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই, তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, স্নিগ্ধ, শান্তি তা সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো।"[৫] সারদাদেবী নিবেদিতা-সহ আরো অনেক খ্রীস্টান রমণীদের নিজগৃহে স্থান দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণকন্যার ঘরে ম্লেচ্ছ বিদেশিনীর অবস্থানকে সেযুগে তাঁর আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত গর্হিত ও সমাজবিরোধী কাজ বলে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু সারদাদেবী ছিলেন নির্ভীক, প্রতিজ্ঞায় অটল। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা সারদাদেবী সম্পর্কে লেখেন : "সারদাদেবীকে

আমরা হোলি মাদার বলি। খুব সাধাসিধে হিন্দুরমণী তিনি। কিন্তু তবুও আমার ধারণায় তিনি বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।"[৬]

শ্রীমা সারদাদেবী নিজে লিখতে পারতেন না, পড়তে পারতেন, কিন্তু শিক্ষার প্রতি অগাধ অনুরাগ ছিল তাঁর। কলকাতায় ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য সিস্টার নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে প্রায়ই পরিদর্শনে যেতেন তিনি। 'লোকমাতা নিবেদিতা'য় উল্লেখিত ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ অক্টোবর সারদাদেবীর বিদ্যালয় দর্শনের একটি বিবরণে দেখা যায়—"কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং বলেন, 'বেশ তো করেছ মেয়েরা'।" অগ্নির মতো তেজস্বিনী ত্যাগী রমণী সিস্টার নিবেদিতা সারদাদেবীর নিকট শিশুর মতো নির্ভীক ছিলেন। শ্রীমার সহজ বুদ্ধি ও বাস্তববোধের সাহায্যে অনেক সমস্যার সমাধান পেতেন তিনি। ভারতের বিভিন্ন দেশ ও তীর্থভ্রমণের ফলে তাঁর [শ্রীমার] জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার পরিধি ছিল বিস্তৃত।

সঙ্কীর্ণ ধর্মান্ধতার উর্ধ্বে থেকে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন সারদাদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত সারদাদেবী ইস্টার দিবসে সঙ্গিনীদের নিয়ে নিবেদিতার আবাসে এসে উপস্থিত হতেন। এ-সম্পর্কে নিবেদিতার মন্তব্য লক্ষণীয়—"আমাদের ছোট ফরাসী অর্গানযোগে ইস্টারের গীতবাদ্য করা হলো। খ্রীস্টের পুনরুত্থান স্তোত্র শ্রীমার কাছে অজ্ঞাত ও বিদেশীয় হলেও যেরকম দ্রুত তার মর্মানুভব করে সুগভীর ভাবাত্মীয়তা প্রকাশ করলেন, তাতেই আমাদের কাছে সর্বপ্রথম অসন্দিগ্ধভাবে উন্মোচিত হলো সারদাদেবীর ধর্মসংস্কৃতির মহিমা কী বিরাট!"[৭]

অন্য ধর্মাবলম্বীর সাথে খাওয়া, ওঠা-বসা, ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ব্যাপারে কোন সংস্কার তাঁর ছিল না। সমাজের রক্তচক্ষু ও লোকনিন্দাকে অগ্রাহ্য করে খ্রীস্টান-কন্যা নিবেদিতার রান্না-করা খাবার অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। সারদাদেবীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য সকল শ্রেণীর মহিলাগণ তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতেন। কলকাতায় সর্বদা ১৪।১৫ জন উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলা তাঁকে ঘিরে থাকতেন। তাঁদের কোন্দলপ্রিয় স্বভাব সকলের বিরক্তি ও অসন্তোষের কারণ ছিল। শ্রীমা তাঁর প্রফুল্লতা ও অপূর্ব বিচক্ষণতার সাহায্যে এঁদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে স্থায়ী শান্তি রক্ষার চেষ্টা করতেন। সারদাদেবীর বাড়িতে গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদিদি সহ আরো অনেক হিন্দু বিধবা থাকতেন। এঁরা অনেকেই স্বামী-সংসার কর্তৃক নির্যাতিতা হয়ে অত্যন্ত করুণ ও বেদনাময় জীবনযাপন করতেন। শ্রীমার মমতাময় স্পর্শে তাঁরা তাঁদের সমস্ত দুঃখে সান্ত্বনার প্রলেপ পেয়েছিলেন।

সারদাদেবী অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্না ও সংস্কৃতিমনা মহিলা ছিলেন। ২।১ বাগবাজার স্ট্রীটের ওপর সারদাদেবীর ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রতি বিকেলে এক

বিরাট আনন্দের হাট বসত। সমাজের সর্বস্তরের মহিলারা ভক্তরূপে এই আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি বালবিধবা লক্ষ্মীমণি দেবী রামপ্রসাদের গান ও কীর্তন গাইতেন অপূর্ব দরদ দিয়ে। এক কথায় তার গৃহ ছিল নির্মল আনন্দ আহরণের এক লীলাভূমি, যেখানে হিন্দু বিধবারা তাঁদের কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধনের জীবনেও এক ঝলক মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেতেন।

প্রজ্ঞা ও মাধুর্যের অপূর্ব সমন্বয় ছিলেন সারদাদেবী। যেকোন জটিল সমস্যার ব্যাপারে তিনি বিনা দ্বিধায় উদার ও মহৎ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করতেন। ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের কঠোরতার মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হলেও তিনি প্রতিক্ষেত্রে নিজেকে পরিবেশের সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উন্নীত করতে পারতেন। এমনকি অভিজ্ঞতার বহির্ভূত সামাজিক সমস্যাবলীও তিনি অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি ও স্বজ্ঞার মাধ্যমে সঠিক সমাধানের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। সারদাদেবী প্রেমময়ী হলেও প্রয়োজনে হতেন বজ্রের মতো কঠোর। কর্তব্যকর্মে তিনি কিছুতেই বুদ্ধিহীন ভাবালুতায় বিভ্রান্ত হননি। আশ্রমে যারা সাধুর আচরণ লঙ্ঘন করেছিল তাদের তিনি কঠোর হস্তে দমন করেছেন। নারীসুলভ ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে অপরাধকে ক্ষমা করেননি। তবে 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়'—এ মতাদর্শে বিশ্বাসী, সারদাদেবী মাতাল, ডাকাত, মজুর-মাঝি-ডোম—সকলকেই তাঁর গৃহে সাদর আমন্ত্রণ জানাতেন। কারণ তিনি ছিলেন 'সতেরও মা অসতেরও মা'। নিজের হাতে তাদের খাবার পরিবেশন করতেন। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান সকলের প্রতি অবারিত ছিল তাঁর গৃহের দুয়ার। জাতিভেদ-বর্ণভেদ, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদই তিনি মানতেন না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বুভুক্ষু মানবের সামনে তিনি দাঁড়িয়েছেন ত্রাণকর্ত্রী হিসাবে। এককথায় সারদাদেবী ছিলেন বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অধিকারী চরম মানবতাবাদী।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রাচ্যের রমণীকুল যখন অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে অন্ধ ও সমাজের জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট, সেইসময়ে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে সারদাদেবী ভক্তদের বিশেষ অনুরোধে হ্যারিংটন নামে একজন ইংরেজ ফটোগ্রাফারকে তাঁর ছবি তোলার অনুমতি দেন। বর্তমানে সারদাদেবীর যে-ছবিটি সর্বত্র অর্চিত ও প্রচারিত হয়, এটি সেই ছবি। বলা বাহুল্য, সেই যুগে একজন হিন্দুকুলবধূর পক্ষে বিদেশী ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ছবি তোলা একটি দুঃসাহসের পর্যায়ে পড়ে। সারদাদেবীর আরেক সন্তান ছিলেন নাট্যজগতের বিস্ময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ। শ্রীমা কলকাতার মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ, বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর, জনা, পাণ্ডবগৌরব, কালাপাহাড় এবং অপরেশচন্দ্রের রামানুজ নাটক দেখেছিলেন। নাটকে অংশগ্রহণকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও তিনি পুত্র-কন্যাসম স্নেহ করতেন। সারদাদেবী যে কতখানি সংস্কারমুক্ত, উদার হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন এসব তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সারদাদেবীর জীবনাদর্শকে নীতিবিদ্যার পূর্ণতাবাদের (Perfectionism) পর্যায়ে দেখা চলে। কারণ, তাঁর জীবন ছিল কৃচ্ছ্রতাবাদ ও সুখবাদের এক অপূর্ব

সমন্বয়। নিজের ক্ষুদ্র সংসারের খুঁটিনাটি কাজ সমাধা করেও বিশ্বমানবতার প্রতি তাঁর বিশাল দায়িত্ব ছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর সেবার আদর্শে বিস্মিত হয়ে বলেন : "তোমরা কি ভাবতে পার যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, মহামায়ী সাধারণ স্ত্রীলোকদের মতো ঘরকন্না ও আর সবরকম কাজকর্ম করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবে মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য আবির্ভূতা হয়েছেন।"[৮] বাস্তবিকই মানবজাতির জন্য তিনি যে অসাধারণ আদর্শ স্থাপন করেছেন, সেই পথই যেকোন ব্যক্তিকে নিয়ে যাবে সর্বজনীন সুখের জগতে যা শুধু প্রেম ও ত্যাগের মাধ্যমেই সম্ভব।* □

পাদটীকা

১ ওকাম্পোতে রবীন্দ্রনাথ—শঙ্খ ঘোষ, ১ম সং, পৃঃ ৭০
২ রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ—ক্রিস্টোফার ইশারউড, ১ম সং, পৃঃ ১২২
৩ ঐ, পৃঃ ৭৯
৪ লোকমাতা নিবেদিতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, আনন্দ সং, পৃঃ ১৭৬
৫ ঐ, পৃঃ ১৯০
৬ ঐ, পৃঃ ১৮৭
৭ ঐ, পৃঃ ১৯৫
৮ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ১ম সং, পৃঃ ২২৮

* ৯৩ বর্ষ, ১২ সংখ্যা

যুবনায়ক বিবেকানন্দ

গোপাল হালদার

যাঁরা ভারতের বা ভারতের বাইরের অন্যান্য রামকৃষ্ণ মিশন বা মঠ বা বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন, তাঁরা আদর্শকে নিজেদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলেও শুধু তাঁরাই যে স্বামীজীর একান্ত ভক্ত ও একান্ত শিষ্য একথা আমরা অনেকেই স্বীকার করব না। অনেকে এই সন্ন্যাসীদের নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ না করেও তাঁদের নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি-চেষ্টার দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দকে নিজের মতো করে দেখবার চেষ্টা করেন এবং তাঁকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করেন কোন-না-কোন দিকে। সর্বতোভাবে তাঁরা স্বামীজীকে অনুসরণ করতে পেরেছেন—এমন কথা কেউ বলতে পারবেন না। কেননা তাহলে তো তিনি দ্বিতীয় বিবেকানন্দই হতেন। কাজেই সে-প্রশ্ন নয়, কথাটা এই যে, পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতির মানুষ নিজেদের পথে নিজেদের মতে স্বামীজীর কাছে পৌঁছবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁর আদর্শকে নিজেদের মধ্যে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। একথাটা আমি সবিনয়ে বলতে চাই, আমরা সাধারণ মানুষ—যারা এদেশে এই শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং স্বামীজীকে চোখে দেখবার অধিকার পাইনি, তথাকথিত 'ধর্মের' পদ্ধতিতে স্বামীজীর পথ অনুসরণ করি না, ধর্মাত্মা লোক নই, ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানি না—আমরাও বিবেকানন্দের কম ভক্ত নই, আমরাও স্বামীজীকে এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছি। সেই দর্শন সম্পূর্ণ মিথ্যা—একথা অন্তত আমার মন স্বীকার করবে না এবং আমরা যে-দৃষ্টিতে দেখেছি সে-দৃষ্টি মিশনের সন্ন্যাসীদের মতে ভ্রান্ত দৃষ্টি হোক বা না হোক, সেটা যদি নিবেদন করতে পারি তাহলে মনে করব যে, আমি আমার একটি কর্তব্য পালন করলাম। অন্তত এইটুকু জানাই যে, স্বামীজীকে দেখবার এমন একটা পথ আছে, যাঁরা তথাকথিত ধর্মের পথে বিচরণ করেন না তাঁরা স্বামীজীকে সেই দিক দিয়ে দেখতে পারেন এবং সেইভাবে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন। আজ সেই দৃষ্টিতে আমি স্বামীজীকে পূজা নিবেদন করি।

বারো বছর বয়সে আমি প্রথম স্বামীজীকে দেখেছি। ঠিক চোখে দেখিনি, তাঁর ভাবরূপের ছায়া প্রথমে আমার মনে উদিত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের এক সামান্য বালকের মনশ্চক্ষে স্বামীজীর যে-মূর্তি তখন উদিত হয়েছিল সেই মূর্তির কথাই আজ নিবেদন করব। জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বামীজীর দু-একখানি গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে আর রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা জেনেছি যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন একজন

---

* রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম প্রকাশিত 'স্বামীজী প্রসঙ্গে' শীর্ষক সঙ্কলনগ্রন্থ (১৯৭১) থেকে সংগৃহীত।

মানুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন যিনি বীরের মতো সদর্পে আমাদের ডেকে বলতে পারেন : "আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।" সেইদিন এই কথা সমুচ্চকণ্ঠে বলবার মতো অধিকার তাঁর ছিল, অথচ অন্য লোকের সে-অধিকার ছিল না যদিও তাঁরা ভারতবাসী ছিলেন। "আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই"—এ তো পাগলের প্রলাপ নয়; ভারতবাসী সম্বন্ধে এইরূপ শ্রদ্ধেয় উক্তি করা, এরকম গর্ব করে বলবার মতো লোক সেদিনের ভারতবর্ষে বেশি ছিলেন না। সবাই তখন ম্রিয়মাণ, লজ্জিত, কুণ্ঠিত—মনে করতেন ভারতবর্ষ এমন কিছু নয় যার পরিচয় নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি। তাঁরা এমনিতে হয়তো শাস্ত্রের দুটো বচন তুলে নানা দোহাই পাড়তেন, কিন্তু সত্যি মনের গভীরতম দেশ থেকে তাঁরা শির উন্নত করে বীর সন্ন্যাসীর মতো, বীর ভারতবাসীর মতো একবারও কি বলতে পেরেছেন যে, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ আমার ভাই এবং এখানকার ভূমি, এর পথ, এর সাধনা, এর জীবন, এর প্রতি ধূলিকণা আমার কাছে প্রাণের প্রাণ, আমার আত্মার আত্মীয়, আমার সর্বস্ব, আমার ভবিষ্যৎ, আমার সাধনা ও সিদ্ধি। এই কথা বলবার মতো প্রেরণা একমাত্র স্বামীজীই আমাদের দান করেছিলেন।

সেই দৃষ্টি নিয়ে সেদিন আমরা স্বামীজীকে প্রথম দেখেছিলাম। স্বামীজী আমাদের কাছে হচ্ছেন সেই লোক যিনি ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসীকে বীরের মতো আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য, আত্মজ্ঞানলাভের জন্য আহ্বান করেছেন। বলেছেন, সর্বাগ্রে আমি এদেশের মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছি, তাতে গৌরববোধ করবার কারণ আছে, আত্মপরিচয় দেওয়ার মধ্যে আমার কুণ্ঠিতবোধ করার কারণ নেই, লজ্জাবোধ করার কারণ নেই। সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে আমি একবাক্যে এই পরিচয় দিয়ে বলতে পারি, অন্যদেশবাসী কারো কাছে আমি ছোট নই, আমার অতীতও ক্ষুদ্র নয়।

এই কথাটাই আমরা বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রথম শুনেছিলাম। এমন অকুণ্ঠিত বীরত্বের সঙ্গে একথা বলবার ক্ষমতা সেযুগে আর কারও ছিল কিনা আমি জানি না।

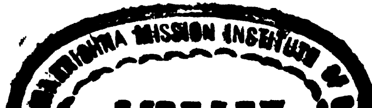
সম্ভবত তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার জন্য মিসেস অ্যানী বেসান্ত প্রমুখ বিদেশীগণ তাঁকে বলেছিলেন 'সেনাপতি'। নিঃসন্দেহে তিনি একজন সেনাপতি। সত্যই তিনি একজন fighting soldier-এর মতো এদেশে আবির্ভূত হয়েছেন। এই দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য, ভারতের সভ্যতা ও সাধনার জন্য, ভারতের ভবিষ্যতের জন্য এবং ভারতবর্ষের অতীতের সর্বপ্রকার মহৎ আদর্শ সংরক্ষণের জন্য তিনি সেনাপতির মতোই পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সেই দৃষ্টিতেই ভারতবর্ষকে দেখতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

সামান্য মানুষ আমরা, অতি সামান্য মানুষ, আমরা অনেকেই সেই পথে অগ্রসর হতে পারিনি। কিন্তু সেই মন্ত্র, সেই অভীঃ মন্ত্র, আমাদের কানে এসে উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেউ বুঝে, কেউবা না বুঝে যে-পথ অনুসরণ করেছিলাম সেই পথকে আজকে অনেকে মুক্তকণ্ঠে বলেন—বিপ্লবের পথ। সেদিনের সেই পথ ছিল গোপন পথ। কিন্তু সেই বিপ্লবের পথ

অনুসরণের জন্য তিনিই আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রেরণা দান করেছিলেন।

সমস্ত বিপ্লববাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখব যে, এদেশে বিপ্লববাদের ইতিহাসে যিনি সবচেয়ে বড়, সর্বপ্রধান মূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, যিনি বিপ্লবের মন্ত্র আমাদের কর্ণে উচ্চারণ করেছেন, প্রাণে সঞ্চারিত করেছেন, যিনি প্রতিটি ভারতবাসীকে 'ওঠো জাগো' বলে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ—একথাটি আজ অকপটে বলতে পারি। পরবর্তী কালে আমাদের মধ্যে অনেকে সেই পথ অনুসরণ করে ভেবেছিলেন, এদেশের মিশন এবং মঠও এই বিপ্লবের মন্ত্র উদ্‌যাপনের সাধনায় রত। সেখানে আমাদের বুঝবার ভুল হয়েছে। হয়তো অনেকেই জানেন না যে, ১৯১৬ থেকে ১৯১৮-এর মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে আমরা যখন তাদের শিকারের বস্তু হয়ে গিয়েছিলাম তখন বাংলার লাট লর্ড রোনাল্ডসে, যিনি বাংলাদেশের সম্বন্ধে কিছু খবর রাখতেন, বলেছিলেন বিপ্লবীরা অনেক সময় পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মধ্যে বা মঠে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একথার মধ্যে কিছু সত্য যে ছিল না তা নয়—কিন্তু সে-সত্যের চেয়ে আরো বড় সত্য এই কথা যে, মঠের অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে জানান যে, স্বামীজী মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন ধর্মসাধনার জন্য, মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন জনসেবা ও সমাজসেবার জন্য, তার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। একথা অতি সত্য। ঐ দুই প্রতিষ্ঠান তিনি রাজনীতি-ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে গড়ে তোলেননি।

তারপর থেকে স্বামীজীকে আরো অন্য দৃষ্টিতে দেখবার আমাদের অবকাশ এসেছে। যে-দৃষ্টিতে দেখেছি তদ্দ্বারা স্বামীজীর প্রচ্ছন্ন মূর্তি বা তাঁর বহির্মূর্তি মোটেই আচ্ছন্ন হয়ে যায় না বরং তাঁর চরিত্রের বৈচিত্র্য, মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব আরো বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সেই মূর্তি আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ইতিহাসে নানা রূপে নানা ভাবে বিকাশলাভ করল। ১৯২০ থেকে ১৯২১, ১৯২৪, ১৯৩০, ১৯৪০—ইতিহাসের এক-এক স্তর উত্তীর্ণ হয়ে আমরা যখন চলেছি, আমাদের জীবনের দর্পণে স্বামীজীর ছায়া পড়েছে। ব্যক্তিগতভাবে যারা স্বদেশের মন্ত্র গ্রহণ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম, তাদের মনেও তাঁর ছায়াপাত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের মাধ্যমে বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণও আমাদের কাছে বিপ্লবের মহামন্ত্রে আরো গভীরতর, আরো উজ্জ্বলতর, আরো সত্যতর হয়ে উঠেছে। যদি বাংলায় এমন কোন শব্দ সত্যতর হয়ে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে তা হচ্ছে 'বিবেকানন্দ'। আমাদের কাছে শুধু এক-বিবেকানন্দ নয়, বহু বিবেকানন্দ। তিনি শুধু একরূপ নন, তিনি বহুরূপ। কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর যে মহামহিম রূপ আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করত সেই রূপ হলো তাঁর ভারতকে বীর্যদানের রূপ, অভয়মন্ত্রদানের রূপ, ভারত ও ভারতবাসীকে ভালবাসার রূপ। ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের এই রূপ দিনের পর দিন বিকশিত হয়ে চলেছে। আজকের যুবকেরা অনেকে প্রাচীনকে, অতীতকে বিস্মৃত হতে চান এবং বর্তমানকেই যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু আমরা অন্তত মনে করি যে, বর্তমান বর্তমানই হয় না যদি অতীতের বাণী সে বহন না করে আসে। অতীতের মধ্যে যতখানি জীবন্ত তা-ই



বর্তমানে এসে উপস্থিত হয়েছে। অতীতের মধ্যে যা জীবন্ত নেই, তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তা অতীতেরও আবর্জনা—মুছে যাক সেসব। যা অতীতের গ্রাহ্য তাকে নতুন করে ভবিষ্যৎকে আবিষ্কার করাই হোক আমাদের বর্তমানের সাধনা। যা প্রচ্ছন্ন তাকে পরিষ্কার করে বোঝা, যা আচ্ছন্ন তাকে পরিস্ফুট করে তোলা, এই হচ্ছে অতীতকে বর্তমানের মধ্যে জীবন্ত করে তোলার উপায়। আজ এই দৃষ্টিতেই অতীতকে আমরা স্বীকার করি, মান্য করি। তাকে আমরা মনে করি আমাদেরই আরেক রূপ, যে-রূপ অনিবার্য কারণে আমাদের উপাস্য হয়েছিল বলে আমি আজ 'আমি' হয়েছি। আমার পিতৃপিতামহের মধ্য দিয়ে যে-ধারা ক্রমশ অনুসৃত হয়ে এসেছে সেই ধারারই একটা ফল তো আমি। কিন্তু আমি সেজন্য আমার পিতৃপিতামহের সম্মানার্থ তাঁদেরই মন্ত্র উচ্চারণ করব বা তাঁদেরই মতো সকল কর্তব্য পালন করব, তার জন্য ইতিহাস নয়, তার জন্য আমার অতীতও নয়। তাঁরা চান যে, ইতিহাস অগ্রসর হোক, তাঁদের বংশধরগণ তাঁদের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁদের সাধনাকে আরো বিকশিত করুক, গৌরবময় করুক। এটাই হচ্ছে বর্তমান-বিবেকানন্দের দৃষ্টি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের অতীতকে অস্বীকার করাটা আমি মনে করি পাপ। কেন অস্বীকার করব অতীতকে? সে তো ইতিহাসের নিয়মেই এসেছে। ইতিহাসের সেই অভিব্যক্তির ফল তো আমি। আবার ঠিক সেইখানটাতে দাঁড়িয়ে যদি বর্তমানকে স্বীকার করি, তাহলে আমি সেই সবই চাই—আমার ভবিষ্যৎকেও আমি নির্মাণ করব। সেইখানেই আমার মহত্তর দায়িত্ব। শুধুমাত্র অতীতকে স্বীকার করলেই শেষ হয় না—যতটুকু ক্ষমতা ক্ষণকালস্থায়ী জীবনের মধ্যে আয়ত্ত করা সম্ভব, যতটুকু আমাদের সীমিত দৃষ্টির মধ্যে অবধারণ করা সম্ভব—মানবের মহামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে, ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রেখে যতটুকু বুঝতে পারি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কোন্ মঙ্গলময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে—ততটুকুই বুঝতে পারি যে, মানুষের সেই মহালগ্নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য ভারতবর্ষের আত্মাও বিশ্বের সঙ্গে একযোগে সাধনা করছে—ভারতবর্ষের বর্তমান যুবক তারই জন্য উন্মুখ। সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমাদের ভারতবর্ষ যতটুকু মঙ্গলময় ভবিষ্যতের দিকে যায় ততটুকুই সেই পথে গড়ার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব যদি বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে গঠনের চেষ্টা এখনো না করি। আমরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—সেই অমৃত লুপ্ত হবে না কোনদিন, মানবজাতি ধ্বংস হয়নি কোনদিন, অ্যাটম বোমা পড়লেও ধ্বংস হবে না। তার মধ্য থেকে তার আত্মা, তার প্রাণ, তার সাধনা, তার কর্মক্ষমতা নতুন করে বেরিয়ে আসবে; মনুষ্যত্ব নতুন রূপ লাভ করবে—সে তার মহত্তর রূপ, মঙ্গলকর রূপ, কল্যাণময় রূপ, এক দেশের মানুষ যাতে সকল মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে পারেঃ এ-পৃথিবী সত্যিই সুন্দর, জীবন সত্যিই আনন্দদায়ক। এমনিভাবে মানুষ তার জীবনকে গঠন করে যাবে। সেখানে সে দাঁড়িয়ে এই সত্য বলতে পারবে—এই দৃষ্টি নিয়ে আমরা বর্তমানকে দেখি। এ-বর্তমান দেখে, এ-অতীত দেখে, এ-ভবিষ্যতের

কথা মনে রেখে স্বামীজীকেও আমরা বুঝবার চেষ্টা করতে পারি।

স্বামীজী ভারতবর্ষে উদ্ভূত সাধনাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সদর্পে বলেছিলেন, আমার ঈশ্বর, আমার উপাস্য, আমার সাধনা, আমার দেবতা—ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষই আমার আদর্শ। একথা যিনি বলতে পারেন, সমস্ত ভারতবাসীকে যিনি আপনার 'ভাই' বলে আলিঙ্গন করতে পারেন, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাচীন অতীতকে তিনিই আপনার মধ্যে স্বীকার করে নেন। কিন্তু শুধু সেই সুদূর অতীত নয়। তিনি তো তাঁর কালে বিশেষ একটা পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাকে বলা হয় পৌরুষ ও বীর্যবত্তার যুগ। স্বামীজীকে বুঝতে হলে জানতে হবে তাঁর কালকে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই যে কালটা এর মধ্যখানেই বিবেকানন্দের স্থান। এঁদের সকলের সাধনার সঙ্গে বিবেকানন্দের সাধনাকে যুক্ত করে তবেই বিবেকানন্দকে আমরা বুঝতে পারব। আমরা বিবেকানন্দকে দেখি শুধুমাত্র সন্ন্যাসী হিসাবে বা রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নয়। তাঁর স্বাদেশিকতার দৃষ্টি আছে, তাঁর বীরত্ব আছে, সবকিছুই আছে; কিন্তু তিনি স্বাদেশিকতার মধ্য দিয়ে রাজনীতি প্রতিষ্ঠা চাননি। বাংলার বিপ্লবীরা তাঁদের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন বিবেকানন্দের কাছ থেকে। তাই বলে বিবেকানন্দের আচারে ব্যবহারে কথাবার্তায় কোন রাজনৈতিক ছলচাতুরী ছিল না। তাঁর সময়ে আমাদের দেশে অনেক রাজনৈতিক সঙ্ঘ সমিতি ছিল, তার কোনটার সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয় ছিল কিনা তা আমি জানি না। তবে বিবেকানন্দকে কোন্ দৃষ্টিতে বিচার করব? যে-বিবেকানন্দ রাজনৈতিক পথ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে, ত্যাগের মন্ত্র অবলম্বন করে সংসার ছেড়ে গিয়েছিলেন, আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করেছিলেন, সেই বিবেকানন্দকে আমরা কি এইভাবে গ্রহণ করতে পারি যে, স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেমের তিনি মন্ত্রদাতা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে তাঁর কালকে বুঝতে হয়। তখন আমাদের দেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে রাজনীতির রূপ কি ছিল? আমাদের রাজনৈতিক রূপ ছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছে অনুরোধ করা, আমাদের দাবি ছিল—আই. সি. এস পরীক্ষাতে আরো বেশি ভারতবাসীকে নেওয়া হোক, শাসন-ব্যাপারে আমাদের আরো কিছু অধিকার দেওয়া হোক, আমরা আরো কিছু বড় চাকরি চাই। এই ছিল আমাদের রাজনৈতিক সবচেয়ে বড় উচ্চাশা। সেদিনকার রাজনীতিবিদ্‌রা এর বেশি আর ভাবতে পারেননি।

যাঁর মধ্যে পৌরুষ ও বীরত্ব আছে তিনি এমন তুচ্ছ আদর্শকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে পারেন না। স্বামীজী সন্ন্যাসী হয়েই এ-আদর্শকে ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করেছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন এর মধ্যে কোন সত্য নিহিত নেই। যে-মানুষের বীরত্ব আছে, কর্মে শক্তি আছে, সত্যে বিশ্বাস, অতীতে শ্রদ্ধা আছে, যিনি উন্নতিতে বিশ্বাসী—তিনি ঐ ভিক্ষানীতিকে গ্রহণ করতে পারেন না। তাই তিনি অতীতের ঐতিহ্যের চর্চা করতে বলেছেন, বলেছেন আমরা অতীতের 'অভীঃ' বাণী থেকে নতুন যুগ ও জীবনের সূচনা করব। স্বামীজীর মধ্যে ছিল profound discontent। ভারতবাসীর তৎকালীন সুযোগ-সুবিধা লাভের রাজনীতির যুগে তিনি এ-দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছিলেন তাঁর 'নিরক্ষর'

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। একতা ও নির্ভীকতাই হলো মুক্তির একমাত্র পথ। আমি অন্তত বিবেকানন্দকে এই দৃষ্টিতে দেখি। বিবেকানন্দই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করেও আমাদের দিয়েছেন স্বাদেশিকতা ও আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা। কোন একটিমাত্র মতবাদের মধ্য দিয়ে নয়, সকল মানুষকে তার কলুষতা দূর করে অধ্যাত্মবোধে আপন করে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন তিনি। এইভাবে বিবেকানন্দকে দেখলে আমরা তাঁর সেবাধর্ম ও দরিদ্রনারায়ণ-ভাবনার মধ্যে পাব একটা নতুনত্ব। বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, দেশ বা জাতি গঠন করতে হলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে যার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সনাতন ভাবধারায় ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে উঠবে। জীবকে শিবজ্ঞান করার মন্ত্র এক হিসাবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। "যত মত তত পথ"—শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন। জীবকে শিবজ্ঞান করা এদেশের ইতিহাসে নতুন নয়, কিন্তু জীবকে এইভাবে শিবভাবে সেবা করা এদেশে নতুন। জীবকে শিব আরো অনেকে মনে করেছেন—এদেশের ইতিহাস তো কাঙালের ইতিহাস নয়। কিন্তু এদেশের ইতিহাসে এযুগের মতো করে জীবকে শিবজ্ঞান করা—সেইটিই বিবেকানন্দ করেছেন। বিবেকানন্দ সেবা থেকে আরম্ভ করে সকল কিছুর মধ্যেই বলেছেন, কোন মানুষই ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয়, জীবমাত্রেই শিব, শূদ্র হোক চণ্ডাল হোক—প্রত্যেক ভারতবাসী আমার ভাই এবং প্রত্যেক ভারতবাসী আমার আত্মার আত্মীয়। তাই স্বামীজী বারবার বললেন, এরাই আসল শিব। এখন শূদ্রের যুগ, আজ শিবজ্ঞানে শূদ্র জেগে উঠছে বিশ্বব্যাপী—এই ভাবীকালের দৃষ্টিও তিনি লাভ করেছিলেন। তিনি বারবার স্বদেশ পরিভ্রমণ করেছেন, ফলে এদেশের দুঃখ-দারিদ্র্য গ্লানি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই যখন আমেরিকায় যান তখন বলেছিলেন, আমি আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করতে যাচ্ছি তা নয়; আমি আমেরিকাকে জানাতে যাচ্ছি যে, আমরা কোন্ দুর্যোগের মধ্যে আছি এবং আমরা কিভাবে সেখান থেকে কি আহরণ করে নিয়ে আসতে পারি তাও আমি দেখব। তিনি ইউরোপের শৌর্য, ইউরোপের জ্ঞানসাধনা বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝেছিলেন, জীবের মধ্য দিয়ে সেই ভগবান, সেই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্, সেই বিরাট আত্মা আত্মপ্রকাশ করেছে। এই দৃষ্টি নিয়েই তিনি আমাদের দেশের সাধনাকে গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি বললেন কম্বুকণ্ঠে, যেদেশের লক্ষ লক্ষ লোক বছরের পর বছর বুভুক্ষু থাকে সেদেশে আবার ধর্মের কথা! কোন্ জ্বালায় জ্বললে সেই সন্ন্যাসীর মতো মানুষ এমন কথা বলতে পারেন যে, ফুটবল খেলার মধ্যে বেদান্তের শক্তি বেশি রয়েছে? সেই জ্বালা তাঁর চারদিকের আবহাওয়াতে ছিল বলেই দেশের সাধারণ মানুষেরা বলেছিলেন যে, এই সন্ন্যাসীই সমস্ত জাতির সাধনাকে উপলব্ধি করতে পারবেন। সেই সাধনাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন শুধু নিজের কল্যাণ বা ব্যক্তি-বিশেষের মুক্তিলাভের জন্য নয়—একটা গোটা দেশের সাধনা তথা সমগ্র মানবজাতির সাধনাকে নিজের মধ্যে পরিস্ফুট করার জন্য। তিনি নিজেকে সমস্ত দেশের কাছে উৎসর্গ করার জন্যই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

আমার দেখা বিবেকানন্দকে এই রূপেই আমি উপস্থাপিত করতে চাই। এই বিবেকানন্দকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমি গভীরতর ও উজ্জ্বলতর রূপে দেখেছি, ভগিনী নিবেদিতার রচনাবলী পাঠ করে তাঁকে সুন্দরতর এবং মহত্তর রূপে দেখতে পেয়েছি।

আমাদের ইতিহাসের মধ্যে, পৃথিবীর অগ্রযাত্রার পদক্ষেপের মধ্যে আমি তাঁকে দেখেছি। বেলুড় মঠের সাধনাই মাত্র নয়, বিপ্লববাদের প্রতিটি পত্তনের মধ্যে দিয়েও নতুন দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে পেয়েছি। তাঁর সাধনাই তো সমস্ত ধনতন্ত্রের মধ্যে, সমাজতন্ত্রের মধ্যে আমাদের প্রেরণা দান করেছে, যার ফলে পৃথিবীর বিরাট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা অগ্রসর হতে পেরেছি। আজ যদি তাঁর সাধনার কিছুমাত্র আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে এই যে দুর্দশাগ্রস্ত এবং দৈন্যগ্রস্ত স্বাধীনতার সার্থক রূপ দিতে আমরা অসমর্থ হয়েছি, সেই পরাজয়ের গ্লানিও আমরা নিশ্চয়ই মোচন করতে পারব। আজ বিবেকানন্দের সেই বীরত্ব, সেই শৌর্য ও অভীঃ মন্ত্র আমাদের সুপ্ত অন্তরে জাগ্রত হোক, যাতে আমরা বলতে পারি—অভীঃ অভীঃ অভীঃ। এই হলো বিবেকানন্দের সেবা, এই হলো বিবেকানন্দ।* □

---

* ৯৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা

ম্যাক্সমূলার-কৃত 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি'

স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞদিগের অধিনায়ক। যে ঋগ্বেদসংহিতা পূর্বে সমগ্র কেহ চক্ষেও দেখিতে পাইত না, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিপুল ব্যয়ে ও অধ্যাপকের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমে, এক্ষণে তাহা অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের পাঠ্য। ভারতের দেশদেশান্তর হইতে সংগৃহীত হস্তলিপি পুঁথির অধিকাংশ অক্ষরগুলিই বিচিত্র এবং অনেক কথাই অশুদ্ধ; বিশেষ, মহাপণ্ডিত হইলেও বিদেশীর পক্ষে সে অক্ষরের শুদ্ধাশুদ্ধি-নির্ণয় এবং অতি স্বল্পাক্ষর জটিল ভাষ্যের বিশদ অর্থ বোধগম্য করা কি কঠিন, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের জীবনে ঋগ্বেদ-মুদ্রণ একটি প্রধান কার্য। এতদ্ব্যতীত আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার বসবাস, জীবন-যাপন, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, অধ্যাপকের কল্পনায় ভারতবর্ষ বেদ-ঘোষ-প্রতিধ্বনিত ও যজ্ঞ-ধূম-পূরিত-গগন, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাদি-বহুল, ঘরে ঘরে গার্গী-মৈত্রেয়ী-সুশোভিত, শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রের নিয়মাবলী পরিচালিত, তাহা নহে। আধুনিক বিজাতি-বিধর্মী-পদ-দলিত, লুপ্তাচার, লুপ্তক্রিয়, ম্রিয়মাণ ভারতের কোন্ কোণে কি নূতন ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাও অধ্যাপক সদা জাগরূক হইয়া সংবাদ রাখেন। এদেশের অনেক এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, অধ্যাপকের পদযুগল কখনো ভারত-মৃত্তিকা-সংলগ্ন হয় নাই বলিয়া ভারতবাসীর রীতিনীতি আচার ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার মতামতে নিতান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে আজীবন এদেশে বাস করিলেও অথবা এদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও যেপ্রকার সঙ্গ, সেই সামাজিক শ্রেণীর বিশেষ বিবরণ ভিন্ন অন্য শ্রেণীর বিষয়ে, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান রাজপুরুষকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিতে হয়। বিশেষ, জাতি-বিভাগে বিভক্ত এই বিপুল সমাজে এক জাতির পক্ষে অন্য জাতির আচারাদি বিশিষ্টরূপে জানাই কত দুরূহ। কিছুদিন হইল, কোন প্রসিদ্ধ এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কর্মচারীর লিখিত 'ভারতাধিবাস'-নামধেয় পুস্তকে এরূপ এক অধ্যায় দেখিয়াছি—'দেশীয় পরিবার-রহস্য'। মনুষ্যহৃদয়ে রহস্য-জ্ঞানেচ্ছা প্রবল বলিয়াই বোধহয় ঐ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখি যে, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান-দিগ্গজ তাঁহার মেথর, মেথরানী ও মেথরানীর জার-ঘটিত ঘটনা-বিশেষ বর্ণনা করিয়া স্বজাতিবৃন্দের দেশীয় জীবন-রহস্য সম্বন্ধে উগ্র কৌতূহল চরিতার্থ করিতে বিশেষ প্রয়াসী এবং ঐ পুস্তকের এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজে সমাদর দেখিয়া লেখক যে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ, তাহাও বোধ হয়। শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ, আর বলি কি? তবে শ্রীভগবান বলিয়াছেনঃ "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে" ইত্যাদি। যাক, অপ্রাসঙ্গিক কথা; তবে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের আধুনিক ভারতবর্ষের দেশদেশান্তরের রীতিনীতি ও সাময়িক ঘটনা-জ্ঞান দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ।

বিশেষত, ধর্ম-সম্বন্ধে ভারতের কোথায় কি নূতন তরঙ্গ উঠিতেছে, অধ্যাপক সেগুলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবেক্ষণ করেন এবং পাশ্চাত্য জগৎ যাহাতে

সেবিষয়ে বিজ্ঞপ্ত হয়, তাহারও বিশেষ চেষ্টা করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ, থিওসফি সম্প্রদায়, অধ্যাপকের লেখনী-মুখে প্রশংসিত বা নিন্দিত হইয়াছে। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ-ভারত নামক পত্রিকাদ্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ও উপদেশের প্রচার দেখিয়া এবং ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের বৃত্তান্তপাঠে, রামকৃষ্ণ-জীবন তাঁহাকে আকর্ষণ করে। ইতিমধ্যে ইন্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরিয়ান টনি মহোদয়-লিখিত রামকৃষ্ণ-চরিতও ইংলন্ডীয় 'এসিয়াটিক কোয়ার্টালি রিভিউ' নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। মাদ্রাজ ও কলিকাতা হইতে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া অধ্যাপক 'নাইনটিস্থ সেঞ্চুরি' নামক ইংরাজী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বহু শতাব্দী যাবৎ পূর্ব মনীষিগণের ও আধুনিক কালে পাশ্চাত্য বিদ্বদ্বর্গের প্রতিধ্বনিমাত্রকারী ভারতবর্ষে নূতন ভাব নূতন ভাষায় নূতন মহাশক্তি পরিপূরিত করিয়া সম্পাতকারী নূতন মহাপুরুষ সহজেই তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিলেন। পূর্বতন ঋষি মুনি মহাপুরুষদিগের কথা তিনি শাস্ত্রপাঠে বিলক্ষণই অবগত ছিলেন, তবে এ-যুগে এ ভারতে আবার তাহা হওয়া কি সম্ভব? রামকৃষ্ণ-জীবনী এ প্রশ্নের যেন মীমাংসা করিয়া দিল। আর ভারত-গত-প্রাণ মহাত্মার ভারতের ভাবী মঙ্গলের, ভাবী উন্নতির আশালতার মূলে বারি সিঞ্চন করিয়া নূতন প্রাণ-সঞ্চার করিল।

পাশ্চাত্য জগতে কতকগুলি মহাত্মা আছেন, যাঁহারা নিশ্চিত ভারতের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু ম্যাক্সমূলারের অপেক্ষা ভারত-হিতৈষী ইউরোপ খণ্ডে আছেন কিনা, জানি না। ম্যাক্সমূলার যে শুধু ভারত-হিতৈষী, তাহা নহেন, ভারতের দর্শনশাস্ত্রে, ভারতের ধর্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা; অদ্বৈতবাদ যে ধর্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া, তাহা অধ্যাপক সর্বসমক্ষে বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। যে সংসারবাদ[১] দেহাত্মবাদী খ্রীস্টিয়ানের বিভীষিকাপ্রদ, তাহাও তিনি স্বীয় অনুভূতি-সিদ্ধ বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন, এমনকি, বোধ হয় যে, ইতিপূর্ব জন্ম তাঁহার ভারতেই ছিল এবং পাছে ভারতে আসিলে এই বৃদ্ধ শরীর সহসা সমুপস্থিত পূর্ব স্মৃতিরাশির প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারে, অধুনা এই ভয়ই ভারতাগমনের প্রধান প্রতিবন্ধক। তবে গৃহস্থ মানুষ, যিনিই হউন, সকল দিক বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। যখন সর্বত্যাগী উদাসীনকেও অতিবিশুদ্ধ জানিয়াও লোকনিন্দিত আচারের অনুষ্ঠানে কম্পিত-কলেবর দেখা যায়, শূকরী-বিষ্ঠা মুখে বলিয়াও যখন প্রতিষ্ঠালাভ, অপ্রতিষ্ঠার ভয়, মহা উগ্র তাপসেরও কার্যপ্রণালীর পরিচালক, তখন সর্বদা লোক সংগ্রহেচ্ছু বহুলোকপূজ্য গৃহস্থের যে, অতি সাবধানে নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, ইহাতে কি বিচিত্রতা? যোগ-শক্তি ইত্যাদি গূঢ় বিষয়-সম্বন্ধেও যে অধ্যাপক একবারে অবিশ্বাসী, তাহাও নহেন।

"দার্শনিক-পূর্ণ ভারতভূমিতে যেসকল ধর্ম-তরঙ্গ উঠিতেছে", তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ ম্যাক্সমূলার প্রকাশ করেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অনেকে "উহার মর্ম বুঝিতে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন এবং অত্যন্ত অযথা বর্ণন করিয়াছেন।" ইহা প্রতিবিধানের জন্য এবং এসোটেরিক বৌদ্ধমত, থিওসফি

প্রভৃতি বিজাতীয় নামের পশ্চাতে "ভারতবাসী সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক ক্রিয়াপূর্ণ অদ্ভুত যেসকল উপন্যাস ইংলন্ড ও আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে উপস্থিত হইতেছে, তাহারও মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য আছে," ইহা দেখাইবার জন্য অর্থাৎ ভারতবর্ষ যে কেবল পক্ষিজাতির ন্যায় আকাশে উড্ডীয়মান, বা পদভরে জলসঞ্চরণকারী অথবা মৎস্যানুকারী জলজীবি, মন্ত্র, তন্ত্র, ছিটা-ফোঁটা যোগে রোগাপনয়নকারী সিদ্ধিবলে ধনীদিগের বংশরক্ষক, সুবর্ণাদি-সৃষ্টিকারী, সাধুগণের নিবাসভূমি, তাহা নহে, প্রকৃত অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্, প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্, প্রকৃত যোগী, প্রকৃত ভক্ত যে একেবারে বিরল নহেন এবং সমগ্র আর্যজাতি এখনো এতদূর পশুভাব প্রাপ্ত হন নাই যে, শেষোক্ত নরদেবগণকে ছাড়িয়া পূর্বোক্ত বাজিকরগণের পদলেহন করিতে আপামর সাধারণ দিবানিশি ব্যস্ত, ইহাই ইউরোপীয় মনীষিগণকে জানাইবার জন্য ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট সংখ্যক 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি' নামক পত্রিকায় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 'প্রকৃত মহাত্মা' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের অবতারণা করেন।

ইউরোপ ও আমেরিকার বুধমণ্ডলী অতি সমাদরে এ-প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং উহার বিষয়ীভূত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অনেকেই আস্থাবান হইয়াছেন—আর সুফল হইয়াছে কি? এই ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা নরমাংসভোজী, নগ্নদেহ, বলপূর্বক বিধবা-দাহনকারী, শিশুঘাতী, মূর্খ, কাপুরুষ, সর্বপ্রকার পাপ ও অন্ধতা-পরিপূর্ণ, পশুপ্রায় নরজাতিপূর্ণ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন—এই ধারণার প্রধান সহায়, পাদরি সাহেবগণ ও বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখ হয়, কতকগুলি আমাদের স্বদেশী। এই দুই দলের প্রবল উদ্যোগে যে একটি অন্ধতামসের জাল পাশ্চাত্যদেশনিবাসীদের সম্মুখে বিস্তৃত হইয়াছিল, সেইটি ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল। যে-দেশে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের ন্যায় লোকগুরুর উদয়, সে দেশ কি বাস্তবিক যে-প্রকার কদাচারপূর্ণ আমরা শুনিয়া আসিতেছি, সেই প্রকার? অথবা কুচক্রীরা আমাদিগকে এতদিন ভারতের তথ্য সম্বন্ধে মহাভ্রমে পাতিত করিয়া রাখিয়াছিল? স্বতই এ-প্রশ্ন পাশ্চাত্য মনে সমুদিত।

পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য-সাম্রাজ্যের চক্রবর্তী অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যখন শ্রীরামকৃষ্ণচরিত অতি ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদিগের কল্যাণের জন্য সংক্ষেপে নাইনটিন্থ সেঞ্চুরিতে প্রকাশ করিলেন, তখন পূর্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভীষণ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল, তাহা বলা বাহুল্য।

মিশনারি মহাশয়েরা হিন্দু দেবদেবীর অযথা বর্ণন করিয়া তাঁহাদের উপাসকদিগের মধ্যে যে যথার্থ ধার্মিক লোক কখনো উদ্ভূত হইতে পারেন না, এইটি প্রমাণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন; প্রবল বন্যার সমক্ষে তৃণগুচ্ছের ন্যায় তাহা ভাসিয়া গেল, আর পূর্বোক্ত স্বদেশী সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি-সম্প্রসারণরূপ প্রবল অগ্নি নির্বাণ করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। ঐশী শক্তির সমক্ষে জীবের শক্তি কি?

অবশ্যই দুই দিক হইতেই এক প্রবল আক্রমণ বৃদ্ধ অধ্যাপকের উপর পতিত হইল, বৃদ্ধ কিন্তু হটিবার নহেন। এ সংগ্রামে তিনি বহুবার পারোত্তীর্ণ। এবারও হেলায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ক্ষুদ্র আততায়ীগণকে ইঙ্গিতে নিবৃত্ত

করিবার জন্যও "যে মহাপুরুষ ইদানীং ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যথায় তাঁহার শিষ্যেরা মহোৎসাহে তাঁহার উপদেশ প্রচার করিতেছেন এবং বহু ব্যক্তিকে এমনকি, খ্রীস্টানদের মধ্য হইতেও অনেককে রামকৃষ্ণমতে আনয়ন করিয়াছেন," "একথা আমাদের নিকট আশ্চর্যবৎ এবং কষ্টে বিশ্বাসযোগ্য," "তথাপি প্রত্যেক মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম-পিপাসা বলবতী, প্রত্যেক হৃদয়ে প্রবল ধর্মক্ষুধা বিদ্যমান, যাহা বিলম্বে বা শীঘ্রই শান্ত হইতে চাহে"। "এইসকল ক্ষুধার্ত প্রাণে রামকৃষ্ণের ধর্ম বাহিরের কোন শাসনাধীনে আসে না" বলিয়াই অমৃতবৎ গ্রাহ্য হয়। "অতএব, রামকৃষ্ণ ধর্মানুচারীদের যে প্রবল সংখ্যা আমরা শুনিতে পাই, তাহা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত যদ্যপিও হয়,... তথাপি যে-ধর্ম আধুনিক সময়ে এতাদৃশী সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং যাহা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সম্পূর্ণ সত্যতার সহিত জগতের সর্ব প্রাচীন ধর্ম ও দর্শন বলিয়া ঘোষণা করে, এবং যাহার নাম বেদান্ত অর্থাৎ বেদশেষ—বেদের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য, তাহা অস্মদাদির অতি যত্নের সহিত মনঃসংযোগার্হ।" সেই মহাপুরুষ ও তাঁহার ধর্ম যাহাতে সর্বসাধারণে জানিতে পারে, সেইজন্য তাঁহার অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

এই পুস্তকের প্রথম অংশে মহাত্মাপুরুষ, আশ্রম-বিভাগ, যোগ, দয়ানন্দ সরস্বতী, পওহারী বাবা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের নেতা রায় শালিগ্রাম সাহেব বাহাদুর প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর অবতরণ [অবতারণা] করা হইয়াছে।

অধ্যাপকের বড়ই ভয়, পাছে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে, যে দোষ আপনা হইতেই আসে—অনুরাগ বা বিরাগাধিক্যে অতিরঞ্জিত হওয়া—সেই দোষ এ জীবনীতেও প্রবেশ করে। তজ্জন্য ঘটনাবলী সংগ্রহে তাঁহার বিশেষ সাবধানতা। বর্তমান লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র দাস। তৎসঙ্কলিত রামকৃষ্ণ-জীবনীর উপাদান যে অধ্যাপকের যুক্তি ও বুদ্ধি উদুখলে বিশেষ কুট্টিত হইলেও ভক্তির আগ্রহে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হওয়া সম্ভব, তাহাও বলিতে ম্যাক্সমূলার ভুলেন নাই, এবং ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক শ্রীযুক্তবাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ দোষোদ্ঘোষণ করিয়া অধ্যাপককে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরমুখে দুই-চারিটি কঠোর, মধুর কথা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাও পরশ্রীকাতরতা ও ঈর্ষাপূর্ণ বাঙালীর বিশেষ মনোযোগের বিষয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা অতি সংক্ষেপে সরল ভাষায় পুস্তকমধ্যে অবস্থিত। এ-জীবনীতে সভয় ঐতিহাসিকের প্রত্যেক কথাটি যেন ওজন করিয়া লেখা, 'প্রকৃত মহাত্মা' নামক প্রবন্ধে যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, এবার তাহা অনেক যত্নে আবরিত। একদিকে মিশনারি, অন্যদিকে ব্রাহ্ম-কোলাহল, এ উভয় আপদের মধ্য দিয়া অধ্যাপকের নৌকা চলিয়াছে। 'প্রকৃত মহাত্মা' উভয় পক্ষ হইতে বহু ভর্ৎসনা, বহু কঠোর বাণী অধ্যাপকের উপর আনে; আনন্দের বিষয়, তাহার প্রত্যুত্তরের চেষ্টাও নাই, ইতরতা নাই, আর গালাগালি সভ্য ইংলন্ডের ভদ্রলেখক কখনো করেন না, কিন্তু বর্ষীয়ান মহাপণ্ডিতের উপযুক্ত ধীর-গম্ভীর, বিদ্বেষশূন্য অথচ বজ্রবৎ দৃঢ় স্বরে মহাপুরুষের অলৌকিক হৃদয়োত্থিত অমানব ভাবের উপর যে আক্ষেপ হইয়াছিল, তাহা অপসারিত করিয়াছেন।

আক্ষেপগুলিও আমাদের বিস্ময়কর বটে—ব্রাহ্মসমাজের গুরু স্বর্গীয় আচার্য শ্রীকেশবচন্দ্রের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মধুর গ্রাম্য ভাষা অতি অলৌকিক পবিত্রতা-বিশিষ্ট; আমরা যাহাকে অশ্লীল বলি এমন কথার সমাবেশ তাহাতে থাকিলেও তাঁহার অপূর্ব বালবৎ কামগন্ধহীনতার জন্য ঐসকল শব্দ-প্রয়োগ দোষের না হইয়া ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে, অথচ ইহাই একটি প্রবল আক্ষেপ!!

অপর আক্ষেপ এই যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে অধ্যাপক উত্তর দিতেছেন যে, তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া সন্ন্যাসব্রত ধারণ করেন এবং যতদিন মর্ত্যধামে ছিলেন, তাঁহার সদৃশা স্ত্রী পতিকে গুরুভাবে গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় পরমানন্দে তাঁহার উপদেশ অনুসারে আকৌমার ব্রহ্মচারিণী-রূপে ভগবৎ সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। আরো বলেন যে, শরীর-সম্বন্ধ না হইলে কি বিবাহে এতই অসুখ? "আর শরীর-সম্বন্ধ না থাকিলেও ব্রহ্মচারী পতি ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের ভাগিনী করিয়া পরম পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, একথা উক্ত ব্রত-ধারণকারী ইউরোপনিবাসীদিগের সম্বন্ধে কার্যে পরিণত হয় নাই, মনে করিতে পারি, কিন্তু হিন্দুরা যে অনায়াসে ঐপ্রকার কামজিৎ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে পারে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি।" অধ্যাপকের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক; তিনি বিজাতি, বিদেশী হইয়া আমাদের একমাত্র ধর্মসহায় ব্রহ্মচর্য বুঝিতে পারেন এবং ভারতবর্ষে যে এখনো বিরল নহে, বিশ্বাস করেন, আর আমাদের ঘরের মহাবীরেরা বিবাহে শরীর-সম্বন্ধ বই আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না!! যাদৃশী ভাবনা যস্য ইত্যাদি।

আবার অভিযোগ এই যে, তিনি বেশ্যাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন না—ইহাতে অধ্যাপকের উত্তর বড়ই মধুর; তিনি বলেন: শুধু রামকৃষ্ণ নহেন, অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকেরাও এ অপরাধে অপরাধী।

আহা! কী মিষ্ট কথা—শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের কৃপাপাত্রী বেশ্যা অম্বাপালী ও হজরত ঈশার দয়া-প্রাপ্তা সামরীয়া নারীর কথা মনে পড়ে। আরো অভিযোগ, মদ্যপানের উপরও তাঁহার তাদৃশ ঘৃণা ছিল না। হরি! হরি! একটু মদ খেয়েছে বলে সে লোকটার ছায়াও স্পর্শ করা হবে না, এই না অর্থ? দারুণ অভিযোগই বটে! মাতাল, বেশ্যা, চোর, দুষ্টদের মহাপুরুষ কেন দূর দূর করিয়া তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁর সুরে কেন কথা কহিতেন না; আবার সকলের উপর বড় অভিযোগ, আজন্ম স্ত্রী-সঙ্গ কেন করিলেন না!!!

আক্ষেপকারীদের এই অপূর্ব পবিত্রতা এবং সদাচারের আদর্শে জীবন গড়িতে না পারিলেই ভারত রসাতলে যাইবে!! যাক, রসাতলে, যদি ঐপ্রকার নীতি-সহায়ে উঠিতে হয়।

জীবনী অপেক্ষা উক্তি-সংগ্রহ এ-পুস্তকের অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ উক্তিগুলি যে সমস্ত পৃথিবীর ইংরাজী-ভাষী পাঠকের অনেক ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করিতেছে, তাহা পুস্তকের ক্ষিপ্র বিক্রয় দেখিয়াই অনুমিত হয়। উক্তিগুলি তাঁহার শ্রীমুখের বাণী বলিয়া মহাশক্তিপূর্ণ এবং তজ্জন্যই নিশ্চিত সর্বদেশে আপনাদের ঐশীশক্তি বিকাশ করিবে। বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়

মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের জন্ম কর্ম অলৌকিক এবং তাঁহাদের প্রচার-কার্যও অত্যাশ্চর্য।

আর আমরা? যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার স্বীয় জন্ম দ্বারা পবিত্র, কর্ম দ্বারা উন্নত এবং বাণী দ্বারা রাজ-জাতিরও প্রীতি-দৃষ্টি আমাদের উপর পাতিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহার জন্য করিতেছি কি? সত্য সকল সময়ে মধুর হয় না, কিন্তু সময়-বিশেষে তথাপিও বলিতে হয়, আমরা কেহ কেহ বুঝিতেছি, আমাদের লাভ, কিন্তু ঐস্থানেই শেষ। ঐ উপদেশ জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করাও আমাদের অসাধ্য। যে জ্ঞান-ভক্তির মহাতরঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তোলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অঙ্গ বিসর্জন করা তো দূরের কথা। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, এ খেলা, বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে শুধু বুঝিলে হইবে কি? বোঝার প্রমাণ কার্যে। মুখে বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে! সকল হৃদ্গত ভাবই ফলানুমেয়; কার্যে পরিণত কর, জগৎ দেখুক।

যাঁহারা আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত জানিয়া এই মূর্খ, দরিদ্র, পূজারী ব্রাহ্মণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, যে দেশের এক মূর্খ পূজারী সপ্ত সমুদ্র পার পর্যন্ত আপনাদের পিতৃপিতামহাগত সনাতন ধর্মের জয়-ঘোষণা নিজ শক্তিবলে অত্যল্প কালেই প্রতিধ্বনিত করিল, সেই দেশের সর্বলোকমান্য শূরবীর আপনারা মহাপণ্ডিত, আপনারা মনে করিলে আরো কত অদ্ভুত কার্য স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণের জন্য করিতে পারেন। তবে উঠুন, প্রকাশ হউন, দেখান, মহাশক্তির খেলা, আমরা পুষ্প-চন্দন-হস্তে আপনাদের পূজার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। আমরা মূর্খ, দরিদ্র, নগণ্য, বেশমাত্রজীবি ভিক্ষুক; আপনারা মহারাজ, মহাবল, মহাকুল-প্রসূত, সর্ব বিদ্যাশ্রয়।

আপনারা উঠুন; অগ্রণী হউন, পথ দেখান, জগতের হিতের জন্য সর্বত্যাগ দেখান, আমরা দাসের ন্যায় পশ্চাদ্গমন করি, আর যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণনামের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবে দাসজাতি-সুলভ ঈর্ষা ও দ্বেষে জর্জরিত-কলেবর হইয়া বিনা কারণে, বিনা অপরাধে নিদারুণ বৈরপ্রকাশ করিতেছেন, তাহাদিগকে বলি যে, হে ভাই, তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা। যদি এই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মহাধর্মতরঙ্গ—যাহার শুভ্রশিখরে এই মহাপুরুষমূর্তি বিরাজ করিতেছেন, আমাদের ধন, জন বা প্রতিষ্ঠালাভের উদ্যোগের ফল হয়, তাহা হইলে তোমাদের বা অপর কাহারও চেষ্টা করিতে হইবে না, মহামায়ার অপ্রতিহত নিয়ম-প্রভাবে অচিরাৎ এ-তরঙ্গ মহাজলে অনন্তকালের জন্য লীন হইয়া যাইবে, আর যদি জগদম্বা-পরিচালিত মহাপুরুষের নিঃস্বার্থ প্রেমোচ্ছ্বাসরূপ এই বন্যা জগৎ উপপ্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি সাধ্য, মায়ের শক্তি-সঞ্চার রোধ কর?* □

পাদটীকা

১ সংসারবাদ—পুনর্জন্মবাদ

*১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা

লোকমাতা রাসমণি

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বসংসারের শাশ্বত নিয়ম এই যে, যা বিরাট ও অসামান্য তার প্রমাণের জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত অনুষঙ্গ ও মাধ্যমের। সৌরজগতে গ্রহমণ্ডলের মধ্য দিয়েই সূর্যের অনন্ত শক্তি ও মহিমা বিচ্ছুরিত হয়। একই নিয়ম লক্ষ্য করা যায় মানবসংসারেও। এই পৃথিবীতে এযাবৎ যত মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পরম জ্ঞান ও সাধনার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন যে-মহাপুরুষ তাঁর কাছে এই প্রদীপের সলিতা যোগান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এক বা একাধিক বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁরা সাধারণ হয়েও ছিলেন অসাধারণ, সংশ্লিষ্ট মহামানবের পূত জীবনেতিহাসে যাঁদের অবদানের কথা সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে। লোকমাতা রানী রাসমণি ছিলেন এই ইতিহাসখ্যাত অনন্য মানবগোষ্ঠীরই একজন। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসাধনার অবিস্মরণীয় ইতিহাস তাঁকে বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ। কারণ দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের অনুকূল জাগতিক পরিবেশ তিনিই তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর ধরে অবিচল ভক্তি ও সেবার অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন গদাধরের চরণে। এই কারণেই, কানু ছাড়া যেমন গীত নাই, তেমনই রানী রাসমণির পুণ্যাবদান উপেক্ষা করে রামকৃষ্ণ-জীবন-জ্যোতির পূর্ণ বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এই ভক্তিমতী রমণীকে শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্টনায়িকার একজন রূপে চিহ্নিত করেছিলেন।

তবে শুধু রামকৃষ্ণ-সেবিকারূপেই নয়, এক অসামান্যা রমণীরূপেও রানী রাসমণির ছিল এক স্বতন্ত্র পরিচয়। আধুনিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আলো পাওয়ার সুযোগ তাঁর হয়নি, তথাপি তিনি ছিলেন এক বিশেষ পরিশীলিত ও শিক্ষিত মনের অধিকারিণী। বস্তুত, তাঁর বহুমুখী কর্মধারায় বারে বারে প্রমাণিত হয়েছিল তাঁর প্রজ্ঞা ও প্রতিভা, তাঁর দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও দুর্জয় সাহস। আপন তেজস্বিতা ও বুদ্ধিবলে তিনি বহুবার ইংরেজ-প্রশাসনকে পর্যুদস্ত করে তার কাছে থেকে ন্যায়বিচার আদায় করতে পেরেছিলেন। নারী হয়েও জমিদারি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে তিনি বিশেষ দক্ষতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিত্তশালিনী হয়েও তিনি মুক্ত ছিলেন বিত্তের অহঙ্কার থেকে এবং সাধারণ মানুষের দুঃখমোচন ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। অর্থাৎ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের এক সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে ও জীবনচর্যায়। আবার নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী হয়েও কর্মক্ষেত্রে তিনি মূলত নির্ভর করেছিলেন যুক্তিবাদের ওপর এবং মানবতাবাদের মহৎ আদর্শ ছিল তাঁর

জীবনের অন্যতম প্রেরণা। এই বিচারে বলা যায় যে, রানী রাসমণি ছিলেন উনিশ শতকীয় নবজাগরণের এক সার্থক প্রতিনিধি।

আজকের ছন্নছাড়া বাঙালী-জীবনে সঙ্গত কারণেই এই মহীয়সী রমণীকে স্মরণ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এজন্যই তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। লেখক নির্মলকুমার রায়কে ধন্যবাদ যে, তিনি এই গ্রন্থের মাধ্যমে রানী রাসমণির ঘটনাবহুল জীবনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এক সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। আবার জীবনীকার হিসাবে তিনি যে গভীর নিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তাও সবিশেষ প্রশংসনীয়। রাসমণির জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন অত্যন্ত নিপুণভাবে এবং প্রতিটি তথ্য পেশ করার আগে তিনি যথাসম্ভব যাচাই করে নিয়েছেন। এছাড়া রানী রাসমণি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি অকারণ ভক্তির আবেগে অতিশয়োক্তি বা অতিকথনে প্রবৃত্ত হননি। সম্পূর্ণ নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি এই জীবনচরিত প্রণয়ন করেছেন। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটনার বর্ণনা অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ। যেমন, রানী রাসমণির পিতৃকুলের আলোচনা প্রসঙ্গে মাহিষ্য সম্প্রদায় ও শূদ্রবর্ণ সম্পর্কে তিনি যে ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিয়েছেন তা নিতান্তই গবেষণানির্ভর। আবার রাসমণিকে দেবীর আসনে বসিয়েও তাঁর মানবিক ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাই রাসমণি অত্যন্ত বিচক্ষণা নারী হওয়া সত্ত্বেও ভুলক্রমে যে তিনি পরমাত্মীয়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিলেন একথা লেখক জানিয়েছেন অকপটে। গ্রন্থটির আরেকটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে সংযোজিত হয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও প্রাথমিক তথ্যসূত্র যা শুধু রানী রাসমণিকে বুঝতেই সাহায্য করবে না, একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কালপর্বের গবেষণায় আগ্রহী সকল ব্যক্তিরই বিশেষ কাজে লাগবে।* □

* ৯৩ বর্ষ, ২ সংখ্যা

মৃত্যু যারা বুক পেতে লয়*

সুদিন চট্টোপাধ্যায়

আমরা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করলাম। পিছনে পড়ে রইল প্রায় দুশ বছরের পরশাসনের গ্লানিময় ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ, পদে পদে আত্ম-অবমাননা, তুচ্ছ স্বার্থসঙ্কুল ধর্মবিদ্বেষ। পড়ে রইল মন্বন্তর, মহামারী, দাঙ্গা ও দেশভাগের কালো ছায়া। আরো কিছু আছে, যা আমাদের গৌরব ও গর্বের, আছে শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ জুড়ে দেশের জন্য আত্মনিবেদন ও আত্মবলিদানের ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য, সাহসবিস্তৃত বক্ষপটের শোনিতধারায় দেশের মাটি ভিজিয়ে দেওয়ার ইতিবৃত্ত। স্বাধীনতা অহিংস আন্দোলনের সোজা সড়ক বেয়ে এসেছে—একথা বললে সত্যের অমর্যাদা হবে। দীর্ঘ রক্তাক্ত আন্দোলনের অবদান স্বাধীনতার সংগ্রামকে পুষ্টি ও শক্তি জুগিয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ—পর্বে পর্বে বিপ্লবের বহ্নিমান শিখাকে স্পর্শ করে তা বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগিয়ে গেছে। শত শত সাহসী, সঙ্কল্পকঠিন তাজা তরুণের দল এদেশে জন্মেছে যারা বিশ্বাস করত, রক্তের সমুদ্রের মধ্যে পা ডুবিয়ে গিয়ে স্বাধীনতার সূর্যকে আকাশ থেকে ছিঁড়ে নামিয়ে আনতে হবে। এই সঙ্কল্পে স্থির থেকেই ক্ষুদিরাম ফাঁসির দড়ি হাসতে হাসতে গলায় নিয়েছেন, প্রফুল্ল চাকী বা প্রীতিলতা আত্মহত্যা করেছেন, সূর্য সেনের মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরের থৈথৈ জলে হারিয়ে গেছে। এযুগের বীরত্ব ও বেদনার কাহিনী আগুনের অক্ষরে লেখা। বসন্তকুমার সরকারের **'রেমিনিসেন্সেস অব দ্য ফায়ারী এজ'** **(Reminiscences of the Fiery Age)** সেই অগ্নিযুগের কাহিনী।

বসন্তকুমার সরকারের বিদ্রোহী জীবনের স্মৃতি দেবজ্যোতি বর্মন সম্পাদিত 'যুগবাণী' পত্রিকায় প্রাথমিকভাবে চার কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। 'যুগবাণী'র কণ্ঠস্বর একটু ভিন্ন ধরনের ছিল। সে যাহোক, এই স্মৃতিচারণে অগ্নিযুগের এক বিপ্লবীর বুকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অনেক কথা ও ব্যথা প্রকাশিত হয়েছে। অনেক মহান আত্মত্যাগ যা অজানা ছিল, অনেক কাহিনী যা ইতিপূর্বে শোনা যায়নি, অনেক তথ্য যা বাংলাদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটি সমন্বিত ইতিহাস রচনায় সহায়ক হবে—তা একে একে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তিনি বলে গেছেন।

বসন্তকুমার জন্মেছিলেন মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার সন্ধিপুরডাঙার কাছাকাছি একটি ছোট্ট গ্রাম কত্রাবলীতে। তাঁদের পারিবারিক অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল ছিল। বেশ কয়েকপুরুষ ধরেই ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন তাঁরা। কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে তাঁদের জমিদারির বাড়বাড়ন্ত ঘটেছিল। তবু

---

* স্বাধীনতালাভের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে নিবেদিত।—সম্পাদক

বসন্তকুমারের বুকে পরপদানত দেশের জন্য গভীর বেদনা জলপ্রপাতের মতো আছড়ে পড়ত। শৈশব থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের আত্মত্যাগের আদর্শ তাঁকে জাগিয়ে রেখেছিল এক মহান ব্রত উদ্‌যাপনের ব্যাকুলতায়। বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন বৈপ্লবিক সাধনার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাগ্রত জাতীয়তাবাদের অভীঃ মন্ত্রকে সম্বল করে বাগড়ি-গড়বেতা অঞ্চলের তরুণ-যুবাদের তিনি মৃত্যুর মূল্যে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন। তিনি বর্ধমান ও কলকাতায় ছাত্রজীবনে গোপনে লাঠিখেলা, তীরধনুক ও বর্শা ছোঁড়া, ছোরা-ছুরি চালানো শিখেছিলেন। একটির পর একটি আখড়া তৈরি করে মেদিনীপুরের তরুণদের অস্ত্রশিক্ষা ও রণদীক্ষা দিয়ে গেছেন তিনি। সতীশচন্দ্র বসুর অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন বসন্তকুমার। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের পর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল জোয়ারের মুখে দাঁড়িয়ে কলকাতার পটুয়াটোলা লেনে ঢাকা অনুশীলন সমিতির শাখা খুললেন বসন্তকুমার। এ-শাখার যোগাযোগ ছিল বিপ্লবী পুলিন দাসের সঙ্গে। কলকাতার দিনগুলিতেই তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটল অরবিন্দ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে, যাওয়া-আসা শুরু হলো বেলুড় মঠে, সাহচর্য পেলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও নলিনী দেবের।

গোখেল এবং সুরেন্দ্রনাথের নমনীয় মধ্যমপন্থা ও সংস্কার আন্দোলন বসন্তকুমারের মনে একটুও রেখাপাত করেনি, বরং লালা লাজপৎ রায় ও বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁকে আন্দোলিত করেছেন, তাঁর সঙ্কল্পে ধ্বনিত হয়েছে—"The time has come to demand Swaraj. ... Swaraj is the birth-right of every Indian." তিলক হিন্দুধর্মের উজ্জীবন ঘটিয়ে সারা মহারাষ্ট্রে গণেশপূজার আয়োজন করেছিলেন। বসন্তকুমারও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভবানীমাতার আরাধনা শুরু করলেন। মা ভবানী তাঁর কল্পনায় ভারতমাতারই প্রত্যক্ষ রূপ। শৃঙ্খলিত ও বন্দিত্বের বেদনায় বিহ্বল দেশমাতার মুক্তিই তাঁর একমাত্র কাম্য। বঙ্গভঙ্গ-উত্তর বাংলাদেশে বিপ্লব আন্দোলন হিন্দু ধর্মচেতনার স্পর্শে রঞ্জিত। সে-কারণে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী এই আন্দোলনে সামিল হননি—এটাও ঐতিহাসিক সত্য। সে যাহোক, সশস্ত্র এই সংগ্রামকে দেশের ভিতর-বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দরকার ছিল প্রচুর অর্থের। শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক ডাকাতি। বসন্তকুমার ডাকাতিতেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে 'Khulna Jessore Gang Robbery Case' চলেছিল অনেকদিন ধরে বিচারপতি জেঙ্কিন্সের এজলাসে। বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন মুখার্জীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল জার্মানী থেকে জাহাজবোঝাই বিদেশী অস্ত্র আনার ব্যাপারে। বালেশ্বরে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের অসফল অভ্যুত্থানেও তাঁর সংযোগ ছিল।

বসন্তকুমারের আলোচ্য গ্রন্থে স্মৃতিচারণার বিভিন্ন পর্যায়ে একে একে উঠে এসেছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নানা পর্বের কথা—স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন, চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ, আইন অমান্য, 'ভারত ছাড়ো'র ডাক। তবে বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যের সঙ্গে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে সশস্ত্র বিপ্লব ও বিপ্লবীদের কথা, যাঁরা ঘরে ঘরে আরামের শয্যাতল শূন্য করে বেরিয়ে এসেছিলেন 'রাঙা

প্রভাত'-এর প্রত্যাশায়। স্কট, স্যান্ডার্স, টেগার্টের মতো কত অত্যাচারী নির্বিবেকী সাহেবের কথা এসেছে, এসেছে কাকোরী ষড়যন্ত্রের মতো নানা দুঃসাহসিক কর্মধারার বিবরণ, বোমার মামলা, ডাকগাড়ি লুঠ আর অসংখ্য বিপ্লবীর নিঃশেষে প্রাণদানের কাহিনী। তাঁরা ভারতবাসীর চেতনালোকের রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছিলেন, গোধূলি-গগনের আলোয় স্নান করে তাঁরা প্রতীক্ষা করেছেন স্বাধীনতার সূর্যকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য।

আলোচ্য গ্রন্থে বিবেকানন্দই মুখ্য চরিত্র, সমস্ত স্বদেশী অভিযান ও বৈপ্লবিক আয়োজনের তিনিই একচ্ছত্র অধিনায়ক, পরম প্রেরণাদাতা। বিবেকানন্দেরও একান্ত বিশ্বাস ছিল—"বিকশিত হওয়ার প্রথম শর্তই হলো স্বাধীনতা।" তিনি ছিলেন তেমন সন্ন্যাসী, যাঁর বুকের মধ্যে জেগে থাকত ক্ষুধা ও অনশন-জর্জর ভারতবর্ষ, যাঁর স্বপ্নে ছিল দেশ, জাগরণেও দেশ। তাঁর প্রতিটি উচ্চারণে ছিল বিপ্লবের চিরস্পন্দিত বাণী, তাঁর কর্মপ্রবাহের মধ্যে ছিল বিপ্লবের চকিত স্ফুরণ। তিনি শিক্ষাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন চাষীর লাঙলের ফলার কাছে। দরিদ্র, অজ্ঞ, মূর্খ, শূদ্র ভারতবাসীকে তিনি নিজের 'ভাই' বলে ডাক দিয়েছিলেন, তাদের ঘুম ভাঙানোর গান গেয়েছিলেন। সর্বপ্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামির মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছিলেন তিনি। ভজন, পূজন, সাধন, আরাধনা ছেড়ে কর্মযোগে নিজেকে লীন করতে বলেছিলেন। সেযুগে এবং আজো তাঁর চেয়ে বড় বিপ্লবী আর কে আছে? স্বামী বিবেকানন্দ কোন অর্থেই রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের অখণ্ড জাতীয়তাবাদের চেতনা নির্মাণে তিনি ছিলেন মুখ্য স্থপতি ও প্রণম্য পথিকৃৎ। জওহরলাল নেহরু তাঁর একটি ভাষণে এই ঐতিহাসিক সত্যের উল্লেখ করেছেন। অথচ এই জাতীয়তাবাদ সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষী ও স্বেচ্ছাচারী ছিল না। বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ ঔদার্য, আত্মদান, প্রজ্ঞা ও পরিশীলিত জীবনবোধের অগ্নিময় দীপ্তিতে চিরভাস্বর। যে যতীন্দ্র মুখার্জীকে আমরা 'বাঘা যতীন' বলে জানি, তিনি ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে বিবেকানন্দের নিকট সান্নিধ্যে আসেন। অনুশীলন সমিতির প্রাণপুরুষ ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র, 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ—সকলেই বিবেকানন্দের কাছে এসেছেন জ্বলন্ত মশাল থেকে অগ্নিকণিকা সংগ্রহের ব্যাকুলতায়। বিবেকানন্দের ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের একাধিক অমূল্য গ্রন্থ থেকে বিবেকানন্দের জাগ্রত দেশচেতনা ও তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লেখা থেকেই জানা যায়, বাল গঙ্গাধর তিলক কলকাতা কংগ্রেসের দিনগুলির অবসরে ছুটে আসতেন বেলুড় মঠে বিবেকানন্দের সান্নিধ্যের ছায়ায়, আলোচনা চলত দেশের মুক্তি ও জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের এইরকমই একটি আলোচনার বিবরণ পাই বিনায়ক বিষ্ণু রানাডের লেখায়। স্বামীজী অকম্পিত কণ্ঠে বলে চলেছেন, তাঁর চোখের তারায় তারায় উদ্ধত আগুনের ফুলকি : "Without political salvation poverty could not be eliminated from our country. India should be freed politically first.... Our political approach should be such that the rulers are compelled to kneel down and surrender. Get freedom even at the cost of life."

এইভাবেই স্বামীজী জাগিয়েছিলেন দেশের যৌবনকে। তাঁর এই কাজে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন অসামান্যা এক বিদেশিনী—তাঁর মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা। ইটালীর অঙ্গার-আন্দোলনের বাণী তিনি বয়ে নিয়ে গেছেন এদেশের ঘরছাড়া সমর্পিতপ্রাণ যুবকদের ডেরায় ডেরায়। বসন্তকুমার সরকারের আলোচ্য এই গ্রন্থটিতে বিবেকানন্দের দীপ্ত তেজ ও বিপ্লবসাধনার স্বরূপটি ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঘরে ঘরে আরামের শয্যাতল শূন্য হয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। সেই শয্যাতল শূন্য হয়ে যাওয়ার উপক্রমণিকা রচনা করেছিলেন বিবেকানন্দ। জেগে-ওঠা তরুণের দল দেশকে জাগাবেই—"None can resist her anymore... for the infinite giant is rising to her feet." বিবেকানন্দের মতো পথপ্রদর্শক সেকালে ছিল বিরল। তাঁর আকস্মিক অকাল-প্রয়াণের সংবাদ বরোদায় পৌঁছালে অরবিন্দ ঘোষ খেদ করে বলেছিলেনঃ "বাংলাকে, বাঙালীকে পথ দেখানোর আর কেউ নেই।" পথ তিনি সত্যি সত্যিই দেখিয়েছিলেন—অনন্য লক্ষ, স্থির দৃষ্টি, কণ্টকাকীর্ণ, রক্তলাঞ্ছিত পথ। কিন্তু সেইই একমাত্র পথঃ "The crying sin of India is slavery. Arise, Awake and stop not till the goal is reached. Your motherland yearns for your sacrifice. Life is transient and death is inevitable, why not give it up for a noble cause." একই পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিঃ

"পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ—
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা।
পথে পথে গুপ্ত সর্পফণা।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

অন্যত্র আবারঃ

"মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।"

বসন্তকুমার সরকারের 'রেমিনিসেন্সেস অব দ্য ফায়ারী এজ' গ্রন্থ মৃত্যুকে যাঁরা বুক পেতে নিয়েছিলেন তাঁদের কাহিনী। এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের অনুপ্রাণিত করার ভূমিকায় ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বসন্তকুমার সরকার স্মৃতির ঝাঁপি খুলে দিয়েছেন—অনেকদিনের দুঃখ-বেদনা, সংগ্রাম ও সঙ্কল্পের কথা একে একে উন্মোচিত হয়েছে। অনেকদিনের আগের কথা—বর্ণনায় কিছু ভ্রম থেকে যেতেই পারে, তবে তা খুবই সামান্য। ব্যক্তিগত আবেগও আছে, থাকারই কথা। এসব স্বীকার করে নিয়েও বলব, অগ্নিযুগের কথা আমাদের স্বাধীনতার চেতনাসঞ্চারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে গ্রন্থটিকে স্বাগত জানানো আমাদের কর্তব্য।* □

---

* ৯৯ বর্ষ, ৮ সংখ্যা

স্বচ্ছন্দ অনুবাদে জীবন্ত গালিবের অবিস্মরণীয় গজল

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

"এখন আমি মরতে যাচ্ছি। আমি খুব সামান্যই খেতে পারি এবং অসুখ-বিসুখ আমাকে কাবু করে ফেলেছে। আমার বয়স ৭৩ বছর। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা আসি, ঈশ্বরেই ফিরে যাই।...

"আমি ৭৩ বছর বয়স্ক এক জরাজীর্ণ বুড়ো। আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, মনে হয় কোনদিনই ছিল না। অনেকদিন থেকেই আমি কানে কম শুনি। আমার স্মৃতিশক্তির মতোই আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ও ক্ষয়িষ্ণু।...

"আমি ধ্বংসের শেষ অবস্থায়, জড়বুদ্ধি, পাপী, লম্পট, আমার মুখমণ্ডল বদমায়েশিতে কালো।"

পুরনো দিল্লির গলি কাসিম জান-এর কুঠুরিতে বসে মৃত্যুর বছর দুয়েক আগে এমন আত্মপরিহাসে মগ্ন হয়েছিলেন যে 'জরাজীর্ণ বুড়ো', তিনি হলেন মির্জা আসাদুল্লা খাঁ বেগ (১৭৯৮-১৮৬৯)। ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে তিনি 'গালিব' (অর্থাৎ 'বিজয়ী') নামেই সুপ্রসিদ্ধ ও চিরস্মরণীয়। মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার সূচনায় ইতিহাসের এক অস্থির সন্ধিক্ষণে বিকশিত হয়ে উঠেছিল গালিবের বহুমাত্রিক, বর্ণময় জীবন। অভিজাত বংশকৌলিন্য থাকলেও অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে প্রথাগত কোন শিক্ষা তিনি পাননি। ছিল না জীবিকার কোন প্রস্তুতি। অধিকাংশ সময় কাটত খেলাধূলা ও ঘুড়ি ওড়ানোয়। তিনি দেখতে অসাধারণ সুন্দর ছিলেন বলে পারিবারিক প্রশ্রয়ের জেরেই মাত্র ১৩ বছর বয়সে উমরাও বেগমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। ফিরোজপুর ঝিরিকার নবাব-পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় গালিব বছরে দেড় হাজার টাকা ভাতা পেতেন। তাও ভাগ করে নিতে হতো ছোট ভাইয়ের সঙ্গে। টাকার পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না, তার ওপর যৌবনকাল থেকেই ছিলেন অমিতব্যয়ী। কাজেই ঋণের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছেন চিরদিন। তবু অনুশোচনা করা বা নিজেকে বদলানো তাঁর ধাতে ছিল না। এক জায়গায় তিনি লিখছেন ঃ "আমি যখন যুবক ছিলাম, এক দক্ষ পথপ্রদর্শক আমাকে বলেছিলেন যে, ধার্মিকতা এবং জপতপ তাঁকে আনন্দ দেয় না, তিনি আনন্দময় পাপপূর্ণ জীবনযাপনে কোন বাধা অনুভব করেন না। 'আমি খাদ্য ও পানীয় নিয়ে খুশির জীবন চাই। শুধুমাত্র মনে রাখতে চাই, মিছরির ওপরে মাছির মতো আমি থাকব, মধুর ওপরে নয়।' আমি এই উপদেশমত কাজ করেছি।"

নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য নিরবচ্ছিন্ন ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া গালিবের একমাত্র কাজ ছিল মজাদার কথা বলা এবং কবিতা লেখা। ঘুরে বেড়ানোর নেশা তাঁর ছিল না। বরং জীবনের কেন্দ্র ছিল তাঁর সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার কুঠুরি এবং বারান্দা। সাধারণত সন্ধ্যার সময় গালিবের বন্ধুবান্ধবরা সেখানে আসতেন

তাঁর কথাবার্তা শুনে আনন্দ পাওয়ার জন্য। একবার মদ্যপানের জন্য দেনার দায়ে আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ ওঠে। মুফতি সদরুদ্দিন আজুরদা ছিলেন বিচারক। সওয়াল জবাবে গালিব নিজেরই কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

"আমি ঋণ করে মদ্যপান করি, কিন্তু এটাও জানি
আমার বেহিসেবি খরচের জন্য যে দারিদ্র্য
তাতে আমার ধ্বংস ডেকে আনবে।"

বিচারক মৃদু হেসে গালিবের বিরুদ্ধেই রায় দিলেন, কিন্তু অভিযোগকারীর দাবিমতো টাকা নিজেই মিটিয়ে দিলেন।

গালিব মদ্যপানের বিষয়টি গোপন করার চেষ্টা না করলেও তার প্রশংসা তিনি কখনো করেননি এবং মাতালের মতো মদ্যপান তিনি পাপ বলে মনে করতেন। স্মরণীয় ব্যাপার হলো, কোন পরিস্থিতিতেই তাঁর নির্মল হাস্যরসের বর্ণচ্ছটাকে ম্লান করা যেত না। একসময় খরচ চালানোর জন্য যখন তিনি পোশাকের আলমারি বিক্রি করে দিচ্ছিলেন তখন এক বন্ধুকে লেখেন ঃ "অন্যরা রুটি খেয়ে বেঁচে থাকে, আমি পোশাক খেয়ে বাঁচি।" অথচ এই অনটনের দিনেও একজন ভিক্ষুকও তাঁর দরজা থেকে খালি হাতে ফিরত না, তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তিনি যথাসম্ভব করতেন। ঐতিহাসিক অধ্যাপক এম. মুজিব গালিবের ইংরেজী জীবনী 'দ্য ইন্ডিয়ান মুসলিমস'-এ দেখিয়েছেন তাঁর আর্থিক দুর্দশার কারণ, তাঁর চিন্তাহীন মহত্ত্ব। তবে মৌলানা ইমতিয়াজ আলি আরশি তাঁর উর্দু গ্রন্থ 'মোকাতীব-ই-গালিব'-এ যে-চিত্র এঁকেছেন তাতে মনে হয়, গালিবের ঐহিক দুঃখের কারণ ছিল তাঁর 'হিউব্রিস' (hubris) বা চূড়ান্ত আত্মাভিমান। ১৮৪২ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত দিল্লি কলেজে অধ্যাপনার কাজ গালিব গ্রহণ করেননি স্রেফ তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভ্রান্ত আশঙ্কায়। কলেজের প্রধান-সচিব টমসনের কাছে গালিবের নামে সুপারিশ করা হয়েছিল। তিনি গালিবকে দেখা করতে বলেন। গালিব পালকিতে চড়ে সেখানে হাজির হন। টমসন খবর পেয়ে গালিবকে ভিতরে আসতে বলেন। কিন্তু গালিব পালকি থেকে নেমে টমসনের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। টমসনও ভিতরে প্রতীক্ষা করছেন। কিছুক্ষণ বাদে গালিব জানালেন—দরবারের নিয়ম হলো, অতিথিকে দরজার সামনে থেকে অভ্যর্থনা জানানো। টমসন চাকুরিপ্রার্থীকে এইভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। গালিব জানালেন, সরকারি-পদে তাঁর মর্যাদা বাড়ার কথা, কমার নয়। এই বলে তিনি ফিরে গেলেন।

আসলে সামান্য অবজ্ঞার ইঙ্গিতও গালিব সহ্য করতে পারতেন না। পরবর্তী কালে সাহিত্যবোদ্ধারা যথার্থই রায় দিয়েছেন—সমগ্র উর্দু ও ফার্সি কাব্যে ইকবাল ছাড়া আর কোন কবি এমন চিরন্তনী প্রতিভা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেননি। গালিবকে তাঁর জীবনী ও কাব্যে পাওয়া যায় পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ, মেধা ও মননে সমৃদ্ধ এক তেজোদীপ্ত স্রষ্টা হিসাবে। তবে সমালোচকদের মূল্যায়নের ভরসা তিনি করেননি। অত্যন্ত আত্মসচেতন এই কবি জীবদ্দশাতেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ছিলেন নিঃসংশয়। তাই তাঁর পক্ষেই ঘোষণা করা সম্ভব ঃ

"হৈ অওর-ভী দুনিয়া-মেঁ সুখনবর বহুৎ অচ্ছে।
কহতে হৈঁ কেহ গালিব-কা অন্দাজ-এ বয়াঁ অওর।।"
("ভাল কবি জানি দুনিয়াতে আরো আছে ঢের
লোকে বলে তবু অতুল ভঙ্গি গালিবের।")

১৮২২ সাল পর্যন্ত তিনি উর্দুতে লিখেছিলেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ বছর। তারপর গালিব লিখতে শুরু করেন ফার্সিতে। ফার্সির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অনেক বেশি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, উর্দুর চেয়ে ফার্সিতে তাঁর আত্মপ্রকাশের সুযোগ বেশি। তাহলেও তাঁর পছন্দ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। ফার্সিতে লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন, তাঁর উর্দু সঙ্কলনগুলি অনুজ্জ্বল। আবার উর্দুতে যখন ফিরে এলেন তখন বলছেন ঃ

"কেউ যদি জানতে চায় উর্দু ফার্সির চেয়ে ঈর্ষান্বিত কেন,
তার কাছে গালিবের কবিতা পড়, দেখাও (উর্দু) কেমন।"

১৮৫০ সাল পর্যন্ত গালিব শুধু ফার্সি ভাষায় লিখেছেন। যখন তিনি মুশায়েরায় (কবিসভা) আমন্ত্রিত হতেন, সেখানে উর্দুই প্রচলিত থাকায় তাঁকে উর্দুতে লিখতে হতো। তবু তিনি ফার্সি ত্যাগ করেননি। পরবর্তী সাত বছর তাঁর উর্দু কবিতার পরিণত অধ্যায় বলে বিবেচনা করা হয়।

আমরা যারা সাধারণ পাঠক উর্দু বা ফার্সি কোনটাই জানি না, তাদের পক্ষে বিশ্বস্ত কোন বাঙলা অনুবাদ ছাড়া গালিবকে আবিষ্কার করা, তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মনন ও কাব্যসৌকর্যের পরিচয় পাওয়া দুরূহ ছিল। কৃতজ্ঞতার বিষয়, কবি বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আলোচ্য গ্রন্থ **গালিব শতক**-এর মাধ্যমে পাঠককে গালিবের গজলের দ্যুতিময় জগতে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর আগেও অনেকে গালিবের কবিতার অনুবাদ বাঙলা-সহ অন্যান্য ভাষায় করেছেন। তবু এই মরমীয়া কবির দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একশ শায়েরির কাব্যানুবাদ **গালিব শতক** প্রকাশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বর্তমান যুগের আস্থাহীনতা, অসহিষ্ণুতা, হিংস্রতার কলুষিত বাতাবরণে গালিবের নিটোল গজলগুলির মানবিক আবেদন ও বিশ্বজনীন অনুভূতির যত প্রচার হয় ততই ভাল।

মুঘল আমলে ইংরেজরা যখন দিল্লি শহর দখল করে নিল তখন গালিবের অনেক বন্ধু-বান্ধব ও পরিজন ব্রিটিশদের নির্মম অত্যাচারের শিকার হন। তাঁর পূর্বপুরুষদের কারো কারো ফাঁসি হয়েছিল। এরপরও জনৈক বন্ধুকে গালিব একটি চিঠি লিখতে পেরেছিলেন ঃ "আদমের প্রতিটি সন্তানকে—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান যাই হোন না কেন, আমি 'ভাই' বলে মনে করি। অন্যরা এতে বিশ্বাস করেন কিনা তা আমি গ্রাহ্য করি না"। মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতার প্রবৃত্তি গালিবের ধর্মনিরপেক্ষ, উদার হৃদয়কে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছিল। তাই তিনি লেখেন ঃ

"দৈর নহীঁ, হরম নহীঁ, দর নহীঁ, আস্তাঁ নহীঁ;
বৈঠে হৈঁ রাহ গুজর-পে হম, গৈর হমেঁ উঠায়ে কিয়ুঁ?"

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর সুন্দর অনুবাদ করেছেন ঃ

"মন্দিরে নয় নয় মসজিদে
নয় দরজায় আস্তানায়
পথের প্রান্তে বসি তবু কেন
আমাকে তুলতে হাত ওঠায়?"

সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত মণিভূষণ ভট্টাচার্যের অনুবাদে দেখি গালিব লিখেছেন :

"ঈশ্বর এক—এটাই আমাদের বিশ্বাস
সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান আমরা বর্জন করতে পারি,
সমস্ত ধর্মই যখন অদৃশ্য হয়ে যায়
তখনই বিশ্বাস পবিত্র হয়ে ওঠে।"

গালিব বিশ্বাস করতেন, জীবন মানে মানুষের আত্ম-আবিষ্কার, শুধু তাই নয়, কবি হিসাবে পাঠকের অন্তরে এমন এক তীব্র অসন্তোষ ও গভীর অস্থিরতা সঞ্চার করা যা আমাদের জীবনের সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে এবং সেই চেতনার আরোহিণী বেয়ে জীবনযাপনকে এক তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতায় মণ্ডিত করে।

গালিব বলতেন :

"তোমার যদি বিশ্বাস থাকে ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা
মঞ্জুর করবেন, তাহলে কিছু চেয়ো না,
যদি চাও, শুধুমাত্র একটি হৃদয় প্রার্থনা করো—
যার কোন ভয় নেই, লক্ষ্য নেই এবং কামনাও নেই।"

ভগবৎকৃপায় সেই হৃদয়াসন যিনি লাভ করেন তাঁরই উপলব্ধি হয় :

"আমি পরমানন্দে হারিয়ে গেছি
নিজেকে জানার মতো কোন উপায়
আমার জানা নেই।"

গালিবের এই কাব্যভাবনা কি আমাদের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' রোমন্থনেরই উদ্দীপনা জাগাচ্ছে না? নুনের পুতুল সাগরে মিশলে কি তার আর পৃথক অস্তিত্ব বজায় থাকে? মরমিয়াবাদী ঐতিহ্যের অনুসরণেই গালিব তাঁর কবিতার মূল প্রতীকরূপে বেছে নিয়েছেন হৃদয়কে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক, আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও গালিবের কবিতায় কান পাতলে কেন শোনা যায় দুঃখ, শোক, নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস? সুরা, সাকি ও প্রণয়ের কেন এত জয়ধ্বনি?

আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক আবদুস সামাদ জানিয়েছেন, গালিব নিজেই তাঁর শায়েরিকে 'গুস্তাখ' বা 'অ-শিষ্ট' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই গুস্তাখই উর্দু কবিতায় যে নতুন ঘরানা সৃষ্টি করেছে তার প্রভাব হয়ে উঠেছে চিরায়ত ও সর্বজনীন। তাই গালিবের রচনা নিছক তাত্ত্বিকের চর্চার বিষয়ে বা দুই মলাটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা অত্যন্ত জনপ্রিয় উদ্ধৃতি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পানওয়ালা থেকে বারবনিতা, ভবঘুরে থেকে ফকিরের মুখে মুখে। অধ্যাপক সামাদ 'উর্দু কাব্যগুলিস্তাঁর এক বিরল প্রজাতির বুলবুল'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে গালিবকে নজরুলের সঙ্গে তুলনা করে

বলেছেন, নিঃসীম হতাশা থেকে উদ্বোধনের বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতিই তাঁর গজলগুলিকে প্রকৃত অর্থে জীবনমুখী করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা বলতে পারি, আধ্যাত্মিক শক্তির জোরেই গালিব দুঃখকে পরম ধন বলে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। অনুবাদকের নির্বাচনের গুণে 'একশ স্বর্ণশায়েরি'র খণ্ডচিত্র থেকে গালিবের পূর্ণতার উদ্ভাস পেতে অসুবিধা হয় না। এপ্রসঙ্গে একটি শায়েরির উল্লেখ এসেই পড়েঃ

"গম-এ হস্তী কা; অসদ, কিস-সে হো জুজ মর্গ ই লজ,
শমা হর রঙ্গ-মে জলতী হৈ সহর হোনে তক।"

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদও সাবলীল ঃ

"জীবনজ্বালায় আর কি ওষুধ আছে
মৃত্যু যদি না ডেকে নেয় তবে
যতক্ষণ না ভোরের আলো ফোটে
প্রদীপকে তো জ্বলে যেতেই হবে।"

নিজের সম্পর্কে গালিব বলতেনঃ "শায়র তো বোহ আচ্ছা হৈ পে বদনাম বহুৎ হৈ" অর্থাৎ "কবি তো ভালই—তবে দুর্নাম ফেরে তার কাছে কাছে।" তখন আমাদের কিন্তু মনে পড়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতেনঃ "যশ অপযশ কুরস সুরস সকল রস তোমারি।"

গ্রন্থের অন্যান্য শায়েরিতে আমরা দেখি, পবিত্র ও নিষিদ্ধ প্রেম একাকার করে মানবপ্রেমী গালিব অসীমের সন্ধানে নিরত। প্রেমিকাকে কখনো তিনি দেখেছেন ভালবাসার পাত্রী-রূপে, কখনো ছলনাময়ী-রূপে, কখনো আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক বা স্বয়ং ঈশ্বর-রূপেই। ফার্সি কবিতায় 'সাকি' (অর্থাৎ যিনি অতিথির পানপাত্র পূর্ণ করে দেন), মদিরা এবং 'মাইখানা' প্রভৃতিকে উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক প্রতীকে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। তার নিশান ধারণ করে রেখেছে উর্দু কবিতাও। গালিবের অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রণয়িনীর চিত্রকল্প ছিল বারবণিতাদেরই চিত্র। অষ্টাদশ শতকের দিল্লি বা লখনৌয়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের প্রভাব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। আবার কোরানের উপদেশ শুনলে আত্মার জন্য অশ্রুপাত করাও ছিল বারবনিতাদের শিষ্টাচারের অঙ্গ। গালিবের গজলে প্রেমের রসলীলার সঙ্গে একান্তভাবে প্রেমের দুঃখলীলাকেও বরণ করা হয়েছে। গালিবের ভাবের মহনীয়তায় বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি আর ভোগবাদী ব্যঞ্জনার দ্যোতক থাকে না, বরং সেগুলির অনুষঙ্গ আমাদের চর্মচক্ষুকে মর্মচক্ষুতে সংশোধিত হতে সাহায্য করে।

অধ্যাপক সামাদ পাঠকবৃন্দকে আশ্বস্ত করেছেন—"অনুবাদগুলি আস্বাদন" করে "সহৃদয় কাব্যপাঠক ঠকবেন না"। আমরা আরো একধাপ এগিয়ে বলতে চাই, মনের উচ্চ ভাবগুলিকে আবাহন করতে হলে, ভূমির চেতনা থেকে ভূমার আনন্দের অংশীদার হতে গেলে বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গালিব শতক-এর ভূমিকা অবশ্যই অনুঘটকের।* □

* ১০০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা




THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA


191354

স্বামী বিবেকানন্দ একটি সার্থক পারিবারিক পত্রিকা করতে চেয়েছিলেন। শতাব্দী-প্রাচীন 'উদ্বোধন'-এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা প্রমাণ করেছে যে, তার মহান প্রবর্তকের ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার সাধনায় সে অনসলভাবে ব্রতী। ভারতে এবং বহির্ভারতে বঙ্গভাষীদের মধ্যে 'উদ্বোধন' বর্তমানে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় এবং এই জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। ১০০তম বর্ষে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকসংখ্যা ছিল ৪০,০০০ এবং পাঠকসংখ্যা প্রায় ২,০০,০০০ (বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশের সময় এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪৫,০০০ এবং প্রায় ২,২৫,০০০।)

স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী তরুণ ও যুবকবৃন্দ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত স্বামীজীর ওজস্বী বাণী ও রচনার দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তদানীন্তন গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট চার্লস টেগার্ট সরকারের কাছে যে সুদীর্ঘ গোপন রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে 'উদ্বোধন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ স্বামীজীর ভয়ানক ব্রিটিশবিরোধী কথার বিশেষ উল্লেখ ছিল। শোনা যায়, 'উদ্বোধন'-কে বাজেয়াপ্ত করার পরামর্শও নাকি তিনি ব্রিটিশ সরকারকে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট প্রভাবের বিষয়টি সর্বজনবিদিত। বঙ্গদেশে এই প্রভাব এসেছিল মূলত 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত স্বামীজীর ভাষণ, কথোপকথন ও রচনাবলীর মাধ্যমে।

'উদ্বোধন' উত্তর কলকাতার বাগবাজারের ১নং উদ্বোধন লেনের (কলকাতা-৭০০ ০০৩) নিজস্ব কার্যালয় থেকে বিগত নব্বই বছর ধরে প্রকাশিত হলেও তার সূচনা হয়েছিল উত্তর কলকাতার কম্বুলেটোলায় (কলকাতা-৭০০ ০০৪) গিরীন্দ্রমোহন বসাকের ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্র লেনের বাড়িতে। সেখানে প্রায় আট বছর থাকার পর 'উদ্বোধন'-এর কার্যালয় দু-বছরের জন্য স্থানান্তরিত হয় বাগবাজারের ৩০নং বোসপাড়া লেনের (কলকাতা-৭০০ ০০৩) ভাড়াবাড়িতে। তারপর 'উদ্বোধন' উঠে আসে তার নিজস্ব ভবনে।

দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে 'উদ্বোধন'ই একমাত্র সাময়িকপত্র, যা সুদীর্ঘ শতবর্ষ ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের অনন্য ঐতিহ্যের অধিকারী। ভারতীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এটি বাস্তবিক একটি স্মরণযোগ্য বিষয়। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত 'ধর্মতত্ত্ব' এবং ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রবর্তিত 'তত্ত্বকৌমুদী' এখনো প্রকাশিত হলেও তাদের প্রকাশ নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত নয়। বিরতি, অনিয়মিত প্রকাশ এবং কয়েকটি সংখ্যার সংযুক্ত প্রকাশ পত্রিকা-দুটিকে শতবর্ষব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যের 'রেকর্ড' গড়তে দেয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীঅরবিন্দ, বিনয়কুমার সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, এস. ওয়াজেদ আলি, সজনীকান্ত দাস, নজরুল ইসলাম, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, বনফুল, জীবনানন্দ দাশ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, রেজাউল্ করিম প্রমুখ সকল বিশিষ্ট বাঙালীই 'উদ্বোধন'-এ লিখেছেন। সাম্প্রতিক কালের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং মননশীল কবি ও লেখক-লেখিকারাও 'উদ্বোধন'-এ নিয়মিত লেখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলার কৃষ্টি ও সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য 'ইন্ডিয়ান এপিক কালচার সেন্টার' 'উদ্বোধন'কে কলকাতার ৩০০তম বর্ষপূর্তিতে 'এপিক পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

পত্র-পত্রিকার অকালমৃত্যুর সুপরিচিত পরিপ্রেক্ষিতে 'উদ্বোধন'-এর ক্রমবর্ধমান গ্রাহক ও প্রচার-সংখ্যা যেকোন সাময়িকপত্রের পক্ষেই ঈর্ষণীয়। একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র কিভাবে তার নিজস্ব চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে একটি 'সম্পূর্ণ' সাময়িকপত্র হয়ে উঠতে পারে 'উদ্বোধন' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে, সস্তা ও চটকদার বিনোদন ও রুচির কাছে কোনভাবে আত্মসমর্পণ না করে 'উদ্বোধন'-এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

'উদ্বোধন : শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন' বাঙালী মানসে 'উদ্বোধন'-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দলিলরূপে আজ ও আগামী দিনের মানুষের কাছে বেঁচে থাকবে। আমাদের বিশ্বাস, বিংশ শতাব্দীর শেষে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিই হয়ে উঠবে বাঙলা ভাষায় শতাব্দীর সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ❑